ত্য।

পত্র ও সমালোচন।

৭৬০/৮

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি

সম্পাদিত।

অষ্টম বর্ষ।

১৩০৪।

কলিকাতা ;

৫০ নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে

শ্রীযতীশচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত

৫০ নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট, সাহিত্য যন্ত্রে

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রবন্ধের বর্ণানুক্রমিক সূচী।

অ

অনুতাপ (ক্ষুদ্র গল্প) ... শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি. এ. ... ২০৩
অমঙ্গলের সৃষ্টি ... শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্. এ. ২৩৯
অশিক্ষিতা (ক্ষুদ্র গল্প) ... শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ... ৩৫৫

আ

আঁথি-নীরে (কবিতা) ... শ্রীচুনীলাল গুপ্ত ... ৪৪৮
আগন্তুক (কবিতা) ... শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়, এম্. এ. ... ৩৪৫
আলফন্স ডোডে (সচিত্র) শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ... ৬০১

উ

উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল, এম্. এ., সি. এস্. ৭৩, ৪০৫, ৫২৫,
উদ্দাম সঙ্গীত (কবিতা) ... শ্রীনৃত্যকৃষ্ণ বসু, এম্. এ. ... ৩৮৭
উল্কা (সচিত্র) ... শ্রীমাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ... ১৭৯

এ

এব্রাহাম্ লিঙ্কলন্ ... শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল, এম্. এ., সি. এস্. ৪৬৭

ঐ

ঐতিহাসিক অর্মে ... শ্রীনিখিলনাথ রায়, বি. এল্. ... ৮৪

ক

কর্ণমর্দ্দনকাহিনী (রহস্য-কবিতা) শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়, এম্. এ. ... ৩৭
কবিতাকুঞ্জ ৯৬, ১৯৭, ২৬৫, ৫৮৬,
কাজির বিচার ... শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বি. এল্. ... ৪৩৯
কীর্ত্তন (গান) ... শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন ... ৪২৮
কোথায় (ক্ষুদ্র গল্প) ... শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ... ১৪৪

গ

গঙ্গোত্রীর পথে ... শ্রীজলধর সেন ... ৪৭২, ৫৭৩,
গান ... শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন ... ৩৯৪

জ

জমা কামেল তুমারী ... শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এ. ... ১০৩
জাপানের পত্র ... পরিব্রাজক ১৩৯
জাপানের প্রথম উপন্যাস ... শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস, সি. আই. ই. ... ৯০

ট

ট্যাভারনিয়ার ও বার্ণিয়ার ... শ্রীনিখিলনাথ রায়, বি. এল্. ... ২৫৪

ত

তীর্থযাত্রীর সঙ্গে ... শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় ৭১৯

দ

দুর্ভিক্ষ না অন্নকষ্ট ? ... শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বি. এল্. ... ১১৯
দেবব্রত (কবিতা) ... শ্রীনৃত্যকৃষ্ণ বসু, এম্. এ. ... ৪৭৯
দেবতার দান (প্রবাদ-গল্প) শ্রীমতী যোগমায়া দেবী ৫৬২
দোষ কাহার ? (ক্ষুদ্র গল্প) শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ৫৩৫

ধ

ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ... শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্. এ. ... ২৩
ধূমকেতু (সচিত্র) ... শ্রীমাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩০৫, ৩৮৮, ৪৪৯

ন

নাক্ষত্রিক সংঘর্ষণ ... শ্রীজগদানন্দ রায় ৩৭৪

প

পরাধীনতা ... শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্. এ. ... ৪৯০
পল্লীগ্রামে দুর্গোৎসব (চিত্র) শ্রীচন্দ্রশেখর কর, বি. এ. ... ৩৩৩
পিতৃ-হীন ... শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল ... ৬৮৫
প্রেমলিপি (কবিতা) ... শ্রীনৃত্যকৃষ্ণ বসু, এম্. এ. ২৯১

ব

বটগাছের কথা (ক্ষুদ্র গল্প) শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় ৩৪৭
বন্ধ্যা ... শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ... ৬৫৩
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য
(সমালোচনা) ... শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্. এ. ... ১৫১
বর্ষার আবাহন (কবিতা) ... শ্রীহরিশ্চন্দ্র নিয়োগী ... ৩২৭

বহুবিবাহ ... শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ... ৩১৯, ৪৮৫
বাঘের ঘরে অতিথি ... শ্রীজলধর সেন ৫৪
বাঙ্গলার ইতিহাসে 'বৈকুণ্ঠ' শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এ. ... ৬৪০
বুড়ী (ক্ষুদ্র গল্প) ... শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি. এ. ... ৮০
বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ ... শ্রীজগদানন্দ রায় ৯৯, ২৩৫, ৪৮০, ৬২৯,
ব্যাঘ্র-শিকার ... শ্রীজলধর সেন ১৬৩

ভ

ভুল (ক্ষুদ্র গল্প) ... শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ২৮১
ভূকম্পন-তত্ত্ব ... শ্রীজগদানন্দ রায় ৬০

ম

মগধের পুরাতত্ত্ব ... শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, এম্. এ. ... ৬৯৭
মলিনমুখী (কবিতা) ... শ্রীহরিশ্চন্দ্র নিয়োগী ৪৩৬
মশক ... ... শ্রীশশিভূষণ বিশ্বাস ৫৫৭
মসূরীর পথে ... শ্রীজলধর সেন ৫৮৯
মহারাষ্ট্র ইতিহাসের উপকরণ শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর ... ৫৪৫
মক্ষিকা-সমাচার ... শ্রীজগদানন্দ রায় ... ৭৬৫
মাতৃ-আজ্ঞা (কবিতা) ... শ্রীনৃত্যকৃষ্ণ বসু, এম্. এ. ৬০৮
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা সম্পাদক ৭১, ১৩৬, ২০১, ২৬৮, ৩৩১,
৩৯৫, ৪৬৬, ৫২৪, ৫৮৮, ৬৫১, ৭৬৯
মুর্শিদাবাদ-কাহিনী (সমালোচনা) শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ... ৩২৯

য

যজ্ঞ ও আহার ... শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪৭
যশোহরে শিকার ... শ্রীনলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়, এম্. এ. ... ৩৯

র

রত্নাবলীর রচয়িতা শ্রীহর্ষ ... শ্রীসতীশচন্দ্র রায়, এম্. এ. ... ৭৩৪
রসভঙ্গ (ক্ষুদ্র গল্প) ... শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি. এ. ... ১৫
রাজা টোডরমল ... শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ... ৬১০
রাণী ভবানী (সচিত্র) ... শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বি. এল্. ১, ২১২,
২৬৯, ৩৬৪, ৩৯৭, ৪৬১, ৬১৪, ৬৬০

ল

লহ উপহার (কবিতা) ... শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল ... ৬৪
লিস্‌বনের ভূমিকম্প ... শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ... ১৬৯

শ

শিকার-কাহিনী ... শ্রীজলধর সেন ৪২১
শ্বেতপদ্মে ভ্রমর (ঐতিহাসিক চিত্র) শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় ... ২৩৯

স

সহযোগী সাহিত্য ... ৬৫, ১২৮, ১৭১, ২৬০, ২৯৮, ৩৭৯, ৪২৯, ৫১৮, ৫৬৬, ৬৩৩, ৭৫৯
সামাজিক সুশিক্ষা ও প্রাকৃতিক কুশিক্ষা শ্রীলালগোপাল চক্রবর্ত্তী, এম্. এ. ... ৬৮৬
সুহৃদ (ক্ষুদ্র গল্প) ... শ্রীনলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়, এম্. এ. ৫১৪
স্নেহের শাসন (কবিতা) ... শ্রীনৃত্যকৃষ্ণ বসু, এম্. এ. ... ৪২০

হ

হাসির গান W ... শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়, এম্. এ. ... ২০০

লেখকগণের নামানুক্রমিক সূচী।

অ

অতুলপ্রসাদ সেন
- কীর্ত্তন (গান) ৪২৮
- গান ১৯৮, ৩৯৪
- লও গো বিদায় (গান) ... ৯৭
- বিরহ (গান) ২৬৬

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বি. এল্.
- কাজির বিচার ৪৩৯
- দুর্ভিক্ষ না অন্নকষ্ট ? ... ১১৯
- রাণী ভবানী ১, ২১২, ২৬৯, ৩৬৪, ৪৬১, ৬১৪, ৬৬০

অক্ষয়কুমার বড়াল
- পিতৃ-হীন (কবিতা) ... ৬৮৫
- প্রেম কি বুঝান যায় ? (কবিতা) ১৯৭
- লহ উপহার (কবিতা) ... ৬৪

উ

উমেশচন্দ্র বটব্যাল, এম্. এ.
- উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি ... ৭০, ৪০৫, ৫২৫
- এব্রাহাম লিঙ্কলন ৪৬৭

ঋ

ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর
- যজ্ঞ ও আহার ৪৭
- হিমালয় (কবিতা) ... ৯৮

ক

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এ.
- জমা কামেল্ তুমারী ... ১০৩
- বাঙ্গালার ইতিহাসে ‘বৈকুণ্ঠ’ ৬৪০

কুঞ্জবিহারী বসাক
- হৃদয়ের আলো (কবিতা) ... ২৬৭

কেশবচন্দ্র কুণ্ডু
- সে আমার গেছে চলে (কবিতা) ২০০

চ

[illegible]ন্দ্রশেখর কর, বি. এ.
- পল্লীগ্রামে দুর্গোৎসব (চিত্র) ৩৩০

[illegible]শেখর মুখোপাধ্যায়
- [illegible]বিবাহ ৩১৯, ৪৮৫
- [illegible]দাবাদ-কাহিনী (সমালোচনা) ৩২৯

চুনীলাল গুপ্ত
- আঁখি-নীরে (কবিতা) ... ৪৪৮
- কবিতা (কবিতা) ৫৮৭

জ

জগদানন্দ রায়
- নাক্ষত্রিক সংঘর্ষণ ৩৭৪
- বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ ৯৯, ২৩৫, ৪৮০, ৬২৯
- ভূকম্পন-তত্ত্ব ৬০
- মক্ষিকা-সমাচার ৭৬৫

জলধর সেন
- গঙ্গোত্রীর পথে ... ৪৭২, ৫৭৩
- বাঘের ঘরে অতিথি ... ৯৪
- ব্যাঘ্র-শিকার ১৬৩
- মসূরীর পথে ৫৮৯
- শিকার-কাহিনী ৪২১

ত

ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য, এম্. এ.
- মগধের পুরাতত্ত্ব ৬৯৭

দ

দীনেন্দ্রকুমার রায়
- তীর্থযাত্রীর সঙ্গে ১১৯
- বটগাছের কথা (গল্প) ... ৩৪৭

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, এম্. এ.
- আগন্তুক (কবিতা) ... ৩৪৫
- কর্ণমর্দ্দনকাহিনী (রহস্য) ... ৩৭
- গান ৫৮৬
- হাসির গান ২০০

ন

নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়, এম্. এ.
- যশোহরে শিকার ৩৯
- সুহৃদ (গল্প) ৫১৪

নিখিলনাথ রায়, বি. এ.
- ঐতিহাসিক অর্মে... ... ৮৪
- ট্যাভারনিয়ার ও বার্ণিয়ার ... ২৫৪

নিত্যকৃষ্ণ বসু, এম্. এ.
- উদ্দাম সঙ্গীত (কবিতা) ... ৩৮৭
- দেবব্রত (কবিতা)... ... ৪৭৯

নীরব সাধনা (কবিতা) ... ২৬৫
প্রেমলিপি (কবিতা) ... ২৯১
বঙ্গের কবিতা (কবিতা) ... ৯৭
বাঁশী (কবিতা) ১৯৭
বিশ্ববধূ (কবিতা) ৫৮৬
মাতৃ-আজ্ঞা (কবিতা) ... ৬০৮
স্নেহের শাসন (কবিতা) ... ৪২০

প

পরিব্রাজক
জাপানের পত্র ১৩৯

প্রমথনাথ রায় চৌধুরী
কুহু (কবিতা) ৫৮৭

প্রমীলা নাগ
শিশু (কবিতা) ৯৬
সিন্ধু (কবিতা) ৫৮৬

ব

বিনয়কুমারী ধর
সন্ধ্যা (কবিতা) ২৬৭

ম

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি
রাজা টোডরমল ৬১০

মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
উল্কা (সচিত্র) ১৮৯
ধূমকেতু (সচিত্র) ৩০৫, ৩৮৮, ৪৪৯

য

যোগমায়া দেবী
দেবতার দান (প্রবাদ-গল্প) ৫৬২

র

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্. এ.
অমঙ্গলের সৃষ্টি ২৩৯
ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ২৩
পরাধীনতা ৪৯০

ল

লালগোপাল চক্রবর্ত্তী, এম্. এ.
সামাজিক সুশিক্ষা ও প্রাকৃতিক
কুশিক্ষা ৬৮৬

শ

শরচ্চন্দ্রদাস, সি. আই. ই.
জাপানের প্রথম উপন্যাস ... ৯০

শশিভূষণ বিশ্বাস
মশক ৫৫৭

স

সখারাম গণেশ দেউস্কর
মহারাষ্ট্র ইতিহাসের উপকরণ ৪৪৫

সরলাবালা সরকার
মীরার প্রার্থনা (কবিতা) ... ৯৮

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি. এল্.
অনুতাপ (ক্ষুদ্র গল্প) ... ২০৩
রসভঙ্গ (ক্ষুদ্র গল্প)... ... ১৫
বুড়ী (ক্ষুদ্র গল্প) ৮০
মরণের পথে (কবিতা) ... ১৯৮

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা ৭১, ১৩৬,
২০১, ২৬৮, ৩৩১, ৩৯৫, ৪৬৬, ৫২৪,
৫৮৮, ৬৫১, ৭৬৯

সতীশচন্দ্র রায়, এম্. এ.
রত্নাবলীর রচয়িতা শ্রীহর্ষ ... ৭৩৪

হ

হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী
বর্ষার আবাহন (কবিতা) ... ৩২৭
মলিনমুখী (কবিতা) ... ৪৩৬

হরিসাধন মুখোপাধ্যায়
শ্বেতপদ্মে ভ্রমর ২৯৬

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্. এ., বি. এল্.
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (সমালোচনা) ১৫১

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
অশিক্ষিতা (ক্ষুদ্র গল্প) ... ৩৫৫
আল্‌ফন্স ডোডে (সচিত্র) ... ৬০১
কোথায় (ক্ষুদ্র গল্প) ... ১৪৪
তুমি (কবিতা) ৫.৬
দোষ কাহার (ক্ষুদ্র গল্প) ... ৫
নিকটে চেও না আর (কবিতা) ৯৮
পথ চাহি (কবিতা) ... ২৬৭
বন্ধ্যা (ক্ষুদ্র গল্প) ৬৫৩

মাসানুক্রমিক সূচী।

বৈশাখ।

১। রাণী ভবানী ১
২। রসভঙ্গ (গল্প) ১৫
৩। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ২৩
৪। কর্ণমর্দ্দনকাহিনী (রহস্য) ... ৩৭
৫। যশোহরে শিকার ৩৯
৬। যজ্ঞ ও আহার ৪৭
৭। বাঘের ঘরে অতিথি (ভ্রমণ) ৫৪
৮। ভূকম্পন-তত্ত্ব ৬০
৯। লহ উপহার (কবিতা) ... ৬৪
১০। সহযোগী সাহিত্য ৬৫—৭১
১। সাহিত্য ... ৬৫
২। জীবনচরিত ... ৬৫
৩। সমালোচনা ... ৬৮
৪। বিবিধ ... ৭০
১১। মাসিক সাহিত্য সমালোচনা ৭১

জ্যৈষ্ঠ।

১। উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি ... ৭৩
২। বুড়ী (ক্ষুদ্র গল্প) ... ৮০
৩। ঐতিহাসিক অর্‌মে ... ৮৪
৪। জাপানের প্রথম উপন্যাস ... ৯০
৫। কবিতাকুঞ্জ ৯৬
৬। বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ ৯৯—১০৩
১। নূতন বায়বশক্তি ... ৯৯
২। উল্কাপিণ্ড ১০১
৩। নূতন বার্ত্তাবহ যন্ত্র ... ১০২
৭। জমা কামেল্ তুমারী ... ১০৩
৮। দুর্ভিক্ষ না অন্নকষ্ট? ... ১১৯
৯। সহযোগী সাহিত্য ... ১২৮—১৩৪
১। ন্যানসেনের মেরুভ্রমণ ১২৮
২। ইংরাজী সাহিত্য ... ১৩০
৩। স্পেনে স্ত্রীশিক্ষা ... ১৩৪
১০। মাসিক সাহিত্য সমালোচনা ১৩৬

আষাঢ়।

১। জাপানের পত্র ... ১৩৯
২। কোথায় (গল্প) ... ১৪৪
৩। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (সমালোচনা) ১৫১
৪। ব্যাঘ্র-শিকার ১৬৩
৫। লিস্‌বনের ভূমিকম্প ... ১৬৯
৬। সহযোগী সাহিত্য ১৭১—১৭৯
১। মিসেস্ অলিফ্যাণ্ট্ ... ১৭১
২। স্ত্রীজাতির সাহিত্য-ব্যবসায় ১৭৪
৩। পারস্যের শাহ ... ১৭৫
৪। ইন্দ্রজাল ১৭৭
৭। উল্কা (সচিত্র) ১৭৯
৮। কবিতাকুঞ্জ ১৯৭
৯। হাসির গান ২০০
১০। মাসিক সাহিত্য সমালোচনা ২০১

শ্রাবণ।

১। অনুতাপ (ক্ষুদ্র গল্প) ... ২০৩
২। রাণী ভবানী ... ২১২
৩। বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ ২৩৫—২৩৯
১। অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র ... ২৩৫
২। ভারতে সূর্য্যগ্রহণ ... ২৩৭
৩। মাইক্রোফোনোগ্রাফ ... ২৩৮
৪। অমঙ্গলের সৃষ্টি ... ২৩৯

৫। ট্যাভারনিয়ার ও বার্ণিয়ার ... ২৪৩
৬। সহযোগী সাহিত্য ২৬০—২৬৫
১। সমাজতত্ত্ব ;—চীনরমণী ২৬০
২। ভ্রমণ ;—ব্রহ্মদেশ ... ২৬৩
৭। কবিতাকুঞ্জ ... ২৬৫
৮। মাসিক সাহিত্য সমালোচনা ২৬৮

ভাদ্র।

১। রাণী ভবানী ২৬৯
২। ভুল (ক্ষুদ্র গল্প) ২৮১
৩। প্রেমলিপি (কবিতা) ... ২৯১
৪। শ্বেতপদ্মে ভ্রমর ... ২৯৩
৫। সহযোগী সাহিত্য ... ২৯৮—৩০৫
১। সাহিত্য ২৯৮
২। সমাজতত্ত্ব ৩০০
৩। বিবিধ ৩০৪
৬। ধূমকেতু (সচিত্র) ... ৩০৫
৭। বহুবিবাহ ৩১৯
৮। বর্ষার আবাহন (কবিতা) ৩২৭
৯। মুর্শিদাবাদ-কাহিনী (সমালোচনা) ৩২৯
১০। মাসিক সাহিত্য ... ৩৩১

আশ্বিন।

১। পল্লীগ্রামে দুর্গোৎসব (চিত্র) ৩৩৩
২। আগন্তুক (কবিতা) ... ৩৪৫
৩। বটগাছের কথা (গল্প) ... ৩৪৭
৪। অশিক্ষিতা (গল্প) ... ৩৫৫
৫। রাণী ভবানী (সচিত্র) ... ৩৬৪
৬। নাক্ষত্রিক সংঘর্ষণ ... ৩৭৪
৭। সহযোগী সাহিত্য ৩৭৯—৩৮৭
১। সাহিত্য ... ৩৭৯
২। শিক্ষা ... ৩৮১
৮। উদ্দাম সঙ্গীত (কবিতা) ... ৩৮৭
৯। ধূমকেতু (সচিত্র) ... ৩৮৮
১০। গান ৩৯৪
১১। মাসিক সাহিত্য ৩৯৫

কার্ত্তিক।

১। রাণী ভবানী ৩৯৭
২। উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি ... ৪০৫
৩। স্নেহের শাসন (কবিতা) ... ৪২০
৪। শিকার-কাহিনী ৪২১
৫। কীর্ত্তন (গান) ৪২৮
৬। সহযোগী সাহিত্য ... ৪২৯—৪৩৫
১। প্রত্ন-তত্ত্ব ৪২৯
২। জীবন-চরিত ৪৩১
৩। ভ্রমণবৃত্তান্ত ৪৩৩
৪। বিবিধ ৪৩৪
৭। মলিনমুখী (কবিতা) ... ৪৩৬
৮। কাজির বিচার ৪৩৯
৯। আঁখি-নীরে (কবিতা) ... ৪৪৮
১০। ধূমকেতু (সচিত্র) ... ৪৪৯
১১। মাসিক সাহিত্য ৪৬৬

অগ্রহায়ণ।

১। রাণী ভবানী ৪৬১
২। এব্রাহাম লিঙ্কলন ৪৬৭
৩। গঙ্গোত্রীর পথে ৪৭২
৪। দেবব্রত (কবিতা) ... ৪৭৯
৫। বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ ... ৪৮০
৬। বহুবিবাহ ৪৮৫
৭। পরাধীনতা ৪৯০
৮। সুহৃদ (গল্প) ৫১৪
৯। সহযোগী সাহিত্য ... ৫১৮—৫২৪
১। সাহিত্য ৫১৮
২। সমাজ-তত্ত্ব ৫২১
৩। বিবিধ ৫২২
১০। মাসিক সাহিত্য ৫২৪

পৌষ।

১। উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি ... ৫২৫
২। দোষ কাহার ? (গল্প) ... ৫৩৫
৩। মহারাষ্ট্র ইতিহাসের উপকরণ ৫৪৫
৪। মশক ৫৫৭
৫। দেবতার দান (প্রবাদ-গল্প) ৫৬২
৬। সহযোগী সাহিত্য ... ৫৬৬—৫৭৩
১। সাহিত্য ৫৬৬
২। ভ্রমণবৃত্তান্ত ৫৬৯
৩। বিবিধ ৫৭১
৭। গঙ্গোত্রীর পথে ৫৭৩
৮। কবিতাকুঞ্জ ৫৮৬
৯। মাসিক সাহিত্য ৫৮৮

মাঘ।

১। মসূরীর পথে ৫৮৯
২। আল্‌ফন্স ডোডে (সচিত্র) ... ৬০১
৩। মাতৃ-আজ্ঞা (কবিতা) ... ৬০৮
৪। রাজা টোডরমল ৬১০
৫। রাণী ভবানী ৬১৪
৬। বৈজ্ঞানিক সার-সংগ্রহ ... ৬২৯
৭। সহযোগী সাহিত্য ... ৬৩৩—৬৪০
১। সাহিত্য ৬৩৩
২। জীবনচরিত ৬৩৬
৩। ভ্রমণবৃত্তান্ত ৬৩৮
৮। বাঙ্গলার ইতিহাসে ‘বৈকুণ্ঠ’ ৬৪০
৯। মাসিক সাহিত্য ৬৫১

ফাল্গুন ও চৈত্র।

১। বন্ধ্যা (গল্প) ৬৫৩
২। রাণী ভবানী ৬৬০
৩। পিতৃ-হীন (কবিতা) ... ৬৮৫
৪। সামাজিক সুশিক্ষা ও প্রাকৃতিক কুশিক্ষা ৬৮৬
৫। মগধের পুরাতত্ত্ব ৬৯৭
৬। তীর্থযাত্রীর সঙ্গে ৭১৯
৭। রত্নাবলীর রচয়িতা শ্রীহর্ষ ... ৭৩৪
৮। সহযোগী সাহিত্য ... ৭৫৯—৭৬৫
১। সাহিত্য ৭৫৯
২। জীবনচরিত ৭৬২
৯। মক্ষিকা-সমাচার ৭৬৫
১০। মাসিক সাহিত্য ৭৬৯

চিত্র সূচী।

১।	ছাতিনগ্রাম—রাণী ভবানীর পিত্রালয়	১ পৃষ্ঠার পূর্ব্বে
২।	উল্কাসংঘাতের চিত্র	১৮৩
৩।	উল্কাবর্ষণের জন্মভূমি	১৮৪
৪।	উল্কা-কক্ষা	১৮৬
৫।	রাণী ভবানীর জন্মস্থান—ছাতিনগ্রাম	২৬৯ পৃষ্ঠার পূর্ব্বে
৬।	ধূমকেতু প্রবন্ধের প্রথম চিত্র	৩১২
৭।	ধূমকেতু প্রবন্ধের দ্বিতীয় চিত্র	৩১৬
৮।	ধূমকেতু প্রবন্ধের তৃতীয় চিত্র	৩৯২
৯।	মহারাজা রামকৃষ্ণের সাধনমন্দির	৩৯৭ পৃষ্ঠার পূর্ব্বে
১০।	ধূমকেতু প্রবন্ধের চতুর্থ চিত্র	৪৫২
১১।	ধূমকেতু প্রবন্ধের পঞ্চম চিত্র	৪৬২
১২।	আল্‌ফন্স ডোডে	৬০১ পৃষ্ঠার পূর্ব্বে

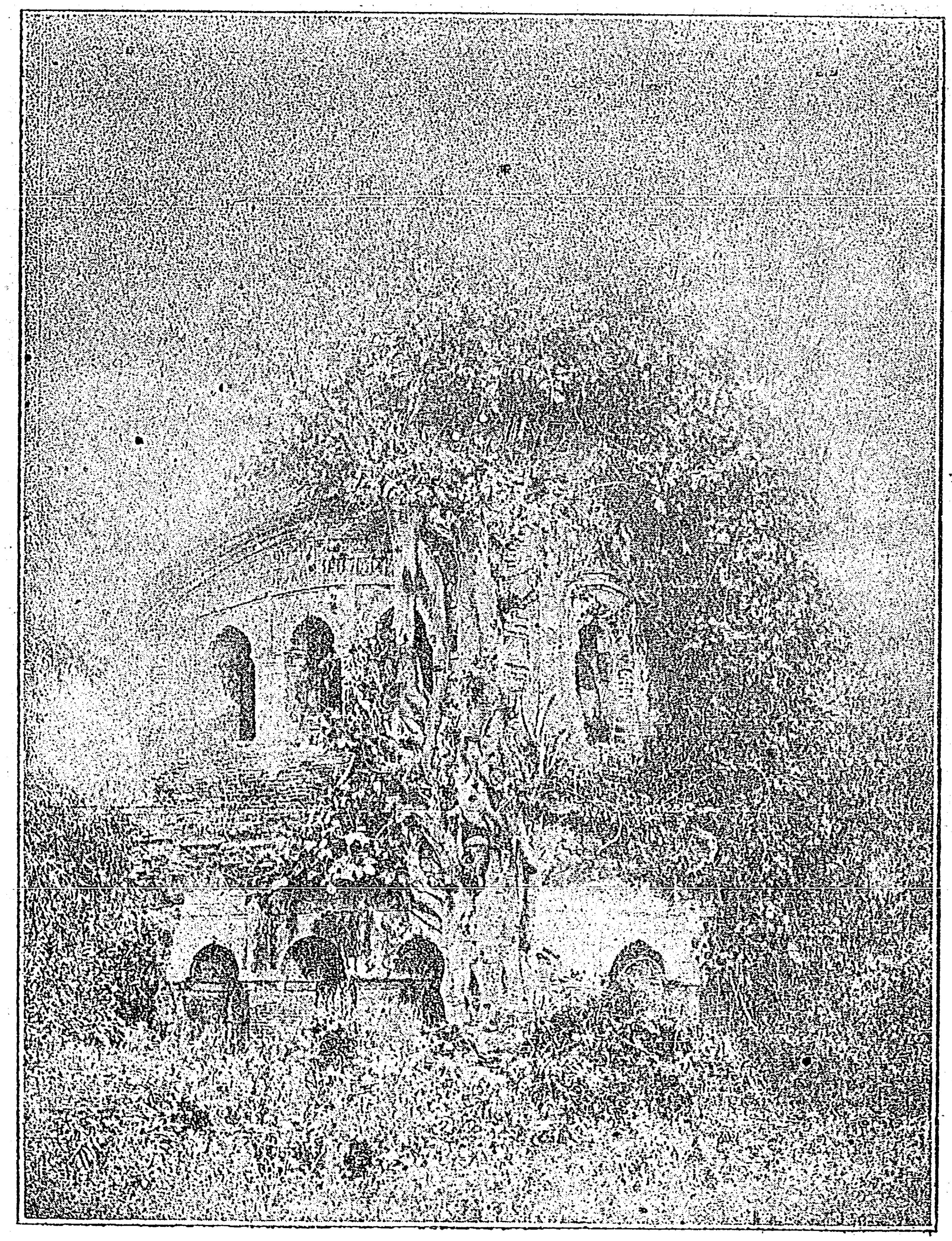

ছাত্নিগ্রাম—রাণী ভবানীর পিত্রালয়।

রাণী ভবানী।

প্রথম পরিচ্ছেদ—বংশাবলী।

রাজসাহী প্রদেশে ছাতিনগ্রাম নামে একটি সমৃদ্ধিশালী পল্লীগ্রাম ছিল। গ্রামখানি নিতান্ত ছোট নহে,—কিন্তু এখন আর সেকালের শ্রী সৌভাগ্য কিছুই নাই। চারি দিক বন জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে ; কেবল স্থানে স্থানে দুই চারিটি পুরাতন দীঘি পুষ্করিণী এবং কতকগুলি ইষ্টকস্তূপ পূর্ব্বগৌরবের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছে! গ্রামবাসীদিগের বিশ্বাস যে, সেকালে এক জন পরাক্রান্ত হিন্দু রাজা এই গ্রামে রাজধানী স্থাপন করিয়া প্রবল প্রতাপে রাজ্যশাসন করিতেন। সে রাজ্যের কোন চিহ্ন নাই ; সে রাজবংশেরও কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না ;—তবে শুনিতে পাওয়া যায় যে, সেই হিন্দুরাজ্যের নাম সপ্তপর্ণগ্রাম ছিল, তাহাই এখন ছাতিনগাঁ নামে পরিচিত হইয়াছে।

নবাবী আমলে ছাতিনগাঁর চৌধুরীবংশের সবিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল, গ্রামের অবস্থাও কথঞ্চিৎ ভাল ছিল বলিয়াই শুনিতে পাওয়া যায়। তৎকালে আত্মারাম চৌধুরী নামে এক জন ধনাঢ্য বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ এই গ্রামের জমিদার ছিলেন। এখনও স্থানে স্থানে আত্মারামের উচ্চ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। লোকে এখন আত্মারামের কথা ভুলিয়া গিয়াছে,—কিন্তু আত্মারাম-দুহিতা রাণী ভবানীর পুণ্যনাম বাঙ্গালীর সাহিত্যে, ইতিহাসে, কবিতায় এবং জনশ্রুতিতে মিলিত হইয়া, সকলের নিকটেই চিরপরিচিত হইয়া রহিয়াছে।

যেখানে রাণী ভবানীর জন্ম হয়, সেই স্থানটি এখন কতকগুলি অযত্নসম্ভূত লতা গুল্মে ঢাকিয়া পড়িয়াছে। ভবানী নিজ জন্মস্থানের পুণ্যভূমি নির্দ্দেশ করিয়া তাহার উপর এক রমণীয় দেবমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া, তাহাতে মাতার নামানুসারে জয়দুর্গা নামে এক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। জন্মভূমির উপর চিরদিন দেবার্চ্চনা হইবে বলিয়া রাণী ভবানী জয়দুর্গার নিত্যপূজা ও

মহোৎসবাদির জন্য পার্শ্ববর্ত্তী ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। মধ্যস্থলে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণের সম্মুখে জয়দুর্গার মন্দির, মন্দিরের পার্শ্বে রন্ধনশালা, এবং প্রবেশপথে সুরচিত তোরণযুক্ত সিংহদ্বার গঠিত হইয়াছিল। সেই তোরণশিরে বসিয়া প্রভাতে সায়াহ্নে বৈতালিকগণ সুললিত রাগ রাগিণীতে জয়দুর্গার জয়গান করিত, সশস্ত্র প্রহরী প্রহরে প্রহরে সদর্পে পাদচারণ করিয়া বেড়াইত, এবং উৎসবসময়ে তোরণ-দ্বারে ধুম জ্যোতি বিকীরণ করিয়া ভবানীর কামান থাকিয়া থাকিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিত। এখন সে সৌভাগ্যগর্ব্ব জনশ্রুতিতে পরিণত হইয়াছে; জয়দুর্গার মন্দির ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; সেই ভগ্নাবশেষের উপর লতাগুল্ম দেহ বিস্তার করিয়াছে; একখানি পর্ণ-কুটীরে জয়দুর্গা আশ্রয় লাভ করিয়া নিত্যপূজা গ্রহণ করিতেছেন। দীঘির জল মসীমলিন হইয়া উঠিয়াছে; সিংহদ্বার ধূলিবিলুণ্ঠিত হইয়াছে; লতাবিতানে মুখ লুকাইয়া ইষ্টকস্তূপের মধ্যে ভবানীর কামান জরাজীর্ণকলেবরে কালাতিপাত করিতেছে। সকলই শ্রীহীন হইয়াছে,—কিন্তু তথাপি সেই পুণ্যভূমির ধূলিমুষ্টির সহিত রাণী ভবানীর পুণ্যস্মৃতি যেন জীবন্তভাবে জড়িত হইয়া রহিয়াছে!

যে সময়ে পরাক্রান্ত মোগল সাম্রাজ্য পরমুখ-প্রত্যাশী বিলাস-লোলুপ নামসর্ব্বস্ব দিল্লীশ্বরের কুক্ষিচ্যুত হইতেছিল; যখন বাহুবল এবং ষড়যন্ত্রই সমুদায় রাষ্ট্রনীতির অদ্বিতীয় মীমাংসক হইয়া উঠিয়াছিল, সেই মহাবিপ্লবকালে জন্মগ্রহণ করিয়া, সম্পদে বিপদে নানা ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে পড়িয়াও রাণী ভবানী অর্দ্ধ-শতাব্দী কাল রাজসাহীর বিস্তৃত রাজ্যের শাসনভার পরিচালন করিয়া, স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণকামনায় যে সকল পুণ্যকীর্ত্তির সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালী তাহা অল্পদিনের মধ্যেই ভুলিয়া যাইতেছে।

আজ কাল "রাজসাহী" বলিতে যত ছোট খাট একটি জেলা বুঝায়, সেকালে তাহা বুঝাইত না। সেকালের রাজসাহীরাজ্য পরিদর্শন করিয়া এক জন ইংরাজ * লিখিয়া গিয়াছেন যে, "গত শতাব্দীর মধ্যভাগে রাণী ভবানীর অধিকৃত রাজসাহীর বিস্তৃত রাজ্য ভ্রমণ করিয়া আসিতে ৩৫ দিন সময় লাগিত। সেই বিস্তীর্ণ জনপদের বার্ষিক আয় এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ, তাহা হইতে বৎসর বৎসর ৭০ লক্ষ টাকা নবাব-সরকারে রাজকর প্রদান করিতে হইত।" আর এক জন অনুসন্ধাননিপুণ সমসাময়িক ইংরাজ লেখক বলেন যে,

* Holwell.

"বঙ্গদেশে,—এমন কি সমুদায় ভারতবর্ষে, রাজসাহীর মত এত বড় জমিদারী আর কোথায়ও ছিল কি না সন্দেহ। ইংরাজ কুঠিয়ালদিগের অধিকাংশ পণ্যদ্রব্য এবং অতুৎকৃষ্ট রেশম এই জমিদারীর মধ্যেই উৎপন্ন হইত। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্তও রাজসাহী, নদীয়া, মুরশিদাবাদ, যশোহর, বীরভূমি ও বর্দ্ধমানের অধিকাংশ জনপদ এই জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইংরাজ-শাসনের আরম্ভসময়ে রাজসাহীর আয়তন ১২৯০৯ বর্গমাইল স্থিরীকৃত হইয়াছিল।" *

নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা রামজীবন এই বিস্তৃত রাজ্যের প্রথম রাজা, এবং তাঁহার প্রাতঃস্মরণীয়া পুত্রবধূ মহারাণী ভবানী সেই বিখ্যাত রাজবংশের উজ্জ্বল রত্ন। নাটোর রাজবংশের সে বিস্তৃত রাজ্য আর নাই, কালক্রমে তাহা সংকুচিত হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু রাণী ভবানীর বংশধর বলিয়া, কি স্বদেশে কি বিদেশে, তাঁহাদিগের পদগৌরব ও রাজসম্মান এখনও অটুট রহিয়াছে।

পৃথিবীতে কাহারও চিরদিন সমান যায় না। অধঃপতিত বাঙ্গলাদেশেরও এক সময়ে গৌরবের দিন আসিয়াছিল। সেই গৌরবের দিনে, শতসৌধবিভূষিত গৌড়নগরীর উচ্চ সিংহাসনে বসিয়া, পালবংশীয় বৌদ্ধ নরপতিগণ কাশী কান্যকুব্জ পর্য্যন্ত শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন। সে গৌরবের দিন চলিয়া গিয়াছে;—আছে কেবল দুই চারিখানি জরাজীর্ণ প্রস্তর-ফলক; তাহাই লইয়া স্বদেশ বিদেশের পরিব্রাজকগণ শ্মশানভস্মের মধ্যে অতীত-গৌরবের বিলুপ্তকাহিনীর অনুসন্ধান করিয়া থাকেন।

অনুসন্ধান-নিপুণ পণ্ডিতেরা বলেন যে, অনুমান ১০৪০ খৃষ্টাব্দ বা তৎসমকাল হইতে পালবংশীয় বৌদ্ধ নরপতি বিগ্রহপালকে পরাজয় করিয়া হিন্দুধর্ম্মানুরাগী আদিশূর বাঙ্গলা দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। †

* Grant's Analysis of Finances of Bengal.

† বারেন্দ্র কুলশাস্ত্র-বিশারদগণও বলিয়া থাকেন—

"সকল-গুণসমেতাঃ সাগ্নিকা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ
হুতবহ-সমভাসা ব্রাহ্মণাঃ কান্যকুব্জাৎ।
নিজপরিকরবর্গৈঃ পাবনং পাপমুক্তং
সুরসরিদবধৌতং যান্তি গৌড়ং মনোজ্ঞং॥
তত্রাদিশূরঃ শূরবংশসিংহো বিজিত্য বৌদ্ধং নৃপপাল-বংশং
শশাস গৌড়ং দিতিজান্ বিজিত্য যথা সুরেন্দ্রস্ত্রিদিবং শশাস।
আগত্য গৌড়ং নৃপতেরনুজ্ঞয়া নাম্না বরেন্দ্রং বহুশস্যযুক্তং
আশ্রিত্য দেশং খলু বিপ্রবর্য্যা বাসং প্রচক্রুর্বহুমানযুক্তাঃ॥"

আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে বেদবেদাঙ্গপারগ যে পঞ্চগোত্রীয় পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনাইয়া বঙ্গদেশে উপনিবেশ সংস্থাপন করাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কাশ্যপ-গোত্রীয় সুষেণ মুনি এক জন। নাটোর রাজবংশীয়গণ এই সুষেণবংশের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ।

আদিশূরের পরবর্ত্তী সময়ে প্রদ্যুম্ন ও বরেন্দ্রশূরের শাসনকালে, বাঙ্গলাদেশ দুই ভাগে বিভক্ত হয়। পশ্চিমে মহানন্দা ও পূর্ব্বে করতোয়া,—এই দুই নদীর মধ্যস্থ স্থান বরেন্দ্রশূরের নামানুসারে বারেন্দ্রভূমি বলিয়া পরিচিত হয়। স্বনামখ্যাত বল্লালসেন ব্রাহ্মণদিগের বাসস্থানের নামানুসারে রাঢ় ও বারেন্দ্র আখ্যা প্রদান করেন। সেই সময়ে সুষেণের অধস্তন অষ্টম পুরুষে স্বর্ণরেখ ও ভবদেব নামে দুই ভাই বর্ত্তমান ছিলেন; স্বর্ণরেখ ও তাঁহার সন্ততিগণ বারেন্দ্রদেশে বাস করিতেন বলিয়া বারেন্দ্র আখ্যা প্রাপ্ত হন।

ব্রাহ্মণদিগের আচার ও চরিত্রগত পার্থক্য দেখিয়া বল্লালসেন তাঁহাদিগের কুলমর্য্যাদার নিরূপণ করিয়া দিয়াছিলেন। সেই মর্য্যাদানিরূপণের সময়ে কাশ্যপগোত্রীয় সুষেণ-বংশের ক্রতু ও মতু নামে দুই ভাই রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা বাসগ্রামের নামানুসারে ক্রতু ভাদুড়ী ও মতু মৈত্র উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নাটোর-রাজবংশধরগণ সেই মৈত্র-বংশের সন্তান।

বল্লালসেনের সময়ে মতু ও তাঁহার সন্তানগণ কুলীন-পদবী লাভ করিয়াছিলেন। মতুর বংশে সুষেণের অধস্তন ষোড়শ পুরুষে কেশব মৈত্রেয় জন্মগ্রহণ করেন; তিনি কুলীন বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র জীবর মৈত্রেয় চণ্ডীপতি ভাদুড়ীর "উপকারের করণে" লিপ্ত হইয়া কুলচ্যুত হন। * একবার কুলচ্যুত হইলে আর কেহ কুলীন হইতে পারেন না; সুতরাং জীবর মৈত্রেয়ের বংশধরগণ আর কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্ত হন নাই। নাটোর-রাজবংশধরগণ এই জীবর মৈত্রেয়ের বংশজাত।

বল্লালী আমলে বাসগ্রামের নামানুসারে ব্রাহ্মণদিগের "গাঁই" অর্থাৎ পদবী নির্ণীত হইত। নবাবী আমলে নিত্য নূতন পদবীর সৃষ্টি হইতে লাগিল। যাঁহারা মুসলমানসরকারে কোনরূপ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা ও তাঁহাদের বংশধরগণ নানাবিধ যাবনিক উপাধি লাভ করিয়া আজিও তাহা গৌরবের সহিত বহন করিয়া আসিতেছেন। মুসলমান রাজ্য আর নাই;—কিন্তু রায়, চৌধুরী, মজুমদার, খাঁ, মুন্সী, সরকার প্রভৃতি মুসলমান-

* তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

দত্ত উপাধি এখনও হিন্দু মুসলমানে সমভাবে বহন করিয়া আসিতেছেন। এই প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া জীবর মৈত্রেয়ের অধস্তন দ্বাদশ পুরুষে কামদেব মৈত্রেয় "সরকার" উপাধি প্রাপ্ত হন। এই কামদেব সরকার নাটোর রাজবংশের আদিপুরুষ।

কামদেব সরকার পুঁঠিয়াধিপতি নরনারায়ণ ঠাকুরের অধীনে পরগণে লস্করপুরের অন্তর্ভুক্ত বারইহাটী গ্রামের তহশীলদার ছিলেন। সেই কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে সর্ব্বদাই পুঁঠিয়ার রাজধানীতে গমনাগমন করিতে হইত। পুঁঠিয়ার রাজবংশ অতি প্রাচীন; তাঁহাদের বংশগৌরবের উপযোগী পুণ্যকীর্ত্তিরও অভাব ছিল না। তৎকালে পুঁঠিয়া বিদ্যাশিক্ষার একটি কেন্দ্রস্থান হইয়া উঠিয়াছিল; রাজানুকম্পায় বিবিধশাস্ত্রবিশারদ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ তথায় চতুষ্পাঠী খুলিয়া অকাতরে বিদ্যাদান করিতেন। কামদেবের তিন পুত্র রামজীবন, রঘুনন্দন ও বিষ্ণুরাম পুঁঠিয়ার রাজধানীতে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতেন।

মধ্যমপুত্র রঘুনন্দন বাঙ্গলার ইতিহাসে প্রতিভাশালী শাস্ত্রবিশারদ রাজমন্ত্রী বলিয়া পরিচিত। রঘুনন্দন অতি অল্পবয়সেই সেই প্রতিভার পরিচয় দিতে আরম্ভ করেন। তিনি রাজানুকম্পায় সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় সবিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া অতি অল্পবয়সেই পুঁঠিয়ার রাজসরকারে এক জন ব্যবস্থাশাস্ত্রবিশারদ কার্য্যকুশল রাজকর্ম্মচারী বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিলেন।

প্রতিভার সঙ্গে জনশ্রুতির চির-সংস্রব। রঘুনন্দন ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর রামজীবনের সম্বন্ধেও একটি কৌতুকাবহ অলৌকিক জনশ্রুতি প্রচলিত হইয়াছে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই যে, রামজীবন ও রঘুনন্দন পুঁঠিয়ার রাজসরকারে দেবপূজকের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এক দিন রামজীবন শ্রান্তদেহে পুষ্পোদ্যানে নিদ্রা যাইতেছিলেন, এমন সময়ে রাজা আসিয়া দেখিলেন যে, এক বিষধর কালসর্প ফণাবিস্তার করিয়া রামজীবনকে রৌদ্রতাপ হইতে রক্ষা করিতেছে। এইরূপ অলৌকিক ঘটনা রাজ্যলাভের পূর্ব্বসূচনা বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল; রাজা সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, রামজীবন ও রঘুনাথকে ডাকাইয়া, অতি সংগোপনে তাঁহাদের উভয় ভ্রাতাকে এইরূপে ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন যে, কালে তাঁহারা রাজা হইলে যেন পুঁঠিয়ার রাজ্যে কখনও হস্তক্ষেপ না করেন। এই জনশ্রুতির মূল্য কি, কবে কোথা হইতে কোন্ সূত্রে ইহার উৎপত্তি,—তাহার কোন বিশ্বাসযোগ্য

ইতিহাস নাই; লোকমুখে ইহা এতই বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে যে, নাটোর রাজবংশের কাহিনী লিখিতে গিয়া বাঙ্গালী লেখকমাত্রেই এই অলৌকিক জনশ্রুতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। রাজসাহীর রাজাদিগের পরিচয় দিতে গিয়া স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র কলিকাতা রিভিউ পত্রে যে সুদীর্ঘ প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহাতেও ইহার উল্লেখ আছে; কিন্তু তিনি রামজীবনের পরিবর্ত্তে রঘুনন্দনের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। *

এই জনশ্রুতি কালে ইতিহাসেও স্থান লাভ করিয়াছে; কিন্তু সকল স্থলেই "নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ" সত্য বলিয়া গ্রহণ করা নিরাপদ নহে। এক জন তহশীলদারের পুত্রকে উত্তরকালে রাজ্যলাভ করিতে দেখিয়া, ঐতিহাসিক ঘটনাপরম্পরা বা কার্য্যকারণশৃঙ্খলার যথোপযুক্ত বিচার না করিয়া কল্পনা-লোলুপ জনসাধারণ যে রামজীবন ও রঘুনন্দনের সম্বন্ধে দুই চারিটি জন-শ্রুতির সৃষ্টি করিবে, তাহা একেবারে অসম্ভব নহে।

রামজীবন ও রঘুনন্দন যখন বিদ্যাশিক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন, তখন হইতেই ধীরে ধীরে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক মহাবিপ্লবের সূচনা হইতেছিল। তখন আরঙ্গজীব বাদশাহ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন,—চারি দিকে তাঁহার বাহুবল ও ততোধিক কূটবুদ্ধির অপূর্ব্ব কৌশলের প্রকাশ্য অভিনয় আরব্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বাদশাহ আরঙ্গজীবের নাম অনল

* "Raghunandana was employed in the Putiya family. He at first served in an humble capacity, but he subsequently rose to power and affluence, partly through the influence of that family, and partly through his own intelligence, cunning and unscrupulousness. It was originally his business, as we have already stated, to gather flowers for the Puja of the family idols. Tradition says that on one occasion while he was employed in this vocation, he was fatigued and fell asleep in a garden, and a snake was observed to spread its hood over his head to protect him from the scorching sun. This circumstance being reported to Darpanarain Rai, the head of the Putiya family, he was surprised at it, and predicted from it the future greatness of Raghunandana. He sent for Raghunandana, assured him that he would de a great Raja and extorted from him a promise not to dispossess his family by fair or foul means, of the Pergana Lashkarpore.'—The Rajas of Rajshahi.

অক্ষরে লিখিত হইয়াছে। তাঁহার কঠোর শাসনের সহস্র নিদর্শনে ভারত-বর্ষের হিন্দুতীর্থগুলি আজিও পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে; আজিও বারাণসী, বৃন্দাবনের হিন্দু দেবমন্দিরের উন্নত ভিত্তির উপর আরঙ্গজীবের উচ্চ মসজেদ্-চূড়া তাঁহার হিন্দুবিদ্বেষের পরিচয় দিতেছে।

আরঙ্গজীব ধর্ম্মান্ধ হইয়া যে সকল মর্ম্মপীড়ায় হিন্দুহৃদয় দলিত করিয়া-ছিলেন, লোকে তাহা ক্রমে ভুলিয়া যাইতেছে। কিন্তু তিনি যে উপায়ে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়া সেই সিংহাসন রক্ষা করিবার জন্য অসি-হস্তে জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরদিনের জন্য তাঁহার কলঙ্ক-কাহিনী ঘোষণা করিতেছে। বৃদ্ধ পিতা সাহজাহানকে নিরপরাধে অন্যায়-কৌশলে আগ্রা দুর্গের একটি ক্ষুদ্র কক্ষে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া, ভ্রাতা ও ভ্রাতৃসন্তানদিগের তপ্তশোণিতে সন্তরণ করিতে করিতে বাদশাহ আরঙ্গ-জীব ভারতবর্ষের স্বর্ণ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু ভাল করিয়া সেই সিংহাসনে উপবেশন করিতে না করিতেই পিতৃদ্রোহের জীবন্ত অভিশাপের প্রত্যক্ষ ফল ফলিতে আরম্ভ করিল। যে সিংহাসনে প্রজাবৎসল আকবর বাদশাহ উপবেশন করিয়া হিন্দু মুসলমানকে প্রীতিবন্ধনে বাঁধিয়াছিলেন, কর্ম্মদোষে সেই সিংহাসনে বসিয়া এক দিনের জন্যও আরঙ্গজীব নিরুদ্বেগ হইতে পারেন নাই।

পৃথিবীতে কাহাকেও তিনি বিশ্বাস করিতেন না; সুতরাং কপটতাই তাঁহার কূটনীতির মূলমন্ত্র হইয়া উঠিয়াছিল। হৃদয়ের অবিশ্বাস লুকাইয়া রাখিয়া মুখের সরলতা দেখাইতে কখনই তিনি ইতস্ততঃ করেন নাই; কিন্তু এত করিয়াও মোগলের অধঃপতনের গতিরোধ করিতে পারিলেন না। যে রাজপুত-বীরগণ অসি-হস্তে দেশ বিদেশে মোগলের বিজয়-পতাকা বহন করিতেছিলেন, তাঁহারাও একে একে গোপনে গোপনে শত্রু হইতে আরম্ভ করিলেন; যে মুসলমান অমাত্যগণ ছায়ার ন্যায় নিয়ত সম্রাটের অনুবর্ত্তন করিতেন, তাঁহারাও সুযোগ বুঝিয়া একে একে বিশ্বাসঘাতকতার বিনিময়ে বিশ্বাসঘাতকতা প্রয়োগ করিতে শিক্ষা করিলেন; এক দিন যে মহারাষ্ট্রীয় বীরগণ "পার্ব্বত্য মূষিক" নামে ঘৃণার সহিত উপহসিত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও ছলের পরিবর্ত্তে ছল, কৌশলের পরিবর্ত্তে কৌশল প্রয়োগ করিয়া, আরঙ্গ-জীবের সকল চেষ্টা বিফল করিতে লাগিলেন। দাক্ষিণাত্যে পরাক্রান্ত হিন্দু-রাজ্যসংস্থাপনের সূত্রপাত হইল; দেশের পর দেশ মহারাষ্ট্র সেনার ঠনলু-

যাতনায় বিপর্য্যস্ত হইতে লাগিল; সম্রাটপুত্রগণ পিতার অসাধু দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিয়া তাঁহার জীবনকালেই সিংহাসনলাভের জন্য ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিলেন; দাক্ষিণাত্য ও অযোধ্যার মুসলমান রাজপ্রতিনিধিগণ স্বাধীনরাজ্য-সংস্থাপনের আয়োজন করিতে লাগিলেন;—অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আরঙ্গজীব চাহিয়া দেখিলেন যে, চারি দিকেই পিতৃশাপের জ্বলন্তশিখা লোলজিহ্বা বিস্তার করিয়াছে, পদতলে মোগলের অটল সিংহাসন টলিয়া উঠিয়াছে, জরাপলিত দুর্ব্বল মুষ্টি হইতে ভারতবর্ষের শাসনদণ্ড খসিয়া পড়িতে চাহিতেছে!

অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বাঙ্গালা দেশেও সেই অধঃপতনের পূর্ব্বসূচনা আরব্ধ হইয়াছিল। যিনিই বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার শাসনভার প্রাপ্ত হন, তিনিই ছলে বলে কৌশলে স্বাধীন হইবার আয়োজন করেন; কখন বহুব্যয়ে ও সৈন্যক্ষয়ে বাঙ্গলা দেশ পদানত করিতে হয়, কখন বা অন্যান্য প্রদেশের রাজকোষ হইতে অর্থভিক্ষা করিয়া বাঙ্গলা দেশের অভাবমোচন করিতে হয়। বাঙ্গলার এই সকল দুর্দ্দশা দেখিয়া, আরঙ্গজীব এক নূতন কৌশলের উদ্ভাবন করিলেন। এক জন মাত্র নবাবের হস্তে সৈন্যবল ও ধনবল থাকাতেই পদে পদে বিপদ উপস্থিত হইতেছে দেখিয়া, তিনি বাঙ্গলা দেশের জন্য দুই জন নবাব নিযুক্ত করিলেন। এক জন "নবাব নাজিম" হইয়া সৈন্যবলে দেশরক্ষা ও রাজদণ্ডে প্রজাশাসন করিবেন, এবং আর এক জন "নবাব দেওয়ান" হইয়া রাজকর সংগ্রহ করিয়া, উভয় নবাবের আবশ্যক ব্যয়ভার বহন করিবেন, এবং উদ্বৃত্ত অর্থ দিল্লীর দরবারে পাঠাইয়া দিবেন। এই কৌশল-নীতি অবলম্বন করিয়া আরঙ্গজীব আপন পৌত্র আজিমশ্বান্‌কে "নবাব নাজিম" ও আপন বিশ্বস্ত অনুচর মুর্শিদ কুলীখাঁকে "নবাব দেওয়ান" করিয়া, ১৭০১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলা দেশে পাঠাইয়া দিলেন। এই উভয় নবাব ঢাকা নগরের রাজধানীতে থাকিয়া বাঙ্গালা দেশ শাসন করিতে আরম্ভ করিলেন।

কুলীখাঁ ব্রাহ্মণ-সন্তান; অতি অল্প বয়সে এক ধনাঢ্য মুসলমান তাঁহাকে ক্রীতদাসরূপে ক্রয় করিয়া ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত ও পারসী আরবী ভাষায় সুশিক্ষিত করেন। ইসলাম ধর্ম্মে কুলীখাঁর ঐকান্তিক অনুরাগ জন্মিয়াছিল, কিন্তু তিনি প্রতিভা ও শিক্ষার বলে বাদশাহের নিকট কর্ম্মকুশল বীরপুরুষ বলিয়াই সমধিক পরিচিত ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘকাল রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া কুলী খাঁ যে প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন, তাহাতেই বাদশাহ

তাঁহাকে নবাব-দেওয়ান করিয়াছিলেন। মুসলমান হইলেও হিন্দুর প্রতি তাঁহার প্রাণের মধ্যে অজ্ঞাতসারে যে সহানুভূতির স্রোত প্রবাহিত হইত, তাহা কোনদিনই বিলুপ্ত হয় নাই। তিনি ধর্ম্মবিশ্বাস অপেক্ষা প্রতিভা ও কার্য্যতৎপরতার সমধিক সম্মান করিতেন, সুতরাং তাঁহার শাসনসময়ে প্রতিভাশালী কার্য্যকুশল হিন্দুদিগের পক্ষে পদোন্নতি লাভ করার কোনরূপ বাধা বা অসুবিধা ছিল না।

কুলী খাঁ বাঙ্গলাদেশে আসিয়া অল্পদিনের মধ্যেই রাজকোষের শোচনীয় অবস্থার মূলকারণ বুঝিতে পারিলেন। দিল্লীর দরবারের প্রিয়পাত্র মুসলমান অমাত্য ও সেনাপতিগণ বাদশাহদিগের মনস্তুষ্টি করিয়া সময়ে সময়ে বহুতর নিষ্কর "জায়গীর" পুরস্কার পাইতেন। তাঁহারা বাদশাহের মন্ত্রিসভার সহায়তায় বাঙ্গলাদেশের উর্ব্বর ভূমিগুলি জায়গীর লইতে পারিলে অন্য প্রদেশে জায়গীর লইতে স্বীকৃত হইতেন না। এইরূপে বাঙ্গলাদেশের অধিকাংশ স্থানই জায়গীরদারদিগের অধীন হইয়া পড়িয়াছিল। অবশিষ্ট স্থানে যে সকল হিন্দু জমিদার বাস করিতেন, তাঁহারা প্রায়ই রাজকর দিতেন না; এবং সুযোগ বুঝিলে দিল্লীর অধীনতা পর্য্যন্তও অস্বীকার করিতেন। কুলী খাঁ সম্রাটের অনুমতি লইয়া মুসলমান জায়গীরদারদিগকে উড়িষ্যার পার্ব্বত্যপ্রদেশে জায়গীর নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া বাঙ্গলার সমুদায় স্থান "সকর" করিয়া লইলেন, এবং প্রথম বৎসরেই বাদশাহের নিকট এক কোটি টাকা রাজকর পাঠাইয়া আরঙ্গজীবের সবিশেষ প্রীতিভাজন হইয়া উঠিলেন।

এই সময়ে বাঙ্গলার জমিদারদিগের পক্ষ হইতে হিসাব নিকাশ বুঝাইয়া দিবার জন্য নবাব-দরবারে এক এক জন মোক্তার রাখিবার নিয়ম ছিল। তাঁহারা নবাব-দরবারে নিজ নিজ প্রভুর পক্ষে প্রতিনিধিস্বরূপ সকল কার্য্যই সম্পাদন করিতেন। ইংরাজদিগের সমসাময়িক কার্য্যবিবরণীতে লিখিত আছে যে, প্রধান প্রধান জমিদারগণ আপন আপন পদমর্য্যাদার অনুরূপ এক এক জন মোক্তার রাখিয়া রাজধানীর সহিত চিঠিপত্র চালাইতেন। *

* "It was the custom for the landholders of distinction and other principal inhabitants to maintain in proportion to their rank an intercourse with the ruling power, and in person or by Vakeel or 'agent' to be in constant attendance at the seat of Government.—Fifth Report.

এই সকল মোক্তারদিগের বিদ্যাবুদ্ধি এবং কার্য্যতৎপরতার উপরেই বাঙ্গলার জমিদারদিগের মানসম্ভ্রম ও জমিদারী নির্ভর করিত; সুতরাং যাঁহারা স্বয়ং নবাব-দরবারে বাস করিতে পারিতেন না, তাঁহারা নিজ কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী ব্যক্তিকেই মোক্তারি পদে নিযুক্ত করিতেন। এই কার্য্যে সর্ব্বদা প্রত্যুৎপন্নমতির প্রয়োজন হইত; পারস্য ভাষায়, মুসলমান ও হিন্দু ব্যবহার শাস্ত্রে এবং হিসাব নিকাশের কূট প্রশ্নাদির মীমাংসা-কার্য্যে সমধিক অভিজ্ঞতা না থাকিলে কেহ এই কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিতেন না। মোক্তারগণ ঢাকায় বাস করিয়া কানন-গো দপ্তরে হিসাব নিকাশ বুঝাইয়া দিতেন। এই কার্য্যে দুই জন কাননগো নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহারা নবাব-দেওয়ানের হিসাব নিকাশ পরীক্ষা করিয়া মোহর দস্তখত করিয়া দিলে তবে তাহা বাদশাহ গ্রহণ করিতেন; সুতরাং নবাবগণ তাঁহাদিগকে কিয়ৎপরিমাণে ভয় করিয়া চলিতেন।

মুর্সিদ কুলী খাঁ নবাব হইয়া আসিলে পুঁঠিয়ার রাজার পক্ষ হইতে ঢাকায় এক জন মোক্তার নিযুক্ত করা আবশ্যক হইয়া উঠিল। রঘুনন্দনের বিদ্যাবুদ্ধি ও প্রতিভা দেখিয়া পুঁঠিয়ার রাজা তাঁহাকেই এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া ঢাকায় পাঠাইলেন। ইহাই নাটোর রাজবংশের ভবিষ্যৎ রাজ্যলাভের প্রথম সোপান। শুনা যায় যে, রঘুনন্দন এমন সহজে ও সুকৌশলে হিসাব নিকাশ প্রস্তুত করিবার এক নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে, কাননগো-দপ্তরে শীঘ্রই তিনি "নায়েব-কাননগো" পদে নিযুক্ত হইলেন।

প্রকৃত প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ যে কার্য্যেই নিযুক্ত হউন না কেন, যখন তাঁহাদের প্রতিভা প্রকাশ হইয়া পড়ে, তখন তাঁহারাই সেই কার্য্যে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠেন। যিনি প্রভু, তিনিও নিজের বিচারবুদ্ধি অপেক্ষা প্রতিভাশালী অধীনস্থ কর্ম্মচারীর বিচারবুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই কারণে অতি অল্পদিনের মধ্যে রঘুনন্দনের উপরেই সকল ভার ন্যস্ত হইয়া পড়িল; তিনি নায়েব কাননগো হইলেও কাননগো-দপ্তরে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। এই কার্য্যে মান সম্ভ্রম ও খ্যাতি প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে রঘুনন্দনের অর্থাগমের পথও প্রশস্ত হইল। তিনি ক্রমে নবাব-দরবারের এক জন ক্ষমতাশালী রাজকর্ম্মচারী হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে ঢাকার নবাবদিগের মধ্যে এক অভাবনীয় বিবাদের সূত্রপাত হওয়াতে রঘুনন্দনের ক্ষমতা চরমসীমায় আরোহণ করিল।

কুলীখাঁর ন্যায় এক জন হিন্দু ক্রীতদাসকে সামান্য সৈনিক-পদবী হইতে নবাব-দেওয়ানের উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়া আরঙ্গজীব কখনও অনুতাপ করেন নাই, বরং বর্ষে বর্ষে বহু লক্ষ টাকা রাজকর পাইয়া তাঁহার উপর ক্রমেই বিশ্বাস স্থাপন করিতেছিলেন। কিন্তু সম্রাট-পৌত্র আজিমশ্বান্ এক জন নগন্য সৈনিককে সহকারী নবাবের উচ্চ পদে আরোহণ করিতে দেখিয়া প্রথমে একটু অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; ক্রমে তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি বাড়িতে দেখিয়া বিরক্তি ঈর্ষ্যায় পরিণত হইতে লাগিল। মনের ভাব অধিক দিন গোপন রহিল না। প্রথমে একটু মনোমালিন্য, ক্রমে বাদানুবাদ, অবশেষে প্রকাশ্য শত্রুতা আরম্ভ হইল। আজিমশ্বান্ গোপনে কুলীখাঁকে হত্যা করিবার আয়োজন করিলেন। সেই চক্রান্ত শীঘ্রই প্রকাশ হইয়া পড়িল; ক্রমে বাদশাহের নিকট সে সংবাদ প্রেরিত হইল। আরঙ্গজীব আজিমশ্বানকে পাটনায় স্থানান্তরিত করিবার আদেশ দিয়া, মুর্সীদ কুলীখাঁর হিসাব নিকাশ তলব করিয়া পাঠাইলেন।

কুলীখাঁ হিসাব নিকাশ লইয়া স্বয়ং সম্রাটের নিকট গিয়া আনুপূর্ব্বিক সমুদায় অবস্থা বলিবার অবসর পাইবেন, এই চিন্তায় আজিমশ্বানের মুখ শুকাইয়া গেল; কিসে মুর্সিদ কুলীখাঁর যাওয়া রহিত হইতে পারে, সেই চিন্তাই প্রবল হইয়া উঠিল। অবশেষে আজিমশ্বান্ স্থির করিলেন যে, যদি কাননগোদ্বয় নবাব-দেওয়ানের হিসাবে মোহর দস্তখত না করেন, তাহা হইলেই সকল দিক রক্ষা হয়। তিনি কাননগোদিগকে শাসন করিয়া দিলেন। আজিমশ্বান্ সম্রাটের পৌত্র, কালে তিনি বাদশাহ হইলেও হইতে পারেন; আর মুর্সিদ কুলীখাঁ আজ আছেন, কাল নাই; সুতরাং আজিমশ্বানের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া কুলীখাঁর হিসাব নিকাশের কাগজে মোহর দস্তখত করা কাননগোদিগের সাহসে কুলাইল না। মুর্সিদ কুলীখাঁর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল; যদি একজন কাননগোও মোহর দস্তখত না করেন, তবে সে কাগজে বাদশাহ দৃষ্টিপাত করিবেন না, এবং নিতান্ত অপদস্থ হইয়া তাঁহাকে নবাবীপদ ত্যাগ করিতে হইবে, এই চিন্তায় কুলীখাঁ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তখন অনন্যোপায় হইয়া নায়েব-কাননগো রঘুনন্দনের শরণাগত হইলেন।

রঘুনন্দনের চেষ্টায় এক জন মাত্র কাননগোর মোহর-দস্তখতযুক্ত হিসাব ও বহুতর উপঢৌকনদ্রব্য লইয়া কুলীখাঁ সম্রাটের নিকট গমন করিলেন।

সম্রাট তখন দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধক্ষেত্রে, অর্থের তখন বড়ই অনাটন; কুলীখাঁও বহুতর অর্থ লইয়া রাজদ্বারে দণ্ডায়মান; সুতরাং দুই জন কাননগো কেন মোহর দস্তখত করেন নাই, সে কথা জিজ্ঞাসার সময় হইয়া উঠিল না। বাদশাহ উপঢৌকনদ্রব্য ও রাজকর গ্রহণ করিয়া রাজপ্রসাদের চিহ্নস্বরূপ মূল্যবান্ রাজপরিচ্ছদ "খেলাত" দিয়া, কুলীখাঁকেই বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার একমাত্র নবাব করিয়া পাঠাইলেন। কুলীখাঁ আসিয়া মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থাপন করিলেন, এবং উপকারী বন্ধু রঘুনন্দনকে আনাইয়া তাঁহাকে রায়-রাইয়ান ও দেওয়ান করিলেন। সেই হইতে প্রতিভার সঙ্গে ক্ষমতা আসিয়া মিলিত হইল,—তাহাই নাটোররাজবংশের রাজ্যলাভের মূলকারণ।

তৎকালের দেওয়ানই প্রকৃতপ্রস্তাবে নবাব ছিলেন, এবং তজ্জন্য দেওয়ানী-পদের মান সম্ভ্রম ও ক্ষমতা বড়ই অধিক ছিল। লোকে সহসা নবাব-দরবারে গমন করিতে পারিত না, সুতরাং অর্থী, প্রত্যর্থী, রাজা, জমিদার, সকলেই দেওয়ানের দরবারে জানু পাতিয়া উপবেশন করিতেন, এবং তাঁহার শুভদৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বিবিধ উপঢৌকনদ্রব্য "নজর" প্রদান করিতেন। রঘুনন্দন দেওয়ানী পদে আরোহণ করিয়া এই সকল মান সম্ভ্রম এবং উচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হইলেন।

এই ঘটনার বর্ণনা করিতে গিয়া অধিকাংশ লেখকই বলিয়া গিয়াছেন যে, কাননগোর মোহর রঘুনন্দনের নিকটেই থাকিত, তিনি কাননগোর অজ্ঞাতসারে গোপনে সেই মোহর লইয়া নবাবের কৃত্রিম আয় ব্যয়ের কাগজে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া দিয়া প্রত্যুপকারস্বরূপ রায়-রাইয়ান ও দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন। *

* "Raghunandana was originally employed as an apprentice or clerk in the canongoe's office. The Nawab, on one occasion, being desirous of submitting false returns of his revenue collections before the Mogal Emperor, was ofcourse obliged to tamper with the canongoe's papers; for some reason he does not appear to have been able to effect his purpose through the canongoe himself; but he had recourse to this apprentice Raghunandana; that person entered into the plot, and having abstracted the canongoe's seal was enabled to draw up fictitious papers for his employer duly stamped and sealed. As a reward for this service,

রঘুনন্দনের নবাব-দরবারে প্রভুত্ব ছিল, এবং সেই প্রভুত্বই যে রামজীবনের রাজ্যলাভের মূলকারণ, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই প্রভুত্বের মূল কি? ঢাকার ইতিহাসলেখক বিনা প্রমাণে রঘুনন্দনকে জালিয়াতি অপরাধে অপরাধী করিয়াছেন। বাস্তবিক্ মুর্সিদ কুলী খাঁ জাল হিসাব প্রস্তুত করিয়াছিলেন কি না, তাহার কোন প্রমাণ নাই; বরং আনুষঙ্গিক ঘটনা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, জাল হিসাব প্রস্তুত করিবার আদৌ কোন কারণ ছিল না। বাঙ্গলাদেশে কত টাকা আয় হয়, কত টাকা ব্যয় হয়, বাদশাহেরা তাহার তত্ত্ব লইবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন না। রাজা টোডরমল্ল বাঙ্গলাদেশের যে রাজস্ব নির্ণয় করেন, তাহাতে বার্ষিক এক কোটী টাকা বাদশাহের প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু সেই এক কোটী টাকা কোন বৎসরেই আদায় হইত না। মুর্সিদ কুলী খাঁ বাঙ্গলাদেশে আসিয়া প্রথম হইতেই এক কোটী টাকা রাজকর প্রদান করিয়া আসিতেছিলেন; সুতরাং কৃত্রিম হিসাব নিকাশ প্রস্তুত করিবার আদৌ কোন আবশ্যকতা ছিল না। সেই হিসাবে প্রকাশ্যভাবে কাননগো দস্তখত মোহর করিতে স্বীকার না করার কারণ কি, ঢাকার ইতিহাসলেখক তাহার কোনও উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং কতকগুলি আনুমানিক প্রস্তাবের উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হয় নাই।

সম্রাট মুর্সিদ কুলী খাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন; বরং তাঁহার উপর এতই সন্তুষ্ট ছিলেন যে, আপন পৌত্রকেও তাঁহার জন্য পাটনায় স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। সেই সন্তোষের চিহ্নস্বরূপ সম্রাট কুলী খাঁকে বাঙ্গলার নবাব-দেওয়ান করিয়াছিলেন। কুলী খাঁ প্রথম বৎসর হইতেই এক কোটী টাকা হিসাবে রাজকর প্রদান করায় সম্রাটের আহ্লাদের সীমা ছিল না। এই সকল কথা জনশ্রুতি নহে,—ঐতিহাসিক সত্য। যদি আজিমশ্বানের সঙ্গে বিবাদ না হইত, তবে যে কাননগো মোহর দস্তখতে অস্বীকার করিতেন না, তাহাও অনুমান করা যাইতে পারে। কাননগোর তখন উভয় সঙ্কটের

Raghunandana appears to have been favoured at the court of Moorshidabad and to have exercised considerable influence and it was through his good offices that Ramjiban succeeded in being nominated to the zamindary of Rajshahy"—History and Statistics of the Dacca Division, by E. M. Lewis, p. 201.

অবস্থা;—আজিমশ্বানের অনুরোধ অবহেলা করাও যেমন নিরাপদ নহে, কুলী খাঁর কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত না করাও সেইরূপ সহজ নহে; এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া কাননগো গোপনে কুলী খাঁর অনুরোধ রক্ষা করিয়া, প্রকাশ্যে আজিমশ্বানের নিকট তাহা অস্বীকার করিয়া, উভয় নবাবের নিকটেই "সরফরাজ" থাকিবার জন্য যে চেষ্টা করেন নাই, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখিয়া গিয়াছেন, "এই সময়ে বাঙ্গলাদেশ রীতিমত শাসন করিতে শৈথিল্য করায় বাদশাহ নবাবের উপর অতিমাত্র অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সেই রাজরোষ পরিহারের জন্য নবাব আয় ব্যয়ের এক কৃত্রিম হিসাব প্রস্তুত করাইয়া কাননগোকে তাহাতে মোহর দস্তখত করিতে অনুরোধ করেন; কাননগো অস্বীকার করায় নবাব রঘুনন্দনের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। নবাবের অনুগ্রহলাভের এরূপ সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া রঘুনন্দন সে প্রবল লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না,—নবাব যাহা বলিলেন, তিনি তাহাই করিলেন।" * কিশোরী বাবু রঘুনন্দনের মস্তকে কলঙ্কভার অর্পণ করিবার সময়ে যদি অগ্রপশ্চাৎ বিচার করিয়া দেখিতেন, তবে দেখিতে পাইতেন যে, "এই সময়ে বাঙ্গলাদেশ রীতিমত শাসন করিতে শৈথিল্য করায় বাদশাহ নবাবের উপর অতিমাত্র অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন"—এই কথা গুলির কোনও ঐতিহাসিক মূল্য নাই। শাসনভার আজিমশ্বানের হস্তে ন্যস্ত ছিল, তাহার জন্য বাদশাহ কুলী খাঁর উপর অসন্তুষ্ট হইবেন কেন; এবং তাহার জন্য কুলী খাঁ কৃত্রিম হিসাবই বা প্রস্তুত করিতে অগ্রসর হইবেন কেন?

তৎকালে রঘুনন্দনের ন্যায় আর কেহ ব্যবস্থাশাস্ত্রবিশারদ ও অর্থনীতিকুশল রাজকর্ম্মচারী ছিল না; সুতরাং বাঙ্গলাদেশের রাজস্ব-নির্ণয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে, কুলী খাঁর ন্যায় প্রতিভাশালী নবাব যে রঘুনন্দনকেই দেওয়ান নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কথা নাই। কেবলমাত্র প্রত্যুপকার করিবার জন্য যে নবাব তাঁহাকে দেওয়ানী-পদে বরণ করিয়াছিলেন, তাহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। এ কালের বড়লোকেরাও যাহাকে ধরিয়া বড়লোক বলিয়া পরিচিত হন, তাহার কথা অল্পই স্মরণ করিয়া রাখেন; মুর্শিদ কুলী খাঁ সে কালের স্বাধীন নবাব হইয়া যে কেবলমাত্র উপকারী বন্ধু বলিয়াই রঘুনন্দনকে দেওয়ান করিয়াছিলেন, এবং রঘুনন্দন

* The Rajas of Rajshahi.

যে "জালিয়াতি" করিয়া তাহারই বিনিময়ে সেই উচ্চ রাজপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বিশ্বাস করিতে হইলে ঐতিহাসিক প্রমাণ আবশ্যক;—কেবলমাত্র জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া রঘুনন্দনের উজ্জ্বল প্রতিভায় কলঙ্ক আরোপ করা সঙ্গত নহে।

ক্রমশঃ।

রসভঙ্গ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিবাহের এক মাস পরে মনোরঞ্জন সস্ত্রীক বরানগরের বাগানবাড়ীর উদ্দেশে যাত্রা করিল।

খুব ভোর থাকিতে স্বামী স্ত্রীতে পান্সীতে গিয়া উঠিল। পান্সী তীরবেগে ছুটিয়া চলিল। কল কারখানা জাহাজ জেটি সহরের হট্টগোল ছাড়িয়া পান্সী যখন ফাঁকায় গিয়া পৌঁছিল, মনোরঞ্জন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। ছবি আঁকা গ্রাম, নদীতীর, লতিকামণ্ডপচ্ছায়ে প্রচ্ছন্ন কুটীর, শিবের মন্দির, স্বচ্ছ নীলাকাশ, নদীর কুলু কুলু শব্দ—যেন স্বপ্নরাজ্য বলিয়া বোধ হইল। প্রকৃতি স্নেহময়ী মাতার ন্যায় অনশনক্ষুধিত হৃদয়ের মুখে অন্ন দিয়া যেন মনোরঞ্জনের হৃত মানসিক স্বাস্থ্যকে পুনরানয়ন করিলেন। বিবাহের এই এক মাস উৎসব আনন্দে, হাস্যরঙ্গকৌতুকতরঙ্গে প্রভা যেন সকলের সঙ্গে মিশিয়া ছিল, আজ সে মনোরঞ্জনের অতি নিকটস্থ করায়ত্ত বলিয়া মনে হইল। প্রবল উচ্ছ্বাসে মনোরঞ্জন বলিয়া উঠিল, "সমস্ত জীবনটা যদি এই রকম সুখে ভাসিয়া যাওয়া যাইত!" প্রভা ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "অর্থাৎ বল না কেন, পৃথিবীতে যদি ঝড় বৃষ্টি নামক পদার্থটা না থাকিত।"—মনোরঞ্জন কহিল, "তোমার সঙ্গে ঝড় বৃষ্টি গহন অরণ্য মরণও আমার পক্ষে সুখ!" মনোরঞ্জন উত্তেজিত হইয়া দ্বিগুণ উচ্ছ্বাস সহকারে বলিতে লাগিল—"জান প্রভা, এত দিন আমি এই সংসারকে ঠিক মরুর মত দেখিতাম—তপ্ত বালুময় নীরস কঠিন বারিহীন তরুলতাহীন তৃণহীন অসীম প্রান্তর কেবল ধূ ধূ করিতেছে; তাহার মাঝে তৃষার্ত্ত আমি শুষ্ককণ্ঠে দগ্ধচরণে বাণবিদ্ধ হরিণের মত অস্থির হইয়া ছুটিয়া

বেড়াইয়াছি, কোথাও জল পাই নাই, কোথাও বসিবার ঠাঁই পাই নাই! কত কাঁদিয়াছি, কতবার মরণকে আলিঙ্গন করিতে গিয়াছি, কেহ আমাকে এ সঙ্কট হইতে উদ্ধার করে নাই! প্রভা, প্রেমময়ী প্রেয়সি, তুমিই আমাকে উদ্ধার করিয়াছ, আমাকে মুক্তি দিয়াছ, হতাশ্বাস মৃত জীবনকে ত্রাণ করিয়াছ! কতবার ভগবানের উপর অবিশ্বাস আসিয়াছিল, পাপ পুণ্য কথার কথা বলিয়া বোধ হইয়াছিল, কতবার বিপথে কুপথে যাইবার প্রবল ইচ্ছা হইয়াছিল, তুমিই আমাকে রক্ষা করিলে! প্রভা, আমি জীবনে কখনো কাহারও নিকট হইতে ভালবাসা পাই নাই, কখনো কাহাকেও ভালবাসি নাই, নিকট আত্মীয় ছাড়া অন্য কোন রমনীর সংস্পর্শে কখনও আসি নাই—তুমিই আমার জীবনের স্পর্শমণি! কতবার এই পথ দিয়া গিয়াছি, কিন্তু আজিকার মত এমন সুখ কখনও পাই নাই!—"

কথা শেষ হইতে না হইতে পান্সী ঘাটে আসিয়া লাগিল। মনোরঞ্জন আগে নামিয়া স্ত্রীর হাত ধরিয়া নামাইয়া দিল। প্রভা নূপুরনিক্বণে মল ঝম্ ঝম্ করিয়া ঈষৎ হাসিতে হাসিতে যখন বাগানে প্রবেশ করিল, প্রস্তর-সোপানবাহী পরিস্কার ছবির মত বাড়িটি, স্ফটিকস্বচ্ছবারিবর্ষী ফোয়ারা, বহু-বিস্তৃত পুষ্করিণী, আম্রতরুকুঞ্জ, সম্মুখে কুলপ্লাবিনী গঙ্গা, সকলেই যেন নীরব অব্যক্ত ভাষায় বাবুর নূতন গৃহিণীটিকে সমাদর করিয়া লইল। মনোরঞ্জনের আজ বাগানবাড়ী করা সার্থক মনে হইল।

দিন গুলা সুখে জলের মত বহিয়া যাইতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রভা বাপের বাড়ী হইতে তাহার ছেলেবেলাকার বুড়ী দাসী শঙ্করীকে শ্বশুরবাড়ীতে আনিয়াছিল। তাহার অসুখ হওয়াতে বাগানে তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিতে পারে নাই। দাসীর অভাবে প্রভার বড়ই কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। মনোরঞ্জন সকলকে দাসী খুঁজিতে বলিয়া দিল।

এক দিন সন্ধ্যায় দুই জনে বারান্দায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে বাগানের মালী আসিয়া খবর দিল, "মা ঠাকুরুণ, এক জন দাসী এসে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, আপনি কি তাকে রাখবেন?" প্রভা তাহাকে ডাকিয়া আনিতে বলিল।

দেখিতে গৌরবর্ণ। বয়স তেইশ চব্বিশ হইবে। পরণে লাল পেড়ে শাড়ী।

মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া জটাবদ্ধ চুল। মুখে বসন্তের দাগ, সামনের দাঁত দুটি ভাঙ্গা। দেখিলেই মনে হয়, এক সময়ে দেখিতে খুব সুশ্রী ছিল, অবস্থার ফেরে তাহার এমন দশা হইয়াছে। দাসীশ্রেণী অপেক্ষা তাহাকে অনেক উচ্চ বলিয়া মনে হয়; বেশ বুঝা যায়, দায়ে পড়িয়া তাহাকে দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে।

প্রভা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি?" সে বলিল, "লক্ষ্মী।" "সব কাজ করতে পারবে ত?" "কেন পারব না? যা বলবেন তাই করব।" সেই দিন হইতেই লক্ষ্মী কাজে নিযুক্ত হইল।

নূতন দাসীটি কিছু অতিরিক্ত কৌতূহলপরবশ ছিল। সন্ধ্যায় বারান্দায় বসিয়া মনোরঞ্জন প্রভাতে যখন নানারূপ গল্প হইত, লক্ষ্মী দরজার আড়ালে থাকিয়া এক মনে সব শুনিত। একটু উচ্ছ্বাস হইলে মনোরঞ্জন প্রায়ই বলিত, "প্রভা! আমার জীবনে কখনো কাহাকেও এত ভালবাসি নাই।" লক্ষ্মী শুনিয়া মনে মনে খুব হাসিত। কখনো কখনো দুপুর বেলায় কৌচের উপর পা ছড়াইয়া দিয়া প্রভা শুইয়া শুইয়া বঙ্কিম বাবুর নভেল পড়িত, আর লক্ষ্মী নীচে বসিয়া পা টিপিয়া দিত। এক দিন প্রভা "মৃণালিনী" পড়িতেছে, লক্ষ্মী দেখিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "বৌ ঠাকুরুণ মৃণালিনী পড়চ? হেমচন্দ্র বড় নিষ্ঠুর না?" শুনিয়া প্রভা অবাক হইল। "তুই আবার বঙ্কিম বাবুর নভেল পড়তে শিখলি কবে?" "হাঁ বৌ ঠাকুরুণ, ছেলে বেলায় বাপ মা একটু লিখতে পড়তে শিখিয়েছিল, তাই বঙ্কিম বাবুর দু'একটা বই পড়েছি।" প্রভা বলিল, "তুই যে দেখচি আমাদের লিটারারী দাসী হলি!"

দুই মাস বাগানবাড়ীতে কাটিয়া গেল।

সে দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে মেঘ করিয়া আসিয়াছিল; টিপি টিপি বৃষ্টিও পড়িতেছিল। ওপারের গাছ পালা ঘর বাড়ী ধূমাচ্ছন্ন ঝাপ্সা দেখাইতে-ছিল। বকুল গাছ হইতে টুপ্ টাপ্ করিয়া বারিসিক্ত ফুলগুলি মাটীতে পড়িতেছিল; তাহার গন্ধ ও জলের চঞ্চল ছলছল শব্দ মনের মধ্যে এক রকম নেশার ভাব গড়িয়া তুলিতেছিল। প্রভা মুখ ধুইয়া, চুল বাঁধিয়া, রঙীন কাপড় পরিয়া, খোঁপায় একটি মালা জড়াইয়া, খাটের উপর চুপ করিয়া শুইয়াছিল, লক্ষ্মী পদপ্রান্তে বসিয়া পা টিপিয়া দিতেছিল। মনোরঞ্জন সামনের ঘরে ডেস্কের কাছে বসিয়া চিঠি লিখিতেছিলেন। তখন বর্ষার অন্ধকারে, মেঘের গর্জ্জনে, বৃষ্টির শব্দে, তরঙ্গিত গঙ্গার কল্লোচ্ছ্বাসে প্রভার অন্তরে একটি

মুগ্ধ মধুর স্নিগ্ধ সুন্দর আবেশের সঞ্চার হইতেছিল—সে হৃদয়াবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া আনন্দজলরেখাপ্লুত চক্ষে লক্ষ্মীর নিকট আপন স্বামি-সৌভাগ্যগর্ব্ব উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রকাশ করিতেছিল। সহসা লক্ষ্মীর মুখে একটা উদ্দীপ্ত তীব্রতার ভাব দেখিয়া থামিল, মনে সন্দেহ হইল যে, এই মেঘমেদুর অন্ধকারে অবিরলবৃষ্টিপাতশব্দে লক্ষ্মীরও কোনও সুখসৌভাগ্য-স্মৃতি জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। নিজের কথা রাখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, লক্ষ্মী, তুই কাহাকেও ভাল বাসিয়াছিলি, তোকে কেহ ভালবাসিয়াছিল ? লক্ষ্মী স্ফুলিঙ্গবৎ কটাক্ষ বিক্ষেপ করিয়া কহিল, "ঠিক তোমারি মত ভালবাসিয়াছিলাম, ঠিক তোমার মত ভালবাসা পাইয়াছিলাম।" শুনিয়া স্বামিসৌভাগ্যগর্ব্বিতা প্রভুপত্নী মনে মনে রাগিল—তাহার সহিত কাহারও তুলনা ! বিশেষতঃ তাহার দাসী লক্ষ্মীর ! কিঞ্চিৎ উদ্ধত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম, শুনিই না !" লক্ষ্মী অধর দংশন করিয়া কহিল, "তবে শোন !" হঠাৎ দশ দিকের অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া একটা বজ্র ভীষণ অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

লক্ষ্মী এক বার ঘরের আদ্যোপান্ত দেখিয়া লইল, যেখানে মনোরঞ্জন বসিয়াছিল, সেইখানে তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, তাহার পর আঁচলের খোটায় চোকের কোণ মুছিয়া বলিতে লাগিল :—

"বৌ ঠাকরুণ, আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ। আমার আসল নাম মৃণালিনী। আমার বাপ মা এক সময়ে খুব সঙ্গতিপন্ন ছিলেন। কলিকাতায় আমাদের বাড়ী। আমার যখন বয়স সাত বৎসর, তখন বাপ মা আমার বিবাহ দেন। বিবাহের এক বৎসর পরে আমার স্বামী কলেরা রোগে মারা পড়েন। আট বৎসর বয়সে বিধবা হইয়া আমি গায়ের গয়না সব খুলিয়া ফেলিলাম, থান পরিতে আরম্ভ করিলাম, এক বেলা হবিষ্যি করিতাম, একাদশীর দিন নির্জ্জলা উপবাস দিতাম। বাপ মা অনেক সময় নিষেধ করিতেন, আমি শুনিতাম না। স্বামীর প্রতি আত্যন্তিক ভালবাসা বশতঃ যে এইরূপ করিতাম, তাহা নহে—আট বৎসরের মেয়ের আর এক বৎসরে কত ভালবাসা হইবে ! লোকের দেখিয়া শুনিয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে এইরূপ করিতাম। এইরূপ কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া আমি শেষে যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলাম।

"সত্য কথা বলিতে কি, যৌবনে পড়িয়া সময়ে সময়ে মনের ভাবান্তর উপস্থিত হইতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় সকলে চুল বাঁধিয়া, রঙীন কাপড় পরিয়া, পায়ে আল্‌তা মাখিয়া, গহনায় ভরিয়া, প্রিয়জনের অপেক্ষায় বসিয়া

থাকিতেন, আমার মনে মনে ভারি হিংসা হইত, জীবনটা নিতান্ত বিফল ব্যর্থ মনে হইত। পাছে এই ভাব আমাকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলে, আমি শেষে আর চুল বাঁধিতাম না, কাহারও সঙ্গে মিশিতাম না, ময়লা কাপড় পরিয়া থাকিতাম, সপ্তাহে এক দিন মাত্র স্নান করিতাম। যত প্রকার উপায়ে আপনাকে বিশ্রী কুশ্রী দেখাইতে পারে, তাহাই করিতে লাগিলাম।

"এই সময়ে আমাদের অতিদূরসম্পর্কীয় একজন কুটুম্ব আমাদের বাড়ীতে প্রায় প্রত্যহই যাতায়াত করিতেন। গৌরবর্ণ, দেখিতে খুব লম্বা চওড়া, তখন সবে অল্প অল্প গোঁফের রেখা দিয়াছে মাত্র। তিনি আসিলেই বাড়ীতে তাস খেলিবার খুব ধুম পড়িয়া যাইত। আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি আমাকে টানিয়া লইয়া গিয়া খেলাইতে বসাইতেন, আমি প্রায় রোজই তাঁহার দলে থাকিতাম। খেলিবার সময় কথায় বার্ত্তায় দৃষ্টিতে ইঙ্গিতে আমার প্রতি তিনি এমন ভাব দেখাইতেন, আমি খেলা ভুলিয়া অন্যমনস্ক হইয়া অনেক সময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতাম। শেষে আমার আর অনিচ্ছা রহিল না, ইচ্ছা করিয়াই আমি রোজ খেলিতে আসিতাম। তিনি না আসিলে আমার কেমন ভাল লাগিত না। ক্রমে সাজ সজ্জার দিকেও আমার দৃষ্টি পড়িল। বিকাল হইলে সাবান দিয়া মুখ ধুইতাম, ভাল করিয়া খোঁপা বাঁধিতাম, পরিষ্কার কাপড় পরিতাম ; সকল রকমে তাঁহার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

"যখন চৈতন্য হইল, যখন বুঝিতে পারিলাম কোথায় যাইতেছি, তখন দেখিলাম, বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি, ফিরিবার আর শক্তি নাই। নিস্তব্ধ রজনীতে চক্ষু দুটি মুদ্রিত করিয়া অনেকবার সেই মুখ ভুলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতাম, কিন্তু যতই চেষ্টা করিতাম, ততই আরও যেন দ্বিগুণ জাগিয়া উঠিত। এইরূপে মদনদেব আপনার বিশ্ববিজয়ী প্রভাব আমার উপর বিস্তার করিলেন।

"এক দিন দুপুর বেলায় একলা আমার ঘরে বসিয়া আছি, এমন সময়ে আমার নামে এক খানা চিঠি আসিল। চিঠিটা হাতে লইয়া গা যেন কাঁপিতে লাগিল। অনেক ক্ষণ ধরিয়া খামের উপরের লেখাটা দেখিতে লাগিলাম, তাহার পর কম্পিতহস্তে চিঠিটা খুলিয়া দেখি, যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই,—সেই বাবুটির লেখা। এসেন্স-মাখান রঙীন চিঠির কাগজে মুক্তার মত অক্ষরে লেখা—কত প্রেম কত আক্ষেপ কত মিনতি কত কাতরতা কত সাধ্য সাধনা যদি দেখিতে। আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। প্রথমে আপনার এই সঙ্গীন অবস্থা ভাবিয়া আমার মনে বিভীষিকার উদয় হইল, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই

আবার সে ভাব গিয়া এই অযত্নবর্দ্ধিত রূপরাশি লইয়া এক জন পুরুষের হৃদয়কে যে জয় করিতে পারিয়াছি, এই কারণে আপনাকে বড়ই সৌভাগ্যবতী মনে হইল; মনে মনে ভারি গর্ব্ব অনুভব করিতে লাগিলাম। চিঠিটা যে কত বার পড়িলাম, তাহার ঠিক নাই, আশ মিটাইয়া পড়িয়া বাক্সে তুলিয়া রাখিলাম। তাহার আর জবাব দিলাম না।

"পর দিন আবার তিনি তাস খেলিতে আমাদের বাড়ীতে আসিলেন। আমার তাঁহার কাছে যাইতে কেমন লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। তাঁহারও বোধ হয় আমার মত অবস্থা হইয়াছিল, কারণ সে দিন আর তিনি আমাকে ডাকিতে আমার ঘরে আসিলেন না। মাসীমা আসিয়া আমাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। ঘরে ঢুকিয়া তাঁহার মুখের দিকে আর চাহিতে পারিলাম না। সমস্ত ক্ষণ ঘাড় হেঁট করিয়া তাস খেলিলাম। তিনিও আমার সঙ্গে বড় একটা কথা কহিলেন না। তাস খেলা শেষ হইলে আমি তাড়াতাড়ি আমার ঘরে চলিয়া গেলাম।

"প্রায় প্রতি সপ্তাহে দু'এক খানা করিয়া চিঠি আসিতে লাগিল।

"এক দিন সন্ধ্যার ছাতে বসিয়া আছি। বসিয়া বসিয়া নীচে রাস্তায় লোকের আনাগোনা একমনে দেখিতেছিলাম এবং ভাবিতেছিলাম, এই পথ দিয়া ত তিনি আসিবেন। দেখিতে দেখিতে ক্রমে রাস্তার গ্যাশ জ্বালিয়া দিল, আকাশের কপালে তারকার টীপ্ একে একে ফুটিয়া উঠিল, চাঁদ দেখা দিল। আমি নিরাশ হইয়া একখানি মাদুর পাতিয়া শুইয়া পড়িলাম। ছাই ভস্ম কত কথাই মনে আসিতেছিল! এমন সময়ে সেই বাবুর পরিবর্ত্তে তাঁহারি হাতের লেখা একখানি চিঠি আসিয়া উপস্থিত হইল। চিঠি খুলিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার গা ছম্ ছম্ করিয়া উঠিল, বুকের মধ্যে ঢিব ঢিব শব্দ হইতে লাগিল। চিঠিতে লেখা ছিল, "মৃণাল, আজ রাত্রি দ্বিপ্রহরে আমি খিড়কির দরজার কাছে থাকিব, তুমি অবশ্য আসিও নিরাশ করিও না।" কি, সমস্ত মান অপমান লজ্জা তুচ্ছ করিয়া বাপ মায়ের বুকে শেল বিঁধাইয়া, কলঙ্কের ডালি মাথায় তুলিয়া কুলে কালি দিয়া মৃত স্বামীর অবমাননা করিয়া তোমার সঙ্গে অভিসারে যাইব! তুমি আমার কে! কখনই না! মাথায় রক্তের স্রোত ঝিন্ ঝিন্ করিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি নীচে গিয়া চিঠিগুলা বাক্স হইতে বাহির করিয়া একে একে সমস্ত ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। পাছে ভাবান্তর উপস্থিত হয়, তাই রাত্রে বাহির হইবার যত প্রকার প্রতিবন্ধক

হইতে পারে, তাহারই চেষ্টা দেখিতে লাগিলাম। আমার ননদ ও এক জন দাসীকে আমার সঙ্গে শুইতে বলিলাম। ঘরে আলো রাখিলাম। শুইবার সময় ভাল করিয়া সমস্ত দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম।

"নিস্তব্ধ রজনী। পৃথিবী নিদ্রিত। দক্ষিণের উন্মুক্ত বাতায়ন দিয়া মৃদু মন্দ বায়ু ও চাঁদের আলো ঘরে আসিতেছিল। এমন সুন্দর রজনীতে স্বামিহীনা আমি এক দিকে দাসী অন্য দিকে ননন্দাকে লইয়া চক্ষু দুটি মুদ্রিত করিয়া কপালের উপর হাতখানি রাখিয়া শুইয়াছিলাম। ঘুমের লেশমাত্রও নাই। জাগিয়া জাগিয়া কেবল স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। এমন সময়ে ঘড়িতে ঢঙ ঢঙ করিয়া এগারটা বাজিল, আমার বুকের মধ্যেও যেন ঢঙ ঢঙ করিয়া বাজিয়া উঠিল। আর ত সময় নাই! সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি আমার চক্ষের সম্মুখে কেবলি ভাসিতে লাগিল। হয় ত এতক্ষণ তিনি আমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন! আমি বিধবা, আমার কে আছে! চিরজীবন ত আমাকে এইরূপ বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে! দূর কর লোক লজ্জা মান অপমান ভয়! আমি আস্তে আস্তে বিছানা হইতে উঠিলাম, আলো নিবাইয়া দিলাম, পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া দরজা খুলিলাম; তাহার পর বাহিরে আসিয়া সিঁড়ি দিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া একেবারে খিড়কীর দরজায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, তিনি আমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। দূরে একটা গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল—দুজনায় তাহাতে গিয়া উঠিলাম। গাড়ী ঘড় ঘড় শব্দে চলিতে লাগিল। সেই নিস্তব্ধ রজনীতে নির্ম্মল আকাশপটে আমার মৃত স্বামীর শেষ মুখ যেন জাগিয়া উঠিল। আমার মনে হইল যে, ঘড় ঘড় করিয়া তমসাচ্ছন্ন পৈশাচিক অট্টহাস্যপ্রতিধ্বনিত পাপভূমি নরকপথে যাত্রা করিয়াছি। চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

"একটি ত্রিতলবাড়ীর সম্মুখে গাড়ী গিয়া থামিল।

"বাড়ীতে ঢুকিয়াই আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। পরিষ্কার বিছানা, ঝাড় লণ্ঠন কৌচ চৌকি দিয়া ঘরটি বেশ সুসজ্জিত। দেয়ালে নগ্ন রমণীর সব চিত্র টাঙ্গান ছিল। কুলুঙ্গির উপর মদের বোতল ছিল। পাশের ঘর হইতে কোন মুসলমান রমণী উচ্চৈঃস্বরে গান গাহিতেছিল, আর তাহারি প্রেমাকাঙ্ক্ষী জনৈক মুসলমান যুবক বিকৃতস্বরে বাহবা দিতেছিল। আমার স্থানটি ঠিক নরক বলিয়া বোধ হইল। ইহার অপেক্ষা মৃত্যুও শতগুণে ভাল! সমস্ত রাত ধরিয়া কেবল কাঁদিলাম।

"সকালে মন আরও হুহু করিতে লাগিল। বাড়ীর জন্য আমি ছট্‌ ফট্‌ করিতে লাগিলাম, বাপ মায়ের জন্য প্রাণ যেন কাঁদিতে লাগিল।

"মনের এই ভীষণ যন্ত্রণা হইতে নিস্কৃতি পাইবার জন্য শেষে আমি মদ ধরিলাম। মাসখানেকের মধ্যে পাপ আমার নিকট অতিশয় সহজসাধ্য বলিয়া বোধ হইল।

"বাবুটি রোজ রাত্রে একবার করিয়া আসিতেন, আর ভোর হইলেই চলিয়া যাইতেন। সমস্ত দিনটা আমি সাজসজ্জা নিদ্রায় কাটাইয়া দিতাম। এসেন্স্‌ সাবান গহনা কাপড় যখন যাহা আমার দরকার হইত, বাবুটি তাহা দুই হাত ভরিয়া আমাকে দিতেন। বাবুটি সপ্তাহে এক দিন করিয়া রবিবারে আমাকে সঙ্গে লইয়া বাগানবাড়ীতে যাইতেন। এই রকম গঙ্গার ধারে প্রস্তরসোপানশোভী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়ী, সম্মুখে এই রকম প্রস্তরমণ্ডিত জলের ফোয়ারা, এই রকম পুষ্করিণী, এই রকম নিবিড় আম্রতরুকুঞ্জের সার;—ঘর এই রকম সাজান, দেয়ালে এই রকম বাঁধান ছবি, এই রকম মেহগিনির খাট, এই রকম ভেল্‌ভেটের কোচ, এই রকম—"

এই সময়ে বাহিরে বৃষ্টির সঙ্গে খুব ঝড় উঠিল। লক্ষ্মী চোখ মুছিয়া বলিল, "বৌ ঠাকৃরুণ, আজ আর থাক্‌।" প্রভা আগ্রহের সহিত বলিল, "না, তুই শেষ কর্‌।"

লক্ষ্মী বলিতে লাগিল—"বাবুটি শেষে আমাকে বাগানবাড়ীতে আনিয়া রাখিলেন। আমার জন্য অনেক দাস দাসী নিযুক্ত হইল, আমি রাণীর হালে এই রকম খাটে শুইয়া দিন কাটাইতে লাগিলাম।

"মাস ছয়ের পরে এক দিন বাবু আর এক জন স্ত্রীলোককে সঙ্গে করিয়া বাগানে আনিলেন। আমার ভারি রাগ হইল—বাবুর সাম্‌নেই আমি তাহাকে দুকথা শুনাইয়া দিলাম। বাবু সে দিন খুব মদ খাইয়াছিলেন। তিনি কোন কথা না বলিয়া উঠিয়া আমার ঘাড় টিপিয়া ধরিলেন, তাহার পর ধাক্কা দিতে দিতে সিঁড়ির উপরে আমাকে সজোরে ফেলিয়া দিলেন—আমার নাক কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, সাম্‌নের দাঁত দুটি ভাঙ্গিয়া গেল। আমি বাড়ী হইতে রক্তাক্তকলেবরে বাহির হইয়া গেলাম। সেই অবধি আর সে-মুখো হই নাই—বৈরাগীর মত পথে পথে ফিরিয়াছি;—"

লক্ষ্মী হঠাৎ সবেগে দাঁড়াইয়া উঠিল। তাহার চোখ দুটো আগুনের মত যেন জ্বলিতে লাগিল। মাথার পরচুলা সজোরে টানিয়া খুলিয়া ফেলিয়া,

দাঁতে দাঁতে ঘসিয়া মনোরঞ্জনের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "ওগো, ঐ সেই বাবু, এই সে বাড়ী!" বলিয়াই সিঁড়ি দিয়া তড়্‌তড়্‌ করিয়া নামিয়া একেবারে ঝড়ের মধ্যে বিদ্যুদ্বেগে বাহির হইয়া পড়িল। মনোরঞ্জন প্রভা অবাক্‌ হইয়া পরস্পরের মুখের দিকে চহিয়া রহিল।

সমস্ত রাত ধরিয়া ঝড় বৃষ্টি হইল। মনোরঞ্জন প্রভা কেহই ঘুমাইল না।

পর দিন প্রাতেই মনোরঞ্জন বাগানবাড়ী ছাড়িয়া প্রভাকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

ধর্ম্মপ্রবৃত্তি।

মহারাজ দিলীপ বশিষ্ঠের হোমধেনুকে বাঁচাইবার জন্য আপনার জীবনদানে উদ্যত হইলে, মায়াসিংহ তাঁহাকে বলিয়াছিল, একটা গরুর জন্য জীবন দেওয়া যুক্তিযুক্ত হয় না, তুমি বাঁচিয়া থাকিলে তোমার প্রজাগণকে কত বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে।

দিলীপ দুই কথায় ইহার জবাব দিয়াছিলেন। প্রথম, আমি ক্ষত্রিয়; আর্ত্তত্রাণ আমার প্রধান ধর্ম্ম; দ্বিতীয়, আমি এক্ষণে পরাধীন; প্রাণপাতেও প্রভুর নিয়োগপালনে বাধ্য।

আজ কাল যাহাকে 'ইউটিলিটি' বলে, যাহার সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা Greatest good of the greatest number,—অধিক লোকের হিত, সেই অনুসারে ধরিলে, দিলীপের হিসাবে ভুল হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়। একটা ভুয়া সেণ্টিমেণ্টের জন্য এতটা সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি বিচারমূঢ়ত্বই দেখাইয়াছিলেন। গরুর জীবনের অপেক্ষা তাঁহার জীবনের মূল্য, বশিষ্ঠের নিকট না হউক, অন্ততঃ অবশিষ্ট সমগ্র সংসারের নিকট অনেক অধিক। তাহা বোধ হয় বশিষ্ঠকেও স্বীকার করিতে হইত।

দিলীপ ভাল বুঝেন নাই, কিন্তু তথাপি অদ্যাপি এই ইউটিলিটিতত্ত্বের জয়-জয়-কারের দিনেও এমন লোক অনেক দেখা যায় যে, কর্ত্তব্যনির্ণয়ের সময় ইউটিলিটির হিসাব না করিয়া সেণ্টিমেণ্টেরই বশবর্ত্তী হইয়া থাকে।

বস্তুতই এই প্রাচীনা বসুন্ধরায় অনেক মনুষ্যজাতি বহুদিন যাবৎ বাস করিয়া যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে সত্য; তথাপি তাহার জীবনে কোন্ কাজটা করা উচিত, এবং কোনই বা করা উচিত, এই সাধারণ তত্ত্বের অদ্যাপি মীমাংসা হইল না।

তবে সমাজবিশেষে কতিপয় স্থলে মনুষ্যের কর্ত্তব্যনির্দ্দেশ শাস্ত্রের বিধান দ্বারা বিহিত হইয়াছে। এবং সেই বিধানের উপর হস্তক্ষেপ করিবার, অথবা তাহার যুক্তিযুক্ততাবিষয়ে সন্দেহ স্থাপন করিবার অবকাশও আমাদের একবারে নাই। পরের গাছের আম পাড়িয়া খাইব কি না এ বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে এই শাস্ত্রে ব্যবস্থা দেয়, যদি ধরা পড়িবার কোন সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে কোন আপত্তি নাই; কিন্তু ধরা পড়িলেই—। বলা বাহুল্য, এই শাস্ত্রের নাম পীনাল কোর্ড; এবং ইহা বিধিবদ্ধ থাকায়, অন্ততঃ কতকগুলা সাংসারিক কাজে কর্ত্তব্যনির্ণয়ের জন্য বিশেষ মাথাব্যথার দরকার হয় না।

কিন্তু পীনাল কোর্ডের মধ্যে নির্দ্দেশ নাই, এরূপ সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কার্য্য মনুষ্যের সম্মুখে সদা সর্ব্বদা উপস্থিত হয়, সে স্থলে মানুষ কোন্ পথে যাইবে স্থির করিতে না পারিয়া আকুল ও দিশাহারা হয়। পথের সংখ্যা এত অধিক, এবং বিশ্বাসী পথপ্রদর্শকের এত অভাব যে, পথিকের অবস্থা এ স্থলে শোচনীয়।

তবে এক সম্প্রদায় পথপ্রদর্শক এইরূপ আশ্বাস দেন যে, এরূপ স্থলেও মনুষ্যের এক উপায় আছে। তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্র-নামধেয় আর একটা পীনাল কোর্ড খাড়া করিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলেন, এই কোর্ডের ব্যবস্থা অনুসারে চল, তবে মঙ্গল হইবে। ইহা মানিয়া চলিলে পুরস্কার, না মানিলে শাস্তি। কেন মানিব, এ কথা জিজ্ঞাসা করিও না। পীনাল কোর্ডের ব্যবস্থা যেমন রাজশক্তি হইতে আসিয়াছে, ইহার ব্যবস্থাও সেইরূপ অপর কোন শক্তি হইতে আসিয়াছে, যাহার উপর তোমার কোন প্রভুত্ব নাই। কোনরূপ দ্বিধা ও দ্বিরুক্তি না করিয়া মানিয়া চল, তোমার মঙ্গল হইবে।

এইরূপে কোন একটা শাস্ত্রবিশেষ মানিয়া চলিতে পারিলে অনেকটা সুবিধা হয়; অন্ততঃ নিজের বিবেচনার উপর নির্ভর করিতে হয় না, সুতরাং নিজের দায়িত্বের বোঝা হইতে অনেকটা নিষ্কৃতি লাভ করিয়া শান্তি লাভ করা যায়, এ কথা স্বীকার্য্য। কিন্তু মনুষ্যের দুর্ভাগ্যক্রমে অনেক সময়ে

অন্তরাত্মা এইরূপ শাস্ত্রের শাসন সকল সময়ে মানিতে চাহে না; অনেক সময়ে বিদ্রোহী হইয়া উঠে। সকল সম্প্রদায়েরই ধর্ম্মশাস্ত্র কতকগুলা কার্য্যকে পাপ ও কতকগুলাকে পুণ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে; কিন্তু অনেক স্থলেই শুনা যায়, শাস্ত্রে শাস্ত্রে ও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ভয়ানক মতভেদ। আবার যখন শুনা যায় যে, রবিবারে স্কুলে যাওয়াকে নরহত্যার সহিত সমান পর্য্যায়ে স্থান দিয়া শাস্ত্রবিশেষে উভয়ের জন্য সমান শাস্তির বিধান করিতেছে, তখন সেই ব্যবস্থার প্রতি বিদ্রোহাচরণই কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া অন্তরের ভিতর একটা উৎকট অশান্তির আবির্ভাব হয়।

ফলে, মনুষ্যের অন্তর মধ্যে Conscience নামে একটা কি আছে, সে সকল সময়েই মনুষ্যের মনোমধ্যে অশান্তি জাগাইয়া রাখিতেছে। এই কন্সেন্সের দর্শনশাস্ত্রসঙ্গত অভিধান যাহাই হউক, চলিত বাঙ্গালাতে আমরা ইহাকে 'সহজ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি' আখ্যা দিতে পারি। মানুষ যখন এদিকে যাইতে চায়, তখন এই প্রবৃত্তি উহাকে ওদিকে টানে। ধর্ম্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, লোকশাস্ত্র প্রভৃতি যাবদীয় পীনাল কোর্ড যখন মানুষকে এ পথে যাইতে বলে, তখন উহা অন্য পথ দেখাইয়া দেয়। বস্তুতই মনুষ্যের ঘরে ও বাহিরে কুত্রাপি শান্তি নাই। মনুষ্যের অন্তরের ভিতরেও এই একটা কিম্ভূতকিমাকার প্রবৃত্তি অন্যান্য প্রবৃত্তির সঙ্গে সর্ব্বদা কলহে ব্যাপৃত রহিয়াছে; এবং অন্তরের বাহিরেও মানুষের অন্যান্য হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু অনুরোধ ও উপদেশ ও ভীতিপ্রদর্শন দ্বারা মানুষের যে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতেছে, উহা সকল অনুরোধ ও সকল উপদেশ উপেক্ষা করিয়া ও সকল ভীতিপ্রদর্শন তাচ্ছীল্য করিয়া, অন্য মার্গ দেখাইয়া দিতেছে।

মানুষ যখন নিজের প্রবৃত্তিসমূহের প্ররোচনায়, অথবা বন্ধুবর্গের উপদেশবাক্যে একটা গন্তব্য স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, এমন সময়ে তাহার অন্তরতম প্রদেশের কোথা হইতে কাহার ধীর গম্ভীর স্বর নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাহাকে সাবধান করিয়া দেয়। প্রবৃত্তির প্ররোচনা তখন আর তাহাকে চালাইতে পারে না; হিতৈষীর হিতবাণী তখন আর ভাল লাগে না; শাস্ত্রের শাসন তখন আর সম্মান পায় না; ইউটিলিটিতত্ত্ব বা অন্যান্য দার্শনিক তত্ত্বের ক্ষতিলাভ গণনা ও হিসাব নিকাশের তখন অবকাশ মিলে না।

মায়াসিংহ যখন দিলীপকে নানা ছন্দে নানা ভঙ্গে ক্ষতিলাভগণনা ও হিসাব নিকাশের কথা আনিয়া কর্ত্তব্যনির্দ্দেশে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সেই সময়ে

দিলীপের সহজ সরল স্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রবৃত্তি তাঁহাকে সেই কদর্য্য ধার্ম্মিকতার প্রবঞ্চনা হইতে রক্ষা করিয়াছিল। এবং মনুষ্যের সৌভাগ্য যে, বিবিধ নীতি ও বিবিধ দর্শন ও বিবিধ শাস্ত্র যখন মায়াজাল বিস্তার করিয়া মনুষ্যের চক্ষুকে অন্ধীভূত করে, ও তাহাকে সর্ব্বনাশের পথে লইয়া যাইতে প্রস্তুত হয়, তখন তাহার সেই অকৃত্রিম, সরল, সুস্থ, বলিষ্ঠ, ধর্ম্মসংস্কারই তাহাকে সে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। কিন্তু মনুষ্যের এই স্বাভাবিক সহজ-সংস্কার বা প্রবৃত্তি, জীবনসংগ্রামে মনুষ্যের এই একমাত্র অকপট সহায়, ইহার উৎপত্তি কোথা হইতে? এ প্রশ্নের কি উত্তর নাই?

এই স্থানে মনুষ্যপ্রকৃতির একটু আলোচনা আবশ্যক। মনুষ্য স্বভাবতঃ সুখান্বেষী। সুখ শব্দের ও দুঃখ শব্দের দার্শনিক ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইবার দরকার নাই। সুখ-শব্দে কি বুঝায় ও দুঃখ-শব্দে কি বুঝায়, তাহা সূক্ষ্ম বিশেষণ দ্বারা স্থির না করিয়াও বলা যাইতে পারে যে, মনুষ্য স্বভাবতই সুখ অন্বেষণ করে, ও দুঃখ হইতে দূরে রহিতে চেষ্টা করে। ইহাতে মানুষের দোষ নাই। প্রকৃতি কর্তৃক মনুষ্য ইহাতে নিয়োজিত। মনুষ্যের অপর ধর্ম্ম যাহাই হউক, জীবনরক্ষা করিয়া চলিতেই হইবে, ইহা তাহার প্রথম ধর্ম্ম ও স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এবং জীবনরক্ষার জন্যই সে সুখের অন্বেষণ ও দুঃখের পরিহার করিয়া থাকে। যদি প্রকৃতির ব্যবস্থা অন্যরূপ হইত, যদি জীবন-রক্ষায় মনুষ্যের প্রবৃত্তি না থাকিত, যদি মনুষ্য সুখ ত্যাগ করিয়া স্বভাবের তাড়নায় দুঃখের প্রতি ধাবিত হইত, তাহা হইলে জগতের ইতিহাসে মনুষ্য-জাতিসম্বন্ধীয় পরিচ্ছেদটা বোধ হয় অস্তিত্বহীন হইত; অন্ততঃ বর্ত্তমান প্রবন্ধের উৎপীড়ন হইতে পাঠকবর্গ অব্যাহতি পাইতেন, ইহা নিঃসংশয়ে ও অকুতোভয়ে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। অথবা তাহার সম্ভাবনাই বা কোথায়; কেন না, যাহা জীবনের অনুকূল, তাহারই নাম সুখ; যাহা জীবনের প্রতিকূল, তাহারই নাম দুঃখ। কাজেই যাহাকে জীবন ধরিতে হইবে, সে সুখসাধনে ও দুঃখপরিহারে বাধ্য। তাহার গত্যন্তর নাই। সময়ে সময়ে দেখা যায় বটে, সুখান্বেষণেই মনুষ্যের বিপদ ঘটে, তাহার জীবন বিপৎসঙ্কুল হয়; কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে তাহার অন্যরূপ তাৎপর্য্য পাওয়া যাইবে।

মানুষ মনুষ্যত্বলাভের পূর্ব্বেই বোধ করি জীবত্ব লাভ করিয়াছে। সংসার-মধ্যে মনুষ্য একটা জীব। তাহার জীবনরক্ষাবিষয়ে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি রহিয়াছে। এই প্রবৃত্তি না থাকিলে তাহাকে এতদিন সংসারে টিকিতে হইত

না, ও পাপপুণ্য ও ধর্ম্মাধর্ম্ম লইয়া আমাদিগকেও তর্কে প্রবৃত্ত হইতে হইত না। জীবনরক্ষাই তাহার প্রথম ও প্রধান ধর্ম্ম। অন্যান্য জীবের সহিত এই স্থলে তাহার সাধারণত্ব। জীবনরক্ষার অনুকূল পথে তাহাকে চলিতে হইবে, নতুবা তাহার অস্তিত্ব থাকিবে না, প্রকৃতি এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন; এবং প্রকৃতি এই জন্য তাহাকে সুখান্বেষী করিয়াছেন। কোন্ পথ জীবনের অনুকূল, তাহা বিচার করিয়া দেখিবার সকলের ক্ষমতা নাই; অথবা তাহা পদে পদে বিচার করিয়া জানিতে গেলে জীবন রক্ষা হয় না; জীবন-সমর এমনি ভয়ানক। সেই জন্য প্রকৃতিই তাহার কতকগুলি মনোবৃত্তির সৃষ্টি করিয়াছেন। সে সেই মনোবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া চলিয়া থাকে।

সেই স্বভাবজাত মনোবৃত্তির নাম সুখান্বেষণপ্রবৃত্তি বা দুঃখপরিহার-প্রবৃত্তি। সে সেই প্রবৃত্তির বশে চলে বলিয়াই আজি পর্য্যন্ত তাহার অস্তিত্ব। সত্য বটে, এই সুখান্বেষণপ্রবৃত্তি সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা তাহাকে ঠিক পথে, জীবনের অনুকূল পথে, লইয়া যায় না। সে প্রকৃতির ব্যবস্থার দোষ। কিন্তু তাহার পক্ষে অন্য উপায় নাই। ভালই হউক আর মন্দই হউক, জীবন থাক আর নষ্টই হউক, সে সুখান্বেষণে বাধ্য। এবং সর্ব্বত্র না হউক, অধিকাংশ স্থলেই সুখ জীবনের অনুকূল, দুঃখ জীবনের প্রতিকূল। সুতরাং জীব যে সুখ চাহে, ও জীবধর্ম্মা মনুষ্যও যে অন্য জীবের মত সুখান্বেষণ করে, ইহাতে মনুষ্যের দোষ নাই। ইহা প্রকৃতির বিধান। ইহাতে মঙ্গল; ইহা সত্যকথা;—ইহার অপলাপ করিও না।

মনুষ্য জীব ও সুখান্বেষী, প্রকৃতির ব্যবস্থা এইরূপ। এই পর্য্যন্ত কোন গোল নাই। কিন্তু প্রকৃতির ব্যবস্থা বড় ভয়ঙ্কর। এক জীবের জীবন নষ্ট না করিলে অন্য জীবের জীবন রক্ষা হয় না; একের যাহাতে সুখ, অন্যের তাহাতে দুঃখ; অপরকে দুঃখ না দিলে নিজের সুখ নাই। ইহাই প্রকৃতির ব্যবস্থা, এবং এই ব্যবস্থার উপর জগৎ সংসার প্রতিষ্ঠিত। আহার বিনা জীবন রক্ষা হয় না, এবং জীবের আহার জীব।

ব্যবস্থা ভয়ঙ্কর, কিন্তু ইহার উপর তোমার আমার হাত নাই। প্রকৃতির ব্যবস্থার উপর তোমার আমার প্রভুত্ব নাই। জীবন রাখিতে হইবে, অথচ অন্যকে নাশ না করিলে জীবন থাকিবে না। জীবমাত্রের এই চেষ্টা, জীবমাত্রের এই দিকে গতি; ফলে ঘোর জীবন-সংগ্রাম। মূলে এই দ্বন্দ্ব; এবং এই দ্বন্দ্বের উপর সমগ্র জাগতিক ব্যাপার প্রতিষ্ঠিত। জগৎ-ব্যাপারের আগা-

গোড়া, সর্ব্বত্র সর্ব্বদা যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার অস্তিত্ব দেখা যায়, এই স্থলেই তাহার মূল। এইখান হইতেই ভাল ও মন্দ, সুখ ও দুঃখ, পাপ ও পুণ্যের উৎপত্তি। এইখানে স্বর্গ ও নরকের, ঈশ্বর ও শয়তানের কল্পনা।

মূলে দ্বন্দ্ব; সংগ্রাম, বিবাদ, রক্তপাত; অথচ ইহা নহিলেও যেন চলিত না। দ্বন্দ্ব হইতে দুঃখ, দ্বন্দ্ব হইতে মৃত্যু, দ্বন্দ্ব হইতে পাপ। কিন্তু এই দ্বন্দ্বহীন, দুঃখহীন, মৃত্যুহীন, পাপহীন জগৎ কেমন হইত, তাহা ত কই কল্পনায় আসে না। কবির কল্পনায় হয় ত আসিতে পারে। দ্বন্দ্ব নাই, দুঃখ নাই, জরা নাই, মরণ নাই, পাপ নাই, সবই সুখ, সবই শক্তি, নিরবচ্ছিন্ন যৌবন, আর বসন্ত, আর মলয়-পবন; কিন্তু সে কবি কেমন, তাহা আমরা বুঝি না। জরামরণহীন দুঃখদ্বন্দ্বহীন অস্তিত্বের সহিত নাস্তিত্বের কি প্রভেদ, আমাকে কেহ বুঝাইয়া দিলে উপকৃত হইব, সন্দেহ নাই।

প্রকৃতির এই অভিব্যক্তি, এই বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্য, জীবনের এই উচ্ছ্বাস ও বিকাশ, সেই সনাতন দ্বন্দ্ব ও বিরোধ হইতেই ইহার জন্ম। মৃত্যু ছাড়িয়া জীবন নাই, দুঃখ ছাড়া সুখ নাই, পাপ ছাড়িয়া পুণ্য নাই, জগতের এই সর্ব্বপ্রধান সত্য।

জীবনরক্ষার জন্য জীবে জীবে দ্বন্দ্ব, নখানখি, দন্তাদন্তি, রক্তারক্তি; ফলে জীবমধ্যে অভিব্যক্তি, উচ্চের আবির্ভাব, নীচের তিরোভাব; দুর্ব্বলের পরাজয়, সবলের জয়। জীবন-সংগ্রাম প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন। অভিব্যক্তি, বিকাশ, উন্নতি;—সঙ্গে সঙ্গে নূতন আকাঙ্ক্ষা, নূতন উদ্দেশ্য, নূতন অশান্তি, নূতন দ্বন্দ্ব। জীবমধ্যে এই দ্বন্দ্ব সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বর্ত্তমান, এবং জীবসমাজে মনুষ্যমধ্যে এই দ্বন্দ্বের পরাকাষ্ঠা।

এই নিষ্ঠুর দ্বন্দ্বকোলাহলমধ্যে প্রকৃতির কি উদ্দেশ্য দেখিতেছ? জীবের প্রতি দয়া? ব্যক্তি জীবনের রক্ষণপ্রয়াস?—বাতুলের কথা। জীবনরক্ষার উৎকট প্রয়াসে জীবগুলী ছুটাছুটি করিয়া মরিতেছে; কিন্তু জীবনরক্ষা ত হয় না। সুখান্বেষণে প্রবৃত্তির নির্দ্দিষ্ট পন্থায় জীবমাত্রই ছুটিতেছে; আপন জীবনরক্ষার জন্য; পরের জীবনে দয়া করিবার তাহার অবসর নাই। কিন্তু সেই আপন জীবনই কি রক্ষা পায়? অভিব্যক্তি? উন্নতি? কাহার? ব্যক্তির নহে।—জাতির। জীবন-সংগ্রামে ব্যক্তিজীবনের জীবনব্যাপী প্রয়াসের চরম ফল মৃত্যু;—মৃত্যুর চরম ফল জাতীয় জীবনের অভ্যুদয়। ব্যক্তি যায়, জাতি থাকে। প্রকৃতির উদ্দেশ্য জাতীয় অভিব্যক্তি, জাতীয় উন্নতি, ব্যক্তির জীবন তাহার নিকট মূল্যহীন। ব্যক্তির জীবন খেলার পুতুল, ক্রীড়নক। ব্যক্তির দ্বারা প্রকৃতি আপন নিগূঢ় উদ্দেশ্য সাধিয়া লয়—সে উদ্দেশ্য ব্যক্তিত্বের নাশ, জাতীয়তার বিকাশ। মনুষ্যজাতি আজিও মহাদম্ভে পরিপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহের তীব্র ও উৎকট উত্তেজনা লইয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু রঘুপতেঃ ক গতোত্তরকোশলা। তুমি মরণের কুক্ষিতে বিস্মৃতিগর্ভে অন্তর্হিত হও, তোমাকে লইয়া প্রকৃতির আর কোন দরকার নাই। তোমার জীবনের যেটুকু কাজ, তাহা তোমা দ্বারা প্রকৃতি সাধিয়া লইয়াছে। তুমি যাও, অপরকে স্থান দাও। অন্তিমকালে ব্যক্তিমাত্রের প্রতি প্রকৃতির এই নির্ম্মম বাণী।

প্রকৃতির নিকট ব্যক্তির জীবন মূল্যহীন; জাতির অভ্যুদয় তাহার উদ্দেশ্য। তবে জাতির অভ্যুদয়সাধনের জন্য ব্যক্তিমাত্রকে কিছু দিন বাঁচাইয়া রাখিয়া খাটাইয়া লইতে হয়; তাই প্রকৃতির প্ররোচনায় ব্যক্তিমাত্রই জীবন ধরিয়া খাটিতেছে। সে মনে করে, আমি আপন জীবনের উৎকর্ষের জন্য এত প্রয়াস এত যত্ন করিতেছি। কিন্তু হায় সে জানে না, কি বিষম প্রতারণায় সে প্রতারিত।

জীব প্রকৃতির তাড়নায় কাজ করে; তাহাতেই তাহার সুখলাভ। তাহাতেই তাহার জীবন কিছু দিনের জন্য রক্ষিত হয়; প্রকৃতির গূঢ় উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তাহার যত দিন বাঁচিয়া থাকা আবশ্যক, তত দিন তাহার জীবন রক্ষিত হয়। কিছু কাল জাতীয় জীবন পুষ্টি পায়। সে জানে না, কি উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সে জীবিত রহিয়াছে। ক্ষুধার উত্তেজনায় ব্যাঘ্র ছাগশিশুর উপর লম্ফ দিয়া পড়ে; স্বভাবের উত্তেজনায় প্রকৃতির তাড়নায় সে এমন করে; এমন না করিয়া তাহার উপায় নাই। সে প্রবৃত্তির দাস; প্রকৃতি কর্ত্তৃক সে অন্ধভাবে ছাগহত্যায় নিয়োজিত। সে ক্রীড়াতে তাহার স্বাধীনতা নাই। তাহার নিজ জীবন ঐরূপে কিছু দিন ধরিয়া রক্ষা করিতে হইবে। কেন না, প্রকৃতির একটা গভীর উদ্দেশ্য আছে। যত দিন সে উদ্দেশ্য সাধিত না হয়, সে ক্ষুধার উত্তেজনায় ছাগশিশু হত্যা করিয়া নিজ জীবন বর্দ্ধন করিতে থাকুক। আবার আততায়ী যখন ব্যাঘ্রশিশুকে আক্রমণ করে, তখন কুপিতা ব্যাঘ্রী তাহার উপর লাফ দেয়; তখন নিজ জীবনে জন্য তাহার মমতা থাকে না। এখানে ব্যাঘ্রীও সেইরূপ স্বাধীনতাবর্জ্জিত ক্রীড়নকমাত্র। তাহার প্রকৃতি তাহাকে সন্তানের জীবনের জন্য আত্মজীবনে মমত্বহীন করে,

সে স্বার্থান্বেষণে অবসর পায় না। ইহাতেই তাহার সুখ; শিশুর জীবন রাখিবার জন্য আপন জীবন দান করিতে তাহার সুখ। প্রকৃতি নিজ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য তাহাকে ঐরূপ প্রকৃতি দিয়াছেন। সে প্রবৃত্তির অনুজ্ঞা-পালনে বাধ্য।

মনুষ্যে এই দ্বন্দ্বের পরাকাষ্ঠা। জীবমধ্যে মনুষ্যের স্থান সকলের উপরে, কিন্তু মনুষ্যের অবস্থা বোধ করি সকলের অপেক্ষা শোচনীয়। এই অবস্থার শোচনীয়তাতেই তাহার মনুষ্যত্ব। ইতর জীব জীবনের চেষ্টায় ব্যাপৃত রহিয়াছে; কিন্তু সে বোধ করি জানে না, তাহার সমস্ত চেষ্টার পরিণতি মৃত্যু। মনুষ্যও তাহার মতই জীবনযুদ্ধে নিরত; কিন্তু মনুষ্য জানে যে, মরণ অবশ্যম্ভাবী। ইতর জীব প্রবৃত্তির বশে কাজ করে; কিন্তু সেই কাজের ফল কি হইবে না হইবে, তাহা সে জানে না ও ভাবে না; তাহার জন্য সে দায়িত্বশূন্য। মনুষ্যও প্রবৃত্তির বশে কাজ করে; কিন্তু আপন কার্য্যের ফল আপন চোখে দেখিতে পায়; এবং সময়ে সময়ে সেই ভবিষ্যৎ ফল পূর্ব্ব হইতে গণনা করিয়া বিচারশক্তি দ্বারা প্রবৃত্তির মুখ ফিরাইয়া লয়। ইতর জীবের রাস্তা একটা; মানুষের রাস্তা সাধারণতঃ অনেকগুলি। আপনার সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার সাহায্যে প্রবৃত্তিকে সংহত ও সংযত করিয়া রাস্তা পছন্দ করিয়া লইতে হয়। সেই দায়িত্ব তাহার স্কন্ধের উপর। মনুষ্য জীব; কিন্তু বুদ্ধিজীবী বিচারপরায়ণ দায়বান্ জীব।

এতদ্ভিন্ন মনুষ্যের সহিত ইতর জীবের আর একটা প্রভেদ আছে। মনুষ্য শারীরিক বলে দুর্ব্বল। মানুষের নখে ও দাঁতে ধার নাই, ও মাংসপেশীতে জোর নাই। বুদ্ধিবৃত্তি জীবনসংগ্রামে মানুষের সহায়; কিন্তু কেবল বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে জীবনধারণ সহজ কথা নহে। সেই জন্য মনুষ্যকে দল বাঁধিয়া থাকিতে হয়। মনুষ্য একা যাহা পারে না, দল বাঁধিয়া তাহা পারে। এই জন্য মনুষ্য-মধ্যে সমাজের উৎপত্তি। অন্যান্য কোন কোন জীবের মধ্যেও সমাজের অঙ্কুরোদ্গম দেখা যায়; কিন্তু অন্যত্র যাহার অঙ্কুর, এখানে তাহা পল্লবিত বৃক্ষ। প্রধানতঃ সমাজ বাঁধিয়া মনুষ্য জীবনসংগ্রামে আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছে; তাহার জীবত্ব পূর্ব্ব হইতেই ছিল; কিন্তু এই সামাজিকত্বের উৎপত্তির সহিত তাহার পূর্ণ মনুষ্যত্বের আরম্ভ।

মনুষ্য জীব, কিন্তু বুদ্ধিজীবী, বিচারপরায়ণ সমাজবদ্ধ জীব। অন্য জীবের মতই মনুষ্য স্বার্থরক্ষার জন্য, অর্থাৎ জীবনরক্ষার জন্য নিযুক্ত; কিন্তু অধিকন্তু

মনুষ্য সমাজরক্ষণেও বাধ্য; কেন না, সমাজরক্ষা না হইলে তাহার জীবন-রক্ষা ত অসম্ভব হইয়া পড়ে। একটা দ্বন্দ্ব পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান ছিল; কিন্তু এইখানে আর একটা নূতন দ্বন্দ্বের আবির্ভাব। কেন না, ব্যক্তিত্বরক্ষার জন্য সমাজের প্রয়োজন; তথাপি ব্যক্তির স্বার্থ সকল সময়ে সমাজের স্বার্থের সহিত এক নহে। সমাজ রাখিতে হইলে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য কতকটা সংহার করিতে হইবে। সর্ব্বতোভাবে আপনার দিকে চাহিলে চলিবে না।

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন দিন ছিল, যখন মনুষ্যের সহিত ইতর জীবের তেমন তফাত ছিল না; মনুষ্য যখন সমাজবদ্ধ জীবমধ্যে গণ্য হয় নাই, তখন তাহার আপনার সুখের অন্বেষণে ব্যাপৃত থাকিলেই চলিত; তজ্জন্য প্রকৃতি তাহাকে যে সকল প্রবৃত্তি দিয়াছিলেন, সেই সকল প্রকৃতির আদেশে চলিলেই তাহার জীবনের কাজ সম্পাদিত হইত। কিন্তু একবার সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিলেই আর ঠিক্ সে অবস্থা থাকে না। মনুষ্যের জৈব প্রবৃত্তি-গুলি তাহাকে সমাজের বাহিরে আনিতে চায়; কিন্তু সমগ্র সামাজিক শক্তি তাহাকে সমাজের ভিতরে ধরিয়া রাখে। একটা বল তাহার আত্ম-জীবনকে কেন্দ্রে রাখিয়া কাজ করে; আর একটা বল তাহাকে সেই কেন্দ্র হইতে দূরে বিক্ষিপ্ত করিয়া অপরের দিকে আকর্ষণ করে। ব্যক্তিত্বের সহিত সামাজিকত্বের এইরূপ দ্বন্দ্ব। দুইটার মধ্যে এক রকম সামঞ্জস্য রাখিয়া তাহাকে চলিতে হয়। তাহার পা দুই নৌকায়; এবং দুই নৌকায় যতক্ষণ পা থাকে, জীবনটাও ততক্ষণ বড় সুখের হয় না।

এই সামঞ্জস্যরক্ষা বড়ই দুঃসাধ্য ব্যাপার। কোটি পুরুষ হইতে সমাগত জীবসাধারণ জৈব প্রবৃত্তি সমুদয় তাহাকে আত্মসুখে ও স্বার্থসুখে প্রেরিত করে; সামাজিক শক্তিনিচয় তাহাকে অপরের দিকে ও পরার্থমুখে টানিয়া ধরে। জৈব প্রবৃত্তিগুলি প্রবল ও বেগবান্, কোটি কোটি বৎসরেও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে তাহারা মানুষের প্রাণের সহিত গাঁথিয়া গিয়াছে; তাহাদের প্ররোচনা অতিক্রম করিয়া চলা মানুষের পক্ষে সহজ নহে। এই প্রবৃত্তিগুলি স্বাভাবিক সংস্কার স্বরূপে জন্মাবধি মানুষকে চালিত করে; মানুষের ক্ষমতা নাই যে, ইহাদিগকে সকল সময়ে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত রাখে। অথচ সমাজের জীবন ব্যক্তিজীবনের অপেক্ষা মূল্যবান্ পদার্থ; সমাজের জন্য ব্যক্তিজীবনে স্বার্থসংহার নিতান্তই আবশ্যক। মানুষের জীবত্ব কতকাল হইল স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে; তাহার তুলনায় তাহার সামাজিকত্ব আধুনিক ব্যাপার। এখনও

প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন তাহার সামাজিকত্বের অভিব্যক্তিতে হাত খেলাইবার অবসর পায় নাই। সামাজিকত্ব এখনও সম্পূর্ণভাবে পুষ্টিলাভ ও স্ফূর্ত্তিলাভ করে নাই। এইখানেই মনুষ্যজীবনের প্রধান সমস্যা। এইখানে মনুষ্যত্বের দায়িত্বের সূত্রপাত। এইখানেই ধর্ম্মাধর্ম্ম ও পাপপুণ্যের ভিত্তিস্থাপন। ব্যক্তিত্ব ও সামাজিকত্ব, Individualism ও Socialism, লইয়া যে ঘোর কোলাহল মনুষ্যের ইতিহাসের আরম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত সমানভাবে চলিতেছে, এইখানেই তাহার আরম্ভ।

মনুষ্য কি পরিমাণে স্বতন্ত্র থাকিবে ও কি পরিমাণে পরতন্ত্র থাকিবে, তাহার মীমাংসা আবশ্যক, অথচ মীমাংসার কোন উপায় অদ্যাপি আবিষ্কার হয় নাই। প্রকৃতির সর্ব্বত্র যেমন বিধান, এখানেও সেইরূপ। দুই দিকে টানাটানি; বলে বলে শক্তিতে শক্তিতে সংঘর্ষ; যে পক্ষ শেষ পর্য্যন্ত জিতিয়া যায়। জীবনসমরে বাঘের জয় কি ছাগলের জয়, প্রকৃতি একবারে মীমাংসা করিয়া দেন না। সংসারক্ষেত্রে বাঘকে ও ছাগলকে ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাহারা পুরুষপুরুষান্তর ধরিয়া মারামারি করিয়া মরুক। শেষ পর্য্যন্ত একের জয় হইবে, অথবা উভয়েই লোপ পাইলে, উভয়ের রক্তবীজ হইতে অন্য জীবের উদ্ভব হইবে। সেইরূপ স্বার্থের জয় কি পরার্থের জয়, ব্যক্তির জয় কি সমাজের জয়, প্রকৃতি কিছুই বলেন না। মনুষ্যত্বের বিকাশ আবশ্যক। মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য ব্যক্তিত্বেরও অভিব্যক্তি আবশ্যক, সামাজিকত্বের অভিব্যক্তি আবশ্যক। ব্যক্তিত্ব সামাজিকত্বের সহিত সনাতন দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত থাকুক, দ্বন্দ্বে ক্রমে উভয়েই স্ফূর্ত্তিলাভ করুক, পুষ্টিলাভ করুক, অভিব্যক্তির পথে অগ্রসর হউক। প্রকৃতির ব্যবস্থা সর্ব্বত্র এইরূপ।

জীবের স্বার্থ সুখ প্রবৃত্তিসমূহ, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে অভিব্যক্ত; মনুষ্য সেই সকল প্রবৃত্তির প্ররোচনায় চলে, অন্যান্য জীবের মতই চলে। তাহাদের প্ররোচনাতে চলিয়াই মনুষ্যের সুখ, স্বার্থসংহারে মনুষ্যের অসুখ। অথচ স্বার্থসংহার আবশ্যক। নতুবা সমাজ থাকে না; সমাজ না থাকিলে আবার দুর্ব্বল মানুষের জীবনও দুরন্ত সমরে ক্ষণেকের বেশী টিকিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং স্বার্থসংহার আবশ্যক; কিন্তু স্বার্থসংহার মনুষ্যের জৈবপ্রবৃত্তির বিরোধী; স্বার্থসংহারে মনুষ্যের সুখ নাই। মানুষকে জোর করিয়া স্বার্থ হইতে নিবৃত্ত রাখিতে হইবে। অঙ্কুশাঘাতে ও কশাঘাতে মনুষ্যকে তাহার প্রবৃত্তির পথ হইতে নিবৃত্ত রাখিতে হইবে। এই নিবর্ত্তনপ্রণালীর নাম শাসন। রাজশাসন, লোকশাসন,

নীতির শাসন, ধর্ম্মশাসন, বিবিধ কৌশল অবলম্বন করিয়া, বিবিধ প্রণালীর উদ্ভাবন দ্বারা মানুষকে শাসনে রাখিতে হইবে। কখন পুরস্কার, কখন তিরস্কার; কখন তাহার কামুকতার উত্তেজনা, কখন বা বিভীষিকার নির্য্যাতনা। রাজদণ্ডহস্তে রাজা বলিতেছেন, আমার আদেশে তোমার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সংযত কর, নতুবা বেত্রাঘাত, কারাবাস, প্রাণদণ্ড। সমাজপতি বলিতেছেন, আমার নিষেধ মানিয়া জীবনবৃত্তি নিয়মিত কর, নতুবা সামাজিক নির্য্যাতন, সমাজ হইতে নির্ব্বাসন। নীতি-প্রচারক বলিতেছেন, আমার কথা অনুসারে জীবনপ্রণালী সাজাইয়া লও, নতুবা তোমার ইহত্র পরত্র কুশল নাই। পুরোহিত থাকিয়া থাকিয়া হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিতেছেন, আমার আদেশের সম্মান সকলের আগে; নতুবা কুম্ভীপাক তোমার জন্য প্রস্তুত। প্রবৃত্তির উত্তেজনা স্বাভাবিক, তাহা না মানিলে নয়; সমাজের শাসন কৃত্রিম, কিন্তু তাহা না মানিলেও জীবন থাকে না। মানুষের মত দুঃখী জীব আর কোথায়?

স্বভাবের সহিত কৃত্রিমতার এইরূপ দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বে মনুষ্যজীবন সুখ দুঃখে একরূপে চলিয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতিও এদিকে নিশ্চিন্ত থাকেন না। ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি যেমন জাতিরক্ষার জন্য আবশ্যক, সামাজিকত্বের বিকাশও সেইরূপ জাতিরক্ষার জন্যই ততোধিক আবশ্যক। সেই জন্য কতক গুলা কৃত্রিম শক্তির হস্তে সামাজিকত্বের অভিব্যক্তির ভার দিয়া প্রকৃতি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। মনুষ্য বুদ্ধিজীবী ও বিচারপরায়ণ জীব। সে অতীতের স্মৃতি রাখে, ভবিষ্যৎ গণিতে পারে। এক পার্শ্বে অতীতের অভিজ্ঞতা, অপর পার্শ্বে ভবিষ্যতের পুরোদর্শন। উভয়ের সাহায্য পাইয়া সে কর্ত্তব্য বিচার করিয়া থাকে। স্বাভাবিক প্রবৃত্তি মানিয়া চলিলে আশু সুখলাভ নিশ্চিত; কিন্তু সমাজের শাসন না মানিলে ভবিষ্যতে বিপদ। ভবিষ্যতের ভয়ের প্রতিমূর্ত্তি কল্পনায় প্রতিফলিত হইয়া আশু সুখের প্রলোভনকে আচ্ছাদিত করে। মনুষ্য তখন প্রবৃত্তির পথ ছাড়িয়া নিবৃত্তিমার্গে চলিতে থাকে। কিন্তু এমন করিয়া কত দিন চলে? প্রবৃত্তির বেগ উৎকট বেগ; বর্ত্তমান সুখের প্রলোভন তীব্র। মনুষ্যকে পদে পদে পথভ্রান্ত হইয়া সমাজের নিকট লাঞ্ছিত তিরস্কৃত হইতে হয়, এবং আপন সর্ব্বনাশের সহকারে সমাজের সর্ব্বনাশও আসিয়া পড়ে। এরূপ বন্দোবস্তে চিরকাল চলে না। স্বভাবের সম্মুখে কৃত্রিমতাকে দণ্ডায়মান রাখিয়া চিরকাল প্রকৃতি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে কাজ করেন। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ধীরে ধীরে চলিতে থাকে।

ব্যক্তির সহিত সমাজের বিরোধ; যে সমাজে ব্যক্তিত্ব যত উচ্ছৃঙ্খল, সে সমাজ সেই পরিমাণে দুর্ব্বল। জীবে জীবে যেমন দ্বন্দ্ব, মনুষ্যে মনুষ্যেও তেমনি দ্বন্দ্ব; এই দ্বন্দ্বের ফলে ব্যক্তিত্বের পুষ্টি। আবার সমাজের সহিত সমাজের দ্বন্দ্ব মনুষ্যের ইতিহাসের সহব্যাপী। ভিতরে যেমন জনে জনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বাহিরে তেমনি দলে দলে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, বর্ণে বর্ণে, সমাজে সমাজে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। দুর্ব্বলের পরাজয়, সবলের জয়। কোন সমাজ দুর্ব্বল? যাহার মধ্যে ব্যক্তিত্বের প্রভাব অধিক, সামাজিকত্ব যেখানে জমে নাই। কোন সমাজ সবল? যাহার মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য সমবেত সমাজশক্তির করায়ত্ত। কাহার পরাজয়? যেখানে ব্যক্তিজীবন সমাজজীবনের প্রতিকূল, যেখানে ব্যক্তিজীবন আপনাকে কেন্দ্রগত করিয়া ঘুরিয়া থাকে। কাহার জয়? যেখানে ব্যক্তিজীবন সমাজজীবনের অনুকূল, যেখানে প্রবৃত্তি নিরঙ্কুশ নহে; যেখানে নিবৃত্তিধর্ম্ম প্রবৃত্তিধর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত রাখে। দুর্ব্বলের পরাজয় ও লোপ, সবলের জয় ও স্ফূর্ত্তি। কালে স্বার্থপ্রবৃত্তি ক্রমশঃ সংহত হইতে থাকে, জীবনের পরিধি প্রসার লাভ করে; জীবনের আয়তন বর্দ্ধমান হয়। নিবৃত্তি আসিয়া প্রবৃত্তির বেগ কমাইয়া দেয়। নিবৃত্তি প্রবৃত্তিতে পরিণতি লাভ করে। প্রকৃতির নির্ব্বাচনে নিবৃত্তি পরিপুষ্ট হয়; নিবৃত্তি ক্রমশঃ কৃত্রিম সমাজশাসনের মুখাপেক্ষা পরিহার করিয়া স্বভাবের বলে বলীয়ান হয়। মনুষ্যের অন্তর মধ্যে প্রবৃত্তির পার্শ্বে নিবৃত্তি আসিয়া দেখা দেয়। যাহা আত্ম হইতে নিবৃত্তি, তাহারই নাম পরমুখে প্রবৃত্তি। আত্মমুখপ্রবৃত্তির পার্শ্বে এই নবোদ্গত পরমুখপ্রবৃত্তি আসিয়া দেখা দিলে মনুষ্যের অন্তঃকরণে নূতন বলের সঞ্চার হয়। এত দিন মনুষ্যের ইতিহাস জীবের ইতিহাস; আজ হইতে মনুষ্যের ইতিহাস মনুষ্যের ইতিহাস। জগতে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা, জগতের ইতিহাসে নূতন পরিচ্ছেদের আরম্ভ।

মনুষ্যের জৈব প্রবৃত্তি এত দিন তাহাকে স্বার্থসাধনে নিযুক্ত রাখিয়াছিল, তাহাতেই তাহার সুখ ছিল, তাহাতেই তাহার শান্তি ছিল। সমাজের কৃত্রিম শাসন জোর করিয়া ভয় দেখাইয়া, লোভ দেখাইয়া, তাহাকে শাসনে রাখিত, তাহার জীবনের গতি কতকটা পরমুখে লওয়াইত। আজ হইতে তাহার স্বভাবই তাহাকে পরমুখে চলিতে বলে। নূতন একটা প্রবৃত্তি তাহাকে পরের মুখে চালিত করিতে থাকে। এই নূতন প্রবৃত্তি, সমাজরক্ষার জন্য প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে কালসহকারে যাহার বিকাশ, ইহাকেই মানুষ প্রবৃত্তি বলিতে পারে; কেন না, মনুষ্য ভিন্ন ইতরজীবে ইহার অস্তিত্ব নাই।

মনুষ্যের ইহাতেই বিশেষত্ব। মনুষ্যত্বের ইহাই প্রধানতম অঙ্গ ও উপাদান, ইহারই নাম স্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, ইংরাজীতে conscience। মনুষ্যের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে কে আসিয়া নবাগত অপরিচিতের মত দেখা দেয়, মানুষ তাহাকে ভাল করিয়া যেন চেনে না; মানুষের কাছে সে যেন নূতন। স্নিগ্ধ গম্ভীর ধ্বনিতে যখন সে ভিতর হইতে কথা কয়, মনুষ্য তখন স্তম্ভিত হয়; মনুষ্য মন্ত্রমুগ্ধের মত তখন তাহার আদেশবাণী মানিয়া চলে। জৈব প্রবৃত্তি মনুষ্যকে আত্মসুখে যখন চালাইতে যায়, তখন সে সেই প্রবৃত্তির মুখে বল্গা ধরিয়া দাঁড়ায়, তাহার গতি রোধ করে, তাহার বেগ সংযত করে। সে নবাগত অপরিচিত, কিন্তু কৃত্রিমতাশূন্য; স্বভাব হইতে তাহার উৎপত্তি, সংসারের মলিন মৃত্তিকায় তাহার অঙ্গ গঠিত হয় নাই। মনুষ্য তাহাকে ভয় করে, তাহাকে সম্মান করে, তাহাকে শ্রদ্ধা করে, তাহাকে ভক্তি করে, অবহেলে তাহাকে প্রেমের আলিঙ্গন দিতে শিক্ষা করে। মানবাত্মার প্রিয়তম সখা, এত দিন তুমি কোথায় ছিলে? এত দিন তোমার অদর্শনে মানবাত্মা যেন ব্যাকুল ছিল। তোমার সিংহাসনে তুমি দৃঢ় হইয়া আসন গ্রহণ কর। আত্মার সহিত তোমার প্রীতির বন্ধন যেন কখন বিচ্ছিন্ন না হয়। জীবনের সংগ্রামক্ষেত্রে বিশ্বাসী পথপ্রদর্শক তুমি, দুর্ব্বল মানুষ জীবকে পথ দেখাইয়া দাও, তোমার অনুজ্ঞা পালন করিয়া সে নিশ্চিন্ত ধন্য ও কৃতার্থ হউক। মরীচিকাভ্রান্ত মৃগের মত মানবাত্মা এত দিন মিথ্যা প্রলোভনের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া উদ্ভ্রান্ত হইয়া এ দিকে ও দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। আজি কাল্পনিক আশা, কালি কাল্পনিক বিভীষিকা, তাহাকে মরুক্ষেত্রে ঘুরাইয়া বেড়াইতেছিল। আজ সে বিশ্বাসী অনুগত আত্মীয় সহচর পাইয়াছে। আজ সে জীবনে শান্তি লাভ করিবে। আজ তাহার জীবনে দুঃখের রজনী পোহাইবে।

রাজশাসন ও লোকশাসন, নীতিশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র, মনুষ্যসমাজে কত কাল আধিপত্য করিয়াছে; জীবধর্ম্মা মনুষ্যের উদ্দাম প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত রাখিবার জন্য এত দিন তাহাদের আধিপত্যের প্রয়োজন ছিল। এখনও মনুষ্যসমাজ এমন অভিব্যক্ত হয় নাই, এখনও মনুষ্যপ্রকৃতি এমন পুষ্টিলাভ করে নাই যে, সেই সকল কৃত্রিম শাসনের, কাল্পনিক আশার ও কাল্পনিক বিভীষিকার প্রভুত্বের আর প্রয়োজন নাই, এরূপ বলা যাইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতি মনুষ্যের প্রতি দয়াপরা; ব্যক্তিজীবনের প্রতি না হউন, জাতীয় জীবনের প্রতি সদয়া। কৃত্রিমতার স্থানে স্বভাবের প্রভুত্ব স্থান পাইবে। কল্পনার স্থানে সত্য

আসিয়া শোভা পাইবে। জৈব প্রবৃত্তি এত কাল মানুষকে চালাইয়াছে, এখন মানুষ প্রবৃত্তি মানুষকে চালাইবে। অন্তর মধ্যে উভয় প্রবৃত্তির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিছু দিন ধরিয়া অনিবার্য্য। তত দিন ধরিয়া ধর্ম্মাধর্ম্মের বিরোধ, পাপের সহিত পুণ্যের সমর। প্রকৃতির খেলায় এই দ্বন্দ্বের ফলে মানুষপ্রবৃত্তির বিকাশ, ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অভ্যুদয় ও স্ফূর্ত্তিলাভ। প্রবৃত্তির আদেশপালনে সুখ। জৈব প্রবৃত্তির আদেশপালনে এত কাল মনুষ্যরূপী জীবেরও সুখ ছিল; কিন্তু মানুষ প্রবৃত্তির আদেশপালনেই কি সুখ জন্মিবে না? মনুষ্য সুখান্বেষী রহুক, ক্ষতি নাই; এত দিন স্বার্থসাধনে তাহার সুখ ছিল, এখন পরার্থসাধনেই তাহার অকৃত্রিম আনন্দ জন্মিবে।

এমন দিন কি মনুষ্যের অদৃষ্টে আসিবে না, যখন জীবধর্ম্ম ও মানুষ ধর্ম্ম পরস্পর সন্ধি-বন্ধনে আবদ্ধ হইবে? উভয়ে যখন মিশিয়া এক হইয়া যাইবে? স্বার্থসাধনে যখন পরার্থে ব্যাঘাত পড়িবে না, পরার্থসাধনে যখন স্বার্থ অব্যাহত থাকিবে? মানুষ এখন যেমন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বভাবের অঙ্কুশতাড়নায় আত্মসুখান্বেষণে রত থাকে, তখনও সেইরূপ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সেই স্বভাবেরই অনুবর্ত্তী হইয়া পরসুখান্বেষণে প্রবৃত্ত হইবে। ব্যাঘ্রী যেমন স্বভাবের অনুবর্ত্তী হইয়া শিশু সন্তানের প্রাণের জন্য আপন প্রাণ সমর্পণ করিয়া সুখলাভ করে, মানুষও তখন কেবল আপন শিশুর জন্য নহে, আপন পিতা বা ভ্রাতা বা বান্ধবের জন্য নহে, দূরতম অপরিচিত মনুষ্যের হিতের জন্য আপন প্রাণ সমর্পণ করিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিবে। পরই তখন আপনার হইবে, আত্মপরে তখন বিভেদ থাকিবে না। সন্তান পিতামাতার অঙ্গীভূত, ফল যেমন বৃক্ষের অঙ্গীভূত। সন্তান পিতামাতার পক্ষে পর নহে, শাখাও যেমন বৃক্ষের অনাত্মীয় নহে। মনুষ্যসমাজ ছোট বড় যে যেখানে বর্ত্তমান রহিয়াছে, সকলেই এক প্রকাণ্ড মানবজাতিরূপ মহাশ্বত্থের শাখাভূত অঙ্গমাত্র। আপন পর কোন বিভেদ নাই। পরার্থে ও স্বার্থে বিভেদ নাই। স্বার্থ পরার্থের অনুকূল, পরার্থ স্বার্থকে জাগ্রত করে। স্বার্থান্বেষণে সুখ; পরার্থান্বেষণে কেনই বা দুঃখ হইবে? প্রকৃতির খেলার শেষ হইবে না; প্রকৃতির খেলার পরিণতি কোথায়, কে বলিতে পারে?

যাহাতে সমাজের মঙ্গল, তাহাই ধর্ম্ম; তাহারই অনুষ্ঠানে মনুষ্য বাধ্য। তাহারই অনুষ্ঠানে মনুষ্যের স্বাভাবিক সুস্থ সহজ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি উপদেশ দেয়। সমাজের মঙ্গল কোন্ কাজে? কে বলিয়া দিবে কোন্ কাজে? এখানে মনুষ্যের বিচারশক্তির উপর বিশ্বাস নাই। ক্ষতিলাভগণনা সহজ কথা নহে;

সামাজিক গণিতশাস্ত্র পূর্ণতা লাভ করিতে এখনও অনেক সময় আবশ্যক। সমাজের মঙ্গলে ধর্ম্ম; এবং সমাজের মঙ্গলের অর্থ Greatest good of the greatest number, অধিক লোকের অধিক হিত। ইউটিলিটিতত্ত্ব এই অর্থে ঠিক্। কিন্তু কোন্ কার্য্যে অধিক লোকের অধিক হিত, কে গণনা করিয়া নিঃসংশয়ে অবধারণ করিবে? বিচারশক্তির উপর বিশ্বাস করিও না; বুদ্ধিবৃত্তির উপর নির্ভর করিও না। সুস্থ সহজ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, মনুষ্য যাহা স্বভাবের নিকট পাইয়াছে, তাহার উপরে নির্ভর কর; সে প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিবে। তাহার নির্দ্দেশে মন, অন্তঃশরীর, স্বাস্থ্য লাভ করিবে; জীবন বল লাভ করিবে। আপাততঃ মনে হইতে পারে, প্রকৃতি তোমার প্রতি নিষ্ঠুরা; কিন্তু তোমার যশঃশরীরে প্রকৃতি দয়াবতী। প্রকৃতি তোমার যশঃশরীর রক্ষা করিবেন। তুমি প্রকৃতির আদেশ পালন কর।

মহারাজ দিলীপ তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রবৃত্তি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াছিলেন; ইউটিলিটিতত্ত্বে নির্ভর করিয়া ক্ষতিলাভগণনায় তিনি সাহসী হয়েন নাই। মায়াসিংহের নিকট তিনি বিচারমূঢ়তা প্রদর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু মনুষ্যের সমাজজীবন যত দিন অভিব্যক্তির অনুকূলে, তত দিন সুস্থ সবল আত্মা এইরূপ বিচারমূঢ়তা প্রদর্শন করিতে লজ্জিত হইবে না।

কর্ণমর্দ্দনকাহিনী।

১

জানো না কি কদাচন মূঢ়, *
কর্ণ-বিমর্দ্দন-মর্ম্ম কি গূঢ়?
কর্ণ দিবাদ কি কারণ অন্য,
না যদি তা আকর্ষণ জন্য?
যদি বল সেটা শ্যালী ভিন্ন
অপর করে নয় আদর-চিহ্ন;
তবু সাহিব যদি অল্পে স্বল্পে
টানে, হয় তা মধুর বিকল্পে;
অন্তত নাসারক্ষার্থে সে
কাণমলা হয় গিলিতে হেসে।

২

বাবা! সে দশ ইঞ্চি প্রস্থে
বিপুল বিশাল প্রকাণ্ড হস্তে—
শূকর-গো-মৃগ-মাংসে পুষ্ট—
(আছে রক্ষা হইলে রুষ্ট?)
কর্ণাকর্ষণ অতিশয় তুচ্ছ,—
যা কর সাহিব নাড়িব পুচ্ছ;
হুজুর হুজুর বলি' জীবন মরণে
রব পড়ি ইন্দুবিনিন্দিত চরণে;
রহিও খুসি,—ঘুঁষি আস্টা রাগে
মেরো না কো কেবল নাকে।

৩

ও ঘুঁষি পড়িলে কর্ণে, স্তব্ধ
ত্রিভুবন; শুনি শুধু ঝাঁ ঝাঁ শব্দ;
ও ঘুঁষি পড়িলে গণ্ডে জোরে
একেবারে মাথা ঘোরে;
কাণা নিশ্চিত পড়িলে চক্ষে;

* পজ্ঝটিকা ছন্দে পড়িতে হইবে। যথা,—'মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং' ইত্যাদি।

ভূমিবিলুণ্ঠিত পড়িলে বক্ষে ;
পড়িলে দন্তে বিভগ্ন পংক্তি ;
পড়িলে নাকে রক্তারক্তি ;
শুধু সে অঙ্গুলি মৃদুল স্পর্শে
শ্রবণে ত প্রভু অমিয়া বর্ষে !

৪

বসিয়া বসিয়া নিজ-ঘর-মধ্যে,
লেখা সোজা গদ্যে পদ্যে ;
"সমুচিত তুলিয়া ঘুঁষি নিজ হস্তে—
"মারা বেগে সাহিব মস্তে।"
ভাবো না সে স্থানে একা,
লাগে, প্রথমত ভেবা চেকা ;
একে, বঙালি দুর্ব্বল হস্ত,
তদুপরি ঘুঁষিটা ত অনভ্যস্ত ;
যখন পরাজয় খলু অনিবার্য্য
তখন কি যুদ্ধটি বুদ্ধির কার্য্য ?

৫

মাখি তৈল ঘন কুঞ্চিত কেশে,
স্নানস্নিগ্ধ উদরটা ঠেসে
ডালে ভাতে করিয়া পূর্ণ,
দন্তে পানে করিয়া চূর্ণ ;
চাপ্‌কান্ পরিয়া আপিস নিত্য
আসি হি পুরুষানুক্রম-ভৃত্য ;
নাকে কর্ণে চুপে চুপে,
রক্ষা করিয়া কোনোরূপে ;
সংসারেতে টিকিয়া আছি,
রহিনা—ঘুঁসি ফুঁসি কাছাকাছি।

৬

ওরা জেতা বিজিত হি মোরা ;
মোরা ভৃত্য প্রভু সব ওরা ;
মোরা চিঁ-চিঁ ওরা জোরালো ;
ওরা ফর্সা মোরা কালো ;
বিশীর্ণ দুর্ব্বল বঙালি অঙ্গে ?
সমর কি সাজে সাহিব সঙ্গে ?
যার কৃপাতে জীবন কাটে,
যার গুঁতাতে পীলা ফাটে,
রক্ষা নাহিক হইলে ক্রুদ্ধ,—
এমত সাহিব সঙ্গে যুদ্ধ !

৭

মোরে সর্ব্বে গালি ত দাও,
চক্ষু বিঘূর্ণিত করিয়া চাহো ;
কহ কত বাণী লম্বা লম্বা ;—
সবাই কার্য্যে সমানই রম্ভা ;—
করেছ কে কে—বল সব শুদ্ধ
কয়টা সাহিব সঙ্গে যুদ্ধ ?
বজ্রপতন যে মুষ্ট্যাঘাতে,
অযুত বেয়নেট্ যৎপশ্চাতে,
দেখি তদীয় সু-ভীষণ মূর্ত্তি
হইয়াছে ঘুঁসি তুলিতে স্ফূর্ত্তি ?

৮

আমি ত দেখি তু জগতে ত্বরিতে,
ব্যগ্র নহে তবু কেহ ত মরিতে ;
সব অতি যত্নে টিকিয়া আছে,
—প্রাণে ইচ্ছা আরো বাঁচে ;—
অর্থ উপার্জ্জে বিবিধ উপায়ে,
—থাকে টাকা আরো চাহে ;—
আমি কি একা সাহিব-ভৃত্য ?
মোরি কি আছে শুধু উদ্বৃত্ত ?
তবু যদি পারিনি সাহিব মার্ত্তে—
ছেড়িছি চাকরি—কয় জন পার্ত্তে ?

৯

আধ্যাত্মিক আহারে নিত্য
সাত্ত্বিক ভাবে পূর্ণ ত চিত্ত,—
গরম কিসে হইবে এ রক্ত ?
নহিলে সাহিব মারা শক্ত ?
যদি বা রক্তটি হইল হি উষ্ণ,
ওঠে না এ বাহু অপুষ্ট।
ভাবি স্ত্রী ও সব সুতকন্যায়,
ভাবি ক্রিমিনল আইন অন্যায়,
ভাবি ক্ষীণ হি দুর্ব্বল হস্ত,
ভাবি হি নাসা আপদ্‌গ্রস্ত,

১০

লইয়ে অভগ্ন দন্তে খাসা,
লইয়ে অক্ষত তিল-ফুল-নাসা,
সাহিব যুদ্ধে কে কে—খোঁজা,
—বিনাস বিদন্ত—অতিশয় সোজা,
সাহিব সঙ্গে করিয়া যুদ্ধ,
মোর পরে সব হইও ক্রুদ্ধ ;
যুক্তি দিতে ও করিতে তর্ক,
স্বগৃহে বসিয়া সবাই পক্ব।
না হইলে সম সঙিন অবস্থা,
বাক্যে বীরত্ব,—ও অতি সস্তা।

যশোহরে শিকার।

সুহৃদ্বরেষু—

রা-মহাশয়ের বাড়ীতে কলিকাতা হইতে জনকয়েক ভদ্রলোক আসিয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগকে লইয়া ব্যস্ত। পল্লীগ্রামে জীবনযাপন যে নিতান্ত দুর্ব্বিষহ ব্যাপার নহে, ইহা তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য আমরা নিতান্ত উৎসুক। রা-মহাশয় তাঁহার বহুযত্নসংগৃহীত বিদেশীয় বন্দুকগুলির ব্যবহার অতিথিদের বুঝাইয়া দিতেছিলেন। আগ্নেয়াস্ত্রের প্রদর্শনীতে বাঙ্গালীর কাপুরুষত্ব কলঙ্কের হ্রাস হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু দিবা দ্বিপ্রহরে অভ্যাগতের জঠরাগ্নির তাহাতে উপশম হইতে পারে কি না, সে বিষয়ে আমরা বিশেষ সন্দিহান হইতেছিলাম। এমন সময় সংবাদ আসিল; দুই ক্রোশ অন্তরে যশোহর ঝিনাইদহের পথে বিষুইখালি গ্রামের নিকট ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক এক জন আহত হইয়াছে। শিকারের সংবাদে সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলেন। আমি নিতান্ত শান্তিপ্রিয় নিরীহ লোক ; কিন্তু আমার তুষারশীতল হৃদয়েও যেন একটু উত্তাপের সঞ্চার হইল। এ কথা শুনিয়া বোধ হয় তোমার অধরপ্রান্তে একটু কৌতূহলদীপ্ত হাস্য দেখা দিবে। কিন্তু তোমার ভ্রমনিরাসের জন্য বলিয়া রাখি, শিকারের সময় নিতান্ত নির্জ্জীব হৃদয়েও একটু চাঞ্চল্যের আবির্ভাব হয়, ভয়ত্রস্তের মনেও কথঞ্চিৎ সাহসের উদ্রেক হয়।

আগন্তুক ভদ্রলোকেরা শিকারে যাইবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলেন। ইতিপূর্ব্বে শিকারে ইঁহাদের বিশেষ আগ্রহ লক্ষিত হইতেছিল। এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহারাও যে শিকার করিয়া থাকেন, তাহার উল্লেখ করিতেও বিস্মৃত হন নাই। কিন্তু এই সংবাদপ্রাপ্তির পর আর তেমন ঔৎসুক্য দেখা গেল না! সুতরাং ব্যাঘ্র-শিকার সে দিবসের জন্য কল্পনাতেই পর্য্যবসিত হইল। ভদ্রলোকেরা সন্ধ্যার সময় অক্ষতশরীরে কলিকাতায় যাইবার জন্য বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে ব্যাঘ্রের সংবাদ আনিবার জন্য লোক প্রেরিত হইল। কিন্তু কোনও নিশ্চিত সংবাদ পাওয়া গেল না। তথাপি শীঘ্র শীঘ্র আহারাদিসমাপন করিয়া আমরা হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ় হইলাম। রা-মহাশয়কে লইয়া "কাঞ্চনমালা" অগ্রসর হইল। তাঁহার পুত্র শ্রীমান প—ও স-বাবু "রণজিৎ সিংহের" উপর, আমিও অ-বাবু "বীরকুমারের" উপর। ইহা ব্যতীত "কমলকলি" "সেরজঙ্গ" ও "চপলা" আমাদের সঙ্গে চলিল। "রণজিৎ সিংহ" ও "সেরজঙ্গ"

বিশাল-শুভ্র-দন্তশালী। "বীরকুমার" আকারে প্রায় সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হইলেও, মাথনাজাতীয় ও দন্তহীন। অনেক গুলি লোক বর্ষা হস্তে করিয়া পদব্রজে ইতিপূর্ব্বেই আমাদের অগ্রগামী হইয়াছিল।

রা-মহাশয়ের হস্তে প্যারাডক্স বন্দুক। আমাদের কাহারো কাহারো হস্তে বর্ষা ও টাঙ্গি। কিন্তু আত্মরক্ষার্থ শ্রীমান প-র হস্তের একনলা বন্দুকটি আমাদের বিশেষ ভীতি উৎপাদন করিতেছিল। কি জানি যদি ব্যাঘ্র-শিকারের পরিবর্ত্তে মনুষ্য-শিকারই হইয়া যায়!

স্বল্পসলিলা বেগবতী পার হইয়া নলডাঙ্গার রাজাদিগের বহুপুরাতন দেবমন্দিরের সম্মুখে উপনীত হইলাম। নদীর অবস্থা ও দেবালয়ের অবস্থা সমতুল্য। নদী প্রায় শুষ্ক ও জলজলতায় পরিপূর্ণ; দেবালয় ভগ্ন ও মন্দিরচূড় বটবৃক্ষ-সমাচ্ছন্ন। নদীর আর সে বেগ নাই, মন্দিরেরও সে অভ্রভেদী চূড়া নাই। নয় দশটি মন্দিরের ভগ্নস্তূপ সুধু প্রাচীন কালের লোকের দেবপ্রীতির কথা ঘোষণা করিতেছে মাত্র। যে তোরণদ্বারের উপর হইতে প্রভাতে সানাইয়ে ভৈরবীর আলাপ হইত, সেই বিচিত্র তোরণদ্বারের সামান্য ভগ্নাবশেষ মাত্র এখন বর্ত্তমান। মন্দিরগুলির গঠন সীতারাম রায়ের মন্দিরের ন্যায়, এবং মন্দিরস্থ ইষ্টকগুলির উপর মহাভারত ও রামায়ণের অনেক ঘটনা ক্ষোদিত। অধিকাংশ মন্দির ১৫০০ ও ১৬০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত। আধুনিক দু' একটি শুভ্র মন্দির যেন প্রাচীনের অবমাননা করিতেছে।

ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব ও বাবু রামশঙ্কর সেন, এই নলডাঙ্গার রাজাদিগের আদিপুরুষ ও এই অতিপুরাতন মন্দিরগুলির নির্ম্মাতা সম্বন্ধে যে অলৌকিক গল্পের উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহার প্রসঙ্গ উত্থাপন না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

প্রায় চারি শত বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা জেলার অন্তর্গত ভাব্‌রাসুবা গ্রামে হলধর ভট্টাচার্য্য নামে এক জন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার অধস্তন পঞ্চম পুরুষ বিষ্ণুদাস হাজরা সন্ন্যাসী হইয়া গৃহ পরিত্যাগ করেন, এবং নলডাঙ্গার নিকট হাজরাহাটি নামক স্থানে বিজনে একটি ক্ষুদ্র আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছিলেন।

এক দিন নবাব বা ফৌজদার ঢাকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় বেগবতী বাহিয়া যাইতেছিলেন। সন্ন্যাসীর কুটীরের নিকট আসিয়া তাঁহাদের খাদ্যের অপ্রতুল হইল। কিন্তু চতুর্দ্দিকে পাঁচ শত ক্রোশ ব্যাপিয়া সুধু ঘন বনানী।

লোকালয়ের কোন চিহ্নমাত্র ছিল না। নবাবের লোকেরা বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতেছিল। সন্ন্যাসী তাহাদিগকে নিকটে আহ্বান করিয়া প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং অসীম যোগবলে মুহূর্ত্তমধ্যে প্রত্যেককে স্ব স্ব অভিলষিত দ্রব্য প্রদানে আনন্দিত করিলেন। নবাব সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণুদাসকে পাঁচখানি গ্রাম অর্পণ করিয়া যান। এই পঞ্চ গ্রাম হইতেই নলডাঙ্গার রাজাদিগের জমিদারীর সূত্রপাত হইল। কিন্তু এই যোগপ্রভাবশালী তপস্বীর গ্রামের কি দরকার, তাহা ভাল বুঝা যায় না।

যাহা হউক, কথিত আছে, যে যোগবলে নবাবের খাদ্য মিলিয়াছিল, সেই যোগবলে দারপরিগ্রহ না করিয়াও তাঁহার এক পুত্র লাভ হয়। পুত্রের নাম শ্রীমন্ত রায়। শ্রীমন্ত রায় স্বরূপপুরের আফগানদিগকে জয় করিয়া তাহাদিগের ভূসম্পত্তি অধিকার করেন। এবং এই কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ মুরশিদাবাদের নবাবের নিকট হইতে "রণবীর খাঁ" উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। দাউদখাঁর পরাজয়ের পর হইতে বাঙ্গালী জমিদারদিগের প্রভাবে আফগানেরা এই প্রকারে বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হইতেছিল। রণবীর খাঁও একটি সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া নদীতীরের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিয়া গিয়াছেন।

ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের কথা যাউক। আমরা মধ্যাহ্নে ধীরে ধীরে দেবালয়ের পাদদেশ অতিক্রম করিতেছিলাম। দেবালয়ের দক্ষিণে কালিকাদহ নামে একটি খাদ এই নিদারুণ বৎসরেও একবারে শুষ্ক হয় নাই। অদূরে বালকেরা ও পল্লীবধূরা দীর্ঘিকার স্নিগ্ধ জলে গাত্রমার্জ্জনা করিতেছিল। আমরা হস্তীদিগকে জলপান করাইয়া শিকারের উদ্দেশে চলিলাম। হস্তিসমূহ নদীগর্ভজাত জলজলতা ভক্ষণ করিতে করিতে মৃদুমন্থরগতিতে চলিতেছিল।

গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া প্রান্তরে উপস্থিত হইলাম। কোন দিকে কোন প্রকার শস্যের নাম মাত্র নাই। দক্ষিণ পার্শ্বে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে উচ্চভূমিতে একখানি গ্রাম ছবির ন্যায় মধ্যাহ্ন সূর্য্যে প্রতিভাত হইতেছিল। শীতকাল হইলেও গ্রামের নিম্নে বিলের ঈষৎ নীলাভ বারি নয়নের প্রীতি সম্পাদন করিতেছিল।

রৌদ্রের কিরণ প্রখর হইয়া আসিল। আমরা সোলার টুপিগুলি ভাল করিয়া টানিয়া দিলাম। ধুতি চাদরের উপর সোলার টুপি মাথায় দিতে দেখিলে তুমি বোধ হয় আমাদিগকে এক অদ্ভুত জীব বলিয়া বিবেচনা করিতে। কিন্তু ইহা ভিন্ন রৌদ্রের উত্তাপ হইতে রক্ষা পাইবার কোনও উপায় ছিল না। মধ্যে

মধ্যে অ—বাবুর সহিত দু' একটি কথা কহিয়া চারি দিকের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিলাম। বুঝিতে পার, আমাদের কথাবার্ত্তা কি লইয়া? সৃষ্টির আদি হইতে কবিরা যাহা লইয়া ব্যস্ত, সেই নিত্যনূতন অঙ্গনাদিগের কথাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। এই সুন্দর প্রহেলিকার কি যুগযুগান্তে কখনও মীমাংসা হইবে?

রা—মহাশয় একটা কুলগাছের নিকট আসিয়া বলিলেন, "পকেটে করিয়া নুন আনিয়াছেন তো?" গত বৎসর দু' এক দিন যখন শিকারে গিয়াছিলাম, তখন শিকার অপেক্ষা রক্তবর্ণ কুলগুলির উপর আমার বিশেষ মনোযোগ আকৃষ্ট হইত।

পূর্ব্ব দিন যেখানে এক জন লোক আহত হইয়াছিল, সেখানে উপস্থিত হইলে, অনেক লোক আমাদিগকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। খড়ের বনে আগুন দিবার সময় নিকটস্থ ঝোপ হইতে একটা বাঘ অতর্কিতভাবে কৃষকদিগের ভিতর লাফাইয়া পড়ে, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে এক জনকে আহত করিয়া খড় বনের ভিতর পলাইয়া যায়। লোকেরা বৃক্ষে উঠিয়া দূর হইতে ব্যাঘ্রকে নিরীক্ষণ করিতেছিল, এবং আশা করিতেছিল, রা—মহাশয় শীঘ্রই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া শক্রনিপাত করিবেন। আজ তাহারা অত্যন্ত আপশোষ করিতে লাগিল।

এক জন বৃদ্ধ নমস্কার করিয়া বলিল, "কাল আমরা বাঘটাকে এক প্রকার ঘিরিয়া রাখিয়াছিলাম। চারি দিক হইতে লোকে দেখিতেছিল বাঘটা কোথায় যায়। কিন্তু সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া অবশেষে আমরা নিরাশ হইয়া গৃহে ফিরিলাম।"

আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোন দিকে ফেউ ডাকিয়াছে, শুনিয়াছ কি?"

"রাত্রে ফেউ ডাকিয়াছিল। কিন্তু দুয়ার জানালা বন্ধ থাকায় বুঝিতে পারি নাই,—কোন দিক হইতে ডাকিয়াছে।"

প্রথম আমরা খড় বন খুঁজিলাম। কিন্তু মধ্যাহ্নে সেই অনাবৃত স্থানে ব্যাঘ্রের অবস্থিতি অসম্ভব। অ—বাবু রা—মহাশয়কে বলিলেন, "অদ্য সত্য সত্যই "Beating the bush!"

এই স্থানের ক্রোশার্দ্ধ দূরে নলডাঙ্গার নিম্নে প্রবাহিতা বেগবতী ঘুরিয়া আসিয়াছে। আমরা বেতসাচ্ছাদিত বেগবতীর তীর অন্বেষণ করিবার মনন করিলাম। কিন্তু বিশেষ আশা হইতেছিল না যে, ব্যাঘ্র মহাশয়ের সহিত অদ্য আমাদিগের দেখা সাক্ষাৎ হইবে।

এক স্থানে বেগবতী শুষ্কপ্রায়। সেই স্থানে পুনর্ব্বার নদী পার হইতে হইল। নদীতীর প্রায় মনুষ্যের অগম্য। কবিরা বানীরকুঞ্জের অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। গীতগোবিন্দে আছে "যমুনাতীরবানীরনিকুঞ্জে মন্দমাস্থিতম্।" কালিদাস বলিয়াছেন, "স্মরামি বানীরগৃহেষুসুপ্তঃ।" কিন্তু আমার বেত গাছের কথা মনে হইলেই ভয়ে গা শিহরিয়া উঠে। হস্তিযূথ যখন বিশাল বিক্রমে বেত বন ছিন্ন ভিন্ন করিয়া চলিল, আমরা তখন ত্রাহি ত্রাহি করিতে লাগিলাম। পরিধেয় খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। মস্তক হইতে টুপি খসিয়া পড়িল। কিন্তু এই কষ্টের মধ্যেও সুখ আছে। দার্শনিকেরা সত্য সত্যই বলিয়াছেন, জগতে অবিমিশ্রিত দুঃখও নাই, এবং অবিমিশ্রিত সুখও নাই। যখন মধ্যে মধ্যে অঙ্গনাদিগের সকৌতূহল স্নিগ্ধ দৃষ্টি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছিল, তখন ভাবিতেছিলাম, এই সুন্দর বসুন্ধরা মানবের আবাসযোগ্য বটে। যখন রমণী-কণ্ঠের অস্ফুট কাকলি, কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছিল,— মনে হইতেছিল, মানবজীবন নিতান্ত দুর্ব্বহ নহে। পাঠ্যাবস্থায় পূর্ব্ববঙ্গের কথিত ভাষা লইয়া পূর্ব্ববঙ্গাগত সহপাঠীদিগকে কত তীব্র উপহাস করিয়াছি। কিন্তু নারীকণ্ঠের সেই নূতন রকম বাঁকা বাঁকা কথা শুনিয়া মত পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। বোধ হইতেছিল, যেন সে ভাষা আমাদের দেশের ভাষা অপেক্ষা শুনিতে অধিক মধুর ও সুমিষ্ট।

নদীতীর অতিক্রম করিয়া আমরা বিষুইখালি বাজারের নিকট পৌঁছিলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। ব্যর্থমনোরথ হইয়া আমরা প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিতেছিলাম। রা—মহাশয় বলিলেন, "নিকটবর্ত্তী জলাশয় অন্বেষণ করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যাউক।"

জলাশয় সম্পূর্ণ শুষ্ক। পুষ্করিণীর গর্ভে নল ও বেতের গাছ। জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী হইলে হস্তিসমূহ ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল। আমরা বুঝিলাম, এই বার তামাসা আরম্ভ হইবে।

শুষ্ক নিম্নভূমি অন্বেষণ করিতে করিতে হঠাৎ বেতবন কম্পিত হইল। "চপলা" বিশেষ চঞ্চল হইয়া উঠিল। আমরা দৃঢ়ভাবে আসনে উপবিষ্ট হইলাম। রা—মহাশয়ের পশ্চাতে এক জন ভৃত্য টোটা লইয়া বসিয়াছিল। সে প্রথমে বাঘ দেখিয়া শিষ্ দিল। বাঘটা নিতান্ত ছোট নহে। সে অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় সাগ্রহচিত্তে আমাদিগের গতি বিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। সে ভাবিতেছিল, আমরা কিছু দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া যাইবে। কাঞ্চনমালা নূতন হস্তিনী,

মাহুতের যথেষ্ট তাড়না সত্ত্বেও কোন প্রকারে ব্যাঘের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল না। এ অবস্থায় ব্যাঘ্রকে গুলি করা চলে না। হস্তীর পার্শ্বদেশ হইতে আক্রমণ বিশেষ সুবিধাজনক নহে। শিকারের সময় হস্তীকে ব্যাঘ্রের দিকে মুখ করিয়া রাখাই ভাল। নতুবা বিপদ ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা।

রা—মহাশয় অগত্যা "কাঞ্চনমালাকে" পরিত্যাগ করিয়া "কমলকলির" উপর আসিলেন। "কমলকলি" হস্তিনী হইলেও সুন্দর শিক্ষিতা ও শিকারের সময় সম্পূর্ণ নির্ভীকা। আমাদের হস্তিসমূহ ব্যাঘ্রের পশ্চাৎ দিক হইতে অগ্রসর হইতে লাগিল। ব্যাঘ্র হঠাৎ বিদ্যুৎবেগে রা—মহাশয়ের হস্তিনীর বাম পার্শ্ব দিয়া পুষ্করিণীর উচ্চতীরের উপর উঠিয়া দুই তিন শত হস্ত দূরে এক ঝোপের মধ্যে আশ্রয় লইল। গুলি করিবার কোন অবসরই হইল না।

পুষ্করিণীর নিকট লোকারণ্য; এমন কি, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা কাতার দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ব্যাঘ্র দেখিয়া কে কোথায় পলাইবে, দিশা পাইতেছিল না। আমাদের নিষেধ সত্ত্বেও ছায়ার ন্যায় তাহারা আমাদিগের অনুসরণ করিতেছিল।

লতাগুল্মাচ্ছাদিত ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডের দিকে আমরা অগ্রসর হইলাম। রা—মহাশয়ের হস্তিনী ঘুরিয়া আসিতেছিল। শ্রীমান প—র হস্তীর সম্মুখে ব্যাঘ্র হঠাৎ বাহির হইয়া এক বার পশ্চাতে বৃহৎ দন্তুর হস্তীর উপর কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া দার্শনিকের ন্যায় ধীর গম্ভীর পদবিক্ষেপে পুষ্করিণীর ভিতর আশ্রয় লইল। বীরপ্রবর আলেকজান্দরকে এক জন ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন, "মৃত্যুকালে যাহার ত্রিহস্তপরিমিত ভূমি হইলেই যথেষ্ট হয়, তাহার এই সমগ্র ভূখণ্ড লাভ করিবার জন্য এত কষ্ট করিয়া উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল নদ নদী পার হইয়া আসিবার প্রয়োজন কি?" আমাদের হস্তিসমূহ লোক জন ও আড়ম্বর দেখিয়া বাঘের মনেও হয় ত এই প্রকার একটা ভাবের উদয় হইয়াছিল। যাহা হউক, আমাদিগকে নিরস্ত্র দেখিয়া বিশেষ ভ্রুক্ষেপ না করিয়া সে চলিয়া গেল।

আমারা শুষ্ক জলাশয়ের ভিতর পুনর্ব্বার অবতরণ করিলাম। কিন্তু ব্যাঘ্রের কোন চিহ্ন নাই। শুষ্ক ভূমিতে পদচিহ্নও দৃষ্ট হইল না। অন্ধকার হইতে অধিক বিলম্ব ছিল না। আমি বলিলাম, "পুষ্করণীর তীর এক বার অনুসন্ধান করিলে ভাল হইত। কিন্তু পুষ্করিণীর তীর হইতে বন জঙ্গল ভাঙ্গিয়া হস্তীগুলিকে উপরে লইয়া যাওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। উচ্চভূমি হইতে ব্যাঘ্র হটাৎ হস্তীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে। আমরা সমস্ত হস্তী লইয়া এক দিক দিয়া

তীরে উঠিলাম, এবং তীর হইতে জলাশয়গর্ভে আসিবার উদ্যোগ করিতেছিলাম। আমাদের মতলব বুঝিতে পারিয়া ব্যাঘ্র হঠাৎ পুষ্করিণীর উচ্চ ভূমি ত্যাগ করিয়া কয়েক শত হস্তে দূরে নদীতীরজাত নলবনের ভিতর প্রবেশ করিল। আমরা দ্রুতবেগে এই নূতন স্থল লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইলাম।

এই স্থানে নদীতে কিঞ্চিৎ জল আছে। কিন্তু জল পঙ্কিল ও জলজলতায় সমাচ্ছন্ন। সন্ধ্যার তিমিরাবরণ সমস্ত জল ও স্থল ঢাকিয়া ফেলিতেছিল। দুই একটি পক্ষী দলভ্রষ্ট হইয়া অতিদ্রুত পক্ষসঞ্চালনে অগ্রগামী সঙ্গীদিগকে ধরিবার জন্য আমাদের মাথার উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছিল। প্রকৃতি প্রায় নিস্তব্ধ ও শান্ত। সুধু আমাদের রক্তলোলুপ হৃদয়ে অশান্তি ও উদ্বেগ বিরাজ করিতেছিল।

আমরা ছয়টি হস্তী অর্দ্ধচক্রাকারে স্থাপন করিয়া অগ্রসর হইতেছিলাম। ব্যূহের সম্মুখে রা—মহাশয়ের হস্তী। হঠাৎ নলবন ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল। কি যেন আমাদের সম্মুখে অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতেছিল। বন্দুকের শব্দ হইল। কিয়ৎক্ষণ পরেই বিরাট পরাক্রমে ব্যাঘ্র নদীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। তখন বুঝিলাম, এই জন্তুর ক্ষুদ্র দেহে কি অসীম বল! যখন নদী পার হইল, বাঘটাকে পরিষ্কার দেখা গেল। সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়া যেন শক্তির স্ফুরণ হইতেছিল। অনেক বন্যজাতি ব্যাঘ্রের পূজা করিয়া থাকে; ইহা কি প্রকারান্তরে শক্তির পূজা নহে? যখন ব্যাঘ্র নদী পার হইতেছিল, রা—মহাশয় গুলি করিলেন। কিন্তু ব্যাঘ্রের অর্দ্ধ হস্ত দূরে গুলি জলের উপর ছিট্‌কাইয়া পড়িল। আমাদের আশা হইতেছিল, রা—মহাশয় পুনর্ব্বার গুলি করিবেন। কিন্তু তাহা হইল না। নদী অল্পপরিসর; ব্যাঘ্র শীঘ্র নদীর অপর পারে নলবনের মধ্যে প্রবেশ করিল। অ—বাবুর ইহাতে ভারি রাগ হইতেছিল। রা—মহাশয়কে একচোট খুব শুনাইয়া দিবেন,—মনে মনে সঙ্কল্প করিতেছিলেন। কিন্তু রা—মহাশয় বলিলেন যে, সম্মুখে বাতাস থাকায় প্রথমবারের বন্দুকনির্গত ধূমে ব্যাঘ্রকে দেখিতে পান নাই। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়িয়া গেল। দুই তিন বৎসর হইল, এক জন সাহেব রা—মহাশয়ের সহিত শিকারে গিয়াছিলেন। সে দিন বাঘটা একটু আহত হইয়া হস্তীগুলিকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করে, এবং হস্তীগুলির সম্মুখে ভীম গর্জ্জন করিতে করিতে ছুটিয়া বেড়াইয়াছিল। মিষ্টার—অনবরত গুলি করিতে আরম্ভ করিলেন। সপ্তদশ গুলিতে ব্যাঘ্র বেচারী নিহত হইল। ইংরাজের এই প্রকার শিকার দেখিয়া সমাগত দর্শকেরা

একটু একটু হাসিতেছিল। দেশীয়ের বিদ্রূপ সাহেবের কি সহ্য হয়! সন্ধ্যার অন্ধকারে বস্ত্রাবাসে ফিরিয়া আসিবার সময় রা—মহাশয়ের এক জন কর্ম্মচারী সিগারেটের ধূম পান করিয়া দিবসের ক্লান্তি দূর করিতেছিলেন। মিষ্টার হুকুম দিলেন, সিগারেট পরিত্যাগ কর। প্রভু জাতির সম্মুখে পদদলিত পরাধীন বাঙ্গালীর এত দূর বেয়াদবি! হায় বন্দুকে টোটা ভরা নাই! ব্যাঘ্রশিকারে কৃতিত্ব না থাকিলেও নিরীহ দেশীয়ের শিকারে যে শ্বেতকারমাত্রেরই অধিকার ও ক্ষমতা আছে, তাহা হয় ত সেই মুহূর্ত্তেই প্রমাণিত হইয়া যাইত।

যেখানে ব্যাঘ্র পার হইল, সেখানে হস্তী লইয়া পার হওয়া সুকঠিন। জল অত্যন্ত অল্প ও নদীগর্ভ পঙ্কিল। পঙ্কে হস্তীর পা বসিয়া যাইতে পারে। নদীর ধার দিয়া প্রায় অর্দ্ধ পোয়া পথ অতিক্রম করিয়া এক শুষ্ক স্থানে আমরা নদী পার হইলাম। সে সময় হস্তীর গতি শামুকের ন্যায় বোধ হইতেছিল। মাহুত অনবরত অঙ্কুশের আঘাত করিতেছিল, কিন্তু তবুও যেন সেই গজেন্দ্রগমনের কোনও পরিবর্ত্তন নাই! অ—বাবু উৎসাহে চীৎকার করিতেছিলেন।

প্রায় পনর মিনিট পরে ব্যাঘ্র যেখানে লুকাইয়াছিল, সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম। এখানেও নলবন। একটু খুঁজিতে না খুঁজিতে ব্যাঘ্র পুনর্ব্বার ভীম বেগে নলবন ভেদ করিয়া নদীর উপর পড়িল। গোধূলির ঈষৎ আলো ও অন্ধকারের মধ্যে রা—মহাশয় আবার গুলি করিলেন। বুঝা গেল না, গুলি লাগিয়াছে কি না। কিন্তু ব্যাঘ্র অপর পারে উপস্থিত হইতে না হইতে রব উঠিল, ব্যাঘ্র পড়িয়াছে। আমাদের সহিত "কাবুলি" নামে একটা দেশী কুকুর গিয়াছিল। দেশী হইলেও তাহার সাহসের ন্যূনতা ছিল না। নদী পার হইয়া যেখানে বাঘ পড়িয়াছিল, সেইখানে উপস্থিত হইয়া, বাঘ আগলাইয়া বসিয়া রহিল।

আমি সোলার টুপি ঘুরাইয়া বলিলাম, "Three cheers for রা—মহাশয়!" দেখিলাম, আমার বন্ধুটি একটি নলের পাঁপ কাটিতে ব্যস্ত। আমি বলিলাম, "ইহার দরকার কি?" তিনি বলিলেন, "কিছু পরে দেখিতে পাইবেন।"

ব্যাঘ্রের পৃষ্ঠদেশ ভেদ করিয়া বক্ষে গুলি প্রবেশ করিয়াছিল। আমরা যখন দেখিলাম, তখনও প্রাণবায়ু একবারে বহির্গত হয় নাই। কে বিদ্রূপচ্ছলে বলিল, "বাঘটা দাঁড়াইয়া উঠিতেছে।" অমনি বায়ুবিক্ষিপ্ত শীর্ণপত্রের ন্যায় সমাগত জনতা নিমেষে কোথায় মিশাইয়া গেল!

তাহার পর ব্যাঘ্রকে হস্তিপৃষ্ঠে লইয়া আমরা গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলাম। একটু শীত বোধ হওয়াতে গাত্রবস্ত্রে শরীর সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিলাম। সকলেই চিন্তানিমগ্ন, নীরব। আকাশ নক্ষত্রময়। আমরা নিস্তব্ধে মাঠের পর মাঠ পার হইতেছিলাম। কত কি মনে হইতেছিল। দেবালয়ের নিকট শঙ্খ ঘণ্টার রবে চমক ভাঙ্গিয়া গেল।

অ—বাবু একটা খেজুর গাছের কাছে আসিয়া বলিলেন, "এইবার নলের উপকারিতা বুঝিতে পারিবেন।" তিনি বৃক্ষ হইতে একটা কলসী নামাইয়া রুমালে নলের মুখ ঢাকিয়া রস পান করিলেন, এবং আমাকেও কিঞ্চিৎ পান করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু আমি বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না।

এইখানে আমার শিকারের বিবরণ শেষ হইল। তুমি যদি এখন জিজ্ঞাসা কর, আমার কি ভাল লাগে? গাড়া গাঁ, না সহর? আমি বলিব, and so the villa for me, not the city! যদিও "Beggars can scarcely be choosers."

যজ্ঞ ও আহার।

স্বভাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই, শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াই মাতৃস্তন্যপানে পরিপুষ্ট হয়। দেখা যায়, এই স্বাভাবিক নিয়ম মানবজাতির শৈশবাবস্থাতেও কার্য্য করিয়াছে; মানবজাতিও অতি শৈশবে প্রকৃতিপালিত শিশু ছিল, প্রকৃতির স্তন্যরূপ ফলমূল আহার করিয়া জীবনধারণ করিত। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির ক্রোড়ত্যাগ করিয়া মনুষ্য যতই স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে শিখিল, ততই তাহার অন্তর্নিহিত ধীশক্তিও ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। সভ্যতার সেই উষাকালে প্রাকৃতিক পদার্থসমূহ ধরণীর প্রথম সন্তানদিগের হৃদয়ে না জানি কত নব নব ভাব উদ্দীপিত করিয়াছিল। ইহা বৈদিক যুগেরও পূর্ব্বকালের কথা। এই আদিম কালেই সম্ভবতঃ অগ্নির সঙ্গে মানবের প্রথম পরিচয়। যখন বৃক্ষের শাখায় ঘর্ষণ লাগিয়া অরণ্য-অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তখন মানবকে অন্তর্নিহিত ধীশক্তি ভিন্ন আর কে তাহার কারণ বুঝাইয়াছিল? কাষ্ঠে কাষ্ঠে বা প্রস্তরে প্রস্তরে ঘর্ষণ দ্বারা যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, ইহা মানব প্রথমে প্রকৃতি-পুস্তকপাঠে শিক্ষা করিয়াছিল।

ইহার পর বৈদিক যুগ। বৈদিক যুগে মনুষ্য জ্ঞানে বিজ্ঞানে অনেক উন্নত হইয়াছে; অন্ন প্রভৃতি কৃত্রিমরূপে পাক করিতে শিখিয়াছে; ঘৃত প্রভৃতি নানাবিধ খাদ্য সামগ্রীরও আবিষ্কার করিয়াছে। এই যুগেই যজ্ঞের অভ্যুদয়। এই কালে যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি লোকের অতিশয় প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। যাগ যজ্ঞের প্রভাব সে সময়ে এত অধিক যে, শুভকর্ম্মমাত্রই যজ্ঞের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইত। তাই আমরা দেখিতে পাই, জগতের সর্ব্বাদিগ্রন্থ ঋগ্বেদে অগ্নিকে সকলের অগ্রে ঋষিরা সম্মান দিয়াছেন। এই যজ্ঞের কারণেই অগ্নিকে অগ্রণী করিয়া বেদের আরম্ভ।

অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং। হোতারং রত্নধাতমম্॥

"অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত এবং দীপ্তিমান; অগ্নি দেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিক এবং প্রভূতরত্নধারী; আমি অগ্নির স্তুতি করি।" ইহাই ঋগ্বেদের সর্ব্বপ্রথম ঋক; ইহার সর্ব্বপ্রথম শব্দটিও অগ্নি। 'অগ্নিমীলে' ইত্যাদি অগ্নিদৈবত সূক্তগুলিতে যে অগ্নিকে 'পুরোহিত', 'ঋত্বিক' ইত্যাদি বিশেষণে বিশিষ্ট করা হইয়াছে, তাহাতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যজ্ঞ হোম প্রভৃতির কারণে অগ্নি পূর্ব্বঋষিদিগের স্তুতিভাজন হইয়াছিল। বৃষ্টি না হইলে শস্য হইবার উপায় নাই, এবং শস্য না হইলে যজ্ঞাদি সম্পন্ন হয় না, তাই দ্যুলোকস্থিত বৃষ্টির আহ্বানের জন্য অগ্নিই নিযুক্ত হইত। অগ্নিতে আহুতি দিলে যে তাহা বৃষ্টিরূপে পরিণত হয়, ইহা ভারতের চিরন্তন সংস্কার। মনুও এই মতের পোষক হইয়া বলিতেছেন,—

অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥

"অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে সূর্য্যের উপস্থান হয়, সূর্য্য হইতে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি হইলে শস্য জন্মে, এবং শস্য হইতে প্রজা উৎপাদিত হয়।" অগ্নি দ্বারা বৃষ্টি প্রভৃতি আহূত হইত বলিয়া বেদমন্ত্রে অগ্নি দেবগণের আহ্বানকারী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যাহা দ্যুলোকস্থিত ও যাহা দীপ্তিমান, তাহারই দেব-নামে অধিকার আছে। এই সূত্রে বোধ হয়, মেঘ সকলও—যাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইন্দ্র,—দেব-শব্দের বাচ্য।

প্রাচীন কালে ঋষিদিগের নিকট অগ্নি পরিবারভুক্ত ব্যক্তিবিশেষের ন্যায় সমাদৃত হইত। একালে আমরা যেরূপ শ্রদ্ধাবশতঃ মাতৃভূমির প্রতি পুত্রোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া গান বা কবিতার রচনা করি, সেইরূপ ঋষি কবিরাও প্রাচীন কালে অগ্নি প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থের উপকারিতা স্মরণ করিয়া

শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ তাহাদের উদ্দেশে ছন্দোবদ্ধ সূক্তগুলির রচনা করিয়াছেন। বঙ্গের কবি ভাবের আবেগে যেমন 'বন্দে মাতরং' 'মাতাকে বন্দনা করি' বলিয়া ভারতমাতার বন্দনা গাহিতে পারিয়াছেন, ঋষি কবিও সেইরূপ ভাবের আবেগে 'অগ্নিমীলে' 'অগ্নিকে স্তুতি' করি বলিয়া অগ্নিস্তোত্র গাহিয়াছেন। কবিতা অধিকাংশ সময়ে প্রকৃতির রাজ্যে খেলা করিতে ভালবাসে, তাই বৈদিক কালেও ঋষি কবিরা অগ্নি বায়ু সূর্য্য প্রভৃতি বাহ্য প্রকৃতি এবং মানব প্রকৃতিকে অধিকাংশ সময়ে কবিতার বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ভারতের কবিতায় চিরদিন পূর্ণোপমা রূপক প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব অত্যধিক। ভারতের গানে রাগকে মূর্ত্তিমান করিয়া তোলা গায়কদিগের লক্ষ্য। পাশ্চাত্য সঙ্গীতে রাগ এবং ভাব আংশিকরূপে প্রবল হইয়া উঠে; পাশ্চাত্য কবিতাও রূপক এবং পূর্ণোপমার তত পক্ষপাতী নহে। এই সকল কারণে, ভাব ও ভাষার গুণে, বেদসূক্তের বর্ণিত বিষয়গুলি যেন মূর্ত্তিমান বলিয়া প্রতিভাত হয়।

ঋষিদিগের গৃহে অধিকাংশ ক্রিয়াকর্ম্মই অগ্নির সহায়ে সুসম্পন্ন হইত; তাই অগ্নির আর একটি প্রাচীন নাম গৃহ্য। গোভিল বলেন, "গৃহাঃ পত্নী গৃহ্য এষো অগ্নির্ভবতীতি"—"পত্নীকে গৃহা এবং এই অগ্নিকে গৃহ্য বলা যায়।" গৃহ্য শব্দের ব্যুৎপত্তি গৃহায় হিতঃ। মধুচ্ছন্দা ঋষি ঋগ্বেদের প্রথম সূক্তটিতে কেমন সরল প্রাণে বলিতেছেন,—'সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে'—হে অগ্নি! মঙ্গলার্থে আমাদিগের নিকট সমবেত হও। কত প্রাচীন কাল হইতে যে ভারতবাসীরা অগ্নির উপকারিতা বুঝিয়াছেন, তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে? পূর্ব্বোক্ত সূক্তেই মধুচ্ছন্দা বলিতেছেন,—

অগ্নিঃ পূর্ব্বেভি ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত।

অগ্নি পূর্ব্ব ঋষিদিগের স্তুতিভাজন হইয়া আসিতেছেন, এবং নূতন ঋষিদিগেরও স্তুতিভাজন।

কিন্তু ঋষিরা অগ্নির প্রতি এত অধিক শ্রদ্ধা ও সমাদর প্রকাশ করাতে অনেকে ভ্রমে পতিত হয়েন যে, তাঁহারা অগ্নি-পূজক ছিলেন। কিন্তু ভারতের পার্শ্ববর্ত্তী অপর এক জাতিকে যখন দেখি যে, তাঁহারা অগ্নিপূজক না হইয়াও, ঐ একই কারণে অগ্নির প্রতি অতিপ্রাচীন কাল হইতে শ্রদ্ধা সমর্পণ করিয়া আসিতেছেন, তখন এ ভ্রম দূর হইবারই কথা। সিন্ধুতীরবাসী আর্য্যদিগের ন্যায় পারসীকেরা ঈশ্বর বা উপাস্য দেবতা বলিয়া কখন অগ্নির পূজা করেন না; অগ্নিকে ঈশ্বরসৃষ্ট মঙ্গলজনক ও পবিত্র বস্তু বলিয়া সমাদর করেন,

এবং অগ্নিহোত্রদিগের ন্যায় গৃহে, দেবমন্দিরে, চির দিন অগ্নি রক্ষা করিয়া থাকেন। জেন্দ ভাষার অভিজ্ঞ সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত আঁকেতিল দুপের (Anquetil Du Perron) পারসীকদিগের ধর্ম্ম মত সম্বন্ধে বলিতেছেন, “পারসীকেরা প্রথমাবধি আজি পর্য্যন্ত উৎসাহের সহিত একেশ্বরের উপাসনা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। তাহারা যে অগ্নি ও সূর্য্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, তাহার জন্য এ কথা কখনই বলা যাইতে পারে না যে, তাহারা ঐ সকল ভৌতিক পদার্থের উপাসনা করিয়া থাকে; কারণ, উহাদিগের প্রধান গুরু জোরোষ্টর উহাদিগকে উপাসনার সময় অগ্নি বা সূর্য্যের সম্মুখে ফিরিয়া উপাসনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু তাহাদিগের উপাসনার প্রার্থনাগুলি দেবদেব একেশ্বরেরই উদ্দেশে করা হয়, অগ্নি প্রভৃতিকে উদ্দেশ করিয়া নহে।” পারসীকেরা যে নিরবচ্ছিন্ন একেশ্বরের উপাসক, এ বিষয় ফর্ব্বস, সর উইলিয়ম আর্ডসলি, ডাক্তার হাইড প্রভৃতি সকল পণ্ডিতেরাই একমত, এবং পারসীকেরা স্বয়ং ইহার জন্য গৌরব করিয়া থাকে। কোন পারসীক ঐতিহাসিক লিখিতেছেন, “Ask a parsse whether he is a worshipper of the sun or fire and he will emphatically answer—No! There is no doubt of their being monotheists; they tolarate no other worship but that of the supreme being.” পারসীকেরা সূর্য্য এবং অগ্নিকে সম্মান প্রদর্শন করে, তাহা কেবল সূর্য্য ও অগ্নি জগতের শুভকারী বলিয়া এবং পবিত্র তেজোমূর্ত্তি দ্বারা জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বরকে স্মরণপথে আনয়ন করে বলিয়া। এই একই কারণে অগ্নির সম্মুখে ঈশ্বরোপাসনা পারসীকদিগের ন্যায় হিন্দুদিগেরও ধর্ম্মবিধি আছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন,—

গৃহেষু তৎসমং জপ্যং গোষ্ঠে শতগুণং ভবেৎ।
নদ্যাং শতসাহস্রন্তু অনন্তমগ্নিসন্নিধৌ॥

গৃহে গায়ত্রী জপ করিলে যে ফল হয়, গোষ্ঠে করিলে তাহার শত গুণ ফল হয়, নদীতে জপ করিলে লক্ষ গুণ ফল, এবং অগ্নিসমীপে করিলে অনন্ত গুণ ফললাভ হয়। ব্যাস, শঙ্খ প্রভৃতি অনেক মুনিই অগ্নিসম্মুখে ঈশ্বরোপাসনা প্রশস্ত এবং সর্ব্বপাপনাশক বলিয়াছেন। এক্ষণে পাঠক দেখিলেন যে, সিন্ধুতীরবাসিগণ এবং পারসীকগণ উভয়েই পবিত্রতা, লোকোপকারিতা প্রভৃতি গুণের জন্য অগ্নির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন। *

* কেবল অগ্নির প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনবিষয়েই যে হিন্দু ও পারসীকে ঐক্য আছে, তাহা

অগ্নিকে যেমন ভারত সকল বিষয়ে অগ্রণী করিয়া চলিতেন, অগ্নিও তাহার প্রতিদানস্বরূপ ভারতকে সকল বিষয়ে সকলের অগ্রণী করিয়া দিয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি যখন অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন, তখন এক অগ্নিই ভারতকে আলোকিত করিয়াছিল, বলিতে হইবে। অগ্নিসংসৃষ্ট যাগ যজ্ঞই যে প্রাচীনকালে সকল বিষয়েই ভারতের উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল, ভারতের ঐতিহাসিকমাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন। শ্রদ্ধাস্পদ রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এ বিষয়ে যাহা বলেন, তাহা নিম্নে আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,—

“নানাবিধ যজ্ঞই প্রাচীন হিন্দুগণের ধর্ম্মানুষ্ঠান ছিল, এবং হিন্দুগণ নানাশাস্ত্রে যে ক্রমশঃ উন্নতি ও জ্ঞানলাভ করেন, তাহাও যজ্ঞানুষ্ঠানমূলক। যজ্ঞসম্পাদনার্থ সূর্য্য চন্দ্র বা নক্ষত্রের গতি দর্শন করিয়া তাঁহারা জ্যোতিষ শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করেন। যজ্ঞে বিশুদ্ধরূপে মন্ত্র উচ্চারণ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা যে নিয়মগুলির আলোচনা করিতে লাগিলেন, তাহা হইতে ‘দেববিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা’ এবং ব্যাকরণের উৎপত্তি, এবং যজ্ঞসম্পাদনার্থ যে চিতি প্রস্তুত করিবার আবশ্যক হইত, তাহারই নিয়মসমূহ হইতে জগতে জ্যামিতিশাস্ত্রের উৎপত্তি।”

ভারতের আয়ুর্ব্বেদ, যাহা দেশে বিদেশে চিকিৎসাশাস্ত্রের বীজবপন করিয়াছে, তাহা যজ্ঞেরই ফলমাত্র; কারণ, যজ্ঞ হোম প্রভৃতি যে অথর্ব্ববেদের সর্ব্বস্ব, সেই অথর্ব্ববেদই আবার আয়ুর্ব্বেদের জন্মদাতা। প্রকৃত কথা এই যে, যজ্ঞের জন্য ঋষিদিগকে ঔষধি ও ফলমূল প্রভৃতি অরণ্য হইতে আহরণ করিয়া আনিতে হইত, এবং তাহারই ফলে নবনব ঔষধি ও ফলমূল প্রভৃতি

নহে; হিন্দুদিগের আচার প্রথার সহিত পারসীক আচার প্রথারও অনেকাংশে সাদৃশ্য বিদ্যমান। পারস্যের প্রাচীন জেন্দভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার যেরূপ ঘনিষ্ঠতা, এরূপ অন্য কোন বিদেশীয় ভাষার সহিত দেখা যায় না। এই সকল কারণে পারসীকেরা সিন্ধুতীরবাসী হিন্দুজাতির উপনিবেশ বা শাখাবিশেষ বলিয়াই বোধ হয়। জেন্দ শব্দটিই এই মতের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে। ভাষাতত্ত্বের নিয়মালোচনা করিলে দেখা যায় যে, একটি শব্দ ভাষা হইতে ভাষান্তরে পরিভ্রমণকালে অক্ষররূপে পরিচ্ছদের কতক পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। কিন্তু এই সময়ে শব্দাক্ষরগুলি নিজ নিজ পরিচিত অপর কতকগুলি অক্ষরকে আপনার স্থানে আহ্বান করে; যেমন, স জ হ, ইহারা পরস্পরের স্থানে পরস্পরকে আসন দিয়া থাকে। এই কারণে সপ্তাহ হপ্তাহ হইয়াছে, সংস্কৃত সোম শব্দ জেন্দ ভাষায় হোম হইয়াছে, এবং এই একই কারণে সংস্কৃত হরিদ্রা শব্দ পারস্য ভাষায় ‘জরদ’ এবং সংস্কৃত ‘হোতা’ জেন্দ ভাষায় জোতা আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। এই প্রমাণে জেন্দ শব্দটি সিন্ধু শব্দ হইতে উদ্ভূত বলিয়াই বোধ হয়। একদিকে সিন্ধু শব্দ হইতে যেমন হিন্দু উৎপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ অন্যত্র জেন্দ আকার প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে।

আবিষ্কৃত হইয়া ঋষি-সভায় তাহাদিগের গুণাগুণও পরীক্ষিত হইয়া যাইত। তাই ভারতের আয়ুর্ব্বেদে আমরা যেমন ফলমূল প্রভৃতির প্রত্যেকটির গুণাগুণ বিশদরূপে জানিতে পারি, এমন আর কোনও বিদেশীয় গ্রন্থের দ্বারা জানিতে পারি না।

প্রাচীন কালে যজ্ঞ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল;—শ্রৌত ও গৃহ্য। তাহার মধ্যে গৃহ্য যজ্ঞ আবার তিনটি উপবিভাগে বিভক্ত;—দৈনিক পঞ্চযজ্ঞ, বিবাহাদি সংস্কার যজ্ঞ ও পাক যজ্ঞ। দৈনিক পঞ্চযজ্ঞ প্রতিদিন আচরণ করা বিধি এবং সংস্কার যজ্ঞ উপবীত বিবাহাদি বিশেষ ক্রিয়াকর্ম্মে অনুষ্ঠান করা বিধি। পাকযজ্ঞগুলি পূর্ণিমা প্রভৃতি পর্ব্বদিনে এবং ঋতুতে ঋতুতে অনুষ্ঠেয়।

যজ্ঞ সেকালের ধর্ম্মসাধন ছিল; দেবতা, পিতৃ, অতিথি এবং পশু পক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণীদিগের পরিতৃপ্তির জন্য ঋষিদিগের সকল চেষ্টা। তাঁহারা ভাবিতেন যে, নিঃস্বার্থভাবে সকলকে পরিতৃপ্ত করিলে নিজে যথেষ্ট পরিতৃপ্ত হওয়া যায়, তাই তাঁহাদিগের নিয়ম ছিল, সকলকে পরিতৃপ্ত করিয়া অবশেষটুকু গৃহস্থেরা আহার করিবেন।

দেবানৃষীন্মনুষ্যাংশ্চ পিতৄন গৃহ্যাশ্চ দেবতাঃ।
পূজয়িত্বা ততঃ পশ্চাদ্‌গৃহস্থঃ শেষভুগ্‌ভবেৎ॥

অতএব দেখা যাইতেছে, যজ্ঞ ও আহার, এই দুইটি কার্য্য, ঋষিপরিবারে সহোদর ভ্রাতৃদ্বয়ের ন্যায় এক সূত্রে আবদ্ধ ছিল; এই কারণেই দেখিতে পাই, যজ্ঞের দ্বারা সূপশাস্ত্রেরও সবিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এক্ষণে আমরা যে সকল মিষ্টান্ন ও অন্ন ব্যঞ্জনাদি আহার করিয়া পরিতৃপ্ত হই, তাহাদিগের অনেকগুলিই যজ্ঞের কল্যাণে জন্মলাভ করিয়াছে। একালে যজ্ঞাদির বড় একটা প্রভুত্ব নাই, আহারই সর্ব্বতোভাবে যজ্ঞের স্থান অধিকার করিয়া শোভান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। যজ্ঞীয় উপকরণগুলি এক্ষণে আহার্য্যের উপকরণে পরিণত।

যজ্ঞ কেবল এইরূপে যে ভারতেরই খাদ্যোন্নতির পক্ষে সহায়তা করিয়াছে, তাহা নয়; এমন কি, আমরা যে সকল বিদেশীয় খাদ্য এবং খাদ্যোপকরণ মুসলমান বা য়ুরোপীয় প্রতিভার ফল বলিয়া জানি, সে সকলেরও অনেকগুলি যজ্ঞমূলক। প্রাচীনকালে ভারতের যাগযজ্ঞই দেশে বিদেশে প্রচারিত হইয়াছিল; তাহা হইতেই সেই সকল দেশের অধিবাসিগণের মধ্যে নব নব যজ্ঞীয় খাদ্যাদিও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আমরা এ সকল বিষয় ক্রমে প্রমাণসহকারে পাঠকের গোচর করিব।

প্রাচীনকালে যজ্ঞ ও আহার যে এক সূত্রে গ্রথিত ছিল, আহার শব্দটিও তাহার প্রমাণ। আহরণ শব্দ হইতেই আহার শব্দটি আসিয়াছে। আহরণ শব্দটি প্রকৃত যজ্ঞসম্পর্কীয় শব্দ; ইহা যজ্ঞ সম্বন্ধেই অধিক ব্যবহৃত হইত। সেকালে বনে বনে যজ্ঞের জন্য এবং যজ্ঞাবশেষ আহারের জন্য ফল মূল প্রভৃতি আহরণ করিয়া আনিতে হইত। এক্ষণে যদিও বনে বনে আহরণ করিয়া বেড়াইতে হয় না, কিন্তু এক্ষণেও বিনা আহরণে আহার্য্য লাভ করা সুকঠিন। ঋষিদিগের আহৃত বনজ শাক শবজিগুলি অধিকাংশ শবুজ রঙ্গের হইত বলিয়া শবুজ রংও 'হরিত' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে;—আহরণ বা হরণ হইতেই হরিত শব্দের উৎপত্তি। আহরণ শব্দের সমগোষ্ঠীয় শব্দ আমরা য়ুরোপীয় ভাষাতেও দেখিতে পাই। ইংরাজী 'আরণ' (earn) শব্দটি সংস্কৃত আহরণ শব্দেরই বংশধর। ইংরাজী আরণ শব্দটি স্যাক্সন আরনিয়ান (earnian) বা জর্ম্মন আরন্‌টেন শব্দ হইতে আসিয়াছে; ইহার অর্থ শস্যাদি সংগ্রহ করা—আহরণ শব্দেরও ঐ একই অর্থ। শুদ্ধ আহার শব্দ নয়, আহারার্থ অনেকগুলি সংস্কৃত শব্দেরই অনুরূপ শব্দ আমরা য়ুরোপীয় ভাষায় প্রাপ্ত হই। অনেকেই জানিতে পারেন, ভোজনার্থ অদ্ ধাতুর অনুরূপ শব্দ লাটিনে 'ইডো' (Edo) ইংরাজীতে ইট (Eat) স্যাক্সন ইটান (Etan) ইত্যাদি। সংস্কৃত অশন শব্দেরও তুল্য শব্দ আমরা জর্ম্মান ভাষায় এস্‌সেন্ (Essen) শব্দ পাই। এমন কি, যে 'ডিনার' (Dinner) শব্দের আমরা অনুবাদ করি, 'মধ্যাহ্নভোজন', সেই ডিনারকে জর্ম্মানরাও 'মধ্যাহ্নভোজন' বলে। ডিনারকে জর্ম্মন ভাষায় মিট্টাগস্ এস্‌সেন্ (Mittags essen) বলে; মিট্টাগস্ অর্থে মধ্যাহ্ন এবং এস্‌সেন্ অর্থে অশন বা ভোজন। অশন, অদন এবং আহরণ, এই শব্দ গুলি বৈদিক কাল হইতে সংস্কৃত ভাষায় চলিয়া আসিতেছে। বেদমন্ত্র এবং বৈদিক গৃহ্যসূত্র প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ প্রভৃতিতে বহু স্থলে ইহাদিগের উল্লেখ আছে। গৃহ্যসূত্র 'সায়মাশ' ও 'প্রাতরাশ' শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ আছে।* "নিষ্ঠিতে সায়মাশপ্রাতরাশেভূত মিতি প্রবাচয়েৎ।" প্রাতরাশ এবং সায়মাশ অনুষ্ঠিত হইলে পরে (ছাত্রগণকে) অধ্যয়ন করাইবে।

* আমরা প্রাতঃকালীন ভোজনকে প্রাতরাশ বলি, কিন্তু সায়ঙ্কালীন ভোজনকে সান্ধ্যভোজন শব্দের দ্বারায় সচরাচর ব্যক্ত করি। কিন্তু বোধ হয়, সান্ধ্যভোজন অপেক্ষা বৈদিক সায়মাশ শব্দ ব্যবহার করিলে অপেক্ষাকৃত শ্রুতিমধুর হয়।

বাঘের ঘরে অতিথি।

আমি কার্য্যোপলক্ষে শ্রীনগর হইতে তিহরীর পথে যাইতেছিলাম। গাড়োয়ালের রাজা শ্রীনগর হইতে তিহরী যাইবার যে রাজপথ প্রস্তুত করিয়াছেন, সে পথের অবস্থা অতীব শোচনীয়। রাজপথ শুনিয়া যাঁহারা কলিকাতা, দিল্লী. লাহোরের রাজপথের কথা মনে করিতেছেন, তাঁহাদের অবগতির জন্য বলা আবশ্যক যে, সে রাজপথ এমন সুপ্রশস্ত যে, দুইটি মানুষ বিভিন্ন দিক হইতে আগত হইলে এক জনকে পর্ব্বতগাত্র ঘেঁসিয়া দাঁড়াইতে হয়; নতুবা অপর ব্যক্তির যাওয়া কষ্টকর। এই পথে এক দিন অপরাহ্ণে আমি পথিক।

দুই প্রহরে এক বৃক্ষতলে অতিথি হইয়াছিলাম। সঙ্গে পর্ব্বতবাসী দৃঢ়কায় এক ব্রাহ্মণপ্রবর পথপ্রদর্শক ছিলেন; তিনি আমার একাধারে সব;—পাচক, ভৃত্য, পথপ্রদর্শক, কথার দোসর। সেই পর্ব্বতবাসী ব্রাহ্মণের নামটি আমি ভুলিয়া গিয়াছি। দুই প্রহরে বৃক্ষতলে 'দাল আউর রুটি বানায়কে' মধ্যাহ্নকৃত্য সম্পন্ন করা গিয়াছিল; তাহার পর উভয়ে সেই বৃক্ষতলে ভূমিশয্যায় কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া অপরাহ্ণ চারিটার সময় যাত্রা করা গেল।

এই স্থানে একটা কুসংস্কারের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার জন্য পাঠকগণের অনুমতি ভিক্ষা করিতেছি। এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে 'হাঁচি টিকটিকি'র উপর অনেক বাক্যবাণ বর্ষিত হইয়া থাকে; এ সব জানিয়াও আমি তেমনি একটা ব্যাপারের কথা বলিতে যাইতেছি। যাত্রা করিবার জন্য যখন প্রস্তুত হইয়াছি, তখন প্রথমেই আমার হাতের লাঠিখানি হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গেল। এমন দৃঢ় সুন্দর যষ্টি, আমার পর্ব্বতভ্রমণের অদ্বিতীয় সহায়, আমার নিবিড় অরণ্যের একমাত্র সহচর, আমার সুখদুঃখের একমাত্র অবলম্বন, আমার সন্ন্যাসিজীবনের প্রাণপ্রিয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা,—কথা নাই, বার্ত্তা নাই, পৃথিবীর অন্যান্য প্রিয়তম চোরেরা যেমন এক এক জন এক এক দিন না বলিয়া না কহিয়া হৃদয় আঁধার করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তেমনি আমার এই অরণ্যবাসসহচর যষ্টিখণ্ডও অসময়ে এই বনপ্রান্তে আমাকে জবাব দিয়া বসিলেন। আমি কিছু অপ্রসন্ন হইলাম; কিন্তু নিরুপায়।

জীর্ণ বস্ত্রের মত যষ্টিখণ্ডদ্বয় পাহাড়ের মধ্যে ফেলিয়া দিলাম। কে জানে, হয় ত কোন্ দিন কোন পথিক আমার এই দেহটিকেও এমনই জীর্ণবস্ত্রের

মত পথের মধ্য হইতে সরাইয়া দিবে; তখন ত সেই দিনেরই অপেক্ষা করিতেছিলাম।

পর্ব্বতপথে আর সমস্ত জিনিস না হইলেও চলে, কিন্তু হাতে একখানি লাঠি থাকা চাই। চড়াই উঠিবার সময় একখানি লাঠি তিনখানি পায়ের কার্য্য করে। কি করি, সঙ্গী পাহাড়ীর লাঠিখানি নিজে লইলাম, সে একটা গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া চলনসই রকম একখানা লাঠি করিয়া লইল। সবে দুই তিন পা অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময়ে কি করিয়া বলিতে পারি না, আমার পায়ে কম্বল জড়াইয়া গেল, আর আমি একেবারে ভূমিসাৎ; এমন পড়িয়া গেলাম যে, যদি সে স্থান কোন একটা চড়াই বা উৎরাইয়ের মুখ হইত, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আমার সন্ন্যাসযাত্রা শেষ হইয়া যাইত। সৌভাগ্যক্রমে স্থানটি তেমন উঁচু নীচু ছিল না; ততোধিক সৌভাগ্য যে, আমার পথপ্রদর্শক অতিনিকটেই ছিল; সে তাড়াতাড়ি আমাকে টানিয়া তুলিল। হাতে সামান্য একটু আঘাত লাগিয়াছিল; মাথাতেও লাগিয়াছিল, তাহা তখন তেমন বুঝিতে পারি নাই।

অকস্মাৎ লাঠি ভাঙ্গিয়া গেল, তাহা অপেক্ষাও অকস্মাৎ আমার মত এক জন পর্ব্বতভ্রমণনিপুণ জোয়ান একেবারে 'পপাত ধরণীতলে' দেখিয়া পথপ্রদর্শক এবেলা যাত্রা করিতে মহা আপত্তি করিয়া বসিল। এমন প্রবল দুইটি বাধা ঠেলিয়া এ অপরাহ্ণে যাওয়া কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। আমি ইংরাজী পড়িয়াছি, বিজ্ঞানের ধার ধারি। সাহেবদের কলেজের ছাত্র, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের উন্নতিশীল যুবক; আমি এই পর্ব্বতের মধ্যে 'বাধা' মানিয়া কি ইংরাজী লেখাপড়ার মুখ হাসাইব? যদি কখন দেশে ফিরিয়া গিয়া এই গল্পটি করি, এমনই করিয়া একটি পাহাড়ীর কুসংস্কারের বশীভূত হইয়া আমি একবেলা অকারণে গাছের তলায় অনাহারে পড়িয়া ছিলাম, তাহা হইলে আমার শিক্ষিত ভ্রাতৃগণ যে আমাকে নিতান্ত বর্ব্বর মনে করিবেন? Huxley, Tyndal, Herbert Spencer প্রভৃতি পড়িবার কি এই ফল হইবে? এই রকম সাত পাঁচ ভাবিয়া সঙ্গীকে নানা কথায় বুঝাইতে লাগিলাম; ও সব কিছুই নহে; এমন করিয়া চলা ফেরা করিলে চাই কি জীবনের অবশিষ্ট কয়টি দিন এই গাছের তলাতেই কাটিয়া যাইতে পারে। কিন্তু যতই তাহাকে বুঝাই, সে সেই একই কথা বলে,—"দোনো বাধা ঠেল্‌কে জানা মুনাসিব নেহি।" শেষে আমি যখন কৃতনিশ্চয় হইলাম, তখন বেচারী আর কি করে?

"বাবুজীকা অদৃষ্টমে ভগবান্ বহুত কষ্ট লিখা",—এই ভবিষ্যৎবাণী করিয়া, সে নিতান্ত অপ্রসন্নমনে আমার অনুগমন করিল, এবং ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। আমি কিন্তু বাধার কথা আর ভাবিলাম না।

সঙ্গীকে ধীরে ধীরে আসিতে দেখিয়া তাহার সঙ্গে চলা আমার পোষাইয়া উঠিল না। সেই দিন সন্ধ্যার সময়ে কোথায় থাকিতে হইবে জিজ্ঞাসা করিয়া লইলাম। সে বলিল, "ঐ স্থান হইতে পাঁচ মাইল দূরে রাস্তার বাম পার্শ্বে একটা পাথরের ভাঙ্গা বাড়ী আছে; সেখানে দোকান আছে; সেখানেই আমরা আজ রাত্রিবাস করিব। সে দোকান ছাড়িয়া গেলে আর দশ মাইলের মধ্যে থাকিবার স্থান নাই। "আর রাস্তার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, "বরাবর সিধা সড়ক"; সুতরাং পথপ্রদর্শকের সঙ্গে সঙ্গে চলিবার আবশ্যকতা আর অনুভব করিলাম না; আমি ক্রমেই দ্রুত চলিতে আরম্ভ করিলাম, সঙ্গীও ক্রমে পশ্চাতে পড়িতে লাগিল।

সেই বেলা চারিটার সময়ে পথ চলিতে আরম্ভ করিয়াছি; এখন সূর্য্য অস্ত যায় যায় হইল। রাস্তারও শেষে দেখি না, বাম পার্শ্বে সে পাথরের ভাঙ্গা বাড়ীও দেখি না; আর এত পথ চলিয়াছি, ইহার মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র কুটীর কি এক জন মানুষ কিছুই দেখিতে পাই নাই; বামে, দক্ষিণে, সম্মুখে, পশ্চাতে, সেই অনন্ত বৃক্ষশ্রেণী নীরবে দাঁড়াইয়া আছে; তাহারই মধ্য দিয়া ক্ষুদ্র সে পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া কখন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে, কখনও বা একটু বেশী প্রশস্ত হইতেছে, কখনও বা অতি কষ্টে পথের রেখা বাহির করিতে হইতেছে। রাস্তার যে প্রকার গতিক দেখিলাম, তাহাতে বোধ হইল, অনেক দিন তাহার অদৃষ্টে হয় হয় ত মনুষ্যের পদস্পর্শ ঘটে নাই।

খুব কম হইলেও দ্রুতপদে প্রায় আড়াই ঘণ্টা কাল পথ চলিয়াছি; ইহার মধ্যেও কি পাঁচ মাইল পথ চলিতে পারি নাই? সন্ধ্যা আগত দেখিয়া এই কথাই বার বার মনে হইতে লাগিল। তাহা হইতেই পারে না। আমার মনে হইল, যে প্রকার তাড়াতাড়ি চলিয়াছি, তাহাতে পাঁচ মাইল কেন, পাঁচ ক্রোশ পথ আমি অতিক্রম করিয়াছি। তখন আর বুঝিতে বাকী রহিল না, আমি এই জনহীন হিমালয়ের গভীর জঙ্গলে পথ হারাইয়াছি। আর এখন স্বীকার করিতেই বা লজ্জা কি, তখন বার বার মনে হইতে লাগিল, 'বাধা' না মানিয়া আসিবার ফল ত হাতে হাতে ফলিল। দেশে আমাদের বাড়ীতে এক জন বহুকালের মুসলমান চাকর ছিল; সে যখন তখনই বলিত, 'যে না

মানে বাধা, সে বড় গাধা'; এই জঙ্গলের মধ্যে সেই কথা মনে হইল। বুঝিলাম, সঙ্গী পাহাড়ীর সেই ভবিষ্যৎবাণী সফল হইল, 'বাবুজীর' অদৃষ্টে ভগবান আজ অনেক কষ্ট লিখিয়াছেন।

এখন এই জনহীন নিবিড় অরণ্যে কি করি? যদি প্রাণ যায় তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু যতক্ষণ প্রাণ আছে, ততক্ষণ ত তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে! এই জঙ্গলের মধ্যে নিশ্চেষ্টভাবে হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকি, আর রাত্রিকালে হিংস্রজন্তু আমাকে অনায়াসে গ্রাস করিয়া ফেলুক, সংসারের উপর, জীবনের উপর হাজার বীতস্নেহ হইলেও, তাহা পারা যায় না; সুতরাং একটা আশ্রয়ের অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইলাম। সময় বুঝিয়া সন্ধ্যার আকাশে মেঘ উঠিল; একেই সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই বনের মধ্যে অন্ধকাররাশি এক এক স্থানে জমাট বাঁধিতেছিল, তাঁহার পর আকাশে মেঘ হওয়ায় তাহারা আরও ঘন হইতে লাগিল, আমারও বিপদ ক্রমে গাঢ়তর হইয়া উঠিল। পর্ব্বতের মেঘ, সবুর সয় না। এই আকাশ নির্ম্মল, কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ পাহাড়ের কোন্ কোণে এক খণ্ড মেঘ চুপ করিয়া এতক্ষণ বসিয়াছিল, দেখিতে দেখিতে আসিয়া উপস্থিত হইল, গাছ ভাঙ্গিল, পাতা উড়াইল, ধূলি কঙ্করে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিল; বৃষ্টি হইল, শিলাবৃষ্টি হইল; আবার দশ পনের মিনিটের পরেই যেমন হাসি মুখ, তেমনি। একে পথহারা, সঙ্গী কোথায় গেল, তাহার ঠিকানা নাই; তাহার পরে বেলা বারটার সময়ে যে দাল রুটী খাইয়াছিলাম, তাহা কখন হজম হইয়া গিয়াছে। তাহার পর সন্ধ্যা আগত; ইহাতেও যেন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই, সুতরাং এই অন্ধকারকে আরও ভীষণ করিবার জন্য আকাশে মেঘ, ঝড়, বৃষ্টি। মড় মড় করিয়া গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল; প্রতিক্ষণেই মনে হইতে লাগিল, এইবার একটা প্রকাণ্ড ডাল মাথায় পড়িয়া আমাকে একেবারে পিষিয়া ফেলিবে আমি একটা পাহাড়ের গায়ে চুপ করিয়া বসিলাম; সৌভাগ্যক্রমে শীঘ্রই বৃষ্টি থামিয়া গেল, ঝড় কিন্তু শীঘ্র গেল না। বৃষ্টি অপেক্ষা ঝড়ই বেশী হইয়াছিল।

এ প্রকার স্থানে বসিয়া থাকিয়া কোনও ফলই নাই, ভাবিয়া, যে পথে আসিয়াছিলাম, সেই পথেই ফিরিতে আরম্ভ করিলাম; মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিতে লাগিলাম; যদি আমার চীৎকারধ্বনি সঙ্গীর অথবা অন্য কোন লোকের কর্ণে পৌঁছে, তাহা হইলেও এই অন্ধকার রাত্রে আমার আশ্রয়

মিলিতে পারে। কেহই কোন উত্তর দিল না, কেবল সেই ঘনান্ধকার নিবিড় অরণ্যের মধ্যে আমার সেই ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে মিলিয়া গেল।

একটু অগ্রসর হইয়াই একটা বেশ পরিষ্কার স্থানে উপস্থিত হইলাম। এই স্থান দিয়াই চলিয়া গিয়াছি, কিন্তু যাইবার সময়ে এদিকে তত লক্ষ্য করি নাই। এই স্থানে পর্ব্বতের গাত্র হইতে একটা নির্ঝর পতিত হইতেছে, এবং তাহারই পার্শ্বে একটা গুহা; অন্ধকারে যত দূর দেখিতে পাওয়া যায়, দেখিলাম, গুহাটি পরিষ্কার বটে। তবে এই অল্পক্ষণ পূর্ব্বের ঝড়ে অনেকগুলি শুষ্কপত্র গুহার মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে। আরও দেখিলাম, গুহার বাহিরে অনতিদূরে বড় বড় তিন চারিটা শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড পড়িয়া আছে। অনেক কষ্টে সেই কাষ্ঠ কয়েকখানি গড়াইয়া গড়াইয়া গুহার মুখে আনিয়া বসাইলাম। তাহার পর গুহার মধ্যে যে শুষ্কপত্র ছিল, সমস্ত সেই কাষ্ঠখণ্ডগুলির সম্মুখে স্তূপাকার করিলাম। আহার আর কি করিব, অঞ্জলি পুরিয়া নির্ঝরের জল পান করিলাম। তাহার পর দুইখানি ছোট ছোট 'চির' কাষ্ঠ লইয়া ঘর্ষণ করিতে লাগিলাম; কিছুক্ষণ পরেই তাহা হইতে অগ্নি বাহির হইল। এত-ক্ষণ আমি গুহার মধ্যে প্রবেশ করি নাই; কারণ, বাহিরে যতটা অন্ধ-কার হইয়াছিল, গুহার মধ্যে অন্ধকার তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক। এখন অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া যখন শুষ্ক পত্রে অগ্নি সংযোগ করিলাম, তখন দেখিলাম, গুহাটি নিতান্ত ছোট নহে, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কিন্তু তাহার মধ্য হইতে কেমন একটা দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে। তখন বুঝিতে পারিলাম, ইহা কোন হিংস্র জন্তুর আবাসস্থান। আজ আমি তাহারই গৃহে অতিথি। উপায়ান্তর না দেখিয়া ধীরে ধীরে গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম, এবং বড় বড় কাঠগুলি এমন করিয়া গুহাদ্বারে সাজাইয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিলাম যে, বাহির হইতে সহজে আর কেহ ভিতরে আসিতে পারিবে না। বিশেষতঃ, গুহার মধ্যভাগ যেমন প্রশস্ত, প্রবেশদ্বার তেমন নহে। বড় একটা বাঘ কি ভালুক গুঁড়ি সুঁড়ি দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু ভিতরে আমি অনায়াসে দৌড়াইতে পারিয়াছিলাম। গুহা এই প্রকার সঙ্কীর্ণমুখ হওয়ায় আমার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল; কারণ, আমি যে আগুন জ্বালাইয়াছিলাম, তাহাতে সেই সঙ্কীর্ণ গুহাপথে আর কাহারও প্রবেশের যো ছিল না।

এই প্রকারে কতক্ষণ কাটিয়া গিয়াছিল, মনে নাই। হঠাৎ একটা শব্দে আমি যেন জাগিয়া উঠিলাম। আমি যে ঘুমাইয়াছিলাম, তাহা নহে; গুহার

মধ্যে কেমন একটু অন্যমনস্ক হইয়া নিজের জীবনের দুঃখ কষ্টের কথা ভাবিতে-ছিলাম। শব্দটি নির্ঝরের দিক হইতে আসিতেছে। স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, কোন জন্তু যেন জিহ্বা দ্বারা চক্ চক্ করিয়া জল খাইতেছে। তাহার অব্য-বহিত পরেই দেখি, প্রকাণ্ডকায় একটা বাঘ গুহার সম্মুখে আসিয়া বসিল; বোধ করি, আগুন জ্বালিয়াছিলাম বলিয়া নিকটে আসিতে পারিল না; দূরে পশ্চাতের দুই খানি পায়ের উপরে বসিয়া একদৃষ্টে প্রজ্বলিত অগ্নির দিকে চাহিয়া রহিল। ব্যাঘ্র মহাশয়ের দীন নয়ন দেখিয়াই বুঝিলাম, এ গৃহ তাঁহারই; আমি আজ তাঁহাকে বেদখল করিয়া জোর করিয়া তাঁহার রাজগৃহে অতিথি। এমন অতিথি সে তাহার ব্যাঘ্রজীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় কখনও দেখে নাই। তাহার মহান রাজশক্তির এমন অবমাননাও তাহার জীবনে কখনও হয় নাই। কিন্তু কি করে? আজ স্বয়ং ব্রহ্মা ক্ষুদ্র মানবের সহায়; নতুবা এত-ক্ষণ এমন নির্লজ্জ ক্ষীণকায় দুর্ব্বল অভ্যাগতের জন্য সে অতি বিজন স্থানে চির-আতিথ্যের বন্দোবস্ত করিত!

এই অন্ধকার রজনীতে সহরের মধ্যে তোমাকে যদি কেহ তোমার বাড়ী হইতে জোর করিয়া তাড়াইয়া দিয়া নিজে দখল করিয়া বসে, তাহা হইলে তুমি যে দুর্ব্বল বাঙ্গালী, তুমি কি অন্ততঃ তোমার ম্যালেরিয়াগ্রস্ত হস্তখানি একবারও মুষ্টিবদ্ধ কর না? ব্যাঘ্র বনের রাজা; সকলের মাথা খাইয়াছে বই নিজের মাথা কাহারও নিকট অবনত করে নাই। আজ এই গভীর নিশীথে, এই অন্ধকারে, তাহাকে গৃহচ্যুত করিয়া জঙ্গলে তাড়াইয়া দেওয়াটা সে সহজেই পরিপাক করিতে পারিল না। কিছুক্ষণ বসিয়া বসিয়া শেষে এমন এক গর্জ্জন করিয়া দণ্ডায়মান হইল যে, আমার বোধ হইল, সে নিজের স্বত্ব সাব্যস্ত করিবার জন্য বুঝি এই অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প প্রদান করে! কিন্তু এ বিষয়ে তাহাকে মানুষের অপেক্ষা বুদ্ধিমান দেখিলাম। তুমি আমি হইলে এই ভদ্রাসন দখলের জন্য যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়া হাইকোর্ট পর্য্যন্ত মামলা করিয়া শেষে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ও তরুতলে রাত্রি-যাপন করিতাম। ব্যাঘ্র মহাশয় সে প্রকার কিছু না করিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। হয় ত আগামী কল্য একবার এই অতিথির সঙ্গে বোঝা পড়া করিবার মতলব আঁটিতে আঁটিতে সে সমস্ত রাত্রি বনের মধ্যে ছুটিয়া বেড়াইয়াছিল। তাহার পর দিন বেলা সাতটার সময়ে আসিয়া সে হয় ত দেখিয়াছিল যে, তাহার অতিথি প্রকৃতই অতিথি; দ্বিতীয়

তিথি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে তিনি মোটেই প্রস্তুত নন। তাহার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত হয় ত সেই ব্যাঘ্র আকাশে মেঘ দেখিলেই আগে ছুটিয়া আসিয়া নিজ গৃহদ্বার জুড়িয়া বসে! কিন্তু সে পরীক্ষা করিতে যাইবার আর আমার অবকাশ ছিল না। এক রাত্রি বাঘের ঘরে অতিথি হইয়া আসিয়াছি। ঝড় বৃষ্টির মধ্যে অন্ধকার রাত্রে তোমার বাড়ী অতিথি হইতে গেলে তুমি তাড়াইয়া দিতে, কিন্তু বনের বাঘ সমস্ত রাত্রি নিজের বাসগৃহ ছাড়িয়া দিয়া অতিথি সেবা করিয়াছিল! কি স্বার্থত্যাগ!

ভূকম্পন-তত্ত্ব।

পৃথিবীর নানা প্রাকৃতিক রহস্যের মধ্যে ভূকম্পন একটি অতি গূঢ় রহস্য। ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বহু অনুসন্ধানেও ইহার সংঘটনকালের বিষয়ে কোন নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। ভূকম্পনের সহিত পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ তাপের বিশেষ সম্বন্ধ আছে, পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন; কিন্তু কি প্রকারে ঐ তাপ দ্বারা এরূপ ভয়ানক ব্যাপার সংঘটিত হয়, এবং উক্ত তাপের প্রকৃতিই বা কি, এ সকল প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞানবিশারদগণ আজও নিরুত্তর; যাঁহারা সাহস করিয়া এ সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়াছেন, তাঁহারা প্রায়ই আন্দাজ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলিয়া থাকেন। বিদ্যুতের সহিত ভূকম্পনের বিশেষ সম্বন্ধ আছে, সম্প্রতি কয়েকটি বিজ্ঞানবিদ্ এইরূপ অনুমান করিয়াছেন।

যে সকল পণ্ডিত বিদ্যুৎকেই ভূকম্পনের মূল কারণ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন, তাঁহাদের মতবাদ আজিও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই, এবং এই অনুমানের পোষক কোন যুক্তিও অদ্যাপি প্রদত্ত হয় নাই। আভ্যন্তরীণ-তাপবাদী পণ্ডিতগণের মতবাদই আজ কাল দার্শনিক সমাজে গ্রাহ্য; কিন্তু অদ্যাপি ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত হয় নাই। বিরুদ্ধমতবাদী বৈজ্ঞানিকগণ নানা যুক্তি দ্বারা ইহার অমূলকতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ভূকম্পের উৎপত্তি-প্রসঙ্গে প্রথমোক্ত শ্রেণীর পণ্ডিতগণ বলেন, সম্ভবতঃ ভূপৃষ্ঠের অতিনিম্ন প্রদেশে বৃহদায়তন গহ্বর আছে। এই সকল গহ্বরে, ভূপৃষ্ঠস্থ জল কোন প্রকারে নীত হইলে, ভূমধ্যস্থ তাপ দ্বারা তাহা বাষ্পাকারে পরিণত হয়। পাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় অবগত আছেন, কোন পদার্থ বাষ্পীভূত হইলেই তাহার আয়তন বর্দ্ধিত হয়; এবং অনতিপ্রসর স্থানে আবদ্ধ বাষ্পে তাপ প্রদান করিলে, বাষ্প আরও অধিক স্থান অধিকার করিবার চেষ্টা করে। যদি

আবদ্ধ স্থান হইতে নির্গমের কোন পথ থাকে, তবে উত্তপ্ত বাষ্প সবলে তথা হইতে বাহির হইতে আরম্ভ করে, নচেৎ আবদ্ধস্থান ভাঙ্গিয়া বাহির হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। ছেলেদের রবার-নির্ম্মিত খেলনা ব্যোমযান লইয়া এ বিষয়ের বেশ পরীক্ষা করা যাইতে পারে। উক্ত বাষ্পপূর্ণ খেলনায় ঈষৎ তাপ সংযোগ করিলে রবার গোলকটি স্ফীত হইতে দেখা যায়; কিন্তু একটু অধিক তাপ প্রয়োগ করিয়া মধ্যস্থ বাষ্প উত্তপ্ত করিলে সশব্দে রবারের আবরণটি বিদীর্ণ হইয়া যায়। বাষ্পীয় যন্ত্রাদিতে যে সকল দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তাহার অধিকাংশ স্থলেই হঠাৎ বাষ্পনির্গমপথ রুদ্ধ হইয়া যাওয়ায়, উক্ত প্রকারে পাত্র বিদীর্ণ হওয়াই বিপত্তির মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। ভূমধ্যস্থ আবদ্ধ বাষ্পরাশি উত্তপ্ত হইয়া অধিক স্থানে ব্যাপ্ত হইবার চেষ্টা করে, কিন্তু স্থানাভাব-বশতঃ যথেচ্ছ প্রসার লাভ করিতে পারে না, কেবল গহ্বরপার্শ্বে ভয়ানক চাপ দিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করে। ভূমধ্যস্থ গহ্বরে প্রায় ভূপৃষ্ঠাভিমুখী দুই একটি ছিদ্র থাকে। গহ্বরস্থ বাষ্পরাশি পূর্ব্বোক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, সেই সকল ছিদ্র অবলম্বন করিয়া ভূপৃষ্ঠাভিমুখে আসিতে আরম্ভ করে। অধিক উত্তপ্ত হইলে এই বাষ্পরাশি কখন কখন ভূস্তরের নানা বাধা অতিক্রম করিয়া ভূপৃষ্ঠের উপরে আসিয়া উপনীত হয়। ক্ষুদ্র ছিদ্রপথ অবলম্বন করিয়া বাষ্প-রাশি ভূপৃষ্ঠস্থ হইবার সময়, ছিদ্রপার্শ্বস্থ ভূমিতে সবলে আঘাত করিতে থাকে। ইহারই ফলে ভূমি আন্দোলিত ও ভূকম্পনের সৃষ্টি হয়। কখন কখন এই উত্তপ্ত বাষ্প ভূপৃষ্ঠস্থ হইবার পূর্ব্বে, কোন জলার্দ্র স্তরের সন্নিহিত হইবামাত্র শীতল হইয়া পুনরায় তরলাকার ধারণ করে; এই সকল স্থলে কেবল ভূকম্পন অনুভূত হইয়া থাকে, তথায় অগ্ন্যুদ্গমাদি অপর কোনও উপদ্রব দৃষ্ট হয় না।

এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা বলেন, জগদীশ্বর জগতের প্রত্যেক কার্য্যই কোনও এক বিশেষ মঙ্গলের উদ্দেশ করিয়া থাকেন; মঙ্গলময় বিধাতার রাজ্যে অকল্যাণ নাই। যদিও আমরা সর্ব্বাংশে এই মতের পক্ষপাতী নহি, তথাপি আপাততঃ অশুভ কার্য্য সকল যে কালে অশেষ কল্যাণের আকর হইয়া থাকে, তাহা আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই। ভূকম্পের সর্ব্বধ্বংসী প্রাকৃতিক উপদ্রব হইতে অতি সুদূর ভবিষ্যতেও যে কোন লোকস্থিতিকর সুফল পাওয়া যাইতে পারে, এ কথা সহসা মনে হয় না। পম্পীনগরের ধ্বংসকাহিনী, লিস্‌বনের সর্ব্বগ্রাসী ভূমিকম্পের বর্ণনা, এবং জাপানের সর্ব্বনাশের কথা শ্রবণ করিলে, এই সকল দেব-উপদ্রব প্রলয়ের মূর্ত্তিভেদ বলিয়াই মনে হয়। ভূতত্ত্ব-

বিদ্‌গণ দেখিয়াছেন, ভূকম্পন দ্বারা নিয়তই মহৎ উপকার সাধিত হইতেছে। যদি সৃষ্টিকাল হইতে এ পর্য্যন্ত একবারও ভূমিকম্প না হইত, তাহা হইলে পৃথিবীর কোনও বৈচিত্র্য থাকিত না। এমন কি, মনুষ্যাদি জীবগণেরও সৃষ্টি হইত না। জল ভূভাগের পরম শত্রু; সমুদ্র, নদী ও বৃষ্টিজলের কার্য্য প্রত্যক্ষ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, ভূ ক্ষয় জলের এক প্রধান কার্য্য। যদি এই অপচয় কোনও প্রবল প্রতিকূলশক্তি দ্বারা প্রতিহত না হইত, তাহা হইলে নদী ও সমুদ্র সমস্ত ভূ-ভাগ গ্রাস করিয়া, কিয়ৎকালের মধ্যে উন্নত প্রদেশমাত্রই স্বল্পোন্নত সমতল চরভূমিতে পরিণত করিত। এবং পরে চরসংস্থান ব্যাহত হইয়া সাগরজলে পৃথিবী আচ্ছন্ন হইয়া পড়িত। সার্ জন্ হার্সেল প্রভৃতি দার্শনিকগণ বলেন, জলের এই সর্ব্বগ্রাসিনী শক্তির প্রতিকূলে অন্য কোনও শক্তি নাই; কেবল ভূমিকম্প দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ক্ষয়ের পূরণ হইয়া থাকে। ভূমিকম্প দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ভূপৃষ্ঠ উচ্চ বা নিম্ন হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা দ্বারা কোন স্থান অসম্ভব উন্নত বা নিম্ন হয় না। সমুদ্রতীরবর্ত্তী যে ভূ-ভাগ ও নদীবহুল প্রদেশ জল দ্বারা অতি শীঘ্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই সকল প্রদেশেই আগ্নেয় পর্ব্বতাদি দ্বারা প্রায় ভূমিকম্প হইয়া স্থলভাগ আবশ্যকানুযায়ী উন্নত হইয়া পড়ে। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের প্রসিদ্ধ ভূকম্পন, ইহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ; এই ভূকম্পন দ্বারা সমুদ্রতীরবর্ত্তী একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম সাগরগর্ভস্থ হইয়া যায়; কিন্তু উক্ত গ্রামের অনতিদূরে প্রায় ৫০ মাইল দীর্ঘ ও ২০ মাইল বিস্তৃত একটি ভূখণ্ড অকস্মাৎ অত্যন্ত উন্নত হইয়াছিল। ভূমিকম্পের পূর্ব্বে সাগরতরঙ্গের উপদ্রবে উক্ত প্রদেশের অনেক অংশ সমুদ্রে বিলীন হইয়াছিল; কিন্তু এই আকস্মিক ভূকম্পন দ্বারা সাগরের উপদ্রব এককালে তিরোহিত হইয়াছে।

প্রাচীন বা আধুনিক বিজ্ঞানশাস্ত্রে ভূমিকম্পের কালগণনা করিবার কোন উপায় লিপিবদ্ধ নাই। সংঘটনসময়নিরূপণের কোনও নিয়ম পরিজ্ঞাত থাকিলে, জাপান ও ইটালি প্রভৃতি স্থানের সর্ব্বসংহারক ভূমিকম্পের অনিষ্টকারিতার অনেক অংশে হ্রাস হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শতচিন্তাজর্জ্জরিত মানবের মন এক নূতন অশান্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া পড়িত। কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভূকম্পনে আমার সুবৃহৎ অট্টালিকা ভূতলশায়ী হইবে, এবং সম্ভবতঃ পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া ধনজনপূর্ণ মহানগরী উদরসাৎ করিবে, ইহা অপেক্ষা ভয়াবহ অশান্তিকর ভবিষ্যৎবাণী আর কি হইতে পারে? আধুনিক

বৈজ্ঞানিকগণ নানা-উদ্বেগ-পীড়িত মানব-মনে আর এক অভিনব উৎকণ্ঠার সঞ্চার করিতে কুণ্ঠিত না হইয়া, আজ কয়েক বৎসর হইতে ভূকম্পের কাল-গণনাপদ্ধতির আবিষ্কারের জন্য নিযুক্ত রহিয়াছেন, এবং এ বিষয়ে কতকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছেন।

বিজ্ঞানবিদ্‌গণ প্রথমে ইটালি প্রভৃতি ভূকম্পনবহুল য়ুরোপীয় প্রদেশে পরীক্ষার সূচনা করেন; কিন্তু তথায় বহুচেষ্টাতেও ভূমিকম্পনের কাল-নিরূপণোপযোগী কোন সূত্র না পাইয়া, তাঁহারা ভূকম্পের কেন্দ্রস্থল জাপান-দ্বীপে পরীক্ষা আরম্ভ করেন। বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্ আচার্য্য মিল্‌নি, গত বিশ বৎসর তথায় অবস্থান করিয়া, এই বিষয়ের পর্য্যবেক্ষণাদি করিয়াছিলেন, এবং অল্প দিন হইল, ভূকম্পনের কালনিরূপক এক যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়াছেন। ঝটিকা প্রভৃতি আকস্মিক প্রাকৃতিক উপদ্রবের সংঘটনকাল অধিক পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করা বড় দুরূহ; এমন কি, আধুনিক উন্নত জড়বিজ্ঞানের অসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; বায়ুমান যন্ত্রাদি দ্বারা যেমন ঝটিকাগমনের সম্ভাবনা সংঘটনকালের প্রায় অব্যবহিত পূর্ব্বে জানা যায়, তেমনই মিল্‌নি সাহেবের উল্লিখিত যন্ত্র দ্বারা ভূকম্পন-সম্ভাবনা কেবল দুই তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে জানা গিয়া থাকে। ভূমিকম্প বাহ্যতঃ যেরূপ আকস্মিক ঘটনা বলিয়া বোধ হয়, প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহা সেরূপ নহে। মিল্‌নি সাহেব বলেন, কোন স্থানে ভূমিকম্প হইবার প্রায় দুই তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে ভূপৃষ্ঠ অতি ধীরে ধীরে কম্পিত হইতে থাকে। এই স্পন্দন এত মৃদু যে, স্থানীয় অধিবাসিগণ ইহা কিছুমাত্র অনুভব করিতে পারে না; কিন্তু সাহেবের এই নবোদ্ভাবিত যন্ত্র দ্বারা এই স্পন্দন উপলব্ধি করিয়া আশু ভূকম্পনের সম্ভাবনা জানা যায়। ভূকম্পনসূচক এই আদি-স্পন্দনের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহার উৎপত্তিস্থানে, অর্থাৎ ভাবী ভূকম্পনক্ষেত্রে, এই স্পন্দন অতি মৃদু ও ক্ষণস্থায়ী থাকে; এমন কি, পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্ম যন্ত্র দ্বারাও ইহার অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না। কিন্তু কেন্দ্র হইতে যত দূর দেশে যাওয়া যায়, স্পন্দন তত সুস্পষ্ট ও কালব্যাপী বলিয়া বোধ হয়। জাপানের কোন আসন্ন ভূকম্পনের আদি-স্পন্দন ইংলণ্ড হইতে যেরূপ স্পষ্ট অনুভূত হইবে, চীন হইতে সেরূপ হইবে না।

আচার্য্য মিল্‌নি জাপান হইতে ভূকম্পন সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ণিত নব তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া, অধুনা ওয়াইট্ দ্বীপে এক পরীক্ষাগার নির্ম্মাণ করিয়া, তথায় নানাবিধ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। ইতিমধ্যে পৃথিবীর নানা অংশের ভাবী ভূমিকম্পের

বিষয় গণনা করিয়া তত্তৎ দেশের অধিবাসীদের বিদ্যুৎযোগে জানাইয়াছেন। গত জুন ও আগষ্ট মাসে জাপানে যে মহা ভূকম্প হয়, মিল্‌নি সাহেব অনেক পূর্ব্বে তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন ; কিন্তু তথনও তাঁহার যন্ত্রটি সম্পূর্ণ হয় নাই বলিয়া, গণনার ফল প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই। পৃথিবীর সকল বৈজ্ঞানিক-সমাজই আচার্য্য মিল্‌নির এই নবাবিষ্কারে বিস্মিত হইয়াছেন। কেবল একটি নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষাগারে স্পন্দন পরীক্ষা করিয়া সমগ্র ভূভাগের ভূকম্পনের কথা গণনা করা অতীব দুরূহ, এবং তাহা ভ্রমপূর্ণ হইবারও সম্ভাবনা আছে বিবেচনা করিয়া, ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান বিজ্ঞান-সভা ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন্ পৃথিবীর নানা অংশে পরীক্ষাগারস্থাপনের আয়োজন করিতেছেন। আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বহু পর্য্যবেক্ষণেও প্রশান্ত ও আট্‌লাণ্টিক্ মহাসাগরের তল-দেশের অবস্থা বিশেষ জানিতে পারেন নাই। সাগরতলশায়ী টেলিগ্রাফের তার প্রায়ই বিকল ও ছিন্ন হইতে দেখিয়া, সমুদ্রতল চঞ্চল ও ভূমিকম্পবহুল বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। আচার্য্য মিল্‌নির এই বৃহৎ আবিষ্কার দ্বারা সমুদ্রের প্রকৃত অবস্থা ও সমুদ্রতলস্থ ভূকম্পনকেন্দ্র সকলের অবস্থান প্রভৃতি অতি সহজেই জানিবার সম্ভাবনা হইল, অনেকে এইরূপ আশা করিতেছেন।

লহ উপহার।

ধর ধর হৃদি-পুষ্প লহ উপহার।
আজি এ মধুর প্রাতে
মধুর প্রভাত-বাতে
কি শুভ সংবাদ আসে প্রেম-দেবতার !
গোপনে আপনে, নারি,
আর না রাখিতে পারি—
ছুটে কি আকুল শ্বাস সুখ-মলয়ার !
বুঝি দলে দলে ফুটে
পূর্ণতায় পড়ি লুটে,
টুটে পড়ে চারিধারে সর্ব্বস্ব আমার।
তুলিতে তুলিতে ফুলে
লহ গো আমারে তুলে—
গাঁথিয়া পর গো গলে প্রেম-ফুলহার।

ধর ধর হৃদি-পুষ্প লহ উপহার।
তুমি স্বর্গ বনদেবী
ভ্রমিছ সমীর সেবি,
আমি মন্দাকিনী-কূল-নবীন-মন্দার !
জন্ম-জন্মান্তর ধরি
আশা স্মৃতি জড় করি
গড়িয়াছি তোমা লাগি স্বপন-সম্ভার।—
তুমি পরিমল-সুখে
তুলিয়া লইবে বুকে,
পবিত্র কৃতার্থ হব পরশে তোমার।
রাখ কিম্বা দল' পায়—
কিবা তায় আসে যায়,
তোমারি একান্ত আমি স্বতঃ উপহার।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

বিদ্রোহের কবিতা।

ফরাসী বিপ্লবের সমকালে, বায়রণ, শেলী প্রভৃতি কবিগণ ইংরাজী সাহিত্যে যে বিদ্রোহের সুর প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, এখন তাহার আর বড় সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। ইংরাজী কবিতায় আজ কাল টেনিসনের আধিপত্যই প্রবল। মৃত রাজকবি, বায়রণের উদ্দাম অশান্তিপূর্ণ শয়তানী সঙ্গীতকে ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়া, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের শান্ত, সুশীতল, দার্শনিকোচিত সন্তোষ সহিষ্ণুতারই অনুসরণ করিয়াছিলেন। বর্ষাসমাগমে নিদাঘ-তপ্ত প্রান্তরের ন্যায় ইংরাজী সাহিত্য এক্ষণে প্রায়শঃ শীতল ও সুখসেব্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু য়ুরোপের অন্যান্য প্রদেশে এই শয়তানী সুরের এখনও সম্পূর্ণ অবসান হয় নাই। দেখিতে পাওয়া যায়, বায়রণের প্রেতাত্মা ব্রিটিশ-রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া কোনও কোনও বিদেশী কবির স্কন্ধে ভর দিয়া বেড়াইতেছেন। আমরা এপ্রিল মাসের "কর্ট্‌নাইট্‌লী" পাঠে অবগত হইলাম যে, সম্প্রতি জর্ম্মান্ সাহিত্যে তাঁহার কিঞ্চিৎ উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে। নিম্নে আর্নো হোল্‌জ্ নামক এক জন নবীন জার্ম্মান্ কবির কয়েক ছত্র অনুবাদ করিয়া, সেই উৎপাতের পরিচয় দিতেছি। "ধর্ম্মতত্ত্ব" নাম দিয়া কবি ভগবানের সহিত কতকটা এইরূপ চুক্তি করিতেছেন,—

শয়তানী সুর।

হে দয়াল যিশু ! সরল সুজন !
শ্রীচরণে শুধু এই নিবেদন,—
দেহমাঝে মোর আছে যে জঠর
খিদমতে তার লইও খবর !
প্রয়োজন মত দিও সেই পানি—
দুনিয়ার সেরা চিজ যারে মানি !
নাস্তিক তবে কোন্ বেটা হয়,

গোড়ের গোলাম রব দয়াময় !
প্রভাতে উঠিয়ে না পিয়ে চা'য়
গোটা বাইবেল করিব সায় !
দিব রবিবারে হইয়ে হাজির
গেলাস গেলাস অনুতাপ-নীর।
আর যাহা যাহা তোমার সাধন,
কিছুতে খেলাপ হবে না কখন।

বায়রণের ভূত ভিন্ন আর কোনও ভূতে এ সব কথা বলাইতে পারে, এমন বিশ্বাস আমাদের নাই। সুতরাং যাঁহার পবিত্র স্বর্গীয় সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া ইংরাজ-পাঠক এই শয়তানী মায়া হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন, তাঁহারই একটা অমোঘ মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক আমরা বিদায় গ্রহণ করিতেছি,—

"It is better to fight for the good than to rail at the ill."

জীবনচরিত।

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল।

বোধ হয়, মিস্ ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল অপেক্ষা কোন ইংরাজ মহিলাই জগতে অধিকতর প্রসিদ্ধ নহেন। তিনি এখনও জীবিত আছেন, এ সংবাদে বোধ হয় অনেকে বিস্মিত হইবেন। নাইটিঙ্গেল এক্ষণে নির্জ্জনে ও সামাজিক সংস্রব হইতে দূরে বাস করিয়া থাকেন। "টেম্পেল ম্যাগাজিনে" মিসেস্ টুলি তাঁহার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ঐ প্রবন্ধে অনেক অপরিজ্ঞাত নূতন কথা আছে; আমরা তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম।

মিস্ নাইটিঙ্গেল ফ্লোরেন্স নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বোধ হয় এই জন্যই তিনি
ফ্লোরেন্স নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম উইলিয়ম শোর নাইটিঙ্গেল;
তিনি হ্যাম্পশায়রের এম্বিল পার্ক ও ডার্ব্বিশায়রের লীহাষ্ট, এই

পারিবারিক পরিচয়
ও বাল্যভ্রমণ।

উভয় সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন; নাইটিঙ্গেল তাঁহার পিতার কনিষ্ঠা
কন্যা। অন্য উত্তরাধিকারীর সহিত একযোগে তাঁহার ঐ সম্পত্তির
উত্তরাধিকারপ্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল। তাঁহার সম্বন্ধে একবার "এক্জামিনার" নামক পত্রে
এইরূপ লিখিত হইয়াছিল,—"তিনি প্রতিভাশালিনী এবং উচ্চশিক্ষার ফলে অসাধারণ
রমণী। প্রাচীন ভাষাসমূহে, এবং অঙ্কশাস্ত্রের উচ্চ শাখা সকলে, সাধারণ শিল্প, বিজ্ঞান,
এবং সাহিত্যে, তাঁহার জ্ঞান গভীর ও অসাধারণ। আধুনিক প্রায় সকল ভাষাই তিনি
বুঝিতে পারেন। তিনি য়ুরোপের সকল দেশে ভ্রমণ করিয়া য়ুরোপীয় জাতিসমূহের আচার
ব্যবহার বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। নাইল নদে এবং নাইল হইতে বহুদূরস্থ
জলপ্রপাত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার বয়স অল্প, রমণীজনসুলভ সুন্দর মুখশ্রী;
তিনি লোকপ্রিয়, তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া তদীয় ভদ্র ও নম্র ব্যবহারে ব্যক্তিমাত্রই
মুগ্ধ হইয়া যান। সকল শ্রেণীর এবং সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহার বন্ধু ও পরিচিত ব্যক্তি
আছেন। কিন্তু নিজ গৃহে সুশিক্ষিত বহু আত্মীয়স্বজনে পরিবৃত হইয়া স্নেহশীল মাতা পিতার
আজ্ঞাপালনে তিনি সমধিক সুখানুভব করিয়া থাকেন।"

যে প্রতিভার গুণে তাঁহার নাম জগতে ধ্বনিত হইতেছে, তাহার লক্ষণ বাল্যেই প্রকাশ
পাইয়াছিল। "শুশ্রূষাকারিণীদের রাণী" নাইটিঙ্গেলের প্রথম রোগী এক বৃদ্ধ মেষপালকের
কুকুর। এক দিন তিনি তাঁহার কোনও ধর্ম্মযাজক বন্ধুর সহিত অশ্বা-

তাঁহার প্রথম রোগী।

রোহণে এক পার্ব্বত্য পথ দিয়া নিকটস্থ অনাথাশ্রমে যাইতেছিলেন;
ঐ ধর্ম্মযাজক নাইটিঙ্গেলের বিশেষ আগ্রহে মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে অনাথনিবাসস্থ রোগকাতর
নিঃস্ব ব্যক্তিদের দেখিতে লইয়া যাইতেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, রজার নামক এক
স্কচ্ মেষপালক অতি কষ্টে তাহার মেষপাল তাড়াইয়া আনিতেছে। সঙ্গে তাহার কুকুরটি
নাই। দেখিলেন, কতকগুলি বালক একটি কুকুরকে প্রস্তর আঘাতে খঞ্জ করিয়া দিয়াছে।
মেষপালক মনে করিয়াছিল যে, বালকেরা কুকুরটির পা ভাঙ্গিয়া একেবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া
দিয়াছে। এই বিশ্বাসে সে কুকুরটির প্রাণসংহারে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময় নাইটিঙ্গেল
তথায় উপস্থিত হইয়া কুকুরের কি হইয়াছে, পরীক্ষা করিতে চাহিলেন। পাখানি একেবারে
ভাঙ্গে নাই, আহত হইয়াছে মাত্র, ইহা দেখিয়া, ধর্ম্মযাজক বন্ধুর পরামর্শে গরম সেঁক দিয়া
মেষপালকের বস্ত্রাংশ ছিন্ন করিয়া তাহার পায়ে পটি বাঁধিয়া দিলেন। এইরূপে তিনি ঐ
কুকুরটিকে সুস্থ করিয়া তাহার প্রভুর হস্তে দিয়া আনন্দ লাভ করিলেন। এই ঘটনার পর,
নিকটবর্ত্তী স্থানে যাহারই কোন জন্তুর পা কাটিত, ভাঙ্গিত, অথবা কোন অসুখ হইত,
তাহারা মিস্ নাইটিঙ্গেলের নিকট চিকিৎসার জন্য পাঠাইয়া দিত।

বিংশতি হইতে ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দশ বৎসর কাল তিনি লণ্ডন, ডব্লিন্
এবং এডিনবর্গের হাঁসপাতালগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিদর্শনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।
নাইটিঙ্গেল ইউরোপের প্রধান প্রধান নগরের বড় হাঁসপাতাল-

শুশ্রূষার শিক্ষা-
ক্ষেত্র।

গুলির সহিত এই সকল হাঁসপাতালের অভাব প্রভৃতির তুলনা
করিয়া একটি অভাব লক্ষ্য করিলেন যে, লণ্ডন, ডব্লিন্ প্রভৃতির
চিকিৎসালয়ে সুশিক্ষিতা শুশ্রূষাকারিণী রমণীর বিশেষ অভাব। নাইটিঙ্গেলই প্রথমে
নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণ করেন যে, স্ত্রীজাতির শুশ্রূষাবিষয়ে স্বাভাবিক শক্তি থাকিলেও,

ফরাসী ও ইটালীয় শুশ্রূষা-
শুশ্রূষাকার্য্যের প্রণালী বিশেষরূপে শিক্ষা করা আবশ্যক। এ বিষয়ে প্রটেষ্টাণ্ট ইংলণ্ড অনেক পশ্চাতে আছেন, তাহা
কারিণী ভগিনীসম্প্রদায় আছে। রাইন নদীর তীরবর্ত্তী কেইসারওয়ার্থ নগরে শুশ্রূষাকারিণী ভগ্নীগণের
তিনি লক্ষ্য করিলেন। বিখ্যাত প্রদর্শনীর বৎসর তিনি সেই বহু-
শিক্ষার জন্য প্রোটেষ্টাণ্টদের এক শিক্ষালয় ছিল। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বেচ্ছায় ঐ শুশ্রূষা-
দূরস্থ ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরিশেষে
কারিণী-সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়া কিছু দিন শুশ্রূষাপ্রণালী শিক্ষা করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শরীর অসুস্থ
পারিস নগরীর চিকিৎসালয়ে শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রিয় নিকেতন লিহষ্টে বাস
হওয়ায়, তিনি কিছুদিন সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া
করিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু অনলসচিত্তে তাঁহার শিক্ষিত শুশ্রূষাপ্রণালী প্রকৃতপ্রস্তাবে কার্য্যে
পরিণত করিবার উপায়চিন্তায় ব্যস্ত ছিলেন। লণ্ডন নগরের ৪৭ নং হার্লষ্ট্রীটে বৃদ্ধা অসুস্থা
শিক্ষয়িত্রীগণের জন্য একটি আশ্রম ছিল। ঐ সময়ে সেই আশ্রমটি অর্থ ও সুব্যবস্থার অভাবে
শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইতেছিল। অসহায়া দরিদ্রা রমণীগণের শোচনীয় অবস্থাদর্শনে মিস্
নাইটিঙ্গেলের কোমল হৃদয় করুণায় কাতর হইয়া উঠিল। তিনি

সেবা।

আর তাঁহার প্রিয় নিকেতনের আরামকক্ষে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি-
লেন না। হার্লষ্ট্রীটের আশ্রমে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন, এবং প্রাণপণ চেষ্টায় আশ্রমটি
সুপ্রণালীতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অদ্যাবধি ঐ আশ্রমটি তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ তাঁহার অব-
লম্বিত সুপ্রণালীক্রমে পরিচালিত হইতেছে। সেই সময়ে কোন মহিলা তাঁহার সহিত ঐ
আশ্রমে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অশ্রান্ত পরিশ্রমের বিষয় এইরূপ
বলেন, "তাঁহাকে হাঁসপাতালের নানাবিধ কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হইত। শুশ্রূষাকারিণীদের
কার্য্যের ব্যবস্থা করিতে, চিঠিপত্রের উত্তর এবং রোগীদের জন্য ঔষধের ব্যবস্থাপত্র লিখিতে
এবং হিসাব রাখিতে হইত। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, এক জন পাকা গৃহিণীর কার্য্য হইতে
এক জন দক্ষ হিসাব-রক্ষকের কার্য্য পর্য্যন্ত করিতে হইত।" এইরূপ গুরুতর পরিশ্রমের ফলে
পুনরায় তাঁহাকে স্বাস্থ্যের অনুরোধে লিহষ্টে বিশ্রামার্থ প্রতিগমন করিতে হইল।
মিসেস টুলি লিখিতেছেন, আমরা ক্রীমিয়ার যুদ্ধকে তুচ্ছ বিবেচনা করিয়া ঝাঁপাইয়া
পড়িয়াছিলাম। আমাদের সৈন্যগণকে বিশেষরূপে তাহার ফলভোগ করিতে হইয়াছিল।
আহত সৈনিকগণের যাতনার সংবাদ শ্রবণে ইংলণ্ডের দয়াবতী রমণী-

ক্রিমীয়ার যুদ্ধে
গমন।

গণের হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা সৈনিকগণের শুশ্রূষার
অভিপ্রায়ে স্বেচ্ছায় যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে
লাগিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তখন সুশিক্ষিত সিড্নী হার্ব্বার্ট যুদ্ধবিভাগের কর্ত্তৃপদে অধিষ্ঠিত
ছিলেন। অসংখ্য মহিলাকে সাহায্যে অগ্রসর দেখিয়া তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ি-
লেন। তিনি মিস্ নাইটিঙ্গেলের শুশ্রূষাকার্য্যে আন্তরিক অনুরাগ ও অভিজ্ঞতার বিষয় জ্ঞাত
ছিলেন। অবশেষে তিনি তাঁহাকে মহিলাগণের অধিনায়িকার পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ
করিয়া এক পত্র লিখিলেন। মিস্ নাইটিঙ্গেলও যুদ্ধক্ষেত্রে গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া
সেই সময়েই তাঁহাকে এক পত্র লেখেন। পরদিন প্রাতে মিস্ নাইটিঙ্গেল মিঃ হার্বার্টের
এক পত্র পাইলেন যে, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে গমনোদ্যতা শুশ্রূষাকারিণী সম্প্রদায়ের অধিনায়ি-
কার পদ গ্রহণ করিয়া আট দিনের মধ্যে পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করুন। লেখিকা উপসংহারে
বলিতেছেন, মিস্ ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের জীবনেতিহাসের অবশিষ্টাংশ মানবজাতির স্মৃতির
সাধারণ উত্তরাধিকারের এক অংশমাত্র। সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।

সমালোচনা।

ষাট বৎসরে।

ইংলণ্ডেশ্বরীর রাজত্বকাল ষাট বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল। এই উপলক্ষে ইংরাজ রাজত্বের সর্ব্বত্র আনন্দোচ্ছ্বাস উচ্ছ্বসিত হইতেছে; ভারতবর্ষেও উৎসবের দুন্দুভি বাজিতেছে। তবে এখানে এ বৎসর অন্নহীন ক্ষুধার্ত্তের আর্ত্তনাদে এ আনন্দকোলাহল ঢাকিয়া যাইতেছে। তাই আমরা মহারাণীর স্মৃতিচিহ্নস্থাপনের প্রসঙ্গে মিষ্টার আনন্দমোহন বসুর কথার সমর্থন করিয়া বলি—যেন বৎসর বুঝিয়া কাজ করা হয়;—যাহাতে ভবিষ্যতে কোন উপকারের আশা আছে, যেন সেইরূপ কোন স্মৃতিচিহ্ন সংস্থাপিত হয়। দুর্ভিক্ষের সাহায্য-সভায় বড় লাট সত্যই বলিয়াছিলেন,—'ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় যে, মহারাণীর রাজত্বের এই ষষ্টিতম বৎসরের স্মৃতির সহিত তাঁহার ভারতবাসী প্রজাদিগের এই দুঃখ দুর্দ্দশার ইতিহাস বিজড়িত থাকিবে।'

এই ষাট বৎসরে জগতের যে উন্নতি হইয়াছে, তাহার আলোচনা আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি। এখন আমরা Bengal Chamber of Commerceএ মিষ্টার প্লেফেয়ারের বক্তৃতা অবলম্বন করিয়া এই সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষের বাণিজ্যের যে উন্নতি হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিব।

বহির্বাণিজ্য।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্যবিস্তারের বিষয় আলোচনা করিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। এখন আমরা কল্পনাও করিতে পারি না যে, ১৮৩৭—৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আমদানী ও রপ্তানী মালের মূল্য স্বর্ণ রোপ্যাদির মূল্য ধরিয়া ১৯¼ কোটী টাকার অধিক ছিল না। ১৮৯৪—৯৫ খ্রীষ্টাব্দে আমদানী ও রপ্তানী মালের মূল্য—২০০¼ কোটী টাকা। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে আমদানী মালের মূল্য ছিল ৫ কোটী টাকা, আর ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তাহাই দাঁড়াইয়াছে ৭৩½ কোটী। তখন রপ্তানী মালের মূল্য ছিল ১১½ কোটী, এখন তাহা দাঁড়াইয়াছে ১০৯ কোটী।

কৃষি।

কিন্তু কেহ যেন ইহা না ভাবেন, আর কোন বিষয়ে উন্নতি হয় নাই। কৃষি ও কল কারখানার উন্নতিও অসাধারণ। এখন পথের সুবিধা হওয়াতে ভারতের দ্রব্য য়ুরোপের বাজারে উপযুক্ত মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। এখন দেশে সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজিত, ধনসম্পত্তি নিরাপদ, ন্যায়বিচার সহজপ্রাপ্য;—এই সকল কারণে কৃষিকর্ম্মে কৃষকের মনোযোগ বৃদ্ধি পাইয়াছে, কৃষিকর্ম্মের প্রভূত উন্নতি হইতেছে। সভ্যতার বিস্তারের সহিত এ দেশে আবাদের উপযুক্ত নূতন নূতন বীজের চাষ হইতেছে, তাহাতে লাভও হইতেছে। ইহার মধ্যে তুলা, পাট, তিসি ও চার চাষই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চা ও তুলা।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে, আসাম অঞ্চলে চার চাষ চলে কি না, কেবল তাহার পরীক্ষা চলিতেছিল। এই বৎসর আসাম গবর্মেণ্টের বাগান হইতে প্রথম এ দেশের চার চালান বিলাতে যায়। সে বৎসর কেবল ছয় মণ চা পাঠান হয়, আবার তখন বিলাতে চার উপর পাউণ্ড প্রতি দুই শিলিং এক পেনি আমদানী শুল্ক ছিল। তাহার পর হইতে, বিশেষ বিগত বিংশতি বৎসরে, চার চাষের আশ্চর্য্য উন্নতি হইয়াছে। গত বৎসর এদেশে প্রায় ১৮১৫০০০ মণ চা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার মূল্য প্রায় ৭ কোটী টাকা। এ উন্নতি ষাট বৎসরে হইয়াছে।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে গবর্মেণ্ট এদেশীয় তুলার উন্নতিসাধনে চেষ্টিত হয়েন। আমেরিকা হইতে

দ্বাদশ জন দক্ষ তুলার চাষী আনিয়া তাহাদিগকে তুলার বীজ ও আবশ্যক সব সরঞ্জাম দেওয়া হয়। যদিও সে কল্পনা সফল হয় নাই, তথাপি ঐ সময় হইতেই এ দেশে তুলা ভাল হইতেছে। এখন তুলার চাষও খুব বাড়িতেছে। এখন বৎসরে প্রায় ১৫৪ লক্ষ মণ তুলা উৎপন্ন হয়; তাহার মূল্য প্রায় ২৪ কোটী টাকা।

পাট ও তিসি।

ষাট বৎসর পূর্ব্বে এ দেশে অতি অল্প পাট উৎপন্ন হইত, তাহাতে গোটাকতক তন্ত চলিত। পাটের রপ্তানী কাজ তখন ছিল না। এখন বৎসরে প্রায় ২৮০ লক্ষ মণ পাট উৎপন্ন হইতেছে, তাহার মূল্য প্রায় ১৫ কোটী টাকা। মহারাণীর রাজত্ব-আরম্ভের পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে প্রথম ১০ বুশেল তিসি রপ্তানী হয়। এ দেশে যে তিসির চাষ হইতেছে, তাহা বিদেশে রপ্তানীর জন্য; দেশে ইহার ব্যবহার বড়ই বিরল। এখন ভারতবর্ষ হইতে বৎসরে প্রায় ১৩ কোটী টাকার বীজ রপ্তানী হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে গোধূমের ব্যবসায় মহারাণীর রাজত্বারম্ভের অনেক পরে আরম্ভ হইয়াছে। তখন কেবল পঞ্জাবে ইহার চাষ হইত; ক্রমে য়ুরোপে ইহার রপ্তানী আরম্ভ হয়; এখন বৎসরে প্রায় ৬¼ কোটী টাকার গোধূম রপ্তানী হয়।

কলকারখানা।

এদেশে তুলার কল, পশমের কল, পাটের কল, কাগজের কল, মদের ভাঁটী, কয়লার খনি, লৌহের কারখানা, এ সবই ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের পরে স্থাপিত হইয়াছে। বাস্তবিক কলকারখানার এ উন্নতি ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ঐ বৎসর এ দেশে প্রথম কাপড়ের কল স্থাপিত হয়। তাহার পর এখন মোটের উপর ১৪৪টি কাপড়ের কল চলিতেছে; সে সকলের মূলধন প্রায় ১৩½ কোটী টাকা। পাটের কল ইহার কিছু দিন পরেই সংস্থাপিত হয়। এখন পাটের কলের মূলধন প্রায় ৪ কোটী টাকা। মদের ভাঁটীর উৎপত্তি ও উন্নতি মহারাণীর রাজত্বারম্ভের পর। ষাট বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলার কয়লার খনির কথা অল্প লোকই জানিত;—এখন ঐ সকল খনি এবং অন্যান্য স্থানের খনি হইতে বৎসরে কোটী টাকারও অধিক মূল্যের কয়লা উঠিতেছে।

এই সকল প্রধান ব্যবসায় ভিন্ন আরও নানা কারখানার কাজ চলিতেছে; নীলের কুঠী, ময়দার কল, তৈলের কল, চিনির কল, সাবানের কল প্রভৃতি নানাবিধ কলের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই সকল কারবারে কত টাকা খাটিতেছে, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে; তবে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের যৌথ কারবারের হিসাবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এ দেশে যৌথ কারবারে সাড়ে সাতাইশ কোটী টাকা খাটিতেছে।

এ কথা বলাই বাহুল্য যে, ব্যবসায়বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের কাজও বাড়িয়াছে। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ বন্দর হইতে ৩৮৪৫ খানা জাহাজ ছাড়িয়াছিল; ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তাহাদের অপেক্ষা বৃহত্তর ৫২৬৮ খানা জাহাজ ছাড়িয়াছে।

ডাকবিভাগ।

বাণিজ্য ছাড়িয়া দেশের শাসন ও অন্যান্য বিভাগে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে এখন সর্ব্বত্রই আশ্চর্য্য উন্নতি লক্ষিত হইবে। এই ষাট বৎসরের উন্নতি সর্ব্বদিকব্যাপিনী। ডাকঘরে এখন বৎসরে ৩৯৪০ লক্ষ পত্র ও প্যাকেট বিলি হয়; টিকিট, মনি-অর্ডার ফি, রেজেষ্টারী ফি প্রভৃতিতে এখন গবর্মেণ্টের বাৎসরিক আয় প্রায় ১৬০ লক্ষ টাকা। মহারাণীর রাজত্বারম্ভের পূর্ব্বে ডাকবিভাগ ছিল না বলিলেই হয়। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ডাকবিভাগে কেবল গবর্মেণ্টের চিটিপত্রই চলিত; লোক বুঝিয়াই কাহারও কাহারও চিঠিপত্র বিলি হইত। তখন ডাকটিকিটের ব্যবহার ছিল না; পত্র কিরূপ ভারি এবং কত দূর যাইবে, তাহা বুঝিয়া মাশুল লওয়া হইত। এক তোলা ওজনের পত্র কলিকাতা হইতে বোম্বাই পাঠাইতে এক টাকা ও কলিকাতা হইতে আগ্রায় পাঠাইতে

বার আনা লাগিত। এখন দেশমধ্যে সাড়ে উনিশ কোটী টাকার মনিঅর্ডার বিলি হয়। আর মহারাণীর রাজত্বের প্রথম বৎসর সমগ্র আমদানী রপ্তানীর মূল্য ছিল প্রায় সাড়ে উনিশ কোটী টাকা। আবার ডাকঘরের সহিত সেভিংস ব্যাঙ্কের কাজ চলে। এখন সেভিংস্ ব্যাঙ্কে প্রায় আট কোটী টাকা জমা আছে।

মহারাণীর রাজত্বারম্ভের সময় টেলিগ্রাফও ছিল না। এ দেশে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে টেলিগ্রাফের বন্দোবস্ত হয়। গত বৎসর এক টেলিগ্রাফের ৮৯½ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে।

ডাক ও টেলিগ্রাফে ব্যবসায় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে; ইহাতে ভারতবাসীদিগের অশেষ উপকার হইয়াছে।

মহারাণীর রাজত্বারম্ভের সময় এ দেশে গাড়ী, পাল্কী বা নৌকায় গমনাগমনের বন্দোবস্ত ছিল; এই সকল বন্দোবস্তে গমনাগমন কিরূপ দীর্ঘকালসাপেক্ষ ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। এখন এ দেশে ১৯০০০ মাইল রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে। গত বৎসর ১৫৩০ লক্ষেরও অধিক লোক রেলপথে গতায়াত করিয়াছে; তদ্ভিন্ন মালের ত কথাই নাই। তাহা ভিন্ন নানা কোম্পানীর জাহাজ নানা নদী ও খালে গতায়াত করিতেছে। এক জন খ্যাতনামা লেখক বলিয়াছেন যে, ইংরাজ গবর্মেণ্ট যদি ভারতবাসীদিগকে আর কিছু না দিয়া থাকেন, তথাপি খালই তাঁহাদিগের দেশাধিকারের সার্থকতা সপ্রমাণ করিবে ও তাঁহাদিগের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। খালকাটায় গত বৎসর যে শস্য জন্মিয়াছে, তাহার মূল্য ৩৬½ কোটী টাকা। এখন ভারতবর্ষে প্রায় ৩৩২৮০ মাইল খাল কাটা হইয়াছে, তাহাতে ব্যয় হইয়াছে প্রায় ৩৭ কোটী টাকা।

গমনাগমন।

বিবিধ।

দীর্ঘজীবন-লাভের উপায়।

মিসেস এমিলি ক্রফোর্ট, "ইয়ংম্যান" নামক পত্রে দীর্ঘজীবন-লাভের উপায় সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটি তদীয় বন্ধু, পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্য ইয়র্কশায়ারনিবাসী, লক্ষপতি সার্ আইজ্যাক হোল্ডেনের স্বাস্থ্যরক্ষাসম্বন্ধীয় বিবরণমাত্র। সার্ আইজ্যাকের বয়স এখন প্রায় নব্বই বৎসর। ছয় বৎসর অতীত হইল, তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী ৮৩ বৎসর বয়সে লোকন্তরিত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু উল্লেখ করিয়া, শোকসন্তপ্তচিত্তে বলিয়া থাকেন যে, "আমার পত্নীর এত অল্প বয়সে অকালমৃত্যুর একমাত্র কারণ, তাঁহার স্বাস্থ্যরক্ষার বিধির প্রতি অমনোযোগ।" সার আইজাক আশা করেন যে, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাধীন থাকিয়া এক শত বিশ বৎসর বাঁচিতে পারিবেন। সার্ আইজ্যাক যৌবনের প্রারম্ভে জন ওয়েস্লির আহারের ব্যবস্থা ও তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যাবলীর আশ্চর্য্য বিবরণ পাঠ করিয়া স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম প্রতিপালনে আস্থাবান হন।

ওয়েস্লির শারীরিক কর্ম্মপটুতা আজীবন অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি প্রত্যূষে চারিটার সময় শয্যা ত্যাগ করিতেন। অত্যন্ত বৃদ্ধাবস্থায় সর্ব্বদাই অশ্বপৃষ্ঠে অথবা শকটারোহণে ইংলণ্ড, ওয়েল্‌স, আয়র্লণ্ড ও স্কটলণ্ডের মধ্যে ভ্রমণ করিতেন। ভ্রমণকালে অধিকক্ষণ বিশ্রাম করিতেন না; কিন্তু যেখানেই বিশ্রাম করিবার জন্য অল্পক্ষণ থাকিতেন, সেইখানেই ধর্ম্মসম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন। তিনি খাদ্য ও পানীয়বিষয়ক পরিমিতাচার তাঁহার অদম্য কার্য্যপটুতার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। প্রৌঢ়াবস্থায় এবং বৃদ্ধাদশায় তিনি অল্প মাংস এবং তদপেক্ষা অল্প রুটি আহার করিতেন। ফল ও অগ্নিপক সব্‌জী তাঁহার প্রিয় আহার্য্য ছিল। স্বাস্থ্যতত্ত্ব-

বিদ্‌গণের মধ্যে ওয়েস্লি প্রথমে উপলব্ধি করেন যে, গোধূমে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ফস্ফেট্স অব লাইম আছে। তাহা বালক, যুবা ও অনধিকবয়স্কা সন্তানবতী রমণীদিগের পক্ষে উপকারী; কিন্তু বৃদ্ধের আয়ুনাশক। কারণ, ফস্ফেটের প্রভাবে অস্থি ঘন ও গুরু, এবং মাংসপেশীসমূহ কঠিন হইয়া রক্তস্থালী ও রক্তবাহী ধমনীসমূহ বদ্ধ হইয়া আইসে। এই বিবরণ পাঠ করিয়া সার্ আইজাক আহারকালে অত্যল্প পরিমাণে রুটি ও বহুলপরিমাণে ফলমূল ব্যবহার করিতেন। শীতকালে তাঁহার কক্ষাভ্যন্তরস্থ বায়ু, গ্রীষ্মকালীন বহির্বায়ুর ন্যায় সুখসেব্য করিয়া রাখা হয়। তিনি অল্প উত্তাপ পছন্দ করিনেন।

কমলালেবু সার্ আইজ্যাকের অত্যন্ত প্রিয়। রুটির পরিবর্ত্তে তিনি বানানা ফল ব্যবহার করেন। প্রত্যেক বার আহারের সময় হয় ত একখানি বিস্কুট খাইয়া থাকেন। যখন তিনি মাংস খান, তখন আর কোন দ্রব্য আহার করেন না। তিনি একেবারে মদ্য পান করেন না। হাউস অব্ কমন্স সভা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কুইন এনির প্রাসাদে নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে, তিনি এক দিনমাত্র এক গ্লাস হুইস্কির সহিত গরম জল পান করিয়াছিলেন। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর একটি লেবু কিম্বা এক থোলো আঙ্গুর খাইয়া থাকেন। তাঁহার প্রধান খাদ্যের মধ্যে রোষ্ট, আপেল ও দুগ্ধ। তাহার সহিত অম্লনিবারণের উদ্দেশে অত্যল্পপরিমাণ বাইকার্ব্বনেট অব্ সোডা মিশ্রিত করা হয়। তিনি আহারকালে পান করেন না। এজন্য তাঁহাকে ভক্ষ্য বস্তু অধিকবার চর্ব্বণ করিতে হয়। জন ওয়েস্লির স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলির সহিত তিনি বিখ্যাত ফরাসী স্বাস্থ্যবিৎ ফ্লোরেন্সের নিয়মগুলি গ্রহণ করিয়াছেন। ফ্লোরেন্সে বিশ্বাস করেন, মানবের স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল এক শত বিশ বৎসর।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

বামাবোধিনী ; চৈত্র। "বামাবোধিনীর" আকার বাড়িয়াছে, অনেকটা শ্রী ফিরিয়াছে। সম্পাদক মহাশয় যদি আভ্যন্তরীণ বিষয়ে আর একটু অবহিত হন, তাহা হইলে আমরা আনন্দিত হইব। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধে 'বামাবোধিনী' পূর্ণ থাকে—কিন্তু প্রায়ই প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয় ভাল করিয়া বলা হয় না। বিষয়নির্ব্বাচনেও কেবল প্রকারের বৈচিত্র্য, উপযোগিতার প্রতি সেরূপ দৃষ্টি দেখা যায় না।—বর্ষীয়সী 'বামাবোধিনী'র উপদেশে আদর্শে এ দেশের অনেক উপকার হইয়াছে;—কিন্তু এখনও আমরা অনেক আশা করি। কাল অগ্রসর হইতেছে; এখন সেই চৌত্রিশ বৎসরের পুরাতন প্রণালীতে বদ্ধ না রাখিয়া 'বামাবোধিনীর' কার্য্যক্ষেত্রও বিস্তৃত করা কর্ত্তব্য মনে করি। স্ত্রীজাতির অধিকার, উন্নতি, আশা, আকাঙ্ক্ষা, কর্ত্তব্য প্রভৃতি লইয়া জগৎ জুড়িয়া যে কোলাহল পড়িয়াছে, 'বামাবোধিনীর' পুরাতন মন্দিরে তাহার যেন প্রবেশাধিকার নাই। বাঙ্গলার বিদুষী মহিলারা বঙ্গ সাহিত্যের বিবিধ মালঞ্চে দেখা দেন, কিন্তু বৃদ্ধা বামাবোধিনীর শবজীর ক্ষেতে ত তাঁহাদের দেখিতে পাই না। বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত "নারীচরিত—উভয়ভারতী" প্রবন্ধটি সুপাঠ্য—কিন্তু মোটে চারি পৃষ্ঠা মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। "মহারাণী বিক্টোরিয়ার জীবনের কয়েকটি কথা" অনেক মহিলার চিত্তরঞ্জন করিবে। কিন্তু লেখক হাতের কাছে যাহা পাইয়াছেন, কেবল তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। একটু অন্বেষণ করিলে আরও অনেক মনোজ্ঞ গল্পের সংকলন করিতে পারিতেন।

দাসী। ফেব্রুয়ারী। শ্রীযুত নৃপেন্দ্রনাথ শেঠের "চস্‌মা" বিগত চৈত্রমাসের "ভারতীতে"

প্রকাশিত হইয়াছে; আমরা গত বারে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে দেখিতেছি, চৈত্রের "ভারতী" প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই এই 'চস্‌মা'ই 'দাসীর' আশ্রয় পাইয়াছিল। আমরা মিলাইয়া দেখিলাম, উভয় প্রবন্ধ সম্পূর্ণ অভিন্ন; স্থানে স্থানে কেবল দুই চারিটি শব্দের বৈলক্ষণ্য আছে; তাহা বোধ করি, সম্পাদকীয় সংশোধনের ফল! 'এক মুরগী দুই বার জবাই' করা কেন, তাহা কে বলিবে? "স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ" শ্রীযুত শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তীর রচনা; ইহা জীবনচরিত নহে, একটি ক্ষুদ্র সন্দর্ভমাত্র; উপকরণের দৈন্যবশতঃ জীবনচরিতের হিসাবে রচনাটি ব্যর্থ হইয়াছে; এবং চরিতবিষয়ক সন্দর্ভে যেরূপ চরিত্র-বিশ্লেষণ ও সূক্ষ্ম সমালোচনার আশা করা যায়,—ক্ষমতার অভাবে লেখক সে বিষয়েও বিফল হইয়াছেন। "সাধনার" শোক বিস্মৃত না হইতেই "দাসীর শেষ কথা"য়, দাসীর অপমৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছিলাম। সম্প্রতি শুনিতেছি—"দাসী" আবার শীঘ্র দেখা দিবে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, নবজীবনে "দাসীর" সাধু সঙ্কল্প সফল হউক।

পূর্ণিমা। চৈত্র। এই সংখ্যায় পূর্ণিমার চতুর্থ বৎসর পূর্ণ হইল। যে কয়টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে "সিপাহী-বিদ্রোহের কাহিনী" উল্লেখযোগ্য।

সখা ও সাথী। ফাল্গুন ও চৈত্র। এই সংখ্যায় "সখা ও সাথীর" ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ণ হইল। "সখা ও সাথীর আশানুরূপ উন্নতি দেখিলে আমরা সন্তুষ্ট হইব। দুঃখের বিষয় যে, এখনও তাহার সূচনা দেখা যাইতেছে না। আশা করি, নববর্ষে "সখা ও সাথীকে" আরও সজীব ও সুন্দর দেখিব। "শীকার" প্রবন্ধটি পাকা হাতের লেখা;—ইহাতে ছেলেদের শিক্ষা ও প্রীতি উভয়ের সংস্থান আছে। "দিল্লী" প্রবন্ধটিও মন্দ নহে। "বাদলায় বিপদ" একটি সচিত্র পদ্য;—রচনায় বিশেষ নিপুণতার পরিচয় নাই, কিন্তু ছবি খানি সুন্দর;—পাঠকগণের প্রীতিবিধান করিবে। দুর্ভিক্ষ প্রবন্ধটি সময়োচিত হইয়াছে। তাহার প্রতি সম্পাদক মহাশয়ের আরও দৃষ্টি থাকা উচিত।

মুকুল। চৈত্র। এই সংখ্যায় মুকুলের দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত হইল। "বঙ্গবন্ধু—উইলিয়ম কেরী" প্রবন্ধে প্রসিদ্ধ মিশনারী কেরী সাহেবের একখানি ছবি আছে, এবং তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত বিবৃত হইয়াছে। "সমুদ্র-যাত্রা" প্রবন্ধটি সুলিখিত ও শিক্ষাপ্রদ। এই প্রবন্ধে চারিখানি ছবি আছে। "সাধের ছবি" একটি রহস্য-কবিতা;—ইহাতেও চারিখানি ছবি। কবিতাটি ভাল হয় নাই। প্রথমে "মুকুলে" যেমন উৎসাহ ও উদ্যমের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইত, এখন যেন তাহার অভাব হইয়াছে। আশা করি, এ অবসাদ অতিক্রম করিয়া মুকুল উত্তরোত্তর অধিকতর বিকাশ লাভ করিবে।

হিন্দু পত্রিকা।—পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র। এই যুক্ত-সংখ্যায় হিন্দু পত্রিকা তৃতীয় বর্ষ অতিক্রম করিল। "হিন্দু পত্রিকা" এত দিন মাসিক ছিল, অতঃপর দ্বৈমাসিক-রূপে প্রকাশিত হইবে। "হিন্দু পত্রিকায়" অনুবাদের সংখ্যাই অধিক; মৌলিক প্রবন্ধের সংখ্যা অত্যন্ত বিরল। আর সাময়িক ধর্ম্মালোচনার বিষয়ে "হিন্দুপত্রিকার" অতিশয় ঔদাসীন্য। বিবেকানন্দ স্বামীর ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন উপলক্ষে বঙ্গের পত্র ও পত্রিকায় বিষম কোলাহল শোনা গিয়াছিল। বিবেকানন্দ স্বামীর বেদান্তপ্রচারসম্বন্ধে "হিন্দু পত্রিকা" নীরব না থাকিলে ভাল হইত। স্বামীজীর বেদান্ত কি,—তাঁহার উদার মতবাদ সমীচীন কি না;—প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মের, হিন্দু আচার ব্যবহারের সহিত স্বামীজির মতবাদের যে বিরোধ আপাতত প্রতীয়মান হয়,—তাহা সত্যই হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধ কি না,—ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা "হিন্দু পত্রিকার" ন্যায় হিন্দুধর্ম্মবিষয়িণী পত্রিকারই কর্ত্তব্য। এক সঙ্গে নানা গ্রন্থের অনুবাদ অল্প মাত্রায় না দিয়া ক্রমে ক্রমে গ্রন্থবিশেষের পর্য্যাপ্ত অনুবাদ দিলে মন্দ হয় না।

উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি।

দীর্ঘতমা ঋষির দেশ কাল এ পর্য্যন্ত অবধারিত হয় নাই। তাঁহার জন্মস্থান ও আবির্ভাবকালের নিরূপণপক্ষে তাঁহার স্বকীয় রচনায় কোনও সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় না। তবে তিনি যে এক জন প্রাচীন ঋষি, তাহার আভাস পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের সূক্ত সকল বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ও ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিরচিত হইয়াছিল। রচনাকারী ঋষিরা কেহ বা অন্যের অপেক্ষায় প্রাচীন, কেহ বা অন্যের অপেক্ষায় নবীন। ঋগ্বেদের প্রারম্ভেই যে মধুচ্ছন্দা ঋষির সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়, তিনি আপন রচনায় আপনাকে এক জন নবীন ঋষি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,—এবং আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিগণেরও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মধুচ্ছন্দার তুলনায়, দীর্ঘতমাকে এক জন প্রাচীন ঋষি বলা যাইতে পারে; তাহার কারণ যথাক্রমে বিবৃত হইবে।

কিন্তু যদিও তাঁহার নিজ রচনায় তাঁহার সময় নিরূপণ করিবার কোন প্রমাণ সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না,—তথাপি ইতরার পুত্র মহিদাস ঋষি, যিনি ঋগ্বেদের সুপ্রসিদ্ধ ঐতরেয় ব্রাহ্মণের রচনাকর্ত্তা, তিনি সেই অভাবের পূরণ করিয়া গিয়াছেন। উক্ত ব্রাহ্মণে তিনি সুস্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন,—

> "এতেন হ বৈ ঐন্দ্রেণ মহাভিষেকেণ দীর্ঘতমা মামতেয়ো ভরতং দৌষ্মন্তিম্ অভিষিষেচ।
> তস্মাদ্ উ ভরতো দৌষ্মন্তিঃ সমন্তং সর্ব্বতঃ পৃথিবীং জয়ন্ পরীয়ায়।"
>
> —ঐতরেয় ব্রাহ্মণ; ৮ম পঞ্চিকা; ২৩।

মহিদাস, মহাভিষেক নামক বৈদিক ক্রিয়ার উল্লেখ করিয়া, পূর্ব্বকালের কয়েক জন বিখ্যাত চক্রবর্ত্তী রাজাদের মহাভিষেককালে কোন কোন ঋষি দ্বারা উক্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহাই বলিতে গিয়া লিখিতেছেন যে,—"দুষ্মন্তের পুত্র ভরত যখন সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হয়েন, তখন মমতার পুত্র দীর্ঘতমা এই ঐন্দ্রমহাভিষেক দ্বারা তদীয় অভিষেকক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাই সেই দুষ্মন্তপুত্র ভরত সমুদায় ভূমণ্ডল জয় করিয়া পরিভ্রমণ করেন।"

আমাদের জাতীয় কবি কালিদাস যাঁহার জন্মবৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া অপূর্ব্ব অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের রচনা করিয়াছেন, তিনিই উপরি-উক্ত 'সর্ব্বদমন' ভরত। যাঁহার নামে আমাদের দেশ অদ্যাপি ভারতবর্ষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, তিনিই উল্লিখিত ভরত। যযাতি রাজার পঞ্চম পুত্র পুরুর বংশে

দুষ্মন্তের ঔরসে শকুন্তলার গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়, ইহা কাহারও অবিদিত নাই। ভরতবংশের এক শাখাই ইতিহাসে 'পৌরব' বলিয়া বিখ্যাত। প্রথমে হস্তিনা নগরে, এবং পরে হস্তিনা নগর গঙ্গাস্রোতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে প্রয়াগের নিকটে কৌশাম্বী নগরে, এই পৌরবেরা বহুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই বংশের কোনও কোনও রাজা অতিশয় পরাক্রান্ত ছিলেন। পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয় এই বংশের এক জন বিখ্যাত রাজা। যিনি এই বিখ্যাত ভরতবংশের আদিপুরুষ, সেই দুষ্মন্তপুত্র ভরত এবং উচথ্যপুত্র দীর্ঘতমা ঋষি একই সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। উভয়েই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বহু পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন।

"যযাতি কহিলেন, হে দেবরাজ! আমি পুরুকে সমস্ত রাজ্যভার অর্পণ করিয়া কহিলাম, বৎস! গঙ্গা-ও-যমুনা এই উভয় নদীর অন্তর্গত সমস্ত রাজ্য তোমারই অধিকারভুক্ত হইল। তুমি এই ধরিত্রীর একমাত্র অধীশ্বর হইলে; তোমার ভ্রাতৃগণ তোমারই অধীনে থাকিয়া অন্ত্যজ জাতিমাত্র শাসন করিবে।" (১) মহাভারতের এই বিবরণে সুস্পষ্ট জানা যায় যে, পৌরবেরা গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগের অধীশ্বর ছিলেন। এই স্থানেই তাঁহাদের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং সময়ে সময়ে তাঁহারা স্বীয় রাজ্য হইতে নির্গত হইয়া দিগ্বিজয় করিতেন, এবং পঞ্জাব, রাজপুতানা প্রভৃতি দেশের যযাতিবংশীয় অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণের উপরেও আধিপত্য বিস্তার করিতেন। দুষ্মন্তপুত্র ভরত এইরূপ এক জন দিগ্বিজয়ী পৌরব নরপতি ছিলেন।

এক্ষণে দীর্ঘতমার সময় নির্ণয় করিতে হইলে, পুরুবংশের রাজত্বকালের সময় নির্ণয় করা আবশ্যক। এই বংশের এক প্রকার বিবরণ বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশে, এবং অপর দুই প্রকার বিবরণ মহাভারতের আদিপর্ব্বের ৯৪।৯৫ অধ্যায়ে, দেখিতে পাওয়া যায়। এই ত্রিবিধ বিবরণের কিয়ৎপরিমাণে ঐক্য এবং কিয়ৎপরিমাণে অনৈক্য দৃষ্ট হয়।

ফলতঃ, এই সমুদয় বিবরণেই একমতে প্রকাশ পাওয়া যায় যে, কালক্রমে পুরুবংশ বহু শাখায় বিভক্ত হইয়াছিল। তন্মধ্যে পুরুবংশ ও পঞ্চালবংশ ইতিহাসে অতিশয় প্রসিদ্ধ। এই দুই বংশের বিবাদ কলহেই কুরুক্ষেত্রের মহাসমর সংঘটিত হয়।

বহু শাখায় বিভক্ত হওয়াতে পুরুবংশে বহুসংখ্যক প্রসিদ্ধ নরপতি প্রাদু-

(১) কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত; আদিপর্ব্ব; ৮৭ অধ্যায়।

র্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু বংশাবলীতে সেই সকল নামের যে ঘোরতর অনৈক্য লক্ষিত হয়, তাহাতে তাঁহাদের ধারাবাহিক বিবরণ সঙ্কলন করা এক্ষণে একপ্রকার অসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু অনৈক্যের মধ্যেও যেরূপ ঐক্য লক্ষিত হয়, তাহাতে কয়েক জন রাজাকে ঐতিহাসিক রাজা স্বীকার না করিয়া ক্ষান্ত হওয়া যায় না। পুরুবংশীয় যে ভরত রাজার নামে অদ্যাপিও আমাদের দেশ ভারতবর্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ, তিনি যে এক জন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সমুদয় বংশতালিকাতেই ভরতের পিতার নাম দুষ্মন্ত, দুষ্মন্তের পিতার নাম ঈলিন বা ইলিন। ঈলিনের পিতার নাম তংসু; তংসুর পিতার নাম মতিনার বা রন্তিনার। যখন অনেকগুলি অনৈক্যের মধ্যে এইরূপ বংশবিবরণ সর্ব্বতোভাবে একই প্রকার দৃষ্ট হয়, তখন এই কয়েক জন রাজাকেই ঐতিহাসিক রাজা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

ফলতঃ, পুরুবংশের যে কয়েকটি বংশতালিকা উল্লিখিত হইল, তন্মধ্যে মহাভারতের আদিপর্ব্বের ৯৪ অধ্যায়ের তালিকাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক বলিয়া বিবেচনা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। উক্ত বংশবলী এইরূপ,—

পুরু
|
রৌদ্রাশ্ব
|
অনাধৃষ্টি
|
মতিনার
|
তংসু
|
ঈলিন
|
দুষ্মন্ত
|
ভরত

ভূমন্যু
|
সুহোত্র
|
অজমীঢ়
|
ঋক্ষ
|
সম্বরণ
|
কুরু
|
অবিক্ষিৎ
|
পরীক্ষিৎ
|
জনমেজয়

পরে দৃষ্ট হইবে যে, এই বংশাবলী-অনুসারে ষোড়শ রাজা পরীক্ষিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর কুরুবংশের রাজা হইয়াছিলেন। সুতরাং এই বিবরণ অনুসারে পঞ্চপাণ্ডবের উপাখ্যান নিরবচ্ছিন্ন কল্পিত উপন্যাসমাত্র। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান "মহাভারত" নামে যে বিপুল উপন্যাস-গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে, ইহার স্থানে স্থানে প্রকৃত ইতিহাসের আভাষ পাওয়া যায়।

কিন্তু বিচক্ষণ ব্যক্তিরা সহজেই বুঝিতে পারেন যে, ইহার অধিকাংশ কথাই কাল্পনিক।

উল্লিখিত বংশতালিকাতে অজমীঢ় নামে যে রাজার নাম শ্রুত হওয়া যায়, তিনিও এক জন প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন, এবং কেহ কেহ তাঁহাকে পঞ্চালবংশ ও কুশিকবংশের আদিপুরুষ বলিয়া বিবেচনা করেন। এই কুশিকবংশে মহর্ষি বিশ্বামিত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে তাঁহার বংশাবলীর যেরূপ বিবরণ লিখিত হইয়াছে, তাহাই অপেক্ষাকৃত প্রামাণিক বলিয়া বোধ হয়। তদনুসারে পুরুরবা রাজার দুই পুত্র, আয়ু ও অমাবসু। আয়ু হইতে পুরুবংশের উৎপত্তি, এবং অমাবসু হইতে কুশিকবংশের উৎপত্তি। আয়ুর পুত্র নহুষ, নহুষের পুত্র যযাতি, যযাতির পুত্র পুরু; অর্থাৎ, পুরু আয়ুর প্রপৌত্র। অপর দিকে অমাবসুর পুত্র ভীম, ভীমের পুত্র কাঞ্চন, কাঞ্চনের পুত্র সুহোত্র; তাহাতে পুরু ও সুহোত্র একই সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, অনুমান করা যাইতে পারে। সুহোত্র হইতে নবম পুরুষে প্রসিদ্ধ ঋষি বিশ্বামিত্রের জন্ম হয়। এক এক পুরুষে ত্রিশ বৎসর করিয়া ধরিলে, পুরুর রাজ্যাধিরোহণের ২৭০ বৎসর পরে বিশ্বামিত্রকে দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্বামিত্রের সময়ে পঞ্চালবংশীয় সুদাস রাজা, পুরুবংশীয় সম্বরণ এবং ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের রচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ বশিষ্ঠ ঋষি বিদ্যমান ছিলেন। উপরোক্ত বংশতালিকা-অনুসারে পুরু হইতে ত্রয়োদশ পুরুষে সম্বরণ রাজার উৎপত্তি। ২৭০ বৎসরে ত্রয়োদশ রাজার রাজত্ব বেশ সুসঙ্গত বিবেচনা হয়। এই কারণেও এই প্রাচীন বংশতালিকার প্রতি সবিশেষ আস্থা জন্মে।

তাহার পর দেখা যায় যে, সম্বরণের পুত্র কুরু, কুরুর পুত্র অবিক্ষিত, এবং অবিক্ষিতের পুত্র পরীক্ষিত। সম্বরণের সমকালীন ঋষি বশিষ্ঠ, বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি, শক্তির পুত্র পরাশর, পরাশরের পুত্র দ্বৈপায়ন কৃষ্ণ। তাহাতে সম্বরণের পৌত্রের সময়ে এবং বশিষ্ঠের প্রপৌত্রের সময়ে কুরুক্ষেত্রের সমর ঘটিয়াছিল, দেখা যায়। অপর আর এক দিকে বশিষ্ঠের সমকালীন রাজা সুদাস, তৎপুত্র সহদেব, তৎপুত্র সোমক, তৎপুত্র পৃষৎ, তৎপুত্র দ্রুপদ। তাহাতে সুদাসের বৃদ্ধ প্রপৌত্র দ্রুপদের সময়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, জানা যায়। এক দিকে তিন পুরুষ, এক দিকে পাঁচ পুরুষ, একই নিরূপিত সময়ের মধ্যে আবির্ভূত হওয়া অসম্ভব কথা নহে।

বশিষ্ঠের রচিত ঋক্‌সূক্তে সুদাস রাজার অনেক বিবরণ জানা যায়। বিষ্ণু-

পুরাণ অনুসারে সুদাসের পিতার নাম চ্যবন, পিতামহের নাম মিত্রয়ু, প্রপিতামহের নাম দিবোদাস। বশিষ্ঠের রচনায় সুদাসের পিতার নাম পিজবন। চ্যবন ও পিজবন একই নামের ভিন্ন ভিন্ন রূপান্তর বলিয়া বিবেচিত হয়, এবং বশিষ্ঠের রচনায় দিবোদাসকে সুদাসের এক জন পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়। তাহাতে দিবোদাস হইতে দ্রুপদ পর্য্যন্ত পঞ্চালবংশের বিবরণ ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পাইতে পারে।

বংশাবলীতে পুরুবংশীয় যে রাজার নাম তংসু বলিয়া এক্ষণে লিখিত হইয়া থাকে, তাঁহার প্রকৃত নাম বশিষ্ঠের ঋক্‌সূক্ত অনুসারে তৃৎসু। ভরতবংশীয় ক্ষত্রিয়েরা কখনও বা "তৃৎসবঃ" কখনও বা "ভরতাঃ" বলিয়া বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক উল্লিখিত হইয়াছেন। অপিচ, বশিষ্ঠের রচনায় প্রকাশ যে, এই তৃৎসুগণ সর্ব্বপ্রথমে সুদাস রাজার মিত্র ছিলেন; কিন্তু কোনও কারণে সুদাসের সহিত তাঁহাদের কলহ ঘটে, এবং তাঁহারা সুদাস কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আপনাদের ধনসম্পত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে বাধ্য হন। এইরূপ ভরতবংশের প্রাধান্য লুপ্তপ্রায় হইলে, তাঁহারা বশিষ্ঠকে আপনাদের পৌরোহিত্যে বরণ করেন, এবং তৎপরে তাঁহাদের পুনর্ব্বার প্রজাবৃদ্ধি হইয়াছিল। বেদোক্ত এই বিবরণ মহাভারতের আদি পর্ব্বের উক্ত ৯৪ অধ্যায়ে এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে,—

"ঋক্ষের পুত্র সম্বরণ। তিনি রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ করিলে প্রজামণ্ডলীর ক্ষয় হইতে লাগিল, এবং অন্যান্য বিষয়েরও বিনাশ হওয়াতে ক্রমশঃ জনপদ উৎসন্ন হইয়া উঠিল। শত শত লোক ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া অকালে কালকবলে পতিত হইতে লাগিল। এবং অনাবৃষ্টি ও ব্যাধিতে লোক সকল পঞ্চত্ব পাইতে লাগিল। এই সময়ে পঞ্চালরাজ চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে রাজা সম্বরণকে আক্রমণ করিয়া পরাজয় করিলেন। অনন্তর রাজা সম্বরণ ভীত হইয়া পুত্র কলত্র অমাত্য ও বন্ধুবর্গের সহিত পলায়ন করিয়া সিন্ধু নদীর তীরবর্ত্তী এক নিবিড় নিকুঞ্জ মধ্যে বাস করিলেন। সেই নিকুঞ্জ নদীতট অবধি পর্ব্বতসমীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই দুর্গমধ্যে তাঁহারা বহুকাল অতিবাহিত করিলেন। এক দিবস ভগবান বশিষ্ঠ তথায় আগমন করিলেন। ভারতেরা মহর্ষিকে সমাগত দেখিয়া পরম যত্নে প্রত্যুদ্গমন ও অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহাকে অর্ঘ দান করিলেন, এবং অনাময় প্রশ্নপূর্ব্বক তাঁহার যথাবিধি সৎকার করিলেন। মুনিবর আসনে উপবিষ্ট হইলে রাজা প্রার্থনা করিলেন, ভগবন্! আপনাকে আমাদিগের পৌরোহিত্য গ্রহণ করিতে হইবেক। আপনি পুরোহিত হইলে আমরা রাজ্যের নিমিত্ত যত্ন করিতে পারি। মহর্ষি বশিষ্ঠ তথাস্তু বলিয়া রাজার প্রার্থনায় সম্মতি প্রদান করিলেন। অচিরকালমধ্যে তাঁহাকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।" (১)

(১) কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত; ৯৪ অধ্যায়; আদিপর্ব্ব।

এই বিবরণ সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এবং বশিষ্ঠের ঋক্‌সূক্ত সকলের অর্থ অনেক স্থানে এই বিবরণ দ্বারা পরিষ্কৃত হয়। সুদাস রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞে বশিষ্ঠই তাঁহাকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু ঐ যজ্ঞে অশ্বরক্ষার ভার বিশ্বামিত্রের জ্ঞাতিগণের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। সুদাসের রাজসভায় বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র উভয়েই বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু এই দুই মহর্ষির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাবশতঃ ঘোরতর শত্রুতা জন্মিয়াছিল, ইহা উভয়েরই রচনায় প্রকাশ পায়। বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক বশিষ্ঠের নানা প্রকার অপবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। তিনি রাক্ষস, তিনি মন্ত্রপ্রয়োগপূর্ব্বক লোকের প্রাণ সংহার করেন; ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল অপবাদ হইতে পরিত্রাণলাভের জন্য বশিষ্ঠ যে একটি ঋক্‌সূক্ত রচনা করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। বোধ হয়, এই সকল কারণেই জাতক্রোধ হইয়া বশিষ্ঠ ঋষি শেষদশায় ভরতবংশীয়গণের সহিত সিন্ধুতীরে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। পরাভূত ভরতবংশীয়েরা উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া পঞ্চালরাজ দ্রুপদকে যুদ্ধে পরাজয় করেন, এবং তাঁহাকে তদীয় রাজ্যের অর্দ্ধাংশ হইতে বঞ্চিত করেন। ইহা হইতেই কুরুক্ষেত্রের মহা সমর প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, এবং এই জ্ঞাতিকলহে কুরুবংশ ও পঞ্চালবংশ উভয়েই প্রায় নির্মূল হইলে, কুরুবংশীয় পরীক্ষিত হস্তিনার সিংহাসনে আরোহণ করেন, এবং বহুকাল তাঁহার বংশ গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে রাজত্ব করে।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় নির্ণয়ের পক্ষে বিষ্ণুপুরাণে একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা স্থানান্তরে তাহার আলোচনা করিয়াছি। তদনুসারে নন্দাভিষেকের ১০।১৫ বৎসর পূর্ব্বে উক্ত যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, জানা যায়; এবং ৪২৫ খ্রীষ্টাব্দে নন্দাভিষেক ধরিলে, ১৪৪০ খৃষ্টাব্দে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল পাওয়া যায়। তৎপূর্ব্বে দ্বৈপায়ন কৃষ্ণ ত্রিশ বৎসর, পরাশর ত্রিশ বৎসর, এবং শক্তি ত্রিশ বৎসর,—এই তিন পুরুষে ১২০ বৎসর লইয়া খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব ১৫৬০ বৎসরে বশিষ্ঠ ঋষিকে দেখা যায়, এবং ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, ইহা মোটামুটি অনুমান করিতে পারা যায়।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ৩৬০ বৎসর পূর্ব্বে পুরুরাজাকে ধরিলে, খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব ১৮০০ বৎসরে পুরুরাজা বিদ্যমান ছিলেন, বিবেচনা হয়। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, দুষ্মন্তপুত্র ভরতরাজা এবং তাঁহার সমকালীন দীর্ঘতমা ঋষি কোন সময়ে বিদ্যমান ছিলেন? উপরে যে বংশতালিকা প্রামাণিক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, তদনুসারে ভরতের পরবর্ত্তী ৫ম রাজা সম্বরণের সময় বশিষ্ঠ ঋষি বিদ্যমান ছিলেন, প্রকাশ পায়। এই পাঁচ জন রাজার রাজত্বকাল, মনুষ্যজীবনের সচরাচর এক এক পুরুষের, কয় পুরুষের কাল ব্যাপিয়া ছিল, তাহা নিশ্চয় করা সুকঠিন। বশিষ্ঠ হইতে দীর্ঘতমা ও ভরত সম্ভবতঃ ন্যূনাধিক ১০০ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন, এইরূপ স্থূল অনুমান করা যাইতে পারে, এবং খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব ১৫৯০ বৎসরে বশিষ্ঠের কাল গণনা করিলে, খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব ১৬৯০ বৎসরে দীর্ঘতমা ও ভরত বিদ্যমান ছিলেন, বিবেচনা হয়।

ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে, এরূপ গণনা কেবল একটি স্থূল অনুমানমাত্র। কিন্তু সুস্পষ্ট প্রমাণের অভাবে আমাদিগকে অগত্যা এইরূপ স্থূল অনুমানের উপরেই আপাততঃ নির্ভর করিতে হইবেক। পূর্ব্ব প্রবন্ধে দীর্ঘতমা ঋষির রচনার যে অংশের অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে প্রকাশ যে, তৎকালে কোনও একটি নদীর ধারে ধারে দীর্ঘতমার যজমানগণ আপনাদের উপনিবেশ বিস্তার করিতেছিলেন। ঐ নদী হয় গঙ্গা, না হয় যমুনা, ইহাই বিবেচনা হয়। তদীয় রচনাতে প্রকাশ যে, বশিষ্ঠ ঋষির সময়েও তৃৎসুগণ, অর্থাৎ যে ক্ষত্রিয়বংশে মহারাজ ভরত প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সেই ক্ষত্রিয়গণ, যমুনা নদীর তীরবর্ত্তী জনপদ সকলে বসবাস করিতেন। অতএব বিবেচনা হয়, গঙ্গা বা যমুনা নদীর তীরবর্ত্তী কোন স্থানেই মহারাজাধিরাজ ভরত এবং মহর্ষি দীর্ঘতমা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

বেদ, মহাভারত এবং বিষ্ণুপুরাণ, এই সকল গ্রন্থে আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের যে সকল বিবরণ কিয়ৎপরিমাণে সংরক্ষিত হইয়াছে, তাহারই অনুসরণ করিয়া আমরা দেখিতে পাইলাম যে, দীর্ঘতমা ঋষি বশিষ্ঠ ঋষি অপেক্ষা অনেক প্রাচীন। কোনও কোনও আধুনিক বেদপাঠীগণের বিবেচনায় দীর্ঘতমা ঋষি বৈদিক ঋষিগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শেষকালীন ঋষি বলিয়া পরিগণিত; এবং শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সেই মতের অনুসরণ করিয়াছেন। উহা যে অসার, তাহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত ঐতিহাসিক বিবরণ সকলের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম। প্রবন্ধটি ইহারই মধ্যে দীর্ঘ হইয়া পড়িল। দীর্ঘতমাকে বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র অপেক্ষা অনেক প্রাচীন বলিয়া গণ্য করিবার আরও যে সকল কারণ আছে, এবং দীর্ঘতমার সময়ে বেদবিজ্ঞানের অবস্থা কিরূপ ছিল, পরবর্ত্তী প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

বুড়ী।

শীতকাল। রাত্রি দুইটা। সমস্ত দিনের এবং অর্দ্ধেক রাত্রের হট্টগোলের পর কলিকাতা সহরের একটু তন্দ্রা আসিয়াছে। এখনও দুই হাত অন্তর গ্যাসের আলো, এবং মাঝে মাঝে দুই একখানি গাড়ীর ঘড়্ ঘড়্ শব্দ, তাহার অকাতর নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইতেছে। রাস্তায় পাহারাওয়ালা রকের উপর বসিয়া দেয়ালে ঠেস্ দিয়া ঢুলিতেছে। তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত আর কিছু নয়, হঠাৎ ইন্‌স্পেক্টর বাবুর ভীমমূর্ত্তিসন্দর্শনের ভয়ে। দুই একখানা খাবারের দোকান এখনও খোলা আছে। তাহার সম্মুখে বুভুক্ষু রাস্তার কুকুর জিহ্বা বাহির করিয়া কাঙালের মত ফিরিতেছে। এমন সময়ে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের ফুটপাত দিয়া একটি বৃদ্ধা দাসী সর্ব্বাঙ্গ শালে জড়াইয়া এক বৎসরের একটি ছোট মেয়েকে কোলে লইয়া আস্তে আস্তে চলিতেছিল। আর মাঝে মাঝে বলিতেছিল, "ভগবান শীগ্গির শীগ্গির আরাম করে দাও!" বৃদ্ধা যখন আমহাউসের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন এক জন পাহারাওয়ালা তাহাকে চোর ভাবিয়া বলিয়া উঠিল, "বুড্ঢি, এৎনা রাতমে কেয়া লেকে কিধার যাতা?" বুড়ী বলিল, "বাবা, আমি চোর নই, এই আমার মনিব শ্যামবাবুর মেয়েটির বড় অসুখ, ডাক্তার বলেছে ভোরের হাওয়া খেলে তার সব অসুখ ভাল হয়ে যাবে, তাই তাকে নিয়ে হাওয়া খাওয়াতে এসেছি।" পাহারাওয়ালা বলিল, "কেয়া তুম্ পাগলী হ্যায়, আবিতো দো বাজা হোগা।" বুড়ী বলিল, "বাবা, জ্যোৎস্নায় ফর্‌সা দেখে সময় ঠাওরাতে পারি নি।" বলিয়া মেয়েটিকে বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া "তাই ত কি কর্‌লুম" বলিতে বলিতে আস্তে আস্তে বাড়ীর দিকে ফিরিয়া চলিল। বাড়ী গিয়া মা বাপের অজ্ঞাতসারে তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া আপনিও পাশে শুইল।

সেই দিন ভোরের দিকে মেয়েটির জ্বর বাড়িয়া গেল, অন্য দিন অপেক্ষা কিছু বেশী ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। বুড়ী সভয়ে মেয়েটির গায়ে হাত দিয়া যখন দেখিল যে, গা আগুনের মত তাতিয়াছে, তখন তাহার সেই কঙ্কালসার দেহের সমস্ত রক্ত যেন শুকাইয়া গেল। তাহাকে কোলে করিয়া সে এক-বার বসে, একবার ঘরময় পায়চালী করিয়া বেড়ায়, মাথায় হাত বুলাইয়া দেয়, পাখা করে, মুখে কপালে গায়ে বারবার হাত দিয়া দেখে, এতক্ষণে যদি জ্বর

একটু কমিয়া থাকে। কিন্তু জ্বর আর কমিল না। সকাল হইলে বুড়ী মেয়েটিকে তার মায়ের কাছে রাখিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে নিকটস্থ ঠাকুরবাড়ীতে ছুটিয়া গিয়া ঠাকুরের চরণামৃত আনিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া দিল। তাহার পর মায়ের কোল হইতে লইয়া মেয়েটিকে কোলে করিয়া ঠায় বসিয়া রহিল।

ডাক্তার আসিলে বুড়ী অতি কাতর ক্রন্দনস্বরে বলিল, "বাবা, আমার দোষেই মেয়েটির জ্বর বেড়েছে। বুড়ী মানুষ চোখে দেখ্‌তে পাইনে, ভোর ভেবে রাত দুটোর সময় মেয়েকে রাস্তায় নিয়ে বেরিয়েছিলুম। ডাক্তার মশায়, আপনার পায়ে পড়ি, মেয়েটিকে ভাল করে দাও, ভগবান আপনার ভাল করবেন!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। ডাক্তার কহিলেন, "দুর পাগলী কাঁদিস কেন, কি হয়েচে?" ডাক্তারের সান্ত্বনায় বুড়ীর কান্না আরও বাড়িল। সকলে মিলিয়া অনেক কষ্টে তাহাকে থামাইল।

সে দিন বুড়ীকে কেহ কিছু খাওয়াইতে পারিল না।

বুড়ী অনেক কালের পুরাণো লোক। মেয়ের মা হেমাঙ্গিনীকে সে হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছিল, এখন তাহার সঙ্গে শ্বশুরবাড়ীতে আসিয়া তাহার মেয়েটিকে আবার মানুষ করিতেছে। সন্তানের মুখ দেখিতে হেমাঙ্গিনীর বরাবর বড় সাধ ছিল। যদি বা অনেক কষ্টে সে সাধ মিটিল, একটি মেয়ে হইল; সে আবার অদৃষ্টক্রমে জন্মরুগ্না। হেমাঙ্গিনীর মুখের দিকে চাহিয়া রাত জাগিয়া শরীর খাটাইয়া বুড়ী মেয়েটিকে মানুষ করিতেছে। মেয়েটির প্রতি তাহার এত দুর স্নেহপক্ষপাত ছিল যে, তাহার জন্য অন্য শিশুর কাপড় কিম্বা দুধ যখন যাহা আবশ্যক হইত কাড়িয়া লইয়া আসিত, কিন্তু অন্য কেহ যদি আবশ্যকবশতঃ বুড়ীর আদরের মেয়েটির কিছু লইতে আসিত, অমনি সে ব্যাঘ্রিনীর মত তাহাকে খাইতে যাইত।

মেয়েটির জ্বর কিন্তু কিছুতেই কমিল না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বুড়ী তাহার সঞ্চিত মাহিনার টাকা হইতে একটি সোনার মাদুলি গড়াইয়া তাহার মধ্যে ঔষধ পুরিয়া মেয়েটির হাতে বাঁধিয়া দিল। বিকাল বেলায় ডাক্তার আসিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন যে, টাইফয়েডের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে;—তিনি মাথায় বরফ দিবার ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। হেমা-ঙ্গিনী কাঁদিতে লাগিল। বুড়ী সজলনয়নে শুষ্ক হস্তে তাহার চোখ মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল, "কাঁদিস্‌নে মা, শীগ্গিরই ভাল হয়ে যাবে। ডাক্তার যা বল্‌চে তাই কর্ মা!" বলিয়া বাহিরে আসিয়া দুই গণ্ড ভাসাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

মনের উদ্বেগে অনাহারে অনিদ্রায় বুড়ীর বুকের পাঁজরে শেষে এমনি ব্যাথা ধরিল যে, তাহার আর উঠিবার ক্ষমতা রহিল না। শুইয়া শুইয়া সে কেবলই মেয়েটির দিকে দৃষ্টি রাখিত। "ওগো ওগো মেয়েটা ভিজেতে পড়ে আছে, উঠিয়ে নাও!" "ওগো মেয়েটার ক্ষিধে পেয়েছে, খেতে দাও।" "ওগো মেয়েটাকে একটু বাতাস কর।" চব্বিশ ঘণ্টাই এইরূপ চীৎকার করিত। কিছু দিনের জন্য নূতন দাসী আনিবার কথা যদি হেমাঙ্গিনী বলিত, অমনি সে সমস্ত যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়া একেবারে ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া খুকীকে কোলে করিয়া বসিত। "না গো না, নতুন দাসী আন্‌তে হবে না, আমিই সব কাজ কর্‌তে পারব।" আর কেহ যে অসুখের সময় মেয়ের সেবা করিবে, বুড়ীর প্রাণে তাহা সহ্য হইত না।

ক্রমে মেয়েটির অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া আসিল। সেদিন দুপুর রাতে মেয়েটি সজোরে মাথা চালাইতে লাগিল, তাহার চোখ দুটা উল্টাইয়া আসিল, দাঁতে দাঁতে লাগিতে লাগিল। ডাক্তারের জন্য লোক পাঠান হইল। ডাক্তার আসিয়া দেখিলেন গতিক মন্দ—বাঁচান দুরূহ। অন্য কোন ঔষধ নাই, চোখে মুখে মাথায় বরফ ঘষিয়া দিতে বলিয়া ডাক্তার অল্পক্ষণ পরে চলিয়া গেলেন। হেমাঙ্গিনী বারাণ্ডায় লুটাইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। বুড়ী মেয়েকে কোলে করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার মাথায় মুখে কম্পিতহস্তে বরফ ঘষিয়া দিতে লাগিল।

কিছুতেই কিছু হইল না। ভোর চারিটার সময় বুড়ীর কোলে মেয়েটি মারা গেল। "ওগো আমার সোনা, ওগো আমার ধন, ওগো তুই কোথা গেলিরে, আমার দোষে এমন হলরে—ওরে ফিরে আয়রে, আমি কেমন করে বাঁচব!" বলিয়া চীৎকারস্বরে বুড়ী কাঁদিতে লাগিল। মেয়েটিকে সে কোন মতেই কোল হইতে ছাড়িবে না, সকলে মিলিয়া অনেক কষ্টে তাহার দৃঢ় আলিঙ্গন হইতে তাহাকে কাড়িয়া লইল।

তিন দিন বুড়ী জলস্পর্শও করিল না, কেবলই কাঁদে। চতুর্থ দিনে সকলে মিলিয়া ধরিয়া বাঁধিয়া তাহাকে একটু দুধ খাওয়াইয়া দিল। দুই চারি দিন পরে বুড়ীর একটু জ্বর দেখা দিল, এবং দেখিতে দেখিতে সেই জ্বর ঘোর বিকারে দাঁড়াইল। প্রলাপে সে কেবলই বকিত, "ওরে আমার দোষে গেলিরে", অনেক ডাক্তার কবিরাজ দেখাইয়া অনেক করিয়া সে যাত্রা বুড়ী রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু তাহার সেই মনের আগুন কোন মতে নিবিল না।

জ্বর হইতে উঠিয়া মুণ্ডিত মস্তক, লোল চর্ম্ম, শ্বেত ওষ্ঠ, পাণ্ডুর বিবর্ণ মুখ, অস্থিপঞ্জরসার ক্ষীণ দেহ লইয়া বুড়ী যখন হেমাঙ্গিনীর ঘরে প্রবেশ করিল, তখন উদ্বেলিত শোকাশ্রুধারায় দু'জনে গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, কিন্তু ধ্বনি প্রতিধ্বনির ন্যায় হেমাঙ্গিনী বুড়ীর শোকাশ্রু আর থামে না। হেমাঙ্গিনীর স্বামী দেখিলেন, দু'জনে কাছা-কাছি থাকিলে কখনও কাহারও শোকের লাঘব হইবার সম্ভাবনা নাই, উপরন্তু উভয়েরই শরীরের পক্ষে যথেষ্ট হানি হইবার সম্ভাবনা। ভাবিয়া চিন্তিয়া হেমাঙ্গিনীর স্বামী স্থির করিলেন, বুড়ীকে চার টাকা করিয়া পেন্‌সন্ দিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিবেন। বুড়ী শুনিয়া হেমাঙ্গিনীকে ফেলিয়া কোন মতেই বাড়ী যাইতে রাজি হইল না। বাবু অনেক করিয়া বুঝাইয়া শুঝাইয়া কিছু দিন পরে চিঠি দিয়া আবার তাহাকে ডাকাইয়া আনিবেন বলিয়া, তাহাকে বাড়ী যাইতে সম্মত করাইলেন।

শরীরে যখন একটু বল পাইল, বুড়ী বাড়ী যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। যাইবার আগের দিন রাত্রে তাহার জিনিস পত্তর গুলো একটা পুঁটলি করিয়া বাঁধিল, গলার সোনার হারটি খুলিয়া হেমাঙ্গিনীকে দিল। ভোর চারিটার সময় উঠিয়া হেমাঙ্গিনীর গলা জড়াইয়া তাহাকে চুম্বন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী হইতে বাহির হইল।

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের সেই পথ। সহর নিস্তব্ধ। ঘরে ঘরে দরজা বন্ধ। কাঁথে পুঁটলী লইয়া, "মাগো কি হোল গো!" বলিতে বলিতে অসহ বেদনাভার লইয়া বুড়ী ফুট্‌পাতের উপর দিয়া আস্তে আস্তে চলিতে লাগিল। আমহাউসের কাছে যখন আসিল, সেই পূর্ব্বপরিচিত পাহারাওয়ালাটা তাহাকে দেখিতে পাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "বুড্‌ঢি আজ ফের্ কেয়া লেকে কাঁহা যাতা?" বুড়ী বলিল, "বাবা, আমার সর্ব্বনাশ হয়েচে, আমার সেই শ্যামবাবুর মেয়েটি মারা গেছে, আমি চোর নই বটে, কিন্তু আমি খুনী, আমার দোষেই সে মারা গেছে, আমাকে ধরিয়া তোমাদের জেলে দাও!" বলিয়া অশ্রুধারায় বক্ষ ভাসাইয়া বসিয়া পড়িল। পাহারাওয়ালা অনেক সান্ত্বনা দিয়া অনেক বুঝাইয়া তাহাকে উঠাইল, এবং সঙ্গে করিয়া খানিক দূর রাখিয়া আসিল। সে আস্তে আস্তে শিয়ালদাহ অভিমুখে চলিতে লাগিল। টিকিট্ কিনিয়া ছয়টার ট্রেনে বাড়ী রওনা হইল।

এক মাস পরে খবর আসিল, বুড়ী দেশে জ্বরবিকারে মারা গিয়াছে।

ঐতিহাসিক অর্মে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে যে সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, ইতিহাসপাঠকের নিকট তাহা অতীব প্রীতিপ্রদ বলিয়াই বোধ হয়। এই অষ্টাদশ শতাব্দীতে মোগল সৌভাগ্য-চন্দ্রমা অস্তমিত হইয়া ব্রিটিশ গৌরব-সূর্য্যোদয়ের সূচনা হইয়াছিল। সেই সূর্য্যের উজ্জ্বল কিরণে অন্যান্য ইউরোপীয় তারকারাজি আভাহীন হইয়া পড়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস পাঠ না করিলে ভারতে ব্রিটিশ রাজ্যপ্রতিষ্ঠার মূল তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না। মুষ্টিমেয় ইংরাজ বণিক-সম্প্রদায় কিরূপে সমগ্র ভারতবর্ষে ধীরে ধীরে আপনাদিগের অমোঘ ক্ষমতার বিস্তার করিতেছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। দক্ষিণ সাগরের তরঙ্গলহরী বিক্ষোভিত করিয়া কিরূপে বঙ্গের শ্যামল প্রান্তরে সেই মহীয়সী শক্তির অভাবনীয় ক্রীড়া আরব্ধ হয়, তাহা জানিতে হইলে, অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস পাঠ করা কর্ত্তব্য। সেই ঘটনামালা, দুই জন ঐতিহাসিক বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। তন্মধ্যে এক জন দেশীয়, আর এক জন বিদেশীয়। এই দুই জনই তৎকালীন অনেক ঘটনার সময় বর্ত্তমান ছিলেন, এই জন্য আমরা তাঁহাদের কথারই উল্লেখ করিলাম। সত্য বটে, আরও দুই চারি জন কোন কোন ঘটনার সময় উপস্থিত থাকিয়া নিজ নিজ পুস্তকে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থ প্রকৃত ইতিহাস নহে, কতকগুলি ঘটনার সঙ্কলনমাত্র ; সুতরাং আমরা তাঁহাদের গণনায় আনিতেছি না। পূর্ব্বকথিত ঐতিহাসিকদ্বয় তদানীন্তন প্রায় সমস্ত ঘটনা ঐতিহাসিক ভাবে বিন্যাস করিয়াছেন ; দুই একটি ঘটনা তাঁহাদের কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও ভিন্ন রূপে লিখিত হইয়াছে। প্রকৃত ঐতিহাসিক বলিয়া আমরা এ স্থলে তাঁহাদেরই উল্লেখ করিতেছি। উক্ত দেশীয় গ্রন্থকারের নাম সৈয়দ গোলাম হোসেন, ও তাঁহার প্রণীত গ্রন্থের নাম সায়র মুতাক্ষরীণ। মুতাক্ষরীণ একখানি বিস্তৃত ফারসী গ্রন্থ। এই গ্রন্থে অষ্টাদশ শতাব্দীর সমগ্র ভারতবর্ষের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। গোলাম হোসেনের গ্রন্থে সমগ্র ভারতের বিবরণ আছে বটে, কিন্তু তাঁহার বাঙ্গলার বিবরণই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত ও বিশ্বাস্য। কারণ, তিনি বঙ্গদেশে উপস্থিত থাকিয়া অনেক ঘটনার বিষয় উত্তমরূপে অবগত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় ঐতিহাসিক এক জন ইংরাজ ;—তাঁহার নাম রবার্ট অর্মে। অর্মেও তৎকালীন ভারতের ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ প্রদান করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। তিনি দাক্ষিণাত্যে অবস্থিতি করিতেন ; সুতরাং তাঁহার দাক্ষিণাত্যের বিবরণ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, এবং তাহাই অনেকপরিমাণে বিশ্বাসযোগ্য। অর্মের বাঙ্গলার বিবরণ হইতেও অনেক নূতন নূতন বিষয় জানিতে পারা যায়। ফলতঃ, এই দুই জনের গ্রন্থ আলোচনা না করিলে, অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতের ইতিহাস জানিবার প্রকৃষ্ট উপায় আর নাই। যদিও তাঁহাদের গ্রন্থ একেবারে ভ্রমপ্রমাদশূন্য নহে, তথাপি এরূপ বিস্তৃতভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিবরণ অন্য কোন গ্রন্থ হইতে জানা যায় না। যাঁহারা ইতিহাসচর্চ্চার জন্য সেই সমস্ত ঘটনামালা গ্রথিত করিয়াছেন, সাধারণে তাঁহাদের কিছু কিছু বিবরণ জানা আবশ্যক। এই জন্য আমরা তাঁহাদের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা দেশীয় গ্রন্থকার গোলাম হোসেনের প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া, বিদেশীয় ঐতিহাসিক রবার্ট অর্মের কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদান করিবার চেষ্টা পাইব।

রবার্ট অর্মের জন্মস্থান ভারতবর্ষ ; তিনি দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত ত্রিবাঙ্কুর প্রদেশের আঞ্জেঙ্গা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন ; ১৭২৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে তাঁহার জন্ম হয়। অর্মের পিতা আঞ্জেঙ্গায় ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে সার্জ্জনের কার্য্য করিতেন। দিন দিন যখন পুত্রের বয়স বাড়িতে লাগিল, তখন পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার জন্য পিতা বিশেষরূপ উদ্যোগী হইলেন। তৎকালে ভারতবর্ষে ইংরাজসন্তানগণের সুশিক্ষার তাদৃশ উপায় ছিল না ; অগত্যা অর্মের পিতা পুত্রকে অল্প বয়সেই ইংলণ্ডে পাঠাইতে বাধ্য হন। অর্মে ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়া হ্যারো স্কুলে পাঠাভ্যাস আরম্ভ করেন। তথায় ছয় বৎসর অধ্যয়ন করিয়া তিনি ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের কোন এক একাডেমীতে বাণিজ্যসংক্রান্ত বিষয়ের শিক্ষায় নিযুক্ত হন। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীন সিভিল সার্ব্বিসে নিযুক্ত হইবার ইচ্ছা হওয়ায়, তাঁহার বাণিজ্যসংক্রান্ত বিষয়ে ব্যুৎপত্তির আবশ্যক হয়। বাল্যকাল হইতে অর্মের নানারূপ গবেষণায় মনোযোগ ছিল ; ইতিহাস প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতির আলোচনায় তিনি বিশেষরূপ আমোদ পাইতেন। এরূপ লোকের পক্ষে বাণিজ্যসংক্রান্ত শুষ্ক বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া কত দূর কষ্টকর, তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। কাজেই সে বিষয়ের আলোচনা তাঁহার নিকট ভাল লাগিত না। কিন্তু তিনি যে কার্য্যে নিযুক্ত হইবার অভিলাষী ছিলেন, তাহার জন্য বাধ্য হইয়া তাঁহাকে উক্ত বিষয়ের

শিক্ষা আরম্ভ করিতে হয়। অর্মে একাডেমীতে পাঠ সমাপন করিয়া, ১৭৪৪ অথবা ৪৫ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর অধীনে এক কেরাণীর পদে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হন। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। যে সময়ে নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়গণের অত্যাচার নিবারণের জন্য আপনার রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিতেছিলেন, এবং যে সময়ে ইংরাজ ফরাসী প্রভৃতি বৈদেশিকগণ গোপনে বঙ্গরাজ্যে আপনাদের ক্ষমতাবিস্তারের চেষ্টা পাইতেছিলেন, সেই সময়ে অর্মে কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়া এ দেশের রাজনৈতিক জ্ঞানে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা হইতে মান্দ্রাজে গমন করিয়াছিলেন। পর বৎসর তাঁহাকে আর একবার ইংলণ্ডে যাত্রা করিতে হয়। এই সময়ে রবার্ট ক্লাইবও তাঁহার সহিত ইংলণ্ডে গমন করেন। ক্লাইবের সহিত অর্মের অত্যন্ত বন্ধুত্ব ছিল। উভয়েরই নাম রবার্ট হওয়ায়, দুই জনে সৌহার্দ্দ্যসূত্রে আবদ্ধ হন। অর্মে প্রায় তিন বৎসর ইংলণ্ডে অতিবাহিত করিয়া পুনর্ব্বার মান্দ্রাজে উপনীত হন। এই সময়ে তিনি মান্দ্রাজ কাউন্সিলের চতুর্থ সভ্যের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

যে সময়ে অর্মে এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময়ে সিরাজ উদ্দৌলা কর্ত্তৃক কলিকাতা আক্রমণের সংবাদ মান্দ্রাজে উপস্থিত হয়। নবাবের সহিত যুদ্ধার্থ কাহাকে পাঠান হইবে, এই বিষয় লইয়া মান্দ্রাজ কাউন্সিলে বিষম তর্ক বিতর্কের ধূম পড়িয়া যায়। অবশেষে ক্লাইবের কথা উঠিলে, অর্মে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করেন, এবং তাঁহারই একান্ত চেষ্টায় ক্লাইব মান্দ্রাজ হইতে বাঙ্গলায় প্রেরিত হন। কর্ণাট যুদ্ধে যখন সমস্ত দক্ষিণ ভারতবর্ষ বিকম্পিত হইয়া উঠে, সেই সময়ে মান্দ্রাজ কাউন্সিলের সভ্যেরা কঠিন কঠিন সামরিক সমস্যার নির্ণয়ের জন্য দিবারাত্র আপনাদিগের মস্তিক বিলোড়ন করিতেন। অর্মে ১৭৫৫ হইতে ৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত মহাযুদ্ধের অনেক সমস্যার মীমাংসা করিয়াছিলেন। তাঁহার সূক্ষ্ম রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া সকলে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তৎকালে তিনি কমিসারী জেনেরালের পদেও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে আলেকজাণ্ডার ডালরিম্পলের সহিত অর্মের অত্যন্ত প্রণয় হয়। ডালরিম্পল মান্দ্রাজে অণ্ডারষ্টোরকীপারের কার্য্য করিতেন, এবং তিনি জলপথসম্বন্ধীয় জরিপ ও অন্যান্য বিবরণে বিশেষরূপ ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

ডালরিম্পলের সহিত প্রণয় হওয়ায় অর্মে তাঁহাকে ডেপুটী একাউণ্টাণ্টের পদে নিযুক্ত করিবার জন্য অত্যন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে অর্মে মান্দ্রাজ হইতে পুনর্ব্বার ইংলণ্ডে গমন করেন। এই সময় হইতেই তিনি ইতিহাসের আলোচনায় অবহিত হন, এবং বাল্যকাল হইতে যে বিষয়ের আলোচনায় বিশেষ আনন্দিত হইতেন, এক্ষণে অবসর পাইয়া তাহা লইয়াই সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। অর্মের ঐতিহাসিক গবেষণার ফলে, তাঁহার প্রধান গ্রন্থ "ভারতে ব্রিটিশ জাতির সামরিক বৃত্তান্ত" * প্রকাশিত হয়। ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্য ও কয়েক বৎসরের বাঙ্গলার বিবরণে এই গ্রন্থ পরিপূর্ণ। অর্মের গ্রন্থ তিন খণ্ডে বিভক্ত। গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণ ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে তাহার দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে ভারতে মুসলমান-বিজয়ের একটি বিবরণ প্রদত্ত হয়, কিন্তু তাহা ভ্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ। প্রথম খণ্ডে ১৭৪৫ হইতে ১৭৫৬ পর্য্যন্ত করমণ্ডল যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। প্রথমে কর্ণাট রাজ্যের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পরে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কর্ণাটের বিবিধ বিষয়, বিশেষতঃ ইংরাজ ও ফরাসীদিগের সংঘর্ষণের বিবরণ, উক্ত খণ্ডে বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে বাঙ্গলায় সিরাজ উদ্দৌলার সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ ও মীরজাফরের রাজ্যাভিষেক প্রভৃতি, এবং ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত করমণ্ডল যুদ্ধের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমে বাঙ্গলার একটি সাধারণ বিবরণ ও ১২০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৫৬ পর্য্যন্ত বাঙ্গলার একটি সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। পরে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে সিরাজ ও ইংরাজের সংঘর্ষণ, সিরাজ কর্ত্তৃক কলিকাতা আক্রমণের বিস্তৃত বিবরণ ও মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতার ইংরাজ সৈন্য প্রেরণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া অর্মে আবার দাক্ষিণাত্যের বিবরণ আরম্ভ করিয়াছেন। ইংরাজগণ কর্ত্তৃক কলিকাতার পুনরধিকার, সিরাজ উদ্দৌলার সহিত যুদ্ধ ও মীরজাফরের রাজ্যাভিষেক প্রভৃতি ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত বাঙ্গলার বিবরণ ও ১৭৫৭ হইতে ১৭৬১ পর্য্যন্ত দাক্ষিণা-

* A History of the Military Transactions of the British Nation in Indostan.

ত্যের বিবরণে গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে একচতুর্থাংশেরও ন্যূন অংশ বাঙ্গলার বিবরণে পূর্ণ। প্রথম খণ্ডে বাঙ্গলার বিবরণের কিছুমাত্র উল্লেখ নাই; সুতরাং বলিতে গেলে, অর্মের গ্রন্থ দাক্ষিণাত্যেরই প্রকৃত ইতিহাস। তবে বাঙ্গলার ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধেও তিনি যাহা লিখিয়াছেন, অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় তাহাও নিতান্ত মন্দ নহে। তাঁহার কর্ণাটযুদ্ধের বিবরণ অনেক পরিমাণে সত্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া নিরপেক্ষভাবে লিখিত। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে অর্মে তাঁহার দ্বিতীয় খণ্ডের উপাদানসংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। ডিরেক্টারগণ তাঁহার ইতিহাস আলোচনার বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে বার্ষিক ৩০০ পাউণ্ড বেতনে কোম্পানীর ঐতিহাসিকের পদে নিযুক্ত করেন। কর্ণাটযুদ্ধসম্বন্ধীয় ফরাসীদিগের বিবরণ অবগত হইবার জন্য অর্মেকে ফ্রান্সে গমন করিতে হইয়াছিল। তথায় তিনি বুসীর সহিত পরিচিত হন। বুসী অর্মের প্রথম খণ্ডে কর্ণাটযুদ্ধের বিবরণ পাঠ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি অর্মের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া তাঁহাকে নিজ পল্লীভবনে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান, এবং তাঁহার ইতিহাসের উপাদানের জন্য অনেক কাগজপত্র সংগ্রহ করিয়া দেন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। তাঁহার তৃতীয় খণ্ড কেবল মানচিত্রে পরিপূর্ণ। তাহাতে ৩৫ খানি মানচিত্র আছে। তন্মধ্যে অধিকাংশই দাক্ষিণাত্যের ভিন্ন ভিন্ন স্থান, নগর ও যুদ্ধের মানচিত্র। প্রথম মানচিত্রখানি সমগ্র ভারতবর্ষের। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের কলিকাতার দুইখানি ও ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের কলিকাতার একখানি মানচিত্র ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। মেজর রেনেলের কৃত দিল্লীর পূর্ব্বপার্শ্বস্থ প্রদেশসমূহের একখানি মানচিত্রও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। রেনেল অর্মের গ্রন্থের জন্যই উক্ত মানচিত্রখানি অঙ্কিত করেন। উপবিভাগ সহিত বাঙ্গলা ও বিহারের একখানি মানচিত্রও ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়।

১৭৮২ খৃষ্টাব্দে অর্মে Fragments নামে আর একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। উক্ত গ্রন্থে দেশীয়গণের শাসনপ্রণালী ও ইউরোপীয়গণ কর্ত্তৃক রাজ্যস্থাপনের নানা প্রকার ঐতিহাসিক বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থ লিখিবার সময় তাঁহাকে পর্টুগীজ ভাষা অধ্যয়ন করিতে হয়। কারণ, প্রধান প্রধান পর্টুগীজ গ্রন্থকার ভারত সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা অবগত হইতে না পারিলে, তাঁহার উক্ত গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না। তিনি সেই সমস্ত গ্রন্থ বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া নিজ গ্রন্থের প্রণয়নে প্রবৃত্ত

হন। তাঁহার উক্ত গ্রন্থ অনেক নূতন নূতন প্রীতিপ্রদ ঘটনায় পরিপূর্ণ। যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের "রাজসিংহ" পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে, রাজসিংহের প্রভাবে সাহানসাহা আরঙ্গজেব বাদসাহকে কেমন নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল, এবং উদিপুরী প্রভৃতি তাঁহার বেগমগণ রাজপুতগণের হস্তে রন্ধ্রপথে কিরূপে বন্দিনী হইয়াছিলেন। অর্মেই তাঁহার গ্রন্থে প্রথমে এই সমস্ত ঘটনার উল্লেখ করেন। রাণা রাজসিংহ দাম্ভিক আরঙ্গজেবকে সৎসাহসের পরিচায়ক যে পত্রখানি প্রথমে লিখিয়াছিলেন, সেই সুপ্রসিদ্ধ পত্র অর্মেই ইউরোপে প্রকাশ করেন। কিন্তু অর্মে ভ্রমক্রমে এই পত্র যশোবন্ত সিংহের রচিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। এইরূপ অনেক অপ্রকাশিত ঘটনায় তাঁহার গ্রন্থ পরিপূর্ণ। ফলতঃ, অর্মের দুইখানি গ্রন্থই ঐতিহাসিকগণের বিশেষ আদরের সামগ্রী।

ক্রমাগত সাহিত্য ও ইতিহাসের আলোচনায় অর্মের স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায়, তাঁহাকে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া এলিং নামক স্থানে যাইতে হয়। এলিংএ গমন করিয়াও তিনি সুস্থ হইতে পারেন নাই। বয়োবৃদ্ধির সহিত শরীর দুর্ব্বল হওয়ায়, দিন দিন তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে লাগিল। অবশেষে ১৮০১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী দিবসে ত্রিসপ্ততি বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। যে ইতিহাস-আলোচনা তাঁহার জীবনের প্রধান অবলম্বনস্বরূপ ছিল, তাহাই ক্রমে তাঁহার শরীরপাতের কারণ হইয়া উঠে। যাহা হউক, তাঁহার ইতিহাস আলোচনার ফলে যে দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ সাধারণের গোচরীভূত হইয়াছে, তাহা চিরদিন দেদীপ্যমান থাকিবে। অর্মে প্রকৃতরূপে বিবাহিত হইয়াছিলেন কি না, তাহা ভালরূপ জানা যায় না। তবে তিনি তাঁহার কোন বিশিষ্ট বন্ধুকে পত্র দ্বারা স্বীয় বিবাহের কথা জ্ঞাপন করিয়া যান। উক্ত পত্র তাঁহার উপদেশানুসারে তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রদত্ত হইয়াছিল। ডিরেক্টারগণ উক্ত পত্রানুসারে অর্মের বিধবার জন্য যৎকিঞ্চিৎ বৃত্তির বন্দোবস্ত করিয়া দেন। অর্মের কোন সন্তান ছিল কি না, তাহা বলা যায় না।

অর্মে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে উপস্থিত ছিলেন। এই জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর বিবরণ জানিতে হইলে, অর্মের ন্যায় সমসাময়িক ঐতিহাসিকের গ্রন্থ আলোচনাই কর্ত্তব্য। যদিও তাঁহার গ্রন্থের স্থানে স্থানে একদেশদর্শিতার পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে, তথাপি তিনি সমসাময়িক ছিলেন বলিয়া তাঁহার গ্রন্থ হইতে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার প্রকৃত বিবরণও অবগত হওয়া যায়।

আজ কাল বাঙ্গালায় ইতিহাসচর্চ্চার সূত্রপাত হইতেছে, এবং অনেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসের অনুশীলনে বিশেষরূপ মনোযোগী হইয়াছেন। সেই জন্য আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর এক জন প্রধান ঐতিহাসিকের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদান করিলাম।

জাপানের প্রথম উপন্যাস।

"কোজিকি" জাপান দেশের প্রথম সাহিত্য। ইহা ৭১২ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। অষ্টম কিম্বা নবম শতাব্দীতে জাপান সাহিত্যে পদ্য ব্যতীত কোন প্রশংসাযোগ্য গদ্য প্রকাশিত হয় নাই। দশম শতাব্দীতে কতকগুলি উপন্যাস গদ্যে প্রকাশিত হওয়ায় জাপানী ভাষার উন্নতির সূত্রপাত হয়। এই সকল উপন্যাসের মধ্যে আমাদের আলোচ্য "টেক্‌টোরি" বা কাঠুরিয়ার গল্পই সর্ব্বপ্রথম। এই পুস্তকের পর হইতেই জাপান সাহিত্যের গতি নূতন দিকে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

জাপানী সমালোচকগণ, রচনার পারিপাট্যে ও ঘটনার বিচিত্রতায় "গেঞ্জিত মনোপটরি"কে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করেন। হতভাগ্য কাঠুরিয়ার গল্পে তাঁহাদিগের তাদৃশ আস্থা দেখা যায় না। কিন্তু পশ্চিম ভূখণ্ডে "গেঞ্জিত মনোপটরি"র বিশের আদর নাই। উহাতে প্রেমকাহিনীর এতই প্রাচুর্য্য যে, তাহা কোন মতেই সুখপাঠ্য নহে।

কেহ কেহ "টেক্‌টোরির" রচয়িতাকেও প্রতিভাহীন বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। টেক্‌টোরির গল্পের অধিকাংশ উপকরণই চীন ও ভারত হইতে সংগৃহীত, তাঁহাদের এইরূপ সংস্কার। কিন্তু, দশম শতাব্দীতেও কোজিকির কতকগুলি গীত ভিন্ন জাপানদেশীয় পুরাতন গল্প বা উপন্যাসের অধিকাংশই চীন উপকরণে গঠিত। কাঠুরিয়ার কথা জাপানের নিজস্ব সম্পত্তি। ইহার কোমল ভাষা ও সরল শোকোচ্ছ্বাস জাপানের নিজস্ব।

কাঠুরিয়ার কথা কোন ধার্ম্মিক বৌদ্ধের লেখনীপ্রসূত। দুষ্কৃতি ও তাহার ফল ইহাতে সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। নায়িকা চিরকৌমারব্রতাবলম্বিনী ছিলেন। নায়কের অভিলাষ, কন্যার পিতার অনুমোদিত হইলেও, কন্যার হৃদয়ে

স্থান পায় নাই। গ্রন্থ মধ্যে পাঁচটি রাজপুত্রের যে উপাখ্যান আছে, তাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয়।

জাপানী কাঠুরিয়া।

পুরাকালে "সনুগি নো মিয়াকো" নামে কোন বৃদ্ধ কাঠুরিয়া পর্ব্বতপার্শ্বে বাঁশ কাটিয়া দিনপাত করিত। এক দিন এক খণ্ড কর্ত্তিত বংশ হইতে সহসা আলোক বহির্গত হইয়া চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত করিল; কাঠুরিয়া আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, আলোক আর কিছু নহে,—অতিক্ষুদ্রকায়া অপরিসীমরূপলাবণ্যসম্পন্না একটি বালিকা বনস্থলী আলোকিত করিতেছে। সে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল যে, এই বংশদণ্ডমধ্যস্থ ক্ষুদ্র জীবটি আমারই। এই মনে করিয়া সে সেই ক্ষুদ্র বালিকাকে লইয়া গৃহে প্রস্থান করিল, এবং তাহার স্ত্রীকে লালন-পালন করিতে দিল।

এই কন্যাপ্রাপ্তির পর হইতেই কাঠুরিয়া প্রত্যহ স্বর্ণাদি প্রাপ্ত হইতে লাগিল; এবং অনতিবিলম্বে এক জন ধনাঢ্য হইয়া উঠিল।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিন মাসের মধ্যে কন্যাটি পূর্ণযৌবনসম্পন্না হইয়া উঠিল। তাহার কেশরাশি গুচ্ছাকারে মস্তকের উপর সজ্জিত * করিয়া দেওয়া হইল। কন্যাটি অনূঢ়া রহিল। তাহার অঙ্গের জ্যোতিতে বাটী সর্ব্বদাই আলোকিত থাকিত; বৃদ্ধের ভবন হইতে বিষাদরেখা অন্তর্হিত হইল। বৃদ্ধ কন্যার নাম রাখিলেন "কস্তুয়া।"

কস্তুয়ার রূপলাবণ্যের কথা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইলে, বিখ্যাত ও ধনাঢ্য যুবকগণ তাহার প্রণয়প্রার্থী হইয়া আসিলেন। বহু দিন অবস্থানের পর কন্যাপক্ষ হইতে কোন কথা না পাওয়ায় ভগ্নমনোরথ হইয়া সকলে ক্রমে ক্রমে প্রস্থান করিলেন। কেবল পাঁচ জন রাজপুত্র দৃঢ়ব্রত হইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছু দিন গত হইলে, ঐ পঞ্চ রাজপুত্র বৃদ্ধকে আহ্বান করিয়া একে একে কন্যার পাণিগ্রহণের প্রার্থনা করিলেন। বৃদ্ধ বলিলেন, কুমারী তাঁহার ঔরসজাতা নহেন, এবং তজ্জন্য তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে কন্যা বাধ্য নহেন। এইরূপে নিরাশ হইয়া সকলে স্ব স্ব ভবনে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু

* পুরাকালে কেশরাশি স্কন্ধের উভয় পার্শ্বে পড়িয়া থাকিত। কন্যা ত্রয়োদশ কিম্বা চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে উপনীত না হইলে সজ্জিত করা হইত না।

কস্তুয়া-রূপ রত্নপ্রাপ্তির আশা তাঁহাদের হৃদয় হইতে এককালে অন্তর্হিত হইল না। বৃদ্ধও রাজকুমারদিগের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে এক দিন কস্তুয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি ঐ পঞ্চ রাজপুত্রের মধ্যে কাহাকেও বিবাহ করিতে ইচ্ছুক কি না? বিবাহ যে সমাজ ও লোকনীতির উন্নতিসাধক, তাহাও বুঝাইয়া দিলেন। কস্তুয়া তদুত্তরে বলিলেন যে, তিনি তাঁহার পিতার বাক্য অবহেলা করিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু যে রাজপুত্রকে তিনি বিবাহ করিবেন, তাঁহার হৃদয় সর্ব্বপ্রথম পরীক্ষা করা আবশ্যক। বৃদ্ধও কন্যার বাক্যে সম্মত হইয়া এক দিন রাজকুমারগণকে স্বীয় ভবনে আহ্বান করিলেন।

রাত্রিসমাগমে রাজপুত্রগণ নানাবিধ নৃত্যগীতে "কস্তুয়াকে" পরিতৃপ্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ ইত্যবসরে তথায় আগমন করিয়া বলিলেন যে, আপনাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত, তিনি আমার কন্যার পাণিগ্রহণে অধিকারী হইবেন। রাজপুত্রগণ তাহাতে সম্মত হইলে, কস্তুয়া বৃদ্ধ কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত হইয়া বলিলেন,

"তেনয়িক্" * রাজ্যে বুদ্ধদেবের প্রস্তরনির্ম্মিত ভিক্ষাপাত্র পাছে। প্রথম রাজপুত্র "ইষিযুকুরি" উহাই আমাকে আনিয়া দিন।

পূর্ব্ব মহাসাগরের উপকূলে "হোরাই" পর্ব্বতশৃঙ্গে, রৌপ্যমূল, স্বর্ণস্কন্ধ ও সুন্দর শ্বেত ফলে সুশোভিত বৃক্ষ আছে। ইহারই একটি শাখা দ্বিতীয় রাজপুত্র "কুরামোচি" আমাকে আনিয়া দিন।

"মোরোকেরি" দেশে এক প্রকার অগ্নিশৌচ মূষিকের লোমে পরিচ্ছদ প্রস্তুত হয়। তৃতীয় রাজপুত্র "দৈনাগোঁ" উহাই আমাকে আনিয়া দিন।

পক্ষবিশিষ্ট নাগবিশেষের মস্তকে এক প্রকার ইন্দ্রধনুলাঞ্ছিত মণি প্রাপ্ত হওয়া যায়। চতুর্থ রাজকুমার "চিউনাগোঁ" উহাই আমাকে আনিয়া দিন।

বিস্তৃত সমুদ্রকূল হইতে তালচঞ্চু পক্ষী কখনও কখনও এই দেশে মুক্তা লইয়া আসে;—পঞ্চম রাজপুত্র "ইষাধিপ" উহাই আমাকে আনিয়া দিন।

প্রথম রাজপুত্রের কথা।

প্রথম রাজপুত্র মনে মনে চিন্তা করিলেন, সামান্য ভিক্ষুকের ভিক্ষাপাত্রের নিমিত্ত দশ সহস্র ক্রোশ ভ্রমণ করা অবিবেচকের কর্ম্ম। বিশেষ এইরূপ কষ্টস্বীকার করিলেও, তাহা পাইব কি না, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। এই

* উত্তর ভারতবর্ষের নামান্তরমাত্র। চীনদেশীয় বৌদ্ধগণ "সিন্ধু" রাজ্যকে ঐ নামে অভিহিত করে।

চিন্তা করিয়া তিনি সাধারণ্যে প্রকাশ করিলেন যে, তিনি "তেনযিকু" যাত্রা করিলেন; কিন্তু "যামাতো" দেশে তিন বৎসর লুক্কায়িত ভাবে বাস করিতে লাগিলেন। পরে "তোকির" পার্ব্বত্য মঠে বিনজুরু মন্দিরে বহু দিনের পুরাতন মসীবর্ণ এক ভিক্ষাপাত্র প্রাপ্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ঐ পাত্র বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত বসনে আচ্ছাদিত করিয়া কস্তুয়ার নিকট প্রেরণ করিলেন। কস্তুয়া দেখিলেন, পাত্র হইতে বিন্দুমাত্র আলোক বিকীর্ণ হইতেছে না, এবং তজ্জন্য কৃত্রিম বিবেচনা করিয়া পাত্রটি প্রত্যর্পণ করিলেন।

দ্বিতীয় রাজপুত্রের কথা।

দ্বিতীয় রাজপুত্র চতুর। তিনি জনসমাজে প্রকাশ করিলেন যে, সুকুষি দেশে স্নান করিতে গমন করিতেছেন। কতিপয় বিশেষ বন্ধুর সহিত তিনি ননিওয়া যাত্রা করিলেন। তথায় তিন দিন মাত্র বাস করিয়া পুনরায় গোপনে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তথায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ কারিকরের দ্বারা কস্তুয়া-বর্ণিত বৃক্ষের শাখাসদৃশ একটি মণিমুক্তাময় শাখা নির্ম্মাণ করাইয়া পুনরায় ননিওয়ায় প্রতিগমন করিলেন। তথায় তাঁহার বন্ধুবর্গ ও অমাত্যগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং স্বীয় রাজভবনে গমন না করিয়া প্রথমেই বৃদ্ধের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। কস্তুয়ার নিকট উক্ত বৃক্ষশাখা আনীত হইলে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। বৃদ্ধ মণিমুক্তাদিখচিত বৃক্ষশাখাটি অকৃত্রিম স্থির করিয়া কন্যাকে অশেষ প্রকারে বুঝাইলেন, এবং অঙ্গীকার পালন করিতে অনুরোধ করিলেন। কস্তুয়া এই সকল কথা শুনিয়া মৌনবতী রহিলেন, এবং পুনরায় জিজ্ঞাসিত হইলে বলিলেন, "আমি জানিতাম ইহা দুষ্প্রাপ্য।" এ দিকে রাজপুত্রও কস্তুয়া-লাভবিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া কি প্রকারে নির্ভীকচিত্তে দুস্তর সমুদ্রে ভাসমান হইয়াছিলেন, কি প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন দেশ, ভিন্ন ভিন্ন বিপদসঙ্কুল স্থান অতিক্রম করিয়া অবশেষে ঈশ্বরকৃপায় "হোরাই" পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিরূপে স্বর্গীয় দূতীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, কিরূপে ঐ পর্ব্বতপার্শ্বে ভ্রমণ করিতে করিতে নানা বর্ণে প্রবহমানা গিরিনদী দর্শন করিয়াছিলেন, এবং কিরূপে তদুপরিস্থিত মণিমাণিক্যাদিখচিত সেতুর পার্শ্বে অভিলষিত বৃক্ষ দর্শন করিয়া একটি শাখা ভগ্ন করিয়াছিলেন, সানন্দে তাহার সবিস্তার বর্ণনা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে দুর্ভাগ্যবশতঃ ছয় জন লোক গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া বলিয়া উঠিল যে, তাহারা সহস্র দিবস ধরিয়া ঐ শাখাটি মণিমাণিক্য দিয়া

সজ্জিত করিয়াছে, কিন্তু অদ্যাবধি কোন পুরস্কার পায় নাই। বৃদ্ধ ও রাজপুত্র তাহাদের কথা শুনিয়া মলিন হইয়া গেলেন। কস্তুয়া এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন, এবং বৃক্ষশাখাটি রাজকুমারকে পুনরায় প্রত্যর্পণ করিলেন। অতঃপর রাজপুত্র দুঃখে ও লজ্জায় রাজ্যত্যাগ করিয়া গভীর অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন। তদবধি তাঁহার বন্ধু ও অমাত্যবর্গ কেহই তাঁহার সন্ধান পান নাই।

তৃতীয় রাজপুত্রের কথা।

তৃতীয় রাজপুত্র অত্যন্ত ধনবান ছিলেন। এই সময়ে মোরাকোষি রাজ্য হইতে কোন বণিক এই রাজ্যে আসিয়াছিল। তৃতীয় রাজপুত্র "সদাইথিন" তাঁহাকে মোরোকোষি হইতে মূষিকলোমনির্ম্মিত অগ্নিশৌচ পরিচ্ছদ আনয়ন করিতে আদেশ দেন। বণিক স্বীকৃত হইলে স্বর্ণাদি দিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন। মোরোকোষি রাজ্য হইতে ঐ জাহাজ প্রত্যাগত হইলে সদাইথিন সংবাদ পাইয়া লোক প্রেরণ করিলেন, এবং উপযুক্ত মূল্যে ঐ পরিচ্ছদ ক্রয় করিলেন, এবং পরিচ্ছদটি দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদসহকারে বৃদ্ধের ভবনে লইয়া আসিলেন। পরিচ্ছদটি কস্তুয়ার নিকট অর্পিত হইল; কস্তুয়া পরিচ্ছদের অকৃত্রিমতা পরীক্ষার নিমিত্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে চাহিলেন। রাজপুত্র সম্মত হইলে উহা অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইল, কিন্তু এককালে ভস্মীভূত হইয়া গেল। তখন সদাইথিন হতাশ্বাস হইয়া গৃহে প্রতিগমন করিলেন। তিনি লজ্জায় আর কখনও স্বীয় ভবন হইতে বহির্গত হন নাই।

চতুর্থ রাজপুত্রের কথা।

চতুর্থ রাজকুমার এক দিন সমস্ত অনুচরবর্গকে আহ্বান করিয়া পক্ষবিশিষ্ট নাগবিশেষের মস্তকের মণি আনয়ন করিবার আদেশ দিলেন। অনুচরবর্গ রাজার এইরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব আদেশ শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন, এবং অশেষ প্রকারে তাঁহাকে বুঝাইলেন। রাজকুমার তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া পাথেয়স্বরূপ প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়া অনুচরগণকে নাগমণির অন্বেষণে প্রেরণ করিলেন।

অনুচরবর্গ রাজার এইরূপ আদেশে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া লব্ধ ধন আপনারা বিভাগ করিয়া লইল, এবং রাজাকে পুনঃপুনঃ ভর্ৎসনা করিতে করিতে যথেচ্ছ গমন করিল।

এদিকে রাজপুত্র স্বীয় রাজভবন কস্তুয়ার অযোগ্য বিবেচনা করিয়া ইচ্ছানু-

রূপ সজ্জিত করিতে লাগিলেন, এবং বাটী হইতে অন্যান্য রমণীগণকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। ক্রমে এক বৎসর অতীতপ্রায় হইল, অথচ তাঁহার অনুচরবর্গের কোন সংবাদ না পাইয়া রাজা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া স্বয়ং মনিওয়া যাত্রা করিলেন। তথায় তাহাদের কোন সংবাদ না পাইয়া স্বয়ং মণি আনিবার আশায় যাত্রা করিলেন। অর্ণবপোত কূল হইতে বহুদূর গমন করিলে দৈববশতঃ এক দিন অত্যন্ত প্রবল বেগে বায়ু বহিতে লাগিল, চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, এবং ভীষণশব্দে বজ্রধ্বনি হইতে লাগিল। কর্ণধার ও রাজকুমার উভয়ে অত্যন্ত ভীত হইলেন। প্রবল বাত্যায় অর্ণবপোত ক্রমশঃ কোন অপরিচিত হিংস্রজন্তুপরিপূর্ণ স্থানে নীত হইবে, এই আশঙ্কায় উভয়েই অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। সমুদ্ররাজ নাগই ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, এই মনে করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। হঠাৎ প্রবল ঝঞ্ঝা প্রশমিত হইল, এবং অনুকূল বায়ুবশে অর্ণবপোত ক্রমশঃ স্বদেশাভিমুখে ধাবিত হইল। চতুর্থ দিবসে তাঁহারা হারিমা মিত্ররাজ্যে উপনীত হইলেন। তথাকার রাজা অতি কষ্টে দেইমাগোঁকে পোত হইতে তুলিয়া আনিলেন। দেইমাগোঁ অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট হইয়া গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, এবং কস্তুয়ার কথা এককালে বিস্মৃত হইয়া গেলেন।

পঞ্চম রাজকুমারের কথা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকরবোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

কস্তুয়ার রূপলাবণ্যের কথা তথাকার রাজপ্রাসাদে প্রচারিত হইল। রাজা অত্যন্ত কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া অতঃপুরস্থ এক রমণীকে তথায় প্রেরণ করিলেন। কিন্তু সে কস্তুয়ার দর্শন না পাইয়া ফিরিয়া আসিল। তৎপরে অধিরাজ বৃদ্ধকে আহ্বান করিয়া নানা প্রলোভনে তাহাকে তুষ্ট করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কস্তুয়াকে দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে এক দিন মৃগয়াচ্ছলে যাত্রা করিয়া তিনি বৃদ্ধের ভবনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, গৃহটি স্বর্গীয় জ্যোতিতে পূর্ণ রহিয়াছে। কস্তুয়াকে দেখিতে পাইয়া রাজা তাঁহাকে স্পর্শ করিবার চেষ্টা করাতে কস্তুয়া হঠাৎ অন্তর্হিত হইলেন, কিন্তু রাজার কাতরোক্তিতে পুনরায় দেহ ধারণ করিলেন। কস্তুয়া রাজার প্রণয়িনী হইতে অস্বীকার করিলে, রাজা বিফলমনোরথ হইয়া প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন।

এইরূপে তিন বৎসর অতিক্রান্ত হইল। কস্তুয়া সহসা এক দিন চন্দ্র দর্শন করিয়া মলিন হইয়া উঠিলেন। সেই দিবস হইতে প্রত্যহ চন্দ্র দর্শন করিয়া তিনি অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সপ্তম মাস গত হইলে কস্তুয়া এতই দুর্ব্বল ও মলিন হইলেন যে, বৃদ্ধ ও তাঁহার পরিচারিকাগণ ক্রমশঃ ভীত হইতে

লাগিলেন। অষ্টম মাসের সমাগমে যখন চন্দ্র ষোল কলায় পূর্ণ হইলেন, কস্তুয়া তখন অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিলেন। পিতা বারম্বার কারণ জিজ্ঞাসিলে তিনি বলিলেন যে, বার বার চেষ্টা করিয়াও আমি দুঃখের কারণ বলিতে পারি নাই। চন্দ্ররাজ্যে আমার বাস। অভিশপ্ত হইয়া এতকাল আমি এ গৃহে বাস করিতেছি। এক্ষণে আমার সময় আগতপ্রায়। আগামী পূর্ণিমায় চন্দ্রলোক হইতে কতিপয় দূত আসিয়া আমাকে লইয়া যাইবে।

রাজা এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া কস্তুয়াকে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে সহস্র যোদ্ধা প্রেরণ করিলেন। সৈন্যগণকে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করা হইল, এবং বৃদ্ধ স্বয়ং কস্তুয়ার গৃহদ্বারে প্রহরীর কার্য্য করিতে লাগিলেন।

রাত্রি বিগত হইলে স্বর্গীয় বিভায় গৃহ আলোকিত হইল, এবং মেঘারোহণে কতিপয় দেবদূত স্বর্গ হইতে অবতরণ করিতে লাগিল। সৈন্যগণ ভয়ে স্তম্ভিত হইল; কাহারও শরত্যাগে সামর্থ্য রহিল না।

প্রধান স্বর্গীয় দূত কস্তুয়াকে আহ্বান করিবামাত্র সহসা গৃহদ্বার আপনি উন্মুক্ত হইল, এবং কস্তুয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি বৃদ্ধকে নানা প্রকারে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ কিছুতেই মস্তক উত্তোলন করিলেন না। তৎপরে রাজাকে একখানি পত্র লিখিয়া এবং স্বর্গীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, কস্তুয়া বিমানারোহণে অমরধামে যাত্রা করিলেন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস।

কবিতাকুঞ্জ।

শিশু। *

[স্বর্গীয়া প্রমীলানাগ রচিত।]

হৃদয়ে পাষাণরাশি সরাইয়া সুকোমল করে,
কে তুই নির্ঝরধারা ঢেলে দিলি হৃদয় উপরে;
অন্ধকার জীবনের সরাইয়া গাঢ় তমোরাশি,
উষার আলোক প্রাণে কে তুইরে জাগাইলি আসি?

চারু দুটি স্নেহকরে জড়াইয়া স্নেহহীন প্রাণ,
কে তুই বিশ্বের প্রাণে খুলে দিলি এ নিরুদ্ধ প্রাণ?
চাহিনি সংসারপানে, নিদারুণ বিতৃষ্ণা তাহায়,
তুই আধ "মা মা" ব'লে সংসারেতে বাঁধিলি আমায়!
কি দিয়ে, কি হাসি দিয়ে হাসালি এ বিশুষ্ক জীবন,

কি বলে বাঁধিলি তুই এ আমার উদাসীন মন?
ওই ক্ষুদ্র মুখে তোর স্বরগের চারু ছবিখানি,
প্রশস্ত ললাট ওই দেখাইছে প্রতিভার খনি,
সুন্দর চাহনি চারু, চারুমুখে সোহাগের হাসি,
নবনীত কচি তনু, কেবলিরে কেন ভালবাসি?
কবে কোন দিন কোথা দুখময় হতাশ জীবনে
ফুটিলি নক্ষত্র তুই হৃদয়ের আঁধার গগনে!

বঙ্গের কবিতা।

১

আর তোর সাজে না মা! ধূলায় শয়ন;—
হৃদয়ে প্রতিভা লীন,
আঁখি দু'টি জ্যোতিহীন,
মলিন বসন হায়! বিষণ্ণ আনন;—
আর তোর সাজে না মা! ধূলায় শয়ন।

২

শুভক্ষণে বিদ্যাপতি জন্ম দিলা তোরে;
বক্ষেতে লইয়া তুলি,
সুমধুর ব্রজবুলি
আধ-ভাষে শুনাইলা শৈশব-শ্রবণে,—
অক্ষয় অমিয়-বীণা থুইলা চরণে।

৩

গাইল বৈষ্ণব কবি সঙ্গীতে নিপুণ;
সাধক ভারত পরে
(নামে যা'র সুধা ঝরে)
রাম-প্রসাদের টীকা দিয়া তোর ভালে
বেঁধে দিলা পা-দু'খানি নূপুরের তালে।

৪

শত কবি শত সাজে তোরে সাজাইল।
স্বর্গ হ'তে অবশেষে
মধুমাসে মধু এসে
গাঁথিয়া নূতন মালা মথিয়া বিমান
সঞ্জীবনী সুধা তোরে করাইল পান।

৫

তাহারি পশ্চাতে নব বিদ্যুতের প্রায়
ঔদাস্য-তামসী নাশি,
দীপ্ত হেমচন্দ্র আসি'
গলে তোর হেমহার করিল অর্পণ,
মাতাইল তীব্র বহ্নি করি' বরিষণ।

৬

নবীন নবীন পরে করিল প্রবেশ,—
উল্লাসে অধীর হ'য়ে
নবীন ভূষণ ল'য়ে
ললিত বিভঙ্গে তোরে রঙ্গে সাজাইল,
হর্ষের তরঙ্গ প্রাণে প্রাণে নাচাইল।

৭

উদিল নূতন যুগ কবিত্ব-জগতে;—
বিহ্বল বিহারী কবি
আঁকিল নূতন ছবি,
মধুর মঙ্গল-গান করিয়া সৃজন,—
দেখাইল সারদার সৌন্দর্য্য কেমন।

৮

আজি পুনঃ নব রবি প্রভাত-গগনে!
একবার দেখ চেয়ে
আনন্দে দিগন্ত ছেয়ে
ছুটিছে অনন্তে কত সঙ্গীত মহান,
ভাসায়ে নাচায়ে বঙ্গ-নরনারী-প্রাণ!

৯

আর তোর সাজে না মা! ধূলায় শয়ন;—
এবার ঘুচাব লাজ,
হের মা! পেতেছি আজ,
সপ্ত কোটি বুকে তোর স্বর্ণ-সিংহাসন;—
আর তোর সাজে না মা! ধূলায় শয়ন।

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

লও গো বিদায়।

[গান।]

ওহে হৃদি-মন্দির-বাসী!
আজি লও গো বিদায়;
যদি দীর্ঘ সহবাসে, চঞ্চল হৃদি পাশে,
মম প্রেমকুঞ্জসঞ্চিত ফুলমালা ম্লান হয়ে যায়।

তোমার নয়নে তিলেকও যদি হই পুরাতন,
আহা এমন সুধাসিন্ধু যদি কমে যায় একবিন্দু,
তোমার আনন-ইন্দু নিতি দরশে, নিতি পরশে।
আজি লও গো বিদায়।

আমি তিক্ত বিরহ করিব গান আকুল মিলন তিয়াষে;
যদি সুখ-পীযূষ করি পান হয় সুখ-পিপাসা অবসান,
যদি দেবতারে করি বলিদান মন-মন্দিরে!
আজি লও গো বিদায়।

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন।

নিকটে চেয়োনা আর।

দূরে সে রয়েছে; তারে নিকটে চেয়োনা আর।
মুছে ফেল আঁখি পরে আকুল নয়ন-ধার।
দূরে যে কেবলি শোভা,
মানস-লোচন লোভা,
কাছে এলে শত ত্রুটি চখে পড়ে অনিবার;
দূরে সে রয়েছে; তারে নিকটে চেয়োনা আর।
দূরে যে কেবলি আলো—
সে ত দূরে থাকা ভালো
কাছে এলে মনে হবে, হেথা হোথা অন্ধকার।
দূরে সে রয়েছে; তারে নিকটে চেয়োনা আর!

দূরে সে রয়েছে; তারে নিকটে চেয়োনা আর!
মুছে ফেল আঁখি পরে আকুল নয়ন-ধার।
দূরত্বের ব্যবধান
হয়ে গেলে অবসান
কল্পনা, বাস্তব, দুয়ে হয়ে গেলে একাকার,
শত ত্রুটি, শত দোষ চখে পড়ে বারবার।
দূরের আলোক লাগি
মধুরিমা উঠে জাগি
কল্পনার স্বর্ণ বর্ণে উজলিত চারি ধার।
নিকটে রবে না তাহা; মুছ তবে আঁখি-ধার।

দূরে সে রয়েছে; তারে নিকটে চেয়োনা আর!
মুছে ফেল আঁখি পরে আকুল নয়ন-ধার।
কল্পনা আলোক দিয়া,
উজলিয়া থাক হিয়া,
বিরহ বেদনা নহে, বিরহ সুখের সার;
বিরহে হৃদয় ভরা, মধুর স্মৃতিতে তার।
বিরহের ব্যবধানে,
প্রণয় ফুটুক প্রাণে,
মাধুরী উঠুক জাগি, বিরহের পরপার।
দূরে সে রয়েছে; তারে নিকটে চেয়োনা আর।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

এ প্রেমের।

সখি, এ প্রেমের নাহি অন্ত নাহি কূল,
বোঝাবার নয় সখি, দেখাবার নয়!
কে জানে একই বৃন্তে কেন দুটি ফুল,
ফুটিয়া উঠিয়া একি সঙ্গে বাঁধা রয়!
সখি, এ প্রেমের নাহি "কেন" বা "কেমনে,"
জানি শুধু তুমি বই নাহি গো ভুবনে!
আমার এ বিশ্ব বাঁধা ঐ দুটি চরণে,
তুমি ছাড়া আর কিছু নাহি গো স্মরণে!
নীরদ সলিলে ভাসে, বায়ু হাহা করে,
তারি সাথে শুধু দুটি আঁখি মনে পড়ে!
এ নহে গো স্বপ্ন শুধু নিমেষের ভুল,
এ যে মর্ম্মে বিজড়িত অন্তরাত্মাময়!
সখি, এ প্রেমের নাহি অন্ত নাহি কূল,
বোঝাবার নয় সখি, দেখাবার নয়!

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হিমালয়।

কত যুগ গেছে চলে কত মন্বন্তর।
জগতের কাহারেও ভ্রূক্ষেপ না করি,
এমনি নীরবে আছ কত কাল ধরি
শুভ্রশির অদ্রিরাজ হে হিমাচল!
দেখিলে মহান ওই প্রশান্ত মূরতি
দূর হয় একেবারে মানবের দম্ভ,
স্ফীত অহঙ্কার যত; ধরণীর মাঝে
তোমার উন্নত শির সর্ব্বোচ্চ বিরাজে;
দাঁড়াইলে তব কোলে বিশ্বের আরতি-
ধ্বনি শুনিবারে পায় মানব-অন্তর;
সৃষ্টির প্রথম আদিযুগ হ'তে তুমি,
যোগী ঋষি দেবতার সেই পুণ্যভূমি,
ইন্দ্র-বজ্র বক্ষে সহি বিরাট অটল
ধরে আছ ধরণীরে এক চির-স্তম্ভ।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মীরার প্রার্থনা।

১

রাজ্য ভোগ সুখ ধন পরিজন
ঘুচায়ে সকল জঞ্জাল,
আইনু যুগল শীতল চরণে,
হে বন্ধু আমার নন্দদুলাল!

২

রতন-হার আমি ফেলেছি দূরে,
গেঁথেছি বন-ফুল-মাল;
ভূষা করি দিব বাসনা মনে,
হে বন্ধু আমার নন্দদুলাল!

৩

ক্ষম মহারাজ, দাসীরে তোমার,
মিনতি করযোড় করি,
চারিদিকে আমি না হেরি কিছু
বিনে সে আমার বনোয়ারী!

৪

গগনে শশী শোভে, চৌদিকে তার
বেড়িয়া নক্ষত্র মাল,
আরতি করে তব, চন্দ্রমা তারা
হে বন্ধু আমার নন্দদুলাল!

৫

কুসুমে মনোলোভা শোভা হে নাথ,
সরসে বিকাশে উতপল,
হৃদয়-সরসী-মাঝে সাজিছে—
হে বন্ধু তোমার পদ-কমল।

৬

প্রফুল্ল বনরাজি, শীতল ছায়া,
বহে গন্ধবহ মন্দ,
শীতল সুখদ মধুর গন্ধ হে,
তোমার চরণ-মকরন্দ।

৭

নীল-নীরা ভানু-কুমারী যমুনা,
বহিছে কল কল স্বনে,
তটচুম্বনছলে সোহাগে মিলেছে,
হে বন্ধু, তোমার দুটি চরণে।

৮

ছত্র ধরে তরু তমাল তোমার,
হে রাজ-রাজেশ্বর, হৃদয়েশ্বর!
ফল-ভার লয়ে' নমিত তরু—
বলে হে, "উপহার ধরহে ধর।"

৯

কদম্ব উঠে ফুটি যমুনাতটে হে,
পুলকে রোমাঞ্চিত অঙ্গ,
শ্রীকর পরশি করিবে চয়ন
পাবে বলে তোমার সঙ্গ।

১০

গন্ধবহ মন্দ বীজন করে
কুসুম সুগন্ধি চামর,
ভ্রমর গুণ গুণ গাহিছে গুণ,
হে বন্ধু, আমার নন্দকিশোর!

১১

রূপ তব গগন ভুবন ভরা,
দিলে হে মোর দুটি আঁখি,
নয়ন-ভরা রূপে ভরে না প্রাণ হে,
বাসনা হৃদয় ভরে দেখি।

১২

মীরা যমুনা-জলে যাবে মিশে,
ধুইবে চরণ দু'খানি,
মীরা পবন সনে মিশিয়া যাবে
দিবে হে সুগন্ধ উপহার আনি।

১৩

মীরা বকুল হয়ে ফুটিবে বিটপে
কেশপাশে দিবে শোভা,
মীরা ধূলি হয়ে রবে চরণতলে হে—
হে বন্ধু আমার মনোলোভা!

শ্রীসরলাবালা সরকার।

বৈজ্ঞানিক সার-সংগ্রহ।

নূতন বায়বশক্তি।

বায়ুর শক্তি চিরপ্রসিদ্ধ। মনুষ্যজাতি আদিম অসভ্য অবস্থা হইতেই এই শক্তির সহিত বিশেষ পরিচিত। বাষ্পীয় যন্ত্র আবিষ্কারের পূর্ব্বে প্রধানতঃ একমাত্র বায়ব শক্তি দ্বারা জাহাজ ও নৌকাদি চালিত হইত; আজ কাল যন্ত্র-বিজ্ঞানের অসামান্য উন্নতি সত্ত্বেও, সমুদ্রযানাদির পরিচালনে বায়বশক্তির উপযোগিতার হ্রাস হয় নাই। বরং আধুনিক উন্নত বিজ্ঞানের সাহায্যে উক্ত শক্তি জলযানাদির পরিচালনে যথাযথরূপে প্রযুক্ত হইতেছে। অল্প

দিন হইল, ট্রিপ্লার নামক জনৈক মার্কিন বিজ্ঞানবিদ্ বায়ুর এক নূতন শক্তির আবিষ্কার
করিয়াছেন ;—এই শক্তি দ্বারা যানাদি চালাইবার ব্যবস্থা হইলে, আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞানে
এক মহা বিপ্লব উপস্থিত হইবে।

কয়েক বৎসর হইল, আমেরিকার এক বৃহৎ হোটেল হঠাৎ অগ্নিসাৎ হয়। এই অগ্নি-
কাণ্ডে উত্তপ্ত রুদ্ধ বায়ুর কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া, ট্রিপ্লার সাহেব বায়ুর নূতন শক্তির আবি-
ষ্কারে নিযুক্ত হন। গত দশ বৎসর নানাবিধ অনুসন্ধান করিয়া, সম্প্রতি তিনি কৃতকার্য্য
হইয়াছেন। জলীয়-বাষ্পের পরিবর্ত্তে উত্তপ্ত বায়ু দ্বারা যন্ত্রাদিপরিচালন সম্ভবপর কি না,—
এই বিষয় লইয়া ট্রিপ্লার প্রথমতঃ অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। কিন্তু এই প্রকার বায়ু দ্বারা
যন্ত্রপরিচালনের কোন সুবিধা না দেখিয়া, অন্য কোন প্রকারে বায়ুর শক্তি যন্ত্রাদিতে প্রয়োগ
করিবার উপায়-উদ্ভাবনে চেষ্টিত হন। পাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় অবগত আছেন,—যে
সকল পদার্থ স্বাভাবিক অবস্থায় বাষ্পাকারে থাকে, তাহাতে উপযুক্ত চাপ দিলে, এবং সঙ্গে
সঙ্গে সেগুলিকে শীতল করিলে, প্রায় অধিকাংশ বাষ্পীয় পদার্থ, তরলাকারে পরিণত করা
যায়। যে সকল পদার্থের তরলাবস্থা প্রাচীন রসায়নবিদ্গণ কল্পনাও করেন নাই, উন্নত
যন্ত্রসাহায্যে পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ায় সেই প্রকার অনেক বাষ্প তরলাবস্থায় নীত হইয়াছে ; অল্প
দিন হইল, কয়েকটি রসায়নবিদ্ বায়ু ও অঙ্গারক বাষ্পের তরলতা সম্পাদন করিয়াছেন।
ট্রিপ্লার উক্ত তরলীভূত বায়ুর শক্তি দ্বারা যন্ত্রাদি চালাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তরল
করিতে হইলে বায়ু অত্যন্ত শীতল করা আবশ্যক ; গলিত বরফ অপেক্ষাও ৪৫০ অংশ পরি-
মাণে শীতল করিলে, বায়ু তরল হইতে আরম্ভ হয়, এবং অতি অল্প তাপ দিলেই, ইহা
সহসা প্রসারিত হইয়া সাধারণ বায়ুর আকার প্রাপ্ত হয়।—ট্রিপ্লার বলেন, তরল বায়ু
সহসা বাষ্পাকারে পরিণত হইবার সময় যে শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহা অনায়াসে যন্ত্রাদিপরি-
চালনে নিযুক্ত হইতে পারে। এই কথা প্রচারিত হইলে, প্রথমতঃ য়ুরোপ ও আমেরিকার
বিজ্ঞানবিদ্গণ সিদ্ধান্ত করেন, ট্রিপ্লারের অনুমান কিছুতেই কার্য্যে পরিণত হইতে পারে
না ; এবং অত্যল্প পরিমাণে তরল বায়ু প্রস্তুত করিতে গেলে যে পরিমাণ শ্রম ও অর্থব্যয়
আবশ্যক, তাহা হিসাব করিয়া, এই নবাবিষ্কৃত বায়বশক্তি যে কোন ক্রমেই আধুনিক যন্ত্রা-
দিতে বাষ্পশক্তির স্থান অধিকার করিতে পারে না, তাহা স্পষ্ট প্রতিপাদন করিয়াছিলেন।

প্রবীণ বৈজ্ঞানিকগণের এই নিরুৎসাহে ট্রিপলার অণুমাত্র ভগ্নোদ্যম বা বিচলিত হন
নাই। স্বল্পব্যয়ে তরল বায়ু প্রস্তুতের এক উপায় উদ্ভাবনের জন্য ইনি বরং দ্বিগুণ উৎসাহ-
সহকারে পরীক্ষা আরম্ভ করেন ; এবং অল্প দিন হইল, প্রচুর তরল বায়ু উৎপাদনকারী
একটি যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া, প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিতগণকে বিস্মিত করিয়াছেন। আধুনিক বাষ্পীয়
যন্ত্রাদিতে বাষ্পের অতিশয় অপচয় হইয়া থাকে ; অনেক সময়েই ব্যবহৃত বাষ্প দ্বারা পুনরায়
যন্ত্রপরিচালনের বিশেষ কোনও সহায়তা হয় না,—বাষ্পোৎপাদক জল উত্তপ্ত ও অগ্নি
উদ্দীপন করাইয়া, ব্যবহৃত বাষ্প প্রায়ই পরিত্যক্ত হইয়া থাকে ; বাষ্পীয়যানাদির যন্ত্রে এই
সামান্য সুবিধাটিও পাওয়া যায় না। ট্রিপ্লার বলেন, তাঁহার কল্পিত যন্ত্রে প্রযুক্ত শক্তির
অণুমাত্রও অপব্যবহার হইবার সম্ভাবনা নাই। কোন তরলপদার্থ বাষ্পীভূত হইবার ইহা
সন্নিহিত পদার্থ হইতে তাপ গ্রহণ করিয়া সেগুলিকে শীতল করিয়া তোলে, কিন্তু ইহা
দ্বারা বাষ্পের তাপবৃদ্ধি হয় না, কেবল তরল পদার্থটিকে অবস্থান্তরিত করিতেই উক্ত তাপ
ব্যয়িত হইয়া থাকে।—তরল বা কঠিন পদার্থমাত্রেরই এইটি সাধারণ ধর্ম্ম। জল কিয়ৎকাল
বায়ুতে উন্মুক্ত রাখিলে বাষ্পীভূত হইয়া যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে সন্নিহিত পদার্থ হইতে তাপ
সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে শীতল করে,—এই জন্য শরীরের কোন স্থান জলসিক্ত করিয়া

বায়ুতে উন্মুক্ত রাখিলে, শীতল বলিয়া বোধ হয়। ট্রিপ্লারের যন্ত্রে তরল বায়ু বাষ্পীভূত
হইবার সময় উল্লিখিত কারণে সন্নিহিত বায়ু হইতে এত অধিক তাপ সংগৃহীত হয় যে,
পার্শ্বস্থ বায়ু স্বতঃই তরল হইয়া যন্ত্রপরিচালনে পুনঃপ্রয়োগের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়া উঠে।
এই সকল দেখিয়া সাহেব আশা করিতেছেন যে, বাষ্পীয় যন্ত্রে যে প্রকার অবিচ্ছিন্নভাবে
বাষ্প প্রয়োগ করিতে হয়, এই নবোদ্ভাবিত যন্ত্রে তরলবায়ুপ্রয়োগের সেরূপ কোন ব্যবস্থা
করিতে হইবে না। এই যন্ত্রের প্রচলনের জন্য, ট্রিপ্লার ইতিমধ্যেই এক কারখানা স্থাপন
করিয়াছেন ;—প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিতগণ কিন্তু আজও ইহার সফলতাসম্বন্ধে সন্দিহান রহিয়াছেন।

উল্কাপিণ্ড।

মেঘহীন পরিষ্কার রাত্রে প্রায়ই উল্কাপাত দৃষ্ট হয়। যদিও দেখিলে বোধ হয়, উল্কা সকল
অনন্ত-নক্ষত্র-রাশি হইতে পড়িতেছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহারা নক্ষত্র নয়। আকাশের ক্ষীণ-
জ্যোতি ক্ষুদ্র নক্ষত্রগুলি গ্রহরাজ সূর্য্য অপেক্ষাও বৃহত্তর ; কিন্তু উল্কা সকল অতি ক্ষুদ্র জড়-
পিণ্ড মাত্র। বিজ্ঞানবিদ্গণ ভূপৃষ্ঠপতিত অনেক উল্কাপিণ্ড পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন,
ইহার পরিমাণ অনেক সময়েই কয়েক মণের অধিক হয় না ; উল্কাপিণ্ডের গঠনোপাদানে
কোন অজ্ঞাত পদার্থ দৃষ্ট হয় না। অনেক স্থলেই দেখা যায়, এ গুলি নানাপ্রকার পার্থিব
পদার্থে গঠিত। পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহগণ যে প্রকার এক নির্দ্দিষ্ট পথে এবং নির্দ্দিষ্ট গতিতে
সূর্য্য পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, এই উল্কাপিণ্ড সকলও সেই প্রকার সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে অবিশ্রান্ত
ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু ইহারা গ্রহগণের ন্যায় একাকী সূর্য্য পরিভ্রমণ করে না। অসংখ্যক
উল্কাপিণ্ড একত্র হইয়া এক নির্দ্দিষ্ট গতিতে সূর্য্যের চতুর্দিকে উল্কাময় পথ নির্ম্মাণ করিয়া
পরিভ্রমণ করে ; এই প্রকারে সৌরজগতস্থ অসংখ্য উল্কাপিণ্ড নানা দলে বিভক্ত হইয়া,
প্রত্যেকে বিসদৃশ পথ অবলম্বন করিয়া, সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছে। পৃথিবী স্বীয় নির্দ্দিষ্ট পথে
ভ্রমণ করিতে করিতে যখন পূর্ব্ববর্ণিত উল্কাপথ সকল ভিন্ন করিয়া বা তাহার নিকট দিয়া
গমন করে, তখন পার্থিব আকর্ষণবশে নিকটবর্ত্তী উল্কাপিণ্ড সকল পৃথিবীতে পতিত হয়।
সৌরজগতে এত অধিকসংখ্যক উল্কাপথ আছে যে, পৃথিবী নিয়তই কোন এক উল্কাদলের
নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহাদের কতকগুলিকে কুক্ষিগত করিয়া থাকেন। জ্যোতির্ব্বিদগণ গণনা
করিয়া দেখিয়াছেন, প্রতিদিন প্রায় ত্রিশকোটী উল্কাপিণ্ড পৃথিবীতে পতিত হয়, কিন্তু ইহার
অর্দ্ধেকেরও অধিক ক্ষুদ্রতাবশতঃ মানবচক্ষুর গোচর হয় না। উল্কাপিণ্ড সকল যে প্রকার
জ্যোতিষ্মান্ দেখায়, ভূপতিত হইবার পূর্ব্বে তাহারা সেরূপ উজ্জ্বল থাকে না, এবং গ্রহ
উপগ্রহ যেমন প্রতিফলিত সৌরালোকে উজ্জ্বল দেখায়, ইহাদের উজ্জ্বলতা তদ্রূপও নহে।
পৃথিবীর আকর্ষণে অতিবেগে ধরাপৃষ্ঠে পড়িবার পূর্ব্বে আকাশস্থ বায়ুর সংঘর্ষণে ইহারা উত্তপ্ত
হইয়া প্রদীপ্ত হইয়া উঠে ; এই ঘর্ষণজাত তাপ এত অধিক যে, অধিকাংশ স্থলে ক্ষুদ্র
উল্কাপিণ্ড সকল বাষ্পীভূত হইয়া পথিমধ্যে বিলীন হইয়া যায় ; বৃহদায়তন পিণ্ড সকল দগ্ধ
হইতে হইতে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। অনেক সময় পতনশীল উল্কার পথে যে ক্ষীণজ্যোতি
আলোকরেখা দেখা যায়, তাহা জ্বলন্তপিণ্ড-জাত প্রদীপ্ত বাষ্প ব্যতীত আর কিছু নহে।
পণ্ডিতগণ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, উল্কাপিণ্ড সকল আকাশে প্রবিষ্ট হইয়া প্রতি সেকেণ্ডে
১৫ ক্রোশ, এবং কখনও ২৫ ক্রোশ বেগে পৃথিবীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে, এবং
ভূপৃষ্ঠের ৬০ হইতে দশ ক্রোশের মধ্যে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।

পৃথিবীতে প্রতিদিন বা প্রতি ঋতুতে সমপরিমাণ উল্কাপাত হয় না। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ
মাসে পৃথিবী একটি সুবিস্তৃত উল্কাপথ ছিন্ন করিয়া পরিভ্রমণ করেন, এজন্য বৎসরের অন্যান্য

সময় অপেক্ষা ঐ সময়েই অধিক উল্কাপাত দৃষ্ট হয়। আজ কয়েক বৎসর হইল, বঙ্গদেশে যে বিস্ময়জনক উল্কাবৃষ্টি দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বোক্তপথচারী উল্‌কারাশি দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছিল, জ্যোতির্বিদ্‌গণ এইরূপ স্থির করিয়াছেন। এই উল্‌কাপথ প্রায় দশ হাজার ক্রোশ বিস্তৃত। গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে, পৃথিবী সেকেণ্ডে ১৯ মাইল গতিতে চলিয়া যখন উক্ত উল্‌কাপথে উপনীত হয়, তখন উল্‌কারাশি প্রতি মিনিটে প্রায় ১৩৮০ ক্রোশ বেগে আকাশমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইয়া, ধরাপৃষ্ঠে পড়িতে আরম্ভ করে। * পণ্ডিতগণ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, আগামী ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে পূর্ব্বের ন্যায় আবার উল্‌কাবৃষ্টি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

নূতন বার্ত্তাবহ যন্ত্র।

বিজ্ঞান-জগতে রোঁৎগেণের (Rontgen) বিখ্যাত আবিষ্কার ও শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র বসুর অদ্ভুত কীর্ত্তির কথা পুরাতন না হইতেই, তদপেক্ষা বিস্ময়কর আর এক আবিষ্কারের কথা শুনা যাইতেছে। যখন প্রথমে তারযোগে বার্ত্তাবহ যন্ত্রে শতযোজনদূরস্থিত স্থানের সংবাদ মুহূর্ত্তে আসিতে লাগিল, তখন কল্পনাও ভাবিতে পারে নাই যে, অদূর ভবিষ্যতে আর এক অদ্ভুত ও সুলভ উপায়ে বার্ত্তাবহন কার্য্য সাধিত হইবে। ইটালিবাসী মার্কনি নামক এক জন দ্বাবিংশবর্ষীয় ইংরাজ যুবক, তারহীন বার্ত্তাবহযন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়াছেন। জগদ্বিখ্যাত আবিষ্কারমাত্রই প্রায় অকস্মাৎ পরিজ্ঞাত হইতে দেখা যায়; এ সকলের মূলে যে পরম্পরাগত শিক্ষা এবং আবিষ্কর্ত্তার সূক্ষ্ম দর্শন বর্ত্তমান নাই, এ কথা কেহ বলিতে পারেন না; কিন্তু প্রায়ই বৈজ্ঞানিকগণ বিষয়ান্তরের অনুসন্ধানকালে অপরিজ্ঞাত বৈজ্ঞানিক তথ্যের সূত্র পাইয়া, তাহার অবলম্বনে পরিশেষে কোনও মহৎ আবিষ্কার সাধন করিয়া থাকেন; প্রাচীন বিজ্ঞানাচার্য্য নিউটন্ ও আধুনিক বিখ্যাত যন্ত্রবিদ্ এডিসনের অনেক প্রসিদ্ধ আবিষ্কার ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মার্কনির এই বিস্ময়কর আবিষ্কারও সহসা হইয়া পড়ে; তিনি এক দিবস আচার্য্য হার্জের আবিষ্কৃত বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সাহায্যে এক মাইল দূরে এক স্থানে সংবাদ প্রেরণ করিতেছিলেন; এই উভয় স্থানের মধ্যে এক অনতিউচ্চ বিস্তৃত পর্ব্বত ব্যবহিত ছিল, হার্জের আবিষ্কৃত বার্ত্তাবহ যন্ত্রে বৈদ্যুতিক তারের আবশ্যক হয় না বটে, কিন্তু উভয় স্থানের মধ্যে উচ্চভূমি বা পর্ব্বতাদির ন্যায় বিস্তৃত বাধা থাকিলে, তড়িৎ-তরঙ্গ সেই বাধা অতিক্রম করিতে পারে না। এজন্য মার্কনি পর্ব্বতের উপর দিয়া সংবাদপ্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই পরীক্ষাকালে পর্ব্বতের অতি নিম্ন প্রদেশে হার্জ-নির্ম্মিতসংবাদ গ্রহণের একটি যন্ত্র ছিল; মার্কনি সাহেব সংবাদ গ্রহণকালে পর্ব্বতমূলস্থ সেই যন্ত্রটি সহসা প্রেরিত বিদ্যুত-তরঙ্গের সহিত কম্পিত হইতে দেখিয়া, সিদ্ধান্ত করেন, নিশ্চয়ই এটি কোন অপরিজ্ঞাত বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা আন্দোলিত হইতেছে পরে নানাবিধ গবেষণা ও অনুসন্ধানের পর এই নূতন বৈদ্যুতিক তরঙ্গের কার্য্য ও শক্তি সম্বন্ধে নানা তথ্য আবিষ্কার করিয়া, সম্প্রতি তিনি তাহার সাহায্যে এক তন্তহীন বার্ত্তাবহযন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়াছেন।

এই যন্ত্রের কার্য্য অতীব বিস্ময়জনক। ইহাতে সাধারণ বার্ত্তাবহযন্ত্রের ন্যায় তারের আবশ্যক হয় না, এবং যে কোন সংবাদগ্রহণোপযোগী যন্ত্র থাকিলে ইহা দ্বারা মুহূর্ত্তে সংবাদ-প্রেরণ করা যাইতে পারে, যোজনব্যাপী পর্ব্বতমালা বা সুবিশাল মহা সমুদ্র সংবাদ প্রেরণের কোন অন্তরায় হয় না; কেবল দূরত্ব অনুসারে যন্ত্রের শক্তি বর্দ্ধিত করা আবশ্যক। মার্কনি

* ভূকক্ষ ও উল্‌কাপথের ছেদ-বিন্দুর নিকটবর্ত্তী পিণ্ড সকল সূর্য্যের সান্নিধ্যবশতঃ প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ২৭ মাইল বেগে পৃথিবীর অভিমুখে গমন করে।

হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, একবার লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিলে লণ্ডন ও নিউইয়র্ক সহরের মধ্যে সংবাদপ্রেরণের চিরস্থায়ী ব্যবস্থা হইতে পারে। এই নবাবিষ্কার দ্বারা সম্ভবতঃ আধুনিক যুদ্ধপ্রথার বিপ্লব সাধিত হইবে; মার্কনি বলেন, এই যন্ত্রের সাহায্যে শত্রুগণের সমরপোতের বারুদের ভাণ্ডারে অনায়াসে অগ্নিসংযোগ করা যাইতে পারে। বারুদের সহিত অনেক সময় লৌহখণ্ডাদি মিশ্রিত থাকে। এই যন্ত্র দ্বারা বহুদূর হইতে বারুদস্থ ধাতুখণ্ডে ইচ্ছামত বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপন্ন করিতে পারা যায়, এবং বিদ্যুতের তাপে বারুদ প্রজ্জ্বলিত হইয়া শত্রুগণের যুদ্ধ জাহাজ মুহূর্ত্তে ধ্বংস করিতে পারে। মার্কনি সাহেব দেড় মাইল দূরস্থিত এক বারুদস্তূপে এই প্রকারে অগ্নিসংযোগ করিয়াছেন। যাহা হউক, মার্কনির কথা সত্য হইলে, যুদ্ধকার্য্যে বারুদ যে ক্রমে অব্যবহার্য্য ও পরিত্যক্ত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

জমা কামেন্ তুমারী।

শিরোনামে পাঠকের বিভীষিকা-উৎপাদনের ভয়ে প্রথমেই বলা ভাল, বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় বঙ্গের জমিদারী প্রথা। এই জমিদারী প্রথার দোষ গুণ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথাই বলিয়াছেন। আপাততঃ, দেশের ভূমি-সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা বা জমিদার ও প্রজার স্বত্ব ও অধিকার সম্বন্ধে ব্যবহারবিদের বিবাদাস্পদ বিষয়ের আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। এ ক্ষেত্রে দোষগুণের সমালোচনাও আমরা করিব না। মোটের উপর ধরিতে গেলে বিজাতীয় শাসনে বর্ত্তমান জমিদারী প্রথা যে প্রভূত কল্যাণকরী, অর্থনীতির সাধারণ সূত্রজ্ঞেরাও তাহা স্বীকার করিবেন। এই জমীদারী প্রথার উৎপত্তি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনাই বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

জমিদারী প্রথার মূল অন্বেষণে প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মনুসংহিতায় দেখা যায়;—

> গ্রামস্যাধিপতিং কুর্য্যাদ্দশগ্রামপতিং তথা।
> বিংশতীশং শতেশঞ্চ সহস্রপতিমেব চ॥ (মনু। ৭। ১১৫)

“রাজা দেশের সুশাসন জন্য গ্রামাধিপতি প্রভৃতি নিযুক্ত করিবেন।” পরবর্ত্তী শ্লোকে গ্রামে চৌর্য্যাদিনিবারণে অক্ষম হইলে, গ্রামপতি দশাধিপতিকে, দশপতি শতাধিপকে, ইত্যাদি ক্রমে জানাইবেন; অর্থাৎ, রাজকীয় কার্য্যে উচ্চাধিপের আদেশের অপেক্ষা করিবেন, এইরূপ নির্দ্দেশ আছে। পরে ইঁহাদের বৃত্তি সম্বন্ধেও ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রতিদিন প্রজাগণ রাজাকে যে অন্নপানাদি দিবে, তাহা গ্রামাধিপের প্রাপ্য। পদের তারতম্য অনুসারে জীবিকার জন্য ভূমি-

প্রাপ্তিরও বিধান আছে ; দশপতি দুইখানি হলপ্রবাহোপযোগী ভূমি, বিংশতীশ পাঁচখানি, শতপতি একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম ও সহস্রপতি বৃহৎ গ্রাম পাইবেন (মনু ; সপ্তম অধ্যায় ; ১১৮) ইহা হইতে অনুমিত হইবে, ভূসম্পত্তিবিষয়ক সমস্ত ব্যবস্থাই ইঁহাদের হস্তে ন্যস্ত ছিল। মহারাষ্ট্র দেশে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই প্রথাই প্রচলিত ছিল, বলা যাইতে পারে। এক্ষণে মুসলমান অধিকারের অব্যবহিত পূর্ব্বে বাঙ্গলায় এ সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা ছিল, দেখিতে হইবে। প্রিন্সেস প্রমুখ মহোদয়গণের প্রকাশিত সেনবংশীয় ভূপতিগণের তাম্রশাসনপত্রে লিখিত আছে :—"সমুপগতাশেষরাজরাজন্যকরাজ্ঞীরাণকরাজপুত্র রাজামত্য......বিদিত মস্ত (বা—মতমস্ত) ভবতাং" (১) অর্থাৎ, উপস্থিত রাজ রাজন্য রাজ্ঞী...প্রভৃতি আপনারা জ্ঞাত হউন (যে আমি এই ভূমি অমুককে দান করিলাম)। এক্ষণে উক্ত গ্রামপতিগণকে পরবর্ত্তী কালের মণ্ডলের পিতামহস্বরূপ নির্দ্দেশ করিলেও, শতপতি, সহস্রপতি প্রভৃতি হইতে এইরূপ ক্ষুদ্র রাজগণের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা অসঙ্কোচে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কথিত রাজন্যগণের অনেকেই অবশ্য পূর্ব্ববর্ত্তী স্বাধীন রাজগণের বংশধর, কিন্তু ঐ সমস্ত প্রাচীন স্বাধীন রাজগণের আবার এই দেশপতিগণ হইতেই উৎপত্তি। পূর্ব্বকালে সমগ্র ভারতেই এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজা ছিলেন। এই প্রাদেশিক ক্ষুদ্র রাজগণ যখন এক জন পরাক্রান্ত নৃপতি দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়া তাঁহার শাসনাধীনে আসিতেন, তখন তাঁহারা কোথাও বা বিজেতা রাজার করদ হইয়া পড়িতেন, কোথাও বা কেবল অধীনতা স্বীকার করিয়াই নিষ্কৃতি পাইতেন। বিজেতা রাজা চক্রবর্ত্তী বা মণ্ডলেশ্বর নামে পরিচিত হইতেন। বিজিত ক্ষুদ্র রাজগণের উচ্ছেদ হিন্দুধর্ম্ম বা স্বভাবের অনুমোদিত নহে। ইহা সুযুক্তিরও বিরোধী ; সেই জন্যই বিচার ও রাজকর আদায় প্রভৃতি কার্য্য এইরূপ বিজিত ক্ষুদ্র ভূস্বামিগণের হস্তে ছিল। পরবর্ত্তী পাঠান নৃপতিগণও এই শ্রেণীর ভূম্যধিকারিবর্গকে বিতাড়িত করা যুক্তিসঙ্গত বোধ করেন নাই। স্থলবিশেষে আবার ঐরূপ উচ্ছেদ একেবারে অসম্ভব ছিল। জেতা পাঠানগণ দেশীয়গণের তুলনায় সংখ্যায় নগণ্য, সুতরাং নিজ শক্তি অব্যাহত রাখিবার জন্য তাঁহাদিগকে প্রায় সর্ব্বদাই যোদ্ধৃবেশে রাজধানীর সমীপস্থ প্রদেশেই আবদ্ধ থাকিতে হইত। প্রতাপবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই দূরস্থ প্রদেশে বাস বা রীতিমত অধিকারবৃদ্ধির

(১) Journal As. Society—vols vii, LXV.

সুবিধা বহুকাল ঘটিয়া উঠে নাই। সেই জন্য প্রাচীন রাজগণকে আংশিকরূপে শাসনাধীনে আনিয়া তাঁহাদের দ্বারাই রাজস্ব আদান প্রভৃতির সুবিধা হইয়াছিল। সম্পূর্ণ আয়ত্ত ভূভাগে কথঞ্চিৎ কোন হিন্দু ভূম্যধিকারীর নিঃসন্তান পরলোক হইলে সুবিধামত মুসলমান জায়গীরদার প্রবেশ করান হইতেছিল মাত্র। অনেক স্থলে মুসলমান জায়গীরদারের অধীনে হিন্দু জমিদারই বিচারবিতরণ ও রাজস্ব আদায় প্রভৃতি রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। প্রকৃতপক্ষে এ কালে দেশের আভ্যন্তরীণ শাসনে মুসলমান রাজ, বা তাঁহার জায়গীরদার কখনই হস্তক্ষেপ করেন নাই। রাজার প্রাপ্য অংশ সময়ে পৌঁছাইয়া দিলেই হিন্দু ভূস্বামীর নিষ্কৃতি ;—ইহাও সুশৃঙ্খলায় নির্ব্বাহ হইত না ; সে কথা আমরা পরে বলিব।

এই সময়ে বঙ্গে দ্বাদশ ভৌমিকের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিশেষ সম্ভব, প্রাচীন কাল হইতেই রাজা ও প্রজার মধ্যবর্ত্তী ভূস্বামিগণ 'ভৌমিক' নামে অভিহিত হইতেন। ভাষা কথায় ইহাঁদিগকে 'ভুইয়াঁ' বলিত। কিম্বদন্তী এই যে, সমগ্র বঙ্গ এককালে বার ভুঁইয়ার মুলুক বলিয়া পরিচিত ছিল। কেহ কেহ বলেন,—ভাগীরথী ও পদ্মাদির মধ্যবর্ত্তী গঙ্গার ব-দ্বীপ-ভাগেই "দ্বাদশ ভৌমিক" নামে খ্যাত ভূস্বামিগণ বর্ত্তমান ছিলেন। (১) কিন্তু এরূপ অনুমানের বিশেষ কোন কারণ নাই। বৌটন বাউস্ সাহেব বলেন, (২) "আকবরের সময়ে বঙ্গদেশ দ্বাদশ জন ভুঁইয়ার অধীন ছিল ; তন্মধ্যে পাঁচ জন দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিতেন।" ডাঃ ওয়াইজ্ বলেন, (৩) "মুসলমান ইতিহাসের একস্থানের উল্লেখ ও কিম্বদন্তী হইতে জানা যায় যে, এই ভৌমিকগণ অন্যনিরপেক্ষ অর্দ্ধস্বাধীন ভূস্বামী ছিলেন। ইহারা উত্তরাধিকারক্রমে ভূসম্পত্তি ভোগ করিয়া আসিতেন। ইঁহাদের সৈন্য, রণতরী,—কাহারও বা দুর্গাদি ছিল। অনেকাংশে তাঁহারা জায়গীরদার ও চাকলাদারগণের সদৃশ ছিলেন। তাঁহাদের অধীনে চৌধুরীগণ। ওয়াইজ পাঁচ জন ভৌমিকের বিবরণ দিয়াছেন। কেহ কেহ দ্বাদশ ভৌমিকের নামও করিয়াছেন,—কিন্তু সেগুলি সমসাময়িক নহে, সুতরাং তাহাদের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। অনেকে আবার আকবরের পূর্ব্ববর্ত্তী জমিদারপ্রধানগণকেই ভৌমিক বলিয়াছেন। যাহা হউক, এই ভৌমিক বা হিন্দু

(১) Col. wilford. Asiatic Researches vol xiv. p. 451.
(২) Dissertations—Boughton Bouse.
(৩) Journal As. Society, Vol XLIII, pp 197—214.

জমিদারগণ যে মুসলমানদের অধীনে অর্দ্ধস্বাধীন করদমাত্র ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ দেখা যায় না। পক্ষান্তরে, সার জর্জ ক্যাম্বেল্ প্রভৃতি ইংরেজ লেখকগণের মত এই যে, যখন মুসলমানের প্রবল প্রতাপ, সে সময়ে রাজা ও প্রজার মধ্যবর্ত্তী ভূস্বামীর অস্তিত্বই ছিল না। রাজকীয় ক্ষমতার হ্রাসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণের উৎপত্তি—এই তাঁহাদের মত; অরাজক অবস্থায় দিল্লী-শ্বরের প্রতাপ যখন নামে মাত্র বর্ত্তমান ছিল, সেই সময়ে আবার প্রাচীন হিন্দু-প্রথামত সামান্য সামান্য ভূস্বামীর উদয় হয়;—এই সমস্ত রাজগণ ও সামন্তবর্গ হইতে বর্ত্তমান জমিদারের উৎপত্তি। মুসলমান আমলের রাজস্ব-আদায়কারী ক্রোরী প্রভৃতি কর্ম্মচারী হইতে পরবর্ত্তী জমিদারশ্রেণীর উৎপত্তি হইয়াছে, অনেকে এরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (১) এই শ্রেণীর লেখক তার্কিকগণের ভ্রম এই যে, তাঁহারা অন্য দেশের বা ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাগের মুসলমানী বন্দোবস্তের দৃষ্টান্ত বাঙ্গলা সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ প্রয়োগ করিতে চান। বাঙ্গলায় মুসলমান রাজ পূর্ব্বপ্রথারই অনুসরণ করেন, ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহা ভিন্ন গত্যন্তরও ছিল না।

দেশীয় ইতিহাসে সম্রাট্ আলাউদ্দীন ও ফিরোজ শাহার রাজ্যকালে জমি-দারী বন্দোবস্তের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ সময়ে জমিদারগণকে 'চৌধুরী' নামেই পরিচিত দেখিয়া অনুমান হয়, প্রত্যন্ত প্রদেশের রাজগণ তখনও সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। খ্যাতনামা সের শাহ, রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বাঙ্গলার রাজস্ব-বন্দোবস্তে সুশৃঙ্খলাস্থাপনের জন্য প্রতি পরগণায় এক এক জন রাজকীয় আমিন, শীকদার, কারকুণ প্রভৃতি নিযুক্ত করেন। এই সময় হইতেই এ দেশের ভূমি-সম্বন্ধীয় ব্যবস্থায় মুসলমানরাজ সাক্ষাৎসম্বন্ধে হস্তার্পণ করেন, দেখা যায়। যাহাতে চৌধুরী, মণ্ডল বা রাজকীয় আমিন প্রভৃতি প্রজার উপর কোন প্রকার অত্যা-চার করিতে না পারেন, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। রাজপথে বা নিজ নিজ অধিকারমধ্যে চুরী, রাহাজানী প্রভৃতি নিবারণ জন্য এই সময় হইতেই প্রথম জমিদারগণকে মুসলমানরাজের নিকট জবাব্দিহী করিতে হইল। (২) স্বনামখ্যাত আদর্শ নৃপতি আকবর শাহের সময় হইতে বঙ্গের জমিদারী বন্দো-বস্তের বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে এই সময় হইতেই বাঙ্গলায়

(১) Campbels' Cobden Club essay, &c.

(২) Tarikhi Firojshahi and Shershahi in Elliot's History of India.—Vols III. IV.

দিল্লীশ্বরের প্রতাপ বদ্ধমূল হয়; সুতরাং জমিদারগণের সহিত তখন হইতেই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। কানুন্গো ও ক্রোরী প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারীর দ্বারা জমিদারবর্গের একাধিপত্যের সঙ্কোচও এই সময় হইতে আরব্ধ। সুপ্রসিদ্ধ আইন-আকবরীপ্রণেতা মহাত্মা আবুল ফজল লিখিয়াছেন, বঙ্গের জমিদারগণ প্রায়ই কায়স্থ। তাঁহাদের সৈন্যবল দেখিয়া তাঁহাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি সহজেই অনুমিত হয়। (১) এই সময়ের অন্বর্থনামা, বঙ্গজকায়স্থকুলগৌরব, 'যশোর-নগরধাম' মহারাজ প্রতাপাদিত্যের নাম বাঙ্গলায় কে না জানে? এই-রূপ রাজা ও ভৌমিক ভিন্ন, আসাম, ত্রিপুরা, কুচবেহার, বিষ্ণুপুর, পঞ্চকোট প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন রাজগণের বিবরণও পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কেহ বা পরবর্ত্তী মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণ কর্ত্তৃক অর্দ্ধপরাজিত হইয়া আধুনিক করদ বা মিত্ররাজ্যের ন্যায় আংশিকভাবে মোগল-শাসনের অধীন হন; কেহ বা এতই বলশালী ছিলেন যে, তাঁহারা কখনই সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। কোথাও বা বহিঃশত্রুর আগমন হইতে প্রত্যন্ত দেশ রক্ষার জন্য ইঁহাদের এই স্বাধীনতায় বাধা দেওয়া মুসলমানরাজ উচিত বোধ করেন নাই। আভ্য-ন্তরীণ কোন কোন রাজাও স্বীয় বাহুবলে সময়ে সময়ে স্বাধীন ব্যবহার আরম্ভ করিতেন। এইরূপ অর্দ্ধস্বাধীন রাজবর্গের স্বকীয় দরবার ছিল, সৈন্যবল বা সৈন্যসংগ্রহ করিবার ক্ষমতাও প্রচুর ছিল। রাজ্যমধ্যে প্রজাবর্গের বিবাদ বিসম্বাদের বিচার, ইঁহারা স্বয়ং, বা নিয়োজিত কর্ম্মচারী দ্বারা, নির্ব্বাহ করি-তেন। এবং হিন্দুস্বভাবসুলভ ব্যবহার অনুসারে, এই সমস্ত অধিকারই তাঁহারা উত্তরাধিকারক্রমে ভোগ করিয়া আসিতেন। এ পর্য্যন্ত যাহা দেখা গেল, তাহাতে সহজেই অনুমিত হইবে যে, উল্লিখিত বঙ্গীয় জমিদারবর্গের মধ্যে শ্রেণী-বিভাগ করা বড় সহজ নহে। ইঁহাদের মধ্যে নানা শ্রেণীর ক্রমবিভাগ, স্বত্ব ও স্বাধীনতা দেখা যায়। পার্ব্বতীয় বা দূরস্থ প্রত্যন্ত প্রদেশের রাজগণ মুসলমানের সৈন্যবলে ত্রস্ত হইয়া সময়ে যৎকিঞ্চিৎ কর, কোথাও বা উপহারমাত্র প্রদান করিতেন। অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল রাজারা বা সীমান্তরক্ষক সামন্তেরা নিজ নিজ সাহস ও বিক্রম অনুসারে দেয় রাজস্ব যথাসাধ্য অল্প করিবার প্রয়াস পাইতেন। কেবল আভ্যন্তরীণ সামান্য ভূম্যধিকারবর্গই নিয়মের অধীন ছিলেন। কিন্তু ইঁহাদেরও একালের 'মহারাজা' অপেক্ষা অধিকতর সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি ছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে সমগ্র বঙ্গ কখনই প্রকৃতপ্রস্তাবে মুসলমানের

(১) Anie Akbari Vol II. Col. Jarret.

শাসনাধীন হয় নাই। মুসলমান অধিকারস্থাপনের শত বর্ষ মধ্যেই (চতুর্দ্দশ শতাব্দী) বঙ্গীয় মুসলমান নৃপতিগণ দিল্লীর অধীনতাশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব আরম্ভ করেন। তখনও পূর্ব্ববঙ্গে সেনবংশীয় হিন্দুরাজ বংশধর বিরাজ করিতেছিলেন। সুতরাং সে সময়ে প্রত্যন্ত ও আভ্যন্তরীণ সামন্ত ও রাজগণের সহিত সদ্ভাবসূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া রাজ্যশাসন মুসলমানরাজের বিশেষ আবশ্যক হইয়াছিল। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা ও দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার জন্য, ইঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতাই সম্পূর্ণ কার্য্যকর হইত। অধিকন্তু দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া একবংশীয় মুসলমান রাজগণের সিংহাসনে স্থির থাকিবার অবকাশ ঘটে নাই। ক্রমাগত বিপ্লবের কালে দেশীয় অধীন রাজগণের সুবিধা ভিন্ন অসুবিধা ছিল না। এইরূপ বিপ্লবের অবকাশেই একবার উত্তরাঞ্চলের রাজা গণেশ (.কংস?) যবনের হস্ত হইতে রাজদণ্ড কাড়িয়া লইতে সক্ষম হন। কিন্তু নানা কারণে (বকল সাহেবের মত সমীচীন হউক বা না হউক) হতভাগ্য বাঙ্গালী জাতির সমবেত চেষ্টা বহুকাল অন্তর্হিত হইয়াছে। সুতরাং এ হিন্দু-অভ্যুত্থান অচিরেই ধূলিসাৎ হইল।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গদেশ মোগল পাঠানের ক্রীড়াভূমি হইয়া পড়ে; এখন দুই দলই দেশীয় জমিদারগণের সাহায্যলাভের জন্য লালায়িত। সুতরাং এই সুযোগে ইঁহাদের পুনরুত্থানের কিছু সুবিধাই হইল, কিন্তু প্রতাপাদিত্যের মত কেহ কেহ স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপনের প্রয়াস পাইলেও, মোগল সম্রাটের বিপুল বলের বিরুদ্ধে তাঁহাদের সেই সামান্য চেষ্টা বিফল হইল। অধিকন্তু মোগলকুলতিলক আদর্শ নৃপতি আকবর শাহ হিন্দু সেনাপতিগণের সাহায্যেই দেশ আয়ত্ত করিয়াছিলেন, সুতরাং জমিদারবর্গের প্রতিকূলশক্তি দিল্লীশ্বরের প্রভাব ও কৌশলজালে সংযত হইয়া রহিল। এই সমস্ত কারণেই অন্যান্য প্রদেশের মত বাঙ্গলায় রাজস্ব-বন্দোবস্ত সুশৃঙ্খলায় নির্ব্বাহিত হয় নাই। জমি-মাপের ত কথাই নাই, পূর্ব্ববর্ত্তী কাগজ দেখিয়া যে 'আসল জমা তুমারী' প্রস্তুত হয়, সে অনুসারেও রাজস্ব আদায় হয় নাই। চারি শত বর্ষের পর আবার দিল্লীশ্বরের জয়পতাকা উড়িল বটে, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে দেশ মোগলের অধীন হইল না। জমিদারগণ সুবিধা পাইলেই গলবদ্ধ রজ্জু উন্মোচন করিবার অবসর ত্যাগ করিতেন না। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গভূমি সর্ব্বদাই অন্তর্জাতীয় বিরোধে বিক্ষুব্ধ হইতেছিল। পরাজিত পাঠানগণ পুনঃ প্রতিষ্ঠালাভের জন্য বারম্বার প্রয়াস পাইতে লাগিল; মগ প্রভৃতি বহিঃশত্রুর হস্ত

হইতেও দেশ সর্ব্বথা নিরাপদ ছিল না। এই অবকাশে প্রত্যন্ত সামন্তগণের কথা দূরে থাকুক, ক্ষুদ্র জমিদারগণও সময়ে সময়ে আবদার আপত্তি আরম্ভ করিতেন; মোগল শাসনকর্ত্তাদিগকে সর্ব্বদাই ত্রস্ত থাকিতে হইত। অতঃপর সাজাহানের শেষ দশায় তাঁহার কৃতী পুত্রগণ সিংহাসন লইয়া টানাটানি আরম্ভ করিলেন। তখন সাসুজা বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা; সুতরাং এই গৃহবিবাদের তরঙ্গ এখানেও প্রসারিত হইয়াছিল।

আরঙ্গজেব ভারতের রাজদণ্ড গ্রহণ করিবার পর সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্রই একটা শৃঙ্খলার সূত্রপাত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাও বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। স্বকীয় কূটনীতির পরিচালনায় আরঙ্গজেব যখন যুগব্যাপী দাক্ষিণাত্য-যুদ্ধে পিতৃপিতামহের সঞ্চিত প্রচুর অর্থ সহ সমীচীন রাজনীতি রসাতলে দিয়া রাজ্যের প্রত্যেক শিরা পর্য্যন্ত শোষণ করিতেছিলেন, সেই সুযোগে প্রত্যন্ত প্রদেশগুলির সর্ব্বত্রই বিদ্রোহ বিপ্লবের সূচনা দেখা দিল। বর্দ্ধমানের এক জন সামান্য তালুকদার শোভা সিংহ বঙ্গে বিদ্রোহের নায়ক;—অতি কষ্টে বিদ্রোহ দমিত হইল; কিন্তু দেখা গেল, সর্ব্বত্রই অশান্তি ও অব্যবস্থা বিদ্যমান। এই জন্যই আরঙ্গজেব সুবিখ্যাত রাজস্বতত্ত্বজ্ঞ মুর্শিদ কুলী খাঁকে দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া, ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গলায় পাঠান। আকবরের সময় হইতেই রাজস্ব-বন্দোবস্ত প্রভৃতির জন্য সুবাদারের সহকারীরূপে দেওয়াননিয়োগের প্রথা চলিয়া আসিতেছিল। (১) কূটনীতিজ্ঞ আরঙ্গজেব এই দুইটি পদ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন করিয়া পরস্পরের ক্ষমতা কিয়ৎপরিমাণে সংযত করার ব্যবস্থা করেন। ইতিপূর্ব্বে নিজ পৌত্র আজিমশ্বানকে শান্তিস্থাপন জন্য সুবাদার করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, এক্ষণে সুব্যবস্থা জন্য মুর্শিদ কুলী প্রেরিত হইলেন। এই মহাত্মা দাক্ষিণাত্যনিবাসী কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণের বংশধর। বাল্যে মুসলমান বণিকের ক্রীতদাসরূপে পারস্যদেশে লালিত হন; পরে দেশে প্রত্যাগত হইয়া নিজ প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তার প্রভাবে হায়দরাবাদের দেওয়ানী পদে উন্নীত হন। রাজস্ববিষয়ে অদ্বিতীয় অভিজ্ঞতা নিবন্ধন ইনি অচিরেই গুণগ্রাহী আরঙ্গজেবের অনুরাগভাজন হয়েন। বঙ্গে আসিলে সাহজাদা আজিমশ্বান নূতন দেওয়ানের প্রতিপত্তিবৃদ্ধি দেখিয়া ঈর্ষ্যাপরবশ হইলেন।

(১) সাধারণতঃ অনেকের সংস্কার এই যে, বাঙ্গলা অধিকারের পর রাজা তোডর মল্ল অন্য প্রদেশের মত এখানেও জরিপ করিয়া জমাবন্দী প্রস্তুত করেন। কিন্তু এটি ভ্রমমাত্র। আইন-আকবরীতে এ বিষয়ের পরিষ্কার উল্লেখ না থাকাই এই ভ্রমের কারণ।

প্রবাদ এই যে, মুর্শিদের প্রাণবধের জন্য কয়েক জন সৈনিক পুরুষ যুবরাজের ইঙ্গিতে পথিমধ্যে বেতনপ্রার্থনাচ্ছলে হাঙ্গামা উপস্থিত করে। (১) যাহা হউক, অতঃপর ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদ কুলী খাঁ আপন অফিস ঢাকা হইতে উঠাইয়া মুকসুদাবাদে লইয়া আসেন;—পরে তাঁহার নাম অনুসারে নগরের নাম মুর্শিদাবাদ হয়। মুর্শিদাবাদ বঙ্গের কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত; এখান হইতে চতুর্দ্দিকের বন্দোবস্ত ও তত্ত্বাবধানের বিশেষ সুবিধা; এই জন্য প্রধান প্রধান জমিদার ও কানুনগোগণের পরামর্শে তিনি এই স্থানটিই মনোনীত করেন। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, বঙ্গের রাজস্ব বন্দোবস্তেও এতদিন বড়ই গোল ছিল। একে ত বঙ্গভূমি অপেক্ষাকৃত অস্বাস্থ্যকর, রাজধানী হইতে বহুদূরে বলিয়া ভাল লোকে দিল্লী হইতে এ অঞ্চলে আসিতেই স্বীকৃত হইতেন না, তাহাতে আবার এইরূপ অশাসিত বলিয়া বঙ্গের অধিকাংশই জায়গীরদারগণের মধ্যে বিভক্ত ছিল, এজন্য সরকারী রাজস্ব এতই অল্প হইয়া পড়ে যে, অন্য সুবা হইতে টাকা আনিয়া এখানে সৈন্যাদির ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইত। এই সমস্ত কারণেই কুলীখাঁর ন্যায় এক জন সুবিজ্ঞ রাজস্বসচিবের প্রয়োজন হইয়াছিল, এবং তিনিও আশানুরূপ ফল দেখাইয়াছিলেন।

রাজা টোডর মল্লের সুবিখ্যাত বন্দোবস্তে বঙ্গভূমি (উড়িষ্যা ব্যতীত) ১৯টি সরকার ও ৬৮২ পরগণায় বিভক্ত হয়। এই সময়ে যে আসল জমা তুমারী প্রস্তুত হয়, তাহাতে সমগ্র রাজস্ব (জায়গীর সমেত) ১০৬৯৩১৫২ টাকা নির্দ্দিষ্ট হয়। বাদশাহ সাজেহানের রাজ্যকালে উত্তরপূর্ব্বের কয়টি প্রত্যন্ত প্রদেশ আংশিক-ভাবে মোগলের আয়ত্ত হয়, উড়িষ্যায় বন্দোবস্তও এ সময়েই অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ছিল; তজ্জন্য সাহ সুজার শাসনকালে উড়িষ্যা সমেত বর্দ্ধিতায়তন বাঙ্গলার রাজস্ব ১৩১১১৫৯০৭ টাকা স্থির হইয়াছিল। কিন্তু এই টাকা অনেক পরিমাণে কাগজেই ছিল, কোন কালেই সমস্ত আদায় হয় নাই। মুর্শিদ কুলী খাঁ পূর্ব্ব ব্যবস্থার আমূল সংশোধনে বদ্ধপরিকর হইলেন। প্রথম দেও-

(১) এই ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অনেক কারণ আছে, এখানে তাহার সমালোচনা অসম্ভব। যে পারসী গ্রন্থ হইতে রিয়াজ-উস-সালাতিন গ্রন্থকার ও ষ্টুয়ার্ট এই বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে নানা সময়ের প্রবাদ একত্র সংগৃহীত হইয়াছে। এক জন দেওয়ানের নগদী সৈন্যের হস্তে প্রাণনাশের কথা ইংরেজ দপ্তরের কাগজে আছে। তিনি কিছু দিনের জন্য মুর্শিদ কুলীর স্থানে কার্য্য করিয়াছিলেন।—Wilson's annals of the British in Bengal.

য়ানী আমলে, তিনি বাঙ্গলার রাজস্বসম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ অথচ সরকারের হিতাকাঙ্ক্ষী আমিনগণকে প্রত্যেক পরগণার রাজস্ব আদায় করিবার জন্য নিয়োজিত করেন। কিন্তু ইহাতেও ঈপ্সিত ফল প্রাপ্ত হন নাই। রীতিমত জরিপ জমাবন্দী করিবার প্রয়োজন, কিন্তু দেশের অবস্থা ইহার সম্পূর্ণ প্রতিকূল এবং তিনি নিজেও তখন দেওয়ানমাত্র। সুতরাং প্রথমে দেশের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। অতঃপর সুবাদার ও দেওয়ানী পদে সুপ্রতিষ্টিত হইয়া পূর্ব্ব সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। ইতিপূর্ব্বেই বাদসাহের সম্মতিক্রমে, সুবাদারের ও প্রধান কর্ম্মচারী দুই এক জনের ভিন্ন সকলের অপর সমস্ত জায়গীর ভূমি বাঙ্গলা হইতে উড়িষ্যায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রান্তদেশস্থ জমিদারগণকে তাঁহাদের নিজ নিজ অধিকারে অশাসিত ভূভাগের সম্পূর্ণ বন্দোবস্তের ভার অর্পণ করিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, এ সকল স্থানের রাজস্বের ভাগ্যে যাহাই হউক, অন্ততঃ একটা হিসাব পাইয়া অবস্থা জ্ঞাত হইবেন। আভ্যন্তরীণ জমিদারবর্গের মধ্যে যাঁহারা এই বন্দোবস্তে সম্পূর্ণ উৎসাহপ্রকাশ ও সাহায্য করিলেন, তাঁহাদিগকে ঐ কার্য্যের সম্পূর্ণ ভার দিয়া সরকার হইতে সহকারী কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়া সেই বন্দো-বস্তের সাহায্য করিলেন। যে সমস্ত জমিদার অনায়ত্ত ছিলেন, তাঁহাদিগকে কৌশলে কিছু দিনের জন্য মুর্শিদাবাদে নজরবন্দী রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্থানে বিশ্বাসী ও কর্ম্মঠ হিন্দু বা মুসলমান আমিন নিযুক্ত করিয়া, সমগ্র ভূভাগে এককালে নূতন বন্দোবস্ত করিবার উপায় বিধান করিলেন। জমিদারবর্গ উপস্থিত থাকিলে এ কার্য্যে বিশেষ বিঘ্ন উৎপাদন করিতেন, এ জন্যই এই কঠোর ব্যবস্থা। জমিদারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদন জন্য আপাততঃ নানকর (ভরণ-পোষণার্থ দত্ত) জমি দেওয়া হইল। প্রত্যেক মহাল জরিপ করিয়া রীতিমত জমাবন্দী কাগজ প্রস্তুত হইল। প্রজাবর্গের অবস্থা ও সুবিধা অনুসারে জমি পত্তনের ব্যবস্থা হইল। দরিদ্র প্রজাগণকে তাগাবী অর্থসাহায্য দিয়া ভূমির উৎকর্ষসাধন চলিতে লাগিল।

এইরূপে অত্যল্পকালেই সমস্ত বন্দোবস্ত সুস্থির হইয়া গেলে, অবাধ্য জমি-দারগণকে ব্যবহারের ইতরবিশেষ অনুসারে ক্রমশঃ স্বপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হইল। কাহারও জমিদারীর আয়তন বর্দ্ধিত হইল; মৃত বা নিতান্ত অসাধ্যশাসন ধূর্ত্ত জমিদারগণকে উৎখাত করয়া তাঁহাদের স্থানে নূতন লোকের সহিত বন্দোবস্ত হইল। এই অভিনব জমিদারশ্রেণীর অনেকেই হয়

সরকারী কর্ম্মচারী—নয় বর্দ্ধিষ্ণু প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। এই শ্রেণীর উৎপত্তি অবশ্য পূর্ব্বাবধিই হইয়া আসিতেছিল। দুই চারি জন ইংরেজ লেখক যে এই সময়েই নূতন জমিদারশ্রেণীর উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহা তাঁহাদের স্বকপোলকল্পিত অনুমানমাত্র। (১) মুর্শিদ কুলী খাঁ নিজের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই ইচ্ছামত জমিদারগণকে উৎখাত করিয়াছিলেন, ইহা মনে করা ধৃষ্টতামাত্র। যাহা হউক, পরে আমরা এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

মুর্শিদ কুলী খাঁ এইরূপে সমস্ত বন্দোবস্ত শেষ করিয়া যে কাগজ প্রস্তুত করান, তাহার নাম "জমা কামেন্ তুমারী"। এই পাকা বন্দোবস্তই পরবর্ত্তী জমিদারী বন্দোবস্ত সকলের ভিত্তিস্বরূপ। রাজা তোড়র মল্লের আসল জমা তুমারীতে বাঙ্গলা ১৯টি সরকার বা জেলায় বিভক্ত হইয়াছিল, পূর্ব্বেই ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে তেরটি চাকলা বা বিভাগে সমস্ত দেশ পুনর্বিভক্ত হইল। ইহার মধ্যে চাকলা হিজ্‌লী ও বন্দর বালেশ্বর, উড়িষ্যা হইতে গৃহীত। সপ্তগ্রাম, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, যশোহর ও ভূষণা, এই পাঁচটি পদ্মার পশ্চিমঃ ভাগে, এবং অবশিষ্ট আকবর-নগর (রাজমহল), ঘোড়াঘাট, কারাবাড়ী, জাহাঙ্গীর-নগর (ঢাকা), শ্রীহট্ট ও ইস্‌লামাবাদ (চট্টগ্রাম), এই ছয়টি পদ্মার উত্তর ও পূর্ব্বপার্শ্বে। সরকার ও পরগণাগুলির পূর্ব্ব নামই ঠিক থাকিল, এবং এইরূপে সমগ্র বঙ্গে ৩৪ সরকার ও ১৬৬০ পরগণায় ১৪২৮৮১৮৬ টাকা সদর জমা নির্দ্দিষ্ট হইল। এখানে দেখা উচিত, অধিকারবৃদ্ধির জন্যই এই রাজস্ব-বৃদ্ধি; নতুবা পূর্ব্বের সহিত তুলনায় জমিদারবর্গের দেয় রাজস্ব বর্দ্ধিত হয় নাই। তবে এই সময় হইতে সমগ্র রাজস্ব কাগজেই শেষ না হইয়া প্রকৃতপক্ষে যাহাতে আদায় পাওয়া যায়, তাহার চেষ্টা হইল। মনে রাখা উচিত, এ সময়ে জমিদারগণ কর্ত্তৃক প্রজার দেয় রাজস্বের অযথাবৃদ্ধির উপায় ছিল না। পরগণা কানুনগোগণের কাগজে প্রত্যেক পরগণার হার নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই বন্দোবস্ত শেষ হইলে ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে জমিদারগণের সহিত বন্দোবস্তে যে এহতিমামবন্দী প্রস্তুত হয়, এবং যাহা ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে (বাং ১১৩৫ সালে) সুজাউদ্দীনের সময়ে পাকা হয়, কোম্পানীর সেরেস্তাদার গ্রাণ্ট সাহেব ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজস্ববিষয়ক বিবরণীতে তাহার বিবরণ দিয়াছেন। গ্রাণ্ট মহোদয় রাজস্ব-সম্বন্ধীয় কাগজপত্র সদর কানুনগোগণের দপ্তর হইতে তাঁহাদের কর্ম্মচারি-

(১) Phillip's Land Tenure—P. 128—29.

গণের সাহায্যে প্রাপ্ত হন। ইতিপূর্ব্বে খ্যাতনামা ফিলিপ ফ্রান্সিস্ সাহেবও ঐ উপায়ে কাগজ পাইয়া নিজ রাজস্ববিষয়ক মন্তব্য লেখেন। সার জন শোর মহোদয়ও এ সমুদয়ের বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। এই সমস্ত বিবরণীর প্রধান আলোচ্য বিষয়ের ঐক্য আছে। (১) সুতরাং ইহা সম্পূর্ণ প্রামাণিক। আমরা এই সকল অবলম্বনে সংক্ষেপে প্রধান জমিদারী কয়টির উল্লেখ করিব। জমিদার বংশগুলির সম্পূর্ণ ইতিহাসবর্ণন বর্ত্তমান প্রবন্ধের অভিপ্রেত নহে। সংক্ষেপে ইহাদের পূর্ব্ব বিবরণ দিয়া, কুলী খাঁর বন্দোবস্তেরই সবিশেষ উল্লেখ করা হইবে।

এ পর্য্যন্ত মুসলমান শাসনকালে জমিদারী প্রথার যে ইতিহাস বর্ণিত হইল, তাহাতে দৃষ্ট হইবে যে, বঙ্গের জমিদারগণকে নিম্নলিখিত চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

১। প্রাচীন স্বাধীন ও করদ রাজগণ;—যাঁহারা মুসলমান শাসনের চূড়ান্ত বৃদ্ধির দশায় কোথাও স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে, কোথাও বা আংশিক অধীনতা স্বীকার করিয়া রাজত্ব করিতেন। প্রত্যন্ত প্রদেশেই ইঁহাদিগকে দেখা যায়। ইঁহারা অধীন হইয়াও স্বরাষ্ট্রে আভ্যন্তরীণ বন্দোবস্তে স্বাধীন রাজার মতই ব্যবহার করিতেন।

২। হিন্দু বা মুসলমান সামন্তগণ;—যাঁহারা বিপ্লবের অবস্থায় সুবিধা পাইয়া কোন স্থানে স্থায়িভাবে দখল করিতেন। মুসলমানরাজও ভয়মৈত্রতায় তাঁহাদিগকে বড় বেশী নাড়াচাড়া দিতেন না। ইঁহারাও প্রথম শ্রেণীর রাজগণের ন্যায় স্বকীয় অধিকারে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবেই থাকিতেন। প্রভাবশালী রাজার রাজত্বকালে রীতিমত রাজকর আদায় দিতেন, এবং সুবিধা পাইলেই অঙ্গুষ্ঠ-প্রদর্শনের অবসর ছাড়িতেন না।

৩। রাজস্ব-আদায়কারী আমিনগণ;—যাঁহারা মুসলমান অধীনে দুই এক পুরুষ কোথাও সাধারণ জমিদারগণের নিকট, কোথাও কোন নাবালক বা মৃত জমিদারের অধিকারে রাজস্বসংগ্রহের ভার প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ স্বীয় ক্ষমতার বিস্তার বা অপব্যবহার দ্বারা দ্বিতীয় শ্রেণীর ভূস্বামিগণের সদৃশ হইয়া উঠিতেন। সুবিধা পাইলেই হিসাবে গোল করা, বা অন্যের জমিদারী সুবিধামত বেনামী প্রভৃতি উপায়ে হস্তগত করা, এই সমস্ত উপায় ইহাদের অস্ত্র ছিল। ইঁহারা উপবেশন করিবার সুবিধা পাইলে শয়নে শেষ করিতেন।

(১) Fifth Report and Harrington's Analysis.

৪। অর্থশালী ব্যক্তিগণ ;—যাঁহারা বেওয়ারিস মৃত বা ক্রমাগত রাজস্ব আদায় দানে অশক্ত জমিদারগণের জমিদারী অনেক সময়ে ইজারায় আরম্ভ করিয়া শেষে স্থায়িভাবে জমিদার হইতেন। বিদ্রোহ প্রভৃতি গুরুতর কারণ ভিন্ন কথার কথায় উচ্ছেদ, বা জমিদারী নিলামের সভ্য ব্যবস্থা সেকালে প্রচলিত ছিল না, ইহা বলাই বাহুল্য।

এই চারি শ্রেণীর জমিদারের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য সহজেই দৃষ্ট হইবে। অনেক ইংরেজ লেখক সমস্ত জমিদারেরই সাধারণ উৎপত্তির একটা কল্পিত কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। সাধারণ নিয়ম সর্ব্বথা অন্ধভাবে চালাইলে যে গোল হয়, এখানেও তাহাই হইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দী হইতে সনন্দ লইবার প্রথা দেখিয়া অনেকে রাজকীয় সনন্দই জমিদারের স্বত্বের ভিত্তিস্বরূপ, এই সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন। আমরা স্থানান্তরে এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিব। এক্ষণে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে বাঙ্গলার দুই চারিটি প্রধান জমিদারীর উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করা যাইতেছে।

বর্দ্ধমান ;—সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে আবু রায় নামক এক ভাগ্যবান্ ব্যক্তি পঞ্জাব হইতে বঙ্গে আসিয়া বর্দ্ধমানের চতুর্ধুরীণ পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার পুত্র বাবু রায় (কৃষ্ণবাবু) বর্দ্ধমান পরগণা ও সমীপবর্ত্তী তিনখানি মহালের জমিদারী পাইয়াছিলেন। এই বাবু রায়ের পুত্র ঘনশ্যাম ; তৎপুত্র কৃষ্ণরাম রায়ের সময়েই পূর্ব্বকথিত চিতোর সর্দ্দার তালুকদার শোভাসিংহ বিদ্রোহী হইয়া বর্দ্ধমান জমিদারী লুণ্ঠনে অগ্রসর হন। জনৈক অশান্ত আফগান সর্দ্দার রহিম খাঁ তাঁহার সহিত যোগ দিলে, সমবেত বিদ্রোহী সৈন্য সদলবলে বর্দ্ধমান আক্রমণ করে (১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে)। অসমসাহসিক রাজা কৃষ্ণরাম বিদ্রোহিগণের সহিত সম্মুখসমরে তাঁহার সামান্য সৈন্যদল সহ পরাস্ত ও স্বয়ং নিহত হন। বিদ্রোহীরা রাজবাটী অধিকার করিয়া রাজপরিবারের অনেককে বন্দী করিল। রাজপুত্র জগৎরাম অনন্যোপায় হইয়া ঢাকায় সুবাদারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে উল্লিখিত আছে, জগৎরাম এই সময়ে স্ত্রীবেশে পলাইয়া প্রথমে কৃষ্ণনগর-রাজের শরণাপন্ন হন। সুবিখ্যাত 'বিদ্যাসুন্দরের' অমর কবির সমসাময়িক কোন রাজ সভাসদ্ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশেই এই ক্ষিতীশবংশাবলীর রচনা করেন। সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বীর বৈঠকের গাল-গল্প প্রকৃত ঘটনা বলিয়া মানিয়া লইতে সহসা প্রবৃত্তি হয় না। সে যাহা হউক, বর্দ্ধমান ও পশ্চিম-দক্ষিণ বঙ্গের অধিকাংশ,

অনতিবিলম্বেই বিদ্রোহী সৈন্যের করকবলিত হইল। শোভা সিংহ বর্দ্ধমান-রাজকুমারী বীরবালার পবিত্র অঙ্গে পাপহস্ত অর্পণ করিতে গিয়া প্রাণ হারাইলেন। অতঃপর রহিমের অধীনে বিদ্রোহী সৈন্য মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও রাজমহল পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করিল। অর্থশালী বণিকবর্গের পূজোপচারে সমৃদ্ধ নগর কাশিমবাজারে আর তাহাদের পদধূলি পড়িল না। সুবাদার ইব্রাহিম বিদ্রোহদমনে অশক্ত হইয়া পদচ্যুত হইলেন, কিন্তু তাঁহার দেশত্যাগের পূর্ব্বেই তাঁহার অন্বর্থনামা পুত্র জবরদস্ত খাঁ মুর্শিদাবাদের নিকটে রহিমকে পর্য্যুদস্ত করেন। সাহজাদা আজিমশ্বান বঙ্গে আসিয়া আপন পিতৃপুণ্যে ভাগ্যে ভাগ্যে বিদ্রোহদমনে সমর্থ হইলেন। এখন জগৎরাম পৈতৃক জমিদারীর সহিত বিদ্রোহী তালুকদারের অধিকৃত ভূসম্পত্তিও প্রাপ্ত হইলেন। রাজা কৃষ্ণরামের জমিদারী শত পরগণামাত্রে সীমাবদ্ধ ছিল ; মুর্শিদ কুলী খাঁর বর্ত্তমান বন্দোবস্তে, জগৎরামের পুত্র রাজা কীর্ত্তিচন্দ্রকে বর্দ্ধমান চাকলার অধিকাংশ, হুগলীর মধ্যে ভূরস্থট ও মুর্শিদাবাদে মনোহরসাহী প্রভৃতি প্রধান জমিদারীর অধিকারী দেখা যায়। ইহার অধিকাংশ ভূভাগই শস্যসমৃদ্ধির জন্য সুবিখ্যাত ছিল, সুতরাং এই অবধি বর্দ্ধমানই বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান জমিদারী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল। এই বন্দোবস্তে সমুদয়ে ৫৭ পরগণায় ২০৪৭৫০৬ টাকা সদরজমা নির্দ্দিষ্ট হয়। [১১৭৮ সালের খৃষ্টাব্দে ১৭৭২ কোম্পানীর বন্দোবস্তে ৭৫ পরগণায় বর্দ্ধমানের রাজস্ব ৪৩২৮৫০৯ টাকা হইয়া দাঁড়ায়। পূর্ব্বের তুলনায় বর্ত্তমানে কি পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা ইহাতে সহজেই অনুমিত হইবে ; অবশ্য বিপ্লবের সময়ে বাড়িতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছিল।]

রাজসাহী—(বা নাটোর জমিদারী) ;—মুর্শিদাবাদের উত্তরপশ্চিমাংশে আধুনিক পাকুড়ের নিকটবর্ত্তী পূর্ব্বতন সরকার উদুম্বর (উদনার) মধ্যস্থিত রাজসাহী পরগণাই আদিম রাজসাহী। (১) মুর্শিদ কুলী খাঁর রাজ্যকালে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন ভূস্বামিবংশীয় রাজা উদয়নারায়ণ রাজসাহীর পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগের বন্দোবস্ত ও রাজস্ব আদায়ের ভার প্রাপ্ত হন। তাঁহার সাহায্য করিবার জন্য নবাব সরকার হইতে গোলাম মহম্মদ ও কালী জমাদার নামক দুই জন সেনানী দুই শত পদাতিক সহ নিযুক্ত ছিলেন। ইহারা প্রাপ্য বেতনের দাওয়া প্রভৃতি ছল করিয়া বিদ্রোহী হয়। নবাব প্রকৃত কারণ নির্ণয় না

(১) Bevarige—The Rajas of Rajshahi—proceedings of the Asiatic Society, January, 1893.

করিয়াই উপস্থিত বিদ্রোহদমন করিবার জন্য লাহরী মল্ল নামক হিন্দু সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। নাটোর-বংশের স্থাপয়িতা সুপ্রসিদ্ধ রঘুনন্দন এই বিদ্রোহদমনে সাহায্য করেন, এইরূপ প্রবাদ। (১) আবার ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে লাহরী মল্লের সহযোগী কৃষ্ণনগররাজ বীরপ্রবর রঘুরামের হস্তে গোলাম মহম্মদ হত হন, এইরূপ লিখিত আছে। যাহা হউক, কথিত আছে,—রাজা উদয়নারায়ণ এই গোলযোগে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আত্মহত্যা করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী না থাকায় নবাব তদীয় বিস্তীর্ণ জমিদারী আপন প্রিয় রাজস্বসচিব ও বিশ্বস্ত অনুচর, রাজা রঘুনন্দনের ভ্রাতা রামজীবনের নামে বন্দোবস্ত করিয়া দেন (১৭১৩ খৃষ্টাব্দে)। রঘুনন্দন কামদেবনামক এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান—পুঁঠিয়ার সুবিখ্যাত রাজা দর্পনারায়ণের অনুগ্রহে কিরূপে তিনি মুর্শিদাবাদ নবাব-সরকারে প্রতিষ্ঠাপন্ন হন, সে কথা আমরা স্থানান্তরে সংক্ষেপে বলিয়াছি। (২) কুলীখাঁর সুনয়নে পড়িবার পরেই ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে বনগাছী নামক ক্ষুদ্র মহাল জমিদারী পান। পরে ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে রাণী সর্ব্বাণীর নিঃসন্তান লোকান্তরের পর বিস্তীর্ণ ভাতুড়িয়া জমিদারীও প্রাপ্ত হন। রঘুনন্দন নিজ কার্য্যদক্ষতায় গুণগ্রাহী মুর্শিদ কুলীর এতই শ্রদ্ধাভাজন হন যে, তিনি ভূষণার সুবিখ্যাত রাজা সীতারাম রায়ের উচ্ছেদ সাধনের পর তাঁহার বিস্তীর্ণ জমিদারীরও সিংহযোগ্য অংশ গ্রহণ করেন। অতঃপর যশোহর অঞ্চলের টুন্কি স্বরূপপুরের দুই জন মুসলমান জমিদার বিদ্রোহী হইয়া নবাবের ষাটি হাজার টাকা রাজস্ব লুণ্ঠন করে—ইহাদের বিনাশের পর এই জমিদারীও রঘুনন্দনী মেলে মিলিয়া যায়। প্রবাদ এই যে, বিদ্রোহী জমিদারদ্বয়ের ও সীতারামের দমনসময়ে রঘুনন্দন বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তিনি রাজকর্ম্মচারী বলিয়া এই সমগ্র জমিদারীই ভ্রাতা রামজীবনের নামে বন্দোবস্ত করিয়া লন। প্রধান জমিদারী কয়টির যে সনন্দ কয়খানি এক্ষণে নাটোর রাজধানীতে আছে,—তাহার তারিখ ১১২৯ হিঃ (১৭১৭ খৃষ্টাব্দ)। জমিদারী সনন্দ প্রভৃতির কথা বারান্তরে আলোচনা করিবার অভিলাষ আছে। (৩) এই অবধি রাজসাহী জমিদারী আয়তনে সর্ব্বপ্রধান জমিদারী হইয়া উঠে; ইহার তদানীন্তন পরিমাণ বার

(১) Sir John Shore's Report in Harnigton's Analysis.

(২) নাটোর রাজবাটীর সনন্দের প্রতিলিপিগুলি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহোদয়ের অনুগ্রহে প্রাপ্ত হইয়াছি।

(৩) সাহিত্য—মাঘ ও ফাল্গুন—১৩০২।

হাজার বর্গ মাইলেরও অধিক ছিল;—অর্থাৎ, চাকলা মুর্শিদাবাদ, ঘোড়াঘাট ও মহম্মদাবাদের অধিকাংশ, বর্ত্তমান রাজসাহী ও মুর্শিদাবাদের অধিকাংশ, বগুড়া, পাবনা, ফরিদপুর প্রায় সমস্তই এবং রঙ্গপুরের অর্দ্ধাংশ, তখন এই জমিদারীর অন্তর্ভূত ছিল। নানাকারণে দেয় রাজকরও অপেক্ষাকৃত অল্প ছিল। সর্ব্বসমেত ১৩৯ পরগণায় এই বন্দোবস্তে ইহার সদর জমা মোট ১৬৯৬০৮৭ টাকা মাত্র নির্দ্দিষ্ট ছিল। কোম্পানীর বন্দোবস্তে দেয় রাজস্ব দ্বিগুণেরও অধিক হয়।

নবদ্বীপ বা কৃষ্ণনগর জমিদারী;—স্বনামখ্যাত ভবানন্দ মজুমদার এই সুবিখ্যাত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। রাজা মানসিংহের অনুগ্রহে ইনি ১৬০৬ হইতে ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে উখড়া প্রভৃতি বিংশত্যধিক পরগণায় জমিদারী পান। ভবানন্দের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ রাজা রঘুরাম মুর্শিদকুলী খাঁর বন্দোবস্তসময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। ইনি এক জন সুপ্রসিদ্ধ বীরপুরুষ, রাজসাহীর রাজা উদয়নারায়ণের বিরুদ্ধে ইঁহার অভিযানের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এ প্রবাদের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিলেও বক্ষ্যমাণ বন্দবস্তে ইঁহার জমিদারীর আয়তন যে বর্দ্ধিত হয়, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ সময়ে কৃষ্ণনগর জমিদারীর সর্ব্বসমেত ৭৩ পরগণার দেয় রাজস্ব ৫৯৪৮৪৬ টাকা হইয়াছিল। কোম্পানীর বন্দোবস্তে ইহার গতিও অন্যের মতই হয়। দুই চারিটি লাভশূন্য মহাল দ্বারা আয়তনে বর্দ্ধিত হইলেও, বর্দ্ধিত রাজস্বের তুলনায় তাহা কিছুই নয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। (বাং ১১৭২ সালে দেয় রাজস্ব ১০৯৭৪৫৪ টাকা হইয়া উঠে।) খ্যাতনামা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রঘুরামের পুত্র; তাঁহার সময়ে কৃষ্ণনগর রাজ্যের চূড়ান্ত শ্রীবৃদ্ধি, জমিদারীর আয়তন ৮৫ পরগণা হইয়া উঠে। জমিদারী অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও, নদীয়া-সমাজপতি বলিয়া কৃষ্ণনগর রাজ্যের সম্মান চিরকালই অন্য কাহারও অপেক্ষা অল্প ছিল না।

দিনাজপুর বা হাবেলী সরকার পিঞ্জারা;—আকবর সাহের রাজত্বের শেষভাগে বিষ্ণুদত্তনামা জনৈক উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ প্রাদেশিক কানুনগো নিযুক্ত হইয়া দিনাজপুরে বাস করেন। তাঁহার পুত্র শ্রীমন্ত চৌধুরী সাজাহানের রাজ্যকালে সাহ সুজার বিশেষ প্রীতিভাজন হন ও দিনাজপুর জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া লন। তাঁহার দৌহিত্রবংশীয়েরা দিনাজপুরের উত্তরাধিকারী হইয়া রাজোপাধি এবং বাদসাহের নিকট বিশিষ্ট সম্মানাদি প্রাপ্ত হন। মুর্শিদকুলী খাঁর এই বন্দোবস্তসময়ে রাজা রামনাথ বর্ত্তমান ছিলেন। ইনি এক জন সুবিজ্ঞ ও প্রতিভাশালী লোক ছিলেন। জমিদারীর সুব্যবস্থা করিয়া ইনি প্রচুর

অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এজন্য প্রবাদ আছে, প্রাচীন বাণরাজার প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ হইতে মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত বিপুল অর্থ লাভ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক ক্ষেত্রস্বামী ও পুত্রচতুষ্টয়ের গল্পের মত তাঁহার অর্থ মৃত্তিকা হইতেই উঠে। নিজ জমিদারীর আভ্যন্তরীণ সমস্ত বন্দোবস্ত ও বিচার প্রভৃতির ভার ইঁহার হস্তে স্থায়িভাবেই প্রদত্ত হয়। ইঁহার সুব্যবস্থাগুণে দিনাজপুর জমিদারী পূর্ব্বপ্রথামত আমিন বা ক্রোক সাজোয়ানের হস্তে কখনও পড়ে নাই। মুর্শিদাবাদের নবাবগণ অনেক সময়ে ইঁহার নিকট ঋণস্বরূপ অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিতেন, ইহাও প্রসিদ্ধ আছে। প্রস্তাবিত বন্দোবস্তে ৮৯ পরগণায় ইহার সদর মালগুজারী ৪৬১৯৬৪ টাকা ছিল। ইংরেজী আমলে দ্বিগুণে উঠিয়াছিল, ইহা বলাই বাহুল্য। সাধারণ নিয়মের এখানে ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

উল্লিখিত চারিটি প্রধান জমিদারীর প্রত্যেকেরই মুসলমানী আমলে উৎপত্তি এবং ইহারা দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ বিষ্ণুপুর, পঞ্চকোট ও ত্রিপুরায় প্রাচীন হিন্দু রাজগণের নিকট বাদসাহী পেসকশ্ স্বরূপ সামান্য কিছু গ্রহণ করা হইত। তাঁহারা আবার ভাল ভাল খেলাৎ ও পুরস্কার পাইতেন। প্রকৃতপক্ষে তঁহাদের স্বাধীন ব্যবহারই ছিল, কুলী খাঁর পূর্ব্বে তাঁহারা ভাল করিয়া মুসলমানের আয়ত্তই হন নাই। ত্রিপুরা এই সময়েই প্রথমে কথঞ্চিৎ শাসনে আইসে। রুকনপুর কানুনগোই জমিদারী, ইউসুফ্পুর বা যশোহর জমিদারী, ফতে সিংহ, পুঁটিয়া, মহম্মদসাহী, ইদ্রাকপুর, এই ছয়টি প্রধান জমিদারী। অতঃপর উল্লেখযোগ্য এই কয়টিও এ আমলে দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত। সমস্তই হিন্দু জমিদার। ইহা ভিন্ন শ্রীহট্ট, বালেশ্বর, তমোলুক, জলামুঠা, সুজামুঠা, (মহিষাদল প্রভৃতি) কাঁকজোল (রাজমহল) ইত্যাদি স্থানের জায়গীর ভিন্ন সমস্ত ভূভাগ, পূর্ণিয়ার অধিকাংশ, ঢাকার অনেক ক্ষুদ্র মজকুরী জমিদারী হিন্দু জমিদারগণেরই অধীন ছিল। বৃহৎ জমিদারীর মধ্যে একমাত্র বীরভূমিতে প্রাচীন মুসলমানবংশীয় জমিদার দেখা যায়; অন্যত্র ক্ষুদ্র মুসলমান জমিদারের সংখ্যাও অতি অল্প। মোটের মাথায় এক আনা রকম মুসলমান জমিদারের অধীনে দেখা যায়। এই জমিদারী বন্দোবস্তই মুর্শিদকুলী খাঁর কীর্ত্তি, আবার ইহাতেই তাঁহার কলঙ্ক-প্রবাদ। কঠোর হস্তে রাজকর আদায়ই তাঁহার কলঙ্কের প্রধান কারণ। কয় জন কঠোর ন্যায়পর লোক সংসারে যশোলাভ করিয়াছেন?

দুর্ভিক্ষ না অন্নকষ্ট?

দুর্ভিক্ষই বল আর অন্নকষ্টই বল, আমাদের পক্ষে উভয়েরই ফল সমান,—অপমৃত্যু! আমরা কৃষিব্যবসায়ী অন্নজীবী দুর্ব্বল জাতি; দিনান্তে নিতান্ত পক্ষে একমুষ্টি অন্ন সংগ্রহ করিতে না পারিলে, কয় দিন বাঁচিব? সেই অন্ন—দরিদ্রের দিনান্তের মুষ্টিভিক্ষা,—তাহাও আর সহজে মিলিতেছে না!

দেশে আর অন্ন নাই! ধনধান্যভরা বসুন্ধরা এবার অনুর্ব্বরা হইয়া উঠিয়াছে; আকাশে মেঘ নাই, নদনদীতে জলপ্লাবন নাই, পৌষের পার্ব্বণদিনেও কৃষাণের গৃহপ্রাঙ্গন 'হায়! হায়!' করিতেছে।

দুর্দ্দশার কথা আর কি বলিব! যে দেশ "ধরিত্রীর রত্নভাণ্ডার" বলিয়া চিরপরিচিত, সে দেশ যে দিনে দিনে এত দূর কাঙ্গাল হইয়া পড়িবে, তাহা কে জানিত? আমরা কাঙ্গাল হইয়া পড়িয়াছি—সে কথা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই! রাজা প্রজা সকলেই তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

আমরা দুর্ভিক্ষের জন্যই এমন কাঙ্গাল হইয়া পড়িলাম, অথবা আমরা কাঙ্গাল বলিয়াই দুর্ভিক্ষ আমাদের কণ্ঠলগ্ন হইয়াছে, সে বিষয়ে বিস্তর মতভেদ থাকিতে পারে। কিন্তু এ দেশে আজকাল যে চাঁদে চাঁদেই দুর্ভিক্ষ হইতেছে, সে বিষয়ে কোনরূপ মতভেদ নাই!

সে বার দুর্ভিক্ষের প্রকোপে উড়িষ্যা উৎসন্ন হইয়া গেল, তাহার কয়েক বৎসর পরেই বিহারে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইল, আরও কয়েক বৎসর যাইতে না যাইতে মাদ্রাজে কালের চিতা জ্বলিয়া উঠিল, বাঙ্গলা কঙ্কালসার হইয়া পড়িল,—ইহাই আমাদের অর্দ্ধশতাব্দীর ইতিহাস! এবার আবার উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম—আসমুদ্র ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই হাহাকার ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে!

সেকালেও দুর্ভিক্ষ ছিল; কিন্তু এমন চাঁদে চাঁদে দুর্ভিক্ষ ছিল না। "দুর্ভিক্ষমল্লং স্মরণং চিরায়ুঃ"—ইহাই সেকালের পুরাতন প্রবাদ। তখন কালে ভদ্রে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলেও, দুর্ভিক্ষাবসানে আবার শস্য সুলভ হইত। গত শতাব্দীতে শস্য এতই সুলভ ছিল যে, ইংরাজেরাও অতি যৎসামান্য বেতনে এ দেশে কুঠিয়ালের গুদামসরকারী করিতেন। * এখন আর সে দিন নাই! তখন যাহাকে দুর্ভিক্ষ বলিত, তাহাই এখনকার নিত্য ঘটনায় পরিণত হইয়াছে।

* Long's Selections from the Records of the Govt. of India.

শায়েস্তা খাঁ ও যশোবন্ত সিংহের আমলে টাকায় আট মন চাউল বিকাইত, * তাহা এখন আট সেরে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে; কাজেই পুরাতন ব্যাধির ন্যায় অন্নকষ্ট আমাদের অঙ্গের আভরণ হইয়া উঠিয়াছে।

এই ধারাবাহিক অন্নকষ্টের ইতিহাস রাজা প্রজা সকলের পক্ষেই সবিশেষ শিক্ষাপ্রদ। রোগের মূল নির্ণয় করাই রোগবিমোচনের প্রথম সোপান। এই নিত্য দুর্ভিক্ষরোগের মূল কোথায়?

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শতাব্দীর ইতিহাস তিন অধ্যায়ে বিভক্ত; প্রথম অধ্যায় কোম্পানীর স্বাধীন শাসন; দ্বিতীয় অধ্যায় সিপাহী বিদ্রোহের তুমুল তরঙ্গ; তৃতীয় অধ্যায় ভারতেশ্বরীর সাক্ষাৎ শাসন।

যৎকিঞ্চিৎ লাভের লোভেই কোম্পানী বাহাদুর এ দেশে শুভাগমন করিয়াছিলেন। ঘটনাচক্রে এ দেশের রাজসিংহাসন কুড়াইয়া পাইয়া যথাসাধ্য শাসন ও শোষণ কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে গিয়া সিপাহী বিদ্রোহে কোম্পানীর স্বাধীন শাসন উঠিয়া গেল! শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের কোম্পানীর রাজ্যের ইতিহাস অশিক্ষিত বাল্যজীবনের ইতিহাসের ন্যায় অনেক শৈশবসুলভ চপলতার কাহিনীতে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। দেশে এত শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা ছিল না, দস্যু তস্করের অভাব ছিল না, যুদ্ধ বিদ্রোহের বিরাম ছিল না, দেশে দেশে লৌহবর্ত্ম সুবিস্তৃত হয় নাই। কিন্তু তথাপি সেই অর্দ্ধ শতাব্দীর ইতিহাসে দুর্ভিক্ষের করাল মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। সিপাহী যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্তও সাধারণতঃ টাকায় একমণ চাউল মিলিত।

সিপাহী বিদ্রোহে অল্প দিনের জন্য ভারতবর্ষের কিয়দংশে তুমুল কোলাহল উত্থিত হয়; কিন্তু সেই কোলাহলের অবসানেও লোকে আবার টাকায় এক মণ চাউল পাইয়াছিল।

বিদ্রোহের অবসানে ভারতবর্ষে গৌরবমণ্ডিত নবযুগের অভ্যুদয় হইয়াছে; শিক্ষার অরুণ-জ্যোতি ভ্রমান্ধকার বিদূরিত করিয়াছে, সুশাসনের শাণিত খরসানে দস্যু তস্কর নিরস্ত হইয়াছে, লোকের ধন মান এবং জীবন সম্পূর্ণরূপে আপদমুক্ত হইয়া সংসারসুখ সুলভ করিয়া তুলিয়াছে; সকলই হইয়াছে; কিন্তু হায়! তথাপি কি অদৃষ্টবিড়ম্বনা! এই গৌরবোজ্জ্বল নবযুগে পদার্পণ করিয়াই এ দেশ জরাপলিত কলেবরে দিন দিন যেন অধিকতর অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে।

* Stewart's History of Bengal.

আজ ভারতেশ্বরীর ষষ্টিসাম্বৎসরিকতম মহামহোৎসবের দিনেও আমাদিগের এই করুণ ক্রন্দন!

শান্তির সুখশীতল ছায়াতলে উপবেশন করিয়াও ভারতবর্ষের দুঃখ দৈন্য দূর হইতেছে না কেন, তাহা সত্য সত্যই সবিশেষ চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। এ কথা এখন ইংলণ্ডে এবং ভারতবর্ষে ঢাকে ঢোলে বাজিয়া উঠিয়াছে; যেখানে দশ জন সম্মিলিত হইতেছেন, সেখানেই কেবল এই কথার আলোচনা হইতেছে; পার্লিয়ামেণ্টের উৎসাহী সভ্য, ভারতশাসনভারপ্রাপ্ত সুযোগ্য রাজপুরুষবর্গ, জ্ঞানী মানী ধনী, কত লোকে ইহার জন্য কত ভাবে মস্তিষ্ককণ্ডূয়ন করিতেছেন। কিন্তু হায়! আজিও ইহার মীমাংসা হইল না, আবার দুর্ভিক্ষ!

এবারকার দুর্ভিক্ষের কথা ধরিও না। দুর্ভিক্ষ দৈববিড়ম্বনা বলিয়া যাহাদের পুরুষানুক্রমিক বিশ্বাস, আজ তাহারা অভাবে পড়িয়া অদৃষ্টকে শতধিক্কার দিয়া কপালে করাঘাত করিতেছে, কিন্তু দুই মুষ্টি অন্ন সঞ্চয় করিতে পারিলে ইহারাই আবার সমস্ত দুঃখ দৈন্য ভুলিয়া গিয়া পিতার শ্রাদ্ধে, কন্যার বিবাহে, শ্যালিকার শুভ সাধভক্ষণে আশাতিরিক্ত অবস্থাতিরিক্ত প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় বাহুল্য করিয়া সহাস্যমুখে ঋণজালে জড়িত হইতে ইতস্ততঃ করিবে না!

এবারকার দুর্ভিক্ষের জন্য ব্যাকুল হইও না; সময় থাকিতে ভারতেশ্বরীর সিংহাসনতলে ক্ষুধার্ত্তের করুণ আর্ত্তনাদ ধ্বনিত হইয়াছে, মাতা অন্নপূর্ণার ন্যায় অভয়বাণী শুনাইয়াছেন, দাসানুদাসেরা অবশ্যই প্রাণপণে প্রজা রক্ষা করিতে ত্রুটি করিবে না। আর তাহারা উদাসীন হইলেই কি ইংলণ্ডের নরনারী আমাদিগকে সহসা লীলাসম্বরণ করিবার অবসর দান করিতে পারে? ইংরাজ অধ্যবসায়শীল স্বার্থরসজ্ঞ বুদ্ধিমান জীব; আমরাই যে ইংরাজ ব্যবসায়ীর পণ্যবীথিকার প্রধান "পাইকের", তাহা তাহারা বিলক্ষণ বুঝিয়াছে; তাহারা এমন সরল খরিদদারকে সহজে মরিতে দিয়া আপন পদে আপনি কুঠারাঘাত করিবে না। আমরা না হয় মরিলাম! কিন্তু আমরা মরিলে যে ম্যাঞ্চেষ্টারের তাঁতিকুল নির্ম্মূল হইবে, তাঁতযন্ত্রে আরশুলা বাসা বাঁধিবে! অতএব ইংলণ্ডের ধনকুবেরদিগের কল্যাণ হউক,—তাঁহারা যেরূপ মুক্তহস্তে স্বার্থরক্ষার সূচনা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা সহজে মরিব না। *

* "The Indian Famine Fund has now reached £ 180,000. The cities of Leeds, Bradford, and Birmingham have subscribed £ 2500, £ 1000, and £ 4000 respectively. Lloyds have given £ 3210 and the Oregun

কিন্তু এমন করিয়া কয় দিন চলিবে? জগতের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাভাণ্ড লইয়া কয় দিন সংসার চালাইব? "ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ",—ইহাই শাস্ত্র-সম্মত উপদেশ। ভিক্ষায় কাহারও কুলায় না, আমাদিগেরও কুলাইবে না; ত্রিশ কোটী নরনারীকে নিত্য ভিক্ষা দিয়া কে কয় দিন বাঁচাইতে পারে?

ভারতবর্ষ যেরূপ সুবিস্তৃত মহাদেশ, ইহার জনসংখ্যা যেরূপ ছিল, কোটী কোটী ভারতবাসী যেরূপ দীন দরিদ্র, তাহাতে নিত্য দুর্ভিক্ষের মূলোচ্ছেদ করিতে না পারিলে, ধনকুবের ইংরাজমণ্ডলী চিরদিন দয়া বাৎসল্যে এ দেশের অন্নক্লেশ বিমোচন করিতে পারিবেন না। ভারতভাগ্যবিধাতৃগণের অপরাধ নাই; তাঁহারা যেমন বুঝিতেছেন, সেইরূপ মন্তব্যলিপিতে রাজ-দপ্তর পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিতেছেন। তথাপি ভারতবাসীর অন্নকষ্ট বিদূরিত হইতেছে না! সুতরাং রোগের মূল নির্ণয় করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। এই কার্য্যে হস্ত-ক্ষেপ করিতে হইলে মহাত্মা জন্ ব্রাইটের উক্তি * স্মরণ করিয়া আলোচনায় অগ্রসর হইতে হইবে, এবং রাজপুরুষেরা এ পর্য্যন্তও যাহা কিছু আলোচনা করিয়াছেন, তাহারও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস অধ্যয়ন করিতে হইবে।

সে ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় "উড়িষ্যার অন্নকষ্ট!" দুর্ভিক্ষ না বলিয়া অন্নকষ্টই বলিলাম; কারণ, অনেকেই সে সময়ে "অন্নকষ্ট" বলিয়া উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ বাক্চাতুরীবলে উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। স্যর সিসিল বীডন্ তখন বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা; তিনি ক্ষুধার্ত্ত উড়িষ্যাবাসীর হাহাকার উপেক্ষা করিলেন, যথাসময়ে সংবাদ পাইয়াও "দুর্ভিক্ষ নহে, অন্নকষ্ট মাত্র" এই বলিয়া ধূয়া ধরিলেন, স্থানীয় রাজপুরুষেরা তাহাই প্রাণপণে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এইরূপে গ্রীষ্মকাল কাটিয়া গেল; বর্ষার তরল তরঙ্গে নদনদী তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল, মুষলধারায় বারিবর্ষণ হইয়া পথ ঘাট

Gold Company £ :525. The Executive committee of the Manchester Fannise Fund, of which Sir Frank Forbes Adam is Chairman, have collected £ 25,000—The Englishman.

* I must say that it is my belief that if a country be found possessing a most fertile soil, and capable of bearing every variety of production and that notwithstanding, the people are in a state of extreme destitution and suffering, the chances are there is some fundamental erro in the Government of that country.—John Bright.

কর্দ্দমলিপ্ত করিয়া তুলিল, উড়িষ্যার গমনাগমনপথ অবরুদ্ধ হইয়া গেল। যখন ক্ষুধার্ত্ত উড়িষ্যাবাসী সত্য সত্যই বনে জঙ্গলে নদীতীরে সমুদ্রসৈকতে গৃহপ্রাঙ্গনে হাহাকার করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল, তখন দুর্ভিক্ষের অস্তিত্বে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। কিন্তু তখন আর প্রজারক্ষা করা সহজ হইল না; সরকারী দপ্তরেই প্রকাশ আছে যে, সেবার দশ লক্ষ উড়িয়া অনাহারে ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল।

উড়িয়া মরিল, কিন্তু এই অমঙ্গল হইতেই মঙ্গলবীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। অপমৃত্যুর শোকসন্তাপে ভারতরাজপ্রতিনিধি সিমলাশৈলবিহারী স্যার জন লরেন্স বিচলিত হইলেন, অনুসন্ধান-সমিতি গঠিত হইল। ভারতরাজপ্রতিনিধি স্যার জন লরেন্স, ভারতরাষ্ট্রসচিব লর্ড ক্রানবোরন্ এবং সমিতির সভ্য স্যার জর্জ্জ ক্যাম্বেলের কৃপায়, উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষের বহুব্যয়সাধ্য সুবৃহৎ ইতিহাস সঙ্কলিত হইল।

কিছু দিন পরে বিহারে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইল। লর্ড নর্থব্রুক্ তখন ভারতরাজপ্রতিনিধি; তিনি উড়িষ্যার অপমৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়া সূচনাতেই ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, বিহারে মহা দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত হইয়াছে। ডিউক অব্ আরগাইল তখন ভারতের রাষ্ট্রসচিব; তিনি লিখিয়া পাঠাইলেন;—"যত ব্যয়বাহুল্য হয় হউক, অন্নাভাবে কাহারও যেন অপমৃত্যু সংঘটিত না হয়।" স্যার রিচার্ড টেম্পল সাহেবের কল্যাণে বিহারে সাড়ে ছয় কোটী টাকা ব্যয় হইয়া গেল, কিন্তু দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল না! লোকে উপহাস করিতে লাগিল;—যাহারা উড়িষ্যার হাহাকারে কর্ণপাত না করিয়া লোকের অপমৃত্যুর পথ সহজ করিয়া দিয়াছিল, তাহারাই বিহারে অর্থের অপব্যয় করিল বলিয়া চারি দিকে টিট্কারী পড়িতে লাগিল;—গবর্মেণ্ট সদুদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করিয়াও কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন

ইহার পর যখন মাদ্রাজে কালের চিতা জ্বলিয়া উঠিল, তখন গভর্মেণ্ট বড়ই সাবধানে সতর্ক দৃষ্টিতে পদক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। ধীরে—অতি ধীরে—সুবিহিত সতর্ক দৃষ্টিতে,—সুমন্থর মৃদুমন্দ গতিতে—দুর্ভিক্ষনিবারণের আয়োজন হইতে লাগিল। লোকে তত দিন দুঃখ ক্লেশ বহন করিতে পারিল না; তাহারা রোগে শোকে অনাহারে হাহাকারে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল!

ভারত দুর্ভিক্ষের এই সকল বিড়ম্বনা বিদূরিত করিবার জন্য এক 'রয়াল

কমিশনের' সৃষ্টি হয়; তাহার কল্যাণে এখন দুর্ভিক্ষের বিধি বিধিবদ্ধ হইয়াছে;—দুর্ভিক্ষের সূচনায়, দুর্ভিক্ষের সময়ে, দুর্ভিক্ষাবসানে, কখন কিরূপ ভাবে কার্য্য করিতে হইবে, তাহা স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে। এই রাজবিধি সমালোচনা করিবার উপযুক্ত অবসর শীঘ্রই উপস্থিত হইবে। এখন কেবল ইহাই বুঝিতেছি যে, 'দুর্ভিক্ষ' সঙ্গের সঙ্গী হইয়াছে বলিয়া রাজপুরুষেরাও বুঝিয়াছেন, নচেৎ তাঁহারা দুর্ভিক্ষের জন্য রাজবিধি সঙ্কলন করিতেন না।

রাজপুরুষদিগের সিদ্ধান্ত ভ্রমসঙ্কুল নহে;—ভারতবর্ষ যেরূপ বহুবিস্তৃত মহাদেশ, এ দেশে অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি শস্যনাশের হেতু সর্ব্বদাই বর্ত্তমান। এ দেশে প্রতি বৎসরেই কোন না কোন প্রদেশে শস্যহানি-জনিত অন্নক্লেশ সমুপস্থিত হওয়া বিচিত্র নহে। সুতরাং দুর্ভিক্ষনিবারণের স্থায়ী তহবিল সৃষ্টি করিবার জন্য গভর্মেণ্ট নূতন রাজকর সংস্থাপন করিতে অগ্রসর হইলেন। লোকে বুঝিল না,—অনেকে অনেকরূপ কটু কাটব্য করিতে লাগিল, কেহ কেহ গভর্মেণ্টের সাধু সঙ্কল্পের প্রতিবাদ করিয়া লর্ড লিটনকে বিরক্ত করিয়া তুলিল; লোকের কিরূপ কুসংস্কার, তাহারা ভাবিল যে, গভর্মেণ্ট হয় ত দুর্ভিক্ষের ধূয়া ধরিয়া টেক্স বসাইয়া অন্য কার্য্যে তাহার অপব্যয় করিয়া ফেলিবেন। গভর্মেণ্ট এই অমূলক আশঙ্কা বিদূরিত করিবার জন্য প্রকাশ্যে মন্তব্যলিপি প্রচার করিয়া ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলেন:—

"The sole justification for the increased taxation which has just been imposed upon the people of India for the purpose of ensuring this Empire against the worst calamities of future famine, so far as an insurance can now be practically provided, is the *pledge* we have given *that a sum not less than a million and a half sterling*, which exceeds the amount of the additional contributions obtained from the people for this purpose, *shall be annually applied to it*."*

সরকারী হিসাবে প্রকাশ যে, ১৮৭৮—৭৯ হইতে ১৮৯৩—৯৪ পর্য্যন্ত ১৬ বৎসরে প্রায় ১৭৪২৯৫৯২ টাকা দুর্ভিক্ষ-তহবিলে সংগৃহীত হইয়াছে। লর্ড লিটনের ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞা অনুসারে বৎসরে দেড় কোটী টাকা দুর্ভিক্ষ নিবারণোদ্দেশে পৃথক রাখিবার কথা ছিল। সুতরাং এই ষোল বৎসরে অবশ্যই ২৪ কোটি টাকা দুর্ভিক্ষ-তহবিলে জমা পড়িয়াছে। বর্ত্তমান বাজার দরে বৎসরে ২৪০০০০০০ টাকা দুর্ভিক্ষ-তহবিলে জমা হওয়া উচিত। তন্মধ্যে

* Minute of Lord Lytton, 12th March, 1878.

১৬০০০০০০ টাকা মাত্র গভর্মেণ্ট বৎসর বৎসর দুর্ভিক্ষনিবারণোদ্দেশে ব্যয় করার কথা শুনা যাইতেছে;—অবশিষ্ট টাকা কি হইল?

হিসাব লইবার চেষ্টা করা বৃথা। তহবিলের টাকা তহবিলেই থাকুক, আর অন্য কোন অবশ্যপ্রয়োজনীয় রাজকার্য্যে ব্যয়িত হইয়া থাক, এ সময়ে তাহার আলোচনা করিয়া বিশেষ লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। তহবিলে প্রচুর অর্থ সঞ্চিত থাকিলেই বা কি হইত? দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে টাকায় তাহার গতিরোধ করা যায় না;—আয়োজন অনুষ্ঠান করিতে করিতেই কত লোক মানবলীলা সম্বরণ করে। যখন দুর্ভিক্ষ-তহবিলের সৃষ্টি হয় নাই, তখনও লোক মরিয়াছে; এখন যে দুর্ভিক্ষ তহবিল আছে, দুর্ভিক্ষের আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, এ দেশে এবং বিলাতে চাঁদা উঠিতেছে, এখনও লোক মরিতেছে! দুর্ভিক্ষের মূলোচ্ছেদ করিতে না পারিলে সাময়িক অর্থভাণ্ডার লইয়া দুর্ভিক্ষে প্রজা রক্ষা করা অসম্ভব।

আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান;—অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা ৮০ জনই কৃষক। অনেকের ধারণা এই যে, আমাদের কষ্টসঞ্চিত শস্যে ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ হয়,—কেবল সেই জন্যই আমরা প্রচুর শস্যোৎপাদন করিয়াও দু' বেলা দু' মুঠা ক্ষুধার অন্ন সঞ্চয় করিতে পারি না; স্বাধীন বাণিজ্যের ছলনা করিয়া বিলাতের লোকে বীজধান্যও তুলিয়া লইয়া যায়। সরকারী কাগজপত্রে কিন্তু ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমাদের ধান্য এবং গোধূমের আদর ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে, বিলাতের লোকে আর তাহা পূর্ব্বের ন্যায় আগ্রহে ক্রয় করিতেছে না; আমেরিকার কৃষককুল আমাদিগকে কৃষিব্যবসায়ে পরাজিত করিয়াছে। এখন পূর্ব্বাপেক্ষা দেশের শস্য দেশেই অধিক পরিমাণে পড়িয়া থাকিতেছে; * কিন্তু তথাপি অন্নকষ্ট দূর হইতেছে না কেন?

কেহ কেহ বলেন যে, দেশের লোকের বিলাস-বাসনা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে বলিয়া তাহারা অর্থোপার্জ্জনের আশায় খাদ্যদ্রব্যের পরিবর্ত্তে নীল, পাট প্রভৃতির আবাদে শস্যক্ষেত্র নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। নীল এবং পাটের চাষের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনেক খাল, বিল, "পয়স্ত" হইয়া ধানের আবাদও ক্রমে বহুবিস্তৃত হইতেছে; সুতরাং আমাদের অন্নকষ্টের মূল কোথায়?

কাহারও কাহারও বিশ্বাস এই যে, লোকসংখ্যা বড়ই বাড়িয়া উঠিয়াছে;

* এ দেশের চাউল এবং গমের রপ্তানি পূর্ব্বাপেক্ষা এখন ক্রমেই কম হইতেছে; আমেরিকার গম ভারতবর্ষের গমের দর মাটি করিয়া দিয়াছে।

দেশের ধনধান্যে এখন আর দেশের লোকের উদরপূর্ত্তি হইতে পারে না। কিন্তু ইংলণ্ডের ধনধান্যে কি ইংলণ্ডের লোকের উদরপূর্ত্তি হইয়া থাকে? তবে তাহারা দুর্ভিক্ষে জীবন্মৃত হয় না কেন?

জাতীয় ধনের অবনতি, জাতীয় শিল্প বাণিজ্যের অধোগতি, দেশীয় লোকের নানারূপ ভ্রম, কুসংস্কার এবং জড়তাই কি আমাদের এইরূপ ধারাবাহিক অন্নক্লেশের যথার্থ কারণ নহে?

শিল্প বাণিজ্যেই জাতীয় ধনের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। যে জাতির শিল্প বাণিজ্য ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে, তাহারা স্বদেশজাত শিল্পদ্রব্য বিদেশে বিক্রয় করিয়া দেশ বিদেশের ফল শস্য আপন দেশে বহন করিয়া আনিতেছে; স্বদেশে শস্যহানি হইলেও, দুর্ভিক্ষ তাহাদের নিকট ক্ষমতা বিস্তার করিতে পারিতেছে না।

গত বর্ষে আমাদের দেশে ন্যূনাধিক ১১৬৯৪৯০০০ বিঘা ধানের আবাদ হইয়াছিল; পাটের আবাদ ৬৮১৪৮০০ বিঘার বেশী হয় নাই। এই ১১৬৯৪৯০০০ বিঘায় যদি আশানুরূপ ধান ফলিত, এবং কৃষাণের গৃহস্থালীতে কিঞ্চিৎ মজুদ থাকিত, তবে আর বিগত হৈমন্তিক ধান্যের ক্ষতিতে বাঙ্গালীর কিছুমাত্র অন্নকষ্ট উপস্থিত হইত না। কিন্তু যে দেশের কৃষিকার্য্য নদীর জল এবং আকাশের বর্ষণের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে, সে দেশে এরূপ শস্যহানি হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে; ধানের আবাদ শতগুণ বর্দ্ধিত হইলেও বাঙ্গালীর অন্নকষ্ট ঘুচিতে পারে না।

ধানের দাম চড়িয়াছে, লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে, শ্রমজীবীদিগের আয় পূর্ব্বের ন্যায় সমানই রহিয়া গিয়াছে;—এরূপ অবস্থায় সামান্য অন্নকষ্টেই লোকের জীবননাশের সম্ভাবনা। কাজেই বাঙ্গালী কাঁদিতেছে,—দু' দিন পরে কাঁদিতে কাঁদিতে দলে দলে জীবনবিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইবে!

রূপার দাম কমিয়া গিয়াছে। এখন আমাদের টাকা আর ষোল আনা নাই, বিদেশের লোকে তাহার ১৩১/২ পেনীর অধিক মূল্য নির্দ্দেশ করে না। অথচ আমাদিগকে পরিধানের বস্ত্র, রোগের ঔষধ, সন্ধ্যাদীপের দিয়াশলাই কাঠি পর্য্যন্তও বিদেশের কাছে ক্রয় করিতে হয়। এই সকল কারণে আমাদের আয়ের অধিকাংশ ভাগই বিদেশে চলিয়া গিয়া জীবনধারণের জন্য যৎসামান্যমাত্র হাতে থাকে; বাজার মন্দা থাকিলে তাহাতে এক সন্ধ্যার আহার সংগ্রহ হয়; বাজার চড়িয়া গেলে হাহাকার করিতে হয়!

মামলা মোকদ্দমা না করিয়া সংসার চলে না;—মামলা মোকদ্দমার খরচ ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। বিচারক্রয় করিতে গিয়াও আমাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। যে দিক দিয়া দেখ,—খরচের অঙ্ক বাড়িয়া চলিতেছে, টাকার মূল্য হ্রাস পাইতেছে, আয়ের পথ সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে; সুতরাং দুর্ভিক্ষ আমাদের সঙ্গের সঙ্গী হইয়া উঠিয়াছে;—আমরা তাহাকে ছাড়াইতে চাহিলে কি হইবে? সে আমাদিগকে ছাড়িবে কেন?

এই নিত্য দুর্ভিক্ষ রোগ দূর করিবার কি কোন সদুপায় নাই? উপায় চিন্তা করিতে বসিলেই বলি,—গভর্মেণ্ট ইচ্ছা করিলেই দূর হইতে পারে। কিন্তু আমরা ইচ্ছা করিলে কি ইহা দূর হইতে পারে না? আমরা যদি হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকি, এবং গভর্মেণ্ট একাকী দুর্ভিক্ষ দূর করিবার জন্য চেষ্টা করেন, তাহাতে কোন ফল হইতে পারে না;—আবার আমরা যদি প্রাণপণ চেষ্টা করি, অথচ গভর্মেণ্ট কিছুই সহায়তা না করেন, তাহা হইলেও কিছুই ফল হইতে পারে না।

জাতীয় ধনবৃদ্ধির জন্য শিল্প বাণিজ্যের আশ্রয় গ্রহণ করাই দুর্ভিক্ষ নিবারণের একমাত্র প্রকৃত সদুপায়। কিন্তু ইহাতে রাজা প্রজা উভয়েরই সহায়তা আবশ্যক। দেশের শিল্পবাণিজ্য যাহাতে বিদ্ধস্ত না হইয়া ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করে, তৎকল্পে রাজবিধির সহায়তা চাই। আবার দেশের চিরাগত কুসংস্কার কুরীতি প্রবল হইয়া যাহাতে শিল্পবাণিজ্যের গতিরোধ না করে, তৎকল্পে আমাদিগের প্রাণপণ চেষ্টার আবশ্যক।

শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি করিতে হইলে 'অসভ্য জাপানের' ন্যায় 'সুসভ্য ভারতবাসীকেও' দেশবিদেশে জ্ঞানার্জ্জনের জন্য সমুদ্রযাত্রা করিতে হইবে। আমরা ঘরে পড়িয়া মরিব, সময়ে অসময়ে গভর্মেণ্টকে লক্ষ্য করিয়া কটুকাটব্য কহিব, কিন্তু সমুদ্রযাত্রা—সর্ব্বনাশ! সাধ্যসত্ত্বে কাহাকেও তাহাতে উৎসাহদান করা দূরে থাকুক, পারি ত তাহাকে বিবিধবিধানে নির্য্যাতন করিয়া 'আদর্শপূর্ণ মনুষ্যের লীলাভূমি' আর্য্যাবর্ত্তে বাঁধিয়া রাখিয়া দুর্ভিক্ষে অনাহারে সদলবলে জীবন বিসর্জ্জন করিব! আমাদিগের নিত্য দুর্ভিক্ষের মূলোচ্ছেদ করিবে কে?

সহযোগী সাহিত্য।

ভ্রমণবৃত্তান্ত।

ন্যানসেনের মেরুভ্রমণ।

ন্যানসেনের নাম আজ জগদ্বিখ্যাত; সভ্য জগতে
সুমেরু প্রদেশ আবিষ্কার চেষ্টায় গমনের জন্য ন্যানসেনের নাম আজ জগদ্বিখ্যাত; সভ্য জগতে
আজ তাঁহার অতুল প্রশংসা। সম্প্রতি তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। যে দেশের
সর্ব্বপ্রধান কবি মধুসূদন দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, সে দেশের পাঠক-
গণ কল্পনাও করিতে পারিবেন না যে, কেবল ইংরাজী সংস্করণের জন্য লেখক দশ সহস্র
পাউণ্ড পাইয়াছেন। সেই ভ্রমণবৃত্তান্ত ও অন্য কতকগুলি প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া আমরা
তাঁহার জীবনী ও কার্য্যের কিছু পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

মেরু প্রদেশ।

মেরু প্রদেশ চিরদিন অজ্ঞেয় রহস্যে পূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইত। অনন্তপ্রসারিত অমল-
ধবল তুষারবসনাবৃত হইয়া সেই প্রদেশ, জগতের আদিকাল হইতে এক প্রাণহীন মহাস্বপ্নে
অভিভূত ছিল,—সেখানে মানবের পদধূলি আপনার কলঙ্কচিহ্ন
রাখিয়া যায় নাই—সেই তুষারশয়নে শয়ন করিয়া সুমেরু তাহার
যুগব্যাপী মহাস্বপ্নে ব্যাপৃত ছিল। বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া কেহ সে স্বপ্ন ভাঙ্গিবার চেষ্টা করে
নাই। জ্ঞানের বিস্তারের সহিত, মানবের জ্ঞানপিপাসা আরও বর্দ্ধিত হইতেছে; তাই
অজ্ঞেয় রাজ্যের সীমাও অতিক্রান্ত হইতে লাগিল। পরিশেষে প্রকৃতির তুষার-মন্দির সুমেরু
ভিন্ন সর্ব্বত্র মানবের গতি অক্ষুণ্ণভাবে পরিচালিত হইতে লাগিল। কেবল মেরু প্রদেশে
তুষার ও কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন রহস্য অজ্ঞেয় রহিয়া গেল—মেরু প্রদেশে ভ্রমণকারীদিগের
সকল চেষ্টা বিফল হইল, সেখানে জ্ঞানপিপাসু ভ্রমণকারীদিগের শ্মশান সৃজিত হইতে
লাগিল। কিন্তু এত দিনে ন্যানসেন প্রমাণ করিয়াছেন যে, সুমেরু-ভ্রমণ অসাধ্যসাধন নহে।

ন্যানসেন।

ন্যানসেনের জীবনচরিতের ইংরাজী অনুবাদক মিষ্টার আর্চার তাঁহার নিরাপদে স্বদেশে
প্রত্যাবর্ত্তনসম্বন্ধে বিশেষ সন্দিহান ছিলেন; কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া তিনিই এখন বলিতেছেন
যে, পূর্ব্বদৃষ্টি, কৌশল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা থাকিলে, মেরুপ্রদেশভ্রমণ
ডোভার প্রণালী অতিক্রম অপেক্ষা অধিক সঙ্কটশঙ্কিল নহে।

ন্যানসেন বংশ চিরদিনই অসমসাহসী, দুঃসাহসিক কার্য্যপ্রিয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে
ন্যানসেন বংশের এক জন রুশ সম্রাটের জন্য শ্বেত সাগরের উপকূলভাগ পরিদর্শন করেন।
তৎপরবর্ত্তীগণ স্বদেশের বিপদসঙ্কুল রাজনীতিক্ষেত্রে যোগদান করিয়াছিলেন। ন্যানসেনের
পিতা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, রক্ষণশীল ও সেকেলে ধরণের লোক ছিলেন। তিনি বীরসন্তানদিগকে
কোনরূপে বিলাসী হইতে দেন নাই। সন্তানগণ নিজ খরচ বাবদে অল্প যাহা কিছু পাইত,
তাহাদিগকে তাহার আবার পুরা হিসাব দাখিল করিতে হইত।

ন্যানসেনের বাল্যজীবন গ্রেট ফ্রোয়েনে অতিবাহিত হইয়াছিল। সেখানে সেই তুষার-
রাশি দেখিয়াই বালক ন্যানসেনের হৃদয়ে প্রথম দিগন্তভ্রমণস্পৃহা জাগিয়া উঠিয়াছিল।
ক্রিশ্চিয়ানায় প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ন্যানসেন সামরিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন,
কিন্তু প্রাণিতত্ত্বশিক্ষার জন্য তিনি সে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন।

প্রথম যাত্রা।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক কলেটের পরামর্শানুসারে পিতার অনুমতি লইয়া ন্যানসেন
প্রথম মেরু প্রদেশে যাত্রা করেন। মেরু প্রদেশের প্রথমদর্শনবর্ণনা আমরা ন্যানসেনের
ডায়েরী হইতে অনুবাদ করিয়া দিলাম। তিনি লিখিয়াছেন, "আমরা
নরওয়ে হইতে ক্রমাগত সাত দিন উত্তরাভিমুখে চলিলাম। উত্তর

সাগরে প্রবল ঝটিকা বহিতেছিল; পাল খাটাইয়া আমরা সেই উত্তুঙ্গতরঙ্গসঙ্কুল সাগর অতিক্রম করিলাম। আমরা চলিতে লাগিলাম; একটা হরিত 'সি-গল' পক্ষী দেখিয়া প্রথম বুঝিলাম যে, আমরা বরফাকীর্ণ প্রদেশের নিকটে আসিয়াছি। তীর হইতে শত শত মাইল দূরে নীলসাগরের উপর ঐ বিহগ যেন প্রহরী রহিয়াছে। দুই দিন ধরিয়া সে আমাদিগের অনুসরণ করিল—সাগর ক্রমেই গাঢ় সবুজ হইয়া আসিতে লাগিল। সপ্তম দিবস সন্ধ্যাকালে জাহাজে রব উঠিল,—বরফ দেখা যাইতেছে। বাহিরে ছুটিয়া আসিলাম; তিমিরাবগুণ্ঠিতা রজনী। সহসা দূরে বহুদূরব্যাপী কি একটা শ্বেত পদার্থ দেখিতে পাইলাম। সেই তুষারগিরি যতই নিকটে আসিতে লাগিল, ততই বৃহৎ ও উজ্জ্বল শ্বেত দেখাইতে লাগিল। সেই অন্ধকার রজনীতে, সেই অন্ধকার অম্বরতলে, সেই অন্ধকার সাগরে, সেই শ্বেত তুষারগিরি ভাসিয়া চলিতেছে। একে একে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুষারগিরি ভাসিয়া গেল; সমুদ্রের তরঙ্গমালা তাহাদের গাত্রে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। সহসা অন্ধকারাবৃত উত্তর গগন আলোকে উদ্ভাষিত হইয়া উঠিল। চক্রবালে সে আলোক অত্যন্ত উজ্জ্বল—তাহার উপরেও আকাশে আলোক ব্যাপ্ত;—যেন প্রেতজগতের আলোক! তাহার পর বরফের উপর সাগরের তরঙ্গাঘাতশব্দ সেই স্তব্ধ রজনীর নিস্তব্ধতা ভগ্ন করিতে লাগিল।"

যদিও ন্যানসেন প্রাণিতত্ত্বশিক্ষার জন্য গমন করিয়াছিলেন, তথাপি শিকারে তিনি উপেক্ষা করেন নাই। দেশে ফিরিয়া তিনি মধুরপ্রকৃতি প্রখ্যাতনামা প্রাণিতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার ডেনিয়েলসেনের অধীনে বারজেন মিউজিয়মে অধ্যক্ষের পদলাভ করেন। ন্যানসেনের ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মেরু-প্রদেশযাত্রার পূর্ব্বে এই বৃদ্ধ ডাক্তারই লিখিয়াছিলেন,—"তোমার গ্রীনল্যাণ্ড ভ্রমণের সাফল্য সম্বন্ধে আমার সন্দেহ ছিল; তোমার মেরুপ্রদেশভ্রমণের সাফল্য সম্বন্ধে আমি আদৌ সন্দিহান নহি। আমি সব বিবেচনা করিয়া এ কথা কহিতেছি। ন্যানসেন! যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীরা নানা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া মেরুপ্রদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, তখন দেশব্যাপী অভ্যর্থনার আনন্দধ্বনিতে আমার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর মিশাইবার অবসর হয় ত আমি পাইব না। তাই মরিবার পূর্ব্বে আমি এখনই তোমাকে অভ্যর্থনা করিয়া রাখিতেছি। ন্যানসেন! মনে রাখিও, তোমার পত্নী ইভা ভিন্ন আমার মত হৃদয়ের সহিত অভ্যর্থনা তোমাকে আর কেহ করিতে পারিবে না। তুমি সফলকাম হইবে।"

ব্যারণ নর্ডেল্স্কিওল্ড ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীণল্যাণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, ন্যানসেনের মেরুপ্রদেশে গমনেচ্ছা পুনরুদ্দীপিত হইয়া উঠে। ব্যারণই প্রথম গ্রীণল্যাণ্ড ভ্রমণে সফলমনোরথ হইয়াছিলেন। এই সময় ন্যানসেন তাঁহার পিতাকে লেখেন যে, এই সকল দুঃসাহসিক কার্য্যের কথা শুনিলে তাঁহার জ্ঞানপিপাসা ও ভ্রমণস্পৃহা এতই প্রবল হইয়া উঠে যে, তাহা দমন করিয়া পুনরায় মানসিক শান্তি লাভ করিতে তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হয়। ফ্রাঙ্কলিন, লিভিংষ্টোন, ষ্ট্যান্লি প্রভৃতি সকলেরই এই রোগ ছিল। চারি বৎসর পরে ন্যানসেনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, তিনি যাত্রা করেন। যাইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। খরচের সামান্য তিন শত পাউণ্ডও তাঁহাকে ডেনমার্ক হইতে সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। গ্রীণল্যাণ্ড-যাত্রার কিছু পূর্ব্বে ২৪শে এপ্রিল তারিখে তিনি "ডাক্তার" উপাধি লাভ করেন।

বিবাহিত জীবন।

গ্রীণল্যাণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিবাহ করেন। ন্যানসেন-পত্নী অতি সুন্দর গাহিতে পারেন,—ন্যানসেন আপনিও সঙ্গীতপ্রিয়। শ্রীমতী ন্যানসেন বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক সার্সের দুহিতা; তাঁহার জননী নরওয়ের খ্যাতনামা কবি ওয়েল হ্যাভেনর ভগিনী। তাঁহার দুই

ভ্রাতা ও এক ভগিনী আছেন। ভগিনী তাঁহার মত সুগায়িকা। ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ
আর্নেষ্ট এক জন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক; তিনি সাহিত্য-জগতে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।
কনিষ্ঠ ওসিয়ান ক্রিশ্চিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যার অধ্যাপক।

ন্যানসেনের প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে শ্রীমতী ন্যানসেন Strand Magazine পত্রিকার
মিষ্টার বেনের নিকট বলিয়াছিলেন যে, "তাঁহার স্বামী যে নিরাপদে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন,
সে বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই; সে সন্দেহ থাকিলে তিনি কিছুতেই স্বামীকে
যাইতে দিতেন না। তাঁহার স্বয়ং স্বামীর সহিত যাইবার ইচ্ছা ছিল,—স্বামীও স্বীকৃত
ছিলেন; কেবল জাহাজের কাপ্তেন আপত্তি করাতেই তাঁহার যাওয়া হয় নাই। তাঁহার
বিশ্বাস, তিনি এ যাত্রার সকল কষ্ট সহ্য করিতে পারিতেন। বিবাহের অল্প দিন পরে
একবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল,—'স্বামীর সহিত তাঁহার যাইতে ইচ্ছা করে কি
না?' তখন তিনি উত্তর দিয়াছিলেন,—'তাঁহার সে ইচ্ছা হয় না, কারণ তাঁহার মতে এ
সকল কার্য্য রমণীর নহে।' এখন বিপদে স্বামীর নিকটে থাকাই তাঁহার ইচ্ছা।" স্ত্রীপ্রকৃতি
এইরূপই বটে! ন্যানসেনের একটি মাত্র কন্যা—লিভ।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ন্যানসেন সুমেরু যাত্রা করেন। এবার খরচ, সঙ্গী, নাবিক, সবই নরওয়ে
হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। নরওয়ের গবর্মেণ্ট ১৫৭৫০ পাউণ্ড ও রাজা ১১২৫ পাউণ্ড
দিয়াছিলেন; মোট আয় হইয়াছিল ২৫ হাজার পাউণ্ড। ন্যানসেন

মেরু-যাত্রা।

সঙ্গে কোনরূপ মাদক দ্রব্য লইয়া যান নাই। তিনি মদ্য বা কোন-
রূপ উত্তেজক দ্রব্য ব্যবহারের বিরোধী। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে জাহাজ ত্যাগ করিয়া ন্যানসেন ও
জোহানসেন উত্তরাভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহারা পঞ্চদশ মাস ক্রমাগত বরফের উপর
ভ্রমণ করেন।

এই ভ্রমণ এতই ঘটনাবহুল যে, তাহার কোনরূপ সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত প্রদান করা সম্ভব
নহে। সে বৃত্তান্ত জানিতে হইলে পাঠককে ন্যানসেনের নবপ্রকাশিত ভ্রমণবৃত্তান্ত—
Farthest North পাঠ করিতে হইবে। গমনকালে ন্যানসেনের মনোভাব যেরূপ হইয়া-
ছিল, সে সম্বন্ধে তাঁহার কথার অনুবাদ করিয়া দিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব :—

"নিদাঘের দিনমান—শেষকালে বিদায়গ্রহণের কাল উপস্থিত হইল। গৃহ হইতে বাহির
হইলাম, এবং একাকী উদ্যান পার হইয়া সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলাম। আমাকে ছোট
জাহাজে উঠিয়া 'ফ্র্যাম' জাহাজে উঠিতে হইবে। আমার যাহা কিছু প্রিয়, সবই পশ্চাতে—
আর সম্মুখে? কত দিনে আবার এই সকল দেখিতে পাইব? তখন ফিরিতে পারিলে আমি
সর্ব্বস্ব দিতে প্রস্তুত ছিলাম। একটা বাতায়নে বসিয়া লিভ করতালি দিতেছিল। হায়
শিশু!—তুমি জান না, জীবনে সুখদুঃখ কিরূপভাবে মিশ্রিত, জীবনে কত পরিবর্ত্তন সংঘটিত
হয়। জাহাজ আমাকে লইয়া তীরবৎ বেগে উপকূল ত্যাগ করিল।"

ন্যানসেন এখন কুমেরুযাত্রার কল্পনা করিতেছেন; তাহার পর আর একবার সুমেরু-
গমনের ইচ্ছাও তাঁহার আছে।

সাহিত্য।

ইংরাজী সাহিত্য।

প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবক মিষ্টার অ্যাণ্ড্রু ল্যাং গত ফেব্রুয়ারী মাসের "গুড্‌ওয়ার্ডস্‌" পত্রে মহারাণী
ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে ইংরাজী সাহিত্যের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। সেই প্রবন্ধ
অবলম্বন করিয়া আমরা ইংরাজী সাহিত্য সম্বন্ধে কতিপয় কথার আলোচনা করিব।

প্রথম দর্শনেই দৃষ্ট হইবে যে, শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ললিত কলার অবনতি হইতেছে।
তবে হিসাব পরিষ্কার করিলে জমার ঘরে যে কিছু থাকে না, এমন নহে। সাহিত্যের এই-

প্রথম কথা।

রূপ অবস্থার প্রধান কারণ, কর্ম্মের কোলাহল; প্রজাতন্ত্র, টেলিগ্রাফ,
সংবাদপত্র প্রভৃতির বিস্তারের এই ফল।

ভিক্টোরিয়ান যুগের কবিদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান অবশ্য টেনিসন ও ব্রাউনিং। ইঁহাদের
উভয়ের রচনার দুই ভাগ আছে; একটা সমসাময়িক, একটা সর্ব্বকালীন; একটা একেবারে

কবি ও কাব্য।

ভিক্টোরিয়ান, একটা সর্ব্বকালীন। প্রথম ভাগ ইঁহাদিগের সাফল্যের
সোপান, দ্বিতীয় ভাগ ইঁহাদের যশঃস্তম্ভ। টেনিসন ও ব্রাউনিংএর
পূর্ব্বেই অবশ্য ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ। পোপ, এডিসন প্রভৃতির হস্তে কবিতা কারারুদ্ধা পরীরাণীর
অবস্থা পাইয়াছিল। আদব কায়দার জ্বালায়, মার্জ্জিত ভাষার অনুরোধে ভাববিসর্জ্জনের
অত্যাচারে, কবিতা স্বাভাবিকতা হারাইয়া কৃত্রিমতার শত বন্ধনে বদ্ধ হইয়া পড়িতেছিল।
প্রথমে কবি কাউপার এ পথ হইতে অন্য পথে গিয়াছিলেন। কাউপারে যাহার অঙ্কুর, ওয়ার্ডস্‌-
ওয়ার্থে তাহা মুকুলিত। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ আপনি একটি স্বতন্ত্র "স্কুল"; তাঁহার অনুকরণে কেহ
সফল হইতে পারেন নাই। তাঁহার ভাষা, তাঁহার ভাব, তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি। প্রকৃতির
শোভা, স্নেহ, ভালবাসা প্রভৃতি মনোবৃত্তির মোহকর প্রভাব, নীতির নিয়ম, তাঁহার মত
করিয়া আর কেহ দেখিতে পারেন নাই। তদ্ভিন্ন সভ্যতার শৈশবাবস্থায়, শিক্ষার প্রথম
বিস্তারকালে, মানব প্রকৃতিতে যেমন ধর্ম্ম মিশাইয়া ফেলিয়াছিল, প্রকৃতিকে যে ভাবে
দেখিয়াছিল, সরলহৃদয় ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তেমনই করিয়াছিলেন। মিষ্টার ল্যাং যে কর্ম্মকোলা-
হলের কথা বলিয়াছেন—তাহা লইয়া লেখকদিগের মধ্যে বড় মতভেদ দৃষ্ট হয়। কিছু দিন পূর্ব্বে
লর্ড মেকলে বলিয়াছিলেন যে, মধ্যাহ্নে সঙ্গীত হয় না। কথাটার একটু বিচার আবশ্যক।
মানবের গঠিত দ্রব্যসমূহ যেমন উন্নতি প্রাপ্ত হয়, মানবও তেমনই উন্নত হয়—প্রকৃতপক্ষে
মানবের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই ঐ সকলের উন্নতি হইয়া থাকে। মানবের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের
উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানবের কৃত দ্রব্যাদিরও উন্নতি হইতেছে। কেবল কি মানবের জ্ঞান ও
অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানবের প্রিয় কবিতারই অবনতি হইবে? কবিতারচনার ক্ষমতা
বা কবিতারসাস্বাদক্ষমতা কিছু বিস্ময়কর নহে; সে সমুদয় ক্ষমতা এক এক জন লোকের উপর
খামখেয়ালি ভাবে অর্পিত হয় না। পরিশ্রম ভিন্ন প্রতিভার উন্নতি নাই। ক্ষমতা অনেকের
থাকে, কাহারও অল্প, কাহারও অধিক। আবার কাহারও অনুশীলনবশতঃ তাহা বর্দ্ধিত
হয়, কাহারও অনুশীলনের অভাবে তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। কবিতা সৌদামিনীর মত
মনোরম; সৌদামিনীর মত সর্ব্বত্র বিস্তারিত। দর্শন প্রভৃতি হইতে বর্ণনাপ্রধান কবিতার
উৎপত্তি; প্রেমাদি বৃত্তি হইতে নাটকোপযোগী কবিতার উৎপত্তি; আবেগ হইতে গীতি-
কবিতার উৎপত্তি; চিন্তা হইতে দার্শনিক কবিতার উৎপত্তি। ভাবাবেশে অতি মূর্খও যে
কথা বলে, তাহা কবিতার মত—আকুলতার সময় অতি কর্ম্মপ্রবণ ব্যক্তিও কবিতা অনুভব
করে। আবার কবিতার উপযোগী বিষয়েরও অভাব নাই। যে ব্যক্তি একদিন সূর্য্যোদয়
হইতে সূর্য্যাস্তকাল পর্য্যন্ত যথাসম্ভব দর্শন করিয়া মনে করে যে, প্রকৃতিতে দেখিবার আর
কিছুই নাই, সে নিতান্তই ভ্রান্ত। পাঠকসম্প্রদায় বর্ণনাবহুল কবিতার বাহুল্যে বিষম বিরক্ত।
কথাটা সত্য কি? এক ভাবের একরূপ পুনরুক্তিই বিরক্তিকর। বর্ণনাবহুল কবিতার উপর
বিরক্ত পাঠকগণের নিকট কি কবি কাউপারের যশোলাভ হয় নাই? প্রকৃতি ও মানব চির-
দিনই কবিতার নূতন নূতন উপাদান দিতে পারিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। হোমার হইতে
আরম্ভ করিয়া বহু কবি যুদ্ধের বিষয়ে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন; তবুও স্কট্ The fight of

floddenfield লিখিবার অবসর পাইয়াছিলেন। ক্যাম্বেলের পূর্ব্বে কেহ হোহেনলিন্ডেন
(Hohenlinden) লিখিয়া যান নাই। বঙ্গ ভাষায় বিদ্যাপতি হইতে মধুসূদন পর্য্যন্ত
বিরহবেদনাব্যঞ্জক কবিতার অভাব ছিল না, তবুও "ব্যর্থযৌবনে" রবীন্দ্র বাবুর
"আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে!"
বলিয়া বিরহব্যথাপ্রকাশের অবসর ছিল। প্রকৃতির অতি সামান্য সামান্য দ্রব্যেও বার্ণস
এক ভাবে এবং ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ আর এক ভাবে কবিতার উপাদান পাইয়াছিলেন। জগতের
আদিকালে যখন মানব আদিম সরলতায় বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে চারি দিকে চাহিয়া ছিল,
তখন তাহার শ্রবণে অমিয় ঢালিয়া বিহগকুল যেমন গান গাহিয়াছিল, আজও তাহারা তেমনই
গাহিতেছে; আজও প্রকৃতি অনন্তশোভাময়ী, আজও প্রেম তেমনই মধুর। কুসুমের মত
কবিতাতেও প্রকৃতির চিরস্থায়ী যৌবনের বিকাশ। এখন মহাকাব্য রচিত হয় না সত্য;
কিন্তু আমরা এখন বুঝিয়াছি যে, ঘটনাবৈচিত্র্যময়, চরিত্রবহুল একটা গল্প পদ্য অপেক্ষা
গদ্যে বলিলেই ভাল হয়; সেই জন্যই এখন মহাকাব্যরচনা আর তেমন প্রচলিত নাই।
যাঁহারা বলেন, কবিতায় বিজ্ঞান নাই, বা বিজ্ঞানে কবিতা নাই, তাঁহাদিগকে টেনিসন
পাঠ করিতে অনুরোধ করি; যাঁহারা বলেন, কবিতায় দর্শন নাই, বা সামান্য সামান্য বিষয়ে
কবিতা নাই, তাঁহাদিগকে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ পাঠ করিতে বলি। মধ্যাহ্নে ইঁহাদিগের উদয়, তবে
কেমন করিয়া বলিব যে, মধ্যাহ্নে সঙ্গীত হয় না? তবে কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব যে,
দর্শনের ভীষণ ভ্রূকুটীতে, বিজ্ঞানের বিষম তাড়নায়, কবিতার উৎস শুষ্ক হইয়া যাইতেছে?
কে বলিবে, কিছু কাল পরে পূর্ব্বরচিত কাব্য গ্রন্থ সকল মিশরের পিরামিডের মত বিস্ময়কর
বোধ হইবে?

সাম্রাজ্ঞীর রাজত্বকালে মেকলে, কার্লাইল, ফ্রুড প্রভৃতি লেখকগণ কল্পনালোকে ঐতি-
হাসিক চিত্র উজ্জ্বল করিয়া মানব-মন মুগ্ধ করিয়াছেন। গার্ডিনার খাঁটি ইতিহাস রচনা
করিয়াছেন। কিন্তু এখন আবার সাধারণ জনগণের শিক্ষার উপ-
ইতিহাসাদি। যোগী ইতিহাসলেখকের অভাব অনুভূত হইতেছে।
এই সময়ের লেখকদিগের মধ্যে এমন এক জন আছেন, যাঁহার সমকক্ষ নাই;—তিনি
রাস্‌কিন। বিজ্ঞানলেখকেরও অভাব হয় নাই। হাক্‌স্‌লি, টিণ্ডাল প্রভৃতি মনীষিগণ বিজ্ঞানের
জটিল তত্ত্বসমূহ অতি সরল ভাবে বুঝাইয়াছেন।
উপন্যাসসংক্রান্ত উন্নতিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাণী এলিজাবেথের সময় নাটকের যেরূপ
উন্নতি হইয়াছিল, রাণী ভিক্টোরিয়ার সময় ইংরাজী সাহিত্যে উপন্যাসের সেইরূপ উন্নতি
হইয়াছে। ডিকেন্স, থ্যাকারে, জর্জ্জ এলিয়ট প্রভৃতি ঔপন্যাসিক-
উপন্যাস। গণ এই সময়ের সাহিত্য পরিপুষ্ট এবং সুশোভিত করিয়াছেন।
ষ্টিভেন্‌সনে স্কটের গল্পরচনাকৌশল এবং থ্যাকারের মধুর রচনাপ্রণালী, এই উভয় মিশ্রিত।
বর্ত্তমান লেখকদিগের মধ্যে রিচার্ড ব্ল্যাকমোর হইতে মেরী কোরেলি পর্য্যন্ত বহু তারকার
স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণে ইংরাজী সাহিত্য-গগন আলোকিত। ইতিমধ্যে ইংরাজী উপন্যাস-রাজ্যে
যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, আমরা সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিব।
চরিত্ররচনা, ঘটনারচনা প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া প্যাল্‌গ্রেভ বলিয়াছেন যে, ইংরাজী
সাহিত্যে স্কটের স্থান সেক্‌স্‌পীয়ারের নিম্নেই। স্কটের পর ঐতিহাসিক রোমান্স রচনায়
থ্যাকারে তাঁহার এস্‌মণ্ড্‌ গ্রন্থে বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। স্কটের রোমান্স যখন
পাঠকদিগের বিশেষ প্রিয়, তখন এক দিন সহসা রোমান্সের ঘনজাল অপসারিত হইয়া গেল,
আর বিচিত্রবেশধারী পিক্‌উইক ক্লবের সভ্যগণ সেই সূর্য্যকরোজ্জ্বল প্রভাতে পাঠকের

দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। নিম্ন শ্রেণীর লোকের চরিত্র অঙ্কনে ডিকেন্স যে ক্ষমতা দেখা-
ইয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। তাঁহার গ্রন্থও নিতান্ত অল্প নহে। তথাপি সেই রচনাসমুদ্র
মন্থন করিলে কোথাও একটা অশ্লীল ভাব বা অশ্লীল ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায় না। স্কট,
ডিকেন্স, থ্যাকারে প্রকৃতির রচনার পর এত ঔপন্যাসিক তাঁহাদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া-
ছিলেন যে, অধ্যাপক ম্যাসন একবার ইংরাজী উপন্যাসগুলিকে ত্রয়োদশটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে
বিভক্ত করিয়াছিলেন। অধ্যাপক ম্যাসনই এক স্থানে বলিয়াছেন যে, এখন ঔপন্যাসিকগণ
অতি সাধারণ, বিরক্তিকর এবং বেদনাদায়ী বিষয় সকলও সযত্নে উপন্যাসের উপাদানরূপে
গ্রহণ করিতেছেন। অধ্যাপক বহু দিন পূর্ব্বে যে কথা বলিয়াছিলেন, বর্ত্তমান ইংরাজী সাহিত্য
সম্বন্ধে সে কথা বিশেষরূপে প্রয়োগ করা যায়। বর্ত্তমান সময়ের বহু ঔপন্যাসিক, নীতি এবং
শ্লীলতার আবরণ উদ্ঘাটন করিয়া প্রকৃতিকে দেখাইতে চাহেন, এবং তাহাই উচিত বলিয়া
প্রকাশ করেন। এ পরিবর্ত্তনের জন্য 'নব-নারী' (New woman) অনেকাংশে দায়ী, সন্দেহ
নাই। এই নবনারীর আবির্ভাব হইতে ইংরাজী সাহিত্য কলুষিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।
আজকালকার অনেক লেখক সমাজপ্রচলিত কোন কোন আচার ব্যবহার আক্রমণ করিয়া
উপন্যাস রচনা করেন। এখন কিছু দিন হইতে ইংরাজী উপন্যাসলেখকদিগের মধ্যে অনেকে
ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সেই একই কথা বলিতেছেন,—প্রণয়হীন পরিণয় অপেক্ষা পরিণয়হীন
প্রণয় শ্রেয়ঃ। অলিভ স্ক্রিনার প্রভৃতি বহু মহিলালেখক ঐ একই কথা বলিতেছেন, অনেকে
আপনার ভগিনীদিগের উদ্ধারকামনায় এই বিষয়ের এমন ভাবে আলোচনা করিয়াছেন যে,
তাহাতে শালীনতার সীমা অতিক্রান্ত হইয়াছে। যাঁহারা এই কথার আলোচনা করিতে
গিয়া লজ্জাশীলতার সীমা অতিক্রম করিয়াছেন, কুমারী মোনা কেয়ার্ড তাঁহাদিগের মধ্যে
অগ্রগণ্য। এই ত গেল মহিলা লেখকদিগের কথা;—পুরুষ লেখকদিগের মধ্যেও অনেকে
ঐ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন—গ্র্যাণ্ট অ্যালেন এবং টমাস হার্ডি প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত।
এইরূপ পুস্তকের লেখকগণ এই বলিয়া আপনাদের সমর্থন করেন যে, উদ্দেশ্যযুক্ত না হইলে
উদ্দেশ্যযুক্ত উপন্যাস। উপন্যাস স্থায়ী হয় না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, স্কট প্রভৃতির
উপন্যাসেও উদ্দেশ্যের নিতান্ত অভাব। তদ্ভিন্ন আর একটা কথা এই
যে, কোন বিশেষ মতের প্রচারার্থ উপন্যাস অপেক্ষা সংবাদপত্রই উপযুক্ততর পথ। উপন্যাসের
প্রধান উদ্দেশ্য আনন্দদান, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য মানবের হৃদয়ের সম্মুখ হইতে রহস্য-যবনিকা
উত্তোলন করিয়া মানবের কোন কার্য্যের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করা। একটি সুন্দর
মূর্ত্তি, একখানি মনোহর চিত্র, একখানি মনোমোহন উপন্যাস, একটি মধুর কবিতা—শিল্পের
হিসাবে দেখিতে গেলে এ সকলেরই প্রধান উদ্দেশ্য আনন্দদান। তাহা হইলে এ কথা
স্বীকার করিতে হয় যে, শিল্প-হিসাবে উদ্দেশ্যযুক্ত উপন্যাসের স্থান খুব উচ্চ নহে; তদ্ভিন্ন
উদ্দেশ্যসিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবনের কার্য্যও শেষ হইয়া যায়; তখন পুস্তকাগারের
আলমারীতে অনাদরে কীটদষ্ট হওয়াই তাহার কপালের লিখন।

পূর্ব্বোক্ত ঔপন্যাসিকগণ মনে করেন যে, আজিও যে অনেক রমণী ভাবেন,—"রমণীর ধর্ম্ম
থাকে বক্ষে কোলে চিরদিন স্থির পতিপুত্ররূপে," ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। রমণীর এই সরল
রমণীর অধিকার। ভ্রান্ত বিশ্বাসের সুযোগ পাইয়া দানব পুরুষজাতি আপনাদিগের যোল
আনা স্বার্থসিদ্ধির সকল পথ অধিকার করিয়া বসিয়া আছে; রমণীর
ভাগ্যে কেবল পুরুষের দাসীপনা—কেবল যাতনা। পত্নীর অর্থে প্রতিপালিত হইয়া পাপী
পুরুষ কেমন করিয়া দেবীপ্রতিমা পত্নীর সর্ব্বনাশ করে, কুমারী মেরী কোরেলি তাঁহার
Murder of Delicia গ্রন্থে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন; সে চিত্রে পুরুষ শয়তান, রমণী দেবী।

আমরা স্বীকার করি যে, Enlightened womanhoodএর সহিত আমাদিগের সহানু-
ভূতির অভাব নাই, কিন্তু তাই বলিয়া আমরা নবনারীর সকল দাবী ন্যায়সঙ্গত বলিতে সম্মত
নহি। রমণী উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে, আপনার ন্যায়সঙ্গত সকল অধিকার পাইলে,
আমাদিগের গার্হস্থ্যজীবনে সুখের শত উৎস উৎসারিত হইবে, সন্দেহ নাই।
স্বামী স্ত্রীর মধ্যে শিক্ষার প্রভেদবশতঃ মানসিক আদর্শের যতই প্রভেদ হইবে, সংসার
ততই অসুখময় হইয়া উঠিবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাই বলিয়া আমরা এ কথা স্বীকার
করিতে পারি না যে, রমণী ও পুরুষ, উভয়ের কর্ম্মক্ষেত্রে বিভিন্নতা নাই। অভাব সভ্যতার
নিত্য সহায়—সভ্যতাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অভাব বর্দ্ধিত হইতেছে, এবং হইবে। জীবন-
সংগ্রাম দিন দিন যেরূপ কঠোর হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহাতে কিছুদিনে রমণীকে কঠোর
জীবনসংগ্রামে পুরুষকে সাহায্য করিতে হইবে; পত্নীকে শান্তিরূপিণীরূপে পতির হৃদয়ে
শান্তি এবং শক্তিরূপিণীরূপে স্বামীর হৃদয়ে শক্তি সঞ্চারিত করিতে হইবে। এ অবস্থায় কে
ইচ্ছা করিয়া রমণীকে পুরুষভাবাপন্না করিয়া সংসার অসুখময় করিতে চাহিবে?
পরিণয়ে যে জীবনব্যাপী সাহায্য থাকে, পরিণয়হীন প্রণয়ে তাহা থাকে না। এক আধটি
দৃষ্টান্ত দেখিয়া সহসা কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ভ্রমমাত্র। বিশেষ বিবেচনা করিয়া
দেখিলে ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে, ধর্ম্ম এবং প্রচলিত লোকাচার-

পরিণয়।

সঙ্গত পরিণয়পদ্ধতির পরিবর্ত্তে জীবনের একটা ঘটনাকে,—আবার
সেই ঘটনা ক্ষণস্থায়ী মোহ হইতে উৎপন্ন হওয়াও আশ্চর্য্য নহে,—প্রাধান্য প্রদান করা সমা-
জের পক্ষে নিতান্তই অনিষ্টকর। প্রচলিত পরিণয়বন্ধনে পতিপত্নীর সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ
অনুভব করিবার যে ভাব আছে, পরিণয়হীন প্রণয়ে সে ভাব থাকিবে না। তাহা হইলেই
সে প্রণয়বন্ধন স্থায়ী হইবার সম্ভাবনাও বিরল। আবার অপরিচিত যুবক যুবতীর প্রথম-
দর্শনসম্ভূত সর্ব্বত্রই পবিত্র ভালবাসা নহে, তাহাকে অনেক স্থানে ক্ষণস্থায়ী মোহমাত্র
বলিতে হয়। এ বিষয়ে আমরা সর্ব্বতোভাবে শ্রীমতী অলিফ্যাণ্টের মতের সমর্থন করি—
তিনি বলেন, পরিণয়হীন প্রণয়ে কাজ নাই—পরিণয়ই প্রচলিত থাকা কর্ত্তব্য।
ইংরাজী উপন্যাসে আজকাল আর একটা পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইতেছে। আজকাল-
কার অনেক ইংরাজী উপন্যাস পাঠ করিতে করিতে মনে হয়, যেন ধর্ম্মযাজকের ধর্ম্মোপদেশ
শুনিতেছি। রিফর্‌মেশনের সময় হইতেই ধর্ম্মোপদেশপ্রিয়তা যেন

শেষ কথা।

ইংরাজের হাড়ে হাড়ে বসিয়াছে। আজকালকার ইংরাজী উপন্যাসে
এই ধর্ম্মোপদেশদানের মাত্রাটা যেন কিছু বাড়িয়াছে;—ইহাও উদ্দেশ্যযুক্ত উপন্যাসের এক
অবিচ্ছিন্ন অংশ।

সাহিত্য সমাজের চিত্র, সুতরাং সমাজে ঘূর্ণী বায়ু থাকিতে সাহিত্য স্থির হইতে পারিবে
না। এখন রমণীর অধিকারের প্রশ্নে সমাজসাগর বিলোড়িত হইতেছে। বহুদিন অবহেলার
পর রমণী আজ আপনার প্রাপ্য চাহিতে আরম্ভ করিয়াছেন; তবে দুঃখের বিষয়, প্রাপ্যের
অধিকও তাঁহারা দাবী করিতে ছাড়িতেছেন না।

তবে ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া আমরা আশা করি যে, কিছুদিনে নবনারীর প্রভাব দূর
হইবে, রমণীর রমণীত্বকেই রমণী আদর করিতে শিখিবেন; আর যখন তাঁহারা সকল ন্যায্য
অধিকার পাইবেন, তখন মহিলাদিগের মধ্যে সুশিক্ষার বিস্তার হইয়া জগতে সুখসম্পদ বর্দ্ধিত
হইবে, সংসার সুখ ও শান্তিতে পূর্ণ হইবে।

সমাজনীতি।

স্পেনে স্ত্রীশিক্ষা।

সম্প্রতি "রিভিউ অফ্ রিভিউ" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, স্ত্রীজাতির শিক্ষা ও অধিকারের বিষয়ে স্পেন দেশে ইতিপূর্ব্বে বিশেষ আলোচনা হয় নাই। সম্প্রতি স্পিনোরা পারডো বাজাম, প্রোফেসার পোসাডা এবং অপর কতিপয় ব্যক্তি এ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া এ বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছেন। স্পেনের অধিকাংশ লোকেই স্ত্রীজাতির কল্যাণজনক আন্দোলনের প্রতি ঈষৎ কটাক্ষপাত করেন, অথবা একেবারেই উপেক্ষা করিয়া থাকেন। স্পেনদেশীয় দুইখানি সমালোচক পত্রের অধুনাতন সংখ্যায় এ

স্পানিয়ার্ড রমণী।

সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। প্রোফেসর পোসাডা, "ইস্পানা মোডারনা" পত্রে "অন্যান্য দেশে স্ত্রীজাতির উন্নতি" ইতিশীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। "রেভিন্টা কন্টেম্‌পোরানিয়া" পত্রে, সিনোরা মারিয়াডি বেন্‌মণ্ট, একটি প্রবন্ধে এই বিষয়ের গুরুত্ব ও উপযোগিতার আলোচনা করিয়া স্পানিয়ার্ডদিগের নিদ্রাভঙ্গের চেষ্টা করিয়াছেন। সেনোরা ডিবেলমণ্ট বলেন যে,—আমি বিজয়পতাকা হস্তে লইয়া স্ত্রীজাতির প্রতিভার প্রাধান্য, অথবা স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই প্রতিভার সাম্য ঘোষণা করিতেছি না। তবে এ কথা স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য যে, পুরাকালে ও বর্ত্তমান সময়ে বহু মহিলা অধিকাংশ পুরুষ অপেক্ষা প্রতিভাবলে স্ব স্ব প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সুপ্রসিদ্ধ, পদস্থ, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, এবং সাহিত্যসেবিগণের সহিত উচ্চপদ অধিকার করিয়াছেন। অনেকে তাঁহাদের পদানুসরণ করিয়াছেন মাত্র। স্ত্রীজাতিসাধারণের বুদ্ধিবৃত্তি পুরুষ অপেক্ষা যথার্থই মলিন স্থির করিয়া লইলেও, তাঁহাদের প্রতিভা বিশেষ বিবেচনার যোগ্য। কারণ, তাঁহারা যে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শনের উচ্চ পদবী অধিকার করিতে পারেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

স্ত্রীজাতি স্বাধীন কার্য্যপ্রণালী ও বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে কোনও কার্য্যসাধনে অসমর্থা, এবং চাপল্যই তাঁহাদের প্রধান আকর্ষণশক্তি, স্পানিয়ার্ডগণ এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া মহিলা-

স্পানিয়ার্ডের আদর্শ গৃহিণী।

দিগের শিক্ষাদান ও লালনপালন করিয়া থাকেন। যাঁহারা আদর্শ গৃহিণী এবং কল্যাণদায়িনী মাতা হইতে চাহেন, অজ্ঞতা ও সকল বিষয়েই নির্ভরশীলতা, তাঁহাদের এই দুইটি গুণের বিশেষ প্রয়োজন! পতির সুখদুঃখের অংশভাগিনী হওয়া, তাঁহার শ্রমের লাঘব করা, তাঁহাকে আরাম দান করা যদি স্ত্রীলোকের উদ্দেশ্য হয়, অথবা, যে শিক্ষার উপর বংশপরম্পরার ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করে, বাস্তবিক যাহার উপর সাধারণতঃ সমাজের ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে,—যদি আশা করা যায় যে,—বালকবালিকাগণের কল্যাণদায়িনী সেই শিক্ষার ভার তাঁহারা গ্রহণ করিবেন,—তাহা হইলে তাঁহাদের কর্ত্তব্যপালনোপযোগী শিক্ষার পথে বাধা দান করা ভুল হইতেছে না কি? আমরা তাঁহাদের শিক্ষার প্রসারপথ সঙ্কুচিত করিয়া ভ্রমে পতিত হইতেছি। পুরাকালের ন্যায় এক্ষণেও রমণীগণ পুরুষজাতির ক্রীড়া-কন্দুকমাত্র। কারণ, পুরুষের সহিত তাঁহাদের কোনও বিষয়েই সাধারণ অধিকার নাই। স্পেনের রমণীগণ আলস্য-পরায়ণা। অন্য কোনও বিষয়ে সমানাধিকার না পাইলেও, এ বিষয়ে তাঁহারা পুরুষজাতির সহিত তুল্যাধিকার লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা স্ত্রীজাতির বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ভাগ্যসম্বন্ধে বিশেষ কিছু চিন্তা করেন না। বিবাহ ব্যতীত অন্য সমস্যাপূরণের কোনও চেষ্টাই নাই।

বিদেশীয় যশস্বিনী ভগিনীগণের সাধারণ অধিকারপ্রাপ্তির জন্য মহতী চেষ্টার সহিত তাঁহাদের
বিশেষ সহানুভূতি নাই। ন্যায়ের প্রমাণিত সত্য এই যে, মানবজীবমাত্রই আইনের চক্ষে
সমান। অতএব, পুরুষজাতির সহিত সমভাবে স্ত্রীজাতির সামাজিক,
রাজনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক শিক্ষালাভ, দাসত্বপ্রথার উচ্ছেদসাধনের
ন্যায় অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। স্ত্রীজাতির শিক্ষাবিধান, সমাজের বিশেষ
হিতসাধক। কারণ ইহাতে সমাজের শক্তির ও জ্ঞানের বৃদ্ধি হইবে। এবং রাজশক্তি যদি
স্ত্রীপুরুষগত সাধারণ অধিকারবিষয়ক সমস্যার মীমাংসা করিয়া সেই শক্তির যথাযথ নিয়োগ
করেন, তাহা হইলে রাজ্যের মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। স্ত্রীজাতির বুদ্ধিবৃত্তি উপেক্ষিত হইয়া
অজ্ঞানরাশিতে সমাধিপ্রাপ্ত হইলে, মানবজীবনের সহচরী রমণীকে প্রকৃতিপ্রদত্ত অমূল্য
জ্ঞান হইতে বঞ্চিত করা হয়। তাহার ফলে, কার্য্যাকার্য্যের নিয়ামক পরিণামদর্শনের
অভাব ঘটে। স্ত্রীজাতির ব্যক্তিগত অবস্থার উন্নতিসাধন বিশেষ আবশ্যক। কারণ, তাহা
হইলে তাঁহারা পুরুষজাতির সহিত একত্র স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে স্বাধীনভাবে নিজ পরিবারের
মঙ্গলজনক কার্য্যে এবং মনুষ্যত্বের সাধারণ কর্ত্তব্যপালনে অগ্রসর হইতে পারেন।

স্ত্রীজাতির উন্নতি একান্ত আবশ্যক।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। বৈশাখ। প্রথমে শ্রীমতী সরলা দেবীর "গীর্ব্বাণী" ইতিশীর্ষক একটি ক্রমশঃ-
প্রকাশ্য গল্প। গল্পটির সূচনামাত্র এবার প্রকাশিত হইয়াছে। "গীর্ব্বাণী" নামটি যেমন
আভাঙ্গা সংস্কৃত, গল্পটির ভাষাও স্থানে স্থানে প্রায় তদ্রূপ। আমরা আশা করি, কালে
এই উৎকট সংস্কৃতপদানুরাগ থিতাইয়া গেলে লেখিকার ভাষা ক্রমশঃ উজ্জ্বল শ্রী ধারণ
করিবে। বঙ্গভাষা সম্বন্ধে গীর্ব্বাণীর নায়কের আক্ষেপ অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক, এবং বিকৃত
ইঙ্গ-বঙ্গ-সমাজের অনুধাবনের যোগ্য।—"হায় অনাদৃতা! মাতৃদুগ্ধের সহিত তোমার যে
পীযূষ ইহাঁদের শিশুরক্তে সঞ্চারিত হইয়াছে তাহার কি যথেষ্ট সুমিষ্টতা নাই? তুমি কি
তাঁহাদের সমস্ত ভাবের আধারের যোগ্য নহ? তুমি কি ক্রোধে স্ফীত, ভয়ে বিকম্পিত,
দ্বিধায় বিচলিত, আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠ না? হে মাতঃ! কাজের রাজ্যে তুমি অধি-
কারচ্যুত বলিয়া ভাবের রাজ্যে তোমার যে আসন তাহা হইতে তোমার দুহিতারাও
তোমায় অকাতরে বঞ্চিত দেখিবেন ও করিবেন?" শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর "বালুকেশ্বর"
প্রবন্ধে "১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের বিলাতযাত্রা"র বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।
এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটির অধিকাংশ বালুকেশ্বর তীর্থের বর্ণনায় পরিপূর্ণ,—বিলাতযাত্রী মহারাষ্ট্রীয়ের
বিশেষ কোনও তথ্য ইহাতে পাওয়া যায় না। শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র মিত্রের "হস্তিপৃষ্ঠে" প্রবন্ধটি
সুখপাঠ্য। "প্রকৃতি" শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর কৃত একটি সমালোচনা। ইহাতে দক্ষতার
বিশেষ পরিচয় নাই। "কাহাকে" এখনও চলিতেছে;—কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা এই
উপন্যাসের রসগ্রহে নিতান্ত অক্ষম। তাহার প্রধান কারণ বোধ করি এই যে, উপন্যাসোক্ত
জীবগণের সদৃশ বঙ্গীয় ইঙ্গজীবের দৈনিক জীবনের এ অংশের সহিত আমরা আদৌ
পরিচিত নহি। এই উদ্ভট রঙ্গভূমির পাত্রগণের চরিত্র, কথোপকথন, ভাব, সব
যেন অদ্ভুত ও নিতান্ত বিদেশী বলিয়া বোধ হয়। সমাজের এক অংশে যে এতখানি
জ্যেষ্ঠতাতত্ব ও হাস্যরস সঞ্চিত হইয়াছে,—তাহা কেমন বেখাপ ও বাঙ্গালী জীবনের

সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু নাচার! শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্র এই সংখ্যায় "মীর
কাসিম" আরম্ভ করিলেন। তাঁহার "সিরাজ" যেমন উপাদেয় হইয়াছে, আশা করি, আরব্ধ
মীর কাসিমও তদনুরূপ হইবে।—মীর কাসিমের প্রারম্ভেই অক্ষয় বাবু স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবুর
ঐতিহাসিক প্রমাদ প্রদর্শন করিয়াছেন। "চন্দ্রশেখরের" ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি ইতিহাসের
সম্পূর্ণ বিপরীত, অক্ষয় বাবু তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। লেখকবিশেষের, বিশেষতঃ কোনও
ঔপন্যাসিকের ঐতিহাসিক ভ্রম কি অন্য ভাষায় প্রদর্শন করা যায় না? অক্ষয় বাবুকে আমরা
স্থিরধী ঐতিহাসিক বলিয়া জানি, তাই তাঁহাকেই এই প্রশ্ন করিতেছি। শ্রীযুত গোপালচন্দ্র
শাস্ত্রীর "রামরাজার মুলুক" তৃতীয় প্রস্তাব সুখপাঠ্য। "মালঞ্চ" ভারতীর নূতন ফুলের বাগান;
ইহাতে চারিটি ক্ষুদ্র কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শ্রীযুত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের
"ব্যাপ্তি" ও শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবীর "কবে," এই দুইটি উল্লেখযোগ্য। "ভোলা ময়রা" প্রবন্ধে
এক জন লেখক উক্ত কবিওয়ালার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কবিওয়ালার ইতিহাস প্রার্থ-
নীয়; কিন্তু ভোলা ময়রা লেখককে কি গুণে ভুলাইয়াছেন, তাহা ভাল বুঝিতে পারিলাম না।
ইতিপূর্ব্বে বিবেকানন্দ স্বামী স্বদেশ ভুলিয়া বিদেশে যাইবেন শুনিয়া শ্রীমতী সরলা দেবী ভার-
তীর পৃষ্ঠায় যে আক্ষেপ করিয়াছিলেন, বোধ করি, পাঠকগণ ইতিমধ্যেই তাহা বিস্মৃত হন
নাই। শ্রীমতী সরলা দেবী এবার তাহার "প্রত্যাহার" করিয়াছেন। এ "প্রত্যাহারের" অর্থ
কি, বিবেকানন্দ স্বামীর উদ্দেশ্য কি,—তাহার বিন্দুমাত্রও আমরা বুঝিতে পারিলাম না।
বিবেকানন্দ স্বামী আপাততঃ তাঁহার উদ্দেশ্য প্রকাশিত করিতে সম্মত নন,—কিন্তু সরলা
দেবী বলিতেছেন, এ দেশের কোনও মনীষী আমাদের অগণ্য অভাবের যে দিকে আদৌ
দৃষ্টিপাত করেন নাই, স্বামী সেই নূতন পথে কিছু নূতন কাণ্ড করিবেন। তথাস্তু; আমরা
প্রতীক্ষায় রহিলাম।

নব্য-ভারত। বৈশাখ। চিরাচরিত প্রথামত "নব্য-ভারত"-সম্পাদক মহাশয় নব-
বর্ষের প্রারম্ভে "বিয়োগ ও যোগ" নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, এবং মামুলি কুবুদ্ধিবশতঃ
এবারও আমরা উল্লিখিত মুখবন্ধস্বরূপ বার্ষিক প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য ও উপযোগিতা হৃদয়ঙ্গম
করিতে পারি নাই। বঙ্গ সাহিত্যের ও বঙ্গ সমাজের দুর্দ্দশা দেখিয়া লেখক অত্যন্ত আক্ষেপ
করিয়াছেন; বঙ্গে দুর্নীতির প্রবল তরঙ্গ, বঙ্গ সাহিত্যের ততোধিক দুর্দ্দশা, ইত্যাদি দেখিয়া
সম্পাদকের করুণ হৃদয় অত্যন্ত বিগলিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা নিরাশ্বাস হতাশ সম্পা-
দককে আশা দিতেছি,—নিতান্ত নিরাশার কারণ নাই, তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন;
আর যাহাই হউক, এখনও স্বয়ং তিনি আক্ষেপ করিতেছেন, ইহাতেও কি বঙ্গ সমাজের ও
বঙ্গ সাহিত্যের কথঞ্চিৎ উন্নতির আশা করিব না? শ্রীযুত ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্যের "মাধবা-
চার্য্য" একটি সুলিখিত প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক সুন্দর প্রবন্ধ। "সত্য" শ্রীযুত নিত্যকৃষ্ণ বসুর রচিত
একটি নীতিকবিতা;—ইহাতে কবিত্ব অপেক্ষা নীতির প্রবাহই অধিকতর বোধ হইল। কিন্তু
লেখকের কামনা পবিত্র। এই দুটি ভিন্ন এবারকার "নব্যভারতে" উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের
অত্যন্তাভাব।

পূর্ণিমা। বৈশাখ। পূর্ণিমা নববর্ষে চারিটি অভিনব বিষয়ের অবতারণা করিয়া-
ছেন; ১—বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ, ২—বিবিধ প্রসঙ্গ, ৩—সহযোগী সাহিত্য, ৪—মাসিক
সাহিত্য। ক্ষুদ্র পত্রে এতগুলি বিষয়ের একটিরও সম্যক স্ফূর্ত্তির সম্ভাবনা নাই। সম্পাদক
যদি কেবল বৈচিত্র্যের পক্ষপাতী না হইয়া অপেক্ষাকৃত অল্প বিষয়ে পরিপূর্ণ সাফল্য লাভের
চেষ্টা করেন, তাহা হইলে ভাল হয়। যাহা হউক, নানা বিষয়ের সমাবেশে পূর্ণিমা অপেক্ষাকৃত
মনোহারিণী হইয়াছে। আশা করি, উত্তরোত্তর পূর্ণিমার অধিকতর উন্নতি দেখিতে পাইব।

তত্ত্ববোধিনী। বৈশাখ। বর্ষীয়সী তত্ত্ববোধিনীর জীবনান্ত হয় নাই বটে, কিন্তু বোধ হয়, ক্রমেই তাঁহার জীবনীশক্তির হ্রাস হইয়া আসিতেছে। এ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত নকুড়চন্দ্র বিশ্বাসের "বৈশাখোৎসব" প্রবন্ধে, উক্তনামধেয় বৌদ্ধ উৎসবের অতিসংক্ষিপ্ত যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ ভিন্ন আর কিছু পাঠ্য বিষয় দেখিতেছি না।

উৎসাহ। বৈশাখ। রাজসাহী হইতে "উৎসাহের" আবির্ভাব দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। ধীরে ধীরে বঙ্গদেশের অভ্যন্তরেও সাহিত্য-রতির যে স্ফূর্ত্তি হইতেছে, পূর্ণিমা, উৎসাহ প্রভৃতি তাহারই পরিচায়ক। এই সংখ্যায় প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক, 'সিরাজদ্দৌলার' লেখক শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্র "অজ্ঞেয়বাদ" সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। শ্রীযুত নিখিলনাথ রায় "জাহানীরা ও রোশেনারার" ঐতিহাসিক কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "ধূমকেতু" প্রবন্ধটি ক্ষুদ্র—কিন্তু মন্দ হয় নাই। আমরা প্রার্থনা করি, রাজসাহীর "উৎসাহ" অটুট থাকুক। সম্পাদক মহাশয়ের নিকট একটি নিবেদন আছে;—তিনি কি উৎসাহে তাঁহাদের প্রদেশীয় ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন না?

ব্রহ্মতত্ত্ব। চৈত্র। এখানি "ব্রহ্মবিদ্যা এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনবিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্র।" এই সংখ্যায় ব্রহ্মবিদ্যার প্রথম বর্ষ অতিবাহিত হইল। ব্রহ্মবিদ্যা দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। প্রবন্ধগুলি বিশেষজ্ঞ পাঠকগণের জন্যই অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায়ের "বৌদ্ধদর্শন" সাধারণ পাঠকেরও অধিগম্য। "আত্মার অমরত্ব ও পুনর্জন্ম" প্রবন্ধটিও উল্লেখযোগ্য। আমরা আশা করি, "ব্রহ্মবিদ্যা" দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রের পরিধি আরও বিস্তৃত করিতে পারিবে।

মুকুল। বৈশাখ। "স্বনামা পুরুষ" প্রবন্ধে কৃষ্ণদাস পাল ও নবীন চন্দ্র রায়, এই দুইজনের সচিত্র সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত প্রদত্ত হইয়াছে। জীবনচরিত দুটি শিক্ষাপ্রদ বটে। "ছেলের খেলা—ঘুড়ি" প্রবন্ধ খুব বিস্তৃত, অথচ এবারও শেষ হয় নাই। বিষয়ের গুরুত্ব বিচার করিয়া প্রবন্ধের পরিমাণ স্থির করিলে ভাল হয়। "গঙ্গা যমুনা" প্রবন্ধটি বেশ, কিন্তু এবারে শেষ হয় নাই। "কুকুরের প্রভুভক্তি" সুপাঠ্য হইয়াছে। এরূপ পত্রে ক্রমশঃপ্রকাশ্য বা অতিবিস্তৃত প্রবন্ধের সংখ্যা যত অল্প হয়, ততই ভাল। মুকুলের ভাষাও সর্ব্বথা প্রশংসনীয় নহে। এরূপ পত্রের ভাষায় অনবধান নিতান্ত নিন্দনীয়। "পেটুক দামু" একটি হাস্যজনক ক্ষুদ্র কবিতা। এবারকার মুকুলে কুড়ি খানি ছবি আছে, কিন্তু একখানিও প্রশংসাযোগ্য নয়। সংখ্যায় কমাইয়া উৎকর্ষবিধানের চেষ্টা করিলে মন্দ হয় কি?

সখা ও সাথী। বৈশাখ। "বিবিধ" নানাবিধ প্রসঙ্গে পরিপূর্ণ ও শিক্ষাপ্রদ। "স্যার মহারাজা লক্ষ্মীশ্বর সিংহ বাহাদুর" প্রবন্ধে দ্বারভাঙ্গার বর্ত্তমান মহারাজার জীবনচরিত আছে। মহারাজার চিত্রখানি সুন্দর হইয়াছে। বাঙ্গলা পত্রে এরূপ চিত্র নিতান্ত বিরল। "শীকার" প্রবন্ধটি বেশ হইয়াছে। এবার লেখক কুম্ভীর-শীকারের কাহিনী বর্ণন করিয়াছেন। এই প্রবন্ধটি কেবল বালকবালিকাদের নহে, বয়স্ক পাঠকদের চিত্তরঞ্জন করিতে পারে। আমরা এইরূপ মৌলিক প্রবন্ধের পক্ষপাতী। "ইতর প্রাণীর বুদ্ধি" প্রবন্ধটিও সুপাঠ্য। সখা ও সাথীর কবিতাগুলি এবার আদৌ ভাল হয় নাই।

জাপানের পত্র।

ইয়াকোহামা; ২৫শে এপ্রেল্; শনিবার; ১৮৯৭।

১৭ই মার্চ প্রশান্ত সমুদ্রের উপর দিয়া অনন্তের স্রোতে অন্তর্যামীর ইচ্ছারূপ পবন 'মুরদা'কে ভাসাইতে ভাসাইতে জাপান দ্বীপে উপস্থিত করিয়াছে। জাপানের দু'একটি কথা শুনিলে আপনি ইহার অবস্থা বিবেচনা করিতে পারিবেন।

জাপানে শীত ও বর্ষা এই দুই ঋতু বড়ই প্রবল। এখানে নবেম্বরের শেষ হইতে বরফ পড়িতে আরম্ভ হয়, এবং মার্চ মাসের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত প্রায় বরফ দেখিতে পাওয়া যায়। আজ এপ্রেল মাসের ২৪শে; এখনও দুটা কম্বল নীচে এবং দুটা কম্বল উপরে না রাখিলে রাত্রে নিদ্রা হয় না। ঘরে দিবারাত্র 'ষ্টোভ' জ্বলিতেছে, তথাপি ৭।৮টা কাপড় না পরিলে থাকিবার যো নাই। এপ্রেল, মে এখানকার বসন্তকাল; কিন্তু আমাদিগের পক্ষে পৌষ মাস।

জাপান বড়ই স্বাস্থ্যকর স্থান। অনেকে স্বাস্থ্যের জন্য জাপানে বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে আইসেন। অনেক কঠিন পীড়া এখানকার দু' একটি আগ্নেয়গিরির প্রস্রবণে স্নান করিলে আরোগ্য হইয়া থাকে।

জাপানের অধিবাসিগণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অত্যন্ত পক্ষপাতী। এখানকার স্বাভাবিক দৃশ্য বড়ই মনোহর। জাপানীরা বড়ই বিনয়ী, ধীর ও নম্রস্বভাব। ইহাদের স্ত্রী পুরুষ সকলেই বিদেশীর সহিত সহজেই মিশিয়া যায়। এ সমস্ত বিষয়ে চীনারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহাদিগের ভাষা ও পরিচ্ছদও স্বতন্ত্র। সকলেই প্রায় ইংরাজী পোষাক ও চালচলন পছন্দ করে, এবং তদ্রূপ ব্যবহারও করিয়া থাকে। জাপানীদিগের আহার, ধর্ম্ম ও দু' একটি সমাজ-প্রণালী প্রায়ই চীনাদিগের অনুরূপ। ইহাদের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই অত্যন্ত পরিশ্রমী। চাউল ইহাদিগের প্রধান খাদ্য। আহার সম্বন্ধে প্রায় হিন্দুদিগের ন্যায়; তবে অনেকে বহুপ্রকার মাংসাদি ভক্ষণ করে, এবং কেহ কেহ সম্পূর্ণ নিরামিষভোজী।

প্রায় ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ইহারা শিল্প ও রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে বড়ই উন্নতি সাধন করিয়াছে। Japanese curio, potteries, silk প্রভৃতি বড়ই সুন্দর। বিদেশীয় বস্তু সকল স্বদেশে প্রস্তুত করিবার জন্য এবং বিদেশীয় শিল্প

সকল শিক্ষা করিবার জন্য, জাপান সরকার হইতে প্রতি বৎসর উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত বালকদিগের মধ্যে নির্ব্বাচিত ৩০ জন বালক ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে গভর্মেণ্টের ব্যয়ে প্রেরিত হইত। এ বৎসর হইতে ৬০ জন করিয়া যাইবার আদেশ হইয়াছে। জাপানীরা যে সমস্ত বিষয় অবগত নহে, সেই বিষয় শিক্ষা করিবার জন্য গভর্মেণ্টের ব্যয়ে কিছু দিনের জন্য বিদেশীয়দিগকে রাখা হয়; পরে আপনারা শিক্ষা করিয়া বিদেশীদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় দেয়। জাপানী গভর্মেণ্ট ঠিক বিলাতি ধরণে গঠিত। ইহাদিগের উপাধি সমস্তও কাউণ্ট, ব্যারণ্ প্রভৃতি বিলাতি ধরণের। দেশের এবং প্রজার উন্নতিসাধন বিষয়ে জাপান সম্রাট একজন আদর্শ বলিলেই হয়। এমন রাজভক্ত প্রজাও জগতের অন্য স্থানে অতি-বিরল। ইহারা আপন পিতামাতার, সন্তান সন্ততির, বা স্ত্রী পুরুষের বিয়োগ বা অপমান সহ্য করিতে পারে, কিন্তু রাজ-আজ্ঞা অবহেলা, বা রাজ-অপমান কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না। রাজার জন্য, দেশের জন্য ইহারা সকলেই মরিতে প্রস্তুত। চীন-জাপান যুদ্ধে জাপানের জয় ও চীনার পরাজয় ইহার একটি প্রধান দৃষ্টান্তস্থল। উক্ত যুদ্ধে আহত ব্যক্তিদিগকে জাপান সম্রাট, তাঁহার স্ত্রী, পুত্র কন্যা ও রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তি সকল সপরিবারে দিবারাত্র সৈনিক-দিগের হেড্ কোয়ার্টার Hirdshima হাঁসপাতালে থাকিয়া স্বহস্তে তাহাদিগের শুশ্রূষা করিতেন। ইহার ফটো সকল আজ পর্য্যন্ত তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

জাপানের স্ত্রী পুরুষ সকলেই উচ্চশিক্ষার পক্ষপাতী। রাজার আজ্ঞানুসারে কি ধনী কি দরিদ্র প্রত্যেক জাপানী যুবক ২১ বৎসর পূর্ণ হইলে স্থানীয় গভর্মেণ্টের নির্দ্দিষ্ট ডাক্তারের নিকট পরীক্ষার জন্য প্রেরিত হইয়া থাকে, এবং উত্তীর্ণ হইলে স্থানীয় সৈনিক বিদ্যালয়ে প্রেরিত হয়। তথায় তিন বৎসর কাল সৈনিকের কার্য্য শিক্ষা করিয়া আপন গৃহে প্রত্যাগমন করে। এই তিন বৎসরের মধ্যে বারাক কম্পাউণ্ডের বাহির হইবার অধিকা[illegible] না। সরকার হইতে সামান্য বেতন, (তিন হইতে পাঁচ ডলারের মধ্যে) আহার ও পরিচ্ছদ প্রভৃতি পাইয়া থাকে। সময়বিশেষে আবশ্যক হইলে গভর্মেণ্ট ইহা-দিগকে সৈনিকের কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া থাকেন।

জাপানী ভাষা অতি সরল ও সুন্দর; বিদেশীরা সহজেই শিক্ষা করিতে পারে; তবে লিখিতে পড়িতে হইলে একটু চেষ্টা করিতে হয়।

জাপানীদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত নাই। বালিকা পনের হইতে পঁচিশ, এবং পুরুষ কুড়ি হইতে ত্রিশের মধ্যে বিবাহ করিয়া থাকে। এ দেশে

বিবাহের কোনও বন্ধন নাই, এবং ধর্ম্মের সহিতও সম্বন্ধ নাই। বিবাহ শব্দ আমরা যে প্রকার গম্ভীরভাবে লইয়া থাকি, যেন ইহজীবনের মত দম্পতী পরস্পর বদ্ধ, ভালই হউক আর মন্দই হউক, ইহারা সে প্রকার মনে করে না। বিবাহ এক প্রকার পরিধেয় বস্ত্রের ন্যায়; ইচ্ছা হইলেই পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। এ বিষয়ে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই সম্পূর্ণ সমান অধিকার। অনেকে ২। ১ বৎসরের জন্য জাঁকড়ে রাখিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখে; যদি মিল হইল, তবেই বিবাহ; নতুবা, যদ্যপি এই সময়ের মধ্যে পুত্রাদি হয়, তবে স্ত্রী ও পুত্রাদি সকলকেই পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় নূতন পত্নী গ্রহণ করে। এ প্রকার জাঁকড়ে রাখিবার অধিকার স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই সমান। যাহার পয়সা আছে, সে অন্যকে আপন গৃহে লইয়া আইসে। যদিও একাধিক বিবাহ জাপানী আইনের বিরুদ্ধ, কিন্তু সেবাদাসী বলিয়া যত ইচ্ছা রাখিতে পারে। অনেকে নূতন খাতার সহিত প্রতি বৎসর নূতন নূতন স্ত্রী পরিবর্ত্তন করে।

এ দেশে রাজবিধি অনুসারে যেখানে সেখানে বেশ্যাবৃত্তি করিবার হুকুম নাই। তবে কোন স্থানে ফাঁকও নাই; ইহা এক প্রকার প্রকাশ্য, অথচ গোপনীয় ব্যাপার। জাপানের প্রতি সহরে বেশ্যার ব্যবসা হইয়া থাকে। এই ব্যবসায়ীরা এই কর্ম্মে প্রচুর অর্থশালী হইয়াছে। ইহারা এজেণ্ট দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম ও নগর হইতে অবিবাহিত বালিকাদিগকে তাহাদিগের পিতামাতার নিকট হইতে সৌন্দর্য্য অনুসারে পঞ্চাশ হইতে পাঁচ শত ডলার পর্য্যন্ত দিয়া, তিন বৎসর, অথবা ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের সম্মতি অনুসারে যত দিন ইচ্ছা সময়ের জন্য, কণ্ট্রাক্ট করিয়া কোর্টে রেজেষ্টারি করিয়া সহরে লইয়া আইসে। প্রতি সহরে দুই চারিটি করিয়া চতুর্দ্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত বারাকের মত স্থান আছে। বালিকাদিগকে তথায় রাখিয়া নৃত্যগীতাদি শিক্ষা দিয়া বেশ্যার কর্ম্মে নিযুক্ত করে। প্রত্যেক বারাকে ব্যবসায়ী ধনীদিগের নিযুক্ত ক্লার্ক দুই চারি জন থাকে। যে কেহ বেশ্যালয়ে যাইবে, তাহাকে নিয়ম অনুসারে ক্লার্কের নিকট টাকা জমা দিতে হয়। গভর্মেণ্টের নিকট হইতে এই ব্যবসায়ের লাইসেন্স লইতে হয়। গভর্মেণ্টের ডাক্তার প্রতি সপ্তাহে এই সকল বারাক পরীক্ষা করিয়া থাকে। * * যত দিন পর্য্যন্ত, বালিকারা ব্যবসায়ীদিগের অধীনে থাকে, তাহারা ধনীর নিকট উপযুক্ত আহার, পানীয় এবং পোষাক প্রভৃতি পাইয়া থাকে, তদ্ব্যতীত ইহাদিগের উপার্জ্জিত অর্থে কোনও অধিকার নাই। চুক্তির নিয়মিত সময় পূর্ণ হইলে, বালিকারা আপন পিতামাতার নিকট প্রেরিত হয়,

এবং তথায় যাইয়া পুনরায় বিবাহাদি করিয়া গৃহস্থধর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। যদ্যপি বারাকে বেশ্যাবস্থায় কাহারও সহিত প্রণয় হইয়া যায়, তাহা হইলে সে ধনীকে কণ্ট্র্যাক্টের টাকা দিয়া বালিকার পিতামাতার অনুমতি-অনুসারে বিবাহ করিয়া থাকে। এই প্রকার ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। বিদেশীরা অক্লেশে জাপানী-দিগকে বিবাহ করিতে, এবং প্রয়োজন হইলে দেশে যাইবার সময় "শাই-নাড়া" করিয়া পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারে। কিন্তু বিবাহ করিয়া ইচ্ছামত দেশে লইয়া যাইবার অধিকার নাই। তাহা গভর্মেণ্টের আদেশ এবং বালিকার পিতামাতার অনুমতিসাপেক্ষ।

বাঙ্গালীদিগের ন্যায় যদিও ভাত এবং মাছ ইহাদিগের প্রধান আহার, তথাপি ইহারা বিশেষ বলিষ্ঠ ; বাঙ্গালীর মত নির্জ্জীব নহে। এ দেশে গরু এবং ঘোড়ার কাজ প্রায় মানুষেই করিয়া থাকে। অধিকাংশ স্থলে চাষের কাজ পর্য্যন্ত মনুষ্যের দ্বারা হইয়া থাকে। গাড়ীর পরিবর্ত্তে "রিকসা" মনুষ্যেই বহন করে।

জাপানের প্রায় সর্ব্বত্রই পুলিস, রেল, ট্রাম, বৈদ্যুতিক আলোক, গ্যাস, জলের কল, টেলিফোঁ, টেলিগ্রাফ হইয়াছে। সমস্ত রাজপথ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; কিছুমাত্র ময়লা নাই। দু' বেলা রাস্তায় জল দিয়া থাকে। জাপানীরা বড়ই পরিষ্কার ; অতি গরিবের ঘরেও কিছুমাত্র ময়লা বা অপরিষ্কার নাই। জাপানে Treaty limitsএর বাহিরে যাইতে হইলে, পাসপোর্ট চাই। ইয়োকোহামা, টোকিও, কোবী, নিইগাটা ও নাগাসাকি ব্যতীত সর্ব্বত্র পাসপোর্টের প্রয়ো-জন। নিজের নাম রেজিষ্টারী করিতে ও পাসপোর্ট লইতে ৪ ডলার খরচ। জাপানে দেখিবার অনেক বস্তুই আছে ; স্থানাভাবে লিখিতে পারিলাম না।

এ দেশের ধর্ম্ম ভারতবর্ষের অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে। শতকরা তিন জন ব্যতীত অবশিষ্ট প্রায় সকলেই মূর্ত্তিপূজক বা পৌত্তলিক। ইহারা এ বিষয়ে চীনার সহিত অভিন্ন। ইহারা বহুতর দেবদেবী, ভূত, প্রেত ও আপন পূর্ব্বপুরুষদিগের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিয়া থাকে। প্রত্যেক জাপানীর গৃহে কাষ্ঠনির্ম্মিত মন্দির আছে ;—ইহারা প্রত্যহ বাতি, পুষ্প, ভাত, চা প্রভৃতি দিয়া পূজা করে। বড় বড় প্রকাশ্য মন্দির এবং দেবদেবীর মূর্ত্তি জাপানে অনেক আছে। ইহাদিগের প্রধান স্থান খিয়োটো, জাপানীরা তথায় গিয়া দেবতাদিগের সম্মুখে পয়সা দেয়, বাতি জ্বালায়, এবং হাতযোড় করিয়া কতকগুলি মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক নমস্কার করে। ইহাদিগের মধ্যে বহুতর সম্প্রদায়

আছে। মন্দিরে আসিবার ও যাইবার সময় ইহারা ঘণ্টা বাজাইয়া থাকে। কোনও সম্প্রদায়ের সাধুরা ঢাক বাজাইয়া মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক উপাসনা করে। আহার, ধর্ম্ম প্রভৃতি অনেক বিষয়ে ইহাদিগকে হিন্দু ব্যতীত আর কিছুই মনে হয় না। ইহারা সকলে কেবল নামমাত্র বৌদ্ধ ; যেমন হিন্দুদিগের মধ্যে নামে মাত্র একপরমাত্মপ্রতিপাদিত বেদকে ধর্ম্মপুস্তক এবং বৈদিক ধর্ম্মকে আপন ধর্ম্ম বলিয়া থাকে।

৩রা এপ্রেল বুদ্ধের জন্ম উপলক্ষে সমস্ত জাপানের বৌদ্ধ সাধু ও বড় বড় পণ্ডিতসমাজের এক মহাসভা হইয়াছিল। ঘটনাক্রমে আমিও নিমন্ত্রিত হইয়া-ছিলাম। সুযোগ পাইয়া "ইনাওয়ে"র সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে, প্রায় এক শতাধিক লোক—যাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া আসিয়াছিলেন,—তাঁহাদিগের সহিত ঐ বিষয়ের বিশেষ প্রসঙ্গ চলিয়া-ছিল। প্রায় দু' ঘণ্টা ধরিয়া বক্তাদিগের Private roomএ এই প্রসঙ্গ হয়। সকলেই এক বাক্যে অন্তর্য্যামীর কৃপায় সমস্ত ধর্ম্মনিহিত এক সত্য, যাহা কোনও ধর্ম্মে ভিন্ন নহে, সম্প্রদায়, জাতি, ধর্ম্ম এবং বর্ণ নির্ব্বিশেষে অঙ্গীকার এবং কার্য্যে পরিণত করা প্রয়োজন, ইহা স্বীকার করিয়াছেন। সভাভঙ্গের পর আরও অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছিল ; দেখিলাম, গুপ্তভাবে অন্তর্য্যামীর শুভবায়ু সর্ব্বত্র বহিতে আরম্ভ হইয়াছে ; নতুবা আমার ন্যায় ব্যক্তির বাক্যে সকলেই স্বীকার করিবে কেন ? "তোমার কার্য্য তুমি কর মা ! লোকে বলে করি আমি !" ইনাওয়ে সমস্ত জাপানের মধ্যে এক জন বিখ্যাত ব্যক্তি। ইনি যাইবার সময় টোকিও যাইবার জন্য আমাকে বিশেষ অনুরোধ করেন, আমি তখন কোনও অভিপ্রায় বুঝিতে পারি নাই। পরে ১৯শে সোমবার এক পত্র পাইলাম, তিনি নির্ব্বিশেষ ধর্ম্ম বিষয়ে সর্ব্ববাদিসম্মত এক সত্যের বিশেষ আলোচনার জন্য একটি সভা করিবেন, এবং আমি কোন দিন যাইতে পারিব, তাহা লিখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। আমি ২রা মে রবিবার যাইব বলিয়া পত্র লিখিয়াছি। পরে যাহা হয়, আপনাকে লিখিব। মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্। যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমদ্বয়ম্।

এখন বোধ হয়, কলিকাতায় রাত্রি দুইটা, আপনারা সকলে নিদ্রিত। কিন্তু এখানে এখন প্রভাত ছয়টা,—জাপান এখন জাগিয়া উঠিতেছে।

কোথায় ?

১

সকল দিক দেখিয়া, সকল কথা বিবেচনা করিয়া কাজ করা ভাল হইলেও
সব সময় তাহা সম্ভব হয় না। তাই একটা অজ্ঞাত আকর্ষণবলে সুরেন্দ্রনাথ
যখন শৈলবালাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন সে সকল দিক
দেখিয়া, সকল কথা বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে পারে নাই। তখন তাহার
বয়সই বা কি ? সে সবে কুড়ির ঘরে পা দিয়াছে, তাহার হৃদয়ে তখন যৌবনের
পূর্ণ অস্থিরতা। আর নহিলেই বা কে সর্ব্ববন্ধনবিরোধী চপল কুসুমায়ুধের
সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারে ?

সেই প্রথম যৌবনে কুটুম্বকন্যা শৈলকে দেখিয়া সুরেন ভাবিল যে, তাহার
দৃষ্টিতে এমন একটা কিছু আছে, যাহা একবার দেখিলে আর ভুলিতে পারা
যায় না। অথচ তাহাতে তীব্রতার লেশমাত্র নাই, সে যেন তারকার মাধুরী-
ময় সলজ্জ কোমল জ্যোতিঃ। শৈল যখন কথা কহিত, তখন বসন্তপবনস্পর্শে
পাদপপত্রের মত তাহার হৃদয়ের প্রত্যেক তন্ত্রী কাঁপিয়া উঠিত। তাহার
পূর্ব্বেও সে শৈলকে দেখিয়াছে ; কিন্তু তখন এত কিছু মনে হয় নাই। জীবনের
এক শুভ মুহূর্ত্তে হয় ত একটা কথায়, একবার দৃষ্টিতে, অধরপ্রান্তে এতটুকু
মৃদুহাস্যে, হৃদয়ে অননুভূতপূর্ব্ব বহু ভাব বিকশিত হইয়া উঠে ; ফুটিবার ঠিক
সময় নহিলে কোরক কুসুমে বিকশিত হয় না।

বর্ষাবারিরাশিস্ফীত স্রোতস্বতীর মত তাহার প্রেম ক্রমেই গভীরতর ও
প্রবলতর হইয়া উঠিতে লাগিল। আশা ও আশঙ্কা তাহার যৌবনলাবণ্যপূর্ণ
মুখে আপনাদের চিহ্ন অঙ্কিত করিল।

তখন তাহার মাতার প্রতিবেশিনীগণ তাঁহাকে জানাইলেন যে, আর
ছেলের বিবাহ না দিলে ভাল দেখায় না ; বিবাহের ভাবনা ভাবিয়া ভাবিয়াই
ছেলে অমন হইয়া যাইতেছে।

২

সুরেনের বিবাহ দিয়া পুত্রবধূ ঘরে আনেন, এ ইচ্ছা সুরেনের জননীর
অনেকদিনই হইয়াছিল। কিন্তু এ তিন বৎসর এত বলিয়া কহিয়াও তিনি
কিছুতেই ছেলেকে বিবাহে সম্মত করিতে পারেন নাই। সে কথা বলিলেই

সে বলিত,—আরও কিছুদিন যাউক ; বিশেষ অনুরোধ হইলে সে বলিত,
"আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ দিয়া আমাকে অসুখী করাই যদি তোমাদের
অভিপ্রায় হয়, তবে সেই চেষ্টা কর। আমি কিছুতেই এখন বিবাহ করিব না।"

ইতিপূর্ব্বেই সুরেনের দুই ভগিনীর বিবাহ হইয়াছিল, তাঁহারা শ্বশুরালয়ে থাকিতেন। বাড়ীতে মা আর বৃদ্ধা পিসীমা ; সে জোর করিয়া 'না' বলিলে তাঁহারা আর জিদ করিতে সাহস করিতেন না। ভগিনীরা পিত্রালয়ে আসিয়া সে কথা পাড়িলে সুরেন তাহা আমলেই আনিত না। কাজেই তাঁহারা কেবল স্বামিগৃহে যাইবার সময় মাকে বলিয়া যাইতেন, "উহার কথা শুনিও না মা ; মা দেখিয়া বিবাহ দিবেন, ছেলের আবার মতামত কি ?"

এবার মা জিদ ধরিলেন যে, তাহাকে বিবাহ করিতেই হইবে। সুরেন তত আপত্তি করিল না। শৈলকে বিবাহ করিতে যে সুরেনের ইচ্ছা ছিল, বোধ হয় মা সে সন্দেহ করিয়াছিলেন। ছেলের নাড়ী নক্ষত্র মা যেমন জানেন, তেমন আর কে জানে ? মা প্রথমেই সুরেনের সহিত শৈলের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। শৈলবালার অভিভাবকের তাহাতে সম্পূর্ণ সম্মতি ছিল। কিন্তু যে সংসারে এক জন পুরুষ কর্ত্তার অভাব, সে হিন্দু সংসারে সকল কার্য্যেই বড় গোলযোগ। দশ জন আত্মীয় স্বজনের মতামত লইয়া কার্য্য করিতে হয়, অথচ সে দশ জনের এক জনও কাজটা ঠিক আপনার ভাবেন না ; পরস্পর পরস্পরের উপর বরাৎ দিয়া চলিতে চাহেন ; সুতরাং অনেক পণ্ডিতে ব্যবস্থা নষ্ট হয়। এখানেও সেই বিপদ হইল ; সুরেনের মাতা জামাতা-দিগের মত করাইতে পারেন ত দূরসম্পর্কীয় দেবরদিগের মত হয় না ; আবার তাঁহাদিগের যদি মত হয়, তবে ভাশুররা বলেন—ভাবিয়া দেখি। আবার কথাটা অক্ষরে অক্ষরে রক্ষা না হইলে সকলেরই রাগ আছে !

বিক্ষিপ্ত আলোকরাশি এক বিন্দুতে সম্মিলিত হইলে যেমন তাহার দাহকরী শক্তি প্রকাশ পায়, তেমনই এই সকল বিভিন্নদিকগামী মত এক সিদ্ধান্তে সম্মিলিত হইলে তবে কার্য্য স্থির হয় ; কিন্তু এই সকল 'নানা মুনির নানা মত' এক সিদ্ধান্তে সম্মিলিত করা অসাধ্য সাধন বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

সুরেনের মাতার বহু চেষ্টা সত্ত্বেও শীঘ্র কিছুই স্থির হইল না। নানা মুনির নানা মতে গড়িমিসিতে ক্রমে মাসের পর মাস কাটিয়া গেল।

৩

ছেলের বিবাহ যত দিন ইচ্ছা স্থগিত রাখা চলে ; কিন্তু হিন্দুর ঘরে মে

বিবাহে তাহা হয় না। তাই যেমনই হউক, হিন্দুর মেয়ের বিবাহ এক রকম না এক রকম করিয়া সম্পন্ন হইয়া যায়—বাধিয়া থাকে না।

এদিকে শৈলের অভিভাবকগণ যখন দেখিলেন যে, মাসের পর মাস যায়, অথচ সুরেনের আত্মীয় স্বজনদিগের মত স্থির হয় না, সুরেনের মাতা ভরাভর দিতে পারেন না, তখন তাঁহারা ভাবিলেন, আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে; কারণ, তাঁহাদের কন্যাদায়। কাজেই তাঁহারা অন্য পাত্রের অন্বেষণে চেষ্টিত হইলেন।

ইহার পর এক টুকরা লাল কাগজ যথাসময়ে সুরেনকে জানাইল যে, অমুক দিন অমুকের পুত্র শ্রীমান্ অমুকের সহিত শৈলবালার শুভ বিবাহ হইবে, বিবাহস্থলে সবান্ধবে তাহার উপস্থিতি প্রার্থনীয়। পত্রখানা পাইয়া প্রথমে সুরেন ভাবিল যে, তাহাকে এ শুভকর্ম্মে নিমন্ত্রণ করা বড় নিষ্ঠুরতার কার্য্য; কিন্তু সে ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিল যে, ইচ্ছা করিয়া তাহার মনে ব্যথা দেওয়া কাহারও উদ্দেশ্য নহে। তবে ইহাতে নিষ্ঠুরতা কি? তবুও তাহার মনে কেমন একটা খট্‌কা রহিয়া গেল; যুক্তি বলিল,—ইহা নিষ্ঠুরতা নহে; কিন্তু হৃদয়ের যেখানে দারুণ বেদনা অনুভূত হইতেছিল, সেখান হইতে তবুও যেন কে বলিতে লাগিল,—নিষ্ঠুরতা ভিন্ন ইহা আর কি? যাহাই হউক, তাহার হৃদয়ে একটা বড় বেদনা বোধ হইতে লাগিল।

হতাশা, বেদনা, নিষ্ফল আক্রোশ, এই সকল মিলিয়া তাহার মনে কেমন একটা আকুলতা উৎপন্ন করিতে লাগিল।

ক্রমে শৈলবালার বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। দিন কাহারও সুখ-দুঃখের জন্য অপেক্ষা করিতে শিখে নাই। সুরেনের শরীর ও মনের অবস্থা এমনই দাঁড়াইল যে, সে আর কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিল না। সে স্থির করিয়াছিল যে, সে বিবাহবাড়ী যাইবে না; কিন্তু আজ তাহার মনে হইল যে, সে না যাইলে ভাল দেখাইবে না,—বিশেষ সে না গেলে যদি কেহ কিছু মনে করে! কেহ কিছু মনে করিবার এই সম্ভাবনাটা আজ সহসা কেন তাহার মনে হইল, তাহা স্থির করা দুষ্কর। অন্য দিন হইলে সে বুঝিতে পারিত যে, তাহার না যাইবার একটা সামান্য কৈফিয়ৎ দিলে, কেহই বিশেষ কিছু মনে করিবে না; কিন্তু আজ কোথা হইতে এতটুকু লজ্জা তাহার হতাশাব্যাপ্ত হৃদয়ের এক নিভৃত কোণ হইতে বলিতেছিল,—আসল কথাটা যদি কেহ বুঝিতে পারে!

কাজেই নিয়মিত সময়ে, সে সেই সন্ধ্যাদীপালোকিত গৃহে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিল, অথচ বিশেষ কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিল না।

অন্ধকার হৃদয়ে সেই আলোকোজ্জ্বল গৃহ হইতে স্বগৃহে ফিরিবার সময় তাহার মনে হইতে লাগিল,—সে কি দেখিয়া আসিল—শৈলের বিবাহ? না আপনার সকল আশার সমাধি?

গৃহে আসিয়া রুদ্ধদ্বার কক্ষে মুক্ত বাতায়ন সম্মুখে একখানা আরাম-চেয়ারে শ্রান্তভাবে পড়িয়া সুরেন কত কি ভাবিতে লাগিল। সম্মুখে তাহার হৃদয়ের অন্ধকারের মত অনন্তপ্রসারিত অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে মধ্যে যে আলোক দৃষ্ট হইতেছে, তাহার হৃদয়ে সেইরূপ আশার ক্ষীণ আলোক আছে কি? আছে; —নহিলে জীবনের উপর তাহার কিছুমাত্র মমতা থাকিত না। কিন্তু সে কথা তখন তাহার মনে হইল না। নৈশ বায়ুর শন্ শন্ শব্দে সে যেন কাহার করুণ ক্রন্দনের কাতরস্বর শুনিতে লাগিল। আমরা মনের অবস্থানুসারে জড় প্রকৃতিকেও বিচার করি; তাই এই দুঃখের সময় তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন প্রকৃতির চিরমাধুরীময় রঙ্গমঞ্চেও কে যেন বিষাদের যবনিকা ফেলিয়া দিয়াছে।

সুরেন কত কি ভাবিতে লাগিল; সবই যেন কেমন গোলমাল বোধ হইতে লাগিল। এইরূপ সময়ে হৃদয় সহজেই অতীত কথা ভাবিতে ভালবাসে; কিন্তু যে অতীত-সরসীসলিলে আমরা আমাদিগের পূর্ব্বস্মৃতি নিমজ্জিত রাখি, তাহার জলরাশি বড় অল্প আলোড়নেই আবিল হইয়া উঠে;—তখন কেবল একটা অস্পষ্ট আকুলতাই অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। সারা রাত্রি সুরেনের নিদ্রা হইল না; নিশাশেষে শীতল সমীরণ যখন তাহার স্বেদসিক্ত ললাট স্পর্শ করিতে লাগিল, তখন তাহার একটু তন্দ্রা আসিল।

প্রভাতে জাগিয়া সুরেন দেখিল, চার পেয়ালা লইয়া তাহার ভৃত্য তাহাকে ডাকিতেছে,—সেই ডাকেই তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। তখন অনেকটা বেলা হইয়াছে,—অম্লানোজ্জ্বল রবিকরে প্রকৃতি হাসিতেছে।

তাহার পর দিন কাটিতে লাগিল; কিন্তু নিদ্রান্তে দুঃস্বপ্নের স্মৃতির মত একটা বেদনা সুরেনের হৃদয়ে ব্যাপ্ত হইয়া রহিল। মা বিবাহের কথা পাড়িলে "হইবে," "ব্যস্ত কি" বলিয়া সে বিলম্ব করিতে লাগিল। এবার আর মার কাছে "বিবাহ করিব না" বলিতে তাহার সাহস হইল না।

৪

এক বৎসর কাটিয়া গেল, সুরেন বিবাহ করিল না। দ্বিতীয় বৎসরে মা

অনুরোধ ছাড়িয়া অশ্রুর আশ্রয় লইলেন। জননী সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র স্নেহময়ী জননী। কালে সুরেনের হৃদয়ক্ষতের বেদনা যেন একটু কমিয়া গেল।

আমরা কোন কার্য্যে যত দিন ইচ্ছা বিলম্ব করিতে পারি; কিন্তু সকলে তাহা করে না।—মৃত্যু কখনও বিলম্ব করে না। দ্বিতীয় বৎসরে প্রথমে পিসীমার মৃত্যু হইল; তাহার অল্প দিন পরে তাঁহার বহু দিনের ইচ্ছা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই, মাও সকল ইচ্ছার অতীত লোকে গমন করিলেন।

মাতার মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে বসিয়া সুরেন ভাবিল,—কি করিলাম! মার একটা ইচ্ছা পূর্ণ করিলাম না! আমার এ দুঃখ যে মরিলেও যাইবে না! মাতার মৃত্যুর পর চিরদীপ্ত হুতাশনের মত তাহার হৃদয়ে অনুতাপ জ্বলিতে লাগিল। মার একটা প্রিয় অভিলাষ পূর্ণ করে নাই ভাবিয়া সে বড় অনুতপ্ত হইল। আবার মাতার মৃত্যুর সহিত তাহার সংসারের শেষ বন্ধনও ছিন্ন হইয়া গেল। যে অবস্থায় সংসারে বিশেষ আকর্ষণ থাকে না, মানবের সে অবস্থা বড় সুখের নহে। অবলম্বিত ব্যবসায়ে অতিরিক্ত মনোযোগ দিয়া, সে তাহার যাতনা ভুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

কিন্তু হৃদয়ের একটা অংশ যদি শূন্য থাকে, তবে অন্য সকল অংশ কানায় কানায় পূর্ণ থাকিলেও, সেই শূন্য অংশের শূন্যতা তাহাতে দূর হয় না। হৃদয়ের যে অংশটা সর্ব্বাপেক্ষা কোমল, যে অংশ পূর্ণ হইলে হৃদয় মাধুরীময়, জীবন সুখময় হইত, সুরেনের হৃদয়ের সেই অংশটাই শূন্য ছিল। তাই সেই অংশ হইতে রৌদ্রতপ্ত মরুবায়ুর হাহুতাশের মত একটা অভাবব্যঞ্জক ভাব সর্ব্বদাই উঠিয়া আকুল শূন্যতা জ্ঞাপন করিত। সুরেন দেখিল, ব্যবসায়ে অতিরিক্ত মনোযোগ দিলেও সে শূন্যতা পূর্ণ হয় না। একের অভাব অন্যে নিবারিত হইতে পারে না। চিরদীপ্ত রাবণের চিতার মত সেই শূন্যতা লইয়া সুরেনের আর এক বৎসর কাটিয়া গেল।

৫

এই সময় আর একটা ঘটনা ঘটিল।

শৈলের স্বামী কোন আফিসে খাজাঞ্চীর কাজ করিতেন। তিনি তহবিল তছরূপের অভিযোগে অভিযুক্ত হইলেন। নিম্ন আদালত হইতে মোকদ্দমা দায়রায় গেল—জামিনের আবেদন গ্রাহ্য হইল না।

এই বিপদের সময় শৈল পিত্রালয়ে আসিল। সুরেন আইন-ব্যবসায়ী; শৈলের পিতা তাহাকে ডাকাইয়া মোকদ্দমা সম্বন্ধে তাহার মতামত জিজ্ঞাসা

করিলেন। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সুরেন মোকদ্দমার সকল ভার লইল। সজলনয়নে তাহার দিকে চাহিয়া শৈল বলিল, "দয়া করিয়া যাহা করিতে হয় কর।"

প্রায় তিন বৎসর পরে সেই দিন শৈলের সহিত সুরেনের আবার দেখা হইল। যেন একটা নির্ব্বাণোন্মুখ বহ্নি পুনঃ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। বর্ষাবারিপাতে নিদাঘতাপতপ্তা শীর্ণাঙ্গী স্রোতস্বিনীর হৃদয়ে প্লাবনের মত, কত ভাবনা যে সুরেনের হৃদয় প্লাবিত করিয়া তুলিল, তাহা বলা যায় না।

সেই দিন গৃহে ফিরিয়া সুরেন আপনার কক্ষে গিয়া কত কি ভাবিতে লাগিল। শৈলের সেই অশ্রুপূর্ণ, সহায়তাপ্রার্থী, কৃতজ্ঞতাপূর্ণ নয়ন যেন শিশিরসিক্ত নলিনী। জানি না অশ্রুতে কি আছে, কিন্তু অশ্রুতে যে সৌন্দর্য্য উদ্ভাবিত হইয়া উঠে, শত আভরণেও তাহা হয় না; অশ্রুর নিকট সকল আভরণ ম্লান হইয়া যায়। বুঝি এই শোকতাপময় জগতে হাসির অপেক্ষা অশ্রুই অধিক স্বাভাবিক;—তাই অশ্রু এত ভাল লাগে। সুরেন ভাবিল, হায় জীবনের গতি যদি ফিরিত!

তাহার চক্ষের সম্মুখ হইতে অতীতের অন্ধকার যবনিকা যেন অপসৃত হইয়া গেল; সে তাহার অতীত জীবনের ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিতে লাগিল। সমস্ত দিন সে কোন কাজ করিতে পারিল না। নিশীথে শয়নকক্ষে মুক্ত বাতায়নের সম্মুখে বসিয়া সুরেন কত কি ভাবিতে লাগিল,—সে ভাবনার কি অন্ত আছে? আকাশে মেঘসমাগম হইতে লাগিল, কাল মেঘের উপর কাল মেঘ তারকাবহুল অম্বর ছাইয়া ফেলিল। তাহার পর ঝড় উঠিল। সুরেন উঠিয়া বাতায়ন রুদ্ধ করিয়া আবার ভাবিতে লাগিল। তাহার হৃদয়েও ঝটিকা বহিতেছিল।

বারিপাত আরম্ভ হইল; বাতায়নপার্শ্বে পবন আর্ত্ত চীৎকার করিতে লাগিল; বৃষ্টিবিন্দু বাতায়নপথে প্রবেশ প্রার্থনা করিতে লাগিল। প্রাণহীন নীরব নিশ্চল মূর্ত্তির মত সুরেন স্থির।

যাহা হউক, সুরেন নিশ্চয় বুঝিল যে, অতীতস্মৃতি হৃদয় হইতে অপনীত হইবার নহে।

৬

মোকদ্দমার দিন শৈলের স্বামী আদালতে দেখিলেন, তাঁহার পক্ষে মোকদ্দমা তদ্বিরের কোনই ত্রুটি হয় নাই। কে এত করিল? তিনি ভাবিলেন, শৈলের পিতাই সব করিয়াছেন, তাঁহার নিকট আত্মীয় ত আর কেহ নাই!

মোকদ্দমা চলিতে লাগিল।

দুই দিনে মোকদ্দমার বিচার শেষ হইয়া গেল; শৈলের স্বামী বেকসুর খালাস পাইলেন। সে সুখসংবাদ তাঁহার নিকট এতই অপ্রত্যাশিত বোধ হইতেছিল যে, তাহা যেন আঘাতের মত আসিল। তবে আনন্দাতিশয্য দুঃখাতিশয্যের মত অনিষ্টকর নহে।

খালাস পাইয়া তিনি কে তাঁহার পক্ষে তদ্বির করিয়াছেন, জানিবার জন্য, যে ব্যারিষ্টার তাঁহার পক্ষে ছিলেন, তাঁহার নিকট গিয়া সে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শৈলের স্বামী জিজ্ঞাসা করিলে ব্যারিষ্টার আদালতের অপর পার্শ্বে উপবিষ্ট এক জন ভদ্রলোককে দেখাইয়া দিলেন। শৈলের স্বামী দেখিলেন, এক জন অপরিচিত ব্যক্তি। তথাপি তাঁহার কাছে সকল সংবাদ লইতে ও তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে তিনি তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন।

কিন্তু তিনি তাঁহার দিকে আসিতেছেন দেখিয়া, সেই অপরিচিত ব্যক্তি উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

তাঁহাকে না পাইয়া শৈলের স্বামী বাড়ী গেলেন।

স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া শৈল খানিকটা আনন্দের কান্না কাঁদিল। তাহার পর সে স্বামীকে এ কয় দিনের সকল ঘটনা বলিল।—তাহার ভাবনা ও পিত্রালয়ে গমন,—সুরেনের মোকদ্দমার ভার লওয়া, সে একে একে স্বামীকে সকল কথা বলিল।

* * * * * * *

পর দিবস ধন্যবাদ দিবার অভিপ্রায়ে সুরেনের বাড়ী গিয়া শৈলের স্বামী শুনিলেন,—সুরেন কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

শৈল পিত্রালয়ে আসিল। শৈলের পিতাও তাহার ভগিনীপতিদ্বয় সুরেনের যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিলেন। কিন্তু কেহই বলিতে পারিল না—সে কোথায় গিয়াছে। সে আপনার গমনের চিহ্নমাত্র রাখিয়া যায় নাই।

অসীম সাগরে ক্ষুদ্র জলবিম্ব যেমন ভাসিয়া যায়, তেমনই অসীম জন-সমুদ্রে সুরেন কোথায় ভাসিয়া গেল, তাহা নির্ণীত হইল না। দুই চার দিন কেহ কেহ তাহার কথা লইয়া আন্দোলন করিল; সে কেন গেল, কোথায় গেল, এই সকল সম্বন্ধে আপন আপন অদ্ভুত মত প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহার পর নানা নূতন চিন্তায় তাহারা সে সকল কথা ভুলিয়া গেল। সুরেনের স্মৃতি তাহাদিগের নিকট নিশান্ত অৰ্দ্ধেকদৃষ্ট স্বপ্নের স্মৃতির মত অস্পষ্ট হইয়া আসিতে লাগিল।

শৈলের স্বামী আর এক স্থানে চাকরী পাইয়া আফিসের কাজে, সংসারের ঝঞ্ঝাটে আপনার কৃতজ্ঞতার ঋণের কথা সহজেই বিস্মৃত হইলেন। কেবল তাহা স্মরণ করিয়া মধ্যে মধ্যে একটি বেপমান রমণীহৃদয় হইতে দীর্ঘশ্বাস উঠিয়া পবনে মিশাইয়া যাইত; আর সে আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিত,—"কোথায়?"

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

(সমালোচনা)।

যে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করিবার আশায় বাঙ্গালী পাঠক এত দিন উৎসুকচিত্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন, দীনেশ বাবুর সে গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠ করিয়া দেখিলাম, গ্রন্থখানি অতি অপূর্ব্ব ও উপাদেয় হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ গ্রন্থ সম্পূর্ণ নূতন জিনিস। এরূপ গ্রন্থ রচনার জন্য যে শ্রম, আয়াস, ঐকান্তিকতা ও অধ্যবসায় আবশ্যক, বাঙ্গালীতে তাহা কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। অতএব বাঙ্গালা দেশে এ ধরণের গ্রন্থ সুলভ নহে। এ সকল কারণে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের একটু বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

যেমন কোন জাতির জাতীয় প্রকৃতি, জীবনের গতি, লক্ষ্য ও বিরাম বুঝিবার জন্য জাতীয় ইতিহাসের প্রয়োজন, সেইরূপ কোন ভাষার প্রকৃতি, তাহার গতি, লক্ষ্য ও বিরাম বুঝিবার জন্য, ভাষার ও সাহিত্যের ইতিহাসের প্রয়োজন। রাণী এলিজাবেথের কালীন ইংলণ্ডেই সেক্সপিয়রের উদ্ভব দেখি কেন? অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জারমানিতে গেটের 'ফাউষ্ট' লিখিত হয় কেন? ইংরেজ-আগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বেই কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় বিদ্যাসুন্দর গীত হয় কেন? এ সকল প্রশ্নের উত্তর বুঝিতে হইলে সাহিত্যের ইতিহাস জানা চাই।

প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রাচীন বাঙ্গালা কিরূপে রূপান্তরিত হইয়া বঙ্কিম বাবুর ভাষায় পরিণত হইয়াছে; সংস্কৃতে বিভক্তি দ্বারা বহুবচন সূচিত হয়, বাঙ্গালায় বহুত্ব বাচক শব্দ যোগ করিয়া বহুবচন সিদ্ধ করিতে হয় কেন? 'কে' বিভক্তি যোগ করিলে কর্ম্মকারক, 'হইতে' বিভক্তি যোগ করিলে অপাদান কারক, 'ল' বিভক্তি যোগ করিলে অতীত কাল সূচিত হয় কেন? এ সকল প্রশ্নের উত্তর বুঝিতে হইলে ভাষার ইতিহাস জানা চাই।

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক জটিল দুর্ব্বোধ্য গুরুতর সমস্যার

মীমাংসা আমরা দীনেশ বাবুর গ্রন্থে পাইয়াছি, সেই জন্য এই গ্রন্থকে অতি অপূর্ব্ব ও উপাদেয় বোধ হইয়াছে। এইরূপ গ্রন্থের সহিত সকলেরই ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। মুখবন্ধে গ্রন্থকার গ্রন্থোৎপত্তিসম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন। "অদ্য ছয় বৎসর অতীত হইল এক দিন আমার পুস্তকাধারস্থিত অতি-জীর্ণ গলিতপত্র প্রেমাশ্রুর নীরব নিকেতন চণ্ডীদাসের কবিতা খানা পড়িতে পড়িতে প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের একখানা ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিতে ইচ্ছা হয়। * * ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পল্লীতে পল্লীতে অনেক প্রাচীন পুঁথি আছে, এই সংবাদ পাইয়া নিজে নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া সঞ্জয়কৃত মহাভারত, গোপীনাথ দত্তের দ্রোণপর্ব্ব প্রভৃতি বিবিধ হস্ত লিখিত প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ করি। * * আমি বৎসর ভরিয়া ত্রিপুরা নোয়াখালী শ্রীহট্ট ঢাকা প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের নানা জেলা হইতে পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছি। * * কোন কোন দিন দশ মাইল পদব্রজে গমন ও সেই দশ মাইল পুনঃপ্রত্যাবর্ত্তন কেবল গমনাগমনসার হইয়াছে। ইহা ছাড়াও কোন সময় নানারূপ বিপদে পতিত হইয়াছি। * * এই ছয় বৎসরের চেষ্টায় বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের প্রথম ভাগ অদ্য পাঠকগণের নিকট প্রকাশিত করিতেছি। এই পুস্তকে ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়া সাময়িক আচার ব্যবহার দেশের ইতিহাস ইত্যাদি নানারূপ প্রসঙ্গসম্বন্ধে আলোচ্য গ্রন্থগুলিতে যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। প্রথম তিন অধ্যায়ে ভাষার উৎপত্তি, বিভক্তি চিহ্ন প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করিয়াছি। পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে সাহিত্যের আলোচনা করিয়া অধ্যায়ের পরিশিষ্টে ভাষা সামাজিক আচার ঐতিহাসিক বিবরণগুলি ও অপ্রচলিত শব্দার্থের তালিকা প্রদান করিয়াছি। যে সব শব্দ ভিন্ন অর্থ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহাও সেই সঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি।"

ইহা দ্বারা বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রথম ভাগে কি কি বিষয় নিবিষ্ট হইয়াছে, পাঠক তাহার আভাষ পাইবেন। কিন্তু বিশেষ যত্ন ও অভিনিবেশ-সহকারে গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত না পড়িলে, গ্রন্থ অথবা গ্রন্থকারের যথার্থ পরিচয় পাইতে পারিবেন না। যথার্থ পরিচয় পাইলে বোধ হয় আমার সহিত একবাক্যে বলিবেন যে, বাস্তবিকই গ্রন্থখানি অতি অপূর্ব্ব ও উপাদেয় হইয়াছে।

গ্রন্থশেষে গ্রন্থকার আশান্বিতহৃদয়ে এই কয়টি কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন;

—'ইংরেজ-আগমনের সঙ্গে সামাজিক জীবনে রাজনৈতিক জীবনে পারিবারিক জীবনে নূতন চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। নূতন আদর্শ নূতন উন্নতি ও নূতন অভিপ্রায়ের সঙ্গে, সমগ্র জাতি অভ্যুত্থান করিয়াছে। * * আমরা দ্বিতীয়ভাগে নবভাবে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত নব আশাদৃপ্ত বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতিশীল চিত্র আঁকিয়া দেখাইব আশা রহিল।'

ভগবান্ গ্রন্থকারের আশা পূর্ণ করুন! সমগ্র বাঙ্গালী জাতি বোধ হয় তাঁহার এ আশার প্রতিধ্বনি করিবে। গ্রন্থরচনার ও সঙ্কলনের বিপুল আয়াসে স্বাস্থ্যভগ্ন হইয়া গ্রন্থকারের জীবনসংশয় ঘটিয়াছিল। ঈশ্বরের কৃপায় তিনি কতক পরিমাণে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। এ সংবাদে বোধ হয় প্রত্যেক বাঙ্গালী পাঠক আনন্দিত হইবেন। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি অচির-কালমধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া আবার বর্দ্ধিতপ্রযত্নে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সেবায় ব্রতী হউন।

এই প্রবন্ধের শিরে সমালোচনা শব্দ নিবদ্ধ করিয়াছি। কিন্তু এ গ্রন্থের সমালোচনা করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। মেন সাহেবের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ 'প্রাচীন বিধি' (Ancient Law) প্রকাশিত হইলে ইংরেজ সমালোচকেরা যাহা বলিয়াছিলেন, এ গ্রন্থসম্বন্ধে আমিও ঠিক সেই কথা বলিতে চাই। সমালোচনার জন্য যে যে উপকরণের প্রয়োজন, তাহার সংগ্রহের জন্য সমালোচিত গ্রন্থেরই সাহায্য লইতে হইতেছে। অতএব সমালোচনা কিরূপে হইতে পারে? দীনেশ বাবু যে সকল প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার অধিকাংশই আমাদের অপরিচিত। এখন যাহা কীটদষ্ট তুলট কাগজের পুঁথির ভিতর লুক্কায়িত আছে, যদি তাহা কালে কখনও মুদ্রিত হইয়া লোক-লোচনের গোচর হয়, তবে সে সম্বন্ধে প্রকৃত মতামত প্রকাশ করা যাইতে পারিবে। আর ঐ সকল গ্রন্থ সাধারণের আয়ত্ত না হইলে, বঙ্গ ভাষার উৎপত্তি, ব্যাকরণের নিয়ম ও শব্দার্থের পরিবর্ত্তনসম্বন্ধে দীনেশ বাবু যে সকল মত লিপি-বদ্ধ করিয়াছেন, সে বিষয়েও নিঃসংশয়ে মন্তব্য প্রকাশ করা যাইতে পারে না। সেই জন্য এ প্রবন্ধে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের কোনরূপ সমালোচনা না করিয়া, যাহাতে পাঠক গ্রন্থের একটু সুস্পষ্ট পরিচয় পান, তাহারই চেষ্টা করিব।

গ্রন্থপাঠ সমাপন করিবার পূর্ব্বেই হৃদয়ে একটা বিস্ময়ের উদ্ভব হয়। এক জন মানুষ নিজের যত্ন, উদ্যম ও অধ্যবসায়ে কতটা সম্পন্ন করিয়াছেন! অন্যান্য দেশে এরূপ বিষয়ে শ্রমবিভাগের নিয়ম আছে। এক শ্রেণীর লোক প্রাচীন

পুঁথি পুস্তকাদি সংগ্রহ করেন। আর এক শ্রেণীর লোক (ইঁহারা বৈয়াকরণ) সংগৃহীত পুস্তকাদির আলোচনা করিয়া ভাষার ইতিহাস ও ব্যাকরণ সঙ্কলন করেন। আর এক শ্রেণীর লোক (ইঁহারা আভিধানিক) প্রাচীন শব্দাদির সংগ্রহ ও তাহাদিগের অর্থাদির মেলন করিয়া ঐতিহাসিকক্রমানুযায়ী অভিধান প্রণয়নের ব্যবস্থা করেন। আর এক শ্রেণীর লোক (ইঁহারা ঐতিহাসিক) প্রাচীন সাহিত্যের দর্পণে প্রতিফলিত সমাজচিত্রের প্রতিলিপি আঁকিয়া জাতীয় ইতিহাসরচনার পথ সুগম করিয়া দেন। সর্ব্বশেষে সাহিত্যসমালোচক পূর্ব্বোক্ত সকলের শ্রমফল স্বায়ত্ত করিয়া সাহিত্যের সমালোচনাসম্বলিত ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করেন। দীনেশ বাবুকে পুস্তকপ্রণয়ন জন্য এতগুলি কার্য্য প্রায় এককই করিতে হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী সংগ্রাহক, সমালোচক ইতিবৃত্ত-লেখক প্রভৃতির নিকট তিনি যে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে গ্রন্থের ভূমিকায় স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু সকল কথা ভাবিয়া দেখিলে ঐ সাহায্য বড় বেশী বলিয়া বোধ হইবে না। সেই জন্য 'প্রায় একক' বলিলাম।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য এক বিরাট বস্তু। অনভিজ্ঞতানিবন্ধন আমাদের ইতিপূর্ব্বে ধারণা ছিল যে, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য দশ কুড়ি খান গ্রন্থ লইয়া গঠিত; অতএব অতি যৎসামান্য জিনিষ। কিন্তু দীনেশ বাবুর গ্রন্থপাঠে সে ভ্রম বিদূরিত হইয়াছে। এখন বুঝিয়াছি যে, 'বঙ্গদেশে এমন পল্লী নাই, যাহাতে প্রাচীনকালে দু' এক জন পল্লীকবির আবির্ভাব হয় নাই। বৈষ্ণব সাহিত্য অতি বিরাট—লূতাতন্তুজড়িত জীর্ণ গলিতপত্র শত শত বৈষ্ণব গ্রন্থ এখনও অজ্ঞাতভাবে পড়িয়া আছে।' 'বঙ্গদেশের প্রত্যেক স্থলেই ভাষাকাব্য রচিত হইয়াছিল। কোন প্রদেশই একবারে প্রতিভাশূন্য মরু ছিল না। আরণ্য-কুসুম ও গ্রাম্য কবিতা সর্ব্বত্রই প্রাপ্ত হওয়া যায়।' এই সকল কাব্য ও কবিতা সংগ্রহের জন্য বিরাট চেষ্টা হওয়া উচিত। ইতিমধ্যে কিছু কিছু আরম্ভ হইয়াছে। অতএব আশা করা যায় যে, কয়েক বৎসরের মধ্যে বহুসংখ্যক প্রাচীন অজ্ঞাত কাব্য সাধারণের সুপরিচিত হইবে। সে সংগ্রহকার্য্যের পক্ষে দীনেশ বাবুর গ্রন্থ বিশেষ সহায়তা করিবার সম্ভাবনা; কারণ তিনি এতগুলি অপরিচিত কাব্যের পরিচয় দিয়াছেন যে, তদ্দ্বারা বাঙ্গালী পাঠকের কৌতূহল উদ্রিক্ত হইয়া পুঁথিসংগ্রহের পক্ষে যে সাধারণের সম্যক চেষ্টা ও উদ্যম প্রযুক্ত হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহাও আশা করা যায় যে, যে সকল প্রাচীন পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা শীঘ্র মুদ্রিত হইয়া সাধারণের

পর্য্যালোচনার বিষয় হইবে। গ্রন্থের ভূমিকায় দীনেশ বাবু শিষ্টাচারসম্মত বিনয় অবলম্বন করিয়া স্বীয় গ্রন্থের নানারূপ ত্রুটি স্বীকার করিয়াছেন, এবং লিখিয়াছেন যে, এখনও প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের একখানা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখিবার সময় উপস্থিত হয় নাই। 'আমার এই পুস্তক ভাষার ভাবী ইতিহাস-রচনাকালে, যদি কিঞ্চিৎ আনুকূল্য করিতে সমর্থ হয়, তবেই শ্লাঘ্য জ্ঞান করিব।' বিনয়ের পরাকাষ্ঠা বটে। দীনেশ বাবু নিশ্চিন্ত থাকুন। তাঁহার গ্রন্থ শ্লাঘ্য হইয়াছে। বঙ্গ সাহিত্যের যিনি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সঙ্কলন করিবেন, তাঁহাকে দীনেশ বাবুর প্রবর্ত্তিত পথেই গমন করিতে হইবে। অথবা আরও প্রাচীন অজ্ঞাত পুঁথি আবিষ্কৃত হইলে বঙ্গ সাহিত্যের অনেক জটিল সমস্যার উদ্ভেদ হওয়া সম্ভব, অনেক নূতন ও মনোহর প্রসঙ্গের অবতারণা হওয়া সম্ভব, কিন্তু তদ্দ্বারা দীনেশ বাবুর যশঃ কিছুমাত্র পরিম্লান হইবে না। বরং সংগ্রহ ও সমালোচনা কার্য্যের দুরূহত্ব উপলব্ধি করিয়া ভবিষ্যৎ কালে পাঠক তাঁহার শ্রম ও অধ্যবসায়ের যথার্থ মূল্য বুঝিতে সমর্থ হইবে।

প্রাচীন সাহিত্যালোচনার ফল বিবৃত করিয়া আমি ১৩০১ সালের 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায়' এইরূপ লিখিয়াছিলাম,—'সমাজের যে প্রধান বন্ধনী ভাষা সেই ভাষারও একটা ইতিহাস আছে। এই ভাষার ইতিহাসজ্ঞান প্রাচীন সাহিত্যের জ্ঞানসাপেক্ষ। অতএব ভাষার ইতিহাসজ্ঞানের জন্য প্রাচীন কাব্য গীত রচনা চিন্তার আলোচনার প্রয়োজন। আর এক কথা। কোন ভাষার ব্যাকরণ সংস্কলন করিতে হইলে সেই ভাষার প্রাচীন সাহিত্যের জ্ঞান থাকা চাই। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রচিত যে কোন ভাষার ব্যাকরণ অধ্যয়ন করুন, দেখিবেন, পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় সেই ভাষার প্রাচীন সাহিত্যপাঠের লক্ষণ সুস্পষ্ট রহিয়াছে। কোন ভাষার প্রণালী বিশুদ্ধ অভিধান সংস্কলন করিতে হইলে, সেই ভাষার প্রচীন সাহিত্যের পরিজ্ঞান থাকা চাই। অভিধান বলিলে শুধু প্রচলিত শব্দ সকলের প্রচলিত অর্থসংগ্রহ বুঝিতে হইবে না। প্রণালীবিশুদ্ধ অভিধানে অধুনাপ্রচলিত বা ইতিপূর্ব্বে প্রচলিত সকল শব্দের অর্থ ব্যুৎপত্তি এবং ইতিহাসের বিশিষ্ট বিবরণ থাকা চাই। শেষ কথা, জাতীয় সাহিত্য জাতীয় জীবনের প্রতিরূপ। যেকালে জাতীয় জীবনের যে ভাব, জাতির যাহা রীতি নীতি প্রণালী পদ্ধতি, সেই কালের কবির কাব্যে তাহার ছায়াপাত দৃষ্ট হয়। অতএব অতীত যুগের জাতীয় জীবন, সেই কালের সামাজিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা বুঝিবার জন্য প্রাচীন কাব্য গীত রচনা চিন্তার আলোচনার

প্রয়োজন।' প্রাচীন সাহিত্য আলোচনায় কত ফল, ভাষার ইতিহাস ও ব্যাকরণ সঙ্কলন প্রণালী, বিশুদ্ধ অভিধান প্রণয়ন, জাতীয় অতীত জীবনের ইতিবৃত্তজ্ঞান প্রভৃতি প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা কত আবশ্যক, তাহা দীনেশ বাবুর গ্রন্থ পাঠ করিলে হৃদয়ঙ্গম হয়। গ্রন্থকার প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে বঙ্গভাষার উৎপত্তি এবং সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালার পরস্পর সম্বন্ধের আলোচনা করিয়াছেন। ইহাকেই সঙ্ক্ষেপে ভাষার ইতিহাস বলিয়াছি। বিষয়ের গুরুত্ব ও জটিলতা বিবেচনায় এ দুইটি অধ্যায় কিছু সংক্ষিপ্ত মনে হয়। গ্রন্থকার অবশ্য অনেক নূতন কথার অবধারণা করিয়াছেন, কিন্তু এ সকল বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য গ্রন্থকারকে এ সম্বন্ধে আরও গবেষণা, অনুসন্ধান ও অনুশীলন করিতে হইবে। আশা করি, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের' দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থকার বাঙ্গালা ভাষার একখানা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের মূলসূত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া পাঠককে উপহার দিয়া কৃতার্থ করিবেন। আর তাহার সঙ্গে সেই ইতিহাসের পর্য্যায়ক্রমে আলোচনা করিয়া বঙ্গভাষার একটি যুগভেদ বাঁধিয়া দিবেন। বর্ত্তমান গ্রন্থে বঙ্গ সাহিত্যের তিনি যে যুগভেদ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা সজীব একত্ব ও ধারাবাহিক একতানতা উপলব্ধি হয়। গ্রন্থকার বিশেষ কৌশল ও গবেষণার সহিত প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য কয়েকটি সুসম্বদ্ধ বিভিন্নযুগে বিভজ্য। প্রথম বৌদ্ধ যুগ, মাণিকচাঁদের গান এবং খনা ও ডাকের বচন এই যুগের সাহিত্যের নিদর্শন। দ্বিতীয়, হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের যুগ; গৌড়ীয় যুগ বা শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্ব সাহিত্য এই যুগের অন্তর্গত। কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কবীন্দ্রের মহাভারত, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাণা হরিদত্তের মনসার পাঁচালী, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পদাবলি প্রভৃতি এই যুগের সাহিত্যের নিদর্শন। তৃতীয়, শ্রীচৈতন্য সাহিত্য বা নবদ্বীপের প্রথম যুগ; চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্যচরিতামৃত, অদ্বৈতমঙ্গল, ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি চরিতকাব্য ও গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস, বলরাম দাস প্রভৃতির পদাবলি এই যুগের সাহিত্যের নিদর্শন। চতুর্থ, সংস্কার যুগ; মাধবাচার্য্য, মুকুন্দরাম, রামেশ্বর, ক্ষেমানন্দ, বলরাম, ঘনরাম প্রভৃতি এই যুগের লৌকিক ধর্ম্মকাব্যের রচয়িতা, এবং কংসারি, লোকনাথ দত্ত, রাজারাম, ষষ্ঠীবর, গঙ্গাদাস, গোপীনাথ, কাশীরাম দাস প্রভৃতি এই যুগে সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদক বা অনুকারক। পঞ্চম, কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ, অথবা নবদ্বীপের দ্বিতীয় যুগ; আলোয়ালের পদ্মাবতী,

কৃষ্ণরাম ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর, কামিনীকুমার, জীবনতারা প্রভৃতি এই যুগের নিদর্শণ।

এই যুগক্রমপ্রদর্শনে স্থানে স্থানে কিছু বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। কদাচ পুনরুক্তি ও সংস্থানবিপর্য্যয় দৃষ্ট হয়। গ্রন্থকার এ বিষয়ে মুখবন্ধে ত্রুটি স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন, 'পুস্তক শেষ না করিয়া ছাপাইতে দেওয়ায় কতকগুলি দোষ হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রধান, এই পুস্তকের আদ্যন্ত সুশৃঙ্খল করিতে পারি নাই।' কিন্তু এই অত্যল্প বিশৃঙ্খলাসত্ত্বেও দীনেশ বাবু স্বীয় গ্রন্থে প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের একটি একতান ও সজীব ভাব বেশ পরিস্ফুট করিয়া দেখাইয়াছেন। তাহাতে বঙ্গ সাহিত্য বুঝিবার বিশেষ সুবিধা হইবে।

বঙ্গ সাহিত্যের যেরূপ যুগক্রম দেখাইয়াছেন, আমার অনুরোধ, গ্রন্থকার দ্বিতীয় সংস্করণে বঙ্গভাষার সেইরূপ একটা লক্ষণ ও উদাহরণসংযুক্ত যুগক্রম নির্ণয় করেন। আমার বিশ্বাস, এরূপ করিলে দেখা যাইবে যে, সকল স্থলে ভাষাও সাহিত্যের যুগ সমকালিক নহে।

গ্রন্থকার তৃতীয় অধ্যায়ে এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ের পরিশিষ্টে (১৩৫ পৃষ্ঠায়) বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণের কয়েকটি প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছেন। প্রধানতঃ বাঙ্গালা বিভক্তি ও ছন্দ ঐ ঐ স্থলে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার বিভক্তির উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই সঙ্গত মনে হয়। ষষ্ঠীর 'র', বহুবচনের 'দিগ' ইত্যাদি দুই চারি স্থলে মতের অনৈক্য আছে মাত্র। আর একটি বিষয়ে এ স্থলে একটু অভাব লক্ষিত হয়। বিভক্তি দ্বিবিধ;—কারকাদিবাচক (সংস্কৃতে যাহাকে 'সুপ্' বলে) এবং কালাদিবাচক (সংস্কৃতে যাহাকে তিঙ বলে)। গ্রন্থকার কারকবাচক বিভক্তিরই আলোচনা করিয়াছেন, কালাদিবাচক বিভক্তির 'এ', 'ব' ইত্যাদির কোন প্রসঙ্গ করেন নাই কেন?

গ্রন্থকার চতুর্থ অধ্যায়ে এবং ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ের পরিশিষ্টে অপ্রচলিতও দুরূহার্থ শব্দের এক একটি বিস্তৃত তালিকা দিয়াছেন, এবং কাব্যবর্ণিতকালে প্রচলিত আচার পরিচ্ছদ ব্যবহার বাণিজ্য প্রভৃতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বাঙ্গালীর অতীত জাতীয় জীবনের কয়েকটি অধ্যায় সংকলন করিয়াছেন। এইরূপে প্রণালীবিশুদ্ধ অভিধানপ্রণয়নের ও সামাজিক ইতিহাসসংকলনের উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে। এই উপকরণসংগ্রহ কত মূল্যবান, তাহা বুঝাইবার জন্য গ্রন্থের দুই তিন স্থল উদ্ধৃত করিব।

'মুসলমান প্রভাবের ক্রমোন্নতির পশ্চাতে দূর ভাগ্যাকাশের সীমান্তে হিন্দুর সুখ স্বচ্ছন্দের তারা ডুবিয়া যাইতেছিল। বঙ্গদেশে হিন্দুর দুর্ভাগ্য ও মুসলমানের সৌভাগ্যের ভাষাই প্রমাণ দিতেছে। হিন্দুর 'কুঁড়ে' মুসলমানের দালান, এমারত; হিন্দুর 'গাঁ', মুসলমানের সহর; হিন্দুর শস্য কর্ত্তিত হইয়া যখন মুসলমানের সেবায় লাগে, তখন তাহা ফসল; হিন্দুর টাকা করগ্রাহী মুসলমানের হস্তে পঁহুছিলে 'খাজনা' হয়। ক্ষুদ্র মেটে তৈলের প্রদীপটি মাত্র তাহার, ঝাড় ফানস দেয়ালগিরি সমস্ত বিলাসের আলোক মুসলমানের। হিন্দু অপরাধ করিলে কাজি মেয়াদ দেয়; ইহা ছাড়া বাদশাহ উমরাহ হইতে উজির নাজির সামান্য কোটাল পেয়াদা বরকন্দাজ নফর পর্য্যন্ত সকলই মুসলমানী শব্দ, 'জমি তালুক মুলুক' প্রভৃতি মুসলমানী শব্দ। উপাধিগুলিও তাবত মুসলমানী—জুমলদার মজুমদার হাবিলদার, সম্মানসূচক সাহেব প্রভুত্বসূচক হুজুর। এই সব ভাষা বঙ্গের ঘরে ঘরে প্রবেশ করিয়া হিন্দুর ভাষাকে যবনাধিকারচিহ্নিত করিয়াছিল।'

'পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের রমণীগণের পরিচ্ছদ একরূপ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে কণ্ঠে সুবর্ণের হার, কর্ণে কুণ্ডল, নাসায় গজমতি, হস্তে বালা কঙ্কণ, কটিতটে ক্ষুদ্র ঘণ্টী, পদে মঞ্জরী প্রভৃতি কতক পরিমাণে পরিচিত অলঙ্কারের উল্লেখ পাই। চণ্ডীদাস মল্লতাড়ল্লনামক একরূপ ভূষণের নাম করিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গের লেখক বিজয় গুপ্ত হস্তে সুবর্ণ বাউটি সুবর্ণ ঘাগরা ও শীলমণি কাচ, কণ্ঠে হাসলি, কর্ণে সোণার মদনকড়ি, পদে পিতলের খাড়ু ও লোটন খোঁপা নামক একরূপ খোঁপার উল্লেখ করিয়াছেন। *** পূর্ব্বকালে বাঙ্গালীরা ডিঙ্গা সাজাইয়া সমুদ্রে যাতায়াত করিত। কোন দীর্ঘযাত্রার প্রাক্কালে স্ত্রীর সন্তান হওয়ার সূচনা লক্ষ্য করিলে তাহাকে একখানা মঞ্জুরীপত্র দিয়া যাইত। মাঝিদিগের তত্ত্বাবধায়ক গাবুর নিযুক্ত থাকিত, ইহারা সারি গাহিয়া মাঝিদিগকে কার্য্যে আকৃষ্ট রাখিত ও মাঝিরা কার্য্যে শ্লথ হইলে, তাহাদিগকে ডাঙ্গা দিয়া প্রহার করিত। ডিঙ্গা গুলির মধ্যে বাণিজ্যের উপযুক্ত নানাবিধ দ্রব্য থাকিত, এবং কোন কোন থানায় হাট মিলিত। এই বাণিজ্যব্যাপারে বিলক্ষণ লাভ ছিল। নাবিকগণ সমুদ্রে ঢেউ দেখিলে তৈল নিক্ষেপ করিয়া ঢেউ নিবারণ করিত। ঝাঁকে ঝাঁকে জোঁক উঠিয়া ডিঙ্গা আক্রমণ করিলে তাহারা ক্ষার চুন ছড়াইয়া ফেলিত। শঙ্খ উঠিয়া ডিঙ্গার গতি প্রতিরোধ করিলে মৎস্য মাংস কাটিয়া দিত, গন্ধে শঙ্খগুলি পলাইয়া যাইত। এই সময়ে বঙ্গে শিল্পজাত দ্রব্যের উন্নতি খুব বেশী হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। পাটের

পাছড়া সম্বন্ধে পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে পাটের পাছড়াকে পাটের খনি বলিত; গায়েন একখান পাটের খনি পাইলেই কৃতার্থ হইতেন। এই খনির মধ্যে বিশেষ নিপুণতা ছিল না। ** স্ত্রীলোকদিগের কাঁচুলীনির্ম্মাণে অপেক্ষাকৃত অধিকতর শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শিত হইত। কাঁচুলীতে সমস্ত দেবদেবীর মূর্ত্তি আঁকিয়া উঠান হইত। ** এই সময়ের কাব্যাদিতে বদল দ্বারা বাণিজ্যনির্ব্বাহের প্রথা দৃষ্ট হয়। কিন্তু সাধারণতঃ বাজারে বট বুড়ি কাহন প্রভৃতি ভাবে নির্দ্দিষ্ট কড়ি দ্বারা দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় হইত। মাটি কাটা ও কোন দ্রব্য ওজন জন্য পুরুষ একরূপ মাপ ছিল। যাহা সেকালে কড়ীর দ্বারা হইয়াছে, এখন তাহা তাম্র ও রজত ভিন্ন পাওয়া যায় না।'

আবশ্যক হইলে আরও অনেক স্থল উঠাইতে পারি; কিন্তু তাহার কোন প্রয়োজন আছে, বোধ হইতেছে না। পাঠক উদ্ধৃত অংশ দ্বারাই গ্রন্থকারের অবলম্বিত প্রণালীর পরিচয় পাইবেন। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে আমরা প্রধানতঃ দেখিতে চাই সমালোচনা। এই সমালোচনা-অংশে দীনেশ বাবুর গ্রন্থের উৎকর্ষ কিরূপ? সমালোচকের কর্ত্তব্য বড় গুরুতর, সে কর্ত্তব্য যথাযথ পালন করিবার জন্য অনেকগুলি সদ্‌গুণের অধিকারী হওয়া আবশ্যক। সহৃদয়তা, অন্তর্দৃষ্টি, অনুসন্ধান, বহু অধ্যয়ন, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, উদারতা, সৌন্দর্য্যজ্ঞান, রচনাচাতুর্য্য, লিপিকুশলতা, এ সকলের একটিরও অভাবে সমালোচক কর্ত্তব্যপালনে অপারগ হয়েন। দীনেশ বাবুর গ্রন্থপাঠে আমার বিশ্বাস হইয়াছে, তিনি এক জন উৎকৃষ্ট সমালোচক, অর্থাৎ উপরি উক্ত সদ্‌গুণাবলির তিনি অনেক পরিমাণে অধিকারী। পাঠক এ কথার প্রমাণ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের' পত্রে পত্রে পাইবেন। আমি কয়েকটি স্থল উদ্ধার করিয়া এ বিষয়ে তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া ক্ষান্ত হইব।

'কিন্তু কবিকঙ্কণ সুখের কথায় বড় নহেন, দুঃখের কথায় বড়। বড় বড় উজ্জ্বল ঘটনার মধ্যে অবিরত ফল্গু নদীর ন্যায় এক অন্তর্বাহী দুঃখসংগীতের মর্ম্মস্পর্শী আর্ত্তধ্বনি শুনা যায়। 'এই পদাবলী সাহিত্য ভালবাসার বিজ্ঞান; ভালবাসা সাহিত্যের এরূপ গূঢ়ভেদ, আর কোনও দেশের সাহিত্যে নাই। লতা যে ক্রম ও কৌশলে তরুকে জড়াইয়া বশীভূত করে, এই বিজ্ঞানে সেই ক্রম লিখিত হইয়াছে। *** পদাবলী সাহিত্য প্রেমের রাজ্য, নয়নজলের রাজ্য। প্রেমের এই বহু বিভাগের পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে কেবল কোমল অশ্রুর উৎস। ইহাতে স্বার্থের আহুতি, অধিকারের বিলোপ।'

'বাঙ্গালা, হিন্দী, সংস্কৃত, এমন কি উর্দ্দু কথা পর্য্যন্ত কৃষ্ণদাস অবাধে ব্যবহার করিয়াছেন। ভাষার এই সাধারণতন্ত্রের হট্টগোলে বাঙ্গালীর স্বর চেনা সুকঠিন। চৈতন্যচরিতামৃতকে বাঙ্গালা গ্রন্থ উপাধি দিতে আমাদিগকে বহুতর সংস্কৃত ও প্রাকৃত শ্লোক, অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ, বৃন্দাবনী যৈছে তৈছে ও উর্দ্দু নানা, মামু, চাচা, পথ হইতে পরিষ্কার করিয়া অতি কষ্টে বাঙ্গালা গ্রন্থটির জাতি রক্ষা করিতে হইয়াছে'। 'কিন্তু এই রাশি রাশি ঘটনা বর্ণনা করিয়াও কবি (ঘনরাম) তাঁহার নায়ককে বড় করিতে পারেন নাই। বিচ্ছিন্ন উপকরণরাশি পড়িয়া আছে, যে বিধিদত্ত শক্তিগুণে সে গুলি একত্র করিয়া এক মহাবীরের চরিত্র গঠিত হইতে পারে, কবির সে শক্তি ও নৈপুণ্যের সম্পূর্ণ অভাব দৃষ্ট হয়।'

'কবিকঙ্কণের পর প্রকৃতি বাঙ্গালীর পর হইলেন, শাস্ত্র আপন হইল। ভাষা ভাবের অধিকার ছাড়িয়া স্বীয় স্বাতন্ত্র্য স্থাপন করিল, এবং কবিগণ প্রকৃত মানুষ না দেখিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের ছবিগুলি দেখিয়া পাগল হইলেন।'

'ভারতচন্দ্রের কাব্যে কোন স্থানেই হৃদয়ের ব্যাকুলতা নাই; হৃদয়ের মর্ম্মস্পর্শী দুঃখ কি স্নিগ্ধ সুখধারা তাঁহার কাব্যের কোন অংশ পবিত্র করে নাই। * * ভাবযুগ গতে সাহিত্যে শব্দযুগ প্রবর্ত্তিত হওয়া স্বাভাবিক। ভারতচন্দ্রের ভাব বিচার না করিয়া ভাষা বিচার করিলে তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। তাঁহার মত কথায় চিত্ত হরণ করিতে প্রাচীন কালের অন্য কোন কবি সক্ষম হন নাই।' রামপ্রসাদের সংগীতে 'মার প্রতি শিশুর সেই গঞ্জনা গুলি বড় মধুর—সেই গঞ্জনার বাহিক কঠোরতা অশ্রুজলে ধৌত হইয়া কোমল হইয়া গিয়াছে। রামপ্রসাদের মার প্রতি ক্রোধ অশ্রুজলগঠিত, উহা নামমাত্র ক্রোধ; উহা নিগৃহীত বালকের স্নেহের সত্ত্ব স্থাপন।'

এ বিষয়ে আর অধিক উদ্ধৃত করিবার স্থান নাই। কৌতূহলী পাঠককে ৯৯ পৃষ্ঠায় বেহুলাচরিত্রের বিস্তৃত সমালোচনা, এবং ২০৭।২০৮ পৃষ্ঠায় চৈতন্যচরিতামৃতরচনার বিবরণ পড়িতে অনুরোধ করিয়া, এ প্রসঙ্গের উপসংহার করিতে পারি।

গ্রন্থকার প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের একটি অতিপ্রয়োজনীয় বিশেষত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার সাহায্যে ঐ সাহিত্যের বিকাশক্রম অতি সহজে ও বিশদভাবে বুঝিতে পারা যায়। ঐ বিশেষত্বের একটু আলোচনা করা উচিত।

'বাঙ্গালী কবিগণ পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কবির পথ না দেখিয়া প্রায়ই অগ্রসর হয়েন নাই। আদি কবি বলিয়া কাহাকেও নিশ্চিতরূপে চিহ্নিত করা যায় না। এক কবির পূর্ব্বে আর এক কবি, তৎপূর্ব্বে অন্য এক জন; এই ভাবে একই কাব্যের রচনায় যুগব্যাপী চেষ্টার বিকাশ দেখা যায়।' গ্রন্থকার রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডীর উপাখ্যান, শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, মনসার পাঁচালী, বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া তাঁহার আবিষ্কৃত তত্ত্বের যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, 'কৃত্তিবাস, সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর প্রভৃতি অনুবাদলেখক ষষ্ঠীবর সেন, গঙ্গাদাস সেন, কাশীদাস, রামমোহন, রঘুনন্দন প্রভৃতির হস্তে; দ্বিজ জনার্দ্দন, বলরাম কবিকঙ্কণ প্রভৃতি লেখক মাধবাচার্য্য প্রভৃতির হস্তে ও কানা হরি দত্ত, বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব প্রভৃতি লেখক কেতকা দাস, ক্ষেমানন্দ দাস প্রভৃতি এক গোষ্ঠী নূতন মনসার ভাসান-রচকের হস্তে নবজীবন লাভ করিয়াছেন। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, বঙ্গভাষায় শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের আদি কবি ময়ূর ভট্ট। তৎপরে খেলারাম এই বিষয় লইয়া কাব্য রচনা করেন। ইহার পর রূপরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল প্রচারিত হয়; এই সব কাব্য হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া, ঘনরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার শ্রীধর্ম্মমঙ্গল কাব্য সমাধা করেন।

তিনি দেখাইয়াছেন, কৃষ্ণরামের হাতে বিদ্যাসুন্দর একমেটে, রামপ্রসাদের হাতে দোমেটে ও ভারতচন্দ্রের হাতে বিদ্যাসুন্দরের রঙ্গ ফিরান হইয়াছিল।

চণ্ডীর উপাখ্যান সম্বন্ধে দেখাইয়াছেন যে, দ্বিজ জনার্দ্দন যে প্রাচীন ও সংক্ষিপ্ত চণ্ডীর উপাখ্যান রচনা করেন, তাহা অবলম্বন করিয়া মাধবাচার্য্য ও তাঁহার পর বলরাম, চণ্ডী কাব্য প্রণয়ণ করেন। অবশেষে মকুন্দরামের হস্তে তাহা চরম শ্রী ও সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হয়।

রামায়ণ সম্বন্ধে দেখাইয়াছেন যে, যে সকল কবি কৃত্তিবাসের ছদ্মবেশে আদি কবির অক্ষরের সঙ্গে স্বীয় অক্ষর মিলাইয়াছিলেন, যাঁহারা পরবর্ত্তীকালে যুগে যুগে যুগোচিত নববস্ত্র পরাইয়া কৃত্তিবাসকে বঙ্গদেশে প্রচলিত রাখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেও, যাঁহারা প্রকাশ্যভাবে কৃত্তিবাসের পর রামায়ণ রচনা করিতে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহাদের রচিত রামায়ণের সংখ্যা আট খানির কম নহে।

মহাভারত সম্বন্ধে গ্রন্থকার এইরূপ লিখিয়াছেন—'আমরা কাশীদাসের পূর্ব্বে সঞ্জয় মহাভারত ও কবীন্দ্ররচিত (পরাগলী) মহাভারত সমগ্র পাইয়াছি, এবং নসরৎ শাহার আদেশে রচিত মহাভারতের খবর পাইয়াছি;

ইহা ছাড়া ষষ্ঠীবর সেন রচিত স্বর্গারোহণ পর্ব্বের শেষ পত্রে জানিতে পাই, তিনিও সমগ্র মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। কাশীদাসের পূর্ব্বে এইগুলি ও সম্ভবতঃ আরও অনেকগুলি সমগ্র মহাভারত বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল; কিন্তু ইহা ছাড়া ও উক্ত খ্যাত নামা কবি (কাশীদাস) তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভারতোক্ত উপাখ্যান ও পর্ব্ববিশেষের অনুবাদ হাতে পাইয়াছিলেন। ছুটি খাঁর আদেশে শ্রীকর নন্দী অশ্বমেধ পর্ব্বের অনুবাদ করেন; রাজেন্দ্র দাস প্রণীত আদি পর্ব্ব, গোপীনাথ দত্ত প্রণীত দ্রোণ পর্ব্ব, গঙ্গাদাস সেন প্রণীত আদি ও অশ্বমেধ পর্ব্ব; এতদ্ব্যতীত নানা কবির রচিত নলোপাখ্যান, প্রহ্লাদচরিত্র ও ইন্দ্র দ্যুম্ন উপাখ্যান প্রভৃতি মহাভারতের অংশগুলিও কাশীদাসের পূর্ব্ব হইতে বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল।'

এইরূপ দীনেশ বাবুর গ্রন্থে নানা নূতন কাব্যের পরিচয়, নূতন তত্ত্বের সমাবেশ, নূতন প্রণালীর সমালোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রন্থের আদ্যোপান্ত না পড়িলে গ্রন্থের অপূর্ব্বত্ব ঠিক হৃদয়ঙ্গম হইবে না। সেই জন্য অধিক লেখা আবশ্যক মনে করি না।

দুই একটা দোষের উল্লেখ না করিলে আজ কাল সমালোচনা সিদ্ধ হয় না। সেই জন্য উপসংহারে আলোচিত গ্রন্থের দুই একটা দোষের আবিষ্কার করিতেছি। গ্রন্থের ভাষা অধিকাংশ স্থলেই প্রশংসার যোগ্য; দুই এক স্থানে একটু মার্জ্জিত, একটু সংযত হইলে ভাল হইত। কোন কোন অংশে দুই একটা ভুল মতের প্রচার দেখিলাম—দীনেশ বাবুর মত অনুসন্ধিৎসু লোকের ভুল হওয়া উচিত নহে। গ্রন্থে যে সকল কবি ও কাব্যের উল্লেখ অথবা আলোচনা আছে, পরিশিষ্টে তাহার একটি বর্ণানুক্রমিক ও আর একটি কালানুক্রমিক তালিকা থাকিলে ভাল হইত। আর সেই সঙ্গে গ্রন্থশেষে একটি সম্পূর্ণ পূর্ণাঙ্গ সূচিপত্র থাকিলে পাঠকের বিশেষ সুবিধা হইত। আশা করি, গ্রন্থকার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রচারকালে এ সকল বিষয়ে মনোযোগী হইবেন।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

ব্যাঘ্র-শিকার।

প্রবন্ধের শিরোনাম দেখিয়া যিনি আমাকে এক জন প্রকাণ্ড শিকারী ভাবিয়া বসিবেন, তাঁহার অবগতির জন্য এই স্থানেই নিবেদন করিতেছি যে, গোলাগুলি দূরে থাকুক, এই বাঙ্গালী জীবনে কখনও সামান্য পটকায় অগ্নিসংযোগের সাহসও আমার হয় নাই। বিনা যুদ্ধে বিনা রক্তপাতে শুধু constitutional agitationএ ভারত উদ্ধার হইবে, এই আশ্বাস পাইয়াই মধ্যে মধ্যে ভারতমাতার উদ্ধারসাধনে কৃতসংকল্প সভাসমিতিতে যোগদান করি; কিন্তু তাহার মধ্যেও যখন কংগ্রেসে arms act ও সখের সৈনিক সম্বন্ধে রেজলিউশন পাশ হয়, তখন প্রাণের মধ্যে কাঁপিয়া উঠে! সুতরাং এ হেন বঙ্গবীরের নিকট এমন কবুল জবাব পাইয়া কেহই মনে করিবেন না যে, আমি সশরীরে 'হেনিরিমার্টিন' হাতে লইয়া অশ্ব বা গজারোহণে ব্যাঘ্র-শিকারের জন্য দিব্য সুন্দর গৃহকোণ ত্যাগ করিয়া নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম! বৃত্তান্ত এই যে, আমার সম্মুখে এক দিন একটি ব্যাঘ্র নিহত হইয়াছিল, আমি তাহারই বিবরণ এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিব।

আমি যখন দেরাদূনে থাকিতাম, তখন লোকালয় অপেক্ষা বনজঙ্গলেই বেশী বেড়াইতাম। লোকালয়ে থাকিবার আমার তেমন আগ্রহ ছিল না, যে সমস্ত বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে একত্র বাস করিতাম, তাঁহাদের আশা আকাঙ্ক্ষার সহিত আমার মনের কোনও কথাই মিলিত না। এ অবস্থায় দিন রাত্রি তাঁহাদের সঙ্গে অতিবাহিত করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িত; আর সেই জন্যই মধ্যে মধ্যে আমি বনে জঙ্গলে প্রবেশ করিতাম, এবং দুই চারি দিন নিরুদ্দেশ থাকিয়া আবার এক দিন ফিরিয়া আসিতাম। যে কয় দিন এই ভাবে বিজন বনে কাটিয়া যাইত, সেই সময়ে নানা প্রকার বিপদেও পড়িতে হইত। অনেক সময়ে আশ্রয় অভাবে একাকী বৃক্ষতলে রজনী অতিবাহিত করিতে হইত; কখনও বা দয়াবান গৃহস্থের গৃহে অতিথি হইতাম। এ সময়ে আমি সচরাচর ভদ্রলোকের মতই বেড়াইতাম; সে সময়ে আমাকে দেখিয়া কাহারও সাধু সন্ন্যাসী বলিয়া ভ্রম হইবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। কখনও বা বাঙ্গালীর ন্যায় ধুতি জামা ও শীতবস্ত্র পরিধান করিয়া এই অনতিদীর্ঘ প্রবাসে যাত্রা করিতাম, কখনও বা পেণ্টুলেন কোট মেকিন্টস ও টুপী লইয়া বাহির হইতাম। এখানে বলিয়া রাখি, আমার এই শেষোক্ত

পরিচ্ছদ দেখিয়া আমাকে সাহেব বলিয়া ভ্রম হইবার কোনও কারণ ছিল না; কেন না, এই ময়ূরপুচ্ছরাশির মধ্য হইতেও আমার ঘনকৃষ্ণ বর্ণ আমার দাঁড়কাকত্ব সপ্রমাণ করিয়া দিত!

এই রকমের এক পোষাক পরিয়া এক দিন অপরাহ্লে আমি আমার বাসা হইতে বাহির হইয়াছিলাম। আমি যখন কোথাও ২।১ দিনের জন্য যাইতাম, তখন প্রায়ই বাসায় না হউক, পাড়ার দুই চারি জন লোককে বলিয়া যাইতাম। এবারে বহু দূরে যাইবার অভিপ্রায় ছিল না, এমন কি, সেই দিনেই ফিরিয়া আসিব মনে করিয়াই বাহির হইয়াছিলাম।

বেড়াইতে বেড়াইতে সহর হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে আমার এক জন গুরখা বন্ধুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। বন্ধুটি ইংরাজী জানেন; তাঁহার নাম মাষ্টার রাধাকিষেণ। তিনি হঠাৎ আমাকে তাঁহার গৃহদ্বারে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন; কারণ, সেই দিন বেলা একটা পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে একত্র ছিলাম, তাঁহার বাড়ীতে যাইব, এ কথা তখনও তাঁহাকে বলি নাই। কখন কোথায় যাইব, তাহা আমারই ঠিক থাকিত না। মাষ্টারের বাড়ীতে প্রায় এক ঘণ্টা বসিয়া নানা প্রকার কথাবার্ত্তা ও কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। তিনি আমার সঙ্গে কতক দূর পর্য্যন্ত আসিলেন; আমি সহরের দিকেই ফিরিতেছিলাম। একটা শুষ্ক নদীর ধারে আসিয়া তিনি আমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া গেলেন। নদীর অপর পারেই সহরের রাস্তা, কিন্তু নদীর ঠিক মাঝখানে গিয়াই আমার মতি ফিরিয়া গেল। তখনও প্রায় দেড় ঘণ্টা বেলা আছে। সহরের রাস্তায় না যাইয়া আমি বামভাগে গমন করিতে আরম্ভ করিলাম। নদীর মধ্য দিয়া পথ; জঙ্গল নাই, দুই পার্শ্বে উচ্চ পাহাড়। কোথায় যাইতেছি, তাহার ঠিকানা নাই, অথচ চলিতেছি। মনে মনে স্থির করিলাম, আজ যেখানে সন্ধ্যা হইবে, সেই স্থানেই অবস্থান। তবে বিশ্বাস ছিল যে, নিকটেই গ্রাম মিলিবে।

যখন সন্ধ্যা আসিল, তখন নদীগর্ভ ত্যাগ করিয়া আমি জঙ্গল-পথে প্রবেশ করিলাম। ইতিপূর্ব্বে নদীতীরস্থ দুই তিন খানি গ্রাম ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। এখন জঙ্গল-পথের দুই পার্শ্বে আর গ্রামের চিহ্নও দেখিতে পাইলাম না। একটু চলিতে লাগিলাম। জঙ্গলে যখন পথ পাইয়াছি, তখন লোকালয় নিশ্চয়ই পাইব। এই ক্ষুদ্র পথ দিয়া যে লোকে যাতায়াত করে, পথের অবস্থা দেখিয়াই তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। দ্রুতপদে চলি, কিন্তু পথ আর ফুরায় না। ক্রমে

পথ চড়াই দিকে যাইতে লাগিল; রাত্রির অন্ধকারও ঘনীভূত হইতে লাগিল; স্থানে স্থানে গভীর জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকার ক্রমেই তাল পাকাইতে লাগিল; অতি কষ্টে পথের রেখা দেখিয়া দেখিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। মনুষ্য বসতি আর দেখিতে পাই না; বিশেষতঃ, দূরে লোকালয় থাকিলেও, এই অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্য দিয়া তাহা দৃষ্টিগোচরই বা হইবে কি করিয়া? এক-বার মনে করিলাম, এক স্থানে দাঁড়াইয়া চীৎকার করি;—যদি নিকটে কোনও গ্রাম থাকে, তাহা হইলে কেহ না কেহ সাড়া দিবে। আবার মনে করিলাম, যে পথে আসিয়াছি, সেই পথেই ফিরিয়া যাই। কিন্তু অপরাহ্লে মাষ্টার রাধা-কিষেণ বলিয়াছিলেন যে, আজ কয় দিন হইতে নদীর মধ্যে বড়ই ভালুকের উপদ্রব হইয়াছে। তখন সেই কথা মনে হইয়া ফিরিয়া যাইতে সাহস হইল না। অদৃষ্টে যাহাই থাক, অগ্রসর হইতেই হইবে, এই স্থির করিয়া আবার দ্বিগুণ উৎসাহে সেই সঙ্কীর্ণপথে চলিতে লাগিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পথ ক্রমে উপ-রের দিকে যাইতেছিল। কতক দূর যাইয়া এক স্থানে একটা মোড় আছে; সেই মোড় ফিরিয়াই দেখি, ঠিক আমার মাথার উপরে একখানি বাড়ী, এবং সেই বাড়ীর একটি ঘর হইতে আলোক বাহির হইতেছে। আমি তাড়াতাড়ি সেই গৃহদ্বারে উপনীত হইলাম, এবং বাহিরে কাহাকেও না দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে আশ্রয় প্রার্থনা করিলাম। আমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া এক জন বর্ষীয়সী ঘরের বাহির হইলেন, এবং আমি কি চাহি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সেই রাত্রির জন্য তাঁহাদের কুটীরে থাকিতে চাই; আহারাদির আবশ্যক নাই, তাহাও জানাই-লাম। গৃহস্বামিনী "মণিয়া" বলিয়া ডাকিতেই গৃহমধ্য হইতে ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশবর্ষীয়া একটি স্থূলকায়া বালিকা বাহির হইয়া আসিল; গৃহস্বামিনী অনুচ্চস্বরে তাহাকে কি বলিলেন, সে অবিলম্বে গৃহে প্রবেশ করিয়া একখণ্ড প্রশস্ত মৃগচর্ম্ম আনিয়া কুটীরের দাবায় পাতিয়া দিল; গৃহস্বামিনী আমাকে উপবেশন করিতে বলিলেন। এতটা পথ হাঁটিয়াও সন্ধ্যার সময়ে আশ্রয় না পাইয়া, আমি একটু উদ্বিগ্ন হইয়াছিলাম, সেই জন্য বড়ই তৃষ্ণা পাইয়াছিল। জল প্রার্থনা করায় গৃহস্বামিনী তাড়াতাড়ি একটা পরিষ্কার লোটায় করিয়া শীতল জল আনিয়া দিলেন। তৃষ্ণা দূর করিয়া তাহাদের পরিচয় লইতে আরম্ভ করিলাম। গৃহস্বামিনী দ্বারের মধ্যে বসিয়া বলিলেন, তাঁহার স্বামী ও পুত্র বাঘ আনিতে গিয়াছেন, তিনি ও কন্যাটি ঘরে রহিয়াছেন। দেরাদুনের স্বনামখ্যাত Captain Hearsy সাহেবের নাম অনেকেই অবগত আছেন। এই গৃহস্বামী ও তাহার

পুত্র সেই সাহেবের নিযুক্ত শিকারী; হার্সি সাহেব মৃগাজিন, ব্যাঘ্রচর্ম্ম ও পাখীর পালকের ব্যবসায় করিতেন। তাঁহার নিযুক্ত অনেক শিকারী ছিল। তাঁহারই এক শিকারীর গৃহে আমরা অতিথি। এই শিকারীরা নানা উপায়ে ব্যাঘ্র শিকার করিত। কখনও বা বন্দুকের দ্বারা, কখনও বল্লমের দ্বারা। তাহারা যখন শিকার করিতে যাইত, তখন তাহাদের সঙ্গে নানা প্রকারের অস্ত্র থাকিত, এবং তাহারা এক একটি লণ্ঠন সঙ্গে লইত। আমি সে দিন যে ব্যাঘ্র-শিকার দেখিয়াছিলাম, তাহা এই প্রকার লণ্ঠনের সাহায্যে। এ প্রকারে ব্যাঘ্র-শিকারের গল্প পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম;—আমাদের দেশে মালদহ জেলার কোনও কোনও শিকারী গৌড়ের জঙ্গলের মধ্যে এমনই করিয়া নাকি অনেক ব্যাঘ্র শিকার করিত।

গৃহস্বামিনী আমাকে ক্লান্ত দেখিয়া আহারের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। প্রথম অতিথি হইবার সময়ে যে আহারের আবশ্যক হইবে না জানাইয়াছিলাম, তাহা ভদ্রতার অনুরোধে; তখনই আমার যথেষ্ট ক্ষুধার সঞ্চার হইয়াছিল। তবে তাহারা যদি সে রাত্রে কিছুই খাইতে না দিত, তাহা হইলে কষ্ট হইত বটে, কিন্তু একেবারে শয্যাগত হইতাম না! গৃহস্বামিনীর অনুরোধ দুই একবার অস্বীকার করিয়া শেষে স্বীকার করিলাম। তাঁহারা মায়ে ঝিয়ে আমার আহারের আয়োজন করিতে ব্যস্ত হইলেন; কিন্তু তাঁহাদের আয়োজনের রকম দেখিয়াই আমি বুঝিলাম যে, তাঁহারা মনে করিয়াছেন, আমি স্বহস্তে রুটী বানাইয়া খাইব। আমি তাঁহাদিগকে বলিলাম, আমি পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, স্বহস্তে কিছুই করিতে পারিব না। তাঁহারা যখন দয়া করিয়া আশ্রয় দিয়াছেন, তখন দয়া করিয়া দুইখানি রুটী বানাইয়া দিলে তাহা গ্রহণ করিতে আমার কোন আপত্তি হইবে না। গৃহস্বামিনী অতিবিনীত স্বরে বলিলেন, পাছে তাঁহাদের প্রস্তুত দাল রুটী আমি না খাই, এই ভয়েই তাঁহারা আমার রান্নার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন, নতুবা অতিথির জন্য রন্ধন করিতে তাঁহারা কাতর নহেন। আরও বলিলেন যে, যদিও তাঁহাদের অবস্থা তেমন সচ্ছল নহে, কিন্তু অতিথি আসিলে তাঁহারা কখনও ফিরান না; ঘরে যাহা থাকে, তাহা দিয়াই অতিথির সেবা করেন। তবে আমি "আমীর লোক", আমাকে তাঁহারা কি খাইতে দিবেন, তাহাই ভাবিতেছেন। আমার পোষাক দেখিয়াই আমীর স্থির করিয়াছেন! আমি যে আমীর ওমরাও কেহই নহি, তাঁহাদেরই মত দরিদ্র গৃহস্থ, অতি বিনয়ের সহিত তাহা বলিলাম, এবং তাঁহা-

দের কুটীরে তাঁহারা আমার আহারের জন্য যাহা দিবেন, তাহা আমি পরম উপাদেয় বলিয়া গ্রহণ করিব।

তাহার পর তাঁহারা মায়ে ঝিয়ে ঘরের মধ্যে আহার প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত হইলেন, কিন্তু মধ্যে মধ্যে মেয়েটি বারান্দায় আসিয়া জঙ্গল-পথের দিকে চাহিয়া আবার ঘরের মধ্যে যাইতে লাগিল। তাঁহারা শিকারীদিগের আগমনের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমি সেই কুটীরের ক্ষুদ্র বারান্দায় প্রশস্ত মৃগচর্ম্মে অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় কখনও বা আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলাম, কখনও বা ভাবিতে ভাবিতে ভাবনার খেই হারাইয়া সেই অন্ধকার বনস্থলীর গম্ভীর প্রশান্ত শোভা দেখিতে লাগিলাম। চারি দিক নিস্তব্ধ; তাহারই মধ্য হইতে থাকিয়া থাকিয়া বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে গমনশীল পক্ষীর পক্ষসঞ্চালনশব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। নিকটে বোধ হয় কোনও নির্ঝর ছিল না, আর থাকিলেও তাহার শক্তি তেমন অধিক নহে; নতুবা এমন শব্দহীন সময়ে অবশ্যই নির্ঝরের কুলকুল শব্দ শুনিতে পাইতাম। আমি সেই পর্ব্বত-মধ্যস্থ ক্ষুদ্র কুটীরের বারান্দায় বসিয়া কত কি চিন্তা করিতে লাগিলাম। ধীরে ধীরে আমার বর্ত্তমান অবস্থার কথা মনে উঠিল। যখন যেখানে একাকী পড়িয়াছি, তখনই আমার অতীত জীবনের সহিত কথায় বার্ত্তায় আমি সময় অতিবাহিত করিয়াছি। শিকারীর ঘরের দাবায় বসিয়া আমি চিন্তাতেই নিমগ্ন ছিলাম, এমন সময়ে সেই বালিকাটি আমার গায়ে হাত দিল। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলাম। বালিকা বলিল, সে আমাকে দুই তিন বার ডাকিয়াছে, কিন্তু আমি কোন সাড়া শব্দ না করায় আমার গায়ে হাত দিয়াছে। সে বলিল, দূরে ঐ যে একটা আলোক দেখা যাইতেছে, ঐ আলোক লইয়া তাহার বাবা ও দাদা আসিতেছে। আজ তিন দিন হইল, এই পাহাড়ে একটা বাঘ আসিয়াছে; তাহারা এই তিন দিন ধরিয়া তাহারই অনুসন্ধান করিতেছে। আজ আলোটি যে প্রকার নাচিতেছে, তাহাতে বোধ হয়, তাহারা বাঘ পাইয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, বাঘ কি তাহারা মারিয়া আনিতেছে? আমার কথা শুনিয়া বালিকা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল যে, তাজা বাঘ আসিতেছে; সে কি তাহার মা বাঘ মারিবে। এই কুটীরপ্রাঙ্গনেই বাঘ মারা পড়িবে।

তাহাদের কথা শুনিয়া আমি অবাক্! তের বৎসরের মেয়ে বলে কি না, সে বাঘ মারিবে! যাহা হউক, একটু পরে সমস্তই দেখিতে পাইব।

এ দিকে আলো ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। ঠিক যেমন আলেয়ার

আলো মাঠের মধ্যে নাচিতে থাকে, কখনও দেখা যায়, কখনও দেখা যায় না, এই
আলোটি ও ঠিক সেই প্রকার। আমার কলিকাতা-প্রবাসী বন্ধুগণ বোধ হয় কখনও
বড় বড় মাঠের মধ্যে আলেয়ার আলো দেখেন নাই। আমরা মফঃস্বলবাসী লোক,
এ প্রকার আলো অনেক দেখিয়াছি। বোধ হয়, যেন মাঠের মধ্যে কে আলো
জ্বালিতেছে ও নিভাইতেছে, কখনও বা আলো হাতে লইয়া দৌড়িতেছে।
গ্রামের অশিক্ষিত লোকেরা ইহা অপদেবতার কাজ বলিয়া মনে করে, এবং
এ প্রকার মনে করিবার যথেষ্ট কারণও আছে। এই আলোর একটি গুণ আছে
যে, এই আলোর দিকে চাহিলে চক্ষু কেমন ঝলসিয়া যায়; অনেকে পথহারা
হইয়া যায়। সেই জন্য অশিক্ষিত লোকেরা বলে যে, এই আলোর সাহায্যে পথ
ভুলাইয়া লইয়া গিয়া অপদেবতারা পথিকদিগকে জলাভূমিতে মারিয়া ফেলে।

সে কথা এখন থাকুক। আলো নিকট হইতে দেখিয়া মা ও মেয়ে উভ-
য়েই বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। দুই জনের পাশেই তিন চারিটি করিয়া
বল্লম; তাহারই এক এক গাছা সজোরে দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া তাঁহারা বসিয়া
রহিলেন। আলোকধারী ব্যক্তি যখন ঠিক প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার
সঙ্গী এক লাফে বারান্দায় উঠিয়া এক গাছা বল্লম ধরিয়া বসিল। কিন্তু যখন
দেখিল মেয়েটি ও তাহার মা প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন, তখন সে দৃঢ়স্বরে
বলিল—"মনিয়া! লাগাও।" ঠিক সেই সময়ে একটা প্রকাণ্ড বাঘ প্রাঙ্গণে উপ-
স্থিত! আলোক-হস্ত ব্যক্তি প্রাঙ্গণ হইতে অপর পার্শ্বে নামিয়া গিয়াছে।
দেখিতে দেখিতে বালিকার হস্তনিক্ষিপ্ত বল্লম "বোঁ" করিয়া গিয়া একেবারে
বাঘের চোখে লাগিল, এবং মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া অপর পার্শ্বে বাহির হইয়া
পড়িল। ব্যাঘ্রবর ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া এক লম্ফ প্রদান করিল, এবং পর-
ক্ষণেই একেবারে ধরাশায়ী হইল। আমি সে সময়ে কুটীরের দেওয়ালের গায়ে
দাঁড়াইয়া; আর এত দিন পরে বলিতেই বা লজ্জা কি, আমি কম্পিত-
কলেবর!

ব্যাঘ্র পতিত দেখিয়া সকলে ছুটিয়া গেল। যে লোকটি পূর্ব্বে বারান্দায়
উঠিয়াছিল, সেইটি ছেলে; এবং আলোকহস্ত ব্যক্তিই গৃহস্বামী। আমিও
তাহাদের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, এক প্রকাণ্ডকায় ব্যাঘ্র।

তাহারা তখন ব্যাঘ্রকে সেই অবস্থায় রাখিয়াই বারান্দায় আসিয়া বসিল।
তখন গৃহস্বামিনী আমার পরিচয় প্রদান করিলেন। গৃহস্বামী আমাকে যথেষ্ট
আপ্যায়িত করিল। তাড়াতাড়ি ধূমপান শেষ করিয়া তখনই ব্যাঘ্রটিকে টানিয়া

প্রাঙ্গণ হইতে দূরে লইয়া গেল, এবং পিতা পুত্রে প্রায় দুই তিন ঘণ্টা ধরিয়া
তাহার চামড়া ছাড়াইল। তাহারা যখন ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছিল, তখন আমি
তাহাদের কুটীরের বারান্দায় নিদ্রিত।

পর দিন প্রত্যুষে গৃহস্বামী ও তাহার পরিবারকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়া
আমি সহরে ফিরিয়া আসিলাম, এবং বন্ধুগণের নিকট এই আশ্চর্য্য ব্যাঘ্র-
শিকারের গল্প করিলাম। আমার পরম শ্রদ্ধেয় কা—বাবু বলিলেন যে, তিনি
ইহা অপেক্ষাও আশ্চর্য্য শিকারের কথা Hearsy সাহেবের নিকট শুনিয়া-
ছেন। তিনি দুই চারিটি গল্প করিলেন, কিন্তু সে কথা আজ থাক্।

শ্রীজলধর সেন।

লিসবনের ভূমিকম্প।

বিগত ৩০শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গদেশে ও আসামে যে ভীষণ ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে, তাহার কথা
স্মরণ করিলে হৃৎকম্প হয়। সেই বহুক্ষণস্থায়ী কম্পনের সময় অনেকেরই মনে হইয়াছিল,
১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ভূমিকম্পকালে লিসবনের হতভাগ্য অধিবাসীদিগের যে শোচনীয় দশা
ঘটিয়াছিল, বুঝি বা আমাদিগকেও সেইরূপ দুর্দ্দশায় উপনীত হইতে হয়। বাস্তবিক এই
দারুণ ভূমিকম্প আর দুই চার মিনিট স্থায়ী হইলে কি হইত, তাহা কল্পনা করিলেও শিহ-
রিয়া উঠিতে হয়। এই যে কয় মিনিট ভূমিকম্প হইয়াছিল, ইহাতেই স্থানে স্থানে পর্ব্বতাঙ্গ
স্থানচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে; কোথাও কোথাও মৃত্তিকা ফাটিয়া ধূম, উষ্ণ জল, বালুকা প্রভৃতি
বাহির হইয়াছে; কোনও কোনও স্থলে মৃত্তিকা বসিয়া গিয়াছে। এই ভূমিকম্পে দেশের
যথেষ্ট ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। জানি না, এই দুর্ভিক্ষকালে অনাহারক্লিষ্ট অন্নহীন দুঃখীকে
গৃহহীন করা অদৃষ্টের কি দারুণ উপহাস! দেশে এই বহুজীবননাশ, আর এই দেশব্যাপী
দুর্ভিক্ষের ভীষণ মৃত্যুচ্ছায়া, বাঙ্গালী কখনও এই বৎসর—এই ভীষণ দুর্ব্বৎসর—ভুলিতে
পারিবে না।

যে ভূমিকম্পে লিসবন সহর ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল, আমরা নিম্নে সেই ভীষণ ভূমি-
কম্পের বৃত্তান্ত বিবৃত করিতেছি।

১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে যে ভীষণ ভূমিকম্পে ধনধান্যপূর্ণ লিসবন সহরের একতৃতীয়াংশ ধ্বংসাব-
শেষে পরিণত হইয়াছিল, আর যাট সহস্র লিসবনবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল,
সে ভূমিকম্প এখন ইতিহাসের কথা। ভূমিকম্পে তেমন সর্ব্বনাশের
কথা ইতিহাসে এ পর্য্যন্ত আর লিখিত হয় নাই;—যেন আর লিখিত
না হয়। পর্টুগালের রাজধানী অতি প্রাচীন এবং সমৃদ্ধিশালী ছিল। টেগাস নদীর মোহা-
নার কাছেই লিসবন নগর সংস্থাপিত;—সহরের দুই দিকে দুই গিরিশ্রেণী দৃষ্টির গতিরোধ
করে,—যেন দূরে মেঘ ও মহীধর মিশাইয়া গিয়াছে। কালের করস্পর্শ লিসবনের অঙ্গ হইতে
সে ক্ষতচিহ্ন মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। সহর আবার গঠিত হইয়াছে. কিন্তু স্থানে স্থানে

লিস্‌বন।

আজও ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে; সেই সকল স্তূপাকার ধ্বংসাবশেষের উপর লতাগুল্মাদি জন্মিতেছে। পুনর্গঠিত নগরাংশকে এখনও লোকে "নূতন সহর" বলিয়া থাকে।

ভূমিকম্প।

১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নবেম্বর; আকাশে মেঘ নাই; রবির অম্লানোজ্জ্বল কিরণ সহরের উপর পড়িয়াছে, সহরের শত শত অট্টালিকার গর্ব্বোদ্ধত শিরে সে কিরণ প্রতিফলিত হইতেছে। সহরে সে দিন আনন্দোৎসব; ধর্ম্মান্ধ লিসবনবাসীরা সে দিন দ্বাদশ জন বিধর্ম্মীকে অনলে নিক্ষেপ করিয়া ধর্ম্মের মহিমা বর্দ্ধিত করিবে! সেই পাপ-অগ্নি তখন কেবল তাহার লোলজিহ্ব শিখা বিস্তার করিতেছে। তখন বেলা প্রায় সাড়ে নয়টা। সহসা মেদিনীর অভ্যন্তরে ভীষণ বজ্রনাদের মত শব্দ শ্রুত হইল; ধরিত্রী চঞ্চল হইয়া উঠিলেন; যেন কম্পনের তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিতে লাগিল। সৌধমালাসুশোভিত নগরীর শত সৌধের গর্ব্বোদ্ধত শির ধূলিবিলুণ্ঠিত হইল।

ধ্বংস।

সে দিন 'অল্-সেণ্টস্-ডে' (All Saints Day); গির্জ্জাগুলি উপাসকমণ্ডলীতে পূর্ণ। সেই সকল বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরবিনির্ম্মিত গির্জ্জাগুলি পড়িতে লাগিল, আর সেই ধ্বংসাবশেষ-তলে ত্রিশ সহস্র হতভাগ্য লিসবনবাসী জীয়ন্তে সমাধিস্থ হইয়া রহিল। ভূমিকম্প প্রায় ছয় মিনিট স্থায়ী হইয়াছিল;—তাহারই মধ্যে সহরের ধ্বংসাবশেষের প্রস্তর ও ইষ্টকরাশির নিম্নে ষাট সহস্র সহরবাসী সমাহিত হইয়াছিল। ক্রমে পর পর দ্বাবিংশতি বার ভূকম্পন অনুভূত হইল। একটা গৃহে আটত্রিশ জন অধিবাসীর মধ্যে চার জন মাত্র কোনরূপে রক্ষা পাইয়াছিল; জেলখানায় আটশত বন্দী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল; হাঁসপাতালে দ্বাদশ শত লোক সেই ভীষণ দুর্দ্দিনে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল। সহস্র সহস্র আহত ধ্বংসরাশির মধ্যে প্রোথিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিল; কিন্তু হায়, কে কাহাকে সাহায্য করিবে? সহরের অদূরবর্ত্তী পর্ব্বতমালা যেন কোনও আভ্যন্তরীণ সঞ্চিত শক্তির উপদ্রবে আমূল কম্পিত হইতে লাগিল; পর্ব্বতাঙ্গ স্থানচ্যুত হইয়া ভীমনাদে উপত্যকায় পতিত হইতে লাগিল। বিদীর্ণ পর্ব্বতাঙ্গে বোধ করি বৈদ্যুতিক অনলশিখা দৃষ্ট হইল; ধ্বংসস্তূপ হইতে সমুত্থিত ধূলিরাশির অন্তরালে সে আলোক যেন কোনও পৈশাচিক আলোক বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

জলোচ্ছ্বাস।

দক্ষিণ য়ুরোপে বাণিজ্যবিষয়ে লিসবন সহরের প্রতিদ্বন্দ্বী অল্পই ছিল। সহরের সম্মুখে কয় দিন মাত্র পূর্ব্বে মর্ম্মরনির্ম্মিত বহুব্যয়সাধ্য একটি শোভনদৃশ্য 'পোতাশ্রয়ের' (quay) নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইয়াছিল। যখন সহর ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইতে লাগিল—তখন লোকে গৃহ, আত্মীয়, স্বজন সকলই পরিত্যাগ করিয়া, প্রাণভয়ে সেই নবনির্ম্মিত পোতাশ্রয়ে ছুটিয়া যাইতেছিল। পথে বাড়ী পড়িয়া অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হইল; অবশিষ্ট সকলে বহুকষ্টে সেখানে উপস্থিত হইল। পোতাশ্রয় লোকে পূর্ণ হইল,—ভয়ত্রস্ত জনতা আর্ত্তনাদ ও প্রার্থনাধ্বনিতে গগন প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল।

তাহার পর সাগরের জলরাশি সরিয়া যাইতে লাগিল; জলরাশি বহুদূরে চলিয়া গেল; 'কি'র বনিয়াদ স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। ইহার অল্পক্ষণ পরেই দূরে ভীষণ জলকল্লোল শ্রুত হইল; শ্বেতফেনচূড় উত্তালতরঙ্গকুলসঙ্কুল সিন্ধু ভীমগর্জ্জনে সহরের দিকে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। সাধারণতঃ সাগরসলিল যতটা উচ্চে ছিল—তরঙ্গ সকল তদপেক্ষা আরও পঞ্চাশ ফিট উচ্চ! চক্ষের নিমেষে জলরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া শতমত্তমাতঙ্গবিক্রমে ধ্বংসাবশেষে পরিণত সহরের মধ্যে প্রবেশ করিল। যে সকল হতভাগ্য বহুকষ্টে সহরের বাহিরে আসিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছিল, তাহারা সেই উচ্ছ্বসিত জলস্রোতে নিমজ্জিত হইল। সহরের ধ্বংসাবশেষ বিধৌত করিয়া সলিলরাশি যেন আবার গৃহাভিমুখে প্রস্থিত হইল। ক্রমে সেই অগাধ জলরাশি আবার সাগরে আসিয়া পড়িল।

সিন্ধুবক্ষে।

তখন সাগরসলিলে বহুসংখ্যক তরী ভাসিতেছিল; সেই সকল তরণী আবার সাগরসমীরসেবী জনগণে পূর্ণ ছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণী সকল তখন সাগরের তরঙ্গে তরঙ্গে চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। সহসা মুহূর্ত্তমধ্যে ভয়াতুর জনগণ সহ সেই মর্ম্মরবিনির্ম্মিত শোভন-দৃশ্য জেটি কোন্ অতলের তলে নিমজ্জিত হইয়া গেল! ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া তরণীগুলিও সেই জলমধ্যে নিমজ্জিত হইল! সে সকল মৃতদেহের একটিও ভাসিয়া উঠে নাই। ভগ্ন তরণী সকলের এক খণ্ড কাষ্ঠও আর দেখা গেল না; পূর্ব্বে যেখানে টেগাস নদীর জল ত্রিশ ফিট মাত্র গভীর ছিল, ভূমিকম্পের পর সেখানে জল ছয় শত ফিট গভীর হইল। আর সেই নদীগর্ভে, কোন্ শব্দহীন, আলোকহীন, বায়ুহীন, প্রাণহীন অতলে, লিসবনের সহস্র সহস্র হতভাগ্য অধিবাসী সমাহিত হইয়া রহিল।

অগ্নিকাণ্ড।

ধর্ম্মান্ধ লিসবনবাসীরা বিধর্ম্মীদিগকে দগ্ধ করিবার জন্য যে অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়াছিল, সিন্ধুসলিলোচ্ছ্বাসে তাহা নির্ব্বাপিত হইল, এবং সেই দ্বাদশ জন নিরপরাধ বিধর্ম্মী সেই ভীষণ মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইল। কিন্তু তখনও বুঝি পাষাণপ্রাণ ধ্বংসদেবতার মনের আক্রোশ মিটে নাই,—সহরের ভগ্নাবশেষের মধ্যে স্থানে স্থানে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। গৃহে গৃহে গার্হস্থ্য কার্য্যের জন্য যে অগ্নি জ্বলিতেছিল, তাহার উপর গৃহের বহু দ্রব্য পড়িয়া অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল; গির্জ্জায় গির্জ্জায় যে সকল মোমবাতি স্নিগ্ধালোক বিস্তার করিতেছিল, সেগুলি হইতেও অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। গৃহের যে দুই এক জন অধিবাসী রক্ষা পাইয়াছিল, তাহাদের তখন আর আত্মরক্ষা করিবার বা দস্যুদিগকে বাধা দিবার ক্ষমতা ছিল না; তাই এই অবসরে দস্যুদল গৃহে গৃহে আগুন লাগাইতে লাগিল; সহরে ধূ ধূ করিয়া অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল—আর বহু হতভাগ্যের অর্দ্ধদগ্ধ দেহ সেই ভীষণ দৃশ্যের ভীষণ-ভাব আরও বর্দ্ধিত করিয়া তুলিল।

শেষ কথা।

ভূকম্পনকালে একজন ইংরাজ লিসবনে ছিলেন;—কম্পনকালে তিনি নৌকায় ছিলেন। কম্পনানুভব করিয়া তিনি তখনই তীরে আসেন। সিন্ধুসলিল সরিয়া যাইতেছে দেখিয়া তিনি একটা পাহাড়ে গিয়া উঠেন। সেখান হইতে তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন, ক্রোধাকুল সিন্ধু সফেন আবেগে সহরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তিনি অনুমান করেন যে, সহরে যে ষাট সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, তদ্ভিন্ন সাগরতীরে তীরবদ্ধ নৌকাসমূহেও প্রায় ছয় সহস্র মানব লোকান্তরিত হইয়াছিল। লিসবনের ভূমিকম্পের মত ভীষণ ভূমিকম্প জগতের ইতিহাসে আর দৃষ্ট হয় না।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

মিসেস্ অলিফ্যাণ্ট।

জ্যৈষ্ঠ মাসের সহযোগী সাহিত্যে ইংরাজী সাহিত্য আলোচনা করিবার সময় পরিণয়হীন প্রণয়ের বিপক্ষে আমরা শ্রীমতী অলিফ্যাণ্টের মত উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। হায়! ইতিমধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। আমরা পাঠকগণকে তাঁহার ও তাঁহার রচনাসমূহের কিছু বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া দিতেছি।

তাঁহার সমসাময়িক লেখক ও লেখিকাদিগের মধ্যে মিসেস্ অলিফ্যাণ্টের অপেক্ষা অধিক-সংখ্যক পুস্তক বোধ করি আর কেহই লেখেন নাই। রচনাপ্রাচুর্য্য সকল সময় রচনাপারিপাট্যের পরিচায়ক না হইলেও, তাহা যে ক্ষমতার পরিচায়ক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্কচ্, ডুমা, ব্যালজাক, সকলেরই এই রচনাপ্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়। একখানি উপন্যাস রচনা শেষ হইবার পূর্ব্বেই, তাঁহাদিগের আবার এক বা একাধিক উপন্যাসের উপাদান স্থির থাকিত। সকল উপন্যাস সমান উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় না হইলেও, সকলগুলিতেই লেখকের প্রতিভা আপনার জ্যোতিঃ বিস্তার করিয়া, সে সকলকে উজ্জ্বল করিয়া তুলে। মিসেস্ অলিফ্যাণ্টের উপন্যাসরাশিসম্বন্ধেও সেই কথা বলা যাইতে পারে। তাঁহার সকল উপন্যাসই সুখপাঠ্য হইত। তাঁহার প্রতিভা, শ্রান্তি কাহাকে বলে, তাহা জানিত না। অতি অল্প বয়সে তিনি পুস্তক রচনা আরম্ভ করেন; তাহার পর যৌবনে দাম্পত্য-জীবনে এবং বার্দ্ধক্যে জননীজীবনেও তিনি বহু পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। মিসেস্ অলিফ্যাণ্ট তাঁহার পুস্তকসমূহে নানা চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, নানা কথার আলোচনা করিয়াছেন, নানা চিত্র দেখাইয়াছেন।

রচনাপ্রাচুর্য্য।

তাঁহার রচনাস্তূপের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে প্রথমেই মনে হয়, তিনি কেমন করিয়া এতগুলি পুস্তকে আপনার রচনামাধুরী প্রসারিত করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার উপন্যাসের প্লট অর্থাৎ গল্পাংশে বিশেষ কিছুই নাই; বাস্তবিক তাঁহার অধিকাংশ পুস্তকে একটা সুগঠিত প্লটও নাই—আছে কেবল কোন গার্হস্থ্য বা মনস্তত্ত্বঘটিত ঘটনার চারি দিকে কতকগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা। তাঁহার রচনা পাঠ করিলে মনে হয় যে, তিনি যে মহিলা, মিসেস্ অলিফ্যাণ্ট সে কথা কখনও ভুলেন নাই। দুঃখের বিষয়, ইংলণ্ডে, এমন কি, এ দেশেও অনেক মহিলালেখক এই টুকুই বিস্মৃত হইয়া যান। তবে সংসারের বিষয়ের জ্ঞানে এবং চরিত্রের চিত্রনে তাঁহার সমকক্ষের সংখ্যা বাস্তবিকই বিরল; সেই সকল ক্ষমতার সহিত শুচিতার মধুর সংমিশ্রণই তাঁহার সাফল্যের সর্ব্বপ্রধান কারণ।

সাফল্য।

মিসেস্ অলিফ্যাণ্টের রচনাসমূহকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। তাহার প্রথম ভাগ অবশ্য তাঁহার প্রথম বয়সের রচনা। ১৮৪৯ হইতে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি যে সকল পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, সে সকলই এই প্রথম ভাগের অন্তর্ভুক্ত। তখন তাঁহার প্রতিভালোক ক্রমে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে। সেই সকল পুস্তকে অসাধারণ প্রতিভার প্রভূত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু তখন লেখিকা নূতন ব্রতী, তখনও তাঁহার অভিজ্ঞতা অল্প, ক্ষমতা সঙ্কীর্ণ। তাই সেই সকল পুস্তকে অনেক স্থানে ভূয়োদর্শনের অভাব দৃষ্ট হয়। তখনকার পুস্তকের চরিত্রগুলিও প্রায় একই ছাঁচে ঢালা। সেই পবিত্রচিত্তা প্রৌঢ়া, সেই লাবণ্যময়ী যুবতী, সেই বলিষ্ঠ যুবক, এই সকলই তখন তাঁহার পুস্তকে অধিক স্থান পাইত। এখনও অনেক লেখক মিসেস্ অলিফ্যাণ্টের প্রথম বয়সে রচিত উপন্যাসগুলিরই উপাসক। সে সকল পুস্তকে দক্ষ শিল্পীর করচাতুর্য্য লক্ষিত হয় না সত্য, কিন্তু তাহাতে যাহা আছে, পরবর্ত্তীকালে লিখিত কোনও পুস্তকে তাহা নাই। তখন সংসার লেখিকার দর্শনলোলুপ নয়নসমক্ষে কেবল আপনার আবরণ উন্মোচন করিতেছে, তাই সে সকল রচনা নূতনত্বে সজীবত্বে পরিপূর্ণ। তখন কুমারী মার্গারেট উইল্‌সন আপনার চারিদিকে যাহা দেখিতেন, যত্নসহকারে তাহাই চিত্রিত করিবার প্রয়াস পাইতেন।

রচনার প্রথমাংশ।

আমরা মিসেস্ অলিফ্যাণ্টের রচনাসমূহকে যে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছি, তাহার

দ্বিতীয় অংশের আরম্ভ, তাঁহার বিবাহের পর কুমারীজীবনের অবসানের সহিত, অর্থাৎ দম্পত্যজীবনের আরম্ভেই জীবনের যে প্রভূত পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা হইতেই রচনার এই দ্বিতীয় অংশের আরম্ভ। কুমারীজীবনে তাঁহার নিকট জগতের যে অংশ অপরিচিত ছিল, এখন তিনি তাহার সহিত পরিচিত হইলেন। তবে যে আনন্দ, যে আশা লইয়া তিনি বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সে আনন্দ বুঝি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়াছিল, সে আশা বুঝি হৃদয়েই বিলীন হইয়াছিল। তাঁহার বিবাহ যে একেবারে ব্যর্থ হইয়াছিল, এমন কথা বলিতে পারি না। কারণ, তাঁহার প্রবল সন্তানস্নেহ তদীয় চরিত্রের একটি প্রধান পরিলক্ষণীয় বিষয়। কিন্তু এ বিবাহ বোধ করি বিশেষ সফলও হয় নাই; কারণ, বিবাহের অল্পদিন পরেই তাঁহাকে লণ্ডনে পুস্তক রচনা করিয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় ব্যাপৃত হইতে হইয়াছিল। তাঁহার এই সময়ের রচনায় অসহিষ্ণুতা ও তীব্রতা বড় পরিস্ফুট। পুরুষের সম্বন্ধে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে পুরুষের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা দূর হইয়া গিয়াছিল, তাঁহার হৃদয়সিংহাসনচ্যুত, ভগ্নদেহ, বিকলাঙ্গ দেবমূর্ত্তি সকল তখন তাঁহার পদপ্রান্তে ধূলিবিলুণ্ঠিত। দাম্পত্য মনোমালিন্যে তিনি তখন বিবাহের প্রতি বিরক্ত। তখন তিনি দেখিয়াছেন যে, প্রকাশকগণ স্বার্থান্ধ এবং ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানবিবর্জ্জিত। তাঁহার তদানীন্তন রচনায় আর স্কটল্যাণ্ডের পূর্ব্ব প্রান্তের সে মধুর গ্রাম্যজীবনের চিত্র দেখিতে পাই না, তাঁহার হৃদয়ে তখন বিষাদের ঘন ছায়া ব্যাপ্ত। আমরা দেখিতে পাই, এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে কেবল তাঁহার যুবকযুবতীসম্বন্ধীয় মত পরিবর্ত্তিত হয় নাই; ডিজ্‌রেলির মত তিনি তরুণবয়স্কের আত্মত্যাগে তখনও বিশ্বাস করেন। তাঁহার তৎকালে লিখিত উপন্যাসগুলি তরুণবয়স্কের প্রশংসায় ও অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক পুরুষের প্রতি বিদ্রূপে পরিপূর্ণ। কাজেই অধিকবয়স্ক পুরুষের নিকট এ সকল উপন্যাস বিশেষ উপাদেয় হইবে না। এই সকল পুস্তকে রচনার বিকাশ লক্ষিত হয়; কারণ, তখন লেখিকা প্রকৃত শিল্পকৌশলশালিনী হইয়াছেন। কিন্তু এই সকল পুস্তকে যেখানে তিনি তরুণবয়স্ক চরিত্রের অঙ্কন বা স্বভাববর্ণন ভিন্ন অন্য কোনও বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, সেখানে আর তাঁহার প্রথম বয়সের রচনাসমূহের মাধুরী পরিলক্ষিত হয় না।

রচনার দ্বিতীয় অংশ।

মিসেস্ অলিফ্যাণ্টের রচনাসমূহের দ্বিতীয় ভাগে যে তীব্রতা ও বিষাদপ্রবণতা পরিলক্ষিত হয়, তাঁহার মত মহৎ ও উদারহৃদয় মহিলার হৃদয়ে কখনও সেরূপ ভাব চিরস্থায়ী হইতে পারে না। তাহার উপর সাহিত্যসেবার সম্পদসৌভাগ্যেও তাঁহার হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। শেষে তাঁহাকে আর প্রকাশকদিগের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে হইত না। প্রকাশকেরাই তাঁহার পুস্তক প্রকাশ করিবার জন্য লালায়িত হইত। কাজেই তাঁহার তীব্রতা কোমলতায় পর্য্যবসিত হইল, চঞ্চলতা গম্ভীরতায় পরিণত হইল, বিষাদ আনন্দে নিমগ্ন হইল। বিশেষতঃ, এখন তাঁহার সংসারের অভিজ্ঞতাও বর্দ্ধিত হইয়াছে; সেই পরিপক্ব অভিজ্ঞতা ও কোমলতা হইতে যে সকল পুস্তক রচিত হইতে লাগিল, সে সকল পুস্তক যে উপাদেয় হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাঁহার অনেক পুস্তকের আলোচ্য বিষয় পুরাতন, এবং তাঁহার পুস্তকে বিশেষ চিত্তাকর্ষক কোনও ঘটনার অভাব, তথাপি সে সকল পুস্তক অত্যন্ত সুখপাঠ্য ও শিল্পসৌন্দর্য্যময়। ইহাই মিসেস্ অলিফ্যাণ্টের বিশেষত্ব।

রচনার তৃতীয় অংশ।

কেবল উপন্যাসরচনাতেই মিসেস্ অলিফ্যাণ্টের বিপুল প্রতিভা পর্য্যবসিত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল। "ব্ল্যাকউডে" তিনি নানা বিষয়ে বিবিধ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। বাস্তবিক, বৈজ্ঞানিক বিষয় ভিন্ন প্রায় অন্য সকল বিষয়েই তিনি কিছু লিখিতে পারিতেন। তিনি সহজেই অতি দুর্ব্বোধ

প্রবন্ধাদি।

বিষয় সকল বুঝিয়া বিশদভাবে সে সমুদয় বুঝাইতে পারিতেন। কেবল তিনি পোষাক সম্বন্ধে যে পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, সেইখানিই আশানুরূপ হয় নাই। তিনি কয়খানি জীবনচরিত লিখিয়াছিলেন। উপকরণপ্রাচুর্য্য এবং সূক্ষ্ম সমালোচনায় সেগুলি জীবনচরিত-রচনার আদর্শ, এ কথা বলিলেও বোধ করি অত্যুক্তি হয় না।

ইহা ভিন্ন তিনি ড্যাণ্টে এবং সারভ্যান্‌টিস্, এই দুই জন লেখকের যে দুইখানি সমালোচনা প্রকাশ করেন, তাহাতে তাঁহার সমালোচনাশক্তি, ভূয়োদর্শন ও গভীর জ্ঞান দেখিয়া, সমালোচকগণ সত্য সত্যই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন।

রমণীর প্রতিভা যে পুরুষের প্রতিভা অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে, রমণীর শিক্ষালাভের ক্ষমতার অভাব নাই, মিসেস্ হেনরী উড্, মিসেস্ অলিফ্যাণ্ট, মিসেস্ হামফ্রী ওয়ার্ড প্রভৃতি মনীষা-সম্পন্ন মহিলাগণই তাহার দৃষ্টান্ত। আমাদিগের ধ্রুব বিশ্বাস যে, রমণীগণ উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে, আপনার ন্যায়সঙ্গত সকল অধিকার প্রাপ্ত হইলে, আমাদিগের গার্হস্থ্য জীবনে সুখের শত উৎস উৎসারিত হইবে।

স্ত্রীজাতির সাহিত্য-ব্যবসায়।

অনলস লেখিকা মিসেস্ টুলি, মে মাসের "টেম্পল্ ম্যাগাজিন" পত্রে ডেলিনিউস, ট্রুথ ও নিউইয়র্ক ট্রিবিউনের পারিসস্থ সংবাদদাত্রী মিসেস্ ক্রফোর্ডের বিষয়ে একটি চিত্তাকর্ষক বিবরণ লিখিয়াছেন। মিসেস্ টুলি কথোপকথনকালে মিসেস্ ক্রফোর্ডকে জিজ্ঞাসা করেন যে. আপনি সাহিত্যোপজীবিগণের মধ্যে বিশেষ গণনীয়া, এবং সংবাদপত্র-সাহিত্যে উচ্চ পদবী অধিকার করিয়াছেন। মহিলাগণের সংবাদপত্রের লেখিকারূপে উপার্জ্জন কি আপনি উত্তম উপজীবিকা বলিয়া মনে করেন? এই প্রশ্নের উত্তরে মিসেস ক্রফোর্ড বলেন, যে সকল মহিলা জীবনের প্রারম্ভে সংবাদপত্রের লেখিকারূপে জীবনযাত্রার পথ স্থির করেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা শারীরিক কষ্ট সহ্য করিতে অক্ষম, এবং যাঁহাদের অদম্য অধ্যবসায়ের অভাব, তাঁহাদিগকে উপজীবিকার জন্য এই পথ অবলম্বন করিতে আমি কখন উপদেশ দিতে পারি না। কারণ, ঐ দুইটি গুণ এ পথে অপরিহার্য্য। তাঁহাদের বিশেষ সৎসাহস থাকা আবশ্যক। কারণ, সময়ে তাহারও পরীক্ষা আবশ্যক হয়। স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক বোধশক্তি পুরুষ অপেক্ষা অনেকাংশে অধিক, এজন্য তাঁহারা সংবাদপত্রের কার্য্যে বিশেষ উপযুক্ত। এই কার্য্যে সিদ্ধি-লাভ, অবিলম্ব ও নিঃসন্দিগ্ধ দৃষ্টির প্রতি নির্ভর করে। বাল্য বয়সে চিত্রবিদ্যার অনুশীলনে আমার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ঐ বিষয়ের চর্চ্চার জন্য বহু বৎসর অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়াছি। আমার বিশ্বাস যে, চিত্রবিদ্যার অনুশীলন দ্বারা আকৃতি ও বর্ণের যথাযথ স্বরূপ-নির্ণয়ে আমার দৃষ্টি বিশেষ তীক্ষ্ণ হইয়াছিল। তাহারই ফলে আমি সংবাদপত্রলেখকগণের মধ্যে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিয়াছি। এই কারণেই আমি কোন বিষয় বা অবস্থান বুঝিয়া লইতে পারি। উত্তম রচনা করিতে হইলে সুকুমার শিল্পচর্চ্চার বিশেষ প্রয়োজন। ইহা সকলে ততটা বুঝিতে পারেন না। যে সকল রমণী সাহিত্য-সংসারে উচ্চপদলাভের অভিলাষিণী, আমি তাঁহাদিগকে চিত্রবিদ্যার চর্চ্চা রাখিতে এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যের অনুকরণে চিত্রাঙ্কন করিতে উপদেশ দিয়া থাকি। কোনও ঘটনামূলক চিত্র অঙ্কিত করিতে হইলে যেমন কল্পনাশক্তির বিশেষ প্রয়োজন, গল্পরচনাকালেও কল্পনাশক্তি তদ্রূপ আবশ্যক। সুকুমার শিল্প এবং সাহিত্যের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। মিসেস টুলি পুনরায় প্রশ্ন করেন যে,

লণ্ডনের ন্যায় অল্প দিনের মধ্যে পারিস নগরীতেও কি মহিলাগণ অধিকসংখ্যায় সংবাদ-পত্রলেখিকার ব্যবসায় অবলম্বন করিতেছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে মিসেস্ ক্রফোর্ড বলেন, পারিসেও অনেক মহিলা এই ব্যবসায় অবলম্বন করিতেছেন যথার্থ, কিন্তু আমি বিশেষ দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, তাঁহারা এই ব্যবসায়ের বিশেষ সুনাম রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। যেরূপ ঘৃণিত উপায়ে তাঁহারা এই পথে চলিয়াছেন, তাহা শুনিলে ঘৃণায় ও দুঃখে মৃতকল্প হইতে হয়। যাঁহারা চিত্রবিদ্যা উপজীবিকারূপে অবলম্বন করিয়া-ছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলিতে হয়। যদিও আমায় বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না যে, পারিসে এমন সংবাদপত্রলেখিকা এবং চিত্রকরীও আছেন, যাঁহাদের সুনাম সম্বন্ধে কেহ কোন কথা বলিতে সাহসী হয় না, তথাপি আমি সন্তপ্তচিত্তে বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, এই দুইটি উপজীবিকাই অনেক রমণীর ব্যভিচারের আবরণ পরিচ্ছদরূপে ব্যবহৃত হইয়া কলুষিত হইতেছে। যদি এই ভাবেই চলে, তাহা হইলে পারিসে সংবাদ-পত্রলেখিকার ব্যবসায় ক্বচিৎ সম্মানের বলিয়া আদৃত হইবে।

জীবনবৃত্ত।

পারস্যের শাহ।

মিষ্টার ফ্রেসার প্রভৃতি তিন জন সাহেব দ্বিচক্র যানে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেছেন। মিষ্টার ফ্রেসার পারস্যের রাজধানী তিহারাণ হইতে মে মাসের "ইংলিশ্ ইলষ্ট্রেটেড্ ম্যাগাজিনে" বর্ত্তমান পারস্যাধিপতির বিষয়ে একটি চিত্তাকর্ষক বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়া-ছেন। পারস্যাধিপতির নাম মজাফর উদ্দীন শাহ। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় যে, তিনি নিতান্ত নিরীহ ব্যক্তি। তিনি অধিকাংশ সময় পর্ব্বতসমূহে মৃগয়াবিহার, অথবা ইংলণ্ডের ধীবর ও নাবিকদিগের ন্যায় পশমের মোটা একটা জ্যাকেট ও সূতি পাজামা পরিধান করিয়া স্বীয় উদ্যানে সামান্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন; কিম্বা ফটোগ্রাফ তুলিয়া থাকেন। শাহ অত্যন্ত দুর্ব্বলপ্রকৃতি; কিন্তু দ্বিচক্ররথচারী পত্রপ্রেরককে তাঁহার প্রাসাদমধ্যস্থ কোষা-গার-পরিদর্শনের অনুমতিদানে তাঁহাকে ভীত বা চঞ্চল বোধ হয় নাই। মিষ্টার ফ্রেসার বলেন, তিনি ময়ূর-সিংহাসন দেখিয়াছেন। ময়ূর-সিংহাসনের মূল্য বিশ লক্ষ হইতে ত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড অনুমিত হইয়া থাকে। ভূতপূর্ব্ব শাহের সময়ে প্রস্তুত এক সুবর্ণময় রত্নখচিত ভূমণ্ডলের গ্লোব কোষাগারে রক্ষিত আছে। ৭৫ পাউণ্ড খাঁটি সোণা ও ৫১ হাজার খণ্ড বহুমূল্য রত্নে ঐ "গ্লোব" নির্ম্মিত হইয়াছে। মরকতমণি সন্নিবিষ্ট করিয়া সাগর, এবং টর্কুইজ মণি দ্বারা পারস্য, এমেথিষ্ট রত্নে ভারতবর্ষ, রক্তবর্ণ মণিখণ্ডে আফ্রিকা ও হীরকখণ্ডের সংযোগে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স চিত্রিত হইয়াছে।

পারস্যের শাহ তুর্কজাতীয়। কিন্তু কনস্তান্তিনোপলের বিখ্যাত গুপ্তহত্যাব্যাপারে তাঁহার সহানুভূতি নাই। শাহের পিতা প্রতি রাত্রে দুই বোতল পোর্ট মদিরা সেবন করিতেন; কিন্তু ইনি মদ্য স্পর্শও করেন না। শাহ সর্ব্বসাধারণের বিশেষ প্রিয় নহেন। ইহার কৌতুকাবহ কারণ এই যে, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী পারস্যাধিপতিরা যেরূপ নির্দ্দয়ভাবে প্রজা-সাধারণের পীড়ন করিতেন, বর্ত্তমান শাহ তাহা করেন না।

মিষ্টার ফ্রেসার শাহের দৈনিক কার্য্যপ্রণালীর এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন;—তিনি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া ঈশ্বরের উপাসনার পর এক টুকরা পারস্যদেশজাত পাতলা রুটি আহার ও এক গ্লাস মিষ্ট চা মাত্র পান করেন। প্রায় বেলা ৮ টার সময় মন্ত্রিবর্গ তাঁহার নিকট রাজ-

কার্য্য লইয়া উপস্থিত হন। বেশের পারিপাট্য অথবা পরিচ্ছন্নতার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নাই। ঘরের মধ্যে চট্ চট্ শব্দে চটি জুতা পায়ে পায়চারী করিয়া থাকেন। এইরূপ প্রবাদ যে,

শাহের প্রাত্যহিক জীবন-যাপন।

তিনি স্নানাদি করেন না, বড়ই অপরিষ্কার; এজন্য তাঁহার প্রথমা পত্নী সর্ব্বদাই অনুযোগ করিতেন, এই কারণে শাহ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। মন্ত্রিবর্গ উপস্থিত হইলে তিনি বহুসংখ্যক চিঠি লিখিয়া থাকেন; রাজকার্য্যসম্বন্ধীয় চিঠিপত্র শুনিয়া থাকেন, প্রধান কর্ম্মচারিগণের সহিত পরামর্শ করেন, এবং রাজ্যের প্রত্যেক কার্য্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ লইয়া থাকেন। এই কার্য্যে অবিরামে ছয় ঘণ্টা কাল অতিবাহিত হয়। তাহার পর তিনি মধ্যাহ্নভোজনে বসেন। সমস্ত আহার্য্য অত্যন্ত সাবধানে প্রস্তুত হয়। যাহাতে খাদ্যের সহিত বিষাদি মিশ্রিত হইয়া প্রাণনাশের আশঙ্কা না থাকে, এজন্য ঘনিষ্ঠসম্পর্কীয় এক জন রাজপুত্রের প্রতি ঐ বিষয়ের তত্ত্বাবধারণের ভার অর্পিত আছে। রন্ধনশালা হইতে শাহের আহারকক্ষে লইয়া যাইবার সময় খাদ্যপূর্ণ প্রত্যেক পাত্র শীলমোহর করিয়া আঁটিয়া দেওয়া হয়। ভোজনকালে শাহের সমক্ষে শীলমোহর ভাঙ্গা হয়। রাজদরবারের নিয়মানুসারে শাহ একাকী ভোজন করেন। পূর্ব্বে তিনি ঘরের মেজেয় বসিতেন, এবং একখানি বড় থালায় করিয়া খাবার দেওয়া হইত। তিহারাণে আসিবার পর হইতে তিনি গদীতে বসিয়া এক ফুট উচ্চ এক টেবিলে আহার-পাত্র রাখিয়া ভোজনে সম্মত হয়েন। প্রথমে তাঁহার টেবিল ছিটের কাপড় দিয়া আবৃত হইত। সাদা কাপড় টেবিলে পাতিলে খুব ভাল দেখাইবে, এই কথা বলায়, তিনি তাহাতে সম্মত হয়েন; এখন তিনি টেবিলে সাদা কাপড় ব্যবহার করিয়া থাকেন। পঞ্চাশ ষাট প্রকারের খাদ্যসামগ্রী টেবিলে সাজাইয়া দেওয়া হয়, কিন্তু পারস্যাধিপতি দুই তিন প্রকার মাত্র আহার করিয়া থাকেন। প্রথমে তিনি পোলাও এবং তাহার সঙ্গে ছোট একটি মুর্গী, কিম্বা দুই খণ্ড পাতলা রুটির মধ্যস্থ পুরের মত এক টুকরা ভেড়ার মাংস আহার করেন; তাহার পর সিরাপে ভিজান "সিট্রন ফল" খান। সিট্রন ফল পারস্যের সর্ব্বসাধারণের সচরাচর খাদ্য। ছুরী কাঁটা পারস্যের শাহের নিতান্ত অপরিচিত। সর্ব্ববিধ আহার হস্ত দ্বারাই সম্পন্ন হয়। মজ্জা তাঁহার বিশেষ প্রিয় খাদ্য। আহারকালে তাঁহাকে ইউরোপীয় সংবাদপত্র শুনান হয়। প্রধানতঃ ফরাসী সংবাদপত্রই অধিক পঠিত হয়। তিনি ইউরোপীয় রাজনীতির বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিয়া থাকেন। পারস্যের শাসনবিষয়ক কথোপকথনকালে প্রায়ই বলেন, "আজ এইরূপ ঘটনায় ইংলণ্ডের রাণী কি করিতেন?" আহারান্তে শাহ এক ঘণ্টা মাত্র নিদ্রা যান। নিদ্রাভঙ্গের পর কয়েক গ্লাস চা পান করিয়া ছোট টেলিগ্রাফ যন্ত্র লইয়া ক্রীড়াসুখ অনুভব করেন; অথবা মন্ত্রিবর্গের সহিত তাস খেলিয়া থাকেন। তাস খেলিবার সময় তাঁহারা জয়ী না হন, এজন্য মন্ত্রিগণ বিশেষ সাবধানে থাকেন! বাগানের চারা গাছগুলি এখানে সেখানে নাড়ানাড়ি করিয়া বসান ও ফটোগ্রাফ তোলা, তাঁহার অন্যতম অবসরবিনোদের কার্য্য; মিষ্টার ফ্রেসর বলেন, তিনি পারস্যাধিপতির স্বহস্তে গৃহীত কতকগুলি ফটো দেখিয়াছেন, সেগুলি বাস্তবিকই খুব চমৎকার। নানাবিধ বেশ ও অবস্থার ফটোগ্রাফ শাহের এক প্রকার বাতিকের মত। এমন কি, তিনি শয্যাশায়ী অবস্থার ফটো তুলাইয়াছেন। তিনি শাহের এক ফটো দেখিয়াছেন, ঐ ফটোতে শাহ কষ্টদায়ক প্রুষদেশীয় সৈনিক-পরিচ্ছদ পরিহিত। ইংরাজ ধর্ম্মযাজকের পরিচ্ছদে শোভিত, তাঁহার ফটোও দেখিয়াছেন। তাঁহার ষাটটি মাত্র পত্নী আছেন, এ বিষয়ে তিনি বিশেষ মিতাচারী! তাঁহার চারি পুত্র, এবং তেইশটি কন্যা। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী শাহের অন্তঃপুরে এক হাজার সাত শত বিংশতি পত্নী ছিলেন। বর্ত্তমান শাহের চিকিৎসক এক জন ইংরাজ। সমুদ্রপীড়ার ভয়ে তিনি ইউরোপে যাইতে ভীত হয়েন, কিন্তু ভারতবর্ষে বেড়াইতে আসিবার জন্য তিনি বিশেষ উৎসুক।

বিবিধ।

ভারতীয় ইন্দ্রজাল।

সম্প্রতি "বর্ডারল্যাণ্ড" পত্রে কোনও লেখক এই ইন্দ্রজালরহস্য বিবৃত করিয়াছেন।—"ভারতবর্ষে আমি অনেক ফকির ও ঐন্দ্রজালিকের সহিত আলাপ করিয়াছি, তাহাদিগের কার্য্যকলাপ

প্রথম পরিচয়।

পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি, এমন কি, তাহাদের কৃত ইন্দ্রজালের রহস্যভেদ করিয়া বুজরুকি ভাঙ্গিয়া দিয়াছি। আমি শুনিলাম, সিমলা শৈলে এক জন অপরিমিতধনশালী, বিদ্বান জহুরী আছেন;—সাধারণ লোকে বলে যে, তিনি মূসারই মত;—এমন কি, মূসার অপেক্ষাও বিপুলক্ষমতাশালী। তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমি সিমলা যাইবার সঙ্কল্প করি।

"আমার এক বন্ধু—বেঙ্গল লান্সার্স সৈন্য দলের এক জন কাপ্তেন—অসুস্থ হইয়া সিমলায় গিয়াছিলেন। আমি তাঁহার গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলাম—তথায় আমার বন্ধু গুর্খা সেনাদলের এক জন ডাক্তার বাস করিতেন। সেই পার্ব্বত্যপ্রদেশের শোভাময় দৃশ্যের মধ্যে শান্ত সন্ধ্যায় যখন কয় বন্ধুতে বসিয়া চুরুট ফুঁকিতে ফুঁকিতে গৃহে ধূম্রলোকের সৃষ্টি করিতেছিলাম, তখন আমি জেকবের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম;—জানিলাম, সিমলায় জেকবকে জানে না, এমন লোক নাই। আমি জেকবের সহিত পরিচিত হইবার বাসনা বিজ্ঞাপিত করিলে বন্ধু বলিলেন যে, আমি যে দুই চার দিন সিমলায় থাকিব, তাহার মধ্যে জেকবের সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নিতান্তই অল্প। স্কচ্ ডাক্তারের কথার ভাবে বোধ হইল, তাঁহার ইচ্ছা নহে যে, আমি জেকবের সহিত আলাপ করি।

"জেকবের বাঙ্গলো আমাদের বাঙ্গলো হইতে প্রায় এক মাইল দূরবর্ত্তী একটা পাহাড়ের উপর অবস্থিত। আমি সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। জেকবের ভৃত্য জানাইল যে,—মনিব বাড়ীতে নাই, কোথায় গিয়াছেন, তিন দিন পরে গৃহে ফিরিবেন। আমি কার্ড রাখিয়া বলিয়া আসিলাম যে, আমি আবার আসিব; কেবল তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যই আমি এত দূর আসিয়াছি। আমি কার্ডে একটা সাঙ্কেতিক চিহ্ন লিখিয়া আসিলাম। পরে জানিয়াছিলাম যে, জেকব আমার সঙ্কেত বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

"তিন দিন পরে প্রভাতে অশ্বারোহণ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখি, জেকব আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন; তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছেন। আমার স্কচ্ বন্ধুর কাছে ইহা বড় ভাল বোধ হইল না। যাহা হউক, আমি নির্দ্দিষ্ট সময়ে জেকবের গৃহে উপস্থিত হইলাম। তখন আরও তিন জন নিমন্ত্রিত ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছেন; তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে সুপরিচিত এক জন সেনাধ্যক্ষ। জেকব আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন।

"আহারান্তে গল্প করিতে করিতে আমি ফকিরদিগের যে সকল ভেল্কি দেখিয়াছিলাম, সেই সকলের কথা বলিতে লাগিলাম। আমি যখন মানবদেহে তরবারি বিদ্ধ করিবার

তরবারির আঘাত।

কথা বলিলাম, তখন জেকব হাসিয়া বলিলেন, 'সে অতি সামান্য ব্যাপার। আপনি উঠিয়া দাঁড়ান।' আমি দাঁড়াইলাম। তখন কক্ষপ্রাচীরে বিলম্বিত বহুমূল্য মণিরত্নখচিত তরবারিখানি লইয়া তিনি সেখানি আমার বক্ষের কাছে ধরিয়া বলিলেন, 'বসাইয়া দিব কি?' তাঁহার উপর আমার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল, তাই আমি বলিলাম, 'অবশ্য দিবেন।' তখন তিনি আমার বক্ষের অস্থির কিছু নিম্নে সেই তরবারিফলক বসাইয়া দিলেন; আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, আমার দেহে তরবারির

শীতল ফলকই প্রবেশ করিতেছে; কিছুমাত্র বেদনা বোধ হইল না—কেবল বোধ হইতে লাগিল, যেন আমি শীতল জল পান করিয়াছি। তরবারির অগ্রভাগ আমার পৃষ্ঠ দিয়া বাহির হইয়া কক্ষের দারুময় প্রাচীরে বসিয়া গেল। তখন তরবারি ত্যাগ করিয়া হাসিতে হাসিতে জেকব বলিলেন, 'আপনাকে কিরূপে দেখাইতেছে জানেন?—যেন পিন্ দিয়া কর্কে বিদ্ধ প্রজাপতি।' কোন কোন অতিথিও আমাকে বিদ্রূপ করিতে ত্রুটি করিলেন না। অল্পক্ষণ পরেই জেকব তরবারি তুলিয়া লইলেন। আমি বিমর্ষভাবে আমার ছিন্ন কোটের দিকে চাহিলাম। জেকব বলিলেন, 'ভয় নাই, সব ঠিক হইয়া যাইবে।' আমরা অন্যান্য ভেল্কি দেখিতে দেখিতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলাম;—তাহার পর চাহিয়া দেখি, কোটে ছিদ্রমাত্র নাই।

অতীত চিত্র।

"ইহার পর জেকব বলিলেন, 'আপনারা কেহ যে যুদ্ধে আহত হইয়াছিলেন, সেই যুদ্ধের বিবরণ বিবৃত করুন।' সেরূপ বৃত্তান্ত আমরা সকলেই বিবৃত করিতে পারিতাম, কিন্তু আত্মপ্রশংসা করিতে হয় বলিয়া সকলেই ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। শেষে আমাদিগের সেনাধ্যক্ষ বন্ধু ব্যালাক্লাভার সঙ্কটশঙ্কিল যুদ্ধক্ষেত্রে আপনার অভিজ্ঞতার কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। অসীম সাহসী সৈনিকেরই মত ওজস্বিনী ভাষায় তিনি সে কথা বলিতে লাগিলেন, আর মুগ্ধ হইয়া জেকব সেই কথা শুনিতে লাগিলেন। তাহার পর পকেট হইতে একখানি ক্ষুদ্র দণ্ড বাহির করিয়া জেকব তাহা প্রাচীরের দিকে ঘুরাইলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে কক্ষপ্রাচীরপার্শ্বে ঘনপীতাভ নীল কুজ্ঝটিকাবরণ অপসৃত হইয়া গেল; আমাদের নয়নসমক্ষে সারিবদ্ধ লাইটব্রিগেড সেনাদলের চিত্র উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আমরা নোল্যানকে তীরবেগে অশ্ব ছুটাইয়া যাইতে দেখিলাম, আমরা রণভেরীর উত্তেজক গভীর নাদ শুনিতে পাইলাম,—আমরা নোল্যানকে নিহত দেখিলাম। বাস্তবিক ব্যালাক্লাভার যুদ্ধক্ষেত্রের সকল ঘটনারই পুনরভিনয় হইল। আমরা দেখিলাম, সেনাগণ অতুলনীয় সাহসের সহিত শত্রুর কামান আক্রমণ করিল, সেগুলিকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফিরিল। সেই প্রত্যাবর্ত্তনকারী সেনাগণের মধ্যে আমরা আমাদিগের বন্ধু সেনাধ্যক্ষকে চিনিতে পারিলাম। প্রত্যাবর্ত্তনকালে বোধ হইল, যেন সেই মুষ্টিমেয় সেনা শত্রুসেনাসাগরে নিমগ্ন হইয়া গেল। আমাদের বন্ধু অতি কষ্টে দুই জন শত্রুসেনার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইলেন; কিন্তু তৃতীয় জনকে আক্রমণকালে, তিনি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন। কোনরূপে উঠিয়া তিনি একটি আরোহিশূন্য অশ্ব ধরিয়া তাহাতে আরোহণ করিয়া শত্রুদলের গুলিবৃষ্টির মধ্য দিয়া ইংরাজ শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন। জেকব আর একবার দণ্ড ঘুরাইলেন—মুহূর্ত্তমধ্যে সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইল।

ঘটনা চিরন্তন।

"আমরা বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে পরস্পরের দিকে চাহিতে লাগিলাম। তাহার পর আমরা আর এক জনের বর্ণিত বৃত্তান্ত শুনিতে লাগিলাম। সকল দেখিতে পাইব জানিয়া আমাদিগের আগ্রহ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বাস্তবিকও আমরা যাহা শুনিলাম, তদপেক্ষা অধিক দেখিলাম; কারণ বন্ধু আলমবাগ অধিকারকালে আপনার বীরত্বের কথার একেবারেই উল্লেখ করেন নাই। দুই জন ভীমকায় সিপাহীর সহিত যুদ্ধ করিয়া, তিনি তাহাদিগকে পরাস্ত করেন, জেকবের কৃপায় আমরা তাহা দেখিতে পাইলাম।

"অতিথিদিগের মধ্যে কেহ কেহ জেকবকে অতীত ঘটনার পুনরভিনয়রহস্যের কথা বলিতে বলিলেন। জেকব বলিলেন যে, ঘটনার বিলোপ হয় না—ঘটনা চিরস্থায়িনী। তিনি বলিলেন যে, পৃথিবীর ইতিহাসে লিখিত সকল ঘটনাই উর্দ্ধে তারকালোকে বর্ত্তমান;—জ্ঞান

ও ক্ষমতা থাকিলে সে সকল পুনরায় দেখান অত্যন্ত সহজ। ফনোগ্রাফ যন্ত্র হইতে মানবের কণ্ঠস্বর শুনান যেমন সহজ, তারকালোক হইতে অতীত অব্যয় ঘটনা সকলের প্রদর্শনও তেমনই সহজ।

সলিলোপরি ভ্রমণ।

"জেকব আমাদিগকে তাঁহার উদ্যানে যাইতে বলিলেন—আমরা স্বীকৃত হইলাম। উদ্যানমধ্যে লক্ষ্য করিলাম—একটি মনোরম সরোবর। আমরা গল্প ও চুরুট লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম,—এমন সময় জেকব যাঁহার সহিত গল্প করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, 'জেকব জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইবেন।' জেকব অনায়াসে জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া চলিলেন;—আমরা দেখিতে পাইলাম, স্বচ্ছ জলমধ্যে মীনগণ এই অভিনব দৃশ্য দেখিয়া জেকবের পদতল হইতে চারিদিকে পলাইতে লাগিল। জেকব সরোবর পার হইয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন। আমি তাঁহার জুতার তলা পরীক্ষা করিলাম—যেন তিনি সিক্ত ভূমির উপর ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। জেকব বলিলেন, 'ইহা অতি সহজসাধ্য। যে বাতাসে উড়িতে পারে, সে জলের উপর হাঁটিতেও পারে। যাহা হউক, এইবার আমি যাহা দেখাইব, তাহাতে প্রকৃত ক্ষমতার আবশ্যক।'

প্রজাপতির পাল।

"ঐন্দ্রজালিক দণ্ড লইয়া জেকব মস্তকের উপর ঘুরাইলেন। দেখিতে দেখিতে লক্ষ লক্ষ প্রজাপতি দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তুষারপাতের মত চারিদিকে যেন প্রজাপতির বৃষ্টি হইতে লাগিল। আমাদের হ্যাটে, কোটে, সর্ব্বত্র প্রজাপতি বসিল। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া আমরা হাসিয়া উঠিলাম। আমাদের হাসিতে জেকব কিছু অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বলিলেন, 'ওঃ! আপনারা হাসিতেছেন—এ সকলে আর কাজ নাই।' তিনি আবার দণ্ড ঘুরাইলেন, প্রজাপতির পাল কোথায় চলিয়া গেল। আমরা গৃহে আসিলাম।

"জেকব স্বয়ং যোগী নহেন। তবে তিনি যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, এবং যোগবলেই এই সকল বিস্ময়কর ভেল্কি দেখাইয়া দর্শককে বিস্ময়াবিষ্ট করেন। তাঁহার ক্ষমতা দেখিলে সত্য সত্যই বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না।"

উল্কা।

১। যে সকল ক্ষুদ্র স্বপ্রভ পদার্থকে রাত্রিকালে পুনঃ পুনঃ নভোমণ্ডলে অতিবেগে নানা দিকে বিচরণ করিতে দেখা যায়, এবং দেখিতে দেখিতে অবিলম্বে অকস্মাৎ অদৃশ্য হইয়া পড়ে, সেই সকল পদার্থকে উল্কা বা খধূপ বলে। নিরভ্র স্বচ্ছ রজনীতে উদীক্ষণ করিলে বোধ হয়, নভোমণ্ডল হইতে একটি সমুজ্জ্বল তারা হঠাৎ খসিয়া পড়িল; নিঃশব্দে একদিকে সাঁ করিয়া চলিয়া গেল, এবং ক্ষণমধ্যে লয় পাইল। অনিত্য পার্থিব সুখে বীততৃষ্ণ চিন্তাশীল ব্যক্তিরা উল্কাপাতে দেহীর লোকান্তরগমনরূপ আধিদৈবিক ব্যাপার জ্ঞান করেন; বিরহবিধুর যুবকযুবতীগণ কাতরহৃদয়ে উল্কার আলোকে দয়িতের শুভাশুভ পাঠ করেন; কবি দেখেন যে, নন্দনকাননজাত কুসুমরাজির উজ্জ্বলদল বাতাহত হইয়া সুরলোক প্রধূপিত করিতেছে; অথবা বৈজয়ন্তের দীপাবলিস্খলিত দগ্ধদশান্ত

নিপতিত হইতেছে; জ্যোতিষী জানেন, এ আলোকপিণ্ড তারা নহে, জীবাত্মা নহে, এ ফুলদল নহে, বাতির গুল নহে; ইহা এক কণা, জগতের এক পরমাণু; কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিল? রোজ রোজ এ হাউই কে ছোঁড়ে?

২। উল্কা-সংখ্যা।—এই ক্ষণস্থায়ী অকিঞ্চিৎকর পদার্থগুলি আকারে যেমন ক্ষুদ্র, সংখ্যায় তেমনই বহুল। অন্তরীক্ষে যে কত কোটী কোটী খধূপ পর্য্যটন করিতেছে, তাহা সংখ্যাবাচক শব্দসহায়ে হৃদয়ঙ্গম হয় না। এ গুলির আকার যেমন ভিন্ন ভিন্ন, পরিমাণও তেমনই নানা প্রকার; কতক উল্কা সের-পরিমিত; কতক উল্কা মন-পরিমিত; কোন কোনটা ছটাকের বেশী নহে; আবার কোনটি মৃৎকণা মাত্র। গ্রহরাজের এমনই মাহাত্ম্য যে, এইরূপ অকিঞ্চিৎকর পদার্থ-সমূহকে পারিবারিক স্নেহরজ্জু দ্বারা আবদ্ধ করিয়া, তাহাদিগের মধ্যে স্বীয় মঙ্গলময় করজাল বিস্তার পূর্ব্বক বিরাজ করিতে কুণ্ঠিত নহেন! কি রবিকিরণে ভাসমান রেণু, কি প্রতাপান্বিত বিশাল বার্হস্পত্য মণ্ডল, সকলেই কেপ্‌লারের নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া সাবিত্রমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতেছে। স্বল্পকায়ত্ব ও সুদূরত্ব প্রযুক্ত এই জ্যোতিষ্কগুলি দূরবীক্ষণের আয়ত্ত্ব হয় না।

৩। উল্কাপাত-দর্শন।—এই সকল ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কগণ আকল্প সূর্য্যের চারি দিকে প্রচণ্ডবেগে অপ্রহিতভাবে ঘুরিতেছে; ঘুরিতে ঘুরিতে কালবশে যখন পৃথিবীর নিকটে আসিয়া পড়ে, তখন ভূবায়ুর ঊর্দ্ধতম স্তরে প্রবিষ্ট হইবা-মাত্র মহা অনিষ্ট উপস্থিত হয়। ঊর্দ্ধতম বায়ুস্তর যদিও যৎপরোনাস্তি তরল, তথাপি জলগত রাইফেলের গুলির ন্যায় অতিবেগবিশিষ্ট উল্কা ভূবায়ুতে সমাগত হইয়া হঠাৎ প্রতিঘাত প্রাপ্ত হয়; উল্কা বায়ুমণ্ডল দিয়া গমন করিতে করিতে সংঘর্ষণবশতঃ উষ্ণ হইয়া পড়ে; অনন্তর লোহিত-তপ্ত, তাহার পর শুক্ল-তপ্ত এবং পরিশেষে বাষ্পীভূত হইয়া গগনমণ্ডল আলোকিত করে, এবং আমরা ১০০।২০০ মাইল নীচে থাকিয়া বলি, ঐ দেখ, তারা খসিয়া পড়িল! উল্কা যখন আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তখন উহার বেগ প্রতি সেকেণ্ডে কুড়ি মাইল। ভূপৃষ্ঠে এত বেগ অসম্ভব; অচিরে বায়ু কর্ত্তৃক ইহার প্রতিরোধ হয়। শূন্যপথে এরূপ বেগের কোনও ব্যাঘাত নাই।

৪। উল্কাপাতের কাল।—বৎসরের মধ্যে এমন রাত্রি নাই, যাহাতে উল্‌কাপাত না হয়। নির্ম্মল রজনীতে প্রতি ঘণ্টায় ৫।৭ উল্‌কাপাত দেখা যায়। প্রথম রাত্রিতে খুব কম পড়ে, তুপর রাত্রিতে মাঝামাঝি, শেষ রাত্রিতে খুব বেশী। আবার মাস হিসাবে দেখা যায় যে, জুলাই হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বেশী বেশী,

এবং জানুয়ারি হইতে জুন পর্য্যন্ত কম কম পড়ে। এবং মাসের প্রথমার্দ্ধ অপেক্ষা শেষার্দ্ধে অধিক উল্‌কাপাত দেখা যায়।

৫। তাপবাদ।—উক্ত তারাবাজির ন্যায় খধূপদর্শন, রাসায়নিক ব্যাপার ভিন্ন তাপোৎপত্তির উদাহরণস্থল। কেবল সংঘর্ষণে এতাদৃশ তাপের উৎপত্তি, এবং সেই তাপজনিত এতাদৃশ প্রদীপ্ত উদ্ভাসের উৎপত্তি,—বিশ্বাসের অভূমি বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু মনে রাখা চাহি যে, রাইফেলগুলির বেগ অপেক্ষা উল্কার বেগ শতগুণে অধিক; এবং সংঘর্ষণজনিত যে তাপের উৎপত্তি, তাহা বেগের বর্গের অনুপাতী। অতএব উল্কা যখন ভূবায়ু ভেদ করিয়া প্রধাবিত হয়, তখন কেবল সংঘর্ষণ প্রযুক্ত উহার তাপ রাইফেলগুলির তাপ অপেক্ষা লক্ষ-গুণে অধিক হয়। সংঘর্ষণজনিত গুলি যে দশ ডিগ্রী পরিমাণে উত্তপ্ত হয়, তাহা অত্যুক্তি নহে; অতএব ভূবায়ু দিয়া উল্কার গমনকালে যে অতি অদ্ভুত তাপের উৎপত্তি হয়, তাহার অংশমাত্র হইলে উহাকে ক্ষণমধ্যে বাষ্পীভূত করিতে পারে।

৬। উল্কার উচ্চতা ইত্যাদি।—কোন ত্রিভুজের ভূমি ও ভূমিসংলগ্ন কোণ-দ্বয় জানা থাকিলে, তাহার বাহুদ্বয় ও শীর্ষকোণ হইতে ভূমির অন্তর ইত্যাদি জানা যায়। এই প্রতিজ্ঞা অনুসারে যথোচিত দূরস্থিত স্থানদ্বয় হইতে যুগপৎ পর্য্যবেক্ষণ করিলে, ভূপৃষ্ঠ হইতে উল্কার উচ্চতা, তাহার গম্যমান পথের দৈর্ঘ্য, এবং গতির বেগ নিরূপণ করা যায়। উল্কাগুলি হারাহারি ৭৪ মাইলের উপর থাকিলে দৃষ্টিগোচর হয়, এবং হারাহারি ৫০ মাইলের উপর আসিলে অদৃশ্য হইয়া পড়ে। তাহাদিগের দৃশ্যমান পথের পরিমাণ ৪২ মাইল। উজ্জ্বলতর উল্কাগণের গতির বেগ ভূপৃষ্ঠ সম্বন্ধে প্রতি সেকেণ্ডে ২৯ মাইল।

১৮৬৯ অব্দের ৬ই নবেম্বর তারিখে ইংলণ্ডের দক্ষিণে একটি অপূর্ব্ব বহ্নিবর্ত্তুল দেখা গিয়াছিল। যখন দেখা গেল, তখন উহার উচ্চ ৯০ মাইল, যখন নিবিল, তখন ২৭ মাইল উচ্চতে; ৫ সেকেণ্ডের মধ্যে ১৭০ মাইল চলিয়াছিল। এই বহ্নিবর্ত্তুলের একটি অদ্ভুত বিচিত্র লক্ষণ দৃষ্ট হইয়াছিল। পূর্ণ ৫০ মিনিট কাল ব্যাপিয়া ইহার পথ ৫০ মাইল লম্বা, ৪ মাইল চওড়া, স্বপ্রভমেঘ দ্বারা আলোকিত ছিল।

দূরবীক্ষণের ক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে যে সকল ক্ষুদ্র পদার্থ দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠে ও নিভিয়া যায়, সেগুলি অতি ক্ষুদ্র উল্কা, চর্ম্মচক্ষে দেখা যায় না; তাহাদের লয়ই কেবল তাহাদের অস্তিত্বের প্রমাণ। ভূবায়ু দ্বারা যদি আমরা আবরিত না

থাকিতাম, তবে উল্কাপাতে আমাদিগকে ক্ষত বিক্ষত হইতে হইত। তাহাদিগের বেগই তাহাদের বিনাশের কারণ; বায়ুমণ্ডলে প্রবেশমাত্রেই দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, এবং ফুস্ করিয়া নিবিয়া যায়, ভস্মাবশেষও প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না।

৭। উল্কাবৃষ্টি।—কখন কখন অনবরত উপর্য্যুপরি বারিবৃষ্টির ন্যায় উল্কাবৃষ্টি হইয়া থাকে। ১৮৬৬র নবেম্বর মাসে যে উল্কাবৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা অতি চমৎকার শোভন ও মোহন দৃশ্য। এই উল্কাবৃষ্টির ইতিহাস বলিতে হইলে সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বের কথা পাড়িতে হয়। ইতিহাস এই যে, ৯০২ খৃষ্টাব্দে জনৈক আফ্রিক যবনরাজের মৃত্যুকালে, সমস্ত রাত্রি প্রদীপ্ত শক্তির ন্যায় অসংখ্য তারাপাত হইয়াছিল। উক্ত রাজার লোকান্তরগমনের স্মরণোৎসব-স্বরূপ দেবগণ আতসবাজি করিয়াছিলেন! এ কথায় এখন আর কে শ্রদ্ধা করিবে! এই ঘটনাপাঠে জ্যোতির্বিদ বুঝিলেন যে, ৯০২ হইতে কতিপয় বর্ষ ব্যবধানে যথানিয়মে এক এক বার উল্কাবৃষ্টি হইয়া আসিতেছে, এবং ১৮৬৬র যে উল্কাবৃষ্টি, তাহা এই সাময়িক উল্কাবৃষ্টির পর্য্যায় ৯০২ হইতে একাল পর্য্যন্ত ঊনত্রিশ বার এই উল্কাবৃষ্টি হইয়াছে; তন্মধ্যে শেষ বারের ইতিহাস অতিযত্নপূর্ব্বক সংগৃহীত হইয়াছে।

৮। পোতাধান।—মনে কর, অসংখ্য ক্ষুদ্র পদার্থসংঘাত নভোমণ্ডলে বিচরণ করিতেছে। মনে কর, সাগরসলিলে কোটি কোটি চিলিচিম পোতাধান (Shoal of herrings) বহু ক্রোশ ব্যাপিয়া নানা ভঙ্গিক্রমে ক্রীড়া করিতেছে। মনে কর, সংখ্যাতীত কপোতকুল নিবিড় অরণ্য মধ্যে কলরব করিতেছে; কিন্তু উল্কাধান, পোতাধান ও কপোতকুল অপেক্ষা বিপুল। উল্কাসমূহ তত নিবিড় নহে, দু' চারি মাইল অন্তরে থাকিয়া ঘুরে; কিন্তু সংখ্যা এত অধিক যে, তাহাদের মণ্ডল-পরিমাণ লক্ষ লক্ষ যোজন।

৯। পোতাধানের গতি।—চিলিচিম-সংঘাত বা কপোতকুল স্বেচ্ছাক্রমে গমনাগমন করিতে পারে; কিন্তু উল্কাসমূহের সে স্বাধীনতা নাই; তাহারা সাবিত্রাদিষ্ট পথে পরিভ্রমণ করে; তাহাদের গত্যন্তর নাই; প্রত্যেকে স্বীয় বৃত্তাভাসে ভ্রমণ করে, প্রতিবেশীর সহিত কোন সম্বন্ধ রাখে না, এবং প্রতি ৩৩ বৎসর কোটি কোটি যোজন ঘুরিয়া এক এক ভূ-ভ্রম সমাধা করে। এই উল্কাসংঘাত আমরা দেখিতে পাই না। এক্ষণে ১৮৯০ অব্দে সে গুলি সূর্য্য হইতে বহু দূরে আছে; সমুদ্রের মাছ দেখিতে পাই না; কিন্তু জানি যে, সমুদ্রে মাছ আছে; তেমনি উল্কা দেখিতে পাই না, কিন্তু জানি যে, উল্কা আছে। মাছ

ধরিলে দেখিতে পাই, তেমনই ভূ-বায়ু রূপ জালে যখন উল্কাধান পড়ে, তখনই

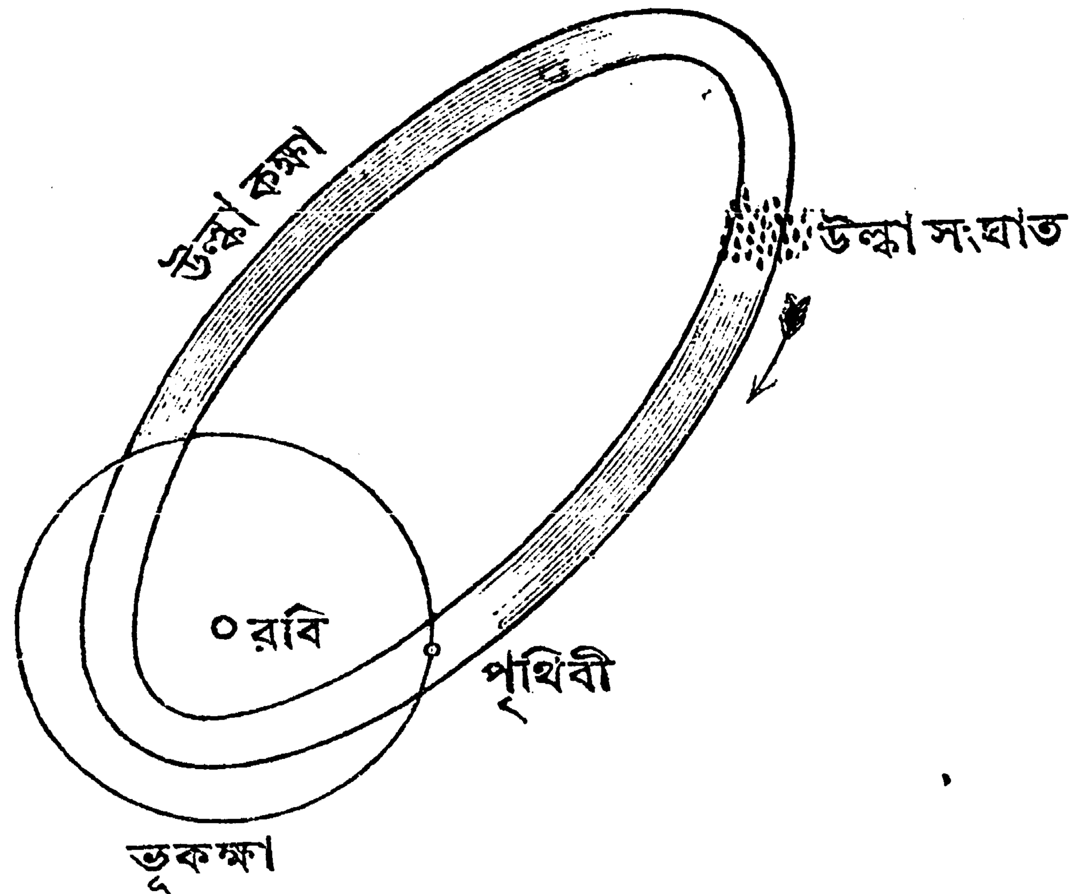

দেখিতে পাই। তেত্রিশ বৎসর অন্তর এই শূন্য-সাগর কূলে পৃথিবী-রূপ বুড়োজালে উল্কা মাছ ধরা পড়ে। উল্কার সংখ্যা এত অধিক যে, প্রতি ৩৩ বৎসরে কোটী কোটী বিনষ্ট হইলেও ভাবী বর্ষের জন্য কোটী কোটী থাকিয়া যায়।

১০। উল্কা-সংঘাতের চিত্র।—চিত্র দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, কেমন করিয়া উল্কাসমূহ ভূবায়ুতে প্রবিষ্ট হইয়া লয়প্রাপ্ত হয়। পৃথিবী রবিপরীত স্বীয় কক্ষায় ভ্রমণ করিতেছেন; উল্কাসংঘাতও নিজ নিজ পথে পরিভ্রমণ করিতেছে; পরন্তু উল্কাকক্ষা পর্য্যাপ্তির অভাবে যথাপরিমাণে অঙ্কিত হয় নাই; ইহা রামঘড়ীর আকারে দীর্ঘতর হইবে। বর্ষে বর্ষে ১২ই কি ১৪ই নবেম্বর তারিখে পৃথিবী উক্ত উল্কাকক্ষা অতিক্রমণ করেন; তৎকালে উল্কাসংঘাত তথায় না থাকিতে পারে; ভ্রষ্টপথ অর্থাৎ এড়াটে যে কতকগুলি উল্কা ঐ তারিখে ঐ স্থানে বেড়াইতে থাকে, তাহারাই ধরা পড়ে; সেগুলি তারাবাজির মত ভূবায়ুতে নিপতিত হয়, এবং তাহাকেই আমরা নবেম্বর উল্কা বলিয়া থাকি।

পৃথিবী যখন উল্কাকক্ষা পার হন, তখন যদি উল্কাসমূহ তথায় থাকে, তবে তাহারা বায়ুজালে পতিত হয়; তাহাদের আর নড়ন চড়নের শক্তি থাকে না; এবং পৃথিবী প্রতি সেকেণ্ডে ১৮ মাইল বেগে ভ্রামিত হইয়া কতিপয় ঘণ্টার মধ্যে উল্কাকক্ষার ও দিকে বাহির হন,—খালুই-ভরা মাছ। যে উল্কা সকল বাঁচিয়া গেল, তাহারা এখন স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে লাগিল; এক এক ক্ষেপে যদি কোটি কোটি পড়ে, তবে শত সহস্র কোটি এড়াইয়া যায়। সংখ্যাই বা কত!

১১। ১৮৬৬ অব্দের ১৩ই। ১৪ইএর উল্কাবর্ষণ।—এই সময় পৃথিবী উল্কা-সংঘাত ভেদ করিয়া গমন করিয়াছিলেন। রজনী অতিশোভনা,—নিশ্চন্দ্রা, নিরভ্রা; উল্কার সংখ্যা নাই, ঔজ্জ্বল্যের পরিসীমা নাই। এ উল্কাবর্ষণ যদিও অনাদিষ্ট ছিল না, তথাপি তারাধারাবিস্ফারিত নভোগুল অচিরে যে

এরূপ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিবে, তাহা কাহারও মনে হয় নাই। সকলেই
নির্নিমেষ,—বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। রাত্রি ১০টা
হইতে (ইংলণ্ডে) একটি একটি, ছুটি ছুটি, তিনটি তিনটি, তারা খসিতে
লাগিল; ক্রমে আসারপাত; দক্ষিণে, বামে, মাথার উপর, যে দিকে চাও,
উল্‌কাবৃষ্টি! কিন্তু সকলই পূর্ব্বদিক হইতে আসিতেছিল; রজনী অতিবাহিত
হইতে লাগিল, ক্রমে পূর্ব্বক্ষিতিজে সিংহের উদয় হইল; তখন বুঝা গেল যে,
মঘা হইতে উল্‌কা সকল আসিতেছে।

১২। এই উল্‌কাবর্ষণের জন্মভূমি।—চিত্রে দেখ, এ বর্ষণের উল্‌কাগুলি
সিংহের অন্তর্গত বিন্দুবিশেষ হইতে বিনিষ্ক্রমণ করিতেছে। নিরীক্ষণ করি-

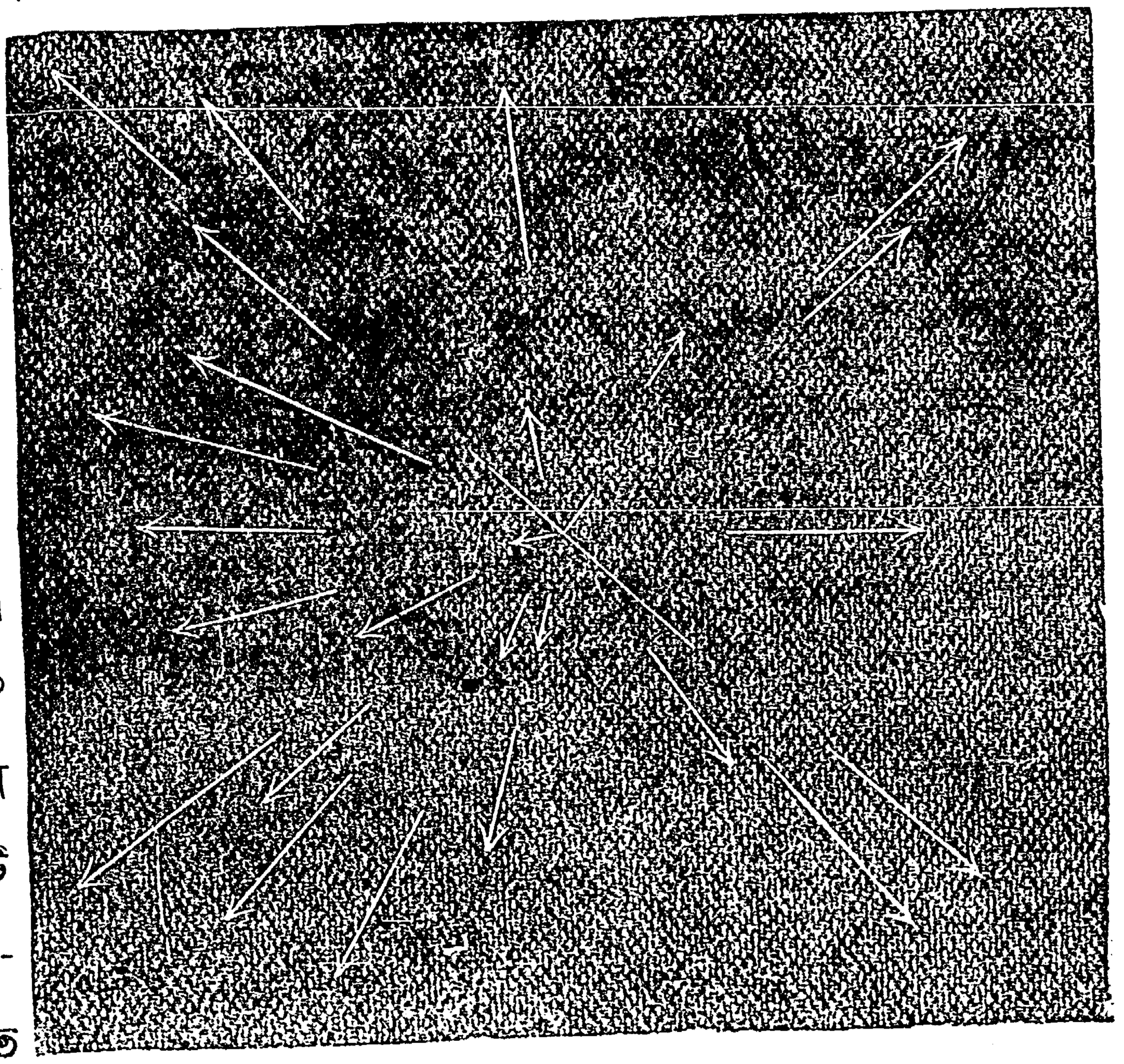

বার পূর্ব্বে জ্যোতিষী
গগনের যে প্রদেশ
হইতে উল্‌কা পড়ি-
তেছে, সেই প্রদেশের
একখানি চিত্র সংগ্রহ
করেন, এবং যে তারার
দিক হইতে উল্‌কা
পড়িল, সেই দিকে ঐ
খ-চিত্রে একটি লাইন
টানেন। এক একটি
করিয়া উল্‌কার পথ-
ব্যঞ্জক রেখাগুলি অঙ্কিত
হইলে দেখা যায় যে, উল্‌কাগুলি বিন্দুবিশেষ হইতে আইসে; যদিও অনেক
অনেক খধূপ দিগন্তর হইতে আইসে, তথাপি অধিকাংশকেই উক্তনিয়মপরতন্ত্র
দেখা যায়। আপাততঃ দেখিলেই বোধ হয়, যেন সত্য সত্য উল্‌কাসমূহ এক-
স্থানসম্ভূত; কিন্তু একটু ভাবিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, বাস্তবী গতি আর দৃষ্টা
গতিতে বিলক্ষণ ভেদ আছে। স্বস্তিক বিশেষ হইতে উল্‌কাপাত হইলেও
ভূতলের ভিন্ন ভিন্ন দেশস্থ দর্শকগণ ভূপঞ্জরের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে তাহাদের
সমাগমের নির্দ্দেশ করিতেন; কিন্তু বস্তুতঃ পৃথিবীর যেখান হইতে দেখ না
কেন, সকলেই বলিবে, এক স্থান হইতে তারা খসিতেছে। ফল কথা, এই
উল্‌কার গতি সমান্তর রেখায়; আমরা দেখিবার সময় মনে করি, সেগুলি

এক বিন্দু হইতে আসিতেছে, এবং আসিতে আসিতে তফাৎ হইয়া পড়িতেছে,
যেমন রেলওয়ের উপর দাঁড়াইয়া দেখিলে বোধ হইবে, দুই থান রেল ক্রমে
কাছাকাছি হইতেছে, এবং কিছু দূরে দুইখানি মিলিয়া একখানি হইয়া গিয়াছে।

১৩। সৈংহিকেয়।—উক্ত উল্‌কাবর্ষণ সৈংহিকেয় নামে অভিহিত; এ গুলি
সিংহরাশি হইতে আইসে; এই সৈংহিক সংঘাতের সুদীর্ঘ পর্য্যটনের অর্দ্ধা-
বশেষ হইয়াছে। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ইহারা রবি হইতে পরমান্তরে ছিল, অর্থাৎ অপহৈ-
লিক প্রাপ্ত হইয়াছিল। তদবধি পরিহেলিকে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। বর্ষে
বর্ষে পৃথিবী এই উল্‌কাকক্ষা পার হইতেছেন; বর্ষে বর্ষে সৈংহিকেরা সেই
সর্ব্বনেশে জায়গার দিকে সরিয়া আসিতেছে; ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে পোতাধান পৃথ্বী-
জালে পড়িয়া প্রাণে মরিবে। ১৮৯৯ বা তাহার পর বৎসর বা উভয় বর্ষে, পূর্ব্ববৎ
চমৎকার উল্‌কাসার বিকাশ পাইবার সম্ভাবনা। এমনও হইতে পারে, পোতা-
ধান পড়িবার পূর্ব্বে ভূজালিনীর বায়ুরূপ বেঁউতী তাহার সঙ্গে আড়া পার হইয়া
গিয়াছে, এ অবস্থায় এখন আর এক বৎসর তাহাদের কোন অনিষ্টশঙ্কা নাই।
পরন্তু যে উল্‌কাগুলি ঝাঁকের অগ্রে থাকে, তাহারা নিশ্চয়ই পরিত্রাণ পাইল;
কিন্তু যেগুলি পশ্চাৎভাগে থাকে, সেগুলি কোটিশঃ ব্যাপ্তমুখ বায়ু দ্বারা কব-
লিত হয়। আবার এমনও হইতে পারে যে, পোতাধানের উপর উপর্য্যুপরি
দুই বৎসর জাল পড়িতে পারে। প্রথম বৎসর পৃথিবী যদি উল্‌কাসংঘাতের
অগ্রভাগ দিয়া যায়, পর বৎসর পৃথিবী ৬০ কোটি মাইল ঘুরিয়া আসিয়াও ঐ
সংঘাতের শেষ অংশকে ধরিতে পারে,—উল্‌কাসংঘাত এতই লম্বা। উপরি
উপরি দুই বৎসর নবেম্বরে উল্‌কাবর্ষণের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়।

১৪। উল্‌কাসংঘাত ক্রমশঃ কক্ষাবৃত্তে ছড়াইয়া পড়ে।—প্রতি ৩৩ বৎসরে
কোটি কোটি উল্‌কা ভূবায়ুতে নিপতিত হইয়া ভস্মীভূত হইয়া যায়; অতএব
উল্‌কাসংখ্যার যে ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে, তাহার সন্দেহ নাই, এবং তন্নিবন্ধন
ভবিষ্যতে উল্‌কাবর্ষণের এবম্ভূত প্রভা ও শোভা থাকিবে না। ঔজ্জ্বল্যহানির
আরও একটি বিশিষ্ট কারণ আছে। উল্‌কাসংঘাতের আকার ক্রমশঃ পরি-
বর্ত্তিত হইতেছে। সংঘাতের প্রত্যেক উল্‌কা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কক্ষায় ভ্রমণ করে;
কক্ষা সকল অবশ্য সমান হইতে পারে না, সুতরাং ভগ্ন কালের বিভিন্নতা ঘটে।
একটি উল্‌কা যদি ৩৩ বৎসরে ঘুরে, তবে হয় ত আর একটিকে ঘুরিতে ৩৪
বৎসর লাগিবে। অতএব যদি কোন সময়ে সকলে একত্র হইয়া এক স্থান হইতে
ঘুরিতে আরম্ভ করে, তবে তাহাদের কক্ষার পরিমাণের ভেদ প্রযুক্ত অনেকে

অগ্র পশ্চাৎ হইয়া পড়িবে, সুতরাং কালক্রমে উল্‌কাসমূহ পথময় ছড়াইয়া পড়িবে, এবং নবেম্বরে আর সে উল্‌কাপাতের সে রকম ধূমধাম থাকিবে না।

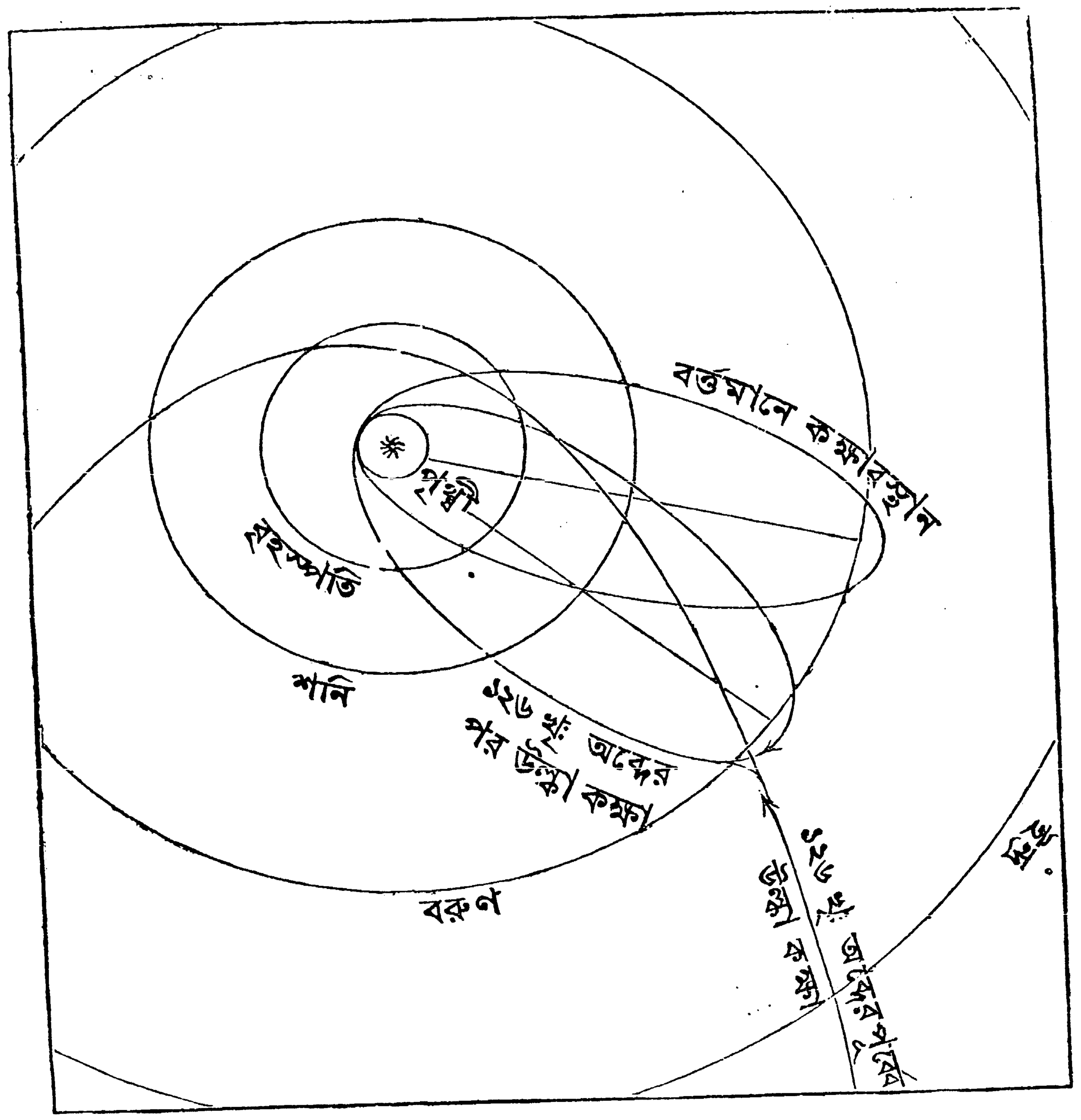

১৫। গ্রহদিগের আকর্ষণজনিত উল্‌কাকক্ষের পরিবর্ত্তন।—জ্যোতির্বিদেরা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, ধূমকেতু ও উল্‌কা, এই উভয়বিধ জ্যোতিষ্ক অনন্ত আকাশের সুদূর প্রদেশ হইতে ক্ষেপণি বৃত্তে পরিভ্রমণ করিতে করিতে সৌর জগতে উপনীত হয়, এবং এখানে আসিয়া গ্রহগণ কর্তৃক বিক্ষুব্ধ হইয়া পূর্ব্বপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অখণ্ড পটোলাকার মার্গে পরিভ্রমণ করিতে থাকে, সুতরাং সাবিত্র পরিবারের মধ্যে পরিগণিত হইয়া গ্রহধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। ১৪ই নবেম্বরের উল্‌কাসংঘাত যখন প্রথমতঃ ১২৬ খৃষ্টাব্দে আদিত্য-অধিকারে প্রবেশ করে, তখন উহাকে বরুণের অনতিদূর দিয়া যাইতে হইয়াছিল। এই বরুণসান্নিধ্যবশতঃ স্বল্পকায় তাণ্ডব্য উল্‌কাসমূহ আকৃষ্ট হইয়া পূর্ব্ব পথ ক্ষেপণী পরিত্যাগ করিয়া বৃত্তাভাসে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

১৬। সৈংহিকের গতি। প্রতি ভূভ্রমে উল্‌কাসংঘাত কেপ্‌লারের নিয়মাধীন হইয়া ঘুরিতে থাকে; তখন গতি অত্যন্ত মন্দ হয়, প্রতি সেকেণ্ডে এক মাইলের কিছু অধিক; ক্রমশঃ রবির যত নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, ততই বেগের বৃদ্ধি হইতে থাকে, এবং যখন ভূকক্ষায় উপনীত হয়, তখন বেগ এক সেকেণ্ডে ২৬ মাইল হয়; তখন পৃথিবীর গতি প্রায় উল্টা দিকে এবং এক সেকেণ্ডে ১৮ মাইল, সুতরাং এ সময়ে উল্‌কাসমূহ ভূবায়ু কর্ত্তৃক আহত হইলে, আহতির বেগ সেকণ্ডে প্রতি ৪৮ মাইল হয়। যদি সমাঘাত হইতে পরিত্রাণ পায়, তবে ভূয়ঃ অগ্রসর হইতে থাকে; এখান হইতে বেগ কমিতে থাকে, পরিশেষে ৩৩$\frac{১}{৪}$ বৎসরে চক্র সমাপ্তি করে।

১৭। সৈংহিকের দৈর্ঘ্য।—এই অসংখ্য উল্‌কাসংঘাত সুদীর্ঘধারাকারে বিন্যস্ত; এই ধারার বিততির তুলনায় বিস্তৃতি অকিঞ্চিৎকর। সাত ফুট পরিমিত বৃত্তাভাস অঙ্কিত করিলে দেড় ফুট বা দু' ফুট লম্বা সেলাই করিবার রেসমী সূতা উল্‌কাধারার অনুরূপ হইবে। সূতা গাছটি ঐ বৃত্তাভাসে আস্তে আস্তে চলিতে থাকে। যদি বলি যে, সূতা গাছটি লক্ষ মাইল চওড়া, তবে ভাবিয়া দেখ, সে গাছটি লম্বায় কত। লম্বারও একটা মোটামুটি এষ্টিমেট করা যাইতে পারে। সৈংহিকেরা যখন ভূকক্ষায় উপনীত হয়, তখন উহাদের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ২৬ মাইল। এই বেগে সমস্ত উল্‌কা ট্রেনকে ভূকক্ষা পার হইতে প্রায় দুই বৎসর লাগে। ১৮৬৬র ১৩ই। ১৪ই নবেম্বর তারিখের রজনীতে পৃথিবী এই উল্‌কাস্রোতের শীর্ষভাগে অবগাহন করিয়া পাঁচ ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত নিমজ্জিত ছিলেন, তাহার পর স্রোতের অপর পারে বাহির হইলেন। এখন পৃথিবীর গতি ধরিয়া হিসাব করিয়া দেখ যে, পাঁচ ঘণ্টায় পৃথিবী কত দূর চলিলেন। এই পাঁচ ঘণ্টার পথ উক্ত প্রবাহের চওড়া পরিমাণ।

১৮। উল্‌কার সহিত ধূমকেতুর সম্বন্ধ।—১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে এক ধূমকেতুর আবির্ভাব হয়। গণিতজ্ঞেরা অসকৃত বেধ দ্বারা ইহার কক্ষার আকার অবস্থান ও পরিমাণ নিরূপণ করিলেন। যখন দেখিলেন যে, এই কেতুকক্ষা আর সৈংহিকের কক্ষা সর্ব্বতোভাবে এক, তখন আর তাঁহাদের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। কক্ষাদ্বয় সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন,—ক্ষেত্র এক, অক্ষ এক, এবং অধিশ্রয়ণ এক; এই ত্রিবিধ সমতা দ্বারা সুপ্রতিপন্ন হইতেছে যে, ধূমকেতুতে আর উল্‌কাসংঘাতে কোন আন্তরিক গহন, অনির্ব্বচনীয়, ভৌতিক ব্যতিষঙ্গ থাকিতে পারে। পরন্ত এই সম্বন্ধে বাস্তবিক প্রকৃতি যে কি, তাহা অদ্যাপি অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে।

পারসিক নামা উপরাশি হইতে যে উল্‌কাবর্ষণ হয়, তাহাকে পারসিকেয় বলে। এই উল্‌কাবৃষ্টি প্রতিবর্ষে ৯ই, ১০ই, ১১ই আগষ্টে হয়। অতি যত্নপূর্ব্বক ইহাদিগের কক্ষা অবধারিত করিয়া আচার্য্যেরা দেখিয়াছেন যে, এ কক্ষাও ধূমকেতুবিশেষের কক্ষার সহিত একতা প্রাপ্ত হয়।

অন্তর্ম্মদা নাম্নী নক্ষত্রপুঞ্জ হইতে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ২৭ নবেম্বর তারিখে ভূরিপ্রমাণে উল্‌কাবর্ষণ হইয়াছিল। এই উল্‌কাসংঘাত আন্তর্ম্মদেয় নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এ স্থলে বিস্ময়ের কথা এই যে, যখন পৃথিবী বিওলার কেতুকক্ষা পার হইতেছিলেন, তখনই তাঁহাকে অন্তর্ম্মদেয়বর্গে উপনীত হইতে হইল। অনন্তর গণিত দ্বারা অবগতি হইল যে, বিওলার কক্ষা আর অন্তর্ম্মদেয়ের কক্ষা একই। এখন দেখা যাইতেছে যে, ধূমকেতুতে আর উল্‌কাতে যে একটা সবিশেষ সম্পর্ক আছে, তাহার আর কোন সংশয় নাই। অধিকন্তু, এই ধূমকেতু ১৭৭২এ দৃষ্ট হয়; পুনঃ ১৮০৫—৬এ; এখনও ইহার সপ্তবার্ষিক আগমন প্রকাশিত হয় নাই। পুনঃ ১৮২৬ বিএলা ইহাকে অবলোকন করিয়াছিলেন, এবং ১৮৩২ খৃষ্টাব্দেও দৃষ্ট হয়। ১৮৪৬ সালে এই ধূমকেতুকে দ্বিখণ্ড দেখিয়া জ্যোতিষিজগৎ বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং উহা ১৮৫২তেও যুগলরূপে দেখা দিয়াছিল। ১৮৫৯ অব্দে বিএলার কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয় নাই, এবং আদিষ্ট আগমনের কাল ১৮৬৫—৬৬তেও নয়নগোচর হয় নাই। আবার ১৮৭২এ যখন বিএলার পুনরাগমনের কাল উপস্থিত হইল, ঠিক তখনই আন্তর্ম্মদেয়গণ আসার-আকারে পতিত হইতে লাগিল। অতএব অনুমান এই যে, আন্তর্ম্মদেয়গণ হয় বিএলার দেহজ, নচেৎ তাহার সহিত তাহাদের গূঢ় সম্পর্ক আছে।

১৯। নির্ঘাত।—যদিও কখন কখন পতনকালে কোন কোন উল্‌কাকে খণ্ডীকৃত হইতে দেখা যায়, তথাপি কোনরূপ শব্দ কর্ণগোচর হয় না। সময়ে সময়ে অসাধারণ ঔজ্জ্বল্যবিশিষ্ট উল্‌কোদয়ের অব্যবহিত পরেই সশব্দ বিদারণ ব্যাপার শুনা যায়। এবম্ভূত উল্‌কাকে নির্ঘাত বলে। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ১৫ই নবেম্বরের প্রাতে নবজরসির দক্ষিণ ভাগ দিয়া এরূপ একটি উল্‌কা চলিয়া গিয়াছিল যে, অনভ্রাচ্ছাদিত মরীচিমণ্ডল বিদ্যমানেও উহার অপূর্ব্ব দীপ্তি দ্বারা অনেকের নেত্র আকৃষ্ট হইয়াছিল। দ্যুতিবিস্ফুরণের অবিলম্বে উপর্য্যুপরি ভয়ানক সশব্দ বিদারণ ব্যাপার ঘটিল। বোধ হইল, যেন সহস্র সহস্র কামান হইতে গোলা বিনির্গত হইতেছে। বহু স্থানে বহু ব্যক্তি এই অদ্ভুত ব্যাপার নেত্র ও শ্রোত্রগোচর করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মত গ্রহণ করিলে হারাহারি ফল এই

দাঁড়ায় যে, উল্‌কা যখন নেত্রগোচর হয়, তখন উহার উচ্ছ্রায় ৬০ মাইল এবং বজ্রবৎ নিদারুণ শব্দশ্রবণকালে উহার উচ্চ ২০ মাইল ছিল। উহার দৃশ্যমান পথের দৈর্ঘ্য ৪০ মাইলের অধিক, ইহার বেগ ভূসম্বন্ধে অন্ততঃ প্রতি সেকেণ্ডে ২০ মাইল, এবং সূর্য্য সম্বন্ধে ২৮ মাইল। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, উল্‌কাটি রবিপরীত; অত্যুৎকেন্দ্রিক বৃত্তাভাসে বা ক্ষেপণিতে বিচরণ করিতেছিল।

১৮৬০, ২রা আগষ্ট তারিখে সায়াহ্নে পিটরস্‌বর্গ হইতে নব অর্লিয়েন্স এবং চারলস্‌টন্ হইতে সেণ্টল্‌ইস্‌, এই চতুঃসীমাপরিচ্ছিন্ন সমস্ত প্রদেশে একটি দেদীপ্যমান বহ্নিবর্ত্তুল অবলোকিত হইয়াছিল। ইহার তিরোধানের কতিপয় মিনিট পরেই সুদূরস্থিত কামানের আওয়াজের ন্যায় গুরুগম্ভীর স্তনিত শুনিতে পাইয়াছিল। এই উল্‌কার দৃশ্যমান পথের দৈর্ঘ্য ২৪০ মাইল, অপক্রমকাল ৮ সেকেণ্ড; সুতরাং বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ৩০ মাইল, সূর্য্যসাপেক্ষ বেগবান ২৮ মাইল।

বিজ্ঞানবিষয়ক সাময়িক পত্রে নির্ঘাতসংখ্যা ৮০০এর অধিক দেখা যায়। অবির্ভাবকালে হারাহারি উচ্চতা ৯২ মাইল, তিরোভাবকালে ৩২ মাইল। গতির বেগ হারাহারি ১৯ মাইল।

বেগ, উচ্ছ্রায় ইত্যাদির তুলনা করিলে সাধারণ উল্‌কা হইতে নির্ঘাতের বিশেষ ভেদ লক্ষিত হয় না। আয়তনে এবং সান্দ্রত্বে কেবল বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। উল্‌কোদয়ের পরে যে শব্দ শুনা যায়, তাহা পতিষ্ণু উল্‌কার পশ্চাৎ শূন্যস্থানে বায়ুসন্নিপাতজনিত ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। সামান্য উল্‌কাপাতকালে শ্রোত্রগ্রাহ্য শব্দ হয় না; তাহার কারণ এ গুলি ক্ষুদ্র ও লঘু, এবং ভূপৃষ্ঠোপরি ৫০ মাইলের উপর আসিতে আসিতে দগ্ধীভূত হইয়া যায়।

এ স্থলে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, উক্ত উল্‌কাসারের সঙ্গে কোন কালে কোন পদার্থ ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে দেখা যায় নাই। কোটি কোটি সৈংহিকেয়, পারসিকেয় এবং আন্তর্ম্মদেয় পতিত হইয়াছে, কিন্তু কেহই বলিতে পারেন না যে, এই কণাটি অমুক উল্‌কার অঙ্গাংশ। আকাশ হইতে যেগুলি পড়ে, এবং যেগুলিকে আমরা নির্ঘাত বলি, সেগুলি উক্ত মহাসারসম্ভূত নহে; সাধারণ সাময়িক উল্‌কাবর্ষণ তাহাদিগের উৎপত্তির স্থল নহে।

২০। অশনি, অশনি-পাতে অবিশ্বাস।—আকাশ হইতে যে প্রস্তর বা লৌহবৎ ধাতুপিণ্ড নিপতিত হয়, তাহাকেই অশনি বলে। ব্যোমাশ্মপাতের কথায় পূর্ব্বপণ্ডিতেরা বড় শ্রদ্ধা করিতেন না। পুরাকালের অদ্ভুত উপলবর্ষণের

বিস্তর জনশ্রুতি থাকিলেও তাহাতে কেহ কর্ণপাত করিতেন না; এমন কি, শতবর্ষ পূর্ব্বে অশনিপাতের কথা কল্পিত উপন্যাস বলিয়া তত্ত্বজ্ঞেরা অগ্রাহ্য করিতেন। স্বচক্ষে দেখিয়াছি, অমুক স্থানে রহিয়াছে, ইহা তত্রত্য প্রস্তর হইতে বিসদৃশ, ইহা আপাততঃ পার্থিব খনিজ বলিয়া বোধ হয় না, ইহা দ্বারা আহত হইয়া অমুক অমুক মরিয়াছে, ইত্যাদি কোন কথাই গ্রাহ্য হইত না, কিছুতেই বিশ্বাস জন্মাইত না।

এরূপ অবিশ্বাসও নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়াও বোধ হয় না; কারণ, অশনিপাতের সংবাদ যাঁহারা প্রথমে প্রচার করেন, তাঁহারা প্রায়ই অজ্ঞ, অশিক্ষিত; তাহারা যথাযথরূপে বর্ণনা করিতে অক্ষম; একাকী বিজন বনে প্রদীপ্ত কালানল দেখিয়া, এবং অচিরে বিভীষণ বজ্রনিনাদ শুনিয়া, সহজেই অনেকেই হতজ্ঞান এবং হতচেতন হন, অশনির বর্ণনা করিবেন কি?

২১। অশনি-সংগ্রহ ও পরীক্ষা।—১৭৯৪ অব্দে জনৈক পর্য্যটক সাইবিরিয়া দেশে এক লৌহপিণ্ড আবিষ্কার করেন; এই লৌহপিণ্ড এবং তদ্বৎ আর কতিপয় খণ্ড দেখিয়া অনেকে বুঝিলেন যে, এ গুলি পার্থিব নহে, আকাশ-সম্ভব। কিন্তু উক্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠ পর্য্যটক বহুবিধ যুক্তি ও উপপত্তি দর্শাইলেও সার্ব্বজনিক অভ্যুপাগম লাভ হইল না। অনন্তর ইটালি, কাশী, ফ্রান্স ইত্যাদি নানা দিগ্দেশ হইতে ব্যোমাশ্ম আসিতে লাগিল, এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইল যে, বস্তুতঃ আকাশ হইতে প্রস্তর আদি পদার্থ পড়ে।

১৮০৭ ডিসেম্বর মাসে কনেক্টিকট্ প্রদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে একটি অত্যুজ্জ্বল উল্কাপাত হইয়াছিল; ইহা দৃষ্টির বহির্ভূত হইবার পরেই তিন বার তোপের ন্যায় গভীর বিদারণশব্দ শুনা গেল, এবং ঔল্কেয় উপলখণ্ড বর্ষণ হইল। যতগুলি খণ্ড পাওয়া গিয়াছিল, তাহাদের মোট ওজন ৩০০ পাউণ্ডের কম নহে। প্রস্তরের সাপেক্ষিক গুরুত্ব ৩·৬, ইহার অঙ্গোপকরণের মধ্যে অর্দ্ধাংশ সাইলেক, একের তিন অক্সাইড অব লৌহ, অবশিষ্ট বেশীর ভাগ মাগনেসিয়া।

১৮৬০ মে মাসে পূর্ব্ব ওহিও প্রদেশে একটা বোমাশ্ম ফুটিয়াছিল, এবং তাহাতে যে প্রস্তরবৃষ্টি হয়, তাহার ভারসমষ্টির আনুমানিক ৭০০ পাউণ্ড, সাপেক্ষিক গুরুত্ব ৩·৫৪ এবং অঙ্গোপকরণ ১৮০৭এর অশনির সদৃশ।

১৮৪৭ জুলাই মাসে বোহিমিয়াতে যে অশনি বিদীর্ণ হয়, তাহা হইতে দুই খণ্ড প্রস্তর পড়ে; ঐ দুই খণ্ডের মোট ওজন ৭২ পাউণ্ড; উহার সাপে-

ক্ষিক গুরুত্ব ৭·৭১ ইহার উপকরণ শতকরা ৯২ লৌহ, ৫ নিকেল, অবশিষ্ট কোবল্ট ইত্যাদি।

যে সকল পদার্থে ভূপৃষ্ঠ বিরচিত, সে সমুদায় অশনিমধ্যে দৃষ্ট হয়, কিন্তু পার্থিব খনিজে ভৌতিক পদার্থের সংশ্লেষণের ভাব, আর ব্যোমাশ্মে ভৌতিক পদার্থের সংশ্লেষণের ভাব পৃথকবিধ। অতএব খনিজ হইতে ব্যোমাশ্মকে অনায়াসে স্বতন্ত্র করা যাইতে পারে।

২২। অশনির উৎপত্তি।—অশনির উৎপত্তির মূল নিরূপণ করিবার জন্য অনেক মত উপন্যস্ত হইয়াছে। প্রত্যেক মতেই একটা না একটা দোষ দৃষ্ট হয়, সুতরাং অসমর্থনীয় হইয়া পড়ে; অতএব আপাততঃ কোন মত অবলম্বন করা কর্ত্তব্য? এ প্রশ্নের উত্তরে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, যে মত অত্যন্ত সম্ভবপর। বহুসংখ্যক ও বহুবিধ অশনি পরীক্ষা করিয়া খনিজজ্ঞেরা অবধারিত করিয়াছেন যে, অশনি সকল জ্বালামুখসম্ভূত। স্বীকার করা গেল, ব্যোমাশ্ম বহ্নিগিরিবিনির্গত; কিন্তু সে গিরি বা গিরি সকল জগতের কোথা কোন গ্রহে বা উপগ্রহে? এ প্রশ্নের উত্তর গণিতজ্ঞ দেউন,—দেখুন সম্ভবতুলা কোন দিকে ঝোঁকে।

২৩। জ্বালামুখবিনির্গত পদার্থ মাধ্যাকর্ষণের ফল।—মনে কর, মঙ্গলাদি কোন গ্রহের আগ্নেয় গিরি হইতে ভীষণ বেগে প্রস্তরাদি উদ্গীর্ণ হইতে লাগিল; সেগুলি উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল, কিন্তু গ্রহও সেগুলিকে টানিতে আরম্ভ করিলেন, আগ্নেয়োদ্গার কতদূর যাইবে?—ফিরিল, গ্রহতলে পড়িল। মনে কর, প্রস্তরাদি প্রচণ্ডতর বেগে বাহির হইতে লাগিল, খুব উচ্চতে উঠিল; এমন কি, গ্রহের ব্যাসার্দ্ধের সমান উচ্চতা প্রাপ্ত হইল; এখন কাজেই গ্রহের আকর্ষণ কমিয়া গেল, সিকি হইয়া পড়িল, * গ্রহ এখন আর সেগুলিকে সহজে ফিরাইতে পারেন না। ফের ধর, দগ্ধপিণ্ডগুলি এত বেগে উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল যে, গ্রহের ব্যাসার্দ্ধের দশগুণ উর্দ্ধে উঠিয়া পড়িল, এখন আর মাধ্যাকর্ষণের জোর খাটে না; পিণ্ড সকল উপরেই রহিয়া গেল। কিন্তু এত দূর উঠিতে হইলে জ্বালামুখ হইতে বিনির্গমনকালে প্রস্তর আদির বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ৬।৭ মাইল হওয়া চাহি। এত বেগ কোথায় পাইবে? উদ্গীর্ণ পদার্থের বেগ দু'মাইলের অধিকও দেখা যায় নাই। এখন জ্যোতিষ্ক ছাড়িয়া যাই কোথা?

২৪। অশনি সকল কি চন্দ্রসম্ভব?—পৃথিবী অপেক্ষা চন্দ্রের সামগ্রী অত্যন্ত

* কারণ আকর্ষণ দূরত্বের বর্গের বিলোমানুপাতী।

কম, ৮০ চাঁদকে এক পিণ্ডে পরিণত করিলে পৃথিবীর সামগ্রীর সমান হইবে; অতএব চন্দ্র খুব হাল্‌কা। সুতরাং, তাঁহার আকর্ষণশক্তিও তদনুসারে কম। পৃথিবী হইতে কোন জিনিস ছুঁড়িয়া দিলে আর পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবে না, এমন ভাবিয়া কোন জিনিস ছুঁড়িতে হইলে যে বেগের প্রয়োজন হয়, চন্দ্রমণ্ডল হইতে তদভিপ্রায়ে কোনও পদার্থ নিক্ষেপ করিতে হইলে অনেক কম বলেই তাহা সম্পন্ন হইতে পারে; পরন্তু এবম্ভূত উৎক্ষেপণের বেগ ঠিক সামগ্রীর অনুপাতী নহে; এরূপ বেগ সামগ্রীর অনুপাতী, এবং ব্যাসার্দ্ধের বর্গমূলের বিলোমানুপাতী। হিসাব করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, পৃথিবী হইতে কোন জিনিসকে চিরকালের জন্য বিদায় করিতে হইলে উহাকে যে জোরে ছুঁড়িতে হয়, সে জোরের ষষ্ঠাংশ হইলেই চন্দ্রমণ্ডল হইতে তদর্থে প্রস্তর আদি নিক্ষেপ করা যাইতে পারে। চন্দ্রমণ্ডলে মাইল-মিত-বলবিশিষ্ট জ্বালামুখ থাকিলে, সেই গুলিকেই অশনিপ্রসূ বলা যাইতে পারে। যে আগ্নেয় গিরি হইতে প্রস্তরাদি বিনির্গত হইয়া এক সেকেণ্ড মধ্যে এক মাইল উর্দ্ধে যাইতে পারে, তাহাকে মাইল-মিত-বল বিশেষণ দেওয়া যায়। চন্দ্রমণ্ডলে প্রচণ্ড জ্বালামুখের উপদ্রবসূচক বহুবিধ লক্ষণ লক্ষিত হয়। সেখানে জ্বালামুখের প্রকাণ্ড গহ্বর দেখিয়া অনুমিত হয় যে, সেগুলি পুরাকালে প্রবল অগ্ন্যুদ্গীরণের স্থান ছিল। বোধ হয়, সমস্ত চন্দ্রমণ্ডলেই বহ্নিশৈল ছিল। চন্দ্রমণ্ডলবিনির্গত প্রস্তরাদি ভূতলে পতিত হইতে পারে, তাহার সন্দেহ নাই, এবং দু'দশটা সত্য সত্য পড়িয়া থাকিবার সম্ভাবনা। কিন্তু চন্দ্রের জ্বালামুখ সম্বন্ধে একটা বিষম আপত্তি আছে। মনে কর, চন্দ্রমণ্ডল হইতে একখণ্ড উপল বিনির্গত হইল; উহা কেপলারের নিয়ম অনুসারে পৃথিবী দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ভূপরিত পরিভ্রমণ করিতে থাকিবে। এখন যদি অন্যান্য জ্যোতিষ্কের আকর্ষণ ছাড়িয়া দাও, যদি স্বয়ং চন্দ্রের আকর্ষণও ছাড়িয়া দাও, তবে বিনিষ্ক্রান্ত পিণ্ড যদি একবার পৃথিবীকে এড়াইয়া যায়, তবে আর কস্মিনকালেও ভূপৃষ্ঠে পড়িবে না। প্রক্ষিপ্তের কক্ষ আর ভূগর্ভ, এতদুভয়ের ব্যবধান ভূব্যাসার্দ্ধের কম না হইলে উক্ত প্রক্ষিপ্ত ভূতলে পড়িবে না। অতএব উপপন্ন হইল যে, চন্দ্রমণ্ডলবিনিষ্ক্রান্ত অশনি যদি ভূমণ্ডলে নিপতিত হয়, তবে উহাকে চন্দ্র হইতে বহির্গত হইয়া প্রথমবার ঘুরিতেই পৃথিবীতে আসিয়া পড়িতে হইবে। উল্‌কাসম্বন্ধে চন্দ্র হইতে ভূমণ্ডল বেশী দিনের পথ নহে। অতএব যখন এখনও অশনিপাত হইতেছে, তবে সেগুলি চন্দ্র হইতে অনবরত আসিতেছে। কিন্তু চন্দ্রাদ্রিসমূহ

এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত হইয়াছে; সেখান হইতে পাথর কি লোহা আর বাহির হইয়া আইসে না। যদি বল যে, ব্যোমাশ্ম সকল কোন কালে চন্দ্রমণ্ডল হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল; যদি তাহাই ধর, তবে সে বহু বর্ষের ব্যাপার; তদনন্তর তাহারা অবশ্য বৃহত্তর জ্যোতিষ্ক পৃথ্বী বা সূর্য্য পরিত; অবশ্যই ভ্রামিত থাকিবে, অর্থাৎ ব্যোমাশ্মের উৎপত্তিস্থান যাহাই থাকুক না কেন, সেগুলিকে এক্ষণে পৃথিবীর বা সূর্য্যের উপগ্রহ বা সহচরস্বরূপ ধরিতে হইবে। এক্ষণে অগত্যা চন্দ্রমণ্ডল পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশনির জন্মভূমির অনুসন্ধানে লোকান্তরে যাইতে হইল।

২৫। ক্ষুদ্র গ্রহগণ হইতে অশনিপাত হয় কি?—তারা গ্রহগণের বিম্ব ভাল দেখা যায় না, তথায় জ্বালামুখ আছে কি ছিল, তাহা বলা যায় না; পরন্তু খেটমাত্রেই প্রচুর তাপের অস্তিত্ব দেখিয়া নিশ্চয় বোধ হয়, তথায় কোন না কোন রকম আগ্নেয়গিরির কার্য্য থাকিতে পারে। বৃহদ্‌বিগ্রহ গুরু শনিকে একেবারে ছাড়া যাইতে পারে; তথায় আগ্নেয় গিরির কোন লক্ষণ নাই; অধিকন্তু এতদ্দ্বয়ের সামগ্রীমান অত্যধিক, অতএব তাহাদের আকর্ষণ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া কোন বস্তু যদি তথা হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইতে পারে, তবে তাহার বেগ কত ভয়ানক! পার্থিব জ্বালামুখ হইতে বার্হস্পত্য জ্বালামুখ ৫।৬ গুণে প্রবল না হইলে তথা হইতে অশনিপাত সম্ভবে না।

এখন দেখিতে হইবে, অশনি উৎপাদনে ক্ষুদ্র গ্রহগণের কোন অধিকার আছে কি না। এগুলি অতি ক্ষুদ্রকায়; ইহাদিগের ব্যাস কতিপয় মাইল মাত্র, তথা হইতে যৎসামান্য বেগে কোন পদার্থ ছুঁড়িয়া দিলে বহুদূরে গিয়া পড়িতে পারে। ২০ মাইল ব্যাস পরিমিত গ্রহে ফুট বলে হিসাব মাফিক ঠোকর দিলে সে বল জন্মের মত চলে যায়। ক্রিকেট খেলিরা বলের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকে, বল হয় ত আকাশে উঠিয়া সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে স্বচ্ছন্দে ঘুরিতে লাগিল। তবেই অশনিনিক্ষেপণে ক্ষুদ্রগ্রহস্থিত জ্বালামুখের প্রচুর শক্তি থাকার সম্ভাবনা আছে, এবং সে অশনি বহুদূর পর্য্যটন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইতে পারে। কিন্তু কিঞ্চিৎ অবহিত হইয়া দেখিলে ব্যাপারটি তত সহজ বোধ হইবে না। মনে কর, অত্যঙ্গারক অন্তরীক্ষে শিরিস্ নামক ক্ষুদ্র গ্রহে একটি জ্বালামুখ আছে; তাহা হইতে অশনি উদ্গীর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইতে হইলে, অশনির ক্রান্তিবৃত্তের উপর দিয়া বা নীচে দিয়া চলা হইবে না; উহাকে ৮০০০ মাইল ভূব্যাস পরিমিত অবিস্তৃত বলয়াকার

যে পৃথিবীর পথ দিয়া যাইতে হইবে, এবং উহার পতনকালে যদি পৃথিবী কক্ষার সেই স্থানে থাকেন, তাহা হইলেই হইল; নচেৎ উহা রবিপরিত সূচিচ্ছেদে আরোহণ করিতে থাকিবে, এবং অবরোহণকালে উল্লিখিত সংকীর্ণ বলয়াকার স্থানে ক্রান্তিবৃত্ত অতিক্রম করিবে। শিরিসের কক্ষাগতির বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ১১ মাইল। আগ্নেয় বেগ এবং কাক্ষ বেগ, এই উভয়ের সংশ্লিষ্ট যে বেগফল, তাহাই উৎক্ষিপ্তের বাস্তব বেগ। গণিতজ্ঞরা উপপন্ন করিয়াছেন যে, শিরিস্ হইতে উৎক্ষিপ্ত পদার্থের স্পর্শরৈখিক বেগ ৮ মাইলে না হইলে উহা ভূকক্ষা ভেদ করিয়া যাইতে পারে না, অর্থাৎ শিরিসের বেগ অত্যন্ত; ৩ মাইল কমাইতে হইবে। তবেই বহ্নিগিরিবিনির্গত পদার্থের বেগ ন্যূনকল্পে ৩ মাইল হওয়া চাই। অতএব তিন মাইলের কম বেগ পাওয়া গেল না। তবেই ক্ষুদ্র গ্রহ হইতে কোন লাভও দেখা গেল না। আর পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পৃথিবীর পথ অতিসংকীর্ণ; সুদূরস্থিত শিরিস হইতে কোন উৎক্ষিপ্ত আসিয়া উহার ভিতর দিয়া ভূপৃষ্ঠে পড়ার সম্ভাবনা বড় কম। ৮ মাইলের কম বেগ হইলে উৎক্ষিপ্ত ভূতলে পৌঁছিবে না। ১৬ মাইল হইলে ভাভ্রমরেখায় চলিয়া যাইবে। হারাহারি বেগ ১২ মাইল ধরিলে উৎক্ষিপ্ত যে ভূমার্গ দিয়া যাইবে, তাহারও সম্ভাবনা বড় কম। পণ্ডিতেরা বলেন যে, শিরিস্ হইতে ৫০ হাজার ঢেলা ছুড়িলে জোর একটা ঢেলা পৃথিবীর গায়ে লাগিতে পারে। ইহাতেই বুঝা গেল যে, ক্ষুদ্র গ্রহ হইতে অশনি আসে না; কারণ, ক্ষুদ্র গ্রহে এত প্রবল জ্বালামুখ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয়তঃ, একটা অশনিকে পৃথিবীতে আসিতে হইলে ৫০ হাজারকে বাহির হইতে হইবে। এখন খুঁজিতে বাকি পৃথিবী।

২৬। তবে পৃথিবীই কি অশনির জননী?—পৃথিবীতে এখন যে সকল আগ্নেয় গিরি আছে, সে সকল নির্ব্বাপিতপ্রায়; তাহাদের আর অশনি-উদ্গীরণের শক্তি নাই। কিন্তু পূর্ব্বকালে ভূস্তররচনাকালে পর্থিব আগ্নেয় পর্ব্বত সকল প্রভূত শক্তিসম্পন্ন ছিল, তাহার সন্দেহ নাই; তথাপি অশনির পৃথিবীতে উৎপত্তি আর পৃথিবীতে নিবৃত্তি বড় সোজা কথা নহে। অশনির উৎপত্তিস্থান তো আছে, সে স্থান যে কোথা, তাহারই ঠিকানা পাওয়া যাইতেছে না। যে স্থানটি খুব সম্ভবপর, তাহাই আপাততঃ গ্রহণ করিতে হইবে। মনে কর, অতি প্রাচীন-কালে,—কল্পারম্ভে, আগ্নেয়গিরি হইতে প্রচণ্ডবেগে প্রস্তরাদি উদ্গীর্ণ হইয়া পৃথিবীর আকর্ষণকে অতিক্রম পূর্ব্বক সৌরাকর্ষণের অধিকারে পতিত হইল। এখন অগত্যা ইহাকে গ্রহবৎ সূর্য্যের চারি দিকে ঘুরিতে হইল। এই উৎক্ষিপ্ত

সকল নানাবিধ কক্ষে ভ্রমণ করিতে পারে; তন্মধ্যে যেগুলি বৃত্তাভাসে চলে, সেগুলিকে প্রতি ভভ্রমে পৃথিবীর পথের যে স্থান হইতে আসিয়াছিল, সেই স্থান দিয়া যাইতে হয়। এ সম্বন্ধে পৃথিবী আর শিরিষে অনেক প্রভেদ। শিরিষ-বিনির্গত ৫০ হাজার উৎক্ষিপ্তের মধ্যে একটা ভূতলে পড়িতে পারে, পৃথ্বী-বিনির্গত প্রত্যেক উৎক্ষিপ্ত পৃথিবীতে পড়িতে পারে। এ মত যদি গ্রাহ্য হয়, তবে অসংখ্য অশনি বৃত্তাভাস কক্ষে রবিপরিত ভ্রমণ করিতেছে। ইহাদিগের কক্ষা অবশ্য পৃথিবীর পথ কাটিয়া যায়। পৃথিবী যখন এই স্থানে উপনীত হন, তখন যদি অশনি সকল ঐ পথ অতিক্রম করিতে থাকে, তবে দীর্ঘ প্রবাসের পর জন্মভূমিতে প্রত্যাগমন করে!

অশনির উৎপত্তিসম্বন্ধে, চান্দ্র-বাদ অপেক্ষা ভৌমবাদ সম্ভাব্যতর। চান্দ্রবাদে চন্দ্রমণ্ডলে অদ্যাপি প্রজ্জ্বলিত আগ্নেয়গিরির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, ভৌমবাদে অতীতকালে পার্থিব আগ্নেয়গিরি পর্য্যাপ্তশক্তিসম্পন্ন ছিল বলিলেই চলে। আমাদের জ্বালামুখ হইতে এখনও প্রস্তরাদি উদ্গীর্ণ হইয়া ভাবী অশনি প্রস্তুত হইতেছে, এ কথা অবশ্য কেহ বলেন না; কিন্তু এখান হইতে যেগুলি প্রয়াণ করিয়াছিল, সেগুলি যে ফের পৃথিবীতে পড়িতেছে, এ কথা অসঙ্গত বোধ হয় না। অতএব এই সিদ্ধান্ত হইল যে, যদি অশনিসমূহ তারাগ্রহসদৃশ কোন বিশালজ্যোতিষ্কস্থিত জ্বালামুখসম্ভব বলিয়া স্বীকার কর, তবে সে জ্যোতিষ্ক এই বসুন্ধরা।

২৭। ভৌমবাদ-সমর্থক বৃত্তান্ত।—অশনি সকল যে অতি প্রাচীন কালে ভূতলেই জন্মিয়াছিল, তাহা তাহাদের অঙ্গীভূত পদার্থনিচয়ের লক্ষণ দেখিয়া সম্ভব বোধ হয়। অশনিপিণ্ডের সবিশেষ লাক্ষণিক পদার্থ লৌহ আর নিকেলের মিশ্রণ, ইহা ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র বিদ্যমান। অশনিবিশেষে প্রায় উক্ত মিশ্রণমাত্র দৃষ্ট হয়; কোন কোন স্থলে সমস্ত পিণ্ড লৌহ-নিকলের কণাময়। কোন ভূতত্ত্ববিদ্ গ্রীনলণ্ডে এক খণ্ড প্রাকৃত লৌহে নিকেল পাইয়া তৎক্ষণাৎ উহার আকাশ-সম্ভবত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। সূক্ষ্ম পরীক্ষার পর প্রকাশ পায় যে, এই অশনি বাসল্ট নামক পাথরে শায়িত। বাসল্ট শ্যামনীলিম কঠোর অকর্ম্ম্য শিলাবিশেষ, ইহা ভাঙ্গিয়া রাস্তার খোয়া হয়। এই বাসল্ট জ্বালামুখ হইতে প্রথম উদ্গারিত হয়, এবং ইহার অর্দ্ধতরলাবস্থা থাকিতে থাকিতে উহার উপর লৌহোদ্গার আসিয়া পড়ে। বাসল্টে প্রাকৃতিক লৌহ অন্যান্য স্থানেও পাওয়া গিয়াছে।

দেখা গেল যে, বড় বড় নিরেট অশনি দেখিয়া তাহাদের ভূসম্ভবত্বের

প্রমাণ পাওয়া যায়। সামান্ত উল্‌কা সকল ভস্মীভূত হওয়ার পর, ধীরে ধীরে রজোবর্ষণেরও সম্ভাবনা। সুমেরু প্রদেশের তুষারে রেণুচিহ্ন দৃষ্ট হয়, এবং সেই রেণুতে লৌহাণু পাওয়া যায়। সূর্য্যকিরণে যে ধূলিকণা দেখি, গ্রহসামগ্রী হইতে যে ধূলা ঝাড়ি, সে সকল আশ্‌মানী বলিলেও বলিতে পার। সাগরগর্ভ হইতে উদ্ধৃত পঙ্কে লৌহের চিহ্ন পাওয়া যায়; এ লৌহের গুঁড়া অবশ্য আকাশ হইতে পড়িয়া থাকিবে। এখন আকাশ হইতে কেবল ধূলা পড়িতেছে; পৃথিবী হইতে কণামাত্রও যাইতেছে না; অনিবার্য্য ফল এই হইতেছে যে, অল্পে অল্পে ক্রমে ক্রমে পৃথ্বী পৃথুতরা হইতেছেন।

কতিপয় পারিভাষিক শব্দের ইংরাজি।

অত্যঙ্গারক,	Beyond orbit of Mars.	চক্র সমাপ্তি করে	Completes circuit.
অত্যুৎকেন্দ্রিক,	Of great eccentricity.	চান্দ্রবাদ,	Lunar theory.
অনাদিষ্ট,	Not predicted.	জ্বালামুখ,	Volcano.
অনুপাতী,	Proportioned.	তাপবাদ,	Theory of heat.
অস্তমর্দা,	Andromeda.	দগ্ধদশান্ত,	Burnt end of wick.
অপক্রমকাল,	Duration.	নন্দনকানন,	ইন্দ্রের কানন।
অপহৈলিক,	Aphelion.	নির্ঘাত	Detonating Meteors.
আগ্নেয়,	Volcanic.	নির্ব্বাপিত,	Extinguished.
আদিষ্ট,	Predicted.	পরিহৈলিক,	Perihelion.
আস্তমর্দেয়,	Pertaining to Andromeda	পারসিক,	Per.
আসার,	Shower.	বাসণ্ট,	Basalt.
ইন্দ্র,	Neptune.	বিএলা	Biela.
উৎক্ষিপ্ত,	Thrown up, Projectile.	বরুণ,	Uranus.
উৎক্ষেপন,	Throwing up.	বহির্বর্ত্তুল,	Tirecall.
উদ্গারিত,	Vomitting.	বিততি,	Extension.
উল্কা,	Shooting stars.	বেগ,	Velocity.
একশঃ,	One by one,	বৈজয়ন্ত,	ইন্দ্রালয়।
কক্ষা,	Orbit.	ব্যোমাশ্ম,	Meteor.
ওলিফক,	Olifak.	ভভ্রম,	Revolution.
ক্ষুদ্র গ্রহগণ,	Minor planets.	ভাভ্রমরেখা,	Hyperbola.
ক্ষেত্র,	Field.	ভূবায়ু,	Atmosphere.
ক্ষেপণী,	Parabola.	ভৌমবাদ,	Terrestrial Theory.
ক্ষোদিষ্ট,	Smallest.	মঘা,	Regulus.
খধূপ,	Shooting stars.	রামখড়ী,	যে পটোলাকার খড়ীতে ছেলেরা ক খ লেখে।
খেট,	Planets.		
জ্বালামুখের গহ্বর	Crater.	শিরিষ	Ceres.
		সৈংহিকেয়,	Leonides.

কবিতাকুঞ্জ।

প্রেম কি বুঝান যায়?

১

প্রেম কি বুঝান যায়?
নয়নে নয়নে না বুঝিল যদি,
কেমনে বুঝাব তায়?
সে ত চলে যায়, ফিরিয়া না চায়,
আমি শুধু চেয়ে থাকি—
বুঝিতে চাহিলে সকলি বুঝিত,
আঁখিতে মিলিত আঁখি।
বহে যেত দিন কোন পথ দিয়ে,
নয়নে নয়ন মিলি—
পলক পড়ে না, জগৎ নড়ে না,
ত্রিসংসার নিরিবিলি!

২

প্রেম কি বুঝান যায়?
নিশাসে নিশাসে বুক ভেঙে আসে,
কেমনে বুঝাব তায়?
দাঁড়াইলে কাছে দুরু দুরু হিয়া,
গুরু গুরু গরজন—
বুঝিতে চাহিলে সকলি বুঝিত,
দেহে মনে সেই রণ!
মিলিত নিশাস, সুবাসে সুবাস,
সুরেতে মিলিত সুর—
পড়ে র'তো দেহ ভেসে যেত প্রাণ
কোন আকাশের দূর!

৩

প্রেম কি বুঝান যায়?
আভাসে বিশ্বাসে যদি না বুঝিল,
কেমনে বুঝাব তায়?
বলি বলি করি, কাছে কাছে ঘুরি,
সে যদি ডাকিয়া কয়!
মালাগাছি ল'য়ে দাঁড়াইয়া থাকি,
সে যদি চাহিয়া লয়!
শিথিল অঞ্চল সরমে সম্বরি
কত না যতন করি!—
বুঝিতে চাহিলে সকলি বুঝিত
কাঁদিত আঁচল ধরি!

৪

প্রেম কি বুঝান যায়?
কথায় কথায় মরম-ব্যথায়
কেমনে বুঝাব তায়!
কোথা তার আদি, কোথা তার শেষ,
কত আঁখিজল-মাখা!
একে সদা হায় আন বুঝে যায়,
এত লাজ-ভয়-ঢাকা!
বলি যেন কত, মুখখানি নত,
কাঁপে সুধু ঠোঁট দুটি—
বুঝিতে চাহিলে সকলি বুঝিত,
হৃদয়ে পড়িত লুটি!
প্রাণ পেত ভাষা ভাষা পেত আশা
পরকাল ইহকালে—
২।৮ হৃদয়ের একটি আঘাত
বাজিত সমান তালে!

৫

প্রেম কি বুঝান যায়?
না দেখে দেখুক, না বুঝে বুঝুক,
সুখ দুখ সেই পায়।
কোথা রবি ওঠে, কোথা ফুল ফোটে,
ছোটে কেন পরিমল!
দেবতা আকাশে, ঋষি বনবাসে,
মাঝে কেন আঁখিজল!
পরবাসে পতি, কেন মরে সতী?—
'মতি গতি সেই পায়।
আপন মরণে আপনি বরিয়া
কেমনে বুঝাব তায়!

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

বাঁশী।

কবে তুমি বেজেছিলে বিশ্ববৃন্দাবনে
হে বিশ্ববেদনাভরা বাঁশী? কালিন্দীর
কালো বুকে, সে দিন কি তরঙ্গ অধীর
প্রথম পড়িল লুটি' তটের চরণে?
রোমাঞ্চ কি দিল দেখা প্রেমের স্বপনে
কদম্বকুসুম-রূপে শুষ্ক বনানীর?

সুনীল অঞ্চলে ধরা ঢাকি' অশ্রুনীর
ফেলিল কি গুপ্তশ্বাস সুপ্ত সমীরণে?
কিশোরী সে ধরিত্রীর কোমলহৃদয়ে
প্রথম সে পূর্ব্বরাগ, কি অন্ধ আগ্রহে
কি গূঢ় সৌরভভরে উঠেছিল জাগি?
কি উচ্ছ্বাসে মরমের গোপন নিলয়ে
কেঁদেছিল আদিমাতা সর্ব্বস্ব তেয়াগি
অপূর্ব্ব সুন্দর লাগি' অপূর্ব্ব বিরহে?

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

কুহু।

গৌর সারং—ঝাঁপতাল।

কি জানি কেন কোয়েলা গায় এত মধুর গানে!
ও কুহু কুহু, কুহুর তান শিখিল কোন্‌খানে!
কত যে নব মিলনকথা, কত দীর্ঘ বিরহব্যথা,
লুকানো ঐ কুহু কুহু কুহু কুহু কুহুর তানে।
বলে সে বুঝি "এসেছি আমি ওগো
এসেছি আমি,

বিশ্বভরা অমিয় লয়ে স্বর্গ হ'তে নামি,
সঙ্গে লয়ে শ্যামল ধরা, পুষ্পিত সুগন্ধভরা,
সঙ্গে লয়ে মলয়মধু তব সন্নিধানে।"
মধুরতর মিলনগাথা গেয়েছে কবি শত;
গায়নি কেহ বিরহগান পাখী রে তোর মত।
—ক অনুরাগ, কি অনুনয়, কত বাসনা-
বেদনাময়,—
ও কুহু তাই আকুল করে বিরহিজনপ্রাণে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

গান।

এস হে এস হে প্রাণে প্রাণসখা!
আঁখি তৃষিত অতি, আঁখি-রঞ্জন,
আঁখি ভরিয়া মোরে দেহ দেখা।

খুলিয়া প্রাণের আধ লাজ-বসন,
জীবনমন্দিরে পেতেছি আসন,
বস হে বিরহক্লেশনাশন,
কণ্ঠে লহ মম মালিকা।

উন্মাদ এ তরঙ্গ, উথলিছে ভীষণ ভঙ্গ,
ঘোর তিমির ঘেরি দশ দিক,
এস হে নবীন নাবিক!

সুখ-তরণী মাঝে নাহিক কাণ্ডারী
প্রেম-পারাবারে আমি একা।

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন।

মরণের পথে।

মনোরথ-রাণি মোর হে বরসুন্দরি,
একি স্রোতে কেন তুমি ভাসাইলে তরি!
আমি যবে ভেসেছিনু মরণ-সাগরে
তুমি কেন দেখা দিলে নয়নের পরে!
ঘন মেঘে ঢাকা পথ, চিকুর চমকে,
দূরে কাছে কোথা কিছু নাহি পড়ে চোখে—
অস্তমিত দিনমণি আঁধারের মাঝে
তুমি কেন প্রকাশিলে ইন্দ্রধনু সাজে!
পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে সলিলে সৈকতে
যাত্রা অবসানপ্রায় মরণের পথে
লাবণ্য ফুটালে কেন দুই কূল ভরি'!—
বড় সাধে তাই আমি ফিরাইনু তরি!

ছবি-আঁকা সেই গ্রাম, সেই নদীতীর,
লতিকামণ্ডপচ্ছায়ে সেই সে কুটীর,
বাঁধা ঘাট, খেয়া তরি, সেই লোকজন,
পরিত্যক্ত আমার সে প্রিয় নিকেতন—
ভিজায়েছি যারে বিদায়ের অশ্রু দিয়া—
স্বপ্নসম একে একে গেল গো ভাসিয়া!
বাঁশরীর রবে মুগ্ধ কুরঙ্গের প্রায়
নাহি রাত্রি নাহি দিন আমি শুধু হায়,
সুদিন দুর্দ্দিনে চির আশ্রয়বিহীন
ছায়ার মতন তব স্বপনেতে লীন
ফিরিয়াছি অনিশ্চিত কূল হ'তে কূলে—
যদি চাহ একবার দুটি আঁখি তুলে!
মনোরথ-রাণি মোর হে বরসুন্দরি,
একি স্রোতে কেন তুমি ভাসাইলে তরি!

পূর্ণিমা রজনী, নিস্তরঙ্গ নদীনীর,
বিশ্বকূলে কূলে বহে সমীরণ ধীর,

প্রস্তরসোপান পরে শিবের মন্দির—
যেন কোন্ মায়াপুরে নন্দনের বনে
ভাসিয়া এসেছি স্রোতে মোরা দুই জনে!—
মন্দ বহে তরি, ধরণী চমৎকার,
সৌন্দর্য্য মাঝারে তুমি সুন্দরী অপার—
ঈষৎ হেলায়ে তনু এলাইয়া কেশ,
চারু অঙ্গে সম্বরিয়া নীলাম্বরী বেশ—
মৃণাল বাহুর পরে কমল-আনন
মোহন মুরতি মাঝে মদির নয়ন—
মন প্রাণ যাহা ছিল করিলে হরণ!
ব্যাকুল অন্তরে চিরপিপাসিত-হিয়া
মন্ত্রমুগ্ধ আমি শুধু রহিনু চাহিয়া!—
কখন্ কাটিয়া গেল সুখবিভাবরী!
মনোরথ-রাণি মোর হে বরসুন্দরি,
একি স্রোতে কেন তুমি ভাসাইলে তরি!

সুদূর তটান্তে ধীরে উদিল তপন,
শান্তিমগ্ন নিশীথের ভাঙিল স্বপন;—
অসংখ্য যাত্রীরে লয়ে ভরাপালে চলি'
দিকে দিকে বাহিরিল তরণীমণ্ডলী;—
যেন কোন শুভলগ্নে শুভসন্ধিস্থলে
রাণী উষার আদেশে দলে দলে দলে
বাহিরিল বন্দী সবে, আমি শুধু হায়,
তোমার পশ্চাতে চিরবন্দীটির প্রায়
একা রহিলাম পড়ি';—সপ্তমে চড়ায়ে
মাঝিরা ছাড়িল তান, পায়ে পায়ে পায়ে,
বধূরা নামিল ঘাটে জল লইবারে,—
কেহ ধুইছে বাসন বসি' একধারে;—
জেলেরা পাতিল জাল—তীরে টানি' আনি'
কেহ সারে একমনে ভাঙা তরিখানি;—
মধ্যাহ্ন-গগনে রবি কখন না জানি।
মনোরথ-রাণি মোর হে বরসুন্দরি,
একি স্রোতে কেন তুমি ভাসাইলে তরি!

দেখিতে দেখিতে পড়ে' এল দীর্ঘ বেলা;
সন্ধ্যাদেবী ভাসাইয়া সুবর্ণের ভেলা
ক্রমে দেখা দিল;—জলে স্থলে নভস্তলে
সুবর্ণের খেলা;—দেবী কনক অঞ্চলে
দিল সাজায়ে তোমায়;—চন্দ্রিকাবরণ
অলক মুখে ঝলিল সাঁঝের কিরণ!

খণ্ড মেঘ ভেসে যায় নীলাম্বর প[illegible]
বাজিল আরতি-ঘণ্টা, তটিনী-শিয়রে
জ্বলিল সন্ধ্যার দীপ, সুন্দর ধরণী;
তারি মাঝে তুমি অয়ি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মণি,
জীবনের চিরবাঞ্ছা পরাণের হার
স্বভাবসুন্দরি অয়ি প্রেয়সি আমার,
কোথায় টানিছ মোরে!—থাম একবার!
আমারে তুলিয়া লও ঐ তরণী পরে!—
নয়নপল্লবচ্ছায়ে ফুল্ল বিম্বাধরে
অতল অগাধ ওই হৃদি-সরোবরে
জীবনের চিরদুঃখ কর অবসান!—
কাঁদিয়া ফিরিল মোর নিষ্ফল আহ্বান!
মনোরথ-রাণি মোর হে বরসুন্দরি,
একি স্রোতে কেন তুমি ভাসাইলে তরি!

*　　*　　*

সহসা ভাঙিল স্বপ্ন—যেন অমানিশি
ঘন মেঘ নেমে এল আঁধারিয়া দিশি!—
ঝর ঝর ঝরে জল, বায়ু বহে বেগে,
ওড়ে ফুল পড়ে পাতা ঢেউ উঠে জেগে!
অশনি হাঁকিয়া যায়,—ঝটিকার ঘায়ে
নদী কাঁপে থরথরি তটেরে জড়ায়ে!
বিহঙ্গের প্রায় দূরে স্বর্ণপাল তুলে
দেখিনু তোমার তরি লাগিল সে কূলে!
কর্ণহীন তরি মোর ছিন্নপাল তায়—
মনে হ'ল এই বার বুঝি যায় যায়!
ঝটিকা আসিল বেগে দিগন্ত আবরি,
নারিনু রাখিতে আর ডুবে গেল তরি!

*　　*　　*

চাহিয়া দেখিনু একা পড়ে' আছি তীরে!
ভীষণ সংগ্রামশেষে সমরশিবিরে
সৈনিকের মত নিদ্রামগ্ন চরাচর!
অম্বরে হাসিয়া লুটে পূর্ণ শশধর!
যত দূর আঁখি ধায় দূর দূরান্তরে
চাহিনু আবার;—শুধু কুলু কুলু স্বরে
নদী গাহে গাথা! হায় আমি যার তরে
মৃত্যুপারাবার হ'তে আসিনু ফিরিয়া—
মনোরথ-রাণি মোর জীবন-অমিয়া
সে নাহি গো আর!—তরণী খুলিয়া
[illegible] …য়াছেন।

স্বর্নাছে চলি! আমি কোথা যাই!
ফে'ফিরে যাই সে শকতি নাই!
মনোরথ-রাণি মোর হায় গো সুন্দরি,
একি স্রোতে কেন তুমি ভাসাইলে তরি!

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সে আমার গেছে চলে।

সেই শেষ বারিবিন্দু মধ্যাহ্ন মরুর,
বসন্তের শেষ ফুল নিদাঘ তরুর,
নিরাশার শেষ আশা মুমূর্ষু জনার,
রজনীর শেষ স্মৃতি মলিন জ্যো'স্নার,
জীবনের একমাত্র প্রীতি-পারাবার,
শান্তিময়ী সুখময়ী মূর্ত্তি মমতার,—
আঁধারে একাকী ফেলে
কোথায় গিয়াছে চ'লে,
কে বলিবে কোথা পথ সেই অমরার?

শ্রীকেশবচন্দ্র কুণ্ডু।

হাসির গান।

চাষার পূর্ব্বরাগ।

ঐ যাচ্ছিল সে ঘোষেদের সেই ডোবার ধার দিয়ে,
ঐ আঁবগাছগুলোর তলায় তলায় কাঁকে কলসী নিয়ে।
সে এমনি করে' চেয়ে গেল শুধু মোরই পানে,
আর আঁখির ঠারে মেরে গেল—ঠিক্ এ—এইখানে ॥
তার রং যে বড়ই ফর্সা তারে পাব হয় না ভরসা,
তার জন্যে কচ্ছে রে মোর প্রাণ আনচান। } কোরস্
পরণে তার ডুরে সাড়ি মিহি শান্তিপুরে;
ঐ শান্তিপুরে ডুরে রে ভাই শান্তিপুরে ডুরে।
তার চক্ষু দুটি ডাগর ডাগর যেন পটল চেরা;
আর গড়নটি যে—কি বলবো ভাই—সকলকার সেরা।
তার রং যে বড়ই ফর্সা [ইত্যাদি।]
ঐ হাতে রে তার ঢাকাই শাঁখা, পায়ে বাঁকা মল;
আর মুখখানি যে একেবারে কচ্ছে ঢল ঢল।
তার নাকটি যেন বাঁশিপানা, কপালটি একরত্তি;
—এর একটা কথাও মিথ্যে নয় রে—আগা গোড়া সত্যি—
তার রং যে বড়ই ফর্সা [ইত্যাদি।]
তার এলো চুলের কিবে বাহার—আর বলবো কিরে;
—তার হেঁটুর নীচে পড়েছিল—মিথ্যে বলিনি রে;
মুই মিথ্যে কবা'র নোক নইরে—করিনিও ভুল;
ও তার হেঁটুর নীচে চুল রে ভাই হেঁটুর নীচে চুল।
তার রং যে বড়ই ফর্সা [ইত্যাদি।]
তার মুখের হাঁ যে ভারি ছোট, গোল-গাল যে তার ঢং;
আর কি বলবো মুই ওরে নেতাই! কিবে যে তার রং;
সে এমনি কোরে চেয়ে গেল কোরে মন চুরি,
আর ঠিক এই জায়গায় মেরে গেল নয়নের ছুরি।
তার রং যে বড়ই ফর্সা [ইত্যাদি।]

বিরহ।

ঝিঁঝিট—আড়া।

তোমারই বিরহে সইরে দিবানিশি কত সই—
এখন, ক্ষুধা পেলেই খাই শুধু (আর) ঘুম পেলেই ঘুমোই।
কি বল্ব আর—পরিত্যাগ (এখন) একেবারে চিঁড়ে দই—
রোচে না ক মুখে কিছু (আর) পাঁঠার ঝোল আর লুচি বৈ!

এখন সকালবেলা উঠে তাই, হতাশভাবে সন্দেশ খাই,
কভু দু'খান সরপুরি—আর দুঃখের কথা কারে কই?
দুঃখের বারিধির আমার কোন মতেই পাইনে থৈ—
—আবার বিরহে বুঝি (আমার) ক্ষুধা জেগে ওঠে ঐ!

(এখন) বিকেলটাও যদি হায় সুর্ব্বৎ খেয়ে কেটে যায়,
সন্ধ্যায় একটু হুইস্কি ভিন্ন প্রাণটা আর বাঁচে কৈ?
কে যেন সদাই এ প্রাণের পাকা ধানে দিচ্ছে মৈ—
(তাই) রাতে দু' চার এয়ার ডেকে (এ দারুণ) বিরহের বোঝা বই।

(এখন) ভাবি ও বিধুবয়ানে ঘুম আসে না নয়ানে,
রাত্তির আর মধ্যাহ্ন ভিন্ন চব্বিশ ঘণ্টা জেগে রই।
বিরহেতে দিন দিন ওজনেতে বেশী হই—
এতদিনে বুঝলেম প্রিয়ে (আমি) তোমা বই আর কারো নই।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। জ্যৈষ্ঠ। "কিষণকাম" শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ শর্ম্মার লিখিত একটি চলনসই ক্ষুদ্র গল্প। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী "নক্ষত্রের ক্ষমতা" প্রবন্ধে 'অনন্ত আকাশের রাশির সহিত পৃথিবীর অগণ্য মানবের কোনও সম্বন্ধ আছে কি না'—এ বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। লেখক এ সম্বন্ধে বিবিধ উদাহরণ সঙ্কলিত করিয়াছেন, কিন্তু কি সমূলক সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা বোধগম্য হইল না। কোনও অজ্ঞাত লেখকের "দুর্ভিক্ষ ও তাহার প্রতীকার" নিবন্ধটি আলোচনার যোগ্য। শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "বরুণ" একটি জ্যোতিষবিষয়ক জ্ঞানগর্ভ রচনা। লেখক যদি ভাষা আরও সরল ও প্রাঞ্জল করেন, তাহা হইলে তাঁহার জ্যোতিষনিবন্ধগুলি সাধারণ পাঠকের অধিকতর অধিগম্য ও আদরভাজন হয়। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র শাস্ত্রীর "রাম রাজার মুলুক" বেশ হইতেছে। শ্রীযুক্ত রমাকান্ত গুপ্ত "আনন্দময়ী" প্রবন্ধে আনন্দময়ী দেবীর জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পাঠক মূল প্রবন্ধে আনন্দময়ীচরিতের পরিচয় লইলে তৃপ্ত হইবেন। শ্রীমতী সরলা দেবী "অনাথবন্ধু" নামক একখানি উপন্যাসের বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছেন।

লেখিকার মুখবন্ধের মর্ম্ম এই যে, বইখানি উপন্যাস হিসাবে যদিও গলাধঃকরণ করা সহজ নয়, তথাপি সংসারবাসী পাঠকের জ্ঞানার্জ্জন জন্য এখানি পড়িয়া দেখা ও ভাবিয়া রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু উপন্যাসের মোড়কে মুড়িয়া এই কুইনিন চালান কেন! জ্ঞাতব্য কথাও কি উপন্যাসের মধু অনুপান দিয়া চালাইতে হইবে! শ্রীমতী সরলা দেবীর এই অভিনব মন্তব্য পাঠ করিয়া আমরা পরম কৌতুক অনুভব করিয়াছি।

নব্যভারত। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়ের "নূতন শিক্ষাপ্রণালীর প্রস্তাব"—দ্বিতীয় অংশ, শিক্ষাসংসৃষ্ট কর্ত্তৃপক্ষদের পড়িয়া দেখা কর্ত্তব্য। লেখকের প্রস্তাব উত্তম, কিন্তু কে বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিবে, তাহার উপায়ও স্থির করা কর্ত্তব্য। শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় এই সংখ্যায় "শেলি" প্রবন্ধে বিলাতী কবি শেলির সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছেন। আরম্ভপাঠে আশা ও কৌতূহলের উদ্রেক হয়; লেখক বঙ্গসাহিত্যে শেলির প্রভাব কিরূপ, তাহারও আলোচনা করিবেন বলিয়াছেন। আমরা সাগ্রহে এই প্রবীণ মনস্বীর মতবাদ শুনিবার আশায় রহিলাম। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্যের "নেপালের পুরাতত্ত্ব" প্রশংসনীয় ও সুপাঠ্য। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র শাস্ত্রীর "হেনরী মার্টিন" প্রবন্ধটি চিত্তাকর্ষক।

সখা ও সাথী। জ্যৈষ্ঠ। এখানি 'সখা ও সাথীর" জুবিলি-সংখ্যা। পত্রের পুরোভাগে মহারাণীর যে স্বতন্ত্র ছবিখানি প্রদত্ত হইয়াছে, সেখানি উৎকৃষ্ট। এই চিত্রের তুলনায় অপর চিত্রগুলি নিকৃষ্ট। এই সংখ্যায় সতরখানি চিত্র আছে। "হীরক জুবিলি" প্রবন্ধে মহারাণীর জীবনের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে; তাহাতেই পত্রিকার অধিকাংশ পরিপূর্ণ। অন্য প্রবন্ধ বিশেষ কিছু নাই। এবারকার সাথীর আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না। চিত্রে যে যত্ন, রচনায় তাহার বিন্দুমাত্রও দৃষ্ট হইল না।

মুকুল। জ্যৈষ্ঠ। স্বর্গীয় ডাক্তার গোপালচন্দ্র রায়ের জীবনচরিত ও চিত্রখানি বেশ হইয়াছে। "শামুক" প্রস্তাবটিও উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের "স্নেহময়ী" কবিতাটি আমাদের বড় ভাল লাগিয়াছে। ছেলেদের জন্য আমরা এমনই খাঁটি বাঙ্গালা কবিতা দেখিতে চাই। কেবল শিশু কেন, শিশুর গুরুজনগণও কবিতাটি পড়িয়া সন্তুষ্ট হইবেন, এই আশায় আমরা কবিতাটি উদ্ধৃত করিলাম;—

"ঘুম পেয়েছিল তাই নে'ছিল মাতুনি,
ঘুমাইল খেয়ে বাছা কতই বকুনি!
না গিয়া কাহারো কোলে, না ভুলিয়া মিষ্ট বোলে,
যখন মুদিয়া চক্ষু কাঁদিয়া আতুর,
তখনি বুঝেছি ঘুম ধ'রেছে যাদুর।

"বাছার চোকের জল শুকাইল চোকে,
যাদুকে কেন গো তোরা ব্যথা দিলি ব'কে?
রাঙ্গিয়াছে চাঁদমুখ, দেখিয়া বিদরে বুক,
একমাথা চুল তায় যাতনার ভার—
গোটা মাথা ভিজে গেছে ঘামেতে বাছার!

"সোণার যাদুরে মোর কে দিয়াছে দুখ,
বিনা দোষে কে ব'কেছে, কে করেছে মুখ!
ওর যে ননীর প্রাণ, সয় কি গো তাপ দান?
ঘুমুলো, বকুনি তবু গেল না ত ভুলে—
এখনো উঠিছে মরি ঠোঁট ফুলে ফুলে!

"আসুক ত আজি ওর দিদিমণি ঘরে,
শাসন করিয়া তায় দিব ভাল ক'রে;
তিলেক কাঁদিলে খোকা, মুখে দে' মুখোস্ ঢাকা,
বড় সে দেখায় ভয় ভয়ঙ্কর বেশে,
খোকা যে কেমন শান্ত দেখুক-না এসে!"

অনুতাপ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিনয়ের সঙ্গে শান্তির যখন বিবাহ হয়, তখন শান্তির বয়স তের বৎসর। শ্বশুর-বাড়ীতে আসিয়া শান্তির বনিবনাও করিয়া লইতে বেশী দিন লাগিল না। হিন্দুর ঘরের মেয়ে, বিবাহের পূর্ব্বেই শ্বশুরবাড়ীর সকলের প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাহার একরকম অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। স্বামী যে দেবতা, শ্বশুর শাশুড়ী যে গুরুজন, ভাসুরকে দেখিলে যে ঘোমটা দিতে হয়, স্বামীর উচ্ছিষ্ট আহার যে স্ত্রীর কর্ত্তব্য, এ সকল বিষয়ে দেখিয়া শুনিয়া তাহার বেশ জ্ঞান জন্মিয়াছিল। বিবাহের পূর্ব্ব দিনে শান্তির পিতা এ সকল বিষয়ে যাহাতে কোন ত্রুটি না হয়, তজ্জন্য বারবার বলিয়া দিয়াছিলেন। শ্বশুরবাড়ী আসিয়া শান্তি প্রথম প্রথম যন্ত্রবৎ যথাকর্ত্তব্য পালন করিত, ক্রমে সে যান্ত্রিক ভাব গিয়া স্বামীর প্রতি তাহার স্বাভাবিক ভালবাসা এবং গুরুজনের প্রতি স্বাভাবিক ভক্তি জন্মিল। এইরূপে অল্পদিনের মধ্যে সে শ্বশুরবাড়ীর সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল!

বাস্তবিকই শান্তি খুব ভাল মেয়ে। বাপের বাড়ীতে ভাই বোন বাপ মা আত্মীয় স্বজনের প্রতি তাহার যে কি টান ছিল, তাহা বলা যায় না। হাজার সুন্দরী মেয়ে বাড়ীতে আসিলে সে তাহার সেই ছোট বোনটির অপেক্ষা কাহাকেও অধিক সুন্দর দেখিত না। অন্য কেহ বহুমূল্য জিনিস দিলে তাহাতে তাহার মন উঠিত না, কিন্তু বাবা যদি আদর করিয়া সামান্যও একটি জিনিস দিতেন, অমনি সে আনন্দে আটখানা হইয়া যত্নে তাহা বাক্সে উঠাইয়া রাখিত।

শান্তির দুই বৎসরের বড় একটি ভাই ছিল। দাদাকে শান্তি আপনার প্রাণের চেয়েও অধিক ভালবাসিত। কেহ কিছু খাবার দিলে শান্তি অমনি বলিত, "দাদাকে দেবে না?" দাদাকে ভাগ না দিয়া, কিম্বা দাদা না খাইলে, সে কোন জিনিস খাইত না। দাদাকে কেহ যদি ধমকাইত, দাদার কাঁদিবার আগে শান্তির চোখ দিয়া টস্‌টস্ করিয়া জল পড়িত। ছোট বোনটিকে শান্তি নিজের হাতে স্নান করাইয়া দিত, খাওয়াইত, এবং সে যখন ছোট ছোট

দু'খানি হাত ঘুরাইয়া "চুড়ি চাই, বালা চাই" বলিত—শান্তি স্নেহচক্ষে দেখিত, যেন আনন্দে সমস্ত জগৎটাও তাহার সঙ্গে ঘুরিতেছে। এইরূপে তপ্তপক্ষ বিস্তার করিয়া মুখাগ্রভাগে স্নেহচঞ্চু লাগাইয়া যে পোষা পাখীটি এতদিন পড়িয়াছিল, সে যখন চলিয়া গেল, পিতৃগৃহে কি হাহাকার উঠিয়াছিল, তাহা কল্পনা করা কিছু দুরূহ নহে।

শান্তির স্বামী বিনয় একরকম অদ্ভুত গোছের লোক ছিল। তাহার কাছে জগতের সমস্তই যেন ফাঁকা ফাঁকা বলিয়া বোধ হইত। তাহার কাছে পাপ পুণ্যের কোনই প্রভেদ ছিল না। "তুমিও যেমন!" "তা বেশ!" ইত্যাদি কথা চব্বিশ ঘণ্টাই তাহার মুখে লাগিয়াছিল। বিনয়ের কাছে যদি কেহ বলিত, "অমুক লোকটা খুব ফাঁকি দিয়েছে"—বিনয় অমনি গম্ভীরভাবে বলিত, "লোকটা বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছে।" এক কথায় বিনয় অতিশয় হাল্‌কা রকমের লোক ছিল, অন্ততঃ আপনাকে সেইরূপ দেখাইতে চেষ্টা করিত।

বিবাহের দুই মাস পরে বিনয়ের বি. এ. পাশের খবর বাহির হইল। তখন তাহার পিতা অম্বিকা বাবু ব্যারিষ্টার হইবার জন্য তাহাকে বিলাত পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। অম্বিকা বাবু খুব সঙ্গতিপন্ন, এবং দলের একরকম কর্ত্তা ছিলেন, সুতরাং ছেলেকে বিলাত পাঠানর পক্ষে তাঁহার কোন বাধা ছিল না। তবে গৃহিণী কখনও নথ নাড়া, কখনও নাক ঝাড়া দিয়া দুই দশ দিন বাধা দিবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু শেষে তাহাও ব্যর্থ হইল। ঠিক হইল, আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে বিনয় বিলাত যাইবে।

পিতার নিকট হইতে শুনিয়া সেইদিনই রাত্রে শয়নকক্ষে বিনয় শান্তির নিকট বিলাত-যাত্রার খবর দিল। শান্তি চুপ করিয়া রহিল। বিনয় বলিল, "আমি বিলেত গেলে তোমার কষ্ট হবে?" শান্তি কোন কথা কহিল না। বিনয় বলিল, "যদি জাহাজ ডুবে মারা যাই?" তবুও চুপ। "বেশ ত আর একটা বিয়ে কর্‌বে"—এইরূপ বারবার বলাতে শেষে শান্তি আর না থাকিতে পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সে দিন আর কোন কথা হইল না।

দিন ঘুনাইয়া আসিয়া শেষে চব্বিশ ঘণ্টারও কম ব্যবধানে দাঁড়াইল। কাল খুব ভোরে জাহাজ ছাড়িবে, আজ রাত্রেই বিনয়কে জাহাজে চড়িতে হইবে। আহারাদি শেষ করিয়া যখন বিনয় সকলের নিকট হইতে বিদায় লইতে গেল, তখন বাড়ীতে ক্রন্দনের রোল উঠিল। শান্তি একলা একটি ঘরে চুপ করিয়া শুইয়াছিল। বিবাহরাত্রে বসনের গ্রন্থিবন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষ্যে

দুইটি অপরিচিত নরনারীর হৃদয়ের গ্রন্থি কেমন করিয়া বাঁধিয়া যায়! দুই মাসের মধ্যেই শান্তির বালিকাহৃদয় নবপরিচিত বিনয়কে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আপন করিয়া লইয়াছিল। পাছে কেহ টের পায়, এই জন্য তাহার সেই অন্তর্দাহ এতক্ষণ সে অনেক কষ্টে চাপিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু আর থাকিতে পারিল না। কান্নার স্বর শুনিয়া সেও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

বিনয় একে একে সকলের নিকট বিদায় লইয়া শান্তির ঘরে প্রবেশ করিল। দেখিল, বালিশে মুখ গুঁজিয়া সে কাঁদিতেছে। অনেক কষ্টে তাহাকে উঠাইয়া বিনয় সান্ত্বনা দিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই তাহার কান্না থামে না। যতই সান্ত্বনা পায়, ততই আরও সে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদে। অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া শেষে শান্তির অশ্রুসিক্ত অধরে জীবনশোধ একটি প্রগাঢ় চুম্বন করিয়া "আমাকে ফি মেলে চিঠি লিখো" বলিয়া বিনয় গাড়ীতে গিয়া বসিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

দ্বিপ্রহর রাত্রি। জ্যোৎস্নায় পৃথিবীর দুই কূল ভরিয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে কোকিলের পঞ্চমস্বর শূন্যতল প্লাবিত করিয়া উঠিতেছিল। এমন সুখময়ী জ্যোৎস্নারাত্রে বিবাহের কয় মাস অতীত হইতে না হইতে এক জন আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের উপায় সংগ্রহ করিতে সাত সমুদ্র তের নদী পার হইতে চলিল, এবং আর এক জন ক্ষুদ্র বালিকা—সে একান্ত নিরুপায় হইয়া পড়িয়া রহিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন হইতে মনের কষ্ট চাপিয়া শান্তি পূর্ব্বমত সাংসারিক কাজ কর্ম্ম করিতে লাগিল। পুত্রবিরহে অধীর হইয়া বিনয়ের মা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলেন, শান্তি নিয়ত তাঁহার কাছে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। শ্বাশুড়ীর কাতরতা দেখিয়া শান্তির যে স্বামিস্মৃতি কিছুমাত্র জাগিয়া উঠিত না, তাহা নহে; যখনই সুবিধা পাইত, একেলা নির্জ্জনে সে চোখের জল ফেলিয়া আসিত। এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল।

বিলাতে পৌঁছিয়াই বিনয় শান্তিকে এক মস্ত চিঠি লিখিল। চিঠিটা আসিবামাত্র তাহা শান্তির দেবর সুরেশের হাতে পড়ে। ঠাকুরপো চিঠিটা লইয়া ছুটিয়া গিয়া বলিল, "বৌঠাকরুণ! একটা সুখবর দিচ্ছি, কি দেবে?" বলিয়াই চিঠিটা বাহির করিয়া বলিল, "খুলি? পড়ি?"—শান্তি লজ্জায় অস্থির ও আরক্তিম হইয়া উঠিল। "ঠাকুরপো, কি কর কি কর" বলিয়া ছুটিয়া

গিয়া চিঠিটা কাড়িয়া লইল। তাহার পর ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া কতবার যে চিঠিটা পড়িল, তাহার ঠিক নাই। শেষে আশ মিটাইয়া পড়িয়া বুকের কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল।

রাত্রে যখন সকলে শুইতে গেল, শান্তি নিজের ঘরে আসিয়া বাতি জ্বালাইয়া চিঠির জবাব দিতে বসিল। কত কাগজ ছিঁড়িয়া কত কি ভাবিয়া আঁকা বাঁকা অক্ষরে শেষে লিখিল, "শ্রীচরণেষু, তোমার চিঠি পেয়ে অত্যন্ত সুখী হলুম। তোমার চিঠি না পেলে আমার বড় কষ্ট হবে। তুমি কেমন থাক লিখতে ভুলো না। মা বাবা বাড়ীর সব ভাল। আমি একরকম আছি। প্রণাম জেনো। শীগিগর উত্তর চাই। আর কি লিখিব।" শেষে নাম সইয়ের জায়গায় আবার মুস্কিলে পড়িল। বিনয় লিখিয়াছিল, "তোমার হতভাগা বিনয়।" শান্তি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া লিখিল, "তোমার হতভাগিনী শান্তি।"

চিঠিটা মুড়িয়া ঠিকানা লিখিয়া দিবার জন্য সকালে আবার ঠাকুরপোকে ধরিল। ঠাকুরপো আবার ভারি দুষ্টুমি আরম্ভ করিয়া দিল। "কি লিখেছ যদি দেখাও তবে ঠিকানা লিখে দেব।" অনেক সাধ্যসাধনার পর, অনেক মাথার দিব্যি দিয়া শান্তি ঠাকুরপোকে চিঠি দেখা হইতে নিরস্ত করিল। ঠাকুরপো ঠিকানা লিখিয়া দিল, এবং প্রতিজ্ঞা করিল যে, সে নিজ হস্তে চিঠিটা ডাকে দিবে, এবং কখনও খুলিয়া দেখিবে না।

চিঠি পাইয়া সম্বোধন দেখিয়া বিনয় মনে মনে হাসিল বটে, কিন্তু তাহার প্রত্যেক অক্ষরে শান্তির সেই বালিকাসুলভ সরল ভাব প্রতিফলিত দেখিল। উত্তর লিখিবার সময় বিনয় আপনার মনোমত শ্রুতিমধুর কতকগুলি সম্বোধন লিখিয়া পাঠাইল। শান্তি স্বামীর ইচ্ছামত প্রত্যেক বার তৎপ্রেরিত এক একটি সম্বোধন লইয়া চিঠি লিখিত।

বছর দেড়েক বিনয় রীতিমত চিঠি লিখিয়াছিল। ক্রমে তাহার চিঠি লেখা সম্বন্ধে শিথিলতা দেখা দিল; এমন কি, তিন চারি মাস অন্তর শান্তি একখানি চিঠি পাইত, এবং শেষাশেষি তাহাও বন্ধ হইল। চিঠি না লিখিলে যে আপনা হইতে চিঠি লিখিবে, লজ্জাসঙ্কুচিতা শান্তির সেরূপ প্রকৃতিই ছিল না। অনেকে অনেক কথা বলিতে লাগিল। অম্বিকা বাবু চিঠিপত্র না পাইয়া টেলিগ্রাফ করিয়া জানিলেন, বিনয় ভাল আছে। সহসা স্বামীর এই অবহেলাভাবের কারণ ঠিক করিতে না পারিয়া শান্তি এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিত যে, হয় ত পরীক্ষা কাছাকাছি আসাতে বিনয় চিঠি লিখিবার অবসর পান না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

তিন বৎসরের পর একদিন টেলিগ্রাম আসিল যে, বিনয় ব্যারিষ্টারী পাশ হইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে।

সেদিন সন্ধ্যায় শান্তি ছাতে বসিয়াছিল। কত কথাই মনে আসিতেছিল। বর্ষায় মেঘ, জল ও বাতাসে যেমন মারামারি হয়, শান্তির মনের মধ্যেও তেমনি অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের একটা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার সেই বাপের বাড়ী, পুতুল খেলা, বাপ মা ভাই বোন, সকলকে একে একে মনে পড়িল; তাহার পর বিবাহের কথা, দুই মাস ভরিয়া স্বামীর আত্যন্তিক ভালবাসার কথা, তিন চারি বৎসরের বিরহের কথা, চিঠি না লেখার কথা, একটার পর একটা আসিয়া মনের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। শান্তি এখন ষোড়শী, নববিকশিত পরিপূর্ণ যৌবনভার লইয়া সে আপনাকে নিতান্ত অসহায় মনে করিল, চোখে জল আসিল। এমন সময়ে সুরেশ আসিয়া হাসিতে হাসিতে খবর দিল, "দাদা বাড়ীর জন্যে ছেড়েছেন, শীগিগর আসচেন, আজ টেলিগ্রাম এসেছে।" সুরেশ শান্তির ভাবগতিক দেখিয়া আর কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেল। শান্তিও অল্পক্ষণ পরে নীচে নামিয়া আসিল।

নীচে আসিয়া বিনয়ের লেখা চিঠিগুলো শান্তি আর একবার আদ্যোপান্ত পড়িল,—পড়িয়া ভাল করিয়া গুছাইয়া একটি ফিতা দিয়া বাঁধিয়া রাখিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বম্বে পৌঁছিয়াই বিনয় টেলিগ্রাফ করিল। বাড়ীতে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। বাড়ী পরিষ্কার করিতে লোক লাগিল। বিনয়ের বসিবার জন্য টেবিল, চৌকি, ছবি, কার্পেট দিয়া একটি ঘর সুসজ্জিত হইল। আলাদা একটি ডাইনিংরুমও ঠিক হইল।

বিনয়ের আসিবার পূর্ব্বদিন দরজায় মঙ্গলঘট ও কদলীবৃক্ষ স্থাপিত হইল; নহবৎ বাজিতে লাগিল। আমোদে আহ্লাদে গল্পে রাত কাটিয়া গেল।

খুব ভোরে উঠিয়া অম্বিকা বাবু ও সুরেশ বিনয়কে আনিতে ষ্টেশনে গেলেন। এদিকে শান্তিকে সাজাইয়া দিবার জন্য সকলে ধরিল। শান্তি প্রথমে অনেক ওজর আপত্তি করিল, কিন্তু যখন আর কিছুতেই পারিয়া উঠিল না, তখন যে যাহা ইচ্ছা করিল, বিনা আপত্তিতে তাহাই করিতে দিল। স্নান করাইয়া, খোঁপা বাঁধিয়া দিয়া, নীলাম্বরী পরাইয়া, গলায় ফুলের মালা দিয়া,

মল বাজুবন্ধ প্রভৃতিতে সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া তাহার ঘরে লইয়া গিয়া সকলে মিলিয়া তাহাকে খাটে বসাইল। শান্তি পুত্তলিকার মত বসিয়া রহিল।

বাড়ীতে আসিয়াই বিনয় খট্‌মট্‌ করিয়া প্রথমে শান্তির ঘরে প্রবেশ করিল। শান্তি অম্‌নি ঘোম্‌টা টানিয়া দিল। O' you look like a princess বলিয়া ঘোম্‌টা খুলিয়া দিয়া বিনয় সকলের সমক্ষে শান্তির মুখ চুম্বন করিল—শান্তি লজ্জায় মরিয়া গেল। সকলে বিনয়ের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া অবাক হইল। যে ধুতি পরিয়া ফিন্‌ফিনে উড়ানি উড়াইয়া বিনাইয়া বিনাইয়া কথা কহিত, পৃথিবীর সর্ব্বত্র ফুঁ দিয়া বেড়াইত—সে আজ নিতান্ত কাটখোট্টা ফিরিঙ্গীর মত হইয়া আসিয়াছে। খাবার সময় বিনয় শান্তিকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া টেবিলে বসাইল—বসাইয়া তিন চারি বৎসরের বিরহের পর এই প্রথম সম্মিলনে নিতান্ত অরসিকের মত কাঁটা চামচ কি করিয়া ধরিতে হয়—শিখাইতে লাগিল। লজ্জায় শান্তির মুখ লাল হইয়া উঠিল, এবং গা দিয়া ঘাম বহিতে লাগিল। সে কিছুই স্পর্শ করিল না। কিছুতেই না পারিয়া বিনয় শেষে হার মানিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল।

বিলাতে থাকিতে বিনয়ের বিলক্ষণ পানদোষ জন্মিয়াছিল। প্রথম রাত্রেই সে তর্‌ হইয়া আসিয়া শান্তিকে ইংরাজি বাঙ্গলায় লম্বা চওড়া বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিল। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের অবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে দিতে শেষে শান্তির প্রতি গালি বর্ষণও আরম্ভ হইল। টেবিলে কাঁটা চামচ দিয়া খাওয়া, গাড়ী হাঁকাইয়া যাওয়া, গাউন পরা, স্ত্রীলোকদের যে অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, অনেক করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিল। শান্তিকে চুপ্‌ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বিনয়ের রাগ আরও বাড়িতে লাগিল—"যা বল্‌চি করবে? বল? বল? বল?"—শান্তি আস্তে আস্তে বলিল, "হাঁ।"

পরদিন বিনয় তাহার বিলাতপ্রত্যাগত জনৈক বন্ধুর স্ত্রীকে আনাইয়া আধুনিক শিক্ষিতা স্ত্রীলোকদের মত শান্তিকে কাপড় পরা শিখাইয়া দিতে বলিলেন। অনেক কষ্টে অনেকবার চেষ্টা করিয়া শান্তি এক রকম শিখিয়া লইল। তাহার পর হইতে কল্‌-এ, ইভ্‌নিং-পার্টি, টী-পার্টি প্রভৃতিতে বিনয় শান্তিকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। শান্তি কত পায়ে পড়িত, কাঁদিত, বিনয় করিত,—বিনয় তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিত না। শান্তি ঘোম্‌টা দিতে গেলে বিনয় তাহা খুলিয়া দিত। শত শত নর নারীর মেলায় শান্তি ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া থাকিত, এবং মনে মনে পৃথিবীকে দ্বিধা হইয়া তাহাকে লইবার জন্য প্রার্থনা করিত।

ইহার উপর বিনয় প্রায়ই রাত্রে বাড়ী আসিত না। শান্তি না খাইয়া প্রদীপ জ্বালাইয়া সমস্ত রাত্রি অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিত। কখনো কখনো দ্বিপ্রহর রাত্রে মত্ত অবস্থায় বিনয় বাড়ী আসিয়া শান্তিকে অকথ্য গালি দিত, এবং নানা প্রকারে লাঞ্ছনা করিত। সমস্ত অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া কেহ যেন তাহা টের না পায়, সেই জন্য শান্তি প্রাণপণে চেষ্টা করিত। শান্তির কাছে বিনয় "আমারি দেবতা তুমি দোষে গুণে।"

শান্তি যতদূর পারে বিনয়ের মন রাখিয়া চলিতে লাগিল। সাহেবী মেজাজে বিনয় যখন যাহা বলিত, শান্তি তাহাই করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিত। সে নিজে ইচ্ছা করিয়া একখানি ফার্ষ্ট-বুক-অব-রিডিং আনাইয়া সুরেশের কাছে পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল। টেবিলে খাইতে ও ভাল করিয়া কাপড় পরিতে শিখিল। কোন পার্টিতে গেলে সে আর ঘোম্‌টা দিত না, সকলের সঙ্গে মুখ ফুটিয়া কথা কহিবার চেষ্টা করিত। স্বামীর মনোরঞ্জনের আন্তরিক চেষ্টাসত্ত্বেও এত করিয়াও পাশ্চাত্যসৌন্দর্য্যবিমুগ্ধ বিনয়ের হৃদয়ে সে স্থান পাইল না। দিন কাটিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আজ সুরেশের বিবাহ। বাড়ীতে খুব ধূম পড়িয়াছে। ঝাড় লণ্ঠনের শব্দ ও চাকরবাকরদের হাঁকডাকে বাড়ী ভরিয়া উঠিয়াছে। ছেলেরা সকাল হইতেই ভাল কাপড় পরিয়া লাফাইয়া বেড়াইতেছে। ক্ষীর দই সন্দেশ প্রভৃতি একটার পর একটা আসিতেছে। দেবদারুপত্রশোভিত উচ্চ মঞ্চে নহবৎ আজিকার আনন্দোৎসব উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছে। সন্ধ্যা সাতটার সময় লগ্ন।

আজ যথার্থ যদি কাহারও আনন্দ হইয়া থাকে ত সে শান্তির। সুরেশকে শান্তি ঠিক্‌ আপনার ছোট ভাইটির মত ভালবাসিত। বিনয় বিলাতে থাকিতে দুই জনে এক সঙ্গে বসিয়া আহার করিত, গল্প করিত; এক জনের অসুখ হইলে অন্য জন সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তাহার সেবা করিত। আজ সুরেশকে কি রকম করিয়া সাজাইয়া দিবে, তাহাই লইয়া শান্তি বিব্রত। নিজের হাতে চন্দন বাটিয়া সুরেশের কপালে মাখাইয়া দিল, বিনয়ের একটি ভাল সিল্কের কামিজ সুরেশের জন্য বাহির করিয়া দিল, এবং গোপনে সুরেশের মুখে একটু রুজ পাউডারও মাখাইয়া দিল। সুরেশের সেই লজ্জানম্র মুখখানি যখন স্নেহ-অঙ্গুলিপরিচালনায় ফুটিয়া উঠিল, তখন শান্তি আপনাকে বড়ই সৌভাগ্যবতী মনে করিল।

খুব সমারোহে বরযাত্রী বাহির হইল।

অনেক রাত্রে মত্ত অবস্থায় বিনয় বাড়ী ফিরিল। বাড়ী আসিয়া সুরেশকে সাজাইয়া দেওয়া উপলক্ষে শান্তিকে ঠাট্টা করিতে করিতে তাহার চরিত্রের উপর সন্দেহব্যঞ্জক তীব্র এমন একটি কথা বলিল, যাহা বিষময় শরের ন্যায় শান্তির মর্ম্মস্থলে গিয়া বিদ্ধ করিল। মদ খাইয়া বলিলেও বিনয়ের মনে যে অবিশ্বাসের ভাব কোন না কোন রূপে স্থান পাইয়াছে, তাহা শান্তির আর বুঝিতে বাকি রহিল না। অদৃষ্টদোষে সে স্বামীর ভালবাসা এবং সেই সঙ্গে পৃথিবীর সুখ হইতে বঞ্চিত, কিন্তু স্বামীর অকারণ অবিশ্বাস স্ত্রীর পক্ষে অসহনীয়। যে ক্ষুদ্র তরণী নদীপথে শত সহস্র বার যাতায়াত করিয়াছে, যে পথ ছাড়া তাহার দাঁড়াইবার আর অন্য স্থল নাই—ভীষণঝটিকাবর্ত্তে তরঙ্গাঘাতে উৎক্ষিপ্ত প্রক্ষিপ্ত হইয়া তাহা যেমন নিতান্ত অসহায় হইয়া পড়ে, শান্তির অবস্থাও ঠিক তাহাই হইল। শান্তি চুপ করিয়া রহিল—কোন কথা কহিল না।

পরদিন শান্তি বিছানা হইতে আর উঠিল না। অসুখ হইয়াছে বলিয়া সমস্ত দিন শুইয়া রহিল, আহারও করিল না। সুরেশ আসিয়া দেখিল, শান্তির মুখখানি যেন কালীর মত হইয়াছে, চোখ দু'টা বসিয়া গিয়াছে। সুরেশকে দেখিয়া অপমানিত ব্যথিত শান্তির হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, অনেক কষ্টে সে তাহা চাপিয়া রাখিল। সুরেশ পাখা লইয়া বিষণ্ণমনে বসিয়া বসিয়া শান্তিকে বাতাস করিতে লাগিল। শান্তির ইচ্ছা তাহাকে বারণ করে, কিন্তু আজ হঠাৎ কি বলিয়া নূতন করিয়া বারণ করিবে!

অনিয়মে অত্যাচারে মনের কষ্টে শান্তি দিন দিন শুকাইয়া যাইতে লাগিল, এবং অবশেষে যাহা হইয়া থাকে, সাংঘাতিক ব্যাধি আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল।

তিন মাস রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিবার পর ডাক্তার বলিল, রক্ষা পাইবার আর সম্ভাবনা নাই।

প্রাতঃকাল, তথাপি সূর্য্যের মুখ দেখা যায় না। ঘনান্ধকার মেঘগর্জ্জনে মুষলধারে অবিরল বৃষ্টি পড়িতেছে। এমন অন্ধকার যে দিনের বেলায় ঘরে আলো জ্বালিতে হইয়াছে। সেই দিন দ্বিপ্রহরবেলায় নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় শান্তি সহসা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। উঠিয়া বসিয়া বিনয় বিলাতে থাকিতে শান্তি তাহাকে যে সকল চিঠি লিখিয়াছিল, বাক্স হইতে বাহির করিয়া একে একে সে সমস্ত ছিঁড়িয়া ফেলিল। গলার হার, কাণের সোনার ফুল, দুই একখানি

ভাল কাপড় পুঁটুলি বাঁধিয়া একটি বিশ্বস্ত দাসীর হাত দিয়া ছোট বোনটির জন্য বাপের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিল, এবং সেই সঙ্গে কম্পিতহস্তে মাকেও এক-খানি চিঠি দিল। রেশমের কাপড়ের একটি পাড় শান্তি ভাল থাকিতে নিজ হাতে বুনিয়াছিল, সেটি সুরেশের বৌকে দিল। তাহার পর সুরেশকে কাছে ডাকিয়া কি বলিতে গিয়া আর বলিতে পারিল না। বেলা চারিটার সময়, বিনয় যখন বন্ধুগৃহে পার্টিতে গিয়াছিলেন, আত্মীয় স্বজনের আর্ত্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে শান্তি তখন ইহলোকে চিরশান্তি লাভ করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শান্তির মৃত্যুর পর বিনয় মদ্যপান আরও বাড়াইল। অম্বিকা বাবু মর্ম্মাহত হইয়া বিনয়কে টাকাকড়ি দেওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। বিনয় শেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া শান্তির ভাল ভাল দামী গহনা কাপড় যাহা ছিল, একে একে সমস্ত বিক্রয় করিল—যে যাহা পাইল, জলের দামে কিনিয়া লইল।

শনিবার। কাল কোর্ট বন্ধ। জ্যোৎস্না রাত্রে বন্ধুবান্ধবসমেত বিনয় পান্সী করিয়া গঙ্গায় হাওয়া খাইতে বাহির হইল। আমোদ আহ্লাদ করিয়া অনেক রাত্রে সকলে বাড়ী ফিরিল। বাড়ী ফিরিবার পথে বিনয় সবান্ধব এক অপরিচিত বারবনিতালয়ে প্রবেশ করিল।

সেখানে গিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে বিনয় একেবারে চম্‌কিয়া উঠিল। বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে বোম্বায়ে বিনয়ের স্বহস্তে ক্রীত, রেশমীপুষ্প-খচিত পুণ্যতনুবেষ্টনে নিত্যপরিহিত শান্তির বড় আদরের বাদামী রঙ্গের শাড়ি জ্যাকেট্ পরিয়া, শান্তির পুণ্যকণ্ঠাশ্রিত হীরক নেক্‌লেস্ গলায় দিয়া, এবং বিনয়ের প্রতিমূর্ত্তিরাজী সোনার ব্রোচ্ পরিয়া এক বারবিলাসিনী আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। উজ্জ্বল দীপালোকে বিনয় সমস্তই স্পষ্ট দেখিতে পাইল। স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় সে হাঁ করিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। নিস্তব্ধ রজনীতে শান্তির সেই বিষাদাঙ্কিত পবিত্র সুন্দর মুখখানি বিনয়ের চক্ষের সম্মুখে কেবলি ভাসিতে লাগিল। বন্ধুবান্ধবদিগের দৃঢ় কবল হইতে আপনাকে সজোরে বিচ্ছিন্ন করিয়া, পাগলের ন্যায় বিনয় ছুটিয়া বাড়ীর বাহির হইল। অনুতাপে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল, সর্ব্বান্তঃকরণ যেন কাঁদিয়া বলিতে লাগিল,—

"এস এস ফিরে এস, বঁধু হে ফিরে এস।
আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত, বঁধু হে ফিরে এস।"

রাণী ভবানী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—রাজ্যলাভ।

দিল্লীর বাদশাহেরা অনেকবার বাঙ্গলা দেশ জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু একবারও দীর্ঘকাল রীতিমত রাজকর সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। বাঙ্গলার জমিদারগণ, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কেহই স্বেচ্ছায় রাজকর প্রদান করিতেন না, বরং অবসর ও সুযোগ পাইলে সকলেই স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতেন। যাঁহারা নামে দিল্লীর অধীন, তাঁহারাও কার্য্যতঃ আপন আপন জমিদারীতে স্বাধীন ভূপতির ন্যায় রাজশক্তি পরিচালন করিতেন। সেই জন্য বঙ্গদেশ অনেকগুলি ছোট ছোট স্বতন্ত্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল ;—সেই সকল ছোট ছোট স্বতন্ত্ররাজ্যের কলহ বিবাদে দেশের সুখশান্তি সর্ব্বদাই বিপর্য্যস্ত হইত।

মানসিংহ তরবারি হস্তে বাঙ্গালা দেশ জয় করিয়া সম্রাট আকবর শাহের একচ্ছত্র শাসন সংস্থাপন করিয়াছিলেন। মহারাজা টোডরমল্ল বাঙ্গালা দেশ বাহুবলে পরাজিত করিয়া বুদ্ধিকৌশলে তাহার রাজস্ব নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। টোডরমল্ল যুদ্ধব্যবসায়ী রাজপুত বীর হইয়াও মসীজীবী রাজকর্ম্মচারীর মত অনবরত রাজস্বসংক্রান্ত কাগজপত্র লইয়া এরূপ নিপুণভাবে কার্য্য সম্পাদন করিলেন যে, তাঁহার বীরত্বকীর্ত্তি ভুলিয়া গিয়া লোকে এখন পর্য্যন্ত তাঁহার রাজস্বনীতির আলোচনা করিয়া থাকে। তিনি বাঙ্গলা দেশ ১৯ সরকারে ও ৬৮২ পরগণায় বিভক্ত করিয়া বার্ষিক ১০৬৯৩২৫৩ টাকা রাজস্ব নির্ণয় করিয়া দেন। * তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে বাঙ্গলা দেশে জিন্নতাবাদ (গৌড়), পূর্ণিয়া, তেজপুর, পিঞ্জারা (দিনাজপুর), ঘোড়াঘাট (রঙ্গপুর), বারবাকাবাদ, বাজুহা, শ্রীহট্ট, সুবর্ণগ্রাম, ফতেহাবাদ, চট্টগ্রাম, আকবরনগর (ঢাকা), সেরিফাবাদ, সেলিমাবাদ, মাদারণ, সপ্তগ্রাম, মহম্মদাবাদ (ভূষণা), খলিফিতাবাদ (যশোহর) ও বাকলা নামে ১৯টি সরকার নির্দ্দিষ্ট হয়, এবং প্রত্যেক সরকারের অধীনে যতগুলি পরগণা ও যে পরিমাণ রাজস্ব, তাহাও লিপিবদ্ধ হয়। † কাগজপত্রের যেরূপ কড়াক্কড়, খাজানা আদায়ে সেরূপ কড়াক্কড় ছিল

* আইন-আকবরি।

† Grant's Analysis of Finances of Bengal.

না; অল্প দিনের মধ্যেই অনেক জমিদার খাজানা দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, এবং "খাল্‌সা" অপেক্ষা "জায়গীরেরই" অধিক শ্রীবৃদ্ধি হইতেছিল।

মুর্সিদ কুলী খাঁ সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া মুর্শিদাবাদে রাজধানী সংস্থাপন করিবার সময় হইতেই রাজস্বনির্দ্ধারণকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই কার্য্যে রায় রাইয়ান্ রঘুনন্দন তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া উঠিলেন। রাজস্বনির্দ্ধারণ করিতে হইলে যেরূপ অধ্যবসায় এবং প্রতিভা থাকা আবশ্যক, রঘুনন্দনে তাহার অভাব ছিল না ; তিনি টোডরমল্লের প্রণালীর অনুসরণ করিয়া ধীরে ধীরে সকর ও জায়গীর ভূমির করধার্য্যে অগ্রসর হইলেন। যথাসময়ে রাজস্বসংগ্রহ করিবার জন্য প্রত্যেক সরকারে এক এক জন "ফৌজদার" রাখিবার নিয়ম ছিল ; ব্যয়সংক্ষেপ করিবার জন্য রঘুনন্দন কেবলমাত্র ১৩ জন "ফৌজদার" রাখিবার কল্পনা করিয়া সমুদায় দেশ ১৩টি চাক্‌লায় বিভক্ত করিলেন, এবং সেই সকল চাক্‌লা ১৬৬০ পরগণায় বিভাগ করিয়া তাহার রাজস্ব নির্দ্ধারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে উড়িষ্যায় দুই চাক্‌লা ও বাঙ্গলা দেশে সপ্তগ্রাম, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, যশোহর, ভূষণা, আকবরনগর, ঘোড়াঘাট, কড়াইবাড়ী, জাহাঙ্গীরনগর, শ্রীহট্ট ও ইসলামাবাদ নামে একাদশ চাক্‌লা নির্দ্দিষ্ট হইল। *

*

সুবা	চাক্‌লা	পরগণা	রাজস্ব
উড়িষ্যা	বালেশ্বর	১৭	১০৮৮৭৬
"	হিজ্‌লী	৩৫	৪১৮৫৮৯
বাঙ্গলা	মুর্শিদাবাদ	১১৮	২৯৯৯১২৬
"	বর্দ্ধমান	৬১	২২৪৪৮১২
"	সপ্তগ্রাম	১১৩	১৫৩৯০০৩
"	ভূষণা	১১৫	৬৭৮৫৭৮
"	যশোহর	৭৯	৩৫৩২৬৬
"	আকবরনগর	১১৮	৯২৬২৬৬
"	ঘোড়াঘাট	৪৫১	২১৮০৪১৫
"	কড়াইবাড়ী	২৫	২০২৭০৫
"	জাহাঙ্গীরনগর	২৩৬	১৯২৮২৯৪
"	শ্রীহট্ট	১৪৮	৩১৪৫৫
"	ইসলামাবাদ	১৪৪	১৭৬৭৯৫
		১৬৬০	১৪২৮৮১৮৬

এই সকল পরগণাগুলির রাজস্ব আদায়ের ভার জমিদারদিগের হস্তে
পূর্ব্ববৎ ন্যস্ত হইল। ইহা ব্যতীত নবাব বাহাদুরের পরিবারপালনের জন্য
১০৭০৪৬৫ টাকা আয়ের ৬০পরগণা, আমীরুল ওমরা বক্সী অর্থাৎ প্রধান
সেনাপতির জন্য ২২৫০০০ টাকা আয়ের ১৮ পরগণা, ফৌজদারদিগের জন্য
৮৯২৮০০ টাকা আয়ের ৭৫ পরগণা, সীমান্তরক্ষক মন্‌সবদারদিগের জন্য
১১০৮৫২ টাকা আয়ের ২০ পরগণা, ত্রিপুরা সুসঙ্গ প্রভৃতি পার্ব্বত্যপ্রদেশ
রক্ষার জন্য ৬৯৭৫০ টাকা আয়ের ২ পরগণা, মৌলবী পোষণের জন্য ২৫৬৬৫
টাকা আয়ের ২ পরগণা, নৌয়ারা অর্থাৎ নৌসেনার জন্য ঢাকা প্রদেশে ৯২৩
জন পর্ত্তুগিজ নাবিক ও ৭৬৮ খানি রণতরী রাখিবার জন্য ৭৮৯৫৪ টাকা
আয়ের ৫৫ পরগণা, আসাম প্রদেশের পার্ব্বতীয়দিগের উৎপাত নিবারণ জন্য
৩৫৯১৮০ টাকা আয়ের ১৩৮ পরগণা নির্দ্দিষ্ট হইল। *

রাজস্ব-নির্দ্ধারণকার্য্য যেরূপ কৌশল ও যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন হইয়া
গেল, রাজস্বসংগ্রহের কার্য্যও সেইরূপ দৃঢ়তা ও কঠোরতার সহিত নির্ব্বাহিত
হইতে লাগিল, রঘুনন্দন বুদ্ধিবলে যে রাজস্ব নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন, নবাবের
দৌহিত্রীপতি সৈয়দ রেজা খাঁ বাহুবলে তাহা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন।
ইহাকে সেকালের লোকে মহম্মদ বলিয়া নামকরণ করিয়াছিল। রঘুনন্দনের
নাম অনেকে ভুলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু মহম্মদের নাম এখনও অনেক প্রাচীন
জমিদারবংশের হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়া রহিয়াছে! তাহার মত নির্ম্মম-হৃদয়ে কর-
সংগ্রহ করিতে ও আবশ্যকমত উৎপীড়নের নিত্য নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে
আর কেহ জানিত কি না সন্দেহ। সে প্রথমে অনুচর পাঠাইয়া রাজকর চাহিত,
তৎক্ষণাৎ দিতে না পারিলে জমিদারকে মুর্শিদাবাদে ধরিয়া আনিত; সেখানে
মহম্মদের কুটিল কল্পনা "বৈকুণ্ঠ" † নামে এক নরকহ্রদ খনন করাইয়া যাবতীয়

* Grant's Analysis.

† 'তারিখ বাঙ্গালা' ও 'রিয়াজ-উস্-সালাতিন' নামক পারস্য গ্রন্থে 'বৈকুণ্ঠের' উল্লেখ
দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইতেই যথাক্রমে গ্লাডউইন, স্কট এবং গ্রাণ্ট এই কাহিনী
গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় 'মুর্শিদাবাদ-কাহিনী' সংকলন করিয়া লিখিয়া
রাখিয়াছেন, 'বর্ত্তমান কেল্লার দক্ষিণ তোরণদ্বারের সম্মুখে' ইহার স্থান নির্দ্দেশও হইয়া
থাকে! মুর্শিদ কুলী খাঁর জীবনচরিত সংগ্রহ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
অনেক অনুসন্ধান করিতেছেন; তিনি বলেন, 'বৈকুণ্ঠের' কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা! রাজসাহী
প্রদেশে কিন্তু ইহার জনশ্রুতি এখনও প্রবল!

পূতিগন্ধময় অপবিত্র পদার্থে তাহা পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। রাজস্বপ্রদানে
অসমর্থ হইলে, অথবা শিথিলতাপ্রদর্শন করিলে, জমিদারদিগকে সেই নরক-
হ্রদে ফেলিয়া মহম্মদের অনুচরগণ নির্ম্মমহৃদয়ে পীড়ন করিত, এবং আবশ্যক
হইলে সসৈন্যে যাত্রা করিয়া বিদ্রোহী অথবা অশক্ত জমিদারের ভিটামাটি
উৎসন্ন করিয়া আসিত। * মহম্মদের সুব্যবস্থায় দেশে হাহাকার পড়িয়া
গেল! দুর্ব্বল জমিদারগণ বাড়ী ঘর ফেলিয়া পলায়নপর হইলেন, কেহ কেহ
মহম্মদের নিমন্ত্রণে রাজধানীতে আসিয়া "বৈকুণ্ঠবাস" করিতে লাগিলেন। †
কাহারও কাহারও হাস্যময়ী রাজপুরী বিজনবনে পরিণত হইতে লাগিল! যথা
সময়ে নির্দ্দিষ্ট রাজকর সংগ্রহ করা এবং বৈশাখমাসে তাহা সম্রাটসদনে প্রেরণ
করাই নবাবের একমাত্র উদ্দেশ্য,—সে উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য প্রাচীন
জমিদারগণকে পৈতৃক বাস্তভিটা হইতে চিরনির্ব্বাসিত করিতে কেহই ইতস্ততঃ
করিল না, নবাবও তাঁহাদের করুণক্রন্দনে কর্ণপাত করিলেন না। সুতরাং
অতি অল্পদিনের মধ্যেই মৃত, পলায়িত বা নির্ব্বাসিত জমিদারদিগের প্রাচীন
জমিদারীর রাজস্ব সংগ্রহের জন্য নূতন নূতন জমিদার সৃষ্টি করা আবশ্যক হইয়া
উঠিল;—ইহাই নাটোর-রাজবংশের রাজ্যলাভের ঐতিহাসিক মূলসূত্র।

দেওয়ানখানা হইতে যখন নূতন জমিদারী-বন্দোবস্তের ঘোষণাপত্র প্রচা-
রিত হইতে লাগিল, মহম্মদের ভয়ে তখন অল্প লোকেই সাহস করিয়া জমিদারী
লইবার জন্য আবেদন করিল। দেওয়ান রঘুনন্দন তখন নবাবের প্রিয় সহচর
এবং প্রধান পরামর্শদাতা। তিনি প্রতিভা ও বুদ্ধিকৌশলে যে রাজস্বের নির্ণয়
করিয়া দিয়াছেন, তাহা নিরুদ্বেগে আদায় করিবার জন্য আপন ভ্রাতা রাম-
জীবনের নামে নূতন জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া দিতে লাগিলেন। রামজীবন
বাহুবলে প্রবল পরাক্রমে রাজস্ব সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করায় অতি অল্পদিনের
মধ্যেই নবাবের প্রিয় [illegible]দার বলিয়া ইতিহাসে পরিচিত হইয়া উঠিলেন।
তখন বিনা চেষ্টাতেও অ[illegible]ক জমিদারী রামজীবনের হস্তগত হইতে লাগিল।

রামজীবন পরগণা ল[illegible]পুরের অধিপতি পুঁঠিয়ার রাজাদিগের অধীনে তরফ
কানাইখালির অন্তর্গত[illegible]রে রাজবাটী নির্ম্মাণ করিয়া প্রবল প্রতাপে রাজ্য-
শাসন আরম্ভ করিলেন, এবং নবাবের অনুকম্পায় দিল্লী হইতে ২২ খান
"খেলাত" ও রাজা বাহাদুর উপাধি পাইয়া ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে নাটোরের

* Stewarts' History of Bengal.

† Sir John Shore's Minute—Fifth Report, Vol I.

রাজা বলিয়া পরিচিত হইলেন। * এতদিনের পর রঘুনন্দনের প্রতিভা ও পদগৌরবের সঙ্গে ঐশ্বর্য্য ও রাজশক্তি মিলিত হইল;—অতি অল্পদিনের মধ্যে নাটোর রাজবংশের এরূপ রাজ্যোন্নতি হইতে লাগিল যে, তাহা "রঘুনন্দনী বাড়" অর্থাৎ রঘুনন্দনের পদবৃদ্ধি বলিয়া বাঙ্গলা দেশের প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়া উঠিল।

১৭০৬ খৃষ্টাব্দের সমকালে পরগণা বাণগাছি বিখ্যাত জমিদার গণেশরাম চৌধুরীর অধিকারভুক্ত ছিল। তিনি যথাসময়ে রাজস্ব প্রদান করিতে না পারায় তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া রামজীবনকে বাণগাছির জমিদারী প্রদান করা হয়। ইহাই প্রথম রাজ্যলাভ।

আত্রেয়ী ও করতোয়া নদীর সম্মিলনস্থানের নিকটে সান্তোল রাজ্যের একটি পুরাতন রাজধানী ছিল। একদিন যেথানে বিপুল রাজপুরীর ঐশ্বর্য্যকোলাহলে অট্টালিকা-বেষ্টিত রাজপথ প্রতিধ্বনিত হইত, আজ সেথানে শৃগাল-রোদনে বনভূমি পরিপূরিত হইতেছে; কোথাও বা দুই চারি জন অন্নহীন মলিনমুখ কাঙ্গাল কৃষক নিভৃতে হলচালনা করিতেছে! একটি জরাজীর্ণ পুরাতন দেবমন্দির ভিন্ন সে রাজপুরীর আর কোনও চিহ্নই বর্ত্তমান নাই। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তথন রামকৃষ্ণ নামক একজন ব্রাহ্মণ জমিদার সান্তোলের রাজা। তপ্পে ভাতুড়িয়া ও তদন্তর্গত ২৪১৩৯৭ টাকা বার্ষিক রাজস্বের ১৩ পরগণায় তাঁহার জমিদারী ছিল। † নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা রঘুরাম রায় ও সান্তোলাধিপতি রাজা রামকৃষ্ণই সে সময়ে বিদ্যোৎসাহ ও পুণ্যকীর্ত্তির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। নদীয়ার ন্যায় সান্তোলের রাজধানীতেও তৎকালে বিবিধশাস্ত্রবিশারদ বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বসতি ছিল। সুপণ্ডিত জয়দেব, তর্কবিশারদ রামকৃষ্ণ, দিব্যসিংহ, অনন্তরাম, লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ সান্তোলের রাজসভার অলঙ্কার ছিলেন। ‡

রাজা রামকৃষ্ণ ডেমরার রায়বংশের সর্ব্বাণী দে[illegible] পাণিগ্রহণ করেন, এবং দীর্ঘকাল রাজ্যশাসন করিয়া সর্ব্বাণী দেবীকে ব[illegible]ন রাখিয়া ১১১৭ শকে (১৭২০ খৃষ্টাব্দে) স্বর্গারোহণ করেন। ¶ হরিপুরন, স্বাসী বারিষ্টার শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরীর পূর্ব্বপুরুষ দেওয়ান রামদেব চৌধুরী সান্তোল রাজ্যের

* Ghose's Indian Chiefs etc..

† Grant's Analysis. ‡ লঘু-ভারতম্। ¶ গৌড়ে ব্রাহ্মণ।

সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। রাণী সর্ব্বাণী নিয়ত ধর্ম্মকর্ম্মে জীবন যাপন করিতেন, দেওয়ান রামদেব সমুদায় রাজকার্য্য পরিদর্শন করিতেন। বগুড়ার দশ ক্রোশ দক্ষিণে করতোয়া নদীর প্রাচীন খাদের তীরবর্ত্তী ভাব্‌তা গ্রামে সর্ব্বাণী দেবী এক প্রাচীনতীর্থের লুপ্তোদ্ধার করিয়া,

"করতোয়াতটে গুল্‌ফং বামে বামনভৈরবঃ।
অপর্ণা দেবতা তত্র ব্রহ্মরূপা করোদ্ভবা ॥" *

এই তন্ত্রোক্ত বচন অবলম্বন করিয়া তাহাকে "মহাপীঠ" সংজ্ঞা প্রদান করেন। রাণী সর্ব্বাণী এই সকল পুণ্যকীর্ত্তির জন্য হিন্দুসমাজে সম্মানশালিনী হইলেও রাজস্ব অনাদায়ে নবাব-দরবারে তাঁহার বিরুদ্ধে ক্রমেই অভিযোগ উপস্থিত হইতে লাগিল। অবশেষে একদিন মহম্মদ সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিয়া সান্তোলের রাজপুরী শ্মশানভস্মে পরিণত করিল! রাণী সর্ব্বাণী প্রাণত্যাগ করিলেন। উত্তরাধিকারিহীন সান্তোলরাজ্য দেওয়ান রামদেব চৌধুরীর সহায়তায় ১৭২১ খৃষ্টাব্দ হইতে রাজা রামজীবনের রাজ্যভুক্ত হইয়া গেল। †

কেহ কেহ বলেন যে, "ভাতুড়ীয়াদিগের জমিদার রামকৃষ্ণ ১১১৭ সালে পরলোক গমন করিলে তাঁহার জমিদারী রাণী সর্ব্বাণীর নামেই চলিত ছিল, কিন্তু রঘুনন্দন তাঁহার কার্য্য সম্পাদন করিতেন; অবশেষে অল্পদিনের মধ্যে উত্তরাধিকারিহীনা সর্ব্বাণী দেবীর মৃত্যু হওয়ায়, সেই জমীদারী রঘুনন্দনের ভ্রাতা রামজীবনের নামে হস্তান্তরিত হয়।" ‡

চাক্‌লা মুর্শিদাবাদের অধীন নিজ চাক্‌লা রাজসাহীতে উদিতনারায়ণ নামে এক জন প্রাচীন জমিদার ছিলেন। রাজধানী মুর্শিদাবাদের নিকটবর্ত্তী পরগণে রাজসাহী তাঁহার জমিদারী ছিল। প্রতিভা ও কার্য্যদক্ষতায় উদিতনারায়ণ রঘুনন্দনের সমকক্ষ ছিলেন, এবং উভয়েই নবাবের সমধিক প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাজস্বনির্ণয়ের নূতন বন্দোবস্ত শেষ হইবার পর রাজধানীর

* তন্ত্র-চূড়ামণি।

† নাটোর রাজবংশের বর্ণনা করিতে গিয়া এক জন স্বদেশীয় লেখক বলিয়া গিয়াছেন যে, রাজস্বনির্ণয়কার্য্যে রঘুনন্দন যে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহারই পুরস্কারস্বরূপ নবাব তাঁহাকে সান্তোল রাজ্য অর্পণ করেন। উক্ত লেখক নিজ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, তিনি নাটোর রাজবংশের "কুমার যোগেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের নিকট এই সকল কথা অবগত হইয়াছেন।"

‡ The Rajas of Rajshahi.

ser 112

নিকটবর্ত্তী অধিকাংশ জমিদারীর শাসন, সংরক্ষণ ও রাজস্বসংগ্রহের ভার উদিতনারায়ণের উপরেই ন্যস্ত হয়। এইরূপে বার্ষিক ৯০৫৩২৪ টাকা রাজস্বের ৬৯ পরগণায় উদিতনারায়ণের জমিদারী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। * এই বিস্তীর্ণ জনপদের করসংগ্রহকার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য গোলাম মহম্মদ জমাদার নামক এক জন মুসলমান সেনানায়কের অধীনে দুই শত অশ্বারোহী উদিতনারায়ণের আজ্ঞাধীন ছিল, এবং উদিতনারায়ণ রাজসাহীর রাজা ও নবাব-দরবারের সর্ব্বপ্রধান সামন্ত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কিন্তু অতি সামান্য কারণে উদিতনারায়ণের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। কয়েক মাস বেতন না পাইয়া উদিতের সৈন্যদল বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সংবাদ পাইয়া বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান না করিয়া বাহুবলে বিদ্রোহ নিবারণ করিবার জন্য নবাব একদল সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। নবাব সৈন্যের সঙ্গে উদিতের বিদ্রোহী সৈন্যের যুদ্ধ হইয়া গোলাম মহম্মদ নিহত হইলেন; মনঃক্ষোভে উদিতনারায়ণ আত্মহত্যা করিলেন। † দুই শত সৈন্যের বিদ্রোহ আর কয় দিন থাকিবে? বিদ্রোহ নির্ব্বাপিত হইল, কিন্তু অরাজকতায় রাজসাহী ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল! নীলকণ্ঠ ও শ্রীকণ্ঠ রায় নামে উদিতের দুইটি অল্পবয়স্ক পুত্র বর্ত্তমান ছিল; কিন্তু রাজধানীর নিকটবর্ত্তী রাজসাহীর ছত্রভঙ্গ জনপদ তাহাদের ন্যায় শিশুর শাসনাধীন করা নিরাপদ নহে বলিয়া নবাব রঘুনন্দনকেই রাজসাহী রাজ্য প্রদান করিলেন। রঘুনন্দন ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে ‡ রামজীবন ও তৎপুত্র কালিকাপ্রসাদের নামে রাজসাহী রাজ্য বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন।

বর্ত্তমান রাজসাহী জেলা পদ্মানদীর বামতীরে, উদিতের রাজসাহী রাজ্য তাহার দক্ষিণতীরে অবস্থিত ছিল; সেখানে এখনও পরগণা রাজসাহী বর্ত্তমান আছে। ¶ এই রাজসাহী রাজ্য লাভ করিয়া রাজা রামজীবন রাজসাহীর মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়া নবাব-দরবারের সর্ব্বপ্রধান সামন্তের আসন প্রাপ্ত হইলেন। এই সূত্রে নাটোর রাজবংশের অধিকৃত সমুদায় রাজ্যই "রাজসাহীর জমিদারী" বলিয়া পরিচিত হইল, এবং যখন যে পরগণা রাজসাহী ভিন্ন জেলাভুক্ত হইয়া গিয়াছে, তথাপি রাজসাহীর রাজাদিগের নাটোরের রাজবাটী ও পদ্মার বামতীরস্থ বিস্তীর্ণ ভূভাগ এখনও রাজসাহী বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছে।

* Grant's Analysis. † Stewart's History of Bengal.

‡ গৌড়ে ব্রাহ্মণ।

¶ Hunter's Statistical Accounts of Bengal Vol. IX.

রাজসাহীর রাজ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে রামজীবনের রাজনৈতিক ক্ষমতাও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল,—তিনি সৈন্যবলে ও পদগৌরবে সকলের নিকটেই পরিচিত হইলেন। অতঃপর উদিতনারায়ণের বংশধরগণ নাটোর রাজবংশের নিকট মাসিক বৃত্তি লাভ করিয়া জীবনধারণ করিতে লাগিলেন; রাজসাহীর বিস্তীর্ণ রাজ্য নাটোর রাজবংশের হস্তচ্যুত হইলেও কিছুদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা যে ইংরাজ কালেক্টারের নিকট হইতে বৎসরে ৯৪৮৲ এবং ২৪০৲ টাকা হিসাবে বৃত্তি পাইতেন, তাহা ইংরাজ গবর্মেণ্টের কাগজপত্রে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

রাজসাহীর জমিদারী পাইয়াই নাটোর-রাজবংশ বাঙ্গলার ইতিহাসে সমধিক গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রবিপ্লবে মূল দলিল বিপর্য্যস্ত হওয়ায় ইহার কালনির্দ্দেশ করিতে অনেকে গোলযোগ করিয়াছেন। বাঙ্গলার ইতিহাস-লেখক ষ্টুয়ার্ট সাহেব ১৭০৮ খৃষ্টাব্দের সমকালীন অন্যান্য ঘটনার সহিত এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন; বোধ হয়, তাহা হইতেই নবনারী-রচয়িতা ১১১৫ সালে ইহার কালনির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র ১১২০ সালে এই ঘটনা সংঘটিত হওয়া উল্লেখ করিয়া সম্পূর্ণ নূতন একটি কাহিনীর সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তিনি কি সূত্রে কোন্ কথা জানিয়াছিলেন, কোন স্থানে তাহার উল্লেখ করেন নাই, সুতরাং তাঁহার কোন কথারই সত্য মিথ্যা বিচার করিবার উপায় নাই। তিনি বলেন যে, উদিতনারায়ণ নিজেই বিদ্রোহী হন, এবং রঘুনন্দন তাঁহাকে বন্দী করিয়া পুরস্কারস্বরূপ রাজসাহীর রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। *

রঘুনন্দনের মন্ত্রণাসাহায্যে বাঙ্গলা দেশের অধিকাংশ পরগণাই নবাবের করায়ত্ত হইয়াছে;—ত্রিপুরা, আসাম ও কুচবিহারের স্বাধীন রাজারাও নবাবের প্রসন্নতালাভের প্রত্যাশায় সময়ে সময়ে উপঢৌকন পাঠাইতেছেন, কিন্তু দক্ষিণবঙ্গে একটি নবপ্রতিষ্ঠিত হিন্দুরাজ্য কিছুতেই নবাবের অধীনতা স্বীকার করিতেছে না। যখন সমুদায় বাঙ্গলা দেশ মুর্শীদ কুলি খাঁর পদানত, তখনও

* "In 1120 Uditnarain, the Zamindar of Rajshahi, being discontented with the oppression of the officers of the Nawab, rebelled, collected his adherents, and retired to the hills of Sultanuba. Raghunandana was deputed to arrest him. He seized and confined him in prison for which service he was rewarded with the Zamindari of Rajshahi which he took in 1121 in the name of his brother Ramjiban."—The Rajas of Rajshahi.

দক্ষিণবঙ্গে সীতারামের স্বাধীনপতাকা নবাবের রাজশক্তিকে উপহাস করিতেছিল।

সীতারাম কে? এক জন ইংরাজ ইতিহাসলেখক বলেন যে, "তিনি এক জন দস্যুদলপতি বিদ্রোহী জমিদার;—দস্যুদলের সহায়তায় জলে স্থলে দস্যুতা করিয়া লোকের ধনসম্পত্তি গোমহিষাদি অপহরণ করিতেন, এবং ভূষণা চাক্‌লার মুসলমান ফৌজদারের রাজধানীর নিকটে থাকিয়াও তাহার রাজশক্তির প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিতেন না।" * কথাটি কত দূর সত্য, তাহার আলোচনা করা আবশ্যক,—তাহার সহিত নাটোর রাজবংশের ঘনিষ্ঠ সংস্রব আছে।

আরঙ্গজীবের শাসনসময়ের চরমদশায় ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই ছোট খাট অনেকগুলি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। সেই সময়ে দক্ষিণবঙ্গে ভূষণা চাক্‌লায় মধুমতী-তীরে হরিহর নগরে সীতারাম রায় নামে এক জন দরিদ্র কায়স্থ বাস করিতেন। শ্যামনগর নামে একখানি ক্ষুদ্র তালুক ভিন্ন সীতারামের আর কোন সম্পদ ছিল না;—কিন্তু বাহুবলে, অসীম সাহসে, উজ্জ্বল প্রতিভায়, সীতারাম প্রকৃতিদত্ত সৌভাগ্যগর্ব্বে গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। সত্যের সঙ্গে কল্পনা জড়িত হইয়া সীতারামের কাহিনী এতই জটিল হইয়া উঠিয়াছে যে, এখানে তাঁহার উত্থানপতনের আনুপূর্ব্বিক ইতিহাসের যথাযথ বিচার করিবার অবসর নাই। মূল কথা এই যে,—মুসলমান রাজ্যের অধঃপতনসময়ে সুযোগ বুঝিয়া দক্ষিণবঙ্গে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য সংস্থাপনের আশায়, সীতারাম বাহুবলে ভূষণা চাক্‌লার অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া মহম্মদপুরে রাজদুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার রাজধানীর ও কীর্ত্তিকলাপের ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে।

সীতারাম মুসলমান-রাজ্যে বাস করিয়া একদিনের জন্যও মুসলমানকে কর-প্রদান করেন নাই। বহু বিন্দু জল একত্র মিশিয়া মহাসাগর রচিত হইয়াছে, বহু ধূলিকণা একত্র মিলিয়া পর্ব্বতশৃঙ্গ গঠিত হইয়াছে;—সীতারামও ভাবিয়াছিলেন, বিলাসলোলুপ বাদশাহের দুর্ব্বলমুষ্টি হইতে তিল তিল করিয়া বঙ্গভূমি কাড়িয়া লইয়া পুনরায় হিন্দু রাজ্য গঠন করিবেন। সীতারামের আশার আকাশ-কুসুম মুকুলেই শুকাইয়া গিয়াছে;—কিন্তু তাহার শোভাটুকু সৌরভটুকু ইতিহাস এখনও সযত্নে বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছে! বাঙ্গালীর নিকট সীতারামের

* Stewart's History of Bengal.

সমুচিত সমাদর হয় নাই;—কিন্তু ইতিহাসের কীর্ত্তিমন্দিরে মহারাষ্ট্রকুলপ্রদীপ শিবজীর জন্য যদি অমরসিংহাসন রচিত হইয়া থাকে, তাহার পার্শ্বে কায়স্থ-কুলতিলক সীতারামের বসিবার স্থানের অভাব হইবে না! আশা সফল হয় নাই বলিয়া সীতারামের গৌরব ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না। ইতিহাস যাহাদের ললাটে ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া দুরপনেয় কলঙ্করেখা আঁকিয়া দিয়াছে, তাহাদের ইতিহাসে সীতারামের যোগ্য স্থান কোথায়?

সীতারামকে পরাস্ত করিবার জন্য নবাব যতই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে লাগিলেন, সীতারামের প্রবল পরাক্রম ততই চারি দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িতে লাগিল। অবশেষে আবু তোরাপের পরাজয়ে ও অকালমৃত্যুতে নবাব ভীত হইয়া পড়িলেন। সে সংবাদ বাদশাহের কর্ণগোচর হইবার পূর্ব্বেই যাহাতে সীতারামকে সমুচিত শিক্ষা দিতে পারেন, তাহার জন্য মন্ত্রণা চলিতে লাগিল। অবশেষে মন্ত্রণাদাতা রঘুনন্দনের উপরেই সকল ভার ন্যস্ত হইল। রঘুনন্দন চারি দিক হইতে খাদ্যদ্রব্য বন্ধ করিয়া বাহুবলের সঙ্গে বুদ্ধিকৌশল মিশাইয়া সীতারামকে পরাজয় করিবার জন্য পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারদিগের সাহায্য লইবার পরামর্শ দিলেন, এবং নাটোর রাজবংশের সাহসী ও সুচতুর দেওয়ান দয়ারাম রায়কে সংগ্রাম সিংহের অধীন সৈন্যদলের সহিত ভূষণায় প্রেরণ করিলেন। এতদিন বাহুবলে যাহা অসম্ভব হইয়াছিল, এবার বুদ্ধিকৌশলে তাহা সম্ভব হইল। অল্পদিনের মধ্যেই দয়ারাম সীতারামকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া ভূষণারাজ্যে নবাবের বিজয়পতাকা উড়াইয়া দিলেন। যশোহরের ইতিহাসলেখক বলেন যে, "সীতারাম বন্দিভাবে মুর্শিদাবাদে আনীত হইয়া শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহাকে শূলারোহণে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।" * স্বাধীনচেতা সীতারাম কুক্কুরের ন্যায় বধ্যভূমিতে নীত হইবেন, রাজপথের কৌতূহলপরায়ণ জনপ্রবাহ তাঁহার উদ্দেশে লাঞ্ছনা ও উপহাস বর্ষণ করিবে,—সীতারামের সে কলঙ্ক সহ্য হইল না। তিনি "১৭১৪ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ রাজকারাগারে বিষাক্ত অঙ্গুরীয়ক চুম্বন করিয়া মানব-লীলা সম্বরণ করিলেন!" †

সীতারামের জীবন ও মৃত্যুকাহিনী লইয়া হিন্দু, মুসলমান ও ইংরাজ ইতিহাসলেখকদিগের মধ্যে মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। মুসলমান ইতিহাস-লেখক ও তাঁহার ইংরাজ অনুবাদক বলেন যে, সত্য সত্যই সীতারাম মুর্শিদাবাদে

* Westland's Jessore.

† Westland's Jessore.

শূলদণ্ডে প্রাণবিসর্জ্জন করেন। * জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়া একজন হিন্দু লেখক লিখিয়া গিয়াছেন যে, সীতারাম বন্দিদশায় নাটোর রাজবাটীতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। † ইহার কোন্ কথা সত্য ?

সীতারাম পরাজিত হইলে তাঁহার ভূষণারাজ্য রামজীবন প্রাপ্ত হন ; এবং রামজীবনের কর্ম্মচারী দয়ারাম রায় নবাব দরবার হইতে পুরস্কারস্বরূপ "রায়-রাইয়ান" উপাধি ‡ ও সীতারামের অনেক তৈজসপত্র প্রাপ্ত হন ; তাহার কোন কোন দ্রব্য এখনও দয়ারামের বংশধরদিগের দিঘাপতিয়ার রাজবাটীতে বর্ত্তমান আছে। নাটোর রাজবাটীর একটি অন্ধতমসাচ্ছন্ন জীর্ণ কক্ষ দেখাইয়া লোকে এখনও বলিরা থাকে যে, সেই গুপ্ত কক্ষে সীতারাম বন্দিদশায় প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই জনশ্রুতির মূল কি, তাহা কেহই বলিতে পারে না। সীতারামের মৃত্যু হইলে নবাব দিল্লীর দরবারে সেই সংবাদ দিবার সময়ে লিখিয়া-ছিলেন যে, মুর্শিদাবাদে তাঁহার সমুচিত শাস্তি দেওয়া হইয়াছে। সীতারাম আত্মহত্যাই করুন, আর শূলদণ্ডেই নিহত হউন, তাঁহাকে একবার ধরিতে পারিয়া নবাব যে চক্ষের অন্তরালে নাটোরের রাজকারাগারে রাখিতে দিয়া-ছিলেন, তাহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না।

সীতারামের ত্যুকাল্ লইয়াও কথঞ্চিৎ মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। একজন বাঙ্গালী লেখক স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, খৃষ্টাব্দ ১৭৬৪ পর্য্যন্তও যে সীতারাম জীবিত ছিলেন, তাহা ইংরাজ গবর্মেণ্টের কাগজপত্রেই প্রকাশ আছে। ¶ লেখক যে কাগজপত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দের একখানি সরকারী পত্র ;—তাহাতে লিখিত আছে যে, "দস্যুদল মিষ্টার রস্ সাহেবকে হত্যা করিয়া সীতারামের জমিদারী মধ্যে পলায়ন করিয়াছে।" § ইংরাজগণ বহুদিন পর্য্যন্ত ভূষণা অঞ্চলকে "সীতারামের জমিদারী" বলিয়া উল্লেখ করিতেন ; সুতরাং তাহা হইতে সীতারাম ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত থাকা সিদ্ধান্ত হইতে পারে না !

উদিতনারায়ণের "রাজসাহী রাজ্য" পাইয়া নাটোর রাজবংশের রাজ-নৈতিক পদগৌরব, রামকৃষ্ণের "সান্তোল রাজ্য" পাইয়া হিন্দুসমাজে খ্যাতি প্রতিপত্তি, এবং সীতারামের "ভূষণারাজ্য" পাইয়া চারি দিকে বাহুবলের পরিচয়

* Stewart's History of Bengal. † লঘুভারতম্।

‡ The Rajas of Rajshahi. ¶ গৌড়ে ব্রাহ্মণ।

§ Long's Selections. Vol. 1.

প্রকাশিত হইয়া পড়িল। ইহার পর ক্রমে পরগণার পর পরগণা রামজীবনের হস্তগত হইতে লাগিল, এবং মহারাজা রামজীবন স্বরাজ্যে স্বাধীন নরপতির ন্যায় সমুদায় ক্ষমতাই পরিচালন করিবার অধিকার পাইলেন।

মহারাজা রামজীবন নবাবের প্রিয় জমিদার বলিয়া ক্রমে ক্রমে যে সকল নূতন জমিদারী পাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে কতকগুলি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। সেকালে হাবেলি, মহম্মদাবাদ, সাহুজিয়াল, তুজী, স্বরূপপুর প্রভৃতি কতকগুলি পরগণা কিশোর খাঁ, সমসের খাঁ এনায়েত খাঁর জমিদারী বলিয়া বিখ্যাত ছিল। পরগণে পুখুরিয়ার জমিদারীও তখন ইস্‌কিন্দার বেগ নামক একজন মুসলমান জমিদারের শাসনাধীন ছিল। নরহত্যা অপরাধে এই সকল মুসলমান জমিদার রাজ্যচ্যুত হইলে রামজীবন সেই সকল জমিদারী প্রাপ্ত হন। জামালপুরের জমিদার এনায়েতুল্লা রাজস্বপ্রদানে অসমর্থ হইয়া ফতেহাবাদ প্রভৃতি কয়েকটি জমিদারী রামজীবনের নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন। * এইরূপে যে সকল জমিদারী রামজীবনের হস্তগত হয়, তাহা প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিল, এবং তজ্জন্য তাঁহাকে নবাব সরকারে ১৭৪১৯৮৭ টাকা রাজকর ও ২১৩৯৫ টাকা বাজে জমা, একুনে ১৭,৬৩,৩৮২ টাকা রাজস্ব প্রদান করিতে হইত।

নবাবী আমলে উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদিগকে বেতন দিবার রীতি ছিল না। নবাব, প্রধান সেনাপতি, ফৌজদারগণ—সকলেই বেতনের পরিবর্ত্তে জায়গীর পাইতেন, এবং নৌসেনাদির জন্যও জায়গীর বন্দোবস্ত ছিল। এই সকল জায়গীরের মধ্যে মহারাজা রামজীবনের হস্তে অনেক জায়গীরের শাসন-ভার অর্পিত হয়। তাঁহাকে বৎসরে যে ১৭৪১৯৮৭ টাকা রাজকর দিতে হইত, তন্মধ্যে কেবল ১৬৯৬০৮৭ টাকা "খালসা" জমিদারীর জন্য ; অবশিষ্ট রাজ-করের মধ্যে ৭৬৪ টাকা "আয়মা" এবং ৪৫১৩৬ টাকা জায়গীরের জন্য প্রদান করিতে হইত। জায়গীর বা আয়মার উপর বাজে জমা বার হইত না ; সুতরাং মহারাজা রামজীবন নবাব সরকারে ১৩৯ পরগণাভুক্ত "খালসা" জমিদারীর জন্য ১৩৯৬০৮৭ রাজকর এবং ২১৩৯৫ বাজে জমা প্রদান করিতেন। এই রাজকর ও বাজে জমা ভিন্ন তাঁহাকে আর কিছু দিতে হইত না ; বিস্তীর্ণ জমিদারী হইতে ইহার অতিরিক্ত যত টাকা আদায় হইত, সে সকলই তাঁহার রাজশ্রী বর্দ্ধন করিত। এত অধিক ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া, বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বপ্রধান

* The Rajas of Rajshahi.

সামন্তপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, রঘুনন্দনের প্রভুত্ব ও বুদ্ধিকৌশলের সাহায্যে মহারাজা রামজীবন নবাবদরবারে সবিশেষ প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়া উঠিলেন!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—সামাজিক পদগৌরব।

রাজকার্য্য উপলক্ষে রঘুনন্দকে সর্ব্বদাই নবাব-দরবারে উপস্থিত থাকিতে হইত। সেই জন্য, রামজীবন যেমন নাটোরে রাজবাটী নির্ম্মাণ করিয়া রাজ্য-শাসন করিতে লাগিলেন, রঘুনন্দনও সেইরূপ আজিমগঞ্জের নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরে এক নূতন বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। ইংরাজদিগের নিকট এই স্থান কখন বড়নগর, কখন বা বীরনগর নামে পরিচিত হইয়াছিল, এবং লোকে এখনও ইহাকে "নাটোরের রাজবাটী" বলিয়া থাকে। কিন্তু নাটোর রাজবাটী অপেক্ষা বড়নগরের রাজবাটীর সঙ্গেই বাঙ্গলার ইতিহাসের ঘনিষ্ঠতর সংস্রব। রঘুনন্দন যখন এই বাটীতে বাস করিতেন, তখন তাঁহার সৌহার্দ্যলাভের জন্য বাঙ্গলার ছোট বড় সকল জমিদারকেই কখন না কখন এই বাটীতে পদার্পণ করিতে হইত। মহারাণী ভবানী গঙ্গাবাস উপলক্ষে অধিকাংশ জীবন এই বাটীতেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন, এবং এই বাটীর প্রাচীরসংলগ্ন ভাগীরথীতীরে মহারাজা রামকৃষ্ণ সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিয়াছিলেন। বড়নগর রাজবাটীর আর সে সৌভাগ্য-গর্ব্ব নাই, রাজ্যনাশের সঙ্গে সঙ্গে রাজবাটীও জরাজীর্ণ হইয়া গিয়াছে; কেবল কয়েকটি দেবমন্দির এখনও পূর্ব্ব সৌভাগ্যের নীরব সাক্ষিস্বরূপ ধ্বংসাবশেষের ইষ্টকস্তূপের মধ্যে দৃঢ়-ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। উদিতনারায়ণের রাজসাহী রাজ্যের অধিকাংশ স্থান মুর্সিদাবাদ চাকলার অধীন ছিল, সেই জন্য বড়নগরের রাজবাটীই প্রকৃত পক্ষে রাজসাহী রাজ্যের রাজধানী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল।

এই রাজবাটীতে বসিয়া রঘুনন্দন যেরূপ মন্ত্রণা দিতেন, নাটোর-রাজবাটীতে বসিয়া রামজীবন তদনুসারেই রাজ্যশাসন করিতেন। জনশ্রুতি এইরূপ যে, রামজীবন সাহসী, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মশীল, দীর্ঘকায় * বলিষ্ঠ সুপুরুষ ছিলেন; কিন্তু বাহুবলের অনুরূপ বুদ্ধিকৌশল ছিল না। রঘুনন্দন সেরূপ বীরপুরুষ না হইলেও বুদ্ধিকৌশলের জন্য বাঙ্গলা দেশের মধ্যে এক জন প্রতিভাশালী

* রাজসাহীর কালেক্টারীতে "মহারাজা রামজীবনের হাতকাঠীর" একটি মাপ আছে; তাহা ২২ ইঞ্চি।—তাহাই যদি প্রকৃতপ্রস্তাবে রামজীবনের হাতের মাপ হয়, তবে তিনি যে সবিশেষ 'দীর্ঘকায়' ছিলেন, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

মন্ত্রণাকুশল "মুৎসুদ্দি" বলিয়া সুপরিচিত হইয়াছিলেন। উভয় ভ্রাতাই সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন; শিক্ষার সঙ্গে প্রতিভা মিলিত হইয়া রঘুনন্দনকে সমধিক ক্ষমতাশালী করিয়া তুলিয়াছিল। রঘুনন্দনের সেই অসীম ক্ষমতাই রাজ্যলাভের মূল কারণ; কিন্তু সেকালের ভ্রাতৃপ্রেম দুই ভাইকে এক বৃন্তের যুগল কুসুমের মত এমন অভেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল যে, রঘুনন্দন সর্ব্বতোভাবে রাজসাহীর বিস্তীর্ণ জনপদের প্রভু হইয়াও জ্যেষ্ঠের নিকট দাসের ন্যায় ব্যবহার করিতেন, এবং প্রতিভা ও ক্ষমতাবলে নবাব-দরবার হইতে যখনই কোন নূতন জমীদারী পাইতেন, তাহা জ্যেষ্ঠের চরণেই উৎসর্গ করিয়া দিতেন।

মুর্সিদ কুলী খাঁর নবাবী আমলে কেবলমাত্র বীরভূমিই যবন জমিদারের অধিকারভুক্ত ছিল; তদ্ভিন্ন প্রায় সমুদায় চাক্‌লাতেই হিন্দু জমিদারদিগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। সেই সকল হিন্দু জমিদারদিগের মধ্যে দিনাজপুরাধিপতি শূদ্রবংশীয় রামনাথ, নবদ্বীপাধিপতি ব্রাহ্মণবংশীয় রঘুরাম, এবং নাটোরাধিপতি রামজীবন ও রঘুনন্দনই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিচিত ছিলেন। রাজ্যপ্রাপ্তি ও ক্ষমতাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক পদগৌরবলালসা স্বভাবতই প্রবল হয়;—রামজীবন এবং রঘুনন্দনও ক্রমে সামাজিক পদগৌরববৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠিলেন।

প্রাচীন ভারতবর্ষে মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতাদি ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজক ঋষিদিগের অনুশাসনক্রমেই হিন্দুসমাজ পরিচালিত হইত; কিন্তু মুসলমানাধিকারসময়ে বাঙ্গলা দেশে কিছু কিছু মতবিবর্ত্তন আরব্ধ হইয়াছিল। শকাব্দা ১২৫০ সালের সমকালে "বারেন্দ্রনন্দনাবাসীয় ভট্টদিবাকরাত্মজ শ্রীমৎ কুল্লুক ভট্ট" মেধাতিথি-বিরচিত প্রাচীন মানব-ভাষ্যের দোষ দেখাইয়া "মন্বর্থমুক্তাবলী" * নামক

* "সারাসারবচঃ প্রপঞ্চনবিধৌ মেধাতিথেশ্চাতুরী
স্তোকং বস্তুনিগূঢ়মল্পবচনাদ্গোবিন্দরাজো জগৌ।
গ্রন্থেঽস্মিন্ ধরণীধরস্য বহুশঃ স্বাতন্ত্র্যমেতাবতা
স্পষ্টং মানবমর্থতত্ত্বমখিলং বক্তুং কৃতোঽয়ং শ্রমঃ॥
প্রায়ো মুনিভির্ব্বিবৃতং কথয়ত্যেষা মনুস্মৃতেরর্থং।
দশভিগ্রন্থসহস্রৈঃ সপ্তদশযুতৈঃ সূনৃতা বৃত্তিঃ॥
সেয়ং ময়া মানবধর্ম্মশাস্ত্রে ব্যধায়ি বৃত্তির্ব্বিদুষাং হিতায়।
দুর্ব্বোধজাতেদুরিতক্ষয়ায় ভূয়াৎ ততো মে জগতামধীশঃ॥"
"সমাপ্তৈষা শ্রীমৎকুল্লুকভট্টবিরচিতা মন্বর্থমুক্তাবলী।"

একখানি নূতন টীকার প্রচলন করেন। ন্যায়শাস্ত্রবিশারদ অভিনব "গৌড়ীয় পণ্ডিতগণ" নূতন নূতন যুক্তি তর্ক উপস্থিত করিয়া প্রাচীন স্মৃতির পরিবর্ত্তে বাঙ্গলা দেশে নব্যস্মৃতির প্রচলন করেন। কালক্রমে জীমূতবাহনের "দায়ভাগ" এবং রঘুনন্দন স্মার্ত্তশিরোমণির "অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের" সঙ্গে বল্লালসেনের প্রতিষ্ঠিত কৌলীন্যপ্রথা প্রচলিত, এবং বাঙ্গলা দেশের হিন্দুসমাজে অনেকগুলি নূতন নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

বল্লালসেন শ্রেণীবিভাগ ও কুলমর্য্যাদানিরূপণ করিয়াই নিরস্ত হইয়াছিলেন, বিবাহাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করেন নাই। সুতরাং কুলীন এবং শ্রোত্রীয়ের মধ্যে কন্যা আদানপ্রদানের কোনরূপ প্রতিবন্ধক ছিল না; কুলীন পিতা আবশ্যকমত শ্রোত্রীয় বরে কন্যাদান করিলেও কুলচ্যুত হইতেন না। কুল্লুকভট্টের সমসময়ে কাশ্যপগোত্রীয় ভাদুড়ীবংশে তর্কশাস্ত্রবিশারদ বৃহস্পতি আচার্য্যের ঔরসে উদয়নাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। * তিনি বারেন্দ্রদেশে অভিনব সমাজ-সংস্কার আরম্ভ করিয়া দিলেন। কৌলীন্যসংস্থাপক বল্লালসেন "ভাদড়াঃ পংক্তি-পূরকাঃ" বলিয়া ভাদড়গ্রামী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগকেও কুলীন করিয়াছিলেন; উদয়নাচার্য্য নিতান্ত অনাবশ্যকবোধে তাঁহাদিগকে কুলচ্যুত করিয়া দিলেন। কুলীনগণ শ্রোত্রীয় বরে কন্যাদান করিতেন, ইহা তাঁহার বিচারে বড়ই অকীর্ত্তিকর ও গ্লানিজনক বলিয়া বিবেচিত হইল। "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি"—ইহা অনেক দিনের পুরাতন কথা। সেই পুরাতন মহাজন-প্রদর্শিত পথারোহণে কুলীনগণ দুষ্কুল শ্রোত্রীয় হইতে "স্ত্রীরত্ন" গ্রহণ করিবার অধিকারী; কিন্তু তাই বলিয়া জানিয়া শুনিয়া সেই দুষ্কুল শ্রোত্রীয়বরে কন্যাদান করিবেন কেন? উদয়নাচার্য্যের তর্কস্রোতে সমুদয় "সনাতনী প্রথা" ভাসিয়া গিয়া কুলীন পিতার পক্ষে শ্রোত্রীয় বরে কন্যাদান করা রহিত হইল; এবং বারেন্দ্র কুলীনসমাজে "করণ" নামক পরিবর্ত্ত-মর্য্যাদা সংস্থাপিত হইল।

বল্লালসেনের কৌলীন্যের সঙ্গে উদয়নাচার্য্যের কৌটিল্য মিলিত হইয়া কুলীন-কুমারীদিগের সার্ব্বদ্বারিক বিবাহের পথ বন্ধ হইয়া গেল। কুলীন পিতা এবং শ্রোত্রীয় পিতা উভয়েই কুলীন বরের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিলেন; উভয়ের প্রতিযোগিতায় কুলীন বর দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিল, কুলীনদিগের মধ্যে "আচারো বিনয়ো বিদ্যা" ক্রমশঃ দুর্ল্লভ হইয়া উঠিতে লাগিল;—অবশেষে

* কেহ কেহ ইঁহাকেই কুসুমাঞ্জলি-প্রণেতা ন্যায়শাস্ত্রবিশারদ উদয়নাচার্য্য বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কুসুমাঞ্জলি-প্রণেতা কাশ্যপগোত্রীয় ছিলেন না।

বারেন্দ্রসমাজে বহুবিবাহ এবং কু—বিবাহ প্রচলিত হইয়া উঠিল। কুলীনের সদ্‌গুণরাশি কালক্রমে "লীন" হইয়া "কু" টুকু অবশিষ্ট থাকিয়া গেল!

যখনই কোন নূতন মত প্রচারিত হয়, তখনই তাহার স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে দুইটি দল হইয়া থাকে;—উদয়ের সময়েও তাহাই হইল। তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত ভূপতি, ভবানীপতি, চণ্ডীপতি, গৌরীপতি, রুদ্রাণীপতি ও শচীপতি নামক ছয় পুত্র মধু মৈত্রেয়ের কুলবহিষ্কৃত আনন্দ ও অর্জ্জুন নামক পুত্রদ্বয়ের সহিত মিলিত হইয়া এক নূতন দল গঠন করিলেন; কিন্তু প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইয়া এই দল "কাপ" নামে পরিচিত হইল। কাপের ও কুলীনের মধ্যে দলাদলি জাঁকিয়া উঠিতে লাগিল;—কাপের সঙ্গে কন্যা আদান প্রদান করা ত দূরের কথা, তাঁহাদের সঙ্গে আহারাদি করিলেও লোকের কুলচ্যুতি হইতে লাগিল! এই চণ্ডীপতি ভাদুড়ীর "উপকারের করণে" লিপ্ত হইয়া নাটোর-রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ জীবর মৈত্রেয় কাপ-দলে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

কাপের দল দিন দিনই পুষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। কুলীনদিগের নিয়ম যতই কঠিন হইতেছে, তাহাতে লোকের কুলচ্যুতির পথ ততই সহজ হইয়া উঠিতেছে, ইহা দেখিয়া তাহিরপুরের বিখ্যাত শ্রোত্রীয় রাজা কংসনারায়ণ মধ্যস্থ হইয়া কতকগুলি নূতন বিধান প্রচলিত করিয়া দিলেন। ইহাতে কাপদিগের পক্ষে পুনরায় কৌলীন্যলাভের উপায় হইল না বটে, কিন্তু শ্রোত্রীয়বরে কন্যাদান করিয়া কাপ হইতে শ্রোত্রীয় হইবার, এবং শ্রোত্রীয় হইয়া কুলীনবরে কন্যাদান করিয়া সিদ্ধশ্রোত্রীয় হইবার উপায় হইল। জীবর মৈত্রেয়ের বংশধরগণ কাপ হইয়াছিলেন, পরে শ্রোত্রীয়বরে কন্যাদান করিয়া শ্রোত্রীয় হন; রামজীবন ও রঘুনন্দন সিদ্ধশ্রোত্রীয় হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

নান্যাসী-গ্রামী পুরুষোত্তম বেদান্তীর বংশে রাজা কংসনারায়ণ জন্ম গ্রহণ করেন। কুলীনগণের আশ্রয়দাতা বলিয়া বারেন্দ্রসমাজে পদগৌরবে কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। রামজীবন ও রঘুনন্দনের সমসময়ে রাজা কংসনারায়ণের প্রপৌত্র রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ তাহিরপুরে রাজত্ব করিতেন। রামজীবন ও রঘুনন্দন সেই লক্ষ্মীনারায়ণের কন্যার সহিত কুমার কালিকাপ্রসাদের বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সে চেষ্টা ফলবতী হইতে অধিক বিলম্ব হইল না; রাজসাহীর ভবিষ্যৎ মহারাজা "কালু কোঙারকে" কন্যাদান করিতে লক্ষ্মীনারায়ণের কোনরূপ ইতস্ততঃ থাকিলেও, নবাব-দরবারে রঘুনন্দনের প্রভুত্ব থাকায়, তাহা লইয়া লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়াবাড়ি করিতে সাহস পাইলেন না।

কালিকাপ্রসাদের সঙ্গে লক্ষ্মীনারায়ণের কন্যার শুভবিবাহ হইয়া নাটোর-রাজবংশের সামাজিক পদগৌরবলাভের পথ সহজ হইয়া গেল।

বাঙ্গলা দেশ দিল্লী হইতে বহু দূরে অবস্থিত। বাঙ্গলার জলবায়ুর দুর্নামে দিল্লীর দরবার পরিপূর্ণ; সুতরাং বাদশাহেরা বাঙ্গলা দেশ শাসন করিবার চেষ্টা না করিয়া শোষণ করিবার চেষ্টা করাই যুক্তিসঙ্গত মনে করিতেন। সেই জন্য বাঙ্গলার নবাবেরাও এই দেশ যথারীতি শাসন করিবার চেষ্টা না করিয়া ক্রমাগত "দেঁহি দেহি" রবে কর সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতেন; আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য্য জমিদারদিগের হাতেই পড়িয়া থাকিত। রাজা এরূপ উদাসীন হইলে রাজপ্রসাদ না পাইয়া দেশের শিল্প বাণিজ্য ও শিক্ষা ক্রমেই অবসন্ন হইয়া পড়ে। বাঙ্গলার জমিদারগণও যদি নবাবদিগের মত কেবলমাত্র কর-সংগ্রহেই ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন, তাহা হইলে দীর্ঘকাল মুসলমানশাসনাধীন থাকিয়া বাঙ্গালী জাতি একেবারে সভ্যতার নিম্নস্তরে নামিয়া পড়িত। বাঙ্গালী প্রবীণ সুসভ্য আর্য্যজাতি যে নিরক্ষর বর্ব্বর জাতিতে পরিণত হয় নাই, বাঙ্গলার জমিদারগণই তাহার মূলকারণ। তাঁহারা শিল্প বাণিজ্য ও শিক্ষার উন্নতিকল্পে সাধ্যানুসারে উৎসাহদান করিতেন বলিয়া বাঙ্গালীমাত্রেই এখনও তাঁহাদিগের লুপ্তস্মৃতি কৃতজ্ঞহৃদয়ে বহন করিয়া থাকেন। বাঙ্গলার অনেক প্রাচীন জমিদার বংশ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কাহারও কাহারও ইতিহাসবিখ্যাত রাজভাণ্ডার ভিক্ষাপাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে; কিন্তু বাঙ্গালীর নিকট তাঁহাদের বংশগৌরব এখনও বহুমানাস্পদ হইয়া রহিয়াছে।

নাটোর-রাজবংশের রাজোন্নতি ও সামাজিক গৌরববৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের অবশ্য-কর্ত্তব্য সদনুষ্ঠানের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রামজীবন ও রঘুনন্দন যেমন প্রবলপ্রতাপে রাজকর সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, সেইরূপ শিক্ষা ও শিল্প বাণিজ্যের উৎসাহ দিবার জন্যও মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতে আরম্ভ করিলেন।

সেকালে এ দেশে সংস্কৃত, পারসী ও বাঙ্গলা ভাষার প্রচলন ছিল। হিন্দু স্বাধীনতার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে রাজদরবার হইতে সংস্কৃত ভাষা চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছিল। বাঙ্গলা ভাষার তখন পর্য্যন্তও ভাল করিয়া দন্তোদ্গম হয় নাই; সুতরাং একমাত্র পারসী বা উর্দ্দু ভাষাই বহুলরূপে প্রচলিত হইয়াছিল। রাজকার্য্য উপলক্ষে যাঁহাদিগকে নবাব-দরবারে গতিবিধি করিতে হইত, তাঁহারা বাধ্য হইয়া রাজভাষা অভ্যাস করিতেন; কিন্তু সকলেই কোনরূপে

কাজ চালাইবার মত পারসী শিক্ষা করিয়াই মৌলবী হইয়া উঠিতেন, তাহাতে উচ্চশিক্ষার অভাব পূরণ হইত না। অগত্যা সংস্কৃতই উচ্চশিক্ষার একমাত্র সোপান হইয়া উঠিয়াছিল। আজ কাল সংস্কৃতশিক্ষা ভিক্ষোপজীবী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরই একমাত্র আরাধ্য বস্তু, কিন্তু সেকালে রাজা জমিদার ও রাজসভার সদস্যগণ সকলেই সংস্কৃত ভাষায় পরিপক্ক হইতেন; সম্ভ্রান্ত বংশের হিন্দু সন্তান-দিগের পক্ষে সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞতা সাধারণতঃ নিন্দার বিষয় ছিল। অনেকেরই সংস্কৃতশিক্ষায় সবিশেষ অনুরাগ ছিল; কিন্তু অধ্যাপকগণ বিনা মূল্যে বিদ্যা বিতরণ করিতেন বলিয়া তাঁহাদিগের অধ্যাপনাকার্য্যে রাজার সাহায্য আবশ্যক হইত। মুসলমান রাজত্বে হিন্দু জমিদারগণ মুক্তহস্তে সাহায্য-দান না করিলে সংস্কৃতশিক্ষা একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যাইত। কিন্তু রামজীবন ও রঘুনন্দনের সংস্কৃত ভাষার উপর আশৈশব অনুরাগ থাকায়, রাজসাহী রাজ্যে তাঁহাদের উৎসাহে সংস্কৃত শিক্ষা ক্রমেই উন্নতিলাভ করিতে লাগিল।

শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম নামক বিখ্যাত নৈয়ায়িক মহারাজা রামজীবনের এক জন সভাসদ ছিলেন। রামজীবন যে সত্য সত্যই বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম তাহার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ শর্ম্মা ১৬৪৫ শকে (১৭২৩ খৃষ্টাব্দে) পদাঙ্কদূত রচনা করিয়া বঙ্গদেশে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। পদাঙ্কদূতের ললিতলাবণ্যময়ী কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে ভক্ত বৈষ্ণবগণ এখনও আনন্দাশ্রু বিমোচন করিয়া থাকেন। পদাঙ্কদূত ক্ষুদ্র চম্পূ-কাব্য, কিন্তু তাহার ছত্রে ছত্রে যে লিপিকৌশল ও পদলালিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতেই কবির যশঃ চিরজীবী হইয়াছে। কবি কাব্যশেষে লিখিয়া গিয়াছেন,

"শাকে সায়কবেদষোড়শমিতে শ্রীকৃষ্ণশর্ম্মার্পয়ন্
আনন্দপ্রদনন্দনন্দন-পদদ্বন্দ্বারবিন্দং হৃদি।
চক্রে কৃষ্ণপদাঙ্কদূতরচনং বিদ্বন্মনোরঞ্জনং
শ্রীলশ্রীযুতরামজীবনমহারাজাধিরাজাদৃতঃ॥" *

---

* বেণীমাধব দে কোম্পানী বটতলা হইতে পদাঙ্কদূতের যে বিকৃত সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহাতে শেষোক্ত চরণটি একটু বিভিন্ন করিয়া নবদ্বীপাধিপতি রঘুরাম রায়কে লক্ষ্য করা হইয়াছে। অনুসন্ধানপ্রিয় পাঠক তাহা পাঠ করিয়া পদাঙ্কদূতের কবির লেখনী-প্রসূত বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত হইবেন না। এ বিষয়ে "গৌড়ে ব্রাহ্মণ"-রচয়িতা যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত হইল:—

"নমস্কারনিবেদনমেতৎ

১১ আপ্রীল দিবসীয় আপনার পত্র পাইয়াছি। আমার বয়স প্রায় ৬০ বৎসর এবং

বাদশাহ আরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর হইতে মোগলের অবশ্যম্ভাবী অধঃপতন ক্রমেই খরবেগ ধারণ করিতেছিল। এক জন ভাল করিয়া সিংহাসনে বসিতে না বসিতেই আর এক জন আসিয়া বাহুবলে অথবা মন্ত্রণাকৌশলে তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিতে লাগিলেন। মোগলের "ময়ূর-সিংহাসন" যতই ক্রীড়াপুতুলে পরিণত হইতে লাগিল, চারি দিকে ততই ছোট খাট স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করিল ;—সেই বিপ্লবের অনুকম্পায় বাঙ্গলার নবাবও প্রকৃতপ্রস্তাবে স্বাধীন হইয়া উঠিলেন। সময় ও সুযোগ বুঝিয়া এক দল রবাহূত বিদেশীয় বণিক ধীরে ধীরে দৃঢ়পদে বাঙ্গলা দেশে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই বিদেশীয় বণিক এখন সমুদায় ভারতবর্ষের একছত্র সম্রাট ; তাঁহাদের ইতিহাসই নব্য বাঙ্গলার ইতিহাস, তাঁহাদের কাহিনীই ভারতবাসীর নিত্য আলোচনার বিষয়। নাটোর-রাজবংশের, বিশেষতঃ রাণী ভবানীর জীবন-কাহিনীর অনেক ঘটনার সঙ্গে তাঁহাদের সংস্রব ;—সুতরাং বাহুল্যভয়ে ভীত হইলেও, তাঁহাদিগের কথা এবং তাঁহাদিগের কীর্ত্তি-কলাপের কিয়ৎপরিমাণে আলোচনা করিতে হইবে।

বগুড়াতে বিদ্যাভ্যাস এবং বিষয় কার্য্য করিয়াছি। বাটী যাতায়াতে রায়গঞ্জ থানার অন্তঃপাতী ঘুরকাগ্রামের নিকট হইয়া যাতায়াত করিতাম, এবং বহুবার ঘুরকাতে নামিয়া পাক শাক করিয়া খাইয়াছি। ঐ ঘুরকাগ্রামে মোরশেদাবাদ চক্রের ভূতপূর্ব্ব জজ আদালতের পণ্ডিত সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চাননের নিবাস ছিল ; অদ্যাপি তাঁহার বাটীর দালান বর্ত্তমান আছে। পদাঙ্কদূতরচয়িতা শ্রীকৃষ্ণ শর্ম্মা ঐ কৃষ্ণনাথের পিতামহ, এবং তিনি পদাঙ্কদূত রচনা করিয়াছেন, ঐ সুযোগে জ্ঞাত হই। বগুড়ার ত্রিলোচন সিদ্ধান্তের বাটী হইতে আমি একখান পদাঙ্কদূত প্রাপ্ত হই, এবং বাল্যকালে নকল করি, তাহাতে রামজীবন পাঠ ছিল স্মরণ হয়। এবং বগুড়া অঞ্চলের প্রাচীন পণ্ডিতের শুনা এবং বিশ্বাস যে, পদাঙ্কদূত-রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণনাথের পিতামহ এবং নাটোরের রামজীবনের সভাসদ ছিলেন। কৃষ্ণনাথ প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক তাহা আপনিও বোধ হয় শুনিয়াছেন। পদাঙ্কদূত পাঠে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণও নৈয়ায়িক ছিলেন। ১৮৪৩ শকাব্দে শ্রীরামপুর যন্ত্রে ডাক্তার জান্ হেবরলীন্ কর্ত্তৃক দেবনাগরাক্ষরে কাব্যপ্রকাশ ছাপা হয়, তাহাতে যে শ্লোক আছে, তাহাই অবিকল আমি নকল করিয়া উঠাইয়া দিয়াছি। রঘুরামের আজ্ঞাতে পদাঙ্কদূত রচনা হইয়াছে, ইহা আমি পুর্ব্বে শুনি নাই।

নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা রঘুরাম, তৎপিতা রামজীবন। রঘুরাম ১৬৫০ শকে অভাব হন। রামজীবনের অন্তে রঘুরাম রাজা হন। ১৬৪৫ শকে নদীয়ার রামজীবন রাজা ছিলেন না, এই সকল কারণে গৌড়ে ব্রাহ্মণে নাটোরের সভা হইতে পদাঙ্কদূত প্রস্তুত হওয়া লিখিয়াছি। নিবেদনমিতি—শ্রীমহিমাচন্দ্র শর্ম্মা মজুমদারস্য নিবেদনম্।"

পর্ত্তুগালের রাজা ইমানুয়েলের শাসনসময়ে বিখ্যাত নাবিক ভাস্কো ডি গামার উদ্যোগে ভারতবর্ষের পথ আবিষ্কৃত হয় ; পর্ত্তুগিজ নাবিকগণ উৎসাহে উল্লাসে জয়ধ্বনি করিতে করিতে ভারতবর্ষের পশ্চিমোপকূলে পদার্পণ করেন। কিন্তু তাঁহারা পদার্পণ করিয়াই বুঝিতে পারিলেন, যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহা সত্য নহে ;—"ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ ভীরু কাপুরুষ নহে, যাহার ইচ্ছা সেই আসিয়া বাহুবলে বা ছলকৌশলে তাহাদের দেশ কাড়িয়া লইবার সুবিধা নাই ; তাহারা বিদ্যাবুদ্ধি ও বাহুবলে তখন পর্য্যন্তও জাতীয়বিক্রমের পরিচয় দিতেছে"।* দেখিয়া শুনিয়া অগত্যা রাজ্যলাভের দুরাশা পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপীয় নাবিকগণ বণিক্‌বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। এই সংবাদ প্রচারিত হইতে না হইতে, প্রথমে দিনামার, তাহার পর ইংরাজ ও তাহার পর ফরাসীরা আসিয়া ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিলেন। কালক্রমে এই সকল বিদেশীয় বণিক ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই বাণিজ্যালয় স্থাপন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। নবাব মুর্শীদ কুলী খাঁ এই সকল বিদেশীয় বণিকদিগের নিকট হইতে যেরূপ কঠোর হস্তে শুল্কগ্রহণ করিতেন, তাহাতে সকলেই মোগলের অধঃপতনের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন। এখন সুসময় নিকটে দেখিয়া ইংরাজবণিক্-সমিতি দিল্লীর দরবারে এক দল প্রতিনিধি পাঠাইয়া দিলেন। তথায় তোষামোদ, বহুমূল্য উপঢৌকন ও সময়োচিত উৎকোচেরই সমধিক প্রাধান্য জন্মিয়াছিল। ইংরাজগণ সেই সকল ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া হামিল্টন নামক এক জন ইংরাজচিকিৎসকের চিকিৎসাগুণে শীঘ্রই সম্রাট ফরোকশায়ারের শুভদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন।

ইংরাজ বণিকেরা পূর্ব্ব হইতেই কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর নামে তিনখানি গণ্ডগ্রাম লইয়া ভাগীরথীতীরে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া রাজসাহী প্রদেশের নানা স্থানে বাণিজ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এক্ষণে আরও ৩৮ খানি গ্রাম ক্রয় করিয়া ও বিনা শুল্কে বাণিজ্য চালাইবার অধিকারযুক্ত সম্রাটের মোহরাঙ্কিত সনন্দ লইয়া, বাঙ্গলা দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।† ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে এই সনন্দ নবাবের নিকটে উপস্থিত করিবামাত্র নবাব বুঝিতে পারিলেন যে, বাঙ্গলার অন্তর্ব্বাণিজ্য আর বেশী দিন বাঙ্গালীর হাতে থাকিবে না, এবং ইংরাজেরা যেরূপ অকুতোভয় অধ্যবসায়শীল যুদ্ধনিপুণ বণিক্‌জাতি,

---

* Torren's Empire in Asia.

† Torren's Empire in Asia.

তাহাতে তাহারা বাঙ্গলা দেশে ৩৮ খানি গ্রামে দুর্গনির্ম্মাণ করিলে বাঙ্গালীকে সসর্প গৃহবাসের ন্যায় সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকিতে হইবে।

বাঙ্গলার নবাব সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন হইলেও, তখন পর্য্যন্ত বাদশাহের "ফারমাণ" প্রকাশ্যরূপে অমান্য করিতে সাহস পাইতেন না। অগত্যা প্রকাশ্যে বাদশাহের ফারমাণ শিরোধার্য্য করিয়া গোপনে তাহা ব্যর্থ করিবার জন্য নবাবদরবারে মন্ত্রণা চলিতে লাগিল। ইংরাজগণ বিনা শুল্কে স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করিবার অধিকার পাইলেন, কিন্তু জমিদারগণকে গোপনে শাসন করিয়া দেওয়া হইল যে, কেহ যেন সূচ্যগ্র ভূমিও ইংরাজবণিকের নিকট বিক্রয় না করেন। *

এই সময়ে রঘুনন্দন নবাবদরবারের সর্ব্বময় কর্ত্তা, ইংরাজদিগের অধিকাংশ বাণিজ্যস্থান রাজসাহীর জমীদারীর অন্তর্গত ; সুতরাং ইংরাজেরা যখন উচিত-মূল্য দিয়া একখানি গ্রামও ক্রয় করিতে পারিলেন না, তখন রঘুনন্দনের মন্ত্রণার উপরেই দোষারোপ করিতে লাগিলেন। ইহাই বাঙ্গালী জমিদারদিগের সঙ্গে ইংরাজের প্রথম বিবাদ ; সে বিবাদে নখাগ্রগণনীয় ইংরাজ বণিককেই পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। † কিন্তু বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার পাইয়া ইংরাজ বণিক জলে স্থলে সর্ব্বত্রই নিজমূর্ত্তি ধারণ করিতে আরম্ভ করিলেন ; এবং দেশের নিরীহ লোকের উপর অনেক অন্যায় উৎপীড়ন হইতে আরম্ভ হইল।

ইংরাজদিগের এই সকল অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্য নবাব তাঁহা-দিগের অন্তর্ব্বাণিজ্যে বাধা প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। নবাবদরবারের বিচক্ষণ দেওয়ান রঘুনন্দন রায় বাদশাহের ফারমাণ হইতেই প্রমাণ করিয়া

* Stewart's History of Bengal.

† "The prudent foresight of Moorshud cooly khan, added to his resentment at the success of the Embassy, made him behold with indignation the concession of this article; but not daring openly to oppose the Imperial mandate, he privately threatened the proprietors of the land with denunciations of his vengeance, if they parted with their ground upon any terms that should be offered: and the Companys servants confiding too much in the sanction of the Emperor's firman, neglected the more efficacious means of bribing the Nuwab to compliance with their wishes. Thus the most important concession which had been obtained by the Embassy was entirely frustrated."——Stewart's History of Bengal.

দিলেন যে, পান গুপারি তামাক গুড় প্রভৃতি গরিবলোকের নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য লইয়া অন্তর্ব্বাণিজ্য করিবার জন্য ইংরাজগণ কোনই ক্ষমতালাভ করেন নাই। অগত্যা ইংরাজ বণিক অন্তর্ব্বাণিজ্য ত্যাগ করিয়া কলিকাতা হইতে ইউরোপে পণ্যদ্রব্য পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। ইংরাজের নিশান উড়াইয়া যাহারা জলে স্থলে কলিকাতাভিমুখে পণ্যদ্রব্য বহন করিত, তাহাদিগকে কিছুমাত্র শুল্ক দিতে হইত না। সুতরাং ইংরাজের অধীনে পর্ত্তুগিজ, আর্ম্মানী, মোগল এবং হিন্দুরাও কলিকাতায় বাস করিয়া বাণিজ্য-ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিতে লাগিলেন ; সামান্য গণ্ডগ্রাম হইতে কলিকাতা একটি সমৃদ্ধিশালী মহানগরে পরিণত হইতে লাগিল।

মুর্শীদ কুলী খাঁ বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ, সত্যনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয় ও ন্যায়পরায়ণ নবাব বলিয়া হিন্দুমুসলমানের নিকট সুপরিচিত। তিনি সুরাপান করিতেন না, একটিমাত্র সহধর্ম্মিণীতে অনুরক্ত থাকিয়া সর্ব্বদা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রাজকার্য্য পরিদর্শন করিতেন, এবং কঠোর শূলদণ্ডে দস্যু তস্কর নিধন করিয়া এবং বিদেশে খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ রহিত করিয়া, জমিদারদিগের সহায়তায়, অকুতোভয়ে বাঙ্গলা দেশে রাজত্ব করিতেন।

যদিও সহসা মুর্শীদ কুলি খাঁকে তাড়িত করিয়া কাহারও পক্ষে সিংহাসন কাড়িয়া লওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, তথাপি দিল্লীর দরবারের ছত্রভঙ্গ অবস্থা দেখিয়া মহম্মদাবাদের দুই জন পাঠান জমিদার সেনা সংগ্রহ করিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী জনপদ লুণ্ঠন করিয়া, পথিমধ্যে নবাবের ৬০০০০ টাকা অপহরণ করিয়া ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। তৎকালে আহসান আলিখাঁ হুগলীর ফৌজদার এবং নবাবের সবিশেষ প্রিয়পাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন। নবাব তাঁহার উপরেই এই বিদ্রোহদমনের ভার সমর্পণ করিলেন। আহসান্ আলীর চেষ্টায় অতি অল্পদিনের মধ্যেই বিদ্রোহী পাঠানদ্বয় বন্দিদশায় মুর্শিদা-বাদে আনীত হইল। মুসলমান বলিয়া তাহাদের প্রাণরক্ষা হইল, কিন্তু যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়া নবাব তাঁহাদের মহাম্মদাবাদের জমিদারী তাঁহার প্রিয় জমিদার রামজীবনকে অর্পণ করিলেন। রাজকোষের যে ৬০০০০ টাকা অপহৃত হইয়াছিল, তাহা পার্শ্ববর্ত্তী সমুদায় জমীদারদিগকে অংশানুসারে পূরণ করিয়া দিতে হইল। *

মুর্শীদ কুলী খাঁ ইহার পর অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। মৃত্যুকাল নিকট

* Stewart's History of Bengal.

হইতেছে দেখিয়া, তিনি স্নেহভাজন দৌহিত্র সরফরাজখাঁকে বাঙ্গলার সিংহাসনে বসাইবার আশায় দিল্লীতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সরফরাজের পিতা সুজাখাঁ উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন, তিনি পুত্রের সিংহাসনলাভের সম্ভাবনায় সুখী হওয়া দূরে থাকুক, নিজেই পুত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া গোপনে গোপনে দিল্লীতে প্রার্থনা জানাইতে আরম্ভ করিলেন। আমীরল্ উমরাখাঁন্ দৌরান্ তখন দিল্লীর দরবারের সর্ব্বময় কর্ত্তা। তিনি নামে বাঙ্গলার নবাব হইয়া সুজাখাঁকে বাঙ্গলার রাজপ্রতিনিধি করিতে সম্মত হইলেন। সুজাখাঁ সেই সংবাদে আশ্বস্ত হইয়া বৃদ্ধ নবাব মুর্শীদ কুলীখাঁর মৃত্যুদিনের অপেক্ষায় উৎকণ্ঠার সঙ্গে দিন গণনা করিতে লাগিলেন।

কুলীখাঁর শেষ জীবন এই সকল কারণে বড়ই তমসাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। জীর্ণ শরীর ক্রমেই অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল; উৎসাহ ও কার্য্যতৎপরতাও ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। কুলীখাঁর সৌভাগ্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নাটোর রাজবংশের সম্পদ লাভ হইয়াছিল, আবার কুলীখাঁর শেষ জীবনের দুঃখবিষাদের সঙ্গে সঙ্গে নাটোর রাজবংশেও দুঃখবিষাদ উপস্থিত হইতে লাগিল!

১১৩১ সালে (১৭২৪ খৃষ্টাব্দে) মহারাজ রামজীবনের একমাত্র সুযোগ্য পুত্র কুমার কালিকাপ্রসাদ সহসা কালগ্রাসে পতিত হইলেন! পুত্রশোক দারুণ শোক, বৃদ্ধ বয়সে সেই শোক শেলের মত রামজীবনের বুকের মধ্যে বিঁধিল। তাহার যন্ত্রণা না ভুলিতেই সেই বৎসরেই রাজসাহী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, নবাবের মন্ত্রণাকুশল প্রিয়সহচর, মহারাজ রামজীবনের দক্ষিণবাহু, নাটোর রাজবংশের উজ্জল প্রদীপ, রায় রাইয়ান রঘুনন্দন ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন! কুলীখাঁ অল্পদিনের মধ্যেই চিরশান্তির আশ্রয় গ্রহণ করায় সুজা ও সরফরাজের মধ্যে সিংহাসন লইয়া প্রতিযোগিতা উপস্থিত হইল।

সুজাখাঁ বাঙ্গলার নবাব হইলেন,—সরফরাজ পিতার সঙ্গে পারিয়া উঠিলেন না। নবাব হইয়াই সুজা খাঁ পূর্ব্বসুহৃদ্ হাজি আহমদ ও আলিবর্দ্দী নামক দুই জন সুশিক্ষিত মুসলমানকে আনিয়া সর্ব্বময় কর্ত্তা করিয়াছিলেন। রঘুনন্দন নাই, রাজকুমার কালিকাপ্রসাদ নাই,—সুতরাং এতদিন নবাবদরবারে রাজসাহীর রাজার জন্য যে উচ্চাসন নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহাতে বসিবার আর কেহই রহিল না। শোকসন্তপ্ত বৃদ্ধ মহারাজ শাখাপত্রহীন শুষ্কতরুর ন্যায় শেষ ঝটিকার অপেক্ষায় নাটোর রাজবাটীতে বসিয়া বিষণ্নহৃদয়ে দিন গণনা করিতে লাগিলেন।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্র।

বৈজ্ঞানিক সার-সংগ্রহ।

অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র।

অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসুর নাম বোধ হয় পাঠকপাঠিকাগণের নিকট অপরিচিত নাই। স্বাধীন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তাঁহার নাম কেবল ভারতবর্ষে নয়,—সমগ্র সভ্য জগতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। জগদীশচন্দ্রের বৈদ্যুতিক আবিষ্কারের বিবরণ পাঠ করিয়া, তাঁহার গবেষণার মৌলিকতায় পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকসম্মিলনীমাত্রই বিস্মিত হইয়াছেন। য়ুরোপপ্রবাসকালে লর্ড কেলভিন্ প্রভৃতি আচার্য্যগণ জগদীশচন্দ্রকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এবং য়ুরোপীয় নানা বিজ্ঞানসভার সভ্যগণ, তাঁহাকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া, সম্মানসূচক বহু উপাধি প্রদান করিয়াছেন।—এরূপ গৌরব অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। য়ুরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিতগণ কোন্ বিশেষ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত হইলে, রাজভাণ্ডার হইতে যথেষ্ট বৃত্তি পাইয়া থাকেন, এবং আবশ্যকানুযায়ী যন্ত্রাদিও রাজব্যয়ে প্রস্তুত হইয়া থাকে;—এইরূপে বিজ্ঞানবিদ্‌গণ সর্ব্বদা নিরুদ্বেগে গবেষণায় রত থাকিয়া, অল্পায়াসেই নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেন। আমাদের দেশে তদনুরূপ সুব্যবস্থা কিছুই নাই;—কৃতবিদ্য ভারতসন্তানগণ ছাত্রজীবনের শেষেই, আর্থিক অসচ্ছলতার কঠোর তাড়নায় বিচলিত হইয়া পড়েন; পূর্ব্বাধীত প্রিয়বিদ্যার চর্চ্চা চিরজীবনের মত ত্যাগ করিয়া, নীরস ব্যবহারশাস্ত্রের অধ্যয়নে রত হন। এ অবস্থায় বঙ্গসন্তানের নানাচিন্তাক্রান্ত মস্তিষ্কে স্বাধীন বৈজ্ঞানিক চিন্তার স্থান থাকিতে পারে কি? সৌভাগ্যের বিষয়, জগদীশচন্দ্র পাঠসমাপনান্তে ব্যবসায়ান্তরে প্রবিষ্ট হন নাই, নচেৎ বঙ্গের শত শত কৃতবিদ্য হতভাগ্যের ন্যায় তাঁহার প্রতিভাও আজীবন মলিন ও নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিত। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করিয়া তাঁহার অতি অল্পই অবকাশ থাকে; এই অত্যল্প সময়ে বিজ্ঞানচর্চ্চা করা, এবং গবেষণার উপযোগী যন্ত্রাদির অভাবে স্বয়ং যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া একটা মহৎ আবিষ্কার করা, কত অধ্যবসায়, শ্রম ও উন্নত প্রতিভার পরিচায়ক, পাঠক পাঠিকাগণ বিবেচনা করুন।

অধ্যাপক বসু বৈদ্যুতিক তরঙ্গসম্বন্ধে অনেক নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন। বিজ্ঞানজ্ঞ পাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় জানেন, "ঈথর" নামক এক সর্ব্বব্যাপী অতি সূক্ষ্ম পদার্থের কম্পনে আলোকের উৎপত্তি হয়,—এবং ইহারই কম্পনভেদে তড়িৎ ও চৌম্বকশক্তির বিকাশ হয়। উক্ত ঈথরস্থ তড়িৎ-তরঙ্গ দ্বারা যে এক প্রকার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অদৃশ্য আলোক উৎপন্ন হইতে পারে, এত দিন দার্শনিকগণ সে কথা জানিতেন না,—ডাক্তার বসু এই ব্যাপার আবিষ্কার করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। উল্লিখিত অদৃশ্যালোকের একটা বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, সাধারণ আলোক যে সকল পদার্থের বাধা অতিক্রম করিতে অসমর্থ, উক্ত আলোক তাহার অধিকাংশগুলিই অবাধে অতিক্রম করিয়া বহির্গত হইতে পারে,—ইষ্টক, কাষ্ঠ, প্রস্তর, নাতিস্থূল ধাতুফলক ইত্যাদি এই বৈদ্যুতিক-তরঙ্গজাত আলোকের অণুমাত্র বাধা উৎপাদন করিতে পারে না; আবার এই আলোক-উৎপাদক তড়িৎ-তরঙ্গ একটি সূক্ষ্ম যন্ত্রের উপর পতিত হইলে টেলিগ্রাফের যন্ত্রের ন্যায় শব্দ করিয়া থাকে;—এই সকল ব্যাপার দেখিয়া বৈদ্যুতিক-তরঙ্গ-সাহায্যে এক প্রকার তন্ত্রীহীন বার্ত্তাবহযন্ত্র শীঘ্রই উদ্ভাবিত হইবে বলিয়া অনেকে আশান্বিত হইয়াছেন। নূতন বার্ত্তাবহযন্ত্রনির্ম্মাণে তড়িৎ-তরঙ্গের উপযোগিতা,

কয়েক মাস হইল, অধ্যাপক বসু কলিকাতাতেই সাধারণসমক্ষে প্রদর্শন করিয়াছিলেন ;—তিনি প্রথমতঃ একটি ক্ষুদ্র গৃহে উক্ত তড়িৎ-তরঙ্গ উৎপন্ন করিয়া, প্রকোষ্ঠান্তরস্থ একটি সজ্জিত বন্দুকের অভিমুখে তরঙ্গ পরিচালন করিয়াছিলেন। তরঙ্গগুলি নির্বাধে গৃহ-প্রাচীর অতিক্রম করিয়া, বন্দুকের বারুদ প্রজ্বলিত করিয়াছিল। বৈদ্যুতিক তরঙ্গে সাধারণ আলোক-তরঙ্গের অনেক ধর্ম্ম পরিলক্ষিত হয়,—স্থূলমধ্য কাচখণ্ড (Lenses) দ্বারা কি প্রকারে সাধারণ আলোক কেন্দ্রীভূত হইয়া বহু দূরে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা বোধ হয় অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন ; নবাবিষ্কৃত বৈদ্যুতিক আলোক উক্ত উপায়ে দূরে প্রেরণের জন্য অধ্যাপক বসু চেষ্টা করিতেছিলেন,—সম্প্রতি এবোনাইট (Ebonitc) নামক একজাতীয় কৃষ্ণপদার্থ দ্বারা স্থূলমধ্য লেন্‌স্ নির্ম্মাণ করিয়া, প্রায় এক মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে তড়িৎ-তরঙ্গ প্রেরণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। যথেচ্ছ ব্যবধানে তরঙ্গপ্রেরণের সুব্যবস্থার জন্য আজ কাল বহু উদ্যোগ হইতেছে,—ডাক্তার বসু যে প্রকার ঐকান্তিকতার সহিত অদ্যাপি উপস্থিত বিষয়ে নিয়োজিত রহিয়াছেন, তাহাতে শীঘ্রই তাঁহার শ্রম সার্থক হইবে, এরূপ আশা করা যায়।

ডাক্তার বসু, বৈদ্যুতিক-তরঙ্গের উৎপাদন, এবং এই তরঙ্গের অস্তিত্বপরীক্ষার উপযোগী দুইটি যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়াছেন। যন্ত্রদ্বয় অতীব সূক্ষ্ম ও সুগঠিত,—জগদীশচন্দ্র এই যন্ত্রযুগলে একাধারে মৌলিক গবেষণা ও যান্ত্রশিল্পের চরমোৎকর্ষের উদাহরণ দিয়া জগতকে আরও মোহিত করিয়াছেন। অতি অল্পকালের মধ্যে উক্ত যন্ত্রযুগলের সাহায্যে বিদ্যুৎতরঙ্গের কার্য্য ও ইহার প্রকৃতিসম্বন্ধে নানা তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই আবিষ্কারগুলির অধিকাংশই অতীব জটিল,—বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার আলোচনা সাধারণ পাঠকগণের চিত্তাকর্ষক হইবে না বলিয়া, অধুনা ক্ষান্ত থাকিলাম।

তড়িৎ-তরঙ্গের কার্য্যাদিসম্বন্ধে যে সকল আবিষ্কার হইয়াছে, তন্মধ্যে একটি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের বিশেষ উপযোগী হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। পাঠকপাঠিকাগণ দেখিয়া থাকিবেন,—কোন স্বচ্ছ তরলপদার্থে একটি বস্তু অর্দ্ধমগ্ন করিলে, বস্তুটির মজ্জমান অংশ, অমগ্ন অংশ হইতে ঈষৎ ভ্রষ্ট হইতে দেখা যায় ; কাচপাত্রস্থিত পরিষ্কার জলে, একটি পেন্সিলের কিয়দংশ বক্রভাবে মগ্ন করিলে, ইহার বেশ পরীক্ষা হয় ;—লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই পেন্সিলটি জলের ঠিক্ উপরিভাগে ভগ্ন হইয়া, নিম্নে বাঁকিয়া আছে, এইরূপ বোধ হইবে। অন্ধকার কক্ষে ক্ষুদ্রছিদ্রাগত আলোক-রশ্মি জলপূর্ণ পাত্রে পড়িতে দিলেও, রশ্মি-পথ বাঁকিয়া যায়।—যে সরল পথে আলোক পাত্রে পতিত হয়, সেই সরলপথক্রমে ইহা কিছুতেই জলে প্রবিষ্ট হয় না। স্বচ্ছ পদার্থমাত্রই এই প্রকার আলোকপথ পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে,—কিন্তু এই পথ-পরিবর্ত্তনের (Refraction) পরিমাণ সকল পদার্থে সমান দেখা যায় না ; নানা স্বচ্ছ পদার্থ লইয়া পরীক্ষা করিলে, প্রত্যেক জাতীয় পদার্থে ইহার পরিমাণ পরস্পর পৃথক্ দৃষ্ট হয় ;—কেরোসিন্ তৈল ও বিশুদ্ধ জলে আলোকপথ বাঁকিবার পরিমাণ পরীক্ষা করিলে, উভয় ফলের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় ; কিন্তু কেবল কেরোসিন তৈল লইয়া বহু পরীক্ষা করিলেও এটির পরিমাণ সকল সময়ে অপবিবর্ত্তনীয় দৃষ্ট হইবে। ইহার সাহায্যে অনেক সময় কেবল আলোকপথপরিবর্ত্তনের পরিমাণ পরীক্ষা করিয়া, পদার্থটি কি, তাহা বৈজ্ঞানিকগণ অনায়াসেই স্থির করিতে পারেন। পূর্ব্ববর্ণিত তড়িৎ-তরঙ্গজাত আলোক ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য হইলেও, কোন পদার্থের মধ্য দিয়া বহির্গত হইবার সময়, সাধারণ আলোকের ন্যায় বক্রপথ অবলম্বন করে।—ডাক্তার বসু তাঁহার নবোদ্ভাবিত যন্ত্র দ্বারা,—কোন্ কোন্ পদার্থে কি পরিমাণে আলোকপথপরিবর্ত্তন হয়, তাহা অভ্রান্তরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্বচ্ছ পদার্থগুলিতে আলোকপথপরিবর্ত্তনের পরিমাণ পরি-

জ্ঞাত থাকিলে, যে কোন স্বচ্ছপদার্থে সাধারণ আলোকের পথপরিবর্ত্তনের পরিমাণ নিরূপণ করিয়া, কি প্রকারে পদার্থের জাতিনির্দ্দেশ করা যায়, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।—এখন ডাক্তার বসুর যন্ত্র দ্বারা বৈদ্যুতিক অদৃশ্যালোকের পথ পরীক্ষা করিবার সুযোগ হওয়ায়, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পদার্থমাত্রেরই জাতিনিরূপণের একটি সুন্দর উপায় পাওয়া গিয়াছে। মর্ম্মর প্রস্তর বা গজদন্তে আলোকপথপরিবর্ত্তনের পরিমাণ পরিজ্ঞাত থাকিলে, সেই সেই পদার্থে নির্ম্মিত বহুমূল্য বস্তু সকল অকৃত্রিম মর্ম্মরময় বা গজদন্তনির্ম্মিত কি না, এখন অনায়াসেই বলা যাইবে। বৈদ্যুতিক তরঙ্গের আর একটি বিশেষ ধর্ম্ম আছে,—কোন বস্তুর মধ্যে “গাঁইট্” থাকিলে, তড়িৎ-তরঙ্গ তাহা ভেদ করিয়া বহির্গত হইলে, তরঙ্গের কম্পন কিঞ্চিৎ বিকৃত হইয়া যায় ; এই প্রকারে প্রবেশ ও বহির্গমনকালে তরঙ্গের কম্পনের অবস্থা তুলনা করিলে, বস্তুমাত্রেরই আভ্যন্তরীণ অবস্থা ঠিক্ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। ইহা দ্বারা কাষ্ঠময় ও প্রস্তরাদিনির্ম্মিত বস্তুক্রয়কালে, ক্রেতৃগণের বস্তু মনোনীত করিবার যে বিশেষ সুবিধা হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ডাক্তার বসুর বৈদ্যুতিক তরঙ্গসম্বন্ধীয় গবেষণা আজও শেষ হয় নাই। ইতিমধ্যে তাঁহার আবিষ্কারাদিসম্বন্ধে যে সকল কথা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সকলই অতীব বিস্ময়কর। জগদীশ্বর ডাক্তার বসুকে কার্য্যক্ষম দীর্ঘজীবন দান করুন।

ভারতে সূর্য্যগ্রহণ।

আগামী ২২শে জানুয়ারি ভারতবর্ষে এক সর্ব্বগ্রাসী সূর্য্যগ্রহণ হইবে। সূর্য্যগ্রহণে পূর্ণগ্রাস প্রায়ই দেখা যায় না,—এজন্য য়ুরোপ ও আমেরিকার অনেক বিজ্ঞানসভা হইতে জ্যোতির্বিদ্‌গণ ভারতে আসিয়া, এই সুযোগে সূর্য্যমণ্ডল পরিদর্শন করিবেন। ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান বিজ্ঞানমণ্ডলী হইতে ইতিমধ্যেই কয়েকজন খ্যাতনামা পণ্ডিত এই কার্য্যের জন্য নিযুক্ত হইয়া আসিতেছেন ; সূর্য্যগ্রহণের পূর্ণতা অতি অল্পকালস্থায়ী, এই কারণে অল্পকালমধ্যে বহুবিধ পরিদর্শনাদি সুসম্পন্ন করিবার জন্য নানাপ্রকার উদ্যোগ রহিতেছে।

আলোকাধিক্য ও উজ্জ্বলতানিবন্ধন সৌরমণ্ডল-পরিদর্শন বড় দুরূহ কার্য্য। গ্রহণকালে উজ্জ্বল সূর্য্যমণ্ডল চন্দ্র দ্বারা আবৃত হইয়া রশ্মি সকল ক্ষীণজ্যোতি হইলে, যন্ত্রাদি দ্বারা পরিদর্শনকার্য্য অতি সহজসাধ্য হইয়া থাকে। এই সকল কারণে পূর্ণসূর্য্যগ্রহণ জ্যোতিষিগণের নিকট বিশেষ আদরের সামগ্রী হইয়াছে। সূর্য্যগ্রহণই সৌরাকাশপরিদর্শনের একমাত্র অবকাশ ; পাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় জানেন, পৃথিবীর ন্যায় সূর্য্যেরও আকাশ আছে।* কিন্তু এই আকাশ কেবল জ্বলন্ত বাষ্পে পূর্ণ ; গ্রহণকালে সূর্য্যমণ্ডল আবৃত হইলে, ইহার বাষ্পাবরণমাত্র কেবল দৃষ্টিগোচর থাকে ; পণ্ডিতগণ সেই অত্যল্প সময়ের মধ্যে রশ্মিনির্ব্বাচন যন্ত্রাদি দ্বারা, ইহার আলোক পরীক্ষা করিয়া, কোন্ কোন্ পদার্থ সৌরাকাশে বর্ত্তমান আছে, তাহার আবিষ্কার করেন। কয়েকটি পূর্ণগ্রহণে পণ্ডিতগণ পূর্ব্বোক্ত প্রকার পরিদর্শনাদি দ্বারা সূর্য্যের বাষ্পাবরণের গঠনসম্বন্ধে অনেক বিষয় জানিতে পারিয়াছেন। অনেকে বোধ হয় জানেন, সূর্য্যমণ্ডলে নির্দ্দিষ্টসময়ান্তে একপ্রকার কৃষ্ণচিহ্ন দেখা যায় ;—এগুলি কয়েক মাস সূর্য্যমণ্ডলে থাকিয়া, আবার বিলীন হইয়া যায় ; সময় সময় ইহাদের আকার এত বৃহৎ হয় যে, তৎকালে নগ্ন চক্ষুতেও স্পষ্ট দৃষ্ট হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিকগণ অদ্যাপি ইহার উৎপত্তি-তত্ত্বের নিরূপণ করিতে পারেন নাই ;—অনেক পণ্ডিত অনুমান করেন, সৌরাকাশস্থ জ্বলন্ত বাষ্পরাশি কোন কারণে স্থানান্তরিত হইলে উক্ত সৌর-কলঙ্কের উৎপত্তি হয়।

* সৌরাকাশের অস্তিত্বও এক পূর্ণসূর্য্যগ্রহণকালে আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

কারণে বাষ্পাবরণ স্থানান্তরিত হয়, তাহা আজও অজ্ঞাত রহিয়াছে। প্রকাশ যে, আগামী জানুয়ারির সূর্য্যগ্রহণে, পণ্ডিতগণ সৌরকলঙ্কের কারণ নিরূপণের জন্য বিশেষ যত্নবান হইবেন।

আগামী গ্রহণের পূর্ণগ্রাস ভারতের সকল অংশ হইতে দেখা যাইবে না; কেবল মান্দ্রাজ প্রদেশ, বোম্বাই ও বিহারের কিয়দংশে পূর্ণগ্রাস স্পষ্ট দৃষ্ট হইবে। গত বৎসর মেরু প্রদেশে এক পূর্ণগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল; নানা দেশ হইতে অনেক দার্শনিক সূর্য্য-পরিদর্শনের জন্য বহুব্যয়ে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন;—কিন্তু গ্রহণকালে হঠাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া, পণ্ডিতগণের বহু অর্থব্যয় ও উদ্যম মুহূর্ত্তে বিনষ্ট করিয়াছিল। ভারতের আকাশ পৌষ মাসে সাধারণতঃ অতি পরিচ্ছন্ন থাকে, এবং গ্রহণটিও মধ্যাহ্নকালে হইবে, এই সকল কারণে উপস্থিত আয়োজনে অর্থ ও শ্রমের অপব্যবহার হইবে না বলিয়া অনেকেই আশান্বিত হইয়াছেন। ভারত-গবর্মেণ্টও নিশ্চিন্ত নাই,—কোন্ স্থানে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করিলে দিগ্দেশাগত জ্যোতিষিগণের সুবিধা হইবে, তাহার নিরূপণের জন্য গবর্মেণ্টের জ্যোতিষী ইতিমধ্যেই নিযুক্ত হইয়াছেন, এবং তাঁহাদিগকে সসম্মানে গ্রহণ করিয়া যথোপযুক্ত পরিচর্য্যা করিবারও আয়োজন হইতেছে।

মাইক্রোফোনোগ্রাফ।

জগদ্বিখ্যাত মার্কিন দার্শনিক ও যন্ত্রবিৎ এডিসনের ফোনোগ্রাফ যন্ত্রের কথা অনেকেই অবগত আছেন।—সম্প্রতি ডুসাণ্ড (M. Franty Dussand) নামক জনৈক জর্ম্মান বিজ্ঞানবিৎ, মাইক্রোফোনোগ্রাফ (Microphonograph) নামক ততোধিক বিস্ময়কর আর একটি যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যেমন অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য অতি ক্ষুদ্র পদার্থ বৃহৎ দেখায়,—এই যন্ত্র দ্বারা সেইরূপ অতি মৃদু শব্দ যথেচ্ছ উচ্চ ধ্বনিতে পরিণত হয়। গত বৎসর এক দিবস ডুসাণ্ড, একটি মূক ও বধির বালিকার দুর্দ্দশায় বিশেষ ব্যথিত হইয়া বধির-গণের শ্রবণশক্তি-উজ্জীবনের উপযোগী একটি যন্ত্রনির্ম্মাণে কৃতসংকল্প হন, এবং বৎসরাধিক-কাল কেবল এই চেষ্টায় নিযুক্ত থাকিয়া, সম্প্রতি উক্ত আশ্চর্য্য যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে বধিরগণ যে কোন শব্দ অতি স্পষ্টরূপে শুনিতে পায়,—য়ুরোপীর অনেক মূক-বধির বিদ্যালয়ে উক্ত যন্ত্র দ্বারা শিক্ষাপ্রদানের প্রস্তাব হইতেছে। শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত-গণ বলেন,—বধিরগণের শ্রবণেন্দ্রিয়, প্রথমাবস্থায় বিশেষ বিকল থাকে না, ব্যবহারাভাবে পরে এই ইন্দ্রিয় অত্যন্ত বিকল হইয়া পড়ে। পণ্ডিতগণ অনুমান করিতেছেন, যদি এই যন্ত্র দ্বারা বধিরগণকে ক্রমাগত উচ্চশব্দশ্রবণে অভ্যস্ত করা যায়, তাহা হইলে ক্রমে শ্রবণেন্দ্রিয়ের শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া, তাহারা শীঘ্রই নির্ব্যাধি হইতে পারিবে।

স্থূলতঃ বলিতে গেলে, মাইক্রোফোনোগ্রাফ্ যন্ত্রটি এডিসনের ফেনোগ্রাফ ও আর একটি যন্ত্রের সম্মিলনে নির্ম্মিত, কিন্তু কার্য্য প্রত্যক্ষ করিলে ইহাকে একটি সম্পূর্ণ নূতন যন্ত্র বলিয়াই বোধ হয়। ইহাতে মাইক্রোফোন্ (Microphone) নামক যন্ত্র দ্বারা অতি মৃদু শব্দ উচ্চ করিয়া, পরে সাধারণ ফোনোগ্রাফের প্রথায় তাহা রক্ষিত হইয়া থাকে, এবং শেষে সেই শব্দ যন্ত্র হইতে ইচ্ছামত নির্গত করা হয়। মৃদু শব্দ ইচ্ছানুযায়ী উচ্চ করিবার ব্যবস্থাও অতি সুন্দর ও সূক্ষ্ম,—যন্ত্রের মূল চালক বিদ্যুৎপ্রবাহের পরিমাণ বর্দ্ধিত করিলেই শব্দ যথেচ্ছ উচ্চ হইয়া থাকে।

এই যন্ত্র দ্বারা শারীরতত্ত্ব ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিশেষ উন্নতি হইবে। হৃৎপিণ্ডের অতি মৃদু শব্দগুলিও ইহার সাহায্যে অতি স্পষ্ট শ্রুত হইয়া থাকে; গীতারম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে গায়কের স্নায়ুমণ্ডলীর যে অতি মৃদু স্পন্দন হয়, ডুসাণ্ড উল্লিখিত যন্ত্র দ্বারা তাহারও

স্পন্দনধ্বনি শুনিয়াছিলেন। মানবমনে হঠাৎ চিন্তার উদয় হইলে শরীরের নানা অংশ হইতে রক্ত প্রবাহিত হইয়া মস্তিষ্কে সঞ্চিত হয়; পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, এই শোণিতপ্রবাহ দ্বারা মস্তিষ্কে এক প্রকার শব্দ উৎপন্ন হয়,—কিন্তু এই শব্দ এত মৃদু যে, কোন উপায়েই তাহা এতদিন মানবশ্রবণেন্দ্রিয়ের গোচর হয় নাই; সুতরাং এ পর্য্যন্ত কথাটা অনুমান-মূলকই ছিল,—অধুনা এই যন্ত্রের সাহায্যে কথাটার শেষ মীমাংসা হইবে, অনেকে এমন আশা করিতেছেন। অধ্যাপক ডুসাণ্ড, অভীষ্টযন্ত্রনির্ম্মাণে কৃতকার্য্য হইয়াই নিরস্ত হন নাই; এই যন্ত্রের আরও নানাবিধ উন্নতি করিয়া আগামী ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মহাপ্রদর্শনীতে দিগ্দেশীয় বিজ্ঞানবিদ্গণের পরীক্ষার জন্য রক্ষা করিবেন বলিয়া, এখন হইতেই সচেষ্ট হইয়াছেন।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

অমঙ্গলের সৃষ্টি।

একখানি সাময়িক পত্রের প্রবন্ধে দেখিলাম, বিগত ভূমিকম্পের দুইটি কারণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রথম, বাঙ্গলা দেশের জমীদারেরা গরীব প্রজার উপর বড় অত্যাচার করিয়া থাকেন, সেই জন্য ঈশ্বর তাঁহাদিগকে একটা হাত দেখাইয়া শিক্ষা দিলেন। দ্বিতীয়, প্রবল দুর্ভিক্ষে গরীব লোকের নিতান্ত অন্নাভাব উপস্থিত হইয়াছিল; এখন বহুলোকের ঘর বাড়ী এক সঙ্গে তৈয়ার উপলক্ষে বহুতর লোক মজুরি পাইয়া জীবন রক্ষা করিবে। উভয়ত্রই ঈশ্বরের করুণার পরিচয়।

এক শরে দুইটি শীকার সচরাচর সম্ভব হয় না। একটিমাত্র ঘটনার সৃষ্টি করিয়া এত প্রকাণ্ড দুইটা উদ্দেশ্যের যুগপৎ সাধন করিয়া ফেলা সামান্য ক্ষমতার কাজ নহে। আবার দেখ, করুণার সহিত ন্যায়পরতার কেমন অপূর্ব্ব সম্মিলন সাধিত হইয়াছে। এই দৃষ্টান্তের নিকট আমাদের ইংরাজ গবর্মেণ্টকেও হারি মানিতে হয়!

আমাদের এত অভাব ও এত প্রয়োজন, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসাদে উকীলেরও এত ছড়াছড়ি, তথাপি পয়সা না দিলে কেহ ওকালতনামা গ্রহণ করিতে চাহে না। কিন্তু ঈশ্বরের জন্য অবারিতভাবে বিনাব্যয়ে ওকালতি করিবার জন্য এত লোকে আগ্রহসহকারে প্রস্তুত! অথচ আশ্চর্য্য এই, যে আসামীর পক্ষে লোকে ওকালতী গ্রহণের জন্য এত লালায়িত, তিনি স্বয়ং বিচারফলের প্রতি সম্পূর্ণমাত্রায় উদাসীন, এবং কোন্ বিচারকের নিকট

মীমাংসা হইবে, তাহাও এ পর্য্যন্ত স্থির হইল না। ভূমিকম্প সত্ত্বেও সংসার বিশেষ সুখের স্থান, কিন্তু ইহার বন্দোবস্ত বড়ই রহস্যময়; কিছুতেই বোধগম্য হইতে চাহে না।

আদালতের অস্তিত্ব অসত্ত্বেও ও আসামীর অনুপস্থিতি সত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তি কল্পিত আসামীর জন্য উকীল সাজিয়া সংগ্রামে দাঁড়ান, তাহা হইলে অস্তিত্বশূন্য ফরিয়াদীর হিতার্থেও কেহ না কেহ ওকালতি গ্রহণ করিবে না, এরূপ আশা করিতে পার না।

বাস্তবিক উক্ত প্রবন্ধে যে দুইটি হেতুবাদ প্রদর্শিত হইয়াছে, বিপক্ষ হইতে এইরূপে তাহার ছিদ্র দেখান সম্ভব। প্রথম, অমুক বড়লোক অত্যাচারী ছিলেন, ঘরের দেওয়াল পড়িয়া তাঁহার মস্তকটা চ্যাপ্‌টা হইয়া গিয়াছে, ইহা বেশ সুন্দর দৃশ্য; কিন্তু সেই সঙ্গে অমুক নিরীহ সুশীল ব্যক্তিটারও দেহপিঞ্জর হইতে প্রাণপক্ষীকে তাড়াইবার জন্য এত তাড়াতাড়ির কি প্রয়োজন ছিল?

মনে করিও না যে, এই প্রশ্নেই নিরুত্তর হইতে হইবে। অতি বাল্যকালেই কথামালাতে পড়া গিয়াছিল যে, দুরন্ত বায়সসমাজে বাস করার ফলে নিরীহ সারস পক্ষীকেও নিগৃহীত হইতে হইয়াছিল; দুষ্টের সংসর্গটাও যে পরিহার্য্য পাপ, তাহা জানা উচিত। আবার সে ব্যক্তিকে আকার প্রকারে শিষ্ট শান্ত বোধ হইলেও, তাহার মনের ভিতরে কি ছিল, কে বলিতে পারে? আবার তিনি না হয় কায়মনোবাক্যে নির্দ্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক ছিলেন; কিন্তু তাঁহার সহধর্ম্মিণীটির চরিত্রে এমন কিছু ছিল না যে, তাঁহার বৈধব্যপ্রাপ্তি নিতান্ত আবশ্যক হয় নাই! তাঁহার দোষ না থাক, তাঁর বাপের দোষ ছিল, অথবা পিতামহের দোষ ছিল; এ জন্মে পাপ না করিয়া থাকেন, পূর্ব্বজন্মের সাফাই কি আছে? ব্যাঘ্র ও মেষশাবকের কাহিনী কি একেবারে ভুলিয়া গেলে?

প্রকৃত কথা এই, বিধাতার ন্যায়পরতাতে যখন সংশয় করিবার কোন উপায় নাই, তখন উত্তর-বাঙ্গলা ও আসাম প্রদেশে দুষ্কৃতকারীর যে বিশেষ জটলা হইয়াছিল, সে পক্ষে সন্দেহ নাই। তবে চেরাপুঞ্জীর পাহাড়ের উপর এতটা পাপ কিরূপে শনৈঃ শনৈঃ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে গবেষণা করিতে পার।

ইহুদী জাতির রচিত বাইবেল নামক বিশেষ মান্য ও প্রামাণিক ইতিবৃত্তে দেখা যায়, তাহাদের জেহোবা-নামধেয় জাতীয় ঈশ্বর সময়ে সময়ে অত্যন্ত কুপিত হইয়া আপন প্রিয় ও চিহ্নিত জনসমাজের মধ্যে অত্যন্ত হুলস্থূল ঘটাইয়া

দিতেন। ইহুদী জাতির সহিত তাহাদের বিধাতার কারবারের যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, বিধাতা ঐ জাতিকে আপনার বলিয়া বিশেষরূপে পছন্দ করিয়া পরিণামে অপরিণামদর্শিতা ও হঠকারিতার জন্য অত্যন্ত অনুতাপ করিয়াছিলেন। বিবিধ উপদেশ ও শিক্ষা সত্ত্বেও তাহারা সময়ে সময়ে এমন অবাধ্য হইত ও বিদ্রোহী হইয়া উঠিত যে, বিধাতা দুষ্ট শিষ্ট নির্ব্বোধ সকলকেই আদর্শদণ্ডে দণ্ডিত করিতেন; এবং পরবর্ত্তীকালে প্রদর্শিত তৈমুরলঙ্গ ও জঙ্গিস খাঁয়ের অবলম্বিত নীতির আশ্রয় করিয়া দণ্ডের ভারটা বালবৃদ্ধবনিতার উপরও অপক্ষপাতে সমাবেশ করিতে কাতর হইতেন না। কিন্তু সুধী ব্যক্তি জানেন যে, এইরূপ দণ্ডনীতির ব্যবস্থা না করিলে সকল সময় শাসনকার্য্য সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হয় না। এবং অত্যন্ত আধুনিক সময়ে আমাদের শাসনকর্ত্তারাও পুনা সহরে এই নীতির কতকটা আশ্রয় লইয়া সবিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন।

আজ কাল আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা বাইবেলের জেহোবার ছাঁচে ঈশ্বর নির্ম্মাণ করিয়া নূতন ধরণের উপাসনাপ্রণালীর প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন, তাঁহারা এই প্রাচীন ব্রাহ্মণশাসিত দেশের ইতিহাসটাকে একবারে ওলট পালট করিতে চাহিয়া কতটা সুবুদ্ধির পরিচয় দিতেছেন, তাহা ঠিক বুঝিতে পারি না। অথবা যে শিক্ষাপ্রণালীর কল্যাণে প্রাচীন টোলের স্থানে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় দণ্ডায়মান হইয়াছে, এবং উকীল ও এডিটার ও গ্রন্থকার ও বক্তৃতাকারের যুগপৎ আবির্ভাবে বঙ্গদেশে রৈ রৈ শব্দ পড়িয়া গিয়াছে, তাহার ফল এতদ্ভিন্ন অন্যরূপ আর কি আশা করা যাইতে পারে! বেণ্টিঙ্ক ও মেকলের প্রেতপুরুষ, তোমরা ভারতবর্ষের উর্ব্বর ভূমিতে যে জ্ঞানবৃক্ষের চারা রোপণ করিয়া গিয়াছ, তাহার ফলভোজনে 'পারাডাইস্‌ লষ্ট' হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই!

সে যাহাই হউক, জগতের যে সকল ঘটনা নির্ব্বোধ সাধারণের চোখে নিষ্কলঙ্ক অমঙ্গলরূপে প্রতিভাত হয়, তাহার অভ্যন্তরেও পরম কারুণিকের যে গুপ্ত গূঢ় মঙ্গলময় উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে, তাহার উদ্ঘাটন কেবল নির্ব্বাচিত ও চিহ্নিতের পক্ষেই সম্ভব। নতুবা কে জানিত, ভারতবর্ষের এই ঘোরতর দুঃসময়ে যখন সর্ব্বত্র হাহাকার ও নৈরাশ্যের করুণক্রন্দন উত্থিত হইতেছিল, তখন কোন অখণ্ডবুদ্ধির আশ্রয়, অনন্তশক্তিমান পুরুষ, পাঁচ মিনিটের মধ্যে বাঙ্গলা দেশের সমুদয় পাকাবাড়ী ভূমিসাৎ করিয়া দিয়া লক্ষ লক্ষ অন্নার্থী লোকের

অন্নের সংস্থান করিয়া দিবেন? আমাদের সরকার বাহাদুর এত যে বুদ্ধিমত্তার আস্ফালন করিয়া থাকেন, তাঁহাদেরও মস্তিষ্কের সচলতার পরিচয় এইখানে পাওয়া গেল; যে হেতু তাঁহারা যে কার্য্য একটা আইন পাস করিয়া ও দুটা সঙ্গীনের গুঁতার ভয় দেখাইয়া অক্লেশে সম্পন্ন করিতে পারিতেন, তাহার জন্য দেশ বিদেশে অর্থভিক্ষার যাতনা ও এত করিয়া পার্লেমেণ্টের নিকট কৈফিয়তের যাতনা সহিতে হইত না। উপানৎপ্রদানরূপ পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য প্রাণিবিশেষের জীবননাশে কিছুই নীতিবিরুদ্ধ দেখা যায় না; বিশেষতঃ যখন জীবনদাতা প্রাণীটি নিরীহ স্বভাবের জন্য জনসমাজে সুবিখ্যাত এবং শৃঙ্গসত্ত্বেও আত্মরক্ষণে সর্ব্বতোভাবে অসমর্থ!

দুর্ব্বুদ্ধি লোকে বলিতে ছাড়িবে না যে, অমঙ্গলের অভ্যন্তরেই মঙ্গলহস্ত দেখা যাইতেছে সত্য কথা, কিন্তু করুণার প্রকোপটা আসাম অঞ্চলের চা-বাগীচার উপরে ও তৎসন্নিহিত প্রদেশে না হইয়া, নাগপুর ও প্রয়াগের অঞ্চলে হইলে অধিক গরীবের উপকার হইত, এবং আমরাও বোধ হয় আর একটু অধিক কৃতজ্ঞতাস্বীকারের অবকাশ লাভ করিয়া আনন্দ পাইতাম।

আসামীর পক্ষের উকীলের জয়ধ্বনি দিয়া এইখানে প্রবন্ধের উপসংহার করিলে, প্রবন্ধলেখক পাঠক মহোদয়গণের এতক্ষণ সম্যক্‌রূপে উদ্দীপিত ক্রোধবহ্নির লেলিহান শিখা হইতে পলায়নের অবকাশ পাইতেও পারিতেন, কিন্তু তাহা হইলে যে শিরোনাম ধরিয়া প্রবন্ধের অবতারণা হইয়াছে, তাহার কিছুই সার্থকতা হয় না। সুতরাং দগ্ধ হইবার বিভীষিকা সম্মুখে রাখিয়াও এখন পাপ লেখনীকে বিশ্রাম দিতে পারিলাম না। তবে সাহস এই যে, জাগতিক বিধানের মঙ্গলময়ত্বে সন্দিহান হইলে যদি পাতকের সঞ্চার হয়, জগতের বিধানকর্ত্তার বিধানপ্রণালীতে মঙ্গলময় বা অমঙ্গলময়, যে কোনও উদ্দেশ্যের আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছি বলিয়া আস্ফালন করিলে সেই বিধাতার নিকটই যে মহাপাতক বলিয়া গৃহীত হইবে, তাহাতে সংশয়মাত্র নাই। অজ্ঞান হইতে উদ্ভূত সংশয়ের ক্ষমা থাকিতে পারে, কিন্তু জ্ঞানহীনের পক্ষে জ্ঞানের অভিনয় সর্ব্বতোভাবে মার্জ্জনার অযোগ্য।

জগতে অমঙ্গলের উৎপত্তি-অনুসন্ধানের পূর্ব্বে, প্রথমে অমঙ্গল আছে কি না, ভাবিয়া দেখা উচিত। নতুবা কেহ যদি বলিয়া বসেন, অমঙ্গল আদৌ অস্তিত্বহীন, তাহা হইলে সমুদয় পরিশ্রম পণ্ড হইবার সম্ভাবনা।

পৃথিবীতে যদি জীবের নিবাস বা অভ্যুদয় না থাকিত, তাহা হইলে ধরাপৃষ্ঠ

কম্পিত কেন, সমগ্র ভূমণ্ডল চূর্ণ হইয়া আকাশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইলেও কাহারও কোনও মাথাব্যথা ঘটিত না। এবং ব্যাপারটা মঙ্গলজনক কি অমঙ্গলজনক, তাহা ভাবিবার কোন আবশ্যকতাও উপস্থিত হইত না। জগতে জীবের অস্তিত্ব না থাকিলে এবং জীবের আবার সুখ দুঃখের মধ্যে পার্থক্য বুঝিবার শক্তি না থাকিলে, অমঙ্গল শব্দের অর্থ লইয়া বিচার করিবার অবকাশই উপস্থিত হইত না। অচেতন জড় জগতে মঙ্গলও নাই, অমঙ্গলও নাই।

এক সম্প্রদায় পণ্ডিত আছেন, তাঁহারা জীবমধ্যে কেবল মনুষ্যের ইষ্টানিষ্ট হিসাব করিয়া মঙ্গল ও অমঙ্গলের বাছাই করিয়া থাকেন। যাহাতে মনুষ্যের ইষ্ট আছে, তাহাই মঙ্গল; যাহাতে মনুষ্যের অনিষ্ট, তাহা অমঙ্গল। এই সম্প্রদায়ের মনের ভাবটা এইরূপ। এই প্রকাণ্ড জগৎটা তাহার বৈচিত্র্য লইয়া কেবল মনুষ্যের ভোগের জন্যই বর্ত্তমান রহিয়াছে। এবং মনুষ্য জগৎকে উপভোগ করিতেছে বলিয়াই জগতের এত মর্য্যাদা ও মাহাত্ম্য। মনুষ্যের ভোগের উপযুক্ত না হইলে কোনও পদার্থ সৃষ্ট হইবার বা বর্ত্তমান থাকিবার কোনও প্রয়োজন দেখা যায় না। সৃষ্টিকর্ত্তা মানুষের জন্যই এতটা পরিশ্রম করিয়াছেন, এবং তাঁহার সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে যেটা মানুষের উপভোগে যত সাহায্য করে, সেটার অস্তিত্ব তত দূর সার্থক, এবং সৃষ্টিকর্ত্তারও সৃষ্টি তত দূর সফল, এবং তাঁহার নৈপুণ্য ও বিবেচনাশক্তি তত দূর প্রশংসনীয়। সৃষ্টিকর্ত্তা ধন্য, কেন না, তাঁহার নির্ম্মিত জগৎ আমাদের চক্ষে এমন সুন্দর লাগে, আমাদিগকে এমন প্রীতি দান করে। তিনি ধন্য, কেন না, এত বিচিত্র দ্রব্যের সমাবেশ করিয়া এত বিবিধ উপায়ে আমাদের জীবনরক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। তিনি সুনিপুণ কারিগর, কেন না, এত কৌশল ও এত বুদ্ধিমত্তাসহকারে তিনি যখন যেটি দরকার, যখন যাহা নহিলে অসুবিধা হইবে, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি প্রশংসনীয়, কৃতজ্ঞতাভাজন ও প্রীতিভাজন, কেন না, তাঁহার রচিত জগতের মধ্যে আমরা এত স্ফূর্ত্তিসহকারে বেড়াইতেছি।

সূর্য্য কেমন আশ্চর্য্য পদার্থ! সূর্য্যের উত্তাপ নহিলে আমরা কোথায় থাকিতাম? বিজ্ঞান শতমুখে সূর্য্যের সৃষ্টিকর্ত্তার গুণগান করিতেছে। বায়ু নহিলে আমরা কোথায় থাকিতাম? বিধাতা আমাদিগকে বায়ু দিয়াছেন। জল নহিলে আমরা কোথায় থাকিতাম? তাই বিধাতা আমাদিগকে জল দিয়াছেন। মাধ্যাকর্ষণ না থাকিলে পৃথিবী স্থির থাকিত না, এবং পৃথিবী না থাকিলে আমাদের দাঁড়াইবার স্থল থাকিত না, অতএব মাধ্যাকর্ষণের ব্যবস্থা কেমন

দূরদর্শিতার পরিচায়ক! এমন কি, বিধাতা আমাদের আহারের জন্ত ঘাসের ফলকে শস্তে ও আমাদের শীতনিবারণের জন্য কাপাসের ফলকে তূলায় পরিণত করিয়া কি অপূর্ব্ব মানবহিতৈষিতার পরিচয় দিয়াছেন! পদ্যপাঠ প্রথম ভাগের প্রথম কবিতাতেই যাহা পড়িতে পাই, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ও শাস্ত্রকার ও নীতিকার সকলেরই মুখে একই সুর চিরকাল শুনিতে পাইয়াও মানুষের তৃপ্তি জন্মিল না। মানবের প্রতি যে অপার করুণার বশে বিধাতা চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই করুণার বশেই মানুষের আহারের জন্ত দেশকালানুসারে গোরু ভেড়া হইতে সীল ও শ্বেত ভল্লূকের সৃষ্টি করিয়া কি অপরিসীম প্রীতি দেখাইয়াছেন!

সমগ্র জগৎটাই যখন মনুষ্যজাতির উপকারের ও সুবিধার জন্য নির্ম্মিত ও সৃষ্ট, তখন জগতের মধ্যে যদি এমন কোন পদার্থ থাকে,—যাহা মানুষের কোন কাজে লাগে না, তাহা হইলে সেই পদার্থের অস্তিত্ব নিরর্থক উদ্দেশ্যহীন হইয়া দাঁড়ায়। ইহাতে সৃষ্টিকর্ত্তার কার্য্যপ্রণালীতে দোষারোপ ঘটে, সেই জন্য এক সম্প্রদায়ের পণ্ডিত জাগতিক সমুদয় পদার্থের মনুষ্যের পক্ষে উপকারিতা প্রমাণ করিবার জন্য ব্যস্ত। এবং যদি সহজ চোখে কোনরূপ প্রমাণ না মিলে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে জ্ঞানের উন্নতিসহকারে ইহার উপকারিতা প্রতিপন্ন হইবে, এইরূপ আশ্বাস দিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া থাকেন।

কিন্তু এইখানে একটা খট্‌কা আসিয়া দাঁড়ায়। কোটি সূর্য্যমণ্ডলে পরিপূর্ণ জগতের মধ্যে পৃথিবী একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বালুকাকণামাত্র, এবং এই প্রকাণ্ড জগতের অতি ক্ষুদ্র অংশ লইয়াই মনুষ্যের কারবার। আবার এই পৃথিবীতেই এই কয়েক বৎসর মাত্র হইয়াছে। মনুষ্যের উদ্ভব হইয়াছে, এবং আর কিছু দিন পরে মনুষ্যের আবার বিলোপ হইবে, এ বিষয়ে নিতান্ত মূর্খ ভিন্ন অন্যে সন্দেহ করে না। জগৎটারও সীমা পাওয়া যায় না, এবং কোন কাল হইতে জগৎ বর্ত্তমান আছে, এবং কতকাল ধরিয়া জগৎ রহিবে, তাহারও আদি অন্ত কিছু নিরূপণ হয় না। ক্ষুদ্র সাদি ও সান্ত মনুষ্যশিশুর জন্য এত বড় অনাদি অনন্ত কারখানাটা চলিতেছে, এইরূপ বিশ্বাস করা নিতান্তই অসম্ভব হইয়া উঠে। পৃথিবীর ইতিহাসে মনুষ্য ছিল না, অথচ অন্যান্য জীবজন্তু বর্ত্তমান ছিল, এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে, এবং পৃথিবীর বাহির অনন্ত আকাশে অবস্থিত অসংখ্য পৃথিবীতে জীবজন্তু যে বর্ত্তমান নাই, তাহারও প্রমাণ নাই; এমন কি, পৃথিবীতে জীবের ধ্বংস হইলেও অন্যান্ত গ্রহ নক্ষত্রে জীব বর্ত্তমান

থাকিবে, ইহাই সম্ভব। কাজেই জগৎটা কেবল মানুষের জন্য নির্ম্মিত, এইরূপ বলিতে সকল সময় সাহস কুলায় না। জগৎটা জীবের জন্য, চৈতন্যযুক্ত, সুখ-দুঃখভোগী জীবমাত্রেরই জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, এইরূপ নির্দ্দেশই সঙ্গত হইয়া পড়ে। দূরস্থিত ধ্রুবতারাকে কেবল নাবিকের দিঙ্‌নির্ণয়ের সুবিধার জন্য বিধাতা ঐরূপে স্থাপন করিয়াছেন বলিলে নিতান্ত হাস্যরসের উদ্রেক হয়, কাজেই অন্যান্য অজ্ঞাত জীবলোকের অজ্ঞাত অনির্দ্দেশ্য হিতসাধনই ধ্রুবতারার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য, এইরূপে মন বুঝাইতে হয়।

এই বিচারে অধিক সময় নষ্ট করিবার দরকার নাই। মনুষ্য অথবা মনুষ্যেতর জীব, যাহার চৈতন্য আছে, সুখভোগের ও দুঃখভোগের ক্ষমতা আছে, তাহার সুবিধার জন্য, তাহাকে বাঁচাইবার জন্য ও আরামে রাখিবার জন্য জগতের সৃষ্টি। জগতের অস্তিত্বের উদ্দেশ্যই এই, এবং যে ব্যাপার এই উদ্দেশ্যের অনুকূল, তাহা মঙ্গল, ও যাহা ইহার প্রতিকূল, তাহা অমঙ্গল।

মঙ্গলের উৎপত্তি বেশ বুঝা যায়। কেন না, সৃষ্টিকর্ত্তার উদ্দেশ্যই তাহাই। কিন্তু অমঙ্গলের উৎপত্তি কিরূপে হইল, তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। এবং ইহা বুঝিবার জন্য মনুষ্যের জ্ঞানের ইতিহাসের আরম্ভ হইতে আজি পর্য্যন্ত গণ্ডগোল চলিতেছে।

জীবকে সুখে রাখিবার জন্য ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, অথচ অমঙ্গল সেই সুখের বিঘ্ন উৎপাদন করে। তবে অমঙ্গলের উৎপত্তি কেন হইল?

মঙ্গলটা যেমন জগতের অংশ, অমঙ্গলও সেইরূপ জগতেরই অংশ। উভয়েরই সৃষ্টিকর্ত্তা এক। কিন্তু ইহাতে কতকগুলি দোষ ঘটে।

প্রথম, ঈশ্বর ইচ্ছানুক্রমেই মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়েরই সৃষ্টি করিয়াছেন। জীবকে সুখ দেওয়া ও দুঃখ দেওয়া উভয়ই তাঁহার অভিপ্রায়। জীবকে সুখ ও দুঃখ দিয়াই তাঁহার আমোদ। এই তাঁহার লীলা। ইহাতে তাঁহার লাভ কি, তিনিই জানেন। তিনি রাজার উপর রাজা, বাদশার উপর বাদশা; তাঁহার অভিরুচির উপর কাহারও হাত নাই। তাঁহার খেয়াল ও তাঁহার খেলার অর্থ তিনিই জানেন।

এইরূপ নির্দ্দেশে তর্কশাস্ত্রে কোনও দোষ দেখে না। কিন্তু ইহাতে ঈশ্বরের চরিত্রে নিতান্ত দোষ আসিয়া পড়ে। পরমকারুণিক মঙ্গলময় প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষণ, যাহা ঈশ্বরের পক্ষে একচেটিয়া রহিয়াছে, সেইগুলির আর প্রয়োজ্যতা থাকে না। কাজেই এইরূপ নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিতে হইবে।

যদি বলা যায়, ঈশ্বর সমুদয় মঙ্গলার্থেই সৃষ্টি করিয়াছেন; তবে কি কারণে জানি না, মঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে অমঙ্গলও আসিয়া পড়িয়াছে। অমঙ্গলের উৎপত্তি তাঁহা হইতে হইতে পারে না। অমঙ্গলের উৎপত্তির কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে। অমঙ্গল ঈশ্বরের অনভিপ্রেত, এবং ইহার উন্মূলনের জন্যই ঈশ্বরের সর্ব্বত্র প্রয়াস। কাজেই অমঙ্গলের সৃষ্টি অন্যত্র দেখিতে হইবে।

মনুষ্যের কল্পনা কিছুতেই হঠিবার নহে। মঙ্গলময়ের—ঈশ্বরের প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী অমঙ্গলময় ঈশ্বর কল্পনা করিতে হইয়াছে। এক জন মঙ্গল সৃষ্টি করিয়াছেন, অন্যজন অমঙ্গল সৃষ্টি করিয়া তাঁহার সহিত বিরোধ উপস্থিত করিতেছেন। একের নাম জেহোবা, অন্যের নাম শয়তান। একের নাম অরহ-মজদ, অন্যের নাম আহ্রিমান। উভয়ে চিরন্তন বিরোধ। একে অন্যকে পরাভবের চেষ্টায় রহিয়াছেন। শয়তান জেহোবার বিদ্রোহী। শয়তান জেহোবার কার্য্য পণ্ড করিবার জন্য, তাঁহাকে ঠকাইবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত। উভয়ের মধ্যে চিরকাল হাঙ্গাম চলিতেছে। ঈশ্বর সর্ব্বদা শয়তানকে জব্দ করিবার জন্য ব্যস্ত; কিন্তু শয়তান বুদ্ধিপ্রাচুর্য্যে ও শয়তানীতে শিবাজীরও সমকক্ষ। আরঙ্গজেবের সাধ্য নাই যে, তাঁহাকে করায়ত্ত করেন। তবে শুনা যায়, শেষ পর্য্যন্ত শয়তানের পরাভব হইবে। সেদিন কবে আসিবে, তাহা গণিয়া বলা দুষ্কর।

শয়তানে বিশ্বাস মনুষ্যের পক্ষে অনেকটা স্বাভাবিক। যাঁহাদের ঈশ্বরে ভক্তি যত দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত, তিনিও শয়তানের ভক্তিতে বিশ্বাস করিতে সেই পরিমাণে বাধ্য। গত ভূমিকম্পে অনেকে চুলে চুলে রক্ষা পাইয়া ঈশ্বরকে কত ধন্যবাদ দিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, ঈশ্বর করুণাময়। ভূকম্প ঘটনাটা শয়তানের কাজ, ঘর বাড়ীগুলা সমূলে ভূমিসাৎ করা, মানুষগুলাকে মারিয়া ফেলা, শয়তানের কাজ। ঈশ্বর যাঁহাদিগকে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের ধন্যবাদের আস্পদ হইবেন, তাহা আর বিচিত্র কি? অবশ্য শয়তানের অত্যাচারে যে সকল জননী পুত্রহীনা ও রমণী পতিহীনা হইয়াছে, তাহাদের নিকট ধন্যবাদ দাবী করিবার তাঁহার কোনও অধিকার নাই।

শয়তানের কল্পনা না করিলে ঈশ্বরের মঙ্গলময়ত্বে দোষ পড়ে, কিন্তু তাহাতেও আবার তাঁহার শক্তি সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। ঈশ্বরের শক্তির অপরিসীমত্বে যাঁহারা বিশ্বাসী, তাঁহারা যুক্তিমাত্রের অনুরোধে শয়তানে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না।

কাজেই অন্য কল্পনার আশ্রয় লইতে হয়। মনুষ্যের অমঙ্গল ঈশ্বরের অনিচ্ছাকৃত, কিন্তু মনুষ্যের ইচ্ছাকৃত। মনুষ্য স্বাধীন-ইচ্ছা-বিশিষ্ট জীব। মনুষ্যের জন্য ভাল মন্দ দুইটা রাস্তা আছে; মনুষ্য ইচ্ছা করিলে যে রাস্তায় ইচ্ছা চলিতে পারে। যে ভাল রাস্তায় চলে, ঈশ্বর তাহার ভাল করেন। যে মন্দ রাস্তায় চলে, ঈশ্বর তাহাকে সাবধান করিবার জন্য দণ্ডিত করেন। মানুষ জানিয়া শুনিয়া আপন অমঙ্গল আপনি ডাকিয়া আনে। বিধাতা তাহাকে মঙ্গলের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, সে সেই পথে যায় না, তাহা তাহারই দোষ। মনুষ্যের দোষে অমঙ্গলের উৎপত্তি।

প্রকৃত হইলে কৈফিয়ৎটা সুন্দর হইত, কিন্তু কথাটা মিথ্যা। মনুষ্যের ইচ্ছা স্বাধীনতার একটা পরিচ্ছদ পরিয়া আছে মাত্র। প্রকৃতপক্ষে তাহার ইচ্ছা স্বাধীন নহে। তাহার শারীরিক গঠন তাহার নিজের ইচ্ছা হইতে উৎপন্ন নহে। তাহার সমগ্র মানসিক গঠনও তাহার ইচ্ছামত সে প্রাপ্ত হয় নাই। পিতৃপিতামহাদি সহস্র পূর্ব্বতন পুরুষ তাহার শারীর প্রকৃতি ও তাহার মানস প্রকৃতির জন্মদাতা। সে সেই প্রকৃতি লইয়া জন্মিয়া কর্ম্মভোগ করিতেছে মাত্র। তাহার ইচ্ছা তাহার মানসিক প্রকৃতির একটা অঙ্গমাত্র। সে যেমন ইচ্ছাশক্তি পূর্ব্বপুরুষ হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছে, সে তাহারই ব্যবহার করিতেছে, তজ্জন্য তাহাকে দায়ী করিও না।

আবার, ইচ্ছা না হয় স্বাধীন হইল। তাহার দুর্ব্বলতার জন্য দায়ী কে? সংসারের প্রচণ্ড নির্ম্মম দ্বন্দ্বে সে কি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা আপনার ইচ্ছামত চলিতে পারে? ইচ্ছা থাকিলেও কি তাহার সাধ্য আছে? দুর্ব্বল জীবের সহস্র শত্রু। সহস্র শত্রু তাহাকে গন্তব্য পথে চলিতে দিতেছে না, সহস্র প্রলোভন তাহাকে অপথে টানিতেছে। ভাগ্যবান সে, যে এই শত্রুকুলকে অতিক্রম করিয়া প্রলোভনসমূহ এড়াইয়া আসল পথে চলিতে সমর্থ হয়।

আবার মনুষ্যের পাপে না হয় মনুষ্যের অমঙ্গল উৎপন্ন হইল। কিন্তু অমঙ্গল একটা মনুষ্য মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। মনুষ্যের নিম্নস্থ জীবপর্য্যায়ে যেখানে কোনও নৈতিক পণ্ডিত স্বাধীন ইচ্ছার আবিষ্কার করিতে সাহস করেন না, যেখানে পাপপুণ্য অস্তিত্বহীন ও অর্থশূন্য, সেই মনুষ্যেতর জীবপর্য্যায়ে নিদারুণ নিষ্ঠুর নির্ম্মম জীবনদ্বন্দ্ব কোথা হইতে আসিল? জীবসমাজে যে দুঃখের যাতনার ও মরণের করুণ কোলাহল প্রকৃতির শান্তি ভঙ্গ করিয়া নিরন্তর উত্থিত হইতেছে, তাহার জন্য দায়ী কে? ঈশ্বর সকল জীবের আহারদাতা ও রক্ষা-

কর্ত্তা অহরহ শুনিতে পাওয়া যায়! কিন্তু জীবের আহার জীব, যখন এইরূপ ব্যবস্থা, একের শোণিতপান ব্যতীত অপরের ক্ষুধানিবৃত্তির যখন উপায়ান্তর নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, তখন ঐ নির্দ্দেশের সারবত্তা প্রমাণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে।

চারি দিকেই গোল। ঈশ্বর অমঙ্গলের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলে তাঁহার দয়াময়ত্বে সন্দেহ প্রকাশ হয়। অমঙ্গলের সৃষ্টিভারটা শয়তানের উপর চাপাইলে তাঁহার শক্তির পূর্ণতায় দোষ পড়ে। নিরীহ মনুষ্যকে দায়ী করিলে অত্যাচারপীড়িতের উপর আরও অত্যাচার করা হয়। দায়িত্বশূন্য জীবের যাতনার কৈফিয়ৎ ত একবারে পাওয়াই যায় নাই। অগত্যা বলিতে হয়, অমঙ্গলের উদ্দেশ্য মঙ্গলাত্মক, অগত্যা বলিতে হয়, মঙ্গলসম্পাদনের জন্য অমঙ্গলের বিকাশ। অল্পবুদ্ধি ও দুর্ব্বুদ্ধি মনুষ্য দূরদর্শনে ও সূক্ষ্মদর্শনে অসমর্থ। সম্মুখে স্থূল দৃষ্টিতে যাহা অমঙ্গল, দূরে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাহাই মঙ্গল।

কথা প্রকৃত। অমঙ্গলের পরিণাম মঙ্গল। জীবজগতেই দেখা যাউক। দারুণ জীবনসংগ্রাম, রক্তপাত, দুর্ব্বলের নিগ্রহ, সবলের অত্যাচার, দুঃখ, যাতনা, মৃত্যু; ফলে জীবজগতে অপকৃষ্টের বিলোপসাধন, উৎকৃষ্টের অভ্যুদয়। জীবের উন্নতির এই একই মাত্র উপায়। অভিব্যক্তির এই একমাত্র পথ। ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে বিরাট মনুষ্যের উৎপত্তি, জগতের এই বিবিধ বৈচিত্র্যের আবির্ভাব, বিবিধ সৌন্দর্য্য, বিবিধ রূপের ক্রমিক বিকাশ, সমস্তই একই সূত্র অবলম্বন করিয়া ভালর জয়, মন্দের ক্ষয়, সবলের জয়, দুর্ব্বলের ক্ষয়, সুন্দরের বিকাশ, কুৎসিতের নাশ, ধর্ম্মের অভ্যুদয়, অধর্ম্মের পরাজয়; সর্ব্বত্র এই একই সূত্র। তোমার সুখের জন্য, তোমার উন্নতির জন্য, তোমার আরামের জন্য, প্রকৃতির এই কাণ্ডকারখানা চলিতেছে না। ব্যক্তির জন্য সৃষ্টি নহে, জাতির জন্য সৃষ্টি। ব্যক্তির জীবনে সুখের আশা না থাকিতে পারে, জাতির জীবনে সুখেরই প্রাধান্য। জীবের ইতিহাস সাক্ষিরূপে দণ্ডায়মান। মনুষ্যের ইতিহাস সাক্ষিস্বরূপে দণ্ডায়মান। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে জীবনসংগ্রাম চলিতেছে। কত জীব এই সংগ্রামে নিষ্ঠুরভাবে জীর্ণ পিষ্ট আহত হইয়া ধরাধাম পরিত্যাগ করিল। শুধু জীব কেন? কত জাতি এই ধরাপৃষ্ঠে দিনকতক জীবনের খেলা অভিনয় করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। ভূপঞ্জরের স্তরমালা উদ্ঘাটন করিয়া দেখ। কত মৃত জীবের কঙ্কাল ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। কত অতিকায় হস্তী, কত ভীমকায় কুম্ভীর, কত বিশালদেহ কূর্ম্ম এককালে ধরাপৃষ্ঠে নাচিয়া বেড়াইয়াছিল। এখন তাহারা কোথায়? এখন তাহারা লোপ পাইয়াছে;

তাহাদের শিলীভূত কঙ্কালচয় তাহাদের অস্তিত্বের একমাত্র সাক্ষী হইয়া বর্ত্তমান। তাহারা গিয়াছে, তাহারা জীবনদ্বন্দ্বে পরাভূত হইয়াছে; অন্যে তাহাদের স্থান গ্রহণ করিয়া তাহাদের রাজ্যে নূতন রাজ্যপাট স্থাপন করিয়াছে। পুরাতন গিয়াছে, নূতনের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। দুঃখ যাতনা ও মৃত্যুর পথ অবলম্বন করিয়া তাহারা উন্নত জীবকে তাহাদের অধিকৃত স্থান ছাড়িয়া দিয়াছে। জীবনসংগ্রাম আজিও চলিতেছে। এখন দুঃখ, এখন যাতনা, এখন মৃত্যু। ফলে উন্নতি, ফলে বৈচিত্র্য, ফলে সৌন্দর্য্য, অমঙ্গল হইতে মঙ্গলের আবির্ভাব। অমঙ্গলের ক্ষয়, মঙ্গলের জয়। পাপের ক্ষয়, পুণ্যের জয়। বিশ্বনিয়ান্তর এই অভিপ্রায়, বিশ্বপ্রণালীর এই রহস্য; বিশ্বসৃষ্টির এই উদ্দেশ্য।

ঠিক কথা, দুঃখের পরে সুখ। কিন্তু তাহা হইলে দুঃখের অস্তিত্ব মিথ্যা নহে। অমঙ্গল হইতে মঙ্গলের উৎপত্তি, কিন্তু তাহা হইলে অমঙ্গল অস্তিত্বহীন নহে। বিধাতার বিধান এইরূপ, কিন্তু হায়! বিধান কি অন্যরূপ হইলে চলিত না? মঙ্গল হইতে মঙ্গলের উৎপাদন কি বিশ্ববিধাতারও অসাধ্য ছিল? উন্নতির জন্য, অভিব্যক্তির জন্য, মৃত্যুর পথ ভিন্ন জীবনের পথ নির্দ্দিষ্ট হইলে কি বিধাতার উদ্দেশ্য সিদ্ধিলাভ করিত না? ধর্ম্মের পথ কণ্ঠকাকীর্ণ না করিলে কি তাঁহার করুণাময়ত্বে ব্যাঘাত পড়িত? এ জীবনের শোণিতপাত ভিন্ন কি জীবের উদ্ভবের অন্য উপায় অনন্তবুদ্ধিও আবিষ্কারে সমর্থ হয় নাই? এক বল, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, তাহা হইলে তিনি দয়াময় নহেন। অথবা বল, তিনি দয়াময়, তাহা হইলে তিনি পূর্ণশক্তি নহেন।

এইরূপ স্থলে আর একটা মাত্র পন্থা আছে। মনুষ্যের বুদ্ধি দিগ্বিজয়ী। ইহার অনধিগম্য দেশ নাই; ইহার অসাধ্য কার্য্য নাই। ইঙ্গিতমাত্র মনুষ্য বুদ্ধি না-কে হাঁ ও হাঁ-কে না-তে পরিণত করিতে সমর্থ। তখন আর ভয় কি? নীতিকার ও শাস্ত্রকার, ধর্ম্মপ্রচারক ও দর্শনপ্রচারক, একবাক্যে একস্বরে বলিয়া উঠিবেন, মঙ্গলের রাজ্যে অমঙ্গলের অস্তিত্ব কোথায়? অমঙ্গল একবারে অস্তিত্বহীন। বৃথা তুমি বিভীষিকা দেখিয়া আতঙ্কিত হইতেছ; বৃথা বাক্যব্যয়ে নিজে মজিতেছ ও পরকে মজাইতেছ। মিথ্যা, মিথ্যা, ভ্রান্তি—ভ্রান্তি। তোমার জ্ঞানচক্ষুর উপর যে মোহের আবরণ ও ভ্রান্তির আবরণ অবস্থিত, তাহা অপসারণ করিয়া দেখ; পূর্ণ মঙ্গলে অমঙ্গল নাই। বৃথা স্বপ্নে তুমি শিহরিতেছ, অলীক আতঙ্কে তুমি আতঙ্কিত ও দিশাহারা হইতেছ। ভ্রান্ত তুমি, অন্ধ তুমি, তোমার সম্মুখে জগৎ বিস্তীর্ণ; জ্যোতিতে পূর্ণ, আনন্দে

পূর্ণ। অন্ধ তুমি, তুমি দেখিয়াও দেখিতেছ না, আনন্দের কোলাহলে আমার শ্রবণপথ প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইতেছে। জ্যোতির তীব্র আলোকে আমার নয়ন ঝলসিতেছে। নির্ম্মল প্রভাময় তরঙ্গে বিশ্বের মহাসাগর উথলিতেছে, জ্যোতির তরঙ্গ, প্রেমের হিল্লোল, তরঙ্গে তরঙ্গে আনন্দ উথলিয়া উঠিতেছে। কাহাকে তুমি দুঃখ বলিতেছ? দুঃখই সুখ, দুঃখই আরাম, দুঃখই আনন্দ। কাহাকে তুমি মৃত্যু বলিতেছ? মৃত্যুই জীবন, মৃত্যু জীবনের সার, মৃত্যু জীবনের সোপান, মৃত্যু জীবনের সহচর, আনন্দময়, বিরামময় সহচর।

জ্ঞানীর কথা এইরূপ, ভক্তের কথা এইরূপ, প্রেমিকের কথা এইরূপ। যিনি একাধারে জ্ঞানী, ভক্ত ও প্রেমিক, তিনি সর্ব্বতোভাবে সুখী, তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহার জীবন সুখের জীবন, কেন না, অমঙ্গল তাঁহার নিকট মঙ্গল। অন্ধকার তাঁহার নিকট আলোক। তিনি পিতাপুত্রের অকালমৃত্যুতে বিধাতার মঙ্গলময় আবির্ভাব দেখিয়া সর্ব্বাঙ্গে পুলকিত হইতে পারেন। তিনি অন্নহীন ক্ষুৎপীড়িতের মরণযাতনায় বিধাতায় প্রেমার্পণে অবসর পাইয়া আনন্দলাভ করেন। তিনি সুখী, তিনি আনন্দে বিভোর, তিনি দুঃখের অস্তিত্ব জানেন না। তাঁহার অবস্থাতে আমাদের ঈর্ষ্যার উদ্রেক হয়, তাঁহার চরণে আমরা প্রণত হই, তাঁহার প্রসাদের জন্য আমরা ভিখারী। তিনি অন্ধকারকে আলোতে পরিণত করিয়াছেন, তিনি দুঃখকে সুখে পরিণত করিয়াছেন; তাঁহার নিকট অমঙ্গল মঙ্গলরূপী। তিনি অসাধ্যসাধনে পটীয়ান, তাঁহার ক্ষমতার সীমা নাই। তাঁহার চরণে প্রণাম।

তাঁহার ক্ষমতা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই, কিন্তু তাঁহাকে ভক্তি করিতে আমরা অসমর্থ। তিনি স্বার্থপরতার কঠোর বর্ম্মে আপনাকে আচ্ছাদিত করিয়াছেন, তাঁহাকে আমরা ভয় করি, কিন্তু ভালবাসিতে পারি না। তিনি দুঃখকে সুখে পরিণত করিয়াছেন, স্বয়ং তিনি সুখী। তিনি আনন্দসাগরে ভাসিতেছেন, তিনি অপারশক্তিশালী। আমার সে শক্তি নাই, আমি তাঁহার সুখে সুখী হইব কিরূপে? তিনি চক্ষুষ্মান। তিনি আলোকে রহিয়া আনন্দপূর্ণ; আমি অন্ধ; আমি অন্ধকারে নিমগ্ন থাকিয়া তাঁহার আনন্দে যোগ দিতে অসমর্থ।

বিশ্বজগৎ মঙ্গলে পূর্ণ ও আনন্দে পূর্ণ, স্বীকার করিতে আপত্তি নাই, যদি সেই মঙ্গল শব্দ ও আনন্দ শব্দ প্রচলিত অভিধানসঙ্গত অর্থে ব্যবহৃত না হয়। তাহার অপর অর্থ কিরূপ, তাহা ঠিক আমরা বুঝি না। আমরা মঙ্গল বলিতে

ও আনন্দ বলিতে কথা বুঝিতে পারি, অমঙ্গল ছাড়িয়া ও দুঃখ ছাড়িয়া তাহার অস্তিত্ব নাই। আমাদের নিকট আঁধার ছাড়িয়া আলোক নাই, সাদা ছাড়িয়া কালো নাই, দুঃখ ছাড়িয়া সুখ নাই। জগৎ হইতে যদি আঁধারের বিলোপসাধন করিতে যাই, সঙ্গে সঙ্গে আলোকেরও বিলোপসাধন ঘটিয়া যাইবে। দুঃখকে যদি নির্ব্বাসিত করিতে যাই, সুখও সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বাসিত হইয়া যাইবে। আঁধার ও আঁধার ও আঁধার। নিরবচ্ছিন্ন নিরপেক্ষ আঁধার কেমন, তাহা বুঝিতে পারি না। আবার আলোক আর আলোক আলোক—নিরবচ্ছিন্ন নিরপেক্ষ আলোক কেমন, তাহাও আমাদের কল্পনার অনধিগম্য। আলোকের পার্শ্বে আমরা আঁধার দেখিতে পাই, আঁধার আছে বলিয়াই আমরা আলোকের অস্তিত্ব প্রত্যয় করি। অমঙ্গলকে উড়াইয়া দাও, মঙ্গলকে আটকাইয়া রাখা মনুষ্যবুদ্ধির অসাধ্য; মঙ্গল সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়া যাইবে। অমঙ্গলের পার্শ্বে আছে বলিয়াই মঙ্গলের মঙ্গলত্ব, নতুবা মঙ্গল অস্তিত্বহীন, অর্থশূন্য বাতুলের প্রলাপ।

কবিকল্পিত অলকাপুরে নিত্য বসন্ত বিরাজ করিয়া থাকে। সেখানে মলয়পবন নিরন্তর প্রবাহিত হয়, রাত্রি নিরন্তর জ্যোৎস্নাময়ী; সেখানে যৌবন ভিন্ন জরা নাই, মরণের দ্বার সেখানে রুদ্ধ। সেখানে বিরহ নাই, মিলনের আনন্দ সেখানে সর্ব্বদা বিদ্যমান। কবির কল্পনা এই দেশের সৃষ্টি করিতে সমর্থ বটে, কিন্তু কল্পনার বাহিরে সত্যের রাজ্যে ইহার অস্তিত্ব নাই। এই নিত্য বসন্তে ও নিত্য জ্যোৎস্নায় কবিকল্পনা সুখের অস্তিত্ব দেখিতে পাইতে পারিত, কিন্তু সুস্থ মনুষ্যের স্বাভাবিক কল্পনা এই নিত্য জ্যোৎস্না ও নিত্য বসন্তে সুখ দেখিতে সর্ব্বতোভাবে অক্ষম। অথবা এই প্রাকৃত স্বভাবরাজ্যে জ্যোৎস্নার ও বসন্তের ও আরামের ও মিলনের নিতান্ত অসদ্ভাবের উপলব্ধি করিয়াই বোধ করি কবিকল্পনা এই অতিপ্রাকৃত প্রদেশের নির্ম্মাণে সমর্থ হইয়াছিল। অন্ধকারের পার্শ্বেই জ্যোৎস্না সম্ভব। বিরহদুঃখের পার্শ্বেই মিলনসুখ উপভোগ্য। যে বিরহের দুঃখ ভোগ করে নাই, সে মিলনের সুখ-আস্বাদনে অধিকারী নহে। যে মরণের সম্মুখীন হয় নাই, সে জীবনে মমত্বহীন।

অমঙ্গলকে জগৎ সংসার হইতে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিও না, তাহা হইলে ও মঙ্গল সমেত উড়িয়া যাইবে। মঙ্গলকে যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছ, অমঙ্গলকে সেই ভাবে গ্রহণ কর। অমঙ্গলের উপস্থিতি দেখিয়া ভীত হইতে পার, কিন্তু হইবার কারণ নাই। অমঙ্গলের উৎপত্তির অনুসন্ধান করিতে

গিয়া অকূলে হাবু ডুবু খাইবার দরকার নাই। যেদিন জগতে মঙ্গলের আবির্ভাব হইয়াছে, সেই দিনই অমঙ্গলের যুগপৎ বিকাশ হইয়াছে। একই দিনে একই ক্ষণে, একই উদ্দেশ্যসাধনার্থ উভয়েরই উৎপত্তি। এককে ছাড়িয়া অন্যের অস্তিত্ব নাই, এককে ছাড়িয়া অন্যের অর্থ নাই। যেথান হইতে মঙ্গল, ঠিক সেইথান হইতেই অমঙ্গল। সুখ ছাড়িয়া দুঃখ নাই, দুঃখ ছাড়িয়া সুখ নাই। একই প্রস্রবণ, একই নির্ঝরধারাতে উভয় স্রোতস্বতী জন্মলাভ করিয়াছে; একই সাগরে উভয়ে গিয়া মিশিয়াছে। উভয়ই বা কেন বলি? একই স্রোতস্বতী একই নির্ঝর হইতে বাহির হইয়াছে। এ পার হইতে বলি সুখ, ও পারে দাঁড়াইয়া বলি দুঃখ। দক্ষিণ পারে সুখ, বাম পারে দুঃখ। দক্ষিণে মঙ্গল, বামে অমঙ্গল। দক্ষিণ ছাড়া বাম নাই, বাম ছাড়িয়া দক্ষিণ নাই। যেথানে এ পার নাই, সেথানে ও পারও নাই। সেথানে স্রোতস্বতীও চক্ষুর অগোচর। জগতের ইতিহাসে অমঙ্গলের উৎপত্তির তারিখ-নির্দ্দেশ মহা সমস্যা; কিন্তু সেই তারিখে তাহার সহচর মঙ্গলেরও উৎপত্তি। যদি এককে পরিহার করিতে চাও, তবে অন্যের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। মঙ্গলের অভিমুখে ধাবিত হইতে চাহিতেছ, অমঙ্গল তোমাকে ছাড়িবে না। জগতের নিয়ম এই। অথবা জগতের অস্তিত্ব এই নিয়মের সূত্রে ধৃত রহিয়াছে।

জীবের অভিব্যক্তির ইতিহাস কিরূপ। অভিব্যক্তির নাম উন্নতি, উন্নতি বল, ক্ষতি নাই; কিন্তু উন্নতি অর্থে সুখবৃদ্ধি ও আনন্দবৃদ্ধি বুঝিও না। উন্নতিসহকারে সুখের বৃদ্ধি, উন্নতিসহকারে দুঃখেরও বৃদ্ধি। যখন সুখ ছিল না, তখন দুঃখ ছিল না; যখন সুখের আধিক্য, তখন দুঃখের জ্বালা তীব্রতাময়। অচেতন জগতে জড়জগতে অনুভূতি নাই, অর্থাৎ সুখও নাই, দুঃখও নাই। চৈতন্যের সহ সুখদুঃখ উভয়েরই পার্থক্য বিকাশ। যে যত সুখ বুঝে, যে যত দুঃখ বুঝে, সে তত চৈতন্যময়; তাহার চৈতন্য সেই পরিমাণে স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। জীবপর্য্যায়ে যত উন্নতি, যত অধম হইতে উত্তমের বিকাশ, যত নীচ হইতে উচ্চের উদ্ভব, ততই সুখ দুঃখেরও অধিক বিশ্লেষণ। জীবসমাজে যাহা দেখা যায়, মনুষ্যসমাজেও তাহাই। সভ্যতার উন্নতির অর্থ কি? সুখের উন্নতি কি দুঃখের উন্নতি, তাহার নির্ণয় নাই। কেহ বলে, সভ্যতাবৃদ্ধির সহিত সুখের পরিমাণ বাড়িতেছে, কেহ বলে, দুঃখের পরিমাণ বাড়িতেছে। প্রকৃত কথা, উভয়েরই মাত্রা বাড়িতেছে; কেন না, এককে ছাড়িয়া অন্য স্বতন্ত্র বিদ্যমান থাকিতে পারে না।

অমঙ্গলের জন্মস্থান কোথায়—জিজ্ঞাসা করিতে চাও! মঙ্গলের জন্মস্থান অনুসন্ধান কর। অমঙ্গল কেন? ইহার উত্তরে বলিব, অমঙ্গলই বা কেন! এক প্রাপ্যের উত্তর মিলিলেই অন্যেরও উত্তর মিলিল। অথবা পূর্ব্বের চৈতন্যের উৎপত্তি কোথায়, তাহার অনুসন্ধান কর; চৈতন্যের উৎপত্তি কেন, তাহার উত্তর দাও। চৈতন্য কি? না, সুখে ও দুঃখে পার্থক্যবোধই চৈতন্য। যেথানে সুখে ও দুঃখে পার্থক্যবোধ নাই, সেথানে চৈতন্যও ফুটে নাই। আবার যাহাতে সুখ, তাহা মঙ্গল, যাহাতে দুঃখ, তাহাই অমঙ্গল। কাজেই যেদিন চৈতন্যের সৃষ্টি, সেই দিনই অমঙ্গলের সৃষ্টি। জগতে অমঙ্গল অবর্ত্তমান, জগতে দুঃখ অবিদ্যমান, অথচ চৈতন্যময় জীব কেবল একই শান্তি, একই আরাম, একই আনন্দ উপভোগে বিরত রহিয়াছে; ইহা কল্পনার অগোচর, ইহা চিন্তার অগোচর, ইহা বাতুলতা, অলীক কল্পনা।

অতএব এস বন্ধু, অকারণ আত্মপ্রবঞ্চনার প্রয়োজন নাই। অমঙ্গলের অপলাপ করিও না, অমঙ্গলকে সম্মুখে দেখিয়াও উড়াইয়া দিবার চেষ্টা পাইও না। সত্যের আশ্রয় কর, মিথ্যাচার বর্জ্জন কর। অমঙ্গলকে মানিয়া লও, অমঙ্গল তোমার সহচর, তোমার চৈতন্যের সহচর, তুমি ছাড়িতে চাহিলেও সে তোমাকে ছাড়িবে না। যতদিন তোমার জাগ্রদবস্থা, মঙ্গল ও অমঙ্গল সমানভাবে তোমার আত্মাকে জড়াইয়া থাকিবে। যতদিন তোমার জাগ্রদবস্থা স্ফূর্ত্তি পাইবে, ততদিন মঙ্গলের সঙ্গে অমঙ্গলও নিত্য নিত্য ফুটিয়া উঠিবে। যখন অমঙ্গলের তিরোধান হইবে, তখন মঙ্গলেরও তিরোধান হইবে; তোমার জাগরণ তখন সুষুপ্তিতে বিলীন হইবে। তুমি সুষুপ্তির প্রার্থনা করিও না; সুষুপ্তিতে তোমার লাভ নাই, সুষুপ্তিতে তোমার মুক্তি, তোমার নির্ব্বাণ, তোমার জীবত্বের বিলোপ। যতদিন জাগিয়া আছ, ততদিন তোমার তুমিত্ব, ততদিন মঙ্গল তোমার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া থাকিবে, অমঙ্গল তোমার বামহস্ত ধরিয়া থাকিবে। উভয়ে তোমাকে জীবত্বের পথে টানিয়া লইয়া চলিবে। একের বুঝি আকর্ষণ, অপরের বুঝি বিকর্ষণ; উভয়ের মধ্যে তোমার গমনীয় পন্থা। জীবনের পন্থা তোমার সম্মুখে প্রশস্ত ও বিস্তীর্ণ রহিয়াছে, জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন কর, তোমার গন্তব্য তোমার সম্মুখে প্রসারিত। তোমার অন্তরের অন্তর হইতে তোমার তুমি তোমাকে জলদগম্ভীরধ্বনিতে সেই গন্তব্য পথে চলিবার জন্য উৎসাহিত করিতেছে। বৃথা আত্মপ্রবঞ্চনা করিবার চেষ্টা পাইও না। মঙ্গলকে আহ্বান কর, অমঙ্গলের নিকট প্রণত হও। এককে আলিঙ্গন কর, ও

প্রেমের বন্ধনে জড়াইয়া ধর; অপরকে ভীতিভরে নমস্কার কর। গন্তব্যপথে তোমার গতি হউক, মঙ্গল ও অমঙ্গল তোমার পথপ্রদর্শক হইয়া তোমার গতি-বিধি চালনা করিতে রহুক। ধীরপদবিক্ষেপে অটলভাবে তোমার কর্ত্তব্য কাজ সম্পন্ন কর, তোমার নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে থাক। মঙ্গলের জয় হউক, অমঙ্গলেরও জয় হউক, উভয়ের জয়ে তোমার আত্মার জয়, তোমার আত্মার পুষ্টি ও বিকাশ।

ভীত ভ্রান্ত স্বাস্থ্যচ্যুত মানবাত্মা মঙ্গলের জয় গান করিয়া আসিতেছে। অমঙ্গলের জয় কি কখনও গীত হইবে না?

ট্যাভারনিয়ার ও বার্ণিয়ার।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে আসমুদ্রহিমালয় সমুদয় ভারত মোগলরাজছত্রের বিস্তীর্ণ ছায়াতলে বিরাজমান ছিল। অভ্রভেদী হিমালয় মোগল বিজয়বৈজয়ন্তী মস্তকে লইয়া সে সময়ে আসিয়া খণ্ডের অন্যান্য সাম্রাজ্যকে উপহাস করিত। দুর্ভেদ্য হিন্দুকুশকেও একদিন সেই বিজয়পতাকা মস্তকে বহন করিতে হয়; কাবুল, কান্দাহার প্রভৃতি প্রদেশও এক সময়ে মোগলসাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হইয়া যায়। যদিও ষোড়শ শতাব্দী হইতে ভারতে মোগলসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, এবং তাহারই শেষভাগে মোগলকেশরী, "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" আকবর সাহ পশুবল পরিহার করিয়া মহামিলনমন্ত্রে ভারতবাসীর হৃদয়রাজ্যে সিংহাসন স্থাপন করিয়াছিলেন, তথাপি সপ্তদশ শতাব্দীতেই মোগল সাম্রাজ্যের গৌরব সমগ্র জগতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ষোড়শ শতাব্দীর ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত মোগল গৌরব-নীহারিকাকে প্রদীপ্ত তপনে পরিণত করিয়া সপ্তদশ শতাব্দী জগতের সমক্ষে উপস্থিত হয়। বিশ্ববিখ্যাত আকবর সাহের উজ্জ্বল মহিমায় সপ্তদশ শতাব্দীর শৈশবকাল পরিপূর্ণ; ভুবনসুন্দরী নুরজাহানের প্রতিভায় ইহার কৈশোর হাস্যময়; সৌন্দর্য্যসারভূত তাজমহল ও রূপৈশ্বর্য্যের অপূর্ব্ব আদর্শ ময়ূরসিংহাসনে অলঙ্কৃত হইয়া ইহার যৌবন শোভাশালী হইয়া উঠে; এবং বিচক্ষণ ও বিশ্ববিজয়ী আরঙ্গজেবের কূটনীতিমন্ত্রে ইহার প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্য প্রভাবিত হয়। শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়া বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত ইহার জীবনে কেবল মোগলের গৌরবলীলাই অঙ্কিত হইয়াছিল। তৎকালে রত্নপ্রসবিনী ভারতভূমির অনন্ত গৌরবগাথা পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে।

মোগলের গৌরবপ্রদীপ্ত ভারতে ভাগ্যোদয়ের আশায় দলে দলে ইউরোপীয়গণ সমাগত হইতে থাকেন। পর্টুগীজ, ইংরাজ, ফরাসী, ওলন্দাজ প্রভৃতির বাণিজ্যজাহাজ সুনীল সাগরবক্ষে তরঙ্গ তুলিয়া মোগল ঐশ্বর্য্যলক্ষ্মীর কণিকামাত্র প্রসাদলাভের লোভে ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হয়। বলা বাহুল্য, আগমনমাত্রেই তাহাদের ভাগ্যফলক মোগল গৌরব-স্পর্শমণির স্পর্শে উজ্জ্বলীকৃত হইয়া উঠে, এবং ক্রমে ক্রমে সমস্ত ইউরোপ ভারতের পণ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। মোগল ঐশ্বর্য্যের অনুমানে অক্ষম হইয়া সেই অদ্ভুত কাহিনীকে ইউরোপীয়গণ আরবের উপন্যাস বলিয়া মনে করিত। অনেকে পর্য্যটকরূপে সেই ঐশ্বর্য্যদর্শনে সমাগত হন। এই সমস্ত পর্য্যটকগণ মোগল গৌরবের এক অপূর্ব্ব ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। তৎকালীন অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা তাঁহাদিগের লিখিত সেই সমস্ত বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়। ঐ সকল বিবরণ অনেকপরিমাণে নিরপেক্ষ বলিয়াও গ্রহণ করা যাইতে পারে। কারণ, হিন্দু বা মুসলমানের লিখিত সে সময়ের কোনও ইতিহাস তাদৃশ নিরপেক্ষ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। মুসলমানেরা আপনাদিগের গৌরববৃদ্ধির জন্য অনেক সময়ে হিন্দুর অনেক বিষয় গোপন করিয়াছেন; আবার কোন কোন স্থলে হিন্দুরাও স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রেমে বিহ্বল হইয়া কোন কোন বিষয় অতিরঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু সেই সময়ের বৈদেশিক পর্য্যটকদিগের গ্রন্থে সেই সকল ঘটনা অনেকটা নিরপেক্ষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তবে তাঁহাদিগের গ্রন্থও যে একেবারে ভ্রমপ্রমাদশূন্য, তাহাও বলা যায় না। কারণ, তাঁহাদিগের বর্ণিত অনেক ঘটনাই পরমুখশ্রুত; তাহার সত্যাসত্যে একটু বিবেচনাপূর্ব্বক বিশ্বাস করাই সঙ্গত। যে সমস্ত বৈদেশিক পর্য্যটক এইরূপ ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাঁহাদিগের জীবনবৃত্তান্ত জানিবার জন্য সাধারণের কৌতূহল হইতে পারে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা দুই জন প্রসিদ্ধ পর্য্যটকের সংক্ষিপ্ত জীবন প্রদান করিতেছি। ইঁহারা উভয়েই ফরাসী। একজনের নাম ট্যাভারনিয়ার, এবং দ্বিতীয়ের নাম বার্ণিয়ার। ইঁহারা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া, এবং অনেক দিন ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী আগ্রা, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে বাস করিয়া, কেহ বা দিল্লীর দরবারে উপস্থিত থাকিয়া, অনেক বিচিত্র ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সেই সমস্ত বর্ণনা অতীব প্রীতিপ্রদ। অনেকে তাঁহাদের বর্ণিত গ্রন্থের বিষয় অবগত আছেন, অথচ তাঁহাদের জীবনীর কিছুই জ্ঞাত নহেন; সেই জন্য আমরা সংক্ষেপে তাঁহাদের জীবনচরিত বিবৃত করিতেছি।

জিয়ান ব্যাপ্টিষ্ট ট্যাভারনিয়ার ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে, সৌন্দর্য্যের অমরনিকেতন পারিস মহানগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জনৈক ফ্লেমিশ শিল্পীর ঔরসজাত। উক্ত শিল্পী সাধারণতঃ প্রস্তরাদির খোদাই কার্য্য করিতেন। ট্যাভারনিয়ারের পিতা দেশভ্রমণেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। পিতার আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া পুত্রও বাল্যকাল হইতে সেই বিষয়ে মনোনিবেশ করেন। পঞ্চদশ বৎসর পূর্ণ না হইতেই ট্যাভারনিয়ার পিতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া দেশভ্রমণে বহির্গত হন। প্রথমতঃ, ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া, তিনি দুই জন ফরাসী সম্ভ্রান্ত লোকের অধীনে কার্য্য স্বীকারপূর্ব্বক প্রাচ্য দেশের অভিমুখে যাত্রা করেন। ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাস হইতে তাঁহার সেই ভ্রমণ আরম্ভ হয়। রীজেন্সবর্গ, ড্রেসডেন, ভিয়েনা, কনষ্টাণ্টিনোপল প্রভৃতি পরিভ্রমণের পর, তিনি ফরাসী ভদ্রদ্বয়ের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন, এবং নিজে এক্সজিরোয়ম, তাব্রিজ, ইস্পাহান, বোগদাদ, আলোপো ও স্কাণ্ডারুন প্রভৃতি স্থান পর্য্যটন করিয়া, ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে সমুদ্রপথে রোমনগরীতে উপস্থিত হন। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয়বার পরিভ্রমণে বহির্গত হন। এবারে মার্শেলিস হইতে আরম্ভ করিয়া স্কাণ্ডারুন পর্য্যন্ত, পরে সিরিয়া পার হইয়া ইস্পাহান ও পারস্যের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশ সকল পরিদর্শন করিয়া, অবশেষে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহার দ্বিতীয় বারের ভ্রমণ ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। ১৬৪৩ হইতে ১৬৪৯ পর্য্যন্ত তাঁহার তৃতীয়বার ভ্রমণের কাল। এইবারে তিনি ইস্পাহান হইতে আরম্ভ করিয়া যাবা প্রভৃতি পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে পর্য্যটন করেন। তাঁহার চতুর্থ ও পঞ্চম বার ভ্রমণের সময় নির্ণয় করা কঠিন। সম্ভবতঃ ১৬৫১ হইতে ১৬৫৮ পর্য্যন্ত তাঁহার উক্ত দুই বার ভ্রমণে শেষ হয়। ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ষষ্ঠবারের ভ্রমণ আরম্ভ হয়। সিরিয়া ও আরবের মরুভূমি পার হইয়া তিনি পারস্য ও ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং প্রত্যাবর্ত্তনকালে আসিয়া মাইনরের মধ্য দিয়া ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে উপস্থিত হন। ট্যাভারনিয়ার সাধারণতঃ জহরতের ব্যবসায়ী হইয়া এই সমস্ত দেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। যে সময়ে তিনি ভারতবর্ষে উপস্থিত হন, সে সময়ে মোগলের গৌরবতপন প্রাচ্য আকাশ আলোকিত করিয়া সমস্ত জগতে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া তিনি ভারতের প্রধান প্রধান স্থানসমূহে পরিদর্শন করেন। বাঙ্গলা দেশেও তিনি আগমন করিয়াছিলেন; কাশীমবাজার প্রভৃতি তৎকালীন বাঙ্গলার প্রধান বন্দরসমূহের কথা তাঁহার

ভ্রমণবৃত্তান্তে দেখিতে পাওয়া যায়। সে সময়ে মোগলসাম্রাজ্যের গৌরবে ও বাণিজ্যব্যবসায়ে ভারতবর্ষে কিরূপ উন্নতির স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, এতদ্ভিন্ন, ভারতের প্রধান প্রধান বন্দরের ও মোগল শাসনপ্রণালীর চিত্র, তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে উল্লিখিত হইয়াছে। ফলতঃ, তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠ করিলে, সপ্তদশ শতাব্দীর ভারত-ইতিহাসের অনেক ঘটনা অবগত হইতে পারা যায়। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে ট্যাভারনিয়ার ইউরোপে উপস্থিত হইলে, ফ্রান্সের অধিপতি চতুর্দ্দশ লুই, ভারতে ফরাসী বাণিজ্যের উন্নতিসাধনের জন্য তাঁহাকে উপাধিতে ভূষিত করেন। ট্যাভারনিয়ার অবশেষে অবনীর ব্যারণ নামে অভিহিত হন। রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহাকে বাধ্য হইয়া সুইজর্লণ্ডে বাস করিতে হয়। তিনি তথা হইতে অবশেষে বার্লিনে গমন করেন। তথায় ব্রাণ্ডেনবর্গের ইলেক্টার কর্ত্তৃক স্থাপিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টারের পদে নিযুক্ত হইয়া রুসিয়ার ভিতর দিয়া ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত একটি পথের আবিষ্কারের জন্য, তিনি ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে বার্লিন হইতে যাত্রা করেন। কিন্তু ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে মস্কো নগরে তাঁহার জীবনবায়ুর অবসান হয়। ট্যাভারনিয়ারের ভ্রমণবৃত্তান্ত একখানি সুন্দর গ্রন্থ। যদিও তাঁহার রচনাপ্রণালী সাহিত্যের হিসাবে উৎকর্ষ লাভ করে নাই, তথাপি ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিষয়ে তাহাতে অনেক সুন্দর বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সেই সমস্ত বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া প্রাচ্য দেশের ব্যবসায় বাণিজ্য, প্রধান প্রধান বন্দর, বাণিজ্যপথ ও নানা স্থানের প্রচলিত মুদ্রার বিষয়ে অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়। এই সমস্ত ভ্রমণবৃত্তান্তের প্রথম দুই খণ্ড ১৭৭৬।৭৭ অব্দে প্রথমে প্রকাশিত হয়। ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল। অনেক বার ভ্রমণবৃত্তান্তগুলি মুদ্রিত হয়। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে সেগুলি সাত খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। ইউরোপের অন্যান্য ভাষাতেও তাহার অনুবাদ হইয়াছে। তন্মধ্যে ইংরাজীতে ১৬৭৮ ও ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে দুই খণ্ডে, ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজীতে, ও ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মান ভাষায় মুদ্রিত হইয়াছিল।

ট্যাভার্ণিয়ারের ন্যায় বার্ণিয়ারও সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারত পর্য্যটন করিয়া অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মোগল দরবারে তিনি চিকিৎসকের কার্য্যে নিযুক্ত থাকায়, মোগল সম্রাটদিগের অনেক পারিবারিক গুপ্তরহস্যও তাঁহার দ্বারা প্রকাশিত হয়। ফ্রান্সিস বার্ণিয়ার ফ্রান্সের অন্তর্গত আঞ্জীয়ার্স নামক নগরে জন্মগ্রহণ করেন। বার্ণিয়ারের জন্মসময় নির্ণয় করা

দুঃসাধ্য। ভল্টেয়ার ১৬২৫ খৃষ্টাব্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বার্ণিয়ার প্রথমতঃ চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হন, এবং মণ্টিলিলিয়ার হইতে ডাক্তার উপাধি লাভ করেন। দেশভ্রমণে তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে তিনি সর্ব্বপ্রথম দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়া সিরিয়ায় উপস্থিত হন। তথা হইতে মিসরে গমন করিয়া এক বৎসরের অধিক কাল কায়রো নগরে অবস্থিতি করেন। সেইখানে তিনি মারক (plague) রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে তাহা হইতে মুক্তিলাভ করেন। তাহার পর সুয়েজ হইতে জলপথে যাত্রা করিয়া লোহিত সাগরের প্রত্যেক অংশ আবিষ্কারের জন্য প্রবৃত্ত হন; কিন্তু মোখায় উপস্থিত হইয়া গণ্ডা পর্য্যন্ত গমন করা বিপদসঙ্কুল মনে করিয়া, তিনি একখানি জাহাজে আরোহণপূর্ব্বক সুরাট বন্দরে আগমন করেন। বার্ণিয়ার দশ বৎসর কাল ভারতবর্ষে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে আট বৎসর তিনি বাদসাহ আরঙ্গজেবের দরবারে চিকিৎসকের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। আরঙ্গজেবের প্রিয় অমাত্য দানেশ মন্দ খাঁ, আরঙ্গজেবের রাজত্বে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের একজন প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। তিনি বার্ণিয়ারের প্রতি যথেষ্ট স্নেহশীল ছিলেন, তাঁহার নিকট হইতে বার্ণিয়ার অনেক বিষয়ে উৎসাহ প্রাপ্ত হন। সম্রাট আরঙ্গজেবের সহিত তিনি কাশ্মীরভ্রমণে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত কাশ্মীরের বিবরণ ইউরোপীয়দিগের নিকট অমূল্য রত্ন বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ হইতে ফ্রান্সে গমন করিয়া বার্ণিয়ার তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। সেই সময়ে রেসিন, বইলোঁ, সেণ্ট এভারমণ্ট, নিনোন ডী লিউক্লস, ম্যাডাম্ ডী লা লাবলীয়ার ও ললিয়ার চাপেল প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়। বার্ণিয়ারের রমণীয় মুখমণ্ডল ও শারীরিক গঠন, মনোজ্ঞ ব্যবহার ও মিষ্ট আলাপনের জন্য সেণ্ট এভারমণ্ট তাঁহাকে "চারু দার্শনিক" বলিয়া অভিহিত করিতেন। বার্ণিয়ারের দার্শনিক মত এপিকিউরসের অনুযায়ী ছিল। এপিকিউরসের মত কতকাংশে আমাদের চার্ব্বাক দর্শনের ন্যায়; সুখে সচ্ছন্দে জীবনযাপনই উক্ত মতের মূল সূত্র। বার্ণিয়ার গ্যাসাণ্ডীরও একজন স্তুতিবাদক ছিলেন। তিনি শাস্ত্রাদির অপৌরুষেয়ত্বে বিশ্বাস করিতেন না। বার্ণিয়ারের দার্শনিক মত অপেক্ষা তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তই সাহিত্যসংসারে অধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের ২২এ সেপ্টেম্বর পারিস নগরীতে তাঁহার ইহজীবনের অবসান হয়। তাঁহার মৃত্যুসম্বন্ধে কনিষ্ঠ

রেসিন এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, কোনও প্রমোদসমিতিতে প্রথম প্রেসিডেণ্ট ডী হার্লে বার্ণিয়ারের প্রতি একটু বিদ্রূপাত্মক ভাষা প্রয়োগ করায়, তিনি তাহাতেই মর্ম্মাহত হইয়া প্রাণবিসর্জ্জন করেন।

বার্ণিয়ারের মোগল সাম্রাজ্যের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর অনেক রাজনৈতিক ঘটনা অবগত হওয়া যায়, এবং মোগল রাজত্বে প্রজাদিগের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহাও অনেকপরিমাণে জানা যায়। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তের প্রথম অংশ সাজাহানের পুত্রকন্যাগণের অন্তর্বিবাদ ও অবশেষে আরঙ্গজেবের বিজয়লাভ ব্যাপার বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অন্তর্বিপ্লবের পর যে সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, দ্বিতীয় অংশ তাহাতেই পরিপূর্ণ; ইহাতে কতকগুলি উপাখ্যানও সন্নিবেশিত হইয়াছে। যদিও তাহাদের বিশেষ কোনও গুরুত্ব নাই, তথাপি যে সমস্ত লোকের বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহাদের বিশিষ্টত্ব ও তৎকালীন আচার ব্যবহারের বিষয় সুন্দররূপে অবগত হওয়া যায়। তৃতীয় অংশে সুপ্রসিদ্ধ কোলবার্টকে একখানি পত্র লেখা হয়। তাহাতে ভারতের অর্থাগমের বিবরণ, সামরিক বল ও ব্যয়বাহুল্য প্রভৃতির বিষয় লিখিত হইয়াছিল। কেবল সেই পত্রখানি হইতেই বার্ণিয়ার স্বদেশবাসীর নিকট প্রশংসা লাভ করিতে সক্ষম হইতেন। ইহাতে তিনি নিজের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিদর্শনের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং তাঁহার ভ্রমণের দ্বিবিধ উদ্দেশ্যও প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম, তিনি বিদেশ হইতে শিক্ষালাভ ও দ্বিতীয়টিতে সেই সেই দেশে আপনাদিগের সাধু মত প্রচার করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। তাহার পর দিল্লী ও আগরা নগরীর বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, ইহাতে তাঁহার পরিদর্শন ও অনুসন্ধানের যথেষ্ট ফল প্রকাশিত হইয়াছে। হিন্দুদিগের আচার ব্যবহারের সম্বন্ধে কোন কোন বিষয়ও লিখিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইউরোপীয়গণ সাধারণতঃ সেই সমস্ত আচার ব্যবহার যেরূপ চক্ষে দেখিয়া থাকেন, বার্ণিয়ার তদপেক্ষা অধিক কিছু পরিদর্শন করিতে পারেন নাই। ইহার সঙ্গে আবার তাঁহার পারমাণবিক দর্শন-মতের কথাও আছে। সম্রাট আরঙ্গজেবের সহিত মহাধূমধামে তিনি যে কাশ্মীর যাত্রা করিয়াছিলেন ও তথা হইতে দিল্লীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহারও বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে; এতদ্ভিন্ন বঙ্গভূমির বিবরণও তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বার্ণিয়ারের ভ্রমণবৃত্তান্তও ইউরোপের অনেক ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজীতে ইহার প্রথম অনুবাদ হয়, কিন্তু সে অনুবাদ তাদৃশ

সুস্পষ্ট হয় নাই। আর্ভিং ব্রক ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজীতে ইহার এক সুন্দর অনুবাদ করিয়া সাধারণের নিকট প্রশংসালাভ করিয়াছেন। যাঁহারা সপ্তদশ শতাব্দীর মোগল সাম্রাজ্যের বৃত্তান্ত অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, ট্যাভারনিয়ার ও বার্ণিয়ারের ভ্রমণবৃত্তান্ত তাঁহাদিগকে অনেক পরিমাণে নিরপেক্ষ ভাবে সাহায্য করিবে।

সহযোগী সাহিত্য।

সমাজ-তত্ত্ব।

চীন রমণী।

চীন অতি প্রকাণ্ড দেশ। চীনের জনসংখ্যা সমগ্র পৃথিবীর জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশেরও অধিক। কিন্তু চীন আপনাতে আপনি এমনই নিমগ্ন যে, সেখানকার সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস বিদেশীর প্রায় অনধিগম্য। তাই কোন ভ্রমণকারী চীনসম্বন্ধে কিছু বিবৃত করিলে, আমরা আগ্রহের সহিত তাহা পাঠ করি। চীনবাসীর পারিবারিক জীবনে রমণীর প্রভাব বড় অল্প নহে। চীনে গার্হস্থ্যশাসনসক্ষম হওয়াই রমণীর ঈপ্সিত বাসনা। তাঁহারা পরিবারবর্গের সুখের জন্যই জীবনযাপন করেন। পতি ভাল হইলে চীন রমণী আপনাকে অসাধারণসৌভাগ্যশালিনী মনে করেন।

সম্প্রতি মসো কোর্ াত কোনও ফরাসী পত্রে চীনরমণী সম্বন্ধেএকটি হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন; আমরা তাহার সারোদ্ধার করিয়া দিলাম।

চীন-বাসীদের মধ্যে পুরুষেরই সম্মান অধিক। তাই কোনও দম্পতীর কন্যাসন্তান জন্মিলে, তাহা পূর্ব্বজন্মকৃত কোনও অপরাধের জন্য ঈশ্বরপ্রদত্ত শাস্তি বলিয়াই গণ্য হয়।

জন্ম ও নামকরণ।

যে দম্পতীর প্রথম সন্তান পুত্র না হইয়া কন্যা হয়, সে দম্পতী আপনাদিগকে দুর্ভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন। তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, চাইনিস পরিবারে দুহিতার অযত্ন হয়। সন্তান জন্মিবার এক মাস পরে পিতামাতার আত্মীয় বন্ধুগণ শিশুকে নানাবিধ উপহার প্রদান করিতে আইসেন। কিন্তু দুহিতা জন্মিলে গৃহে যেন একটা বিষাদের ছায়া থাকে; পুত্র জন্মিলে জননী যেমন "পূর্ব্বপুরুষদিগের কক্ষে" গিয়া ধূপ পোড়ান, এবং প্রেত তাড়াইবার ব্যবস্থা করেন, কন্যা জন্মিলে সেরূপ কোনও অনুষ্ঠান হয় না। রমণীর এই অনাদর কেবল চীনেই আবদ্ধ নহে। এবার কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিসংক্রান্ত ব্যাপারে, ইংলণ্ডের সভ্যতার শত কোলাহলের মধ্যে এক ধ্বনি ধ্বনিত হইয়াছে—এখনও ইংরাজের বর্ব্বরতা লোপ পায় নাই। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় মহিলাদিগকে উপাধি দিতে অসম্মত হইয়াছেন, যেন রমণীর প্রতিভা নাই! কুমারী ফসেট প্রভৃতি রমণীগণ যে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তাদের সঙ্কল্প টলিল না। ছাত্রগণ যখন জানিতে পারিল যে, ভোটে রমণীদিগকে উপাধি প্রদান না করাই স্থির হইয়াছে, তখন তাহারা আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিল। যখন বিবেচনা করা যায় যে, এই সকল ছাত্র ভদ্রসন্তান এবং ইহাদের অধিকাংশেরই জননী ভগিনী বিদ্যমান, তখন নিতান্ত বিষণ্ণভাবে এ কথা বলিতে হয় যে,

ইংরাজের নারীর প্রতি সম্মানপ্রদর্শন আন্তরিক নহে, কেবল মৌখিক। তাই আমরা বলিয়াছি, রমণীর অনাদর কেবল চীনেই আবদ্ধ নহে।

চাইনিস বালিকাদিগের দুই একটি নাম বড় মধুর ও কবিত্বপূর্ণ। শিশু কোনও সুন্দর দ্রব্যের দিকে চাহিলে, দ্রব্যের সেই নামানুসারেই তাহার নামকরণ হইয়া যায়;—যেমন "সুন্দর জলদ," "সুগন্ধ পত্র," ইত্যাদি। সাত বৎসর পর্য্যন্ত বালিকার এই নামই প্রচলিত থাকে, তাহার পর একটা জমকাল রকমের নাম বাছিয়া রাখা হয়; তখন নূতন নাম আসিয়া পুরাতন নামকে বেদখল করে। তবে এ কথা বলা বাহুল্য যে, আত্মীয় স্বজনগণ বালিকাকে পূর্ব্বের পরিচিত নামেই ডাকিয়া থাকেন; তাঁহাদের নিকট নূতন নামটা পোশাকী।

চীনে জননী স্বয়ং শিশুপালনের ভার গ্রহণ করেন। অপরের হস্তে ছেলের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া দূরে থাকুক, শিশুকে গোদুগ্ধ বা ছাগদুগ্ধ প্রদান করিতেও জননী অসম্মত।

শৈশব।

এ প্রথা ভাল কি মন্দ,—ইহাতে জননী ও সন্তানের মধ্যে স্নেহবন্ধন দৃঢ়তর হয় কি না, পাঠক তাহার বিচার করিবেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, চাইনিস পরিবারে দুহিতার আদর অল্প, তথাপি তাহারা অতিযত্নে পালিত হইয়া থাকে। তাহাদের বেশ হয় হরিদ্রাবর্ণের, নয় লোহিতবর্ণের, নয় ত হরিৎবর্ণের; এই তিন বর্ণ সৌভাগ্য সূচিত করে। শৈশবেই বালিকাদিগের মস্তক মুণ্ডিত করিয়া দেওয়া হয়; কেবলমাত্র তিনটি শিখা থাকে,—সে শিখা কয়টি লোহিতবর্ণ রেশমী ফিতা দিয়া বাঁধিয়া রাখা হয়। মোটের উপর চাইনিস্ জনকজননী শিশুসন্তানের প্রতি অত্যন্ত সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন।

চীনে একটা বিস্ময়কর প্রথা আছে,—মেয়েদের পা ছোট করা। ইংরাজ-সুন্দরী যেমন আপনার কটিদেশ যথাসম্ভব সূক্ষ্ম করিবার জন্য শরীরকে ক্লিষ্ট করেন, চাইনিস বালিকা

ক্ষুদ্র পদ।

তেমনই আপনার পদদ্বয় ক্ষুদ্র করিবার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করেন। বালিকার বয়স সাত বৎসর পূর্ণ হইলেই তাহাকে আর ভ্রাতাদিগের সহিত খেলা করিতে দেওয়া হয় না। শৈশবের সে স্বাস্থ্যকর ক্রীড়া কৌতুক তখন অতীতের ঈপ্সিত স্মৃতির মধ্যে পরিগণিত হয়। তখন হইতেই বালিকার পদদ্বয় বাঁধিয়া দেওয়া হয়, পদদ্বয় আর বড় বাড়িতে পারে না। বাস্তবিক এই পদ ক্ষুদ্র করিবার প্রবৃত্তি চীনে এতই প্রবল যে, প্রোটেষ্টাণ্ট ও ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকসম্প্রদায় সকলের অনাথাশ্রমে প্রতিপালিত বালিকারাও আশ্রমকর্ত্রীদিগকে পদদ্বয় বাঁধিয়া দিতে বলে; তাহারা জানে, আপনাদের পূর্ণবিকশিত পদদ্বয় লইয়া চাইনিস সমাজে বিবাহ করা বড় সহজ হইবে না। ইহাকেই বলে "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ"। আবার বিস্ময়ের কথা এই যে, চীনে সর্ব্বস্থানে এই প্রথা প্রচলিত নাই। চীনের রাজবংশ অর্থাৎ ম্যাঞ্চুরা কখনও এ প্রথা অবলম্বন করেন নাই।

স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে চীন অনেক দেশের আদর্শ হইতে পারে। চীনের সভ্যতা অতি প্রাচীন, চীনের প্রচলিত আচার ব্যবহারও নূতন নহে; নব সভ্যতা বা নবমত চীনের দৃঢ়গঠিত

স্ত্রীশিক্ষা।

প্রাচীরেই প্রতিহত হয়, চীনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। চীনে যাহা ছিল, তাহাই আছে। চীনে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত ছিল, এখনও প্রচলিত আছে। আমাদিগের উচ্চ চীৎকারসত্ত্বেও লজ্জিতভাবে এ কথাটা স্বীকার করিতে হয় যে, আমাদিগের দেশে স্ত্রীশিক্ষার আশানুরূপ বিস্তার হয় নাই। এ দেশে যে দুই এক জন বিদুষী মহিলার নাম শুনিতে পাই, তাঁহারা জলদাচ্ছন্ন অনন্ত অম্বরে দুই একটি তারকার সহিত উপমেয়। স্ত্রীশিক্ষার স্রোত এখনও আমাদিগের অন্তঃপুরের প্রাচীর ভেদ করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। পুরুষের প্রচুর চেষ্টার অভাব ও রমণীর শিক্ষার প্রতি

আন্তরিক অনুরাগের অভাব, এই দুই কারণে, এ দেশে মহিলাদিগের মধ্যে আজও শিক্ষার আশানুরূপ বিস্তার সাধিত হয় নাই। কিন্তু চীনে বালিকাদিগের ভালরূপ শিক্ষাই হইয়া থাকে। চীনে শিক্ষয়িত্রীরা প্রত্যেকের গৃহে গিয়া বালিকাদিগকে শিক্ষা দিয়া আইসেন। সেখানে বালিকাদিগকে গৃহকর্ম্মে সুনিপুণ করিবার জন্যও যথাসম্ভব চেষ্টা করা হয়। বালিকাদিগের শিক্ষার বিষয়ও অল্প নহে;—পাঠ, হস্তলিপি, সাহিত্য, কবিতা, সঙ্গীত, চিত্রবিদ্যা, সূচিকার্য্য। বালিকাদিগকে বিশেষ কোনও ধর্ম্মের শিক্ষা দেওয়া হয় না; তবে বালিকারাও পিতামাতার সহিত মন্দিরে গমন ও গৃহের ধর্ম্মকর্ম্মে যোগদান করে।

বিবাহ।

চীনে একটা প্রবাদ আছে, বিবাহই মানব-জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ব্যাপার। চাইনিস বালিকার বয়স দ্বাদশ বৎসর হইতে না হইতেই তাহার পিতা উপযুক্ত পাত্রের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়া পড়েন। পাত্র মিলিলেই সম্বন্ধ স্থির করা হয়;—আমাদের দেশের "পাকা দেখার" মত।—আবার কোনও বিশেষ কারণ ভিন্ন সম্বন্ধ ভাঙ্গা যায় না। বিবাহের কিছু দিন পূর্ব্বেই সম্বন্ধ স্থির হইয়া থাকে, অনেক সময় বালক বালিকার শৈশবেই সম্বন্ধ স্থির হইয়া যায়। বিবাহটা চাইনিসের নিকট এতই আবশ্যক ও গুরুতর যে, যদি কোনও পিতার অবিবাহিত পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইলে শোকসন্তপ্ত পিতা অনুসন্ধান করেন, কাহার অবিবাহিতা দুহিতা মরণের মহা-স্বপ্নে অভিভূত হইয়াছে। তখন একটি মৃতদেহ সমাধি হইতে তুলিয়া আর একটির সমাধিতে সমাধিস্থ করা হয়। বন্ধুবান্ধবগণ বিবেচনা করেন যে, এই অনুষ্ঠানে মৃত বালক বালিকার জীবন তবু সফল হইল। এই "বিবাহের" পর শোকার্ত্ত পিতামাতাদের মধ্যে যথারীতি সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া যায়। এরূপ বিস্ময়কর প্রথা জগতে আর কোথাও আছে কি না, জানি না। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ভারতবর্ষের মত চীনেও বিবাহ ব্যাপারটা নিতান্তই অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। চীনের জনসংখ্যাও অসাধারণ অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে; ইহাতে লোকের আয় কমিয়া যায়, নানাবিধ অসুবিধা হয়, দেশের যথেষ্ট অমঙ্গল ঘটে। অর্থনীতিবিদ্ ইহাকে নানা দোষের মূল বলিয়া নির্ণয় করেন।

বিবাহান্তে।

বিবাহ হইলে চাইনিস রমণী সম্পূর্ণভাবে স্বামীর পরিবারভুক্ত হইয়া পড়েন। তখন তিনি আপনার পূর্ব্বপুরুষ ছাড়িয়া স্বামীর পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট প্রার্থনা করেন। পিতা-মাতার মৃত্যু হইলে, বিবাহিতা দুহিতার অশৌচ অল্পদিনমাত্র স্থায়ী হয়। যদি কোন চাইনিস বিবাহবন্ধন ছেদন করে, তবে তাহাকে নিকট হইতে গৃহীত সমস্ত দ্রব্যজাত প্রত্যর্পণ করিতে হয়। এইখানে বলিয়া রাখি, চীনে বিবাহবন্ধনচ্ছেদ বড় দেখা যায় না।

শিশুহত্যা।

পূর্ব্বে রাজপুতানার মত চীনে বালিকাহত্যা প্রচলিত ছিল। তাহাকে জলদেবতার সহিত বিবাহ দেওয়া বলিত। এখন চীনে নানা বিদেশীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অনাথাশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। এখন অনেক সময় বালিকার জনক তাহাকে এমন কোনও স্থানে ফেলিয়া যায়, যেখানে কোনও ধর্ম্মযাজক বা "নান" তাহাকে দেখিতে পাইবেন। অনেক সময় দুহিতাকে কোনও ধনী পরিবারের নিকট বিক্রয় করা হয়, সময় সময় কোনও পিতা ইহার পর পুত্রের সহিত বিবাহ দিবেন বলিয়া শিশুকে গ্রহণ করেন।

যাঁহারা চাইনিসদিগের পারিবারিক জীবনের বিষয় জানিতে চাহেন, আমরা তাঁহাদিগকে জেনারল চেঙ-কি-টঙ-প্রণীত পুস্তকদ্বয় পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

ভ্রমণবৃত্তান্ত।

ব্রহ্মদেশ।

ইতিপূর্ব্বে মিষ্টার কেনের ভ্রমণবৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া আমরা পাঠকদিগকে উত্তর ব্রহ্মের চিত্র উপহার দিবার প্রয়াস পাইয়াছি। * তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তের আর এক অংশ অবলম্বন করিয়া আমরা পাঠকদিগকে ব্রহ্মসম্বন্ধীয় আরও কতকগুলি বিষয়ের বিবরণ দিতেছি।

শোভা ও সমৃদ্ধি।

লেখক প্রবন্ধারম্ভেই বলিয়াছেন যে, তিনি জগতের বহু স্থান ভ্রমণ করিয়াছেন; কিন্তু ব্রহ্মবাসীদিগের আচার ব্যবহার অন্যান্য স্থানবাসীদিগের আচার ব্যবহার হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আবার ব্রহ্মে অনন্তযৌবনসম্পদশালিনী শোভাময়ী প্রকৃতির অনন্ত শোভা। খরস্রোত নদ, কলনাদিনী নিম্নগা, অভ্রভেদী গিরি-শ্রেণী, রম্য কানন, আর শ্যামশোভাময় শস্যক্ষেত্র,—এই সকলের একত্র সমাবেশ বড় মনোরম। লেখকের মতে, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ সকলের অপেক্ষা ব্রহ্ম অধিক সমৃদ্ধিশালী। ইরাবতীর জলরাশি ব্রহ্মের অভ্যন্তরভাগ বিধৌত করিয়া বহিতেছে;—এখানে অনাবৃষ্টিতে শস্য নষ্ট হয় না;—কৃষক তাহার শ্রমের আশাতিরিক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। বঙ্গদেশ বা চীনের মত এখানে জনসংখ্যা অতিরিক্ত অধিক নহে, তাই বসতিও ঘনসন্নিবিষ্ট নহে। চারি দিকে বহুদূরবিস্তৃত ক্ষেত্র—জনসংখ্যা তুলনায় অল্প। এখন ক্রমেই জমী আবাদ হইয়া যাইতেছে, কিন্তু এখনও অনেক জমী পড়িয়া আছে। ব্রহ্ম হইতে চাউল ও সেগুনকাষ্ঠের যথেষ্ট পরিমাণে রপ্তানি হইয়া থাকে। লেখক অনুসন্ধানে যত দূর জানিতে পারিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বোধ হয়, ব্রহ্মে কেরাণীরা, এমন কি, শ্রমজীবীরাও ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের বেতনের হিসাবে, তিন গুণ পারিশ্রমিক পাইয়া থাকে। ভারতবর্ষের নানা স্থানে বহুকালব্যাপী দারিদ্র্যের যে ভীষণ প্রকোপ দৃষ্ট হয়, ব্রহ্মে তাহা আদৌ দৃষ্ট হয় না। দারিদ্র্য-দুর্দ্দশার ইতিহাস কখনও ব্রহ্মের ইতিহাস কলঙ্কিত করে নাই। ইহা অতীতের কথা—এখন ব্রহ্মের মরা গাঙ্গে নব সভ্যতার বন্যা আসিয়াছে; ভবিষ্যতে কি আছে, তাহা কে বলিবে! প্রাচ্য সভ্যতা ও প্রতীচ্য সভ্যতার সংঘর্ষণে যে অনল জ্বলিয়া উঠিবে, তাহাতে অলস ব্রহ্মবাসী ভস্মসাৎ হইবে কি না, তাহা কে বলিবে?

জাতি ও ধর্ম্ম।

ব্রহ্মবাসিগণ বহু জাতিতে বিভক্ত। দেখিলে বোধ হয়, মঙ্গোলিয়ানদিগের সহিত ইহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; ইহাদিগের শিরায় আর্য্যশোণিত আছে কি না সন্দেহ। ইহাদিগের আকৃতি ও স্বভাবসুন্দর ব্যবহার দেখিলে সহজেই জাপানিদিগের কথা মনে পড়ে;—সেও এমনই ব্যবহার। ব্রহ্মে খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকদিগের মধ্যে আমেরিকান অধিক—প্রচারকার্য্যে তাঁহাদের প্রচুর উৎসাহ। ব্রহ্মে মোটের উপর খৃষ্টানের সংখ্যা ৮৪০০০; মগ ধর্ম্মযাজকের সংখ্যাও অল্প নহে; ব্রহ্মে গীর্জ্জার সংখ্যা ৫২৬—বড় অল্প।

বৌদ্ধধর্ম্মই ব্রহ্মের প্রধান প্রচলিত ধর্ম্ম। পুরোহিতগণ সকলেই অকৃতদার, সংসারত্যাগী, বিষয়বাসনাহীন। তাঁহারা সাধারণতঃ মঠেই বাস করেন। বৌদ্ধ ব্রহ্মবাসিমাত্রই জীবনে একবার অন্ততঃ একদিনেরও জন্য পুরোহিত হয়। দীক্ষাকার্য্য প্রায় দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে সম্পন্ন হয়। দীক্ষান্তে বালক মঠে প্রবেশ করে। যদি তাহার পুরোহিত অর্থাৎ ফুঙ্গি হইতে ইচ্ছা না থাকে, তবে সে পৌরোহিত্য-প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ না হইয়া, দুই চারি দিন পরেই গৃহে ফিরিয়া আইসে।

ফুঙ্গিরাও সকলেই চিরজীবনের জন্য পৌরোহিত্য-ব্রত গ্রহণ করেন না। তাঁহারাও যতদিন

* ১৩০৩ সালের ফাল্গুনের "সহযোগী সাহিত্য" দ্রষ্টব্য।

ইচ্ছা পুরোহিত থাকেন ;—তাহার পর সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দেশের লোকের সাহায্যেই মঠগুলি সংরক্ষিত। প্রত্যূষেই গলদেশে পিত্তলের ভিক্ষাপাত্র বিলম্বিত করিয়া দলে দলে ফুঙ্গিরা সহরে বা গ্রামে ভিক্ষার্থ বাহির হয়েন। ফুঙ্গিরা কোনও কথা না বলিয়া কেবল আসিয়া গৃহস্থের গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান হয়েন ; গৃহকর্ত্তী তখনই আসিয়া অন্ন, ব্যঞ্জন, ফলমূলাদি প্রদান করেন। ফুঙ্গিরা সকলেই মুণ্ডিত-মস্তক, পীতাম্বরধারী ; অধিকন্তু রমণীদিগের দৃষ্টি হইতে আপনাদের মুখ আবৃত করিবার জন্য সকলের সহিতই এক একখানা পাখা থাকে। ফুঙ্গিরা সকলেই মঠে বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। লেখক কোনও পল্লীগ্রামে কোনও আশ্রমে প্রধান ফুঙ্গির (সর্দ্দার পাণ্ডা বা মোহন্ত) সহিত সাক্ষাৎ করেন ; তিনি লেখককে মঠের সকল কার্য্য দেখাইয়াছিলেন। বালকগণ উবুড় হইয়া বৃত্তাকারে শয়ন করিয়া থাকে, আর শিক্ষক পড়াইতে থাকেন। বিদ্যালয়ে লিখিতে ও পড়িতে শিখান হয়।

পুরোহিতসম্প্রদায়।

ব্রহ্মে ধর্ম্মমন্দিরকে প্যাগোডা বলে। ব্রহ্মদেশে লক্ষ লক্ষ প্যাগোডা আছে। মক্কাগমন যেমন মুসলমানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা, একটা প্যাগোডা নির্ম্মাণ করাও তেমনই মগের সর্ব্বোত্তম আকাঙ্ক্ষা। তাই কিছু টাকা জমাইতে পারিলেই মগ রৌদ্রশুষ্ক ইষ্টকে একটা প্যাগোডা নির্ম্মাণ করাইয়া পুণ্য সঞ্চয় করে। তবে প্যাগোডানির্ম্মাণেই পুণ্য, প্যাগোডার সংস্কারে পুণ্যসঞ্চয়ের সম্ভাবনা নাই ;—তাই অল্প দিনের মধ্যেই প্যাগোডার গর্ব্বোন্নত শির ধুলিবিলুণ্ঠিত হয়—তাহার ধ্বংসাবশেষের উপর বৃক্ষ লতা জন্মে, ভগ্নস্তূপ উরগজাতীয়দিগের আবাসভূমি হইয়া উঠে। তবে দুই চারিটি প্রসিদ্ধ প্যাগোডার কথা স্বতন্ত্র—সেগুলিতে যাত্রীর স্রোতে কখনও ভাঁটা পড়ে না ; সেগুলি প্রায়ই সুসংস্কৃত থাকে। সকল প্যাগোডার আকার একরূপ—দেখিতে কতকটা ঘণ্টার মত।

প্যাগোডা।

রেঙ্গুনের "সইডেগণ" প্যাগোডা অতি প্রসিদ্ধ ;—মগদিগের একটি প্রধান তীর্থস্থান। একটা পাহাড়ের উপরিভাগ সমতল করিয়া তাহার উপর প্যাগোডা নির্ম্মিত, প্যাগোডার মূলদেশ বৃহদায়তন—ক্রমে যত উচ্চ হইয়াছে, ততই আয়তন কমিয়া, শেষে চূড়ামাত্রে শেষ হইয়াছে। প্যাগোডার চূড়া বহুমূল্য প্রস্তরখচিত, সুবর্ণনির্ম্মিত কিঙ্কিনীজালে জড়িত ;—মৃদু মন্দ পবনে সেই কিঙ্কিনীমালার সুমধুর ধ্বনি সত্য সত্যই বড় শ্রুতিমধুর। খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৮৮ অব্দে এই প্যাগোডা নির্ম্মিত হয়। ইহাতে বুদ্ধের আট গাছি কেশ সংরক্ষিত হইয়াছিল। দেড় শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে প্যাগোডার এই অভিনব শ্রী। প্যাগোডা বেষ্টন করিয়া বৃত্তাকারে মনোহর ভ্রমণপথ—পথিপার্শ্বে মন্দিরের সারি—কোনটি সুসংস্কৃত, কোনটির অঙ্গে কাল ধ্বংসের চিহ্ন চিহ্নিত করিয়াছে।

"সইডেগণ।"

প্যাগোডাগুলি হয় ইষ্টকে নয় কাষ্ঠে নির্ম্মিত ;—সকলগুলিতেই মর্ম্মর বা পিত্তলনির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। পাহাড়ের উপর উঠিবার জন্য পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ,—চারি দিকে সোপানশ্রেণী। সহরের দিকের সোপানশ্রেণীর উপর সেগুন কাষ্ঠের ছাত। মন্দিরের কাছে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিপণিশ্রেণী ; এই সকল বিপণিতে খাদ্য দ্রব্য, বুদ্ধের মূর্ত্তির পদতলে অর্পণ জন্য পুষ্প, মন্দিরে জ্বালাইবার জন্য বাতি, পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গ ও খেলেনা বিক্রয় হয়। অনেকে বিক্রেতাদের নিকট হইতে বিহগ ক্রয় করিয়া তাহাকে পিঞ্জরমুক্ত করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করে। সোপানশ্রেণীর উপর দুইটি সিংহ-বা সারমেয়ের মূর্ত্তি—ইহারা প্রেত দূর করে। মগেরা বুদ্ধকে যত ভয় না করে, প্রেতকে ততোধিক ভয় করে। সোপানে ভিক্ষুকের দল—ইহাদের মধ্যে কুষ্ঠরোগীরও অভাব নাই। কোনও উৎসবের দিন প্যাগোডামূলে যে দৃশ্য নয়নসমক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তাহার বর্ণনা করা সম্ভব নহে। মগ পরিচ্ছদে সমুজ্জ্বল বর্ণবৈচিত্র্য বড়ই ভালবাসে।

প্যাগোডার বর্ণনা।

পুরুষ ও রমণীদিগের রেশমী কাপড়ের জামার বর্ণবৈচিত্র্য বাস্তবিকই বিস্ময়কর ; পুরুষের মস্তকে রেশমী রুমাল বাঁধা—রমণীর মস্তকে আজানুলম্বিত ভ্রমরকৃষ্ণকেশকলাপে কুণ্ডলীকৃতা ফণিনীর মত মনোহর কবরী, তাহাতে আবার পুষ্পগুচ্ছ শোভা পাইতেছে ; কর্ণে, কণ্ঠে ও বাহুতে মণিমুক্তার অভাব নাই।

ব্রহ্মবাসীদিগের বুদ্ধোপাসনায় ভক্তির সংস্পর্শমাত্র নাই। কতক লোক যখন উপাসনা করে, কতক লোক তখন গল্প করে ; উপাসনাকারীরাও মধ্যে মধ্যে চারি দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, এবং পরিচিতদিগকে অভিবাদন করিয়াও দূষণীয় বলিয়া মনে করে না। অনেকে মন্দিরদ্বারে রক্ষিত সারমেয়কুলকে আহার দিয়া পুণ্য সঞ্চয় করে। সকল দেশেই ধর্ম্মের এইরূপ দুর্দ্দশা ; ব্রহ্মবাসীর ধর্ম্মবুদ্ধিও যে বিকৃত হইয়াছে, তাহা বিচিত্র নহে।

কর্ম্ম ও ভক্তি।

ব্রহ্মে চুরুট সর্ব্বব্যাপী। কি ছোট, কি বড়, কি পুরুষ, কি রমণী, সকলেই ধূমপান করে। শিশুরা একবার স্তন্য পান করে, একবার জননীর দ্বাদশ ইঞ্চ দীর্ঘ চুরুটে ধূমপান করে। ছেলেরা তাহাদের পদের মত দীর্ঘ চুরুট ফুঁকে। আবার পুরুষ অপেক্ষা রমণীর চুরুটানুরাগ অধিক প্রবল। তবে ব্রহ্মের চুরুট নাকি আদৌ কড়া নহে। তাই বোধ হয় ইহাতে বিশেষ অনিষ্ট হয় না। ব্রহ্মবাসীরা বিলক্ষণ বলিষ্ঠ ; কিন্তু ইহারা অত্যন্ত আলস্যপরবশ।

চুরুট।

ব্রহ্মে আর একটি দেখিবার জিনিস,—হস্তী। হস্তীর বুদ্ধির নানা গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মে কাঠের কারখানায় শিক্ষিত হস্তী দিয়া নানাবিধ কাজ করান হয়। লেখক একদিন প্রভাতে একটি বৃহৎ কাঠের কারখানায় হস্তীর কার্য্যকৌশল দেখিতে গিয়াছিলেন। মাহুতের ইঙ্গিতমাত্র হস্তী নদী হইতে বৃহৎ বৃহৎ সেগুন কাষ্ঠ আনিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিতেছে। এক একটি শিক্ষিত হস্তীর মূল্য পাঁচ হইতে ছয় হাজার টাকা। এক একটা বড় কারখানায় এইরূপ তিন চারি শত হস্তী আছে।

হস্তী।

ব্রহ্মের বাণিজ্য প্রধানতঃ জলপথেই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে,—ইংরাজ গভর্মেণ্ট বাণিজ্যের সুবিধার জন্য ইতিমধ্যেই প্রায় নয় শত মাইল রেলপথ খুলিয়াছেন।

কবিতাকুঞ্জ।

নীরব সাধনা।

১

আজ বুঝি সব মোর হল অবসান,
ভাষা আর পাই না খুঁজিয়া ;
নূতন নূতন ছন্দ চাই রচিবারে,
বিন্দুমাত্র পাই না ভাবিয়া।
হৃদয়ের গ্রন্থখানি খুলিয়া যতনে
ব্যগ্র-আঁখি পড়িবারে ধাই ;
কে জানে পড়িতে বুঝি গিয়েছি ভুলিয়া,
রেখামাত্র দেখিতে না পাই।

২

মনে মোর ছিল সাধ, জগতের কাছে
এ হৃদয় দেখাব খুলিয়া,
যে উচ্ছ্বাস প্রাণে ল'য়ে লভেছি জনম
দিব তারে সঙ্গীতে ঢালিয়া।
একমাত্র সেই আশা ধরিয়া হৃদয়ে,
দিবানিশি করি প্রাণপণ,
নিভৃতে আপন মনে গান গাইয়াছি,
আর শুধু গেঁথেছি স্বপন।

৩

হায়! হায়! তবু ত গো নারিনু বলিতে
যাহা আমি চাই বলিবারে,
কোনও মতে বাহিরে তা হ'ল না প্রকাশ
ভিতরে যা পাই দেখিবারে;—
বিমল হৃদয়-সরে উঠে যে লহরী
সৌন্দর্য্যের অতল নিভৃতে,
পৃথিবীর নিদারুণ ভাষার বাঁধন
প্রাণে সে ত পারে না সহিতে।

৪

ওরে মূঢ়! এত তুই গাঁথিলি কবিতা,
এত ভাব ঢালিলি সঙ্গীতে,
তবুও যাহার লাগি যত্ন আজীবন
তাই তুই নারিলি বলিতে!
অতীতের অতি মৃদু স্মৃতির মতন,
অদৃশ্যের স্বপনের প্রায়,
জীবন্ত যে ছবিখানি জাগিছে হৃদয়ে
তাই আঁকা হ'ল না রে হায়!

৫

চিহ্ন নাই, শব্দ নাই, নাহিক উপমা,
শূন্য মোর হ'ল অভিধান;
মরমে যে ভাবরাশি উঠেছে উথলি
আজিও তা রয়েছে সমান।
যোগাতে পারি না তার ছন্দ অনুরূপ,
সুর তার পারি না মিলাতে;
হায় গো এ হৃদয়ের অসীম উচ্ছ্বাস
কিছুতে কি নারিব কমাতে?

৬

জানি না এ জগতেরে বুঝাব কেমনে,
তাই আমি মানি পরাজয়;—
মৌন মোর ভাবরাশি, শূন্য অলঙ্কার,
ম্রিয়মাণ ইন্দ্রিয়নিচয়।
কথা না বলিলে এরা পায় না শুনিতে,
না দেখালে দেখিতে জানে না;
আলোকের পর-পারে জাগে যে আলোক
সে আলোক বুঝিতে পারে না।

৭

তবে কি কিছুই আর নাহি রে উপায়?
বৃথা মোর বৃথা এ জীবন?
একটু যে আলো ল'য়ে উঠিনু ফুটিয়া
তাও মোর যাবে অকারণ?
এত যে সাধনা করি সাজানু এ গৃহ
মৃত্যুরে কি দিতে উপহার!
এ বাসনা উপাসনা সবই হবে বৃথা?
ধিক্ ধিক্! অদৃষ্ট আমার!

৮

রে অবোধ! একবার দেখ চেয়ে দেখ
সমুখেতে মরণ দাঁড়ায়ে;
এ তোর সঙ্গীত-রাজ্য কল্পনার খেলা
এখনই দিবে সে ঘুচায়ে!
একমাত্র ভাব—তাও বুঝাতে নারিলি,
তোর কথা যাবে তোরই সাথে,
জীবন যেথায় ছিল সেথা পড়ে রবে
অসুন্দর অসত্য-গুহাতে।

৯

আজ তুই পুনর্ব্বার কর প্রাণপণ,
আশা সাধ ডেকে নে সকল।
বাক্য তোর হেরে গেছে, হেরেছে সঙ্গীত,
আজ শুধু ঢাল অশ্রুজল।
দূরে ফেলি বীণা-বাঁশী নীরবে চাহিয়া
অশ্রু তুই থাক্ বরষিতে,—
কাব্য-কল্পনার সেই অশক্য কাহিনী
সেও যদি পারে বুঝাইতে!

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

বিরহ।

খাম্বাজ।

আজি স্বরগ-আবাস তুমি এস ছাড়ি,
আজি বরষে বরষা বিরহ বারি।

আজি ফুলে নাহিক মধু গন্ধ,
মলয়ে নাহিক মৃদু মন্দ,
জীবনে নাহিক গীত ছন্দ,
তোমারে ছাড়ি।

মোর এ ভালবাসা পাবে না নন্দনে,
উঠেনি এত সুধা সাগরমন্থনে,
না জানি নিশি যাপ' কতই ক্রন্দনে,
আমারে ছাড়ি।

সেথায় নাহিক আত্মবলিদান,
মিছে কলহ, মিছে অভিমান,
বিরহ-বেদন, বিরহ-অবসান,
সেথা রবে কেমন করি।

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন।

সন্ধ্যা।

অয়ি সন্ধ্যা,
ছায়ার বসন পরি এলায়ে অলকরাশ,
শান্ত আঁখি নত করি, ধীরে,
দাঁড়ায়ে নিশার কূলে ফেলেছিস্ জগতেরে
কি যেন রহস্যজালে ঘিরে!
রবিতাপে খেলা করি' শ্রান্ত শিশুটির ভাবে,
ধরা নিতি আসে তোর কোলে,
ঢেকে দিস্ স্নেহে তার অনাবৃত শ্যাম কায়া
সুকোমল আঁধার-আঁচোলে!
নিঃশবদে রুদ্ধ করি দিক্-বাতায়নগুলি
নিরালার নিভৃত নিলয়ে,
শোয়াইয়া সযতনে, শিয়রে বসিস্ তার,
সন্ধ্যা, তুই নতমুখী হ'য়ে!
কি এক মোহন মন্ত্র অস্ফুট বচনে পড়ি
ললাটে বুলাস্ মৃদু, কর,—
বসুধার আঁখি যেন তন্দ্রায় মুদিয়া আসে,
স্থির হ'য়ে আসে কলেবর!
স্নেহময় শান্তিময় দয়াময় চোকে যেন
ব্যথিতের মুখে তুই চাস্,
কমে যায় হৃদয়ের দারুণ পাষাণ-ভার
তোর কাছে ফেলি' দীর্ঘশ্বাস!
বিজনে বিরহী যবে বসিয়া ছায়াতে তোর
চায় তোর কোমল আকাশে,
মানসী মূরতি তার সাকার রূপেতে যেন
নয়নের কত কাছে আসে!
হৃদয়ের প্রিয় যারা ছেড়ে এই ধরাধাম
চলে' গেছে আর এক লোকে,
তোর তারাটির মাঝে সেই স্নেহ-মুখগুলি
ফুটে ফুটে ওঠে, হেরি চোকে!
তোর সাথে কলপনা আসি' যেন মায়াবলে
রুদ্ধ হৃদি-দ্বার খুলে দেয়,
বন্দী আত্মা সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র কারা হতে যেন
অসীমের মাঝে মুক্তি পায়!
অস্ফুট হেমাভাব্যাপ্ত পশ্চিম আকাশে তোর,
স্বর্ণময় মেঘের প্রাঙ্গণে,
বসি সে দেখিতে পায় ধরাতলস্থিত তার
দূরবাসী অতিপ্রিয় [illegible]!
ছায়াময় পাখা মেলি নগ নদী অতিক্রমি'
কত স্থানে উড়ে চলে' যায়;
কত নব জগতের চারু চিত্রবৎ দৃশ্য
আঁখির সম্মুখে খুলে যায়।
প্রশান্ত হৃদয়ে তোর একটি দুইটি ক'রে
যেমন তারারা জ্বলে' ওঠে,
স্মৃতির কাননে মোর তোরে হেরি তেমনি লো
হারানো সুখের ফুল ফোটে!
বড় ভালবাসি আমি, অয়ি সন্ধ্যা, সঙ্গ তোর,
আসিস্ লো সখীর মতন,
তোর কাছে বসে' থাকি তোর মুখপানে রাখি
স্বপ্নময় বিমুগ্ধ নয়ন!

বিনয়কুমারী ধর।

পথ চাহি।

সারা নিশি গন্ধটুকু ব্যথিত হৃদয়ে ধরে,
কুসুম রয়েছে চেয়ে রজনী-প্রভাত তরে;
সারা দিন ম্লানমুখ ব্যথিত তারকাবালা
জেগে আছে সাঁঝবেলা ছড়াতে সে স্নিগ্ধ আলা;
স্নেহ-অশ্রুকণারাশি ধরিয়া হৃদয়প'রে,
লতায় ঢালিতে বারি ছুটে মেঘ দেশান্তরে;
নিশিদিন স্রোতস্বতী বুকে নিয়ে ঊর্ম্মিরাশি
আত্মহারা চলিয়াছে সুদূর সাগরে ভাসি;
যতনে জাগায়ে জ্যোতি ওই চাঁদ আছে চেয়ে,
নীল আকাশের বুক আলোকে ফেলিবে ছেয়ে;
মধুর সঙ্গীত-সুধা জড়ায়ে আপন গানে
বিহগ রয়েছে চাহি সাথীটির পথ পানে।
আমিও ব্যথিত হৃদি দিব বলি উপহার,
আছি তব পথ চাহি প্রাণে বেঁধে আশাভার।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

হৃদয়ের আলো।

আঁধার যেতেছে সরি,
আলোক আসিছে ফিরে,
আবার আলোক ডুবি
আঁধার আসিছে ঘিরে;
আঁধারে আলোকে খেলা
এ ধরায় পরে পরে;
হৃদয়ের আলো কেন
নিভে যায় চির তরে!

শ্রীকুঞ্জবিহারী বসাক।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

মুকুল। আষাঢ়। এখানি 'মুকুলের' জুবিলি-সংখ্যা। রঞ্জিত বর্ণে উত্তমরূপে মুদ্রিত এবং কুড়িখানি সুন্দর চিত্রে সুশোভিত। অনেকগুলি ছবি খুব উৎকৃষ্ট হইয়াছে। দেখিতেছি, 'সখা ও সাথী', 'দাসী' ও 'মুকুল', এই তিনখানি মাসিকপত্র ঊনবিংশ শতাব্দীর নূতন আবিষ্কার জুবিলি-'ব্রত' পালন করিয়াছেন; এই তিনখানি পত্রের মধ্যে চিত্রগৌরবে "মুকুলই বিজয় লাভ করিয়াছে। মহারাণীর তিনখানি বড় ছবি ও প্রিন্স্ আলবার্টের প্রতিমূর্ত্তিখানি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এবারকার আবরণপত্রখানিও অভিনব ও মনোরম হইয়াছে। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় এই চিত্রসৌন্দর্য্যের জন্য আমাদের ধন্যবাদভাজন। চিত্র সম্বন্ধে এ দেশ এখনও অন্ধতমসে পড়িয়া আছে, সেই দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের প্রয়াস সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। 'মুকুলের' আদ্যোপান্ত মহারাণীর বিবরণে পরিপূর্ণ—বালকগণ পড়িয়া সুখী হইবে। "জয় ভিক্টোরিয়া জয়!" ইতিশীর্ষক কবিতাটির আরম্ভভাগই কবিতা, তাহার পর সবটাই 'জুবিলি।' 'জুবিলি' কবিতার বিষয় নয়, অগত্যা লেখক 'পদ্য' রচিয়াই বিরত হইয়াছেন।

সখা ও সাথী। আষাঢ়। "মহারাণীর উত্তরাধিকারী" প্রবন্ধে, প্রিন্স্ অফ্ ওয়েলস্, তদীয় পত্নী প্রভৃতির পাঁচখানি চিত্র আছে। বঙ্গে 'বাহুল্য' ভিন্ন কোনও কাজের উপসংহার দেখিতে পাওয়া যায় না। জুবিলি উপলক্ষে রাজভক্তির যে তরঙ্গ উথলিয়া উঠিয়াছে, তাহাও সহসা নির্ব্বাণসুখ লাভ করিবে, আমরা অবশ্য এমন দুরাশা হৃদয়ে স্থান দিতে পারি না। জুবিলি, রাজা ও রাণী এবং রাজপরিবারের ছবি পুরাতনেরও পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে, আর কেন? এখন কি 'ইতিশেষ' করিলে ভাল হয় না? "ভূমিকম্প" প্রবন্ধটি সুলিখিত ও সুচিত্রিত। "দুই বন্ধুর" ছবিখানি সুন্দর—একটি বাঘ ও তাহার বন্ধু একটি কুকুর!

উৎসাহ। জ্যৈষ্ঠ। শ্রীযুক্ত শশধর রায়ের "গাছের বুদ্ধি" একটি সংক্ষিপ্ততম প্রবন্ধ, কিন্তু কৌতূহলের উদ্দীপক। লেখক উদ্ভিদ্-জগতের যে কয়টি তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা বুদ্ধিবিজৃম্ভিত বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা "গাছের বুদ্ধির" অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় কি? "কোনও কোনও গাছের ফুল এবং শাখাগ্রভাগ সূর্য্যের অভিমুখে সতত থাকিতে ভালবাসে। তাহারা প্রাতঃকালে পূর্ব্বমুখে, অপরাহ্নে পশ্চিমমুখে থাকে। ইহার মধ্যে কি সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা নাই?" এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে ইহাও বলা যায়, সৌন্দর্য্যপ্রিয় লেখকের কল্পনায় যাহা সৌন্দর্য্য-প্রিয়তারূপে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, তাহা হয় ত কোনও প্রাকৃতিক নিয়মের অলঙ্ঘনীয় শাসন-মাত্র। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়ের "কলিকাতা" প্রবন্ধে প্রাচীন কলিকাতার বিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে।

উৎসাহ। আষাঢ়। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র ক্রমশঃপ্রকাশ্য অজ্ঞেয়বাদ ও শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়ের "জগৎ শেঠ", এই দুইটি প্রবন্ধই উল্লেখযোগ্য। আজ কাল একটা কথা উঠিয়াছে, কবিতার পরমায়ু আর কত দিন? শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ "কবিতার যুগ" প্রবন্ধে সে বিষয়ের বিতর্ক করিয়াছেন।

দাসী। জুন। "জুবিলি উপলক্ষে সচিত্র।" এই সংখ্যার আদ্যোপান্ত মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কাহিনী ও কথায় পরিপূর্ণ। এবারকার দাসীতে অনেকগুলি চিত্র আছে। খোকা 'মুকুলের' অনেক 'ছবির' গহনাই এবার দাসীর অঙ্গে শোভিত দেখিতেছি। প্রবন্ধগুলি অনুবাদ বা সংগ্রহ; "ভিক্টোরিয়া যুগ" প্রবন্ধে চিন্তাশীলতা না হউক, অন্ততঃ মৌলিক মন্তব্য দেখিতে পাইবার আশা ছিল; কিন্তু হায়, মানুষের সব আশা পূর্ণ হয় না।

রাণী ভবানী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ;—বিবাহ।

বিল বাসবের বর্ষাসলিলপ্লাবিত নিম্নভূমি সমুন্নত করিয়া, মহারাজ রামজীবন তাহার উপর নবপ্রতিষ্ঠিত নাটোর রাজবাটীর বিচিত্র সৌধমালা রচনা করিয়াছিলেন। সম্মুখে দৃঢ়োন্নত সিংহদ্বার, চারি দিকে সমুন্নত পুর-প্রাচীর, প্রাচীরের বাহিরে প্রশান্তসলিলা দুর্গ-পরিখায় সুশোভিত হইয়া, রামজীবনের রাজবাটী রাজসাহী প্রদেশের গৌরববর্দ্ধন করিয়াছিল। যে তিনটি দুর্গপরিখা চক্রাকারে রাজবাটী পরিবেষ্টন করিয়া শত্রুসেনার আক্রমণ প্রতিহত করিত, তাহা এখন স্থানে স্থানে জলশূন্য হইয়াছে ;—রামজীবনের গৌরবমণ্ডিত সিংহদ্বারের জরাজীর্ণ ভগ্নাবশেষমাত্র এখনও বর্ত্তমাম আছে। পুরাতন রাজবাটীর অধিকাংশ রাজপ্রাসাদ কালক্রমে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে ; যাহা কিছু অতীত গৌরবের স্মৃতিচিহ্ন বর্ত্তমান ছিল, তাহাও ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে ধরাবিলুণ্ঠিত হইয়াছে। *

এই ঐতিহাসিক রাজবাটীতে বাস করিয়া মহারাজাধিরাজ রামজীবন সবিশেষ উৎসাহে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। কিন্তু রঘুনন্দন ও কালিকাপ্রসাদের পরলোকগমনে তাঁহার উৎসাহ অনুরাগ অবসন্ন হইয়া পড়িল! আর সেকালের যৌবনোৎসাহ নাই ; আর বঙ্গবিহার উড়িষ্যার নবাব-দেওয়ান কনিষ্ঠ সহোদর রঘুনন্দন নাই ; আর অতুল রাজসম্পদের একমাত্র উত্তরাধিকারী কুলপ্রদীপ কালিকাপ্রসাদ নাই ;—এখন কেবল শোকতাপপূর্ণ বৃদ্ধদশা! বাহুবলে, সংগ্রাম-কৌশলে, প্রতিভাগুণে, যে বিস্তীর্ণ রাজসাহী রাজ্য গঠিত হইল, তাহা উপভোগ করিবে কে, তাহাই রামজীবনের একমাত্র চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল।

---

* রামজীবনের প্রতিষ্ঠিত 'দোলমঞ্চ' নাটোর রাজবাটীর সমধিক শোভাবর্দ্ধন করিত ; এখন তাহার চিহ্নমাত্রও বর্ত্তমান নাই। দোলমঞ্চের ভিত্তিমূলে যে তাম্রফলক নিহিত ছিল, তাহা এখনও নাটোরাধিপতির রাজবাটীতে দেখিতে পাওয়া যায় ; তাহাই পূর্ব্বগৌরবের যৎসামান্য নিদর্শন।

সকলেই দত্তকপুত্র গ্রহণ করিবার জন্য পরামর্শ দিতে লাগিলেন। কেহ কেহ আবার বিষ্ণুরামের পুত্র দেবীপ্রসাদকেই রাজ্যদান করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। অবশেষে দত্তকপুত্র গ্রহণ করাই স্থির হইয়া গেল।

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সমসাময়িক গৌড়ের বাদশাহদিগের অধীনে কাশ্যপ-গোত্রীয়, ভাদুড়ী-বংশজাত, সুবুদ্ধি, কেশব ও জগদানন্দ নামে তিন ভাই উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। মুসলমান-রাজ-সরকারে ইঁহারা খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জগদানন্দ খাঁর পাঁচু রায় ও ভুবন রায় নামে দুই বৃদ্ধ-প্রপৌত্র ছিলেন। তন্মধ্যে পাঁচুর পুত্র রসিক রায় মহারাজ রামজীবনের সমসাময়িক ব্যক্তি। রসিক রায়ের দুইটি সুলক্ষণাক্রান্ত পুত্রসন্তান ছিল; তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্রটিকে মহারাজ রামজীবন দত্তকপুত্র গ্রহণ করিলেন। * এই দত্তকপুত্র নাটোর রাজবংশের দ্বিতীয় রাজা, এবং বাঙ্গালার ইতিহাসে মহারাজ রামকান্ত নামে সুপরিচিত।

রসিক রায় পুত্রদান করিয়া রামজীবনের বংশরক্ষা করিলেন; রামজীবনও প্রত্যুপকারস্বরূপ তাঁহাকে দুইটি মূল্যবান ভূসম্পত্তি দান করিলেন। নবাব সরকারে মহারাজ রামজীবনের নামে ঘোড়াঘাট চাক্‌লায় তপ্পে ভাতুড়িয়ার অন্তর্গত বার্ষিক ৭৭৬০৲ টাকা জমায় পরগণা চৌগ্রামের জমিদারী লিখা যাইত। † রসিক রায় উক্ত চৌগ্রাম ও ইসলামাবাদ নামক দুইটি পরগণা প্রাপ্ত হইলেন। রসিকের পুত্র কৃষ্ণকান্ত চৌগ্রামে রাজবাটী নির্ম্মাণ করিয়া বংশানুক্রমে "চৌগ্রামের রাজা" বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার সেই রাজসম্পদ এখন তাঁহার কুলভূষণ প্রপৌত্র সুপণ্ডিত রাজা রমণীকান্ত রায় বি. এ. উপভোগ করিতেছেন।

রামকান্তকে দত্তকগ্রহণ করায় রামজীবনের সামাজিক পদগৌরব অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। পাঁচু রায় এবং ভুবন রায় উভয়েই শ্রেষ্ঠ কুলীন; সুতরাং তাঁহাদের বংশের সন্তানকে দত্তকগ্রহণ করায় রামজীবনের পদগৌরব আর কেহ অস্বীকার করিতে পারিল না।

রামজীবন দত্তকগ্রহণ করায় সকলেই সমধিক আনন্দলাভ করিলেন; কেবল বিষ্ণুরামের পুত্র দেবীপ্রসাদ বিমর্ষ হইয়া উঠিলেন। রাজকুমার কালিকাপ্রসাদের অকালমৃত্যুতে দেবীপ্রসাদের আশালতা অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছিল;

* গৌড়ে ব্রাহ্মণ।

† Grant's Analysis of Finances of Bengal.

তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, অপুত্রক রামজীবনের অতুল রাজসম্পদ অতঃপর তাঁহারই করতলগত হইবে। দেবীপ্রসাদের সৌভাগ্যলাভের পথ পরিষ্কৃত হইয়া আসিয়াছিল; রামকান্তকে দত্তকগ্রহণ করায় তাহা আবার কণ্টকপূর্ণ হইল; সুতরাং দেবীপ্রসাদের হর্ষবিন্দু বিষাদসিন্ধুতে নিমগ্ন হইয়া গেল।

রামজীবন, রঘুনন্দন এবং বিষ্ণুরাম, তিন সহোদর। তিন জনেই একান্নে এক বাটীতে পরমসুখে জীবন যাপন করিতেন। রঘুনন্দনের উত্তরাধিকারী ছিল না; রামজীবনের দত্তকপুত্র রামকান্ত এবং বিষ্ণুরামের ঔরসপুত্র দেবীপ্রসাদ ভিন্ন নাটোর রাজ-সম্পদের আর কোনও অধিকারী নাই! সুতরাং দেবীপ্রসাদ বুঝিলেন যে, রামকান্তকে শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধ দত্তকপুত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও, তিনি কেবলমাত্র অর্দ্ধ রাজ্যের অধিকারী; আর যদি তাঁহাকে অসিদ্ধ দত্তকপুত্র বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায়, তবে একমাত্র দেবীপ্রসাদই সমগ্র রাজ্যের ভবিষ্যৎ অধিপতি। কিন্তু রামজীবনের জীবনকালে এ সকল কূটতর্ক উপস্থিত করিতে সাহস হইল না; দেবীপ্রসাদ নিতান্ত বিষণ্ণহৃদয়ে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

দেবীপ্রসাদের মনের ভাব অধিক দিন গোপন রহিল না। রাজদরবারে বিচক্ষণ বুদ্ধিমান পরমর্শদাতার কখনও অভাব হয় না। মধুমত্ত মধুকর যেমন ঝাঁকে ঝাঁকে মধুচক্রের আশে পাশে ভন্ ভন্ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, রাজদরবারেও সেইরূপ মক্ষিকারূপী হিতাকাঙ্ক্ষিগণ, আবশ্যক না থাকিলেও, গায়ে পড়িয়া সদুপদেশ দিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত হইয়া ঘুরিয়া বেড়ান। ইহাঁদের সুপরামর্শে কখনও কখনও সত্য সত্যই মধুবর্ষণ করে, কিন্তু সেরূপ সৌভাগ্য প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না;—অধিকাংশ স্থলে দংশনযাতনাই সার হইয়া থাকে। রামজীবনের ভাগ্যেও তাহাই হইতে লাগিল। তিনি এই সকল পরম-হিতাকাঙ্ক্ষিগণের কথায় বার্ত্তায় আকারে ইঙ্গিতে অল্পদিনের মধ্যেই দেবীপ্রসাদের মনের লেব বুঝিতে পারিলেন। বুঝিতে পারিলেন যে, এখন সময় থাকিতে কোনরূপ মীমাংসা না করিলে, কালে ইহা হইতেই তুমুল গৃহকলহের সূত্রপাত হইবে। সেই জন্য, রামজীবন দেবীপ্রসাদকে অনেক বুঝাইলেন, এবং তাঁহার রাজ্যপিপাসা শান্ত করিবার জন্য, তাঁহাকে রাজসাহী রাজ্যের ছয় আনা অংশ দান করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। * ইহাতে দেবীপ্রসাদের হিতৈষিবর্গ আহ্লাদিত না হইয়া নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। দেবীপ্রসাদ

* The Rajas of Rajshahi.

রামকান্তকে স্বীকার করিয়া লইলেও যখন অর্দ্ধরাজ্য লাভ করিতে সক্ষম, তখন তিনি ভিখারীর মত ছয় আনা অংশের দানগ্রহণ করিবেন কেন? রামজীবন বুঝিলেন যে, দেবীপ্রসাদ সহজে সম্মত হইবেন না, এবং এখন সম্মত হইলেও কালে গৃহকলহের সূত্রপাত করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিবেন না। সুতরাং তিনি আর পীড়াপীড়ি করিলেন না; সমুদায় রাজ্যই রামকান্তের থাকিয়া গেল।

রামজীবনের বিস্তৃত রাজ্যের তিন স্থানে তিনটি প্রধান রাজধানী সংস্থাপিত হইয়াছিল। নাটোর, বড়নগর এবং সেরপুরে এই সকল রাজধানীর কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বড়নগরের রাজধানীই রাজসাহী রাজ্যের সর্ব্ব-প্রধান রাজধানী; তথায় চাকলে মুরশিদাবাদ ও নিজ চাকলা রাজসাহীর সমুদায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। রাজকুমার কালিকাপ্রসাদের উপর বড়-নগরের পরিদর্শনভার ন্যস্ত ছিল; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে রায় রাইয়ান রঘুনন্দন সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে বড়নগর, এবং পূর্ব্ববঙ্গে সেরপুর,—এই দুইটি প্রধান কর্ম্মস্থল। সেরপুর বড় পুরাতন স্থান। ইহা এখন বগুড়া জেলায় পরগণে মেহমানশাহীর অন্তর্গত। সম্রাট আকবরের সময়ে শাহজাদা সেলিমের নামানুসারে সেরপুর কিছু দিবস "সেলিমনগর" নামে পরিচিত ছিল। ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে সেরপুরে একটি বাদশাহী কেল্লা ছিল; আইন-আকবরীতে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ১৫৮৯ হইতে ১৬০৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মহারাজ মানসিংহ বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার শাসনভার পরিচালনা করিয়া-ছিলেন। তিনি সেই সময়ে সেরপুরে একটি রাজবাটী নির্ম্মাণ করেন। গত শতাব্দীতে সেরপুর একটি গণ্য মান্য স্থান বলিয়া পরিচিত ছিল। প্রাচীন মানচিত্রে * দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেরপুর পূর্ব্ববাঙ্গলার প্রান্তরাজ্যের প্রধান নগর বলিয়া পরিচিত ছিল। সেই জন্য এখানে "বারদ্বারী কাছারি" নামে রাজসাহী রাজ্যের একটি প্রধান কাছারী বাটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। † এই কাছারীতে বৎসরে পাঁচ লক্ষ টাকা আদায় হইত। রঘুনন্দনের অভাবে এই সকল প্রধান প্রধান কাছারীর পরিদর্শনকার্য্য শিথিল হইয়া উঠিতে লাগিল। নাটোর রাজবাটীতে বসিয়া একাকী বিস্তীর্ণ জনপদের শাসনভার

* Rennel's Map.

† Hunter's Statistical Accounts, Vol. VIII.

পরিচালন করা কত দূর কঠিন, তাহা ক্রমেই রামজীবন উপলব্ধি করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে রামজীবনের শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতার পরিচয় পাইয়া, অনেকেই তাঁহার শাসনক্ষমতা চূর্ণ করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রভুভক্ত বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী দয়ারাম রায়ের শাসনকৌশলে আবার রামজীবনের প্রবল প্রতাপ চারি দিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল।

দয়ারাম সাহসী, প্রভুভক্ত, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, ধর্ম্মভীরু রাজকর্ম্মচারী বলিয়া, রামজীবন তাঁহাকে বহুদিন হইতে সস্নেহে সমাদর করিয়া আসিতেছিলেন; এখন রঘুনন্দনের অভাবে সেই দয়ারাম রায় মহারাজ রামজীবনের দক্ষিণ-বাহু বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিলেন। নাটোর-রাজবংশের ইতিহাসে দয়া-রামের স্মৃতি এখনও চিরজীবন্ত হইয়া রহিয়াছে। কখনও অসিহস্তে, কখনও বা লেখনীধারণ করিয়া, কখনও ভূষণায়, কখনওবা রাজসাহী অঞ্চলে, যখন যেখানে যেরূপ কার্য্যের আবশ্যক হইয়াছে, দয়ারাম অকুতোভয়ে, অপরাজিত উৎসাহে, অক্ষুণ্ণ অধ্যবসায়ে তাহাই সম্পাদন করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার প্রভুভক্তির পরিচয় পাইয়া রামজীবন সময়ে সময়ে তাঁহাকে যে সকল বহুমূল্য 'তালুক' প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা এখনকার দিনে একটি ছোট খাট রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। দয়ারাম এই সকল রাজপ্রসাদ লাভ করিয়া রাজ-সাহী রাজ্যে এবং নবাব দরবারে সবিশেষ পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাম-জীবন তাঁহার সঙ্গে প্রভুভৃত্যের ন্যায় ব্যবহার করিতেন না; রাজকুমার রাম-কান্ত তাঁহাকে দাদা ভিন্ন অন্য কোনরূপ সম্বোধন করিতে পারিতেন না; লোকেও দয়ারামকে সবিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিত।

বিশ্বস্ত মন্ত্রী দয়ারামের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া মহারাজ রামজীবন শেষ জীবনে কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইবার অবসর পাইয়াছিলেন। ক্রমে চরমকাল উপস্থিত হইতেছে দেখিয়া, দয়ারামকেই রাজকুমার রামকান্তের অভিভাবক নিযুক্ত করিলেন।

নানা স্থান হইতে রামকান্তের বিবাহের প্রস্তাব আসিতে লাগিল। দয়া-রামই সে সকল বিষয়ে সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। অবশেষে দয়ারামের উদ্যোগে, ছাতিনগ্রাম-নিবাসী আত্মারাম চৌধুরীর একমাত্র কন্যা ভবানী দেবীর সহিত রামকান্তের শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হইল। এই রাজকুললক্ষ্মী উত্তরকালে বাঙ্গলার ইতিহাসে প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী নামে চিরপরিচিতা হইয়াছেন।

রাণী ভবানীর বিবাহে অনেক সমারোহ হইয়াছিল। অনেক দেশ বিদেশের রাজা মহারাজেরা নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। নাটোর রাজসংসারের তখন পূর্ণযৌবনের গৌরবোজ্জ্বল অবস্থা; সুতরাং "মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ" এই প্রবাদ সার্থক হইয়াছিল;—কিন্তু সে সকল কথার সঙ্গে আমাদের সংস্রব অল্প। এখনও তাহার কত কিম্বদন্তী রাজসাহী প্রদেশে প্রচলিত রহিয়াছে।

আত্মারাম একজন সম্ভ্রান্ত জমিদার। ছাতিনগ্রাম অঞ্চলে পদগৌরবে বা মানমর্য্যাদায় কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। ছাতিনগ্রামের প্রাচীন অধিবাসীরা বলেন যে, আত্মারামের আগ্রহাতিশয্যে ছাতিনগ্রামেই রাণী ভবানীর বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়াছিল; এবং তদুপলক্ষে বরকর্ত্তা মহারাজাধিরাজ রামজীবনকেও ছাতিনগ্রামে পদধূলি প্রদান করিতে হইয়াছিল। তাঁহারা এখনও একটি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া থাকেন যে, সেই স্থানে বরকর্ত্তার বাসাবাটী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু বরকর্ত্তা অন্যের জমিদারীতে পদার্পণ করিতে অসম্মত হওয়ায়, আত্মারাম চৌধুরী সাহ্লাদে ছাতিনগ্রামের একাংশ বৈবাহিককে যৌতুকদান করিয়াছিলেন। এ সকল কাহিনীর সত্য মিথ্যা নির্ণয় করা সুকঠিন; তবে এইমাত্র জানিতে পারা যায় যে, আত্মারামের ছাতিনগ্রাম কালক্রমে অন্য লোকের জমিদারীভুক্ত হইয়াছে, কিন্তু ছাতিনগ্রামের একাংশ, এখনও নাটোর রাজবংশের অধিকারে রহিয়াছে।

এই বিবাহের পর, মহারাজ রামজীবন অধিকদিন জীবিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু রামকান্তের বিবাহ এবং রামজীবনের মৃত্যুকাল লইয়া ইতিহাসলেখকদিগের মধ্যে বহুদিন হইতে বাদ প্রতিবাদ চলিয়া আসিতেছে।

রামজীবনের স্বর্গারোহণের পরে, রাজকুমার রামকান্ত কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত দয়ারাম রায়ের রক্ষণাবেক্ষণে থাকিয়া, ১১৪১ সালে নবাবসরকার হইতে নিজ নামে জমিদারী সনন্দ লাভ করেন; * কেহ কেহ বলেন যে, তখন তিনি "অষ্টাদশ বৎসরের তরুণ যুবক।"† মহারাজ রামজীবন ১১৩৭ সালে পরলোক গমন করেন; কেহ কেহ বলেন যে, তখনই রামকান্ত "অষ্টাদশ বৎসরের তরুণ যুবক।" ‡ স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখিয়া গিয়াছেন যে, দয়ারামের হস্তে

* Grant's Analysis of Finances of Bengal.

† নবনারী।

‡ দ্বাদশনারী।

রাজসাহী রাজ্যের ও রাজকুমার রামকান্তের রক্ষণভার সমর্পণ করিয়া, মহারাজ রামজীবন ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। * মিত্র মহাশয়ের অন্যান্য অনেক উক্তির ন্যায় এটিও অপ্রকৃত বলিয়া বোধ হয়। তিনি কোথায় কাহার নিকট হইতে ইহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে কথার কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দ ১১৪৪ সাল; তাহার অন্ততঃ তিন বৎসর পূর্ব্বে, ১১৪১ সালে রামকান্ত যে রাজ্যভার পাইয়াছিলেন, তাহা নবাবী আমলের ১১৪১ সালের "এহিতিমামবন্দীতে" প্রকাশিত রহিয়াছে। † সুতরাং সকল কথা একত্র বিচার করিলে, মহারাজ রামজীবন যে ১১৩৭ সালে (১৭৩০ খৃষ্টাব্দে) পরলোক গমন করেন, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না।

দিল্লীর বাদশাহের প্রবল প্রতাপ দিন দিন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল; তথাপি লোকে বিপদে পড়িলে বাদশাহের দোহাই দিতে ক্রটী করিত না। এইরূপে বাদশাহের দোহাই দিয়া সুজা খাঁ দিন কতকের জন্য সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি চিররুগ্ন হইয়া পড়ায়, তাঁহার নামে তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁ নবাবী করিতেছিলেন। সরফরাজের সময়ে, হাজি আহ্‌মদ এবং আলিবর্দ্দীর প্রতিপত্তি ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল।

এই সময়ে মুরশিদাবাদে একরূপ রাজবিপ্লব। পিতা সুজা খাঁকে প্রতিহত করিয়া পুত্র সরফরাজ খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন; অবশেষে সুজা খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করায়, সরফরাজ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং রাজধানীতে সুজা খাঁর এবং সরফরাজ খাঁর আত্মীয় অন্তরঙ্গগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। দেশের লোক সুজা খাঁর অনুরক্ত, কিন্তু নানা কারণে সরফরাজ খাঁর উপর বিরক্ত;—অথচ সুজা খাঁ শয্যাগত, আর অপ্রিয়দর্শন সরফরাজ খাঁ তাঁহার নামে রাজ্যশাসনে নিযুক্ত! কাহার ভাগ্যে কি ঘটিবে, তাহা অল্প লোকেই অনুমান করিতে পারিত। এরূপ অবস্থায় রাজসাহীর ন্যায় বিস্তৃত জনপদের শাসনভার লইয়া দয়ারাম যেরূপ সুকৌশলে প্রজাপালন করিতেছিলেন, তাহাতে নবাব-দরবারে রাজসাহীর গৌরব পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ ছিল। ১১৩৭ হইতে ১১৪১ পর্য্যন্ত দয়ারাম যেরূপ

* In 1737, Ramjiban died, leaving the temporary charge of the Raj in the hands of his friend and counsellor Dayaram Rai"—The Rajas of Rajshahi.

† Grant's Analysis of Finances of Bengal.

সুকৌশলে রাজ্যরক্ষা করিতেছিলেন, তাহাতে ইচ্ছা থাকিলেও, দেবীপ্রসাদ কোনরূপ গোলযোগ উপস্থিত করিতে সাহস পাইলেন না।

দয়ারামের শাসনকৌশলের পরিচয় দিবার জন্য মিত্র মহাশয় লিখিয়া গিয়াছেন যে, "দয়ারাম যেরূপ ভাবে রাজসাহী রাজ্যের শাসনভার পরিচালন করিয়াছিলেন, তাহা যথার্থই সবিশেষ প্রশংসাযোগ্য। ইহাতে দয়ারামের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও নিরপেক্ষ স্বভাবের পরিচয় রহিয়া গিয়াছে।" * রামকান্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বৃদ্ধ মন্ত্রী দয়ারাম রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, দিঘাপতিয়ায় রাজবাটী নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ১১৪১ সাল (১৭৩৪ খৃষ্টাব্দ) হইতে রামকান্ত স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন কার্য্যে অগ্রসর হইলেন।

এতদিন দেবীপ্রসাদ যে সুযোগের অপেক্ষায় নীরবে দিনযাপন করিতেছিলেন, দয়ারাম অবসর গ্রহণ করায় সেই সুযোগ উপস্থিত হইল। কিন্তু নবাব-দরবারে চেষ্টা করিয়া ফল হইল না; সেখানে তখন পর্য্যন্তও রঘুনন্দনের স্মৃতি বিলুপ্ত হয় নাই; সুতরাং রামকান্তের প্রতি সকলেরই সবিশেষ স্নেহদৃষ্টি ছিল।

১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে (১১৪৪ সালে) নলডাঙ্গার রাজা রঘুদেব রাজস্বপ্রদানে অক্ষম হইলে, নবাব সুজা খাঁর আদেশে তাঁহার জমিদারী রামকান্তের হস্তে সমর্পিত হইল। দেবীপ্রসাদ বুঝিলেন যে, নবাব সুজা খাঁর আমলে তাঁহার আশালতা বর্দ্ধিত হইতে পারিবে না। রামকান্ত রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন; দেবীপ্রসাদ ঈর্ষ্যাকষায়িতলোচনে তাঁহার ছত্রদণ্ডের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

মহারাজ রামজীবনের সময়ে অল্পদিনের মধ্যে অনেকগুলি জমিদারী রাজসাহীর রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল; তাহার মধ্যে কত পরগণা রাজসাহীর, কত পরগণা অন্য লোকের, তাহার কিছুমাত্র স্থিরতা ছিল না। রামজীবন এবং রঘুনন্দনের বাহুবলে অথবা শাসন-কৌশলে অনেক স্থান নবাবের অজ্ঞাতসারেও তাঁহাদের রাজ্যভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। রামকান্ত রাজ্যলাভ করিলে, রাজসাহী রাজ্যের সীমা ও পরগণাদি নির্দ্দিষ্ট হইল, এবং বার্ষিক রাজকর ও বাজে জমার পরিমাণ পুনরায় স্থিরীকৃত হইল।

* "His management of the Raj during the inter-regnum was admirable; and evinced great sagacity and impartiality"—The Rajas of Rajshahi.

রামজীবনের সময়ে রাজসাহী প্রদেশে ৬৮ পরগণা, ভাতুড়িয়া প্রদেশে ৩০ পরগণা, ভূষণা অঞ্চলে ২৯ পরগণা, এবং বাজে মহালে ১২ পরগণা, রাজসাহীর রাজ্যভুক্ত বলিয়া পরিচিত ছিল। এতদনুসারে ১৩৯ পরগণার জন্য রামজীবন বার্ষিক ১৭৪১৯৮৭ টাকা রাজকর প্রদান করিতেন। রামকান্তের সময়ে রাজসাহী প্রদেশে ৭৮ পরগণা, ভাতুড়িয়া প্রদেশে ২৩ পরগণা, ভূষণা অঞ্চলে ২১ পরগণা, এবং বাজে মহালে ৪২ পরগণা, মোট ১৬৪ পরগণা ও ১৮৫৩৩২৫ টাকা বার্ষিক রাজকর নির্দ্দিষ্ট হইল। * পূর্ব্বাপেক্ষা ১১১৩৩৮ টাকা রাজকর বর্দ্ধিত হইল বটে, কিন্তু নূতন বন্দোবস্তে অনেক নূতন পরগণা রামকান্তের রাজ্যভুক্ত হইল। এই সকল পরগণার রাজকর বড় অধিক ছিল না; কিন্তু বিলক্ষণ লাভ ছিল। সুতরাং রামকান্তের সময়ে রাজসাহী রাজ্যের সমধিক উন্নতির অবস্থা প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

১১৪১ সাল হইতে ১১৪৭ সাল (অর্থাৎ ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত ছয় বৎসরের ইতিহাস একটু বিশেষ ভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। এইরূপ আলোচনা না করিয়া অনেকে অনেকরূপ অদ্ভুত জনশ্রুতির সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। এই সময়ের ইতিহাস নানা কারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য;—এই সময়ে রাজসাহীর শাসনভার লইয়া "তরুণ যুবক" রামকান্ত রাজসাহীর মহারাজা নামে পরিচিত হইয়াছিলেন; এই সময়ে বিচক্ষণ বৃদ্ধমন্ত্রী দয়ারাম রায় দিঘাপতিয়ায় রাজবাটী নির্ম্মাণ করিতেছিলেন বলিয়া নাটোর রাজদরবারে সর্ব্বদা গতিবিধি করিতেন না; এই সময়ে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার সিংহাসনে কখন সুজা, কখন সরফরাজ উপবেশন করিয়া, নানারূপ রাষ্ট্রবিপ্লবের সূত্রপাত করিতেছিলেন।

এই ছয় বৎসর রামকান্ত 'তরুণযুবক' হইলেও কিরূপ সুকৌশলে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় রহিয়া গিয়াছে। রাজসাহী রাজ্যের মত অর্দ্ধবঙ্গব্যাপী সুবিস্তৃত জনপদের শাসন সংরক্ষণ করিয়া যথাকালে নির্দ্দিষ্ট রাজকর প্রদান করাই সেকালে সবিশেষ যোগ্যতার পরিচয়স্থল হইয়া উঠিয়াছিল। 'তরুণযুবক' রামকান্তের সমসাময়িক অনেক পুরাতন জমিদার বার্ষিক রাজকর পরিশোধ করিতে না পারিয়া, এই ছয় বৎসরের মধ্যে অন্যের হস্তে জমিদারীর রক্ষণভার প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রামকান্তের

* Grant's Analysis of Finances of Bengal.

ভাগ্যে সেরূপ বিড়ম্বনা উপস্থিত না হইয়া, ক্রমে ক্রমে এই ছয় বৎসরে তাঁহার হস্তে অনেক নূতন জমিদারীর শাসনভার ন্যস্ত হইয়াছিল। যশোহরের ইতিহাস-লেখক * বলেন যে, ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিন বৎসরের জন্য নলডাঙ্গার রাজা রঘুদেবের জমিদারী রামকান্তের হস্তে সমর্পিত হইয়াছিল। মিত্র মহাশয় বলেন যে, ১১৪৬ সালে রামকান্ত স্বরূপপুর ও পাতিলাদহের জমিদারী প্রাপ্ত হন। † এই ছয় বৎসরের মধ্যে রামকান্ত যে অনেক নূতন জমিদারীর শাসন-ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সুজা খাঁর আমলের 'এহিতিমামবন্দী'ই তাহার প্রমাণ। ‡

একালে টাকা থাকিলে নূতন জমিদারী ক্রয় করিতে পারা যায়; সুতরাং কাহাকেও জমিদারীর উপর জমিদারী ক্রয় করিতে দেখিলে তাহাতে কোনরূপ ব্যক্তিগত যোগ্যতা সূচিত হয় না। নবাবী আমলে এরূপ নিয়ম ছিল না। কেহ বৎসরের রাজকর পরিশোধ করিতে না পারিলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার জমিদারী নিলাম হইত না; কিন্তু যাঁহারা শাসনকৌশল ও রাজস্বপ্রদানের জন্য নবাব-সরকারে সুখ্যাতি লাভ করিতেন, সেই সকল সুযোগ্য জমিদারের হস্তে ঐ সকল রাজস্বদানবিমুখ জমিদারীর শাসনভার ন্যস্ত হইত। সুতরাং সবিশেষ শাসনকৌশল না থাকিলে, কেহ নবাবী আমলে নূতন জমিদারীর শাসনভার প্রাপ্ত হইতেন না।

নবাব-দরবারে রামকান্তের শাসনকৌশলের পরিচয় না থাকিলে, অন্যের রাজ্য তাঁহার হস্তে সমর্পিত হইত না। যথাকালে রাজকর প্রদান করা জমিদার-দিগের অবশ্যকর্ত্তব্য; তাহাই তাঁহাদের শাসনকৌশলের প্রধান পরিচয়। মুরশিদ কুলী খাঁ প্রতি বৎসরের বৈশাখ মাসে দিল্লীতে রাজস্ব প্রেরণ করিতেন, এবং তদুপলক্ষে নূতন বৎসরের রাজস্বসংগ্রহের জন্য জমিদারদিগকে লইয়া "পুণ্যাহ" করিবার এক অভিনব নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন। পুণ্যাহদিনে সকল জমিদারকেই স্বয়ং অথবা প্রতিনিধি পাঠাইয়া জগৎশেঠের বাটীতে উপস্থিত থাকিয়া, পূর্ব্ব বৎসরের রাজকর পরিশোধ করিয়া দিতে হইত; কপর্দ্দক বাকী থাকিলে এবং সেই বাকী সঙ্গত কারণে "মাফ্" না পাইলে, কেহই নূতন বৎসরের রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষমতা পাইতেন না। জমিদারেরা

* J. Westland.

† The Rajas of Rajshahi.

‡ Grants' Analysis of Finances of Bengal.

নবাবসরকারের করসংগ্রহকারী বার্ষিক কর্ম্মচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুতরাং পৈতৃক পদগৌরব রক্ষা করিতে গিয়া, অনেকে জগৎশেঠের নিকট ঋণগ্রস্ত হইতেন। এই সকল নিয়ম প্রচলিত থাকায়, কাহারও পক্ষে দুই তিন বৎসরের রাজকর বাকী রাখা সম্ভব হইত না।

আমরা যে ছয় বৎসরের ইতিহাস বিশেষভাবে আলোচনা করিতেছি, সেই ছয় বৎসরে রামকান্ত যে শাসনকৌশলের পরিচয় প্রদান করিয়া অন্যের জমিদারীর শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। এই কথাগুলি বিস্মৃত হইলে মহারাজ রামকান্ত ও রাণী ভবানীর পরবর্ত্তী দুঃখ-কাহিনী ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায় না। কেহ কেহ সেই জন্য ঐতিহাসিক সত্যানুসন্ধান না করিয়া, রামকান্তকে কল্পনাবলে নিতান্ত অসচ্চরিত্র, বিষয়-বুদ্ধিহীন, উচ্ছৃঙ্খল, "তরুণ যুবক" বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন! মিত্র মহাশয় রামকান্তের ধর্ম্মনিষ্ঠার সবিশেষ প্রশংসা করিয়াও তাঁহার বিষয়বুদ্ধিহীনতার উল্লেখ করিয়া নিন্দা করিতে ত্রুটি করেন নাই। *

প্রতিভাশালিনী শাসনকর্ত্রী বলিয়া রাণী ভবানী বাঙ্গলার ইতিহাসে চির-স্মরণীয়া হইয়াছেন। তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমতী সহধর্ম্মিণী লাভ করিয়া রামকান্ত যে স্বধর্ম্মনিষ্ঠার ও রাজ্যশাসনের জন্য স্বদেশে প্রশংসালাভ করিবেন, তাহা আশ্চর্য্যের কথা নহে। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, মহারাজ রামকান্তের ইতিহাসের সমুচিত সমালোচনা না করিয়া, অনেকেই তাঁহাকে বিষয়বুদ্ধিহীন কুক্রিয়াসক্ত তরুণ যুবক বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। রামকান্ত জীবিত থাকিতে রাণী ভবানী রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই; কিন্তু তাঁহার পুণ্য কার্য্যের প্রবাহ তখন হইতেই প্রবাহিত হইয়াছিল। সহসা এক অভিনব রাজবিপ্লব উপস্থিত হইয়া রামকান্ত ও রাণী ভবানীর সুখের সংসার দুঃখের হাহাকারে ডুবিয়া পড়িল।

নবাব সুজা খাঁর শাসনসময়ে আলিবর্দ্দী বিহারের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়া পাটনার নবাব বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। হাজি আহমদ ও আলিবর্দ্দী বাঙ্গালী জমিদারদিগের নিকট সবিশেষ সুপরিচিত; সুজা খাঁর দক্ষিণবাহু

* When Ramkanta succeeded to the Raj, he was 18 years old. He was a pious man, and devoted his time to the performance of the Pujas and religious duties, but he had no capacity for business.—The Rajas of Rajshahi.

বলিয়া সকলেই তাঁহাদিগকে সমুচিত সমাদর করিতেন। তাঁহাদের পদগৌরবে, তাঁহাদের ক্ষমতাবিস্তারে, তাঁহাদের লোকপ্রশংসায়, সরফরাজ খাঁ ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিলেন; সেই জন্য সরফরাজের সঙ্গে আলিবর্দ্দীর মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয়। সুজা খাঁ এই সকল গৃহকলহের আভাস পাইয়া, আলিবর্দ্দীকে পাটনার শাসনভার প্রদান করিয়া, তাঁহাকে সরফরাজের চক্ষুর অন্তরাল করিয়া রাখিয়াছিলেন।

এই সময়ে * লুণ্ঠনলোলুপ নাদির শাহ সসৈন্যে দিল্লী আক্রমণ করিয়া সদর্পে পুরপ্রবেশ করেন। উন্মত্ত নাদির-সৈন্যের উচ্ছৃঙ্খল অত্যাচারে দিল্লীর ইতিহাসবিখ্যাত ইন্দ্রপুরী শ্মশানভূমিতে পরিণত হইল। রাজধানীর পল্লীতে পল্লীতে হাহাকার পড়িয়া গেল। কত লোক শত্রুহস্তে নিহত হইল;—কত লোক আহত-শরীরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল;—যখন চারি দিক হইতে বায়ুবেগে প্রচণ্ড উল্কাপিণ্ড উদ্গীরণ করিয়া অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল, তখন কত অন্তঃপুরচারিণী অবগুণ্ঠনবতী রমণী ও অসহায় বালকবালিকা অর্দ্ধদগ্ধ-কলেবরে একবিন্দু পিপাসার জলের জন্য করুণ ক্রন্দনে রাজপথ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল,—কেহ তাহার সন্ধান লইবার অবসর পাইল না। সকলেই প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল! নাদির শাহ যথাশক্তি ভারতলুণ্ঠন-ব্রত সুসম্পন্ন করিয়া, ভারতরত্ন কোহিনূর কুক্ষিগত করিয়া, স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন;—কিন্তু মোগলের প্রবলপ্রতাপ আর দিল্লী নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল না!

এই সকল দুর্ঘটনার মধ্যে সুজা খাঁ লোকান্তরিত হইলেন; সরফরাজ তাঁহার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। সরফরাজের পাপস্রোত খরবেগ ধারণ করিল;—হাজি আহ্‌মদ পদে পদে অবমানিত হইতে লাগিলেন; বিলাসবাসনার সঙ্গে সঙ্গে পাপলিপ্সা শতমুখী হইয়া ছুটিয়া চলিল; অবশেষে একদিন জগৎশেঠের পুত্রবধূকে বলপূর্ব্বক প্রাসাদে আনয়ন করিয়া সরফরাজ সম্ভ্রান্ত শেঠবংশের নিষ্কলঙ্ক কুলে কালিমা ঢালিয়া দিলেন। † জগৎশেঠ পাদাহত কালসর্পের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন; জমিদারদল তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া সরফরাজের সর্ব্বনাশসাধনের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

* 8th March, 1739.

† ষ্টুয়ার্ট এই কথা লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু শেঠবংশধরদিগের মধ্যে কেহই এই কলঙ্ক-কাহিনী সত্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

সেকালে জগৎশেঠের ন্যায় আর কোনও ক্ষমতাশালী ধন-কুবের ছিলেন কি না সন্দেহ। বাদশাহ ফর্‌রোক্‌শায়ারের "ফারমান" অনুসারে নবাবের বাম পার্শ্বেই জগৎশেঠের আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। লোকে বলিত, জগৎশেঠ মনে করিলে কেবলমাত্র স্বর্ণমুদ্রা ঢালিয়া দিয়া ভাগীরথীর স্রোত বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন। জগৎশেঠ জমিদারদিগের আশ্রয়বৃক্ষ;—যথাসময়ে রাজকর প্রদান করিতে না পারিলে, অনেকেই তাঁহার নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়া রাজ্যরক্ষা করিতেন। তাঁহার উপর যখন এরূপ অত্যাচার হইয়া গেল, তখন আর অন্য লোকের নিরাপদ হইবার সম্ভাবনা কি? অগত্যা সকলেই সরফরাজ খাঁকে পদচ্যুত করিয়া আর কাহাকেও সিংহাসনে বসাইবার জন্য দিল্লীতে দরবার করিতে লাগিলেন। নাদির শাহের নির্য্যাতনে দশ মাস পর্য্যন্ত কোনও ফল হইল না; অবশেষে প্রার্থিত সনন্দ বাহির হইল। গিরিয়ার প্রান্তরে সরফরাজ খাঁকে সম্মুখযুদ্ধে নিহত করিয়া, ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে, প্রজাসাধারণের শুভাশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া, নবাব আলিবর্দ্দী বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

ভুল।

১

মানবজীবন নদীর স্রোতের মত; ঘটনার পর ঘটনার তরঙ্গ তাহার বক্ষ বিলোড়িত করে। তরঙ্গহীন নদীস্রোত নাই; ঘটনাহীন মানবজীবন নাই। নদীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ যেমন উঠে, আবার মিলাইয়া যায়, কোনও চিহ্ন রাখিয়া যায় না, মানবজীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাও তেমনই কোনও অলঙ্ঘ্য অচিন্তনীয় কারণে আইসে যায়, কোনও চিহ্ন রাখিয়া যায় না। নদীর এক একটা বৃহৎ তরঙ্গ যেমন তীরে আপনার চিহ্ন রাখিয়া যায়, মানবজীবনের এক একটা বৃহৎ ঘটনা তেমনই হৃদয়ে চিরস্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া যায়; কালের করস্পর্শেও সে চিহ্ন মুছে না। সকলেরই জীবনে সেরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে; তবে কোনও ঘটনায় আমরাই কর্ত্তা, কোনও ঘটনায় আমরা কোন না কোনরূপে বিজড়িত। আমি আমার জীবনের একটা সেইরূপ ঘটনার কথা বলিব।

ভবেশ আমার বাল্যবন্ধু। বাল্যকালে আমরা পরস্পরকে অত্যন্ত ভাল-

বাসিতাম। বঙ্কিমচন্দ্র সত্যই বলিয়াছেন—"বাল্যকালের ভালবাসায় বুঝি কিছু অভিসম্পাত আছে।" বাল্যকালে যাহাদিগের সহিত এত ভালবাসা ছিল, আজ তাহারা কে কোথায়? সংসারের স্রোত নানা জনকে নানা দিকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে; সে অতীত জীবন যেন স্বপ্নের মত হইয়া গিয়াছে। আজ এই সংসারে পুত্রকন্যাপরিবেষ্টিত হইয়াও কিন্তু সে স্বপ্ন বড় মধুর বলিয়া মনে হয়।

সংসারে প্রবেশের পরও ভবেশের সহিত মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ হইত। পুরাতন বন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ করা আমার একটা বাতিক বিশেষ। তাহার পর একেবারে বর্ষাধিক কাল ভবেশের কোনও সংবাদ পাই নাই। ইহার মধ্যে একবার কোনও বিবাহবাটীতে আমার পত্নীর সহিত ভবেশের পত্নীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। গৃহিণী আসিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, ভবেশের পত্নী বড় কৃশ হইয়াছেন, আর গৃহিণী ভবেশের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। আমি সে কথায় বড় কান দিই নাই; রমণীর অশ্রু আমার নিকট নিতান্তই সহজ ও সুলভ বলিয়া বোধ হয়।

২

ইহার পর একদিন এক বন্ধুর কাছে শুনিলাম যে, ভবেশ আবার বিবাহ করিবে। কথাটা বিশ্বাস করিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। এক স্ত্রী বর্ত্তমানে আবার যে ভবেশ বিবাহ করিবে, ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। সেই দিন বন্ধুগৃহ হইতে গৃহে ফিরিবার পথে আমি ভবেশের গৃহে গমন করিলাম। ভবেশের দেখা পাইলাম না।

তাহার পর দিন ভবেশকে একখানা পত্র লিখিলাম।

চার দিন পরে পত্রের উত্তর আসিল—সুদীর্ঘ পত্র। সেই পত্র পাঠ করিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। ভবেশ লিখিয়াছে,—সে কথা সত্য! সে লিখিয়াছে,—

"আমি যে যাতনা সহিয়াছি, তাহা আর কি বলিব? বিবাহের পরেই দেখিলাম, আমি আকাশে ঘর বাঁধিতেছিলাম। দেখিলাম, আমার কথা, আমার আশা, আমার পত্নীর নিকট দুর্ব্বোধ প্রহেলিকা, তাঁহার কথা আমার নিকট শিশুসুলভ। ছেলেখেলার জন্য কি বিবাহ করিয়াছিলাম! এ যে আমার খেলার সাথী; জীবনের মহদনুষ্ঠানে এ ত আমার সহায় সহচর নহে! তবে এ কি করিয়াছি? কেন এ ভুল করিলাম? তখনই দেখিলাম—

'সে কি জানে কি প্রেম-ভাণ্ডার পুরুষের বিশাল হৃদয়?
সে কি জানে নিজ অধিকার কি বিস্তৃত কি শকতিময়?

বুঝালে কি বুঝিবে আমার অতীত সমর-পরাজয়?
এ আমার বিলাস-সাধন, আত্মার সঙ্গিনী এ ত নয়!'

"দেখিয়া ব্যথিত হইলাম। তবুও একবার তাঁহাকে 'আত্মার সঙ্গিনী' করিবার চেষ্টা করিলাম। প্রাণপণ চেষ্টা করিলাম, সব চেষ্টা বিফল হইল।

"আমার কর্ত্তব্য আমি করিলাম। যখন বিফলমনোরথ হইলাম, তখন বুঝিলাম, জীবনে যে সুখের আশা করিয়াছিলাম, তাহা পাইব না। এ মরুময় জীবন লইয়া জগতে কোনও কার্য্যই সাধন করিতে পারিব না; এ নিষ্ফল জীবন কেবল দুঃখ যন্ত্রণার ইতিহাস হইবে। যেমন ঔৎসুক্য হইতে আকাঙ্ক্ষা, আকাঙ্ক্ষা হইতে আসক্তি, আসক্তি হইতে প্রেম ভালবাসার ক্রমবিকাশ, তেমনই তাহার আবার ক্রমনিবৃত্তি আছে; প্রেম হইতে উপেক্ষা, উপেক্ষা হইতে বিরক্তি, বিরক্তি হইতে ঘৃণা। ঘটনায় যেমন প্রেম বিকশিত হয়, তেমনই আবার ঘটনায় প্রেমের নিবৃত্তি হয়।

"আমার প্রেম ক্রমে ক্রমে উপেক্ষায় পরিণত হইল। আমি আমার পত্নীর কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতাম না। তিনি তাঁহার হাসি, গল্প, বসন, ভূষণ লইয়া ব্যাপৃত থাকিতেন।

"তাঁহার প্রতি আমার আর কি কর্ত্তব্য ছিল? তাঁহার ভরণপোষণের জন্য আমি দায়ী—সে দায়িত্ব আমি অস্বীকার করি না। আমার কার্য্য আমি করিয়াছি, করিতেছি, এবং করিব। তাহার পর আমার আর কি কর্ত্তব্য আছে? তিনি আমার অভিপ্রায় মত কার্য্য করেন নাই, তিনি আমার নিকট আবার কি প্রত্যাশা করিতে পারেন? আমি জীবনে যে কি যাতনা সহ্য করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। যদি তিনি এতটুকু চেষ্টা করিতেন, যদি আপনার এতটুকু উন্নতি সাধিত করিতেন, যদি আমার মনোমত হইবার জন্য এতটুকু চেষ্টা করিতেন! আমি কি করিয়াছি, কি যাতনা সহিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতে পারি না।"

তাহার পর ভবেশ এমনই নানা কথা লিখিয়াছে। কথাগুলা বড়ই বেদনায় বাহির হইয়াছে। পড়িয়া ভবেশের জন্য দুঃখ হইল; কিন্তু আমার মনে হইল, কোথায় একটা বড় ভুল হইয়াছে, তাই এত গণ্ডগোল। আর আমার মনে হইল, ভবেশ আপনার পায় আপনি কুঠার মারিয়াছে; আর একজনের উপর, বিশেষ স্ত্রীর উপর, কি অত আশা স্থাপন করিতে আছে? ও বিষয়ে আমার মত স্বতন্ত্র; আমি আমার বন্ধুবান্ধব, উপন্যাসপাঠ, পার্টি, চুরুটের পাইপ, হাওয়া

খাওয়া, এই সব লইয়া আছি; গৃহিণী তাঁহার ছেলে মেয়ে, গৃহকর্ম্ম, হাঁড়ি কুড়ি লইয়া ব্যস্ত আছেন;—একটু পশমের কারু কার্য্য, তাহাও এক ছেলের মা হইয়াই ছাড়িয়াছিলেন। আমার অসুখটা কিসের ? তবে মধ্যে মধ্যে একটু ঝগড়া ঝাঁটি, মান অভিমান,—কোন স্বামী স্ত্রীর তাহা নাই ? আমি ত বেশ সন্তুষ্ট আছি ; গৃহিণীরও কোনও অসুখ দেখি না। ছেলে মেয়ের অসুখের সময় তাঁহার মুখখানি একটু মলিন হয়, নহিলে নহে।

পত্রের শেষে ভবেশ লিখিয়াছে ঃ—

"আজ কয় মাস হইল, একদিন একটা সামান্য কথা লইয়া তাঁহার সহিত একটু বাদানুবাদ হইয়াছিল ; তাঁহার কথার ভাবে আমার বোধ হইয়াছিল, আমার প্রতি তাঁহার ভালবাসা নাই। সেই দিন আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, 'তোমার সহিত আমার আর সাক্ষাৎ না হইলে বোধ করি তুমিও ভাল থাক, আমিও ভাল থাকি।' তাহার কয় দিন পরে তিনি পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন। আমিও তাঁহাকে আনিবার চেষ্টা করি নাই, তিনিও আইসেন নাই। সত্যই আমার মনে হয়, প্রণয়হীন পরিণয় অপেক্ষা পরিণয়হীন প্রণয়ও ভাল।

"তিনি আমাকে ভালবাসেন নাই—ভালবাসেন না। আমার হৃদয়ের ভালবাসা এখন বিরক্তিতে, ঘৃণায় পরিণত হইয়াছে। আমিও মানুষ, আমারও হৃদয় আছে, আমিও প্রতিহিংসা লইতে পারি। আমার যথাসাধ্য আমি করিয়াছি ; আমি আমার কর্ত্তব্যপালনের চেষ্টার ত্রুটী করি নাই। আমি তাঁহাকে যত ভালবাসিয়াছি, কোন্ স্বামী স্ত্রীকে তদপেক্ষা অধিক ভালবাসিয়াছে ?—কোন স্বামী স্ত্রীকে তদপেক্ষা অধিক ভালবাসিতে পারে ? আমার দোষ কি ?"

৩

ভবেশের পত্র পড়িয়া ভাবিলাম, এ পত্রের উত্তর দেওয়াই ভাল। আমি লিখিলাম,—

"তোমার পত্র পাইয়া মর্ম্মাহত হইলাম। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য ঘটা কোনও মতেই অভিপ্রেত নহে। তুমি এক স্ত্রী বর্ত্তমানে আবার বিবাহ করিতে চাহিতেছ, ভাল করিয়া বিবেচনা না করিয়া কার্য্য করিও না। তোমার নৈতিক আপত্তির কথায় আমি তোমার সহিত একমত। আমাদিগের পিতামহদিগের সময় একাধিক বিবাহ দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হইত না। এখন আমরা প্রাচ্য আদর্শ ত্যাগ করিয়া প্রতীচ্য আদর্শ লইয়াছি—তাই এরূপ বিবাহে এখন আমাদিগের আপত্তি। কিন্তু আমাদিগের সমাজে প্রতীচ্য আদর্শ

ষোল আনা বজায় রাখা কি সম্ভব ? য়ুরোপে যাহাতে ডাইভোর্স অর্থাৎ বিবাহবিচ্ছেদ আছে, এ দেশে সে অবস্থায় স্বামীর পক্ষে আবার বিবাহ করা কি দোষের ? তবে কোনও বিশেষ কারণ ভিন্ন আমি এক স্ত্রী বর্ত্তমানে স্বামীর আবার বিবাহের পক্ষপাতী নহি। আমি পুরুষ বা রমণী কাহারও একাধিক বার বিবাহেরই পক্ষপাতী নহি। তবে যেখানে স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসেন না, স্বামীর যত্ন ও ভালবাসা চাহেন না, স্বামীর নিকট থাকিতে চাহেন না, সেখানে স্বামী যদি স্ত্রীর অভাব অনুভব করিয়া আবার বিবাহ করেন, তবে আমি তাঁহাকে দোষ দিতে পারি না। স্ত্রীর সম্বন্ধেও আমি এই কথা বলিতাম ; কিন্তু সমাজের শাসন অন্যরূপ, আইনের বিধান স্বতন্ত্র।

"তুমি লিখিয়াছ, প্রতিহিংসা লইবে। কাহার উপর ? স্ত্রীর উপর ? তুমি লিখিয়াছ, তোমার স্ত্রী তোমাকে ভালবাসেন না ;—যে স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে না, সে স্ত্রী কি স্বামী আবার বিবাহ করিলে ব্যথিত হয় ? কখনই নহে। তবে কি আপনার প্রতি প্রতিশোধ লইবে ? স্ত্রীকে এত ভালবাসিয়াছিলে বলিয়া আপনার উপর রাগ করিয়াছ ; তাই আপনার উপর প্রতিশোধ লইতে চাহিতেছ।

"আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, তুমি এখনও তোমার স্ত্রীকে ভালবাস। ভালবাসা যাইবার নহে। তিনি বহুদিন ধরিয়া তোমাকে সুখী করিয়াছেন ; সত্য, তুমি তোমার আপনার প্রেমোচ্ছ্বাসে মগ্ন ছিলে, কিন্তু সে প্রেম ত তাঁহাকে দেখিয়াই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল ! কই, বিবাহের পূর্ব্বে ত সে প্রেমসুখ পাও নাই ! আমার অনুরোধ, সেই প্রেমের কথা স্মরণ করিয়া আরও একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সকল কথা বুঝাইয়া বল। স্ত্রী যদি না বুঝিয়া কোন দোষ করেন, তবে স্বামী তাঁহার সংশোধনের চেষ্টা না করিলে আর কে করিবে ?

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, একটা কি ভুল হইয়াছে, তাই এত গণ্ডগোল। যাহা কর, অল্পক্ষণস্থায়িনী উত্তেজনাবশে একটা কায করিয়া সারা জীবন কষ্ট পাইও না। আর একবার ভাবিয়া দেখ—এক পত্নীতে যে অসুখ পাইয়াছ, অন্য পত্নীকে যে তাহাই পাইবে না, এমন কথা কে বলিতে পারে ?"

৪

আমি ভবেশকে এই পত্র লিখিয়া, গৃহিণীকে ভবেশের স্ত্রীকে একখানা পত্র লিখিতে বলিলাম। গৃহিণী একেবারে অস্বীকার করিলেন—তাঁহার এ ছাই

হাতের লেখাও কি লোকের কাছে দেখাইতে আছে ? ছিঃ ! সে লোকের বাহিরে কেবল তাঁহার স্বামীটি। গৃহিণী সোজা কথায় স্পষ্ট বলিলেন, "আমি তাহা পারিব না।" অনেক কষ্টে তাঁহাকে বুঝাইলাম, ব্যাপার বড় গুরুতর, এ সময় তিনি একটু লজ্জা ত্যাগ করিলেই ভাল।

গৃহিণী চলিয়া গেলেন, এবং কিছুক্ষণ পরে একখানা পত্র আনিয়া আমাকে দেখাইলেন। পত্র দেখিতে আমার ইচ্ছা ছিল না ; এক জন মহিলা আর এক জন মহিলাকে পত্র লিখিতেছেন,—আমি তাহার কি দেখিব ? গৃহিণী ছাড়িলেন না।

দেখিলাম,—গৃহিণী ভবেশের পত্নীকে স্বামীকে পত্র লিখিতে বলিয়াছেন, স্বামীর কাছে ক্ষমা চাহিতে লিখিয়াছেন, স্বামীর কাছে যাইতে লিখিয়াছেন। স্বামীই স্ত্রীর পরম দেবতা, তাঁহার কাছে ক্ষমা চাহিতে দোষ নাই। স্বামী যাহার উপর অসন্তুষ্ট, সে স্ত্রীর জীবনে সুখ কি ?—ইত্যাদি।

পত্রে যে সকল বর্ণাশুদ্ধি ছিল, সেগুলি সংশোধন করিয়া আমি দুইখানা পত্রই ডাকে পাঠাইয়া দিলাম।

৫

প্রত্যাশিত দিবসে গৃহিণীর পত্রের উত্তর আসিল। ভবেশের পত্নী লিখিয়াছেন,—

"দিদি,—আমার দুঃখের কথা শুনিয়া তুমি আমাকে পত্র লিখিয়াছ। আমি এতদিন যে যাতনা সহিয়াছি, তাহা আর কি বলিব ? আমার এ দুঃখের কথা কাহাকেও বলিতেও পারি না।

"মার অসুখের কথা শুনিয়া বাপের বাড়ী আসিয়াছিলাম, তাহার পর এত দিন একবার আমার সংবাদও লইলেন না ! আমি তাঁহার অনুপযুক্ত ; কিন্তু আমি ত তাঁহার স্ত্রী বটে ! আমারই কি ইচ্ছা নহে যে, আমি তাঁহার মনের মত হই। আমি কি চেষ্টা করি নাই ? তাঁহার মনের মত হইতে পারিলে লাভ কাহার ? সে ত আমারই ! আর যদি তাঁহার মনের মত হইতে না পারিলাম, যদি তাঁহার ভালবাসা না পাইলাম, তবে দিদি, এ ছাই নারীজন্মে কি ফল ! আমি এত চেষ্টা করিলাম, তঁহার মনের মত হইতে পারিলাম না। আমাকে কোন বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করিলে, আমি কিছু বুঝিতে না পারিলে, বা আগাগোড়া ভুল বুঝিলে, হতাশ হইয়া ম্লানমুখে তিনি যখন উঠিয়া যাইতেন, তখন দিদি, তাঁহার অপেক্ষা আমার কষ্ট কি কম হইত ! আমি আবার বুঝিতে চেষ্টা করিতাম, তাঁহার সেই ম্লানমুখের কথা মনে পড়িত, আর পোড়া চক্ষে জল

ধরিত না। তিনি কি আমার ব্যথা বুঝিতে পারিতেন ! আমি কেমন করিয়া তাঁহাকে সে কথা বুঝাইব ?

আমি কি বুঝিতাম না যে, এই হতভাগিনীর জন্যই তাঁহার কিছু ভাল লাগিত না, তিনি সারাদিন একলা কি ভাবিতেন, বন্ধুবান্ধবের কাছেও যাইতেন না ? বুঝিতাম ; কিন্তু কি করিব, আমি এত চেষ্টা করিয়াও তাঁহার মনের মত হইতে পারিলাম না ! তিনি বলিতেন, আমার কথা তাঁহার নিকট শিশুসুলভ বলিয়া বোধ হইত, তাই ত আমি তাঁহার কথা বুঝিতে পারিতাম না। তিনি যদি আমার বুঝিবার মত করিয়া বুঝাইতেন, তবে হয় ত আমি বুঝিতে পারিতাম ; নহিলে আমি বুঝিব কেমন করিয়া ? আমি কেবল কাঁদিতাম।

"তাহার পর তিনি আর পূর্ব্বের মত ব্যবহার করিতেন না। বলিলে, আমাকে আমার হাসি, গল্প, বসন, ভূষণ লইয়া থাকিতে বলিতেন। তাঁহার কথা বুঝিবার চেষ্টা আমি করি নাই ! তাঁহার মনের মত হইবার ইচ্ছাও আমার নাই ! বসন ভূষণেই কি আমার সুখ ? আমার নিকট তাঁহার ভালবাসা অপেক্ষা কি বসন ভূষণই বড় ? আমার বসন ভূষণে যত্ন হইলেই কি আমার সব হইল !

"স্বামীর তিরস্কার সহ্য হয়, তবুও স্বামীর ভালবাসাহীন যত্ন সহ্য হয় না ; সে আরও যাতনার।

"স্বামীর কাছে ক্ষমা চাহিতে স্ত্রীর লজ্জা কি ! তিনি আমার উপর রাগ করিয়া থাকিতে পারেন ; কিন্তু অভিমান করিয়া তাঁহাকে না দেখিয়া আমি কয় দিন থাকিতে পারি ? আমাকে লইয়া যাইবার জন্য লিখিয়াছি। তাঁহার কাছে থাকিলে, তাঁহার দেখা পাইলেও যে যাতনার অনেক উপশম হয়।

"মনের কষ্টে তোমাকে অনেক কথা লিখিলাম। আশা করি, ছেলে মেয়েরা সবাই ভাল আছে। তোমার সঙ্গে একবার দেখা করিতে বড় ইচ্ছা করে।

তোমার ভগিনী

শোভা।"

আমি দেখিলাম, যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই সত্য ; একটা বড় ভুল হইয়াছে। ভুলেই এত গোল। ভাবিলাম, এই ত রমণী ; এই কোমলতা, এই মাধুরী, রমণী কি ইহা ত্যাগ করিতে পারেন ? রমণী কি পুরুষের মত কঠোর হইতে পারেন ? পারিলে এ সংসার মরুময় হইত, পারিলে এ সংসার মানবের বাসের অনুপযোগী হইত।

৬

ইহার দুই দিন পরে আমি ভবেশের এক পত্র পাইলাম। ভবেশ লিখিয়াছে,—

"ভাই,—তোমার পত্র পাইয়াছি। জগতে যদি আর কিছুও না পাইয়া থাকি, তবু যে তোমার মত বন্ধু পাইয়াছি, ইহা আমার অল্প সুখের কথা নহে। কিন্তু তোমাদের কিছুই করিতে পারিলাম না। তোমাদের বন্ধুত্বের উপযুক্ত হইতে পারিলাম না। উপযুক্ত হইবার সম্বল আমার ছিল। তবে আজ আমার এ দুর্দ্দশা কেন?

"জানি না, কোন জন্মের কাহার কোন অভিশাপ এ জীবনে পত্নীরূপে অনুসরণ করিতেছে; আমার জীবন মরুময় করিতেছে; আমার সকল আশা সকল কল্পনা নিষ্ফল করিতেছে। জীবনে অনেক কাজ করিব ভাবিয়াছিলাম; কিন্তু কিছুই হইল না—কিছুই হইবে না।

"আমি বিবাহের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছি। তুমি সত্যই লিখিয়াছ, এক পত্নীতে যে অসুখ পাইয়াছি, অন্য পত্নীতে যে তাহাই পাইব না, এমন কথা কে বলিতে পারে? আমি এখন কিছু দিন দেশভ্রমণ করিব; লক্ষ্যহীন ভাবে দৃশ্য হইতে দৃশ্যান্তরে যাইব। দেখিব, সেই অস্থিরতায় যদি হৃদয়ের এ যাতনা ভুলিতে পারি। কবে ফিরিব, বলিতে পারি না; ফিরিব কি না, বলিতে পারি না। যাইবার পূর্ব্বে একবার তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি। তুমি কখন বাড়ীতে থাক? হয় ত সেই শেষ সাক্ষাৎ হইবে। গৃহে যাহার কেবল যাতনা, তাহার কি আর গৃহে কোনও আকর্ষণ থাকে? তাহার কি আর গৃহে ফিরিয়া আসিতে ইচ্ছা করে? আমি কোথায় যাইব, তাহার স্থির নাই।

"তোমার পত্র পাইবার পর এত দিন পরে সহসা আমার পত্নীর এক পত্র পাইয়াছি। জানি না কেন, তিনি তাঁহার পিত্রালয় হইতে তাঁহাকে আমার গৃহে লইয়া আসিতে লিখিয়াছেন। হয় ত পিত্রালয়ে তাঁহার কোন অসুবিধা হইতেছে। যখন তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছি, তখন তাঁহার ভরণপোষণের ভার আমার; কাজেই তিনি ইচ্ছা করিলে আমি তাঁহার আগমনে বাধা দিতে চাহি না। কিন্তু তাঁহার সহিত আমার আর দেখা না হওয়াই ভাল। যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা নাই, ঘৃণা আছে, সে দম্পতীর পরস্পর সাক্ষাৎ যন্ত্রণামাত্র। সে যন্ত্রণা আমি ইচ্ছা করিয়া সহ্য করিব কেন? তিনি আসিবার পূর্ব্বেই আমি দেশভ্রমণে চলিয়া যাইব। আমি যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়া যাইব, তাহাতে তাঁহার কোনও অভাব হইবে না। আমার পত্নীকে এ কথা লিখিয়া দিলাম। তিনি যেদিন আসিতে চাহিবেন, সেই দিন তাঁহার আসিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আমি চলিয়া যাইব।

"কখন তোমার বাড়ী থাকা নিশ্চিত, তাহা লিখিবে,—তোমার সহিত দেখা করিব। আশা করি, তুমি ভাল আছ। ইতি

"হতভাগ্য ভবেশ।"

পত্রখানি পড়িয়া আমি দেখিলাম—আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই বটে। ভবেশ নিতান্তই ক্ষণিক উত্তেজনায় বিবাহের সঙ্কল্প করিয়াছিল, তাই আমার পত্র পড়িয়াই সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছে। যে ভাল করিয়া ভাবিয়া কিছু স্থির করে, সে কি সহজে আপনার মতের পরিবর্ত্তন করে?

কিন্তু ভবেশ তাহার পত্নীকে যে পত্র লিখিয়াছে, তাহা আমার ভাল বলিয়া বোধ হইল না। কেন যে তিনি পিত্রালয় হইতে স্বামীর কাছে যাইতে চাহিয়াছিলেন, তাহা আমি আমার পত্নীর পত্রে জানিতে পারিয়াছিলাম। ভবেশ তাহা জানিত না; জানিলে তাহার মত পরিবর্ত্তিত হইত। একবার ভাবিলাম, এখনই গিয়া ভবেশকে সব কথা বলি; তাহাকে দিয়া শোভাকে আর একখানা পত্র লেখাইয়া পাঠাইয়া দিয়া আসি। হায়, তখন যদি তাহাই করিতাম! কিন্তু তখন ত ভাবি নাই, এত দূর হইবে; আর সেদিন আমার বাড়ীতে কিছু কাজ ছিল।

আজ ভাবি, সে দিন সব কাজ ফেলিয়া কেন যাই নাই, কেন ভবেশকে দিয়া শোভাকে আর একখানা পত্র লিখাইয়া পাঠাইয়া দিয়া আসি নাই! সেদিন যে সুযোগ গিয়াছে, তেমন সুযোগ জীবনে আর আসিবে না; বুঝি সেরূপ সুযোগ জীবনে একবারমাত্র আইসে। একটা মানব-জীবন! আর এক জনের সর্ব্বনাশ! আমার নয় কিছু অসুবিধা হইত, কেন সব কাজ ফেলিয়া যাই নাই! সে জন্য আমি এতদিন অনুতাপ করিয়াছি; যত দিন বাঁচিয়া থাকিব, ততদিন অনুতাপ করিব। কিন্তু তখন ভাবি নাই, এত দূর হইবে।

৭

সে দিন যাইতে পারিলাম না। তাহার পর দিন অপরাহ্নে ভবেশের চাকর আমার নামে একখানি পত্র লইয়া আসিল। পত্রপাঠ করিয়া মাথা ঘুরিতে লাগিল। ভবেশ লিখিয়াছে,—

"ভাই, সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আমার পত্র পাইয়া শোভা আত্মহত্যা করিয়াছে। তুমি যাহা বলিয়াছিলে, তাহাই বটে। আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম, ভুল করিয়াছিলাম। যে স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে না, সে স্ত্রী কি স্বামীর সামান্য উপেক্ষায় প্রাণত্যাগ করিতে পারে? সহজে কি কেহ জীবন ত্যাগ করিতে চাহে? এ জীবন কে না ভালবাসে? তখন যদি একবার ভাবিয়া দেখিতাম, তখন যদি একবার তোমার কথা শুনিতাম!

"শোভা লিখিয়াছে—'তুমি আমাকে চরণে স্থান দিলে না; আমার অপরাধের জন্য তোমার কাছে ক্ষমা চাহিবারও অবসর দিলে না;—আর এ প্রাণ রাখিব কিসের জন্য? আমি অপরাধ করিয়াছিলাম; তুমি আমার স্বামী, তুমি আমার শিক্ষক, তুমি আমার দেবতা, তুমি আমায় ক্ষমা করিলে না। যে স্ত্রী স্বামীর ভালবাসা পায় না, স্বামীকে কেবল যাতনা দেয়, তাহার মরণই মঙ্গল। তুমি কি মনে কর, আমার ব্যবহারে তুমি ব্যথিত হইলে তোমার ম্লান মুখ দেখিয়া আমার কষ্ট হইত না? আমি কেমন করিয়া তোমাকে বুঝাইব, আমি কি কষ্ট পাইয়াছি। দোষ আর কাহারও নহে,—দোষ আমার অদৃষ্টের, আর আমার। মরিবার সময় যদি একবার তোমাকে দেখিয়া মরিতে পারিতাম, যদি তোমার কাছে ক্ষমা চাহিয়া মরিতে পাইতাম! হায়! এ পোড়া অদৃষ্টে তাহাও হইল না।'

"তাহার পর শোভা লিখিয়াছে 'তোমার কাছে ক্ষমা চাহিয়া মরিতে পারিলাম না, এই দুঃখ লইয়া মরিলাম। তোমার কাছে আমার শেষ প্রার্থনা, আমার অপরাধ ক্ষমা করিও; আর আশীর্ব্বাদ করিও,—এ জন্মে যাহা হইল না, পরজন্মে যেন তাহা হয়, পর জন্মে যেন তোমার মনের মত হইয়া তোমার ভালবাসা পাই।'

"আমিই আমার স্ত্রীর মৃত্যুর কারণ। আমি আত্মহত্যা করিব না; বাঁচিয়া—সুদীর্ঘ জীবনে হৃদয়ে নরকযন্ত্রণা সহ্য করাই আমার পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত।

"সমাজের পক্ষে আমি মৃত। আর আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও না। যদি পার, মধ্যে মধ্যে এই হতভাগ্যের কথা স্মরণ করিও। ইতি ভবেশ।"

কি দারুণ ভুল! পত্র পড়িয়া তাড়াতাড়ি ভবেশের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। দ্বারে ভবেশের ভৃত্য জানাইল যে, ভবেশ কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিবে না,—আমার সহিতও নয়।

প্রেমলিপি।

১

বৈশাখী প্রভাতে যবে কুহরিত কুহুরবে
ভরিবে চম্পকবাসে বসন্তের বাসর-ভবন;
লবঙ্গকলিকা ঘ্রাণে লালস-বিবশ প্রাণে
সহকার-কুঞ্জে পশি' শিহরিবে মৃদু সমীরণ;
ভাবি কার চন্দ্রানন কাঁদিবে কবির মন,
অজ্ঞাতে নয়নজলে ভাসিবে নয়ন;—
হে সুন্দর! আসিও তখন।

২

আষাঢ়ে নিশীথকালে সজল জলদজালে
হয় যবে মুহু মুহু দলমল দামিনী-স্ফুরণ;
বিজন শয়ন 'পরে একা শুয়ে শূন্য ঘরে
মরমে উচ্ছ্বসি উঠে মরমের গভীর বেদন;
তিমিরে মগন সব, অশ্রান্ত ঝিল্লীর রব,
চারি পাশে ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি-বরিষণ;—
হে সুন্দর! আসিও তখন।

৩

আশ্বিনে আকাশ-গায় পরিপূর্ণ পূর্ণিমায়
শরতের শুভ্রশশী শুভ্র হাসি বিকাশে যখন;
সরসে কহ্লারবনে নগ্ন শোভানিকেতনে
তরল লহরী-সনে খেলা করে তরল কিরণ;
সুদূরে স্বপন-প্রায় চকোর ডাকিয়া যায়,
কেঁপে উঠে প্রকৃতির প্রস্ফুট যৌবন;—
হে সুন্দর! আসিও তখন।

৪

হায়নে হেমন্ত-রাণী সোহাগে বুকেতে টানি'
রাশি রাশি ব্রীহিযব—গুচ্ছে গুচ্ছে অপূর্ব্ব শোভন—
যত দূর দৃষ্টি চলে দেখেন সুকুতূহলে
শস্যের লহরলীলা, পক্বশীর্ষে কষিত কাঞ্চন;
হেরি সে মুরতি ধীর কৃষিবধূ মুছে নীর
সভয়ে অঞ্চলখানি করিয়া ধারণ;—
হে সুন্দর! আসিও তখন।

৫

পৌষে প্রথম যবে গোলাপ-কুমারী সবে
সরমে রাঙিয়া উঠে অরুণের লভিয়া চুম্বন ;
শুভ্র-হিয়া শুভ্র-বাস কুন্দ-মুখে,ফুটে হাস,
ধরিত্রী কসিয়া লয় নিজ কাঁখে কুহেলি-বসন ;
সন্ধ্যা না হইতে সুখে বাঞ্ছিতেরে ল'য়ে বুকে
সাধ যায় সুপ্ত কক্ষে করিতে শয়ন ;—
হে সুন্দর ! আসিও তখন।

৬

ফাল্গুনে বসুধারাণী প্রথম যৌবন মানি'
প্রথম মুকুল দু'টি রাখে কোথা করিয়া গোপন ;
বিহ্বল সৌরভ তাঁর ছায় ক্রমে চারি ধার,
বসে থাকে উদাসিনী আপনাতে আপনি মগন ;
উন্মুক্ত অলকরাশ, শিথিল বুকের বাস
টানিয়া লইতে বুকে হয় না স্মরণ ;—
হে সুন্দর ! আসিও তখন।

৭

এরূপে জীবনে যবে প্রমোদ-প্রফুল্ল রবে—
বীণার ঝঙ্কারে হ'বে প্রতিধ্বনি-ধ্বনিত ভুবন ;
প্রকৃতির স্নেহহাস পরিস্ফুট কলভাষ
জাগাইবে মর্ম্মমাঝে তৃপ্তিহীন অনন্ত স্বপন ;
সহস্র বাঁধনে বাঁধা সহস্র সাধনে সাধা
পিরীতের সরোবরে অমিয়-মন্থন ;—
হে সুন্দর ! আসিও তখন।

৮

অন্তিমে মৃত্তিকা 'পরে শ্রান্ত ক্লান্ত কলেবরে
মরমের স্তরে স্তরে পরিতাপ বিঁধিবে যখন ;
কত দুঃখ কত ক্লেশ কিছুরি হ'বে না শেষ,
দহিবে সৌন্দর্য্য-তৃষা অন্তর্দাহী স্ফুলিঙ্গ মতন ;
বারেক বিমুগ্ধ প্রাণে চাহিয়া বিশ্বের পানে
ধীরে ধীরে যবে কবি মুদিবে নয়ন ;—
হে সুন্দর ! আসিও তখন।

শ্বেতপদ্মে ভ্রমর।

ঐতিহাসিক চিত্র।

১

আজকাল যে স্থান অধিকার করিয়া শুভ্রকায়, বিশালদর্শন, অপূর্ব্ব প্রেমের অদ্ভুত নিদর্শন, সৌমমূর্ত্তি তাজমহল আজও অতীতের সাক্ষিস্বরূপ বর্ত্তমান, জাহাঙ্গীর সাহের রাজত্বকালের প্রথমাংশে, এক দিন সেই স্থানের প্রায় দুই ক্রোশ ব্যাপিয়া এক ক্ষুদ্র জনতা উপস্থিত হইয়াছিল। আজকাল যেখানে তাজ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বে, সেই স্থানে ক্ষুদ্র রাজপথ ও তাহার দুই ধারে খানিকটা মুক্ত ভূমি পড়িয়াছিল।

আকাশ প্রভাত হইতেই মেঘাচ্ছন্ন। এক প্রহর বেলা হইয়াছে, তবু কেহ সেদিন সূর্য্যের মুখ দেখিতে পায় নাই। অমন প্রাসাদসৌন্দর্য্যময়ী আগরা নগরী সে দিন যেন অত্যন্ত মলিন দেখাইতেছিল। রাজপথে অশ্বারোহী বা পদাতিক একজনও ছিল না। তাঞ্জামে চড়িয়া কোনও আমির ওমরাহও বাহির হয়েন নাই। বাদশাহের আজ্ঞা, সেদিন কোনও আমীর ওমরাহ সহরের রাস্তায় বাহির হইতে পারিবেন না। কেন যে এমন আদেশ প্রচারিত হইল, তাহা কেহ জানে না।

যাহারা নিকটে জনতা করিয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা বিশ পঁচিশ জনের অধিক হইবে না। তাহারা বাদশাহের লোক, সামান্য ভারবাহী কর্ম্মচারিমাত্র। সঙ্গে শিবিরসন্নিবেশের কতকগুলি উপকরণ। তাহারা অগ্রসর হইয়া ঐ স্থানে বিশ্রাম করিতেছিল।

সহসা সেই মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মলিন ভাব অপসারিত করিয়া সূর্য্যদেব একবার নিজের মলিন মূর্ত্তি দেখাইয়া আবার অন্তর্হিত হইলেন। আবার দুই চারিখানি মেঘ কোথা হইতে সবেগে উড়িয়া আসিয়া আগ্রার রক্তপ্রস্তর-মণ্ডিত উন্নত দুর্গপ্রাচীরে ধূসর ছায়া প্রতিফলিত করিল। এমন সময়ে সহসা বেহারাদের অস্ফুট কোলাহল শ্রুত হইল।

সর্ব্বাগ্রে প্রায় পঞ্চাশ জন সেনানী, মধ্যে তিনখানি শিবিকা। ইহার মধ্যে একখানি আবার কারুকার্য্যময়ী মখমল-আচ্ছাদনীতে আবৃত। পশ্চাতে আরও

পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী। তার পরে প্রায় শতাধিক পদাতিক সারি সারি চলিয়াছে। সকলেই পথশ্রান্ত, ক্লান্ত ও অবসন্ন।

অশ্বারোহী সৈন্য আগ্রার রাজপ্রাসাদের কিছু দূরে দাঁড়াইল। সেনাপতি রস্তম খাঁ ভারবাহীদের বিদায় করিয়া দিলেন। পদাতিক ও সমস্ত অশ্বারোহী সৈন্যকে চলিয়া যাইবার আদেশ করিলেন। কেবল চারি জন পদস্থ মোগল সৈনিক তাঁহার আজ্ঞানুসারে শিবিকার পার্শ্ববর্ত্তী হইল।

বাহকেরা আবার শিবিকা স্কন্ধে উঠাইল। আবার তাহা মন্থরগতিতে সেই বিশালদর্শন দুর্গদ্বারে প্রবেশ করিল। দ্বাররক্ষী সৈনিক অস্ত্র নোয়াইয়া রস্তমকে অভিবাদন করিল। রস্তম প্রথম দ্বার অতিক্রম করিল।

প্রথম ও দ্বিতীয় দ্বারের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র প্রাঙ্গন। প্রাঙ্গনের অর্দ্ধেক পথ অতিবাহিত হইলে, সেই রক্তমখমলমণ্ডিত শিবিকার মধ্য হইতে রমণীকণ্ঠে কে ডাকিল, "রস্তম আলি!"

মুহূর্ত্তমধ্যে রস্তম শিবিকার পার্শ্ববর্ত্তী হইল। সসম্মানে বলিল, "কি আজ্ঞা করিতেছেন?"

শিবিকামধ্যবর্ত্তিনী উত্তর করিলেন, "কোথায় লইয়া যাইতেছ?"

"আগরার রাজপ্রাসাদে।"

"অনাথিনীর রাজপ্রাসাদ কেন?"

"কি করিব?—বাদশাহের হুকুম।"

"তোমাদের বাদশাহ কি অনাথার উপর এইরূপ বিচার করিয়া থাকেন?"

"তা আমি জানি না। আপনি নিজে বাদশাহকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন।"

"আমি বাঙ্গলা দেশ হইতে এত দূর বিনা বাক্যব্যয়ে আসিয়াছি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আমি যদি না যাই?"

"জীবন দিয়া বাদশাহের আদেশ প্রতিপালন করিব।"

"আমি যদি না যাই, তবে তুমি কি করিবে?"

"আমার সাধ্য কি, আমি আপনার নিকটস্থ হই। আমি দাসানুদাস। আপনি না গেলে আমায় অন্তঃপুরে খবর দিতে হইবে। তাতারী প্রহরিণী বাদশাহের আদেশ পালন করিবে।"

"এক জন সামান্য স্ত্রীলোককে আয়ত্ত করিবার জন্য এত সঙ্গীন ও বর্ষার প্রয়োজন কি? রস্তম, এখন আর আমার সে দিন নাই। এখন আর আমি

বর্দ্ধমানের সুবাদারের পত্নী নহি। আমি এখন বাঁদীর অধম। বাদশাহ এক জন সুন্দরী বাঁদী চান, তাই অত রুধিরপাত করিয়া আমায় আয়ত্ত করিয়াছেন।"

রস্তম করজোড়ে বলিল, "আমরা সামান্য সেনাপতিমাত্র। হুকুম তামিল না করিলে আমাদের মাথা যাইবে।"

মেহেরউন্নিসা বলিলেন, "রস্তম! তুমি ইচ্ছা করিলে আমায় ছাড়িয়া দিতে পারিতে। এই দুই শত সেনা তোমারই আজ্ঞাধীন। বাদশাহ তোমায় যে বেতন দেন, তার বিশ গুণ অর্থ আমি তোমায় দিতাম। আজ তোমার জন্যই আমি পিঞ্জরবাসিনী হইলাম। তোমার এই অত্যাচার আমি কখনও ভুলিব না।"

রস্তম ধীরে ধীরে অথচ সদর্পে বলিল, "আমরা মোগল বাদশাহের দাস।"

আর কেহ কোনও কথা কহিল না। রস্তম সেনাদিগকে বাহিরে থাকিতে আদেশ করিলেন। হুকুম হইল, "চালাও—মতিমহল।" বাহকেরা মতিমহলের দ্বারে আসিল। শিবিকার আচ্ছাদনী উন্মুক্ত হইল। কতিপয় তাতারী প্রহরিণী উন্মুক্ত শিবিকা দেখিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিল। এমন সময়ে এক জন প্রবীণা বেগম অন্তঃপুর হইতে তথায় আসিয়া শিবিকারোহিণীর গলা জড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "মেহের! আসিয়াছিস্, আয়, ভিতরে আয়।"

মেহেরের চক্ষে জলধারা বহিল; সেই মলিন, ক্লিষ্ট, বিষণ্ন, বৈধব্যযন্ত্রণাদগ্ধ গণ্ড বহিয়া শতধারা বহিতে লাগিল। প্রবীণা রমণী মেহেরউন্নিসাকে লইয়া মতিমহলের মর্ম্মরপ্রস্তরময় শীতল কক্ষের অভ্যন্তরভাগে লইয়া গেলেন।

এ সকল ঘটনা, এইখানেই একরূপ মিটিল। সেই দেবতার অগম্য মোগল বাদসাহদের অন্তঃপুরের কথা অন্তঃপুরিকারাও অনেক সময় জানিতে পারিতেন না। মেহের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, কেহ দেখিল না। দেখিলেন কেবল সেই চারি যুগের সাক্ষী সর্ব্বশক্তিমান, সেই রমণীসৈনিক-চতুষ্টয়, এবং আর এক জন। দেওয়ানখাসের একটি ছাদের আলিসার পাশে, অতি দূরে সুন্দরশ্মশ্রুপূর্ণ উষ্ণীষমণ্ডিত একখানি মুখ দৃষ্ট হইতেছিল; মেহের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবামাত্র সে মুখখানি সেখান হইতে সরিয়া গেল।

২

কিরূপ নৃশংস ও নীতিবিগর্হিত উপায়ে, অজস্র শোণিতপাত করিয়া, জাহাঙ্গীর সাহ সের আফগানের পত্নী মেহেরউন্নিসাকে লাভ করিয়াছিলেন,

এ স্থলে তাহার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই। মেহেরউন্নিসা আগ্রায় আসিয়া মোগল বাদশাহের পুরীমধ্যবর্ত্তিনী হইবার পর, জাহাঙ্গীর একবারও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না।

জগতের নিয়মই এই, আকাঙ্ক্ষা যত দিন অতৃপ্ত থাকে, লালসা যত দিন চরিতার্থ না হয়, আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর গৌরবও ততদিন! আজ যাহার ধ্যানে জীবন মন তন্ময়, কাল তাহাকে পাইলে হয় ত আর চাহিব না! যে মেহের-উন্নিসার জন্য জাহাঙ্গীর সেই বীরপ্রবর, নির্দ্দোষ, সের আফগানের শোণিত-পাত করিলেন, যাহার জন্য বাঙ্গলার সুবাদার কুতবউদ্দিন অকালে প্রাণত্যাগ করিলেন, সেই মেহেরকে পাইয়া জাহাঙ্গীর কেন যে সাক্ষাৎও করিলেন না, তাহার কারণ কে নির্দ্দেশ করিবে?

আকবর সাহের এক বিধবা রাজ্ঞী, মেহেরউন্নিসাকে স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছিলেন। মোগলের অন্তঃপুর-কারায় তাঁহার স্নেহই মেহেরের একমাত্র শান্তি। রাজ্যের সামান্য এক জন কর্ম্মচারীর আহারাদির যেরূপ বন্দোবস্ত হয়, মেহেরউন্নিসার জন্যও জাহাঙ্গীর সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন!

দিন কাহারও প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে না। সকলেরই দিন যায়। যে সুখের প্রমোদহিল্লোলে জীবনতরী ভাসাইয়াছে, তাহারও দিন যায়; এবং যে চিরকাল নিরাশা, দুঃখ সহিয়া জীবনে মরিয়া আছে, তাহারও দিন যায়। মেহেরউন্নিসার দিন কেন তবে বসিয়া থাকিবে?

সরকারী বন্দোবস্তে মেহেরউন্নিসার আর চলে না। মেহের শিল্পকার্য্য আরম্ভ করিলেন। মখমলের উপর রেশমী বসনের উপর নানাবিধ কারুকার্য্য, শিল্পকৌশল প্রকাশ করিয়া মেহেরউন্নিসা তাহা বাজারে পাঠাইয়া দিতে লাগিলেন। বড় বড় আমীর ওমরাহেরা ক্রমে সেই সুন্দর শিল্পের পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। বাজারে চড়া দামে তাহা বিকাইতে লাগিল।

মেহেরউন্নিসা এখন দশ বার জন পরিচারিণী নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহাদের সকলেই শিল্পকার্য্যে সুনিপুণ। জরীর কাজগুলি বাহিরে খুব চড়া দামে বিক্রীত হইতে লাগিল। মেহেরউন্নিসার নামের জন্য নহে, শিল্পের গুণে। মেহের যে ভারতে "নূরজাঁহা বেগম" হইবেন, তখন সে কথা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই।

ক্রমে ক্রমে এই শিল্পকার্য্য দ্বারা মেহেরউন্নিসা ঐশ্বর্য্যশালিনী হইয়া উঠিলেন। এখন তাঁহার পরিচারিকার সংখ্যা অনেক। মেহেরউন্নিসা সকলকে

কারুকার্য্যময় পেশোয়াজ ও আঙ্গরাখা করিয়া দিয়াছেন। তাহাদের আহার, পরিচ্ছদ ও সুখস্বচ্ছন্দের প্রতি তাঁহার সতত দৃষ্টি। তাহাদিগের পরিচ্ছদাদি দেখিলে, মেহেরকে তাহাদের পরিচারিকা বলিয়া বোধ হইত।

বিস্তৃত গালিচার উপর সমস্ত সঙ্গিনীগণে পরিবৃতা হইয়া মেহেরউন্নিসা দিবসের অধিকাংশ সময় শিল্পকার্য্যে অতিবাহিত করিতেন। মধ্যে মধ্যে সেতার, এস্‌রার, বীণা প্রভৃতি যন্ত্রের সঙ্গীতে তিনি চিত্তবিনোদন করিতেন।

এইরূপে মেহেরউন্নিসার দিন কাটিতে লাগিল। একদিন ঘটনাক্রমে বাদশাহ মেহেরউন্নিসার এই কাহিনী শ্রবণ করিলেন। সহসা বাদসাহ একদিন মেহেরউন্নিসার কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

দেখিলেন, তারকামণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী রোহিণীর ন্যায় মেহেরউন্নিসা সঙ্গিনীগণ-পরিবৃতা হইয়া একমনে কাজ করিতেছেন। বাদশাহকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাঁহার সঙ্গিনীরা যখন সসম্ভ্রমে দূরে দাঁড়াইল, তখন মেহেরের চৈতন্য হইল। মেহেরউন্নিসা সহসা নিজ কক্ষে দিল্লীশ্বরকে উপস্থিত দেখিয়া চমকিত হইলেন—বলিলেন,

"জাঁহাপনা! আজি সহসা এ অনুগ্রহ কেন?"—আর বলা হইল না, চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল। সেই আরক্তিম, সদ্যঃপ্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় সুকুমার গণ্ডস্থলে প্রস্রবণধারার সৃষ্টি হইল।

বাদশাহ ধীরে ধীরে মেহেরের হাত ধরিলেন। তাঁহার হৃদয়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। বাদশাহ সাদরে মেহেরের কমলমুখে চুম্বন করিলেন। মেহেরউন্নিসা বাদশাহকে উপযুক্ত আসনে বসাইয়া স্বয়ং তাঁহার পদপ্রান্তে উপবেশন করিলেন।

বাদশাহ ঔৎসুক্যসহকারে জিজ্ঞাসিলেন, "ইহারা তোমার বাঁদী; তোমার বেশভূষা দেখিলে বাঁদীদেরই কর্ত্রী বলিয়া ভ্রম হয়। তোমার এরূপ হীনবেশে থাকিবার কারণ কি?"

মেহেরউন্নিসা বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে উত্তর করিলেন, "দিল্লীশ্বর! আমি আমার বাঁদীদের যেমন সুখে রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তাহারা সেইরূপই আছে। আমি আপনার বাঁদী, আপনি আমায় যেমন রাখিয়াছেন, আমিও তেমনিই আছি। ইহা আর বিচিত্র কি?"

জাহাঙ্গীর শাহ হৃদয়হীন ছিলেন না। তিনি মেহেরউন্নিসার সহিত যথেষ্ট দুর্ব্যবহার করিয়াছিলেন। বাদশাহ প্রেমপূর্ণকণ্ঠে বলিলেন, "হৃদয়েশ্বরি! এই

দিল্লীর সিংহাসন আজ হইতে তোমার হইল। শীঘ্র তোমাকে সাধারণসমক্ষে রাজ্যেশ্বরীরূপে গ্রহণ করিয়া আমি অতীত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।"

বাদশাহ ধীরে ধীরে মেহেরকে শয্যাতল হইতে তুলিয়া নিজের পার্শ্বদেশে বসাইলেন। সে শোভা অতুলনীয়—অবর্ণনীয়। এক জন সঙ্গিনী বলিয়া উঠিল,—"ঠিক যেন শ্বেতপদ্মে ভ্রমর বসিয়াছে।"

অতি মৃদুস্বরে উচ্চারিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু বাদশাহ তাহা শুনিতে পাইলেন। কথাটা শুনিয়া তিনি হাসিয়া উঠিলেন, মেহেরউন্নিসাকে বাহুপাশে নিপীড়িত করিয়া বলিলেন, "বাঁদী ঠিকই বলিয়াছে—বাস্তবিকই শ্বেতপদ্মে একটা বিকৃতাকার ভ্রমর বসিয়াছে।"

রহস্যের অভিনয় এইখানেই সমাপ্ত হইল। সপ্তাহমধ্যে মহাসমারোহে মেহেরউন্নিসা "নূরজাঁহা" উপাধি লইয়া বাদশাহের পার্শ্বে বসিয়া দিল্লীর সিংহাসম অলঙ্কৃত করিলেন।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

ডিকেন্স।

ধর্ম্মজগতে যেমন মধ্যে মধ্যে এক এক জন মনীষাসম্পন্ন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, সাহিত্য-জগতেও তেমনই মধ্যে মধ্যে এক এক জন প্রতিভাশালী মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়া থাকে। তাঁহারা এক এক জন অবতার,—তাঁহারা প্রতিভার অবতার, শক্তির অবতার, উন্নতির অবতার। তাঁহাদিগের কর্ম্মফলে জগতের সুখ বর্দ্ধিত হয়; চিরদুঃখকাতর মানবহৃদয় কথঞ্চিৎ শান্তি প্রাপ্ত হয়। ইংরাজী সাহিত্যে ডিকেন্স সেইরূপ এক জন অবতার।

সম্প্রতি নাইন্‌টিন্থ সেঞ্চুরী পত্রে মিষ্টার হার্বার্ট পল ডিকেন্সের যে সমালোচনা প্রকাশিত করিয়াছেন, আমরা তাহার সারোদ্ধার করিয়া দিলাম।

রচনা ও যশ।

বর্ষাপগমে রৌদ্রকরোজ্জ্বল শরৎপ্রভাতের মত ডিকেন্সের রচনাসমূহ যখন সহসা সাহিত্য-গগনে দেখা দিয়াছিল, তখন তাঁহার আদর অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল। সে যশের, সে আদরের স্রোতে এখন ভাঁটা পড়িয়াছে। যে সকল সামাজিক প্রথার উপর তিনি বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিয়াছিলেন, সে সকল এখন প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে; এখন লোকের ব্যবহারেও প্রচুর পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু কেবল এই সকল চিত্রিত করিতেই ডিকেন্সের অসাধারণ প্রতিভা ব্যয়িত হয় নাই। ডিকেন্সের সমসাময়িক লেখকদিগের মধ্যে তিনি যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহার সমসাময়িক লেখকদিগের মধ্যে কেবল লিটন ও ডিস্‌রেলির উপন্যাস এখনও লোকে পাঠ করে। আবার ডিকেন্সের সহিত তুলনায় তাঁহারা ভাস্করের নিকট ক্ষীণজ্যোতিঃ খদ্যোত। ডিকেন্সের বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার রচনাপ্রণালী তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি,—কাহারও অনুকরণ নহে। তাঁহাকে লণ্ডনবাসীর সেক্সপীয়ার বলিলে বোধ করি অত্যুক্তি হয় না। সেক্সপীয়ারে তিনি আগ্রীব নিমগ্ন ছিলেন; তাঁহার প্রিয় ঔপন্যাসিক ছিলেন—এস্ মলেট্।

যখন মনে করা যায় যে, 'পিকুইক' এবং 'অলিভার টুইষ্ট' একই সময়ে প্রকাশিত হয়, আবার 'অলিভার টুইষ্ট' শেষ হইতে হইতেই 'নিকোলাস্ নিক্‌ল্‌বির' প্রকাশ আরম্ভ হয়, তখন বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। প্রায় তিন বৎসরের মধ্যে এরূপ তিনখানি পুস্তক রচনা করা, ইংরাজ লেখকদিগের মধ্যেও স্কট ও ডিকেন্স ভিন্ন আর কাহারও সাধ্য ছিল না।

ঐতিহাসিক উপন্যাস।

ঐতিহাসিক-উপন্যাসের লেখক হিসাবেও ডিকেন্সের স্থান বড় নিম্নে নহে। এমন অনেক পাঠকও আছেন, যাঁহারা ডিকেন্সের গ্রন্থাবলীর মধ্যে Tale of Two Citiesকেই সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করেন; থ্যাকারের Esmond সম্বন্ধেও এ কথা প্রযুক্ত হইতে পারে। ডিকেন্সের Tale of Two Cities কার্লাইলের ফরাসী বিদ্রোহের বিবরণের উপর সংস্থাপিত; ইহাতে হাস্যরসের তেমন প্রাচুর্য্য নাই; কিন্তু এই পুস্তকখানি অনিন্দ্যসুন্দর। অথচ ইহার আখ্যানবস্তু (Plot) নিতান্ত সরল, সহজ। প্রকৃতপক্ষে ডিকেন্সের ইতিহাস-জ্ঞান তেমন গভীর ছিল না। লোকে তাঁহার ডেভিড্ কপারফিল্ডের ইতিহাসেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আদর করে,—কপারফিল্ড তিনি স্বয়ং! তিনিও গ্রন্থ সকলের মধ্যে এইখানিকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন। লোকে যে বলে, লেখক স্বয়ং আপনার রচনার প্রকৃত বিচারক নহেন, এখানে সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে। ডিকেন্সের রচনা বুঝিতে হইলে একটা কথা বুঝিতে হয়;—ডিকেন্স এক জন আসল অভিনেতা। অভিনয় করিতে বা অভিনয় দেখিতে ডিকেন্স বড়ই ভালবাসিতেন। ডিকেন্সের নিকট এ জগৎ রঙ্গমঞ্চ, আর নরনারীরা তাহার অভিনেতা।

করুণরস।

ডিকেন্সের উপন্যাসসমূহের করুণরস সম্বন্ধে পাঠক ও সমালোচকদিগের মধ্যে মতের অনৈক্য থাকিবেই। ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে, এমন কি একই পুস্তকে, এই করুণরসের বিভিন্নতা দৃষ্ট হইবে। শুনিতে পাওয়া যায়, কোনও বৃদ্ধা রজকিনী বলিয়াছিল, যে, Dombey and Son যে এক জন লেখকের রচনা, ইহা তাহার বিশ্বাস হয় না। হয় ত এ কথা বলিবার সময়, ডিকেন্সের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার প্রভূত প্রশংসাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। ডিকেন্স বড় সাদাসিধা সোজা রকমের লোক ছিলেন। যখন তিনি পাঠককে হাসাইতে চাহিতেন, তখন তিনি রচনায় যথাসম্ভব হাস্যরসের প্রয়োগ করিতেন; আবার যখন তিনি পাঠককে কাঁদাইতে চাহিতেন, তখন তিনি হাস্যরস ছাড়িয়া কেবল করুণরসের ব্যবহার করিতেন। তিনি হাস্যরস ও করুণরস স্বতন্ত্র রাখিতেন, কখনও মিশাইয়া ফেলিতেন না; তাই তাঁহার হাস্য কেবলই হাস্য, তাঁহার বেদনা কেবলই বেদনা।

কেহ কেহ বলেন যে, ডিকেন্স সমাজের নিম্নস্তর যেমন বুঝিতেন, যেমন জানিতেন, উচ্চ স্তর তেমন বুঝিতেন না, তেমন জানিতেন না। এ কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। ডিকেন্সের মত সূক্ষ্মদর্শী লেখক বিরল; তিনি যেখানে গোলাপ দেখিয়াছেন, সেখানে তাহার পার্শ্বে ক্ষুদ্র কণ্টকটিও তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। তিনি যে সমাজের এক অংশমাত্র জানিয়া নিবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইহা বিশ্বাস হয় না। এ কথার প্রমাণস্বরূপ

Great Expectations গ্রন্থের উল্লেখ করা যাইতে পারে। উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিলেই প্রমাণিত হইবে যে, ডিকেন্স প্রকৃত "ভদ্রলোকের" চিত্র অঙ্কিত করিতে পারিতেন।

সাহিত্যে ডিকেন্সের স্থান।

ইংরাজী সাহিত্যে ডিকেন্সের স্থান বড় উচ্চ। জীবিতকালে ডিকেন্স সর্ব্বশ্রেণীর প্রিয় লেখক ছিলেন। সকলেই তাঁহার পুস্তক পাঠ করিত। তাঁহার রচনা পাঠ করিতে ও বুঝিতে বিশেষ বিদ্যাবুদ্ধির আবশ্যক হয় না, অথচ সাধারণ শ্রমজীবী হইতে প্রগাঢ় পণ্ডিত পর্য্যন্ত সকলেই তাহা পাঠ করিয়া প্রচুর আনন্দ লাভ করিতে পারেন। তাঁহার মত সাফল্যলাভ বুঝি আর কোনও লেখকের অদৃষ্টে হয় নাই। ডিকেন্সের গতানুগতিকগণ তাঁহার যত অনিষ্ট করিয়াছেন, তত আর কেহ করেন নাই। তাঁহাদিগের না ছিল ডিকেন্সের প্রতিভা, না ছিল ডিকেন্সের রচনাকৌশল, অথচ ডিকেন্সের অনুকরণ করিবার ইচ্ছা ছিল ষোল আনা; ফল হইত এই যে, তাঁহারা প্রায়ই শিব গড়িতে বাঁদর গড়িয়া বসিতেন। তাই মনে হয়, Imitation may be the sincerest form of flattery. It is the most dangerous form of admiration. তাঁহারা বুঝেন না যে, ডিকেন্স শুভ্রতুষারমুকুটমণ্ডিত অম্বরচুম্বিত গিরিশিখরের মত অনধিগম্য। সুখের বিষয় এই যে, এখন এই সকল গতানুগতিকের আর বড় আবির্ভাব হইতেছে না।

ইংরাজী সাহিত্য হইতে ডিকেন্সের প্রভাব বিদূরিত হইবার নহে। ডিকেন্সের মত মনীষী মহাপুরুষের প্রভাব সাহিত্য হইতে বিদূরিত হইতে পারে না। ডিকেন্সের মত থ্যাকারেরও যথেষ্ট অনুকরণ হইয়াছে; তিনিও তেমনই উচ্চ শিখরে সমাসীন। ডিকেন্স তাঁহার সময়ের Typical humourist, আর থ্যাকারে তাঁহার সময়ের Typical satirist.

যত দিন ইংরাজী ভাষা থাকিবে, তত দিন সমালোচকগণ ডিকেন্সকে প্রতিভাশালী ঔপন্যাসিক ও পরিহাস-রসিকচূড়ামণি বলিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

সমাজতত্ত্ব।

হিন্দু রমণী।

সম্প্রতি হিন্দুমহিলা সম্বন্ধে দুইটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উভয় প্রবন্ধের লেখিকাই ইংরাজ রমণী; প্রথম প্রবন্ধের লেখিকা ভারতবিখ্যাত শ্রীমতী বেসাণ্ট; দ্বিতীয় প্রবন্ধের লেখিকা পঞ্জাবের বালিকাবিদ্যালয়পরিদর্শক, ঔপন্যাসিক শ্রীমতী ফ্লোরা অ্যানি ষ্টিল। হিন্দু সমাজের এখন পরিবর্ত্তনযুগ। আমরা যে প্রাচীন আদর্শ হারাইয়াছি, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু এখনও কোন নূতন আদর্শ গ্রহণ করিতে পারি নাই। অতীতের অন্ধকারে যেখানে ঐতিহাসিকের দৃষ্টি আর কিছুই দেখিতে পায় না, সেখানেও প্রাচীন হিন্দুর সভ্যতার সকল লক্ষণই দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুর দুর্ভাগ্য যে, হিন্দু কালের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সমাজে পরিবর্ত্তন আনে নাই; তাই আজ প্রতীচ্য সভ্যতার তীব্র সুরার আস্বাদন পাইয়া হিন্দু আর প্রাচ্যসভ্যতার স্নিগ্ধসলিলের প্রতি তেমন আকৃষ্ট নহে। আমাদিগের এই গঠনযুগে চিন্তাশীলা বিদেশীয়া মহিলাদিগের মন্তব্য বিচার করিয়া দেখিলে উপকার ভিন্ন অপকারের সম্ভাবনা নাই। আমরা প্রথমে শ্রীমতী বেসাণ্টের মন্তব্য প্রদান করিলাম।

বিবাহ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা।

প্রতীচ্য দেশবাসীদিগের মনে এই একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, হিন্দুরা বহুবিবাহরত। এ ধারণার মূলে সত্য নাই; লেখিকার বহু ভারতবাসী বন্ধুর মধ্যে কেহই বহুবিবাহে রত নহেন। পরন্তু সাধারণতঃ সকল হিন্দুই একদাররত। ভারতবর্ষে দুই চারি জন দেশীয় রাজার একাধিক পত্নীর কথা শুনিতে পাওয়া যায়, এই পর্য্যন্ত। প্রাচীন কাব্যগ্রন্থ সকলে যে "শুদ্ধান্ত" "অন্তঃপুর" প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, সেও বোধ হয় বহুবিবাহরত রাজাদিগের গুণে—জনসাধারণ সে দোষে দোষী নহেন। তবে প্রথম পত্নীর সন্তান না জন্মিলে কেহ কেহ দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিয়া থাকেন—কেন না, পুত্র না হইলে হিন্দুর প্রধান তিন ঋণের মধ্যে একটি শোধ করা হয় না। পতিপত্নীর মধ্যে সদ্ভাবের আবশ্যকতা হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থে কথিত হইয়াছে।

একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা।

ইহার সহিত আর একটি প্রথার বিষয় বিবেচনা করিতে হয়—সেটি একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা। অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বীর মত হিন্দু বিবাহান্তে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া পত্নীকে লইয়া স্বতন্ত্র সংসার সংস্থাপন করে না। হিন্দুপরিবারে পিতামাতা, ভ্রাতা, ভ্রাতৃবধূ, অবিবাহিতা ভগিনী সকলেই একত্র বাস করেন; কোন কোন পরিবারে তিন পুরুষ একত্র বাস করিতেও দেখা যায়। জীবিত থাকিলে কর্ত্তৃত্বে পিতামহ ও পিতামহীরই অধিকার—তাঁহাদিগের সম্মতি ভিন্ন কোন আবশ্যকীয় কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। তাঁহাদিগের মৃত্যুর পর সে কর্ত্তৃত্বে জ্যেষ্ঠেরই অধিকার। এরূপ সংসার দেখিলে মনে আনন্দ হয়। প্রবীণারাই গৃহের কার্য্য পরিচালনা করেন—গৃহে তাঁহাদিগের অসাধারণ সম্মান। হিন্দুশাস্ত্রে রমণীর স্বাতন্ত্র্যের ব্যবস্থা নাই সত্য—

"বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা।
ন স্বাতন্ত্র্যেণ কর্ত্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্য্যং গৃহেষ্বপি॥" (মনু)।

কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে মহিলার সম্মানের বিধান অনেক—

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥" (মনু)।

বাস্তবিক বিচার করিয়া দেখিতে গেলে, হিন্দু-পরিবারে মহিলার সম্মান অন্য কোন পরিবারে মহিলার সম্মানাপেক্ষা ক্ষুণ্ণ নহে। অথচ, প্রতীচ্য দেশবাসীদিগের বিশ্বাস হিন্দুরা মহিলাদিগের প্রতি পশুর মত ব্যবহার করে!

বিবাহ।

হিন্দুর বিবাহের আদর্শ অতি উচ্চ, অতি মহৎ। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য আত্মার মিলনই প্রকৃত হিন্দুবিবাহ; দেহের মিলন ইহলোকের, তাহার উদ্দেশ্য সমাজসংরক্ষণ। হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য এখানেই আবদ্ধ নহে। তাই হিন্দুদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত। অল্প বয়সে বিবাহ হইলে বালকবালিকা প্রথম হইতেই পরস্পরকে ভালবাসিতে আরম্ভ করে—বালকের হৃদয়ে অন্য কোন রমণীর বা বালিকার হৃদয়ে অন্য কোন পুরুষের স্থান হয় না।

প্রাচীনা ও নবীনা।

ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে সংসারনির্ব্বাহার্থ হিন্দুমহিলা যে শিক্ষা পাইতেন, তাহা অতি উত্তম। অল্পবয়সেই ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের শিক্ষা হইত; ধর্ম্মোপদেশপূর্ণ গল্প, মহচ্চিন্তাপূর্ণ কবিতা, এ সকল তাঁহাদিগের কণ্ঠস্থ থাকিত। ইহা ভিন্ন গৃহকর্ম্ম, ঔষধব্যবহার, খাদ্যদ্রব্যের গুণাগুণ এ সকলও তাঁহারা শিখিতেন। কিন্তু মহিলারা আরও উচ্চশিক্ষা পাইতেন; হিন্দুমহিলা শারীরিক বিষয় আধ্যাত্মিক বিষয়াপেক্ষা হীন বুঝিতেন—হিন্দুমহিলা কর্ত্তব্যপালন করিতে শিখিতেন।

তাই হিন্দুমহিলার মত ধৈর্য্যশালিনী, কোমলপ্রকৃতিসম্পন্না, স্বার্থত্যাগকারিণী, পবিত্রচিত্তা মহিলা অন্যত্র দুর্ল্লভ। তাঁহাদিগের পবিত্র প্রভা কোন স্বর্গীয় সৌরভের মত হিন্দুর সংসার ব্যাপ্ত করিয়া থাকিত।

দুঃখের বিষয়, প্রতীচ্য সভ্যতার কল্যাণে এখন আর হিন্দুমহিলার এরূপ শিক্ষা হয় না। তথাপি এখনও হিন্দুমহিলা তাঁহার স্বাভাবিকী মাধুরী হইতে একেবারে দূরে পড়েন নাই। এখন হিন্দুবালিকাদিগকে প্রতীচ্যপ্রণালীতে শিক্ষা দিবার কল্পনা হইতেছে, তাই বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইতেছে। প্রতীচ্য সভ্যতার ফলে বৎসর বৎসর বহু রমণীকে উদরান্নের জন্য জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে, পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে। প্রতীচ্য শিক্ষাপ্রণালী প্রতীচ্য সভ্যতারই উপযোগী। যে বালিকাদিগের কর্ম্মক্ষেত্র বাজার নহে পরন্তু গৃহ, তাহাদিগের মধ্যে এ শিক্ষা প্রচলিত করা কেন?

মহীশূরের প্রধান মন্ত্রীর অনুরোধে একটি প্রবন্ধে, লেখিকা হিন্দুরমণীর শিক্ষা-সম্বন্ধে যাহা আবশ্যক মনে করেন, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। লেখিকা বলেন যে, এই বিষয়টি বড়ই গুরুতর; কারণ, যদি প্রতীচ্য-প্রভাবই প্রবল হইয়া উঠে, তবে আমরা কেবল বিদেশীয় আদর্শের কতকগুলি হীন অনুকরণ মাত্র পাইব, হিন্দুরমণীর অতুলনীয় আদর্শ জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইয়া কেবল সাহিত্যেই অবস্থিতি করিবে। সে দুর্দ্দিন যেন কখনও উপস্থিত না হয়।

ইহার পর শ্রীমতী ষ্টিলের কথা। তিনি তাঁহার পঞ্চবিংশতি বৎসর কালব্যাপী ভারত-প্রবাস-সময়ে পঞ্জাবপ্রদেশে ভারতীয়দিগের, বিশেষতঃ ভারতীয়া মহিলাদিগের, সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। উপন্যাসপ্রিয় পাঠক তাঁহার সূক্ষ্মদর্শনের বিশেষ পরিচয় পাইয়াছেন, তাঁহার মত আমরা প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে।

তিন সহস্র বৎসরব্যাপী প্রাচীন সভ্যতায় ভারতবাসী সুখস্বচ্ছন্দে ছিল, তাহাতে সম্প্রদায়-বিভাগ ছিল না। সম্প্রদায়-বিভাগ অর্থে কেহ যেন এমন বুঝেন না যে, লেখিকা ভারতবর্ষে জাতিভেদের কথা অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি সামাজিক সম্প্রদায় বিভাগের কথা বলিতেছেন না—দৈনন্দিন জীবনের কার্য্যাবলির সম্প্রদায়-বিভাগের কথাই বলিতেছেন। য়ুরোপীয় সভ্যতায় প্রধান লক্ষ্য আরাম-বিলাস। এই আরামের ধারণা বা "কম্ফর্ট"-কল্পনা, এই বিলাস-বাহুল্য বা বিলাস-বাহাদুরী ভারতবাসীর নিকট একেবারেই অপরিজ্ঞাত। ভারতবর্ষে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বাস-বিষয়ে বৈষম্য বড়ই অল্প। রাজার প্রাসাদেও দরিদ্রের গৃহের মত অনাবৃত হর্ম্ম্যতল দৃষ্ট হইবে—উভয় গৃহেই আহারার্থ সেই একই প্রকার পাত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মোটামুটি কথায় বলিতে গেলে, দরিদ্রগৃহেরই মত ধনীর প্রাসাদে স্নানের সজ্জারও সম্পূর্ণ অভাব; কারণ, নদীতে স্নান করিয়া রৌদ্রতাপে গাত্রের জল শুকান ভারতবাসী অপমানজনক মনে করে না। ভারতবাসীর জীবনে বিলাসের প্রভাব নাই, তাই তাহাদের সবই সাদাসিধা রকমের। ভারতবাসী বড় জোর পত্নীর অলঙ্কারে কিছু ব্যয় করে—আপনার আরামের জন্য তাহার ব্যয় অতি সামান্য। ভারতীয় সভ্যতার এই সাদাসিধা মোটামুটি ভাব তিন সহস্র বৎসর কাল অক্ষত রহিয়াছে; য়ুরোপীয় সভ্যতায় তাহা পঞ্চাশ বৎসর মধ্যে বিনষ্ট হইবে।

এখনই ভারতবাসী য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রভাবে নিত্য নূতন অভাব সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভবিষ্যতের অন্ধকার যবনিকার অন্তরালে কি আছে, তাহা কে বলিবে?

শ্রীমতী বেসাণ্টের মত শ্রীমতী ষ্টিলও বলিয়াছেন যে, তাঁহার বিশ্বাস ভারতবর্ষে বিবাহ প্রায়ই সুখস্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন করে। য়ুরোপে দম্পতির মধ্যে নির্দ্দয় ব্যবহার এবং অত্যাচার

বিবাহ।

যত অধিক, ভারতবর্ষে তত অধিক নহে। হিন্দুর বিবাহের ধারণা য়ুরোপীয়ের বিবাহধারণাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। হিন্দু, বিবাহটা নিতান্তই ব্যক্তিগত ভাবে গ্রহণ করে না, পরন্তু পুত্রার্থী হইয়াই বিবাহ করে।

কিন্তু এ সম্বন্ধে সহসা কোন মত প্রকাশ করা সহজ নহে; কারণ হিন্দুর কুলের কথা আদালতে গড়ায় না, হিন্দুর অন্তঃপুরে অপরের দৃষ্টি চলে না। হিন্দুমহিলার পক্ষে পতির অত্যাচারের প্রতিবিধান চেষ্টা করা, সধবা অবস্থায় বৈধব্য-ভোগের পথ পরিষ্কৃত করা। তদ্ভিন্ন আবার হিন্দুর সামাজিক ব্যবস্থা য়ুরোপীয়ের সামাজিক ব্যবস্থা হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। উভয়ের গার্হস্থ্য-ব্যবস্থা সম্বন্ধেও সেই কথা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কে বলিবে, বিবাহের স্ফূর্ত্তি খেলায় হিন্দু ভাগ্যবান? কি বলিবে, কোন বহ্নি অপরের দৃষ্টির অগোচরে হিন্দুর বিবাহিত জীবন জ্বালাময় করিয়া তুলে না?

এখন সমাজের নিম্ন স্তরে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের বিশেষ চেষ্টা হইতেছে; কিন্তু লেখিকার মত এই যে, তাহাতে বালিকাগণ সুখী না হইয়া অসুখী হয়; কারণ, সমাজের নিম্নস্তরে

প্রতীচ্য শিক্ষার কুফল।

পুরুষগণ সচরাচর শিক্ষিত হয় না। গভর্মেণ্টের সাহায্যে এখন যাহারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়, তাহারা অশিক্ষিত পুরুষের সহিত পরিণীতা হয়; তাহাদের গার্হস্থ্য-জীবন বড় সুখের হয় না। লেখিকা স্বয়ং বিদ্যালয়ের পরিদর্শক ছিলেন, তিনি দেখিয়াছেন, কোন কোন স্থানে এই শিক্ষার জন্যই বালিকাদিগের গার্হস্থ্য-জীবন অসুখময় হইয়াছে। এখন সমাজের নিম্নস্তরেই স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের বিশেষ চেষ্টা হইতেছে।

এই বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাবিস্তার অতি সামান্যই হইয়াছে। এ দেশে এখনও শিক্ষার প্রতি মহিলাদিগের আন্তরিক অনুরাগ উৎপাদিত হয় নাই; যত দিন তাহা না হয়, তত দিন মহিলাদিগের মধ্যে প্রকৃত উন্নতি ও অনুশীলন প্রত্যাশা করা আকাশ-কুসুমেরই মত অসম্ভব।

ইহা ভিন্ন এই শিক্ষায় অথবা এই শিক্ষার বৈষম্যে আর এক কুফল উৎপন্ন হইতেছে। সে কুফল ফলিতেছে, সমাজের উচ্চ স্তরে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, মহিলাদিগের মধ্যে প্রকৃত

শেষ কথা।

পক্ষে শিক্ষার বিস্তার অতি সামান্যই হইয়াছে। অথচ সমাজের উচ্চ স্তরে পুরুষদিগের মধ্যে শিক্ষার যথেষ্ট বিস্তার হইয়াছে। এইরূপে পতিপত্নীর মানসিক অবস্থার বিষয়বৈষম্য বিলক্ষণ স্পষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বে এদেশীয়দিগের, ভাল হউক মন্দ হউক, দাঁড়াইবার একটা স্থান ছিল, এখন ঠিক সেই স্থানটুকু অপসারিত হইতেছে—পতিপত্নী এক স্থানে দাঁড়াইতে পারিতেছেন না। উভয়ের মানসিক অবস্থার বৈষম্য এতই প্রবল হইয়া উঠিতেছে যে, একার কার্য্যে অপরের কিছুমাত্র আকর্ষণ থাকে না। পত্নীর কথা এমন শিশুসুলভ যে, তাহা শুনিতে পতির বিরক্তি জন্মে, আবার পতির কথা এমন যে, পত্নী তাহার কিছু বুঝিতে পারেন না। অনুশীলনাভাবে পত্নীর হৃদয়ের উন্নতি সাধিত হয় না। আবার অনুশীলন-ফলে পতির মানসিক বৃত্তি সকল স্ফূর্ত্ত হয়; কাজেই যত দিন যায় উভয়ের মনোভাবে বৈষম্য ততই বর্দ্ধিত হয়। স্বামী আদর্শানুরূপ পত্নী না পাইয়া জীবন মরুময় বিবেচনা করেন; পত্নী ভাবেন যে, তিনি এক দিনের জন্য স্বামীকে সুখী করিতে পারিলেন না। একটা অতৃপ্ত পিপাসা, একটা দারুণ হতাশা পারিবারিক জীবন তিক্ত করিয়া তুলে। উভয়েরই হৃদয়ে একটা গুরুভার চাপিয়া থাকে। পতি মনে

করেন, উপযুক্ত পত্নী পাইলে জীবনের সব আশা সফল হইত, জীবনে অনেক কার্য্য করিতে পারিতেন, এ মরুময় জীবন লইয়া সে সকল কিছুই হইল না—এ জীবন বৃথা গেল। পত্নী মনে করেন, পতি যদি আপনার উচ্চাসন হইতে একবার নামিয়া আসিতেন, যদি এক বার তাঁহার দিকে সদয় দৃষ্টিতে চাহিতেন, তবে তিনি কৃতার্থ হইতেন। তাহাও হইল না! সমাজস্রোতমধ্যে ক্রমবর্দ্ধনশীল চড়ার মত এই প্রশ্ন সমাজস্রোতাবলম্বী যাত্রীদিগের পক্ষে দিন দিন অধিক আশঙ্কার কারণ হইয়া উঠিতেছে।

আশা করি এই পরিবর্ত্তন-যুগে বাঙ্গালী এই কথাগুলি বিবেচনা করিবেন।

বিবিধ।

দীর্ঘজীবন।

লোক্যালবোর্ড, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড এবং মিউনিসিপ্যালিটী সমূহের, দরিদ্র প্রজার স্কন্ধে প্রায় সম্ভবাতিরিক্ত ট্যাক্সের বোঝা চাপাইয়া, সাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতি করিবার, এত চেষ্টাসত্ত্বেও দেখা যায় যে, পূর্ব্বের অপেক্ষা এখন অনেক লোক অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সেই জীবনের যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছে। ইহার নানা কারণ আছে। জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা, অতিরিক্ত মানসিক শ্রম, এ সকল সে কালে এত অধিক ছিল না। কিন্তু এ সকল ভিন্ন অন্য কারণও অনেক আছে, যাহা আমরা ইচ্ছা করিলে দূর করিতে পারি।

সম্প্রতি ডাক্তার পার্ডি, নর্থ-আমেরিকান রিভিউ পত্রে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা সকলেরই কর্ত্তব্য। ডাক্তারের অনেক কথা আজ কাল আমাদের সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে।

প্রধান কয়টি কথা।

ডাক্তার প্রথমেই তিনটি কথা বলিয়াছেন;—প্রথম, আমরা অনেক সময় অভ্যাসের দোষে রোগ ভোগ করি ও কষ্ট পাই, আমাদিগের অভ্যাসের পরিবর্ত্তন করিলে সে সকল সমূলে বিনষ্ট হয়; অথচ তাহা না করিয়া আমরা কেবল ঔষধ প্রয়োগ করি। দ্বিতীয়.—আমরা অনেক সময় অনাবশ্যক কষ্ট, যাতনা ও পীড়া ভোগ করি, এবং সেই রোগ সন্তানদিগকে উত্তরাধিকারসূত্রে দিয়া যাই। তৃতীয়—,অনেক লোকের পূর্ব্বপুরুষদিগের পরমায়ু, দেহের গঠন ইত্যাদি দেখিয়া তাহারা যত দিন বাঁচিবে বোধ হয়, তাহারা প্রকৃতপক্ষে তত দিন বাঁচে না। এইরূপ অকালমরণ ইচ্ছা করিলেই দূর করা যাইতে পারে।

সুস্থকায় সবল পিতামাতার সুসন্তান যদি কোন দৈবঘটনা বা সংক্রামক ব্যাধি ভিন্ন পঁয়ষট্টি বৎসরের পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে সে তাহার আপনার দোষে।

আহার সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট অনিয়ম করি। প্রধান অনিয়ম—অতিরিক্ত মাংসভোজন। এ দোষে দরিদ্রগণ তত দোষী নহে। অতিরিক্ত মাংসভোজনের ফলে হৃদ্‌রোগাদি উৎপন্ন

আহার ও পান।

হয়। অতিরিক্ত মাংসভোজন না করিয়া বরং কিছু পরিমাণে নিরামিষ আহার করিলে, শরীরের পক্ষে উপকারের সম্ভাবনা। যেমন অতিরিক্ত মাংস-আহার একটা দোষ, তেমনই অতিরিক্ত শ্বেতসারযুক্ত খাদ্য ও অতিরিক্ত মিষ্ট দ্রব্যের ভোজনও একটা গুরুতর দোষ। মদ্যে অতিরিক্ত মিষ্ট দ্রব্য থাকে; তাই অতিরিক্ত মদ্যপান করিলে মাথা-ধরা ও অজীর্ণ উৎপন্ন হয়।

পোষাকেও আমাদের দোষ আছে। আমরা পশমী পোষাক ব্যবহার করি না। যাহারা সাধারণতঃ বসিয়া কাজ করে, তাহাদিগের পক্ষে মৎস্য, টাট্‌কা ফলমুল এবং অম্ল ফলই

আর আর কথা।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাহাদিগের পক্ষে দিন একবারের অধিক মৎস্য-আহার উচিত নহে। শ্বেতসারযুক্ত খাদ্যের মধ্যে রুটি ও গোলআলুই ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। চিনি অধিক আহার করা উচিত নহে। আহারের সময় জলীয় দ্রব্য অধিক পান করা অত্যন্ত অন্যায়। সন্ধ্যার সময়েই 'সায়মাশ' শেষ করা উচিত; আর কখনই অতিরিক্ত আহার করা উচিত নহে।

অপেক্ষাকৃত উষ্ণপ্রধান দেশে পশমী পোষাকের পরিবর্ত্তে রেশমী পোষাক ব্যবহার করা যাইতে পারে। শীতল জলে স্নানও সকল সময় নিরাপদ নহে; বিশেষতঃ, বয়স একটু অধিক হইলে, তাহাতে আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ থাকে।

ব্যায়ামের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অশ্বারোহণ, তাহার পর দ্বিচক্র-রথচালন, তাহার পর ভ্রমণ।

ধূমকেতু।

ধূমকেতু অপশকুন।—অতি প্রাচীন কাল হইতে, এমন কি, ধূমকেতুর প্রথম দর্শনাবধি লোকসাধারণ উহাকে অপশকুন অর্থাৎ অমঙ্গলসূচক উৎপাতবিশেষ বলিয়া জানে। ফলতঃ, প্রত্যূষের পূর্ব্বে বা প্রদোষের অনতিবিলম্বে, নভোমণ্ডলের পূর্ব্ব বা পশ্চিম কপালে; অপূর্ব্বদৃষ্ট, বৃহৎ ও বিকটাকার এক, দ্বি, ত্রি, ধূমাভশ্মশ্রুবিশিষ্ট দুষমন চেহারা অবলোকিত হইলে, স্বভাবতঃ হৃদয়ে প্রগাঢ় ভয়বিস্ময়ের সঞ্চার হয়। কেহ বলেন, এ ধূমকেতু কি "উপপ্লবায় লোকানাং?" কেহ বলেন, ইহা ছত্রভঙ্গ, রাজ্যবিপ্লব, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি অমঙ্গলের লক্ষণ। কেহ কেহ বলেন, লক্ষণবিশেষে ধূমকেতু শুভসূচকও হয়।

উক্ত বিপরীতরূপো ন শুভকরো ধূমকেতুরুৎপন্নঃ। ইন্দ্রায়ুধানুকারী বিশেষতঃ দ্বিত্রিচূলো বা। হ্রস্বতনুঃ প্রসন্ন ইত্যস্মাদুক্তাৎ যো বিপরীতো বিশেষতঃ শক্রচাপরূপকেতুরুৎপন্নঃ স ধূমকেতুঃ স চ ন শুভকরঃ, পাপং করোতীত্যর্থঃ। ইন্দ্রধনুঃ সদৃশো ন শুভকর এব তথা দ্বিশিখস্ত্রিশিখশ্চ বিশেষতঃ পাপফলদঃ। তথাচ সময়সংহিতায়াং। অচিরস্থিতোঽতিবৃষ্টস্বস্তমিতঃ স্নিগ্ধমূর্ত্তিরুদগুদিতঃ। হ্রস্বতনুঃ প্রসন্নঃ কেতুর্লোকস্যাভাবায় ন শুভো বিপরীতো বিশেষতঃ শক্রচাপসঙ্কাশঃ। দ্বিত্রিচতুশ্চলো বা দক্ষিণসংস্থশ্চ মৃত্যুকরঃ।—ইতি শব্দকল্পদ্রুমঃ।

"The blazing Star,
Threatening the world with famine, plague and war;
To princes death; to kingdoms, many curses;
To all estates, inevitable losses;
To herdsmen, rot; to ploughmen, hapless seasons;
To Sailors, storms; to cities, civil treasons."

এক্ষণে বিজ্ঞানপ্রভাবে এ অমূলক ভয় অনেক পরিমাণে নিরাকৃত হইয়াছে।

ধূমকেতু কি? রবিপরিতঃ ভ্রাম্যমান, নীহারবৎ পিণ্ডবিশেষকে ধূমকেতু বলে। ইহাদিগের ধূমকেতু নামটি সার্থক; কিন্তু সকল ধূমকেতুর কেতু বা পুচ্ছ থাকে না। ধূমকেতুর সমধিক উজ্জ্বল তারাবৎ স্থানটিকে গর্ভ বলে। ধূমকেতুগণ রবিপরিতঃ পরিভ্রমণ করে বটে, কিন্তু তাহাদিগের কক্ষার সহিত গ্রহকক্ষার বিলক্ষণ বিষমতা দৃষ্ট হয়। কেতুকক্ষা অত্যন্ত উৎকেন্দ্রিক, অর্থাৎ উহা অতীব দীর্ঘবর্ত্তুলের দীর্ঘচ্ছেদের মত; এমন কি, উহাকে অণ্ডাকার না বলিয়া সরল দীর্ঘ কৃশাঙ্গ পটোল বলা কর্ত্তব্য। সিরিস, পাল্লাস, জুনো প্রভৃতি খোদিষ্ট গ্রহগণেরও কক্ষা ০°৩৮২এর কম উৎকেন্দ্রিক নহে; কিন্তু ১৮৬৭ সালে আবিষ্কৃত টেম্পেল্ নামক ধূম্রকেতুর কক্ষার উৎকেন্দ্রত্ব সর্ব্বাপেক্ষা কম (০°৪০৫) হইলেও ০°৩৮২ অপেক্ষা অনেক বেশী। উৎকেন্দ্রত্বের আতিশয্য ও দীপ্তির মান্দ্যপ্রযুক্ত এই জ্যোতিষ্কগণের প্রতি ভভ্রমে পরিহৈলিক হইতে কিয়দ্দূরে অপসৃত হইলেই দৃষ্টিপথের বহির্ভূত বা অদর্শনীয় হয়।

ধূমকেতুর সংখ্যা।—সিদ্ধান্তশাস্ত্রে ধূমকেতুর কথা কিছু দেখি না। ইহার সংখ্যা সম্বন্ধে কেহ বলেন, ১০১; কেহ বলেন ১০০০; নারদ বলেন, একমাত্র ধূমকেতু নানা সময়ে নানারূপ দেখায়।

শতমেকাধিকমেকে সহস্রমপরে বদন্তি কেতূনাং।
বহুরূপমেকমেব প্রাহ মুনির্নারদঃ কেতুম্॥—শব্দকল্পদ্রুমঃ।

ধূমকেতুর সংখ্যা কত, এই প্রশ্নের উত্তরে কেপ্লার বলিয়াছিলেন, "সমুদ্রে মাছ যত।" কথাও মিথ্যা নহে, ধূমকেতুর সংখ্যা নাই। খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ হইতে অদ্যাবধি ৯৬২ ধূমকেতু দৃষ্ট ও লিপিবদ্ধ হইয়াছে; ইহার মধ্যে ১১৮টির পুনরাগমন ও দর্শন হইয়াছিল বলিয়া অভিজ্ঞাত; বাকি ৮৫৩টিকে একবার-মাত্র দেখা গিয়াছে, সুতরাং সেগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন কেতু বলিয়া ডাকা হয়। যে গুলির কক্ষা গণিত হইয়াছে, তাহাদিগের সংখ্যা ৩৯২। ১৬০০ অব্দ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ দূরবীক্ষণের সৃষ্টির পূর্ব্বে, যে সকল ধূমকেতু পর্য্যবেক্ষিত হইয়াছিল, সেগুলি অবশ্যই বড় বড়; তৎকালে লোকে শুধু চক্ষে দেখিতেন, ছোট ছোট ধূমকেতু দেখিতে পাইতেন না। কিন্তু দৌরবীক্ষণিক অর্থাৎ ছোট ছোট ধূমকেতুর সংখ্যাই অধিক। ঊনবিংশ শতাব্দে অর্থাৎ ১৮০১ হইতে ১৮৮৫ পর্য্যন্ত যে ২৭০ ধূমকেতু দেখা গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ২৫টির বেশী শুধু চক্ষে দেখিবার উপযুক্ত নহে। গত ২০০০ বৎসরে যত ধূমকেতুর উদয়

হইয়াছিল, সে সমস্ত যদি দূরবীক্ষণ দিয়া দেখা যাইত, তবে তাহাদের সংখ্যা ৮০০০এর অধিক হইত। গ্রীষ্মকালে দিনমানের আধিক্যপ্রযুক্ত প্রায় শতকরা ১৪ কেতু দৃষ্টিগোচর হয় না; অতএব, এ হিসাবে আরও ১০০০ কেতু ধরিলে, মোট ৯০০০ হয়। আবার ধর, যে সকল ধূমকেতু পৃথিবীর নিকট, সে সবগুলিকে যে আমরা দূরবীক্ষণ দিয়া দেখি, এমন নহে; প্রতিনিশ নভোমণ্ডলের সর্ব্বত্র দূরবীক্ষণ দিয়া জ্যোতির্বিদেরা দেখিতেছেন, এমন নহে। বোধ হয়, উদিত ধূমকেতুর অর্দ্ধাধিকের খবরই লওয়া হয় না। মেঘাচ্ছন্ন রাত্রির কথা আর কি বলিব? অতএব এই দুই হাজার বৎসরে যে ২০০০০ ধূমকেতু আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। এ সংখ্যা কেবল আমাদের দর্শনোপযোগী কেতু সম্বন্ধে। গ্রহকক্ষাব্যবহিত স্থাননিচয়ে যে কত কোটি ধূমকেতু বিচরণ করিতেছে, তাহা কল্পনার অতীত।

১৮৭৫ অব্দ পর্য্যন্ত যে ৩২৯ ধূমধ্বজের গণনা করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে ৪৩টির কক্ষা বৃত্তাভাস, ১৯৪এর কক্ষা ক্ষেপনি, এবং ছয়টির কক্ষা হাইপারবোলা।

ইউরোপীয়েরা ত্রিবিধ প্রকারে ধূমকেতু সকলকে নির্ব্বাচন করেন। প্রথমতঃ, যে বৎসর ধূমকেতু প্রথম উদিত ও পর্য্যবেক্ষিত হয়, উহাকে সেই বৎসরের ধূমকেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; যেমন, ১৮১১র ধূমকেতু; কখন বা আবিষ্কর্ত্তার নামানুসারে অভিহিত হইয়া থাকে; যেমন, বিএলার ধূমকেতু; এবং কখন বা ধূমকেতুর গণক বা ইতিবৃত্তসংগ্রাহকের নামে পরিচিত হয়; যেমন, এঙ্কর ধূমকেতু।

ধূমকেতুর কক্ষার অবস্থান।—ধূমধ্বজগণের কক্ষার অবস্থান নানাপ্রকার। ক্রান্তিবৃত্তে উক্ত কক্ষার ০° হইতে ৯০° পরিমাণে অবনতি, এবং তাহাদিগের মধ্যে অনেকের গতি যেমন পূর্ব্বাভিমুখী, তেমনই আবার অনেকের গতি পশ্চিমাভিমুখী; সুতরাং বলিতে হইল যে, অবনতির পরিমাণ ০° হইতে ১৮০°। গ্রহগণ ক্রান্তিবৃত্তের অনতিদূর পর্য্যন্ত বিচরণ করে, কিন্তু কেতুগণ কখন ক্রান্তিবৃত্তে, কখন বা তদীয় কেন্দ্রকদম্বকে অবলোকিত হয়।

সাময়িক ধূমকেতুগণের ক্রান্তিবৃত্তে কক্ষার অবনতি অতি সামান্য। ইহাদিগের মধ্যে অনেকের কক্ষা ক্রান্তিবৃত্তে ৫০° অবনত; ইহাদিগের মধ্যে যে ১৩টির পুনরাগমন দেখা গিয়াছে, তাহাদিগের সকলেই পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে যায়, কেবল হেলীর কেতু উল্টা দিকে চলে। বৃত্তাভাস কক্ষে

এক্ষণে বিজ্ঞানপ্রভাবে এ অমূলক ভয় অনেক পরিমাণে নিরাকৃত হইয়াছে।

ধূমকেতু কি? রবিপরিতঃ ভ্রাম্যমান, নীহারবৎ পিণ্ডবিশেষকে ধূমকেতু বলে। ইহাদিগের ধূমকেতু নামটি সার্থক; কিন্তু সকল ধূমকেতুর কেতু বা পুচ্ছ থাকে না। ধূমকেতুর সমধিক উজ্জ্বল তারাবৎ স্থানটিকে গর্ভ বলে। ধূমকেতুগণ রবিপরিতঃ পরিভ্রমণ করে বটে, কিন্তু তাহাদিগের কক্ষার সহিত গ্রহকক্ষার বিলক্ষণ বিষমতা দৃষ্ট হয়। কেতুকক্ষা অত্যন্ত উৎকেন্দ্রিক, অর্থাৎ উহা অতীব দীর্ঘবর্ত্তুলের দীর্ঘছেদের মত; এমন কি, উহাকে অণ্ডাকার না বলিয়া সরল দীর্ঘ কৃশাঙ্গ পটোল বলা কর্ত্তব্য। সিরিস, পাল্লাস, জুনো প্রভৃতি খোদিষ্ট গ্রহগণেরও কক্ষা ০°৩৮২এর কম উৎকেন্দ্রিক নহে; কিন্তু ১৮৬৭ সালে আবিষ্কৃত টেম্পেল্ নামক ধূমকেতুর কক্ষার উৎকেন্দ্রত্ব সর্ব্বাপেক্ষা কম (০°৪০৫) হইলেও ০°৩৮২ অপেক্ষা অনেক বেশী। উৎকেন্দ্রত্বের আতিশয্য ও দীপ্তির মান্দ্যপ্রযুক্ত এই জ্যোতিষ্কগণের প্রতি ভভ্রমে পরিহৈলিক হইতে কিয়দ্দূরে অপসৃত হইলেই দৃষ্টিপথের বহির্ভূত বা অদর্শনীয় হয়।

ধূমকেতুর সংখ্যা।—সিদ্ধান্তশাস্ত্রে ধূমকেতুর কথা কিছু দেখি না। ইহার সংখ্যা সম্বন্ধে কেহ বলেন, ১০১; কেহ বলেন ১০০০; নারদ বলেন, একমাত্র ধূমকেতু নানা সময়ে নানারূপ দেখায়।

> শতমেকাধিকমেকে সহস্রমপরে বদন্তি কেতূনাং।
> বহুরূপমেকমেব প্রাহ মুনির্নারদঃ কেতুম্॥—শব্দকল্পদ্রুমঃ।

ধূমকেতুর সংখ্যা কত, এই প্রশ্নের উত্তরে কেপ্লার বলিয়াছিলেন, "সমুদ্রে মাছ যত।" কথাও মিথ্যা নহে, ধূমকেতুর সংখ্যা নাই। খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ হইতে অদ্যাবধি ৯৬২ ধূমকেতু দৃষ্ট ও লিপিবদ্ধ হইয়াছে; ইহার মধ্যে ১১৮টির পুনরাগমন ও দর্শন হইয়াছিল বলিয়া অভিজ্ঞাত; বাকি ৮৫৩টিকে একবার-মাত্র দেখা গিয়াছে, সুতরাং সেগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন কেতু বলিয়া ডাকা হয়। যে গুলির কক্ষা গণিত হইয়াছে, তাহাদিগের সংখ্যা ৩৯২। ১৬০০ অব্দ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ দূরবীক্ষণের সৃষ্টির পূর্ব্বে, যে সকল ধূমকেতু পর্য্যবেক্ষিত হইয়াছিল, সেগুলি অবশ্যই বড় বড়; তৎকালে লোকে শুধু চক্ষে দেখিতেন, ছোট ছোট ধূমকেতু দেখিতে পাইতেন না। কিন্তু দৌরবীক্ষণিক অর্থাৎ ছোট ছোট ধূমকেতুর সংখ্যাই অধিক। ঊনবিংশ শতাব্দে অর্থাৎ ১৮০১ হইতে ১৮৮৫ পর্য্যন্ত যে ২৭০ ধূমকেতু দেখা গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ২৫টির বেশী শুধু চক্ষে দেখিবার উপযুক্ত নহে। গত ২০০০ বৎসরে যত ধূমকেতুর উদয়

হইয়াছিল, সে সমস্ত যদি দূরবীক্ষণ দিয়া দেখা যাইত, তবে তাহাদের সংখ্যা ৮০০০এর অধিক হইত। গ্রীষ্মকালে দিনমানের আধিক্যপ্রযুক্ত প্রায় শতকরা ১৪ কেতু দৃষ্টিগোচর হয় না; অতএব, এ হিসাবে আরও ১০০০ কেতু ধরিলে, মোট ৯০০০ হয়। আবার ধর, যে সকল ধূমকেতু পৃথিবীর নিকট, সে সবগুলিকে যে আমরা দূরবীক্ষণ দিয়া দেখি, এমন নহে; প্রতিনিশ নভোমণ্ডলের সর্ব্বত্র দূরবীক্ষণ দিয়া জ্যোতির্বিদেরা দেখিতেছেন, এমন নহে। বোধ হয়, উদিত ধূমকেতুর অর্দ্ধাধিকের খবরই লওয়া হয় না। মেঘাচ্ছন্ন রাত্রির কথা আর কি বলিব? অতএব এই দুই হাজার বৎসরে যে ২০০০০ ধূমকেতু আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। এ সংখ্যা কেবল আমাদের দর্শনোপযোগী কেতু সম্বন্ধে। গ্রহকক্ষাব্যবহিত স্থাননিচয়ে যে কত কোটি ধূমকেতু বিচরণ করিতেছে, তাহা কল্পনার অতীত।

১৮৭৫ অব্দ পর্য্যন্ত যে ৩২৯ ধূমধ্বজের গণনা করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে ৪৩টির কক্ষা বৃত্তাভাস, ১৯৪এর কক্ষা ক্ষেপনি, এবং ছয়টির কক্ষা হাইপারবোলা।

ইউরোপীয়েরা ত্রিবিধ প্রকারে ধূমকেতু সকলকে নির্ব্বাচন করেন। প্রথমতঃ, যে বৎসর ধূমকেতু প্রথম উদিত ও পর্য্যবেক্ষিত হয়, উহাকে সেই বৎসরের ধূমকেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; যেমন, ১৮১১র ধূমকেতু; কখন বা আবিষ্কর্ত্তার নামানুসারে অভিহিত হইয়া থাকে; যেমন, বিএলার ধূমকেতু; এবং কখন বা ধূমকেতুর গণক বা ইতিবৃত্তসংগ্রাহকের নামে পরিচিত হয়; যেমন, এঙ্কর ধূমকেতু।

ধূমকেতুর কক্ষার অবস্থান।—ধূমধ্বজগণের কক্ষার অবস্থান নানাপ্রকার। ক্রান্তিবৃত্তে উক্ত কক্ষার ০° হইতে ৯০° পরিমাণে অবনতি, এবং তাহাদিগের মধ্যে অনেকের গতি যেমন পূর্ব্বাভিমুখী, তেমনই আবার অনেকের গতি পশ্চিমাভিমুখী; সুতরাং বলিতে হইল যে, অবনতির পরিমাণ ০° হইতে ১৮০°। গ্রহগণ ক্রান্তিবৃত্তের অনতিদূর পর্য্যন্ত বিচরণ করে, কিন্তু কেতুগণ কখন ক্রান্তিবৃত্তে, কখন বা তদীয় কেন্দ্রকদম্বকে অবলোকিত হয়।

সাময়িক ধূমকেতুগণের ক্রান্তিবৃত্তে কক্ষার অবনতি অতি সামান্য। ইহাদিগের মধ্যে অনেকের কক্ষা ক্রান্তিবৃত্তে ৫০° অবনত; ইহাদিগের মধ্যে যে ১৩টির পুনরাগমন দেখা গিয়াছে, তাহাদিগের সকলেই পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে যায়, কেবল হেলীর কেতু উল্টা দিকে চলে। বৃত্তাভাস কক্ষে

CORRECTION

ভ্রমিত ২০টি পরিচিত ধূমধ্বজের মধ্যে ১৪টির পূর্ব্বা গতি, আর ৬টির পশ্চিমা বা বক্রা গতি।

ধূমকেতু কত দিন পর্য্যন্ত দেখা যায়।—কোন কোন কেতু কতিপয় নিশি, এবং কোনও কোনও কেতু বৎসরাধিক কাল পর্য্যন্ত আমাদের প্রত্যক্ষীভূত থাকে; সাধারণতঃ, ২।৩ মাসের অধিক দেখা যায় না। অধিকাংশ কেতুকে ৩, ৪, ৫, ৬, সপ্তাহ পর্য্যন্ত দেখা যায়। ১৮২৫ অব্দে পনসের আবিষ্কৃত, এবং ১৮৬১র তেব্বত্ত আবিষ্কৃত, এই দুইটি ধূমকেতু বৎসরাবধি আমাদের দৃষ্টিগোচর ছিল। ১৮১১তে ফ্লগরগেসের আবিষ্কৃত কেতু ১৭ মাস পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছিল। ধূমকেতুগণ কত দিন দৃষ্টিগোচর থাকিবে, তাহার পরিমাণ উহাদিগের আন্তরিক উজ্জ্বলতার ও রবিপৃথ্বী সম্বন্ধে তাহাদিগের অবস্থানের উপর নির্ভর করে। যে সকল ধূমকেতু দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর ছিল, তাহাদিগের মধ্যে এই কয়েকটি প্রধান।

১৮১১	অব্দের	(১)	১৭ মাস	১৮৪৭	অব্দের	(৪)	৯½ মাস
১৮২৫		(৪)	১২ „	১৮৫৮	„	(৬)	৯ „
১৮৬১	„	(২)	১২ „	১৮৪৪	„	(২)	৮ „
১৮৩৫	„	(৩)	৯½ „	১৮৪৭	„	(২)	৮ „

গর্ভাবরণ, ভর্গ, পুচ্ছ ইত্যাদি।—অতিভাস্বর ধূমকেতুগণের ন্যূনাধিক ঘনীভূত নীহারবৎ পদার্থপিণ্ডে বিরচিত গোলাকার অঙ্গকে তদীয় শীর্ষ বলে। এই শীর্ষপ্রদেশ হইতে যে ধ্বজাকার সুতরল নীহারিকাবৎ পদার্থ নিঃসৃত হয়, তাহাকে পুচ্ছ বলে। এই পুচ্ছ রবির বিপরীত দিকে লম্বিত। শীর্ষদেশে মধ্যে মধ্যে তারা বা গ্রহবৎ উজ্জ্বল বিন্দু দৃষ্ট হয়, উহাকে ধূমকেতুর গর্ভ বলে। শীর্ষের মধ্যস্থল প্রায়ই ঘনীভূত নীহারবৎ পদার্থ ভিন্ন কিছুই নহে; সুতরাং তাহা দূরবীক্ষণে সতত অপরিচ্ছিন্ন আকারে লক্ষিত হয়। গর্ভাবরণের ব্যাস প্রায় লক্ষ মাইলের কম নহে, এবং কদাচ ২ লক্ষ মাইলের বেশী হইবে না। ১৮১১র কেতু গর্ভাবরণের ব্যাস ১০ কোটি মাইলের অধিক। গর্ভ ঠিক শীর্ষের মাঝারে নহে, রবির দিকে একটু বেশী সরিয়া যায়।

গর্ভের পরিমাণ।—কতিপয় স্থলে গর্ভের ব্যাস ৫০০০ মাইল পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছিল; কিন্তু প্রায়ই ৫০০ মাইলের অধিক দেখা যায় না। ধূমকেতুদিগের মধ্যে অধিকাংশেরই উজ্জ্বল গর্ভ নাই।

যে যে স্থলে গর্ভের ব্যাসকে ৫০০০ মাইল ধরা গিয়াছিল, সেই সেই স্থলে

বোধ হয় শুদ্ধ সসারপদার্থবৎ গোলাকার স্থানটির মাপ হয় নাই; অত্যন্ত সান্দ্রীভূত নীহারিকাবৎ পদার্থ পর্য্যন্ত ধরা হইয়াছিল। ১৮৫৮ অব্দে দোনাতির কেতুর গর্ভের ব্যাস ১৯ জুলাই তারিখে ৫৬০০ মাইল, ক্রমে কমিয়া কমিয়া ২৩ নবেম্বরে ১২৮০ মাইল হইয়া পড়িল; ৫ই অক্টোবরে ৪০০ মাইল, ৬ই ৮০০, ৮ই ১১২০, এবং আবার ১০ তারিখে কমিয়া ৬৩০ মাইল হইল। অনেক ধূমকেতুর গর্ভ সসারপদার্থবৎ দেখায়, কিন্তু তদীয় পার্শ্বস্থ নীহারিকাবত্তা পরিত্যক্ত হইলে মূল গর্ভ অতি ক্ষুদ্র দেখাইবার সম্ভাবনা।

বিশাল ভর্গাবরণের উদাহরণ।

১৮১১র	(১)	ব্যাস	১১,২৫০০০ মাইল
হেলের ধূমকেতু ১৮৩৫			৩,৩৭০০০ „
এঙ্কর ধূমকেতু ১৮২৮			৩,১২০৬০ „

ক্ষুদ্র আবরণের উদাহরণ।

১৮৪৭এর	(৫)	১৮০০০ মাইল
১৮৪৭এর	(১)	২৫৫০০ „
১৮৪৯এর	(২)	৫১০০০ „

বৃহদ্ভর্গের উদাহরণস্থল।

১৮৪৫এর ধূমকেতুর	(৩)	গর্ভের ব্যাস	৮০০০ মাইল
১৮৫৮এর দোনাতির			৫৬০০ „
১৮৫১র			৫৩০০ „
১৮২৫এর	(৪)		৫১০০ „

ক্ষুদ্রভর্গের উদাহরণস্থল।

১৭৯৮এর	(১)	২৮ মাইল
১৮০৬এর		৩০ „
১৭৯৮এর	(২)	১২৫ „
১৮১১র	(১)	৪২৮ „

ধূমকেতুর আকারের পরিবর্ত্তন।—যত দিন পর্য্যন্ত ধূমকেতু দেখা যায়, তত দিনের মধ্যে উহার নীহারবৎ অঙ্গের বারংবার পরিবর্ত্তন হয়। ধূমকেতুর প্রথম উদয়কালের ছবির সহিত উহার মধ্যমাবস্থার ছবির বিস্তর বিষমতা দৃষ্ট হয়। যদি এক দিন ধূমকেতু দেখিয়া দুই তিন সপ্তাহ আর না দেখ, তবে তখন এ ধূমকেতু সে ধূমকেতু কি না, তাহা ঠাহরান ভার। অনেক ধূমকেতু যত

রবির সন্নিকৃষ্ট হয়, ততই খর্ব্ব হইতে থাকে; আর যতই রবি হইতে বিপ্রকৃষ্ট হয়, ততই দীর্ঘ হইতে থাকে। এঙ্কর ধূমকেতুর অনেকবার এই অবস্থা ঘটিয়াছিল। ধূমকেতুর এইরূপ আকারপরিবর্ত্তনের কারণ, বোধ হয়, তাপের ন্যূনাধিক্য। ধূমকেতু যতই রবিমণ্ডলের সমীপবর্ত্তী হইতে থাকে, ততই উহার নীহারিকাবৎ আবরণ অত্যুৎত্তাপে স্বচ্ছ অদৃষ্টগোচর দ্রব পদার্থ হইয়া পড়ে; সূর্য্যমণ্ডল হইতে যতই অবসৃত হইতে থাকে, ততই তাপের অপচিতিনিবন্ধন বাষ্পরাশি সান্দ্রীভূত হইয়া অভ্রবৎ দৃশ্য বস্তু হয়। অতএব, ধূমকেতুর দৃশ্যমান পিণ্ডের বৃদ্ধি ঘটিলেও, উহার প্রকৃত পিণ্ডের হ্রাস ঘটে।

গর্ভাবরণে নীহারবত্তার পরিবর্ত্তন।—যখন সুপ্রভ পুচ্ছ এবং সমুজ্জ্বল গর্ভবিশিষ্ট ধূমকেতু সকল রবিমণ্ডলের সন্নিকৃষ্ট হয়, তখন উহাদের গর্ভাবরণের নীহারবত্ত্বের চমৎকার পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। তখন গর্ভ ক্রমশঃ অধিকতর উজ্জ্বল হইতে থাকে, এবং গর্ভ হইতে প্রদীপ্তপদার্থময় ধারা সূর্য্যাভিমুখে ক্রমাগত উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকে। এইরূপ সপ্রভ পদার্থোৎসর্গ প্রায় অবিরামে বহু সপ্তাহ ব্যাপিয়া চলিতে থকে। এই তেজোময় স্রোতের আকারে ও দিকে এত বিসদৃশ ও সুব্যক্ত পরিবর্ত্তন ঘটে যে, অদ্য রাত্রিতে যেমন ধূমকেতুটি দেখিলাম, কল্য তেমনটি ছিল না, কিম্বা আগামী কল্য তেমনটি থাকিবে না। এই দীপ্তিপ্লব গর্ভের যে স্থান হইতে বিনির্গত হয়, সেই স্থানে অত্যুজ্জ্বল দেখায়; ক্রমে যত নীহারবৎ কোষোপান্তে বিস্তৃত হইতে থাকে, তত বিকীর্ণ হইয়া পড়ে, এবং যেন পদার্থবিশেষের দ্বারা প্রতিহত হইয়া বক্রাকারে প্রত্যাবৃত্ত হয়। এই আলোকধারাসমূহ সমবেত হইয়া সমুজ্জ্বল ক্ষেপণীবৎ কোষের বহিরঙ্গরূপে পরিণত হয়, এবং গর্ভ হইতে যতই অপসৃত হইতে থাকে, ততই সমভাবে কলেবরের বৃদ্ধি লাভ করে। কতিপয়দিনান্তে এই সপ্রভ কোষের অন্তর্ভাগে কিয়ৎ শ্যামল স্থানের ব্যবধানে পূর্ব্বোক্ত কোষসদৃশ দ্বিতীয় কোষের আবির্ভাব হয়। এই দ্বিতীয় কোষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, পুনরায় কতিপয়দিনান্তে তৃতীয় কোষ সমুৎপন্ন হয়, এবং এইরূপে বহু কোষের সৃষ্টি হইতে থাকে। দোনাতির ধূমকেতুর এইরূপ উপর্য্যুপরি সাতটি আবরণ দৃষ্ট হইয়াছিল। প্রত্যেক দুই আবরণের মধ্যে অপেক্ষাকৃত শ্যাম মেখলা ব্যবহিত থাকে।

এই কোষগুলি পার্থিব বাষ্পবৎ পদার্থ নহে; কারণ, উহা বাষ্পবৎ পদার্থ হইলে তদ্দ্বারা আলোকের বিবর্ত্তন দৃষ্ট হইত। বোধ হয়, এগুলি কোন প্রতিঘাত। বলবিশেষ দ্বারা গর্ভ হইতে সূর্য্যাভিমুখে বিদ্রুত হয়, যেমন বৈদ্যুতিক-অবস্থাপন্ন কোনও পরিচালক হইতে বৈদ্যুতিক প্রতিঘাত কর্ত্তৃক লঘিষ্ঠ কণা সকল অপাকৃত হয়। আর প্রতিঘাতীবলের সাময়িক বিরাম বা হ্রাসপ্রযুক্ত উপর্য্যুপরি কোষব্যবহিত শ্যামপট্টিকার উৎপত্তি ঘটে।

পুচ্ছ বা কেতু।—নীহারবৎ গর্ভকোষ পরিবর্দ্ধিত হইয়া ধূমকেতুর কেতু বা পুচ্ছে পরিণত হয়। গর্ভের সূর্য্যাভিমুখ অঙ্গ হইতে এক একটি পদার্থকণা বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া ক্রমশঃ বক্রভাবে ফিরিতে থাকে; যাবৎ উহার গতি সূর্য্যের বিপরীতদিগভিমুখী না হয়। আবরণের বৈপুল্য ও ঔজ্জ্বল্য অনুসারে অনুগামী পদার্থকণাসমূহের সংশ্লেষণ হইতে থাকে। পুচ্ছ নিরবচ্ছিন্ন কোষনিঃসৃত পদার্থে বিনির্ম্মিত; এবং ধ্বজ যেমন ধ্বজদণ্ডের প্রতীপগামী, ধূমকেতুর কেতু তেমনই সূর্য্যমণ্ডলসমুদ্ভূত তেজস্বী বলবিশেষ দ্বারা প্রতিহত হইয়া সূর্য্যের বিপরীত দিকে ঘুরিয়া পড়ে। গর্ভের যে অঙ্গ সূর্য্যাভিমুখ, সে অঙ্গে সপ্রভ ধারার লক্ষণ লক্ষিত হয় না। এই কারণবশতঃ পুচ্ছের মধ্যভাগস্থিত শ্যাম ডোরা দ্বারা পুচ্ছটি লম্বালম্বিভাবে স্পষ্ট দ্বিখণ্ডে বিভক্ত হয়। পূর্ব্বকালে অনেকে মনে করিতেন যে, ধূমকেতুর মস্তকের ছায়া উক্ত শ্যাম ডোরার মূল; কিন্তু পুচ্ছ বক্রভাবে বিবর্ত্তিত হইলে শ্যাম ডোরার অস্তিত্ব যায় না। বোধ হয়, পুচ্ছটি শূন্যগর্ভ আবরণ; আবরণের পার্শ্ব অবলোকন করিলে দৃক্সূত্রকে সমধিক নীহারবৎ কণারাশি ভেদ করিতে হয়, কিন্তু মধ্যরেখানুসারে দৃষ্টিক্ষেপ করিলে অপেক্ষাকৃত অল্প নীহারিকা অতিক্রম করিতে হয়; তজ্জন্যই মধ্যরেখা অপেক্ষা পার্শ্ব রেখা উজ্জ্বলতর দেখায়।

পুচ্ছোদ্ভব।—উদয়কালে ধূমকেতুর পুচ্ছ প্রায় থাকে না, যদি থাকে ত সে অতি খর্ব্ব; কিন্তু ক্রমশঃ নীহারবৎ আবরণ বিরচিত হইতে থাকে; অচিরে পুচ্ছ দৃষ্ট হয়, এবং ধূমকেতু যত সূর্যসামীপ্য প্রাপ্ত হইতে থাকে, পুচ্ছ তত উজ্জ্বল ও দীর্ঘ হইতে থাকে। ধূমকেতু যখন সূর্য্যসান্নিধ্যের পরাকাষ্ঠা লাভ করে, প্রায় তখনই অতিবেগে পুচ্ছ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ১৮৫৮ অব্দে দোনাতির ধূমকেতুর পুচ্ছ প্রতিদিন দুই লক্ষ মাইলের হিসাবে বাড়িত। ১৮১১ অব্দের ধূমকেতুর পুচ্ছ রোজ নয় কোটি মাইল বাড়িত। ১৮৪৩এর ধূমকেতু পরিহৈলিক অতিক্রান্ত হইয়া অহরহ সাড়ে তিন কোটি করিয়া বাড়িত।

পুচ্ছের পরিমাণ।—ধূমকেতু সকলের পুচ্ছ প্রায় অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে।

১৮৪৩এর ধূমকেতুর পুচ্ছ ১৯৮০০০০০০ মাইল লম্বা হইয়াছিল। ১৮১১র কেতুর পরিমাণ দশ কোটি নব্বই লক্ষ মাইল, এবং এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ মাইল চওড়া; আর চারটি ধূমকেতুর পুচ্ছ পাঁচ কোটি মাইল পর্য্যন্ত হইয়াছিল। পুচ্ছের দৃশ্যমান দৈর্ঘ্য কেবল বাস্তব দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে না, পুচ্ছের অক্ষের দিক এবং পৃথিবী হইতে দূরত্বের উপর নির্ভর করে। লেখা পড়ার ভিতরে এমন ছয়টি ধূমকেতু আছে, যাহাদের পুচ্ছের (পৃথিবী হইতে দেখিলে) সম্মুখস্থ কোণ ৯০এর অধিক, অর্থাৎ তাহাদের দৈর্ঘ্য ক্ষিতিজ হইতে থ স্বস্তিক পর্য্যন্ত; এবং আর দ্বাদশটির পুচ্ছ এত লম্বা যে, পুচ্ছের সম্মুখস্থ কোণ ৪৫০ এর অধিক।

অনুহৈলিক বিন্দু অতিক্রম করিবার কতিপয় দিবস পরেই কেতুর দৈর্ঘ্যের এবং ভাস্বরত্বের পরমসীমা লাভ হয়। ধূমকেতু রবি হইতে যত বিপ্রকৃষ্ট হইতে থাকে, ততই পুচ্ছ হীনজ্যোতিঃ হইতে থাকে, অবশেষে শূন্য-সাগরে অপাস্ত হইয়া যায়।

পুচ্ছের অক্ষের অবস্থান।—পুচ্ছের অক্ষ গছ সরল রেখা নহে, এবং গর্ভের নিকট ভিন্ন ইহার অন্য কোন স্থান রবির ঠিক প্রতীপ নহে। পুচ্ছের অক্ষ চলকর্ণ গ-স-এ সতত অবনত। এই অবনতি ১০° বা ২০°, এবং কখন কখন তদধিকও ঘটিয়া থাকে। ধূমকেতুর গম্যমান নভোভাগ হইতে তদীয় পুচ্ছ সতত অবনত হইয়া থাকে। ধূমকেতুর শিরঃপ্রদেশ হইতে বিনির্গত সপ্রভ পদার্থকণা যদি সৌরমণ্ডলসমুদ্ভূত বলবিশেষ দ্বারা প্রতিহত হইয়া পুচ্ছান্তে প্রেরিত হইত, তাহা হইলে পুচ্ছাক্ষ ঠিক রবিমণ্ডলের প্রতীপ হইত। কিন্তু

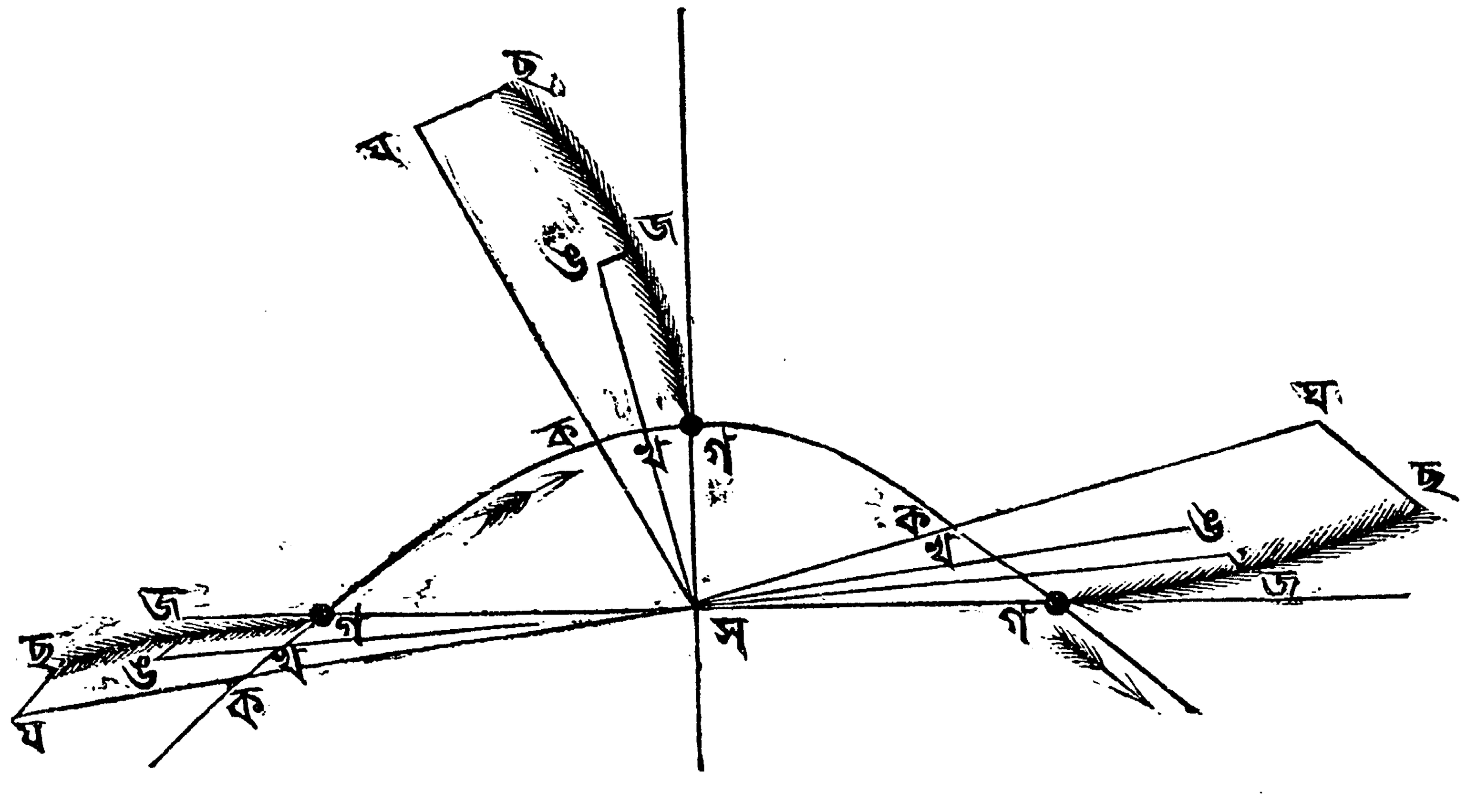

বস্তুতঃ পুচ্ছান্তে (ছএ) যে সকল পদার্থকণা থাকে, তাহা বহুদিন পূর্ব্বে প্রায় ২০ দিন (যখন ধূমকেতুর মাথা কএ ছিল) গর্ভ হইতে বিনির্গত হইয়াছিল; এবং সেগুলির নিশ্চেষ্টতানিবন্ধন গর্ভ হইতে বিচ্ছেদকালে কাক্ষ্য গতি যদ্রূপ ছিল, তদ্রূপ গতিই থাকিয়া যায়। পুচ্ছের মধ্যভাগ জ স্থানের কণাগুলি পূর্ব্বোক্ত কণাগুলির বিনিষ্ক্রমণের পর, সম্ভবতঃ ১ দিন পরে, বিনির্গত হইয়াছিল, অর্থাৎ যখন ধূমকেতু খ এ ছিল। এবং এই কণাগুলি কক্ষার সেই দিকেই চলে, যে দিকে কণাবিনিষ্ক্রমণের কালে গর্ভ চলিতেছিল।

পুচ্ছোৎপত্তির সম্ভাব্য পদ্ধতি।—ধূমকেতুর পুচ্ছোদ্ভবরূপ ব্যাপারের ব্যাখ্যা-স্থলে নিম্নলিখিত কারণচতুষ্টয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। সূর্য্য কর্ত্তৃক ধূমকেতু নানা প্রকারে বিধুরিত ও উদ্বেজিত হয়। প্রথমতঃ সূর্য্যাকর্ষণে অহোরাত্রমধ্যে ভূমণ্ডলে জলধিজলে যেমন দুইবার জোয়ার হয়, তেমনই নভোমণ্ডলে বায়ুসাগর দুইবার উচ্ছ্বসিত হয়; পরন্তু কেতুগগনের অধিকতর বিপুলতাপ্রযুক্ত এবং উহাদের অধিকতর সূর্য্যসান্নিধ্যবশতঃ জলোচ্ছ্বাস অপেক্ষা বায়ুর উচ্ছ্বাস প্রবলতর হয়। দ্বিতীয়তঃ, তপনের তাপজনিত গর্ভ তাপাক্রান্ত হয়, গ্যাস বিস্ফারিত হইতে থাকে, নব নব বাষ্পের উৎপত্তি হইতে থাকে, এবং ভৌতিক ও রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের কার্য্য হইতে থাকে; তৃতীয়তঃ, সূর্য্যমণ্ডলসমুদ্ভূত আকর্ষণ ও বিকর্ষণ এই অনিবার্য্য বলদ্বয়বিশিষ্ট বৈদ্যুতিকা ও অয়সাকর্ষণী শক্তি; চতুর্থতঃ, প্রতিঘাতী বলবিশেষ;—এ বলের তত্ত্ব অদ্যাপি অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে। এই প্রতিঘাতক বল দ্বারা পদার্থকণাবিশেষ গর্ভ হইতে নিঃসারিত হয়, এবং পুনর্ব্বার সূর্য্যমণ্ডলসঞ্জাত সমধিকতেজোসম্পন্ন প্রতিঘাতী বল দ্বারা উক্ত কণা সকল প্রণোদিত হয়।

পূর্ব্ব চিত্রে স সূর্য্য, আর ক খ গ ধূমকেতুর কক্ষাংশ। ধূমকেতুর গতি শরাভিমুখী। মনে কর, গর্ভ যখন ক এতে, একটি পদার্থকণা ধূমকেতুর মস্তক হইতে বিনির্গত হইয়া স ক ঘ এর দিকে প্রেরিত হইল। এই কণার এখনও অর্থাৎ বিচ্ছেদের পরও সেই গতি থাকিবে,—যে গতি পূর্ব্বে গর্ভের গতির সহিত সমতুল ছিল। এই গতির বশবর্ত্তী হইয়া পদার্থকণা যে কালমধ্যে ঘ হইতে ছএ আসিবে, সেই কালমধ্যে কেতুর মস্তক ক হইতে গ-এ যাইবে। যখন গর্ভ খএ আসিল, তখন মনে কর, একটি কণা বহির্গত হইয়া স খ ঙ দিকে গেল। এখন এই কণার সেই গতি থাকিবে যে গতি ইহার গর্ভ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্ব্বে ছিল। এবং মস্তক যখন খ হইতে গএ গেল, তখন কণাটি ঘ হইতে

ছএ গেল। এইরূপে গর্ভ যখন ক হইতে গএ আসিল, তখন সমস্ত কণাগুলি গ জ ছ রেখায় অবস্থিত হইল। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, রেখাটি চাপাকার এবং এটি পরিবর্দ্ধিত চলকর্ণ স গ এর গ বিন্দুতে স্পর্শ করিতেছে, এবং ধূমকেতুর গন্তব্য গগনপ্রদেশ হইতে সতত বক্রভাবে হেলিয়া আছে।

ধূমকেতু সম্বন্ধে ম র স বলের মত।—ধূমকেতুর সমস্ত শরীর যে সূর্য্যাকর্ষণের বশবর্ত্তী, তাহার সন্দেহ নাই। ধূমকেতু যখন বৃত্তাভাস বা ক্ষেপনী কক্ষায় পরিভ্রমণ করে, তখন রবি ও ধূমকেতু উভয়ে যে মহাকর্ষণের পরতন্ত্র হইয়া পরস্পরকে আকর্ষণ করে, তাহারও সন্দেহ নাই। ধূমকেতুর সর্ব্বাঙ্গ পক্ষে এইরূপ আকর্ষণ সত্য বটে, পরন্তু ইহাও অসত্য নহে যে, পুচ্ছ রবিকর্ত্তৃক বিপরীত দিকে প্রেরিত হয়। এরূপ কেন ঘটে, তাহা ঠিক করিয়া বলা সাধ্যাতীত।

পুচ্ছ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা সম্ভাব্য কি না, তাহা দেখুন। ধূমকেতুর উপকরণীভূত পদার্থসমূহের মধ্যে এক বা তদধিক পদার্থ দ্বারা তদীয় পুচ্ছ বিরচিত হয়। ধূমকেতু সূর্য্যসান্নিধ্য লাভ করিয়া আতপজনিত সমুত্তেজিত হয়; সুতরাং পুচ্ছোপকরণ দ্রবীভূত ও বাষ্পে পরিণত হয়। যদিও উপাদান সকল সসার অবস্থায় যথাযথরূপে আকৃষ্ট হয়, তথাপি অত্যন্ত বিরলীকৃত বাষ্পাকারে পরিণত হইলে, তাপ আকর্ষণকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিয়া বাষ্পকে সূর্য্যের বিপরীত দিকে নিরাকৃত করিতে থাকে। অতএব অনুভূত হইতেছে যে, ধূমকেতু যাবৎ সূর্য্যসমীপে থাকে, তাবৎ নূতন নূতন উপাদান অনবরত বাষ্প বা ধূমাকারে পরিণত ও প্রদ্রাবিত হইয়া পুচ্ছ বিরচন করিতে থাকে। ইহার উদাহরণস্থল লোকোমোটিব এঞ্জিনের ধুঁয়া। সূর্য্যের বিপরীত দিকে পুচ্ছ থাকিবার এই তো কারণ বলিয়া বোধ হয়; নচেৎ, একই পুচ্ছ প্রথমাবধি রবিপরিত অতি প্রচণ্ডবেগে মনোজবের ন্যায় ভ্রমিত হইতে পারে, এমন বোধ হয় না।

ফ্লামেরিয়নের মত।—এ কাল পর্য্যন্ত যে সকল বৃহত্তম ধূমধ্বজ নরনেত্রে প্রতিভাত হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে ১৮৪৩র ধূমকেতুর পুচ্ছ সম্পূর্ণ সরল ও রবির ঠিক বিপরীতদিকস্থ। এই কেতু সূর্য্যমণ্ডলের অত্যন্ত সমীপস্থ হইয়াছিল; ইহার পুচ্ছের দৈর্ঘ্য কুড়ি কোটি মাইল। এই প্রকাণ্ড অত্যদ্ভুত ধূমকেতু যে জড়পদার্থময়, তাহা কদাচ স্বীকার করিতে পারা যায় না; কারণ, তাহা হইলে এই পুচ্ছের বেগ এত অধিক হইত যে, তাহা কল্পনার অতীত।

১৬৮০, ১৮৮০, ১৮৮২, ১৮৮৭র এবং অন্যান্য বৃহদাকার ধূমকেতুগণ অনুহৈলিকে উপস্থিত হইলেই উক্তরূপ ব্যাপার ঘটে। অতএব বুঝিতে হইল যে, বড় বড় ধূমকেতুর পুচ্ছে কোনরূপ জড়পদার্থ নাই। পুচ্ছ ধূমকেতুর সপ্রভ ছায়াবিশেষ একটু বাঁকা হইয়া ধূমকেতুর সঙ্গে সঙ্গে চলে; এই ছায়ার পথে মেঘ যেন অবিরত জন্মাইতেছে, এবং অবিরত বাষ্পীভূত হইয়া অন্তর্হিত হইতেছে। ইহা বৈদ্যুতিক বা তদ্বৎ কিরণচ্ছটা; অথচ ইহার দ্বারা অন্তরীক্ষ যে আলোকিত হয়, তাহাও বলা যায় না; কারণ, অন্তরীক্ষ ত সতত সূর্য্যালোকে আলোকিত থাকে, তথাপি ইহা নয়নগোচর হয় না। অতএব ধূমকেতু কর্ত্তৃক আকাশে এক অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটে,—ব্যোমী গতি। ব্যোমের অস্তিত্ব, ব্যোম না থাকিলে আলোকতরঙ্গের সঞ্চার হইত না। অতএব অগত্যা স্বীকার করিতে হইবে যে, অন্তরীক্ষ যৎপরোনাস্তি সুস্থিল দ্রব্যে পরিপূর্ণ। এই দ্রব্যের শ্লক্ষ্ণতা অপরিসীম হইলেও উহা অবস্তু বলা যায় না। অতএব অপরিমেয় পুচ্ছ সকলের অপরিমেয় বেগবতী গতি, এই আশঙ্কা দূর করিবার অভিপ্রায়ে, এবং সেগুলির সূর্য্যের বিপরীত দিকে থাকিবার কারণ ব্যাখ্যা করিবার অভিপ্রায়ে, এই বলাই আবশ্যক, এই বলাই পর্য্যাপ্ত যে, নভোমণ্ডলে ধূমকেতু পরকলাবিশেষের কার্য্য করে; পরন্তু ইহা হইতে সপ্রভ কিরণজাল ঠিক বিবর্ত্তিত হয় না বটে, তথাপি পার্থিব বায়ুমণ্ডলের সীমান্তে প্রাদুর্ভূতা উদীচী ঊষার অপেক্ষা তরলতর তাড়িততরঙ্গ উৎপন্ন করে। কলিকাতা হইতে লণ্ডনে তারে খবর দিলে তার দিয়া কোনও পদার্থ লণ্ডনে যায় না, বেগের গতি হয়। জলাশয়ে তরঙ্গেরই গতি দেখা যায়, জল যেখানকার, সেইখানেই থাকে। এই প্রকাণ্ড পুচ্ছ সকলে কোন দ্রব্যই নাই, সেগুলি আপনা-আপনি চলিতে পারে না। পুচ্ছ দ্বারা এইমাত্র ব্যঞ্জিত হইতেছে যে, সেগুলি কেবল কোনও অনির্ব্বচনীয় অস্থায়ী ব্যোমাবস্থা এবং রবিসম্মুখে ধূমকেতুর অবস্থান প্রযুক্ত প্রচালিত হয়।

ব্রিডিসিনের মত।—মস্কাউ বেধালয়ের অধ্যক্ষ ব্রিডিসিন পঁচিশ বৎসরের অধিক কাল ধূমধ্বজের পুচ্ছপরীক্ষায় ব্যাপৃত ছিলেন। যদিও তাঁহার পরিশ্রমের ফল দ্বারা পরিহৈলিকে আগত সুদীর্ঘ সরল পুচ্ছের গতির কারণ যথাযথরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, তথাপি এই গহন চরিত্র উপাহিত অঙ্গ সম্বন্ধে সে সকল তত্ত্বানুসন্ধান করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ কর্ত্তব্য। তিনি বহুবিধ ধূমকেতুর ইতিবৃত্ত ও চিত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ধূমকেতু সকলকে তিন শ্রেণীতে

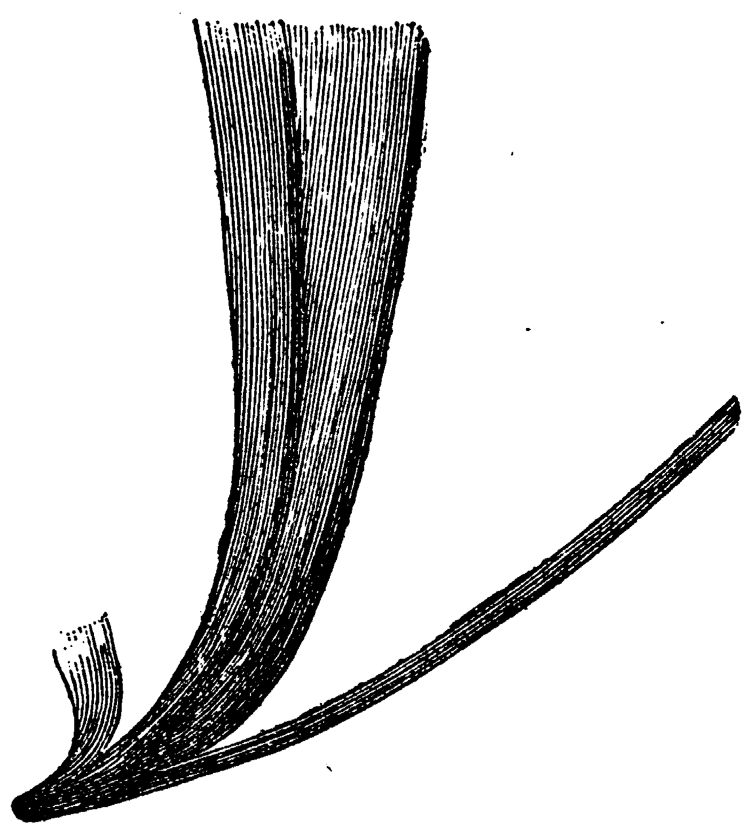

বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম শ্রেণীর কেতু সকল সরল, দীর্ঘ, অথচ অবিস্তৃত। দ্বিতীয় শ্রেণীর কেতু বিলাতী হাত-পাথার মত একীকৃত, বহুপুচ্ছ, চাপাকার এবং অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব। তৃতীয় শ্রেণীর পুচ্ছ আরও বাঁকা, আরও খাট। প্রথম শ্রেণীর পুচ্ছে হাইড্রজেনের অধিক্য; দ্বিতীয় শ্রেণীর পুচ্ছে হাইড্রকারবনের আধিক্য; এবং তৃতীয়ে ক্লোরিণ, লৌহ এবং অন্যান্য গুরুতর মৌলিক পদার্থের ভাগ বেশী দেখা যায়। প্রথম শ্রেণীর পুচ্ছ উৎপাদনে আকর্ষণ অপেক্ষা প্রতিঘাতী বল দ্বাদশ গুণে অধিক হওয়া আবশ্যক; দ্বিতীয় শ্রেণীর পুচ্ছের জন্য প্রতিঘাতী বল মাধ্যাকর্ষণের সমান হইলেই হয়; এবং তৃতীয় শ্রেণীর পুচ্ছনির্ম্মাণে মাধ্যাকর্ষণের পাদমাত্র বল হইলেই চলে। এই প্রতিঘাতী বলই কি তাড়িত? সূর্য্য তড়িতের অধিশ্রয়।

পুচ্ছ কি বস্তুতঃ অঙ্গারাত্মক দ্রব্যে বিরচিত? সকলেই জানেন, হীরক শুদ্ধ অঙ্গার, অঙ্গার ভিন্ন কিছুই নহে। এই বহুমূল্য বজ্রমণিকে অনায়াসে অঙ্গারে পরিণত করা যায়। রাসায়নিকের চক্ষে কহিনূরও অলৌকিক কৌশল দ্বারা বিন্যস্ত অঙ্গারকণামাত্র। তবে কি ধূমকেতু ইন্দ্রপত্নী শচী দেবীর রত্নকরঙ্ক? আদিতে নরলোকে ও অন্যান্য গ্রহমণ্ডলে অঙ্গারসংহতি উদ্ভিদের ও প্রাণিজীবনের বীজস্বরূপ ছিল, সেই অঙ্গারসংহতি ধূমকেতুর পুচ্ছে দৃষ্ট হইতেছে। বিষয়টি কি গুরুতর! পার্থিব জীবনের বীজ, পার্থিব জীবনের অঙ্কুর কোথা হইতে আসিল? এ বীজ কি ধূমকেতু বপন করিল?

বহুপুচ্ছ ধূমকেতু।—ধূমকেতুর পুচ্ছকে এড়ো দিকে ছেদ করিলে, ছেদমুখ বৃত্তাকার না হইয়া, বৃত্তাভাসাকার হয়। এই বৃত্তাভাস ন্যূনাধিক দীর্ঘ। দোনাতির ধূমকেতুর পুচ্ছছেদে যে বৃত্তাভাস, তাহার দীর্ঘ ব্যাস, হ্রস্ব ব্যাসের চতুর্গুণ। ১৭৪৪এর ধূমকেতুর উক্তরূপ পুচ্ছছেদে দীর্ঘ ব্যাস হ্রস্ব ব্যাস অপেক্ষা আরও দীর্ঘতর ছিল। এড়ো ছেদের দীর্ঘ ব্যাস প্রায় কেতুকক্ষার ক্ষেত্রগত। ফলতঃ, ধূমকেতুর পুচ্ছ (পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে) বিলাতি হাতপাখার ন্যায় বিস্তৃত। পুচ্ছের চওড়া কক্ষাক্ষেত্রের দিকে মাপিলে বেশী এবং এড়ো দিকে মাপিলে কম হয়।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে, সূর্য্যের প্রতিঘাতী বল পুচ্ছের উপকরণোপযোগী সকল কণার প্রতি সমান নহে। এই বল অত্যধিক হইলে, পুচ্ছ সরল ও রবির প্রতীপ হয়, এবং কম হইলে চলকর্ণের দিক হইতে বহু পশ্চাৎ পড়িয়া থাকে; অতএব ধূমকেতুর মস্তকগত কণাসকলের উপর সৌর বলের কার্য্য অসমরূপে সম্পন্ন হয়; সুতরাং বহুসংখ্যক বা অসংখ্য পুচ্ছ উৎপন্ন হয়, এবং সেই পুচ্ছগুলির অক্ষ যৎকথঞ্চিৎ ভিন্ন ভিন্ন ভাবাপন্ন হয়; কিন্তু সমস্ত অক্ষ ধূমকেতুর ক্ষেত্রগত। দোনাতির ধূমকেতুর পুচ্ছে যে ডোরা ডোরা দেখা যায়, তাহারও কারণ কেবল উক্ত প্রতিঘাতী বলের বিষমতা। ১৭৪৪এর বিচিত্র ধূমকেতুর ষট্‌পুচ্ছতার কারণও উক্ত বল।

দৌরবীক্ষণিক ধূমকেতু।—যে সকল ধূমধ্বজকে শুধু চক্ষে দেখা যায় না, সে সকলকেই দৌরবীক্ষণিক ধূমকেতু বলে। ধূমকেতুর মধ্যে অধিকাংশই পুচ্ছবিহীন এবং দৌরবীক্ষণিক ধূমকেতুর এই উপাঙ্গ প্রায় দৃষ্ট হয় না। পুচ্ছবিহীন ধূমকেতুগণ সূর্য্যসন্নিধানে উপনীত হইলে, তদীয় আকর্ষণপ্রযুক্ত দীর্ঘাকৃত হয়, এবং পরমোজ্জ্বল বিন্দুটি নীহারবৎ মণ্ডলের মধ্য হইতে অন্তর্হ্নত হয়।

এবম্ভূত ধূমকেতুগণের স্বল্পকায়তা এবং তন্নিবন্ধন আলোকের অনুজ্জ্বলতা, তাহাদিগের পুচ্ছের অনস্তিত্বের কারণ; পরন্তু পুচ্ছ যে মূলে জন্মে না, তাহা নহে; পুচ্ছ বস্তুতঃ হইলেও দেখিতে পাওয়া যায় না।

কোন কোন স্থলে বোধ হয়, ভূয়োভূয়ঃ সূর্য্যসান্নিধ্যবশতঃ ধূমকেতুর যে জাতীয় কণাসমূহে পুচ্ছ বিরচিত হয়, সে কণাসমূহ সম্পূর্ণরূপে অপচিত হইয়া পড়ে, এবং তখন সেগুলির আর পুচ্ছ না হইয়া আকার কেবল কথঞ্চিৎ দীর্ঘ হয়। পুচ্ছের উপাদানের ও রচনাপ্রণালীর কথায়, পুচ্ছ কেমন করিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, তাহা যেন বুঝা গিয়াছে; এক্ষণে দেখিবে যে, উক্তরূপ প্রণালী অনুসারে পুচ্ছ ক্রমশঃ লোপ পায়। কেতু যত সূর্য্য হইতে বিপ্রকৃষ্ট হয়, ততই তেজের হানি হইতে থাকে, এবং বাষ্পোদ্গমের বিরতি হয়। এখন প্রতিঘাতী বল বিষয়াভাবে নিশ্চেষ্ট থাকে; সুতরাং পুচ্ছ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। সাময়িক কেতুগণ অনুহৈলিকে পুনরাগমন করিলে আদ্যোপান্ত পূর্ব্ববৎ পরিবর্ত্তন সকল আনুপূর্ব্বিক ঘটিতে থাকে। এখন নব পুচ্ছ উৎপন্ন, কিন্তু পুনরায় যখন ধূমকেতু অগাধ নভোসাগরে নিমগ্ন হয়, তখন ঐ উপাঙ্গের আবার লয় হয়। এইরূপে বার বার অনুহৈলিকে আসিতে আসিতে ধূমকেতুর পুচ্ছকার পদার্থের ভাণ্ডার শূন্য হইয়া পড়ে, অবশেষে দীর্ঘপুচ্ছ ধূমকেতুকে হীনপুচ্ছ দেখিতে হয়।

ধূমকেতুর সামগ্রীপরিমাণ।—ধূমকেতুর সামগ্রীর পরিমাণ অত্যন্ত অল্প। অনেক ধূমকেতু কোন কোন গ্রহ ও উপগ্রহের নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল, কিন্তু তজ্জন্য গ্রহ ও উপগ্রহের গতি সম্বন্ধে কিছুমাত্র ব্যতিক্রম না জন্মিয়া প্রত্যুত কেতুগণের নিজের গতিই বিক্ষোভিত হইয়াছিল। উপগ্রহের সামগ্রীর সহিত ধূমকেতুর সামগ্রীর তুলনাস্থলে, ধূমকেতুর সামগ্রী কিছুই নয় বলিলে, অত্যুক্তি হয় না। ধূমকেতুর আয়তন প্রকাণ্ড, সুতরাং তদীয় নীহারপিণ্ডের সান্দ্রত্ব এত অল্প যে, তাহা পরিমাণের যোগ্যই নহে।

আবার ধূমকেতুর নীহারবত্তার স্বচ্ছতা অতীব বিস্ময়কর। ৫০ হাজার বা লক্ষ মাইল ব্যাসবিশিষ্ট ধূমধ্বজের ভিতর দিয়াও অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র সকল বারংবার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। অধিকন্তু কেতুর ব্যবধান সত্ত্বেও তারাগণের উজ্জ্বলতার কিছুমাত্র ক্ষতি টের পাওয়া যায় নাই।

ধূমকেতুর কি চন্দ্রকলার ন্যায় কলা আছে?—ধূমকেতুগণ স্বপ্রভ কি না, তাহা অদ্যাপি কেহ ঠিক করিয়া বলিতে পারেন নাই; তথাপি উহারা যে স্বপ্রভ, তাহারও সন্দেহ করিবার কোনও বিশিষ্ট কারণ দেখা যায় না। অত্যন্ত তেজস্বী দূরবীক্ষণের সহায়ে দেখা গিয়াছে যে, উহারা নিজের আলোকে আলোকিত হয়। কলার অস্তিত্ব যদি নির্ব্বিবাদে প্রতিষ্ঠিত হইত, তবে ধূমকেতু যে প্রতিফলিত আলোকে প্রতিভাত হয়, তাহার আর সংশয় থাকিত না। মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায় যে, কেতুকলা নয়নগোচর হইয়াছে; কিন্তু এ সকল কথা কত দূর বিশ্বাস করা যায়, তাহা দেখা কর্ত্তব্য। যদিও রাজসাম্বৎসর এয়্যারি প্রভৃতি কতিপয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ জ্যোতির্ব্বিদেরা কেতুমণ্ডলে কলার অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তথাপি বিশিষ্টকারণবশতঃ সাধারণের বিশ্বাস এই যে, ধূমকেতু স্বপ্রভ।

পক্ষান্তরে ইহাও বিবেচ্য যে, যদিও ধূমকেতুর আলোক সম্পূর্ণ প্রতিফলিত সূর্য্যালোক না হউক, তথাপি ঐ আলোক যে সূর্য্যের দূরত্বের উপর নির্ভর করে, তাহার সন্দেহ নাই। স্বপ্রভ বিম্ব দূরস্থ হউক বা নিকটস্থ হউক, উহার উজ্জ্বলতার তারতম্য দৃষ্ট হয় না,—ইহাতে প্রতিপ্রসব এই যে, জ্যোতিষ্কের চাপাত্মক ব্যাস অন্ততঃ নেত্রগ্রাহ্য হয়, অর্থাৎ দৃক্‌সূত্রদ্বয়ের অন্তর্গত বিম্বের পরিমাণ ধূলিকণার নিতান্ত ক্ষুদ্র না হয়। যথা, ইউরেনস্ হইতে সূর্য্য-বিম্ব দেখিলে অতি ক্ষুদ্র দেখায়, কিন্তু সূর্য্যকে আমরা যেমন প্রদীপ্ত দেখি, ইউরেনস্‌ও তেমনি প্রদীপ্ত দেখেন। অতএব ধূমকেতু যদি স্বপ্রভ হয়, তবে উহার বিম্বের ব্যাস যতক্ষণ পর্য্যন্ত নেত্রগ্রাহ্য থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহার উজ্জ্বলতা সমান থাকিবে। কিন্তু ঘটনাটি এরূপ নহে; ধূমকেতু যত দূরবর্ত্তী হইতে থাকে, ততই উহা মলিন হইতে থাকে; এবং পরিণামে শুদ্ধ আলোক অভাবে তিরোহিত দেখায়, অথচ তখন বিম্ব টের পাওয়া যায়।

ক্রমশঃ।

বহুবিবাহ।

বহুবিবাহ মনুষ্য সমাজে বহুপ্রচলিত। এত প্রচলিত, এবং আমরা এই প্রণালীর বিবাহের সহিত এত পরিচিত যে, ইহার যে আবার কোন প্রকার ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইতে পারে, ইহা সহজে মনেই হয় না। বাস্তবিক অধিকাংশ অসভ্য সমাজে এবং অনেক উন্নত ও সভ্য সমাজে এই বিবাহপদ্ধতি প্রচলিত আছে। যে সকল সভ্য সমাজে ধর্ম্মশাসনে বা অন্য কোন কারণে অধুনা ইহা রহিত হইয়াছে, সে সকল সমাজেও প্রাচীনকালে বহু-স্ত্রী-গ্রহণ-প্রথা প্রচলিত ছিল; মধ্যযুগে বিরল হইলেও কিয়ৎপরিমাণে ছিল; এখন যে নাই, তবু প্রকারান্তরে ও ভিন্ন মূর্ত্তিতে আছে।

অসভ্য সমাজে স্ত্রীগ্রহণের সহিত ধর্ম্ম বা নীতির কোন সম্বন্ধ না থাকায়, পরিণতবয়স্ক পুরুষেরা আপন আপন প্রবৃত্তি অনুসারে যত ইচ্ছা স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে ও করিয়া থাকে। অষ্ট্রেলিয়াতে পরিণতবয়স্ক পুরুষেরা সকল বয়সের স্ত্রীলোকেই এত অধিক পরিমাণে আত্মসাৎ করিয়া লয় যে, অপেক্ষাকৃত নবীনদিগের অধিকাংশকে অধিক বয়স পর্য্যন্ত বাধ্য হইয়া অবিবাহিত থাকিতে হয়। উত্তর আমেরিকার প্রায় সকল অসভ্য জাতিই বহুবিবাহ-পরায়ণ। রেড্‌স্কিন্ জাতির রীতি এই যে, কোন পরিবারের সর্ব্বজ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করিলেই তাহার অনুজাদিগকে স্ত্রী-রূপে পাইবার অধিকার জন্মে। ওমাহা, চেইনে, ওসাজে, কৃষ্ণপাদ, স্পোকান, চাওয়ানন, প্রভৃতি জাতির মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে। ইহাদের বহুস্ত্রীগ্রহণের অধিকার এইখানেই পর্য্যবসিত হয় না। পুরুষেরা ইচ্ছা করিলে প্রথমা ভার্য্যার ভগিনীগণ ব্যতীত অন্য স্ত্রীলোকও গ্রহণ করিতে পারে। কালিফর্নিয়া এবং গ্রীনলণ্ডের অধিবাসীরা ভগিনীগুলিকে লইয়াও ক্ষান্ত হয় না; সময়ে সময়ে তাহাদের মাতাকেও পত্নীরূপে গ্রহণ করে। চিপিওয়ে জাতির বিশ্বাস যে, বহু স্ত্রী গ্রহণ করিলে দেবতা প্রীত হইয়া থাকেন, কেন না, ইহা বহুসংখ্যক অপত্যলাভের উপায়।

আফ্রিকাখণ্ডের সমগ্র নিগ্রোজাতি বহুবিবাহপরায়ণ। এক পত্নী লইয়া যে জীবন কাটাইতে পারা যায়, ইহা তাহারা ধারণা করিতেই পারে না। চাকি এবং বাদাগ্রি প্রভৃতি স্থানের অধিবাসীদিগের নিকট ক্লাপারটন সাহেব যখন ইংরেজজাতির একমাত্রপত্নীগ্রহণের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, তখন কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেই উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিয়াছিল; ব্যাপারখানা তাহাদের চক্ষে এতই অদ্ভুত, এতই হাস্যজনক বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল!

আমেরিকা ও আফ্রিকার ন্যায় এসিয়া ও ইউরোপখণ্ডের অসভ্য ও কিঞ্চিদুন্নত সমাজেও বহুবিবাহের বহুপ্রচলন দেখা যায়। ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী জাতিসমূহের অধিকাংশই বহুবিবাহপরায়ণ, কিন্তু সকল জাতি নহে। ইহাদের মধ্যে কোন কোন জাতির মধ্যে একমাত্র স্ত্রী গ্রহণ করাই জাতীয় প্রথা। কোন জাতি বহুপত্যাত্মকবিবাহপরায়ণ। ভুটানের পার্ব্বত্য প্রদেশে একই জাতির মধ্যে বহুবিবাহ এবং বহুপত্যাত্মক বিবাহ, উভয়বিধ প্রণালীই প্রচলিত দেখা যায়। ইয়াকুতজাতীয় পুরুষদিগের মধ্যে যাহাদিগকে কার্য্যোপলক্ষে দূরবর্ত্তী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সর্ব্বদা যাতায়াত করিতে হয়, তাহাদের গন্তব্য প্রত্যেক স্থানে একটি করিয়া স্ত্রী থাকে। পালস্ এবং কেরোলাইন দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা বহুবিবাহপরায়ণ। প্রাচীন গলেরা এবং টিউটনেরা বহু স্ত্রী গ্রহণ করিত। প্রাচীন রুষিয়া ও স্কান্দিনেভিয়াতেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। তাসিতস্ লিখিয়াছেন যে, অন্যান্য অসভ্য জাতি অপেক্ষা জর্ম্মনেরা এক বিষয়ে উন্নত, তাহারা একটির অধিক বিবাহ করে না। কিন্তু তাঁহাকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, ইহাদের মধ্যেও নেতৃস্থানীয় প্রধান প্রধান পুরুষদিগের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। তাসিতসের বহুকাল পরবর্ত্তী মেরোভিঞ্জীয় নৃপতিগণ বহুবিবাহপরায়ণ ছিলেন, জানা যায়। রাজা ডেগোবার্টের তিন স্ত্রী ছিল। সম্রাট শার্লিমেনও দুই স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। নৃপতি থিয়েরির বহুবিবাহে দোষারোপ করার অপরাধে, সেণ্ট কলম্বানকে গল্ হইতে নির্ব্বাসিত হইতে হইয়াছিল।

সভ্যতাপ্রাপ্ত সমাজেও এই বিবাহপদ্ধতি বহুপ্রচলিত দেখা যায়। প্রাচীন মিসরে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল; কেবল ধর্ম্মযাজকেরা বহু স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিত না। প্রাচীন পেরুতে বিত্তহীন পুরুষদিগকে এক স্ত্রী লইয়াই সন্তুষ্ট হইতে হইত, কিন্তু ইঙ্কা এবং অভিজাতবর্গ যত ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারিতেন। এমন কি, শেষ ইঙ্কা আতাহুয়েল্পার তিন সহস্র পত্নী ও উপপত্নী

ছিল। মেক্সিকোর বিবাহপ্রথাও ঠিক এইরূপ ছিল। হোমরের সমসাময়িক গ্রীকেরা বহুবিবাহ করিত না বটে, কিন্তু অনেক সময়ে তাহারা উপপত্নী রাখিত, এবং এই সকল উপপত্নী বিবাহিতা পত্নীর সহিত এক গৃহেই বাস করিত। পরবর্ত্তী কালে এইরূপ উপপত্নীরক্ষা রাজবিধি দ্বারা অনুমোদিতও হইয়াছিল। রোমদিগের মধ্যেও অনেকটা এইরূপই দেখা যায়। তালমুদের বিধি অনুসারে এক জন পুরুষ চারিটি পর্য্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিত। তৎপূর্ব্বে হিব্রুজাতির স্ত্রীসংখ্যার কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা ছিল না। সলমনের সাত শত বিবাহিতা পত্নী এবং তিন শত উপপত্নীর কথা বাইবেলে লিখিত আছে। কোরাণের ব্যবস্থানুসারেও মুসলমানের পক্ষে চারিটির অধিক স্ত্রী বিবাহ করা নিষিদ্ধ, কিন্তু তাহারা আপন ইচ্ছানুসারে উপপত্নী গ্রহণ করিতে পারে এবং মুসলমানদিগের মধ্যে পত্নী এবং উপপত্নীর মধ্যে প্রভেদ বড় অধিক নহে। চীন দেশে এক পত্নী বিদ্যমানে অন্য পত্নী গ্রহণ করা রাজবিধি দ্বারা নিষিদ্ধ বটে; কিন্তু ইচ্ছানুসারে উপপত্নীগ্রহণসম্বন্ধে কোন বাধা নাই। এমন কি, সমাজ এবং রাজবিধি ইহার অনুমোদনই করে; কেন না, চৈনিক আইনানুসারে উপপত্নীর গর্ভজাত সন্তানদিগের স্বত্বাধিকার পত্নীর সন্তানদিগের সমান।

কোরিয়ার মান্দারিনেরা সামাজিক রীত্যনুসারে অনেকগুলি পত্নী এবং অনেকগুলি উপপত্নী স্ব স্ব অন্তঃপুরে রাখিতে বাধ্য। ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের স্ত্রীসংখ্যার কোন সীমানির্দ্দেশ আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখা যায় না।

খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রসাদে যে ইউরোপ হইতে বহুবিবাহের লোপ হইয়াছিল, ইহাও বলা যায় না। কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপরে দেওয়া গিয়াছে, আরও দেওয়া যাইতে পারে। হ্যালাম তাঁহার 'মধ্যযুগের' ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, চার্লস্ দি গ্রেটের একটি বিধি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ধর্ম্মযাজকেরা পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতেন। 'ত্রিংশদ্বর্ষব্যাপী যুদ্ধে' লোকসংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস হইয়া যাওয়ায়, ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধির অব্যবহিত পরেই জর্ম্মণীর কোন কোন প্রদেশে দ্বিপত্নীগ্রহণপ্রথা সমাজ ও রাজবিধির অনুমোদনক্রমে প্রকাশ্যভাবে অবলম্বিত হইয়াছিল। হর্বর্ট স্পেন্সর্ লিখিয়াছেন যে, ইউরোপে বহুবিবাহ বিধিনিষিদ্ধ হইলেও অতি অল্পকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, রাজাদিগের উপপত্নীরক্ষার পাকতঃ অনুমোদন করিয়া, সমাজ তাহা জীবিত রাখিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। সেণ্ট অগষ্টিন স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, তিনি বহুবিবাহ

নিষেধ করেন না। হেসেনের ফিলিপ্ দি ম্যাগনানিমস্‌কে স্বয়ং লূথর রাজনৈতিক কারণে দ্বিপত্নী গ্রহণ করিতে দিয়াছিলেন। শুদ্ধ তাহাই নহে। তিনি স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন যে, বহুপত্নী গ্রহণ সম্বন্ধে খৃষ্ট নিজে যখন কোন কথা বলেন নাই, তখন একাধিক পত্নী নিষেধ করিতে পারেন না। মর্ম্মনদিগের বিবাহপ্রণালীর পরিচয় নূতন করিয়া দিবার বোধ হয় প্রয়োজন নাই। ইহারা বহুবিবাহ ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়াই বিশ্বাস করে। ফরাশী সমাজতত্ত্ববিদ্ লেতুর্ণে লিখিয়াছেন যে, পৃথিবীতে যে সকল সমাজ সভ্যতাবিষয়ে শীর্ষস্থানীয়, সেই সকল সমাজের শীর্ষস্থানীয় শ্রেণীর অধিকাংশ লোক যৌনসম্মিলন বিষয়ে আজি পর্য্যন্ত বড়ই বৈচিত্র্যপ্রিয়। এই বেগবতী আকাঙ্ক্ষা সামাজিক বিধানানুসারে বৈধ ,উপায়ে পরিতৃপ্ত করিবার পথ নাই, অথচ পরিতৃপ্ত হইতে বাকিও থাকে না।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, অসভ্যেরা উচ্ছৃঙ্খল, নিষ্ঠুর, পশুপ্রকৃতি বলিয়াই দুর্ব্বল, নিরুপায় স্ত্রীলোকদিগের সুখ দুঃখ উপেক্ষা করিয়া, তাহাদের মর্ম্মে ব্যথা দিয়া, নিজের উদ্দাম ইন্দ্রিয়লালসা তৃপ্তির জন্য বহু স্ত্রী গ্রহণ করিয়া থাকে। এরূপ সিদ্ধান্ত অনেক স্থলেই. অমূলক। স্বামী অপরাতে উপগত হইলে সভ্যসমাজের স্ত্রীলোকদিগের প্রাণে যেরূপ আঘাত লাগে, অসভ্য সমাজের স্ত্রীদিগের সেরূপ কিছুই হয় না। যৌন-সাহচর্য্য বিষয়ে অসভ্যদিগের সংস্কার ইতর জীবের সংস্কার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নত মাত্র। তাহারা যেমন ক্ষুধা হইলে আহার করে, তৃষ্ণা হইলে জলপান করে, তেমনি ইন্দ্রিয়লালসা বেগবতী হইলে তাহা চরিতার্থ করে। ইহার সহিত মানমর্য্যাদা, সুখদুঃখের যে কোন সম্বন্ধ আছে বা থাকিতে পারে, ইহা তাহাদের সংস্কার-বহির্ভূত। তবে স্বামী অন্য স্ত্রীগ্রহণ করিলে যতটুকু নিজের অবহেলা বুঝায়, তাহার জন্য মনোবেদনা হইতে পারে বটে; কিন্তু যেখানে কোন কালেই আদর ছিল না, সেখানে অবহেলার স্থল কোথায়? অসভ্যদিগের মধ্যে স্ত্রী ক্রীতদাসী মাত্র—গৃহপালিত পশুর অবস্থায় এবং তাহার অবস্থায় প্রভেদ অতি অল্প। সংসারের শ্রমসাধ্য সকল কাজ তাহাকেই করিতে হয়, এবং তাহাতে কোন প্রকার ত্রুটি হইলে, পুরুষেরা গৃহপালিত পশুর প্রতি যে ব্যবহার করে, স্ত্রীর প্রতিও সেই ব্যবহার করে—গালি দেয়, পদাঘাত করে, চাবুক মারে, জ্বলন্ত কাষ্ঠ দিয়া ছেঁকা দেয়, অঙ্গচ্ছেদন করে, হত্যা করে। অবহেলার স্থল কোথায়? বরং স্বামী অন্য স্ত্রীগ্রহণ করিলে, ইহাদের লাভ বৈ ক্ষতি

হয় না। অসভ্য স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে, স্বামী কর্ত্তৃক অধিক স্ত্রীগ্রহণের অর্থ—অধিকতর শ্রমবিভাগ। সপত্নী যত অধিক হইবে, নিজের শ্রমের এবং স্বামীর অত্যাচারের ভাগ লইবার লোক তত অধিক হইবে। আর একটা কথা। অসভ্যদিগের মধ্যে পুরুষের এক স্ত্রী দারিদ্র্যের, সুতরাং হীনতা ও নীচতার, পরিচায়ক; বহু স্ত্রী ক্ষমতা বা সঙ্গতির পরিচায়ক। সে কারণেও অসভ্য স্ত্রীলোকেরা স্বামীর একাধিক স্ত্রীগ্রহণের পক্ষপাতী। এই সকল কারণে অসভ্য রমণীরা অনেক স্থলে নিজেই স্বামীকে অন্য স্ত্রীগ্রহণ করিতে উত্তেজিত করে। মধ্য আফ্রিকার সম্বন্ধে রীড্ সাহেব লিখিয়াছেন যে, "কোন পুরুষ বিবাহ করিলে, তাহার স্ত্রী যদি বিবেচনা করে যে, স্বামীর আরও স্ত্রীগ্রহণ করিবার মত সঙ্গতি আছে, তাহা হইলে পুনরায় বিবাহ করিবার জন্য দিন রাত তাহাকে অনুরোধ উপরোধ করিতে থাকে—অস্বীকার করিলে কৃপণ বলিয়া উপহাস করে।" ম্যাকালোলো জাতীয় স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে লিভিংষ্টোন সাহেব লিখিয়াছেন যে, "ইংলণ্ডে এক জন পুরুষের একের অধিক স্ত্রী হইতে পারে না শুনিয়া, ইহারা বলিয়াছিল যে, এমন দেশে তাহারা বাস করিতে চাহে না। ইংলণ্ডের স্ত্রীলোকেরা কেমন করিয়া এরূপ প্রথা ভালবাসে, ইহা তাহারা বুঝিতে পারে না। তাহাদের বিবেচনায়, যাহারই কিছু মান সম্ভ্রম আছে, তাহারই একাধিক পত্নী থাকা আবশ্যক।" কালিফর্ণিয়ার 'মোদক' জাতির সম্বন্ধে মিচ্যাম সাহেব বলেন যে, বহুবিবাহ প্রথার কোনরূপ পরিবর্ত্তনের স্ত্রীলোকেরাই বিশেষ বিরোধী; জুলুদিগের মধ্যে প্রথমা স্ত্রী, স্বামীর অন্য স্ত্রীগ্রহণের সংস্থান করিয়া দিবার জন্য নিজে প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করে। আর দৃষ্টান্ত বাহুল্যের বোধ হয় প্রয়োজন নাই।

অল্পশিক্ষিত ইউরোপীয়েরা, বিশেষতঃ মিশনরিরা, আমাদিগকে উপহাস করিবার জন্য ঘটা করিয়া বলিয়া থাকেন যে, যে সমাজে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে, সে সমাজ অসভ্য; ইউরোপ সভ্য দেশ, তাই ইউরোপের লোক এক পত্নীপরায়ণ। কথাটা আদৌ মিথ্যা। ইউরোপীয়েরা একের অধিক পত্নীগ্রহণ করিতে পারে না বটে, কিন্তু তাহারা একপত্নীপরায়ণ নহে। বহুবিবাহ নাই বটে, কিন্তু তাহার অনুকল্প যে বিলক্ষণই আছে, তাহা উপরি-উদ্ধৃত ফরাশী সমাজতত্ত্ববিদ্ লেতুর্ণোর কথাতেই বিলক্ষণ প্রমাণ হয়। পক্ষান্তরে, এমন অনেক অত্যন্ত অসভ্য জাতি দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা, ইউরোপীয়দিগের ন্যায়, একের অধিক স্ত্রীগ্রহণ করে না। হিরিয়ট সাহেব লিখিয়াছেন যে, উইয়ানডট্

জাতি একটিমাত্র স্ত্রী লইয়া থাকিতে বাধ্য। ইরকয় জাতির মধ্যে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ। কালিফর্ণিয়ার কিন্‌ক্লা এবং ইউরক্ জাতির মধ্যে এক পুরুষের একাধিক পত্নী কখন দেখা যায় নাই। কারক জাতির অধিনেতা পর্য্যন্ত একাধিক পত্নীগ্রহণ করিতে পারে না। আন্দামান্ দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদিগের সম্বন্ধে ম্যান্ সাহেব লিখিয়াছেন যে, "দ্বিবিবাহ, বহুবিবাহ, বহুপত্যাত্মক বিবাহ এবং স্ত্রীবর্জ্জন ইহাদের মধ্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।" পার্ব্বত্য ডায়াক জাতি একের অধিক স্ত্রী কখন গ্রহণ করে না। তাহাদের এক জন অধিনায়ক একবার এই নিয়ম ভঙ্গ করায়, তাহার প্রভাব ও প্রভুত্ব একেবারে লোপ হইয়া গিয়াছিল। এমন শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহার প্রয়োজন দেখা যায় না। এক পত্নীর অধিক বিবাহ করিতে না পাইলেই যে সভ্য হইতে হইবে, এবং একাধিক পত্নীগ্রহণের ব্যবস্থা থাকিলেই যে অসভ্য হইতে হইবে, ইহার কোন অর্থ নাই।

এক্ষণে দেখা যাউক, কি কি কারণে, কি প্রকার অবস্থাবশে বহুবিবাহ উৎপন্ন ও প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, কোন সমাজে পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীসংখ্যার অযথা আধিক্য হইলে, সমাজের মঙ্গলের জন্যই বহুবিবাহ প্রণালী অবলম্বনীয় হয়। কিন্তু কথা এই যে, কোন সমাজে, কোন জাতির মধ্যে স্ত্রী পুরুষের সংখ্যার এরূপ অযথা বৈষম্য ঘটে কি না, যাহাতে বহুবিবাহ প্রথা অবলম্বন না করিলে চলে না। ভিন্ন ভিন্ন জাতির স্ত্রী পুরুষের সংখ্যার যে সকল তালিকা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা হইতে এবং ভ্রমণকারীদিগের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে দেখা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে এরূপ বৈষম্য আছে—কোথাও পুরুষের সংখ্যার অযথা আধিক্য, কোথাও স্ত্রীসংখ্যার অযথা আধিক্য। পুরুষের সংখ্যাধিক্যের স্থল নির্দ্দেশ করা এ প্রবন্ধে নিষ্প্রয়োজন। স্ত্রী-সংখ্যার আধিক্য-স্থলের অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। লিসিয়ানস্কি বলেন, সিতকা দ্বীপসমূহে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অনেক অধিক। কালিফর্ণিয়ার শষ্টিক জাতির মধ্যেও এইরূপ। ১৮৫১ সালে ওরেগণের নেজ পার্‌সে জাতির লোকসংখ্যা গণনা করিয়া ডাক্তার ডার্ট দেখিয়াছিলেন যে, তাহাদের পুরুষের সংখ্যা ৬৯৮, এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১১৮২। কৃষ্ণপাদ, শিয়ান্ এবং পুঙ্কা জাতির মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষের দ্বিগুণ—স্থলবিশেষে ত্রিগুণ। ইউকাটানে স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষের দ্বিগুণ, এবং কোচারাম্বায় পাঁচ গুণ। অন্যান্য ভূখণ্ড অপেক্ষা আফ্রিকাতেই বহুবিবাহ অধিক প্রচলিত;

এবং এই আফ্রিকায় দেখা যায় যে, কেবল গলেগা প্রদেশ এবং এঙ্গোলা প্রদেশের কুইসামা জাতি ছাড়া আর সকল প্রদেশেই এবং সকল জাতির মধ্যেই স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষের অপেক্ষা অনেক অধিক।

অসভ্য সমাজে স্ত্রীসংখ্যার অযথা আধিক্যের প্রধান কারণ, পুরুষের অকালমৃত্যু এবং অপমৃত্যু। স্ত্রীলোকদিগকে বহু শ্রম করিতে হয় বটে, কিন্তু তাহাদের কর্ম্মস্থান প্রধানতঃ নিজের কুটীর এবং তৎসংলগ্ন শস্যক্ষেত্র। রন্ধন, সন্তানপালন, ভূমিকর্ষণ, বীজবপন, শস্যকর্ত্তন ও বহন, এই সকল তাহাদের করণীয় কার্য্য; এবং এ সকল কার্য্যে দুর্ঘটনা ও প্রাণহানির সম্ভাবনা নাই বলিলেই হয়। কিন্তু পুরুষদিগের জীবনপ্রণালী অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল; তাহাতে দুর্ঘটনা এবং মৃত্যু পদে পদে ঘটিতে পারে, এবং সচরাচর ঘটিয়াও থাকে। মৎস্য এবং অন্যান্য জলচর জীব ধরিবার জন্য তাহাদের অধিকাংশ সময় সমুদ্রে বা নদীবক্ষে অতিবাহিত হয়, শীতাতপ মাথা পাতিয়া সহ্য করিতে হয়, ঝড় বৃষ্টি মাথার উপর দিয়া যায়। ইহার ফল—কেহ রোগে মরে, অনেকে ডুবিয়া মরে। পশুশীকার উপলক্ষে হিংস্র জন্তুর কবলেও কেহ কেহ পতিত হয়। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মৃত্যু ঘটে যুদ্ধে। অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে দেখা যায় যে, নিকটবর্ত্তী অন্যান্য জাতির সহিত যুদ্ধ প্রতিনিয়ত লাগিয়াই আছে; এবং এই নিয়ত যুদ্ধে অনেক লোকের ক্ষয় হয়। আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদিগের সম্বন্ধে ক্যাট্‌লিন সাহেব লিখিয়াছেন যে, পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য জাতির সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় ইহাদের এত লোকক্ষয় হয় যে, ইহাদের পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা কোন জাতির মধ্যে দ্বিগুণ, কোন জাতির মধ্যে তিন গুণ। এলিস্ সাহেব তাঁহার 'মাদাগাস্কারের ইতিহাসে' লিখিয়াছেন যে, প্রতিনিয়ত যুদ্ধে ইহাদের এত লোকক্ষয় হয় যে, এই দ্বীপে পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীসংখ্যা কোথাও তিন গুণ, কোথাও বা পাঁচ গুণ।

স্ত্রীপুরুষের সংখ্যাবৈষম্য আরও নানা কারণে হয়। সে সকলের বিস্তৃত সমালোচনার এ স্থান নহে। মোটামুটি দুই চারিটার এখানে আমরা উল্লেখ করিতেছি। প্রথমতঃ, স্বভাবতই খানিকটা হয়। কন্যা এবং পুত্র সমান সংখ্যায় সর্ব্বত্র জন্মে না,—কোথাও কন্যাসন্তান, কোথাও পুত্রসন্তান, অধিক জন্মে। এই বৈষম্য অনেক স্থলে বিলক্ষণ গুরুতর। ব্রস সাহেব বলেন, মেসোপোটেমিয়া, আরমেনিয়া এবং সিরিয়ার অনেক অংশে যত পুত্র জন্মে, তাহার দ্বিগুণ কন্যা জন্মে। লাটিকিয়া এবং লেওডিসিয়া হইতে সিরিয়ার উপকূল হইয়া সিডন পর্য্যন্ত প্রদেশে জন্মকালে কন্যার সংখ্যা পুত্রসংখ্যার প্রায় তিন গুণ। দ্বিতীয়তঃ, জন্মকালে কন্যা ও পুত্রসংখ্যার তারতম্য অনেকটা পিতা মাতার সাংসারিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। সমাজতত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সমৃদ্ধ দেশে এবং সম্পন্ন পরিবারে কন্যা অধিক জন্মে; দরিদ্র দেশে এবং দরিদ্র পরিবারে পুত্র অধিক জন্মে। তৃতীয়তঃ, কেহ কেহ ইহাও বলেন যে, বহু কন্যা সন্তান জন্মিবার একটা কারণ, বহুবিবাহ; অর্থাৎ যাহারা

বহুবিবাহপরায়ণ, তাহাদের মধ্যে কন্যা সন্তান অধিক জন্মে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তাঁহারা বলেন যে, মর্ম্মনদিগের মধ্যে পুত্র অপেক্ষা কন্যা অনেক অধিক জন্মে। ইহা ছাড়া আরও দুই একটা দৃষ্টান্ত তাঁহারা দিয়া থাকেন। কিন্তু যে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখা যায়, তাহার উপর একটা তত্ত্ব সংস্থাপিত হইতে পারে না। ইহা আজিও একটা অনুমানমাত্র—আজিও বিজ্ঞানের পদবীতে উন্নত হয় নাই। সুতরাং এখানে ইহার উল্লেখমাত্র করিলাম।

এই সকল কারণে অনেক সমাজে, অনেক জাতির মধ্যে, স্ত্রীসংখ্যার অযথা আধিক্য হয়, এবং সেই জাতি, সেই সমাজের পক্ষে বহুবিবাহ প্রথা অবলম্বনীয় হইয়া উঠে। এতৎপ্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, অসভ্য সমাজে, স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামিলাভে বঞ্চিত হওয়ার অর্থ—মৃত্যু।

যৌনসম্মিলন বিষয়ে পুরুষের আগ্রহাধিক্য যে বহুবিবাহের একটা কারণ, ইহা অস্বীকার করা যায় না। প্রকৃতির উত্তেজনা স্ত্রী পুরুষ উভয়ের জন্যই আছে, কিন্তু স্ত্রীজাতির অপেক্ষা পুরুষ যে এ বিষয়ে অধিকতর ব্যগ্র, তাহাতে সন্দেহ নাই। পুরুষের এই আগ্রহাধিক্য প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন নিয়মে সিদ্ধ; কেন না, পুরুষের আগ্রহাধিক্য প্রজাবৃদ্ধির একটা উপায়। এখন, এক স্ত্রীর স্থলে স্বাভাবিক ঘটনাবশতঃই এই ব্যগ্রতা অনেক সময়ে দমন করা আবশ্যক হয়, অনেক দিন ধরিয়া লালসা-তৃপ্তি হইতে বিরত থাকিতে হয়। ঋতুকালের কথা নাই ধরিলাম; স্ত্রীর গর্ভাবস্থায় এবং প্রসবের কিছুকাল পর পর্য্যন্ত স্ত্রীসহবাসে বঞ্চিত থাকিতে হয়। এই নিবৃত্তি বিষয়ে সভ্য জাতির অপেক্ষা অসভ্য জাতির নিয়ম কঠোরতর। অনেক অসভ্য জাতির নিয়মানুসারে, সন্তান যে পর্য্যন্ত স্তন্যপান পরিত্যাগ না করে, সে পর্য্যন্ত স্ত্রীসহবাস নিষিদ্ধ; এবং অসভ্য জাতির সন্তানেরা তিন চারি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মাতৃস্তন্যের উপর নির্ভর করে। সন্তান যে পর্য্যন্ত বিনা সাহায্যে দৌড়াইতে না পারে, ততদিনের মধ্যে স্ত্রীসহবাস করিলে, সিয়েরা লিওন প্রদেশে তাহা গুরুতর অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হয়। ফিজি দ্বীপে কোন স্ত্রীলোকের এক সন্তান হওয়ার পর নিয়মিত তিন চারি বৎসরের পূর্ব্বে যদি আবার সন্তান হয়, তাহা হইলে তাহার আত্মীয় স্বজনেরা এই ঘটনাকে আপনাদের দারুণ অপমান বলিয়া বিবেচনা করে। এরূপ অবস্থায় উপায় কি? সুসভ্য মনুষ্যের আত্মসংযম অসভ্যে প্রত্যাশা করা যায় না। প্রকৃতির সন্তান, প্রকৃতির উত্তেজনায় অধীর হইয়া পড়ে। বিবাহিত স্ত্রী ব্যতীত অন্য স্ত্রীলোকে উপগত হওয়া অসভ্য সমাজে নিরাপদ নহে। তবে উপায়? বহুবিবাহ ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই।

এই প্রসঙ্গে আর একটা বিষয়ের উল্লেখ করিতে হয়। তাহা, ইন্দ্রিয়লালসাতৃপ্তিবিষয়ে পুরুষের নূতন-প্রিয়তা। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের সহিত এই প্রবৃত্তির কি সম্বন্ধ, তাহা বিচার করিবার এ স্থান নহে; কিন্তু ইহা সত্য যে, পুরুষ জাতি অনেকটা ভ্রমরপ্রকৃতি—পাঁচ ফুলে বিচরণ করিতে ভালবাসে। সুসভ্য মনুষ্য উদ্দাম কল্পনার প্রভাবে যে আপনার জন্য এই কৃত্রিম লালসার সৃষ্টি করে, তাহা নহে; অসভ্যদিগেরও এই প্রবৃত্তি বড় প্রবল। এঙ্গোলা প্রদেশের নিগ্রোরা মধ্যে মধ্যে পরস্পরের সহিত স্ত্রীবিনিময় করে। মেরোলা ডা সোরেণ্টো ইহার জন্য তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করায় তাহারা উত্তর করিয়াছিল,—"একই জিনিষ কি প্রত্যহ খাওয়া যায়?" এই প্রবৃত্তির উত্তেজনায় অসভ্যেরা বহুবিবাহ করে; সভ্য মানব বহুবিবাহ করে না বটে, কিন্তু প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতেও ছাড়ে না।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

বর্ষার আবাহন।

১

শ্যামানন্ত নীলাকাশ সজল জলদে ভরি,
আবরি' বসন শ্যাম ধরণী-শ্যামাঙ্গোপরি,
ধূসর অঞ্চল দিয়ে
চারু চন্দ্র লুকাইয়ে,
তারকা অলক-হার, প্রকৃতি-সীমন্ত-তলে,
এসেছ বরষা-বাণি! আজি তুমি ভূমণ্ডলে।

২

প্রেমময় জলধর শোভে কত রসে রসি,'
প্রেমময়ী সৌদামিনী হাসে তার পাশে বসি;
প্রেমে দর দর মন,
চুম্বে মুখ ঘনে ঘন,
নির্লজ্জ প্রেমিকে হেরি দামিনী লুকায় লাজে;
ঝাঁপিয়া রতন রুচি সুনীল বসন মাঝে।

৩

স্নানিতে নিদাঘতাপে বরিষা-নির্ঝরজলে,
প্রকৃতি নিবদ্ধ বেণী খুলিয়াছে বিশৃঙ্খলে,
জলদ চিকুরভারে
আনিতম্ব অন্ধকারে
আচরণ বিচুম্বিয়া পড়েছে কুন্তলরাশি;
এলোকেশী প্রকৃতির কি মনোমোহিনী হাসি!

৪

দেখ আজি কবিকুঞ্জ, এ বিনোদ কুঞ্জভূমি,
সাজাইলে কত রাগে, বরষা-রূপসী তুমি;
নির্ম্মল সলিলে মাজি'
নব তরুদল-রাজি,
মাজিয়া বিকচ তনু রূপবতী ব্রততীরে
ফুল রত্ন-অলঙ্কার পরাইলে ধীরে ধীরে।

৫

সৃজিয়া আরসিখানি ভরন্ত সরসী জলে,
সাজন্ত বদন বিধু, প্রকৃতি দেখিবে বলে,

নিকুঞ্জ সানন্দ-হিয়া,
রাখিয়াছে সাজাইয়া,
দেখিতেছে সে দর্পণে লতা-বধূ কুঞ্জেশ্বরী,
কত রম্যতর রুচি, নবনীরে স্নান করি!

৬

সজল অমৃতময় সুখদ প্রাবৃট কালে,
অবনী অম্বর ঢাকা অস্ফুট আলোকজালে;
অম্বরে অপ্সরা কত—
হেমদীপ শত শত,
তরল বিজলী দিয়ে, জ্বালিয়া রতনভাসে,
ঝলকে ঝলকে ক্ষণে নিবিড় তিমির নাশে।

৭

এমন বরিষা কালে কোথা মাগো বীণাপাণি?
এ বিনোদকুঞ্জে মম এস মা সারদা রাণি!
বৈকুণ্ঠের সরোবরে
নীলমণি থরে থরে
পদ্মরাগ মরকতে শোভিয়া সুখের ধাম,
ফুটিয়াছে হীরকের সোনার সরোজদাম;

৮

অধিষ্ঠিত তুমি সেই রতন-কমল-বনে;
ঝঙ্কারি বীণার তার অমৃতের বরিষণে;
ছাড়ি সে কমলবনে
আসিবে কি মনোরমে!
এ দরিদ্র কুঞ্জবনে,—এ পর্ণকুটীরে মম?
কুহকিনী আশা, মাগো তাই এই আকিঞ্চন!

৯

মৃদু মধু গরজনে গগনে জলদ তুলি,
বরষা তিমিরময়ী, দেখ মা নয়ন খুলি!
আঁধারিয়া চরাচরে
অবিশ্রামে বারি ঝরে;
এ হেন দুর্দ্দিনে কি মা আসিবে দয়ার্দ্র মনে?
দীনের অপূর্ব্ব সাধ পুরাইবে বিশ্বরমে!

১০

এস তবে এস দেবী!—গাহিব মা পুনরায়,
ছিন্ন বীণা বাঁধি সুরে তোমার ও রাঙা পায়;
পূজিব কুসুম-থরে,
ডাকি কৃতাঞ্জলিকরে,
ভারতি! করুণাময়ি! এস এ নিকুঞ্জে মম,
এ সুখ বরষাকালে করে কবি আবাহন।

শ্রীহরিশচন্দ্র নিয়োগী।

মুর্শিদাবাদ-কাহিনী। *

বঙ্গমাতা চিরদিন রত্নপ্রসবিনী বলিয়া প্রসিদ্ধা। আজ কাল তাঁহাকে রত্নপ্রসবিনী বলিতে অনেকের আপত্তি থাকিতে পারে, কিন্তু পুস্তকপ্রসবিনী বলিতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। জর্ম্মণীর কাগজ কলম খুব শস্তা; কলিকাতার মুদ্রাযন্ত্র, প্রতিযোগিতা ও অভাবের দায়ে, আরও শস্তা; তাই আমাদিগের মুদ্রাযন্ত্র হইতে কাব্য, উপন্যাস, নাটক, দিন দিন রাশি রাশি উদ্গীরিত হইতেছে। ইহাদের পৌনে ষোল আনা, অপাঠ্য, অশ্রাব্য, অস্পৃশ্য—উপন্যাসগুলি প্রেতোপন্যাস, নাটকগুলি কেবল উন্মাদালয়ে অভিনীত হইবার যোগ্য, আর কাব্যগুলি যে কি অদ্ভুত পদার্থ, তাহার পরিচয়, পাঠক—"উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারতে" লইবেন।

বাঙ্গালা সাহিত্যের এই বিভ্রাট ও অরাজকতার দিনে, 'মুর্শিদাবাদ-কাহিনীর' ন্যায় একখানি উপাদেয় গ্রন্থ হাতে পড়িলে কত যে আহ্লাদ হয়, তাহা বলিয়া উঠা যায় না। সেই আহ্লাদের বশবর্ত্তী হইয়া আমি এই গ্রন্থ-সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

গ্রন্থখানি প্রকৃতপক্ষেই অতি উপাদেয় হইয়াছে। প্রথম প্রথম যাঁহারা বঙ্গভাষায় বঙ্গের ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা ইংরেজের লিখিত ইতিহাস এবং ইংরেজের লিখিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধ হইতে তথ্যসংকলন করিয়া, তাহাই বাঙ্গলা ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। স্বাধীন অনুসন্ধানের দ্বারা তথ্যনির্ণয় করিতে তাঁহারা কিছুমাত্র প্রয়াস পান নাই। তাই তাঁহাদের সংকলিত ইতিহাসনামধেয় গ্রন্থ সকল ইতিহাস হইত না, উপন্যাসমাত্র হইত। হইবারই কথা। ইংরেজ ইতিহাসলেখকেরা স্বজাতির দোষ এবং প্রতিদ্বন্দ্বীর গুণ ঢাকিবার জন্য না করিতে পারেন, এমন কাজ নাই। আপনাদিগকে দেবতা এবং শত্রুকে পিশাচ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা, ইংরেজের স্বভাব। আপনাদের গৌরবখ্যাপনের জন্য অপরে ভীরুতা, শঠতা, নীচতার আরোপ করিতে ইংরেজ ঐতিহাসিক বড়ই তৎপর। তাই তাঁহাদের লিখিত বাঙ্গলার ইতিহাসে আমরা পাঠ করি যে, সতর জন মাত্র মুসলমান অশ্বারোহী বঙ্গবিজয় সংসাধিত করিয়াছিল; যে পলাশীর যুদ্ধ, ইংরেজ সেনার অলোকসামান্য বিক্রম এবং ক্লাইবের অতুলনীয় সামরিক প্রতিভার জ্যোতিষ্মান্ নিদর্শন; যে সিরাজদ্দৌলা মানবাকারে পিশাচ ছিল; যে অন্ধকূপহত্যারূপ পৈশাচিক কাণ্ড তাঁহারই আদেশে সংঘটিত হইয়াছিল। অনুসন্ধানে দেখা যায় যে—সর্ব্বৈব মিথ্যা। দেখা যায় যে, মুসলমান কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয় সতর জন অশ্বা-রোহীর দ্বারা হয় নাই; তাহার প্রকৃত কারণ—বিশ্বাসঘাতকতা। দেখা যায় যে, পলাশীর যুদ্ধ একটা যুদ্ধই নহে—রাজদ্রোহ, শঠতা, বিশ্বাসঘাতকতা, কৃত-

---

* মুর্শিদাবাদ-কাহিনী;—শ্রীনিখিলনাথ রায়, বি. এ. প্রণীত। বহরমপুর; শ্রীবনওয়ারীলাল গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য কাগজে বাঁধা ২৲ দুই টাকা, কাপড়ে বাঁধা ২॥০ আড়াই টাকা।

ঘ্নতা, নীচতা, নির্ব্বুদ্ধিতা, অপরিণামদর্শিতা এবং নিমকহারামির একটা বীভৎস অভিনয়মাত্র। দেখা যায় যে, তখনকার ইংরেজ কর্ত্তাদের তুলনায় সিরাজকে দেবচরিত্র বলিলও বড় একটা অত্যুক্তি হয় না। দেখা যায় যে, অন্ধকূপহত্যারূপ কোনও ঘটনা ঘটিয়াছিল কি না, ইহা বিলক্ষণ সন্দেহের বিষয়। যদিই ঘটিয়া থাকে, একটা সামান্য কোন কিছু ঘটিয়াছিল ; এবং সেই সামান্য কোন কিছুও সিরাজদ্দৌলার অজ্ঞাতে ঘটিয়াছিল। ইংরেজের লিখিত ইতিহাস ও প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া যাঁহারা বঙ্গভাষায় বঙ্গের বা ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাঁহাদের গ্রন্থ উপন্যাস বৈ আর কি হইবে—উপন্যাস বৈ আর কি হইতে পারে? পরম আহ্লাদের বিষয় এই যে, অধুনা এই গড্ডলিকাবৃত্তির পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে। এখন যাঁহারা বাঙ্গলার ইতিহাস বা বঙ্গদেশসম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত, তাঁহারা স্বাধীন গবেষণা দ্বারা তথ্যনির্ণয় করিতে যত্নবান। ইহাঁরা বঙ্গমাতার সুসন্তান, এবং ইহাঁদিগের দ্বারা বঙ্গের প্রকৃত ইতিহাসের যে এক দিন উদ্ধার হইবে, এরূপ আশা করা যায়। বঙ্গের এই সকল সুসন্তানদিগের মধ্যে শ্রীমান্ নিখিল-নাথ রায় এক জন।

এই গ্রন্থের উপকরণসংগ্রহের জন্য গ্রন্থকারকে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। অনেক প্রাচীন উর্দ্দু, ফারসী ও ইংরেজি গ্রন্থ এবং হস্তলিখিত কাগজপত্র সংগ্রহ করিতে ও পড়িতে হইয়াছে। মুর্শিদাবাদের নানা স্থানে ভ্রমণ ও অবস্থিতি করিয়া তত্তৎস্থানপ্রচলিত কিম্বদন্তী হইতে কতক তথ্য নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হইয়াছে। গ্রন্থকারের নিজের ভূমিকাতেই প্রকাশ যে, আজ প্রায় পাঁচ বৎসর তিনি এই কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। এরূপ কার্য্যে পরিশ্রম ছাড়া অর্থব্যয়ও যে হইয়াছে, তাহা না বলিলেও চলে। এই অর্থব্যয়, এই পরিশ্রম, এই যত্ন এবং আগ্রহ যে সার্থক হইয়াছে, ইহা সর্ব্বান্তঃকরণে এবং মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।

কেবল অর্থব্যয়, পরিশ্রম ও যত্নে এতটা সার্থকতা হয় না। লিখিতব্য বিষয়ে প্রাণ থাকা আবশ্যক। তাহা নিখিলনাথের আছে। মুর্শিদাবাদের পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করিয়া, এবং বর্ত্তমান দুরবস্থা দেখিয়া, নিখিল বাবু যে মর্ম্মে মর্ম্মে আহত, তাহার পরিচয় এই গ্রন্থের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে পাওয়া যায়। এমন সমবেদনা, এত সহানুভূতি না থাকিলে, এই গ্রন্থ এত উপাদেয় হইত না। গ্রন্থকার বড় দুঃখে এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, কোন মহানগরীর মুর্শিদাবাদের ন্যায়, এত অল্প কালের মধ্যে ধ্বংস হয় নাই। ইহা সত্য কথা। আমরাই বাল্যকালে ও নবীন বয়সে যাহা দেখিয়াছি, তাহার কিছুই এখন নাই। আজিকার মুর্শিদাবাদে বসিয়া বাল্যকালের সেই মুর্শিদাবাদের কথা স্মরণ করিলে, মনে হয়, যেন শ্মশানক্ষেত্রে বসিয়া কোন অমরাবতীর স্বপ্ন দেখিতেছি। হায়! বাল্যকালের সেই উৎসাহময়, আনন্দময়, হাস্যময়, মহিমাময় মুর্শিদাবাদ কোথায় গেল! আজও মুর্শিদাবাদ আছে—কিন্তু, হায়! কত নিষ্প্রভ, কত মলিন, কত প্রাণশূন্য! মহাকালের করাল ধ্বংসচ্ছায়া আসিয়া

ইহার উপর পতিত হইয়াছে। বিধাতা বাদ সাধিলে আর কে রক্ষা করিবে!

এই গ্রন্থের যথাযথ পরিচয় দিতে হইলে ইহার অনেক প্রবন্ধ আদ্যন্ত উদ্ধৃত করিতে হয়। গ্রন্থকারের উপর সে অত্যাচার আমরা করিব না। পাঠকবর্গ গ্রন্থপাঠ করিয়া গ্রন্থের পরিচয় গ্রহণ করেন, ইহাই আমাদের ইচ্ছা। বাঙ্গালী পাঠক যে সে পরিচয় লইবে, এরূপ আশা কতকটা দুরাশা, সন্দেহ নাই। বাঙ্গালী, কদর্য্য উপন্যাস পাঠ করে, নাটকাকারে পাগলামি পড়ে, রহস্য-নামে অভিহিত ইতরামির আদর করে, কিন্তু যাহা পড়িলে শিক্ষা হয়, জ্ঞান হয়, ভ্রান্তিনিরসন হয়, আলোকলাভ হয়, তাহা পড়ে না। কিন্তু অধিক গ্রাহক না জুটিলেই যে গ্রন্থরচনার সার্থকতা হয় না, এরূপ ধারণা আমাদের নাই। ভাল পুস্তকের পাঠক আমাদের এই বাঙ্গলা দেশে না জুটিবারই কথা। মুর্শিদাবাদ-কাহিনী যদি অধিক না বিকায়, তাহাতে গ্রন্থকারের দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই। কথাপ্রসঙ্গে বঙ্কিম বাবু এক দিন বলিয়াছিলেন,—"আমার পুস্তকের বিশেষ কোন গুরুতর দোষ আছে, নতুবা ইহাদের এত আদর কেন?" বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থ সম্বন্ধে না খাটুক, কথাটা মোটের উপর সত্য বটে।

উপসংহারে গ্রন্থকারকে সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া এইরূপে সাহিত্যসেবা করিয়া নিজের এবং দেশের মুখোজ্জ্বল করিতে থাকুন।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। আষাঢ়। "সতীর খেলা" শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থের রচিত একটি 'আষাঢ়ে' উপকথা; রচনার বিশেষত্ব বা কোনও বৈচিত্র্য নাই। উপকথার বিষয় অতিমানুষ ও অত্যন্ত অলৌকিক,—সেকালের বুড়ীদের মুখে শোভা পাইতে পারে। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়ের "সৌর কলঙ্ক" একটি জ্যোতিষবিষয়ক প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় "প্রবাদ প্রসঙ্গ" প্রবন্ধে বঙ্গদেশে প্রচলিত প্রবাদবচনের ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিতেছেন। কোন প্রবাদপ্রসঙ্গ কোন অঞ্চলে প্রচলিত, তাহার উল্লেখ করিলেও ভাল হয়। "বিদেশে বাঙ্গালী" স্বাক্ষর করিয়া এক জন লেখক "হায়দ্রাবাদ এসাইণ্ড ডিষ্ট্রীক্টস্" নামক প্রবন্ধে বেরারের অন্তর্গত অমরাবতী নগরীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "কবির মালঞ্চে" শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের চারিটি কবিতা আছে। কবিতাগুলিতে দেবেন্দ্র বাবুর মৌলিকতা নাই; পড়িয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। "জাতীয় শোক ও জাতীয় হর্ষ" শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের রচনা। লেখকের বক্তব্য কি, তাহা আমাদের সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইল না। "স্বরলিপিতে" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গান আছে; গানটি সুনির্ব্বাচিত সুমিষ্ট শব্দের সমষ্টিমাত্র;—ভাবের বিশেষত্ব, যাহা রবীন্দ্রনাথের ন্যায় কবির নিকট আশা করা যায়,—ইহাতে তাহার সম্পূর্ণ অভাব। "রাষ্ট্রীয় অশান্তি ও তাহার প্রতিকার" প্রবন্ধে লেখকের নাম নাই। নামেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, প্রবন্ধটি রাজনৈতিক। "কাহাকে" এখনও

চলিতেছে। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র শাস্ত্রীর "রাম রাজার মুলুক" বেশ হইতেছে। "জাতীয় মহাসভা ও জাতীয় সজ্জা" ইঙ্গবঙ্গগণের আলোচনার যোগ্য।

নব্যভারত। শ্রাবণ। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির "ভারতীয় ইতিহাসের একাংশ" একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। লেখক মোগল ইতিহাসের এক অংশ,—১৫৬৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব ঘটনা,—বর্ত্তমান প্রবন্ধে বিবৃত করিতেছেন। লেখকের অনুসন্ধাননিপুণতা প্রশংসার যোগ্য। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্যের "নেপালের পুরাতত্ত্ব" নামক উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক নিবন্ধটি এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইল। আমরা ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতে দেখিলে আনন্দিত হইব। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী, "খ্রীষ্ট ও তাঁহার ধর্ম্ম" প্রবন্ধে "য়িহুদীবংশাবতংস জগৎ-বিখ্যাত য়িশুখ্রীষ্টের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের উৎপত্তি উন্নতি এবং পরিণতি সম্বন্ধে আলোচনা" করিবেন। শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের "শেলি" দ্বিতীয় প্রস্তাব এবার প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটি উৎকৃষ্ট হইতেছে। শ্রীযুক্ত নিত্যকৃষ্ণ বসুর "বর্ষাসঙ্গীত" কবিতাটি উল্লেখ-যোগ্য। এই সংখ্যায় "নব্যভারতের" সম্পাদক মহাশয়ের রচিত "খোসামুদী" নামক একটি 'অমর' প্রবন্ধ পত্রস্থ হইয়াছে: এই প্রবন্ধে সম্পাদক মহাশয় একটি অমূল্য 'সত্য' প্রকটিত করিয়াছেন,—দেশের সবাই খোসামুদে; "তাহারা একটা স্বতন্ত্র দল বাঁধিয়াছে। আর আমি স্বতন্ত্র একাকী। দল বাঁধিয়াছে বলিয়া তাঁহাদের প্রশংসা করিবার লোক যুটিয়াছে, আর আমার নিন্দা, দিবারাত্রি, চতুর্দ্দিকে অবাদে (অবাধে?) ঘোষিত হইতেছে। আমি সপ্তরথি-বেষ্টিত অভিমন্যুর ন্যায় একাকীত্বের ভীষণ সংগ্রামে অহরহ যুঝিতেছি।" আমরা কি বলিয়া এই রোরুদ্যমান সম্পাদককে আশ্বাস দিব, তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। তবে একটা আশার কথা এই যে, যাহারা দল বাঁধিয়া পরস্পরের প্রশংসা করিতেছে, তাহারা 'নব্যভারত'-সম্পাদককে দল হইতে খারিজ করিয়াছে বটে, কিন্তু সম্পাদক তাঁহাদের উদ্দেশ্য বিফল করিয়াছেন। অধুনা তিনি নিজের ঢাক নিজে বাজাইতেছেন; লোকে কখন প্রশংসা করিবে, তজ্জন্য প্রতীক্ষা না করিয়া, নিজের বাদ্য নিজে বাজাইলে মন্দ হয় না, নব্যভারতের 'অভিমন্যু' সম্পাদক তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। লোকে হয় ত এই প্রবন্ধটি পড়িয়া তাঁহার সহজ বুদ্ধির অভাব কল্পনা করিবে, কিন্তু বলিতে কি, আমরা তাঁহার এই শিশুসুলভ সরলতায় মুগ্ধ হইয়াছি! তিনি নিজে না গাহিলে আমরা তাঁহার এই একচেটে সত্যপ্রিয়তার গান আদৌ শুনিতে পাইতাম না!

উৎসাহ। শ্রাবণ। "অজ্ঞেয়বাদ" চলিতেছে। শ্রীযুক্ত জলধর সেন এবার "উৎসাহে" "রাজনীতি" ধরিয়াছেন। "প্রতিবাদে" লেখক নেপোলিয়ানের জীবনের কতিপয় তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। "জুয়ারী জাতি" প্রবন্ধটি সুপাঠ্য, জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ।

মুকুল। শ্রাবণ। "জ্ঞানবীর" প্রবন্ধটিতে অনেকগুলি চিত্র আছে, কিন্তু বড় ভাল হয় নাই। "ভূমিকম্প" প্রবন্ধটিতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। "বিগত ভূমিকম্পে নীলফামারী রেলওয়ে ষ্টেশন ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের অবস্থা"—ইতিশীর্ষক ছবিখানি বেশ হইয়াছে।

সখা ও সাথী। শ্রাবণ। "বিবিধ" সুপাঠ্য। "শীকার" প্রবন্ধটি বেশ হইয়াছে। নীল গাইএর ছবিটি সুন্দর। "সেকালের সরীসৃপ" প্রবন্ধটি পড়িয়া ছেলেরা আমোদের সহিত শিক্ষা লাভ করিবে। "হাসি" একটি রহস্য-কবিতা; ছবিগুলি দেখিয়া বালক বালিকারা হাসিতে পারে, কিন্তু কবিতাটির রচনা ভাল হয় নাই,—উহাতে হাস্যরসের অত্যন্ত অভাব।

পল্লীগ্রামে দুর্গোৎসব।

১

মাতা। চল্ মা, চল্।

কন্যা। কোথায়?

মাতা। বড় বাড়ী।

কন্যা। আমি যাব না।

মাতা। কেন?

কন্যা। না মা, তুমি যাও।

মাতা। যাবিনি কেন বল্?

কন্যা। যে দুরন্ত ছেলে, ওকে নিয়ে পরের বাড়ীতে যেতে আমার লজ্জা করে।

মাতা। ছেলে দুরন্ত কার না আছে? গ্রামের সব লোকই ত আজ সেই বাড়ীতে।

কন্যা। তা থাক। তুমি যাও।

মাতা। তুই না গেলে এখনি বড় গিন্নি আস্‌বেন ডাক্‌তে। বড় গিন্নিই ত তোকে আন্‌তে পাঠিয়েছেন; বেহারাদের টাকা দিয়েছেন। আমাকে বলে দিলেন,—'মেয়েকে সঙ্গে করে এখনি এস।'

কন্যা। যেতে ইচ্ছা করে না আমার—তা কি কর্ব্বো! ছেলেটার না আছে একখানা কাপড়, না আছে এক জোড়া জুতো।

মাতা। তা ত বুঝি। যেমন কপাল করেছিলে মা।

এই কথার পরে উভয়ের অপাঙ্গে অশ্রু দেখা দিল।

জননী কন্যাকে বুঝাইলেন, "বছরকার দিনে চখের জল ফেলো না মা। ওকে মানুষ কর্ত্তে পাল্লে ও নিজেই নিজের কাপড় জুতো করে নিতে পার্ব্বে।"

মাতার সান্ত্বনায় কন্যার মনোবেগ আরও বর্দ্ধিত হইল। কিন্তু সে তাড়াতাড়ি চক্ষের জল মুছিয়া মাকে কহিল, "ঐ যে জ্যাঠাইমা আসছেন।"

কিঞ্চিৎ দূর হইতে একটি প্রবীণা রমণী ডাকিলেন, "সুরির মা, এখনও বসে আছ? এস শীগ্গির।"

"যাই দিদি!" বলিয়া সুরির মা উত্তর করিল।

যে রমণী আসিয়া অজ্ঞাতে এই মাতাপুত্রীর অশ্রুস্রোত থামাইয়া দিলেন, তাঁহার বয়স পঞ্চাশের উপর। পরিধান একখানা লালপেড়ে শাড়ী। হাতে দুটি শাঁখা ও দুগাছি সোনার বাউটী। নাকে একটি মুক্তা-দেওয়া নথ, কপালে খানিক টক্‌টকে সিন্দূর।

২

জেলা নদীয়ার উত্তরপূর্ব্বাংশে বেণীপুর গ্রাম। বেণীপুরের দেবীপ্রসাদ বসু এক জন সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ। দেবীপ্রসাদের বয়স ষাইট বৎসর হইবে। তাঁহার দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ গিরিশের এক পুত্র হইয়াছে, তাহার নাম বিজয়। বিজয়ের বয়স চারি বৎসর হইয়াছে। কনিষ্ঠ মাধব এখনও অপত্যহীন। দেবীপ্রসাদের এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন। তাঁহার কাল হইয়াছে। বিধবা ভ্রাতৃজায়ার সন্তান নাই। দেবীপ্রসাদের সন্তানেরা তাঁহাকে জননীর ন্যায় ভক্তি করিয়া থাকেন, এবং তাঁহাকে ছোট মা বলিয়া ডাকেন। ছোট মাই সংসারের কর্ত্রীস্বরূপা। লোককে দেওয়া থোওয়া যা কিছু, সবই ছোট মার হাতে। দামী কাপড়চোপড় গহনাপত্র প্রভৃতি যে সব বাক্সে থাকে, তার চাবিও ছোট মাই রাখেন। তিনি বিধবা হইলে দেবীপ্রসাদ ও তাঁহার স্ত্রী পরামর্শ করিয়া এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। গ্রামে দেবীপ্রসাদের স্ত্রী ও তাঁহার ভ্রাতৃজায়া যথাক্রমে বড় গিন্নি ও ছোট গিন্নি নামে পরিচিতা।

বোসেরা বুনিয়াদি লোক। বাড়ীর ভিতরে চকমিলানো দোতলা কোটা। বাহিরবাড়ীতে পূজার দালান, বৈঠকখানা এবং কাছারিঘরও পাকা। গ্রামের লোকে তাঁহাদের বাড়ীকে বড় বাড়ী বা বাবুদের বাড়ী বলিয়া থাকে।

৩

দেবীপ্রসাদের বাড়ীতে প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব হয়। আমরা পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। এই সময়ে বেণীপুরের বোসেদের বাড়ীতে পূজায় বড়ই সমারোহ হইত। দেবীপ্রসাদ নিষ্ঠাবান হিন্দু। দেবতা ব্রাহ্মণে তাঁহার ভক্তি অসীম। পূজা ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলের হেতু বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। সারা বৎসর ধরিয়া তিনি পূজার উদ্যোগ, পূজার আয়োজন করিতেন। মনে করিতেন, পূজাই হিন্দু গৃহস্থের সাংসারিক নিত্য ব্রতের বার্ষিক উদ্‌যাপন; সংবৎসর আয়োজন উদ্যোগ করিয়া, আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে এই উদ্‌যাপনে গৃহস্থের বার্ষিক সঞ্চয়ের অধিকাংশ ব্যয় করা কর্ত্তব্য।

পূজার কয়েক দিন ধরিয়া দেবীপ্রসাদ অকাতরে অসংখ্য লোককে অন্ন দান করিতেন। কিসে লোকে ভাল খাইবে, কেমন করিয়া কোথা হইতে কি নূতন জিনিস আনা যাইবে, পূজার পূর্ব্বে কেবল এই চিন্তাই তাঁহার মনে আসিত। তাঁহার এক আত্মীয় মেদিনীপুরে চাকরি করিতেন; তিনি একবার কতকগুলি মিঠা পান আনিয়া দেবীপ্রসাদকে দিয়াছিলেন। দেবীপ্রসাদ তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন, পূজার সময়ে তুমি এই পান দু' তিন হাজার পাঠাইবে;—আমি দাম পাঠাইয়া দিব। কৃষ্ণনগরের সরভাজা সরপুরি ভাল বলিয়া দেবীপ্রসাদ প্রতি পূজায় তথা হইতে দু' জন লোক আনাইতেন, এবং বাড়ীতে সরভাজা সরপুরি প্রস্তুত করাইয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে খাওয়াইতেন।

বস্তুতঃ, দেবীপ্রসাদ যাহা ব্যয় করিতেন, তাহার অধিকাংশই লোকের আহারের নিমিত্ত। গৃহসংস্কার, অলঙ্কারনির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্য, সেকালের পল্লীগ্রামের পূজার অঙ্গীভূত ছিল না।

আজ কাল এই ভাবের পূজা কমিয়া আসিতেছে। আমাদের কোনও রহস্যপটু বন্ধু, তাঁহার রচিত একটি তর্জ্জা গানে, দেবদেবীবন্দনার স্থলে, দেবী দশভুজাকে "দ্বাদশ-দিন-ছুটি-প্রদায়িনী" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ, এখন তেমন ভাবে পূজা করিব, লোক জন খাওয়াইব,—সে প্রাণ, সে স্ফূর্ত্তি, আমাদের নাই। পূজার সময়ে খাটুনির বিরাম হয় বলিয়াই যেন আমাদের আনন্দ। দেবীপ্রসাদের সময়ে নিয়ম বিপরীত ছিল। তখন সারা বৎসরের পরিশ্রম পূজার সময়ে করিতে হইত। বাড়ীর লোকে পূজার কয় দিন প্রায় অনাহার অনিদ্রায় কাটাইতেন। রাত্রি দু'টার সময়ে গেলেও দেখা যাইত, হয় দেবীপ্রসাদ, না হয় তাঁহার কোনও পুত্র, আগন্তুকের অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত রহিয়াছেন।

জিনিসটা গিয়াছে, বা যাইতে বসিয়াছে; কিন্তু কথাটা আছে। এখনও আমরা "দুর্গোৎসব ব্যাপার," "দুর্গোৎসবের আয়োজন" বলিলে, একটা মহা ব্যাপার, মহা আয়োজনই বুঝিয়া থাকি। বঙ্গের সাধারণ লোকে ইহাকে বড় পূজা বলিয়া থাকে। সুধু "পূজা" বলিলেও কেবল দুর্গোৎসবই বুঝায়। এমন পূজা ত আর নাই!

৪

বোসেদের বাড়ীর অতি নিকটে দীননাথ দাস নামে এক দরিদ্র কায়স্থ বাস করিতেন। দীননাথের দু' চারি বিঘা জমি ছিল। তাহার ফসলেই তাঁহার

একরূপ চলিয়া যাইত। দীননাথ সামান্যরূপ লেখা পড়া জানিতেন। দীননাথ শৈশবে অভিভাবকহীন। তদবধি দেবীপ্রসাদের আশ্রিত। অনেক বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার বিবাহ হয় নাই। দেবীপ্রসাদ সাহায্য করিয়া তাঁহার বিবাহ দিয়া দেন। দীননাথ পাঁচ বৎসরের এক কন্যা রাখিয়া লোকান্তরিত হয়েন। দেবীপ্রসাদের অনুগ্রহে, দীননাথের স্ত্রী কন্যাটির কুলীন বরের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। অদৃষ্টদোষে সেই কন্যা আঠার বৎসর বয়সে তিন বৎসরের একটি পুত্র লইয়া বিধবা হইয়াছে। শ্বশুরালয়ের অবস্থা সচ্ছল নহে। তাহার স্বামীই উপার্জ্জনক্ষম ছিল। মার অবস্থাও ততোধিক। বিধবা হইবার পর সে একবার আসিয়া মাকে দেখিয়া গিয়াছে। এবারে পূজার কিছু দিন পূর্ব্বে দীননাথের স্ত্রী একদিন দেবীপ্রসাদের গৃহিণীর সাক্ষাতে বলিয়াছিলেন, "ডুলি-ভাড়া দিতে পাল্লে পূজার সময়ে একবার মেয়েটাকে আন্‌তাম।" বড় গিন্নি বলিয়া দেন, "তুমি তাকে আন্‌তে পাঠাও, বেহারার টাকা আমি দিব।"

দীননাথকে বোসেদের বাড়ীর সকলেই ভালবাসিতেন। দীননাথ উপকারী লোক ছিলেন। দেবীপ্রসাদ বা তাঁহার কোনও পুত্র যখনই কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে গিয়াছেন, দীননাথ তাঁহাদের সঙ্গে যাইতেন। পুত্রদের সঙ্গে তিনি অভিভাবকের ন্যায় থাকিতেন। প্রয়োজন হইলে কখনও পাচকের এবং সময়ে সময়ে তিনি ভৃত্যের কাজও করিতেন। কেহই কিন্তু দীননাথকে অবজ্ঞা করিতেন না। দীননাথ দেবীপ্রসাদকে দাদা বলিয়া ডাকিতেন। গিরিশ এবং মাধব তাঁহাকে দীনু খুড়ো বলিতেন।

দীননাথের গুণ স্মরণ করিয়া বড় গিন্নি তাঁহার বিধবা পত্নীকেও বড় ভালবাসিতেন। মধ্যে মধ্যে দু' একটি টাকা দিয়া তাঁহার সাহায্য করিতেন। তখনকার দিনের হিন্দুগৃহের পুত্রবতী রমণীরা সাধারণতঃ দয়ার আধার ছিলেন।

৫

বেণীপুরে পনের ষোল ঘর কায়স্থের বাস। ষষ্ঠী হইতে বিজয়ার দিন পর্য্যন্ত ইহাদের কাহাকেও উনুনে হাঁড়ি চড়াইতে হইত না। সকলেই পূজাবাড়ীতে প্রসাদ পাইতেন। বেণীপুরে আর কোনও বাড়ীতে পূজা নাই। নিকটে দুই গ্রামে দুই বাড়ীতে পূজা হইত। গ্রামের কেহ কেহ সেখানে গিয়া দুই বেলা নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিতেন। বাকি কয় বেলাই বোসেদের বাড়ীতে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার চলিত।

বলা কর্ত্তব্য যে, গ্রামের লোকে যে কেবল নিমন্ত্রিতের ন্যায় উদরের ব্যাপার নিষ্পন্ন করিত, তাহা নহে। পূজার কয়েক দিন ধরিয়া তাহারা প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই বোসেদের বাড়ীতে থাকিত; এবং স্ত্রীলোকেরা বাড়ীর ভিতরে ও পুরুষেরা বাহিরে, অম্লানচিত্তে ও অক্লান্তদেহে পরিশ্রম করিত। কোনও কোনও বাড়ীতে দু' এক জন বৃদ্ধ বা অকর্ম্মণ্য লোক থাকিত। কেহ কেহ ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া ক'দিনের মত আসিয়া বোসেদের বাড়ীতে উঠিত; দুই চারি জন রাত্রিতে বাড়ী যাইত। সকলেই মনে করিত, যেন পূজা গ্রামস্থ সকলেরই। পূজার কথা লইয়া তাহারা অন্য গ্রামের লোকের সহিত জাঁক করিত। অন্য গ্রামের পূজায় কিরূপ যাত্রার বায়না হইল, বা হইবে, তাহার সংবাদ লইয়া তাহারা গিরিশ বাবুকে উস্কাইত,—"ওদের চাইতে ভাল যাত্রা আন্‌তে হবে।"

পূজার দেবার্চ্চনা এবং আহার-অঙ্গ বৃদ্ধ দেবীপ্রসাদের দৃষ্টির বিষয় ছিল। যাত্রা প্রভৃতি আমোদ-অঙ্গ গিরিশ বাবুর বিবেচনাধীন। গ্রামের বৃদ্ধদিগের সহিত দেবীপ্রসাদ পরামর্শ করিতেন। গিরিশ বাবুর কথায় যুবকেরা খাটিত। কোনও কার্য্যে কোথাও যাইতে হইবে শুনিলে, এক জনের যায়গায় পাঁচ জন দাঁড়াইত।

সময়ের পরিবর্ত্তনে পল্লীগ্রামের এ ভাবও চলিয়া যাইতেছে। শিক্ষায় আমাদের পরশ্রীকাতরতা কমাইয়াছে সত্য, কিন্তু সেকালের সে সরলতা ও মেশামিশির ভাবটাও যেন লোপ পাইতেছে। তখন অশিক্ষিত লোকের মধ্যে অনেক সময়ে দলাদলি থাকিত, সন্দেহ নাই। কিন্তু যে গ্রামে দেবীপ্রসাদের ন্যায় লোকের বাস, সেখানে পরস্পরের মধ্যে বড়ই সদ্ভাব ও প্রীতি লক্ষিত হইত।

৬

দীননাথের কন্যার নাম সুরধুনী। কিন্তু বাপের বাড়ীতে এখনও সেই শৈশবের সুরি নাম ঘুচে নাই।

১২৭৯ সালের দুর্গোৎসবের সপ্তমী পূজার দিন বেলা তিনটার সময় সুরি পিত্রালয়ে পঁহুছে।

গ্রামের যে সকল বিধবার অন্ন বিধবার হাতে খাইতে আপত্তি নাই, তাঁহাদেরই জন্য দীননাথের স্ত্রী বোসেদের বাড়ীতে রন্ধন করিতেছিলেন। পাক শেষ হইলে তিনি গা ধুইয়া কাপড় ছাড়িতে যাইবেন, এমন সময়ে সংবাদ পাইলেন, তাঁহার কন্যা আসিয়াছে। তিনি ঘরের কবাট বাঁধিয়া আসিয়াছিলেন; বড় গিন্নিকে বলিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ী গেলেন।

দু' চারি কথার পরেই জননী কন্যাকে বড় বাড়ীতে যাইবার জন্য অনুরোধ

করিলেন। দুঃখিনী বিধবা তাহাতেই আপত্তি করিতেছিল। মনে ব্যথা থাকিলে, আমোদের বা উৎসবের স্থানে যাইতে ইচ্ছাই হয় না।

এ দিকে দীননাথের স্ত্রীর আগমনে বিলম্ব দেখিয়া দেবীপ্রসাদের গৃহিণী অন্য একটি বিধবাকে তাহাদের অন্ন পরিবেশন করিতে বলিয়া, নিজে সুরির মাকে ডাকিতে গেলেন।

বেলা শেষ হইয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের জলপান, কায়স্থদের ভোজন ও সধবাদিগের আহার হইয়া গিয়াছে। দুঃখী, কাঙ্গালী ও চাকরেরাও খাইয়াছে। কেবল বিধবাদের বাকি। গৃহিণী ছুটাছুটি করিতেছেন বটে, কিন্তু এখনও জল-গ্রহণ করেন নাই। আরতি শেষ হইয়া গেলে কর্ত্তা আহার করিবেন। গৃহিণী তার পরে।

তিনি ডাকিবামাত্রই দীননাথের স্ত্রী ও কন্যা তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইলেন। রন্ধনশালার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া দেবীপ্রসাদের গৃহিণী কহিলেন, "সুরির মা, সুরিকে খাইয়ে দাও, তুমি খাও, আমি দেখে আস্‌ছি—মাছ আছে কি না। ওর ছেলেটাকে দু'খানা মাছ দিতে বলি।"

সুরধুনী বলিল, "আপনি আর মাছ দেখতে যাবেন না। খোকা আমার সঙ্গেই যা হয় দুটো খাবে এখন।"

গৃহিণী জিদ করিলেন, "কেন রে? মাছ আছে। তোর ছেলেকে আমার সঙ্গে দে। আমি ওকে মাছের ঘরের বারাণ্ডায় খাইয়ে দিচ্ছি।"

সু। না জ্যাঠাইমা, ও ভারী দুরন্ত।

গৃহিণী। হ'ক দুরন্ত। দুরন্তপনা কল্লে ওর কান কেটে দেবো।

এই বলিয়া তিনি সুরধুনীর ছেলেটির হাত ধরিয়া লইয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন, "সুরি, খাওয়া হলে তোর ছেলেকে নিয়ে ওপরে বউমাদের কাছে যাস্‌। সুরির মা, সুরিকে দিয়ে এস।"

৭

আহারান্তে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সুরধুনী পুত্রটিকে সঙ্গে লইয়া উপরে গেল। উপরে এক সারি ঘর আছে,—যাহার জানালা হইতে বাহিরবাড়ীতে দৃষ্টি চলে। সমস্ত জানালাতেই চিক দেওয়া। সুরধুনী দেখিল, এই ঘরগুলি স্ত্রীলোকে পুরিয়া গিয়াছে। গ্রামের প্রায় সকলেই, এবং কুটুম্বালয়ের অনেকেই সেখানে সমাগত। তাহাদের শিশু পুত্র কন্যারাও অবশ্য সেখানে। কেহ ছেলেকে দুধ খাওয়াইতেছেন; কাহারও ছেলে ঘুম ভাঙ্গিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে; কেহ বা

ছুটাছুটি করিতেছে। গিরিশ বাবুর পুত্র বিজয় খেলিতেছিল। তার মা মাধবের স্ত্রী ও অন্য দু' এক জনকে সঙ্গে লইয়া পান সাজিতেছিলেন।

পূজার সময়ে পান সাজা, জল খাবার সাজানো, ইত্যাদি মিহি কাজের ভার যুবতীদিগের উপর। রন্ধন, পরিবেশন প্রভৃতি প্রৌঢ়ারা করিয়া থাকেন।

সুরধুনীর জননী তাহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। সিঁড়ির উপর থাকিয়াই তিনি কন্যাকে কহিলেন, "যা, ঐ যে বউমারা পান সাজছেন্।" তিনি সরিয়া যাইতেই বড় বধূ ডাকিলেন,—"এস ঠাকুরঝি, এস। আয় বসন্ত, আয়।"

সুরধুনীর ছেলের নাম বসন্ত। সে মাতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া টানিতেছিল।

বসন্তের চেহারা মন্দ ছিল না। চক্ষুর্দ্বয় মেধাব্যঞ্জক। কিন্তু মুখে ও সর্ব্বাঙ্গে দরিদ্রতার কালিমা-মাখানো।

বড় বধূ কহিলেন, "ঠাকুরঝি! তোমার ছেলে বিজয়ের সঙ্গে খেলা করুক; তুমি এসে সুপুরি কাটো কি পান সাজো।"

সুরধুনী কহিল, "ছেলেটি আমার বড় ঠাণ্ডা নয়।"

বড় বধূ। ঠাকুর জামাই ত খুব ঠাণ্ডা ছিলেন। ছেলে অমন হ'ল কেন?

এই কথায় ছোট বধূর মুখে একটু হাসি দেখা দিল। সুরধুনী কোনও উত্তর না দিয়া ছেলেটিকে বিজয়ের কাছে দিয়া আসিল। সে দেখিল, তখনও রাশীকৃত পান সাজিতে বাকি রহিয়াছে। সে বড় বধূ ও ছোট বধূর সাহায্যে প্রবৃত্ত হইল।

তখন পল্লীগ্রামে যাত্রার কাছে পানের দোকান বসিত না। আজ কাল বসে। শ্রোতৃবর্গ সে সময়ে পূজাবাড়ী হইতেই পান পাইতেন।

৮

বেলা পাঁচটা বাজিয়াছে। দেবীপ্রসাদ পূজার দালানেই বসিয়া আছেন। প্রত্যূষে প্রাতঃস্নান করিয়া তিনি সেখানে গিয়াছেন। পূজা কোনও রূপে অঙ্গহীন না হয়, কোনও অভ্যাগতের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার ত্রুটী না হয়, ইহাই তিনি দেখিতেন। পূজা শেষ হইয়া গেলে ব্রাহ্মণদিগের জলপান, কায়স্থদিগের ভোজন, কাঙ্গালীর আহার, তিনি দেখিয়াছেন। দেবীপ্রসাদের আদর, অন্তরে ও ব্যবহারে। মুখে তেমন প্রকাশ নাই। পাঁচটার সময়ে একজন বৈরাগী আসিয়া রামপ্রসাদের শান্তিরসাত্মক গান গাহিতেছে। দেবীপ্রসাদ ও সমাগত

লোকেরাও তাহাই শুনিতেছেন। গীত শেষ হইলে একটা শব্দ উঠিল,—"শীতল চক্রবর্ত্তী মহাশয় আসিয়াছেন!"

শীতল একজন ভোজনপটু ব্রাহ্মণ। প্রতি বৎসর পূজার সময়েই ইনি আসিয়া থাকেন। সপ্তমী অষ্টমী নবমী ঠিক নাই। সাধারণতঃ ইনি সন্ধ্যার পূর্ব্বেই দেখা দেন। দেবীপ্রসাদের বাড়ীতে পূজার ক'দিন ব্রাহ্মণ যে কোন সময়ে আসিলেই আহার পান।

শীতল কায়স্থের বাড়ীতে লুচি তরকারি ইত্যাদি খান না। খান সুধু দই, ক্ষীর, আর মিষ্টি। তাহাই এমন খান যে, তাঁহার জল খাওয়া দেখিবার জন্য লোক দাঁড়াইয়া যায়। কথিত আছে যে, ১২২৫ সালে যে সমস্ত উদরসর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণ নলডাঙ্গার রাজবাড়ীতে আহার করিয়া মর্ত্ত্যধামে নিদারুণ বিসূচিকা রোগ আনয়ন করেন, শীতলের পিতা তাঁহাদের মধ্যে একজন। আহারের নিমিত্ত শীতল কিছু অতিরিক্ত দক্ষিণা পাইয়া থাকেন।

শীতল পাদপ্রক্ষালন করিলেন। তাঁহার জলযোগের উদ্যোগ হইতে লাগিল। চারিদিকে লোক ফিরিয়া দাঁড়াইল। উপর হইতে রমণীগণ দেখিতে লাগিলেন। শীতলের বয়স সত্তর বৎসর হইবে। কিন্তু এখনও তাঁহার শরীর দেখিলে বুঝা যায় যে, বয়সকালে তিনি একজন বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন।

দেখিতে দেখিতে শীতল দু' সের ক্ষীর, তিন সের রসগোল্লা, চারি সের সন্দেশ ও পাঁচ সের দধি উদরস্থ করিলেন। আহারান্তে কহিলেন,"আর সে দিন নাই, আহার কমিয়াছে!" দেবীপ্রসাদ তখনও জিদ্ করিতে লাগিলেন, "আর কিছু নিন্।" তিনি তাঁহাকে ইহা অপেক্ষাও অধিক আহার করিতে দেখিয়াছিলেন।

৯

আচমন করিয়া হরিতকী চর্ব্বণ করিতে করিতে শীতল গল্প আরম্ভ করিলেন, "দাদা গেছ্লেন একবার গঙ্গাস্নানে। কাঁচড়াপাড়ার বৈদ্যদের নাম শুনে ভাবলেন, কিছু ওষুধ নিয়ে যাই। দাদার তখন একটু অগ্নিমান্দ্যের মত হয়েছিল। তাতেও কিন্তু তিন সের চালের অন্নধ্বংস কর্ত্তে পার্ত্তেন। রাস্তায় এক বাড়ীতে অতিথি হন। গৃহস্থ রীতিমত সিদে দেয়। দাদা সেই আধ সের আন্দাজ চাল চালজলের মত খেয়ে বসে আছেন। খানিক বাদে বাড়ীর কর্ত্তা এসে জিজ্ঞাসা কল্লেন, 'আপনি পাক কচ্ছেন না?' দাদা উত্তর কল্লেন, 'চাল পাই নি।' 'চাল দিয়েছিল ত?' 'সে অল্প দুটো আমি চাল-জল খেয়েছি।'

শেষে গৃহস্থ তিন চারি সের চাল আনিয়া দিলেন। দাদা আহারে বসিলে গৃহস্থ এসে দেখেন যে, সব অন্নই উঠে গেল। আহার হয়ে গেলে তিনি দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রভু কোথায় যাচ্ছেন?' দাদা বল্লেন, 'কাঁচড়াপাড়া।' 'কেন?' উত্তর হল, 'চিকিৎসার জন্য।' 'আপনার ব্যারাম কি?' 'অরুচি।' গৃহস্থ আর কিছু না বলিয়া কহিলেন, 'চিকিৎসা হবার পরও কি এই দিক দিয়া ফিরবেন?'"

চারিদিকে হো হো হাসির শব্দ পড়িয়া গেল। ভোজনসম্বন্ধে শীতলের অনেক গল্প ছিল। "বেলা শেষ হইল" বলিয়া তিনি আর বসিলেন না। দেবীপ্রসাদ তাঁহাকে দক্ষিণা ও প্রণামী দিয়া বিদায় করিয়া, যাইবার সময়ে হাস্যমুখে কহিলেন, "মধ্যে মধ্যে যেন পায়ের ধুলা পড়ে।"

এখনকার দিনে শীতলের ন্যায় ব্রাহ্মণ বা অতিথি দেখিলে, আমরা বোধ হয় তাড়াইয়া দিতে পারিলে বাঁচি। দেবীপ্রসাদ তাঁহাকে জিদ করিয়া আকণ্ঠ পুরিয়া খাওয়াইলেন। সমাজের দেবীপ্রসাদেরা পলায়ন করিতেছেন বলিয়াই শীতলের ন্যায় ব্রাহ্মণেরও অন্তর্দ্ধান হইতেছে। শীতলের বংশধরেরা নানা উপায়ে জঠরাগ্নি নির্ব্বাণ করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। গত বৎসর পল্লীগ্রামের এক পূজায় আমরা প্রবেশিকা-পরীক্ষোত্তীর্ণ পুরোহিত দেখিয়া আসিয়াছি।

বলিতে পার, সময়ের সহিত অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে দশ জন লোককে আহার দিতে যাহা লাগিত, এখন হয় ত চারি জন লোককে খাওয়াইতে তাহাই লাগে। তখনকার দিনে যে ব্যয়ে সংসার চলিত, এখন তাহা চলে না। ইহাও ঠিক যে, এক এক কন্যার বিবাহেই অনেকের উপর সেকালের দুই দুর্গোৎসবের চাপ পড়ে। তথাপি ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমাদের মধ্যে অন্নদান, বস্ত্রদান প্রভৃতির প্রবৃত্তি ক্রমশই কমিয়া আসিতেছে। এখন আমাদের মৌখিক সৌজন্য ও শিষ্টাচারের কিছু বাড়াবাড়ি। কিন্তু মনে মনে যেন আমরা অনেকেই এই মত পোষণ করিতে শিখিতেছি যে, "বর্ব্বরেরা দেয় খানা, বুদ্ধিমানে খায়।"

১০

বসন্ত, বিজয়ের প্রতি হুকুম চালাইতে লাগিল। বিজয় বড়মানুষের ছেলে, আর সে দরিদ্র, এ পার্থক্য বুঝিবার বয়স এখনও তাহার হয় নাই। পৃথিবীর পার্থক্য, অত্যাচার বুঝিতে পারে না বলিয়াই ত শিশুরা এত সুখী!

অল্পক্ষণেই বসন্ত তাহার দুরন্তপনা দেখাইল। আধ ঘণ্টা না যাইতে

যাইতেই সে বিজয়ের দুই তিনটি খেল্‌না ও কাঁচের পুতুল ভাঙ্গিয়া ফেলিল। বিজয় শেষে বড়ই চটিয়া গেল। "যাও, তোমার সঙ্গে খেল্‌ব না" বলিয়া সে তাহাকে এক ধাক্কা মারিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে ছোট গিন্নি আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিলেন, "ছি দাদা, ওকি? তোমার বাড়ীতে পূজো; তোমার কি কাউকে কিছু বল্‌তে আছে?"

বিজয় ভাঙ্গা জিনিসগুলি দেখাইয়া কহিল, "দেখ ত কি করেছে?"

ছোট গিন্নি কহিলেন, "তা করুক। আমি কালই আবার ও সব তোমাকে এনে দেব।"

বিজয় ইহাতেই চুপ করিল।

বিজয় ও বসন্ত দৃষ্টির বাহিরে থাকিলেও, সুরধুনীর কান সেই দিকেই ছিল। শীতল চক্রবর্ত্তীর জলযোগ তাহাকে একটু অন্যমনস্ক করিয়াছিল। সহসা ছোট গিন্নির কথা তাহার কানে প্রবেশ করিল। সে নিশ্চয় বুঝিল, পুত্র কিছু অন্যায় করিয়াছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া সে ভাঙ্গা খেল্‌না দেখিতে পাইল, এবং বসন্তের গালে এক প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিল।

বসন্ত অবশ্য কাঁদিয়া উঠিল। ছোট গিন্নি বিজয়কে ছাড়িয়া দিয়া বসন্তকে কোলে করিলেন। অশিষ্ট বালক মাকে ফিরাইয়া মারিবার জন্য পুনঃপুনঃ কোল হইতে নামিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ছোট গিন্নি তাহাকে নামিতে দিলেন না, কিন্তু তাহার মাকে বকিতে লাগিলেন,—

"বছরকার দিনে ছেলেটাকে মাল্লি কেন? তুই ভারী যা'চ্ছেতাই।"

সু। ওকে নিয়ে আমার কোথাও মুখ পাবার যো নাই, খুড়ীমা। এই ছেড়ে দিয়ে গিয়েছি, দেখ, এর মধ্যেই কি কারখানা করেছে—

ছো। কি কর্‌বি তা বলে? ছেলে মানুষ, বুদ্ধি হলেই সেরে যাবে।

এই সময়ে বড় গিন্নি উপরে আসিলেন। "কি, হয়েছে কি?" বলিয়া জিজ্ঞাসা করায়, ছোট গিন্নি তাঁহাকে সমস্ত কহিলেন।

বড় গিন্নিও বসন্তের গালে হাত বুলাইতে বুলাইতে সুরধুনীকে বকিতে আরম্ভ করিলেন।

সুরধুনী অপ্রস্তুত হইয়া পান সাজিবার যায়গায় ফিরিয়া গেল।

বড় গিন্নি ছোট গিন্নিকে কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে গিরিশ বাবু উপরে আসিলেন, এবং কহিলেন, "ছোট মা! আমি নিমন্ত্রণ খেতে যাই।"

ছোট মা। কেন, মাধব? সে যাবে না?

গি। মাধবের মাথা ধরেছে;—ক'দিন যে খেটেছে। বাবা বল্লেন আমাকে যেতে।

ছোট মা। যাও, রাত্‌ করো না। শীগিগর ফিরে এস।

গি। যেমন যাব, অমনই আস্‌ব। নৌকায় যাচ্ছি। জ্যোৎস্না রাত আছে।

ছোট মা। মাধবকে উপরে এসে শুয়ে থাকৃতে বল।

১১

বসন্ত তখনও ছোটমার কাছে দাঁড়াইয়া।

কাঁধে চাদর ফেলিতে ফেলিতে গিরিশ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কে, ছোট মা?"

ছোট মা। চিনতে পাল্লে না? তোমার ও বাড়ীর খুড়োর নাতি।

গি। আমি ওকে খুব ছেলেবেলায় দেখেছি। মধ্যে ওরা একবার এসেছিল। আমি তখন বাড়ী ছিলাম না। ওর মা এসেছে বুঝি?

বড় মা নিকটেই ছিলেন। তিনি কহিলেন, "হাঁ। আমিই আন্‌তে পাঠিয়েছিলুম।"

বড় মা আসিয়া ছোট মা ও গিরিশ বাবুর নিকটবর্ত্তিনী হইয়া দাঁড়াইলেন, এবং আস্তে আস্তে দু'জনকেই বলিতে লাগিলেন, "মেয়েটা শ্বশুরবাড়ীতে বড়ই কষ্টে থাকে। তাদের কিছু নাই। দেখতে পাচ্ছ না ছেলেটার অবস্থা?"

ছোট মা কহিলেন, "ওর মা ত পাবেই, ওকেও এক জোড়া কাপড় দিতে হয়।"

বড়। তাই একটু ভাল দেখে। আমি যখন ওর মাকে আর দিদিমাকে ডাকতে যাই, তখন বোধ হয় মায়ে ঝিয়ে কাঁদছিল। আমি ডাকতেই দু'জনে উঠে এল। দেখলাম, দু'জনেরই চোখ ড্যাবডেবে। ছেলেটার কাপড় নাই, জুতো নাই, বোধ হয়, তাইতে মেয়েটা আস্‌তে ইতস্ততঃ কচ্ছিল।

গি। কি করবো? এখানকার দোকানে ত ভাল দিশী কাপড় নাই। আমাদের পূজোর কাপড়ও প্রায় বিলি হয়ে গেছে। যদি একটু আগে বলতে। ছেলেপিলের কাপড় ত খুব বেশী আনা হয় না।

বড়। খোকা পূজোয় যে সব কাপড় পেয়েছে, তার এক জোড়া দিলে হয় না?

গি। বেশ হয়, ওরা ত এক-বয়সী। ছোট মা, খোকার এক জোড়া কাপড় এনে ওকে দাও। দীনু খুড়ো যে ভালবাসতেন আমাদের—তাঁর নাম রাখতে ত আছে কেবল ঐ।

বলিতে বলিতে ছোট মা এক জোড়া রেশমী-পেড়ে দেশী কাপড় লইয়া আসিলেন। সুরধুনীকে ডাকিলেন, "সুরি! এ দিকে আয়।"

সুরধুনী আসিয়া গিরিশের পায়ে এক নমস্কার করিল।

ছোট মা কহিলেন, "তোর দাদা তোর ছেলেকে এই কাপড় দিলে।"

কাপড় জোড়া হাতে লইয়া সুরি এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিল। কহিল, "এত ভাল কাপড় নিয়ে ও কি করবে?"

গি। তা হ'ক, তুই নে। আমি তোর ছেলের এক যোড়া জুতো কিনে দেবো। একটা পোষাক করে দেবো।

সু। পোষাক টোষাক চাইনে দাদা, ওকে মানুষ করে দিও।

গি। তা দেবো।—ও বেঁচে থাক, ওকে বিজয়ের সঙ্গে রেখে দেবো।

সুরধুনীর গণ্ড বহিয়া অশ্রু ছুটিল।

দরিদ্রা বিধবার প্রাণের আশীর্ব্বাদ কুড়াইতে কুড়াইতে গিরিশচন্দ্র সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেলেন।

এই সময়ে নীচে কাঙ্গালী-বিদায়ের ন্যায় একটা গোল উঠিল। নিকটস্থ যে সমস্ত সামান্য গৃহস্থদের স্ত্রীলোকেরা সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রতিমা দেখিতে আসে, তাহারা বোসেদের বাড়ীতে তেল পান সুপারি পাইয়া থাকে। সেই সকল স্ত্রীলোকে বাড়ী ভরিয়া গিয়াছে।

ইহা একটু পরেই সান্ধ্য আরতি;—তার পর নৈশ আহার; পরে ক্ষণিক আরাম; শেষে সেই সাবেকী আমোদ—যাত্রার আয়োজন।

পূজা 'একদিনও যা, তিন দিনও তা।' আমরা এক দিনের তিন ঘণ্টার সামান্য চিত্র আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। পল্লীগ্রামে এখনও দু'একজন বৃদ্ধ হিন্দুর বাড়ীতে দেবীপ্রসাদের পূজার ন্যায় পূজা হইয়া থাকে। কিছু দিন পরে হয় ত এমন পূজা আর দেখিতে পাইব না!

আগন্তুক।

কি গো! তুমি কে আবার! বলি কোথা হতে!
কি চাও?—কি মনে করে এ বিশ্বজগতে!
এই দ্বন্দ্ব, এই অন্ধ অর্থলোলুপতা,
—এই স্বার্থ, এই শাঠ্য, এই মিথ্যা কথা,
এই ঈর্ষ্যা-দ্বেষ-ভরা নীচ মর্ত্ত্যভূমি-
মাঝখানে—বলি—ওগো—কে আবার তুমি?
কি দেখিছ চারি দিকে চেয়ে আগন্তুক?
এ শৌণ্ডিকালয়। এর দুঃখ, এর সুখ
মাতালের।—দেখিছ না মদ্যপাত্র হাতে
কেহ হাঃ হাঃ অট্টহাসে; কেহ কার সাথে
করে বাগ্বিতণ্ডা কিম্বা বাহুযুদ্ধ; কেহ
একধারে বিস্তারিয়া তার স্ফীত দেহ
প্রবল নাসিকাধ্বনি করি' নিদ্রা যায়;
কেহ বকে; কেহ কাঁদে; কেহ নাচে গায়;
কেহ মদ্য খায়; তাহা কেহ বা উদ্গারে;
কেহ বা ঝিমোয় দূরে বসি একধারে
মদ্যপাত্র হাতে; কেহ অকারণ রেগে
কারো নাসা কামড়ায় গিয়া তীব্রবেগে;
(সে হয় ত এক গণ্ডে কামড়ালে দিত,
ফিরায়ে অপর গণ্ড; কিন্তু বিধি তায়
দিয়াছেন একটি নাসিকামাত্র সবে,
কোথা পাবে অন্য নাসা ফিরাইতে? হয়ে
সে জন্য অনন্যোপায়) কেশে ধরি তার
লাঞ্ছনা করিছে বিধিমত।—এ আগার
প্রকাণ্ড শৌণ্ডিকালয়।—অতিথি! হেথায়
কেন তব আগমন—শিশু! নিঃসহায়?
—কি এ সুরা? তীব্র ধনলিপ্সা। জন্য যার
এ অধম নর করে নিত্য হাহাকার,
দৌড়াদৌড়ি, হুড়াহুড়ি, নিত্য সাধাসাধি,
চৌর্য্য, হত্যা, দাস্য, শাঠ্য—খুঁজিতে উপাধি—
ব্যগ্র, উগ্র, করে ফৌজদারি আদালত,
ভণ্ডামী।—ইহারই জন্য সংসার বৃহৎ
অরণ্য; মনুষ্য তায় হিংস্র জন্তু মত
উত্তম শিকারে শুদ্ধ ফিরিছে নিয়ত।
কোথা হ'তে ক্ষরিয়াছে মধু—অমনি এ
ব্যগ্র পিপীলিকাদল সারি সারি গিয়ে
চায় স্বাদ, মিটাইতে কাল্পনিক ক্ষুধা
অমর হইতে যেন পিয়ে সেই সুধা!
কোথায় ক্ষরেছে ব্রণ—মক্ষিকার মত
ছুটিয়াছে ঝাঁকে ঝাঁকে সেই ব্রণক্ষত
লক্ষ্য করি'। (হায় নর! হা অন্ধ মানব!
এই চেষ্টা, এ বিপুল উদ্যম—এ সব
ভস্মে ঘৃত ঢালা।)—সেই সংসার-বিগ্রহে
যোগ দিতে এসেছ কি? না না তাহা নহে।
তুমি শুদ্ধ, তুমি শান্ত। বল কি স্বর্গীয়
সন্দেশ এনেছ শুনি।—এস মম প্রিয়,
নেত্রাঞ্জন, হৃদয়রঞ্জন—এস নেমে
স্বর্গ হ'তে সুকুমার সুপবিত্র প্রেমে
বিরঞ্জিত স্বর্গদূত। তুমি শুধু কহ—
"এসেছি, আমারে ভালবাস, কোলে লহ,
দুগ্ধ দাও"—তুমি বল,—"তোমরা কে তাহা
জানি না, চিনি না; তবু আমি চাহি যাহা
তাহা দিবে জানি—আছে সে টুকু মমতা।
আর, নাহি থাকে যদি—শোন এক কথা—
আমি এমনই মন্ত্র জানি—সারি সারি
কালসর্প সম সবে খেলাইতে পারি,
দংশিতে ভুলিয়া যাবে দংশিতেই আসি
সেই মন্ত্রে।—সেই এক মন্ত্র মোর হাসি।
"আরও এক মন্ত্র জানি। সে কিন্তু ব্রহ্মাস্ত্র।
যদিও উল্লেখ তার কোন হিন্দু শাস্ত্র
খুঁজে পাবে নাক! সেই দিব্য মন্ত্রবলে,
দিগ্বিজয়ী আমি; তাহা মাতৃবক্ষঃস্থলে
বাজে সর্ব্বাপেক্ষা; আর অন্যে নিরুপায়
হাজারই বিরক্ত হোক ভাবে খুব দায়।
হয় সব বিপর্য্যস্ত মুহূর্ত্তে অমনি—
সে অস্ত্র এ ক্ষীণ কণ্ঠে ক্রন্দনের ধ্বনি।
যা চাই তা দিতে হবে, কোন তর্ক যুক্তি
নিষ্ফল, যা চাই দাও, তবে পাবে মুক্তি।"
—কি দেখিছ? পরিচয় করিতে কি চাও
আমাদের সঙ্গে? যাঁর স্তন্যদুগ্ধ খাও
ইনি তোর মাতা; উনি মাসী; ইনি পিসী;
ইনি কাকী; উনি জ্যেঠী; যাঁর দাঁতে মিশি,

উনি মামী ; উনি দিদি, ইনি মাতামহী।
উনি পিতামহী ; ইনি—না না আমি নহি,
এই ব্যক্তি বৃদ্ধ মাতামহ ; আর আমি—
আমরা—এঁহেম্—সব ওঁয়াদেরই স্বামী।
আজি শুয়ে মাংসপিণ্ডসম ; উৰ্দ্ধে চাও,
চাও চারিদিকে ; নাড়ো হস্তপদ ; দাও
করতালি ; কর হাস্য ; জ্বলিলে জঠরে
অগ্নি, কাঁদ মাতৃবক্ষঃস্তন্যদুগ্ধ তরে ;
সব দুঃখ—দৈহিক যন্ত্রণা কিম্বা ক্ষুধা ;
সব সুখ—পান করা মাতৃস্তন্যসুধা ;
ক্রীড়া—হস্তপদ সঞ্চালন একা একা ;
কার্য্য—শুধু নিদ্রা কিম্বা শুধু চেয়ে দেখা।
দ্বিতীয় অঙ্কেতে তুমি দাও হামাগুড়ি,
বেড়াও যে চতুষ্পদ ঘরময় জুড়ি'।
যা দেখ তা নিতে চাও ; যা নাও তা নিয়ে
দাও মুখমধ্যে পুরে ; সেই মুখ দিয়ে
চাও সব রাখিতে সে নিরাপদ গর্ত্তে,
পুরাইতে পারে নাই এত দিন মর্ত্ত্যে
যাহা কেহ কভু। তৃতীয় অঙ্কেতে গিয়া
একবারে চতুষ্পদ-অবস্থা ছাড়িয়া
দ্বিপদে উত্তীর্ণ। যাও পড়ি শতবার
অনম্য অধ্যবসায়ে উঠি চারিধার
কর পরিক্রম। কহি বিবিধ বচন,
'মা-মা দা-দা খাব নেব' আনন্দবর্দ্ধন
কর স্বজনের। কার্য্য করা গর্ত্ত পূর্ণ ;
দ্রব্যপ্রাপ্তিমাত্রে করা ছিন্ন কিম্বা চূর্ণ
মূল্য নাহি দিয়া। অনন্ত আকাঙ্ক্ষাময়,
পৃথিবীর দ্রব্যে শুধু আবদ্ধ সে নয় ;
সূর্য্য চন্দ্র তারা,—তাও তোমার মৌরুষি !
না পাইলে সে ব্রহ্মাস্ত্র। কিসে থাকে খুসি
ভেবেই অস্থির সবে ;—সাধ্য কি অসাধ্য
সকল কামনা তোর পুরাতেই বাধ্য ?
চতুর্থ অঙ্কেতে জগতের এ নিষ্ঠুর
কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশের আয়োজন। দূর
নিভৃতে সাজায় যত্নে পিতামাতা বসি,'
দিয়া আগ্নেয়াস্ত্র, তীর-ধনু, চর্ম্ম অসি ;—
যাহার যা সাধ্য কিম্বা রুচি। নব দীক্ষা
বালকের ; মন্ত্রপাঠ, ব্যায়াম ও শিক্ষা ;
উদ্যম ও কর্ম্ম ; নীতি, ধর্ম্ম, জাগরণ—
কর সেই সমরের যোগ্য আয়োজন।
পঞ্চম অঙ্কেতে সেই নিষ্ঠুর সংগ্রাম
জীবিকার জন্য। সেই নিত্য অবিশ্রাম
দ্বন্দ্ব। সেই অন্ধ দ্বন্দ্বে মাতা নহে মাতা ;
পিতা ?—অতীতের বস্তু। ভগ্নী কিম্বা ভ্রাতা—
সে আবার কারে বলে, সে ত প্রকৃতির
খেয়াল। পুত্র ও কন্যা ! নিত্যই অস্থির
তাদের বিবর্দ্ধমান সংখ্যায় ; স্বীকার্য্য
তবে এত দূর যে, তাহারা অনিবার্য্য।
প্রেম ? কারে বলে ! সে ত দৈহিক পিপাসা,
বন্ধুত্ব ত দু'দণ্ডের হাসি ও তামাসা,
গল্প ও গুজব। ভক্তি স্নেহ ? পড়ি বটে
উপন্যাসে ; ভালো লাগে আমার নিকটে
কবিতা কি গল্পে। তবে সত্য কি পদার্থ ?
সত্য রৌপ্য, সত্য নিজ সুখ, সত্য স্বার্থ।
অর্থ চাই অর্থ চাই—তাহার লাগিয়া
অনন্ত পিপাসা—মুখ ব্যাদান করিয়া—
ঊর্দ্ধকণ্ঠে তৃষ্ণাতুর চাতক যেমন
চায় জলবিন্দু ; চায় রৌপ্য নরগণ।
এ চীৎকার থামে শেষে সেই একাকারে,
সেই নিত্যপ্রধূমিত ঘন অন্ধকারে।
এস দিব্য, এস কান্ত, এস মিষ্টহাসি,
এস গৌরকান্তি, এস সুন্দর সন্ন্যাসী।
এস ধরাধামে বৎস। হেথা বিশ্বময়,
সকলই কদর্য্য নয়, সবই দ্বন্দ্ব নয়।
হেথা সব মেঘ ঝড় বজ্র ও আঁধার,
নয়। শুদ্ধ মরুভূমি নয় সব তার।
—আছে উর্দ্ধে নীলাকাশ—শান্ত দিব্য স্থির,
অনন্ত অভয়-ভরা স্নিগ্ধ সুগভীর
স্নেহে বক্ষে ধরি ধরণীরে। নিত্য তাহে
লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র করুণনেত্রে চাহে
অনন্ত অনুকম্পায় ধরণীর পানে।
এখানেও সূর্য্য ওঠে। বিতরে এখানে
চন্দ্র দিব্যরশ্মি। দূরে কল্লোলিয়া যায়
উচ্ছ্বসিত স্বচ্ছ নীল জলধি। হেথায়
হাসে শ্যামা ধরিত্রী। আলেখ্যবৎ তাহে
তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ রাজে ; অশ্রান্ত প্রবাহে
ধায় নদনদী ; ফোটে পুষ্প ; গায় পিক।
হেথা বহে বসন্ত-পবন দশ দিক
বিকম্পিত করি মৃদু সুস্নিগ্ধ পরশে ;—
আসে এক বার তাহা বরষে বরষে।

হেথা সবই কালসর্প, কীট ও কণ্টক
নয় ; সবই প্লীহা, যক্ষ্মা, জ্বর, বিস্ফোটক
নয়।—আছে হেথা নব শৈশবের মত
উচ্ছৃঙ্খল ক্রীড়া, যৌবনের চিরস্বত্ব,
প্রেমের রাজত্ব, বার্দ্ধক্যেও ক্ষীণ আশা—
আছে চিরপবিত্র মাতার ভালবাসা
চিরপ্রবাহিত নির্ঝরের ধারাসম
অবারিত উৎসারিত নিত্য মনোরম
চিরস্নিগ্ধ ; সেই স্নেহ কভু নাহি যাচে
প্রতিদান।—হেথা দুঃখ আছে, সুখ আছে ;
মিথ্যা আছে, সত্য আছে ; উদ্বেগ ও ভয়
আছে ; শান্তি ও ভরসা আছে। বিশ্বময়
সব স্থানে তুঁষ-মধ্যে ধান্য আছে ;—তবে,
শুদ্ধ সেই টুকু বৎস ! বেছে নিতে হবে।
এস, এই বিমিশ্রিত সুখ দুঃখ মাঝে,
প্রিয়তম। আর আমি (ব্যস্ত বড় কাজে
বেশী অবসর নাই) তোরে বক্ষে ধরি
কায়মনোবাক্যে এই আশীর্ব্বাদ করি—
সুখে থাকো সুখে রাখো ;—আর বেছে নিও
সংসারে গরল হ'তে যে টুকু—অমিয়।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

বটগাছের কথা।

আমি একটা প্রকাণ্ড বটগাছ ;—এই নদীতীরে সুদীর্ঘ শাখাবাহু মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছি দেখিয়া তোমরা কি ভাবিতেছ জানি না। কিন্তু এক সময়ে আমি তোমাদেরই মত ছোট ছিলাম; প্রকৃতি-মাতা অতি ধীরে ধীরে আলোক ও উত্তাপে, জল ও বায়ুপ্রবাহে, তাঁহার সুললিত স্নেহস্তন্যদানে আমাকে এত বড় করিয়া তুলিয়াছেন ; আমি অচলভাবে চিরদিন একই স্থানে দাঁড়াইয়া আছি ; জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত বুঝি আমাকে এমনি করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। কাহার পথ চাহিয়া আমি দিবারাত্র দাঁড়াইয়া আছি জানি না, আমার জীবনের উদ্দেশ্য কি বুঝিতে পারি না।

আমার জীবনের কোন উদ্দেশ্য থাক না থাক, আশা ও নিরাশার জীবনব্যাপী দ্বন্দ্বে হৃদয় ক্ষত করিয়া, আমি তোমাদের মত নিষ্ফল ক্রন্দনে ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশ করি না। তোমরা দেখ—আমার কোন কাজ নাই, কিন্তু সত্য সত্যই কি আমি কোন কাজ করি না ? তোমরা যাহাকে কাজ বল, তাহার অর্থ স্বার্থ ; স্বার্থসিদ্ধি করিয়াই তোমাদের আনন্দ, সুতরাং তোমাদের আনন্দ দিয়া আমার আনন্দের পরিমাণ করিতে পারিবে না। কিন্তু তাই বলিয়া তোমাদের অপেক্ষা আমার আনন্দোচ্ছ্বাস অল্প নহে। কত দূর হইতে প্রতিদিন সহস্র পাখী আসিয়া আমার শাখায় আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাদিগের প্রতি দিবসের গান, তাহাদের বিমুক্তবন্ধন খেচর-জীবনের নিত্য নব হর্ষ-কাকলি আমার কর্ণমূলে প্রতিদিন সুখস্বপ্নের ন্যায় ধ্বনিত হয় ; কত পথশ্রান্ত,

রৌদ্রক্লান্ত পান্থ আমার পদপ্রান্তে বসিয়া ক্লান্তি দূর করে; আমি ধীরে ধীরে তাহাদিগকে বীজন করি। কত দুর্ভাগ্য পথিক কত দিন আমার ছায়ায় বসিয়া তাহাদের রৌদ্রতপ্ত, মরুময় ব্যর্থ জীবনের দুঃখগাথা একান্তে তাহাদের সহচর-বর্গের নিকট ব্যক্ত করিয়াছে, শুনিয়া আমার কঠিন হৃদয়ও বিচলিত হইয়াছে; যদি আমার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে আমার এই স্থূল বল্কল ভেদ করিয়া তাহাদের জন্য স্নেহের উৎস প্রবাহিত করিতাম।

অদূরে ঐ নদী দেখিতেছ, আজিকার বর্ষার প্রবল প্লাবনে প্রায় আমার মূলদেশে আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু গ্রীষ্মের সময় উহা কিছু দূরে থাকে। আমার সম্মুখ দিয়াই নদীতে যাইবার পথ; এই পথ দিয়া স্নান করিয়া যাইবার সময়, বৈশাখী প্রভাতে পল্লীরমণীগণ আমার পাদমূলে জলধারা দান করিয়া নতমস্তকে প্রণাম করিয়া যায়, তাহাদের সজল কোমল কুন্তলস্পর্শে আমি ভক্তের মনোবাঞ্ছা বুঝিতে পারি।

আমার এই সুবিস্তীর্ণ কাণ্ডদেশ তোমরা সিন্দূররাশিতে চর্চ্চিত দেখিতে পাইতেছ? পল্লীযুবতীগণ প্রতিবর্ষে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমার পাদমূলে ষষ্ঠীপূজা করিয়া যায়, কত জন আমার অবনত শাখায় পুষ্পমালা ঝুলাইয়া দেয়, কত রমণী প্রদোষে ভক্তিভরে মৃণ্ময় প্রদীপ জ্বালিয়া রাখে;—বিজন অরণ্যের প্রান্তে নির্জ্জন পথের ধারে তরুমূলে, এই ক্ষুদ্র প্রদীপ নিশাগমে অতি মৃদুরশ্মি বিকীর্ণ করে, তাহাদের অন্ধকার হৃদয়ের ভক্তির আলোকের ন্যায় তাহা স্নিগ্ধ। জানি না, তাহারা আমাকে এত ভক্তি করে কেন? জানি না, তাহাদের হৃদয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষাগুলি কখন সফল হইয়াছে কি না? কিন্তু আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হইলেও আমার প্রতি তাহাদের ভক্তি অবিচল, আমার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা তাহারা পাপ বলিয়া মনে করে। কিন্তু তাহাদের এই ভক্তি আমি স্বয়ং গ্রহণ করিতে পারি না—সে ক্ষমতা আমার নাই। যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এই নিখিলজীবধাত্রী ধরিত্রীর যিনি আদি কারণ, সেই সর্ব্বভক্তির আধার অনন্ত দেবতার পদে প্রতিদিনের সঞ্চিত ভক্তি আমি সমর্পণ করি, আমি ধন্য হই, পুলকে আমার পত্রে পত্রে কৃতজ্ঞ হৃদয়ের নৈশ শিশিরাশ্রু ফুটিয়া উঠে।

এ পর্য্যন্ত আমি কত দৃশ্য দেখিয়াছি, কত বিচিত্র সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছি; শুধু বিহঙ্গের কলকাকলি নহে, স্রোতস্বিনীর অস্ফুট মর্ম্মগাথা নহে, সমীরণের কুসুমসুরভিসংমিশ্রিত সুমন্দ আনন্দহিল্লোল নহে, মানবহৃদয়ের কত হর্ষের,

কত শোকের, কত বিরহবিষাদের সম্মিলিত উচ্ছ্বাস, কত দূর হইতে ভাসিয়া আসিয়া, প্লুতরাগিণীর ন্যায় আমার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে। শত শত বৎসর ধরিয়া আমার সম্মুখে যত সুখের ও শোকের দৃশ্য সংঘটিত হইয়াছে, তাহার কথা আজ তোমাদের কাছে বলিতে পারিলে, তাহা তোমাদের একখানি অতি সুন্দর ইতিহাস হইতে পারিত।

সকল কথা মনে নাই, অনেক দিনের কথা কি না! কিন্তু তথাপি দুই একটি ঘটনা আমার মনে এমন দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে, যেন কাল তাহা ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়;—তাহার একটি কথা আজ তোমাদের কাছে বলিব।

কত বৎসরের কথা ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না; আমার এই জঙ্গম-জীবনের বৎসর আর তোমাদের বৎসর ঠিক একরূপও নহে। কিন্তু মনে আছে, তখন আমি বড় হই নাই, তখন আমার প্রথম যৌবন। তখন যাহারা আমার কাছে খেলা করিতে আসিত, তাহাদের অনেককেই এখন আর দেখিতে পাই না! কত শিশু বৃদ্ধ হইয়াছে, কত বালিকা পিতামহী হইয়াছে, আবার কত জন অকালে সংসারপ্রবাস ছাড়িয়া গিয়াছে; জীবস্রোত তেমনিই প্রবহমান রহিয়াছে বলিয়াই হয় ত ধরণী চিরনবীন দেখাইতেছে, কিন্তু যদি তোমরা আমার মত দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করিতে—যদি তোমরা বসুধাকে এমনি করিয়া সুদৃঢ় প্রেমবন্ধনে বাঁধিয়া, তাহার বক্ষের উপর আমার মত অটলভাবে অবস্থিতি করিতে পারিতে—তাহা হইলে বুঝিতে, বর্ত্তমানের উল্লাসহাস্যের নিম্নস্তরে কত হৃদয়ভেদী হাহাকার, কত রুদ্ধশোকাশ্রু প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—তাহা হইলে পুরাতন শোকের স্মৃতি মনে করিয়া, তোমাদের নয়নপ্রান্ত হইতে আনন্দাশ্রু-ধারা ঝরিয়া পড়িবার অবসর পাইত না। যে স্থানে কত লোকের জীবনান্ত হইতে দেখিয়াছি, ঠিক সেই স্থানে কত দিন পরে মিলনোৎসবের আনন্দ-বাদ্য ধ্বনিত হইয়াছে দেখিয়া আপন মনে 'হা' 'হা' করিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারি নাই! আমার সেই বিদ্রূপহাস্য দেখিয়া লোকে ভাবিয়াছে, বায়ুপ্রবাহে বুঝি আমার শাখাপত্র সঞ্চালিত হইতেছে—তোমাদের চর্ম্মচক্ষু এতই মোহান্ধ!

কিন্তু কি বলিতে চাহিয়াছিলাম ভুলিয়া গিয়াছি, কথায় কথায় আমার ভ্রম! এত বিভিন্ন স্মৃতি দিবারাত্র আমার বক্ষের মধ্যে একত্র মিশিয়া গুঞ্জন করিতেছে যে, যখন যে কথা বলিব মনে করি, ঠিক সেই সময়ে তাহা বলিয়া

উঠিতে পারি না। যে সময়ে তোমাদের পিতামহগণ, আজিকার তোমাদের ছোট ছোট ছেলেদের মত বয়সে, অপরাহ্ণে মাঠে বেড়াইতে আসিয়া, আমার পাদদেশে যে একটা কাঠের গুঁড়ি পড়িয়া থাকিত, তাহার উপর বসিয়া গল্প করিতেন, সেই সময়ে এক এক দিন একটি বালিকা আসিয়া সকালে ও সন্ধ্যাকালে আমার পদতলে কত খেলা করিত। মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রে যখন সমস্ত পৃথিবী উত্তপ্ত হইয়া উঠিত, এবং কর্ম্মশ্রান্ত গ্রামখানির মিশ্র কোলাহল সংযত হইয়া আসিত, তখন নিদ্রাকুলা স্নেহময়ী জননীর বাহুপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া বালিকা অতি লঘুপদক্ষেপে তাহার ভ্রাতার সঙ্গে আসিয়া, আমার পদতলে তাহাদের খেলিবার ঘরবাড়ী নির্ম্মাণ করিত। তাহার মা স্নান করিয়া গৃহে ফিরিবার সময়, সিক্তবস্ত্রে অবনতমস্তকে আমার নিকট প্রার্থনা করিত, "মা ষষ্ঠী আমার সুরমাকে জন্মএয়েস্ত্রী করিও।" আমি শাখা নাড়িয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতাম।

ক্রমে সুরমা বড় হইয়া উঠিল। এক দিন শরৎকালের সকালবেলা গ্রামের মধ্যে ভারি শানাই বাজিতেছিল; শানাইয়ের সেই হৃদয়ভাঙ্গা করুণসুর শরতের উজ্জ্বল প্রভাতে পীতরৌদ্রে ভাসিয়া ভাসিয়া সমস্ত গ্রামখানি এক বিষাদ-কোমল রাগিণীতে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। শুনিলাম, আজ সুরমার বিবাহ; বুঝিলাম, তাই সে এ দু'দিন আমার কাছে আসে নাই, এই বুঝি আমাদের বিচ্ছেদের সূত্রপাত; বুড়োবরের সঙ্গে নাকি সুরমার বিবাহ হইতেছে; শুনিয়া আমার বড় দুঃখ ও রাগ হইল, আমি শাখাপল্লব কাঁপাইয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলাম।

পরদিন আমার পাশ দিয়া পাল্কী চড়িয়া খুব সমারোহে সুরমা শ্বশুরবাড়ী গেল। আমি একবার তাহার সেই চন্দনচর্চ্চিত ভাল, লজ্জারক্তিম সুন্দর মুখখানি দেখিয়া লইলাম; সেই চঞ্চলা সরলা বালিকাকে অবগুণ্ঠন টানিয়া এমন গম্ভীরভাবে বসিয়া থাকিতে কে বাধ্য করিয়াছে? আহা, পিতামাতার স্নেহ-বিজড়িত সঙ্কোচহীন গৃহকোণ ছাড়িয়া সে কত দূরে কোন্ অপরিচিত স্থানে চলিয়াছে, হয় ত সেখানে তাহাকে দেখিবার শুনিবার, স্নেহ করিবার কেহ নাই, হয় ত তাহারা পদে পদে তাহার দোষ ধরিবে, কত তুচ্ছ কারণে উচ্চ কথা বলিয়া তাহার মনে আঘাত দিবে; অভিমানে তাহার বুক ফাটিয়া গেলে কে দুটি স্নেহের কথা বলিয়া তাহার অভিমান দূর করিবে? সে তাহার মায়ের বড় আদরিণী মেয়ে, তবু সে মায়ের উপর অভিমান করিয়া কত দিন

আমার কাছে আসিয়া বসিয়া থাকিত। আমি আদর করিয়া তাহার কপালের ঘাম মুছাইয়া দিতাম, তাহার সুকোমল কুন্তল দোলাইয়া তাহাকে সোহাগ করিতাম, পাখীর দল আমার শাখায় বসিয়া সুললিত আলাপে তাহার অভিমান দূর করিত। আজ সে হঠাৎ আমাকে না বলিয়া চলিয়া যাইতেছে! তাহার যাইবার সময় হইয়াছে, তাহা বুঝি সে জানিত না, কত জন ত এমনি করিয়া না বলিয়া অসময়ে চলিয়া গিয়াছে! আমি ত কাহাকেও স্নেহবন্ধনে বাঁধিয়া রাখিতে পারি নাই, আমি শুধু একই স্থানে দাঁড়াইয়া তাহাদের জন্য দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছি; কিন্তু কাহারও বিরহে কখনও আমার মনে এত কষ্ট হয় নাই। সুরমার বিদায়দৃশ্য দেখিয়া আমার বল্কলাবৃত শুষ্ককঠিন বুক বেদনায় টন্‌টন্ করিতে লাগিল, আমি অনুভব করিতে পারিলাম, আমার বক্ষের মধ্যে সমস্ত শিরা উপশিরা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। আমার ইচ্ছা হইতে লাগিল, সেই মাতৃক্রোড়বিচ্যুতা বালিকাকে একবার আমার এই পল্লবময় ক্রোড়ে তুলিয়া তাহার মুখচুম্বন করি, ক্ষণেকের জন্য তাহার মস্তকের উপর আমার স্নেহছায়া দান করি।

কিন্তু আমার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল না, সে চলিয়া গেল। তাহার পর অনেক দিন সুরমার কোন কথা শুনিতে পাই নাই। শারদোৎসবের অবসানে, বিজয়া দশমীর ভাসানের দিন গ্রামের চারিদিক হইতে বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিতে লাগিল, আমার কিন্তু সে দিন শুধু সুরমার সেই বিবাহের দিনের কথাই মনে পড়িতেছিল। সে দিন কত বালকবালিকা উৎসবের পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া আমার নিকট দিয়া নদীতে ভাসান দেখিতে গিয়াছিল, আমি ব্যাকুল হৃদয়ে তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়াছিলাম,—তেমনি সজাসজ্জা করিয়া উৎসবের দীপ্ত ছবিখানির মত যদি তাহাকে সেই বালিকাদলের সঙ্গে যাইতে দেখি! কিন্তু সে তাহাদের মধ্যে ছিল না, সে গ্রামেও না, সে দেশেও না, বুঝি তাহার অশ্রুসজল ঢলঢল মুখখানি শুধু আমার হৃদয়পটেই অঙ্কিত ছিল। হায়! যদি আমার দুখানি চরণ থাকিত, আমি তোমাদের মত চলিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমি দেখিয়া আসিতাম, আমার সেই অবোধভক্ত, অভিমানিনী বালিকা কোন্ দেশে কেমন আছে!

কত দিন পরে একদিন ঘাটের পথে শুনিলাম, সুরমা বাপের বাড়ী আসিয়াছে, তাহার বৃদ্ধ স্বামী বড় পীড়িত; বাঁচে কি না!—তাই তাহার চিকিৎসার জন্য সুরমার মা বাপ তাহাকে এখানে লইয়া আসিয়াছে। আমি

আগ্রহভরে সুরমার পথ চাহিয়া রহিলাম, কত দিনের সেই পরিচিত পদশব্দ শুনিবার জন্য কান পাতিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। অবশেষে বহু দিনের বিস্মৃতপ্রায় সেই কোমল পদধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ করিল, চাহিয়া দেখিলাম, আমার সেই সুরমাই বটে!

কত কাল পরে সুরমাকে দেখিলাম! সে এখন অনেক বড় হইয়াছে, এতদিন পরে কেহ তাহাকে দেখিলে বোধ হয় চিনিতে পারিত না। তাহার সেই বাল্যচাপল্যের চিহ্নমাত্র বর্ত্তমান নাই, রূপ তাহার সর্ব্বাঙ্গে ভরিয়া উঠিয়াছে—যেন শ্রাবণের তরঙ্গময়ী গঙ্গা; কিন্তু তাহার মুখে একটুও হাসির রেখা নাই, যেন ভাদ্রের জ্যোৎস্নাপ্লাবিত আকাশ মেঘে ঢাকিয়া আছে। তাহার বিষাদাচ্ছন্ন মুখখানি এবং জ্যোতিহীন ম্লান চক্ষু দুটি দেখিয়া আমার মনে হইল, সে যেন কত রাত্রি নিদ্রা যায় নাই, যেন সে সর্ব্বংসহা বসুন্ধরার মত অসীম ধৈর্য্যসহকারে মৌনভাবে হৃদয়ের উপর দিবানিশি অসহ্য ভার বহন করিতেছে! সেই দিন হইতে সুরমা তাহার পীড়িত স্বামীর সেবা করিয়া অবসর পাইলে অনেক বেলায় নদীতে স্নান করিয়া যাইত, অতি ধীরে ধীরে সে নিজের ছায়ার মত আসিয়া আমার পাদদেশে লুণ্ঠিতমস্তকে প্রণাম করিত, সকাতরে প্রার্থনা করিত, যেন তাহার পীড়িত বৃদ্ধ স্বামী শীঘ্র সারিয়া উঠে; যেন তাহার হাতের নোয়া, সিঁথির সিঁদুর বজায় থাকে।

আমি কে, আমি কতটুকু, আমি কত ক্ষুদ্র! আমি কি সেই পতিব্রতা সাধ্বীর এই অন্ধভক্তির উপযুক্ত? কেমন করিয়া আমি তাহার স্বামীকে রক্ষা করিব? ভগবান, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে দয়া কর, তাহার জীবনের অনেক সাধ নষ্ট হইয়াছে, তাহার শেষ আশা চূর্ণ করিও না।

কিন্তু কাহারও অনুরোধে পৃথিবীর নিয়ম পরিবর্ত্তিত হয় না, তাহার কঠোর, নির্ম্মম নিয়ম-চক্র অন্ধবেগে আপনার নির্দ্দিষ্ট পথে আবর্ত্তন করিতে থাকে, যে দুর্ভাগ্য ব্যক্তি তাহার নীচে আসিয়া পড়ে, তাহাকেই নিষ্পিষ্ট করিয়া চলিয়া যায়—কাহারও আগ্রহ, দীর্ঘশ্বাস, হাহাকারে নিয়মের গতি রুদ্ধ হয় না,—আমার অনুরোধ কে শুনিবে?

সুতরাং যাহা হইবার তাহাই হইল। সুরমার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া, তাহার আত্মীয়গণকে শোকসাগরে ভাসাইয়া, এক ঘনঘোরা বর্ষার অপরাহ্ণে সুরমার স্বামী ইহলোক পরিত্যাগ করিল। অনেক দূর হইতে সুরমার মাতার রোদন-ধ্বনি আমার কানে আসিয়া বাজিতে লাগিল; সুরমা কাঁদে নাই কেন জানি

না, কিন্তু তাহার হৃদয়ের হাহাকার আমি অনুভব করিতে পারিলাম, শুনিলাম তাহার চক্ষে অশ্রু ছিল না—জ্বালাময় তীব্র বেদনায় তাহার সমস্ত হৃদয় শুকাইয়া মরুভূমি হইয়াছিল। কিন্তু মূর্খেরা তাহা বুঝিতে পারে নাই, তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, বুড়ো স্বামী মরিয়াছে, সুরমার বেশী দুঃখ হয় নাই; শুনিয়া আমার বড় রাগ হইল, পৃথিবীতে সুরমা কাহাকে ভাল না বাসে?

সে দিন সমস্ত রাত্রি ধরিয়া বৃষ্টি। আকাশে স্তরে স্তরে মেঘ কৃষ্ণবর্ণ দৈত্যের মত সাজিয়া আসিয়াছিল—কি কঠোর বজ্রনাদ, বিদ্যুতের কি জ্যোতির্ম্ময় তীব্র বিকাশ! বোধ হইতে লাগিল, সুরসুন্দরীগণের জন্য দেব-দৈত্যে আকাশে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে, শঙ্কাকুলা সুন্দরীগণ কেবল দ্রুত পলায়নে আত্মরক্ষা করিতেছে। আমার বৃহৎ শাখাগুলি ঝটিকাবেগে মড় মড় করিতে লাগিল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাপত্র ভাঙ্গিয়া ছিঁড়িয়া কোথায় উড়িয়া গেল, সেই ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশের নীচে, ঝঞ্ঝাবিক্রীড়িত নৈশ অন্ধকারের মধ্যে, প্রতি মুহূর্ত্তে প্রলয়ের প্রতীক্ষায় আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম।

প্রলয় হইল না, কিন্তু গভীর রাত্রে একটি ভয়ানক দৃশ্যে আমার দেহ ও মন আলোড়িত হইয়া উঠিল! আজ সুন্দরী সুরমা কি মনোমোহিনী সাজে সজ্জিত হইয়াছে! তাহার সীমন্তে উজ্জল সিন্দূরবিন্দু জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতেছে, প্রকোষ্ঠের শাঁখা কি শুভ্র! তাহার বামহস্তে আলতার পেছে, দক্ষিণ হস্তে ধান্য-পূর্ণ আড়ি, চক্ষে কজ্জল, সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত, কিন্তু তাহার নির্ণিমেষ দৃষ্টি কি ভয়ানক! সুরমা কি আজ উন্মাদিনী? সে কি এই ঘনান্ধকারপূর্ণ প্রলয়ঙ্করী নিশীথে কোন নৈশ অভিসারে যাত্রা করিয়াছে? সঙ্গে এত আলো, এত বাদ্য কেন? পার্শ্বে কি কাহারও মৃতদেহ?—কে বলিয়া উঠিল, আজ রাত্রে সুরমার সহমরণ। সুরমা ধীরে ধীরে আমার পাদমূলে আসিয়া নতমস্তকে বলিল,—"মা, এতদিন বাঁচিয়া মরিয়া ছিলাম, এখন যেন মরিয়া বাঁচিতে পারি। লজ্জা নিবারণ করিও।"

আমি কাঁপিয়া উঠিলাম। ধীরে ধীরে তাহারা শ্মশান অভিমুখে চলিয়া গেল, আমি আমার সমস্ত শাখাপত্র প্রসারিত করিয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম। অনেক দূরে শ্মশানে শুধু একবার মশালের চকিত আলো দেখিতে পাইলাম, ঢাকের শব্দ ঝড়ের শব্দের সঙ্গে মিশিয়া এক একবার রুদ্রতালে আমার কানে আসিয়া নৃত্য করিতে লাগিল; তাহার পর চন্দনের সুগন্ধ আমার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল, ঘৃতাহুতিপূর্ণ জ্বালাময় ঊর্দ্ধমুখ বহ্নিশিখা

আমার চক্ষের উপর আসিয়া পড়িল; অতি ভীষণ 'বল হরি!' শব্দ আমার কর্ণ বধির ও আমার হৃদয় মথিত করিয়া ফেলিল, আমি আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলাম।

সে চলিয়া গেল! কোথায় গেল, জানি না; কোন্ পাপে সেই পবিত্র কুসুম অকালে দগ্ধ হইল, বলিতে পারি না। কিন্তু হায়, শ্রাবণের সেই তিমিরাবগুণ্ঠিত নিশীথে মরণোৎসবের মধ্য দিয়া সে তাহার রোগক্লিষ্ট বৃদ্ধ অক্ষম স্বামীর প্রেমমহিমাদীপ্ত আত্মা সঙ্গে লইয়া কোন্ এক অজ্ঞাত রাজ্যে চিরদিনের জন্য চলিয়া গেল, আর ফিরিয়া আসিল না! আমি মাথা নাড়িয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম, লোকে ভাবিল, শুধু ঝড় আর বৃষ্টি হইতেছে!

তাহার পর কতদিন চলিয়া গিয়াছে। পৃথিবীতে আবার কত নূতন অতিথির আবির্ভাব হইয়াছে; প্রকৃতি তেমনি সুন্দর এবং সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপ, বিহঙ্গের কাকলি, সমীরণের প্রবাহ, তরঙ্গিণীর কলোচ্ছ্বাস তেমনি অবিকৃত রহিয়াছে, কেবল সুরমা নাই! তাহার পরিবর্ত্তে কত ছেলেমেয়ে কতদিন আমার পদতলে, আমার ছায়ায় বসিয়া তেমনি করিয়া খেলা করিয়াছে, কিন্তু আর কাহাকেও আমি তেমন ভালবাসি নাই, আর কাহাকেও আমি তেমন ভালবাসিতে পারিব না; আমার হৃদয় উদাস হইয়া গিয়াছে, মায়ার বন্ধন ছিঁড়িয়া গিয়াছে, পৃথিবীতে শুধু নিত্যকালব্যাপী সুদুঃসহ বিষাদের অভিনয় দেখিয়া জীবনে অনাস্থা জন্মিয়াছে।

এখনও কত গৃহস্থ-বধূ আসিয়া সন্ধ্যাকালে আমার পাদমূলে প্রদীপ রাখিয়া যায়, কত সুন্দরী আমার পদপ্রান্তে প্রণাম করিয়া আমার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করে; কিন্তু আমি তাহাদের কি বলি? আমি বলি, "কেন তোরা এখানে এমন করিয়া তোদের কামনা ব্যর্থ করিতে আসিয়াছিস্? তোদের উপকার করিবার আমার ক্ষমতা নাই; আমি অতি অক্ষম, অতি ক্ষুদ্র, অতি হীন।"—কিন্তু তাহারা আমার কথা বুঝিতে পারে না, দিবারাত্র আমার সেই মর্ম্মকথা তাহাদের কর্ণে অর্থহীন পল্লবমর্ম্মরের ন্যায় প্রবেশ করে। আমি প্রাণপণ আগ্রহে, মাথা নাড়িয়া, শাখা নাড়িয়া, তাহাদের যত কথাই বলি না কেন, তাহারা শুধু শুনিতে পায়—"সন্, সন্, সন্।"

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

অশিক্ষিতা।

১

গ্রামের বিদ্যালয় হইতে পাঠ সমাপ্ত করিয়া, যতীশচন্দ্র যখন অধ্যয়নমানসে কলিকাতায় আসিল, তখন লেখাপড়া শিখিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া সংসারের উন্নতি করাই সে তাহার জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচনা করিত। কিন্তু সৌধারণ্য মহানগরীর ধূলিধূমসমাকীর্ণ বাতাসে শীঘ্রই সেই স্নিগ্ধশোভাময় পল্লিগ্রাম হইতে আগত যুবকের সব কল্পনা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল; আপনার অধ্যয়ন অপেক্ষা অন্য কার্য্যে সে অধিক সময় ব্যয় করিতে আরম্ভ করিল।

রাজনীতি অপেক্ষা সমাজসংস্কারেই তাহার অধিক মনোযোগ লক্ষিত হইত। বাল্যবিবাহের বিপক্ষে বা বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষে যখনই কোথাও বক্তৃতা হইত, তখনই যতীশচন্দ্র সেখানে উপস্থিত হইত; তাহাতে সে বারিপাত এবং ঝঞ্ঝাবাতও গ্রাহ্য করিত না। তদ্ভিন্ন সে "সমাজ-সংস্কার" "শিক্ষা-প্রচারক" প্রভৃতি পত্রে স্ত্রীশিক্ষা, পূর্ব্বরাগ প্রভৃতি সমর্থন করিয়া নানা প্রবন্ধ লিখিত, এবং "মাস-এডুকেসনের" আবশ্যকতা প্রতিপাদনচেষ্টার ত্রুটি করিত না।

এই সকল কথা তাহার দেশের অন্যান্য ছাত্রগণ কর্ত্তৃক তাহার পিতার নিকট বিজ্ঞাপিত হইলে, তিনি মনে করিলেন যে, বিবাহ না হইলে ছেলের এ সকল রোগ দূর হইবার নহে। তিনি পুত্রের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিলেন।

গ্রীষ্মাবকাশের সময় আপনার নববিকশিত নানা মত লইয়া যতীশচন্দ্র গৃহে গেল। কলিকাতা হইতে বাড়ী যাইবার সময় সে স্থির করিয়া গিয়াছিল যে, এবার দেশে যাইয়া দুইটি কার্য্য করিবে, গ্রামে বালিকাদিগের জন্য একটি বালিকা-বিদ্যালয় এবং কৃষকদিগের সন্তানগণের জন্য একটি নৈশ-বিদ্যালয় সংস্থাপন করিবে। "শিক্ষা-বিস্তার-সমিতি" তাহার এই সঙ্কল্পিত মহদনুষ্ঠানে সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছিলেন এবং তাহার নিকট প্রথম দুই মাসের সাহায্য দশটি টাকাও দিয়াছিলেন। দেশের ভবিষ্যৎ সৌভাগ্য কল্পনা করিয়া যতীশচন্দ্র আনন্দোৎফুল্ল হইয়াছিল। সে দেশহিতে, জনহিতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল, আপনার কথা তাহার মনেই ছিল না; সুতরাং যখন বাড়ী আসিয়া সে শুনিল যে, কোন দ্বাদশবর্ষীয়া কুমারীর সহিত তাহার বিবাহ

সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে, তখন সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল। এ বিবাহে সে কিছুতেই সম্মতি দিতে পারিল না।

কিন্তু তাহার মতামতের কিছুমাত্র অপেক্ষা না রাখিয়া তাহার পিতা বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন। সে বাড়ী আসিবার দুই দিন পরে জন দুই ভদ্র লোক আসিয়া পাকা দেখা শেষ করিয়া গেলেন। তখন সে বিবাহ না করিলে তাহার পিতাকে অপমানিত হইতে হয়, কাজে কাজেই এরূপ স্থলে সব বাঙ্গালী ছেলে যাহা করে, যতীশও তাহাই করিল—অর্থাৎ নিতান্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও বিবাহ করিল।

২

বিবাহবন্ধনে একটা কি আছে, যাহাতে বিবাহের অব্যবহিত পর হইতেই পতিপত্নীর মধ্যে পরস্পরের উপর একটা আকর্ষণ সৃজিত হয়; তাই যে নিতান্ত অনিচ্ছায় বিবাহ করে, সেও বিবাহের পর ভাবে, ইহাতে এত আপত্তি করিয়াছিলাম কেন? কিন্তু পূর্ব্বের সকল সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া, বাধ্য হইয়া এই এক বোধোদয়-মাত্র-পড়া অর্দ্ধশিক্ষিতা দ্বাদশবর্ষীয়া কুমারীকে বিবাহ করায় যতীশচন্দ্রের মনে এমনই বেদনা বোধ হইয়াছিল যে, তাহার বেদনাস্রোতে পত্নীর প্রতি তাহার ক্ষীণ আকর্ষণ স্রোতোমুখে লঘু তৃণখণ্ডের মত ভাসিয়া গেল। যতীশচন্দ্র বড় ব্যথিত হইল।

তাহার পর জ্যৈষ্ঠমাসে জামাই-ষষ্ঠীতে শ্বশুরালয়ে নিমন্ত্রণ খাইয়া যতীশচন্দ্র কলিকাতায় ফিরিয়া গেল—কোন বিদ্যালয়ই স্থাপন করা হইল না;—"শিক্ষা বিস্তার সমিতির" দশ টাকা ব্যাগে যেমন আসিয়াছিল, তেমনই ফিরিয়া গেল। ট্রেণে যতীশচন্দ্র ভাবিতে ভাবিতে গেল, কেমন করিয়া সে আর সংস্কারসঙ্কল্পী বন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবে! আর সে কেমন করিয়া সংস্কার-সভায় যোগদান করিবে!

বাস্তবিক কলিকাতায় আসিয়া বন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রথম প্রথম কয়দিন তাহার লজ্জা করিতে লাগিল! এরূপ লজ্জা অধিক দিন স্থায়ী হয় না—কয়দিনেই লজ্জা কাটিয়া গেল; তখন যতীশচন্দ্র আবার নানা সংস্কার সভার কার্য্যে যোগ দিতে লাগিল। কিন্তু বড় দৌড়মুখে একটা বিশেষ বাধা পাইলে, অশ্বের আবার পূর্ব্বের উৎসাহ পাইতে যেমন কিছু বিলম্ব হয়, তেমনই সংস্কারকার্য্যে আবার পূর্ব্বের উৎসাহ পাইতে যতীশচন্দ্রের কিছু বিলম্ব হইল।

এই বিলম্বের যে অবসর, তাহারই মধ্যে যতীশচন্দ্র হৃদয়ে একটা অননু-ভূতপূর্ব্ব ভাব অনুভব করিতে লাগিল। তাহার নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহার হৃদয়ে সেই সদ্যঃপরিণীতা পত্নীর প্রতি একটা আকর্ষণ পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার কারণ বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া যতীশচন্দ্র কিছুই খুঁজিয়া পাইত না। উভয়ে পরিচয় অতি সামান্য; উভয়ের শিক্ষার প্রভেদ প্রভূত; উভয়ের বয়সে অনৈক্য অনেক; উভয়ের জীবনের উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা যথেষ্ট; উভয়ের মনোভাব—তাহাও হয় ত একই প্রকার নহে। তবে এ আকর্ষণের উৎপত্তির কারণ কি, এ আকর্ষণের মূল কোথায়? যতীশচন্দ্র তাহা বুঝিতে পারিত না, তথাপি সে সেই আকর্ষণ অনুভব করিত। সে আকর্ষণ দর্শনের বা বিজ্ঞানের, বিশ্লেষণের বা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

অল্পদিনের মধ্যেই যতীশচন্দ্র আবার পূর্ব্বের মত সংস্কারাদি কার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

৩

সংস্কারকার্য্যে অতিরিক্ত মনোযোগ প্রদান করাতেই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, যতীশচন্দ্র সে বার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিল না।

তাহার পর ক্রমে ক্রমে তিনবার পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইয়া, সময়ে অসময়ে, স্থানে অস্থানে চাকরীর উমেদারী করিয়া, বিফলমনোরথ যতীশচন্দ্র শেষে বাড়ীর টাকায় কলিকাতার বাসার প্রাপ্য চুকাইয়া আসিল। উমেদারীপেশনযন্ত্রের প্রবল চাপে তাহার স্ফীত সংস্কার-সঙ্কল্প অনেকটা ছোট হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু তাহার ব্যাপ্তি যেমন কমিয়াছিল, তাহার কাঠিন্য তেমনই বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল। সে সঙ্কল্প এখন তাহার হৃদয়ের ক্ষুদ্র এক কোণে আসিয়া স্থির হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেই ক্ষুদ্র কোণে সে তাহার পূর্ণভার স্থাপন করিয়া-ছিল, সেখান হইতে তাহাকে স্থানচ্যুত করা আর সহজ নহে।

চাকরীর চেষ্টায় বিফলমনোরথ হইয়া যতীশচন্দ্র গৃহে ফিরিল; কিন্তু তখন তাহার পক্ষে চাকরী করাও আবশ্যক। তাহার পিতার অবস্থা তত ভাল নহে, তাহার পত্নী সুকুমারীর তখন একটি কন্যা হইয়াছে, আর বসিয়া বসিয়া পৈতৃক অর্থ ধ্বংশ করা ভাল দেখায় না। চাকরীর জন্য তাহার চেষ্টার কিছু-মাত্র ত্রুটি ছিল না।

বাড়ী আসিবার অল্প দিন পরেই যতীশচন্দ্র তাহার এক বন্ধুর সুন্দরবনে কোন জমিদারীর নায়েবী পদ পাইল। অগ্নিশ্বাসী মরুমধ্যে পিপাসার্ত্ত স্নিগ্ধ

সলিল পাইলে, যেমন আগ্রহের সহিত তাহা গ্রহণ করে, যতীশচন্দ্র তেমনই আগ্রহের সহিত এই চাকরী গ্রহণ করিল। কিন্তু সে এই চাকরী লইল বলিয়া তাহার সংস্কার-সভার অনেক বন্ধু দুঃখিত হইলেন; কারণ জমিদারী সেরেস্তার কর্ম্মচারীরা যে নিষ্পাপ জীবন যাপন করিতে পারে, এ বিশ্বাস তাঁহাদিগের ছিল না। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, জমিদারী সেরেস্তা পাপের লীলাভূমি।

৪

চাকরী পাইয়া যতীশচন্দ্র সুন্দরবনে গেল—পত্নী সুকুমারী, কন্যা লাবণ্যময়ী এবং চাকর বিশ্বনাথকে সঙ্গে লইয়া গেল।

আদায় তহসিলের কার্য্য সেখানে বড় অধিক নহে। জমিদারী বন, সেই নিবিড় বনমধ্যে এখানে ওখানে দুই চার ঘর প্রজা। প্রজারা সেই বনের মধ্যে দুই চার বিঘা জমিতে ধান্য বুনে, তাহার পর বনে কাঠ আছে, নদীতে মৎস্য আছে, অনাহার ক্লেশ তাহাদিগকে ভোগ করিতে হয় না। আর তাহাদিগের প্রধান কার্য্য—চুরি করিয়া গাছ কাটিয়া বিক্রয় করা; জমিদারের কর্ম্মচারীর প্রধান কার্য্য—এই সকল তস্করের কুঠারাঘাত হইতে বৃক্ষগুলিকে রক্ষা করা। বিস্তৃত বনমধ্যে প্রভুর বৃক্ষ রক্ষা করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। দুই জন নায়েব ইতিপূর্ব্বে সে চেষ্টা করিয়া প্রজাদিগের শানিত কুঠারাঘাত সহ্য করিয়াছেন। তাহার পর যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহারা কিছু অর্থ পাইলে আর তস্করদিগের এ সকল কার্য্য দেখিয়াও দেখিতেন না। কিন্তু যতীশচন্দ্রের কর্ত্তব্যজ্ঞান অন্যরূপ ছিল। সে ভাবিয়া আসিয়াছিল, কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে যদি প্রাণ দিতে হয়, তাহাও দিবে।

নদীর তীরে কাছারিবাড়ী—চারিদিকে সুগঠিত প্রাচীরে বেষ্টিত, দস্যুতস্করের আশঙ্কায় জমিদার কাছারিবাড়ী যথাসম্ভব সুগঠিত এবং সুরক্ষিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কাছারি হইতে দুই তিন ক্রোশের মধ্যে বিদ্যালয় বা চিকিৎসক ছিল না—এতদুভয়ের আবশ্যকও ছিল না। প্রজাদের বিদ্যা-শিক্ষার প্রবৃত্তি বা অবসর কিছুই ছিল না, লেখাপড়া কাহাকে বলে, তাহা তাহারা জানিত না; আর চিকিৎসক—তাহাদের চিকিৎসকের কোনই আবশ্যক ছিল না। কোনরূপ পীড়া হইলে, তাহারা হয় কোনরূপ ঔষধ ব্যবহার করিত না, নহে ত, কোন গাছগাছড়ার রস বা পত্রমাত্র ঔষধরূপে গ্রহণ করিত; অথচ তাহাদিগের মধ্যে শিশুর যকৃৎবৃদ্ধি, যুবকের অজীর্ণ, প্রৌঢ়ের বহুমূত্র ও রমণীদিগের মূর্চ্ছার একেবারেই অসদ্ভাব ছিল!

সেই সুগঠিত বলিষ্ঠ বনবাসীদিগকে দেখিয়া যতীশচন্দ্র ভাবিত—হায়, ইহাদের মধ্যে যদি শিক্ষার বিস্তার করিতে পারিতাম, তবে এ নিষ্ফল জীবনে একটা মহদনুষ্ঠান সাধন করিয়া যাইতে পরিতাম। তাহা কি পারিব না?

যতীশচন্দ্র চেষ্টা করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিল যে, ইহাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের মহৎ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হওয়া অসম্ভব। নিতান্ত দুঃখের সহিত সে সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিল।

শিক্ষাপ্রচারের সৎ সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া যতীশচন্দ্র ভাবিল—যাহাই হউক, যেখানে চিকিৎসা হইলে হয় ত একজনের প্রাণ রক্ষা হইতে পারে, সেখানে যাহাতে বিনা চিকিৎসায় সে না মরে, তাহা করিব। কাহারও অসুখ হইয়াছে শুনিলেই, নায়েব যতীশচন্দ্র আপনার হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স লইয়া তাহার গৃহে উপস্থিত হইত। মলিন ছিন্ন শয্যায় রোগীর পার্শ্বে বসিয়া সে রোগীকে পরীক্ষা করিয়া ঔষধ দিয়া আসিত। ভয়ে রোগীর আত্মীয়গণ তাহার প্রদত্ত ঔষধ গ্রহণ করিত এবং সে গৃহের বাহির হইলেই ঔষধ ফেলিয়া দিয়া, তাহার উদ্দেশে নানা অপ্রীতিকর কটুবাক্য কহিতেও ত্রুটি করিত না। এই সকল কারণে তাহারা নায়েব মহাশয়কে বড় ঘৃণা করিত। যতীশচন্দ্র তাহা বুঝিত না—সে ভাবিত, প্রজাগণ তাহার উপর সন্তুষ্ট হইবে। তাহার এ ভ্রম শীঘ্র নিবারিত হইল না।

৫

কর্ম্মস্থলে আসিয়া যতীশচন্দ্র এক জন দাসী নিযুক্ত করিয়াছিল। তাহার পিত্রালয় কাছারির কাছেই, সে বালবিধবা—পিত্রালয়েই থাকিত। প্রথমে তাহার মাতার মৃত্যু হয়—তাহার পর যতদিন তাহার পিতা জীবিত ছিল, ততদিন ভ্রাতারা এবং ভ্রাতৃবধূরা তাহাকে সম্মান করিয়াই চলিত; ততদিন সেই বাড়ীর কর্ত্রী ছিল। কিন্তু বৃদ্ধ পিতার মৃত্যু হইতে না হইতেই ভ্রাতারা তাহাকে নিতান্ত অনাবশ্যক গলগ্রহ বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল, এবং ভ্রাতৃবধূগণের রসনার তীব্র বিষ তাহাকে কথায় কথায় সহ্য করিতে হইতে লাগিল। অভাগিনীর দাঁড়াইবার অন্য স্থান ছিল না, সে সকলই সহ্য করিয়া থাকিত।

সে যতীশচন্দ্রের গৃহে দাসীপনা করিতে লাগিল।

পত্নীর নিকট তাহার দুঃখদুর্দ্দশার ইতিহাস শুনিয়া, যতীশচন্দ্র বলিত, "যতদিন দেশে শিক্ষাবিস্তার না হইবে, ততদিন স্ত্রীলোকের এ দুঃখ দূর হইবে না। শিক্ষা পাইলে, এমন কি সামান্য কিছু শিল্পশিক্ষা পাইলেও, ইহাকে আজ

আর ভ্রাতাদিগের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হইত না। তাহা হইলে শ্যামা অনায়াসেই আপনার জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারিত। যাহারা অশিক্ষিত, তাহাদিগের দ্বারা কোন মহদনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হওয়া দূরে থাকুক, সকল সময় আপনাদের গ্রাসাচ্ছাদনোপায় হওয়াও অসম্ভব হইয়া উঠে।"

শুনিয়া পত্নী সুকুমারী এক দিন বলিয়াছিলেন, "কেন, যাহারা অশিক্ষিত, তাহাদের দ্বারা কি কোন মহদনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইতে পারে না?"

যতীশচন্দ্র বলিয়াছিল, "যাহাদের মনের বিস্তার হয় নাই, তাহাদের দ্বারা কি কোন মহদনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইতে পারে? অশিক্ষিতা শ্যামার মনে কি কোন মহৎ চিন্তা স্থান পাইতে পারে যে, সে কোন মহৎ কার্য্য করিবে?"

৬

প্রজাদিগের নিকট নূতন নায়েব ক্রমেই অপ্রিয় হইয়া উঠিতে লাগিল। পূর্ব্বে প্রজারা গাছ কাটিলে, নায়েবকে দুই এক টাকা ঘুস্ দিলেই সব চুকিয়া যাইত। কিন্তু যতীশচন্দ্রের সে প্রবৃত্তি ছিল না। তবে সে দোষীর কোন কঠোর শাস্তি বিধানও করিত না, কারণ, সে জানিত শাস্তিতে অনেক সময় ভাল না হইয়া মন্দ হয়; তাই অনেক সময় দোষীকে ন্যায়ান্যায়সম্বন্ধে একটা দীর্ঘ উপদেশ দিয়াই সে ছাড়িয়া দিত।

এক দিন নিশাকালে সহসা জাগরিত হইয়া, যতীশচন্দ্র যেন কাছারির কাছে রাস্তায় কোন ভারী-জিনিস-বোঝাই গরুর গাড়ীর গমন-শব্দ শুনিতে পাইল। পরদিন মুহুরীর নিকট অনুসন্ধান করিয়া সে জানিতে পারিল যে, দস্যুতস্করগণ রাত্রিকালে গাছ কাটিয়া গাড়ী বোঝাই করিয়া লইয়া যায়। সে কথা পূর্ব্বে তাঁহাকে না বলার জন্য সে মুহুরীকে তিরস্কার করিল; সে জানিত না যে, মুহুরী সবই জানিত, অধিকন্তু এই সকল দুষ্কার্য্যে তাহার কিছু আয়ও ছিল।

পরদিন গভীর রাত্রে যতীশচন্দ্র স্বয়ং যাইয়া কাছারির কাছে রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া রহিল। সেখানে অনেকগুলি বিততবহুবল্লি বৃক্ষ, দিবাভাগেও সে স্থানটিকে অস্পষ্টালোকময় করিয়া রাখে। সে দিন অমাবস্যা; ঘনমেঘরাশি আকাশে তারকাকুলের মৃদুজ্যোতিও নির্ব্বাপিত করিয়া দিয়াছে; বনমধ্যে নিবিড় অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না, কিছুই চিনিতে পারা যায় না; কেবল সেই গভীর অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া মধ্যে মধ্যে চঞ্চল চপলালোক দৃষ্ট হইতেছে; টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে; পবন একটু বেগে বহিয়া কাননের মৃদুমর্ম্মর, সম্মোহন সঙ্গীত এবং আর্ত্তচীৎকার মিশাইয়া দিতেছে।

যতীশচন্দ্র দাঁড়াইয়া মশকদংশন সহ্য করিতে লাগিল। বহুক্ষণ মধ্যে শকটের আগমনের কোন লক্ষণই দেখা গেল না। যতীশচন্দ্র ভাবিল, বুঝি আজ আর শকট যাইবে না; সে কাছারিতে ফিরিবে কি না ভাবিতেছে, এমন সময় দূরে শকটের শব্দ শ্রুত হইল—সে স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

শকট নিকটে আসিল, যতীশচন্দ্র উচ্চস্বরে বলিল, "গাড়ী থামাও।"

গাড়ী থামিল। প্রজারা সকলেই জানিত, নায়েবের নিকট রিভলভার থাকে, আর শকটচালক মনে করিয়াছিল যে, নায়েবের সঙ্গে অনেক লোক আছে।

যতীশচন্দ্র বলিল, "গাড়ী কাছারিবাড়ীতে লও।"

শকটচালক প্রহৃত সারমেয়ের মত গাড়ী কাছারিবাড়ীতে লইয়া গেল। শকটচালক যতীশচন্দ্রের দাসী অশিক্ষিতা শ্যামার ভ্রাতা মধু।

পরদিন প্রভাতে যতীশচন্দ্র মধুকে বলিল, "দেখ, আমি ইচ্ছা করিলে তোমাকে শাস্তি দিতে পারি।" তাহার পর সে প্রথামত ন্যায়ান্যায় সম্বন্ধে একটা সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিল। সে বক্তৃতা প্রবন্ধাকারে কোন মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইলে, কেহ পাঠ করিত কি না বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা বলিতে পারি যে, মধু তাহার কিছুই শুনে নাই।

বক্তৃতা শেষ হইলে মধু চলিয়া গেল। হিংস্র জন্তুর মুখ হইতে তাহার শিকার কাড়িয়া লইয়া, তাহাকে তাড়াইয়া দিলে, তাহার নয়নে যেরূপ দৃষ্টি বিভাসিত হইয়া উঠে, দীর্ঘ বক্তৃতাতে গৃহে গমনসময় মধুর নয়নে সেইরূপ দৃষ্টি বিভাসিত হইয়া উঠিল—সে দৃষ্টিতে ঘৃণা এবং প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি পরিস্ফুট।

সে দিন ভ্রাতার ভাব দেখিয়া, শ্যামা শঙ্কিতা হইল। যতীশচন্দ্র কোন সন্দেহই করিল না, বরং একটা লোককে ন্যায়ান্যায় বুঝাইয়া পাপপথ হইতে পুণ্যপথে লইতে চেষ্টা করিয়াছে বলিয়া, সে একটু আত্মপ্রসাদ অনুভব করিল। সে জানিত না, প্রজারা তাহার প্রতি কিরূপ অসন্তুষ্ট হইয়াছে।

৭

মধ্যে মধ্যে কোন কোন পরিবারে এমন দুই একটি মহিলা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদিগকে দেখিলেই মনে হয়, যেন তাহারা যে পরিবারে জন্মান উচিত ছিল, কোন ভ্রমে সে পরিবারে না জন্মিয়া অন্য পরিবারে জন্মিয়াছে। শ্যামাকে দেখিলে তাহাই মনে হইত। তাহার ভ্রাতাদিগের হীন ব্যবহার সে ঘৃণা করিত, তাহার পিতৃগৃহের অপরিচ্ছন্নতা তাহার মনে অত্যন্ত বিরক্তি উৎপাদন করিত, অথচ সে তাহারই মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সে তাহারই

মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু সে সকল তাহার জীবনে প্রভাবসংস্থাপন করিতে পারে নাই।

আবাদী জমি যেমন বহুদিন পড়িয়া থাকিলে তাহার ক্রমবর্দ্ধনশীল উর্ব্বরতা বাহির হইতে পথ না পাইয়া, আপনার মধ্যে আপনি বর্দ্ধিত হয়, এবং যদি কোন ক্রমে তাহাকে একটি ক্ষুদ্র বীজ পতিত হয়, তবে সেই জমি ক্ষুদ্র বীজের উপর আপনার পূর্ব্ব উর্ব্বরতা ঢালিয়া দেয়; তেমনই বালবিধবা শ্যামার হৃদয়ে স্নেহাদি কোমলবৃত্তি বাহির হইবার পথ না পাইয়া হৃদয়েই বর্দ্ধিত হইতেছিল, এবং এখন সে যতীশচন্দ্রের দুহিতা লাবণ্যময়ীর উপর আপনার সেই পূর্ণ স্নেহ ঢালিয়া দিয়াছিল। অন্তরের পূর্ণ আবেগে সে সেই বালিকাকে ভালবাসিত।

শ্যামা বুঝিতে পারিত না, কোথা হইতে এই বালিকা আসিয়া তাহার শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিতেছে। সে ভাবিয়া পাইত না, এই বালিকা তাহার কে। কিন্তু সে তাহাকে ভাল না বাসিয়াও থাকিতে পারিত না।

প্রকৃতপক্ষে অল্পদিনের মধ্যেই শ্যামা আপনাকে যেন যতীশচন্দ্রের পরিবারের কেহ বলিয়া মনে করিত। নিষ্ঠুর স্বজাতিদিগের মধ্যে থাকিয়া, তাহার হৃদয়ে যে কোমলতা ফুটিতে পাইতেছিল না, এখন তাহা ফুটিয়া উঠিল—শ্যামার হৃদয়ে যেন নূতন জগৎ সৃষ্ট হইল।

অশিক্ষিতা শ্যামার হৃদয়ের এত পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইতে পারে, যতীশচন্দ্র তাহা কল্পনা করিতেও পারিত না; কারণ তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, শিক্ষা ভিন্ন হৃদয়ের উন্নতি নাই। কূপমণ্ডুক যেমন বুঝিতে পারে না যে, কূপের বাহিরে বিচিত্রশোভাময় জগৎ থাকিতে পারে; তেমনই তাহার সঙ্কীর্ণ মত লইয়া যতীশচন্দ্র বুঝিতে পারিত না যে, পুঁথিগত বিদ্যা না হইলেও মানবের মনের অসাধারণ উন্নতি হইতে পারে।

৮

যে দিন যতীশচন্দ্র মধুকে ধরিয়াছিল, তাহার পর এক মাস চলিয়া গেল। বর্ষার পর শরৎ আসিল—আকাশে আর স্নিগ্ধগম্ভীর মেঘমালা নাই; উপরে নীল আকাশ আর নিম্নে নদীকূলে সোনার ধান—প্রকৃতির আর সে গম্ভীর মূর্ত্তি নাই, এ যেন ক্রীড়াচঞ্চলা বালিকা। ইহার মধ্যে কোনই গোলমাল হইল না। শ্যামার আশঙ্কা ক্রমেই বিস্মৃতিতে নিমজ্জিত হইয়া যাইতে লাগিল।

ইহার পর এক দিন অপরাহ্ণে বন তদারক করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের পর

ফিরিয়া যতীশচন্দ্র দেখিল, কাছারিতে মুহুরী নাই; তাহার পর পাইকদিগকে ডাকিয়া দেখিল, কেহই উপস্থিত নাই। সে ভাবিল, এ কি! যতীশচন্দ্র কাছারি-বাড়ীর পশ্চাতে যে বাটীতে স্নকুমারী থাকিত, সেখানে গেল। শ্যামাও নাই!

তখন যতীশচন্দ্রেব মনে সন্দেহ হইল। চাকর বিশ্বনাথকে লইয়া দুই জনে চারিদিকে সব দ্বারগুলা বন্ধ করিয়া দিল। তাহার পর স্বামীস্ত্রীতে বসিয়া ভাবিতে লাগিল,—অজানিত বিপদের আশঙ্কায় উভয়েই ত্রস্ত। সুকুমারী বলিল, "আমি শ্যামাকে ভাল বলিয়াই জানিতাম, আজ সেও গেল! ইহাদের বিশ্বাস করিতে নাই।" যতীশচন্দ্র বলিল, "আমি ত বরাবরই বলিয়াছি, যাহার শিক্ষা নাই, তাহার কি মহত্ত্ব থাকিতে পারে? অশিক্ষিতার মনে কি কোন মহৎ চিন্তা স্থান পাইতে পারে?" দুই জনে বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

ক্রমে সূর্য্য অস্ত গেল—বনমধ্যে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। সুকুমারী প্রদীপ জ্বালিল। লাবণ্য ঘুমাইয়া পড়িল। তাহার পর রজৎস্বপ্নে গগন পূর্ণ করিয়া চন্দ্র উদিত হইল।

সহসা কাছারিবাড়ীর সদরদ্বারে কোলাহল শ্রুত হইল। বাহিরে এক দল লোক গৃহবাসীদিগকে দ্বার খুলিয়া দিতে বলিতে লাগিল। উত্তর না পাইয়া তাহারা দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল। দ্বার দৃঢ় কাষ্ঠে নির্ম্মিত, আগাগোড়া বড় বড় পেরেক মারা—কুঠারের ধার নষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল।

যতীশচন্দ্রের নিকট রিভলভার ছিল—সে দ্বারের ছিদ্রপথে তাহা ব্যবহার করিলে হয় ত ইহারা নিবৃত্ত হইত; কিন্তু সে ভাবিল, আমার জীবনও যেমন, ইহাদের জীবনও তেমনই। এই অশিক্ষিত দুর্বৃত্তগণ আমাকে হত্যা করিতে চাহিতেছে বলিয়া, আমি কি ইহাদের হত্যা করিব? যাহা হয় হউক, আমি এ পাপে লিপ্ত হইব না।

এ দিকে দ্বার ভাঙ্গিতে অশক্ত হইয়া দস্যুদিগের মধ্যে এক জন বলিল, "ইহাদের পোড়াইয়া মার।" সে মধু। তখন সকলে কাষ্ঠ ও শুষ্কপত্রাদি আনিয়া দ্বারের নিকট ফেলিতে লাগিল।

ঠিক সেই সময় এক দল সশস্ত্র লোক সেখানে আসিয়া পড়িল। কেহ কেহ পলাইয়া গেল, মধু ও আর কয়জন ধৃত হইল। আগন্তুকদিগের মধ্যে এক জন উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "আমি দারোগা—দ্বার খুলুন।"

দ্বার খুলিয়া স্ফুটচন্দ্রালোকে যতীশচন্দ্র দেখিল, পাঁচ জন দুষ্কৃতকে পাঁচ জন

কনেষ্টবল ধরিয়া রাখিয়াছে, আর তাহাদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আরও কয়জন কনষ্টেবল, দারোগা ও শ্যামা!

শ্যামার চরণ ধূলিধূসর—সে তখনও পথশ্রমে হাঁপাইতেছে। যতীশচন্দ্র বলিল, "শ্যামা, তুমি এখানে?" শ্যামা বলিল, "আজ যখন জানিতে পারিলাম এই কাণ্ড হইবে, তখন বুঝিলাম আজ কাছারিবাড়ীতে কেহ থাকিবে না। কাজেই, আর কাছারিতে সংবাদ দেওয়া বৃথা জানিয়া, আমি একেবারে থানায় গিয়াছিলাম।"

শ্যামার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। মুহূর্ত্ত মধ্যে কনষ্টেবলের হস্ত হইতে হস্ত মুক্ত করিয়া, বসনাভ্যন্তর হইতে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা লইয়া, মধু তাহা ভগিনীর হৃদয়ে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিয়া বলিল, "তোর কাজ?" কয় জন কনষ্টেবল তাড়াতাড়ি যাইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

শ্যামা পড়িয়া গেল। যতীশচন্দ্রের দিকে চাহিয়া সে এক বার ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "লাবণ্যকে লইয়া আপনি দেশে ফিরিয়া যাইবেন।" সে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িল।

তাহার বিদীর্ণ ফুস্‌ফুস্ হইতে রক্তস্রোত এবং তাহার দেহ হইতে জীবন স্রোত বাহির হইয়া যাইতে লাগিল। চন্দ্রালোক তাহার মরণাহত মুখে আসিয়া পড়িল, সে মুখে কোন বেদনাব্যঞ্জক ভাব দৃষ্ট হইল না।

রাণী ভবানী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাজ্য-নাশ।

আলিবর্দ্দী জিতেন্দ্রিয় সাধুস্বভাব ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি বলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসে সুপরিচিত হইয়াছেন। বিলাসলোলুপ ব্যসনাসক্ত মুসলমান নবাবদিগের ন্যায় সুরা এবং সহচরী লইয়া আত্মহারা না হইয়া, আলিবর্দ্দী একটিমাত্র সহধর্ম্মিনীতে অনুরক্ত থাকিয়া, সাধ্যানুসারে প্রজারঞ্জন করিতেন। তাঁহার সাধুস্বভাবের পরিচয় পাইয়া, অল্পদিনের মধ্যেই লোকে তাঁহার অনুরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু ঘটনাচক্রের অনতিক্রমনীয় আবর্ত্তনে, এরূপ শান্তস্বভাব প্রবীন নরপতির শাসন-সময়েও রামকান্ত এবং রাণী ভবানীর সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল!

এতকাল পর্য্যন্ত দেবীপ্রসাদ উপযুক্ত সুযোগ লাভ করিবার জন্য অলক্ষিতভাবে নীরবে দিন-গণনা করিতেছিলেন। রাষ্ট্র-বিপ্লবে সম্পূর্ণ নূতন নরপতি সিংহাসনে পদার্পণ করায়, দেবী-প্রসাদের অভীষ্টপূরণের সুসময় সমুপস্থিত হইল। তিনি নবাব-দরবারে উপস্থিত হইয়া প্রকাশ করিলেন যে, মহারাজ রামজীবনের উত্তরাধিকারীহীন রাজসাহী-রাজ্য বড়ই বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার যথোপযুক্ত শাসন-সংরক্ষণের জন্য তিনি একখানি সনন্দ পাইবার প্রার্থনা করিতেছেন। বলা বাহুল্য যে, রাজসাহীর ন্যায় অর্দ্ধবঙ্গব্যাপী বিশাল রাজ্যের রাজকরসংগ্রহের জন্য নবাব সরকার ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, এবং দেবীপ্রসাদের অভিযোগের সত্যমিথ্যা নির্ণয় করিবার জন্য কালক্ষয় না করিয়া, তাঁহাকেই আবশ্যক "সনন্দ" প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। এই সনন্দখানি এরূপ সুকৌশলে এবং এত অল্প সময়ের মধ্যে দেবীপ্রসাদের হস্তগত হইল যে, রামকান্ত বা রাণী ভবানী ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিলেন না। তাঁহারা যখন প্রকৃত অবস্থা অবগত হইলেন, তখন আর দেবীপ্রসাদের গতিরোধ করিবার সম্ভাবনা ছিল না; তখন তিনি লোক লস্কর লইয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছেন! সুতরাং দেবীপ্রসাদ সহজেই রামকান্ত এবং রাণী ভবানীকে গৃহতাড়িত করিয়া সগৌরবে রাজসাহীর শাসনভার গ্রহণ করিলেন।

নাটোর-রাজবংশের ইতিহাসে ইহাই গৃহবিবাদের প্রথম সূচনা। কিন্তু এই গৃহবিবাদের আনুপূর্ব্বিক কাহিনী লইয়া ইতিহাস-লেখকদিগের মধ্যে বহুবিধ বাদপ্রতিবাদ চলিয়া আসিতেছে। রাণী ভবানী যে সত্য-সত্যই রাজ্যভ্রষ্ট ও গৃহতাড়িত হইয়া জগৎশেঠের সহায়তায় পুনরায় রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে কোনরূপ মতপার্থক্য নাই; এবং নবাব আলিবর্দ্দীর শাসন সময়েই যে এই দুঃখদুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাও সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু কি জন্য, কাহার চক্রান্তে, কোন্ সময়ে এই রাজ্যনাশ সংঘটিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

এই ঘটনা বর্ণনা করিতে গিয়া একজন লেখক লিখিয়া গিয়াছেন, "পতি রামকান্ত অষ্টাদশবর্ষবয়স্ক তরুণ যুবক। যৌবনের প্রারম্ভে তাঁহার হৃদয়মন যৌবনোচিত চাঞ্চল্যে পূর্ণ। বিপুল অর্থের অধিকারী হইয়া, অসংখ্য দাস দাসীর উপর আধিপত্য পাইয়া, তাঁহার যৌবনোচিত হৃদ্বেগ আর কিরূপে নিবৃত্ত থাকিবে? অর্থ অমৃতময়; কিন্তু ব্যবহারের বিপর্য্যয়ে তাহা হইতে

প্রাণনাশক বিষের সৃষ্টি হয়। তরুণ রামকান্ত আর অর্থের ব্যবহার কি জানেন? সুতরাং তাঁহার হস্তে অর্থ অনর্থকর হইল। দয়ারাম বহুকাল হইতে রাজসরকারের কর্ম্মচারী। রামজীবনের মৃত্যুর পর রামকান্তের পরিদর্শনের ভার তাঁহার উপরেই অর্পিত হয়। রামকান্তের বিকৃত চরিত্রকে (!) প্রকৃতিস্থ করিবার কারণ তিনি রামকান্তকে নানারূপ উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু রামকান্ত সে হিত বাক্য শুনিলেন না। ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে গরীয়ান্ নবীন যুবক দয়ারামকে অবমানিত করিয়া বাটী হইতে বাহির করিয়া দিলেন। * * * * দয়ারাম সুবুদ্ধিসম্পন্ন, ধর্ম্মনিষ্ঠ। অবমানিত হইয়া রাজভবন হইতে বিতাড়িত হইলেন বটে, কিন্তু তিনি প্রতিপালকের অধঃপতন দেখিতে পারিলেন না। * * * * রামকান্তের চৈতন্যসম্পাদন দয়ারামের লক্ষ্য। রামকান্তের অধঃপতন অনিবার্য্য দেখিয়া, সুবুদ্ধির গুণে তিনি ধীরে ধীরে সে লক্ষ্য কার্য্যে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন!

"এই সময়ে বঙ্গদেশ নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর শাসনাধীন। অত্যাচার করা তাহাদের অঙ্গের ভূষণ। কুলকামিনীর পবিত্র কুল তাহাদের অত্যাচারে রক্ষা হওয়া বড়ই কঠিন ছিল। চতুর দয়ারাম আলিবর্দ্দীচরিত বিশেষ পরিজ্ঞাত ছিলেন। * * * * তিনি আলিবর্দ্দী সমীপে বলিলেন, 'রাজসাহীর রাজভাণ্ডার অর্থপরিপূর্ণ। অথচ রাজা রামকান্ত আপনাদের প্রাপ্য কর প্রদান না করিয়া অর্থের অপব্যয় করিতেছেন। সুতরাং আপনি রামকান্তকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তৎস্থানে নূতন লোক নিযুক্ত করুন।' দয়ারামের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া, অর্থলোলুপ আলিবর্দ্দী এই সুযোগ ত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন, রাজ্য কিছুদিন লোকের মনপ্রবোধের জন্য অন্যের হস্তে অর্পণ করিয়া, পরে আবার তাহা যবনরাজ্যভুক্ত (!) করিয়া লইব। * * * সৈন্যদল পাঠাইয়া আলিবর্দ্দী রামকান্তের রাজ্য কাড়িয়া লইলেন। বলপ্রদর্শনপূর্ব্বক অকারণে অন্যায়রূপে রামকান্তকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া, দয়ারামের অভিলাষক্রমে লোকের মন বুঝাইবার জন্য, দেবীপ্রসাদ রায় নামে ঐ বংশীয় এক ব্যক্তি রাজ্যভার প্রাপ্ত হইলেন। সস্ত্রীক রামকান্ত গৃহত্যাগী হইয়া জগৎশেঠের শরণ লইলেন।" *

এই স্থূলেখক যেরূপ উজ্জ্বলভাবে দয়ারাম ও আলিবর্দ্দীর গুপ্ত কথোপকথন পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া স্বতই মনে হয় যে,

* দ্বাদশনারী।

অবশ্যই এরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সরস বর্ণনার কোন না কোনরূপ ঐতিহাসিক প্রমাণ বর্ত্তমান আছে। সে প্রমাণ কি, লেখক কিন্তু একবারও তাহার উল্লেখ করেন নাই। ঐতিহাসিক জীবন-চরিত লিখিতে বসিয়া, তদুপলক্ষে কাহারও ব্যক্তিগত চরিত্রে দুরপনেয় কলঙ্ক আরোপ করিতে হইলে, যেরূপ নিরপেক্ষ সত্যনিষ্ঠা ও অনুসন্ধানতৎপরতা থাকা আবশ্যক, আমাদের মধ্যে সেরূপ প্রবৃত্তি প্রয়োজনানুরূপ বিকাশ লাভ করে নাই। আমরা সামান্য একটু জনশ্রুতি পাইবামাত্র কল্পনা-বলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গড়িয়া তুলি, এবং স্বকপোলকল্পিত চিত্রখানি লইয়া জনসাধারণের নিকট ইতিহাস বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকি! উপন্যাস-পিপাসা এতই প্রবল যে, একটু লিপিচাতুর্য্য, একটু সরস-পদলালিত্য-বিকাশ, অথবা একটু অনুপ্রাস-প্রয়োগ-কৌশল দেখাইবার সুবিধা পাইলে, তাহার অনুরোধে ঐতিহাসিক সত্যনির্ণয়ের জন্য কিছুমাত্র ব্যাকুল না হইয়া, যথেচ্ছভাবে পদবিন্যাস করিতে প্রবৃত্ত হই!

'দ্বাদশনারী'তে রাণী ভবানীর যে সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে কোনরূপ স্বাধীন অনুসন্ধানতৎপরতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বোধ হয় 'নবনারী'-লেখকের পদানুসরণ করিয়াই 'দ্বাদশনারী' রচিত হইয়া থাকিবে। 'নবনারী'-লেখক বহুদিন রাজসাহী-প্রদেশে বসতি করিয়া অনেক জনশ্রুতি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও সবিশেষ সত্যানুসন্ধানের চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। 'নবনারী' এবং 'দ্বাদশনারী', এই উভয় গ্রন্থেই লিখিত আছে যে, ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে মহারাজ রামজীবন পরলোকগমন করেন,—তৎকালে রামকান্ত "অষ্টাদশবর্ষবয়স্ক তরুণ যুবক।" উভয় লেখকেরই এইরূপ ধারণা যে, তৎকালে আলিবর্দ্দী বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার নবাব। কিন্তু ইতিহাসপাঠী পাঠশালার বালকেরাও জানে যে, ১৭৪০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আলিবর্দ্দী সিংহাসনে পদার্পণ করেন নাই;—১৭৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি পাটনার শাসনকর্ত্তা, একজন রাজকর্ম্মচারী মাত্র!

১৭৩০ খৃষ্টাব্দে রামজীবনের মৃত্যু হয়;—ইহা সত্য হইলেও, তৎকালে রামকান্ত "অষ্টাদশবর্ষবয়স্ক তরুণ যুবক", এ কথা সত্য হইতে পারে না। ১৭২৪ অথবা ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে রাজকুমার কালিকাপ্রসাদের অভাবে রামকান্তকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করা হয়। সুতরাং ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে রামকান্ত "অষ্টাদশবর্ষবয়স্ক তরুণ যুবক" হইলে, দত্তকগ্রহণের সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম ১৩ বৎসরের ন্যূন হইতে পারে না। 'দ্বাদশনারী'তে লিখিত আছে যে, রামকান্ত যখন "অষ্টাদশ

বর্ষবয়স্ক তরুণ যুবক”, রাণী ভবানীর তখন ১৫ বৎসর বয়ঃক্রম। এই হিসাবে রাণী ভবানীর বিবাহের সময় লইয়াও বিলক্ষণ বিতর্ক উপস্থিত হয়। অতি শৈশব-কালে “গৌরীদান”-প্রথামতে রাণী ভবানীর উদ্বাহকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল; ‘দ্বাদশনারী’র হিসাবে রামকান্ত তখন একাদশ বৎসরের বালক! রামজীবন কি বিবাহের পর ত্রয়োদশবর্ষবয়স্ক রামকান্তকে সস্ত্রীক দত্তকগ্রহণ করিয়াছিলেন? বয়ঃক্রমসম্বন্ধে ‘দ্বাদশনারী’-রচয়িতা যেরূপ ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইয়াছেন, তাঁহার অন্যান্য বর্ণনার মধ্যেও সেইরূপ ভ্রমপ্রমাদ রহিয়া গিয়াছে।

রাণী ভবানী বা নাটোর রাজবংশ সম্বন্ধে যত পুস্তকে এই রাজ্যনাশ-কাহিনী লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ‘দ্বাদশনারী’তেই কল্পনার প্রাবল্য কিছু অতিমাত্রায় প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় যে, এই লেখক বোধ হয় মিত্র মহাশয়ের সরসবর্ণনার উপর আরও একটু রং চড়াইয়া, স্বরচিত ইতিহাসখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। মিত্র মহাশয় রাজসাহীতে ডেপুটী কালেক্টরী করিবার সময়ে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। নানা কারণে দিঘাপতিয়ার রাজপরিবারের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সূত্রপাত হয়। সেই সূত্রে প্রাচীন কর্ম্মচারিদিগের নিকট যে সকল ‘গল্পগুজব’ শুনিতে পাইয়াছিলেন, মিত্র মহাশয় তাহার একবর্ণও পরিত্যাগ করেন নাই। সুতরাং মিত্র মহাশয়ের সকল কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা নিরাপদ নহে। *

* “If Ramkanta had had something of the intelligence and foresightedness of his wife, he would have succeeded in managing the Raj; but he had not in his whole composition a particle of that strong common sense and clear judgment which distinguished the Maharani Bhabani. He was destitute of the faculty of appreciating the merits of men, and he could never distinguish friends from foes. A few months after he succeeded to the Estate, he quarrelled with Dayaram Rai who had been the firm friend, the trusted adviser and confidential agent of Ramjibana. The Raj *being in arrears*, Dayaram remonstrated with the Maharaja *against his* careless management and pointed out to him the necessity and importance of collecting and punctually forwarding the revenue to the Nawab. Ramkanta, being unable to appreciate this disinterested advice, was offended with his outspokenness. He first ceased to be guided by the

মিত্র মহাশয়ের বর্ণনালালিত্যে মুগ্ধ হইয়া অনেকেই তাঁহার বর্ণিত বিষয়ের সমালোচনা করিবার চেষ্টা করেন নাই। যে দেশে ইতিহাসের সমাদর নাই, সে দেশে জনশ্রুতিই একমাত্র সম্বল; সুতরাং বংশপরম্পরায় প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের অনুকম্পায় অনেক অলৌকিক জনশ্রুতি এইরূপে ইতিহাস বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে। যাঁহাদের পলিতকেশ, গলিতদন্ত, শিথিলচর্ম্ম বহুদর্শনের পরিচায়ক বলিয়া লোকসমাজে সমাদর লাভ করিয়াছে, তাঁহারা যখন বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে “সে কালের” প্রাচীন কাহিনী বর্ণনা করিতে আরম্ভ করেন, তখন সে সকল কথার প্রতিবাদ করা অসম্ভব হইয়া উঠে। নীরবে পিতামহীর কাহিনী শুনিবার মত, মধ্যে মধ্যে ‘হুঁ’ পূরণ করা ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু মিত্র মহাশয় ইতিহাস লিখিতে বসিয়াও, এই সকল উপকথায় ‘হুঁ’ পূরণ করিয়া সত্যানুসন্ধানের পথ কঠিন করিয়া তুলিয়াছেন।

দয়ারামের বাহাদুরি বাড়াইবার জন্য যাঁহারা এই সকল জনশ্রুতির সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, মিত্র মহাশয় সেই সকল মূল প্রস্রবণ হইতে কাহিনী

advice of Dayaram, then ceased to shew common courtesy to him, whom he had been taught by Ramjiban to regard and address as his *dada* or elder brother and at last he dismissed him from the post of Dewan. Surrounded by a band of flatterers, he was led by them to believe Dayaram to be more an enemy than a friend. Dayaram was astounded and disgusted with this insult and wishing to bring the young Maharaja to his senses, he proceeded to Moorshidabad, *where he represented the real* state of things to the Nawab. Having entire confidence in the Rai Rayan, His Excellency deprived Ramkanta of the management of the Raj: and made it over to Deviprasad, the son of Visnuram and nephew of Ramjiban. Ramkanta was helpless and solicited the interference of his *quondam* Dewan for the restoration to the Raj. Dayaram compassionating the condition of Ramkanta, and specially of his wife, Maharani Bhabani, for whom he had great regard, moved, and with success, the court of Moorshidabad to restore the rightful owner to the Gadi. Dayaram returned to the old post of Dewan after having taught his young master a lesson which he was not in a hurry to forget.”—The Rajas of Rajshahi.

সংগ্রহ করিতে গিয়া, দয়ারামের ধর্ম্মনিষ্ঠ, উদার চরিত্র কলঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। দয়ারামের ন্যায় প্রভুভক্ত রাজকর্ম্মচারীর পক্ষে এরূপ ব্যবহার করা আদৌ সম্ভব কি না, সে কথার আলোচনা করা প্রয়োজন বোধ করেন নাই। দয়ারাম যেরূপ বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান বলিয়া চিরপরিচিত, তাহাতে মুসলমান দরবারের অব্যবস্থিতচিত্ততার কথা তাঁহার নিকট অপরিজ্ঞাত থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না। একবার মুসলমান নবাব দেবীপ্রসাদকে রাজ্যদান করিলে, আবার যে রামকান্ত পিতৃরাজ্যে অধিকার লাভ করিতে সক্ষম হইবেন, তাহা কেহই বিশ্বাস করিতে পারিত না। দয়ারাম মুসলমান দরবারের রীতিনীতি জানিয়া শুনিয়াও, এরূপ অসমসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সম্মত হইবেন কেন? মিত্র মহাশয় যে সকল কারণে দয়ারামের ক্রোধোদয়ের সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, সে গুলি এতই অকিঞ্চিৎকর যে, তাহার বিস্তৃত সমালোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। রামকান্ত কেন, কোন রাজাই স্বহস্তে রাজকার্য্য সম্পাদন করেন না। সুতরাং দয়ারামের ন্যায় বিচক্ষণ রাজকর্ম্মচারী থাকিতে রামকান্ত যে রাজস্বপ্রদানে শিথিলতা প্রদর্শন করিবার অবসর পাইয়াছিলেন, তাহা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। প্রকৃত প্রস্তাবে রামকান্ত যে একবৎসরও রাজস্বদানে ত্রুটি করেন নাই, এখনও তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ বিলুপ্ত হয় নাই। এরূপ অবস্থায়, রামকান্তের রাজস্বদানের শিথিলতা উপলক্ষ করিয়া, দয়ারামের যত্নে রামকান্তের রাজ্যনাশ ও বনবাস সংঘটিত হওয়া সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। দয়ারামের বিষয় বিভবের অভাব ছিল না—তিনি মহারাজ রামজীবনের সময় হইতেই তরফ নন্দকুজাদিগরের তালুকদার বলিয়া লোকসমাজে পরিচিত ছিলেন। রামজীবনের কৃপায় এই তালুক লাভ করিয়া দয়ারাম সবিশেষ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাহা উপভোগ করিতেছিলেন। এই তালুকের রাজস্ব নাটোররাজসংসারে প্রদান করিতে হইত, এবং এই তালুকের অস্তিত্বও সে কালের রীতি অনুসারে নাটোর রাজবাটীর অনুগ্রহের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করিত। সুতরাং দয়ারামের ন্যায় বিচক্ষণ রাজমন্ত্রী, যে বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছেন, তাহারই মূলচ্ছেদ করিয়া আপনার হাতে আপনার সর্ব্বনাশ-সাধনের চেষ্টা করিবেন কেন?

রামকান্তের চরিত্র-সম্বন্ধে মিত্র মহাশয় যাহা লিখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার সহিত 'দ্বাদশনারী'র বর্ণনার সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। নবাবসরকারের কাগজ পত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রামকান্তের শাসনসময়েই রাজসাহী-রাজ্যের

সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতি হইয়াছিল। সে রাজ্য সর্ব্বতোভাবে "যবনরাজ্যভুক্ত" থাকাই ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। লোক-প্রবোধের জন্য তাহাকে দিনকতক মাত্র পরের হাতে রাখিয়া, অবশেষে শনৈঃ শনৈঃ "যবনরাজ্যভুক্ত" করিয়া লইবার জন্য আলিবর্দ্দীর এত মস্তিষ্ক-কণ্ডুয়ন উপস্থিত হইবে কেন? নবাবী আমলের গল্পগুজব প্রায়ই অসম্ভব কাহিনী ও 'দ্বাদশনারী'লেখকের এই সকল ঐতিহাসিক বিবরণ তাহারই উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

আর একজন লেখক বলেন যে, ১১৫৮ সালের সমসময়ে রায় রাইয়াঁ নন্দকুমারের চক্রান্তে পড়িয়া মহারাণী ভবানী রাজ্যচ্যুতা হন; কিন্তু তখন তিনি বিধবা। * মিত্র মহাশয় ইহারও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। † সুতরাং মিত্র মহাশয়ের মতানুসারে রাণী ভবানীর দুইবার রাজ্যনাশ উপস্থিত হইয়াছিল, এবং দুইবারই আলিবর্দ্দীর সময়ে। আমরা ইহার কোনরূপ প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। প্রকৃত অবস্থা না জানিয়া আলিবর্দ্দী একবার মাত্র রাণী ভবানীকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন, তাহার পর প্রত্যেক বর্ষেই নবাবদপ্তরে রাণী ভবানীর নামজারি দেখিতে পাওয়া যায়।

১১৫৮ সালের সমসময়ে রাণী ভবানীর সবিশেষ গৌরবের অবস্থা। তখন তিনি ভারতবর্ষের বিবিধ পুণ্যক্ষেত্রে দেবমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া পুণ্য পিপাসার পরিচয় দিতেছিলেন। এই সকল মন্দিরফলকে শকাব্দার উল্লেখ আছে। তৎকালে রাজ্যনাশ ও বনবাস সংঘটিত হইলে, এই সকল পুণ্যকীর্ত্তি সংস্থাপিত হইতে পারিত না।

রাজ্যচ্যুত হইলে রাণী ভবানীর আর দাঁড়াইবার স্থান রহিল না! তিনি জগৎ শেঠের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, দেওয়ান দয়ারামের সহায়তায় রাজ্যলাভের জন্য নবাব-দরবারে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। লেখকদিগের মধ্যে মতভেদ বিস্তর। কিন্তু সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, আলিবর্দ্দীর শাসন সময়েই এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল! কাহার চক্রান্তে রাণী ভবানীর সর্ব্বনাশ হইয়াছিল, কেবল সেই সম্বন্ধেই যাহা কিছু মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

রাজসাহী প্রদেশে অদ্যাপি শুনিতে পাওয়া যায় যে, রাণী ভবানী মণি-মুক্তাপ্রবালাদি অপেক্ষা স্বর্ণালঙ্কারই বহুল পরিমাণে পরিধান করিতেন।

---

* গৌড়ে ব্রাহ্মণ।

† The Rajas of Rajshahi.

ইহাতে অল্পবয়স্কা শেঠকন্যারা কথঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া জিজ্ঞাসা করিত যে, রাণীজী সুবর্ণের ধাতুপাত্র প্রস্তুত না করিয়া, তাহাকে পরম সমাদরে অঙ্গে ধারণ করিয়াছেন কেন? তৎকালে রাণী ভবানীর এরূপ দৈন্যদশা যে, রাজ্যোদ্ধারের জন্য যাহা কিছু ব্যয় করিতে হইয়াছিল, তাহার জন্যও অঙ্গের অলঙ্কারগুলি খুলিয়া দিতে হইয়াছিল! এ সকল অবশ্যই "গল্পগুজব"; কিন্তু তথাপি ইহা রাণী ভবানীর বৈধব্যদশার "গল্পগুজব" নহে।

কুচক্রী দেবীপ্রসাদের ষড়যন্ত্রে পড়িয়াই যে রামকান্ত ও রাণী ভবানীকে রাজ্যভ্রষ্ট ও গৃহতাড়িত হইতে হইয়াছিল, এবং প্রভুভক্ত দয়ারাম ও ক্ষমতা-শালী জগৎশেঠের অধ্যবসায়গুণেই যে তাঁহারা নষ্ট রাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহাই বিশ্বাস-যোগ্য বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত।

এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, বাপুদেব শাস্ত্রী নামক এক জন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বহু পূর্ব্বে আলিবর্দ্দীর সিংহাসনলাভের কথা গণনা করিয়া দিয়াছিলেন। * এই জনরব সত্য হউক আর মিথ্যা হউক, আলিবর্দ্দীর সময়ে এক জন হিন্দু সাধুপুরুষ এবং তাঁহার শিষ্য নন্দকুমারের সবিশেষ ক্ষমতাবৃদ্ধি হইয়াছিল। নন্দকুমার অলক্ষিত ভাবে ইতিহাসে প্রথম পদার্পণ করেন; পরে নবাব আলিবর্দ্দীর সময় হইতে গবর্ণর ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময় পর্য্যন্ত, বাঙ্গালার ইতিহাস কেবল মহারাজ নন্দকুমারের নামে এবং কার্য্যবিবরণীতে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। আলিবর্দ্দীর শাসন-সূচনাতে নন্দকুমার মুর্শিদাবাদের নবাব-দরবারে সবিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার পর নন্দকুমার যখন হুগলীর ফৌজদার, তখন তাঁহার মনস্তুষ্টিসম্পাদনের জন্য ইংরাজ বণিকেরাও তাঁহাকে বৎসরে ২৭০০৲ টাকা পার্ব্বণী প্রদান করিতে বাধ্য হইতেন! † এই মহারাজ নন্দকুমারের চক্রান্তেই রাণী ভবানীর সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইয়াছিল; কিন্তু "গৌড়ে ব্রাহ্মণ"-রচয়িতা মহাশয় তাহার যেরূপ কালনির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদিগের নিকট অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। নন্দকুমারের চক্রান্তে রাজ্যনাশ সংঘটিত হইয়া থাকিলে, নন্দকুমার মুর্শিদাবাদের নবাব-দরবারে বাস করিবার সময়েই যে তাহা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয়। কিন্তু "গৌড়ে ব্রাহ্মণ"-রচয়িতা মহাশয় কালনির্দ্দেশ করিয়াছেন,

* মহারাজা নন্দকুমার—শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ সেন।

† Long's Selections from the Records of the Government of India, Vol. I.

তখন নন্দকুমার হুগলীর ফৌজদার, এবং রাণী ভবানী বৈধব্যভারগ্রস্ত—আত্মজীবনে বীতরাগ হইয়া জামাতা রঘুনাথ লাহিড়ীর নামে নবাব-সরকারে রাজসাহী-রাজ্যের নামজারি করিয়াছিলেন!

দেবীপ্রসাদ বহুদিন হইতে যে রাজসাহী-রাজ্যের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া চাহিয়া কালপ্রতীক্ষা করিতেছিলেন, নন্দকুমারের চক্রান্তে সেই রাজসম্পদ প্রাপ্ত হইয়াও দীর্ঘকাল উপভোগ করিবার অবসর পাইলেন না! জগৎশেঠের কল্যাণে রামকান্ত এবং রাণী ভবানী কয়েক মাস পরেই নষ্ট রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন।

মহারাজ রামকান্ত এবং মহারাণী ভবানী দেবী যখন শেঠগৃহে আতিথ্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, জগৎশেঠের ইতিহাস-বিখ্যাত রাজবাটীর তখন বড়ই গৌরবের অবস্থা। এখনও সেই ধ্বংশাবশিষ্ট ইন্দ্রপুরীকে লোকে 'মহিমাপুর' বলিয়া পরিচয় প্রদান করে। কিন্তু এখন আর মহিমাপুরের পূর্ব্ব মহিমার লেশমাত্রও বর্ত্তমান নাই। সে বিচিত্র সৌধমালার অধিকাংশই ভাগীরথী-গর্ভে বিলীন হইয়াছে! এখনও যাহা কিছু ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা আর মানুষের বাসোপযোগী বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু ভাগ্যবিবর্ত্তনের বিচিত্র শাসনে জগৎশেঠের দীন দরিদ্র বংশাবতংসগণ সেই জরাজীর্ণ রাজপ্রাসাদের কয়েকটি মসীমলিন ভগ্নকক্ষেই কোনরূপে কালাতিপাত করিতেছেন! শেঠ-ভবন বাঙ্গালার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু যে গৃহের গুপ্তমন্ত্রণাবলে পলাসিবীর বৃটীশ-বণিক্ কালক্রমে ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় অধিনায়কপদে সমারূঢ় হইয়াছেন, সে মন্ত্রভবন এখন নদীগর্ভে, তাহার উপর দিয়া ভাগীরথীর জলস্রোত ধীর মন্থরগতিতে কায়ক্লেশে প্রবাহিত হইতেছে। * যেখানে বাদশাহের মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহার আর চিহ্নমাত্রও বর্ত্তমান নাই;—ইংরাজবণিক তাহার শেষ ইষ্টকখানিও সর্ব্বোচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিয়া, মুদ্রাযন্ত্রের সাজসরঞ্জামগুলি কুড়াইয়া লইয়া, অন্যত্র যাদুঘর সুসজ্জিত করিবার উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। † যে গৃহে শুভ পুণ্যাহ-উপলক্ষে বাঙ্গালাদেশের ছোট বড় সকল জমীদারকেই কখন না কখন সসম্ভ্রমে জানু পাতিয়া উপবেশন করিতে হইত; যেখানে আবশ্যকমতে বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার প্রবলপ্রতাপ মুসলমান নবাবদিগকেও সময়ে সময়ে শুভাগমন

* H. Beveridge. C. S.

† Hunter's Bengal Mss.

করিতে হইত; যেখানে ঋণগ্রহণের জন্য, অথবা পদাশ্রয়লাভে নবাবের উৎপীড়ন হইতে নিরাপদ হইবার জন্য, জগৎশেঠের কৃপাকটাক্ষের প্রতীক্ষায় চিন্তাক্লিষ্ট বৃটীশ-বণিক দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া প্রহর গণনা করিতেন; সে সকল ঐতিহাসিক প্রাসাদকক্ষ এখন ধূলিবিলুণ্ঠিত হইতেছে। কয়েকটি জীর্ণ তোরণ, তাহার উপর কতকগুলি তৃণলতা, এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রাশি রাশি ইষ্টক ও প্রস্তরস্তূপ ব্যতীত জগৎশেঠের রাজবাটীতে এখন আর দেখিবার বস্তু অল্পই পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার প্রত্যেক জীর্ণ প্রস্তরের সঙ্গে শতবর্ষের গুপ্তকাহিনী এখনও যেন চিরজীবন্ত হইয়া রহিয়াছে।

এই শেঠভবনে রাজসাহীর রাজ-পরিবারের যেরূপ সমাদর ছিল, তাহাতে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া রামকান্ত ও রাণী ভবানী যদি এক জন প্রতিনিধি পাঠাইয়াও জগৎশেঠের সাহায্য প্রার্থনা করিতেন, তাহাতেও সমাদরের ত্রুটি হইত না। তাঁহারা সশরীরে শেঠভবনে সমাগত হইলে, জগৎশেঠ প্রাণপণে তাঁহাদের কল্যাণসাধনে নিযুক্ত হইলেন। আলিবর্দ্দীকে প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত করিতে যাহা কিছু বিলম্ব হইল। আলিবর্দ্দী অবিলম্বে মূলানুসন্ধান করিয়া আবার রামকান্তকেই রাজসাহী-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন।

নাক্ষত্রিক সংঘর্ষণ।

সুব্যবস্থার উদাহরণ দিতে হইলে, লোকে সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া খুব গাম্ভীর্য্যের সহিত বলে, "বিধাতা কেমন সুন্দর কৌশলে এই অনন্ত সৃষ্টিখানা শাসনে রাখিয়াছেন; তাঁহার রাজ্যে বিদ্রোহিতা নাই, আর তাঁহার আইনগুলি এত সূক্ষ্ম ও অভ্রান্ত যে, সেই সৃষ্টির কাল হইতে সেগুলা একবারমাত্রও সংশোধিত না হইয়া, কেমন পরস্পর নির্ব্বিরোধ-ভাবে কার্য্য করিয়া আসিতেছে।" এ কথাগুলি ভ্রমপূর্ণ বলা যায় না, বুদ্ধিমান ক্ষুদ্র মানুষ যখন সজ্ঞানে অর্থহীন "ভুয়ো" কার্য্য করে না, তখন সেই মানুষের সৃষ্টিকর্ত্তা—অনন্ত বিশ্বের বিধাতা যে যথেচ্ছ কার্য্য করিবেন, এ কথা কিছুতেই গ্রাহ্য নয়। তাঁহার সৃষ্টিব্যাপী আইন-সকল নিশ্চয়ই কোন এক গূঢ় উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য কার্য্য করিতেছে; কিন্তু সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধিপথে অগ্রসর হইবার কালীন তদ্দ্বারা যে কোন উচ্ছৃঙ্খল কার্য্য হয় না, তাহা বলিতে পারি না। মেকলে সাহেবের পিনালকোড নামক আইনগ্রন্থখানির উদ্দেশ্য অতি মহৎ; তাহার সাহায্য ব্যতীত রাজ্যস্থিতি ও শান্তিরক্ষা অতীব কঠিন, এ সকলই সত্য; কিন্তু তাহার ব্যবহারে যে উচ্ছৃঙ্খলতা নাই, কে বলিবে? ভগবদ্‌ভক্ত বলিবেন, "হে মঙ্গলময় বিধাতা, তোমার রাজ্যে অকল্যাণ নাই, তোমার ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক কার্য্যই গভীর উদ্দেশ্যপূর্ণ ও সৎ, এ কথা ধ্রুব সত্য; কিন্তু দয়াময়! মধ্যে মধ্যে এ প্রকার ভূমিকম্প হইলে কি সৃষ্টি থাকিবে? তোমার মঙ্গলময় নামে আর কলঙ্ক লেপন করিও না, প্রভো, লীলা সংবরণ কর।" অতি নিরীহ রাজভক্ত নাগরিক বলিবে, "হে সুবিজ্ঞ ব্যবস্থাকার, পিনাল কোড্‌টা খুব ভাল আইন, ইহার প্রত্যেক ধারার প্রত্যেক কার্য্যটি তোমার অসাধারণ বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিতেছে সত্য; কিন্তু একটা হাঙ্গামা হইলে, মাদৃশ নিরীহকেও গোলাগুলির ভয়ে গৃহকোণে আশ্রয় লইয়া, আইনপ্রয়োগকর্ত্তা পুলিশের ভয়ে কম্পিত হইতে হয় কেন? অতএব হে আইনবিশারদ, অধীনদের প্রতি একটু কৃপাকটাক্ষপাত কর।" শান্তিময় সুব্যবস্থিত রাজ্যের আইনকানুনের কার্য্যে যে প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা মধ্যে মধ্যে দেখা যায়, একটু সূক্ষ্মভাবে পর্য্যালোচনা করিলে, অশেষ কল্যাণের নিদানভূত প্রাকৃতিক নিয়মেরও সেই প্রকার অপব্যবহার ও তজ্জনিত দৃশ্যতঃ কুফল প্রায়ই দৃষ্ট হয়। এই ব্যাপারের উদাহরণ, প্রকৃতির অনেক কার্য্যেই আমরা দেখিতে পাই; তন্মধ্যে আকাশরাজ্যের অধিবাসী জ্যোতিষ্কগণ সময়ে সময়ে তদ্দ্বারা যে নির্য্যাতন ভোগ করে, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রাচীন গ্রীক্ দার্শনিকগণ গ্রহনক্ষত্রাদির নিয়মিত গতি ও নক্ষত্রাদির স্থিরতা দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, আকাশস্থ প্রত্যেক জ্যোতিষ্ক, নির্দ্দিষ্ট গতিতে ভ্রমণ করিতে করিতে, এক সুমধুর সঙ্গীতরব উত্থিত করিয়া পরমেশ্বরের মহিমা গান করিতেছে, সে সঙ্গীতের বিরাম নাই। মানুষ ও অপর প্রাণীগণ উক্ত মহান্ গীতে যোগ দিয়া, তালে তালে পদক্ষেপ করিয়া সংসারে আনাগোনা করিতেছে, এই ঐকতান সঙ্গীতের একটি স্বরও "বেসুরা" নয়, তাহার "তাল" "ফাঁক" "সম" ঠিক্ যথাকালে পড়িয়া থাকে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে জ্যোতিষ্কপরিদর্শনোপযোগী নানা উন্নত যন্ত্রের উদ্ভাবনে ক্রমেই সে বিশ্বাস অপনীত হইতেছে—দূরবীক্ষণাদি যন্ত্র সাহায্যে এখন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ গ্রহনক্ষত্রাদিগণের সেই নৃত্য দেখিতে পাইতেছেন না, এবং উক্ত মহান্ সঙ্গীতের রসাস্বাদনও করিতে পারিতেছেন না। প্রাচীনেরা যাহাকে ঐকতান সঙ্গীত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সেটা

আধুনিকের নিকট, তাললয়হীন ও হাহাকারপূর্ণ বিকট চীৎকাররূপে প্রতিভাত হইতেছে। জ্যোতিষ্করাজ্যে গ্রহউপগ্রহাদির গতি প্রভৃতিতে সুন্দর নিয়ম দৃষ্ট হইয়া থাকে বটে, কিন্তু পক্ষান্তরে এ প্রকার জ্যোতিষ্ক অনেক দেখা যাইতেছে, যাহারা লক্ষ্যহীন হইয়া অনন্ত আকাশে মহাবেগে ছুটাছুটি করিতেছে।

প্রাচীনেরা যে সকল নক্ষত্র নিশ্চল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে তাহাদের সকলেরই পূর্ব্বোক্ত প্রকার অসংযত গতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই আবিষ্কার-বার্ত্তা জগতে ঘোষিত হইলে, সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন, এবং ভ্রাম্যমাণ নক্ষত্রগণের পরস্পর সংঘর্ষণ সম্ভবপর কি না, এই প্রশ্ন অনেকের মনে উদিত হইয়াছিল; কিন্তু অনেক দিন অবধি ইহার মীমাংসা হয় নাই। এই ঘটনার বহুকাল পরে, জ্যোতির্বীগণ এক জাতীয় "পরিবর্ত্তনশীল তারকা" (Variable Stars) আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই নক্ষত্র প্রায় জ্যোতিষ্কপুঞ্জমাত্রেই দৃষ্ট হইয়া থাকে; ইহাদের বিশেষত্ব এই যে, এগুলি সহসা প্রথম শ্রেণীর তারকার ন্যায় উজ্জল হইয়া, পরে কয়েক দিবসের মধ্যে ক্রমশ অদৃশ্য হইয়া যায়। এই ব্যাপার কোন পার্থিব কারণ বা দৃষ্টিবিভ্রম দ্বারা সংঘটিত হয় বলিয়া, জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ প্রথমতঃ বিষয়টির তত্ত্বানুসন্ধানে মনোনিবেশ করেন নাই। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে হঠাৎ একটি অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রের উদয় এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তাহার অন্তর্দ্ধান প্রত্যক্ষ করিয়া, উহা যে একটা প্রকৃত নাক্ষত্রিক ব্যাপার, তাহা সকলেই বুঝিয়াছিলেন, এবং ঐ সময় হইতে অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিত "পরিবর্ত্তনশীল তারকার" উৎপত্তিতত্ত্বনির্ণয়ের জন্য নানা পরিদর্শনাদি করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু অনেকদিন অবধি তদ্বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। অধুনা ভুবনবিখ্যাত জ্যোতিষী আচার্য্য বলপ্রমুখ পণ্ডিতগণ তারকাগণের আকস্মিক প্রজ্জলন, নাক্ষত্রিক সংঘর্ষণের ফল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মানুষের দৃষ্টিশক্তি সীমাবদ্ধ, এবং মানব-বুদ্ধি-প্রসূত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদিরও শক্তি সসীম। মানবচক্ষুর অগোচর এবং সহস্র সূর্য্যাপেক্ষাও বৃহত্তর কোটি কোটি অসংখ্য জগৎ অনন্ত আকাশবক্ষে ভাসমান রহিয়াছে;—ইহাদের অস্তিত্ব অতি বৃহৎ দূরবীক্ষণযন্ত্রসাহায্যেও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বলেন, উক্ত অদৃশ্য জগৎ মহাবেগে পরিভ্রমণ করিতে করিতে ভ্রমণপথের কোন স্থানে অপর জ্যোতিষ্কের সহিত সংঘর্ষণ প্রাপ্ত হইলে, ঘর্ষণজাত তাপ দ্বারা উভয়েই প্রজ্জলিত হইয়া আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া পড়ে, এবং শীঘ্রই উক্ত তাপ দ্বারা উভয়েই ভস্মীভূত হইয়া পুনরায় অদৃশ্য হইয়া যায়। সংঘর্ষণজাত তাপ দ্বারা দুইটা বৃহৎ জগৎ এককালীন প্রজ্জলিত হইয়া ভস্মীভূত হওয়া অসম্ভব মনে হয় বটে, কিন্তু ইহা প্রকৃত ঘটনা। প্রতি সেকেণ্ডে আঠার মাইল হিসাবে পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। সার্ রবার্ট বল্ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, যদি পৃথিবী এই নির্দ্দিষ্ট গতিতে চলিয়া ঠিক তাহার ন্যায় আর একটি জ্যোতিষ্কের সহিত সংঘর্ষণ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে উভয়েই প্রজ্জলিত হইয়া অল্প সময় মধ্যে কেবল বাষ্পরাশিতে পরিণত হইবে।

জ্যোতিষ্কপরিদর্শনকার্য্যে ফটোগ্রাফি ও রশ্মিনির্ব্বাচন-যন্ত্র (Spectroscope) প্রভৃতির ব্যবহার প্রচলিত হওয়ায়, অতি অল্পকাল মধ্যে অনেক নাক্ষত্রিক সংঘর্ষণ দৃষ্ট হইয়াছে। কয়েক বৎসর হইল, হারভার্ড বিদ্যালয়ের সুবিখ্যাত মানমন্দির হইতে কেবল একটি নক্ষত্ররাশিতে ৮৭টি সংঘর্ষণের ফটোগ্রাফ ছবি তোলা হইয়াছিল। অন্যান্য নক্ষত্ররাশির তুলনায় কন্যারাশিস্থ তারকাগুলির মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষণজাত উৎপাত দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন্ রাশিতে কি পরিমাণে এই নাক্ষত্রিক উৎপাত সংঘটিত হইতে পারে, অদ্যাপি তদ্বিষয়ের অনুসন্ধান শেষ হয় নাই, জ্যোতির্ব্বিদ্ নিযুক্ত রহিয়াছেন। এক সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, প্রত্যেক রাশির দৃশ্যমান নক্ষত্রের সংখ্যার সহিত সংঘর্ষণ-পরিমাণের একটা নির্দ্দিষ্ট অনুপাত আছে; কিন্তু সে অনুপাতটি যে কি, তাহা আজও স্থিরীকৃত হয় নাই।

প্রতি মুহূর্ত্তেই আকাশরাজ্যে এই প্রকার সৃষ্টিনাশ প্রত্যক্ষ করিয়া, ভবিষ্যতে আমাদের সৌরজগৎটার অবস্থা কি হইবে ভাবিয়া, অনেকে আকুল হইয়াছেন। কক্ষপরিভ্রমণ ও মেরু-রেখা-আবর্ত্তনজাত আহ্নিক গতি ব্যতীত পৃথিবীর আরও একটা গতি আছে,—সেই গতি যে কেবল পৃথিবীরই আছে, তাহা নয়; স্বয়ং গ্রহরাজ সূর্য্য এবং সৌর-পরিবারস্থ প্রত্যেক গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতুও সেই গতির বশবর্ত্তী হইয়া মহাশূন্যে পরিভ্রমণ করিতেছে। সূর্য্য নিশ্চল বলিয়া যে একটি কথা আছে, তাহার অর্থ অন্যরূপ। চলিষ্ণু যানে এক ব্যক্তি স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে এবং অপর এক আরোহী তথায় চলাফেরা করিলে, প্রথম ব্যক্তিকে দ্বিতীয়ের তুলনায় যে প্রকার নিশ্চল বলা যায়, সেই হিসাবে গতিশীল গ্রহউপগ্রহাদির তুলনায় সূর্য্য স্থির। আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ সমবেত সৌর জগতের উক্ত গতি সম্বন্ধে অনেক বিষয়ের আবিষ্কার করিয়াছেন। পাঠকপাঠিকাগণ দেখিয়া থাকিবেন,

কোন দ্রুতগামী যান আরোহণ করিয়া চলিলে, যানের সম্মুখস্থ দূরবর্ত্তী বৃক্ষাদি প্রথমতঃ নিবিড় জঙ্গলরূপে দৃষ্ট হয়, কিন্তু কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই সেগুলির পরস্পর ব্যবধান বেশ বুঝা যায়; আবার উক্ত বৃক্ষ সকল অতিক্রম করিয়া চলিলে, তাহাদের পরস্পরের ব্যবধান ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইতে আরম্ভ হয়। এই প্রকারে যানের গতির অন্য কোনও চিহ্ন জানিতে না পারিলেও, কেবল উক্ত চিহ্ন দ্বারা গতির দিক্ ও পরিমাণাদি পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। আকাশের এক অংশের নক্ষত্র ক্রমেই পরস্পর বিচ্ছিন্ন এবং তাহার ঠিক বিপরীত অংশস্থ তারকাসকল পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইতে দেখিয়া, ঠিক্ পূর্ব্বোক্ত উদাহরণানুযায়ী সমবেত সৌরজগতের গতির অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। জ্যোতিষিগণ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, সূর্য্যদেব ক্ষুদ্র বৃহৎ গ্রহউপগ্রহাদি পরিবৃত হইয়া, হারকিউলিস্ রাশিস্থ একটি নক্ষত্র লক্ষ্য করিয়া, বৎসরে ৩৩ কোটি মাইল তদভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। কথাটা যে অতীব বিস্ময়কর ও ভয়জনক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই ভবিষ্য মহাপ্রলয়ের ভয়ে, আপাততঃ উৎকণ্ঠার কোনও কারণ নাই। হারকিউলিস্ রাশির যে নক্ষত্রটির সহিত পৃথিবীর সংঘর্ষণের সম্ভাবনা অনুমিত হইতেছে, তাহা সৌরজগৎ হইতে বহুদূরে অবস্থিত; এই ব্যবধান এত অধিক যে, আলোক প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ আশি হাজার মাইল গমন করিয়াও, ৫১ বৎসরে উক্ত সুদীর্ঘ ব্যবধান অতিক্রম করিতে পারে না। পণ্ডিতগণ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, প্রায় দুই কোটি বৎসর পরে উক্ত প্রলয় সংঘটিত হইবে; প্রতিযুগে জীবরাজ্যের যে প্রকার পরিবর্ত্তন হইতেছে, উক্তসময়ান্তে পৃথিবীর অবস্থা কি প্রকার থাকিবে, তাহা সহজেই অনুমতি হইতে পারে। সম্ভবতঃ সেই দূর ভবিষ্যতে নানা-বৈচিত্র্যময় এই জীবরাজ্য, জলবায়ুশূন্য প্রাণিহীন চন্দ্রের দশা প্রাপ্ত হইয়া ভ্রমণ করিবে, এবং সহসা এক দিন হারকিউলিস্ রাশির সহিত মিলিত হইয়া, অনন্ত আকাশের এক অংশ কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য আলোকিত করিয়া চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইবে। হয় ত সৌরজগতের এই ভয়ানক পরিণামের স্মৃতি, কোন নবাভ্যুদিত জ্যোতিষ্কের অধিবাসিগণের হৃদয়ে কিয়দ্দিন জাগরিত থাকিবে, আবার কিছু কাল পরে তাহাও লুপ্ত হইয়া, এই অতি ক্ষুদ্র কীর্ত্তিটির অস্তিত্বের কাহিনী পর্য্যন্তও বিস্মৃতিসাগরে মগ্ন হইবে।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

দশ বৎসরে ইংরাজী সাহিত্য।

সাহিত্যের এই নিত্য পরিবর্ত্তনের যুগে বিগত দশ বৎসরে ইংরাজী সাহিত্যে যে প্রভূত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধের সংকীর্ণ পরিসরে তাহার সম্যক আলোচনা করা সহজ নহে, বুঝি সম্ভবও নহে। সম্প্রতি নর্থ আমেরিকান রিভিউ পত্রে প্রখ্যাতনামা ইংরাজ সমালোচক মিষ্টার এডমণ্ড গস্ এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন; আমরা তাঁহার প্রবন্ধের সার সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

লেখকের মতে বিগত দশ বৎসরে ইংরাজী সাহিত্যে প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয়, প্রাচীন লেখকদিগের তিরোভাব এবং নবীন লেখকদিগের আবির্ভাব। বিগত দশ বৎসরে ইংরাজী

মৃত্যুর প্রভাব।

সাহিত্যের প্রাচীন সেবকগণ প্রায় সকলেই মরণের মহাস্বপ্নে অভিভূত হইয়াছেন। সাহিত্যস্রোত প্রবাহিত হইতে হইতে স্থানে স্থানে বাধা পাইয়া কিছুক্ষণ বিলম্ব করে। মনীষাসম্পন্ন মহাপুরুষদিগের জীবনের দীর্ঘতার সহিত এই বিলম্বও বর্দ্ধিত হয়। কারণ সে সকল সাহিত্যসেবক প্রায়ই খ্যাত্যাপন্ন, রক্ষণশীল মতের এবং জনসাধারণ কর্ত্তৃক প্রতিভানুসারে সম্যকরূপে সম্মানিত। সাহিত্যের স্রোতোমুখে তাঁহারা দৃঢ়গঠিত গিরির মত দণ্ডায়মান হইয়া, সেই প্রবাহে বাধা প্রদান করেন। মরণের করস্পর্শে সে সকল বাধা দূর হইলে সাহিত্যস্রোত অগ্রসর হয়। প্রমাণস্বরূপে ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে বেন জনসনের, ১৭০০ খৃষ্টাব্দে ড্রাইডেনের, এবং ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে স্যামুয়েল জনসনের মৃত্যুর উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঐ সকল বৎসরে সাহিত্যের কাটা খালে যেন নূতন জোয়ারের জল প্রবেশ করিতে পাইয়াছিল।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজী সাহিত্যে পূর্ব্বোক্তরূপ প্রবীন সাহিত্যসেবকের সংখ্যা বড় অল্প ছিল না। টেনিসন, ব্রাউনিং, নিউম্যান, যোয়েট, টিণ্ডাল, হাক্স্লি, কিংলেক, ফ্রুড, ইঁহারা

বিশেষত্ব।

সকলেই তখন জীবিত। সকলেই ভাবিয়াছিলেন যে, এই সকল প্রাচীন সম্মানিত লেখকের কর্ম্মক্লান্ত জীবনের অবসানের অধিক বিলম্ব নাই; কিন্তু ইহাও সকলে আশা করিয়াছিলেন যে, সেই সকল ভাস্বর জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতিষ্কের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাকৃত অল্পদিনের নবীন জ্যোতিষ্কগণ সাহিত্যাম্বরে তাঁহাদিগের স্থান অধিকার করিয়া আলোক ও জ্যোতিঃ বিকীরণ করিবেন। টেনিসন ও ব্রাউনিং যাইলেও, ম্যাথু আর্ণল্ড ও উইলিয়াম মরিসের থাকিবার সম্ভাবনাই অধিক ছিল। যোয়েট যাইলেও পেটারের থাকিবার সম্ভাবনা ছিল, এবং ফ্রুডের পর তাঁহার স্থান ফ্রিম্যান অধিকার করিবেন, ইহাই একরূপ নিশ্চিতই ছিল। কিন্তু এই বিগত দশ বৎসরের বিশেষত্ব এই যে, ইহার মধ্যে প্রবীণ লেখকদিগের এবং যে সকল অপেক্ষাকৃত নবীন লেখকগণের তাঁহাদিগের স্থান অধিকার করিবার সম্ভাবনা ছিল, তাঁহাদিগেরও মৃত্যু হইয়াছে। প্রাচীন লেখকদিগের মধ্যে এখন দুই জন মাত্র জীবিত—রাস্কিন ও স্পেন্সার। ইঁহাদিগের মধ্যে আবার রাস্কিনের লেখনী দীর্ঘকাল পরিশ্রমের পর এখন নিশ্চল হইয়াছে। কাজেই প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রবীণ সাহিত্যসেবকদিগের মধ্যে এখন এক স্পেন্সারই বর্ত্তমান।

আশায় নিরাশা।

সহজেই আশা করা যায় যে, এই সকল প্রবীণ লেখকদিগের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বহু প্রতিভাশালী নবীন লেখকের আবির্ভাবে সাহিত্যাম্বর আলোকিত হইবে; কিন্তু হায়, দুঃখের সহিত এ কথা স্বীকার করিতে হয় যে, সে আশা সফল হয় নাই। ইহার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর লেখকের আবির্ভাব বড় হয় নাই। এখন গ্রন্থকারদিগের ব্যবসায় বেশ লাভজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে সত্য; কিন্তু ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের পর উচ্চাঙ্গের সাহিত্যস্রোতে আর কখনও এমন মন্দা পড়ে নাই।

কেবল কবিতাই এই নিয়মের বহির্ভূত দেখা যাইতেছে।

কবিতার উন্নতি।

আর্ণল্ড, ব্রাউনিং, রসেটি এবং সর্ব্বোপরি টেনিসনের মৃত্যুতে কবিতায় প্রভূত পরিবর্ত্তন হইয়াছে—কবিতার কিছু সুবিধাও হইয়াছে বলিতে হইবে। টেনিসনের মৃত্যুর সময় সংবাদ-পত্রের লেখকগণ বলিয়াছিলেন যে, এইবার কবিতার মৃত্যু হইল; এখন প্রমাণ হইয়াছে যে, তাঁহাদিগের সে ভবিষ্যৎবাণী সত্য নহে। প্রবীণ লেখকদিগের জীবনকালে পাঠকগণ বহু প্রতিভাশালী তরুণ কবির সংবাদ রাখেন নাই—তাঁহারা অনাদৃত ছিলেন। এখন বিহগের প্রথম কাকলির মত তাঁহাদিগের মধুর সঙ্গীতে পাঠকগণকে মুগ্ধ করিতে লাগিল। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কবিতার পূর্ণ প্লাবন—এখন সে প্লাবন সরিয়াছে সত্য; কিন্তু স্রোতস্বতী এখনও কূলে কূলে ভরা। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের নবকবিগণ যদি প্রবীন কবিদিগের মরণজনিত সাহিত্যের ক্ষতি সম্পূর্ণরূপে সম্পূরণ করিতে না পারিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহাদিগের আবির্ভাবে সাহিত্যের যে প্রভূত উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

উপন্যাসের প্রাচুর্য্য।

বিগত দশ বৎসরে বহু উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে; তাহার মধ্যে দুই চারখানি প্রথম শ্রেণীর। অনেকগুলি সুখপাঠ্য এবং অবশিষ্ট গুলি অসার—সাহিত্যের আবর্জ্জনা মাত্র। উপন্যাস অনেক স্থলে নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। আজকাল লোকে উপন্যাস ভালবাসে, উপন্যাসই এখনকার "ফ্যাসান", তাই সকল লেখকই উপন্যাস লিখিবার চেষ্টা করেন—তা সেদিকে তাঁহাদিগের প্রতিভা থাকুক আর নাই থাকুক; ইহাতে সাহিত্যের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। ষ্টিভেন্‌সনের প্রতিভা প্রবন্ধ-রচনা এবং হয় ত দর্শনালোচনার উপযোগী ছিল; কিন্তু প্রথম ছেলেদের জন্য "ট্রেসার আইল্যাণ্ড" আরম্ভ করিয়া শেষ তিনি উপন্যাস রচনাই করিয়া গিয়াছেন। শ্রীমতী হামফ্রি ওয়ার্ড উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করাতে আমরা এক জন প্রতিভান্বিত সাহিত্য-সমালোচক হারাইয়াছি। এইরূপ মিষ্টার জর্জ্জ মুরে আমরা এক জন সমাজতত্ত্ববিৎ এবং মিষ্টার ওয়াই-ম্যানে এক জন ঐতিহাসিক হারাইয়াছি। সকল শ্রেণীর লেখকগণ যে আর সকল বিষয় ছাড়িয়া উপন্যাসরচনায় প্রবৃত্ত হইতেছেন, ইহা সত্য সত্যই বড় আশঙ্কার বিষয়।

উপন্যাসের অপকারিতা।

উপন্যাসের এই অতিরিক্ত আদরের অবশ্যম্ভাবী ফলে পাঠকগণ এখন উপন্যাস ব্যতীত আর কিছুই পাঠ করিতে চাহেন না। লেখক যদি কোন নূতন ভাব, কোন নূতন মত প্রচার করিতে চাহেন—তবে তাঁহাকে তাহা উপন্যাসে প্রচার করিতে হইবে, নহিলে কেহ তাহা পাঠ করিবে না। এখন ক্রমেই পাঠকের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে সত্য, কিন্তু গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের কথার সহিত মিশাইয়া না দিলে কোন বিষয় ভাল করিয়া পাঠ করেন, এমন পাঠকের সংখ্যা ক্রমেই কমিতেছে ভিন্ন বাড়িতেছে না। এখন যাঁহারা উপন্যাস ব্যতীত আর কিছু লিখেন, তাঁহারা আলোচ্য বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করেন; কিন্তু বড় অধিক পাঠক সে সকল পাঠ করেন না। অধিকাংশ পাঠক উপন্যাস এবং সংবাদপত্র ব্যতীত আর কিছু পাঠ

করিতে চাহেন না। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, "Modern Painters", "The Grammar of Assent", এমন কি "The History of Civilisation"ও যদি বিগত দশ বৎসর মধ্যে প্রকাশিত হইত, তবে অল্প লোকেই সে সকলের আদর করিত। বাক্‌ল, নিউম্যান, এমন কি রাস্‌কিন যদি বিগত দশ বৎসরের মধ্যে আবির্ভূত হইতেন, তবে তাঁহাদিগকেও আপনাদিগের মত-প্রচারের জন্য বাধ্য হইয়া উপন্যাস লিখিতে হইত।

আজ কাল আবার যুবকদলে ব্যায়াম-চর্চ্চাটা অসম্ভব বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দশ বৎসরে ইংরাজী সাহিত্যে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় তিনটি—ইতিমধ্যে প্রবীণ লেখকদিগের প্রায় সকলেরই মৃত্যু হইয়াছে; ইতিমধ্যে ইংরাজী সাহিত্যে উপন্যাসের কিছু অধিক আবির্ভাব হইয়াছে; ইতিমধ্যে সাহিত্যের পক্ষে অশুভজনক ব্যায়ামপ্রিয়তা এবং ব্যবসাব্যাপৃতি অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে।

শিক্ষা।

শিল্প-বিদ্যা।

ইংলণ্ডে আজকাল টেক্‌নিক্যাল এডুকেশন অর্থাৎ শিল্পবিদ্যাশিক্ষার একটা হুজুগ উঠিয়াছে। সহসা পাউণ্ড-পূজক ইংরাজের এ নূতন হুজুক কেন? ইহার প্রধান কারণ,—জার্ম্মানির বাণিজ্যে অসাধারণ উন্নতি। ফ্রি ট্রেড অর্থাৎ অবাধ বাণিজ্যের পথরোধ করিয়া জার্ম্মানি এখন আপনার বাণিজ্যে বিস্ময়কর উন্নতি করিয়া লইয়াছে। এই ভারতবর্ষেই দেখিতে পাই, জার্ম্মানির সস্তা জিনিস অনেক স্থলেই ইংলণ্ডের জিনিসকে আর আমল দিতেছে না। তাই এখন Made in Germany শুনিলে ইংরাজ শিহরিয়া উঠে। ইংরাজের বিশ্বাস এই, শিল্পবিদ্যাশিক্ষার আধিক্যেই জার্ম্মানির এত উন্নতি; তাই ইংলণ্ডে এই নূতন হুজুগ। এই হুজুগ আমাদের দেশে পর্য্যন্ত আসিয়াছে। আমাদের রাজনৈতিক সভাসমিতিতে আজকাল গরিব প্রজাপুঞ্জের অবস্থার উন্নতির পক্ষে এই শিল্পবিদ্যাশিক্ষা মহৌষধ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। শিল্পবিদ্যাশিক্ষা সম্ভবমত ভাল, সন্দেহ নাই; কিন্তু এখন হুজুগ এমন প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, আমাদের আশঙ্কা হয়, কতকদিন পরে আমাদের দেশে কেহ কেহ বঙ্গদেশের পলিপড়া মাটিতে কর্ণওয়ালের বিশুদ্ধ টিন বাহির করিবার কল্পনা করিবেন।

সম্প্রতি লণ্ডনে School of Economicsএ বিগত আদমসুমারীর কর্ত্তা মিষ্টার বেন্‌স্ এবং দেশদ্রোহী সার মান্‌চারজি ভবনগরী, ভারতবর্ষে শিল্পবিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তদুভয় প্রবন্ধের সারসংগ্রহ প্রদান করিলাম।

মিষ্টার বেন্‌সের কথা।

সুবিধা অসুবিধা।

কেবল শিল্পবিদ্যাশিক্ষা কেন, সকল শিক্ষাই সাধারণের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হওয়া আবশ্যক। নহিলে তাহাতে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা নাই। বিদেশের আমদানী জিনিস সকল সময় সাধারণের পক্ষে উপকারী হয় না। বঙ্গদেশে অশ্বত্থবৃক্ষ বিনা যত্নেও বর্দ্ধিত হয়; কিন্তু বহু যত্নেও ওক বৃক্ষ জন্মে কি না সন্দেহ;—আবার জন্মিলেও তাহা স্বাভাবিকরূপে বর্দ্ধিত হইবে না। মধ্য-যুগের শেষভাগে য়ুরোপের অবস্থা যেরূপ ছিল, এখন ভারতবর্ষের অবস্থা কতকটা সেইরূপ।

ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা ইংলণ্ডের নবীন খরস্রোত সভ্যতার সংঘর্ষে আসিয়া বিশিষ্ট পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হইয়াছে,—যেন সে প্রাচীন সভ্যতার মূলদেশ কিছু শিথিল হইয়া পড়িয়াছে; তদ্ভিন্ন ভারতবর্ষে এবং পশ্চিম য়ুরোপে নৈসর্গিক প্রভেদও প্রভূত।

ভারতবর্ষ প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান দেশ। ভারতবর্ষ উষ্ণপ্রধান দেশ, তদ্ভিন্ন ভারতবর্ষে কলকারখানার প্রধান উপযোগী জিনিস—কয়লা এবং লৌহ—বড় সুলভ প্রাপ্য নহে। উষ্ণপ্রধান দেশে মানব সাধারণতঃই কিছু শ্রমবিমুখ হয়; তদ্ভিন্ন উষ্ণপ্রধান দেশে কলকারখানায় বহুলোকের একত্র সমবেশ বড় সুবিধাজনক নহে। কলকারখানার জন্য সহর বাজার আবশ্যক; কিন্তু ভারতবর্ষে শতকরা কেবল পাঁচ জন লোক সহরে বাস করেন। অবশিষ্ট সকলেই পল্লীগ্রামে নীরবে জীবন যাপন করে। এখন ইংরাজ-শাসনে লোকের গতায়াতের সুবিধা হইয়াছে, এখন লোকে বহির্জগতের সংবাদ রাখিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে অধিকাংশ লোকে গ্রামে পিতৃপিতামহাদিক্রমে অধিকৃত জমি চাষ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। এক গ্রামের লোক পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসীদিগের সংবাদও রাখিত না! গ্রামেই গ্রামবাসীদিগের আবশ্যকসম্পূরণের জন্য কুম্ভকার, সূত্রধর, কর্ম্মকার, তন্তুবায়, ক্ষৌরকার মিলিত; তাহাদিগের কার্য্যের জন্য তাহারা গ্রামে কোন জমি খাসে বা ভাগে আবাদ করিত, অথবা কৌলিকপ্রথানুসারে কিছু কিছু নগদও পাইত। তখন লোকের এত অভাব ছিল না, তখনও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে ভারতবাসী আপনার চারি দিকে অভাবের ক্রমবর্দ্ধনশীল

সেকাল ও একাল।

গণ্ডি দেয় নাই, কাজেই ব্যবসায়ীরাও অধিক মক্কেল সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিত না—করিবার সুবিধাও ছিল না। দেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত ছিল, শুল্ক দিতে দিতে ব্যবসায়ীর প্রাণান্ত হইত। ইহার উপর আবার দস্যুভয়, এমন কি, রাজকর্ম্মচারীদিগের ভয়ও ছিল। আবার জাতিভেদের কঠোর শাসনে ব্যবসায়ীকে পুরুষানুক্রমে একই ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিতে হইত। জাতিভেদের এই শাসন এখন অনেকটা শ্লথ হইয়া আসিয়াছে, এখন ব্রাহ্মণ কায়স্থও পূর্ব্বপুরুষের অকৃতপূর্ব্ব অনেক ব্যবসায় অবলম্বন করিতেছে। পৈতৃক ব্যবসায় ছাড়িয়া অনেকে এখন কলে কাজ করিতেছে; কলিকাতায় ও পশ্চিমভারতবর্ষে অনেক কলে লোকে বৎসরে কয় মাস খাটিয়া থাকে, তাহাতে জাতির অভিমান বড় থাকে না। (সে অনেকটা—"পেট কি ওয়াস্তে।")

পুরুষানুক্রমে একই ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকায় যেমন অপকার হয়, তেমনই উপকারও হয়। প্রতাপগড়ের মিনার কার্য্য, সুরাটের রেশম এবং জরীর কার্য্য এবং কাশ্মীরের জগৎবিখ্যাত শালের কার্য্যে এত উন্নতির ইহাই প্রধান কারণ। এখন আবার বিভিন্ন ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে জাতিভেদ সৃষ্ট হইতেছে। যে সকল তন্তুবায় রেশমের কাজ করে, তাহারা, যে সকল তন্তুবায় সূতার কাজ করে, তাহাদিগের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে চাহে না। যাহারা রঙ্গিন সূতার কাজ করে, তাহারা আবার যাহারা সাদা সূতার কাজ করে, তাহাদিগের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে অনিচ্ছুক। সাধারণ সূত্রধরগণ মিউনিসিপ্যালিটির ময়লার গাড়ী মেরামতি কার্য্যে ব্যাপৃত স্বজাতীয়গণের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে লজ্জা বোধ করে। অনেক ব্যবসায়েই এইরূপ হইতেছে। যাঁহারা ভারতবর্ষে শিল্পবিদ্যাশিক্ষাবিস্তারের জন্য চেষ্টিত, তাঁহাদিগের এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।

ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষের অধিকাংশ শিল্পজাতই ধনীদিগের ব্যবহারে আসিত, কাজেই

পরিবর্ত্তন।

শিল্পদ্রব্যসকলও রাজধানীর নিকটেই প্রস্তুত হইত। ঢাকার মশলিন্, উত্তর ভারতবর্ষের প্রস্তর ও ধাতুর দ্রব্য এবং আহম্মদাবাদের জরীর কাপড় প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্তস্থল। এখন রেলপথে দেশে গমনাগমন সহজ, এমন কি সুখকর

হইয়া উঠিয়াছে, তাই বোম্বাই, কানপুর প্রভৃতি স্থানে কাপড়ের কল এবং কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে পাটের কল প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। আবার রেলওয়ের কারখানাসমূহে কাজ করিয়া কত লোক নূতন মত, নূতন শিক্ষা, অন্ততঃ নূতন প্রকারের যন্ত্রপাতি লইয়া দেশে ফিরিতেছে। ইহাতে ধীরে ধীরে গৌণ উপায়ে পল্লীগ্রামেও নূতন ভাব আসিতেছে।

কেবল বাগ্‌বৈদগ্ধ্যপরিপ্লুত বক্তৃতায় বা প্রভূতপাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধে দেশে শিল্পবিদ্যাশিক্ষা

প্রকৃত পথ।

প্রতিষ্ঠিত হইবে না। সাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার এবং বিজ্ঞানচর্চ্চা বিশেষ আবশ্যক। এ বিষয়ে ভারতবর্ষ অন্য সকল দেশ অপেক্ষা অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে। এখনও ভারতবাসী-(ব্রহ্মদেশ ধরিয়া) দিগের মধ্যে শতকরা চুরানব্বুই জন নিরক্ষর। দেশের এই অবস্থার জন্য লেখক প্রধানতঃ ব্রাহ্মণদিগকেই দোষী স্থির করেন। হিন্দু রাজাদিগের সময় ব্রাহ্মণদিগেরই প্রাধান্য ছিল; তখন তাঁহারা স্বার্থসাধনোদ্দেশে সাধারণ জনগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারবিষয়ে বিপুল বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান অবস্থা তাহারই ফল। সাধারণ লোকেরা লেখাপড়া আবশ্যক বলিয়াই মনে করে না। লেখক য়ুরোপীয় মতের রঙ্গিন চশমা চক্ষে দিয়া ব্রাহ্মণদিগের বিচার করিয়াছেন; তাই তিনি ব্রাহ্মণ্যপ্রাধান্যের গুণের বিষয়ে একেবারেই অন্ধ।

গভর্মেণ্টের এত চেষ্টা সত্ত্বেও এখন প্রধানতঃ কায়স্থ ও ব্রাহ্মণগণই শিক্ষিত হইতেছেন; আর আধুনিক ফ্রান্স ও গ্রীসের মত ভারতবর্ষে কেবল ব্যবহারজীবীর সংখ্যাই বৃদ্ধি পাইতেছে। যে ত্রিশ লক্ষ ছাত্র শিক্ষারম্ভ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে শতকরা কেবল একজন উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইবে। অন্যান্যদেশবাসীদিগেরই মত ভারতবাসী সাধারণ লোকেরা বড়ই রক্ষণশীল। দেশে শিল্পবিদ্যাশিক্ষাবিস্তারের পূর্ব্বে তাহার উপকারিতা এবং উপযোগিতা সাধারণ লোককে বুঝাইতে হইবে; নতুবা সকল চেষ্টাই বিফল হইবে।

ভারতবর্ষে যে পরিমাণে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে কেবল কৃষিকার্য্যে আর চলে না। দেশের লোকের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইতেছে, তাহাতে লোকের আয়বৃদ্ধির কোন উপায় উদ্ভাবন করা নিতান্তই প্রয়োজন। শিল্পবিদ্যাশিক্ষাবিস্তারের জন্য এখন গভর্মেণ্টের চেষ্টা এবং প্রজার প্রকৃত অনুরাগ আবশ্যক।

সার মান্‌চারজি ভবনাগরীর কথা।

ভারতের অধিবাসীদিগের সংখ্যা ২৮৮০০০০০০, তাহার মধ্যে প্রায় ১৮০০০০০০০ কৃষি-ব্যবসায়ী।

দেশের দারুণ দুর্দ্দশা।

তাহারা যদি দেশী মোটা কাপড় প্রভৃতি ব্যবহার করে, তবুও অবশিষ্ট লোকের মধ্যে শিল্পবিদ্যাশিক্ষার ফল বহুপরিমাণে প্রচলিত হইতে পারে। দেশে শিল্পবিদ্যাশিক্ষা বড় কিছু হয় নাই—তাহার প্রমাণ,—কলের সহিত প্রতিযোগিতায় এখনও দেশীয় তন্তুবায়গণ বিধ্বস্ত হয় নাই। এখন দেশে দরিদ্রের সূচ, সূতা, দেশলাই হইতে ধনীর প্রাসাদসজ্জাদি সকলই বিদেশ হইতে আমদানি হয়।

ধর্ম্মের কঠোর শাসনে এখনও অধিকাংশ লোকে দেশে উৎপন্ন ধান্য, গোধূম, ডাউল, শাকসবজী, দুগ্ধ, এই সকল আহার্য্য ব্যবহার করে। কিন্তু পার্শী, মুসলমান, খ্রীষ্টান ও "উদার মতাবলম্বী" হিন্দু, এই সকলে প্রায় ত্রিশ লক্ষ লোক বিদেশীয় পাত্রে রক্ষিত খাদ্য এবং মদ্যাদি ব্যবহার করিয়া থাকে। উপযুক্ত শিক্ষা থাকিলে এই যে টাকা বিদেশে যায়, তাহার অনেকটাই দেশে রাখিতে পারা যাইত।

শিল্পের মধ্যে ভারতবর্ষে স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য্যেরই বিশিষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। ইহার জন্য হিন্দু, মুসলমান, উভয়েই বিশেষ চেষ্টা করিয়া গিয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান, উভয়েরই

শিল্পচাতুর্য্য দেবালয়ে প্রদর্শিত হইত। এখন আর মন্দিরে বা মসজিদে সে সকল বিপুল ব্যয়সাধ্য বিচিত্র শিল্পকৌশল প্রদর্শিত হয় না; তথাপি এখনও পাশ্চাত্য আদর্শের কাঠ ও প্রস্তরের কার্য্যে ভারতবাসীর শিল্পনৈপুণ্য প্রকটিত হইয়া থাকে।

দুই শতাব্দী পূর্ব্বে য়ুরোপের এবং ভারতবর্ষের অবস্থা প্রায় একইরূপ ছিল; উভয়ই কৃষিপ্রধান ছিল। আর এখন?——আজ প্রতীচ্য প্রদেশের প্রবল প্রতিযোগিতায় ভারতের শিল্প মুমূর্ষু। ঢাকাই মসলিন, বারাণসীর বসন—সে সকল আজ অতীতের স্বপ্নমাত্র!

মালাবার-উপকূলে সংস্থাপিত কালিকট নগর হইতে কালিকো কাপড়ের নামকরণ হয়, আর আজ ভারতে কালিকো আইসে বিদেশ হইতে! দেশের লোকের নিত্যব্যবহারের সূতি কাপড় ল্যাঙ্কাষ্টার, এমন কি, জার্ম্মানি হইতেও আমদানী হইয়া থাকে! রেশমী কাপড়েই সুরাট প্রভৃতি নগরের সমৃদ্ধি; আর, প্রথমে চীনের, তাহার পর ফ্রান্সের প্রতিযোগিতায় সে রেশমি শিল্প এখন দেশছাড়া হইয়াছে। এইখানে বলিয়া রাখি, চীনবাসীরাও ভারতবাসীদিগের মত হাতে কাজ করে—কল ব্যবহার করে না। ইহা হইতে বুঝাযায় যে, শিল্পবিদ্যাশিক্ষার

অন্যান্য ব্যবসা।

অভাবে ভারতবাসীরা আপনাদিগের স্বাভাবিক তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্যবসায়ে ব্যবহার করিতে পারিতেছে না। পার্থিব উন্নতির প্রতি প্রথম হইতেই ভারতবাসীর অমনোযোগ। তবে বিদেশীয়গণ আজও ভারতবর্ষের শাল ও জরীর ব্যবসার বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে নাই। ভবিষ্যতে কি আছে, কে বলিতে পারে? এখনও ভারতবর্ষে প্রচুর কার্পেট প্রস্তুত হইয়া থাকে; কিন্তু ব্রাসেল্‌সের সহিত প্রবল প্রতিযোগিতায় সে ব্যবসা আর অধিক দিন টিকিবে কি না সন্দেহ। ভারতবর্ষে প্রায় ১৫০টি সূতার কল চলিতেছে; তদ্ভিন্ন ২২টি মদ্যের কারখানা ও কতকগুলি কাগজের ও পাটের কলও আছে। এই সকল কলে মোটের উপর প্রায় ৩০০০০০ লোক কাজ করে; দেশের জনসংখ্যার তুলনায় এই ত্রিশ লক্ষ অতি সামান্য। আবার ইহার মধ্যে অধিকাংশই "নগদা মুটে"—তাহারা দৈনন্দিন কার্য্যের জন্য বেতন প্রাপ্ত হয়, এই পর্য্যন্ত; কলের লাভে তাহাদিগের কোনও অংশ নাই। চা ও কফির ব্যবসা বিশেষ লাভজনক; কিন্তু তাহা বিদেশীয়ের হস্তে।

১৮৯৪-৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ হইতে ২১৭৯৫৭৬০ টাকার অপরিষ্কৃত চামড়ায় রপ্তানি হয়, আবার ঐ বৎসরেই ১৭৮৫৯৭০ টাকার পরিষ্কৃত চামড়া এবং জুতা প্রভৃতির আমদানি হয়।

আমদানি ও রপ্তানি।

ঐ বৎসরে ১২৩০৯০৩০ টাকার দলুয়াচিনি ও গুড়ের রপ্তানি হয়, আবার ২৮৭৫২৯৭০ টাকার পরিষ্কার চিনির আমদানি হয়। ঐ বৎসর তৈল আমদানি হইয়াছিল ২১২২৯৯৯০ টাকার, কিন্তু তৈলের জন্য বীজ রপ্তানি হইয়াছিল ১৪২০৬০৪২০ টাকার। আর অধিক উদাহরণ আহরণ করা অনাবশ্যক। অনেক বিষয়েই এই অবস্থা।

আবার এই আমদানি রপ্তানি ব্যাপারে ভাড়া, শুল্ক, বাট্টা, দালালি প্রভৃতিতে যে কত টাকা যায়, তাহা সহজেই অনুমেয়।

ভারতবর্ষে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণে এই সকল দ্রব্য যদি দেশেই পরিষ্কৃত হইত, এবং অবশিষ্ট অংশ যদি কতক পরিমাণে পরিষ্কৃত হইয়া বা অপরিষ্কৃত অবস্থাতেই

উপায় কি?

রপ্তানি হইত, তবে অপব্যয় হইত না। আর দেশের কত শত অর্দ্ধাশনাভ্যস্ত হতভাগ্যের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় হইত! এখন ভারতবর্ষের জিনিস ভারতবর্ষেই ক্রয় করিয়া বিদেশীয়গণ আপনাদিগের দেশ সমৃদ্ধিশালী

করিতেছে, আর উপযুক্ত শিল্পবিদ্যাশিক্ষার অভাবে ভারতবাসী অর্দ্ধাশন হইতে ক্রমে অনশন অভ্যাস করিতে বাধ্য হইতেছে।

যে সকল ব্যবসায়ে বিশেষ শিক্ষার আবশ্যক, কেবল সে সকলে নহে, পরন্তু সকল ব্যবসারই এই অবস্থা। চা, কফি, তামাক, এ সকলের ব্যবসায়ে বিশেষ কোনও শিক্ষার প্রয়োজনই হয় না। কার্য্যকারকগণ প্রায়ই ভারতবাসী, মালমসল্লাও ভারতবর্ষের, কিন্তু লাভ—"মাঝে থেকে লুটে খায় কুঠেল যবন।" বিদেশীয় ব্যবসায়ীরা অল্প বয়স হইতে এই সকল ব্যবসা শিখিয়া এই সকলেই বিশেষ পারদর্শী হইয়া লাভবান হয়; আর দেশের লোকের অন্ন হয় না। ইহা কি কম আক্ষেপের কথা?

ভারতবর্ষের চা ও কফি-বাগানসমূহের স্বত্বাধিকারীদিগের, তামাক ও চামড়ার কারখানাগুলির অধিকারীদিগের, এবং লৌহের, তেলের, ময়দার, সূতার ও রেশমের কলগুলির মালিকদিগের নাম দেখিলে, দেশের দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া নিতান্তই ব্যথিত হইয়া পড়িতে হয়;—তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই বিদেশীয়।

বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি শিল্পবিদ্যাশিক্ষাগার সংস্থাপন ব্যতীত ভারতবর্ষে আধুনিক বিজ্ঞান-সঙ্গতমতে ব্যবসাশিক্ষাবিস্তারের বিশেষ কোনও চেষ্টাই হয় নাই। দশ বৎসর পূর্ব্বে

শিল্পবিদ্যা-শিক্ষাপ্রচার।

কয়েকটি কলেজের বিজ্ঞানাগারে এবং রেলওয়ে বিবিধ কলের কারখানায় ভিন্ন আর কোথাও দেশীয়দিগের বিজ্ঞান ও কলকব্জার কাজ শিখিবার উপায় ছিল না। এই সময় বোম্বাই ও মান্দ্রাজে শিল্পবিদ্যাশিক্ষাগার অর্থাৎ টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউশন সংস্থাপনের প্রথম প্রস্তাব হয়। মান্দ্রাজে কেবল কথাবার্ত্তাই সার হইয়াছে, প্রকৃতপ্রস্তাবে কোনও কার্য্যই আরব্ধ হয় নাই। বোম্বায়ে সৌভাগ্যক্রমে তখন লর্ড রিয়ে গভর্ণর; তাঁহারই বিশেষ চেষ্টায় কয় জন কর্ম্মঠ লোক লইয়া পরিচালনসমিতি সংগঠিত হয়। উপযুক্ত সম্পাদকও মিলিল—মিষ্টার ওয়াদিয়া ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান ব্যবসাগঞ্জে মেক্যানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারের কার্য্য শিক্ষা করিয়াছিলেন। এ দিকে আবার তিনি দেশের অভাব এবং দেশের লোকের ভাবগতিক বিশেষরূপ অবগত ছিলেন। লর্ড রিয়ের পর লর্ড হেরিস্‌ও বোম্বাইয়ের এই শিল্পবিদ্যাশিক্ষাগারের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। এই সকল কারণে বোম্বাইয়ের এই শিল্পবিদ্যাশিক্ষাগারের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে।

প্রথমেই য়ুরোপ হইতে উপযুক্ত শিক্ষিত শিক্ষক আনাইয়া বোম্বাই বিদ্যালয়ে প্রধানতঃ প্রচলিত বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল। যোগ্য লোকের হস্তে ভার থাকায় অল্পদিনের মধ্যে ভারতবর্ষে এই শিল্পবিদ্যাশিক্ষার উপযোগিতা সপ্রমাণিত হইয়া গেল; এই বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ ছাত্রগণ স্থানীয় কলকারখানায় বিশেষ লাভের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে লাগিল। এইরূপ নানা কারণে আজ বোম্বাইয়ের ভিক্টোরিয়া শিল্পবিদ্যাশিক্ষাগার দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অন্য কোন বিভাগে এরূপ কোন বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সূত্রধরের ব্যবসা প্রভৃতি শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয় আছে সত্য, কিন্তু কোন বিদ্যালয়ের বন্দোবস্তই বোম্বাই বিদ্যালয়ের বন্দোবস্তের মত নহে; তাই সে সকলে কাজও ভাল হয় না।

পূর্ব্বে জাতিভেদের কঠোর শাসনে পুরুষানুক্রমে একই ব্যবসা শিক্ষা করায়, তাহাতে উত্তরোত্তর উন্নতিই হইত;—ক্রমে তাহা বিনষ্ট হইতেছে, এদিকে আবার নূতন ধরণে নূতন ব্যবসায়শিক্ষার কোনও চেষ্টাই হইতেছে না। কর্ম্মশিক্ষার জন্য শিক্ষানবিশ দেশে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ইহার উপর আবার ভারতবর্ষে প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী হইতেও কুফল উৎপন্ন হইতেছে। শিক্ষার দোষে যুবকগণ পৈতৃক ব্যবসা ছাড়িয়া চাকরী ও আইন ব্যবসায়ের জন্য লালায়িত।

শিক্ষার দোষ।

সকলেই যদি এই দুই দিকে যাইতে চাহিবে, তবে আর অন্য অন্য ব্যবসায়ের উন্নতি হইবার উপায় কি? এই সকল কারণে এবং সর্ব্বোপরি পাশ্চাত্য বাণিজ্যের প্রবল প্রতিযোগিতায়, নূতন ব্যবসায়ের উৎপত্তি হওয়া দূরে থাকুক, পুরাতন ব্যবসাগুলি নষ্ট হইতে চলিল। আজকাল ভারতবর্ষে ব্যবসাবাণিজ্যে পার্শিজাতিই শীর্ষস্থানীয়, শিক্ষাতেও তাহারা বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। অল্পদিন পূর্ব্বে তাহারা পোতগঠনে, গৃহসজ্জানির্ম্মাণে, গজদন্ত ও চন্দন কাষ্ঠের খোদাই কার্য্যে এবং অন্যান্য নানা ব্যবসায়ে প্রভূত উন্নতি করিয়াছিল। উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে আজ তাহারা আরও উন্নতি করিয়া বিদেশীয়দিগের সহিত প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইতে পারিত; কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর দোষে তাহাদিগের সন্তানগণ এখন পৈতৃক ব্যবসা ছাড়িয়া ওকালতি, ডাক্তারি, স্কুলমাষ্টারি এবং কেরাণীগিরি করিতে ব্যস্ত। তাই দেশের এই দুর্দ্দশা। পাঠক! স্বর্গীয় ঈশ্বর গুপ্তের সেই কথা মনে করিবেন, "যত গোপগোয়ালা, সদরআলা—কে দেবে গো ঘোল?" এখন দেখা যাইতেছে, যে সম্প্রদায় যত অধিক দিন বর্ত্তমান সাহিত্যপ্রধান শিক্ষার বন্যা রোধ করিতে পারিবে, সে সম্প্রদায় তত অধিক দিন টিকিয়া থাকিতে পারিবে।

সকল সম্প্রদায় সম্বন্ধেই আজ এই কথার প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বঙ্গদেশে এক সময় চট্টগ্রামে জলযাননির্ম্মাণের সবিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। উপযুক্ত শিক্ষা ও শিল্পীর সাহায্য পাইলে সেখানে সেই ব্যবসায়ের আরও উন্নতি হইত; কিন্তু আজ তাহা বিধ্বস্তপ্রায়।

ভারতবর্ষে কয়লা ও লৌহ যথেষ্টপরিমাণে পাওয়া যায় না সত্য, কিন্তু ভারতবর্ষে মজুরের পারিশ্রমিক এতই অল্প যে, তাহাতে সে অসুবিধা পোষাইয়া যায়। প্রতীচ্যদেশের

ভারতবর্ষে সুবিধা।

ব্যবসায়ীদিগের মূলধনে ভারতবর্ষে নানা ব্যবসা বিশেষ উন্নতি লাভ করিতেছে, ইহা হইতেই লেখকের কথা প্রমাণিত হইতেছে। ভারতবর্ষে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয়, এবং যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিতে ভারতবাসীরা বহুকালের অভিজ্ঞতা ও দেশের অবস্থা হেতু বিশেষ দক্ষ, সে সকলেও তাহাদিগের উন্নতি হয় না। তাহার কারণ,—তাহাদিগের ব্যবসায়-বিদ্যার শিক্ষা হয় না, এবং তাহার অনিবার্য্য ফলে তাহারা পরস্পরের উপর বিশ্বাস করিতে পারে না। তাই সে সকল ব্যবসাও বিদেশীয়দিগের হস্তে যাইতেছে;—চা, নীল, নানাপ্রকার ঔষধ প্রভৃতির ব্যবসায়ও ইহার দৃষ্টান্ত। বিদেশ হইতে অনেক রক্ষিতখাদ্য (Preserved Food) ভারতবর্ষে আমদানি হয়; কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে বহু সুবিধাসত্ত্বেও মৎস্য এবং নানারূপ ফলের রপ্তানি হয় না, পরন্তু বিক্রয়াভাবে সে সকল বহুপরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়। একটু চেষ্টা করিলে সে সকল রক্ষিত খাদ্যরূপে বিদেশে রপ্তানি করিয়া বেশ দু পয়সা লাভ করা যাইতে পারে। আজকাল ভারতবর্ষ হইতে চাট্‌নি এবং আচার প্রভৃতির রপ্তানি হয় সত্য; কিন্তু ব্যবসায় বুদ্ধির অভাবে, তাহাতে দেশীয়গণ অতি সামান্য লাভই পাইয়া থাকে। আর ব্যবসায়-বুদ্ধি-সম্পন্ন চতুর বিদেশীয়গণ তাহাই শোভনদৃশ্য পাত্রে করিয়া অত্যন্ত চড়া দামে বিক্রয় করে এবং বিশেষ লাভবান হয়। যে দেশের উৎপন্ন দ্রব্য রূপান্তরিত ও দেশান্তরিত করিয়া বিদেশীয় বণিক্‌গণ লক্ষ্মীশ্রী লাভ করিতেছে, সেই দেশের অধিবাসীরা এক সন্ধ্যাও পেট পুরিয়া খাইতে পায় না,—ইহা বিচিত্র নয় ত কি?

ভারতবর্ষে ব্যবসা-যোগ্য দ্রব্যের অভাব নাই; লোকেরও অভাব নাই; অভাব কেবল

শেষ কথা।

উপযুক্ত শিক্ষার। ভারতবাসীরা কেবল যে পিতৃপিতামহাদিক্রমে অনুসৃত ব্যবসায়ে উন্নতিলাভ করিয়াছে, এমন নহে; পরন্তু প্রতীচ্য-জগৎপ্রসূত শিল্পেও শিক্ষা পাইলেই তাহারা অসাধারণ উন্নতিলাভ করিয়াছে। এখন দেশে শিল্পবিদ্যাশিক্ষারই প্রয়োজন।

তবে প্রথমেই আমরা বলিয়াছি যে, দেশের লোকের ইচ্ছা এবং চেষ্টা ব্যতীত কেবল গভর্মেণ্ট এবং বিদেশীয়দিগের চেষ্টায় কেবল সভাসমিতিতে, কেবল বক্তার বাগ-বৈদগ্ধ্য-বিপ্লুত বক্তৃতায় বা সংবাদপত্রের সুদীর্ঘ সন্দর্ভে কিছুই হইবে না।

উদ্দাম সঙ্গীত।

অয়ি গঙ্গে! আজি এই সরস শ্রাবণে
সঘন গগনতলে শ্যাম আস্তরণে
কি অপূর্ব্ব শোভা তোর! বরষা-বিভবে
পরিপূর্ণ বরতনুখানি, কি গৌরবে
যৌবনতরঙ্গ 'পরে তুলি আন্দোলন,
রাজরাজেন্দ্রাণী সম মহিমা আপন
প্রতি সৌম্যপদক্ষেপে করিছে প্রচার!
বহুদূরবিসর্পিত সলিলসম্ভার;
শুভ্র ফেন-লেখা তাহে, ধূর্জ্জটীর ভালে
শুভ্রকান্তি শশিকলা সম। মেঘমালে
দিগন্ত লম্বিতপ্রায়,—প্রসারিত-কর
ব্যোমচারী করী যেন আলস্যমন্থর
স্নিগ্ধ শান্ত তৃপ্তিভরে গাঢ় আলিঙ্গনে
বুকে তোর পড়েছে হেলিয়া। ক্ষণে ক্ষণে
ঘনাইছে শ্যামছায়া, ঝরিছে সলিল,—
তপোলোক-প্রান্ত হ'তে প্লাবিয়া নিখিল
ঋষিদের আশীর্ব্বাদধারা। পূর্ব্বতটে
মুহূর্ত্তে আবার, ঘননীল চিত্রপটে
স্তব্ধ বনশ্রেণীশিরে প্রশান্ত শোভায়
বিকশিছে পূর্ণশশী, রজত-প্রভায়,
উজলি বসনখানি বরষা-বধূর।
কভু ধীরে সমীরণ স্নিগ্ধ সুমধুর
আসিছে ভাসিয়া; মনোবনবিহারিণী
প্রেয়সীর সুখস্পর্শসম, উদাসিনী
বাসনারে, সোহাগের বেদনে ব্যথিয়া
করিছে বিহ্বলপ্রায়; নিতেছে টানিয়া
কোন্ কল্পকুঞ্জগৃহ পানে। শিহরিত
সুপ্তশাখা ত্যজি কভু স্বপ্নবিজড়িত
বকুলকলিকাগুলি ঝরিছে আলসে;
কভু বা পল্লব হ'তে বায়ুবেগবশে।
বনানীর অশ্রুরাশি স্নেহের মতন
করিছে সান্ত্বনাসিক্ত সর্ব্ব দেহমন।

এই সন্ধ্যাকূলে আজ ফুলের সৌরভে,
পূর্ণিমা-কিরণে আর ঊর্ম্মিকলরবে
মনে হয় মিথ্যা সব; মিথ্যা এ সংসার,
সুখে দুঃখে মোহে গড়া বিড়ম্বনা তার।
সত্য শুধু ওই স্নিগ্ধ অঞ্চলশয়ন;
হে জাহ্নবী! সত্য শুধু সুন্দর মরণ
সুন্দর সলিলতলে তোর। অতিশয়
শ্রান্তিভরে আজি মোর উদ্ভ্রান্ত হৃদয়
চাহে অবসর, চাহে সাঙ্গ করিবারে
এ সংগ্রাম, দুরাশার দুষ্ট-পারাবারে
জীর্ণ তরী বাহি নিত্য উত্থান-পতন।
হায় মাগো! হেথা কভু করি প্রাণপণ
মিটে না প্রাণের সাধ; দিবসের সুখ
সন্ধ্যারে হেরিয়া হয় আপনি বিমুখ;
অসীম আগ্রহপূর্ণ প্রমোদ-রজনী
আঁখির পলকে কোথা মিলায় অমনি
প্রভাত বাতাসে! তার পরে চিরকাল,

যতনে কুড়ায়ে লয়ে স্মৃতির জঞ্জাল,
জ্বলন্ত সন্তাপশিখা মরমের তীরে
নীরবে নিভাতে হয় নয়নের নীরে।
যে উগ্র ব্যগ্রতাভরে সৌন্দর্য্য-স্বপনে,
প্রকৃতির প্রেমকুঞ্জে প্রথম যৌবনে
পশিতাম শতবার, আজি সে অনল
ব্যথিছে মথিছে শুধু মরমের তল!
কবির হৃদয় মোর অনন্ত উদার,
মুক্তপক্ষে জলে স্থলে শূন্যের মাঝার
করে সদা বিচরণ; হেলিয়া হেলায়
নীচতার শত ছল, গিরিচূড়াপ্রায়
সহজে স্পর্শিতে চায় আকাশ-নীলিমা;
সপ্তলোকসঞ্চারী সে উন্নত মহিমা
সে গুরু গরিমাজ্ঞান অঞ্জলি ভরিয়া,
ছুটি উদরান্ন তরে দিয়েছি ঢালিয়া
অতি হীন দাসত্বের পদে। ঘৃণাভরে
করি যারে অবহেলা, সংসার-প্রান্তরে
অন্ধ দেহভারবাহী পশুর মতন,
নিশিদিন নতশিরে তাহারই শাসন
বিধির বিধানসম নিয়েছি মানিয়া।
চিরবাঞ্ছিতের লাগি বাসর রচিয়া,
তুচ্ছ যশোবাসনারে মোহের আবেশে
বরিয়া সাদরে সেথা বসায়েছি শেষে!
হায়, তাও বৃথা মোর! শত-সাধভরা
হৃদয়-শোণিতে লেখা সৌন্দর্য্যপশরা
লুটাইছে ধূলি 'পর; দুরাশা-দহন
দহে শুধু মর্ম্মবিদ্ধ শল্যের মতন।

তাই অয়ি গঙ্গে! তোর স্নেহমূর্ত্তিখানি
মত্ত বাসনারে মোর লইতেছে টানি,
সান্ত্বনার বশে। আজি হেন মনে লয়,
ওই যেথা রঙ্গে তোর অগাধ হৃদয়
অগাধ-সলিল-ভঙ্গে উঠিছে উলসি'!
শশীর কিরণে, ওই সুখনীরে পশি'
জুড়াইবে জ্বালা মোর; মন্দ কলকলে
ঢেকে যবে দিবি তুই তরল অঞ্চলে,
সংসারতপনতপ্ত এই তনু মন
লভিবে অনন্ত শান্তি সুষুপ্তি-শয়ন।

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

ধূমকেতু।

ধূমকেতুর কক্ষা।—এক্ষণে উত্তমরূপ অবগতি হইয়াছে যে, অনেকানেক ধূমকেতু সময়ে সময়ে পুনরাগমন করে, কতিপয় বৎসর অদৃশ্য থাকিয়া নয়নপথে পুনরাবির্ভূত হয়, এবং পুনরপি ভভ্রম সমাধা করিবার প্রয়াসে অন্তরীক্ষে প্রত্যাবৃত্ত হয়। এখন কথা এই যে, ধূমকেতু আবার যখন দেখিলাম, তখন কেমন করিয়া বুঝিব যে, এটি সেই ধূমকেতু? এখন সে আকার নাই, সে শোভা নাই, সে পুচ্ছ নাই, চিনিবার কোন উপায় নাই, বহিরঙ্গ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ধূমকেতু এইরূপে ছদ্মবেশীর ন্যায় সাধারণ দর্শকের চক্ষে ধূলি দিয়া অপরিচিতের মত বিনা সম্ভাষণে চলিয়া যাইতে পারেন, কিন্তু গতিগণিতজ্ঞের কাছে তাঁহার পার পাইবার যো নাই। যিনি হউন না কেন, এক

বারের পর দ্বিতীয় বার এই পার্থিব বায়ুসাগরে ভাসমান হইলেই, কেপলারীয় বিধিজালে জড়ীভূত হইতে হইবে।

মাধ্যাকর্ষণ-সদৃশ কোন মধ্যবর্ত্তী বলপ্রভাবে কোন পদার্থ যদি উক্ত বলপরিতঃ ভ্রামিত হয়, এবং উক্ত বল যদি পদার্থের দূরত্বের বর্গের বিলোমানুপাতী হয়, তবে উক্ত পদার্থ কোন না কোন সূচীখণ্ডে অর্থাৎ ক্ষেপণী, বৃত্তাভাস বা পার্শ্বসমান্তর খণ্ডবৃত্তে (হাইপারবোলায়) ঘুরিতে থাকিবে। এই প্রতিজ্ঞাটি প্রথমতঃ নিউটন কর্ত্তৃক উৎপাদিত হইয়াছিল। অনেক ধূমকেতু পটলাকার অত্যুৎকেন্দ্র বৃত্তাভাসে পরিভ্রমণ করে, অনেকের কক্ষা ক্ষেপণী বলিয়া স্বীকৃত হয়, এবং কতিপয় ধূমকেতু পার্শ্বসমান্তর খণ্ডবৃত্তে চালিত বলিয়া বোধ হয়। এখন দেখুন, ক্ষেপণী ও পার্শ্বসমান্তর খণ্ডবৃত্ত, উভয়েই পরাক্ বা প্রতীপগামী ও অসীমশাখাবিশিষ্ট,—এইরূপ বৃত্তখণ্ডে ভ্রামিত পদার্থের কোন কালেই রবিপরিতঃ একটি পূর্ণ ভভ্রম হইতে পারে না। এবংবিধ ধূমকেতু সুদূর গগন হইতে সৌরজগতে উপনীত হয়, এবং অনুহৈলিক অতিক্রম করিয়া ভিন্ন দিকে বিনির্গত হয়, এবং অদৃষ্টিগোচর গগনে চলিয়া যায়, আর কখন ফিরিয়া আইসে না। অতএব যে সকল জ্যোতিষ্ক ক্ষেপণী বা পার্শ্বসমান্তর খণ্ডবৃত্তে চালিত হয়, সে সকলকে সাময়িক ধূমকেতু বলা যায় না; কিন্তু যে সকল ধূমকেতু গ্রহগণের ন্যায় বৃত্তাভাস কক্ষে চলে, তাহাদিগের উপর্য্যুপরি ভভ্রম সম্পন্ন হয়।

ইহাও অসঙ্গত বোধ হয় না যে, যে সকল কক্ষাগুলিকে ক্ষেপণী বলিয়া ধরা যায়, সেগুলি হয় ত সুদীর্ঘ বৃত্তাভাস; কারণ যতদিন ধূমকেতু দেখা যায়, তত দিনে উহার কক্ষাংশ বৃত্তাভাস কি ক্ষেপণী, তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য।

১৮৭৫অব্দের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত যে সকল ধূমকেতুর গণিত সমাধা হইয়াছে, তন্মধ্যে, ২০টি সাময়িক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; ৬৬টির পুনরাগমন দৃষ্ট হইয়াছে; ৪৩টির কক্ষা বৃত্তাভাস কি না তাহা সন্দেহ; ১৯৪টি ক্ষৈপণিক ধূমকেতু; ৬টি হাইপারবলিক ধূমকেতু।

কোন কোন গণক নিম্নের ধূমকেতুগণকে বার্ত্তভাসিক বলেন; কিন্তু এ বিষয়ে অদ্যাপি প্রচুর প্রমাণের অভাব;—

১৮৪৫, ১৫৮৫; ১৭৪৪, ১৭৭৩, ১৮২৬ (২), ১৮৩২ (২), ১৮৪৬ (৮); ১৮৪৭ (১); ১৮৪৭ (৩); ১৮৪৯ (১); ১৮৫০ (১); ১৮৫৭ (৫); ১৮৬০ (৩)।

নিম্নলিখিত ছয়টি হাইপরবলিক ধূমকেতু ;—

১৭২৯ ; ১৭৭১ ; ১৭৭৪ ; ১৮৪০ (১) ; ১৮৪৩ (২) ; ১৮৫৩ (৩)।

কোন কোন গণক নিম্নের ধূমকেতুগণকে হাইপরবলিক বলেন ; কিন্তু এ বিষয়ে অদ্যাপি প্রচুর প্রমাণের অভাব ;—

১৭২৩ ; ১৭৭৩ ; ১৭৭৯ ; ১৮১৮ (৩) ; ১৮২৬ (২) ; ১৮৩০ (১) ; ১৮৪৩ (১) ; ১৮৪৪ (৩) ; ১৮৪৫ (১) ; ১৮৪৫ (২) ; ১৮৪৯ (৩) ; ১৮৫২ (২) ; ১৮৬৩ (৬)।

বেধ দ্বারা ধূমকেতুর কক্ষা-নিরূপণ।—গ্রহকক্ষ নিরূপণজন্য অধ্যায়ে যে সকল প্রথা বাখ্যাত হইয়াছে, সেগুলি ধূমকেতুর কক্ষা সম্বন্ধে কোনরূপেই প্রয়োজ্য নহে ; কারণ তদ্রূপ প্রথা অবলম্বন করিলে, কক্ষার স্থানবিশেষের বেধ আবশ্যক হয়, এবং তদ্রূপ বেধ বহুবর্ষ অন্তর ভিন্ন হইতে পারে না। কিন্তু ধূমকেতুগুলি আমাদের নেত্রপথে কতিপয় সপ্তাহমাত্র আবির্ভূত থাকে, এবং সেই স্বল্পকালমধ্যে নির্ব্বাহিত কতিপয় বেধ দ্বারা কক্ষার অবস্থান নিরূপণ করিতে হয়। ধূমকেতুর অবস্থানে তিন বেধমাত্র অবলম্বন করিয়া কক্ষাকার স্থির করিবার প্রথা প্রথমতঃ স্যার আইজাক নিউটন দ্বারা আবিষ্কৃত হয়। এই প্রথা এক্ষণে অনেক সুগমীকৃত হইয়াছে, এবং গণিতের সুবিধা ও সৌকর্য্যার্থে সারণী সকল প্রস্তুত হইয়াছে।

ধূমকেতুর কক্ষানিরূপণ জন্য তিনটি ভিন্ন ভিন্ন দিনে আকাশমণ্ডলে ধূমকেতুর দিক জানা আবশ্যক। এই তিন বেধ ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সমাধা হইতে পারে ; কিন্তু বেধের ব্যবধান-কাল যতই দীর্ঘ হয়, বেধলব্ধ কক্ষা ততই ঠিক বলিয়া বিশ্বাস হয়। যদি প্রথম বেধ হইতে দ্বিতীয় বেধের কাল, দ্বিতীয় বেধ হইতে তৃতীয় বেধের কালের সমান হয়, তবে হিসাবের বড় সুবিধা হয়, কিন্তু এরূপ ব্যাবৃত্তি নিতান্ত আবশ্যক নহে। মনে কর, পৃথিবী হইতে ধূমকেতুকে তিন স্থলে বেধ করা গেল, অর্থাৎ উহার তিন অবস্থানে বিষুবাংশ ও ক্রান্তি লওয়া গেল ; এখন বিষুবাংশ ও ক্রান্তিকে যথাক্রমে ভোগে ও বিক্ষেপে পরিণত কর, কারণ ধূমকেতুর গতি ভূকক্ষায় আনিয়া হিসাব করিলে অনেকটা সুবিধা হয়।

এক্ষণে নাবিক-পঞ্জিকা হইতে উক্ত বেধত্রয়ের সমসাময়িক রবির ভোগ ও বিক্ষেপ লও ; এই ভোগে ১৮০° যোগ করিলেই পৃথিবীর ভোগ হইল। তদন্তর ভূকক্ষার পরিলেখ প্রস্তুত কর, এবং এই কক্ষোপরি উক্ত কালত্রয়ে

পৃথিবীর অবস্থান যথাযথরূপে অঙ্কিত কর। এই তিন স্থান হইতে যে দিকে ধূমকেতু দেখা গেল, সেই দিকে রেখা টান। এই সকল উপকরণ অবলম্বম করিয়া ধূমকেতুর কক্ষা নিরূপণ করিতে হয়।

ধূমকেতুর কক্ষার গণিতে স্বীকৃত নিয়মাবলি।—সৌরজগতের অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপ পরিজ্ঞাত গ্রহউপগ্রহগণের গণিতে যে সকল নিয়ম প্রমাণীকৃত হইয়াছে, সেই সকল নিয়ম ধূমকেতুর কক্ষাগণনায় স্বীকৃত হইয়া থাকে ;—

১ম।—ধূমকেতুর কক্ষা অবশ্যই সূর্য্যমণ্ডলের ক্ষেত্রগত।

২য়।—ধূমকেতুর কক্ষা অন্যতম সূচিখণ্ড। এই সূচিখণ্ডের অন্যতর অধিশ্রয়ণ সূর্য্যাধিষ্ঠিত ; সূচিখণ্ডের উৎকেন্দ্রত্ব অত্যধিক হইলে, কক্ষার আকার ক্ষেপণী হইতে বড় তফাৎ হওয়া সম্ভব নহে ; অতএব স্বীকৃত হইল যে, কক্ষা ক্ষেপণী।

৩য়।—রবিপরিতঃ কক্ষায় ভ্রাম্যমাণ জ্যোতিষ্কের গতি এরূপ যে, চলকর্ণ দ্বারা সমকালে সমক্ষেত্রফল বিলিখিত হয় ; অতএব কোনও ক্ষেত্রফল কাল দ্বারা বিভক্ত করিলে, ভাগফল সেই জ্যোতিষ্কসম্বন্ধে (জ্যোতিষ্ক গ্রহ বা ধূমকেতু) ধ্রুব হইবে, অর্থাৎ অভিন্ন থাকিবে।

৪র্থ।—রবিপরিতঃ ভ্রাম্যমাণ ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতিষ্কসম্বন্ধে উক্ত ভাগফলের বর্গ উত্তেজিনীর (Latus Rectum) অনুপাতী।

ধূমকেতুর কক্ষানিরূপণ জন্য এই সকল বিধিপ্রয়োগকালে প্রথমতঃ কক্ষার একটা ক্ষেত্র গ্রহণ করিতে হইবে। এই কল্পিত ক্ষেত্র যদি উপরি-উক্ত কোন ক্ষেত্রের বিরোধী না হয়, তবে জানা গেল যে, কক্ষার প্রকৃত ক্ষেত্রই গ্রহণ করা হইয়াছে ; অন্যথা ক্ষেত্র পরিবর্ত্তন করিতে হইবে ; যাবৎ না উক্ত বিধি-চতুষ্টয়ের অবিসম্বাদী ক্ষেত্র পাওয়া যায়, তাবৎ এইরূপ ক্ষেত্রান্তর কল্পনা করিতে হইবে। অনন্তর গৃহীত কক্ষায় ধূমকেতুর দিন দিনের অবস্থান গণিত করিতে হইবে ; এবং গণিত স্থানের সহিত বেধলব্ধ স্থানের তুলনা করিতে হইবে। বেধে আর গণিতে যে অন্তর, তাহা পর্য্যবেক্ষণে অপরিহার্য্য যে ভ্রম, তাহার অধিক হওয়া উচিত নহে। যদি অধিক হয়, তবে পুনরায় কক্ষান্তর গ্রহণ করিতে হইবে, যাবৎ দৃগ্‌গণিত ঐক্য না হয়। পর্য্যবেক্ষণে অবশ্যম্ভাবী ভুলটুকু অবশ্যই রহিয়া যাইবে। এইরূপে স্থির করা যাইতে পারে যে, কেতুকক্ষা ক্ষেপণী বা বৃত্তাভাস বা হাইপারবোলা। প্রথম স্বীকারে ভুল থাকিলে কিছু ক্ষতি হয় না।

গণিতের প্রথা পরিলেখ-যোগে বিশদীকরণ।—সূ সূর্য্য, ক খ গ তিন দিন

বেধকালে পৃথিবীর স্বীয় কক্ষে অবস্থান ; সূক, সূখ, সূগ এই তিন রেখার অবস্থান ও পরিমাণ নাবিক পঞ্জিকাতে পাওয়া যায়। ক হইতে ক ঘ রেখা টান ; প্রথম দিন যে দিকে ধূমকেতু ছিল, ক ঘ সেই দিকে ; তদ্রূপ খ ঙ ও গ ঢ় অপর দুই দিবসে ধূমকেতুর দিক্‌সূচক রেখা। প্রথম দর্শন কালে ধূমকেতু কখ রেখার কোন এক স্থলে ছিল, কিন্তু ঠিক কোন স্থলে ছিল, তাহা অবিজ্ঞাত। যদি ধর যে, প্রথম দিন জ্যোতিষ্ক ছএ ছিল, তবে পূর্ব্ব প্রকরণের প্রথম বিধি অনুসারে, অপর দুই তারিখে উহার অবস্থান খজ ও গঝ অবশ্য হইবে, অধিকন্ত উহার ক্ষেত্র সূছ দিয়া যাইবে ; আবার উক্ত প্রকরণের তৃতীয় বিধি অনুসারে ক্ষেপণীখণ্ড সূজছ ও সূজঝ সমান হইবে। আর বেধকালের ব্যবধান যদি কতিপয় দিন মাত্র হয়, তবে সূজছ ও সূজঝ সমতল ত্রিভূজ হইবে এবং উভয়ের ক্ষেত্র ফল প্রায় সমানই হইবে। শুদ্ধ এই সকল সময়-সহায়ে কেতুকক্ষার অবস্থান প্রায় ঠিক করা যাইতে পারে। যদি ক্ষেপণীখণ্ডদ্বয়ের ক্ষেত্রফল ঠিক সমান হয়, এবং উক্ত প্রকরণের চতুর্থ বিধির লিখনানুরূপ ক্ষেত্রের পরিমাণ হয়, তবে নিশ্চয় জানা গেল যে, প্রকৃত কক্ষা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এক প্রথা অবলম্বনপূর্ব্বক কতিপয় দিন ব্যবধানে তিনটি বেধ করিলেই, এক ঘণ্টার মধ্যে ধূমকেতুর কক্ষা নিরূপিত হইতে পারে ; এরূপ গণিতাগত কক্ষা যদিও ঠিক বাস্তব কক্ষা না হয়, তথাপি বাস্তব কক্ষা হইতে বড় তফাৎ হয় না।

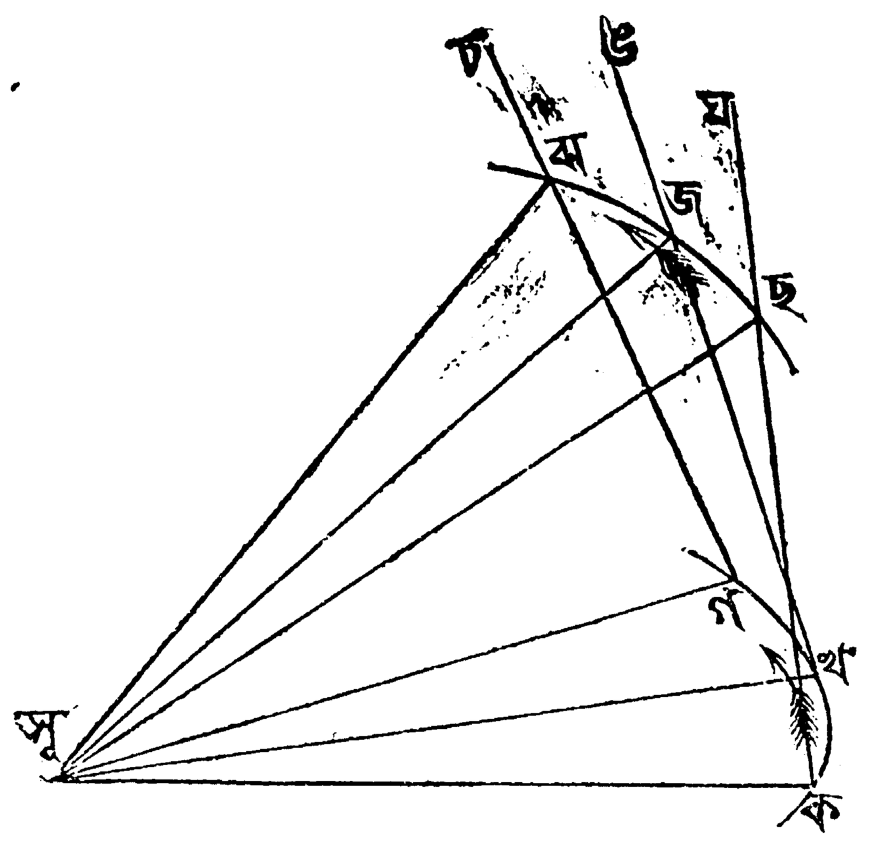

কক্ষা গণিতের ধারা।—কেতুকক্ষার উপকরণীভূত বিষয়গুলি যথাযথ রূপে গণিত করিতে হইলে, উক্তরূপ বিধিমূলক প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হয়। পূর্ব্বে যে রেখার ও ক্ষেত্রের সম্বন্ধ ব্যক্ত করা হইয়াছে, তাহা সমীকরণের আকারে ব্যবস্থিত হয়, এবং অসকৃত আসন্ন রাশি গ্রহণপূর্ব্বক সমীকরণ সাধিতে হয়। সারণী-সহায়ে ধূমকেতুর আনুমানিক কক্ষোপকরণ অনায়াসে পাওয়া যায়। যথাসম্ভব প্রকৃত কক্ষানিরূপণ করিতে হইলে, ধূমকেতু যাবৎ

দৃষ্টিগোচর থাকে, তাবৎ কাল পুনঃপুনঃ পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে এবং বেধলব্ধ ফলেরও তারতম্য দেখিতে হইবে ; সুতরাং এজন্য অনেক দিন ধরিয়া পরিশ্রম করিতে হয়।

এ স্থলে গণিতের যে রীতি প্রদর্শিত হইল, তাহা যদ্রূপ কেতুকক্ষানিরূপণ জন্য প্রযুক্ত হয়, তদ্রূপ গ্রহকক্ষানিরূপণ জন্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে। গ্রহগণের গতি যে সকল নিয়মের অধীন, ধূমকেতুগণ সেই সকল নিয়মের অধীন। সুতরাং উভয়বিধ জ্যোতিষ্কের কক্ষাগণিতের সবিশেষ রীতিভেদ হইতে পারে না। ভেদের মধ্যে এই যে, কেতুকক্ষা সাধারণতঃ ক্ষেপণী বলিয়া স্বীকার করা যায়। এই ক্ষেপণীব্যক্ত সূচীখণ্ড বিশেষ উৎকেন্দ্রত্ববিশিষ্ট ; তাহা হইলেই গ্রহকক্ষায় যত অব্যক্ত রাশি থাকে, কেতুকক্ষায় তাহা অপেক্ষা একটি কম অব্যক্ত রাশি থাকে। পূর্ব্বে গ্রহবিষয়ক উপকরণ সকল নিরূপণের যে সকল বিধি লিখিত হইয়াছে, সে সকল কেবল উজ্জ্বল গ্রহ পক্ষে প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু যখন একটি ক্ষুদ্র গ্রহ আবিষ্কৃত হয়, তখন কতিপয় দিবসের বেধলব্ধ ফল দ্বারা কক্ষনিরূপণ করা আবশ্যক, এবং তখন এই পরিচ্ছেদে লিখিত রীতি অবলম্বন করিতে হয়।

কোন ধূমকেতু সাময়িক কি না, তাহা জানিবার উপায়।—কেতুগণ যাবৎ অনুহৈলিকের আসন্ন থাকে, অর্থাৎ যখন রবিসন্নিহিত কক্ষাংশে বিচরণ করে, তাবৎ তাহারা দৃষ্টিগোচর থাকে ; পরন্ত অনুহৈলিক বিন্দুর উভয় পার্শ্বে অনেক দূর পর্য্যন্ত কি বৃত্তাভাস, কি ক্ষেপণী, কি হাইপারবোলা সকলই একাকার দেখায় ; সুতরাং এই ত্রিবিধ সূচীখণ্ডের মধ্যে কোন্‌টিতে কেতু ঘুরিতেছে, তাহা ঠিক করা কঠিন। ধূমকেতু যদি বৃত্তাভাস-কক্ষায় পরিভ্রমণ করে, তবে এক ভভ্রম-সমাপনের পর আবার অনুহৈলিকে অবশ্যই আসিবে। অতএব ভিন্ন ভিন্ন বৎসরের দুইটি ধূমকেতুকে অভিন্ন, কক্ষে পরিভ্রমণ করিতে দেখা যায়। তবে খুব সম্ভব যে, কেতুদ্বয় অভিন্ন অর্থাৎ একই কেতু বৃত্তাভাসে পরিভ্রমণ করিয়া পুনরুদিত হইয়াছে ; এবং এই কেতুকে যদি পুনঃপুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হইতে দেখা যায়, তবে কেতুকক্ষার বৃত্তাভাসত্বের পূর্ণ প্রমাণ পাওয়া গেল।

কোন ধূমকেতুর ভগণকাল ৩½ বৎসরের ন্যূন নাই। ধূমকেতুর পুনরুদয় দেখিয়া দৃঢ়রূপে প্রমাণীকৃত দীর্ঘতম ভগণকাল ৭৫ বৎসরের অধিক পাওয়া যায় নাই। অনেক ধূমকেতুর গণিতাগত ভগণকাল শতাব্দের অধিক ; অনেকের

ভগণ বহু শতাব্দও সম্ভব। কেতু যদি বস্তুতঃ ক্ষেপণীকক্ষে ভ্রামিত হয়, তবে তাহার পূর্ণ ভগণ কোন কালেও সম্পূর্ণ হইবে না। নিম্নলিখিত তেরটি ধূমকেতুর ভগণ কাল অবিসংবাদী।

এম্‌ক	৩.৩০৮	বৎসর	দ আরেষ্ট	৬ ৬৮৬	বৎসর
টেম্পেল ১৮৭৩	৫.২১২	„	ফে	৬.৫৬৬	„
টেম্পেল ১৮৬৭	৬.৫০৭	„	বিএলা	৬.৬০৮	„
টেম্পেল স্বীফ্‌ট	৫.৫৩৫	„	তুত্তেল	২৩.৭৬০	„
উইন্‌নেক	৫.৮১২	„	ওলবর্স	৭২.৬৩	„
ব্রোর্সেন	৫ ৪৬২	„	পোনস ব্রুক্স	৭১.৪৮	„

হেলি ৭৬.৩৭ বৎসর।

ক্রমশঃ।

গান।

ছায়ানট,—আড়াঠেকা।

সখা, দিও না দিও না মোরে এত ভালবাসা ;
জগতে তাহলে মোর রবে না কিছুরই আশা।
তুমি দিলে সারা মন,
কি করিব আরাধন,
মাগিয়ে তোমার দ্বারে শুধু কি পাব নিরাশা ?
প্রতিদিন ফুল তুলে,
যাইব তোমার কূলে,
সে দিনের মত শুধু মিটায়ো প্রেমপিপাসা।
কোটি কোটি লয়ে কান,
যাব শুনিবারে গান,
সরমে কহিও শুধু একটি মরম-ভাষা।
আমার জীবন-নদী
এত প্রেম পায় যদি,
ভাঙ্গিয়া ভাসিয়া যাবে আমার সুখের বাসা।

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। শ্রাবণ। "সুখু" শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বিরচিত একটি ক্ষুদ্র গল্প। লেখক বোধ করি নূতন ব্রতী। "ইন্দ্র" শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ, শিক্ষাপ্রদ জ্যোতিষবিষয়ক প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত "পাটের চাষ" প্রবন্ধটিতে বিশেষ জ্ঞাতব্য কিছু নাই। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের "ঝুলনযাত্রা" প্রবন্ধটি সুখপাঠ্য। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র শাস্ত্রীর "রাম রাজার মুলুক" ও শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর "কাহাকে" এখনও চলিতেছে ; এ সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "কাব্য-বিজ্ঞানে" 'চন্দ্রের ইতিবৃত্ত' ও 'বৈজ্ঞানিক গবেষণা' নামক দুইটি কবিতা আছে। কবিতা দুটির কবিত্ব কি, তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না ; বরং ইহাতে কিঞ্চিৎ হাস্যরস আছে, বোধ হইল। "দর্পেশিনী" একটি গল্প, ক্রমশঃপ্রকাশ্য। লেখকের ভাষা বড় দীন ; গল্পটি অদ্ভুত, কিন্তু কৌতূহলের উদ্দীপক। শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন রায় "সমালোচনা" প্রবন্ধে সমালোচকের লক্ষণ ও কর্ত্তব্য প্রভৃতির নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। লেখকের "পাথুরিয়া কয়লা সমাচ্ছন্ন বাষ্পীয় যান ঘর্ঘরিত সভ্যতা" প্রভৃতি ভাষা অত্যন্ত কর্ণকটু ও বিকৃত বলিয়া মনে হয়।

নব্যভারত। ভাদ্র ও আশ্বিন। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্যের "রাজ-তরঙ্গিণী" একটি গবেষণাপূর্ণ প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। ত্রৈলোক্য বাবু প্রত্নতত্ত্বে পারদর্শী,—এ বিষয়ে তিনি বঙ্গসাহিত্যের যথার্থ উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি করিতেছেন। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধটিও তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রভূত পরিচয় দিতেছে। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসুর "দার্শনিক মতভেদ" উৎকৃষ্ট হইতেছে। শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচন্দ্র ঘোষের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" আলোচনার যোগ্য। "বল ও ব্যায়াম" প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত মনোমোহন সেন গুপ্তের রচিত। এই উৎকৃষ্ট প্রবন্ধটি সময়োপযোগী হইয়াছে। আমাদের শারীরিক বলের উৎকর্ষ সর্ব্বথা প্রার্থনীয়। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং" বর্ত্তমান অবস্থায় ইহাই আমাদিগের মূলমন্ত্র হওয়া আবশ্যক। যাঁহারা এ বিষয়ে বাঙ্গালীর মনোযোগ আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী "একশৃঙ্গ" নামক মনোজ্ঞ প্রবন্ধে যথেষ্ট অনুসন্ধাননিপুণতা ও রসানুভাবকতার পরিচয় দিয়াছেন। লেখক ইহাতে রামায়ণের ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত অবদান-কল্পলতার একশৃঙ্গের অভিন্নতা প্রতিপাদিত করিয়াছেন এবং উভয় আখ্যায়িকার বিশ্লেষণ ও তুলনায় সমালোচনা করিয়াছেন। "দীন-জননী মহারাণী স্বর্ণময়ী" প্রবন্ধটি "নব্যভারতের" সম্পাদক মহাশয়ের রচিত। প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। স্বর্ণময়ীর জীবনের আলোচনায়, লেখক সহৃদয়তা ও আন্তরিকতা ঢালিয়া দিয়াছেন।

উৎসাহ। ভাদ্র। শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী "জুলিয়াস্ সিজারে পোর্সিয়া" প্রবন্ধে পোর্সিয়া-চরিত্রের সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। প্রবন্ধ এখনও সমাপ্ত হয় নাই। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "রাজসাহী" প্রবন্ধটি বেশ হইতেছে।

সখা ও সাথী। ভাদ্র। "মহারাণী স্বর্ণময়ী" প্রবন্ধটি বালকদিগের জন্য লিখিত, কিন্তু ভাষা ও ভাব তাহাদের উপযোগী করিবারজন্য লেখক চেষ্টা করেন নাই। "সাথীর" "সিংহ ভয়ে পলাইও না" ও "মুকুলের" "বাঘের ভয়" দুটি গল্পই এক ; বোধ করি, উভয় লেখকই এক স্থান হইতে গল্পটি সংগ্রহ করিয়াছেন ! এরূপ বিভ্রাট বড় মন্দ নয় ! "গ্লটন" প্রবন্ধটি বেশ হইয়াছে। "ধূর্ত্ত শেয়াল" একটি সচিত্র পদ্য। ছবিখানি মন্দ নয়, কিন্তু কবিতাটির আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না।

মুকুল। ভাদ্র। "মুন্সী কালীপ্রসাদ" একটি সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত। আমরা বয়স্ক পাঠকগণকেও এই হিন্দুস্থানী কায়স্থ মহাত্মার জীবনচরিত পাঠ করিতে বলি। "বাঘের ভয়" গল্পটি মন্দ নয়। "অদ্ভুত শিক্ষা" নামক প্রবন্ধটি সুখপাঠ্য। "কয়লার কাহিনী" রচনাটি শিক্ষাপ্রদ। "মা ও মেয়ে" কবিতাটি আমাদের মতে প্রকাশ না করিলেই ভাল হইত।

স্বাস্থ্য। প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা। ইহা একখানি নূতন মাসিকপত্র। নামেই পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন, স্বাস্থ্যবিষয়িণী আলোচনাই বক্ষ্যমাণ নবীন পত্রের উদ্দেশ্য। আশা করি, "স্বাস্থ্য" দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। স্বাস্থ্যপ্রসঙ্গ, স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবী লোক, রুগ্ন শিশুর শুশ্রূষা, খাদ্যের আবশ্যকতা ও উদ্দেশ্য প্রভৃতি প্রবন্ধগুলির বিষয় উৎকৃষ্ট ও সাধারণের উপযোগী; কিন্তু ভাষা ভাল নহে। ভাষার দোষে বক্তব্য বিষয়গুলি অনেক স্থলে পরিস্ফুট হয় নাই। এরূপ পত্রের ভাষা যথাসম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও প্রাঞ্জল হওয়া আবশ্যক। আশা করি, সম্পাদক মহাশয় এ বিষয়ে অবহিত হইবেন।

বীণাবাদিনী। "সঙ্গীত-প্রকাশিনী মাসিকপত্রিকা।"—শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত। ১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা; শ্রাবণ। আমরা এই অভিনব মাসিকপত্রিকার উদয় দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। সঙ্গীতবিষয়িণী মাসিকপত্রিকার প্রচার বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম। আশা করি, সম্পাদক মহাশয়ের এই প্রথম উদ্যম অচিরে সফল হইবে, এবং ভবিষ্যতে "বীণাবাদিনী"র "গঠিত মন্দিরে বঙ্গীয় সঙ্গীতশ্রীর রত্নসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। এই সংখ্যায় সাতটি গান ও তাহার স্বরলিপি আছে। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়েরা এই সাতটি গানের প্রণেতা। এরূপ ঐকদেশিক নির্ব্বাচন সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। বঙ্গসাহিত্যে উৎকৃষ্ট সঙ্গীতের অভাব নাই;—"বীণাবাদিনী" যে চারি জন রচয়িতার গান লইয়া আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের গীত রচনা করিবার, এমন কি, ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার বহু পূর্ব্বেও, অনেক সুপ্রথিত সঙ্গীতরচয়িতার গানের তানে বঙ্গভূমি প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। তাঁহাদের পরেও এ দেশে সঙ্গীতের প্রস্রবণ শুষ্ক হইয়া যায় নাই। সঙ্গীতশাস্ত্রের পারদর্শী ও সঙ্গীতসাহিত্যে সুনিপুণ "বীণাবাদিনী"র সম্পাদকমহাশয়কে বোধ করি তাহার পরিচয় নূতন করিয়া দিতে হইবে না। দেখিতেছি, "বীণাবাদিনী"র প্রথম সংখ্যায় আর সকলে একেবারেই বাদ পড়িয়াছেন। অন্ততঃ বৈচিত্র্যের অনুরোধেও বাহিরের দু'একটি গান প্রকাশিত হইলে আমরা সুখী হইতাম। প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া একাল পর্য্যন্ত যে বিস্তৃত সঙ্গীতসাহিত্য পুঞ্জীকৃত হইয়াছে, তাহার গুণগ্রহণে অক্ষম বা অনিচ্ছু হইলে "বীণাবাদিনী" প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবে না। যে সাতটি সঙ্গীত প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যেও সবগুলি সাধারণের উপযোগী বা চিত্তরঞ্জনের যোগ্য বলিয়া আমাদের মনে হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখী" ইতিশীর্ষক গানটি উল্লিখিত হইতে পারে। গানটিতে সুমিষ্ট শব্দসমষ্টি ব্যতীত আর কি আছে, বলিতে পারি না। এরূপ গানের প্রচারে, কেবল "বীণাবাদিনী"র নয়, আমাদের প্রিয় কবিরও প্রতিষ্ঠাহানি হয়। "মম হৃদয় শয়ন-মাঝে শুন মধুর মুরলী বাজে মম অন্তরে থাকি থাকি" কেবল কষ্টকল্পিত চর্ব্বিতচর্ব্বণ নয়, নিতান্তই হাস্যরসের উদ্দীপক।

আমরা "বীণাবাদিনী"র দীর্ঘজীবন ও সুপ্রতিষ্ঠার অভিলাষী; তাই প্রথম সাক্ষাতেই এই অপ্রিয় সত্য কীর্ত্তন করিতে হইল। আশা করি, "হিতং মনোহারি চ দুর্ল্লভং বচঃ", এই কবিবচন স্মরণ করিয়া মাননীয় সম্পাদক মহাশয় আমাদের ক্ষমা করিবেন।

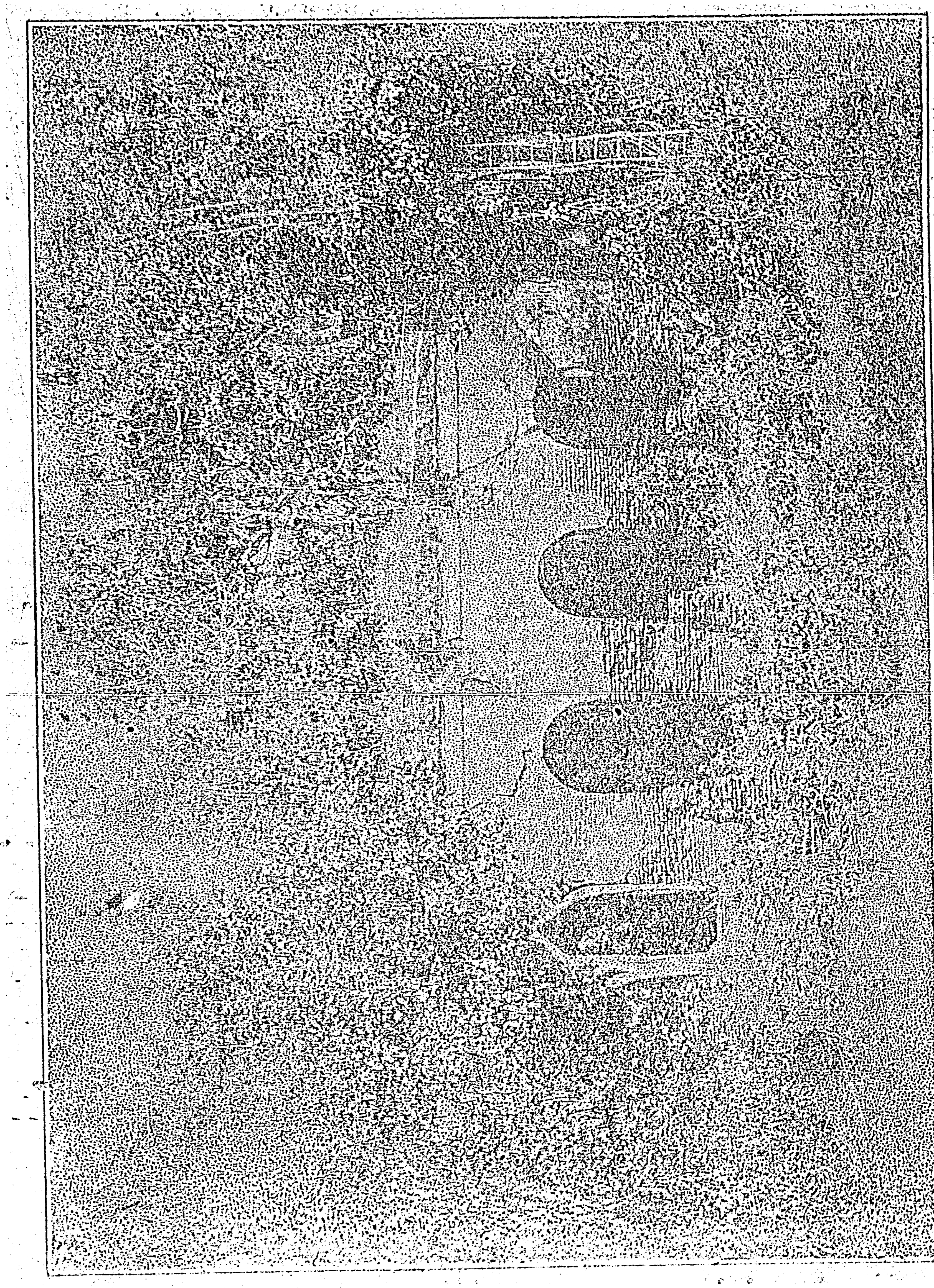

মহারাজা রামকৃষ্ণের সাধনমন্দির।

রাণী ভবানী।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাজ-দম্পতি।

সমতল-ক্ষেত্রবাহিনী স্রোতস্বিনীর প্রবাহ-বিধৌত বঙ্গভূমি সমধিকরূপে রূপৈশ্বর্য্যশালিনী বলিয়া বিদেশের লোকে চিরদিনই বাঙ্গালীর অল্পায়াসলভ্য পর্য্যাপ্ত অন্নব্যঞ্জনের প্রতি ঈর্ষ্যাকলুষিতনয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া আসিয়াছে, এবং সময়োচিত অবসর উপস্থিত হইলে, কেহই এ দেশের ধনধান্য লুণ্ঠন করিবার প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। এই জন্য একদিন পাঠান-সেনা "সোনার বাঙ্গালা" বিপর্য্যস্ত করিয়াছিল ; এই জন্য আবার পাঠানকে স্থবর্ণরেখা-পারে চিরনির্ব্বাসিত করিয়া মহারাজ টোডরমল্ল ও মানসিংহের বীর বাহু বাঙ্গলাদেশে মোগলের বিজয়-বৈজয়ন্তী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।* মহারাজ রামকান্ত ও রাণী ভবানী যথন রাজসাহী-রাজ্যে পুনরায় অধিকার লাভ করিলেন, তথন হইতে আবার বঙ্গভাগ্যে অভিনব রাষ্ট্রবিপ্লবের সূত্রপাত হইতে লাগিল। ইতিহাসে ইহারই নাম 'বর্গীর হাঙ্গামা'।

মহারাষ্ট্র-শক্তির অদ্বিতীয় অধিনায়ক ছত্রপতি শিবাজীর দৃষ্টান্ত ও উপদেশ অনুসরণ করিয়া, যাহারা বাহুবলোন্মত্ত বাদশাহ আলমগীরকেও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, শিবাজীর স্বর্গারোহণের পরে তাহারাই আবার লুণ্ঠন-লোলুপ দস্যুদলের ন্যায় ভারতবর্ষের বিবিধ প্রদেশে আত্ম-শক্তি বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল। ইহাদের উপদ্রবে বাদশাহের মুমূর্ষু শক্তি আরও হীনবল হইয়া পড়িল, ইহাদের লুণ্ঠনযাতনায় ভারতবর্ষের সমৃদ্ধ জনপদগুলি হাহাকার করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল ; অবশেষে বন্যাতরঙ্গতাড়িত জলস্রোতের ন্যায় এই সকল মহারাষ্ট্রবাহিনী "হর হর মহাদেও" রবে সগর্ব্বে বঙ্গভূমির বুকের উপর পিশাচের ন্যায় নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। গ্রাম, নগর উৎসন্ন হইতে লাগিল, শস্যক্ষেত্র পদদলিত হইতে লাগিল, লোকে প্রাণ লইয়া দূর স্থানে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল, শিল্পবাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইল ;† কেবল নিশিদিন,

---

* Stewart's History of Bengal.

† Despatch to the Court of Directors ; 8 January 1752 ; para 49.

আজ এখানে কাল সেখানে,—বনে জঙ্গলে, গ্রামে, নগরে, নদীসৈকতে, রাজপথে,—নবাবসেনার সহিত মহারাষ্ট্রসেনার তুমুল সংঘর্ষে বঙ্গভূমি রুধিররঞ্জিত নরকঙ্কালাকীর্ণ শ্মশানভূমিতে পরিণত হইতে লাগিল! নবাব আলিবর্দ্দীর অক্ষুণ্ণ অধ্যবসায় সে প্রতিকূল শক্তির গতিরোধ করিতে পারিল না; রাজধানী মুরশিদাবাদ পর্য্যন্ত লুণ্ঠিত হইয়া গেল! *

বর্গীর হাঙ্গামা বার্ষিক ঘটনায় পরিণত হইয়া পড়িল। † ভাগীরথীর পশ্চিমতীরস্থ জনপদগুলি জনশূন্য হইয়া উঠিতে লাগিল। রাজসাহী-রাজ্যের প্রধান রাজধানী বড়নগর এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী সমুদয় স্থান মহারাষ্ট্রনির্য্যাতনে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। রামকান্ত ও রাণী ভবানী রাজসাহীরাজ্যে অধিকার লাভ করিয়াও এই সকল কারণে নিরুদ্বেগে রাজ্যশাসন করিবার অবসর পাইলেন না।

লোকে দলে দলে ভাগীরথী এবং পদ্মার প্রবল প্রবাহ উত্তীর্ণ হইয়া উত্তর ও পূর্ব্ববাঙ্গালায় পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। অশ্বারোহী মহারাষ্ট্র-সেনার সহিত বাঙ্গালী পদাতিক সেনা কিছুতেই পারিয়া উঠিল না। অবশেষে নবাবপরিবার নিরাপদ স্থানে রক্ষা করিবার জন্য মহাবীর আলিবর্দ্দীও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন।‡ রামকান্ত ও রাণী ভবানী ভাগীরথীতীরসংলগ্ন বড়নগর-রাজবাটীর মায়ামমতা পরিত্যাগ করিয়া, নাটোরের পরিখাবেষ্টিত সুগঠিত রাজবাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; রাজবাটী রক্ষা করিবার জন্য মথুরাবাসী বলিষ্ঠদেহ বীরবংশোদ্ভব রণকুশল সেনাদল সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন;§ এবং গৃহতাড়িত অনাথ প্রজাপুঞ্জের সকরুণ হাহাকার নিবারণ করিবার জন্য অন্নবস্ত্র ও আবাসগৃহের সংস্থান করিয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ¶

* Mutakherin.

† During the 15 years of Aliverdi's Government or reign, scarcely a year passed free from the ruinous invasions of the Mahrattas—Mill's History of British India, Vol III. 161.

‡ Stewart's History of Bengal.

§ রাণী ভবানীর পুররক্ষী মথুরাবাসী সিপাহীসেনাদলের অবস্থিতির জন্য নাটোর রাজবাটীর অন্দরমহলের পার্শ্বদেশে যে সেনানিবাস বা 'বারিক' ছিল, তাহা কিয়ৎপরিমাণে ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া পড়িয়াছিল; ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ভূকম্পনে গৃহগুলি ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়া রহিয়াছে!

¶ বর্দ্ধমান অঞ্চল বর্গীর হাঙ্গামার কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিয়াছিল। সে অঞ্চলের যে সক

মহারাষ্ট্র-লুণ্ঠনে রাজসাহী-রাজ্যের একাংশ বিধ্বস্ত হইয়া গেল, রাজকোষ দিন দিন সঙ্কুচিত হইয়া আসিতে লাগিল, আত্মরক্ষা এবং প্রজাপালনের জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত সেনাদল পোষণ করিতে হইল; ইহাতেই মহারাজ রামকান্তের অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত হইয়া গেল! এই মহাবিপ্লবের প্রবল তরঙ্গে নিপতিত না হইলে, মহারাজ রামকান্তও যে সবিশেষ শাসন-কৌশল প্রদর্শন করিতে পারিতেন না, তাহা কে বলিতে পারে? এরূপ বিপ্লবের মধ্যে নিশিদিন বিড়ম্বিত হইয়াও, তিনি যতটুকু শাসনকৌশলের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহাও নিতান্ত যৎসামান্য নহে। পদ্মার উত্তরতীরস্থ রাজসাহী-প্রদেশের লোকে তাঁহার শাসনকৌশলে এই মহাবিপ্লবের মধ্যেও এরূপ অবিচলিতভাবে দিনযাপন করিয়াছিল যে, নবাব আলিবর্দ্দী রামকান্তের রাজ্যমধ্যেই নবাব পরিবারের জন্য নিরাপদ বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। রামপুর বোয়ালিয়ার অনতিদূরবর্ত্তী গোদাগাড়ি গ্রামে এই ঐতিহাসিক নবাব-বাড়ীর সীমাচিহ্ন ও ভগ্নাবশেষ এখনও পড়িয়া রহিয়াছে; এই স্থানের নাম "কেল্লা বারুইপাড়া।"*

রাজসাহী-প্রদেশ শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যের জন্য যেরূপ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা দেখিয়া নবাগত ইউরোপীয় বণিকেরা ইহার স্থানে স্থানে অনেকগুলি বাণিজ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন। সে সকল কুঠীর কোন কোন পুরাতন অট্টালিকা এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। বর্গীর হাঙ্গামায় এই সকল ইউরোপীয় বণিকদিগকেও সবিশেষ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সেকালে জলপথেই অধিকাংশ পণ্যদ্রব্য চলাচল করিত; কিন্তু ভাগীরথীতীরে মহারাষ্ট্রসেনা থানা দিয়া বসিয়া থাকিত বলিয়া, লুণ্ঠনভয়ে কেহ সহজে কলিকাতা-অঞ্চলে পণ্যদ্রব্য প্রেরণ করিতে স্বীকার করিত না।

ইহাতে শিল্পবাণিজ্যের কিঞ্চিৎ ক্ষতি হইলেও কৃষিপ্রধান রাজসাহী-রাজ্যে কোনরূপ অন্নকষ্ট উপস্থিত হয় নাই; সুতরাং রামকান্তের সময়ে রাজসাহীর

লোক আত্মরক্ষার আশায় পৈতৃক স্থান পরিত্যাগ করিয়া রাণী ভবানীর রাজ্যে আশ্রয়লাভ করিয়াছিল, তাহাদের বংশপ্রবাহ এখনও রাজসাহী-প্রদেশের নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

* The district contains no forts, except one beloning to the Nawab of Moorshidabad, at Godagaree, which was built in former times as a place of refuge for the Nawab's household, and is now in a most ruinous condition.—Hamilton's Description of Hindoostan. Vol. I.

অধিকাংশ স্থানের প্রকৃতিপুঞ্জ যে অপেক্ষাকৃত নিরুদ্বেগে জীবনযাপন করিতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

নবাবী আমলে রাজকর ব্যতীত অনেকগুলি বাজে জমা প্রদান করিতে হইত। এই বাজে জমার সংখ্যা এবং পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। মুরশিদ কুলি খাঁ এবং সুজা খাঁর আমলেই অধিকাংশ বাজে জমা সংস্থাপিত হয়। আলিবর্দ্দী সিংহাসনে পদার্পণ করিবার পর, 'আবওয়াব মন্‌সুরজী' ও 'চৌথ মারহাট্টা' নামে কয়েকটি বাজে জমা প্রচলিত হইয়াছিল। * এই সকল বাজে জমা ও বার্ষিক নির্দ্দিষ্ট রাজকর যথাকালে নবাব-সরকারে প্রদান করিতে রামকান্ত কোনদিনই ক্রটি করেন নাই। চারিদিকে যখন মহাবিপ্লব, চারিদিকে যখন নিরন্তর হাহাকার, চারিদিকে যখন অন্নাভাব, রাজসাহী-রাজ্যে যে তখনও ধনধান্য লইয়া প্রজাপুঞ্জ পরম সুখে সংসার পালন করিয়া অকাতরে রাজকর প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াছিল, ইহাই রামকান্তের শাসনগৌরবের উৎকৃষ্ট পরিচয়।

রামকান্ত ও রাণী ভবানী বিস্তৃত রাজ্যের অধিকারলাভ করিয়াও সাংসারিক জীবনে বিশেষ আনন্দ উপভোগ করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। রাণী ভবানীর দুইটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু দুইটি সন্তানই অকালে পরলোক গমন করায়, রাজদম্পতীর পক্ষে সংসার-সম্পদ বিষময় হইয়া উঠিয়াছিল। একমাত্র রাজকুমারী তারা তাঁহাদিগের শোক-সন্তপ্ত রাজপরিবারে সায়াহ্নের স্নিগ্ধোজ্জ্বল শশিকলার ন্যায় ধীরে ধীরে পরিবর্দ্ধিত হইতেছিলেন। এই কন্যারত্নই রাজদম্পতীর অপত্যস্নেহের একমাত্র আধার হইয়া উঠিতে লাগিলেন। রামকান্ত ও রাণী ভবানী তাঁহাকে আশৈশব পুত্রের ন্যায় পরম স্নেহে লালনপালন করিতে ও বিদ্যাশিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। আজকাল এদেশে স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচার হইতেছে, সেকালে স্ত্রীশিক্ষার এরূপ সমাদর ছিল না। কিন্তু তথাপি সেকালের প্রাচীন রাজপরিবারের কন্যাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা দৃষ্টিগোচর হইত। † স্বাভাবিক স্নেহবশতঃই হউক, আর রাজসংসারের মর্য্যাদারক্ষার জন্যই হউক, রাজকুমারী তারা বাল্যকাল হইতেই বিবিধ বিদ্যায় শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন।

রামকান্ত ও রাণী ভবানী উভয়েই ধর্ম্মানুরাগে বিবিধ পুণ্যকার্য্যের প্রতিষ্ঠা

* Grant's Analysis of Finances of Bengal.

† ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত।

করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। স্বামীর জীবনকালেই রাণী ভবানীর নাম দেশ বিদেশে প্রচারিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ রামকান্তকে যেরূপ উচ্ছৃঙ্খল-স্বভাব কুক্রিয়াসক্ত তরুণ যুবক বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের হয় ত এইরূপ ধারণা যে, রাণী ভবানীর পুণ্যকার্য্যগুলি, তাঁহার বৈধব্যদশায় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বাস্তবিক তাহা সত্য নহে। রামকান্ত স্বয়ং ধর্ম্মানুরাগী না হইলে রাণী ভবানীর পক্ষে রাজপুরবধূ হইয়া বহুব্যয়সাধ্য পুণ্যকার্য্যে হস্তক্ষেপ করা সহজ হইত না। উপর্য্যুপরি দুইটি পুত্রসন্তানের পরলোক-গমনে স্বামীস্ত্রী উভয়েই সংসারে কথঞ্চিৎ বীতরাগ হইয়া পরসেবাব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। রামকান্ত দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলে, হয় ত তাঁহার সংসারসুখ আবার উদ্বেলিত হইয়া উঠিত, কিন্তু অতি অল্পবয়সে সহসা তাঁহার পরলোকগমনে রাণী ভবানী সংসারসুখে চিরজীবনের জন্য জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হইলেন!

১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে মহারাজ রামকান্ত সহসা পরলোক গমন করায়, রাণী ভবানী রাজসাহী-রাজ্যের অদ্বিতীয়া অধীশ্বরী হইলেন। রাজসাহীর বিস্তৃত জনপদ এবং রাজকুমারী তারা তাঁহার একমাত্র চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল। চারিদিকে রাষ্ট্রবিপ্লব—স্বয়ং নবাব আলিবর্দ্দী অসিহস্তে মহারাষ্ট্রদমনে ছুটাছুটি করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতেছেন, কত প্রতিভাশালী রাজা, জমীদার রাজ্যরক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া, পথে পথে হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছেন,—এমন সময়ে রমণী হইয়া, অন্তঃপুরচারিণী হইয়া, রাণী ভবানী কেমন করিয়া রাজসাহীর ন্যায় অর্দ্ধবঙ্গব্যাপী বিস্তৃত রাজ্যের শাসনভার পরিচালন করিবেন, নবাব আলিবর্দ্দী সে জন্য একবারও চিন্তিত হইলেন না। রাণী ভবানীর উজ্জ্বল প্রতিভার কথা রাজা রামকান্তের জীবিতকালেই চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং নবাব আলিবর্দ্দী কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া তাঁহাকেই জমীদারী সনন্দ প্রদান করিলেন! সেকালের জমীদারদিগের জীবন-মরণের বিচারক্ষমতা ছিল, বাহুবলে রাজ্যরক্ষা করিবার স্বাধীনতা ছিল, এবং আবশ্যকমতে রাজদরবারে উপনীত হইয়া, মন্ত্রণাবলে নবাবের পক্ষ সমর্থন করিবার দায়িত্ব ছিল। জমীদার সর্ব্বতোভাবে করসংগ্রাহক শাসনকর্ত্তা বলিয়া পরিচিত ছিলেন, সুতরাং কোন জমীদার নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করিলে, তাঁহার বিধবা রমণীর পক্ষে উত্তরাধিকারিত্বসূত্রে পতিত্যক্ত রাজসম্পদ ও শাসনক্ষমতা সম্ভোগ করিবার অধিকার ছিল না। নবাব বাহাদুর যাঁহাকে ইচ্ছা করিতেন, তাঁহাকে শাসনভার সমর্পণ করিয়া পরলোকগত জমীদারের পরিবারবর্গের ভরণ-

পোষণের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। এরূপ ক্ষেত্রে, শাসনকৌশলের পরিচয় না পাইলে, আলিবর্দ্দীর ন্যায় প্রবীণ নরপতি যে বিপ্লবময় রাজসাহী-রাজ্য একজন রমণীর শাসনাধীন রাখিতে সম্মত হইতেন না, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

রাণী ভবানী যখন রাজসাহী-রাজ্যের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার পূর্ণ গৌরবের অবস্থা। বাঙ্গালাদেশ যে একাদশ চাকলায় বিভক্ত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে আট চাকলায় রাজসাহীর জমীদারী বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং রাণী ভবানী মুরশিদাবাদ, ঘোড়াঘাট, ভূষণা, আকবর-নগর, জাহাঙ্গীরনগর, বর্দ্ধমান, যশোহর এবং কড়াইবাড়ী নামক আট চাকলার বিবিধ স্থানের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন।* এই আট চাকলার মধ্যে কোন কোন চাকলার সমুদায় স্থানই রাণী ভবানীর অধিকারভুক্ত ছিল। এই সকল বহুবিস্তৃত জনপদের রাজকর সংগ্রহ করাই কত কঠিন; তাহার উপর আবার সেকালের রাজবিধির ব্যবস্থানুসারে এই বিস্তৃত রাজ্যের প্রকৃত শাসনভারও রাণী ভবানীর হস্তেই সমর্পিত হইল। সুতরাং বিপ্লবময় যুগে বিধবা হিন্দুরমণীর হস্তে এতগুলি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র প্রদেশের শাসনভার সমর্পিত হইবামাত্র রাণী ভবানীর সকল চিন্তা রাজসাহী-রাজ্যের প্রতিই আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। তিনি কিরূপ সুকৌশলে সেই বিস্তৃত রাজ্যের শাসনকার্য্য সম্পাদন করিয়া আপন নাম প্রাতঃস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক বড়ই বিস্ময়ের বিষয়। ইহাতেই তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে।

রাণী ভবানীর অধিকৃত রাজসাহী-রাজ্যের বর্ণনা করিতে গিয়া একজন সমসাময়িক ইংরাজ লেখক যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, সেই বর্ণনানুসারে জানা যায়, "তৎকালে রাণী ভবানীর বার্ষিক দেড়কোটী টাকা আয় ছিল, তাহা হইতে কেবল ৭০ লক্ষ টাকা রাজকর প্রদান করিতে হইত; এবং তিলিবংশীয় মন্ত্রীবর দয়ারামের সাহায্যে তিনি সুসংস্থাপিত রাজসাহী-রাজ্যের শাসনভার পরিচালন করিতেন।"† এই শাসনভার পরিচালনা করিবার সময়ে রাণী

* Grant's Analysis of Finances of Bengal.

† At Nattore about ten days' travels North-east of Calcutta resides the family of the most ancient and opulent of the Hindu princes of Bengal. Raja Ramkant of the race of Brahmins, who deceased in the year 1748,

ভবানী যে সকল পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, একালের লোকের পক্ষে তাহার মর্য্যাদা নির্ণয় করা সহজ নহে। একালে টাকা থাকিলে যাহা সম্ভব হয়, সেকালে টাকা থাকিলেই তাহা সম্ভব হইত না। দেশে পথ ঘাট ছিল না, লোকে দস্যুতস্করের ভয়ে সযত্নসঞ্চিত ধনরত্ন মৃত্তিকাগর্ভে বা ভস্মস্তূপে লুকাইয়া রাখিতে বাধ্য হইত; সর্ব্বত্র বাহুবলের প্রবল প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। সুতরাং জমীদারদিগকে বাহুবলে রাজ্যরক্ষা করিতে হইত, বিচারবলে দুষ্টের দমন করিতে হইত, শাসনকৌশলে শান্তি সংস্থাপন করিতে হইত; এবং এই সকল দুরূহ কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে না পারিলে, কেহই দেশে দেশে পুণ্য-কার্য্যের প্রতিষ্ঠা করিবার অবসর লাভ করিতেন না। বর্গীর হাঙ্গামায় দেশের মধ্যে তুমুল কোলাহল ও দীর্ঘস্থায়িন অরাজকতা উপস্থিত হইয়া, এই দুষ্কর ব্রত আরও দুষ্কর করিয়া তুলিয়াছিল। রাণী ভবানী সেই ব্রত যেরূপ সুকৌশলে সুসম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া ইতিহাস-লেখকমাত্রেই তাঁহাকে অজস্র সাধুবাদ প্রদান করিয়া গিয়াছেন।* রাণী ভবানীর জীবনকাহিনী আমাদের দেশের অর্দ্ধশতাব্দীর সুখদুঃখের বিস্তৃত কাহিনীর সঙ্গে এরূপ ভাবে জড়িত হইয়া রহিয়াছে যে, সমসাময়িক ইতিহাসের আলোচনা না করিলে, তাঁহার জীবনকাহিনীর প্রকৃত সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার উপায় নাই। এখন আর সেদিন নাই! এখন আমরা পরাধীন; অন্নবস্ত্রের জন্য, শিক্ষাদীক্ষার জন্য, সুবিচার সুশাসনের জন্য, দেশের উন্নতি অবনতির জন্য, সকল বিষয়ের জন্যই পরমুখাপেক্ষী। রাণী ভবানীর সময়ে যদিও মুসলমান এ দেশের রাজসিংহাসন অধিকার করিতেন, তথাপি সাক্ষাৎসম্বন্ধে বাঙ্গালাদেশ

was succeeded by his wife, a princess named Bhobanee Ranee, whose Dewan or minister was Dayaram of the Teely caste or tribe; they possess a tract of country about thirty-five days' travel and under a settled Government; their stipulated annual rent to the Crown was seventy lakhs of sicca Rupees, the real revenues about one krore and a half"—Holwell.

* She was the most celebrated personage in the whole family and her administration of the Raj, during the last half of the last century, was memorable. ... ... Maharani Bhabhani was pious, liberal and actively benevolent. She was not slow in performing the duties of her station, as she understood them according to the lights of her age and country.—The Rajas of Rajshahi.

জমীদারদিগেরই শাসনাধীন ছিল। সে শাসনকার্য্যে নবাবের মুখাপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হইত না, কিংবা প্রতেক শাসনকার্য্যেই ভয়ে ভয়ে পদসঞ্চালন করিতে হইত না। প্রতিভাশালিনী রাণী ভবানী সেই জন্য স্বাধীন শাসনক্ষমতা পরিচালনা করিবার অধিকার লাভ করিয়া আত্মগৌরবে বাঙ্গালী জাতিকেও গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। স্বাধীনভাবে শাসনক্ষমতা পরিচালন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইলে, বাঙ্গালী কত সহজে, কত অল্পব্যয়ে, কিরূপ সুকৌশলে রাজ্যশাসন করিয়া প্রজাপুঞ্জের সুখসৌভাগ্য বর্দ্ধন করিতে সক্ষম, রাণী ভবানীর জীবনকাহিনীই তাহার উজ্জ্বল নিদর্শন।

আলিবর্দ্দী সামান্য অবস্থা হইতে প্রতিভা ও বাহুবলে বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি যদি সে সময়ে সরফ-রাজের সিংহাসনে আরোহণ না করিতেন, তবে যে মহারাষ্ট্র লুণ্ঠনে এদেশের কত না দুর্গতি হইত, তাহা অনেকেই দিব্যচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। অন্যের কথা দূরে থাকুক, পরবর্ত্তী ইংরাজ ইতিহাসলেখকেরাও সে কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন! * আলিবর্দ্দী বুঝিয়াছিলেন যে, কেবল বাহুবলে অথবা সংগ্রামকৌশলে মহারাষ্ট্র সেনার নিষ্ঠুর নির্য্যাতন হইতে প্রজাসাধারণকে রক্ষা করা অসম্ভব; সেই জন্য তিনি সমুদায় জমীদারদিগের সহিত মিলিত হইয়া, কখন বাহুবলে, কখন মন্ত্রণাকৌশলে, কখন বা শাসনগুণে দেশরক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। এই জন্য নবাবের সঙ্গে জমীদারদিগের এবং জমীদারদিগের সঙ্গে নবাবের যে স্বাভাবিক স্নেহবন্ধন সুদৃঢ় হইয়া উঠিতেছিল, তাহাতেই আলিবর্দ্দীর সিংহাসন তুমুল সংঘর্ষের মধ্যেও অটল হইয়া রহিল! সেই সিংহাসন রক্ষা করিবার জন্য জমীদারদল সেনাসাহায্য করিয়া, অর্থসাহায্য করিয়া, কেহ কেহ বা যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও আলিবর্দ্দীর পৃষ্ঠরক্ষা করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য যে, রাজসাহী-রাজ্যের অধীশ্বরীকে এই কার্য্যে বিশেষভাবে নবাবের সহায়তা-সাধন করিতে হইত। তজ্জন্য নবাব-দববারে রাণী ভবানীর নাম বিশেষ পরিচিত হইয়া উঠিল।

আলিবর্দ্দীর পুত্রসন্তান ছিল না;—তিনটি মাত্র কন্যা। তিনি ভ্রাতা হাজি আহ্‌মদের তিন পুত্র—নওয়াজেস্ মোহম্মদ, সাইয়েদ আহম্মদ এবং জয়েনউদ্দী-নের সঙ্গে আপন কন্যাত্রয়ের বিবাহ দিয়া, নওয়াজেস্‌কে ঢাকার, সাইয়েদকে পূর্ণিয়ার এবং জয়েনউদ্দীনকে পাটনার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন;

* Mill's History of British India, Vol. III.

এবং জয়েন উদ্দীনের জ্যেষ্ঠপুত্র মিরজা মোহম্মদকে উত্তরাধিকারী করিবার জন্য তাঁহাকেই পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইতিহাসে এই পোষ্যপুত্রের নাম নবাব সিরাজদ্দৌলা। বর্গীর হাঙ্গামায় বঙ্গভূমি যখন নিরতিশয় নির্য্যাতন সহ্য করিতেছিল, তখন বীরবালক সিরাজদ্দৌলা মাতামহের সঙ্গে অসি হস্তে উড়িষ্যায়, মেদিনীপুরে, বর্দ্ধমানে, বেহারে—নানা স্থানে শত্রুদলনে ছুটিয়া বেড়াইতেছিলেন। * সাহসে, সমরকৌশলে, কূটনীতিতে অথবা অদম্য হৃদয়-বেগে বালক হইয়াও সিরাজদ্দৌলা লোকসমাজে সুপরিচিত হইয়া উঠিয়া-ছিলেন। কেবল মাতামহের অসঙ্গত স্নেহপ্রবণতায় বাল্যজীবনে প্রবৃত্তি-দমনের শিক্ষা না পাইয়া, তাঁহার তরুণ হৃদয় অশান্ত ঝটিকার ন্যায় তীব্রতেজে সহসা আলোড়িত হইয়া উঠিত।

সিরাজদ্দৌলার প্রতি আলিবর্দ্দীর আন্তরিক অনুরাগ দেখিয়া, আলিবর্দ্দীর কন্যা বা জামাতাদিগের মধ্যে কেহই আনন্দলাভ করেন নাই। নওয়াজেস এবং সাইয়েদ আহম্মদ একরূপ প্রকাশ্যভাবেই প্রতিদ্বন্দী হইবার ভয়প্রদর্শন করিতেন। সুতরাং যে সময়ে বহিঃশত্রুর প্রবল প্রতাপে বঙ্গভূমি কম্পিত-কলেবরে বর্ষাযাপন করিত, সেই সময়ে রাজধানীতে বসিয়া পাত্রমিত্রগণ এবং প্রধান প্রধান জমিদারদল, কে কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিবেন, তাহার জন্য নানারূপ কলকৌশল বিস্তার করিতেন। রাণী ভবানী এই গৃহকলহে কোন পক্ষেই যোগদান না করিয়া, নিপুণভাবে রাজ্যরক্ষায় নিযুক্ত রহিলেন।

উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি।

দীর্ঘতমা সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধ ইতিপূর্ব্বে "সাহিত্যে" প্রকাশিত হইয়াছে। †

* Mutakherin.

† সাহিত্য; ৭ম ভাগ ৫ম। ৬ষ্ঠ সংখ্যা এবং ৮ম ভাগ ২য় সংখ্যা। এই শেষ সংখ্যার প্রবন্ধে অনেকগুলি ছাপার ভুল প্রবিষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েকটি ভ্রম অর্থগ্রহ-পক্ষে ব্যাঘাত উৎপাদন করে বলিয়া নিম্নে সংশোধিত হইল:—

পত্রাঙ্ক	পংক্তি	অশুদ্ধ পাঠ	শুদ্ধ পাঠ।
৭৪	১	পৌরব	কৌরব
"	৪	পৌরবেরা	কৌরবেরা
"	২৬	পুরুবংশ	কুরুবংশ
৭৮	২১	১০।১৫ বৎ	১০।১৫ বৎসর

অধিকন্ত যে ঋষির প্রকৃত নাম বসিষ্ঠ, তাহা বশিষ্ঠ বলিয়া অশুদ্ধ ভাবে মুদ্রিত হইয়াছে।

তাহাতে প্রথম প্রবন্ধে ঋষির জীবনবৃত্তান্তঘটিত দুই একটি কথার উল্লেখ করিয়াছি; দ্বিতীয় প্রবন্ধে তাঁহার আবির্ভাবকাল ও জন্মস্থান সম্বন্ধে বিচার করিয়াছি। পাঠকবৃন্দের স্মরণ হইবে, এই বিচার অনুসারে ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দপূর্ব্ব বৎসরে উক্ত ঋষি বিদ্যমান ছিলেন, সিদ্ধান্ত হইয়াছে। ইহা একটি স্থূল সিদ্ধান্ত; দশ বৎসর এদিক ওদিক হইতে পারে। সহজে স্মরণ রাখিবার জন্য অতঃপর খ্রীষ্টাব্দপূর্ব্ব ১৭০০ বৎসরকে দীর্ঘতমার আবির্ভাবকাল বলিয়া ধরা যাইবে।

প্রাচীন ইতিহাসে দীর্ঘতমার স্থান।

কেবল খ্রীষ্টাব্দপূর্ব্ব ১৭০০ বৎসরে দীর্ঘতমা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এই কথায় ইতিহাসে দীর্ঘতমার স্থান পরিষ্কাররূপে বুঝা যায় না। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে আমরা এই সমালোচনা করিতেছি; অতএব বর্ত্তমান সময়ের ৩৫৯৭ বৎসর পূর্ব্বে ঋষি দীর্ঘতমা জীবিত ছিলেন। কিন্তু আমাদের ইতিহাসের প্রারম্ভ কোথায়?

যে বিশাল বেদশাস্ত্রের একটি কোণে দীর্ঘতমা নিদ্রিত রহিয়াছেন, তাহা কোন্ সময়ে রচিত হইতে আরম্ভ হয়, এবং তাঁহার এদিকে ওদিকে আরও যে বহুসংখ্যক ঋষি তাঁহার ন্যায় নিদ্রামগ্ন, তাঁহারাই বা কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন? যখন দীর্ঘতমা জীবিত ছিলেন, তখনও ভারতবর্ষের 'ভারতবর্ষ' নাম হয় নাই। তিনি যে চক্রবর্ত্তী রাজাকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, সেই শকুন্তলাপুত্র ভরত আমাদের আদিম ঐতিহাসিক রাজা নহেন। ভরতের পূর্ব্বপুরুষেরা কোথায় পূর্ব্বে বসবাস করিতেন, কোন্ সময়ে এ দেশে প্রবিষ্ট হয়েন, এবং সাম্রাজ্যের সূত্রপাত করেন, তাহা না জানিলে, ভরত রাজা এবং তাঁহার রাজসভার প্রধান ঋষি দীর্ঘতমার ইতিহাস সম্যক্ বোধগম্য হইতে পারে না। এজন্য প্রাচীন ইতিহাসে দীর্ঘতমার স্থাননিরূপণ করা আবশ্যক।

জম্বুদ্বীপ।

অতি প্রাচীনকালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা, পৃথিবীর যে অংশের সহিত তাঁহাদের পরিচয় জন্মিয়াছিল, তাহাকে জম্বুদ্বীপ বলিতেন। তাঁহারা অনুমান করিয়াছিলেন যে, জম্বুদ্বীপ চারি দিকেই লবণসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। বাস্তবিক ভারতবর্ষের তিন দিকেই লবণসমুদ্র, ইহা নিশ্চয়ই তাঁহারা দেখিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া গেলে, বহুদূরে যে মহাসমুদ্র দৃষ্ট হয়, তাহার সহিত তাঁহাদের পরিচয় ছিল কি না, নিশ্চয় বলা যায় না। জনরবে হয় ত তাঁহারা শুনিয়াছিলেন, উত্তরেও সুদূরে লবণসমুদ্র আছে। ফলতঃ, জম্বুদ্বীপের সীমা ও আয়তন অধিকাংশই কাল্পনিক

ভারতবর্ষকে তাঁহারা জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত বলিয়া বর্ণনা করিতেন; ভারতবর্ষের সহিতই তাঁহাদের উত্তরকালে সম্যক্ পরিচয় হইয়াছিল। ভারতবর্ষেরই বিবরণ তাঁহারা যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পক্ষান্তরে, জম্বুদ্বীপের কথা প্রায়ই কাল্পনিক। জম্বুদ্বীপের বহির্দ্দেশে দধিসমুদ্র, ক্ষীরসমুদ্র ইত্যাদি নিরবচ্ছিন্নকল্পনামূলক সমুদ্রবেষ্টিত অন্যান্য ছয়টি দ্বীপের কথা শুনা যায়, এবং পৃথিবী এইরূপে সপ্তদ্বীপা বলিয়া কল্পিত হয়েন। চিন্তাশীল পাঠকমাত্রেরই কৌতূহল জন্মিবে যে, এরূপ একটা কাল্পনিক জম্বুদ্বীপের কথা আমাদের সমাজে কেন সমীচীন বলিয়া একদা পরিগৃহীত হইয়াছিল? বাস্তবিক কি কোনও জম্বুদ্বীপ ছিল না? তবে অসংখ্য লোকে বহুকাল ধরিয়া জম্বুদ্বীপের কথায় বিশ্বাস করিত কেন? জম্বুদ্বীপকল্পনার উৎপত্তিই বা কিরূপে হইল?

জম্বুখণ্ড।

জম্বুদ্বীপ অধিকাংশই কল্পনা; কিন্তু যে সত্য হইতে এই কল্পনার উদ্ভব, তাহার নাম জম্বুখণ্ড। এই জম্বুখণ্ড একটি যথার্থ ঐতিহাসিক নাম। পৃথিবীর একটি স্থান বাস্তবিকই একদা জম্বুখণ্ড নামে বিখ্যাত ছিল। তদ্দেশবাসিগণ বাস্তবিকই তাহাকে 'জম্বু'-দেশ বলিত। যেমন ইয়োরোপের তুর্কি এক সময়ে রোম না হইয়াও রোমানগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়া রোম নামে বিখ্যাত হইয়াছিল, তেমনি জম্বুর আর্য্যেরা ভারতবর্ষে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইলে, ইহাও জম্বু নামে বিখ্যাত হয়। দীর্ঘতমার সময়ে তৎকালীন ভারতবর্ষ এইরূপে 'জম্বু' নাম লাভ করে। কিন্তু আদিম জম্বুখণ্ড ভারতবর্ষের বহির্দ্দেশে অবস্থিত ছিল। জম্বুখণ্ডের আর্য্যেরা দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িলে, জম্বু নামটিও সম্প্রসারিত হইয়া উঠে।

মহাভারতে জম্বুখণ্ডের বিবরণ।

আদিম জম্বুখণ্ড কোথায় ছিল? কুতূহলী পাঠক মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্ব উদ্ঘাটন করিলে দেখিতে পাইবেন, ভীষ্মপর্ব্বের প্রারম্ভেই 'জম্বুখণ্ডবিনির্ম্মাণপর্ব্বাধ্যায়।' ইহার পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে জম্বুখণ্ডের কথা আছে। তদনুসারে হিমালয় পর্ব্বতের উত্তরে আর একটি বিশাল পর্ব্বতশ্রেণী আছে, তাহার নাম হেমকূট পর্ব্বত। যেমন হিমালয়ের দক্ষিণে ভারতবর্ষ, তেমনই হিমালয় ও হেমকূটের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগের নাম হৈমবতবর্ষ। হেমকূটেরও উত্তরে আর একটি পর্ব্বতের নাম নীল পর্ব্বত, এবং তাহারও উত্তরে অপর একটি পর্ব্বতের নাম নিষধ পর্ব্বত। হেমকূট ও নীল পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগের নাম হরিবর্ষ; এবং নীল ও নিষধ পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগের নাম ইলাবৃতবর্ষ। এই সকল প্রাচীন বর্ষ সম্ভবতঃ এক

একটি বা কতকগুলি পর্ব্বতবেষ্টিত উপত্যকামাত্র। ইলাবৃতবর্ষেরই একাংশের নাম জম্বুখণ্ড।

ইলাবৃতবর্ষের মধ্যস্থলে একটি অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ বিদ্যমান ছিল; ইহা আমাদের সাহিত্যে অতিশয় প্রসিদ্ধ। ইহাই আমাদের মেরু বা সুমেরু পর্ব্বত।

ইলাবৃতবর্ষ।

ইহার হিমানীমণ্ডিত মনুষ্যের অগম্য মেঘসঞ্চরণপ্রদেশেরও ঊর্দ্ধবর্ত্তী শিখরে দেবলোক অবস্থিত বলিয়া প্রাচীনেরা কল্পনা করিয়াছিলেন। মধ্যস্থলে এই বিশাল পর্ব্বত অবস্থিত থাকায় ইলাবৃতবর্ষ চারি খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছিল। মেরুর পশ্চিমে কেতুমাল খণ্ড; উত্তরে উত্তরকুরু-খণ্ড; পূর্ব্বে ভদ্রাশ্বখণ্ড; এবং দক্ষিণে জম্বুখণ্ড। এই জম্বুখণ্ড একটি প্রকাণ্ড নদের উৎপত্তিস্থান; জম্বুখণ্ডের নদ বলিয়া ইহার নাম 'জম্বুনদ' হইয়াছিল। জম্বুনদের সিকতায় সুবর্ণ পাওয়া যাইত; তজ্জন্য আমাদের প্রাচীনেরা সুবর্ণকে 'জাম্বুনদ' বলিতেন। এই জম্বুনদই বর্ত্তমান আমুদরিয়া বলিয়া বোধ হয়। নদ বলিলে, মৃদুগামিনী, মৃদুভাষিণী, ক্ষীণাঙ্গী রমণীগণের মধ্যে ধাবন কুর্দ্দনে পটু গম্ভীরকণ্ঠ দীর্ঘাকার পুরুষের ন্যায়, ক্ষুদ্রাবয়বা স্রোতস্বতীগণের মধ্যে বিপুল জলপ্রবাহ বুঝিতে হইবে। সিন্ধুনদের উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত; তাহার উত্তরে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী আমুদরিয়া ভিন্ন আর অন্য নদ দেখা যায় না। 'আমু' শব্দের সহিত 'জম্বু' শব্দের কোনও সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা আমি অবগত নহি। জম্বুনদের যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহাতে ইহাকে স্পষ্টই আমুদরিয়া (Oxus) বলিয়াই উপলব্ধি হয়। জম্বুনদ সুমেরু পর্ব্বতকে প্রদক্ষিণ করিয়া উত্তরকুরুতে প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া বর্ণিত। উত্তরকুরু কোথায়?

মহাভারতে উত্তরকুরুর বর্ণনা এই রূপ:—

"সুমেরুর উত্তর ও নীলপর্ব্বতের দক্ষিণপার্শ্বে সিদ্ধগণনিষেবিত অতিপবিত্র উত্তরকুরু প্রতিষ্ঠিত আছে। তথায় বৃক্ষসকল প্রতিনিয়ত মধুররসসম্পন্ন সুস্বাদু ফল ও সুগন্ধি কুসুম-নিচয় প্রসব করে; সেই স্থানে সর্ব্বপ্রকার কামফলপ্রদ কতকগুলি পাদপ সকলের মনোরথ পরিপূর্ণ করিয়া থাকে এবং ক্ষীরী নামে কতকগুলি বৃক্ষ ছয়রসযুক্ত অমৃতোপম ক্ষীরধারা-বর্ষণ ও ফলগর্ভে বস্ত্র ও আভরণসমূহ উৎপন্ন করে। সেই স্থানের সমস্ত ভূভাগ মণিময় ও সূক্ষ্মকাঞ্চন-বালুকাসম্পন্ন। কোনও কোনও ভূমিখণ্ড হীরক বৈদূর্য্য ও পদ্মরাগতুল্য অতি রমণীয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। তত্রত্য পুষ্করিণীসকল পঙ্কশূন্য ও মনোরম; তাহার সলিল সকল ঋতুতেই সুখস্পর্শ হইয়া থাকে। মনুষ্য সকল দেবলোক হইতে পরিচ্যুত হইয়া তথায় জন্ম-গ্রহণ করে; তাহারা সকলেই প্রিয়দর্শন ও শুক্লবংশোদ্ভূত। স্ত্রী সকল অপ্সরাসদৃশ। সেই স্থানের সমুদায় লোক ক্ষীরীপাদপের অমৃতসদৃশ ক্ষীর পান করিয়া থাকে। তথায়

চক্রবাকযুগলের ন্যায় নরমিথুন এককালে জন্মগ্রহণ করিয়া সমভাবে পরিবর্দ্ধিত হয়; তাহারা তুল্যরূপগুণসম্পন্ন, তুল্য বেশে সুশোভিত, রোগশূন্য ও নিত্যসন্তুষ্ট। তাহারা একাদশ সহস্র বৎসর জীবিত থাকে এবং কেহ কাহারে কখনও পরিত্যাগ করে না। তাহারা কলেবর পরিত্যাগ করিলে তীক্ষ্ণতুণ্ডসম্পন্ন অতি ভয়ঙ্কর ভারুণ্ড নামে পক্ষী সকল তাহা-দিগকে হরণ করিয়া গিরিদরীতে নিক্ষেপ করিয়া থাকে।" (১)

কেহ কেহ বিবেচনা করেন, এই উত্তরকুরুই আমাদের বৈদিক ঋষিদের পূর্ব্বপুরুষগণের আদিম বাসস্থান। আমার বিবেচনায় তাহা নহে, উহা ঋষিদের পূর্ব্বপুরুষগণের জ্ঞাতিস্থানীয় প্রাচীন ইরানী আর্য্যগণের আদিম বাসস্থান। এক্ষণে যথায় বোখারা ও সমরখন্দ নগর অবস্থিত, সেই তরুলতাসুশোভিত উর্ব্বরভূমিই উত্তরকুরু। ইরানীরা ইহাকে "বেরেকধা" (বৃকধা; বৃক = লাঙ্গল; বৃকধা = লাঙ্গলের দেশ) ও যবনেরা বাকত্রিয়া বলিত। কৃষি-অনুরাগী ইরানীগণ হলকর্ষণ করিয়া এই প্রদেশকে উদ্যানবৎ করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইহার মধ্য দিয়া জম্বুনদ প্রবাহিত ছিল, সুতরাং তাহাই যে আমুদরিয়া, তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। ইরানীদের আবস্তিক শাস্ত্র পাঠ করিলে, তাঁহারা কিরূপ কৃষি-অনু-রাগী ও কৃষিনিপুণ ছিলেন, তাহা সবিশেষ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। উত্তরকুরুর সমৃদ্ধি ও ফলপুষ্পাদির কথা শুনিয়া যেমন ইরানীদের আদিম স্থানের কথা মনে পড়ে, তেমনি উত্তরকুরুর লোকের আচারব্যবহারেও তাহাদিগকে স্পষ্টই ইরানী বলিয়া চেনা যায়। কেন না, উপরের বর্ণনাতে তাহাদের মধ্যে ভাই ভগিনীর বিবাহের প্রথা প্রচলিত ছিল, দেখা যায়। চক্রবাকযুগলের ন্যায় নরমিথুন, অর্থাৎ ভ্রাতা ভগ্নী এককালে জন্মগ্রহণ করিয়া সমভাবে পরিবর্দ্ধিত হয় ও পরে "কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করে না;—" অর্থাৎ পতিপত্নীর ন্যায় ব্যবহার করে। ইহা ইরানী আচার—কোন কালেরই বৈদিক আচার নহে। ইরানীগণের মধ্যে এই আচারের নাম 'খেতুদা।' তাহার পর উত্তরকুরুর লোক কলেবর পরিত্যাগ করিলে তাহাদের মৃতদেহ যে পক্ষী কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইত, এবং অবশিষ্ট কঙ্কাল গিরিদরীতে নিক্ষিপ্ত হইত, ইহা পাঠ করিয়া, বোম্বাই নগরে পারসীক সমাজের Tower of Silence-এর কথা কাহার না স্মরণ হয়? উত্তরকুরুর এই আচার অদ্যাপি পারসীক সমাজে চলিয়া আসিতেছে। পারসীকগণের প্রাচীন রাজাদের মধ্যে অনেকের 'কুরু' নাম ছিল। তাহাদের যে দিগ্বিজয়ী রাজা ইংরেজীতে Cyrus বলিয়া লিখিত, এবং সাইরস্ বলিয়া

(১) কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।

কথিত হয়েন, যিনি বাবীলন রাজ্য ধ্বংস করিয়া পারস্য সাম্রাজ্য স্থাপিত করেন, তাঁহার প্রকৃত নাম 'কুরু।' বোধ হয়, যে সময়ে অস্মদ্দেশে বাক্-ত্রিয়াকে উত্তরকুরু নাম অর্পণ করা হয়, তখন কুরু-নামধারী রাজারা তথায় রাজত্ব করিতেন। গঙ্গাতীরের কুরুরা দক্ষিণকুরু, ও জম্বুনদতীরের কুরুরা উত্তরকুরু বলিয়া কথিত হইতেন। পণ্ডিতেরা অবধারণ করিয়াছেন যে, প্রাচীন ইরানীদের ভাষা (যাহা অবস্তা শাস্ত্রে সংরক্ষিত) এবং প্রাচীন বৈদিক ভাষা, একই ভাষার দুইটি dialect বা থানীরূপমাত্র। উত্তরকুরুতে আবস্তিক ভাষা ও জম্বুতে বৈদিক ভাষা প্রচলিত ছিল।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ইরানী জ্ঞাতিদের উত্তরকুরু যেমন শ্রীসম্পন্ন ও ধনধান্যে সুশোভিত ছিল, তাঁহাদের নিজের জম্বুখণ্ড ঠিক তাহার বিপরীত।

জম্বুখণ্ডের অনুর্ব্বরতা ও দারিদ্র্য।

জম্বুখণ্ড পর্ব্বতাকীর্ণ ও ভীষণ স্থান ছিল। এই খণ্ডে মাল্যবান নামে এক পর্ব্বত ছিল,—তৎসম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে;—"মাল্যবান পর্ব্বতের শিখরদেশে সম্বর্ত্তক নামে কালাগ্নি নিরন্তর পরিদৃশ্যমান হইতে থাকে।" বলা বাহুল্য, ইহা একটি আগ্নেয় গিরি। ইহাতে স্পষ্টই অনুমান করা যাইতে পারে যে, জম্বুখণ্ডে ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাতের উপদ্রব ছিল। এই উপদ্রবের স্মৃতি ঋগ্বেদী ঋষিদের হৃদয় হইতে একবারে অন্তর্হিত হয় নাই। গৃৎসমদ শৌনক ইন্দ্রের বর্ণনা করিতে গিয়া বলিতেছেন,—

যঃ পৃথিবীং ব্যথমানাম্ অদৃংহৎ
যঃ পর্ব্বতান্ প্রকুপিতান্ অরম্নাৎ।—ঋগ্বেদ ; ২।১২।২

"যে ইন্দ্র একদা কম্পমানা ধরণীকে দৃঢ় করিয়াছেন, যিনি প্রকুপিত আগ্নেয় গিরিকে প্রশান্ত করিয়াছেন," তাঁহাকে স্পষ্টই জম্বুখণ্ডের ইন্দ্র বলিয়া চেনা যায়। এই ভয়ানক মাল্যবান গিরির সন্নিকটেই আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা একদা বসবাস করিতেন। লিখিত আছে, "মাল্যবান পর্ব্বত পঞ্চাশ যোজন বিস্তীর্ণ। সেই স্থানে সুবর্ণবর্ণ মনুষ্য সকল জন্মগ্রহণ করিয়া অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান-পূর্ব্বক ঊর্দ্ধরেতা হইয়া থাকেন। তাঁহারা সকলেই দেবলোকপরিভ্রষ্ট ও ব্রহ্ম-বাদী।" এই 'ব্রহ্মবাদি'গণ হইতেই আমরা উৎপন্ন হইয়াছি।

আমুদরিয়ার উৎপত্তিস্থানের সন্নিকটে এক দিকে হিমানীমণ্ডিত মেরু ও অপর দিকে কালাগ্নিসঙ্কুল মাল্যবান পর্ব্বতের পাদদেশে জম্বুনামক উপত্যকায় আমাদের 'দেবলোকভ্রষ্ট' ব্রহ্মবাদী পিতামহগণ একদা বসবাস করিতেন। এই সময়ের ইতিহাসের মধ্যে কেবল এই একটি কথা জানা যায় যে, উক্ত পিতামহ-

গণ দস্যুবৃত্তিপরায়ণ হইয়া উত্তরকুরুবাসী জ্ঞাতিগণের চক্ষে অতিশয় নিন্দনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। আপনাদের দেশ অনুর্ব্বর, তথায় কৃষিকার্য্য তাদৃশ ফলপ্রদ ছিল না ; আর উত্তরকুরু যেমন উর্ব্বরা, তেমনি ধনধান্যপূর্ণ। কঠোর অভাবের দায়ে তাঁহারা দলে দলে উত্তরকুরুর জনপদসকল লুণ্ঠন করিতে যাইতেন। তাঁহারা দেবার্চ্চনা করিয়া এই লুণ্ঠনব্যাপারে নির্গত হইতেন, দেবতাদের নামোচ্চারণ করিতে করিতে সম্প্রহারে প্রবৃত্ত হইতেন। তাহাতে উত্তরকুরুর লোকে কালক্রমে দেবতার নাম শুনিলে চমকিয়া উঠিত। অবশেষে তাহারা দেবগণকে এবং দেবোপাসকগণকে এতই ঘৃণার চক্ষে দেখিত যে, তাহাদের ভাষায়, ইংরেজীতে Devil বলিলে যাহা বুঝায়, 'দেব' বলিলে তাহাই বুঝাইত।

দেব-শব্দটি অতি প্রাচীন ; গ্রীক, রোমক, পারসীক, হিন্দুস্তানী, সকল আর্য্যভাষাতেই এই শব্দ বিদ্যমান। ইহার অর্থ উজ্জ্বল বা জ্যোতির্ম্ময়। উপাস্য সত্ত্বগণকে ইলাবৃতবর্ষের লোকে 'যজত' বলিত। এই শব্দ বেদে এবং অবস্তায় তুল্য অর্থে ব্যবহৃত দেখা যায়। যজতগণকে এক সময়ে উত্তরকুরু এবং জম্বু, উভয়ত্রই সমভাবে দেব অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময়, এবং অসুর অর্থাৎ বলশালী বলিয়া উল্লেখ করা হইত। জম্বুতে এবং পরে ভারতবর্ষেও বৈদিক ঋষিগণের মধ্যে ঐ রীতি অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু জম্বুখণ্ডবাসীদের প্রতি ঘৃণাপরবশ হইয়া উত্তরকুরুবাসিগণ আপনাদের যজতগণকে আর 'দেব' বলা রীতি পরিত্যাগ করিল। তাহারা দেবশব্দকে ঘৃণাসূচক জ্ঞান করিয়া যজতগণকে কেবল অসুর বলিতে আরম্ভ করিল।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুতেই এক এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কল্পনা করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি বাক্য উপাসনার জন্য

ইলাবৃত শব্দের ব্যাখ্যা।

ব্যবহৃত হইত, এবং তাহা অতিশয় পবিত্র বলিয়া গণনীয় ছিল। ইহাদের সাধারণ নাম 'বাক্'। অন্যান্য পদার্থের ন্যায় বাকেরও এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পিত হইয়াছিলেন—তাঁহার নাম বাগ্‌দেবী। দ্যুলোকে তাঁহার নাম 'ভারতী' ; কেন না, তিনি মনুষ্যের স্তুতি বহন করিয়া দেবতাদের সমক্ষে লইয়া যান। অন্তরিক্ষে তাঁহার নাম 'সরস্বতী' ; কেন না, 'সরস্বান্' সূর্য্যের সহিত তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ। আর পৃথিবীতে তাঁহার নাম 'ইলা'। ইল্ ধাতুর অর্থ স্তব করা। ইলা অর্থাৎ স্তুতি। এবং সেই স্তুতির অধিষ্ঠাত্রী বাগ্দেবী। ইরান বা ইলান শব্দ এই 'ইলা' হইতেই উৎপন্ন বোধ হয়।

ইলা দ্বারা আবৃত, অথবা ইলা কর্ত্তৃক বৃত (প্রার্থিত) দেশকে 'ইলাবৃত বর্ষ' বলা যায়। যে জম্বুখণ্ড ইলাবৃতবর্ষের অন্তর্গত, সেখানে যে 'ইলা'-সংজ্ঞক বাক্যরাশি বিদ্যমান ছিল, তাহার সন্দেহ কি? এই সকল ইলাই আমাদের বেদের মূল।

জম্বুখণ্ড হইতে বাহির হইয়া প্রতিষ্ঠানে আগমন।

জম্বুখণ্ডে বসবাসকালে আমাদের মধ্যে কোন ঐতিহাসিক মহাপুরুষের নাম শ্রুত হওয়া যায় না। সমাজ তখন কতিপয় বৃহৎ পরিবারের আকারে বিদ্যমান ছিল; এবং এক এক পরিবারের কর্ত্তা 'প্রজাপতি' বলিয়া কথিত হইতেন। প্রজাপতিগণ পরস্পরের মধ্যেও সর্ব্বদা কলহ করিতেন। সুতরাং অশান্তি এবং অশান্তিমূলক দারিদ্র্য ও দুরবস্থার মধ্যে তাঁহারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তবে অশান্তির মধ্যে বাস করিলে মনুষ্য স্বভাবতঃই যেমন সাহসী, কষ্টসহিষ্ণু ও উগ্র হয়, তাঁহাদের স্বভাবও তাদৃশ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

অনেকগুলি প্রজাপতি জীবিকার্জ্জনের জন্য জম্বুখণ্ড হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া, হিন্দুকুশ পর্ব্বত পার হইয়া, বর্ত্তমান কাবুলের সন্নিকটেই উপনিবিষ্ট হয়েন। এই নূতন উপনিবেশের রাজধানীর নাম 'প্রতিষ্ঠান', এবং ঐ নগর মহাবীর আলেকজাণ্ডারের সময়েও বিদ্যমান ছিল, দেখা যায়। আলেকজাণ্ডারের ইতিহাসলেখকগণের লিপিতে উহা অর্তোস্পান বা পর্তোস্পান, এবং চীনদেশীয় লিপিতে উহা

ফো-লি-সি-সা-টাং-না
প্র—তি—ষ্ঠা—ন

বলিয়া লিখিত হয়। (১) প্রতিষ্ঠান হইতেই আমাদের ধারাবাহিক ইতিহাস পুরাণাদিতে লিখিত হইয়াছে। বৈবস্বত মনু এই প্রতিষ্ঠানের রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহারই বংশে মহারাজা পুরু, এবং পুরুর বংশে মহারাজা ভরত জন্মগ্রহণ করেন।

পিতামনু ও মন্বন্তর।

প্রতিষ্ঠান রাজধানীর উৎপত্তিতে আমরা আমাদের সমাজে সর্ব্বপ্রথম রাজত্বের আবির্ভাবসমাচার প্রাপ্ত হই। বৈবস্বত মনুই আমাদের সমাজের সর্ব্বপ্রথম রাজা। তিনি সর্ব্বপ্রথমে করের ব্যবস্থা ও করগ্রহণ করিয়া 'মনু' নাম পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজা উপাধি ধারণ করেন। (২) তাঁহার পূর্ব্বের সময়কে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি।

(১) Cunningham's Ancient Geography of India. কনিংহাম সাহেব প্রতিষ্ঠানের বিষয় জানিতেন না। সুতরাং নগরটির প্রকৃত নাম কি, তাহা তিনি অবধারণ করিতে পারেন নাই।

(২) বৈবস্বতো মনুর্নাম মাননীয়ো মনীষিণাম্।
আসীন্ মহীক্ষিতাম্ আদ্যঃ প্রণবশ্ছন্দসামিব ॥—রঘুবংশ। ১। ১১

প্রথম,—প্রাজাপত্য যুগ; দ্বিতীয়,—মানবযুগ। প্রাজাপত্যযুগে প্রজাপতিগণ স্ব-স্ব-প্রধান হইয়া বিচরণ করিতেন, কেহ কাহারও অধীনতা স্বীকার করিতেন না। এক এক প্রজাপতি এক একটি প্রকাণ্ড সংসৃষ্ট পরিবারের কর্ত্তাস্বরূপ ছিলেন; এক দিকে দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, অপর দিকে সেনাপতি ছিলেন;—কিন্তু করগ্রাহী ছিলেন না। কর দিবেই বা কে? শ্রমসাধ্য কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য দাসদাসী ছিল; ভাই বন্ধু পুত্র পৌত্রগণ যুদ্ধ বিগ্রহেই নিযুক্ত থাকিত। এই অবস্থায় সমাজ অতিশয় ক্ষুদ্র ছিল। এই যুগের শেষে আমাদের আদিব্যবস্থাপক পিতা মনু প্রাদুর্ভূত হয়েন। পিতা মনু ঋগ্বেদে অতিশয় প্রসিদ্ধ। ইনিই আমাদের ইতিহাসের আদিম ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ইনি হয় জম্বুখণ্ডে বসবাসকালেই হউক, অথবা জম্বুখণ্ড হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইবার পর কিন্তু প্রতিষ্ঠান নগরের উৎপত্তির পূর্ব্বেই হউক, প্রাদুর্ভূত হইয়া, ভৃগু অঙ্গিরা মরীচি প্রভৃতি অপর দশ জন প্রজাপতির সহিত সম্মিলিত হইয়া সমাজের গতি ফিরাইয়া দিলেন। যাঁহারা এই মিলিত সমাজের শাসনকর্ত্তা, তাঁহারা পিতামনুর নাম বা উপাধি অনুসারে 'মনু' নামে বিখ্যাত হয়েন। এবং তাঁহাদের এক এক জনের শাসনকাল মন্বন্তর নামে অভিহিত হয়। পৌরাণিকেরা এই মন্বন্তরকে এক বিশাল কালাবয়বে পরিণত করিয়াছেন। কিন্তু শব্দার্থেই আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, মনু-উপাধিধারী এক এক শাসনকর্ত্তার অধিকার-কালই মন্বন্তর। সচরাচর বৈবস্বত মনুর পূর্ব্বে ছয় মন্বন্তর গণিত হয়। সুতরাং পিতা মনু হইতে ছয় জন মনু অন্তর্দ্ধান করিলে, মনুর স্থান রাজাতে অধিকার করিলেন। ছয় মন্বন্তরে সম্ভবতঃ ন্যূনাধিক ১৮০ বৎসরকাল অতিবাহিত হইয়াছিল। অর্থাৎ, পিতা মনুর প্রায় ১৮০ বৎসর পরে তৎপ্রতিষ্ঠিত 'মানবসমাজে' সর্ব্বপ্রথমে রাজার অভ্যুত্থান হয়।

এক্ষণে আমাদের ভাষায় নরনারীমাত্রই মানব। চীন ও ইংরেজ আমাদের ন্যায় মানব। কিন্তু মানব শব্দের আদিম অর্থ অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ।

মানবসমাজ।

পিতা মনু যে সমাজের আদি ব্যবস্থাপক, চাতুর্বর্ণ্য যাহার লক্ষণ,—আদিম অর্থে তাহাই মানবসমাজ। সেই সমাজের সকল লোকই আপনাদিগকে পিতা মনুর সন্তান বলিয়া কল্পনা করে, তাই তাহারা মানব। সেই সমাজের আচার ব্যবহার পৃথিবীতে মানব ধর্ম্মশাস্ত্র নামে প্রসিদ্ধ। ফলতঃ, এক্ষণে যাহাকে হিন্দুসমাজ বলা যায়, তাহারই প্রাচীন নাম মানবসমাজ। মানবসমাজ আমাদের আপনাদের ঘরের কথা; আর

হিন্দুসমাজ এই নামটি আমরা বৈদেশিকগণের নিকট হইতে পাইয়াছি। যত দিন আমরা একটি স্বাধীন জাতি ছিলাম, ততদিন আমরা মানবজাতি ছিলাম, স্বাধীনতা হারাইয়া এক্ষণে আমরা হিন্দুজাতি হইয়াছি। ফলতঃ, যে সময়ে আমরা সিন্ধুতীরে রাজত্বস্থাপন করিতে পারি নাই, সে সময়ের কথা লিখিতে গেলে, হিন্দুসমাজ লেখা ভাল দেখায় না। তাই উপরে মানবসমাজের উল্লেখ করিলাম।

সবিস্তার লিখিতে গেলে প্রবন্ধ অতিশয় বাড়িয়া যায়, সেই জন্য সংক্ষেপে এইমাত্র এ স্থলে বক্তব্য যে, ঋগ্বেদে ভূরি ভূরি স্থানে পিতা মনুর উল্লেখ আছে, এবং তাঁহার কীর্ত্তির প্রশংসা আছে। এই সকল কীর্ত্তির মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ;—

মানবসমাজের আদি ব্যবস্থাপকের কীর্ত্তি।

(ক) "শং যোঃ" ব্যবস্থা।

একজন ঋষি বলিতেছেন,—"হে রুদ্রদেব! পিতা মনু স্বকীয় প্রজাগণকে শং ও যোঃ নামক যে কল্যাণদ্বয় প্রদান করিয়াছিলেন, আমরা যেন তোমার নায়কতায় তাহা প্রাপ্ত হই।"—১।১১৪।২ শং=শান্তি; যোঃ=সম্মিলন। শং যোঃ=অর্থাৎ শান্তি ও সংমিলন। পিতা মনু ও অপর দশ জন প্রজাপতি, এই একাদশ প্রজাপতিতে (১) সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া পরস্পরের মধ্যে কলহ বিবাদ পরিত্যাগ করেন। তাঁহাদের মধ্যে পরস্পরের বিবাদভঞ্জনের ব্যবস্থা প্রচলিত হয়; এবং বহিঃশত্রুর সহিত বিবাদ ঘটিলেও সমাজের অভ্যন্তরে শান্তি সংস্থাপিত হয়। এই "শং যোঃ" নামক কল্যাণের প্রসাদে মানবসমাজ পৃথিবীতে মস্তক উত্তোলন করিয়া এক মহাজাতিতে পরিণত হইয়াছিল।

(খ) কৃষিব্যবস্থা।

পিতা মনুর পূর্ব্বে গোচারণ ভিন্ন লুণ্ঠনই ধনাগমের প্রশস্ত উপায় ছিল; পরেও যুদ্ধ করিয়া বলপূর্ব্বক পরস্বাপহরণ যে একবারে নিষিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা নহে; কিন্তু পিতা মনু কৃষিকার্য্য দ্বারা ধনাগমের বিশেষ ব্যবস্থা করেন; এবং কৃষিকার্য্যের জন্য একটি 'গাতু' স্থাপন করেন। একজন ঋষি বলিতেছেন ঃ—

"হে অশ্বিদ্বয়! পূর্ব্বকালে তোমরা মনুর জন্য এক 'গাতু' নির্ম্মাণ করিয়াছিলে।" ১।১১২।১৬

আর একজন ঋষি বলিতেছেন ঃ—

"হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা মনু প্রজাপতির জন্য লাঙ্গলের দ্বারা যব বপন করিয়া অন্নদোহন করিয়াছিলে।" ১।১১৭।২১।

'গাতু' বড়ই প্রাচীন শব্দ। বেদব্যাখ্যাকারীরা ইহার এক অর্থ 'পৃথিবী' বলেন। ফলতঃ সমগ্র পৃথিবী নহে; পৃথিবীর এক একটি স্থান এক একটি গাতু। কৃষকের গ্রামের নাম গাতু। যে স্থানে নিরাপদে কৃষিকার্য্য করা যায়, তাহার নাম গাতু। ইহার আবস্তিক প্রতিশব্দ 'গয়েথ'। পিতা মনুর সময় হইতে অস্মৎসমাজে গাতু বা কৃষকের গ্রামের উৎপত্তির সূত্রপাত হয়। এবং পিতা মনু নিজে ক্ষেত্রপতি হইয়া বৃকের দ্বারা (অর্থাৎ লাঙ্গলের দ্বারা) যববপনকার্য্য আরম্ভ করেন। এই সময় হইতে গোচারণ অপেক্ষা ভূমিকর্ষণ অস্মৎসমাজে সমধিক অনুশীলিত হইতে আরম্ভ হইল।

(গ) বিশ্বদেব-উপাসনাপ্রণালীর ব্যবস্থা।

যদিও পিতা মনুর পূর্ব্বেও বেদবাক্য ছিল, কিন্তু যাহাকে আমরা বেদ বলিয়া জানি, অর্থাৎ বিশ্বদেব-উপাসনামূলক বেদ, তাহা পিতা মনু হইতেই উৎপন্ন। এই উপাসনাতে দেবদেবী কেবল নামে অসংখ্য, কিন্তু ক্রিয়াতে এক। অসংখ্য উপাসক অসংখ্য প্রকারে ঈশ্বরকে কল্পনা করে, সুতরাং দেবদেবী অসংখ্য; কিন্তু তা বলিয়া ঈশ্বর বহু নহেন। উপাসকের চক্ষে এইটি স্পষ্ট করিবার কামনায় পিতা মনু "বিশ্বে দেবাঃ" বলিয়া সকল দেবের মিলিত হোমের ব্যবস্থা করেন। মানবসমাজের ঋত্বিক্‌গণ যখন সকল দেবকে সমস্বরে আহ্বান করিয়া বিশ্বদেব হোম করিতে শিখিল, তখন তন্মধ্যে তোমার দেবতা ছোট, আমার দেবতা বড়,—এই কথা লইয়া বিবাদ বিসংবাদের পথ চিরকালের জন্য নিরুদ্ধ হইল। এ বড় কম কথা নয়।

স্বয়ং বৈবস্বত মনু পিতা মনুর এই মহতী কীর্ত্তির কথা স্মরণ করিয়া বলিতেছেন ঃ—

---

(১) একাদশ প্রজাপতির নাম মনুসংহিতার প্রারম্ভে দ্রষ্টব্য। মনুসংহিতার লিখন অনুসারে পিতা মনু অপর দশ প্রজাপতির সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি করিলেন কিরূপে? তপস্যার দ্বারা। সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে, ঐ দশ প্রজাপতি পিতা মনুর ঔরস পুত্র নহেন। পক্ষান্তরে, ঋগ্বেদের এক স্থানে অঙ্গিরাবংশীয় অথর্ব্বা ও পিতা মনু, উভয়েই বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের ব্যবস্থাপক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইহাতে মনু কর্ত্তৃক অপর দশ জন প্রজাপতির যে সৃষ্টির কথা শুনা যায়, তাহাতে একাদশ প্রজাপতির সম্মিলন ব্যতিরেকে আর কোন বিচারসঙ্গত তাৎপর্য্যই পাওয়া যায় না। বিশেষ 'শং যোঃ'র শান্তি ও মিলনেও এই মিলনেরই সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

নহি বো অস্তি অর্ভকো
দেবাসোন কুমারকঃ।
বিশ্বে সতো মহাংত ইৎ॥
ইতি স্তুতাসো অসথা বিশাদসো
যেস্থ ত্রয়শ্চ ত্রিংশচ্চ।
মনো দেবা যজ্ঞিযাসঃ॥ ৮।৩০।১-২

"হে দেবগণ! তোমাদের মধ্যে কেহই অন্য অপেক্ষায় ছোট নয়; সকলেই তুল্যভাবে 'সতোমহাংতঃ' (যাহা কিছু আছে তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ) তোমরা যে ৩৩ জন যজ্ঞীয় দেবতা আছ, পিতা মনু তোমাদিগকে এই বলিয়াই উপাসনা করিয়া গিয়াছেন।"

এই ৩৩ দেবতার বিষয়ে নানা মুনির নানা মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ঋগ্বেদের প্রমাণ অনুসারে ইহাঁরা কেবল স্থানভেদে ৩৩ মাত্র। অর্থাৎ, পৃথিবীতে এগার, অন্তরিক্ষে এগার ও দ্যুলোকে এগার, এই তেত্রিশ দেবতা। ইহাই সুন্দর ও সমীচীন মত। তদনুসারে পিতা মনুর 'যজ্ঞীয়' ৩৩ দেবতা মূলে এগারটি মাত্র। কিন্তু এগারটি কিরূপে হইল, ইহার কোনও ব্যাখ্যা আমি কোথাও দেখি নাই। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, যে একাদশ প্রজাপতি মিলিত হইয়া পিতা মনুর ব্যবস্থা মত নূতন সমাজের পত্তন করিলেন, তাঁহাদের জন্যই সর্ব্বপ্রথমে একাদশ মিলিত দেবতাকে "বিশ্বে দেবাঃ" বলিয়া পূজা করিবার ব্যবস্থা হয়। ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের ঊনত্রিশ সূক্ত একটি বৈশ্বদেব সূক্ত। কে ইহা রচনা করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, মরীচিপুত্র কশ্যপ; কেহ বলেন, বৈবস্বত মনু। এটি যে অতি প্রাচীন সূক্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সূক্ত অনুসারে বিশ্বদেবের তালিকা এই:—

১। দিব্য অলঙ্কারধারী 'সোম'
২। যোনিসদ্ 'অগ্নি'
৩। বাশীধারী 'ত্বষ্টা'
৪। বজ্রধারী 'ইন্দ্র'
৫। পিণাকধারী 'রুদ্র'
৬। মার্গরক্ষক 'পূষা'
৭। ত্রিবিক্রম 'বিষ্ণু'
৮।৯ অশ্বারোহী 'অশ্বিদ্বয়'
১০।১১ স্বর্গবাসী রাজদ্বয় 'মিত্রাবরুণ'

আমার বিবেচনা হয়, এই একাদশ দেবতাকে একাদশ প্রজাপতি আপনাদের প্রধান উপাস্যস্বরূপ গ্রহণ করেন, এবং আপনারা মিলিত হইয়া

দেবতাদিগকেও মিলিত করিয়া "বিশ্বেদেবাঃ" বলিয়া তাঁহাদের যুগপৎ হোমের বিধান করেন।

(ঘ) পরলোকতত্ত্ব-প্রচার।

হিরণ্যস্তূপ ঋষি বলিতেছেন:—

ত্বমগ্নে মনবেদ্যাম্ অবাশয়ঃ। অর্থাৎ হে অগ্নি! তুমি মৃত্যুর পর পরলোক আছে, এই সত্য মনুকে বলিয়াছিলে।

এই সত্য বেদের ভিত্তি; এবং পিতা মনু ইহার প্রচারক। অতি পূর্ব্বকালে দেহব্যতিরিক্ত আত্মাতে কেহ বিশ্বাস করিত না। মরিলেই সব ফুরাইল। জীবন যতদিন দুঃখপ্রধান ছিল, ততদিন এ কথায় কেহ দুঃখিত হইত না। রোমকেরা যখন জীবনে কোন সুখ নাই দেখিত, তখন আত্মঘাতী হওয়া শ্লাঘনীয় বোধ করিত। কিন্তু উত্তরকুরুর সমৃদ্ধ আর্য্যগণ কথাটা বড় পছন্দ করে নাই। মরিয়াও আবার বাঁচিয়া উঠিতে তাহাদের বড় সাধ হইত। তাহাতে তাহাদের মধ্যে এক বিশ্বাস জন্মে যে, তাহাদের প্রধান 'যজত' মেধ্যাসুর যদি কৃপা করেন, তবে অবশ্যই মরাকে বাঁচাইতে পারেন। যেমন দেহে মানুষ মরে, মেধ্যাসুরের কৃপায় আবার তেমনই দেহ লইয়া মাটি হইতে একদিন উঠিবে। এই অপূর্ব্ব মতের নাম Resurrection of the dead অর্থাৎ মৃতের পুনরভ্যুত্থান। ইরানীগণ হইতে প্রথমে ইহুদীদের কতক লোকে, পরে তাহাদের হইতে খৃষ্টশিষ্যগণ, এবং খৃষ্টশিষ্যগণের নিকট হইতে মহম্মদ এবং মুসলমানেরা, এই পুনরভ্যুত্থানমত অঙ্গীকার করিয়াছে।

এরূপ সশরীরে মৃতের পুনরভ্যুত্থানের মত মানবসমাজে কখনও সমাদৃত হয় নাই। কিন্তু না হইলেও মানবসমাজ চিরকালই মৃত্যুর পর পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে। পিতা মনু যে দেবতাগণকে উপাসনার বিধি দেন, তাঁহাদের কোন রক্তমাংসের শরীর নাই; ধার্ম্মিক মনুষ্য পরলোকে দেবজন্ম লাভ করিয়া দেবতাদের ন্যায় হইবে; পরলোকে তাহাদেরই বা রক্তমাংসের শরীরে আবশ্যকতা কি? এই পরলোকতত্ত্ব কেবল সুমার্জ্জিত বুদ্ধির বোধগম্য।

মন্বন্তরসময়ে মানবসমাজের অভ্যুদয়।

পিতা মনুর এই সকল সুব্যবস্থার ফলে দুই শত বৎসরের মধ্যে মানবসমাজে নূতন জীবনের সঞ্চার হইয়া অভ্যুদয়ের পথ পরিষ্কৃত হইয়া গেল; আভ্যন্তরীণ শান্তির মধ্যে কৃষিকার্য্যের অনুসরণে ধনাগম ও প্রজাবৃদ্ধি হইতে লাগিল; লোকের মনে পরলোকতত্ত্ববিষয়ক উপদেশ বদ্ধমূল হইলে এক অপূর্ব্ব উল্লাসের উদয় হইল; ধর্ম্ম ও

ন্যায়ের সম্মান বাড়িয়া উঠিল। মানবসমাজে বীরের অসদ্ভাব কোন দিন ছিল না, এক্ষণে ধনী লোকের এবং কৃতবিদ্য ও ধার্ম্মিক লোকেরও আবির্ভাব হইতে লাগিল। এই অবস্থায়, অন্যান্য জাতির দেখাদেখি, মানবেরা আপনাদের এক রাজা মনোনীত করিলেন। এবং বিবস্বান্ নামক এক ব্যক্তির পুত্র, যিনি মনু উপাধির সহিত সমাজের শাসনভার গ্রহণ করেন, তিনিই মানবসমাজের প্রথম রাজা হইলেন।

বৈবস্বত মনুর বংশের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। বৈবস্বত মনু
|
২। ইলা
|
৩। পুরূরবা
|
৪। আয়ু
|
৫। নহুষ
|
৬। যযাতি
|
৭। পুরু
|
৮। রৌদ্রাশ্ব
|
৯। অনাধৃষ্টি
|
১০। মতিনার
|
১১। তংসু (তৃংসু)
|
১২। ঈলিন
|
১৩। দুষ্মন্ত
|
১৪। ভরত

এই তালিকার রাজগণের মধ্যে যযাতি এক জন দিগ্বিজয়ী রাজা। প্রতিষ্ঠান হইতে বিনির্গত হইয়া মানবেরা সর্ব্বপ্রথমে কোন্ রাজার সময়ে পঞ্জাব প্রদেশে প্রবিষ্ট হয়েন তাহা জানা যায় না; কিন্তু দিগ্বিজয়ী যযাতি রাজার সময়ে যে তাঁহারা পঞ্জাব অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা অনুমান করা যাইতে

পারে। মহাভারতের লিখনানুসারে যযাতি মনুবংশীয় রাজগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম সম্রাট পদবী লাভ করেন। তিনি অন্যান্য রাজাকে পরাজিত করিয়া এক বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের গঠন করেন, এবং তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর সন্তানেরা গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্ত্তী স্থানে উপনিবিষ্ট হইয়া অতিশয় সমৃদ্ধ হইয়া উঠেন। পুরুবংশীয় ভরত রাজাও একজন বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী রাজা হইয়া উঠেন; এবং উত্তরকালে তাঁহার বংশধরগণ দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া গঙ্গা যমুনার মধ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন। মৎস্যপুরাণের লিখন অনুসারে এই স্থানেই প্রতিষ্ঠান নগরী নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহার পোষকে অপর কোন প্রমাণ আমি দেখি না। তবে প্রতিষ্ঠান হইতে সমাগত মানব ক্ষত্রিয়গণ আপনাদের রাজ্যকেও প্রতিষ্ঠান রাজ্যেরই শাখা বিবেচনা করিতেন, ইহা সম্ভব। এবং কনষ্টাণ্টিনোপলকে যেমন 'নবরোম' নাম দেওয়া হইয়াছিল, তদ্রূপ গঙ্গা যমুনার মধ্যেও কোনও নগরের নবপ্রতিষ্ঠান নামকরণ হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু সে প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর কোনও প্রমাণ দেখি না। :বৈবস্বত মনুর প্রতিষ্ঠানের সান্নিধ্যে সম্প্রতি আমীর আবদুর রহমান খাঁ রাজত্ব করিতেছেন।

এক্ষণে আমাদের প্রাচীন ইতিহাসে দীর্ঘতমার স্থান একপ্রকার নির্ণীত হইল, বলা যায়। দীর্ঘতমা হইতে ন্যূনাধিক ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে বৈবস্বত মনু, এবং ন্যূনাধিক ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে পিতা মনু বিদ্যমান ছিলেন, বিবেচনা করা যাইতে পারে। অর্থাৎ, খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব প্রায় ২৩০০ বৎসর পূর্ব্বে পিতা মনু কর্ত্তৃক মানবসমাজ ও সেই সমাজের বেদের ভিত্তি স্থাপিত হয়। তদবধি গণনা করিয়া অদ্য পর্য্যন্ত ৪১৯৭ চারি হাজার এক শত সাতানব্বই বৎসর অতীত। আমরা যে মানবসমাজের লোক, ইহাই সেই সমাজের বয়স বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। আমাদের ন্যায় প্রাচীন ইতিবৃত্ত ভূভারতে অপর কোনও জাতিরই নাই। যে দীর্ঘতমা ঋষির কথা হইতেছে, তিনি পিতা মনুর ৬০০ বৎসর পরে, এবং এক্ষণকার সময়ের ৩৫৯৭ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। অতএব, তদ্রচিত সূক্তমালায়, মানবসমাজ প্রথমে জম্বুখণ্ড হইতে ও পরে বর্ত্তমান আফ্‌গানিস্তান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পঞ্জাব অতিক্রম করিয়া গঙ্গা যমুনার মধ্যে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইলে কিরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছিল, তাহা অনেকটা জানা যায়। ঈদৃশ ঋষির রচনা পাঠ করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়?

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।

স্নেহের শাসন।

১

চারি বছরের শিশু সে সরল,
তার কথা ক'ব কি ?
কীর্ত্তি তাহার কহিতে অশেষ,
করিতে স্মরণ ফেলিতে নিমেষ
একবারে শত দীপশিখা সম
প্রাণে উঠে 'ঝলকি' !

২

দিনরাত শুধু রাজার মতন
গৃহদেশখানি করিছে শাসন,
না জানে বিরাম না মানে বারণ
কুড়াইছে রাজভাগ ;
পালে তা'রে এক তরুণ তপসী,
তা'রই পরে করে যত রোষারোষি
তপে জপে তার ঢেলে দিল মসী,
ভেঙে দিল যোগযাগ !

৩

দূরে গেল তা'র যতেক সাধন,
ফিরে এল তার যতেক বাঁধন ;
একদিন বড় হয়ে জ্বালাতন
তাপসী কহিল তায়,
"দূর কর ছাই ! পারিনেক আর
পোড়া ছেলে সব ঘুচালে আমার ;
রে দুরন্ত ! তোর কেমন ব্যাভার !
কেবলি জ্বালাবি মা'য় ?

৪

"নাহি সাঁজ মেনে নাহিক প্রভাত
তোরই পিছে শুধু র'ব দিনরাত ?
আর কোনও কাজে নাহি দিব হাত ?
একি রে বিটলপনা !
এবে ভাল করে তোরে শিখাইব,
নিয়ে যেতে মোরে বাপেরে কহিব,
ঘুমাবি যখন তোরে ফাঁকি দিব,
হেথা আর আসিব না ! "

৫

শিশুমুখে রোষ উঠিল রাঙিয়া ;
বলে,—"চুল তোর ফেলিব ছিঁড়িয়া,
দুই চড়ে গাল দিব রে ভাঙিয়া,
কাপড় ছিঁড়িব দাঁতে !
ঘুম পেলে যবে শুবি বিছানায়,
আরশুলা ধরে ছেড়ে দিব গায়,
মাছ ফেলে দিব ভাতে !"

৬

ধেই ধেই শিশু কাঁপাইছে ঘর,
সৈনিক যেন করিছে সমর !
সভয়ে সে নারী হইয়া ফাঁফর
বলে,—"মাগো কোথা যাই !
ছেলে এ ত নয়, যেন হুতাশন,
চিরদিন মোরে করিবে দহন ;—
চারি পাশে কত হতেছে মরণ ;
মোর কি মরণ নাই !

৭

"বলি এইবার শোন্ রে বিটল !
দস্যুতা তোর ঘুচাব সকল ;
ছিঁড়ে ফেলে যত মায়ার শিকল
ম'রে আমি প'ড়ে র'ব !
যেই মত তোর দাদা মহাশয়,
চলি' গেলা যবে আপন আলয়,
ডেকেছিলি, তবু কথা নাহি কয়,—
সেই মত আমি হ'ব !"

৮

অতি সুকুমার শিশু সে যে, হায়,
মরণের কথা কে বুঝা'বে তা'য় ?
বাহু তুলে পুন কহিল সে মা'য়,—
"মারিব তা হ'লে তোয় !"
পলকে না জানি কিসের কারণ
মুখে আর তার সরে না বচন,
ধীরে ধীরে দু'টি তুলিয়া নয়ন
মা'র মুখ প'রে থোয়।

৯

ক্ষণেক নীরবে চাহিয়া চাহিয়া
সহসা সে শিশু উঠিল কাঁদিয়া ;
দু'টি আঁখিধারা কপোল বহিয়া
ভিজাইল গৃহতল ;
দূরে গেল তার শত আস্ফালন,
কাঁদে অসহায় অনাথ মতন,
হেরি' সে আকুল কাতর রোদন
চোখে মোর এল জল।

১০

রমণীর রোষ দূরে গেল ভাসি,
যত অভিমান ফেলে শিশু নাশি ;—
কোথা হ'তে ঝ'রি মুকুতার রাশি
শোভিল শিরসে তা'র !
অনায়াসে শিশু বিনা ছলবল
বিদ্রোহী মায়ে করিল দখল,
চুম্বনে মিশা স্নেহ-আঁখিজল
করিল তা' পরচার !

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

শিকার-কাহিনী।

প্রবন্ধ-সূচনাতেই পাঠক মহোদয়গণকে অভয় দিতেছি, আমার এ প্রবন্ধে তুষারধবলিত হিমাচলের অভ্রভেদী শৃঙ্গের বর্ণনা নাই। পশ্চিমদেশের সঙ্গে এ দেশের কোনও সুদূর সম্বন্ধ ভৌগোলিকের নিকট থাকিতে পারে, অথবা ততোধিক তীক্ষ্ণদৃষ্টি কবির থাকিতে পারে ; আমার ন্যায় খাঁটি-গদ্য মানুষের মনে পশ্চিমের সঙ্গে এ দেশের কোনও সম্বন্ধ নাই।

আমি নবেম্বর মাসের শেষে, বোধ হয় ২৭শে নবেম্বর, প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদান করি। তখন চারি দিনেই পরীক্ষা শেষ হইত। এখনকার মত পঞ্চম-দিনে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রকে না হউক, অনেকগুলি বালককে "রাফেলের" আণবিক সংস্করণে পরিণত করিবার কল্পনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাতব্বরগণের উর্ব্বর মস্তিষ্কে তখন প্রবেশ লাভ করে নাই, এবং সায়েন্স-ভীতিও এত প্রবল হয় নাই। ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামের নির্জ্জন বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপন করিয়া, সরপুরিয়ার জন্মভূমি স্বনামধন্য কৃষ্ণনগরে, পঠিত অপঠিত সমস্ত বিদ্যার বোঝা পরীক্ষকগণের পাঁচসাতশতটাকাপুষ্ট সবল স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া, একেবারে দীর্ঘ অবকাশ। মা সরস্বতীর সঙ্গে কিছু দিনের জন্য সম্বন্ধ-ত্যাগের দীর্ঘ পরওয়ানা লইয়া আমি ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। নিতান্ত শুভানুধ্যায়ী "কেতাব-কীট" কেহ পড়িতে শুনিতে বলিলে, তাঁহার প্রতিবাদ করিবার কষ্ট আর আমাকে গ্রহণ করিতে হইত না ; যাঁহারা দিবারাত্রি শুধু "পড়, পড়" ভিন্ন অন্য উপদেশ দিতেন না, তাহারাও এখন যথেষ্ট করুণকণ্ঠে, কাতরবচনে

আমার পক্ষসমর্থন করিতেন—সুতরাং স্ফূর্ত্তির সীমা এতদিন যে ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে নির্দ্দিষ্ট ছিল, এই প্রবেশিকাপরীক্ষার পরে আত্মীয়জনের স্নেহে তাহার চৌহদ্দি খুব বাড়িয়া গেল! আমি একেবারে দেশ ছাড়িয়া উত্তর দেশে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। উদ্দেশ্য দেশভ্রমণ।

আমার এক খুড়ামহাশয় উত্তরবঙ্গ ষ্টেট্ রেলওয়ের সোদ্‌পুর লোকো-মোটিভ্ আফিসে চাকুরী করিতেন। আমরা আদর করিয়া তাঁহাকে "চাচা" বলিয়া ডাকিতাম; তিনি আমার অপেক্ষা ৮।৯ বৎসরের বড় ছিলেন। পূর্ব্ব হইতেই চাচার সঙ্গে বন্দোবস্ত ছিল যে, পরীক্ষার পরেই তাঁহার কাছে বেড়াইতে যাইব। সে সময়ে দারজিলিং রেল হয় নাই; উত্তরবঙ্গ রেলের সীমা শিলিগুড়ি অবধি; তবে রঙ্গপুর শাখা তখন খুলিয়াছে। চাচার কাছে যাইব, সুতরাং বাড়ীতে বিশেষ আপত্তি হইল না। চাচা আমার জন্য একখানি মধ্যমশ্রেণীর যাতায়াতের পাশ দিয়াছিলেন। তখন সবে পার্ব্বতীপুর, সোদপুর সহর বসিতেছে; রেলও নূতন হইয়াছে। চাচা একটু উচ্চ বেতনের কর্ম্মচারী, তাই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে বলিয়া আমার জন্য একখানি পাশ যোগাড় করিয়াছিলেন।

তখনও দারজিলিং মেলট্রেণ ছিল, আমি সেই মেলট্রেণে যথাসময়ে সোদ-পুরে চাচার বাসায় উপস্থিত হইলাম। দূর দেশে আমাকে পাইয়া চাচা এবং তাঁহার বাসার অন্যান্য বন্ধুগণ বড়ই প্রীত হইলেন। তাঁহারা ৫।৭ জনে মিলিয়া একটা বাসা করিয়া থাকিতেন। আমি কবে কোথায় বেড়াইতে যাইব, তাহার একটা Programme হইল। আফিসের বাবুরা রবিবার ব্যতীত অন্য কোনও দিন আমার সঙ্গী হইতে পারিবেন না; সুতরাং জলপাইগুড়ি, রঙ্গপুর, নাটোর প্রভৃতি স্থান একাকীই দেখিয়া আসিলাম। মধ্যে এক রবিবার জলপাই-গুড়িতে কাটিয়া গেল; এই জন্য সে রবিবারে চাচাদের সঙ্গে বেড়াইতে যাওয়া হইল না।

অবশেষে একদিন আমাদের বাসার ফুলবেঞ্চে স্থির হইল যে, সম্মুখের শনিবার বৈকালের গাড়ীতে আমরা সকলে একত্র শিলিগুড়ির জঙ্গলে শিকার করিতে যাইব। বাসায় যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই জন বন্দুক নাড়া-চাড়া করিতে পারেন। একজন আমার চাচা, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তরপাড়ার এক ব্রাহ্মণসন্তান। ইহাঁদের দুই জনের সঙ্গেই দুইটি ভাল বন্দুক ছিল।

আমার চাচা দুইটি কাজে সিদ্ধহস্ত ছিলেন; তিনি অতি সুন্দর বাঁশী

বাজাইতে পারিতেন, এবং খুব ভাল শিকারী ছিলেন। তিনি যে কখনও বাঘ মারিয়াছেন, তাহা শুনি নাই; তবে উড়ন্ত পাখী অনায়াসে মারিতে পারিতেন; সুতরাং তিনি যে একজন ভাল পাখীমারা, তাহা আমি জানিতাম। তবে জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া, বাঘের সঙ্গে লড়াই করিয়া তাহাকে বধ করা আমার পূজনীয় খুড়া মহাশয়ের সাধ্য কি না, সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ ছিল। দক্ষিণদেশী উত্তরপাড়াবাসী টেড়ীকাটা টপ্পাবাজ ব্রাহ্মণসন্তান যে সিংহের গহ্বরে প্রবেশ করিয়া সিংহশাবক লইয়া আসিতে পারেন, তাঁহার কথাবার্ত্তায়, হাবভাবে, আমি সেটা বুঝিয়া লইয়াছিলাম।

চাচাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি উপায়ে তিনি বাঘ বা অন্য হিংস্রজন্তু শিকার করিবেন। তিনি বলিলেন, যাহারা সাপ খেলায়, তাহারা বাঁশী বাজা-ইয়া সাপকে একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখে;—জীবজন্তুমাত্রই সুস্বর শুনিতে ভালবাসে। তাহার পর তিনি, বৃন্দাবনের শ্যামের বাঁশীতে যে যমুনা উজান বহিত, তাহাও অসম্ভব নহে, ইহা প্রমাণিত করিতে বসিলেন। বাঁশী যে অনেক গুণ জানে, তাহা এই বৈষ্ণবপ্রধান দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া, আজন্ম বৈষ্ণবগৃহে পালিত হইয়া, মাতৃস্তন্যের সঙ্গে সঙ্গেই জানিতে পারিয়াছি। খুড়া মহাশয় এ হেন বাঁশীর স্বরে বনের হিংস্র জন্তুকে টানিয়া আনিবেন, এবং শেষে বেশ ধীরে সুস্থে চুরুট টানিতে টানিতে তাহার প্রকাণ্ড শরীরে গুলি বসাইয়া দিবেন, ব্যাঘ্রপ্রবরও গত-জীবন হইয়া খুড়ামহাশয়ের জয়ঘোষণা করিবে,—এ বন্দোবস্ত নিতান্ত মন্দ বোধ হইল না!

সোদপুর ও অন্যান্য রেল আফিসে সে সময়ে যে সমস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহাদের খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি স্থানান্তর হইতে আনিবার জন্য প্রত্যেকেরই এক একখানি পাশ ছিল,—তাহার নাম Provision Pass। সে সময়ে সবে নূতন সহর বসিয়াছে, অনেক স্থানে বাজার হাট বসে নাই, তাই কর্ম্মচারিগণ ছুটীর দিনে নিজেরা যাইয়া বা অন্যদিনে চাকর পাঠাইয়া, যেখানে যে দ্রব্য ভাল ও সস্তা পাওয়া যায়, তাহা সংগৃহীত করিতেন। শনিবারে তাঁহারা সকলেই সেই রকমের এক একখানি পাশ সহ গাড়ীতে চড়িলেন; আমার এক মাসের যাতায়াতের পাশ আছে, এবং তাহাতে লেখা ছিল, এই এক মাস আমি ঐ রেলের সর্ব্বত্র যত বার ইচ্ছা বেড়াইতে পাইব।

শিলিগুড়ির রেলষ্টেশনের কর্ম্মচারিগণ আমাদের যাওয়ার সংবাদ পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন, এবং আমাদের অভ্যর্থনার জন্যও যথেষ্ট আয়োজন করিয়া-

ছিলেন। রাত্রে শিলিগুড়িতে নামিয়া ষ্টেশনে পরমসমাদরে অবস্থান করা গেল; এবং প্রত্যূষেই জঙ্গলে ব্যাঘ্র শিকার করিতে যাওয়া হইবে, স্থির হইল। শিলিগুড়ির বন্ধুগণ নিকটস্থ একটি চা-বাগানের এক ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে পূর্ব্ব হইতেই কথাবার্ত্তা স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই চা-বাগানের মধ্যে দুই তিন স্থানে খুব জঙ্গল ছিল, এবং সেই জঙ্গলের ধার দিয়াই একটি ক্ষুদ্রকায়া পর্ব্বতনদী ধীরে ধীরে বহিয়া যাইত। ব্যাঘ্রমহাশয়গণের অন্য দিকে দৃষ্টি আছে কি না, জানি না; কিন্তু শরীররক্ষার জন্য নির্ম্মল জল যে বিশেষ আবশ্যক, তাহা তাঁহাদের বিশেষ জানা আছে; নিকটে নির্ম্মল জলাশয় না থাকিলে বাঘ সেখানে থাকেন না,—তাঁহার পানীয় জল নির্ম্মল হওয়া চাই।

পূর্ব্বকথিত চা-বাগানের ম্যানেজার সাহেব নিজে একজন ভাল শিকারী, তাঁহার অধিকার-মধ্যে যেখানে যেখানে ব্যাঘ্রের গতিবিধি আছে, এবং যে যে স্থানে তাহারা জলপান করিতে সর্ব্বদা যাতায়াত করে, তাহার সন্ধান তাঁহার জানা ছিল; এবং তিনি সেই সেই স্থলে গাছের উপর বাঁশ, কাঠ দিয়া বেশ ভাল বসিবার স্থান প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই সমস্ত স্থানকে সে দেশে "টঙ্গ" বলে।

ডিসেম্বর মাস, শীতকাল। প্রত্যূষে উঠিয়া শীতে হি-হি করিতে করিতে প্রাতঃকৃত্য শেষ করা গেল। তাহার পর দুই তিন পেয়ালা করিয়া গরম চা পান করিয়া আমরা ছয় জন ও শিলিগুড়ি ষ্টেশনের দুই জন, এই আট জনে শিকারে যাত্রা করিলাম। সঙ্গে এক জন ভৃত্য চলিল,—তাহার স্কন্ধে দুইটি বন্দুক; ম্যানেজার সাহেব আরও দুইটি বন্দুক যথাস্থানে প্রেরণ করিতে চাহিয়াছিলেন; তিনি নিজেই এই শিকারে যোগ দিতে পারিতেন, কিন্তু সম্মুখের মেলে তাঁহাকে বিলাতে অনেক চিঠিপত্র ও রিপোর্ট পাঠাইতে হইবে, সুতরাং তাঁহার অবকাশ ছিল না।

এক জন কি দুই জন হইলে, অতি সহজ কাজেও কেমন একটু আশঙ্কা হয়, কিন্তু আমরা কতকগুলি মানুষ,—উৎসাহেও কেহ কম নহেন,—সুতরাং তখন মনে বিন্দুমাত্র ভয়ের সঞ্চার হইল না; মহা উৎসাহে আমরা পরিষ্কার চা-বাগান পার হইয়া জঙ্গলে গিয়া পড়িলাম। এই স্থানে সাহেবের বেহারা দুইটি বন্দুক লইয়া আসিল, এবং সাহেব তাহাকে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে বলিয়াছেন, তাহাও জ্ঞাপন করিল। এই বেহারা সে জঙ্গলের সমস্ত স্থানই জানিত; সে আমাদিগকে অনেক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, শেষে

একটা ক্ষুদ্র নদীর ধারে লইয়া গেল, এবং বেলা নয়টা কি দশটার সময়ে সেখানে বাঘের আগমনসম্ভাবনা জানাইল।

আমরা তখন দুই দলে বিভক্ত হইলাম। একদল নদীর একেবারে কিনারায় যে 'টঙ্গ' ছিল, তাহাতে উঠিয়া বসিলাম; অপর দল একটু দূরে বাঘের পথের পার্শ্বে আর একটি 'টঙ্গে' বসিলেন। চাচা আমাদের দলে রহিলেন—আমাকে ছাড়িয়া থাকা তিনি সঙ্গত মনে করিলেন না; সাহেবের বেহারাও আমাদের দলেই রহিল। আমরা গাছের উপর এমন স্থানে বসিলাম যে, সেখানে বাঘের পৌঁছিবার কোনও সম্ভাবনাই নাই—আমরা নিশ্চিন্তমনে বসিয়া রহিলাম। চাচা তখন তাঁহার প্রকাণ্ড অলষ্টার-কোটের পকেট হইতে সুন্দর ফ্লূট্ বাহির করিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বাঁশী অনেক দিন অনেকবার শুনিয়াছি; কিন্তু সেদিন তাঁহার বাঁশী সত্যসত্যই অমৃতধারা প্রবাহিত করিতে লাগিল—তাঁহার সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত নৈপুণ্য, বাঁশীর ভিতর দিয়া বাহির হইতে লাগিল। তিনি বাছিয়া বাছিয়া সময়োচিত সুন্দর সুন্দর রাগিণী বাজাইতে লাগিলেন। আমি দেখিলাম, খুড়া মহাশয় শিকারের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন, নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে, সুধু সেই বাঁশী একবার করুণ স্বরে, একবার তীব্র স্বরে, আবার ধীরে ধীরে, গভীর মর্ম্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। আমি অবাক্ হইয়া চাচার অদ্ভুত শিক্ষা দেখিতে লাগিলাম। বাঁশীর স্বর সমস্ত বনভূমি প্লাবিত করিয়া, দূর জঙ্গলের পত্রাবলীর মধ্যে ধীরে ধীরে মিশিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু বাঘ ত আসিল না! অবশেষে ক্লান্ত হইয়া চাচা বাঁশী ত্যাগ করিলেন।

বেলাও ক্রমে বাড়িতে লাগিল। শেষে বেহারা পরামর্শ দিল, বাঘ অবশ্যই নিকটে আছে—একবার নীচে নামিয়া একটু সন্ধান করিলে ভাল হয়। বাঘের মুখে এমন করিয়া কে যাইতে চাহে? আমরা দুই তিন জন একেবারে জবাব দিয়া বসিলাম। কখনও বন্দুক ধরি নাই,—আমরা নিতান্ত বর্ব্বরের মত প্রাণটা এই জঙ্গলে রাখিয়া যাইতে কিছুতেই সম্মত নহি। বেহারা বলিল, "এ জঙ্গলে যে বাঘ আছে, তাহারা বড় নহে; ছোট ছোট বাঘ—বোধ-হয় নেকড়ে হইবে।" "হাঁ, নেকড়ে বাঘ, তারি জন্য আবার ভয়!" এই বলিয়া আমার খুড়া মহাশয় নীচে নামিতে প্রস্তুত হইলেন। তাঁর Hunting dress পরা ছিল—তিনি তাহা লইয়াই নামিতেছিলেন। আমি অলষ্টারটা আর বাঁশী সঙ্গে লইতে বলিলাম—কি জানি

যদি বাঘের উদরেই তাঁহাকে যাইতে হয়, তবে বাঁশীটিরও সহমরণে যাওয়া উচিত। চাচা অলষ্টার লইলেন না, কিন্তু বেহারাটা তাঁহার অলষ্টার কাঁধে ফেলিয়া ও দুই হাতে দুইটা গুলিপূর্ণ বন্দুক লইয়া নীচে নামিল। চাচার হাতে একটি বন্দুক। তাঁহারা আমাদিগকে বলিয়া গেলেন, যদি আমরা নিকটে বাঘের সাড়া পাই, তাহা হইলে আমরা যেন একটা শব্দ করি—শব্দ শুনিলে তাঁহারা ফিরিয়া আসিবেন।

তাঁহারা দুই জন জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের সাড়াশব্দও আর পাওয়া যায় না। এই ভাবে প্রায় আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। অবশেষে আমাদের নিকটেই জঙ্গলের মধ্যে সড় সড় শব্দ হইতে লাগিল, এবং জঙ্গলের গাছপালা কাঁপিতে লাগিল। আমরা ভাবিলাম, হয় বাঘ আসিয়াছে, আর না হয় আমাদের সঙ্গিগণই জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। চাচার আদেশমত সঙ্কেত করা আবশ্যক বোধ হইল। আমরা যে কয় জন ছিলাম, তাঁহাদের একজনের পকেটে একটা রেলওয়ে গাড়ীর Whistle ছিল; তিনি তাহাই বাজাইলেন। কিছু ক্ষণ কোনও শব্দই পাওয়া গেল না। প্রায় আট মিনিট পরে দেখা গেল, দুই তিন জন কুলি সঙ্গে, বেহারা ও খুড়ামহাশয় অতি ধীরে ধীরে, এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে আসিতেছেন। আমরা তাঁহাদের গতিবিধি বেশ দেখিতে পাইলাম। যে জঙ্গলের মধ্যে সড় সড় শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলাম, ঠিক সেই জঙ্গলের পার্শ্বে আসিয়া সাহেবের বেহারা স্থির হইয়া দাঁড়াইল; শেষে নিজের স্কন্ধ হইতে চাচার সেই প্রকাণ্ড অলষ্টার ও বাম হস্তের বন্দুকটি মাটীতে রাখিয়া, অপর বন্দুকটি লইয়া বসিল, এবং নিঃশব্দে নিশানা লইতে লাগিল; চাচাও তাহার পার্শ্বে বন্দুক ধরিয়া বসিলেন। চক্ষুর নিমেষে একটা আওয়াজ হইল, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই একটা প্রকাণ্ডকায় নেকড়ে বাঘ লাফাইয়া রাস্তার উপর আসিয়া পড়িল। বেহারা বন্দুক ছুড়িয়াছিল, কিন্তু তাহার লক্ষ্য ব্যর্থ হইয়া গেল। বাঘকে রাস্তার উপরে দেখিয়া চাচা যেই পাশ ফিরিয়া গুলি করিতে যাইবেন, অমনই দেখিতে না দেখিতে ব্যাঘ্র মহাশয় এক লম্ফে একেবারে চাচার স্কন্ধে আসিয়া পড়িলেন। আমরা ভয়ে আড়ষ্ট; কিন্তু দেখিলাম, চাচা বাঘের শরীরের নীচে হামাগুড়ি দিয়া পড়িয়াছেন, এবং তাঁহার বন্দুকটি ছুটিয়া অনেক দূরে যাইয়া পড়িয়াছে। আমরা সেই 'টঙ্গ' হইতে চীৎকার করিয়া উঠিলাম। দিশেহারা হইয়া বেহারা বেচারী আর দ্বিতীয় বন্দুক

কুড়াইবার অবকাশ পাইল না। তাহার মনে হইল, বাঘ হয় ত এতক্ষণ চাচার প্রাণ বাহির করিয়া ফেলিতেছে। বেহারা তখন দেখিল, তাহার হাতের কাছেই চাচার সেই প্রকাণ্ড অলষ্টার পড়িয়া আছে। সে তাড়াতাড়ি সেই অলষ্টার তুলিয়া বাঘের মাথায় ফেলিয়া দিল। সাহেবী অলষ্টারের অষ্টপৃষ্ঠেললাটে বোতাম, বন্ধনী, বেল্ট; কেমন করিয়া জানি না, অলষ্টারটি যেই বাঘের মাথায় পড়িয়াছে, আর সে মাথা নাড়া দিয়াছে। কোনও স্থানে কোনও বোতাম হয় ত আট্‌কান ছিল, বাঘ মহাশয় মাথা নাড়া দিতেই অদৃষ্টগুণে অলষ্টারটি তাহার মাথায় বেশ আটকাইয়া গেল। বাঘ মনে করিলেন, এ আবার কি এক ভীষণ জন্তু তাহার পৃষ্ঠে উপস্থিত! চাচার কথা তখন আর তাহার মনে নাই। বাঘ সেই অলষ্টারের বোঝা মাথায় করিয়া পলাইবার পথ পায় না—ভয়চকিত হইয়া সে দ্রুতপদে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং গর্জ্জন করিতে করিতে ক্রমেই দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া আমরা অবাক্! চাচা তখন গায়ের ধলা ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমরা সকলে তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া চাচাকে অক্ষত শরীর দেখিয়া মহা আনন্দিত হইলাম।

বেহারা বেচারীর উপস্থিতবুদ্ধিতেই চাচার এবার প্রাণরক্ষা হইল। আমাদের শিকার সে দিনের মত শেষ হইল। সকলে ফিরিবার আয়োজন করিলাম। বেহারা সাহেবের বাঙ্গালার দিকে চলিয়া গেল; আমরা তাহাকে পাঁচটি টাকা পুরস্কার দিলাম।

রাস্তায় আসিতে আসিতে চাচার আর আপশোষের সীমা নাই; তাঁর অলষ্টারটা গেল, তাহার জন্য বিশেষ দুঃখ নাই; প্রাণটি যে যাইতেছিল, সে কথাও একবারও বলা নাই। কিন্তু পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন—"তাই ত হে, আমাকে একেবারে হতভম্ব করিয়া বাঁশীটা লইয়া গেল?—এমন বাঁশী আর হবে না!"

আমার সেই পূজনীয় খুড়া মহাশয় এখন স্বর্গে, নতুবা তাঁহার মুখ হইতে এই গল্পটা শুনাইতে পারিলে বড়ই আমোদ হইত। তিনি এই শিকারের গল্প করিতে গেলেই, প্রতিবার তাঁর সেই বাঁশীটার জন্য একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেন!

শ্রীজলধর সেন।

কীর্ত্তন।

আমি কি দেখিব তোমায় হে!
তোমার সকলি সুন্দর হে—অতি সুন্দর!
তব চরণ সুন্দর, বরণ সুন্দর, সুন্দর তব নয়ন,
তুমি দাঁড়ায়ে সুন্দর, বসিয়া সুন্দর, সুন্দর তব শয়ন।
তব গমন সুন্দর, থমক সুন্দর, সুন্দর তব আলস,
তব গরব সুন্দর, অশ্রু সুন্দর, সুন্দর হাসি-বিকাশ।
তব বচন সুন্দর, রচন সুন্দর, সুন্দর তব গীতি,
তব মরম সুন্দর, সরম সুন্দর, সুন্দর তব ভীতি।

আমি কত দেখিব তোমায় হে?
তুমি সকল সময়ে মধুর হে—অতি মধুর!
তুমি দিবসে মধুর, নিশীথে মধুর, মধুর তুমি স্বপনে,
তুমি সজনে মধুর, বিজনে মধুর, মধুর তুমি গোপনে।
তুমি বিপদে মধুর, বিষাদে মধুর, মধুর যবে বরষা,
তুমি শরতে মধুর, হরষে মধুর, মধুর যবে ভরসা।
তুমি সোহাগে মধুর, মিলনে মধুর, মধুর যবে অভিমান,
তুমি কলহে মধুর, বিরহে মধুর, মধুর যবে ভাঙ্গা প্রাণ।
তুমি মধুর হে যবে আমারে ভালবাস—মধুর যবে বাস অন্যে,
তুমি মধুর যবে ব'স কনক-আসনে, আমার কাটে দিন দৈন্যে।

আমি কত ভালবাসিব তোমায় হে?
তুমি সদা দুর্ল্লভ হে—অতি দুর্ল্লভ!
যবে রূপে ভরি আনি দেহ কলসী—দুর্ল্লভ তুমি দুর্ল্লভ!
যবে গুণে ভরি যায় প্রাণসরসী—দুর্ল্লভ তুমি দুর্ল্লভ!
যবে সকল ভালবাসা বাসিয়া ফেলি—দুর্ল্লভ তুমি দুর্ল্লভ!
যখন অভিমানে যাইগো চলি—দুর্ল্লভ তুমি দুর্ল্লভ!
বড়ই সাধ মনে রহিব এক সনে—তুমি ফুল আমি পল্লব,
তুমি কি হবে না আমার চিরসখা,—আমার প্রাণের বল্লভ।
হে অতি-সুন্দর! হে সদা-মধুর! হে অতিশয়-দুর্ল্লভ!

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন।

সহযোগী সাহিত্য।

প্রত্ন-তত্ত্ব।

প্রাচীন তাম্রলিপ্ত।

আধুনিক তমলুকের সহিত আমরা পরিচিত। তম্‌লুক মেদিনীপুর জেলার একটি মহকুমা; কলিকাতা হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় আঠার ক্রোশ দূরে সংস্থাপিত। তমলুকের প্রাচীন নাম তাম্রলিপ্ত;—পূর্ব্বকালে তাম্রলিপ্ত অতি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। তখন তাম্রলিপ্তের পদমূল ধৌত করিয়া সুনীল সিন্ধু চঞ্চল তরঙ্গ তুলিয়া সফেন উচ্ছ্বাসে বহিয়া যাইত, আর সেই বন্দর হইতে বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবযান মন্দ পবনে কেতন উড়াইয়া যাত্রী ও পণ্য লইয়া চীন প্রভৃতি দূরদেশে যাইত। এখন আর সে দিন নাই; এখন সেই পদতলবাহী সিন্ধুস্রোতের মত তাম্রলিপ্তের গৌরবও বিদূরিত হইয়া গিয়াছে। সমুদ্র হইতে দূরে, বিগতগৌরব তাম্রলিপ্ত সমৃদ্ধির শ্মশানের মত পড়িয়া আছে। সম্প্রতি বাবু রাজেন্দ্রলাল গুপ্ত প্রাচীন তাম্রলিপ্ত সম্বন্ধে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমরা সেই প্রবন্ধের সারসংগ্রহ করিয়া দিলাম।

পৌরাণিক যুগ।

পূর্ব্বকালে তাম্রলিপ্ত মৌর্য্যবংশীয় মোমধ্বজ ও তাম্রধ্বজ নৃপতিদ্বয়ের রাজধানী ছিল। তাম্রধ্বজ গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন; তিনি সম্মুখসংগ্রামে শ্রীকৃষ্ণসহায় পাণ্ডবদিগকে পরাভূত করিয়া পরিশেষে তাঁহাদিগের সহিত সন্ধিসংস্থাপন করেন। তাঁহার শৌর্য্যে ও তদীয় পিতার দানশীলতায় শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, সন্ধির সর্ত্তানুসারে তাঁহারা আবশ্যক হইলেই তাম্রলিপ্তে আসিতে স্বীকৃত হয়েন। যে প্রাচীন মন্দিরে তাঁহাদিগের মূর্ত্তি পূজিত হইত, সহরের একাংশের সহিত সে মন্দির এখন রূপনারায়ণের গর্ভে বিলোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন আর তাহার চিহ্নমাত্র নাই। অপেক্ষাকৃত অল্পদিন পূর্ব্বে নির্ম্মিত আর একটি মন্দিরে এখনও তাঁহাদিগের মূর্ত্তি পূজিত হয়। সে মন্দিরে আজও অনেক যাত্রী পুণ্যলাভাশায় আসিয়া থাকে।

তমলুকের বর্ত্তমান রাজা প্রাচীন মৌর্য্যবংশের বংশধর বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন; কিন্তু মৌর্য্যবংশীয়গণ রাজপুত ছিলেন, আর বর্ত্তমান রাজা কৈবর্ত্ত। কথিত আছে, তিনি কালু ভুঁইয়ার ষড়্‌বিংশ বংশধর। মোগলসম্রাটদিগের সময় বঙ্গদেশ যে সকল অংশে বিভক্ত ছিল, সে সকল দ্বাদশ ভুঁইয়ার অধিকারে ছিল। কালু ভুঁইয়া এই দ্বাদশ ভুঁইয়ার একজন।

বৌদ্ধ যুগ।

পৌরাণিক যুগের পর তাম্রলিপ্তে বৌদ্ধপ্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এখানে অনেকগুলি বৌদ্ধবিহার ছিল ও অনেক ভিক্ষু সেখানে বাস করিতেন। এখানে প্রায় দুই শত ফিট উচ্চ একটি স্তম্ভ ছিল, তাহা অশোক কর্ত্তৃক সংস্থাপিত বলিয়াই প্রসিদ্ধ। তাম্রলিপ্ত তখন বাণিজ্যবাহুল্যে প্রধান বন্দর বলিয়া কীর্ত্তিত; এই বন্দর হইতেই চাইনিস্ ভ্রমনকারীরা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ইহার পর সমুদ্রসলিল দূরে অপসারিত হইয়া গেল; কাজেই খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতেই তাম্রলিপ্তের বন্দরের বাণিজ্য বিলুপ্ত হইয়া গেল। ইহারও চার পাঁচ শতাব্দী পূর্ব্বেই তাম্রলিপ্ত হইতে বৌদ্ধপ্রভাব বিদূরিত হইয়াছিল। বর্গভীমার মন্দির পূর্ব্বে বৌদ্ধ মন্দির ছিল; ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক উহা কালীর মন্দিরে পরিণত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ মহাসমারোহে ঐ

মন্দিরমধ্যে কালীমূর্ত্তি সংস্থাপিত করেন। এখনও সেইখানে কালীমূর্ত্তি সংস্থাপিত রহিয়াছে। পণ্ডিতপ্রবর ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার পুস্তকসমূহে এই মন্দিরের বর্ণনা করিয়াছেন। সার্ উইলিয়াম হণ্টার বলেন যে, কেহ কেহ বলেন, ইহা দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার বিরচিত। এই মন্দির অতি বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরে গঠিত ; কিরূপে সেই সকল প্রস্তর অত উচ্চে উথাপিত হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। যে স্থানে এই মন্দির সংস্থাপিত, সে স্থান সহর অপেক্ষা অনেক উচ্চ। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রবল ঝড় ও বানের সময় বহুসহস্র সহরবাসী সেখানে আশ্রয় লইয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিল।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে রূপনারায়ণ পূর্ব্বখাদ পরিত্যাগ করিয়া নূতন খাদে প্রবাহিত হয়। সেই সময় ভূগর্ভ হইতে বহু প্রাচীন মুদ্রা ও মৃৎমূর্ত্তি (Terra cotta) বাহির হইয়াছিল। সে সকল

প্রাচীন মূর্ত্তি ও মুদ্রা।

স্থানীয় পাঠাগারে সংগৃহীত হয়। মেদিনীপুরের তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার উইল্‌সন ও মহকুমার প্রধান কর্ম্মচারী সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় তাহার মধ্যে কতকগুলি এসিয়াটিক সোসাইটীতে প্রেরণ করেন। মুদ্রাগুলির মধ্যে অধিকাংশই সচ্ছিদ্র, সে সকলের উপর কিছুই লিখিত ছিল না—কেবল পদ্ম, চক্র, চৈত্য অথবা হস্তী, মৃগ ও সিংহ প্রভৃতি জন্তুর মূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল। এই সকল মুদ্রা খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল বলিয়াই বোধ হয়। একটি বৃহৎ সুবর্ণ মুদ্রা গুপ্তরাজগণের সময়ের—তাহার এক পার্শ্বে লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত। গুপ্তরাজারা লক্ষ্মীর উপাসক ছিলেন। পণ্ডিতবর বাবু আনন্দকৃষ্ণ বসু ও কলিকাতায় অন্য অনেক প্রাচীন মুদ্রাতত্ত্ববিৎ একটি ক্ষুদ্রতর স্বর্ণমুদ্রায় লিখিত অক্ষরগুলি পাঠ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ঐ সকল মুদ্রার মধ্যে মোগল সম্রাটদিগের সময়ের কতকগুলি মুদ্রাও ছিল। আরঙ্গজীব তাম্রলিপ্ত নগরে একটি মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ; তাহাও এখন নদীগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। আর তাহার চিহ্নমাত্রও নাই।

সেই সময় যে সকল মৃৎমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল, সে সকলের মধ্যে একটি মারের—মার বৌদ্ধদিগের মতে কতকটা খ্রীষ্টানদিগের শয়তানের মত ; একটি বুদ্ধজননী মায়াদেবীর—হস্তিদন্তের আকারে বুদ্ধদেব ইহারই গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন বুদ্ধ গৃহত্যাগের সঙ্কল্প করিলে, বৃদ্ধ রাজা শুদ্ধোধন পুত্রের গৃহত্যাগী মন সংসারে বদ্ধ করাইবার অভিপ্রায়ে যে সকল বিলাসচতুরা সুন্দরীদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সে সকলের মধ্যেও দুই জনের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল।

বোধ করি, অনুসন্ধান করিলে আরও বহু মূর্ত্তি ও মুদ্রা পাওয়া যাইত। ভারতবর্ষের প্রাচীন সহর সকল অনুসন্ধান করিলে, প্রাচীন সভ্যতা ও শিল্পের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। কিন্তু হায়, আমরা এখনও প্রত্নতত্ত্বোদ্ধারের জন্য শ্রমস্বীকার করিতে শিখি নাই। সসঙ্কোচে এ কথা স্বীকার করিতে হয় যে, প্রকৃতপক্ষে আমরা এখনও অতীতগৌরবের উদ্ধার ও নবগৌরবলাভের জন্য প্রয়াসী হইতে পারি নাই।

জীবনচরিত।

লর্ড টেনিসন।

টেনিসনের মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পরে এইবার তদীয় পুত্র তাঁহার জীবন-চরিত রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। জীবনচরিত প্রকাশে পিতার বড় বিতৃষ্ণা ছিল ; তবে তিনি বলিয়াছিলেন যে, পুত্র মনে করিলে তাঁহার জীবনী প্রকাশ করিতে পারেন। তাহাতে আর কিছু না হউক, এই একটা বিশেষ লাভ হইবে যে, অন্য কেহ জীবনী রচনা করিলে তাহাতে যে সকল ভ্রম প্রমাদ থাকিবে, পুত্র জীবনী রচনা করিলে সে সকল থাকিবে না। পুত্র এতদিনে সেই জীবনী প্রকাশিত করিয়াছেন। গোপনীয় পত্রাদিও অনেক সময় জীবনীতে প্রকাশিত হয়। সে সম্বন্ধে টেনিসনের মত তিনি মিষ্টার গ্ল্যাডষ্টোনকে

জীবনচরিত।

লিখিত এক পত্রে স্পষ্টই ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, তিনি একজন মহিলার কথা শুনিয়াছেন ; দেশের অনেক প্রতিষ্ঠাপন্ন লোক তাঁহাকে পত্রাদি লিখিতেন ; ফ্রুড-বিরচিত কার্লাইলের জীবনী প্রকাশিত হইলে, তিনি সে সকল পত্র অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন ; তিনি বলিয়াছিলেন—সে সকল পত্র তাঁহার জন্য, সাধারণের জন্য নহে। টেনিসন বলেন, সেই বৃদ্ধা মহিলার উদ্দেশে একটা মন্দির সংস্থাপন করা উচিত।

অভিজাতত্ব লইতে টেনিসনের বিশেষ আপত্তি ছিল। "ব্যারনেট্‌সি" লইতে অনুরুদ্ধ হইয়া, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি মিষ্টার গ্ল্যাডষ্টোনকে বলেন যে, মিষ্টার ও মিসেস্ টেনিসন

অভিজাতত্ব।

থাকিতেই তাঁহার ও তাঁহার পত্নীর ইচ্ছা ; তবে তাঁহাদের পুত্রকে সম্মানিত করিলে তাঁহাদিগের আপত্তি নাই। রাজভক্ত টেনিসন এ সম্মান লইতে অস্বীকৃত হইয়া রাণীর প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করেন নাই। ইহার পর লর্ড বীকন্সফীল্ড একবার টেনিসনকে অভিজাতত্ব প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। টেনিসন তাহা লইতে স্বীকৃত হয়েন নাই। ইহার পর একবার টেনিসন, মিষ্টার গ্ল্যাড্‌ষ্টোন প্রভৃতি সার ডোনাল্ড কারীর 'পেম্‌ব্রোক কাস্‌ল্' নামক ষ্টীমারে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সেই সময় মিষ্টার গ্ল্যাডষ্টোন পিতাকে অভিজাতত্ব প্রদানের ইচ্ছা পুত্রের নিকট প্রকাশ করেন। পুত্রের আশঙ্কা হইল, ইহাতে চিন্তা করিতে হইবে ; সুতরাং পিতার আনন্দহানির সম্ভাবনা। মিষ্টার গ্ল্যাডষ্টোন মহারাণীকে লিখিবার জন্য কবির মত জানিতে চাহিলে, পুত্র শেষে পিতার নিকট প্রস্তাব করিতে সম্মত হইলেন। পরিশেষে পুত্র ধূমপানরত পিতাকে এ কথা জানাইয়া চলিয়া গেলেন ; কিছুক্ষণ পরে আসিয়া দেখেন, মিষ্টার গ্ল্যাড্‌ষ্টোন ও মিষ্টার টেনিসন হোমারের উপমা সম্বন্ধে আলোচনায় মগ্ন। অনেক ভাবিয়া শেষে টেনিসন অভিজাতত্ব লইতে স্বীকৃত হয়েন। টেনিসন বেশবিষয়ে নিতান্তই অমনোযোগী ছিলেন ; মিষ্টার গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের আশঙ্কা ছিল, পাছে টেনিসন কোন দিন সেই সাধারণ বেশে লর্ড সভায় যাইয়া উপস্থিত হয়েন।

টেনিসনের জীবনে তাঁহার পত্নীর যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তিনি আপনি অনেক ক্লেশকর কার্য্য করিয়া স্বামীকে বিশ্রামদান করিতেন। স্বামীর পত্রাদির উত্তর স্ত্রীই প্রদান

পত্নীর প্রভাব।

করিতেন। কবিতা ছাপাইবার পূর্ব্বে কবি একবার তাহা পত্নীকে শুনাইতেন। কবির নিকট পত্নীর সমালোচনার বিশেষ আদর ছিল। পত্নীর পবিত্র প্রেমপূর্ণ প্রভাবে টেনিসনের দাম্পত্যজীবন ও পারিবারিক জীবন অত্যন্ত সুখের হইয়াছিল। পত্নীসৌভাগ্যে সৌভাগ্যশালী কবির জীবন যে হতাশার শ্মশানভূমি হইতে পায় নাই, সে কেবল মনোমত বুদ্ধিমতী পত্নীর প্রভাবে।

সম্প্রতি অধ্যাপক নাইট 'ব্ল্যাকউড্‌স্ ম্যাগাজিন' পত্রে টেনিসনের সহিত তাঁহার সাক্ষাতের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেই বিবরণ হইতেও আমরা কয়েকটি কথা সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

টেনিসনের কবিতা পাঠ করিয়া যেমন মুগ্ধ হইতে হয়, তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়াও তেমনই মুগ্ধ হইতে হইত। কার্লাইলের কথাবার্ত্তায় মধ্যে মধ্যে যে ঔজ্জ্বল্য ও যে

কথাবার্ত্তা। স্রোতোবেগ ছিল, টেনিসনের কথাবার্ত্তায় সে সকল ছিল না; তাঁহার কথাবার্ত্তা বিশেষ সংযত ছিল। ব্রাউনিংএর কথাবার্ত্তার সম্বদ্ধভাব বা রাস্কিনের কথাবার্ত্তার পূর্ণতাও টেনিসনের ছিল না—টেনিসনের কথাবার্ত্তা স্ফটিকের মত নির্ম্মল; তাঁহার কথাবার্ত্তা স্থির, গম্ভীর ও উজ্জ্বল—তাহাতে বাহুল্য ছিল না।

টেনিসনের আর এক বিশেষ গুণ ছিল, তিনিই কথা একচেটিয়া করিয়া লইতেন না। অপরের মতামত তিনি জানিতে চাহিতেন, তাই অপরকে কথাবার্ত্তা কহিবার অবসর দিতেন। টেনিসন সহজেই কথার বাহ্যাবরণ ভেদ করিয়া মর্ম্মস্থলে উপনীত হইতে পারিতেন। আবার টেনিসনের এই মর্ম্মভেদী সূক্ষ্মদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে সরলতা ছিল। টেনিসন তাঁহার সমসাময়িক লেখকদিগের প্রশংসার যোগ্য রচনার প্রশংসা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

টেনিসন বলিতেন, পূর্ব্বকাল হইতে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সাত জন কবির স্থান সর্ব্বোচ্চে। সে সাত জন—হোমার, অ্যাস্‌কিলাস, সোফোক্লেস, ভার্জিল, সেক্‌স্‌পিয়ার ও গেটে। ত্রয়োদশ হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে টেনিসন একখানি মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা সে কাব্যখানির প্রশংসা করিয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন যে, সেই কাব্যের কবি ভবিষ্যতে ইংরাজী-সাহিত্যে অতি উচ্চ স্থান পাইবেন। কিন্তু শেলীর প্রথম বয়সের কবিতা দেখিয়া, কবি সে কাব্যখানি ভস্মসাৎ করিয়াছিলেন। পাঠক English Idylls এ কবির সেই কথা স্মরণ করিবেন—

"These twelve book of mine
Were faint Homeric echoes, nothing worth,
Mere chaff and draff, much better burnt."

টেনিসন বলিতেন, আমাদিগের চারি দিকে যাহাকে আমরা অজ্ঞেয় রাজ্য বলি, প্রকৃত পক্ষে তাহা অজ্ঞেয় রাজ্য নহে। তিনি লেখকের নিকট কয়েকটি ভূতের গল্পও করিয়া-

অজ্ঞাত রাজ্য। ছিলেন। তিনি বলিতেন, সকল দ্রব্যই একটা সম্পূর্ণতার অংশমাত্র,—কাজেই কোন অংশেরই ধ্বংস অসম্ভব। টেনিসনের In Memoriaum গ্রন্থ পাঠ করিলে তাঁহার এই সকল মতের আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। টেনিসন ঈশ্বর, কর্ত্তব্য ও অমরত্ব, এই তিনের প্রতি বিশেষ ভক্তিমান ছিলেন।

টেনিসন আজ আর ইহজগতে নাই, কিন্তু তাঁহার যশঃসৌরভে ইংরাজী-সাহিত্য আমোদিত। যতদিন ইংরাজী-সাহিত্য থাকিবে, ততদিন ইংরাজী পাঠক তাঁহার কবিতা পাঠ করিয়া আনন্দ ও শিক্ষালাভ করিবে। মধুসূদন সত্যই বলিয়াছেন—

"সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন।"

ভ্রমণবৃত্তান্ত।

লাডক।

লাডক ভারতবর্ষের অতি নিকটেই সংস্থাপিত; কিন্তু লাডক সম্বন্ধে আমাদিগের অভিজ্ঞতা অতি সামান্য। লাডকে যাইবার অসুবিধা অল্প নহে। ম্যাডাম্ ইসাবেল মাস্ সম্প্রতি কোন ফরাসী পত্রে তাঁহার লাডক-ভ্রমণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষ, আফগানিস্থান প্রভৃতি পরিভ্রমণের পর কাশ্মীর হইতে রওনা হইয়া পামীর পার হন ও তুর্কিস্থান দিয়া য়ুরোপে প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্কল্প করেন; কিন্তু ভারত গভর্মেণ্টের পররাষ্ট্রবিভাগের কর্ম্মচারীরা নিবৃত্ত করিলে, তিনি ইংরাজাধিকৃত লাডকের রাজধানী লে নগরে গমন করেন।

কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর হইতে গেলে পূর্ব্ব দিকে লাডক পঞ্চদশ দিবসের পথ। চারি জন প্রধান ভৃত্য, অনেকগুলি কুলি প্রভৃতি লইয়া লেখিকা শ্রীনগর হইতে যাত্রা করেন। পথে

লাডকের পথে। দেখিবার জিনিস, পার্ব্বত্য ছাগদল; ভারত গভর্মেণ্ট বহুকষ্টে এই সকল ছাগের আক্রমণ হইতে পঞ্জাবের বনবিভাগ রক্ষা করেন। ছাগপালগণের গঠন বলিষ্ঠ, চক্ষু উজ্জ্বল, নাসা তীক্ষ্ণাগ্র, শ্মশ্রু ভ্রমরকৃষ্ণ—যেন গ্রীকজাতির মত। তাহাদিগের রমণীরাও রূপলাবণ্যসম্পন্না; প্রায়ই দেখিতে পাইবে, সুন্দর কণ্ঠাভরণশোভিতা, হাস্যময়ী রমণীরা তুষারধবলহস্তে মস্তকে স্থাপিত ভার ধারণ করিয়া যাইতেছে। ভূস্বর্গ কাশ্মীর ত্যাগ করিয়া লেখিকা অম্বরনাথের গুহা সকলের সন্নিকটে সমুপস্থিত হয়েন;—বহু হিন্দু যোগী ও যোগিনী প্রবল শীতে এই সকল তুষারাবৃতদ্বার গুহামধ্যে যাইয়া সাধনা করেন।

অল্প দূর অগ্রসর হইয়াই লেখিকা নূতন নূতন আচার ব্যবহার লক্ষ্য করিতে আরম্ভ করেন। বল্‌তিস্থানে পুরুষদিগের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত; কিন্তু তিব্বতবাসী ও ভোট-

আচার ব্যবহার। দিগের মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের বহুবিবাহ প্রচলিত; তিন চারি ভ্রাতার একমাত্র পত্নী,—ইহার উপর স্বামীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার অধিকার স্ত্রীর আছে; সে অধিকার বিশেষরূপে ব্যবহৃতও হইয়া থাকে। এরূপ বিবাহের কারণও আছে; অনুর্ব্বর দেশে যাহাদিগের বাস, তাহাদিগের মধ্যে জনসংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়া বড় সুবিধার কথা নহে।

পথে প্রায়ই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৌদ্ধস্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। গোলাকার সেই সকল স্তম্ভ প্রায়ই পল্লীপার্শ্বে জনহীন সঙ্কটসঙ্কুল স্থানে সংস্থাপিত। সে সকল স্মারক স্তম্ভ—সে সকলের

দৃশ্য। মধ্যে মৃত ব্যক্তির ভস্ম ও মৃত্তিকা মিশাইয়া কতকটা বুদ্ধমূর্ত্তির মত করিয়া নির্ম্মিত একটা একটা মূর্ত্তি সংস্থাপিত। স্তম্ভপ্রাচীরে সংস্কৃত বা তিব্বতীয় ভাষায় প্রার্থনা লিখিত;—যাহারা দক্ষিণে যায়, তাহারা ঐ প্রার্থনা পাঠ করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিয়া যায় বলিয়া গণ্য করা হয়; যাহারা বামে যায়, তাহাদের অশুভ হয়। চীনদেশে একটা চক্রে প্রার্থনা লিখিত হয়, সেই চক্র আবর্ত্তিত করিলেই প্রার্থনার পুণ্যলাভ হয়।

লাডকের মহিলারা আদৌ মুসলমানমহিলার মত নহেন। তাঁহারা উজ্জ্বল বর্ণের বেশ পরিধান করেন। লেখিকা বলেন যে, বৃদ্ধারা দেখিতে শ্রীহীনা—যুবতীরা মোটের উপর চলনই রকমের সুন্দরী। দেশের লোকেরা নৃত্য ভালবাসে। লেখিকা বলেন, মুসলমানধর্ম্ম ক্রমেই বিস্তৃত হইতেছে। তিনি লামাদিগের নিন্দা করিয়াছেন।

বিবিধ।

অতলতলে।

এই যে সাগর—অতল, অকূল, অসীম, অবিরামগতি—ইহার অন্তরে কি অনন্ত রহস্য নিহিত আছে, কে তাহার নির্ণয় করিতে পারে? কখন স্থির গম্ভীর, কখন বীচিবিক্ষুব্ধ, কখন মত্ত "ফেনাময় ফণাময় যথা ফণিবর"; যুগযুগান্তরের কত আনন্দ, কত বিষাদ, কত অভ্যুত্থান, কত বিলয়, কত গঠন, কত ধ্বংস, কত কাহিনী যে ইহার দিগন্তবিস্তৃত জলরাশির সহিত বিজড়িত, তাহা কে বলিবে? কে বলিবে, ইহার কলকল নিনাদে কি ভাষা প্রকাশিত হইতেছে? প্রকৃতির উপাসক কবিবর বায়রণ বলিয়াছেন,—

"কল্লোলে বহিয়া যাও নীল সিন্ধুজল,
পোতমালা বৃথা তব বক্ষে ভাসি যায়;
মৃত্তিকায় চিহ্ন রাখে মানবের বল,
তার ক্ষমতার শেষ তোমার বেলায়।"

এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাতকে জ্ঞাত করিবার ইচ্ছা মানবের হৃদয়ে ক্রমেই প্রবল হইতেছে; সেই ইচ্ছা হইতে নানা চেষ্টা উদ্ভূত হইতেছে। এখন মানবের চেষ্টা—

"To follow knowledge like a sinking star,
Beyond the utmost bound of human thought."

এখন অতলতলের অনুসন্ধানেচ্ছু মানব সাগরের তলদেশ পরীক্ষা করিবার যথাসম্ভব চেষ্টা করিতেছে। সে চেষ্টা একেবারে বিফল হয় নাই। সম্প্রতি ডাক্তার ফিপসন 'চেম্বার্স জর্ণাল' নামক পত্রে সিন্ধুতল সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। সেই প্রবন্ধ হইতে বর্ত্তমান প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইল।

সিন্ধুতলে বৈচিত্র্য নাই।

এ পর্য্যন্ত পরীক্ষায় যাহা জানা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, সিন্ধুতলে ভূভাগের মত বৈচিত্র্য নাই। ভূতলে বৃষ্টি, স্রোতস্বিনী, রৌদ্র, শীত, আতপ, বায়ু, তুষার প্রভৃতির প্রভাবে বৈচিত্র্য উৎপন্ন হয়, সাগরতলে এ সকলের প্রভাব নাই। সাগরতলে সুদূরপ্রসারিত সমতল ভূমি, উপত্যকা, এবং কোথাও কোথাও পর্ব্বত-শ্রেণীও লক্ষিত হয়। এই সকল পর্ব্বতের মস্তক সময় সময় সাগরের জলরাশি ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত ও লক্ষিত হয়। যদি বঙ্গোপসাগরের কথাই ধরা যায়, তবে আমরা দেখিতে পাই যে, তাহার তলদেশে বহুদুরবিস্তৃত সমতলভূমি রহিয়াছে। কোথাও কোথাও তাহার পরিসর সহস্র মাইল পর্য্যন্ত দেখা যায়। সেই সমতলভাগে কেবল এক সারি গিরিশ্রেণী সিন্ধুসলিলমধ্যে গর্ব্বোদ্ধত শির উত্তোলিত করিয়া দণ্ডায়মান—সিন্ধুস্রোত তাহাদিগের প্রতিরোধক্ষম শরীরে আঘাত করিয়া বহিয়া যাইতেছে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ এই গিরিশ্রেণীর উপর সংস্থাপিত। সিন্ধুতলে না আছে শীতাতপবৈচিত্র্য, না আছে বায়ু, না আছে সলিলের আন্দোলন। সলিলের আন্দোলন নাই বলিলে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। এত যে তরঙ্গভঙ্গ, এত যে স্রোত, ইহার কিছুই সাগরের তলদেশ পর্য্যন্ত পৌঁছে না। সকলই উপরে উঠিয়া উপরেই বিলীন হইয়া যায়। সিন্ধুতলে জলজ উদ্ভিদাদিও নাই;—সে সকলের বর্দ্ধনের জন্য সূর্য্যকর আবশ্যক, সিন্ধুতলে সূর্য্যকর পৌঁছে না।

আলোক ও উত্তাপ।

সমুদ্রের জলরাশি সাগরতল হইতে সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপ সযত্নে অপসারিত করে। আমরা দেখিতে পাই, আকাশে মেঘোদয় হইলে একটু শীত বোধ হয়—মেঘ জলের রূপান্তরমাত্র। সিন্ধুতল ও সূর্য্যালোক এতদুভয়ের মধ্যে ক্ষণস্থায়ী মেঘমাত্র নাই; পরন্তু অনন্ত কাল ধরিয়া দুই চারি ক্রোশ গভীর জলরাশি

বিদ্যমান। সাগরের উপরিভাগ হইতে অল্প দূর, এমন কি, ত্রিশ গজ মাত্র নামিলে প্রখর প্রভাকর-কিরণ স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকবৎ প্রতীয়মান হয়। অতি স্বচ্ছজলপূর্ণ হ্রদেও সূর্য্যালোক ৩১০ গজের অপেক্ষা অধিক নিম্নে প্রবেশ করিতে পারে না। অতি গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও তপনকিরণ সাগরসলিলে ৪০০ গজের নিম্নে যাইতে পারে না। তন্নিম্নে কেবল অন্ধকার,—"না সেথায় দিন ভায়, না নিশীথ-তারা!"

জলতলে জীব।

ভূপৃষ্ঠে উদ্ভিদের বৈচিত্র্য দেখিয়া বিস্ময় জন্মে, কিন্তু সিন্ধুগর্ভে উদ্ভিদের চিহ্নমাত্র নাই। সূর্য্যালোক ভিন্ন উদ্ভিদ জন্মিতে ও বর্দ্ধিত হইতে পারে না। কাজেই অতলতলে শব্দহীন, আলোকহীন, সীমাহীন প্রান্তর ও উপত্যকায় উদ্ভিদমাত্র নাই। ইহাতে সহজেই মনে হইতে পারে যে, সিন্ধুতলে কোন প্রাণী নাই। সে কথা সত্য নহে—প্রকৃতপক্ষে সিন্ধুতলে অসংখ্য জীব বাস করে। আমরা সকলেই অবগত আছি যে, ভূপৃষ্ঠে আমাদিগের প্রতিবর্গইঞ্চ স্থানে বায়ুস্তরের যে চাপ সহ্য করিতে হয়, তাহার পরিমাণ ৭½ সের। বায়ু অপেক্ষা জল গুরুভার, কারণ প্রায় ৪৫ মাইল উচ্চ বায়ুস্তরের চাপ আর কেবল ৩৩ ফিট উচ্চ জলরাশির চাপ সমান। কাজেই প্রায় ৪০০০ গজ গভীর জলতলে প্রতিবর্গইঞ্চের ভার প্রায় ২½ টন। অতলতলবাসী প্রাণিকুল এই গুরুভার বহন করে। আবার তাহাদিগের বাসস্থানে সূর্য্যালোক নাই—সেখানে শীত অত্যন্ত প্রবল, সেখানে আহার্য্য উদ্ভিদের লেশমাত্র নাই। এই সকল জীব মাংসভোজী। ইহাদিগের মধ্যে অনেক প্রাণীর দৃষ্টিশক্তি নাই। আবার কোন কোন জীবের দেহ হইতে আলোক বিকীর্ণ হইয়া থাকে। ভূপৃষ্ঠে আমরা সকলেই খদ্যোতের অঙ্গনিঃসৃত আলোক দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। যে সকল জীবের দেহ হইতে এইরূপে আলোক বিকীর্ণ হয়, তাহাদিগের দৃষ্টিশক্তি উৎপন্ন হয়। বিবর্ত্তনের নিয়মই এইরূপ।

যখন অতলতলে উদ্ভিদ নাই, তখন এই সকল অতলবাসী জীব আহার ও অম্লজান পায় কোথা হইতে? ভূপৃষ্ঠে আমরা দেখিতে পাই, প্রাণিগণ অম্লজানের জন্য (অর্থাৎ গ্রহণোপযোগী বায়ুর জন্য) বৃক্ষলতাদির উপর নির্ভর করে; প্রাণিকুল কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অঙ্গারকাম্ল উদ্ভিদের পক্ষে যেমন অত্যাবশ্যক, উদ্ভিদ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অম্লজান তেমনই প্রাণিকুলের পক্ষে অত্যাবশ্যক। মুখ্যভাবেই হউক আর গৌণভাবেই হউক, সকল প্রাণীরই জীবনধারণের জন্য উদ্ভিদের প্রয়োজন; অনেক প্রাণী আমিষ আহার করে সত্য, কিন্তু তাহারা যে সকল প্রাণীর মাংসে দেহ পরিপুষ্ট করে, তাহারা উদ্ভিদ আহার করে। তবে অতলতলবাসী জীবগণ কিরূপে জীবনধারণ করে?

পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, সিন্ধুর উপরিভাগে উদ্ভিদের অভাব নাই—তথায় বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদপদার্থ বিদ্যমান। সেই সকল সর্ব্বদাই ধারাধর-ধারাপাতের মত সিন্ধুতলে নিপতিত হইতেছে; আবার নদীর স্রোতের সহিত বহু উদ্ভিদপদার্থ সাগরে নীত হয়,—সে সকলও সিন্ধুতলে স্থান প্রাপ্ত হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীরা সেই সকল আহার করিয়া জীবন ধারণ করে; আবার জীবন-সংগ্রামের তাড়নায় বৃহৎ প্রাণীরা সেই সকল প্রাণীর আমিষে দেহ পরিপুষ্ট করে। এইরূপে সিন্ধুতলে, বায়ু, আলোক ও শব্দহীন অতলেও ভূপৃষ্ঠের মত জন্মমৃত্যুর অলঙ্ঘ্য নিয়মে চালিত হইয়া বহু জীব নিত্য বিচরণ করিতেছে। সে কথা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়।

বোধ করি, পাঠকগণ অবগত আছেন,—কোনও কোনও প্রাণীর দেহাবশেষ একত্রিত হইয়া পরিশেষে জীববাসযোগ্য বৃহৎ বৃহৎ দ্বীপের উৎপত্তি হয়।

মলিনমুখী।

১

মরি কি অমৃতময় করুণ বদনখানি ;
অবসন্ন ভুজলতা কোমল যুগল পাণি,
মলিন নয়ন চল—
কিবা নীলে ঢল ঢল,
কমনীয় অঙ্গে যেন মাখা স্বর্গ-সরলতা ;
লজ্জাময়ী, মধুময়ী, বসন্তের বনলতা !

৩

প্রবেশি' বিধাতা যেন লাবণ্য-বিলাসবনে,
প্রফুল্ল কুসুমগুলি অবচয়ি' সযতনে,
কমলের দল দিয়ে,
চম্পকের বর্ণ নিয়ে,
মিশা'য়ে মল্লিকা যূথী আরো কত পুষ্পসনে,—
গড়িল শ্রীঅঙ্গ তব বসি যেন নিরজনে।

৩

উষার চুম্বনে যথা নীল নীরে সরোবরে,
স্ফূট কমলের মধু মৃদু ধীরে ধীরে ঝরে !
তেমতি ও কলেবরে,
কত উষা আলো করে ;
কত পরিমল সহ স্বর্গীয় অমৃতরাশি
ঝরিতেছে তব রূপে কি সুষমা পরকাশি'।

৪

হে বিধাতঃ ! বল দেব কোন্ দুরদৃষ্টফলে,
এমন ফুটন্ত পদ্ম মলিন নীহারজলে ?
কষিত নির্ম্মল হেম,
মলিনতা মাখা কেন,
পূর্ণিমা-চন্দ্রমা কেন মাখান কলঙ্ক-থরে,
সরোজী শৈবালে বুঝি রম্যতর শোভা ধরে ?

৫

এমনি মলিনমুখে থাক লো মলিনমুখী ;
মধুর মলিনে মেলা করে প্রাণ কত সুখী।
লবঙ্গের লতা সম,
অঙ্গ যষ্টি-মনোরম,
মলিনে এলান কিবা আবেশে বিষাদভারে,
শুভ্র যূথীরাশি যেন প্রকৃতির কণ্ঠহারে !

৬

এই বিষাদিনীবেশে থাক তুমি ক্ষীণাঙ্গিনী,
নিন্দিয়া ত্রিদিবশোভা শতসাজে উল্লাসিনী,
উষার কুন্তলতলে
যথা শুকতারা জ্বলে,
ম্লানজ্যোতিঃ কিন্তু রূপে ধরাদিবি-উজ্জলিনী,—
নীহারে নিষিক্ত কিংবা ম্লানশোভা সরোজিনী।

৭

হেম-অঙ্গে নাহি কাজ হেম-রত্ন-অলঙ্কারে ;
শুভ্র শেফালিকা দেখ পতিত সৌরভভারে ;
আভরণহীন কায়—
পরিপূর্ণ সুষমায় ;
প্রত্যঙ্গে প্রকৃতি কিবা লিখিয়া সৌন্দর্য্যলেখা,
দিয়াছে আদরে চারু চরণে অলক্তরেখা।

৮

সরলতা মধুরতা কোমলতা মাখাইয়ে—
প্রেম-পুষ্পমালা দিয়ে যে বাঁধা বেঁধেছ প্রিয়ে,—
ছিঁড়িতে কি পারি তারে ?—
প্রেমভরে সহকারে—
বাঁধিলে মল্লিকা লতা, কভু কি ছিঁড়িয়া যায় ?
ভুলিব না এ জীবনে,—ভুলিও না কভু হায় !

শ্রীহরিশচন্দ্র নিয়োগী।

কাজির বিচার।

একালের ধর্ম্মাবতারগণ সেকালের "কাজির বিচারের" নাম শুনিলেই নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন। ধর্ম্মাবতারদিগের বিশেষ অপরাধ নাই—জনশ্রুতির কল্যাণে "কাজির বিচার" নিতান্তই অশ্রদ্ধার কথা হইয়া উঠিয়াছে। লোকের বিশ্বাস, কাজি সাহেব আইনকানুনের ধার ধারিতেন না, বিদ্যাবুদ্ধিরও সংস্রব রাখিতেন না—যখন যাহা ইচ্ছা হইত, একটা খামখেয়ালি রকমের বিচার-মীমাংসা করিয়া বসিতেন, আর হতভাগ্য জনসাধারণকে তাহাই মাথা পাতিয়া সুবিচার বলিয়া গ্রহণ করিতে হইত ! ইহা অবশ্যই ভ্রান্ত বিশ্বাস, কিন্তু এখন আর সহজে ইহা দূর হইবার নহে।

"কাজির বিচারের" কলঙ্কভঞ্জন করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের লক্ষ্য নহে, তাহার একটি মোটামুটি ঐতিহাসিক চিত্র প্রদান করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। যাঁহারা সেকালের গোঁড়া, তাঁহারা ইহাতে স্বমতসমর্থনোপযোগী অনেক তথ্য লাভ করিবেন ; যাঁহারা একালের গোলাম, তাঁহারা ইহাতে সেকালের অনেক অপকীর্ত্তির সন্ধান প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু যাঁহারা সেকালের ও একালের সুখদুঃখ তুলনায় সমালোচনা করিয়া বিশেষ কোন পার্থক্য দেখিতে পান না, তাঁহারা "কাজির বিচারের" সহিত একালের সুবিচারের তুলনা করিবামাত্র, হয় ত বলিয়া উঠিবেন, এখানেও পার্থক্য বড় অধিক বলিয়া বোধ হইতেছে না !

মুসলমান-শাসনের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অর্থী ও প্রত্যর্থী উভয়েই মুসলমান, অথবা উভয়েই হিন্দু হইলে, "কাজির বিচারে" বড় একটা বিচারবিভ্রাট ঘটিতে পারিত না। কোন কোন ইংরাজ ইতিহাসলেখকও এ কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অর্থী-প্রত্যর্থীর মধ্যে এক পক্ষ মুসলমান হইলে কোন কোন স্থলে কিছু কিছু গোলযোগ ঘটিয়া উঠিত। কখন বা রাজবিধির কষ্টকল্পিত কদর্থ বাহির হইত, কখন বা রাজবিধি নির্দ্দয়রূপে পদবিদলিত হইত, এবং মোটের উপর কাজি সাহেবের অপরিসীম স্বজাতিবাৎসল্যের খাতিরে হিন্দুপক্ষকে ন্যায় বিচারের নামে কিয়ৎপরিমাণে অন্যায় অত্যাচার সহ্য করিতে হইত ! *

* The Hindoos were in many instances exposed to unfair and partial decisions, but more particularly where a Mussulman was con-

কাজির বিচারের ইহাই প্রধান কলঙ্ক। ইহার জন্য মুসলমানশাসনাধীন হিন্দুপ্রজাসাধারণ "কাজির বিচার" উপলক্ষ করিয়া কত কি কুৎসা রটনা করিয়া আসিয়াছেন। নিরপেক্ষ ইতিহাসের বিচারে ইহা অবশ্যই দুরপনেয় কলঙ্ক মধ্যে পরিগণিত হইবে; কিন্তু ইতিহাস বলিবে যে, এই শ্রেণীর কলঙ্ক একরূপ অপরিহার্য্য। ব্রাহ্মণানুশাসিত স্বাধীন ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণশূদ্রে কলহ উপস্থিত হইলে যাহা হইত, মুসলমানাধিষ্ঠিত হিন্দুস্থানে হিন্দুমুসলমানে বিবাদ বাধিলে যাহা হইয়াছে, ইংরাজাধিকৃত বৃটিশ ইণ্ডিয়ায় শ্বেতকৃষ্ণের দ্বন্দ্বে অধিকাংশ স্থলে যাহা হইয়া থাকে, তাহা এই ঐতিহাসিক সত্যের পুনরুক্তি-মাত্র। আজকাল সাময়িক পত্রে, সভামণ্ডপে বা পুস্তকবিশেষে "সিবিলিয়ানী বিচারের" যে সকল দৃষ্টান্ত প্রকটিত হইয়া থাকে, তাহাতে সাহস হয় যে, উত্তর কালে কাজি সাহেবকেই একাকী সমস্ত লোকাপবাদ গলাধঃকরণ করিতে হইবে না, আমাদের সিবিলিয়ান ভ্রাতৃগণও তাহার অংশ লইবার জন্য ছুরি কাঁটা চালাইতে পারিবেন!

হিন্দু, মুসলমান এবং খৃষ্টান, এই তিন ধর্ম্মের উপাসকগণ যথাক্রমে ভারত-বর্ষে আত্মশক্তি বিস্তার করিয়া আসিয়াছেন। হিন্দুর দিন চলিয়া গিয়াছে, মুসলমানের দিনও চলিয়া গিয়াছে, এখন সুসভ্য সুশিক্ষিত খৃষ্টানের আমল চলিতেছে। এই তিন আমলের বিচারপ্রণালীর তুলনায় সমালোচনা করিতে বসিলে, একটি কথা সর্ব্বাগ্রে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়,—ইতিহাসোক্ত এই তিন প্রধান ও পরাক্রান্ত জাতির দণ্ডবিধির মধ্যে ব্যক্তিভেদে শাস্তিভেদের ব্যবস্থা নাই কি? মুসলমান এবং খৃষ্টান উভয়েই গোখাদক, সুতরাং হিন্দুর নিকট অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছ বলিয়া ঘৃণার্হ। কিন্তু এই ঘৃণার্হ ম্লেচ্ছদিগের ব্যবস্থাশাস্ত্রে ব্যক্তিভেদে দণ্ডভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না। বিচারে অপরাধ প্রমাণীকৃত হইলে, হিন্দুর একরূপ শাস্তি, আর মুসলমানের অন্যরূপ, অথবা ইংরাজের একরূপ ও "নেটিভের" অন্যরূপ, মুসলমান বা ইংরাজদিগের ব্যবস্থাশাস্ত্রে এরূপ কোনও ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এ বিষয়ে হিন্দুব্যবস্থা-শাস্ত্রের নিয়ম কিছু স্বতন্ত্র। তাহাতে একই অপরাধের জন্য ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের পক্ষে বিভিন্ন দণ্ডের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। যে অপরাধে ব্রাহ্মণের কেবলমাত্র অর্থদণ্ড হইবার ব্যবস্থা আছে, সেই অপরাধে শূদ্রের প্রাণদণ্ড

cerned, in which case the Law of MAHAMMED was doubtless often misinterpreted, and wrested to the purposes of injustice.——Hamilton's HEDAYA, Preliminary Discourse, XIV.

পর্য্যন্তও হইতে পারে! কেহ কেহ হয় ত মনে করিবেন যে, ইহারই নাম যথার্থ "কাজির বিচার", অথবা ইহা হয় ত নিতান্তই রচা কথা! যাঁহারা কাজির বিচার অথবা সিবিলিয়ানী বিচার লইয়া সর্ব্বদাই হাস্যকৌতুকে বন্ধুজনকে পরিতুষ্ট করিয়া থাকেন, তাঁহারা মানবধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত অষ্টমাধ্যায়ের নিম্নলিখিত রাজবিধিগুলি পাঠ করুন :—

শতং ব্রাহ্মণমাক্রুশ্য ক্ষত্রিয়ো দণ্ডমর্হতি।
বৈশ্যোঽপ্যর্দ্ধশতং দ্বে বা শূদ্রস্তু বধমর্হতি॥
পঞ্চাশদ্‌ব্রাহ্মণো দণ্ড্যঃ ক্ষত্রিয়স্যাভিশংসনে।
বৈশ্যে স্যাদর্দ্ধপঞ্চাশচ্ছূদ্রে দ্বাদশকো দমঃ॥
সমবর্ণে দ্বিজাতীনাং দ্বাদশৈব ব্যতিক্রমে।
বাদেষ্ববচনীয়েষু তদেব দ্বিগুণং ভবেৎ॥
একজাতির্দ্বিজাতীংস্তু বাচা দারুণয়া ক্ষিপন্।
জিহ্বায়াঃ প্রাপ্নুয়াচ্ছেদং জঘন্যপ্রভবো হি সঃ॥
মনু। ২৬৭—২৭০।

শূদ্রো গুপ্তমগুপ্তং বা দ্বৈজাতং বর্ণমাবসন্।
অগুপ্তমঙ্গসর্ব্বস্বৈর্গুপ্তং সর্ব্বেণ হীয়তে॥
বৈশ্যঃ সর্ব্বস্বদণ্ডঃ স্যাৎ সংবৎসরনিরোধতঃ।
সহস্রং ক্ষত্রিয়ো দণ্ড্যো মৌণ্ড্যং মূত্রেণ চার্হতি॥
ব্রাহ্মণীং যদ্যগুপ্তাস্তু গচ্ছেতাং বৈশ্যপার্থিবৌ।
বৈশ্যং পঞ্চশতং কুর্য্যাৎ ক্ষত্রিয়ন্তু সহস্রিণং॥
উভাবপি তু তাবেব ব্রাহ্মণ্যা গুপ্তয়া সহ।
বিপ্লুতৌ শূদ্রবদ্দণ্ড্যৌ দগ্ধব্যৌ বা কটাগ্নিনা॥
সহস্রং ব্রাহ্মণো দণ্ড্যো গুপ্তাং বিপ্রাং বলাদ্‌ব্রজন্।
শতানি পঞ্চ দণ্ড্যঃ স্যাদিচ্ছন্ত্যা সহ সঙ্গতঃ॥
মৌণ্ড্যং প্রাণান্তিকো দণ্ডো ব্রাহ্মণস্য বিধীয়তে।
ইতরেষান্তু বর্ণানাং দণ্ডঃ প্রাণান্তিকো ভবেৎ॥
ন জাতু ব্রাহ্মণং হন্যাৎ সর্ব্বপাপেষ্বপি স্থিতং।
রাষ্ট্রাদেনং বহিঃকুর্য্যাৎ সমগ্রধনমক্ষতং॥
ন ব্রাহ্মণবধাদ্ভূয়ানধর্ম্মো বিদ্যতে ভুবি।
তস্মাদস্য বধং রাজা মনসাপি ন চিন্তয়েৎ॥
মনু। ৩৭৪—৩৮১।

মানবধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত এই সকল সনাতন ব্যবস্থাজ্ঞাপক শ্লোকাবলীর "অস্যার্থঃ" প্রদান করা নিষ্প্রয়োজন। কেবল এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, "কাজির বিচারে" বহুবিধ কলঙ্ক থাকিলেও এরূপ কোনও কলঙ্ক ছিল না; মুসলমান ব্যবস্থাশাস্ত্রের বিধানে হিন্দু মুসলমান বলিয়া কোন ইতরবিশেষ ছিল না, আইনের দোহাই দিয়া কেহ বিচারবিভ্রাট উপস্থিত করিতে পারিতেন না; কোন কোন স্থলে অসঙ্গত স্বজাতিবাৎসল্যের জন্য কোন কোন কাজিসাহেব ন্যায়ের নামে অন্যায় করিয়া বসিতেন, এইমাত্র!

সেকালেও আইনকানুনের অভাব ছিল না। পুরাকাল হইতে ধর্ম্মগ্রন্থ অবলম্বন করিয়া মুসলমান খলিফা ও মনীষিগণ যত কিছু রাজবিধি ও ব্যবস্থা-পত্র সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন, তাহা পুঞ্জীকৃত হইয়া কালক্রমে একটি পর্ব্বতাকার দপ্তরের সৃষ্টি হইয়াছিল। মুসলমানেরা ভারতবর্ষে আসিয়া তাহারই সাহায্যে বিচারকার্য্য সম্পাদন করিতেন। এক দেশের রাজবিধি অন্য দেশে ব্যবহার করিতে হইলে, এক যুগের রাজবিধির অন্য যুগে প্রয়োগ করিতে হইলে, এক সমাজের রাজবিধি অন্য সমাজে প্রচলিত করিতে হইলে, তাহা সর্ব্বথা সুসঙ্গত হয় না—কোন কোন স্থলে নিতান্তই হাস্যাস্পদ হইয়া উঠে। তজ্জন্য

"কাজির বিচার" কোন কোন স্থলে যথার্থই হাস্যাস্পদ বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু এইরূপ কারণে রাজবিধি কেন, কত সনাতন সামাজিক ব্যবস্থাও আজ কাল হাস্যাস্পদ হইয়া উঠিতেছে!

কাজির বিচার ভাল হউক আর মন্দ হউক, সকল বিষয়ে হিন্দুদিগের স্কন্ধে কাজির বিচার চাপাইয়া দেওয়া হইত না। সামাজিক ব্যাপারে, দায়-বিভাগ কার্য্যে, ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়ে, কেবল মুসলমানদিগকেই কাজির বিচারের অধীন হইতে হইত, হিন্দুদিগের পক্ষে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ইহা মুসলমান শাসনের উদারতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ জন্য মুসলমান বাদশাহেরা ইতিহাসে এখনও সমুচিত প্রশংসালাভ করেন নাই; বরং সচরাচর প্রচলিত ইতিহাস পড়িলে মনে হয় যে, "স্বত্ব ও অধিকার" * বলিয়া আজকাল যে ধুয়া উঠিয়াছে, ইহা সম্পূর্ণ নূতন কথা—এমন কথা এ দেশের লোকে ইতিপূর্ব্বে কখনও স্বপ্নেও জানিত কি না সন্দেহ। এ দেশের ইতিহাস লিখিত হইলে, সে ইতিহাস এই মতের সমর্থন করিতে পারিবে না।

কেবল ফৌজদারী বিচারে ও ক্রয়বিক্রয়াদিসংক্রান্ত কতকগুলি বিষয়ে হিন্দুদিগকে "কাজির বিচারের" অধীন হইতে হইয়াছিল। এই বিচারপ্রণালী কিরূপ ছিল, তাহা বুঝিতে হইলে কতকগুলি পুরাতন কথা অবগত হইতে হইবে।

ধর্ম্মশীল, সত্যবাদী, পূর্ণবয়স্ক, সুস্থমনা, স্বাধীনচেতা ব্যক্তি ভিন্ন "কাজির বিচারে" অন্য কাহারও সাক্ষ্য দিবার অধিকার ছিল না। মুসলমান ব্যবস্থা-শাস্ত্রপ্রয়োজক ঋষিগণ বলিতেন যে, যিনি সাক্ষী হইবার অযোগ্য, তিনি বিচারক হইবার যোগ্য নহেন। সুতরাং তাঁহাদের মতানুসারে সুস্থমনা, পূর্ণ-বয়স্ক, সত্যবাদী, স্বাধীনচেতা, ধর্ম্মশীল ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহ "কাজি" হইতে পারিতেন না। এই স্থলে সেকাল এবং একালের একটু তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখ। একালে বিচারক বা সাক্ষীর ধর্ম্মবিশ্বাস থাকা না থাকা কেহ অনুসন্ধান করিতে চাহে না। বিচারক নিয়োগ করিবার সময়ে তিনি কোন্ ধর্ম্মে আস্থাবান বা আদৌ কোন ধর্ম্মেই বিশ্বাস আছে কি না, সে কথা কেহ ভুলিয়াও জিজ্ঞাসা করে না। এইখানে কাজির বিচারের সহিত আধুনিক বিচারের একটা প্রধান পার্থক্য।

* Rights and Privileges.

আরও একটি প্রধান পার্থক্য আছে। বিচারনিয়োগসম্বন্ধে সেকাল ও একালের ব্যবস্থায় আকাশ পাতাল প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। একালে কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপনের ঢোল পিটিয়া দিয়া, ঝাঁকে ঝাঁকে উমেদার জড় করিয়া, লাখে লাখে সুপারিশের সুকতলা ঝাড়িয়া, অথবা কোন প্রকাশ্য পরীক্ষার প্রশ্নোত্তরপত্র পরীক্ষা করিয়া, বিচারক নিয়োগ করা হইয়া থাকে। এইরূপ নিয়োগ-প্রণালী অনুসরণ করিতে গিয়া উপরোধে কত ঢেঁকি গিলিতে হয়। প্রশ্নোত্তরপত্রে পরিতুষ্ট হইয়া কত দুশ্চরিত্র ব্যক্তিকেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিতে হয়, তাহা কাহারও অবিদিত নাই! সেকালের কাজি-নিয়োগ-ব্যাপার এরূপ ছিল না। যিনি পদপ্রার্থী নহেন, অথচ সর্ব্বথা লোকসমাজে চরিত্রবল, বংশমর্য্যাদা ও ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য সকলের বিশ্বাসভাজন, বাদশাহ বা নবাব এইরূপ লোককেই ডাকাইয়া আনিয়া সাধ্যসাধনা করিয়া কাজির আসনে বসাইয়া দিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। বাদশাহ বা নবাব ধর্ম্মভীরু হইলে, এইরূপ প্রণালীতে যথার্থ ধর্ম্মশীল ন্যায়বিচারকগণ ভিন্ন অন্য কেহ কাজি নিযুক্ত হইতে পারিতেন না। কারণ মুসলমানধর্ম্মসংস্থাপক মহানুভব মহম্মদের ব্যবস্থা এইরূপ যে, "যিনি কাজি হইবার জন্য লালায়িত, তাঁহাকে নিয়োগ করিও না; যিনি বাধ্য হইয়া উক্ত পদ গ্রহণ করিবেন, কেবল তাঁহা-কেই দেবদূতগণ বিচারকার্য্যে শুভবুদ্ধি প্রদান করিবেন।" *

যাঁহারা এইরূপে কাজি নির্ব্বাচিত হইতেন, তাঁহারা যে মুসলমান-সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তদ্বিষয়ে অনুমান ভিন্ন আর কোনরূপ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ বর্ত্তমান নাই। মুসলমান বাদশাহগণ স্বধর্ম্মনিরত বলিয়া ইতিহাসে বিখ্যাত; ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থাগুলি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করাই স্বধর্ম্মনিরত বলিয়া পরিচিত হইবার প্রধান প্রমাণ। মুসলমানেরা আত্মজীবনে ধর্ম্মশাস্ত্র-বিরোধী অন্যায় কার্য্য করিলেও প্রকাশ্য রাজকার্য্যে কখনও ধর্ম্মশাস্ত্র অবহেলা করিতে সাহস করিতেন না। সেই ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে, "রাজা প্রজাবর্গের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে বিচারক নির্ব্বাচন না করিলে সর্ব্বথা প্রত্যবায়ভাগী হইবেন।" † ইহা হইতেই মনে হয় যে, মুসলমান বাদশাহ বা

* Whosoever seeks the appointment of Kazee shall be left to himself; but to him who accepts it on compulsion, an angel shall descend and give directions.—The Koran.

† Whoever appoints a person to the discharge of any office, whilst there is another amongst his subjects more qualified for the same than

নবাবগণ সচরাচর এই ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত পুরাতন পদ্ধতি লঙ্ঘন করিতেন না, স্বরাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকেই কাজি মনোনীত করিতেন।

কাজি সাহেব কিন্তু একাকী বিচারকার্য্য সম্পন্ন করিবার অধিকারী ছিলেন না। কাজি সাহেব দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন বটে, কিন্তু সেই দণ্ড শাস্ত্রানুমোদিত কি না, তাহার ব্যবস্থাপ্রদানের জন্য তাঁহার একজন পার্ষদ থাকিতেন। ইঁহারই নাম "মুফ্‌তি"। কাজা শব্দ হইতে "কাজি", এবং ফতোয়া শব্দ হইতে "মুফ্‌তি" হইয়াছে। যিনি ব্যবস্থা প্রদান করেন, তাঁহার নাম "মুফ্‌তি", আর যিনি তাহার প্রয়োগ করেন, তাঁহার নাম "কাজি"; এইরূপ প্রণালীতে "কাজির বিচার" নিষ্পন্ন হইত; সুতরাং অধিকাংশ স্থলেই কাজির বিচার যে সর্ব্বথা শাস্ত্রসম্মতরূপে নিষ্পন্ন হইত, তাহাই বিশ্বাস হয়। সে বিচারের দোষগুণ কাজির নহে, মুসলমান ব্যবস্থাশাস্ত্রের।

কাজি সাহেবকে কি করিতে হইবে এবং কি করিতে হইবে না, তদ্বিষয়ে মুসলমানব্যবস্থাশাস্ত্রে একটি সুদীর্ঘ তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। প্রত্যেক বিধি ও প্রত্যেক নিষেধ-বাক্যের যুক্তি ও প্রমাণ উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন, মর্ম্মজ্ঞ পাঠক তালিকা হাতে পাইলেই বুঝিতে পারিবেন। তালিকাটি এইরূপ :—

১। কাজি সাহেব রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইবামাত্র কাজির দপ্তর জিম্মা লইবেন, এবং আমীন নিযুক্ত করিয়া পূর্ব্ব কাজির প্রদত্ত দপ্তর পরীক্ষা করাইবেন।

২। পূর্ব্ব কাজির আমলে যাহারা কারাদণ্ড ভোগ করিতেছে, তাহাদের প্রত্যেকের দণ্ডের কারণাদি অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন।

৩। কোন প্রকাশ্য মস্‌জিদে অথবা উন্মুক্ত স্থানে বসিয়া সর্ব্বসমক্ষে বিচার-কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। নিজ বাটীতে বসিয়াও বিচারকার্য্য চলিতে পারে, কিন্তু তাহার দ্বার অবারিত রাখিতে হইবে।

৪। আত্মীয় কুটুম্ব ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট হইতে কোন উপঢৌকন লইতে পারিবেন না। কলা মূলা শাকসবজিই হউক, আর ষোড়শোপচার-পূর্ণ "ডালিই" হউক, কাজির পক্ষে সর্ব্বপ্রকার উপঢৌকনই নিষিদ্ধ।

৫। কাজি সাহেব কাহারও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৬। নিজ অধিকার-মধ্যে যাহারা পীড়িত হইবে, তাহাদের তত্ত্ব লইতে

the person so appointed, does surely commit an injury with respect to the rights of God, the Prophet and the Mussulmans.——The Koran.

হইবে, এবং কেহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহার সমাধিস্থলে উপস্থিত থাকিতে হইবে।

৭। সাংসারিক আচারব্যবহারে কতকগুলি বিশেষ নিয়ম পালন করিতে হইবে; যথা,—অর্থী-প্রত্যর্থীর মধ্যে উভয় পক্ষ ভিন্ন এক পক্ষকে নিমন্ত্রণ করিতে পারিবেন না।

৮। বিচারাসনে উপবেশন করিয়া কতকগুলি বিশেষ নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে; যথা, উভয়পক্ষকে তুল্যরূপে প্রত্যভিবাদনাদি করিতে হইবে, কোন এক পক্ষের প্রতি সহাস্যমুখ হইতে পারিবেন না, সাক্ষীদিগকে উৎসাহ-সূচক বাক্য বা ভৎ'সনাদিজ্ঞাপক তিরস্কার প্রয়োগ করিতে পারিবেন না।

৯। বিচারকার্য্যে লিপ্ত থাকিবার সময়ে কতকগুলি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে; যথা,—ক্ষুধার্ত্ত বা তৃষ্ণার্ত্ত বা ক্রোধান্ধ অবস্থায় কদাচ কোন বিচার-মীমাংসা বা দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিতে পারিবেন না।

১০। বিচারকার্য্যে লিপ্ত হইবার পূর্ব্বে অল্পবয়স্ক কাজিদিগকে একটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে;—বিচারসময়ে কোনও যুবতী স্ত্রীলোক পক্ষ বা সাক্ষীরূপে উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, বিচারাসনে উপবেশন করিবার পূর্ব্বে, কাজি সাহেবকে আপন স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতে হইবে। *

এতগুলি বিধি এবং নিষেধবাক্য মানিয়া চলিতে পারিলে, "কাজির বিচারে"ও যে সুবিচার হইতে পারিত, সে কথা সহজেই ধরিয়া লইতে পারা যায়। কিন্তু কোন কোন কারণে এতগুলি বিধি-নিষেধ থাকিতেও কাজির বিচারে লোকে সন্তুষ্ট হইতে পারিত না। ইহার প্রধান কারণ এই যে, কাজির বিচারে যে ব্যবস্থাশাস্ত্র ব্যবহৃত হইত, তাহার বিধান বড়ই কঠোর ছিল। কখন কখন তাহাতে সত্যসত্যই শিহরিয়া উঠিতে হয়। একালের হিসাবে দেখিতে গেলে, কাজি সাহেবকে অনেক অযথা গঞ্জনা সহ্য করিতে হইবে; কিন্তু সেকালের হিসাবে ইহাতে বিশেষ দোষ দৃষ্ট হইত না।

অপরাধীর চরিত্র-সংশোধন করা অথবা পথভ্রষ্ট নষ্ট মানবসন্তানকে সৎ-পথে পুনরাবর্ত্তিত করিবার সহায়তা করা, সেকালের দণ্ডবিধির উদ্দেশ্য মধ্যে পরিগণিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। একালেও যে তাহা সর্ব্বত্র সম্যক্

* এই শেষোক্ত অনুশাসন-বাক্য মূলানুযায়ী অনুবাদিত হইল না, ইহাতে অবশ্যই অর্থগ্রহণ করিতে কাহারও অসুবিধা হইবে না।

প্রচলিত হইয়াছে, তাহাও দেখিতে পাওয়া যায় না। দণ্ডবিধান করিয়া "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল" বিতরণ করাই ধর্ম্মাধিকরণের প্রধান লক্ষ ছিল বলিয়া বোধ হয়। ইহার নাম "প্রতিহিংসা"। এই প্রতিহিংসার সাধনই যে সেকালের সকল দেশের রাজবিধির প্রধান লক্ষ্য ছিল, তাহার পরিচয় সকল দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। সেই জন্য অপরাধ-বিশেষে অপরাধীর নাক কাণ হাত পা কাটিয়া ফেলা হইত। কাজির বিচারেও ইহার অভাব ছিল না।

কেবল তিনটিমাত্র অপরাধের জন্য "কাজির বিচারে" প্রাণদণ্ড হইতে পারিত; যথা,—পরদারাভিগমন, স্বধর্ম্মত্যাগ, নরহত্যা। এতন্মধ্যে নরহত্যা অপরাধে অদ্যাপি প্রাণদণ্ড হইয়া থাকে; পরদারাভিগমনে অর্থদণ্ড বা কারাবাস, বা উভয় দণ্ড, এবং স্বধর্ম্মত্যাগে কোনও দণ্ডই প্রদত্ত হয় না। নরহত্যাপরাধে আমরা এখনও "কাজির বিচার" ছাড়াইয়া বিশেষ উন্নততর সোপানে আরোহণ করিতে পারি নাই; এবং এ বিষয়ে কখন কখন আমাদের বিচারও "কাজির বিচারের" মত উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে।

পরদারাভিগমনে "কাজির বিচারের" কিরূপ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তাহাই আলোচনা করিয়া অদ্য প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এই বিচার-প্রণালী অধ্যয়ন করিলে সহজেই কাজির বিচারের ভালমন্দ বিচার করিতে পারা যাইবে।

দুই কারণে কাজি সাহেব দণ্ডদান করিতে পারিতেন;—অপরাধী অপরাধ স্বীকার করিলে, অথবা তাহার অপরাধ বিশ্বাস্য সাক্ষীর বাক্যে প্রমাণীকৃত হইলে। এ বিষয়ে সেকাল এবং একালের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু একালে যাহাকে অপরাধ-স্বীকার করা বলা যায়, "কাজির বিচারে" তাহাকে অপরাধ-স্বীকার বলা হইত না।

কেহ পরদারাভিগমনাপরাধে অভিযুক্ত হইয়া কাজি সাহেবের নিকট আনীত হইয়া আত্মাপরাধ স্বীকার করিলে, কাজি সাহেব তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাকে বিদায় দিতেন; এবং বলিয়া দিতেন যে, আত্মাপরাধ স্বীকার করা স্বাভাবিক নহে, সুতরাং তিনি উহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন। অপরাধী ব্যক্তি যদি পুনঃপুনঃ ভিন্ন ভিন্ন দিবসে চারি বার ঐরূপ আত্মাপরাধ স্বীকার করিত, তবেই কাজি সাহেব তাহাকে অপরাধী বলিয়া গণ্য করিতেন।

পরদারাভিগমনের অভিযোগ উপস্থিত করা খুব সহজ, অভিযুক্ত ব্যক্তির

পক্ষে তাহা খণ্ডন করা দুরূহ ব্যাপার। সেই জন্য কাজির বিচারে নিতান্তপক্ষে চারি জন সাক্ষীকে অপরাধ প্রমাণ করিতে হইত। এইরূপে অপরাধ প্রমাণ করিতে পারিলে, কাজি সাহেব অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অপরাধী বলিয়া গণ্য করিতেন।

অপরাধী গণ্য করা পর্য্যন্তই কাজি সাহেবের কার্য্য। তাহার পর, "মুফ্‌তি" ব্যবস্থাশাস্ত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দণ্ডের কথা বলিয়া দিতেন, কাজি সাহেব তদনুসারে দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিয়া স্বয়ং দণ্ডবিধানের সময়ে উপস্থিত থাকিতেন। এখানেও সেকালের সহিত একালের অনেক পার্থক্য।

পরদারাভিগমনের অপরাধী বিবাহিত ব্যক্তি হইলে তাহার প্রাণদণ্ড, অবিবাহিত হইলে শত বেত্রাঘাত দণ্ড হইত। কাজি সাহেবকে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া দণ্ডবিধান করিতে হইত। দণ্ডবিধানের প্রণালীও স্বতন্ত্র ছিল। যাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইত, তাহাকে নগরোপকণ্ঠে বিস্তৃত প্রান্তরে আনয়নপূর্ব্বক হস্তপদ দৃঢ়বদ্ধ করিয়া সর্ব্বসমক্ষে দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ করাইতে হইত। তৎপরে তাহাকে লোষ্ট্রনিক্ষেপে নিহত করিতে হইত। এই হত্যাপ্রণালীও অদ্ভুত ছিল। সর্ব্বপ্রথমে সাক্ষিগণকে একে একে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে হইত; তাহারা অস্বীকার করিলে বা বধ্যভূমিতে উপস্থিত না হইলে, অপরাধী তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ করিত। সাক্ষিগণ লোষ্ট্রনিক্ষেপ করিতে সম্মত হইয়া সাক্ষীর বাক্যের সত্যতাসম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ প্রদান করিলে, কাজি সাহেবকে স্বয়ং লোষ্ট্রনিক্ষেপ করিত হইত; তিনি অস্বীকার করিলেও অপরাধী মুক্তিলাভ করিত। কাজি সাহেব স্বীকার করিয়া স্বয়ং লোষ্ট্রনিক্ষেপ করিলে, উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া লোষ্ট্রনিক্ষেপে বধকার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য আদেশ করা হইত। তাহারা অসম্মত হইলে, হয় কাজি সাহেবকে স্বহস্তে দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিতে হইত, না হয়, অপরাধীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইত।

আমরা "কাজির বিচারের" সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর দণ্ডাজ্ঞা ও দণ্ডবিধানের বিবরণ প্রদান করিলাম। ইহা কঠোর—অতি কঠোর—বর্ব্বরোচিত ব্যবস্থা, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ব্যবস্থার মধ্যেই এমন কতকগুলি কৌশল রহিয়াছে, যাহাতে "কাজির বিচারে" কাহাকেও অবিচারে প্রাণ হারাইতে হইত না! সে কালের জনসাধারণ পরদারাভিগমনে প্রাণদণ্ড প্রদান করা আবশ্যক বলিয়া বুঝিয়া রাখিয়াছিল; সুতরাং জনসাধারণের সম্মতি

ও সহায়তা না লইয়া কাহাকেও উক্ত দণ্ড প্রদান করা হইত না। একালে অনেক সুবিচারের সূত্রপাত হইয়াছে। কিন্তু জনসাধারণের সম্মতি লওয়া দূরে থাকুক, জনসাধারণের হাহাকার উপেক্ষা করিয়া রাজবিধি নির্ম্মমহৃদয়ে কত কঠোর দণ্ডাজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করিতেছে! সুতরাং সেকালের ও একালের তুলনায় সমালোচনা করিতে বসিলে, প্রকৃত "কাজির বিচার" কোন্‌টি, তাহার মীমাংসা করা কঠিন হইয়া উঠে।

আঁখি-নীরে।

না শুনিয়া কোন কথা,
না বুঝিয়া কোন ব্যথা,
তবু প্রাণ চায়।
অতিথির মত এসে
চ'লে যাওয়া ভালবেসে
আপনার জীবন-সন্ধ্যায়!
থাকি দূরে আঁখি-নীরে
সে জীবন যায়।

স্নেহেতে হৃদয় বাঁধে,
পরাণ বিনায়ে কাঁদে
ক্ষত-স্মৃতি ল'য়ে বুকে
তীব্র আকাঙ্ক্ষায়;
প্রতি কাজে, প্রতিপদে
ডুবিয়া নিরাশা-হ্রদে
সে জীবন যায়।

দু' দিনের পরে আর
কিছুই থাকে না তার,
শুধু স্মৃতি হৃদয়ে জাগায়;
সেই কথা, সেই ব্যথা,
মুহূর্ত্তের আকুলতা,
সেই মুখ নীরব নিশায়;
সংসারের সুখে দুখে
প্রতি পায় পায়।
থাকি দূরে আঁখি-নীরে
সে জীবন যায়।

শ্রীচুনীলাল গুপ্ত।

ধূমকেতু।

হেলির ধূমকেতু।—এই ধূমকেতুর নাম হইলেই সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ জ্যোতির্ব্বিদ্‌ হেলি স্বতঃই স্মৃতিক্ষেত্রে উদিত হন। ইনি গণিতরত্ন প্রিন্‌সিপিয়া নামক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া দেখিলেন যে, ধূমকেতুগণের বৃত্তাভাস কক্ষে পরিভ্রমণ সম্ভাব্য; এই দেখিয়া তিনি বহুসংখ্যক কৃতবেধ ও পত্রারূঢ় ধূমকেতুর কক্ষাদির মূলোপকরণ সকল পরীক্ষণে ব্যাপৃত হইলেন। তাঁহার পরীক্ষার ফল যে কেতুকক্ষার উপকরণ সকল, তাহা ১৭০৫ অব্দে প্রকটিত হইয়াছিল। কেতু-কক্ষার মধ্যে কোন্‌টার সহিত কোন্‌টার মিল আছে, কোন্‌টার সহিত কোন্‌টার গরমিল, এইরূপ তুলনা করিতে করিতে তিনি দেখিলেন যে, ১৬৮২তে তিনি এবং অন্যান্য জ্যোতিষীরা যে ধূমকেতুর পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহার কক্ষা এবং ১৬০৭ ও ১৫৩১এর ধূমকেতুর কক্ষা প্রায়ই অভিন্ন। ইহাতে তাঁহার অনুমান হইল যে, এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন কেতু নহে, একই কেতু ৭৫, ৭৬ বৎসর অন্তর ভূলোক সম্বন্ধে উদিত হয়, এবং তিনি সমাদেশ করিলেন যে, এই ধূমকেতু আবার ১৭৫৮ কি ৫৯ অব্দে পুনরাগমন করিবে। পরন্তু তিনি উক্ত ধূমকেতুর গতিতে বিক্ষোভের বিশিষ্ট কারণ দেখিয়া, আদিষ্ট সময়ে উহার পুনরুদয়ের সবিশেষ ব্যাঘাতের আশঙ্কা করিলেন। এই ধূমকেতু অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে বার্হস্পত্যমণ্ডলের সন্নিকৃষ্ট হয়, এবং এই মহাবল সুরগুরু দ্বারা অত্যন্ত উদ্বেজিত হয়, অর্থাৎ বৃহস্পতির আকর্ষণপ্রযুক্ত কেতুর বেগ বৃদ্ধি হয়, সুতরাং ভগণ-কাল কথঞ্চিৎ ন্যূন হইয়া পড়ে। অতএব ১৭৫৮ অব্দের অন্তে, বা ১৭৫৯ অব্দের আদিতেই, ধূমকেতুর পুনরাগমনের প্রতীক্ষা করা যাইতে পারে।

হেলির ধূমকেতুর আদিষ্ট পুনরাগমন।—এই আদেশ জ্যোতিষ-ইতিহাসে একটি চিরস্মরণীয় ঘটনা। গ্রহণ বা সদৃশ ব্যাপারসকল ঠিক গণিত কালে ঘটে, তাহা অতি প্রাচীনকালাবধি লোকে দেখিয়া আসিতেছে, তাহার আর চমৎকারিত্ব নাই। কিন্তু এই অজ্ঞাত লক্ষণ, অজ্ঞাত গতিবিধি, কিম্ভূত-কিমাকার অপশকুনের পুনরাগমন শুনিয়া সকলেই বিস্ময়ান্বিত হইলেন। তাঁহার এই আদেশটি যে কত গুরুতর, তাহা হেলি নিজে বেশ বুঝিয়াছিলেন। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, এই ধূমকেতুর পূর্ণ ভগণ হইবার অনেক পূর্ব্বেই তাঁহাকে

মানবলীলা সম্বরণ করিতে হইবে, এবং তজ্জন্যই এই হৃদিস্পৃশ্ বাক্যটি বলিয়া গিয়াছেন—"অস্মদাদির আদেশ অনুসারে ধূমকেতু যদি ১৭৫৮অব্দে পুনরাগমন করে, তবে অপক্ষপাতী উত্তরপুরুষগণ অবশ্যই অস্বীকার করিবেন না যে, বিষয়টি এক জন ইংরাজের আবিষ্কৃতি।"

ধূমকেতুর পুনরাগমনের কাল যত আসন্ন হইতে লাগিল, জ্যোতির্ব্বিদেরাও তত তদ্দর্শনোপযোগী আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। গণকপ্রধান ক্লেয়ার্ট নবাবিষ্কৃত উৎকৃষ্টতর রীত্যনুসারে ধূমকেতুর প্রতি গ্রহগণের বিক্ষোভক-বলের ফলগণনায় নিযুক্ত হইলেন। অভিপ্রায় এই যে, তদ্দ্বারা কেতুকক্ষা যথাযথরূপে গণিত হইবে, এবং পরিহৈলিকে উপনীত হইবার কালও ঠিক পাওয়া যাইবে। অনন্তর ক্লেয়ার্ট স্থির করিলেন যে, ১৭৫৯ অব্দের ১৩ই এপ্রেলে ধূমকেতু অনুহৈলিকে আসিবে; কিন্তু তিনি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার গণিতে কতিপয় স্বল্পরাশি পরিত্যক্ত হওয়াতে গণিত কিঞ্চিৎ স্থূল হইয়াছে, অতএব গণিত কালের মাসেকের ভুল থাকিতে পারে। ক্লেয়ার্টের বিঘোষিত কালের ঠিক এক মাস পূর্ব্বে ১২ই মার্চ তারিখে ধূমকেতু অনুহৈলিকে উপনীত হইল। লাপ্লাস দেখাইয়াছেন যে, এক্ষণে শনির সামগ্রী-পরিমাণ যত ধরা যায়, হেলি যদি তত ধরিতেন, তাহা হইলে সমাদেশে কেবল ১৩ দিনের ভুল থাকিত।

উক্ত ধূমকেতুর পুনরাগমনের কাল ১৮৩৫এর পূর্ব্বে অনেক জ্যোতির্ব্বিদ উহার কক্ষার গণিত করিয়াছিলেন; এবং যাঁহাদিগের গণিত অতি সূক্ষ্ম হইয়াছিল, তাঁহারা ১৮৩৫ অব্দের ১৪ই নবেম্বর পুনরুদয়ের দিন স্থির করিয়াছিলেন; কেতু কিন্তু ঠিক ১৬ই তারিখে অনুহৈলিক অতিক্রম করিয়াছিল।

এখান হইতে সূর্য্য যত দূর, সূর্য্য হইতে এই ধূমকেতু তার ১৮ গুণ অন্তর; অর্থাৎ সূর্য্য হইতে বরুণের যে হারাহারি দূরত্ব, তাহার অপেক্ষা কিছু কম। কিন্তু ইহার কক্ষার উৎকেন্দ্রত্ব প্রযুক্ত যখন অপহৈলিকে থাকে, তখন ইন্দ্র অপেক্ষা অন্তর অধিক হয়। ১৯১০ অব্দে ২৪শে মে তারিখে হেলির পুনরাগমন হইবে। এবার ভভ্রমকাল ২৭৯৩৭ দিন না হইয়া ২৭২১৭ বা ৭৪ বৎসর ৬ মাস হইবে। ১৮৭৩ অব্দে ইহা হিমতিমিরাবগুণ্ঠিত অপহৈলিকে উপনীত হইয়া সমুজ্জল সূক্ষ্ম রবি-পৃথ্বী-প্রদেশ অভিমুখে পুনরাগমন করিতেছে। দীর্ঘকালের পর ইহার পুনঃসমাগমে জ্যোতির্ব্বিদগণ পরমানন্দ লাভ করিবেন।

হেলির ধূমকেতুর শারীরিক লক্ষণ।—এই ধূমকেতু ১৮৩৫অব্দে যখন আবার উদিত হইল, তখন উহার বাহ্য লক্ষণ সকল এত শীঘ্র শীঘ্র এবং এত অধিক

পরিমাণে পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল যে, ব্যাপার দেখিয়া সকলে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। অনুহৈলিক অতিক্রম করিবার এক মাস পূর্ব্ব হইতে পুচ্ছবিরচন ব্যাপার আরম্ভ হইল। উহার সূর্য্যাভিমুখ অঙ্গ হইতে নীহারবৎ পদার্থ বিনির্গত হইতে লাগিল। এই উদ্গত পদার্থনিচয় অন্ধকার গৃহে স্থিত তীক্ষ্ণাগ্র তার হইতে বিনির্গত বৈদ্যুতিক আলোক-তুলিকা-সদৃশ। এই পদার্থ সকল শিরোদেশ হইতে বিনির্গত হইয়া, কিঞ্চিৎ সূর্য্যাভিমুখে সরিবামাত্র যেন সৌর-তেজঃ দ্বারা ব্যাহত হইয়া বহুদূর চলিয়া গেল, এবং গর্ভপশ্চাৎ পুচ্ছ বিরচিত হইতে লাগিল। পদার্থ-উদ্গম সবিরামে হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে উদ্গত পদার্থনিচয় সূর্য্যের দিকে দ্বিতীয় পুচ্ছের আকার ধারণ করিতে লাগিল। কোন বার দুইটি, কোন বার তিনটি নীহারবৎ ধারা বাহির হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন দিকে চলিয়া গেল। বিদ্রুত পদার্থের ক্রমাগত দিক্ ও উজ্জ্বলতার পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল, এবং কখনও বা খঞ্জনপুচ্ছাকারে প্রতিভাত হইতে লাগিল। পদার্থ-ধারা বিনির্গমনকালে নাভিসমীপে যদিও সমধিক উজ্জ্বল, তথাপি বিস্তৃত হইয়া গর্ভাবরণে পরিণত হইবার সময় অতি শীঘ্র মলিনীভূত হইল।

দেখা গেল, যেন পুচ্ছটি শুদ্ধ মস্তক হইতে বিনিষ্ক্রান্ত এবং সৌরতেজঃ দ্বারা ব্যাহত পদার্থনিচয়ে বিরচিত হইতে লাগিল। সূর্য্য হইতে অতিপ্রচণ্ড-বেগে পদার্থধারা বিদ্রুত হইতে লাগিল—বেগ ২৪ ঘণ্টায় ২০ লক্ষ মাইল। নাভির আকর্ষণশক্তির স্বল্পতাপ্রযুক্ত শিরোভাগ হইতে অপ্রাকৃত পদার্থ-সংঘাতের অধিকাংশ ইতস্ততঃ বিকীর্ণ, অপচিত এবং শূন্যসাগরে নষ্টীভূত হয়, কেতুর সহিত আর কস্মিন্ কালেও সমাগত হয় না। অতএব ইহা অনুমান-সিদ্ধ যে, ধূমকেতু যতবার সূর্য্যসান্নিধ্য প্রাপ্ত হয়, ততবার উহার পুচ্ছোপকরণের অপচিতি ঘটে, সুতরাং উত্তরোত্তর এই উপাঙ্গ খর্ব্বীভূত হয়। এই কেতুর ভিন্ন ভিন্ন কালে অনুহৈলিকে আগমনের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা দৃষ্টে নিষ্পন্ন হইয়াছে যে, ১৩০৫ হইতে কেতু ক্রমশঃ ছোট হইতেছে। কিন্তু ১৭৫৯এর পর ১৮৩৫এর উদয়ে, ইহার খর্ব্বতার বিশেষ লক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই। অতএব ইহাই অবধার্য্য যে, যদি এই কেতুর বাস্তব ক্ষয় হইতেছে, তবে সে ক্ষয় অতি অল্পে অল্পে হইতেছে।

এঙ্কের ধূমকেতু।

১৮১১ অব্দে মহোত্মমী জ্যোতির্ব্বিদ পন্‌স মারসেই নগরে একটি ধূমকেতু প্রকাশ করেন। কেতুটি দৌরবীক্ষণিক, দেখিতে যেন হাজার হাজার নীহারি-

কার মধ্যে একটি মিটমিটে জ্যোতিষ্ক—নীহারিকার গতি শত শত বৎসরেও টের পাওয়া যায় না, ধূমকেতুর গতি বেশ বুঝা যায়। ইহার অবস্থান পন্‌স এবং অপরেও স্থির করিলেন। বার্লিননগরনিবাসী জ্যোতিষাধ্যাপক শ্রীমৎ এঙ্ক ১৮১৯ অব্দে এই কেতুর সাময়িকত্ব আবিষ্কার করেন। ধূমকেতুর চিত্রাদি দেখিয়া তাহার অনন্যতাস্থাপনের সম্ভাবনা নাই; কারণ ইহা একবার এক বেশে উদিত হয়, অপর বার অপর বেশে আবির্ভূত হয়; আকার পরিবর্ত্তনশীল—আকার দেখিয়া চিনিবার যো নাই। কক্ষা কেবল অপরিবর্ত্তিত থাকে, শারীরিক অনবস্থিতির সহিত কক্ষার কোন সম্বন্ধ নাই। কেতুকক্ষার আকার ও অবস্থান, সৌরজগতের অন্যান্য জ্যোতিষ্কের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে, এবং এঙ্কের ধূমকেতু এই মতের একটি উত্তম উদাহরণের স্থল। নিম্ন পরিলেখ্যে

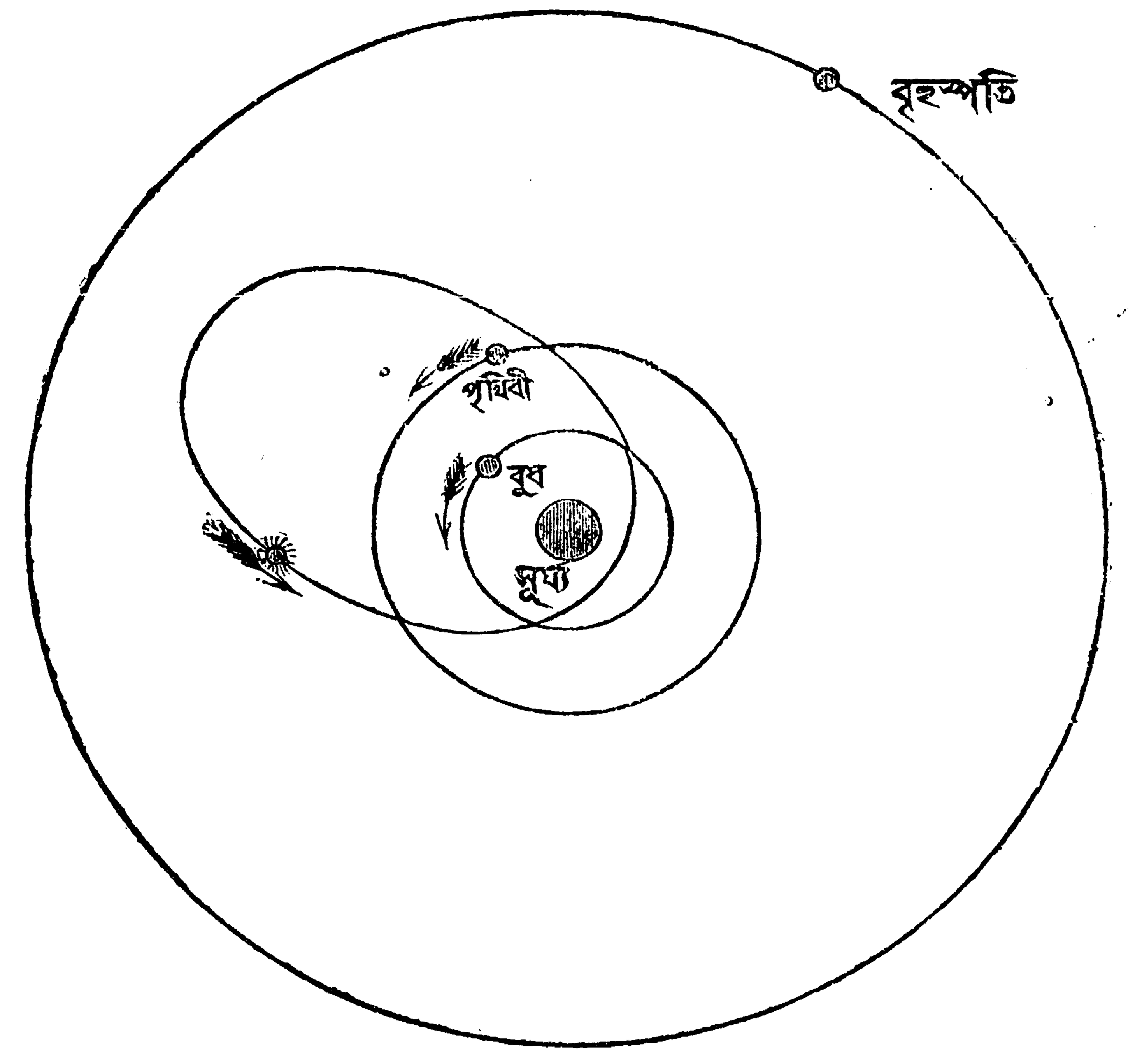

তিনটি গ্রহকক্ষা দেখা যাইতেছে; সকলের ছোটটি বুধকক্ষা, তাহার চেয়ে বড়টি ভূকক্ষা এবং সকলের বড়টি বৃহস্পতিকক্ষা। এই তিন কক্ষা ব্যতীত চতুর্থ যে বৃত্তাভাস দেখা যাইতেছে, সেটি ভূকক্ষার ক্ষেত্রগত এই ধূমকেতুর কক্ষা। কক্ষার অন্যতর অধিশ্রয়ণে সূর্য্য। সূর্য্যাকর্ষণের বশবর্ত্তী হইয়া ধূমকেতু

এই কক্ষায় সাবযাবয তিন বৎসরে এক পূর্ণ ভভ্রম করে। পরিহৈলিকে সূর্য্যের খুব সমাসন্ন হয়, এবং বুধকক্ষার অন্তর্গত স্থান দিয়া যায়, এবং অপহৈলিকে সুদূরস্থিত বার্হস্পত্যকক্ষার সন্নিকৃষ্ট হয়। এই কক্ষার বৃত্তাভাসত্বের কারণ প্রধানতঃ সৌরাকর্ষণ। ধূমকেতুর আয়তন বা গুরুত্বের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। ধূমকেতু এক সের হউক বা এক মন বা কোটি মণ হউক, আর এক মাইল হউক বা সহস্র মাইল হউক, কক্ষা অপরিবর্ত্তিত থাকিবে। এই কক্ষার আকার, পরিমাণ ও অবস্থান দ্বারা ধূমকেতুর তদাত্মের প্রমাণ হয়।

একবার যদি জানা যায় যে, ইনি সৌরপরিবারভুক্ত, ইনি কাশ্যপেয়, তাহা হইলে এঙ্কনামা ধূমকেতুর নিকট হইতে সৌরজগতের অনেক খবর পাওয়া যায়। ইনি ভ্রমণ করিতে করিতে একবার রবিমণ্ডলের সন্নিহিত বুধকক্ষার আসন্ন হন, আবার একবার বৃহস্পতির কক্ষা-সমীপে উপস্থিত হন; ফের ঘুরিতে ঘুরিতে যখন দূরবীক্ষণের আয়ত্তাধীন হন, তখন স্বীয় ভ্রমণের অনেক পরিচয় দিতে থাকেন। মাধ্যাকর্ষণের পারতন্ত্র্য প্রযুক্ত জ্যোতিষ্কবিষয়ক ব্যাপারাবলি সমাহিত হইবার রীতি, এবংবিধ গতাগতির পর্য্যালোচনা করিলে, প্রগাঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম হয়।

৩২। বুধের ওজন।—সৌর জগতের সমস্ত জ্যোতিষ্ক অপনীত হইলেও এঙ্কের ধূমকেতু অভিন্নবৃত্তাভাসে সমভাবে প্রধাবিত হইতে থাকিবে। এক্ষণে প্রকৃতপ্রস্তাবে উক্ত কেতুকক্ষার সমতা আলোচ্য বিষয় নহে; পরন্তু বুধাদি গ্রহ কর্ত্তৃক উক্ত কক্ষে বিষমতার প্রবেশই বক্তব্য। এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে ধূমকেতু অনুহৈলিকে উপনীত হইলে বুধকক্ষার সামীপ্য লাভ করে, তখন বুধ প্রায়ই স্বীয় কক্ষার তদংশে না থাকিয়া দূর প্রদেশে পরিভ্রমণ করেন; সুতরাং তৎকালে বুধ কর্ত্তৃক কেতুকক্ষা যৎসামান্য বিক্ষোভিত হয়। কিন্তু বুধ আর ধূমকেতু মধ্যে মধ্যে পরস্পরের খুব নিকটস্থ হয়। ১৮৪৮ অব্দের ২২ নম্বরে ধূমকেতু বুধের এত সন্নিকট হইয়াছিল যে, তাহাদের ব্যবধানে ৩০ লক্ষ মাইলের অধিক হয় নাই। এরূপ অবস্থায় বুধপিণ্ড স্বল্প হইলেও, তদীয় গুরুত্বপ্রযুক্ত, কেতু নির্দ্দিষ্ট কক্ষা হইতে বিচলিত হয়, এবং বেগেরও পরিবর্ত্তন ঘটে। পরে ধূমকেতু বুধ হইতে যত অপসৃত হইতে থাকে, বুধের বিক্ষোভক বলও তত কমিতে থাকে; এবং অচিরে উক্ত বলজনিত ফলের লক্ষণ আর অনুভূত হয় না। কিন্তু বুধের আক-

র্ষণ প্রযুক্ত কেতুকক্ষায় যে বিকৃতি ঘটিল, তাহা আর কোন কালে অপনীত হইবে না। শুদ্ধ সৌরাকর্ষণজনিত ধূমকেতু-কক্ষা যে আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা হইতে এখন এই বিক্ষুব্ধ কক্ষা ভিন্ন হইয়া পড়িল। কেবল সাবিত্রী-শক্তিপ্রভাবে এই কক্ষা যে পরিমাণে যে আকার ধারণ করে, তাহা গণিতায়ত্ত, এবং এই কক্ষায় বুধের আকর্ষণজনিত যে বিষমতা ঘটে, বুধের সামগ্রী-পরিমাণ অর্থাৎ ওজন পাওয়া গেলে তাহারও গণিত করা যাইতে পারে।

বুধ একটি ক্ষুদ্র গ্রহ বটে, কিন্তু ইনি সহজে গণকের আয়ত্তাধীন হন না। লে বেরিয়া লিখিয়াছেন—

"Nulleplanete n'a demandè aux astronomers plus de soins et de peines que Mercure, et ne leur a donne en recompense taut d'inquietudes, taut cantrarietes."

স্বীয় কক্ষার সূর্য্যসান্নিধ্যপ্রযুক্ত বুধ সতত দৃষ্টিগোচর হন না; ইহার কক্ষা অত্যন্ত উৎকেন্দ্র, এবং কক্ষায় অপরাপর গ্রহের আকর্ষণ জন্য কি পরিমাণে বিক্ষোভ জন্মে, তাহাও অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত হয় নাই, অধিকন্তু ইহাকে তুলাযন্ত্রের শিক্যস্থ করিবার প্রয়াসে বহুবিধ ব্যাঘাত পড়ে। পৃথিবীকে ওজন করা যায়, রবিচন্দ্র এবং গ্রহগণকেও ওজন করা যায়, কিন্তু বুধকে ত্যরাজুতে আনিতে গেলেই বিপদ। যাহা হউক, শ্রীমৎ লেবিরিয়া বুধের গুরুত্ব-নিরূপণার্থ উপায় আবিষ্কারে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, পৃথিবী বুধ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হন এবং রবির অবস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এই আকর্ষণের পরিমাণও উপলব্ধ হয়। এইরূপে বহুবিধ বেধায়ত ফল পরীক্ষা করিয়া উক্ত জ্যোতির্ভূষণ বুধের গুরুত্ব স্থূলমানে পৃথিবীর গুরুত্বের কিঞ্চিদধিক এক আনা ধরিয়াছেন।

লে বেবিয়ার গণিত সন্দেহ হওয়ায় বন আস্তেন এ বিষয়ের পুনরালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং দেখিলেন যে, লে বেরিয়া-দর্শিত বুধের সামগ্রী গ্রহণ করিয়া গণিত করিলে এঙ্কের ধূমকেতু দৃক্‌সিদ্ধ হয় না। ইনি বুধ সামগ্রী কিছু কম ধরিয়া হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, গণিত-বুধ দৃষ্ট-বুধের অনেকটা আসন্ন হন। তৃতীয়বার বুধ-সামগ্রী ভূসামগ্রী পঁচিশ ভাগের এক ভাগ ধরিয়া গণিত করায় বুধের দৃগ্‌গনিতৈক হইল।

এ ওজনে যদি সংশয় থাকে, যদি মনে কর যে, কাঁটার দোষ আছে, তবে বৃহস্পতির কক্ষায় চল, এঙ্কের ধূমকেতু মধ্যে মধ্যে বার্হস্পত্য কক্ষার

নিকটস্থ হয়; এরূপ স্থলে ধূমকেতু এই প্রবল গ্রহ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়, এবং ধূমকেতুর কক্ষা সবিশেষরূপে বিকৃত হইয়া পড়ে। এখন দেখা যাউক, ব্যাপারটি কিরূপ দাঁড়াইল। কেতুকক্ষা বুধের আকর্ষণে বিক্ষুব্ধ হইতেছে এবং বৃহস্পতির আকর্ষণেও বিক্ষুব্ধ হইতেছে, আবার এই উভয় আকর্ষণ গ্রহরাজের আকর্ষণের তুলনায় কিছুই নহে, তবেই গণিত বড় জটিল ও গহন হইয়া পড়িল। কিন্তু জ্যোতিষীর গণিত-কৌশলের এবম্ভূত অপূর্ব্ব শক্তি যে, এই ত্রিবিধ আকর্ষণের ফল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র করিয়া দেখাইতে পারেন। তবেই বুধের ওজনে যে সন্দেহ আছে, তাহার নিরাসের জন্য একটা উপায় পাওয়া যাইতেছে। বৃহস্পতির চন্দ্রচতুষ্টয় দ্বারা তদীয় সামগ্রীর পরিমিতি সিদ্ধ হয় এবং দেখা যায় যে, পাল্লার এক দিকে সূর্য্যকে দিলে, অপর দিকে ১০৪৮ বৃহস্পতি দিতে হয়, তবে কাঁটা ঠিক দাঁড়ায়। এঙ্কের কক্ষাগণিতকে দৃক্-সিদ্ধ করিতে হইলে সূর্য্যতে বৃহস্পতির ১০৫০ গুণ সামগ্রী ধরিতে হয়; সুতরাং ১০৪৮ আর আর ১০৫০ কার্য্যতঃ প্রায় একই হইল। মীমাংসা এই হইল যে, বুধকে পৃথিবী অপেক্ষা ২৫ গুণে হালকা আর বৃহস্পতিকে সূর্য্য অপেক্ষা ১০৫০ গুণে হালকা ধরিয়া, এঙ্কের ধূমকেতুর কক্ষার গণিত করিলে, দৃগ্‌গণিতৈক্য হয়—কোন গণ্ডগোল থাকে না।

সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব।—এঙ্কের ধূমকেতুর পর্য্যটন পাঠ করিলে সৌর জগতের অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। এই ধূমকেতু বিশ বার যাতায়াত করিতেছে; এক বারের গতির সহিত অপর বারের গতির সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে, গণিতের উপকরণীভূত বিষয়সমূহের যথাযথ পরিমাণ ধরিতে হয়। নানাবিধ গ্রহধর্ম্মপ্রযুক্ত এঙ্কের ধূমকেতুর গ্রহবৈগুণ্য জন্মে, সর্ব্বংসহা পৃথিবীও উহাকে উৎপীড়িত করিতে কসুর করেন না। সূর্য্য হইতে পৃথিবীর যে দূরত্ব, তাহা এই ধূমকেতুর আবনীকী দুর্গতির এক বিশিষ্ট কারণ; সুতরাং পৃথিবীর ঠিক দূরত্ব না ধরিতে পারিলে, কেতুকক্ষার গণিতে ভুল হয়; অতএব এই পর্য্যটক-মুখে শুনিতে পাইবে যে, বসুমতী সূর্য্য হইতে কত দূরে আছেন। তাৎপর্য্য এই হইল যে, এঙ্কের ধূমকেতুর গণিত করিলে পৃথিবীর দূরত্ব কত দূর শুদ্ধ, তাহার পরীক্ষা হয়।

প্রতিঘাতী মধ্যক।—এতক্ষণ সন্দেহনিরাসের অভিপ্রায়ে পর্য্যটক এঙ্ককে বুধের সামগ্রী, বৃহস্পতির সামগ্রী ইত্যাদি ন্যূনাধিক বিদিত বিষয়ের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করা যাইতেছিল, এক্ষণে তাঁহা হইতে একটি অপূর্ব্বজ্ঞাত বিষয়ের

জ্ঞানলাভ হইবে। এঙ্ক ১২১০ দিন অন্তর এক এক বার ঘুরিয়া সূর্য্য-সন্নিধানে উপনীত হয়; কিন্তু প্রতিবার ঠিক ১২১০ দিনের পর আসে না। এখনই বলা হইল যে, গতির বিষমতার বিশিষ্ট কারণ বুধ ও বৃহস্পতির আকর্ষণ এবং পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগণ কর্ত্তৃক যে বিক্ষোভ জন্মে, তাহাও ধরিতে হয়। এখন এই নানাবিধ বিক্ষোভের কারণ ধরিয়া হিসাব করিলে কি এঙ্ককক্ষে বিশ্বব্যাপী মহাকর্ষণ অত্রুটিত-ভাবে বিরাজিত দেখিব? এঙ্ক কি গণিতাচার্য্যের হুকুম অনুসারে চলিবে? না—এঙ্ক কেবল মহাকর্ষণের পরতন্ত্র হইয়া অব্যাহতরূপে পরিভ্রমণ করিতেছে না, এঙ্ক গণিতাচার্য্যের হুকুম মানিতেছে না। ভগণকাল বারংবার সমভাবে কমিতেছে—এক ভভ্রমকাল পূর্ব্বাপেক্ষা ২½ ঘণ্টা কম।

এঙ্কের প্রকাশিত নিম্নলিখিত পত্র দেখিলে এই ধূমকেতুর ভগণকালের পরিবর্ত্তন উত্তমরূপ বুঝা যাইবে।

বৎসর	ভগণকাল	বৎসর	ভগণকাল	বৎসর	ভগণকাল
১৭৮৯	১২১২,৭৯	১৮১৫	১২১২,৮৯	১৮৩৮	১২১১,১১
১৭৯২	১২১২,৬৭	১৮১৯	১২১১,৭৮	১৮৪২	১২১০,৯৮
১৭৯৫	১২১২,৫৫	১৮২২	১২১১,৬৬	১৮৪৫	১২১০,৮৮
১৭৯৯	১২১২,৪৪	১৮২৫	১২১১,৫৫	১৮৪৮	১২১০,৭৭
১৮০২	১২১২,৩৩	১৮২৯	১২১১,৪৪	১৮৫২	১২১০,৬৫
১৮০৫	১২১২,২২	১৮৩২	১২১১,৩২	১৮৫৫	১২১০,৫৫
১৮০৯	১২১২,১০	১৮৩৫	১২১১,২২	১৮৫৮	১২৩০,৪৪

এক ভগণের কালের তুলনায় ২½ ঘণ্টা অকিঞ্চিৎকর, সন্দেহ নাই। কিন্তু নভোমণ্ডলের যে প্রদেশে উপনীত হইলে আমাদের নয়নগোচর হয়, সে প্রদেশে ইহার গতি এত বেগবতী যে, ২½ ঘণ্টায় অনেক দূর চলিয়া যায়। এ বিষমতা অগ্রাহ্য করা যায় না; কারণ এক আধ বার নহে, উপর্য্যুপরি সমভাবে দেখা যাইতেছে। কেহ কেহ মনে করেন, গ্রহগণের আকর্ষণের ফলবিশেষ বুঝিতে না পারায়, হয় ত তাহা হিসাবে ধরা হয় নাই, সেই জন্যই এই তফাৎটুকু হইতেছে।

বন আষ্টেন ১৮৭৫ পর্য্যন্ত বেধগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমালোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, অন্তরীক্ষে প্রতিঘাতী মধ্যকের অস্তিত্বপ্রযুক্ত এই বিষমতা ঘটে। যখন বলা হয় যে, জ্যোতিষ্কগণ আকর্ষণের বশবর্ত্তী হইয়া রবিপরিত বৃত্তাভাস-পথে পরিভ্রমণ করে, তখন স্বীকার করা হয় যে, জ্যোতিষ্কগণের গতি অপ্রতিহত, শূন্যমার্গে সংঘর্ষণ বায়ু বা গতিবিরোধী কোন ব্যাপার

নাই। কিন্তু এ মত যদি অসত্য হয়, অন্তরীক্ষে যদি এমন কোন সূক্ষ্ম পদার্থ থাকে, যদ্দ্বারা ধূমকেতু আহত হয়,—যেমন বন্দুকের গতিবিরোধী বায়ু—তবে কি হয়? যদিও আকাশের অধিকাংশ বস্তুতঃই সম্পূর্ণরূপে শূন্য হয়, এবং অসার ছায়াবৎ ধূমকেতু ভ্রমণকালে কোনরূপ প্রতিঘাত অনুভব না করিতে পারে, তথাপি সৌরমণ্ডলসমীপে এমন কোনরূপ মধ্যক থাকিতে পারে, যদ্দ্বারা এরূপ লঘিষ্ঠ প্রেতবৎ পদার্থের অস্তিত্ব কেবল এঙ্কের গতিতে যে ব্যক্ত হইতেছে, এমত নহে; বসন্তে পশ্চিম আকাশে অপবৃত্তীয় আলোক নাম্নী যে অস্পষ্টা শোভা (বরাহমিহিরের দিগ্‌দাহ?) নয়নগোচর হয় এবং পূর্ণসূর্য্যগ্রহণকালে নিরালোক চন্দ্রমণ্ডলপরিতঃ যে আলোকচ্ছটা দেখা যায়, এই উভয়বিধ ব্যাপার সম্পূর্ণ মধ্যক-বিহীন আকাশে ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

বিএলার ধূমকেতু।

১৮২৭ অব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারি তারিখে অষ্ট্রিয়া রাজ্যের বিএলা নামক জনৈক সেনাপতি এই ধূমকেতু আবিষ্কার করেন; দশ দিন পরে মারসেই নগরে জ্যোতিষী গামবার্ট ইহার বেধ করিয়া গণিতারম্ভ করেন। ইনি ইহার কক্ষোপকরণ পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, ১৭৭২ ও ১৮০৫ অব্দের যে ধূমকেতু উদিত হইয়াছিল, সে এই-ই। যে কারণে পনসের আবিষ্কৃত ধূমকেতু হাল্লীর নামে বিখ্যাত হইল, সেই কারণে ইহাকে ত গামবর্ট বলা উচিত। ইহার ভগণকাল সাড়ে ছয় বৎসর। ১৮৩২ অব্দে ইহা পুনরাগমন করিবে, এই আদেশ শুনিয়া জনসমাজ সভয় হৃদয়ে ইহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। আদিষ্ট কালে ধূমকেতু ৫ কোটি মাইল অন্তরে থাকিয়া ভূকক্ষার ক্ষেত্র অতিক্রম করিল। এই সমাগমে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা থাকিলে, তাহা কেতুপক্ষে সম্ভাব্য—পৃথ্বীপক্ষে নহে; কারণ এতদ্দ্বারা উহার কক্ষা অত্যন্ত বিকৃত হইয়াছিল। ১৮৩৯ অব্দের জুলাই মাসে যখন এই ধূমকেতু আবার আসিয়াছিল, তখন ইহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিবার বড় সুবিধা ছিল না—একে সূর্য্যসন্নিকর্ষ, তাতে আবার আষাঢ়ে দিন। ফের গণিত স্থানে, গণিত কালে ১৮৪৫ সালে ২৫শে নবেম্বর দিবসে বিএলার ধূমকেতু দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইল; আচার্য্যেরা সতৃষ্ণ ও সযন্ত্র নয়নে আদরপূর্ব্বক উহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। বেধের কোন ব্যাঘাত নাই, পর্য্যবেক্ষণ সুচারুরূপে চলিতে লাগিল, এমন সময়ে, ১৮৪৬ অব্দের ১৩ই জানুয়ারী তারিখে, অকস্মাৎ

বিএলার ধূমকেতু দ্বিখণ্ড হইয়া পড়িল।—এই অচিন্তিতপূর্ব্ব চমৎকারী

ব্যাপারের কারণ কি হইল? ইহার হৃৎপিণ্ডে কি রোগ হইল? কেন এ বিদারণ? এই ব্যোমচরে এ অদ্ভুত উপপ্লব কোথা হইতে আসিল? জানি না। এক কেতু যুগলরূপে পাশাপাশি হইয়া শূন্যসাগরে ভাসমান হইল। এক ধূমকেতু দুইটি পূর্ণাবয়বসম্পন্ন ধূমকেতু হইল,—দুই শীর্ষ, দুই ভর্গ, দুই গর্ভাবরণ, দুই পুচ্ছ; ১০ই ফেব্রুয়ারীতে দুইয়ের ব্যবধান ১,৪৯,০০০ মাইল। ধূমকেতু-যুগল পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়া অচিরে অকূল শ্যামসাগরে নিমজ্জিত হইল।

পুনঃ ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে ভূলোকের দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইল। এবার বিচ্ছেদ বড় বেশী বেশী, ৫০০,০০০ মাইল অন্তর; ১৮৪৬ অব্দে উভয়ের মধ্যে একটা প্রণয়পট্টিকাবৎ দৃষ্ট হইত, এবার সেটা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। জ্যোতির্ব্বিদেরা যমজ ধূমধ্বজের এই বিপর্য্যস্ত দশা সচকিত নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, '৪৬সে এক বিগ্রহের দ্বিশরীরপ্রাপ্তি এই বাসনব্যাপার ইহার ভাবী বিনাশের পূর্ব্ব লক্ষণ হইল; কেতুদ্বয় আর নাই,—লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৮৫২তে অনেক অন্বেষণেও ইহাকে কোথাও পাওয়া গেল না। ইহার বৃত্তাভাস-কক্ষ ধরিয়া গণিত করিয়া দেখা গিয়াছিল যে, ইহা ১৮৫৯, ১৮৬৬, ১৮৭২, ১৮৭৭, এবং ১৮৮৫ অব্দে আমাদের দৃষ্টিগোচর হইবে; কিন্তু ১৮৫৯ গেল ১৮৬৬ গেল, একে একে ঐ সকল নির্দ্দেশিত বৎসর চলিয়া গেল, কেতু দৃষ্টিগোচর হইল না; জ্যোতিষী দুরবীক্ষণ লইয়া কেতুমার্গ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেতু আর নয়নগোচর হইল না। কোথা হইতে হইবে? কেতু নাই—কেতু লয় পাইয়াছে।

ফের ধূমকেতু।

১৮৪৩ অব্দে পারি বেধালয়ের জ্যোতির্ব্বিদ ম, ফে একটি নূতন ধূমকেতু দেখেন। তিনি স্থির করিলেন যে, কেতুর কক্ষা বৃত্তাভাস, এবং ভগণকাল ৭½ বৎসর। লে বেরিয়া অতি যত্নসহকারে ইহার কক্ষার গণিত করিলেন এবং আদেশ করিলেন যে, ১৮৫১ অব্দে ৩রা এপ্রেল তারিখে ইহার পুনরাগমন হইবে। ধূমকেতুটি প্রথমতঃ ১৮৫০ অব্দে ২৮শে নবেম্বরে লে বেরিয়ার আদিষ্ট স্থানের কাছাকাছি দেখা গিয়াছিল, এবং আদিষ্ট কালের ২০।২২ ঘণ্টার মধ্যে পরিহৈলিকে উপনীত হইল। ফের কেতুর পরিহৈলিকে সূর্য্য হইতে ১৬ কোটি মাইল অন্তর এবং অপহৈলিকে অন্তর ৫৬ কোটি মাইলের অধিক হইবে। ইহার কক্ষার উৎকেন্দ্রত্ব গ্রহকক্ষার ন্যায়, ০০০৫৫ মাত্র।

ফের ধূমকেতু দ্বারা প্রতিঘাতী মধ্যকের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়

না। এই ধূমকেতুর প্রথম উদয়কালে ৬ মাস পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ চলিয়াছিল, সুতরাং জ্যোতিষিগণ কক্ষাগণনায় অলব্ধপূর্ব্ব সূক্ষ্মতা লাভ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় উদয়ে ৩ মাস পাওয়া গিয়াছিল এবং তৃতীয় উদয়ে মাসাধিক। এই সমস্ত পর্য্যবেক্ষণের ফল এই দাঁড়াইল যে, কক্ষাটি সুব্যক্ত বৃত্তাভাস। কেতুর গতি যে আকাশবৎ কোন সূক্ষ্ম পদার্থ দ্বারা ব্যাহতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার লক্ষণ কিছুই দৃষ্ট হইল না। ১৮৬৫ অব্দে চতুর্থ উদয়েও অবস্থান দৃগ্‌গণিতৈক্য হইল। অতএব সিদ্ধ হইল যে, এ কেতুর গতি আকাশবৎ মধ্যক দ্বারা প্রতিহত হয় না।

এ কাল পর্য্যন্ত যত দূর দেখা গেল, তাহাতে বোধ হয় যে, এঙ্কের ধূমকেতুর গণিত করিতে হইলে, প্রতিঘাতী মধ্যকের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। অধ্যাপক এঙ্কের মত এই যে, শুক্রকক্ষার অতীত আকাশে এরূপ ব্যাহতি অনুভূত হয় না; এবং মধ্যকের সান্দ্রত্ব সূর্য্য হইতে দূরত্বের বর্গের বিলোমানুপাতী। কেতুকক্ষার উপরে প্রতিঘাতী মধ্যক যে বলপ্রকাশ করে, তাহা অনেকের আশার অননুরূপ। এরূপ মধ্যক দ্বারা স্পর্শরৈখিক বেগের হ্রাস হয়, অর্থাৎ কেন্দ্রবিমুখী শক্তির অপচয় ঘটে; তজ্জন্য ধূমকেতু সূর্য্যসমীপে আকৃষ্ট হয়, সুতরাং কক্ষা খর্ব্বীভূত হইয়া পড়ে। কিন্তু কক্ষা যখন ছোট হয়, তখন অনন্যসম্বন্ধ বেগ বাড়ে। অতএব সিদ্ধান্ত এই হইল যে, প্রতিঘাতী মধ্যকে সমাগত হইলে, কি গ্রহের কি ধূমকেতুর অনন্যসম্বন্ধ বেগের আধিক্য হয়।

ব্রোর্সেনের ধূমকেতু।

১৮৪৬ অব্দে দেনমার্কের সর ব্রোর্সেন কর্ত্তৃক একটি দৌরবীক্ষণিক ধূমকেতু আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এটি রবিপরিতঃ ৫½ বৎসরে পরিভ্রমণ করে। পরিহৈলিকে ইহার দ্বিতীয় আগমনের কাল ১৮৫১ অব্দের সেপ্টেম্বর বলিয়া আদিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু এই সময়ে কেতুর অবস্থান বেধপক্ষে নিতান্ত অননুকূল থাকায় দেখিতে পাওয়া যায় নাই—তাহার পরের বারে ১৮৫৭ অব্দে পরিহৈলিকে দৃষ্ট হইয়াছিল। ১৮৫৭ অব্দের ১৮ই মার্চ তারিখে বার্লিন নগরে প্রকট হয়, এবং ঐ মাসের ২৯শে তারিখে অনুহৈলিকে পৌঁছে। পরিহৈলিকে ইহার সূর্য্য হইতে দূরত্ব ছয় কোটি ২০ লক্ষ মাইল, অর্থাৎ শুক্রের দূরত্বের কম; অপহৈলিক দূরত্ব ৫৩ কোটি ৮০ লক্ষ মাইল, অর্থাৎ বৃহস্পতির দূরত্ব অপেক্ষা অধিক। ইহার ভগণকাল ২০৩১ দিন। ক্রান্তিবৃত্তের ক্ষেত্রে ইহার কক্ষা অঙ্কিত করিলে, বিএলার কক্ষার অভ্যন্তরে পড়িবে।

পর্য্যবেক্ষণ-পক্ষে প্রতিকূল অবস্থান প্রযুক্ত ব্রোর্সেনের ধূমকেতু ১৮৬২ অব্দে দৃষ্টিগোচর হয় নাই; কিন্তু ১৮৬৪ অব্দে পরিহৈলিকে গণিতাগত অবস্থানের ১০এর মধ্যে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল।

ড’আর্‌রেস্তের ধূমকেতু।

লিপজিক নগরের ড’আররেস্তাব ১৮৫১ অব্দে একটি যন্ত্রদ্রষ্টব্য অনুজ্জ্বল ধূমকেতু আবিষ্কার করেন। ইহার গণিতাগত কক্ষা বৃত্তাভাস এবং ভগণকাল ৬০৪ বৎসর। তদনুসারে আদেশ হইয়াছিল যে, ১৮৫৭ অব্দের ৩০ নবেম্বর তারিখে ইহার সূর্য্যসমীপে আসন্ন পুনরাগমন হইবে। ইহার যাম্যক্রান্তির আধিক্যপ্রযুক্ত অর্থাৎ বিযুবন্মণ্ডল হইয়া, অনেক দূর দক্ষিণে থাকায়, উত্তর ভূগোল হইতে ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না; পরন্তু উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে ১৮৫৭ অব্দের ডিসেম্বর মাসে ইহা দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল; এবং জানুয়ারির মাঝামাঝি পর্য্যন্ত বেধকার্য্য চলিয়াছিল। ২৮ নবেম্বরে ইহা পরিহৈলিক অতিক্রম করিয়া ১৮৫১র আদিষ্ট পথে ঠিক চলিতে লাগিল। ইহার পরিহৈলিক অন্তর এগার কোটি দশ লক্ষ মাইল এবং অপহৈলিক অন্তর চুয়ান্ন কোটি ষাট লক্ষ মাইল।

উইলেকের ও তত্তেলের ধূমকেতু।

১৮১৯অব্দে মারসেইস নগরে ম. পনস কর্ত্তৃক একটি ধূমধ্বজ আবিষ্কৃত হয়, এবং উহা ৩৮ দিন পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষিত হইয়াছিল। এঙ্ক ইহার কক্ষা ও ভগণকালের গণিত করিয়াছিলেন। কক্ষা—বৃত্তাভাস, ভগণকাল—৫.৬ বৎসর। ইহা ৩৯ বৎসর পর্য্যন্ত অদৃষ্ট থাকিয়া বনন্ নগরে ডর উইন্‌নেক দ্বারা পুনরাবিষ্কৃত হইয়াছিল। তখন ১৮১৯এর পর উহার সাত ভগণ হইয়াছিল এবং প্রতিভ্রমে গড়ে ৫.৫৪ বৎসর পড়িয়াছিল। সূর্য্য হইতে ইহার পরিহৈলিক দূরত্ব সাত কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল এবং অপহৈলিক দূরত্ব বাহান্ন কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল। অবস্থানের অসুবিধাবশতঃ ইহাকে ১৮৬৩ অব্দে দেখা যায় নাই, কিন্তু ১৮৬৯এর গ্রীষ্মকালে পুনর্দৃষ্ট হইয়াছিল। এবারও ঠিক আদিষ্ট কক্ষায় ঘূরিয়াছিল।

১৮৫৮ অব্দে আমেরিকার কেম্ব্রিজ নগরে মর তুত্তেল কর্ত্তৃক একটি ক্ষুদ্র ধূমকেতু আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহার কক্ষা বৃত্তাভাস। ১৭৯০ অব্দে যে ধূমধ্বজ পর্য্যবেক্ষিত হইয়াছিল, তাহার কক্ষোপকরণে এবং ইহার কক্ষোপকরণে সবিশেষ ভেদ দৃষ্ট হয় নাই, এবং আদেশ হইয়াছিল যে, ১৮৭১ অব্দের

৩০শে নবেম্বর তারিখে ইহার পুনরুদয় হইবে। ১৮৭১ অব্দের প্রায় ঠিক আদিষ্ট স্থানে ধূমধ্বজ আবির্ভূত হইল, এবং ইহার সাময়িকত্বের আর সংশয় রহিল না। ইহার অনুহৈলিক দূরত্ব পৃথিবীর দূরত্ব অপেক্ষা কিঞ্চিদধিক, এবং অপহৈলিক দূরত্ব শনির দূরত্ব অপেক্ষা অধিক। ভগণকাল ১৩.৬৪ বৎসর।

১৭৪৪এর ধূমকেতু।

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দের ধূমকেতুর মধ্যে ১৭৪৪এর ধূমকেতু সর্ব্বাপেক্ষা শোভন ও ভাস্বর। ইহার পরিহৈলিক দূরত্ব পৃথিবীর দূরত্বের পঞ্চমাংশমাত্র, অথবা বুধের দূরত্বের কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ। পরিহৈলিক অতিক্রমের তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে ইহার দীপ্তি বৃহস্পতির পরমদীপ্তির সমান হইয়াছিল, এবং পরিহৈলিক উত্তীর্ণ হইবার এক পক্ষ পূর্ব্বে ইহার আলোক শুক্রালোক সদৃশ হইয়াছিল। পরিহৈলিক অতিক্রমের দিবসে মধ্যাহ্নে ইহা দুরবীক্ষণ সাহায্যে নয়নগোচর হইয়াছিল, এবং সূর্য্যোদয়ের পরও কতক্ষণ লোক সুধু চক্ষে দেখিতে পাইয়াছিল।

ইহার ধ্বজা প্রায় দুই কোটি মাইল লম্বা। পরিহৈলিক অতিক্রম করিবার দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে পুচ্ছটি দুই শাখায় বিভক্ত বলিয়া বোধ হইয়াছিল। একটি ৭° অপরটি ২৪° লম্বা। যে দিন পরিহৈলিকে আসিবে, তাহার পূর্ব্ব দিন পুচ্ছটি চাপাকার ধারণ করিল—দেখিতে যেন অর্দ্ধক্ষেপণী হইয়া উঠিল। তাহার পর সপ্তাহকাল মেঘাচ্ছন্ন থাকাতে আর বেধকার্য্য চলিল না। কিন্তু পরিহৈলিক পার হইবার ছয় দিন পরে সূর্য্যোদয়ের দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে যখন ধূমকেতুর শিরঃপ্রদেশ ক্ষিতিজের অনেক নীচে গেল, তখন পুচ্ছটি ক্ষিতিজের ঊর্দ্ধে পাখার মত বিস্তৃত হইয়া রহিল। এই অংশটি ছয় পুচ্ছে বিভক্ত দেখাইতে লাগিল। মস্তক হইতে ৩০°। ৪৪° পর্য্যন্ত বিস্তার।

১৭৭০এর ধূমকেতু।

এই ধূমকেতু পৃথিবী ও বৃহস্পতির অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল; এবং তন্নিবন্ধন উহার কক্ষার বিলক্ষণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। ইহার কক্ষা বৃত্তাভাস ও ভ্রমকাল ৫½ বৎসর। গণিত-সহায়ে অতীত কালে ইহা যে কক্ষায় গমন করিয়াছিল, তাহা বিলিখিত করিলে দেখা যায় যে, ১৭৬৭ প্রারম্ভে ইহা বৃহস্পতির অত্যন্ত সন্নিকৃষ্ট ছিল। তৎকালে এই ধূমধ্বজ ও বৃহস্পতির যে ব্যবধান, তাহা সূর্য্য হইতে ধূমকেতুর ব্যবধানের ১/৫৮ মাত্র। এ অবস্থায় সৌরাকর্ষণ অপেক্ষা বার্হস্পত্যাকর্ষণের ফল অবশ্যই তিন গুণ অধিক হইয়াছিল।

কক্ষার এই অংশে বৃহস্পতি ও ধূমকেতু প্রায় এক দিকে চলিতেছিল; এবং কতিপয় মাস পর্য্যন্ত ধূমকেতু বৃহস্পতি কর্ত্তৃক অত্যন্ত উদ্বেজিত হইয়াছিল। এই উদ্বেজনা প্রযুক্ত ১৭৭০ অব্দে ধূমকেতুর কক্ষা অত্যন্ত হ্রস্বীভূত হইয়াছিল। ইতঃপূর্ব্বে ইহার কক্ষা এত বিশাল ছিল যে, এক ভ্রমে ৪৮ বৎসর লাগিত। তখন উহার পরিহৈলিক অন্তর ত্রিশ কোটি মাইল, সুতরাং তখন উহাকে পৃথিবী হইতে দেখা যাইত না।

১৭৭০ হইতে এ কেতুকে আর দেখিতে পাওয়া যায় নাই। পৃথিবী হইতে অত্যন্ত দূরত্ব প্রযুক্ত ১৭৭৬ অব্দে ইহাকে পর্য্যবেক্ষণ করা অসম্ভব হইয়াছিল; এবং আর এক ভ্রমণ পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই বৃহস্পতিসমীপে উপস্থিত হইয়াছিল। ১৭৭৯র আগষ্ট মাসে ইহার বৃহস্পতি হইতে দূরত্ব সূর্য্য হইতে দূরত্বের $\frac{১}{৪৯৬}$ মাত্র হইয়াছিল; এই অবস্থানে বৃহস্পতির আকর্ষণ সূর্য্যের আকর্ষণ অপেক্ষা ২৩০ গুণে অধিক হইয়াছিল। কারণ,

এই আকর্ষণ জন্য কক্ষা এরূপ হইয়া গেল যে, ভ্রমকাল ১৬ বৎসর হইয়া পড়িল; এবং ইহার পরিহৈলিক অন্তর পুনঃ ত্রিশ কোটি মাইল হইল। এইরূপে এই ধূমকেতু ১৭৭০এর পূর্ব্বে এবং ১৭৭০এর পরে অস্মদাদির দৃষ্টির অবিষয়ীভূত হইয়াছিল। এই ধূমকেতুর ১৭৭০এর কক্ষা ভূকক্ষা ও গুরুকক্ষা সম্বন্ধে তাহার অবস্থান পরিলেখে দ্রষ্টব্য।

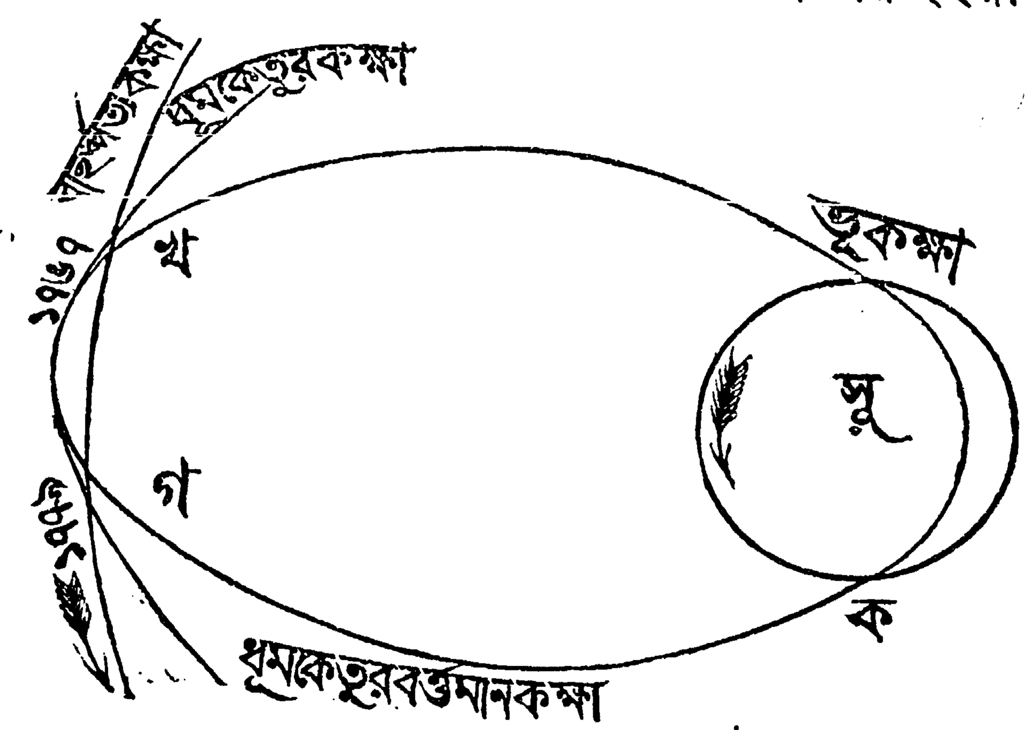

এই ধূমকেতুর সামগ্রী।—যত ধূমকেতুর বিষয় পত্রারূঢ় হইয়াছে, তন্মধ্যে এই ধূমকেতুর তুল্য কোন ধূমকেতু পৃথিবীর এত নিকটস্থ হয় নাই। একবার ১৪ লক্ষ মাইলের মধ্যে আসিয়াছিল। এই অবস্থানে উহার নীহারময় গর্ত্তাবরণের সম্মুখস্থ কোণ ২° ২৩′ পরিমিত হইয়াছিল, অর্থাৎ চন্দ্রবিম্বের প্রায় ৫ গুণ হইয়াছিল। লাপ্লাস গণনা করিয়াছিলেন যে, যদি এই ধূমকেতুর সামগ্রী পৃথিবীর সামগ্রীর সমান হইত, তবে ইহা দ্বারা ভূকক্ষা এত পরিমাণে বর্দ্ধিত হইত যে, বর্ষপরিমাণ ২ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট অধিক হইত। কিন্তু বেধ দ্বারা সপ্রমাণ

হইয়াছে যে, বর্ষপরিমাণ দুই সেকেণ্ডও হয় নাই; অতএব অনেকে অনুমান করেন যে, এই কেতুর সামগ্রী পার্থিব সামগ্রীর ৫০০০ অংশের একাংশ হয় কি না।

এই কেতুর সামগ্রী উক্ত, পরিমাণ অপেক্ষা কম হইয়া থাকিবে। কারণ, বৃহস্পতির চতুর্থ চন্দ্রের বৃহস্পতি হইতে যে অন্তর, তাহা অপেক্ষা এই ধূমকেতু বৃহস্পতির নিকটে আসিয়াছিল, তথাপি বার্হস্পত্য চন্দ্রগণের কিছুমাত্র বিক্ষোভ জন্মে নাই।

১৮৪৩এর বৃহৎ ধূমকেতু।

খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দের অত্যন্ত উজ্জ্বল ধূমকেতুগণের মধ্যে ১৮৪৩এর ধূমকেতুর পরিগণনা হইয়া থাকে। এটি ভূমণ্ডলের অনেক স্থলে ২৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে মধ্যাহ্নে রবি-সন্নিধানে লক্ষিত হইয়াছিল; এবং অচিরে প্রদোষ-আলোকে বিশেষ দর্শনীয় পদার্থ বলিয়া উহার প্রতি অনেকের দৃষ্টিপাত হইত। ইহার দৃশ্যমান পুচ্ছ ৫০° হইতে ৭০° পর্য্যন্ত এবং বাস্তব পুচ্ছ ন্যূনাধিক ১২ কোটি মাইল লম্বা হইয়াছিল। পরিহৈলিকে ধূমকেতু রবিবিম্বের এত সন্নিকৃষ্ট হইয়াছিল যে, উভয়ের ব্যবধান দৃষ্টিগোচর হয় নাই, এবং গণিতজ্ঞেরা স্থির করিয়াছিলেন যে, তৎকালে ধূমকেতু লোহিত লৌহাপেক্ষা দুই সহস্র গুণে উত্তপ্ত হইয়াছিল। পরিহৈলিক অতিক্রম করিবার কতিপয় দিন পর্য্যন্ত পুচ্ছের স্পষ্ট অগ্নিবৎ প্রভা প্রতীয়মান হইয়াছিল। অত্যন্ত সৌরতাপে নিপতনই ইহার পুচ্ছের এবম্ভূত অসাধারণ আকৃতির কারণ;—যেমন ভয়ানক লম্বা, তেমনই বিরচন-ব্যাপারের বিস্ময়কর ক্ষিপ্রতা!

এই ধূমকেতুর কক্ষা পটোলাকার সুদীর্ঘ বৃত্তাভাস। ১৬৬৮ ও ১৬৮৯এর ধূমকেতুর সহিত ইহার একতা স্থাপনের প্রয়াস করা হইয়াছিল। কিন্তু যত্নসিদ্ধ সূক্ষ্ম গণিত দ্বারা অবগতি হয় যে, ইহারে ভগণ কাল ১৭০ বৎসর।

দোনাতির ১৮৫৪এর ধূমকেতু।

১৮৫৮ অব্দে জুন মাসে ফ্লরেনস নগরে দোনাতির দ্বারা এই ধূমকেতু আবিষ্কৃত হয়। ইহা দুই মাস পর্য্যন্ত অযন্ত্রসহায় নেত্রপক্ষে মলিন পদার্থ-বিশেষবৎ অপ্রত্যক্ষ রহিল। অনন্তর অগষ্টের শেষ কালে পুচ্ছের লক্ষণ লক্ষিত হইতে লাগিল। ২৯ সেপ্টেম্বরে পরিহৈলিক পার হইল। পুচ্ছটি ১০ই অক্টোবর পৃথিবীর পরম সন্নিকর্ষে উপনীত হইল। পুচ্ছটি ১০ই অক্টোবর পর্য্যন্ত ক্রমাগত পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল; এবং পুচ্ছ যখন ৫ কোটী মাইল দৈর্ঘ্য

প্রাপ্ত হইল, তখন উহার সম্মুখস্থ কোন ৬০° হইল। কেতুগর্ভ যেমন বিশাল, তেমনই তেজঃপুঞ্জময়। অক্টোবরের পর আর ইহা ইউরোপে দৃষ্ট হয় নাই। দক্ষিণ গোলে ১৮৫৯ এর মার্চ পর্য্যন্ত দেখা যাইত। এই কেতু বৃত্তাভাসে ভ্রমণ করে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ভ্রমণকাল ১৬০০ বৎসর—২১০০ বৎসরও অসম্ভব নহে। ৯ম প্রকরণে কোষের ব্যাখ্যা এবং পরিমাণের পরিবর্ত্তন-সম্বন্ধে যাহা উল্লেখ করা গিয়াছে তদ্বৎ পরিবর্ত্তন এই কেতুর ঘটিয়াছিল, এবং তজ্জন্যই ইহা এত স্মরণার্হ হইয়াছে।

ধূমকেতু কি পৃথিবীকে সমাঘাত করিতে পারে?—অসীম অন্তরীক্ষে গ্রহগণ যত দুর পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিতেছেন, তত দুর পর্য্যন্ত সকল দিকেই অসংখ্য ধুমকেতু বিচরণ করিতেছে; অতএব সম্পূর্ণ সম্ভব যে, কালক্রমে একদিন পৃথিবীর সহিত ধুমকেতুর সংঘর্ষণ হইতে পারে।

অনেক ধূমকেতুর গর্ভ সসার বলিয়া বোধ হয়। উল্কাপাত অধ্যায়ে অবগতি হইবে যে, সসার পদার্থ পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইয়াছে, মনুষ্যাদি জীব নিহত করিয়াছে, এবং ভবনাদি লোকালয় দগ্ধ করিয়াছে। সত্য বটে যে, সংগৃহীত ব্যোমাশ্ম সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড—ওজনে কয়েক সের মাত্র। এ কেবল বড়র সহিত ছোটর সম্বন্ধ, ইহা তত্ত্ববিরোধী নহে। বহু-মাইল-ব্যাস-বিশিষ্ট অনেক ব্যোমাশ্ম পৃথিবী ছুঁইয়া গিয়াছে।

১৮১১ অব্দের	ধূমকেতুর গর্ভ	৪২৮	মাইল
১৮৪৩ „	„	৪৯৭০	„
১৮৫৮ „	„	৫৫৮০	„
১৭৬৯ „	„	২৭০০০	„

গর্ভ উপকরণের বাস্তবিক প্রকৃতি যাহাই হউক না কেন, পৃথিবী ও ধূমকেতু যদি ঘণ্টায় ৬০ হাজার মাইল বেগে ঘুরিতে থাকে, তবে ধূমকেতুর সহিত পৃথিবীর সমাগম হইলে, আমাদিগকে যে ধাক্কা লাগিবে, তাহার সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, ধূমকেতুর বায়ুমণ্ডলে পৃথিবীর প্রবেশ সহজেই ঘটা সম্ভব। ১৮১১র ধূমকেতুর সসার গর্ভের ব্যাস ৪২৮ মাইল; কিন্তু ইহা ১১ লক্ষ ১৮ হাজার মাইল পরিমিত বায়ুমণ্ডলে পরিবেষ্টিত ছিল। ইহার অধিক বায়ু-মণ্ডলের পরিমাণ কেহ কখন দেখে নাই। রবিবিম্বের ব্যাস ৮৬৬০০০ মাইল; অতএব এই ধূমকেতু রবি অপেক্ষা বড়; রবির ঘনফলের দ্বিগুণ। এই ধূমকেতু

যদি আমাদের ৫০০০০০ মাইল দুর দিয়া যায়, তবে আমরা ইহার মাথায় গিয়া পড়িব। কিন্তু এরূপ ঘটনা ঘটে নাই—অন্ততঃ আমরা জানি না।

অতএব ধূমকেতুতে ও পৃথিবীতে যে একদিন ঠেকাঠেকি হইবে না, তাহার কোন বিশিষ্ট কারণ নাই। তবে এরূপ সমাগমের ফল যে কি হইবে, তাহা এখন বলা সুকঠিন; কারণ সে ফল ধূমকেতুর সমাসন্ন অংশের সামগ্রী ও সান্দ্র-ত্বের উপর নির্ভর করে। একটা রাসায়নিক সংশ্লেষণ ঘটিতে পারে; এই জগৎ-প্রাণ ভূবায়ুর সহিত কারবলিক আসিড বা অপর কোন প্রাণনাশক গ্যাস মিশ্রিত হইতে পারে; মনুষ্যজাতিমাত্রই বিষদিগ্ধ হইতে পারে; জীবমাত্রেরই শ্বাসক্রিয়ার অবরোধ হইতে পারে; অখিল ভূমণ্ডল অকস্মাৎ বিদীর্ণ হইতে পারে; সমস্ত সহসা তাড়িতাহত হইতে পারে; গতি তাপে পরিণত হইতে পারে; সংঘাতজনিত মহা খণ্ডপ্রলয় ঘটিতে পারে—এতগুলি বিপদের আশঙ্কা। অতএব ধূমকেতুগুলিকে সম্পূর্ণরূপে অনিষ্টকারী নহে বলিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না; অথচ ইহাও বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, যদিও ধূমকেতুর সংখ্যার ইয়ত্তা নাই, এবং রবিপরিতঃ তাহাদিগের গতির বিষমতা ও বিচিত্রতার পরিসীমা নাই, তথাপি যাবৎ না ভগবতী বসুমতী নৈসর্গিক নিয়মের বশবর্ত্তিনী হইয়া লয় প্রাপ্ত হইতেছেন, তাবৎ ধূমকেতুর উপপ্লবজনিত তাঁহার বিনাশের আশঙ্কা দেখি না। এই অখিল বিশ্বসংসারের তুলনায় বসুন্ধরা মৃৎকণামাত্র; ইনি যখন মনোজবার ন্যায় অকূল শূন্যসাগরে ভাসমান হন, তখন ইঁহাকে কে গণনা করে—কে লক্ষ্য করে? জ্যোতির্ষার্ণবে ইহার অস্তিত্ব কোথায়? *

শ্রীমাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

* "ধূমকেতু" প্রবন্ধে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দের ইংরাজী আগামী বারে প্রকাশিত হইবে।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। ভাদ্র। "বাবু" শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ হালদারের প্রণীত একটি ক্ষুদ্র গল্প। গল্পটির আখ্যানবস্তু মন্দ নয়, কিন্তু রচনাপ্রণালী ভাল নহে। "দেশীয় অশান্তি ও বিদেশীয় সমালোচনা" একটি রাজনৈতিক প্রবন্ধ। ইহাতে কোনও মৌলিক চিন্তা বা বিশেষ দক্ষতার পরিচয় নাই। শ্রীযুক্ত নকুড়চন্দ্র বিশ্বাসের সঙ্কলিত "কলা" প্রবন্ধটি বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রের সঙ্কলিত "মীর কাসিমের" প্রথম পরিচ্ছেদ এবার প্রকাশিত হইয়াছে। "দর্কেশিনী" এবার সমাপ্ত হইল। গল্পটি মনোরম। "মসূরী পাহাড়ে তিন দিন" একটি ক্ষুদ্র সঙ্ক্ষিপ্ত ভ্রমণবৃত্তান্ত;—বিশেষ চিত্তাকর্ষক কিছু নাই। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "সে আমার" কবিতাটি মন্দ নহে। শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "ক্ষোদিষ্ঠ গ্রহগণ" বেশ হইয়াছে। জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনুরাগী ও কৃতবিদ্য চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এ বিভাগে বঙ্গসাহিত্যের প্রভূত উপকার করিতেছেন। এবারকার "স্বরলিপিতে" শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেনের রচিত একটি মধুর সঙ্গীত নিবিষ্ট হইয়াছে। "নিদাঘ দিবসে" একটি গল্প। গল্পটির আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না। লেখকের ভাষা অত্যন্ত কাঁচা। এবারকার "ভারতী"র একটি বিজ্ঞাপনে প্রকাশ যে, নব বর্ষের প্রারম্ভ হইতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "ভারতী"র সম্পাদকতা গ্রহণ করিবেন। "ভারতী" অধঃপাতের প্রায় চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে, এ সময়ে রবীন্দ্র বাবু যদি তাহার উদ্ধারসাধন করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি সাধারণের ধন্যবাদভাজন হইবেন।

উৎসাহ। আশ্বিন। এবারকার উৎসাহের প্রবন্ধভাগ্য মন্দ দেখিতেছি। "অজ্ঞেয়বাদ" ও "জগৎশেঠ" এই দুইটি ক্রমশঃপ্রকাশ্য প্রবন্ধ ভিন্ন আর কোনও রচনা উল্লেখযোগ্য নহে।

মুকুল। আশ্বিন। "কুমারী হেলেন কেলার" প্রবন্ধটি পাঠকদের মনোরঞ্জন করিবে। কুমারী কেলারের ছবিখানি সুন্দর হইয়াছে। "ভালুকের লেজ কাটা" গল্পটি মন্দ নয়। "বড় কেও কেটা নয়" একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি বুঝিয়া পড়িলে বালকবালিকারা বায়ুর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে কতকটা অভিজ্ঞতা লাভ করিবে। "ন্যানসেন্" প্রবন্ধটি পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। লেখক ন্যান্সেনের মেরুভ্রমণের অদ্ভুত কাহিনী সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

সখা ও সাথী। আশ্বিন। "অপূর্ব্ব প্রতিজ্ঞাপালন" গল্প না সত্য? হিম্মতের চরিত্র চিত্রিত করিয়া লেখক বালকপাঠকদের উপকার করিয়াছেন। "খবরের বোতল" গল্পটি নিতান্তই গল্প—প্রশংসাযোগ্য নয়। এরূপ অসার ও অসম্ভব গল্পে "সখা ও সাথীর" এতগুলি পত্র ব্যয়িত হইতে দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। এবারকার "শীকার" প্রবন্ধটিও ভাল হয় নাই;—লেখার বাঁধুনি আদৌ নাই। এই সংখ্যায় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়ের "প্রবন্ধ-লহরী" এবং "কিটিংসের ছারপোকার পাউডার" একত্র সমালোচিত হইয়াছে। দেখিয়া আমাদের একটি উদ্ভট শ্লোকের কিয়দংশ মনে পড়িতেছে—"অশেষবিৎ পাণিনিরেকসূত্রে শ্বানং যুবানং মঘবানমাহ।"—এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। বালকপাঠ্য পত্রে "প্রবন্ধ-লহরীর" সমালোচনার উপযোগিতা কি, এবং "ছারপোকার" ঔষধের সমালোচনায় বালকেরা কি শিখিবে, তাহা সম্পাদকমহাশয়ই বলিতে পারেন!

রাণী ভবানী।

সপ্তম পরিচ্ছেদ;—হিন্দু-রমণী।

রাণী ভবানী বিধবা হিন্দু-রমণী। হিন্দু-রমণী বলিতে অধিকাংশ ইউরোপীয়গণ যেরূপভাবে নাসিকা-কুঞ্চন করিয়া আন্তরিক অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে ইতস্ততঃ করেন না, রাণী ভবানীর কীর্ত্তিকলাপ দেখিয়া অনেকেই তাঁহার প্রতি সেরূপ অবজ্ঞা-প্রদর্শনের অবসর প্রাপ্ত হন নাই। সেকালের ইংরাজ-লেখকেরা বলিতেন যে, "এই হিন্দুরমণীর যশঃপ্রভা বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল।" * একালের সহৃদয় ইংরাজ-লেখকেরাও বলিয়া থাকেন যে, প্রতিভাগুণে রাণী ভবানী বাঙ্গালীর চক্ষে "পূজনীয়া দেবী বলিয়া" প্রতিভাত হইয়াছেন। † যে গুণে অন্তঃপুরবাসিনী বিধবা হিন্দু-রমণী হইয়াও রাণী ভবানী স্বদেশে বিদেশে ইতিহাসলেখকদিগের নিকট এতদূর সমাদর লাভ করিয়াছিলেন, যে গুণে রাণী ভবানী হিন্দুনরনারীর নিকট প্রাতঃস্মরণীয়া, পূজনীয়া দেবী বলিয়া ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া আসিতেছেন, যে গুণে রাণী ভবানী স্বদেশপ্রেমিকদিগের নিকট মূর্ত্তিমতী মহাদেবী বলিয়া জয়মাল্য উপহার প্রাপ্ত হইতেছেন, যে গুণে রাণী ভবানী স্বদেশের প্রতিভাশালী নবীন কবির কল্পনা-প্রবাহে অমৃতধারা সঞ্চারিত করিয়া দিবার শক্তি লাভ করিয়াছেন, মানবসমাজ সকল যুগে, সকল দেশেই সেই সদ্গুণরাশির নিকট করযোড়ে প্রণিপাত করিয়া থাকে। যদিও এ দেশের আর সে দিন নাই, যদিও সেকালের পুরাতন আদর্শ অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, যদিও এখনকার লোকের পক্ষে, সেকালের ক্রিয়াকলাপের গূঢ় মর্ম্ম সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া, তাহার দোষগুণ নিরপেক্ষভাবে সমালোচনা করিবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি এখনকার লোকের নিকটেও রাণী ভবানীর পুণ্য নাম প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে!

---

* Holwell.

† Rani Bhabani is a heroine among the Bengalees.—H. Beveridge. C. S.

এখনও এ দেশের বহুশত নরনারী প্রত্যূষে ভক্তিভরে রাণী ভবানীর পুণ্য নাম স্মরণ করিয়া দিন সফল হইল বলিয়া আনন্দ অনুভব করে!

সকল দেশেই এমন দুই চারিটি ঐতিহাসিক চরিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার সহিত দেশের লোকের হৃদয়-মনের বৈদ্যুতিক আকর্ষণ সংস্থাপিত হইয়া গিয়াছে। কি সিংহাসনারূঢ় রাজাধিরাজ, কি পর্ণকুটীরবাসী দরিদ্র কৃষক, সকলেই সেই পুণ্য নামে সমভাবে সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশের ধারাবাহিক ইতিহাস নাই, বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসচর্চ্চায় আন্তরিক অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি রাণী ভবানী বাঙ্গালীর অলিখিত ইতিহাসের সেইরূপ ঐতিহাসিক চরিত্র! বাঙ্গালী যে দিন স্বদেশ-প্রেমে বাহুতে বাহুতে মিলিত হইয়া দৃঢ়পদে উন্নতি-সোপানে আরোহণ করিতে পারিবে, সে দিনেও তাহার পথ-প্রদর্শক-পতাকাশীর্ষে রাণী ভবানীর পুণ্য নাম উজ্জ্বল অক্ষরে নরনারীর হৃদয়মন আকর্ষণ করিতে নিরস্ত হইবে না!

সাহস, সত্যনিষ্ঠা, পরহিতাকাঙ্ক্ষা ও স্বদেশপ্রেম যেমন জাতিবিশেষের গৌরবের বস্তু, ব্যক্তিগত জীবনেও তাহাদের সেইরূপ গৌরব। যে সাহসী, সত্যপরায়ণ, পরহিতকারী স্বদেশ-প্রেমিক, তাহার নামে সকল দেশেই জয়-ধ্বনি উত্থিত হইয়া থাকে। সে যদি দীন হীন কাঙ্গাল হয়, তথাপি অনেক মুকুটমণিপরিহিত রাজচক্রবর্ত্তী অপেক্ষা উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিয়া থাকে। তাহাকে চিনিবার জন্য, তাহার দিকে লোক-চিত্ত আকৃষ্ট করিবার জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিবার আবশ্যক হয় না—জনসাধারণ স্বভাবতঃই তাহার দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

রাণী ভবানী রমণী হইয়াও এই সকল চরিত্রগুণে বাঙ্গালীর নিকট চির-স্মরণীয়া হইয়া রহিয়াছেন। তিনি যখন যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাহা পালন করিবার জন্য ক্ষণকালও ইতস্ততঃ করেন নাই। সত্যনিষ্ঠা হেতু তাঁহার জীবনে সৎসাহস এরূপ সুন্দরভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল? সমসাময়িক রাজা, প্রজা, সকলেই তাহার জন্য রাণী ভবানীর নিকট অবনতমস্তকে দণ্ডায়মান হইতেন। সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে এক শ্রেণীর উচ্চাভিমানের নিত্যসংস্রব;—তিনি সেই উচ্চাভিমানের পূর্ণগৌরবে আত্মহৃদয়ের উন্নত মহিমায় আপনাতে আপনি এমন উজ্জ্বলভাবে সমাজের সম্মুখে দেবীমূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান ছিলেন যে, তাঁহাকে হারাইয়া বাঙ্গালীর জাতীয় মন্দির যেন সত্যসত্যই অন্ধকার হইয়া পড়িয়াছে!

বাঙ্গালীর ইতিহাসে রাণী ভবানীর ন্যায় দেবী-চরিত্র বড়ই দুর্ল্লভ। তাঁহার জীবনলীলা যখন শেষ হইয়া আসিতেছিল, সেই সময়ে আর একজন হিন্দু-মহিলা ধীরে ধীরে প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়া উঠিতেছিলেন। তীর্থযাত্রী হিন্দু নর-নারী গয়াধামের দেবমন্দিরদ্বারে ভক্তি, বিস্ময়ে প্রণিপাত করিবার সময়ে, এখনও সেই পবিত্রব্রতধারিণী অহল্যারাণীর কথা স্মরণ করিয়া সাধুবাদ প্রদান করিয়া থাকেন। একজন চিন্তাশীল লেখক ইঁহার কীর্ত্তিকলাপ লক্ষ্য করিয়া যে সকল সমালোচনা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, রাণী ভবানীর সম্বন্ধেও তাহার প্রত্যেক কথাই প্রযুক্ত হইতে পারে। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, "এই হিন্দুমহিলা যেরূপ চরিত্রগৌরব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা পৃথিবীর সকল যুগ ও সকল দেশকেই গৌরবমণ্ডিত করিতে পারিত। সত্য বটে, সীতা সাবিত্রী অথবা কুন্তী দ্রৌপদী হিন্দুসমাজের সমাদর ও পূজা লাভ করিয়া চিরস্মরণীয়া হইয়াছেন; কিন্তু ইহাও সত্য যে, প্রতিভাশালী অমর কবিকুলতিলকদিগের বর্ণনা-লালিত্যের সহিত অবতারবাদের গুপ্ত বিশ্বাস মিলিত হইয়া, এই সকল হিন্দুরমণীর কীর্ত্তিকাহিনী আরও অমৃতময় করিয়া তুলিয়াছে। মহারাষ্ট্র-কুলমহিলা অহল্যারাণী দেবতা বা দেবাবতার ছিলেন না। তিনি মানুষ হইয়া যেরূপ ভাবে দেবহৃদয়ের পরিচয় প্রদান করিয়া নীরবে ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার স্বদেশীয়গণ আজিও সেই দেবী-চরিত্রের সমুজ্জ্বল চিত্রপট লোকচক্ষুর নিকট উদ্ঘাটন করিবার জন্য লেখনী ধারণ করেন নাই!" *

রাণী ভবানীও অনেকদিন হইল লোকচক্ষুর অন্তরাল হইয়াছেন। আমা-দিগের নিকট তাঁহার জীবন-কাহিনী ক্রমেই অলৌকিক উপন্যাসের কল্পনা-কুসুমে পরিণত হইতেছে; ইতিহাসের অভাবে অল্প দিনের মধ্যেই কত অদ্ভুত জনশ্রুতি মুখে মুখে পল্লবিত হইয়া উঠিতেছে। এইরূপে এ দেশের অনেক ঐতিহাসিক চরিত্র ধীরে ধীরে জনশ্রুতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইতেছে। এখন আমরা সে সকল ভিত্তিহীন জনশ্রুতিতে আস্থাস্থাপন করিতে সাহস না পাইয়া, ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিকেও স্বকপোল-কল্পিত উপন্যাস মনে করিয়া আশানু-রূপ সমাদর প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হইতেছি। আমাদিগের এইরূপ বিড়ম্বনা দর্শন করিয়া, একজন ইংরাজলেখক লিখিয়া গিয়াছেন, "দুঃখের কথা আর কি বলিব? ইংলণ্ডের প্রত্যেক পল্লীর ইতিহাস আছে, কিন্তু ভারতবর্ষের

* Calcutta Review.

ভাগ্যে সমগ্র ইংলণ্ড অপেক্ষা বৃহত্তর জনপদেরও কোনরূপ ইতিহাস দেখিতে পাওয়া যায় না!" * বাঙ্গালার ইতিহাস নাই বলিয়াই রাণী ভবানীর জীবনী নূতন করিয়া সঙ্কলন করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালীর যদি সযত্নগ্রথিত স্বদেশের ইতিহাস থাকিত, তবে তাহার অর্দ্ধ শতাব্দীর অতীত কাহিনীর প্রত্যেক প্রধান ঘটনার সঙ্গে রাণী ভবানীর পুণ্য নাম জড়িত হইয়া থাকিত; তাঁহার কীর্ত্তিকাহিনী ঘোষণা করিবার জন্য স্বতন্ত্র জীবনী সঙ্কলন করিবার আবশ্যক হইত না।

রাণী ভবানী যে যুগে জন্মগ্রহণ করেন, সে যুগ মুসলমান নবাবদিগের প্রবল প্রতাপের অলৌকিককাহিনীপরিপূর্ণ রহস্যময় তামস-যুগ বলিয়া ইংরাজের ইতিহাসে সুপরিচিত হইলেও, সেকালে এদেশের সকল স্থানেই হিন্দুজমীদার-দিগের আত্মশাসনগৌরব উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। সেই জন্য হিন্দু রীতি নীতি, হিন্দু আচার ব্যবহার, হিন্দু পরহিতাকাঙ্ক্ষার পবিত্র নিদর্শনগুলি কিছু-মাত্র বিলুপ্ত হয় নাই। ভবানী আত্মারাম চৌধুরীর একমাত্র স্নেহময়ী দুহিতা—আত্মারামের সৌধ-বিভূষিত সৌভাগ্যসম্পদের একমাত্র আশালতা। সুতরাং আশৈশব পরম স্নেহে লালিত পালিত হইয়া, ভবানী বাল্যজীবনেই পিতার সাধু দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে শিখিয়াছিলেন। পিতৃগৃহে যে সকল অনাহূত পথশ্রান্ত বিপন্ন পথিকগণ প্রতিদিন অকাতরে অন্নপানীয় পাইত, পিতৃগৃহের সুমার্জ্জিত দেবমন্দিরে শঙ্খঘণ্টানিনাদমুখরিত মন্ত্রোচ্চারণে যে সকল দেবদেবীর সেবাপূজা প্রতিদিন পরম সমারোহে নির্ব্বাহিত হইত, তাহা বালিকাহৃদয়ে এমন চিরস্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল যে, উত্তর কালে অতুল সম্পদের অধিকারিণী হইয়া, রাণী ভবানী পিতৃগৃহের ন্যায় সমগ্র বঙ্গভূমিকে সেই মহোৎসবের রসাস্বাদন করাইবার জন্য দেশে দেশে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া, পূজাব্যপদেশে অকাতরে সর্ব্বজীবে অন্নদানার্থ রাজভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন!

অর্দ্ধবঙ্গাধিকারিণী দীনপালিনী রাণী ভবানী যেরূপ সগৌরবে অর্দ্ধশতাব্দী-কাল রাজ্যশাসন করিয়াছেন, পরহিতাকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া স্বদেশের কল্যাণকামনায় যে সকল সদনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন, স্বধর্ম্মানু-

* "Every country, almost every parish, in England, has its annals; but in India, vast provinces, greater in extent than the British Islands, have no individual history whatever!"—Sir W. W. Hunter.

রাগের বশবর্ত্তিনী হইয়া দেশে দেশে যে সকল দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, লোকহিতব্রতে অগ্রসর হইয়া মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিয়া যে সকল অক্ষয় কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ কাল সহকারে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে; কিন্তু এখনও যাহা সংগ্রহ করা সম্ভব, তাহাও এত বহুবিস্তৃত যে, তাহাতেই একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়া যায়।

বাঙ্গালা দেশে নদনদীখালবিলের অভাব নাই। বরং বর্ষাকালের অপরি-সীম জলপ্লাবনে অধিকাংশ স্থানেই লোকের বাড়ী ঘর, পথ ঘাট জলমগ্ন হইয়া যায়! কিন্তু এ দেশের এমনই অদৃষ্টবিড়ম্বনা যে, সেই সকল পল্লীতে পল্লীতে গ্রীষ্মকালের নিদারুণ জলকষ্টে পল্লীবাসিগণ হাহাকার করিতে থাকে! বাঙ্গালা দেশ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ; বাঙ্গালীজাতি কৃষিপ্রধান জাতি;—জল ভিন্ন বাঙ্গা-লীর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা যে কত দূর অসম্ভব, তাহা বাঙ্গালী ভিন্ন আর কেহ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে না। বাঙ্গালীর জলদৈন্য দূর করিবার জন্য যাঁহারা মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালীর নিকট তাঁহাদের পুণ্য নাম চিরস্মরণীয় হইয়াছে। রাণী ভবানীর যে সকল পুণ্যকীর্ত্তি এখনও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই, তন্মধ্যে তাঁহার জলাশয়গুলিই সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অনেক দেবমন্দিরের উচ্চ চূড়া ধূলি-বিলুণ্ঠিত হই-য়াছে, তাঁহার সংস্থাপিত অনেক অতিথিশালার ভিত্তিমূল পর্য্যন্তও তিরোহিত হইয়া গিয়াছে, তাঁহার বহুব্যয়নির্ম্মিত অনেক রাজপথ কণ্টকবনে সমাচ্ছন্ন হওয়ায় লোকচলাচল রহিত হইয়া গিয়াছে;—কিন্তু তিনি যে সকল দীর্ঘিকা ও সরোবর খনন করাইয়া দিয়া দরিদ্রের জলকষ্ট নিবারণ করিয়াছিলেন, তাহার স্বচ্ছ সলিলে তাঁহার পুণ্যকীর্ত্তি এখনও প্রতিবিম্বিত হইতেছে! তিনি কোথায় কত সরোবর খনন করাইয়া দিয়াছিলেন, পরোক্ষভাবে কত স্থানে জলাশয়খননের উৎসাহদান করিয়াছিলেন, এখন আর তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা সহজ নহে। একবার দুর্ভিক্ষসময়ে রাঢ়দেশের দুর্দ্দশার অবস্থা স্বচক্ষে পরিদর্শন করিবার জন্য স্বদেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রীষ্ম-কালের প্রখর রৌদ্রতাপে অশ্বারোহণে দীর্ঘ পথ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, যেখানেই এক একটি প্রসন্নসলিলা বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা দেখিয়া জলদাতার নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সেখানেই লোকে দুই হাত তুলিয়া রাণী ভবানীর নাম করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছে। কেহ যদি এখনও পুরাতন রাজসাহী-রাজ্যের সকল স্থান পরিভ্রমণ করিতে পারেন, তবে এইরূপ শত

শত জলদানব্রতের কীর্ত্তিস্তম্ভে রাণী ভবানীর সহৃদয় শাসননীতির পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন।

আজকাল এ দেশে গমনাগমনের পথ সহজ হইয়াছে। সেকালে প্রধান প্রধান স্থানে যাতায়াত করিবারও সুবিধা ছিল না। যে দুই চারিটি পথ ঘাট ছিল, তাহাতেও লোকে নিঃশঙ্কচিত্তে গমনাগমন করিতে সাহস পাইত না। দূরদেশে গমন করিতে হইলে হয় পথক্লেশে, না হয় দস্যুহস্তে, শীঘ্রই ভ্রমণকার্য্য সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিত। পথিমধ্যে পথিকদিগের বিশ্রামের জন্য কোনরূপ আশ্রয়স্থান ছিল না। ইহাতে বাণিজ্য-ব্যবসায়ের যেরূপ ক্ষতি হইত, তীর্থযাত্রীদিগকে ততোধিক বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হইত। নবাব মুরশিদকুলী খাঁ বাহাদুর রাজধানী মুরশিদাবাদ হইতে হুগলী পর্য্যন্ত রাজ-পথপার্শ্বে স্থানে স্থানে অনেকগুলি প্রহরিমন্দির ও পান্থশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। রাণী ভবানীও তদনুরূপ কতকগুলি রাজপথ ও পান্থশালা নির্ম্মাণ করিয়া তীর্থযাত্রী হিন্দুদিগের তীর্থক্লেশ অনেক পরিমাণে দূর করি-বার চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজসাহী-প্রদেশে রাণী ভবানীর একটি রাজপথ ও সেতু এখনও বর্ত্তমান আছে; তাহার নাম "ভবানী জাঙ্গাল"। এই পথের বিশেষত্ব এই যে, ইহার স্থানে স্থানে জলাশয় এবং জলাশয়তীরে পথিপার্শ্বে প্রস্তরনির্ম্মিত ভোজনপাত্র, পানপাত্র ও রন্ধনস্থান নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে; পথিকগণ অনায়াসে সেখানে আসিয়া স্নানাহার সম্পাদন করিতে পারিতেন। দেখিলেই মনে হয় যে, সেই পুরাতন রাজপথগাত্রে এখনও যেন করুণা-রূপিণী রাণী ভবানীর সরল সুন্দর সৌম্যমূর্ত্তি চিরাঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।

ক্রমশঃ।

শ্রীঅক্ষয় কুমার মৈত্র।

এব্রাহাম লিঙ্কলন।

যাঁহারা ইহজীবনে ধর্ম্মানুগত অর্থকামের অনুসরণে ব্যাপৃত হইয়া উৎকৃষ্ট গুণশালী বলিয়া যশস্বী হইয়াছেন, এব্রাহাম লিঙ্কলন তন্মধ্যে এক জন। এই মহাপুরুষের জন্মে মার্কিনদেশ পবিত্র হইয়াছে। অতি দীনদুঃখীর সন্তান হইয়াও তিনি স্বদেশে সর্ব্বোচ্চ রাজসম্মান পাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি রাজ-পদ পাইয়াছিলেন বলিয়াই যে আমাদের প্রশংসার পাত্র বা অনুকরণের যোগ্য, তাহা নহে। ধর্ম্মাবিরুদ্ধ অর্থকামের অনুসরণে তিনি যে উৎকৃষ্ট গুণরাশির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি আমাদের একজন শ্রেষ্ঠ আদর্শস্থল বলিয়া চিরস্মরণীয়। তাঁহার দেহে অসুরের বল ও মনোমধ্যে দেবতার শক্তি নিহিত ছিল। সুস্থ দেহে সুস্থ মনের আদর্শ এখন অতি বিরল। তাঁহার পিতা একজন সামান্য সূত্রধর ছিলেন, সুতরাং লিঙ্কলন অতি কষ্টের মধ্যেই লালিত হইয়াছিলেন। শ্রমজীবী লোকের ঘরে জন্মিয়া ও নিজেও বাল্য হইতে শ্রম-সহিষ্ণু হইয়া, তিনি অতিশয় দৃঢ় ও বলিষ্ঠকায় পুরুষ হইয়া উঠিয়াছিলেন। দুই জনের বোঝা একাকী বহন করিতে পারিতেন, কাষ্ঠমধ্যে কেহই তাঁহার ন্যায় গভীর কুঠার বসাইতে পারিত না। জ্ঞানপিপাসা এত অধিক ছিল যে, একটি সামান্য গ্রাম্য পাঠশালায় এক জন সামান্য জ্ঞানবান শিক্ষকের নিকট পাঠ জানিতে তিনি নিত্য সাড়ে বার ক্রোশ পথ পদব্রজে যাতায়াত করিতেন। গৃহে কাগজ কলম নাই, তথাচ কাষ্ঠনির্ম্মিত টুলের উপরিভাগে তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্র দ্বারা অঙ্ক কশিতেন ও প্রবন্ধরচনা করিতেন—কাষ্ঠতল ভরিয়া গেলে আবার তাহা চাঁচিয়া ফেলিতেন। দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার তাঁহার অসহ্য ছিল, কেহ তদ্রূপ আচরণ করিলে তাহাকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করিয়া শাস্তি দিতেন। লোভ কি, তাহা তিনি জানিতেন না। উত্তরকালে এক সময়ে তিনি একটি সামান্য ডাকঘরে ডাকমুন্সীর কার্য্য করিতেন; ঐ পদ পরিত্যাগ করিয়া ওকালতিতে প্রবৃত্ত হইলে, কিয়ৎকাল পরে পোষ্টআফিস বিভাগের একজন কর্ম্মচারী, একদিন তাঁহার নিকটে আসিয়া প্রকাশ করেন যে, তাঁহার নিকট নাদাবি ন্যূনাধিক সপ্তদশ মুদ্রা পোষ্টআফিসের প্রাপ্য আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ একটি পেটিকা উদ্‌ঘাটন করিয়া একখানি নেকড়ায় বাঁধা আনা-পাই-গণ্ডাসমেত ঠিক দাবিকৃত টাকার একটি পোঁটলা বাহির করিয়া বলিলেন, "এই লউন, পরের

টাকা নিজের কার্য্যে ব্যবহার করা আমার স্বভাব নহে।” অর্থোপার্জ্জনের জন্য তিনি নানা কার্য্যে ব্যাপৃত হয়েন। পৈতৃক ব্যবসায়ে অর্থাগমের সুবিধা না দেখিয়া দিনকতক জরিপ-আমীনের কার্য্য করেন, পরে দিনকতক ডাকঘরের কার্য্য করেন ; অবশেষে ওকালতিতে প্রবৃত্ত হয়েন। তাঁহার বক্তৃতাশক্তি ক্রমে সাতিশয় স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল। সরল ভাষায় মধুর ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতায় তিনি শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করিতে পারিতেন। ওকালতি-ব্যবসায়ে ক্রমে তিনি সাতিশয় যশস্বী ও অর্থশালী হইয়া উঠিলেন, এবং এইরূপে কৃতী হইয়া বত্রিশ বৎসর বয়সে দারপরিগ্রহ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট ভাগ গৃহস্থাশ্রমেই দাম্পত্য প্রেমের বিমল চন্দ্রিকায় অতিবাহিত হইয়াছিল।

ওকালতিতে নিযুক্ত হইয়া তিনি রাজনৈতিক প্রসঙ্গে সমধিক ব্যাপৃত হয়েন। সকল দেশে সকল সমাজেই এক এক সময়ে এক একটি রাজনৈতিক সমস্যা সর্ব্বগ্রাসী প্রাধান্য লাভ করে। লিঙ্কলনের জীবদ্দশায় দাস-সমস্যাই মার্কিন দেশে তাদৃশ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। ইয়ুরোপীয় ঔপনিবেশিকেরা নিগ্রো দাসগণ দ্বারা শ্রমসাধ্য সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহিত করিতেন, দাসেরা প্রভুর সম্পত্তির মধ্যে গণ্য ছিল, এবং হাটে ক্রীত বিক্রীত হইত। দাসদাসীর সন্তানেরা গর্ভদাস হইত। তাহাদের কোনও প্রকার স্বাধীনতা ছিল না, প্রভুর আদেশে তাহারা কশাঘাত ও বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইত, এবং অশেষ নিগ্রহ, অপমান, এমন কি, প্রাণনাশ পর্য্যন্ত সহ্য করিত। তাহাদের দুর্দ্দশাদর্শনে অনেকের হৃদয় বিদীর্ণ হইত। ক্রমে অনেক ন্যায়পরায়ণ, ধার্ম্মিক ও পরদুঃখকাতর ব্যক্তি এই জঘন্য দাসত্বপ্রথা দেশ হইতে উঠাইয়া দিতে বদ্ধপরিকর হয়েন। লিঙ্কলন তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান, এবং অবশেষে তিনি এই পক্ষের অগ্রণী বলিয়া পরিগণিত হয়েন। তাঁহার কোমল হৃদয়ে যেমন প্রভূত করুণার সঞ্চার হইয়াছিল, তাঁহার বীর হৃদয়ে তেমনই অসীম উৎসাহও স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল। পক্ষান্তরে, দাসেরা সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত থাকায়, অনেকেই সম্পত্তিহানি হইবে বলিয়া, সেই দূষণীয় আচারের রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। দাসবন্ধুগণের সংখ্যা মার্কিনদেশের উত্তরাঞ্চলে অধিক ও দক্ষিণাঞ্চলে অল্প ছিল। দেশটি প্রথম কতকগুলি প্রজাতন্ত্র খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত এবং খণ্ডরাজ্যগুলি আবার একটি প্রজাতন্ত্র সাধারণ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সাধারণ সাম্রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভার নাম কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের প্রজানির্ব্বাচিত সভাপতি নিয়মিত

সময়ের জন্য সাম্রাজ্যের রাজদণ্ড ধারণ করিতেন। মার্কিনদেশে চিরাগত দাসত্বপ্রথা অক্ষুণ্ণ থাকিবে, কি তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইবে, এই কথা লইয়া তৎকালে ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছিল। লিঙ্কলনের বক্তৃতায় লক্ষ লক্ষ লোক উত্তেজিত হইয়া উহা উঠাইয়া দিতেই কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে সভাপতি-নির্ব্বাচনের সময় আসিয়া উপস্থিত হইলে, আন্দোলনের একটা না একটা মীমাংসা হইবে, ইহা সকলেই অনুভব করিল। আন্দোলন আরও তুমুল হইয়া উঠিল। একদিকে দাসত্বের স্বপক্ষে, আর একদিকে দাসত্বের বিপক্ষে, বক্তৃতার স্রোতে দেশ প্লাবিত হইতে লাগিল। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ২৭এ ফেব্রুয়ারি তারিখে, নবইয়র্ক নগরে লিঙ্কলন যে এক প্রসিদ্ধ বক্তৃতা করেন, তাহাতে দেশের লোক মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। তড়িৎ-প্রবাহের ন্যায় উহা রাষ্ট্রবাসিগণের হৃদয় আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। দাসবন্ধুগণ তাঁহাকেই আপনাদের বিহিত নায়ক বলিয়া বুঝিতে পারিল। কংগ্রেসের সভাপতি-নির্ব্বাচনের সময় আসিয়া উপস্থিত হইলে, এক পক্ষ তাঁহাকেই মনোনীত করিল। প্রচলিত নিয়মানুসারে মনোনীত ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে নির্ব্বাচক-সভা নামক এক সভাতে অধিকাংশের সম্মতিক্রমে একজন সভাপতিত্ব নির্ব্বাচিত হয়েন। ঐ সভায়, মনোনীত ব্যক্তিগণের মধ্যে একা লিঙ্কলন ১৩০ জনের সম্মতি এবং অপর সকলে মিলিয়া কেবল ১২৩ জনের সম্মতি পাইলেন। তদনুসারে তিনিই বিশাল এবং পরাক্রান্ত মার্কিন-সাম্রাজ্যের সভাপতিত্ব ও সম্রাটের আসন প্রাপ্ত হইলেন।

যে দেশ এইরূপ সদ্‌গুণের পূজা করিতে জানে, সেই দেশেই মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়া থাকে। যখন দুর্য্যোধনের সেনাপতি হইব বলিয়া কর্ণ ও অশ্বত্থামার মধ্যে বিবাদ হয়, তখন অশ্বত্থামা কর্ণকে সূতপুত্র বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। কিন্তু মার্কিনদেশে সূতপুত্র বলিয়া লিঙ্কলনকে অবজ্ঞা করে নাই—করিলেও তিনি মহাকবি ভট্টনারায়ণের ভাষায় বলিতে পারিতেন,

> সূতো বা সূতপুত্রো বা যো বা সো বা ভবাম্যহম্।
> দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মমায়ত্তং তু পৌরুষম্॥

সূতপুত্র লিঙ্কলন কিরূপে পৌরুষ আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাহার কাহিনী অতীব বিচিত্র। তাহা লইয়া মহাভারতের ন্যায় বিস্তীর্ণ এবং মহাভারত অপেক্ষাও হৃদয়গ্রাহী ইতিহাস রচিত হইয়াছে। এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা আমূল বর্ণনা করা যায় না।

বিপদি ধৈর্য্যম্ অথাভ্যুদয়ে ক্ষমা
সদসি বাক্‌পটুতা যুধি বিক্রমঃ।

এই সকল প্রসিদ্ধ সদ্‌গুণ একাধারে দেখাইবার জন্যই বিধাতা এব্রাহাম লিঙ্কলনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ২৩ বৎসর বয়সে যখন লিঙ্কলন পৈতৃক বাসস্থানে দরিদ্র ও হীন অবস্থায় বাস করিতেছিলেন, তখন কৃষ্ণশ্যেন নামক একজন তাম্রত্বক্ ভূমিজ অধিপতির সহিত তত্রত্য সীমান্তবাসীদের যুদ্ধ ঘটে। এই যুদ্ধে লিঙ্কলন একজন উপযাচক সৈনিক হইয়া যোগদান করেন। ইহারই মধ্যে স্থানীয় লোক তাঁহাকে একজন উপযুক্ত নায়ক বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল, এবং তদনুসারে তাঁহাকেই তদীয় বিভাগের সেনাপতির পদে নির্ব্বাচিত করিয়াছিল। এই যুদ্ধে লিঙ্কলন যথেষ্ট বিক্রম প্রদর্শন করিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন। ইহার পর যদিও তিনি আর সশরীরে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হয়েন নাই, কিন্তু তিনি সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলে মার্কিনদেশে এক ভীষণ সংগ্রাম বাধিয়া উঠে। এই সময়ে কুরুপাণ্ডবের অক্ষৌহিণীর ন্যায় লক্ষ লক্ষ সেনা এবং ভীষ্মার্জ্জুনের ন্যায় বীরগণ পঞ্চবর্ষব্যাপী মহাহবে ব্যাপৃত হইয়াছিল; এবং স্বয়ং অস্ত্র ধারণ না করিয়াও এব্রাহাম লিঙ্কলন বাসুদেবের ন্যায় এই যুদ্ধের প্রধান নায়ক ছিলেন। বিপক্ষপক্ষের সেনানী জেনারেল রবার্ট লী বাস্তবিকই এ যুগের ভীষ্ম। তাঁহার সম্মুখে লিঙ্কলনের সেনা-পতিগণ সকলেই উত্তরোত্তর পরাভূত হইয়াছিলেন। ম্যাক্‌ক্লীনাম, বরণসাইড, হুকার, রোজক্রান্স, মীড প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ মহারথিগণ লক্ষ লক্ষ সেনা সহ যখন একে একে লীর সম্মুখে পরাভূত হইতে লাগিলেন, তখন দাসবন্ধুগণ একবারে হতাশার সমুদ্রে নিমগ্ন হইলেন। কিন্তু এক এব্রাহাম লিঙ্কলন অচল ও অটল থাকিলেন। উপর্য্যুপরি পরাভব-সঙ্কটে এইরূপ অমানুষ ধৈর্য্য, অধ্য-বসায় ও উদ্যমের পরিচয় ইতিহাসে বড়ই বিরল। উত্তালতরঙ্গময় বিপদ্-সমুদ্রে তিনি শৈলশিখরের ন্যায় গ্রীবা উত্তোলন করিয়া থাকিতেন। বিপদে কেবল তাঁহাকে অধিক পরিমাণে নির্ভীক ও অসন্ধেয় করিয়া তুলিল। যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয় নাই, তখন শোণিতপাতনিবারণাকাঙ্ক্ষায় তিনি দাসাধিকারি-গণকে ক্ষতিপূরণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন—যদি তাহাতেও তাহারা নিরস্ত হইয়া যুদ্ধ না করে। কিন্তু যখন তিনি পরাজিত হইতে লাগিলেন, তখন মন্ত্রি-গণের সহিত বিনা পরামর্শে নিজের মনে তিনি এক কঠিন সঙ্কল্প করিলেন। তদনুসারে এই ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইল যে, ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারি

হইতে বিনা ক্ষতিপূরণদানেও সমুদয় বিদ্রোহী খণ্ডরাজ্যে দাসগণ মুক্তিলাভ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। জগতের লোক তাঁহার সাহসদর্শনে অবাক্ হইয়া গেল। তিনি সহস্র সহস্র নিগ্রোদাসকে সৈনিকশ্রেণীতে গ্রহণ করিলেন, এবং তাহারাও স্বাধীনতা-লাভের জন্য অকাতরে জীবন উৎসর্গ করিতে ত্রুটি করিল না। অবশেষে জেনারেল ইউলিসিস গ্রাণ্ট লিঙ্কলনের সেনাপতি হইয়া অর্জ্জুনের ন্যায় সমরে অগ্রসর হইলেন। ঘোরতর সংগ্রামের পর লী পরাভূত হইলেন। শত্রুপক্ষের রিব্‌মণ্ড নগর লিঙ্কলনের হস্তগত হইল। বিদ্রোহবহ্নি ধূমায়মান হইতে হইতে ক্রমে ক্রমে নিবিয়া গেল। "যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ"—এই কুরুক্ষেত্রেও উক্ত মহাবাক্য সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল। ফলতঃ, ব্যাসের কুরুক্ষেত্রও যেমন জ্ঞাতিকলহের ফল, মার্কিনদের কুরুক্ষেত্রও তাদৃশ জ্ঞাতি-কলহেরই ফল; কিন্তু ব্যাসের কুরুক্ষেত্র এক সামান্য হস্তিনার রাজসিংহাসন লইয়া, এ কুরুক্ষেত্র একটি অক্ষয় নীতিতত্ত্ব লইয়া।

এব্রাহাম লিঙ্কলনের ক্ষমাগুণের কথা শুনিবে? যাহাদের অন্যায় নৃশংসতা, অর্থগৃধ্নুতা এবং নীচ প্রবৃত্তিতে মার্কিন-সাম্রাজ্য ছারখার করিতে বসিয়াছিল, যাহারা অর্থের লোভে দয়ামায়াতে জলাঞ্জলি দিয়া এবং শোণিতসম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়া, জ্ঞাতিবধরূপ মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছিল, যুদ্ধে পরাভূত হইলে লিঙ্কলন তাহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে আদেশ দেন?—তখন তাঁহার মূর্ত্তি বড়ই রহস্যকর হইয়াছিল। হৃদয়ে অগাধ ক্ষমা ও করুণা, কিন্তু মুখে দারুণ ভ্রূকুটী। শত্রুপক্ষীয় নরাধমগণ তাঁহাকে কালান্তক যমের ন্যায় দেখিল, কিন্তু যাঁহারা ভিতরের সংবাদ পাইবার অধিকারী, তাঁহারা এক অদ্ভুত সন্দেশ প্রাপ্ত হইলেন। তাহা লিঙ্কলনের নিজ ভাষাতেই চিরদিন লিখিত হওয়া উচিত। তিনি বলিয়া বসিলেন, 'No one need expect he would take any part in hanging or killing these men, even the worst of them. Frighten them out of the country, open the gate, let down the bars, scare them off. Enough lives have been sacrificed. We must extinguish our resentment, if we expect harmony and union.

লিঙ্কলন জয়ী হইলেন। জয়লাভ হেতু মহোৎসবের দিন নির্দ্ধারিত হইল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ১৪ই এপ্রেল গুডফ্রাইডের পর্ব্বাহে, অনাথবন্ধু ঈশ্বরকে দাসগণের শৃঙ্খলমোচনের জন্য ধন্যবাদ দিয়া ফোর্ডের নাট্যশালা নামক নাট্য-

মন্দিরে লিঙ্কলন নাট্যাভিনয় সন্দর্শনার্থ গমন করিলেন। তথায় তিনি নাট্য-দর্শন করিতেছেন, এমন সময়ে নরাধম বুথ রাক্ষসের ন্যায় পশ্চাদভাগ হইতে অলক্ষিতভাবে গুলি করিয়া তাঁহার প্রাণসংহার করিল। পৃথিবীর লোকে তখন হাহাকার করিতে লাগিল। বাস্তবিকই সে দিন আমাদের এই অন্ধকারময় পৃথিবী হইতে এক অপূর্ব্ব স্বর্গের জ্যোতি নিবিয়া গেল।

ঈদৃশ জীবনের ঈদৃশ পরিমাণ কি ক্ষোভের বিষয়! কিন্তু মহাপুরুষের জীবনেও যেমন উপকার হয়, মরণেও তেমনি উপকার হইয়া থাকে। নৃশংস ঘাতকের হস্তে যখন এব্রাহাম লিঙ্কলনের শোণিত নির্গত হইল, তখন যে সকল বীরপুরুষেরা চিরন্তন প্রথা রক্ষার জন্য তাঁহার বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়া সম্মুখ সমরে অগ্রসর হইয়াছিল, এবং পরাভূত হইয়াও যাহাদের হৃদয়ে বিদ্বেষ-বহ্নি প্রধূমিত হইতেছিল, তাহারাও শোকে গলিয়া গেল। তিনি ঘাতকের হস্তে প্রাণসমর্পণ করিয়া শত্রুরও হৃদয় অধিকার করিয়া বসিলেন। যে জন্য পৃথিবীতে তাঁহার আগমন তাহাও সুসিদ্ধ হইল, তিনিও সংসারের মলসম্পর্ক ছাড়িয়া অন্তর্ধান করিলেন। ব্যাসের কুরুক্ষেত্রে ভারতবর্ষ চিরকালের জন্য উপক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু এই কুরুক্ষেত্রে মার্কিন-সাম্রাজ্য নবীকৃত হইয়া একতামূলক স্বাধীন পরাক্রমে পৃথিবীতে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়াছে। এব্রাহাম লিঙ্কলন মার্কিনদেশে উন্নতিমূলক নূতন সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।

গঙ্গোত্রীর পথে।

আমার শেষ প্রবন্ধে * বলিয়াছি, বেলা এগারটার সময়ে এক ছায়াযুক্ত শিলা-শয্যায় স্বামীজির নিদ্রাভঙ্গ হইল;—আমি তাঁহার নিদ্রাভঙ্গের অপেক্ষায় একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষের ছায়ায় উপবিষ্ট ছিলাম। দুই জনে কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে 'ধারাসু' নামক স্থানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। 'ধারাসু' সে স্থান হইতে প্রায় ৪ মাইল। একে প্রখর রৌদ্রের উত্তাপ, তাহার পর স্বামীজির কঠোর উপদেশরাশি আমাকে একেবারে মরার দাখিল করিয়া ফেলিল! সূর্য্যের উত্তাপ অনেক সহ্য করা গিয়াছে, তাহাতে কষ্ট হইলেও সে কষ্ট সহ্য করিবার মত শরীরের অবস্থা ছিল; কিন্তু স্বামীজির সন্ন্যাসধর্ম্মসম্বন্ধে

মায়ামমতাপরিশূন্য উপদেশ আমাকে বড়ই কাতর করিয়া ফেলিল। আমি কেন তাঁহার জন্য বসিয়াছিলাম, আমি কেন চলিয়া গেলাম না, এই তাঁহার অভিযোগ। সে সময়ে সামান্য দুই একটা জবাব করিয়াছিলাম, কিন্তু আজ যদি সেই গৈরিকবাস প্রকাণ্ডউষ্ণীষধারী দীর্ঘশ্মশ্রু স্বামীজিকে সম্মুখে পাইতাম, তাহা হইলে তাঁহার চরণপ্রান্তে বসিয়া বলিতাম, "সন্ন্যাসী, আপনাকে আমি ফেলিয়া যাইতে পারি না; এই প্রকৃতি মাতা সে শিক্ষা কাহাকেও ত দেন না—দিতে পারেন না; সর্ব্বনিয়ন্তা সে বিধান করেন নাই; এমন উদ্দাম বিধানে জগৎ থাকিত না; কেহ কাহাকেও যাইতে দিতে চায় না—কেহ কাহারও নিকট হইতে দূরে যাইতে চাহি না। যে দিন কেহ কাহারও মুখ না চাহিয়া যে দিকে সে দিকে চলিয়া যাইতে চাহিবে, সে দিন মনুষ্যনাম উড়িয়া যাইবে, সে দিন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া কোথায় কিসে পরিণত হইবে। চাহি না আপনার প্রেমহীন সন্ন্যাস; প্রেমময় পরমদেবতাকে লাভ করিতে হইলে কি এমনই করিয়া কাহারও দিকে না চাহিয়া সুধু আপনাকে লইয়াই অগ্রসর হইতে হইবে? আমি ত তাহা বুঝি না, প্রেমের রাজ্য দিয়াই প্রেমময়ে পঁহুছিতে হইবে। অসীম ধরিত্রী, নিশিদিন এই জগৎ-ময় কত প্রেম, কত স্নেহ, কত সুধা ঢালিতেছেন;—তাই চাঁদের আলো এত মিষ্ট, এত মধুর; তাই বৃক্ষে পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, ফল ধরে; তাই নদী বহিয়া যায়; পাখীতে গান গায়। সন্ন্যাসীর নির্ম্মম উপদেশে চলিলে এ সব যে কোথায় বিলীন হইয়া যাইত! আমি এমন সন্ন্যাস চাহি না।" সে দিন সে সময়ে এত কথা বলিতে পারি নাই—বলিবার অবস্থাও ছিল না; কিন্তু তিনি আমাকে যাহা করিতে বলেন, তাহা আমি কি করিয়া করি? তাঁহার মত আমি কোন দিনই গ্রহণ করি নাই, তাঁহার উপদেশ আমার নিকট সর্ব্বদাই বৃদ্ধ সংসার-ত্যাগী সাধুর অতিসাবধানতা বলিয়া বোধ হইত। আর সে কথাও বলিয়া রাখি, স্বামীজির কথায় কাজে মিল হইত না। তিনি বলিতেন এক, করিতেন আর; অনেক স্থলে তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছি। এ দিকে আমাকে বলেন, "কেন তুমি আপন মনে চলিয়া গেলে না?" অথচ কোন দিন যদি কোন কারণে আমি পথের মধ্যে পশ্চাতে পড়িয়াছি, তাহা হইলে তিনি আমার অপেক্ষায় পথের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন। এ সব ব্যাপার উল্লেখ করিয়া কিছু বলিলে, তাঁহার সেই একই কথা,—"তাঁহার কথা স্বতন্ত্র।" তিনি আমাকে কি বুঝাইতে চান, তাহা তিনি নিজেই বুঝেন না।

এই ভাবে বেলা প্রায় একটার সময়ে আমরা 'ধারাসু'তে উপস্থিত হইলাম। এখানে আর আমাদের দরিদ্রের কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় নাই। ধারাসুতে তিহরির রাজার Forest Bunglow আছে। এত বড় একটা মহাকায় হিমালয় অগণিত তরুগুল্মলতা বক্ষে ধারণ করিয়া এতকাল নিরাপদে বাস করিতেছিলেন, তাহার সে সব গগনস্পর্শী বৃক্ষমূলে কখনও যে কুঠারের আঘাতে পড়িবে, তাহা কখনও চিন্তার বিষয় হয় নাই। পর্ব্বত বা জঙ্গল প্রদেশ যে সমস্ত রাজগণের রাজ্যভুক্ত ছিল, তাঁহারা উহা হইতে কোন প্রকার আয় করিবার ইচ্ছা কখনও করেন নাই; যাহার দরকার হইত, সেই পাহাড় হইতে কাঠ কাটিয়া আনিত—কেহ নিষেধ করিত না। তিহরীর রাজার রাজত্বই জঙ্গলের উপর; গড়োয়াল রাজ্যের মধ্যে মনুষ্য অধিবাসী অপেক্ষা বৃক্ষ-বনস্পতি অধিবাসীই অধিক। ইংরেজের দেখাদেখি এখন তিহরি-রাজ যথারীতি জঙ্গলবিভাগ স্থাপন করিয়াছেন; অভিজ্ঞ Conservator, Ranger, forestor নিযুক্ত করিয়াছেন। পূর্ব্বে এ সমস্ত সুবন্দোবস্ত ছিল না, এমন একটা বহুদূরবিস্তৃত ভূভাগ হইতে কোন প্রকারই আয়ই হইত না। এখন একজন কৃতকর্ম্মা বঙ্গদেশবাসীর সুবন্দোবস্ত ও শাসনের গুণে তিহরী রাজ্যের যথেষ্ট আয় হইয়াছে। এই বঙ্গদেশবাসী আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ দেশবিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য। কোথায় সুদূর বঙ্গদেশের একটি গ্রাম হইতে চাকুরীর উদ্দেশে একজন বাঙ্গালী পশ্চিমে গিয়াছিলেন, আজ তিনি স্বীয় বুদ্ধি ও কর্ম্মকুশলতায় একটি পার্ব্বত্য রাজ্যের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছেন। জঙ্গলবিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী রাজমাতুল মিঞা হরি সিংও একজন দক্ষ ব্যক্তি। তাঁহারই চেষ্টায় আমরা তিহরীরাজ্যের মধ্যে কোথাও কোনও অসুবিধা ভোগ করি নাই।

তিহরী রাজ্যের মধ্যে স্থানে স্থানে অতি সুন্দর বাঙ্গলা সকল নির্ম্মিত হইয়াছে। কতকগুলি বাঙ্গলায় যথারীতি আফিস আছে এবং কতকগুলি পরিদর্শক কর্ম্মচারিগণের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহারই একটি বাঙ্গলায় আমরা অতিথি হইলাম। বাঙ্গলাটি একটি সুন্দর টিলার উপরে নির্ম্মিত; রাস্তা হইতে অনেকখানি চড়াই ভাঙ্গিয়া তবে বাঙ্গলায় যাইতে হয়। অতি সুন্দর অনতিদীর্ঘ দ্বিতল অট্টালিকায় আমাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। আমাদের সঙ্গী পেয়াদা মহাশয় বহুপূর্ব্বে আসিয়া সমস্ত আয়োজন করিয়া

রাখিয়াছিলেন। সুধু আয়োজন নহে, আমাদের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া সে তাহার বিবেচনামত আমাদের জন্য খাদ্যাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল; আমাদের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিলে, সেদিন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে আর আমাদের আহার হইত না।

এই অট্টালিকার পার্শ্বেই গৃহরক্ষকের বাড়ী। সে এ স্থানের অধিবাসী নহে; তাহার বাড়ী পূর্ব্বে তিহরীতে ছিল, রাজার এই বাঙ্গলায় প্রহরীর কাজ পাইয়া সে সপরিবারে এখানে উঠিয়া আসিয়াছে। রাজসরকার হইতে তাহার বাড়ী প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, বেতনস্বরূপ কিছু জমি দেওয়া হইয়াছে; তিনটি পুত্র ও একটি কন্যা লইয়া সে সেই নিভৃত স্থানে পরম সুখে দিনপাত করিতেছে। পাহাড়ের গায়ে দুই তিন খানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে; অপরাহ্নে সেই সমস্ত গ্রাম হইতে লোকেরা আসিয়া এই বাঙ্গলায় আড্ডা দেয়, এবং তাহাদের সেই ক্ষুদ্র পৃথিবীর সুখদুঃখের আশা আকাঙ্ক্ষার কথায় অনেক সময় কাটাইয়া যায়।

আমাদের সহযাত্রী পেয়াদা বলিলেন, আজ আর আমাদের রসদের জন্য গ্রামের লোকের বাড়ীতে যাইতে হয় নাই। বাঙ্গলাতে সর্ব্বদাই সমস্ত দ্রব্য মজুদ থাকে এবং যাহা অকুলান হয়, অথবা দীর্ঘকাল থাকিয়া নষ্ট হইয়া যায়, গৃহরক্ষক মধ্যে মধ্যে তাহা ক্রয় করিয়া সঞ্চিত রাখে; এ প্রকার না করিলে সেই নির্জ্জন স্থানে কর্ম্মচারিগণ হঠাৎ আসিলে নানা প্রকার অসুবিধা হইতে পারে। বিশেষতঃ আমরা আজ যে বাঙ্গলায় অতিথি, তিহরী-রাজ্যের ফরেষ্ট-বাঙ্গলার মধ্যে এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম স্থানে নির্ম্মিত; এই জন্য প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ প্রায়ই এখানে আসিয়া পাঁচ সাত দিন বাস করিয়া যান।

রাজ-অট্টালিকায় রাজভোগে আমরা পরিতৃপ্ত হইলাম। স্বামীজি গৃহরক্ষকের পুত্রকন্যাগণের সহিত বিস্তৃত বারান্দায় বসিয়া গল্প জুড়িয়া দিলেন। আমি আজ পথশ্রমে বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাই ঘরের মধ্যে এক পার্শ্বে আমার কম্বল পাতিয়া একটু শয়নের ব্যবস্থা করিলাম। পর্ব্বত-প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া আর কিছু না হউক, নিদ্রাদেবীর সঙ্গে বিশেষ সম্প্রীতি হইয়াছিল; কোন প্রকারে একবার শয়ন করিতে পারিলেই হয়, অমনি নিদ্রাদেবী শিয়রে উপস্থিত। আমার এই পর্ব্বতভ্রমণে দুই এক দিন বিশেষ অসুখের সময় ব্যতীত কখনও নিদ্রার আরাধনা করিতে হয় নাই; বিছানা নাই, উপাধান

নাই, কঠিন পাষাণ-কঙ্কর-শয্যায় কোন দিক্ দিয়া রাত্রি চলিয়া গিয়াছে, তাহা কখনও বুঝিতে পারি নাই।

স্বামীজি মনে করিয়াছিলেন, আমি হয় ত আশে পাশে ঘুরিতে গিয়াছি; আমি এ দিকে ঘরের এক কোণে পরম সুখে নাসিকাগর্জ্জন সহকারে নিদ্রা দিতেছি। কতক্ষণ পরে ঠিক বলিতে পারি না, আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল; উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দেখি, স্বামীজি বারান্দায় নাই। এ দিক ও দিক দেখিতে দেখিতে তাঁহার সন্ধান পাইলাম, তিনি গৃহরক্ষকের কুটীর-সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া হাত-মুখ নাড়িয়া কি বক্তৃতা করিতেছেন, এবং কতকগুলি লোক হাঁ করিয়া তাঁহার কথা শুনিতেছে, কেহ কেহ বা মাথা নাড়িয়া তাঁহার কথায় সায় দিতেছে। স্বামীজি যখনই কোথাও এই প্রকার মণ্ডলী করিয়াছেন, তখনই বুঝিয়াছি, সে দিন আর সে স্থান হইতে একপদ অগ্রসর হইবার তাঁহার ইচ্ছা নাই। সেদিনে বিপদ আমারই অধিক; তাঁহার সেই সুমধুর উপদেশ, তাঁহার সেই তুলসীদাস, কবীরের শ্লোক শুনিয়া আমাদের মত পাষণ্ডের হৃদয়ই ক্ষণ-কালের জন্য কোমল হইত, আর এ সব ত ধর্ম্মপ্রাণ সরলহৃদয় পবিত্রচেতা পর্ব্বতবাসী। অনেক দিন দেখিয়াছি, স্বামীজির উপদেশ শুনিতে শুনিতে কত-জন অশ্রুবর্ষণ করিয়াছে। স্বামীজি এ ব্যবসায়ে নূতন ব্রতী নহেন; তাঁহার বাক্‌পটুতা অসাধারণ—বাল্যকাল হইতে আমি তাঁহার বাক্যে মুগ্ধ। সম্প্রদায়-বিশেষের ধর্ম্মোপদেষ্টা হইয়া যখন তিনি বাঙ্গালা দেশের গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেন, তখন তাঁহার বক্তৃতা, তাঁহার প্রাণস্পর্শী উপদেশ শুনিবার জন্য আমরা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছুটিয়া যাইতাম; তিনি তখন গ্রাম্য বালক রেজিমেণ্টের কম্যান্ডার-ইন্-চিফ রূপে বেড়াইতেন। আসাম কুলীর অত্যাচার-কাহিনী যখন তিনি বলিতেন—তখন আমরা সভয়ে সেই সব কথা শুনিতাম, প্রতিমুহূর্ত্তে নয়ন-সমক্ষে অসহায়া সতী রমণীর জীবনান্ত দৃশ্য দেখিতাম। বৃদ্ধ স্বামীজি এখনও সে তেজ ভুলিয়া যান নাই, এখনও কথা কহিতে কহিতে এক এক সময়ে বিশেষ উত্তেজিত হইতেন; কিন্তু হায়, বৃদ্ধ স্বামীজি এখন লোকালয় ছাড়িয়া এই বনভূমি আশ্রয় করিয়াছেন; তাঁহার ন্যায় একজন স্বদেশপ্রেমিক দেশহিতব্রত সন্তানকে বনে বিসর্জ্জন দিয়া আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। এখন ইচ্ছা করে, তিনি আবার তেমনি করিয়া বাঙ্গলা দেশের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া, তেমনি করিয়া আমাদের দুর্নীতি, ভগবানে অবিশ্বাস দূর করিবার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি আজ জীবিত

বাঙ্গালীর তালিকা হইতে নিজের নাম খারিজ করিয়া লইয়াছেন; তিনি বাঁচিয়া থাকিলেও আমাদের নিকট মৃত।

পর্ব্বতপ্রদেশে স্বামীজি যখন মণ্ডলীমধ্যে বসিয়া উপদেশ দিতেন, আমি তখন সে দিকে বড় ঘেঁসিতাম না; কারণ সে সময়ে আমার মনের যে প্রকার অবস্থা, তাহাতে নীরব উপদেশই আমার কাছে ভাল লাগিত; স্বামীজি তাহা জানিতেন, সেই জন্যই এতদিন তাঁহার সঙ্গে ছিলাম, কোন দিন বিশ্রাম-সময়ে আমাকে তিনি কোন উপদেশ দেন নাই। যদি কখনও কোন কথা হইয়াছে, তাহা তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রতের কথা—সেই আসামের কুলী-কাহিনী।

স্বামীজির নিকটে যাইয়া গমন প্রস্তাব করা আমার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। এতগুলি লোক একাগ্র মনে তাঁহার উপদেশ শুনিতেছে, এ সুখের ব্যাঘাত করা সঙ্গত মনে করিলাম না; অথচ আজ রাত্রিটা এখানে বাস করিতেও তেমন মন যাইতেছিল না। আমি অনন্যোপায় হইয়া সেই দীর্ঘ বারান্দায় পাদচারণা করিতে লাগিলাম। বোধ হয়, স্বামীজি আমার চলিবার ভঙ্গীতেই আমার অধীরতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন; তাই তিনি সে স্থান ত্যাগ করিয়া দ্বিতলে উঠিয়া আসিলেন, এবং তখনই বাহির হইবার প্রস্তাব করিলেন। বেলা তখন প্রায় ছয়টা, কিন্তু গ্রীষ্মকালের বেলা, তখনও দুই ঘণ্টা দিন থাকিবে। আমরা ধারাসু ত্যাগ করিয়া পথে নামিলাম। অপরাহ্ণ দেখিয়া সঙ্গী পেয়াদা আমাদিগকে ছাড়িয়া অগ্রসর হইতে অস্বীকার করিল; কারণ অপরিচিত পথ, কি জানি আমরা যদি পথ হারাইয়া যাই, তাহা হইলে এই অন্ধকার রাত্রিতে জঙ্গলে বিশেষ কষ্ট পাইব, প্রাণও যাইতে পারে। সে অঞ্চলের পথ ঘাট তাহার বিশেষ পরিচিত, সে গভীর রজনীতে সে পথে অনায়াসে চলিতে পারে।

ধারাসু হইতে একটু অগ্রসর হইয়াই মসূরী যাইবার একটা রাস্তা দেখিলাম; এ পথে পর্ব্বতবাসী পথিক ব্যতীত অন্য কেহ যাইতে সাহস করে না, কারণ পথ অতি দুর্গম; যে সমস্ত ইংরেজ গঙ্গোত্রী-দর্শনে আসিয়া থাকেন, তাঁহারা কেহই এ পথে কখনও যান নাই; তবে পাহাড়ী লোক সর্ব্বদাই এই পথে মসূরী যায়, রাস্তাও কম। এখান হইতে দুই দিনে মসূরী যাওয়া যায়, আর রাজপথ ধরিয়া তিহরী হইয়া গেলে, পাঁচ দিনের কমে আর কিছুতেই যাওয়া যায় না। মনে মনে স্থির করিলাম, যদি এ পথে

ফিরিয়া আসি, তাহা হইলে এই সোজা রাস্তায় যাইতে হইবে। এই ফিরিবার চিন্তাই আমার কাল হইয়াছিল। গঙ্গোত্রীর পথে যে আমি বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারি নাই, গঙ্গোত্রীতে যে আমি পঁহুছিতে পারি নাই, এই ফিরিবার চিন্তাই তাহার কারণ। কোন বন্ধন ছিল না, কোন টান ছিল না, তবুও এই পথে চলিবার সময়ে এক একদিন ফিরিবার বাসনা মনে প্রবল হইত। কোথায় ফিরিয়া কাহার কাছে যাইব, তাহা ভাবিয়া পাইতাম না, কিন্তু ফিরিয়া লোকালয়ে যাই, এই ইচ্ছা মধ্যে মধ্যে আমার মনে হইত। আজ যখন সঙ্গী পেয়াদা মস্থরীর সোজা পথ দেখাইয়া দিল, তখনই ইচ্ছা হইল, সেই পথে মস্থরী ফিরিয়া যাই। অন্য কোন পথে চলিতে আমার এমন মনের ভাব হয় নাই। আমি যে অনিচ্ছায় গঙ্গোত্রীর পথে গিয়াছিলাম, তাহা নহে; কিন্তু সে ইচ্ছার মধ্যেও সময়ে সময়ে ফিরিবার বাসনা প্রবল হইত। যখন সেই বাসনার সঙ্গে তর্ক করিতে বসিতাম—কেন আমি লোকালয়ে সহরে ফিরিয়া যাইব, সেখানে আমার কে আছে, সেখানে না গেলে কেহ কেহ দুঃখিত হইতে পারেন বা কাহারও মনে কষ্ট হইতে পারে; কিন্তু আমার প্রতিগমন অপেক্ষায় প্রাণটি রাস্তায় কি কেহ বসাইয়া রাখিয়াছে, আমার অভাবে কি কাহারও জীবন একেবারে অন্ধকারে ডুবিয়া যাইবে, আমার জন্য কি জগতের কোন কাজ আটকাইয়া আছে? যখন এমনই করিয়া প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া আমার বাসনাকে বিরক্ত করিয়া তুলিতাম, তখন সে বেচারী নীরব হইত; আবার কোন সুযোগে কোন দৃশ্য-সম্মুখে আমাকে উপস্থিত করিয়া, মস্থরী দেরাদুন কেন, তাহা অপেক্ষাও বহুদূরে ক্ষুদ্র গ্রামে আমার পর্ণকুটীরের কথা মনে করিয়া দিত—সেই স্নেহশীতল আশ্রয়বৃক্ষের দিকে আমার হৃদয়ের গতি ফিরাইয়া দিত। এই জন্যই গঙ্গোত্রীর পথে আমার বেশী দূর যাওয়া হয় নাই। যার পশ্চাদ্দিকে টান আছে, সে পর্ব্বতে উঠিতে পারে না।

এই সব চিন্তা ঠিক তখন আমার মনে উঠিয়াছিল কি না, কেমন করিয়া বলিব? কিন্তু আমাদের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া পেয়াদা পথের বামপার্শ্বস্থ একটি পরিত্যক্ত গ্রাম দেখাইয়া দিল। এ গ্রামের কথা আর একদিন বলিব।

শ্রীজলধর সেন।

দেবব্রত।

১

ছেড়েছি বিষয়-সুখ বিলাস-বাসনা,
হৈমপুরী হস্তিনার রাজসিংহাসন;
ধরেছি কৌমার-ব্রত কঠোর সাধনা,
শুভ্র বাক্যে, দেহে, মনে শুভ্র আচরণ;
ভীষণ তরঙ্গ 'পরি
ভাসায়ে জীবন-তরী
ভীষ্ম নাম করেছি গ্রহণ।

২

চারি পাশে সুগভীর রহস্য অকূল,
সৌন্দর্য্যের উচ্ছ্বসিত অসীম বিকাশ;
ফুটিছে টুটিছে কত কিরণের ফুল,
জ্বলিছে নিবিছে কত জ্যোতিষ্কের হাস;
কত কণ্ঠে কত গান
সুখের দুখের তান
উঠিছে পড়িছে বারো মাস।

৩

তারি মাঝে ভাসমান ভীষ্মের তরণী
ফেনিল সলিল-ভঙ্গে দুলিছে হেলায়,
কভু হেরি' উর্ম্মিবরে উল্লাসে অমনি
আশার ক্ষেপণীভরে নাচিতেছে তায়!
কভু দ্রুত কভু ধীর,
উন্নত আনত শির,
উৎসাহের প্রতিমার প্রায়।

৪

গুরু গরজনে আসে জলদ সজল,
ঝম্ ঝম্ বারিরাশি ঝরে অনিবার;
আসে পুনঃ শুভ্র হাস্যে শরৎ বিমল,
মধুনিশি পৌর্ণমাসী-পূর্ণ সুষমার;
ছয় ঋতু আসে যায়,
কত মৌন ছবি তায়
জেগে উঠে মনের মাঝার।

৫

প্রভাতে পূরবে যবে করি দরশন
রঞ্জিত মেঘের মাঝে দিগন্তের গায়
জবা-কুসুমের কান্তি গলিত কাঞ্চন
নবোদিত তপনের বরণ-বিভায়,
হেরি কার প্রেম-মুখ
পুলকিয়া উঠে বুক,
কোথা বীণা বেজে উঠে, হায়!

৬

মধ্যাহ্নে মগন ধ্যানে স্তম্ভিত ভূতল;—
কভু অতি দূরাগত পাপিয়ার তান,
কভু বা কপোত-কণ্ঠে করুণ তরল
উঠি' সুর সুমধুর বিকলে পরাণ,
তারি সাথে কার কথা
জাগায়ে বিজন ব্যথা,
ভেসে যায় সজল নয়ান।

৭

সন্ধ্যায় বিমুগ্ধ নেত্রে নিশ্চল নীরব
দিবসের শ্রান্তি যবে ভুলিবারে চাই,
কোথা হ'তে আসে কানে ঘণ্টা-ঘনরব,
কার সে আরতি-শঙ্খ শুনিবারে পাই;
কেমন মন্দির, হায়!
কেমন সে মূর্ত্তি তা'র,
শূন্য মনে ভাবি আমি তাই।

৮

নিশীথে নিদ্রায় যবে মগ্ন চরাচর,
শুধু মোর নেত্র 'পরে জাগে জাগরণ,
হেরি আমি,—অহো আমি কিবা ভাগ্যধর!
যা' দেখিনু সে ত নহে নিশার স্বপন!
নিশ্চয় নিশ্চয় মোর
ছিঁড়িবে মরণ-ডোর,
ধন্য হবে মানব-জীবন!

৯

হেরি আমি দেবসভা অপূর্ব্ব সুন্দর,
তারি মাঝে স্বর্ণাসনে মূরতি-যুগল;—
একের বঙ্কিমঠাম বাঁশরী-অধর,
অন্যের আননে হাসি প্রসন্ন সরল!
একের বরণ কালো,
অন্যের সকলি আলো,
যুগ্মরূপে চোখে আনে জল।

১০

কভু হেরি রত্নরথ গরুড়কেতন,
আলো পাশে কালো শশী সম্মুখে আমার!
ধাই আমি ধরিবারে,—হারাই চেতন,—
দূরে—বহু দূরে তারে নিরখি আবার!
নিরখি নক্ষত্রপ্রায়
নীরবে মিশিয়া যায়
নব নীল নীলিমা মাঝার।

১১

হে সুন্দর! দেখা দিয়ে লুকালে কোথায়?
হের আজি তোমা বিনা আঁধার ধরণী;
এ অকূল সিন্ধুনীরে তরঙ্গ-দোলায়
বৃথা কি ভাসানু তবে যৌবন-তরণী?
সহসা নিশার প্রাণ
ফেটে হয় শতখান,
কর্ণে মোর বরষে অশনি!

১২

"ধা'ছ তরী, ভক্ত মোর, না হও নিরাশ;
অদূরে অদৃষ্ট তব সমুজ্জ্বল ভায়;
একদিন শুভক্ষণে সম্মুখে প্রকাশ
এই মূর্ত্তি পুনর্ব্বার দেখাব তোমায়;
বিচিত্র সাধন ডোরে
তুমি বাঁধিয়াছ মোরে,
তাই কৃষ্ণ জন্মিব ধরায়।"

১৩

কৃষ্ণ তুমি? কৃষ্ণ তবে দেবতা আমার?
কৃষ্ণ নামে করিব কি তব আরাধন?
দীন আমি,—মোর লাগি কৃষ্ণ-অবতার?
হবে কৃষ্ণ? হবে কালো? কালিন্দী-বরণ?
হে বাঞ্ছিত! যে বা হও,
যেথা বা জনম লও,
দেবব্রতে দিও শ্রীচরণ।

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ।

নূতন মুদ্রাযন্ত্র।

আধুনিক বিজ্ঞানের কীর্ত্তিকাহিনী শুনিলে বাস্তবিকই বিস্মিত হইতে হয়। নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সহিত উন্নত যান্ত্রশিল্পিগণের কৌশল মিলিত হইয়া, জড়বিজ্ঞানের মহিমা ক্রমেই অতি উচ্চ করিয়া তুলিতেছে। জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এডিসনের কীর্ত্তির কথা পাঠক পাঠিকাগণ অবশ্যই শুনিয়াছেন—তাঁহার ফোনোগ্রাফ্ ও বিদ্যুদুৎপাদক যন্ত্রের ন্যায় সংসারের দৈনিক কার্য্যের ব্যবহারোপযোগী অনেক যন্ত্র আজ কাল উদ্ভাবিত হইতেছে। ইহাদের প্রত্যেকেই অতি সূক্ষ্মভাবে নির্ম্মিত; এ প্রকার সুব্যবস্থিত এবং শিল্পচাতুর্য্যপূর্ণ যন্ত্র যে মানববুদ্ধিসাধ্য হইতে পারে, বোধ হয়, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, কেহ কল্পনাই করিতে পারিতেন না। বৃহৎ বৃহৎ রাশির গুণন ও ভাগকরণ প্রভৃতি গণিতের প্রক্রিয়াও, অতি অল্প সময়ে এবং নির্ভুলরূপে যন্ত্র দ্বারা সাধিত হইতেছে,—ইহা অপেক্ষা অধিক বিস্ময়কর কার্য্য আর কি হইতে পারে? সম্প্রতি এই প্রকার আশ্চর্য্যজনক আর একটি যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে,—ইহা দ্বারা সংবাদপত্র ও গ্রন্থাদির মুদ্রনকার্য্য অতি শীঘ্র সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রচলিত মুদ্রাঙ্কনকার্য্যে, যে প্রকার ধাতুময় অক্ষরগুলি এক একটি করিয়া বাছিয়া সাজাইতে হয়, উক্ত নবোদ্ভাবিত যন্ত্রে তাহার কিছুই আবশ্যক হয় না, এবং প্রচলিত প্রথায় সুচারুরূপে অক্ষরবিন্যাস করিতে যে কৌশল ও অভ্যাসের প্রয়োজন হয়, নূতন প্রথায় তাহারও আবশ্যকতা নাই,—যে কোনও পরিচিতাক্ষর অনভ্যস্ত ব্যক্তি দ্বারাও সুন্দররূপে মুদ্রাঙ্কন সম্পন্ন হইতে পারে।

এই নূতন মুদ্রাযন্ত্র, দুই অংশে বিভক্ত;—প্রথম অংশ দ্বারা অক্ষরবিন্যাস, এবং দ্বিতীয়টির সাহায্যে অক্ষরগঠন হইয়া থাকে। আধুনিক মুদ্রন-ব্যাপারে, যে প্রকার পূর্ব্বপ্রস্তুত অক্ষর

লইয়া কার্য্য করিতে হয়, ইহাতে তাহার কোনও আবশ্যকতা হয় না।—কোন হস্তলিপি মুদ্রিত করিতে হইলে, তাহার সমস্ত অক্ষরগুলি, অতি সহজে পৌর্ব্বাপর্য্যরূপে যন্ত্র দ্বারা ঢালাই হইয়া থাকে। এই মুদ্রাযন্ত্রের প্রথমোক্ত অংশটি, অর্থাৎ অক্ষরবিন্যাসযন্ত্র, অতি সুব্যবস্থিত;—হার্‌মোনিয়ম্ বা পিয়ানোর চাবির ন্যায়, ইহাতে বর্ণমালার সমগ্র অক্ষরাঙ্কিত কতকগুলি চাবি আছে—দেখিতে কতকটা আধুনিক টাইপ্ রাইটারের ন্যায়; কিন্তু টাইপ্ রাইটারে যে প্রকার অক্ষরাঙ্কিত চাবিটি টিপিলেই অক্ষরটি যন্ত্রসংলগ্ন কাগজে মুদ্রিত হইয়া যায়, ইহার ব্যবস্থা সেরূপ নয়। এক খণ্ড অনতিপ্রসর দীর্ঘ কাগজ এই কলে আবদ্ধ থাকে; হস্তলিপি দেখিয়া অক্ষরাঙ্কিত চাবি টিপিলেই সূচ্যগ্র-উৎপন্ন চিহ্নের ন্যায় কতকগুলি ছিদ্র উক্ত কাগজ খণ্ডে অঙ্কিত হইয়া যায়। এই প্রকারে সমস্ত হস্তলিপির অক্ষরব্যঞ্জক চিহ্নগুলি অঙ্কিত হইলে. কেবল উক্ত কাগজখানি দ্বারা যন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে অক্ষরগঠন হইয়া থাকে। প্রচলিত অক্ষরবিন্যাস-প্রথায় বাক্যগুলির মধ্যে নির্দ্দিষ্ট অন্তর, এবং ছত্রগুলির মধ্যে নিয়মিত ব্যবধান রাখা বড়ই কঠিন,—নূতন যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কনের সৌষ্ঠবসাধক এই কার্য্যগুলি, অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ছত্রের কতদূর অক্ষরবিন্যাস হইল, তাহা বাহির হইতে জানিবার উপায় আছে; আবার প্রত্যেক ছত্রের এবং প্রত্যেক পৃষ্ঠার অক্ষরবিন্যাস শেষ হইলে, যন্ত্র হইতে স্বতঃই এক শব্দ উৎপন্ন হইয়া, মুদ্রাকরকে সতর্ক করিয়া দেয়, এবং তৎপরে নূতন ছত্র বা নূতন পৃষ্ঠার বিন্যাস-আরম্ভে যে যে চাবি টিপিতে হইবে, সেগুলি নিতান্ত অজ্ঞ ব্যক্তিরাও যাহাতে সহজে বুঝিতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা আছে। যন্ত্রের দ্বিতীয়াংশ অর্থাৎ ঢালাই যন্ত্রটির গঠন কিঞ্চিৎ জটিল,—পূর্ব্ববর্ণিত ছিদ্রাঙ্কিত কাগজখণ্ড ইহাতে প্রবেশিত করিয়া, যন্ত্রস্থ অপর এক ছিদ্রপথ দ্বারা গলিত ধাতু নীত করিলেই, হস্তলিপির অক্ষরগুলি যথাযথ স্থানে গঠিত হইয়া যায়। পাঠকপাঠিকাগণ মনে করিতে পারেন, এই অক্ষরগঠন-প্রথা অধিক সময়সাপেক্ষ, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নয়। গলিত ধাতু কঠিন হইতে যে সময় আবশ্যক হয়, সেই কালমধ্যেই সুসজ্জিত ও সুন্দর অক্ষরপূর্ণ মুদ্রাফলক প্রস্তুত হইয়া যায়। তার পর সাধারণ উপায়ে মসী দ্বারা গ্রন্থাদি মুদ্রিত হইয়া থাকে। এই প্রকারে মুদ্রনকার্য্য শেষ হইলে, সেই অক্ষরগুলি পুনরায় গলাইয়া, তাহাই আবার অপর হস্তলিপির অক্ষরগঠনে প্রযুক্ত হয়। এই যন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়াগুলি এত শীঘ্র সম্পাদিত হয় যে, তাহা প্রত্যক্ষ করিলে বাস্তবিকই বিস্মিত হইতে হয়। সংবাদপত্র-মুদ্রাঙ্কনকার্য্যে এই প্রথা বিশেষ সুবিধাজনক হইয়াছে। গ্রন্থাদি-মুদ্রনেও সুবিধা বড় অল্প নয়,—কোন গ্রন্থ, এই যন্ত্রে একবার মুদ্রিত করিয়া, উক্ত অক্ষরফলকগুলি না গলাইয়া রাখিয়া দিলে, গ্রন্থের পুনর্মুদ্রন-কার্য্য অতি অল্পব্যয়েই সম্পন্ন হইতে পারিবে।

ইতিমধ্যেই য়ুরোপের অনেক সংবাদপত্র-প্রচারক, এই যন্ত্র দ্বারা মুদ্রনকার্য্য করিয়া, একবাক্যে ইহার উৎকর্ষ স্বীকার করিতেছেন। আমাদের দেশেও অনেক সম্পাদক ও গ্রন্থকারকে মুদ্রন-বিভ্রাটে প্রায়ই ব্যতিব্যস্ত হইতে দেখা যায়, এই নূতন যন্ত্রটির কল্যাণে এ দেশের কিছু উপকার হইবে কি?

বৃহত্তম দূরবীক্ষণ।

আজ কাল যে সকল জ্যোতিষিক আবিষ্কার হইতেছে, আধুনিক উন্নত যন্ত্রই তাহার মূল কারণ বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। বর্ত্তমান শতাব্দীতে গণিতশাস্ত্রের মূলগত কোন বিশেষ উন্নতি হয় নাই; সেই কেপ্‌লারপ্রমুখ প্রাচীন মনীষিগণের প্রকটিত নিয়মাবলী নাড়াচাড়া করিয়া, আকাশপরিদর্শনোপযোগী উন্নত যন্ত্রের সাহায্যেই, আজকাল জ্যোতির্বিদ্যার কলেবর পুষ্ট হইতেছে। রশ্মিনির্ব্বাচনযন্ত্র (Spectroscope) উদ্ভাবিত না হইলে,

গ্রীন্‌উইচের মানমন্দিরে বসিয়া, কোটিযোজনদূরস্থিত জ্যোতিষ্কপুঞ্জের গঠনোপাদানের আবিষ্কার সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া পড়িত; আর দুরবীক্ষণের ক্রমোন্নতি সাধিত না হইলে, গ্যালিলিওর অসম্পূর্ণ যন্ত্র দ্বারা, বৃহস্পতির পঞ্চম উপগ্রহ আবিষ্কার কত দুর সহজসাধ্য হইত, পাঠকপাঠিকাগণ বিবেচনা করুন। যন্ত্রবিদ্যার সেই দীন অবস্থায়, বোধ হয়, অসাধারণ গণিতজ্ঞ লেভেরিয়ারও, বরুণগ্রহ আবিষ্কার করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইবার সুযোগ পাইতেন না।

জ্যোতির্বিদ্যার উন্নতি বৃহৎ দুরবীক্ষণের উপরই নির্ভর করিতেছে দেখিয়া, য়ুরোপ ও আমেরিকার প্রধান প্রধান মানমন্দিরে যাহাতে উন্নত দুরবীক্ষণ ব্যবহৃত হয়, তাহার ব্যবস্থার জন্য, জ্যোতিষিগণ অনেক দিন অবধি বহু আয়োজন করিতেছেন। বৃহৎ দুরবীক্ষণ-নির্ম্মাণ, অতীব কষ্টসাধ্য ব্যাপার; ইহার সুদীর্ঘ নলিকা নির্ম্মাণ বিশেষ কঠিন নয়; এই নলের মধ্যে যে বৃহৎ কাচখণ্ডগুলি আবদ্ধ থাকে, তৎগঠনেই নির্ম্মাতৃগণকে বিশেষ গোলযোগে পড়িতে হয়; একটি নাতিবৃহৎ দুরবীক্ষণ নির্ম্মাণ করিতে হইলেও, কাচ ঢালাই করিয়া, তদ্দ্বারা একেবারেই দুরবীক্ষণ নির্ম্মাণ করা অতি সুচতুর শিল্পীরও অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে না। এই সকল নানা প্রতিকূল কারণে, প্রচুর অর্থব্যয়েও একটি বৃহৎ দুরবীক্ষণ নির্ম্মাণ বড় সহজ নয়। পাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় অবগত আছেন, দুরবীক্ষণের বস্তুখণ্ড * যতই বৃহত্তর, যন্ত্রের শক্তিও ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত নানা কারণে জগতে বৃহৎবস্তুখণ্ডযুক্ত দুরবীক্ষণ প্রায়ই দেখা যায় না। সুবিখ্যাত লিক্ মানমন্দিরের দুরবীক্ষণে বস্তুখণ্ডের ব্যাস ৩৬ ইঞ্চি, এবং রুসিয়ার রাজকীয় দুরবীক্ষণের ব্যাস কেবল ৩০ ইঞ্চি মাত্র; বহুকাল এই দুইটি যন্ত্রই পৃথিবীর বৃহৎ দুরবীক্ষণ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। ইংলণ্ডের গ্রীন্‌উইচ্ মানমন্দিরে, অনেক দিন অবধি দ্বাদশ-ইঞ্চি-ব্যাসযুক্ত দুরবীক্ষণ দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ-কার্য্য সাধিত হইয়া আসিতেছিল; কয়েক বৎসর হইল, তথায় একটি ২৮ ইঞ্চি দুরবীক্ষণ স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু পরিদর্শনাগারের যথাস্থানে যন্ত্রটি স্থাপিত না হওয়ায়, সেটি এখন এক প্রকার অব্যবহার্য্য অবস্থাতেই রহিয়াছে। আমেরিকার লিক্ মানমন্দিরের পূর্ব্বোক্ত দুরবীক্ষণ অপেক্ষা বৃহত্তর যন্ত্রের নির্ম্মাণ, একরূপ অসম্ভব বলিয়াই বিশ্বাস ছিল; সম্প্রতি আমেরিকার চিকাগো নগরে ৪০-ইঞ্চি-ব্যাসযুক্ত একটি দুরবীক্ষণ নির্ম্মিত হওয়ায়, উক্ত বিশ্বাস সম্পূর্ণ অপনীত হইয়াছে।

চিকাগোর উক্ত দুরবীক্ষণ কেবল সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নয়; এই জাতীয় যন্ত্র দ্বারা আকাশ-পরিদর্শনকালে, স্বতঃই যে সকল অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, নির্ম্মাতার শিল্পনৈপুণ্যে, তাহার কিছুই ভোগ করিতে হয় না।—রশ্মিনির্ব্বাচনযন্ত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কপর্য্যবেক্ষণের অত্যাবশ্যক যন্ত্রগুলিও দুরবীক্ষণে সংলগ্ন আছে। জার্কিস্ নামক জনৈক বিজ্ঞানোৎসাহী মার্কিন্ ভদ্রলোক, এই অসাধারণ যন্ত্রনির্ম্মাণের সমগ্র ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা সর্ব্বাংশে অপকৃষ্ট লিক্ মানমন্দিরের দুরবীক্ষণটি নির্ম্মাণ করিতে ২১ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল; সেই অনুপাতে জার্কিসের যন্ত্রনির্ম্মাণে কত ব্যয় হইয়াছে, পাঠকপাঠিকাগণ অনুমান করুন। যন্ত্রটির দৈর্ঘ্য প্রায় পঞ্চাশ হাত, ইহার ভারও বড় অল্প নয়, তৎসংলগ্ন নানা যন্ত্রের সহিত, সমবেত ভার ৫৬০ মণেরও অধিক হইবে। পাঠক মনে করিতে পারেন, এই প্রকার একটা বৃহৎ যন্ত্রের যথেচ্ছ ব্যবহার বড় কঠিন, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নয়। ইহা এমন সুকৌশলে স্থাপিত হইয়াছে যে, একটি চাবি টিপিলেই, দুরবীক্ষণকে যদৃচ্ছ চালিত করা যায়; এতদ্ব্যতীত পর্য্যবেক্ষণ-প্রাঙ্গণটি এমন সুকৌশলে নির্ম্মিত যে, সমগ্র প্রাঙ্গণটিই পরি-

* অর্থাৎ Object-glass,—যে কাচখণ্ড যন্ত্রের পুরোভাগে সংলগ্ন থাকে, পরিদর্শনকালে ইহা দর্শনীয় বস্তুর অভিমুখে উন্মুক্ত রাখা হয়।

দর্শকের ইচ্ছানুরূপ উন্নত বা অবনত করা যাইতে পারে। জ্যোতিষ্কগণ পৃথিবীর আহ্নিক গতি হেতু আকাশে চঞ্চল অবস্থায় বিচরণ করে; এজন্য কোন নক্ষত্র অধিক কাল ব্যাপিয়া পরিদর্শন করিতে হইলে, নক্ষত্রের গতির সহিত দুরবীক্ষণের অপসরণও আবশ্যক হইয়া পড়ে;—জার্কিসের দুরবীক্ষণে এই কার্য্য যন্ত্র দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। কোন এক জ্যোতিষ্ক লক্ষ্য করিয়া দুরবীক্ষণটি একবার স্থাপিত করিলে, একঘণ্টাকাল মধ্যে তাহার আর পুনঃস্থাপন আবশ্যক হয় না।

জার্কিস্ এই দুরবীক্ষণনির্ম্মাণে অনেক সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, নচেৎ পূর্ব্বোক্ত-প্রকার একটি নূতন যন্ত্রের আমূলনির্ম্মাণ আরও ব্যয়সাধ্য হইত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কালিফর্ণিয়া প্রদেশে একটি বৃহৎ দুরবীক্ষণ নির্ম্মাণের প্রস্তাব হয়,—নির্ম্মাণকার্য্যও কতকটা অগ্রসর হইয়াছিল; কিন্তু ইতিমধ্যে কোন বিশেষ কারণে কালিফর্ণিয়াবাসিগণ দুরবীক্ষণ-নির্ম্মাণসংকল্প ত্যাগ করেন। জার্কিস্ এই সুযোগে কল্পিত যন্ত্রটির দৃষ্টিখণ্ডের কাচখানি হস্তগত করিয়াছিলেন; এতদ্দ্বারা যন্ত্রনির্ম্মাতৃগণকে কাচ ঢালাইয়ের অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই;—কিন্তু এই সুযোগ সত্ত্বেও কাচখানি নিয়মিত আকারে গঠন করিতে, সুবিখ্যাত আলোকতত্ত্ববিদ্ ক্লার্ক সাহেবের চারি বৎসর সময় কঠোর পরিশ্রমে ব্যয়িত হইয়াছিল। উক্ত কাচখণ্ড এত সূক্ষ্মভাবে গঠিত হইয়াছে যে, তদুপরি কিয়ৎকাল অঙ্গুলি ঘর্ষণ করিলে কাচের যে ক্ষয় সাধিত হয়, তদ্দ্বারাও দুরবীক্ষণটি একবারে অব্যবহার্য্য হইয়া যাইতে পারে। নানাদেশীয় পণ্ডিতগণ বলিতেছেন, কোটি মুদ্রা ব্যয়েও, কেহই এ প্রকার বৃহৎ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন না,—ইহার বস্তুখণ্ডের কাচখানি নিশ্চয়ই কোনও দৈব অনুকম্পায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া পড়িয়াছে।

বৃহৎ দুরবীক্ষণ নির্ম্মিত হইলেই, তাহার ক্ষমতার অনেক "আজ্‌গবি" সংবাদ প্রকাশিত হয়; ফরাসী যান্ত্রশিল্পিগণ আগামী ১৯০০ খৃষ্টাব্দীয় মহাপ্রদর্শনীতে, দুরবীক্ষণ দ্বারা চন্দ্রদেবকে ভূপৃষ্ঠ হইতে দুই মাইল ব্যবধানে আনয়ন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন!—ইঁহাদের আয়োজনের কি ফল ফলিবে, পাঠকপাঠিকাগণ তাহা বিবেচনা করুন। বলা বাহুল্য, জার্কিসের দুরবীক্ষণ দ্বারা পূর্ব্বোক্তপ্রকার অলস স্বপ্নের সার্থকতা হইবে না। ষাট মাইল ব্যবধানে চন্দ্র যত বৃহৎ দেখায়, ইহা দ্বারা চন্দ্রদেবকে তদনুরূপ দেখা যাইবে। নিকৃষ্ট লিক্ দুরবীক্ষণ দ্বারা অনেক জ্যোতিষিক আবিষ্কার হইয়াছে,—বৃহস্পতির পঞ্চম উপগ্রহের অস্তিত্বও ইহার সাহায্যেই প্রথম দৃষ্ট হইয়াছিল; তদপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট জার্কিসের দুরবীক্ষণ দ্বারা যে কোন আবিষ্কার হইবে না, এ কথা বলা যায় না।

নির্ধূম অগ্নি।

তাপ ও আলোক অগ্নির প্রধান ধর্ম্ম,—এই শক্তি প্রাত্যহিক কার্য্যে প্রযুক্ত করিবার জন্য, মানুষ অগ্নির সাহায্য গ্রহণ করে। শুষ্ক কাষ্ঠ, কয়লা ও তৈল প্রভৃতি দাহ্য পদার্থে যে অগ্নি-জননী শক্তি নিহিত থাকে, তদ্দ্বারা অগ্নির উৎপাদন করিলে উক্ত শক্তির সম্পূর্ণ সদ্ব্যয় হয় না; অপর কোন সুব্যবস্থা না থাকিলে তাহার অধিকাংশই ধূম, বাষ্প ও ভস্মাদির উৎপাদনে অপব্যয়িত হয়। দাহ্যপদার্থমাত্রই অঙ্গার-(Carbon)-বহুল; যখন এই অঙ্গার, বায়ুস্থিত অম্লজান (Oxygen) বাষ্পের সহিত মিলিত হইয়া দ্ব্যম্লাঙ্গারক বাষ্পের (Carbonic acid gas) উৎপাদন করে, তখন যে রাসায়নিক তাপ উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারাই অগ্নি উদ্দীপিত হইয়া থাকে। দাহ্যপদার্থস্থ সমস্ত অঙ্গারকেই এই প্রকারে দ্ব্যম্লাঙ্গারে পরিণত করা বড় কঠিন। কাষ্ঠাদি সাধারণ উপায়ে প্রজ্বলিত হইলে, তাহার অঙ্গারের অনেক অংশই ভস্মে ও ধূমাকারে পরিবর্ত্তিত হয়; কাজেই যথেষ্ট তাপ ও আলোক উৎপন্ন হয় না। পাঠকপাঠিকাগণ দেখিয়া

থাকিবেন, চঞ্চল বায়ুতে দীপশিখা উন্মুক্ত রাখিলে, শিখা হইতে অত্যন্ত ধূম নির্গত হইয়া আলোক ম্লান হইয়া পড়ে, এবং তৈলও অধিক দগ্ধ হইয়া যায়। আজ কাল কেরোসিন দীপশিখার উপরে যে কাচনির্ম্মিত চিম্‌নি দেখা যায়, তাহা কেবল তৈলস্থ সমগ্র অঙ্গারকে দ্ব্যম্লাঙ্গারে পরিণত করিবার জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে; এই কারণে দীপশিখা চিম্‌নি-আবৃত হইবামাত্রই, তৈলস্থ যে সকল অঙ্গার পূর্ব্বে রাসায়নিক কার্য্যে যুক্ত না হইয়া ধূমাকারে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতেছিল, সেগুলি সম্পূর্ণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রযুক্ত হওয়ায়, দীপ-শিখা নির্ধূম ও পরিচ্ছন্ন হইয়া থাকে। আজকাল নানা দেশে রন্ধনাদি কার্য্যের জন্য উক্ত প্রথায় নানা প্রকার চুল্লী নির্ম্মিত হইতেছে; যে সকল উননের গঠনকৌশলে ইন্ধনস্থ অঙ্গার ধূমোৎপাদন না করিয়া কেবল পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তাপ উৎপাদিত করে, তাহাই জনসমাজে বিশেষ আদৃত হইয়া থাকে।

সাধারণ চুল্লীতে ধূমোৎপাদনজনিত ইন্ধনের অপব্যবহার দেখিয়া, বহুকাল হইতে বিজ্ঞানবিদ্‌গণ নির্ধূম অগ্নি উৎপাদনের জন্য সচেষ্ট রহিয়াছেন। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে নির্ধূম অগ্নি প্রজ্বালনের উপযোগী দুই একটি চুল্লীও নির্ম্মিত হইয়াছে; কিন্তু তাহার নির্ম্মাণব্যয় অত্যন্ত অধিক বলিয়া প্রাত্যহিক গৃহকার্য্যের জন্য সেগুলি এত দিন কোন দেশেই ব্যবহৃত হয় নাই। সম্প্রতি মেয়ার (Fritz Maier) নামক জনৈক অষ্ট্রীয়ান্ বিজ্ঞানবিদ্ নির্ধূম অগ্নির জন্য এক প্রকার সুলভ ও সুন্দর চুল্লী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, সাধারণ উননে যে পরিমাণ ইন্ধন ব্যয় হয়, এই চুল্লীতে তাহার এক তৃতীয়াংশ অল্প ব্যয়িত হইবে। দুঃখের বিষয়, ইহা আজও গার্হস্থ্য ব্যবহারের উপযোগী করিয়া নির্ম্মিত হয় নাই; বাষ্পীয়যান ও কলকারখানায় যাহাতে ইহার ব্যবহার হয়, এখন নির্ম্মাতা তাহারই জন্য সচেষ্ট রহিয়াছেন। অগ্নি নির্ধূম করিতে হইলে, অগ্নি-সংশ্লিষ্ট বায়ু সর্ব্বদা নিয়মিত রাখা আবশ্যক; উক্ত চুল্লীতে এই কার্য্য অতি সুকৌশলে সম্পন্ন হইয়া থাকে। সাধারণ বাষ্পীয় যন্ত্রে যে প্রকার চুল্লীদ্বার থাকে, ইহাতে তাহা নাই; ইন্ধনাদি নিয়মিতরূপে অপর পথ দিয়া অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয়, এবং দগ্ধাবশিষ্ট পদার্থ স্থানান্তরিত করা ও অগ্নি-উদ্দীপন প্রভৃতি কার্য্যও কলে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

অষ্ট্রিয়ার রাজকীয় বাষ্পীয়পোতাদি আজকাল এই চুল্লী দ্বারা চালিত হইতেছে, এবং তত্রত্য কলকারখানাতেও এই নূতন চুল্লী গৃহীত হইয়াছে। মেয়ারস্‌ সাহেব যে সকল সুবিধার কথা বলিয়াছেন, তাহা সত্য হইলে সকল দেশেই যে তাঁহার আবিষ্কৃত অভিনব চুল্লীর বহুল প্রচলন হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বলা বাহুল্য, সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা প্রভৃতির ন্যায় কারখানা-বহুল নগরের অধিবাসিগণও একটু নির্ধূম স্নিগ্ধ বায়ু সেবন করিয়া শান্তিলাভ করিবেন।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

বহুবিবাহ।

বহুবিবাহের আর এক কারণ, পুরুষের উপর স্ত্রীলোকের রূপ ও যৌবনের আকর্ষণ। রূপ অবশ্যই মোহের জন্যই হইয়াছিল; কিন্তু স্ত্রীলোকের রূপ বুঝি পাগল করিবার জন্য হইয়াছিল। পুরুষজাতি, যত কেন সভ্য হউক না, স্ত্রীলোকের রূপের অনল জ্বলিতে দেখিলে, তাহাতে ঝাঁপ দিবার জন্য বহ্নিমুখ-বিবিক্ষু পতঙ্গের ন্যায় ব্যাকুল হয়, দগ্ধ হইতে হইবে কি না, তাহা পর্য্যন্ত ভাবিবার মত ধৈর্য্য রাখিতে পারে না। অনেক সময় পুড়িতে হইবে জানিয়াও ঝাঁপ দেয়। এই আকর্ষণের প্রভাব যে কিরূপ দুরতিক্রম্য, তাহা আমাদের পুরাণাদিতে বর্ণিত ঋষিদিগের বৃত্তান্তে অতি জাজ্জ্বল্যমানরূপে দেখা যায়। সংসারত্যাগী, ভোগলালসারহিত, চিরসংযত, তপোনিরত, ব্রহ্ম-নিষ্ঠ ঋষি একাগ্রচিত্তে তপস্যা করিতেছেন; অমরাবতী হইতে প্রেরিতা কোন অপ্সরার একটু বিভ্রম-বিলাস দেখিলেন, আর অমনি একেবারে জ্ঞানশূন্য হইয়া একটা কাণ্ড করিয়া ফেলিলেন! অন্যের কথা কি, স্বয়ং মহাদেব এক দিন এই আকর্ষণের প্রভাবে বিচলিত হইয়াছিলেন। রূপ-যৌবনের আকর্ষণ কি ভয়ঙ্কর মনে কর দেখি! সুসভ্য সমাজে মানুষকে এই আকর্ষণের প্রভাব হইতে রক্ষা করিবার জন্য কত না প্রয়াস, কত না অনুষ্ঠান, কত না শাসন —ধর্ম্মের শাসন, নীতির শাসন, সমাজের শাসন, রাজবিধির শাসন,—সংযম-শিক্ষার জন্য একনিষ্ঠার মাহাত্ম্য, ইন্দ্রিয়দমনের মাহাত্ম্য, শতরূপে ঘোষিত হইতেছে; অথচ প্রকৃতির স্বহস্তরচিত এই ফাঁদে মানুষ প্রতিনিয়তই ঝাঁকে ঝাঁকে পড়িতেছে। অনেক সভ্য সমাজে একাধিক পত্নীগ্রহণ একেবারেই নিষিদ্ধ; যে সকল সভ্য সমাজে তাহা নহে, সেখানেও বহুবিবাহ অর্থসাপেক্ষ এবং বহুবিধ পারিবারিক অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার আকর; সুতরাং সুসভ্য মনুষ্য এই আকর্ষণের প্রভাবে বহুবিবাহ করে না বটে, কিন্তু ব্যভিচারাদি সামাজিক পাপে সচরাচরই পতিত হয়। অসভ্য সমাজে, যেখানে আত্মসংযম-শিক্ষা নাই বলিলেই হয়, যৌননীতি যারপরনাই শিথিল, স্ত্রীলোক সম্পত্তি-মাত্র, বহু স্ত্রী নিন্দনীয় হওয়া দূরে থাক, বরং গৌরবের বিষয়; ভাষায় 'প্রেম' বা 'ভালবাসা' বলিয়া কোন শব্দ পর্য্যন্ত নাই, সেখানে লোকে এই অনভি-ভবনীয় আকর্ষণের বশবর্ত্তী হইয়া যে বহু স্ত্রী আত্মসাৎ করিবে, ইহা সহজেই অনুমেয়।

আর। অসভ্যদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের রূপযৌবন বড় স্বল্পকালস্থায়ী। ...ম-নিবন্ধনই হউক, অপরিণত বয়সে পুরুষ-সহবাস-নিবন্ধনই হউক, দীর্ঘ কাল স্তন্যের দ্বারা সন্তান পালন করিতে হয় বলিয়াই হউক, বা এই সকল কারণের সমবায়েই হউক, অসভ্য রমণীর রূপ ও যৌবন অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প বয়সে লয়প্রাপ্ত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, তাপাধিক্যও অকালবার্দ্ধক্যের একটা কারণ;—শীতপ্রধান দেশ অপেক্ষা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে স্ত্রীলোকের যৌবনের শীঘ্র অবসান হয়। সে যাহা হউক, অসভ্য জাতির মধ্যে এবং তাপপ্রধান দেশে স্ত্রীলোক যে অতি অল্পকালের মধ্যে বিগতযৌবনা হয়, তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। পাউয়ার্স সাহেব বলেন যে, কালিফর্ণিয়ার স্ত্রীলোকেরা বিবাহের পূর্ব্বে দেখিতে বেশ সুশ্রী থাকে, কিন্তু পঁচিশ বা ত্রিশ বৎসর বয়সেই অতিশ্রমে ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং কুৎসিত হইয়া উঠে। মণ্ডল জাতির স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য বিবাহের পর অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিরোহিত হয়। ওয়ারাউ জাতির স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে শোম্বর্গ লিখিয়াছেন যে, কুড়ি বৎসর বয়স হইতে ইহাদের যৌবনের প্রভা বিলুপ্ত হয়। মিসর দেশের স্ত্রীলোকেরা চতুর্দ্দশ হইতে বিংশতি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নারীসুলভ অঙ্গসৌষ্ঠব ও সৌকুমার্য্য বিষয়ে স্ত্রীজাতির আদর্শস্থানীয়া, কিন্তু বিংশতি বৎসর অতিক্রম করিলেই তাহার কিছুই আর থাকে না। সাহারা-প্রদেশের আরব স্ত্রীলোকদিগের যৌবনের নবীনতা ও প্রফুল্লতা ষোড়শ বৎসর বয়সের অধিক থাকে না; এবং বাথিলে জাতির স্ত্রীলোকের পঞ্চবিংশতি বৎসরে সৌন্দর্য্যের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়। ফুলা জাতির স্ত্রীলোকেরা বিংশতি বৎসর বয়সের ঊর্দ্ধে ক্বচিৎ গর্ভধারণ করে; এবং এমিন পাশা বলেন যে, উনিওরো-প্রদেশে তিনি পঁচিশ বৎসর বয়সের স্ত্রীলোকের 'কোলের ছেলে' কখন দেখেন নাই। এই সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, অসভ্য জাতির পুরুষেরা প্রাপ্তযৌবনে প্রায় নিজের সমবয়স্কা স্ত্রী গ্রহণ করে। সুতরাং ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, পুরুষের যৌবনান্ত হইবার বহু পূর্ব্বে তাহার স্ত্রী যৌবনের শেষ সীমা অতিক্রম করে, এবং সৌন্দর্য্যের কাছে চিরবিদায় লয়। এমত স্থলে যাহা হইবার, তাহাই হয়,—অসভ্যেরা আবার কোন নবীনাকে বিবাহ করে।

বহুবিবাহের আর একটি প্রবল কারণ, অপত্যাকাঙ্ক্ষা, বিশেষতঃ পুত্রাকাঙ্ক্ষা। সভ্য, অর্দ্ধ-সভ্য, অসভ্য, অনেক জাতির মধ্যে এই আকাঙ্ক্ষার অস্তিত্ব ও প্রবলতা পরিলক্ষিত হয়, এবং সেই জন্যই পূর্ব্বপরিণীতা পত্নীর

বন্ধ্যাত্ব অনেক স্থলে বহুবিবাহের একটি প্রধান কারণ। গ্রীনলণ্ডবাসীরা সন্তান না হইলে, বিশেষতঃ পুত্র না হইলে, সমাজে অপদস্থ হয়, সুতরাং প্রথমা স্ত্রী হইতে এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হইলে তাহারা অন্য স্ত্রী গ্রহণ করে। লাদাখের বোটি জাতির সম্বন্ধে কনিংহাম সাহেব ঠিক এই কথা লিখিয়াছেন। ইণ্ডো-চীনের মুৎসা জাতির পুরুষেরা কেবল স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব স্থলেই দারান্তর গ্রহণ করিতে পায়। তুর্কি জাতির নিয়ম এই যে, যতদিন না পুত্রসন্তান জন্মে, ততদিন পুরুষ পুনঃ পুনঃ দারপরিগ্রহ করে; পুত্র জন্মিলে আর করে না। চীনে, টঙ্কুইনে এবং ছোটনাগপুরের মুণ্ডা কোলদিগের মধ্যে বন্ধ্যা স্ত্রী নিজেই অনেক স্থলে স্বামীকে দারান্তর গ্রহণ করিতে অনুরোধ করে। কিছু কাল পূর্ব্বে আমাদের দেশেও এ দৃশ্য সচরাচরই দৃষ্ট হইত; যে সকল স্থানে বিলাতি শিক্ষা ও সভ্যতা প্রবেশ করে নাই, সে সকল স্থানে আজিও দেখা যায়। পুত্রলাভই যে বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য, এই আর্য্য সংস্কার হিন্দুসমাজ হইতে বিলাতি ভাবের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে লোপ হইতেছে—'প্রেম' বলিয়া একটা কথার কথা ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যের স্থান অধিকার করিতেছে। কথার কথা বলিতেছি, কেন না যাঁহারা এই কথাটা প্রায় নিজস্ব করিয়া তুলিয়াছেন, এবং অত্যন্ত আড়ম্বর করিয়া ইহার দোহাই দিয়া থাকেন, তাঁহাদের 'প্রেমের' প্রকৃত অর্থ—রূপজ মোহ, যৌবনসুলভ কল্পনার খেয়াল, অথবা নির্জ্জলা এবং নির্ল্লজ্জ স্বার্থপরতা। ভোগলালসাকে প্রেম বলিলে, 'প্রেম' কথাটার অপব্যবহার ও অবমাননা করা হয়। সে যাহা হউক, আর্য্য ভারতবর্ষে বন্ধ্যাত্ব অধিবেদনের একটা প্রধান কারণ ছিল, এখনও কতকটা আছে। চীনে, মিসরে এবং ইহুদীদিগের মধ্যেও এই রীতির অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

শুধু বন্ধ্যাত্ব কেন, ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা আরও কতকগুলি কারণে দারান্তরপরিগ্রহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

মদ্যপাসাধুবৃত্তা চ প্রতিকূলা চ যা ভবেৎ।
ব্যাধিতা বাধিবেত্তব্যা হিংস্রার্থঘ্নী চ সর্ব্বদা॥

মনুসংহিতা।

ইহার অর্থ,—স্ত্রী যদি সুরাপায়িনী, ব্যভিচারিণী, সতত স্বামীর অভিপ্রায়ের বিপরীতকারিণী, চিররোগিণী, হিংস্রস্বভাবা ও অর্থনাশিনী হয়, তাহা হইলে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবে।

এতদ্ব্যতীত, স্ত্রী মৃতপ্রজা হইলে, কন্যামাত্রপ্রসবিনী হইলে, বা অপ্রিয়-

বাদিনী হইলে, দারান্তর-পরিগ্রহ শাস্ত্রানুসারে কর্ত্তব্য। এই সকল কারণের মধ্যে স্ত্রীর অপ্রিয়বাদিতাই শাস্ত্রকারগণ সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন—

বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেদ্যাব্দে দশমে তু মৃতপ্রজা।
একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী॥

মনুসংহিতা।

অর্থাৎ, স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে অষ্টম বর্ষে, মৃতপ্রজা হইলে দশম বর্ষে, কন্যামাত্র প্রসবিনী হইলে একাদশ বর্ষে, এবং অপ্রিয়বাদিনী হইলে কালবিলম্ব না করিয়া, অধিবেদন করিবে। আজকালকার 'পবিত্র প্রেমের' দিনে এই সকল ব্যবস্থা, বিশেষতঃ শেষোক্ত কারণে দারান্তরগ্রহণের ব্যবস্থা যে অতিমাত্র অন্যায় ও নিষ্ঠুর ব্যবস্থা বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু স্বামীর প্রতি দুঃশ্রবকটূক্তিপরায়ণা স্ত্রী লইয়া যাহাকে ঘর করিতে হয়, তাহার জীবন যে জীবনব্যাপী নরক, তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু আর্য্য-বিবাহ-ব্যবস্থার বিস্তৃত আলোচনা এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে।

অসভ্য ও কিঞ্চিদুন্নত সমাজে বহুবিবাহের আর একটা কারণ,—বহুবিবাহকারীর স্বসমাজে সম্মান, প্রতিপত্তি ও প্রভুত্বলাভ। এই সম্মান, মর্য্যাদা ও প্রভুত্বলাভ নানা রকমে ঘটে।

এই প্রবন্ধের প্রথমাংশে বলিয়াছি যে, অসভ্যদিগের মধ্যে বহু স্ত্রী ক্ষমতা বা সঙ্গতির পরিচায়ক। ইহা হইবারই কথা। বহুসংখ্যক স্ত্রী এবং তাহাদের গর্ভজাত বহুতর সন্তানের ভার যে ব্যক্তি লইতে পারে, সে যে ক্ষমতাশালী বা সঙ্গতিসম্পন্ন, তাহা অসভ্যেরাও সহজেই বুঝিতে পারে। বিশেষতঃ বহুবিবাহপরায়ণ অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে দেখা যায় যে, পুরুষের পদমর্য্যাদা অনুসারে—সে পদমর্য্যাদা বংশমূলকই হউক, ক্ষমতামূলকই হউক, আর সঙ্গতিমূলকই হউক —স্ত্রীসংখ্যার ন্যূনাধিক্য হয়। আলুৎ জাতির মধ্যে যাহারা মৃগয়া-বিষয়ে দক্ষতম, স্ত্রীসংখ্যা তাহাদেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ব্রেজিলের আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে যাহারা প্রধান, তাহারাই কেবল বহুবিবাহ করে। ডেহমি প্রদেশ সম্বন্ধে ফর্ব্‌স্‌ সাহেব লিখিয়াছেন যে, রাজার পত্নীসংখ্যা সহস্র সহস্র, অভিজাতবর্গের শত শত, মধ্যবিত্ত লোকের দশ কুড়িটা, এবং সৈনিক শ্রেণীর পুরুষের হয় ত একটাও না। এইরূপ সকল সমাজে বহুবিবাহের সহিত মর্য্যাদার ভাব, এবং একপত্নীত্বের সহিত হীনতা

ও নীচতার ভাব যে সংযুক্ত হইবে, ইহা ত পড়িয়াই আছে। সমাজ যাহাকে অভিজাত, সম্পত্তিশালী বা ক্ষমতাপন্ন বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহার সম্মান না করিবে কেন—না করিয়া কি থাকিতে পারে? সভ্য সমাজও ত এ দায় হইতে মুক্ত নহে। অসভ্য বা কিঞ্চিদুন্নত সমাজ যে এই সকল লোককে বিশেষ সম্মান করিবে, ইহা ত স্বতঃসিদ্ধের মধ্যে। ব্যান্‌ক্রফ্‌ট সাহেব আপাচি জাতির সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, ইহাদের মধ্যে যাহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক স্ত্রী, সেই সমাজ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গৌরবান্বিত ও সম্মানিত।

বহুবিবাহ সম্পত্তির পরিচায়ক ত বটেই, অনেক স্থলে সম্পত্তি অর্জ্জনের উপায়ও বটে। যে সকল অসভ্য জাতি এতটা উন্নত হইয়াছে যে, তাহাদের মধ্যে কৃষিকার্য্য প্রচলিত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে বহু স্ত্রীর অর্থ—বহু উপার্জ্জন; কেন না, অসভ্যদিগের মধ্যে বীজবপন, ভূমিকর্ষণ, শস্যলালন ও কর্ত্তন প্রভৃতি কার্য্য স্ত্রীলোকেই করিয়া থাকে। তাহারাই শস্যোৎপাদন করে, তাহারাই গো-সেবা ও গো-দোহন করে, তাহারাই রন্ধন করে—তাহারাই প্রায় সব করে। মার্কো পোলো বলেন—তাতারদিগের মধ্যে ব্যবসায় বাণিজ্য পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের দ্বারা পরিচালিত হইত। সুতরাং, এ হিসাবে, যাহার যত অধিক স্ত্রী, সে তত সমৃদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইবার কথা।

অসভ্য বা কিঞ্চিদুন্নত সমাজে বহুবিবাহকারীর প্রভুত্বলাভের একটা বিশিষ্ট কারণ আছে—সেইটাই বোধ হয় প্রধান কারণ। নিকটবর্ত্তী জাতির সহিত যুদ্ধই অনেক অসভ্য জাতির স্বাভাবিক অবস্থা। যুদ্ধই নিয়ম; শান্তি তাহার ব্যভিচার মাত্র। অনেক অসভ্যের মধ্যে, যে আপনার নহে, সেই শত্রু। এরূপ স্থলে, যাহার আপনার লোক অধিক, সেই যে শক্তিশালী হইবে, ইহা ত সহজেই বুঝা যায়। এখন বুঝিতে হইবে যে, যাহার স্ত্রীসংখ্যা অধিক, তাহার বংশজাত পুরুষের সংখ্যা অধিক ত হইবেই, জ্ঞাতি এবং আত্মীয়ের সংখ্যাও অধিক হইবে। সুতরাং অসভ্য সমাজে তাহার প্রাধান্য ও প্রভুত্ব অবশ্যম্ভাবী। বিশেষতঃ, যাহার স্বজন, জ্ঞাতি ও কুটুম্বের সংখ্যা অধিক, সে যে সমাজের রক্ষা ও উন্নতির জন্য অন্যের অপেক্ষা অধিক যত্নবান হইবে, ইহা সহজেই অনুমেয়। সমাজের অমঙ্গলে তাহার যত ক্ষতি, তত ক্ষতি অপরের হইতে পারে না। সুতরাং জাতীয়হিতসাধনে সে যে অন্যের অপেক্ষা অধিক যত্নবান হইবে, এ বিশ্বাস লোকের থাকে; এবং সেই জন্য

অকুণ্ঠিত ও বিশ্বস্ত চিত্তে তাহার হস্তে ক্ষমতা প্রদান করে। হিরিয়ট্ সাহেব লিখিয়াছেন যে, উত্তর আমেরিকার কতকগুলি জাতির মধ্যে নেতৃত্ব-পদপ্রাপ্তি সাধারণের নির্ব্বাচনসাপেক্ষ, এবং এই নির্ব্বাচন, যাহার সন্তান-সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহারই অনুকূলেই হইয়া থাকে। চিপিওয়া জাতির সম্বন্ধে কিটিং সাহেব লিখিয়াছেন যে, পিতামাতার মর্য্যাদা তাহাদের অপত্যসংখ্যার উপর নির্ভর করে। এরূপ হইবার যে যথেষ্ট কারণ আছে, তদ্বিষয়ে একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। বস্‌মান্ সাহেব লিখিয়াছেন যে, ফিদা প্রদেশের নিগ্রো নৃপতির অধীন একজন রাজপ্রতিনিধি, কেবলমাত্র আপন পুত্রপৌত্রাদি ও ক্রীতদাসদিগের সাহায্যে, এক জন পরাক্রান্ত শত্রুকে বিধ্বস্ত ও সমরক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল। বহুবিবাহকারীর ক্ষমতা ও প্রভুত্ব সমাজ মধ্যে কত হইবে, মনে কর দেখি।

এই সকল কারণে বহুবিবাহ-প্রথা প্রচলিত হয়। কিন্তু ইহাও দেখা যায় যে, নিতান্ত অসভ্যদিগের মধ্যে, অর্থাৎ মনুষ্য-জীবনের প্রাথমিক অবস্থায়, বহুবিবাহ নাই। মানুষ কথঞ্চিৎ উন্নত না হইলে বহুবিবাহপরায়ণ হয় না। আবার, মানুষ সমধিক উন্নত হইলে, বহুবিবাহপ্রথা ত্যাগ করিয়া পুনরায় একপত্নীমূলক বিবাহ-প্রণালী অবলম্বন করে। বিবাহপ্রণালীর এইরূপ পরিবর্ত্তন ও পরিণতি কিরূপে হয়, সে কথা প্রবন্ধান্তরে বলিব।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

পরাধীনতা।

হিন্দুজাতির পরাধীনতা কেন ঘটিল, এই প্রশ্নের নানাবিধ উত্তর ইতিহাস-গ্রন্থে প্রচলিত আছে।

কেহ বলেন, হিন্দুরাজারা এজন্য দায়ী। জয়চন্দ্র মুসলমানকে ডাকিয়া আনিয়া প্রথম কীর্ত্তি রাখিয়া যান। লক্ষ্মণ সেন মুসলমানের সঙ্গে লড়াই কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন নাই, ইত্যাদি।

এই উত্তরে সন্তুষ্ট হওয়া যায় না। দুই একটা লোকের দোষে এত বড় একটা ঐতিহাসিক বিপ্লব সংঘটিত হওয়া সম্ভব নহে। প্রকৃত কারণ নির্ণয়

করিতে হইলে আরও মূলে গিয়া অনুসন্ধান করিধেঃপতনের কাহিনী ঐতিহাসিক ঘটনার তথ্যনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলে জাতীয় প্রথ্য কারণগুলি আলোচনা আসিয়া পড়ে। অবশ্যই সেই সময়ে হিন্দুগণের জাতীয় ৫,
এমন একটা কিছু ঘটিয়াছিল, যাহাতে পরাধীনতার পথ সুগম কান্ধে দিয়াছিল। জাতীয় প্রকৃতির শোচনীয় অবনতি না ঘটিলে সহজে পরাধীনতা ঘটে না। নিশ্চয়ই কোন আভ্যন্তরীণ মূল কারণে সেই সময়ে ভারতবাসীর জাতীয় চরিত্র অধঃপতিত হইয়াছিল। পরের আক্রমণে বাধা দিবার বা পরের আক্রমণ সহিয়া লইবার শক্তি তখন হিন্দুজাতির ছিল না। তাহাতেই মুসলমান এত সহজে ভারতবাসীকে পদানত করিয়া ফেলিয়াছিল।

বস্তুতই জাতীয় চরিত্রের ভয়াবহ অবনতি ব্যতীত এরূপ পরাজয় বা পরাধীনতা ঘটে না। সে পরাজয়ই বা আবার কেমন! জয়চন্দ্র কর্ত্তৃক নিমন্ত্রণ-ব্যাপারের পূর্ব্বেই হিন্দুর সহিত মুসলমানের যথেষ্ট পরিচয় ছিল। তাহারও তিন শত বৎসর পূর্ব্বে মুসলমানেরা কিছু দিন সিন্ধুদেশে রাজত্ব করিয়া গিয়াছিল। হিন্দুদিগের দেবতার উপর ও হিন্দু গৃহস্থের স্ত্রীকন্যার উপর মুসলমান কিরূপ সদয় ব্যবহার করিতেন, তাহা হিন্দুগণ সেই কয়-দিনেই জানিতে পারিয়াছিলেন। ঠাণ্ডা রক্ত গরম করিবার জন্য যে সকল ইন্ধন আবশ্যক, মুসলমান-কৃত ব্যবহারে তাহার কিছুরই অভাব ছিল না। অথচ তাহাতেও হিন্দুর রক্ত গরম হয় নাই, একবারে তুষারের মত জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল। সিন্ধুদেশ হইতে মুসলমান বিদূরিত হইবার পরও গজনীপতি কয়েকবার ভারতবর্ষে আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই অভ্যাগত মহোদয়ের এক একবার সৎকার-ব্যাপারে যে ব্যয়-বিধানের ঘটা ইতিহাসে বর্ণিত দেখা যায়, তাহাতে অদ্যাপি বাঙ্গালী-হৃদয় দুরু দুরু কম্পিত হইয়া থাকে; এবং যখন শোনা যায়, এ হেন অতিথিকে দলবলে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে একজন হিন্দু রাজা সঙ্কোচ বোধ করেন নাই, এবং আর একজন হিন্দু রাজা আপনার রাজ্যভার ও অধীন প্রজাবর্গের মানসম্ভ্রম ও ধনপ্রাণ তাঁহাদের হস্তে বিনা বাক্যব্যয়েই সমর্পণ করিয়া আপনার জরাজীর্ণ অস্থি কয়খানির ও ভুক্তাবশিষ্ট প্রাণটুকুর কল্যাণপ্রার্থী হইয়াছিলেন, তখন জাতীয় অবনতি যে নিম্নতম সোপানে উপস্থিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণমাত্র জন্মে না।

সুতরাং এই তত্ত্বনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইতে হইলে জাতীয় দুর্গতিরই কারণ-

নির্দ্দেশ আবশ্যক হইয়া পড়ে, এবং তত্ত্বান্বেষী ঐতিহাসিকমাত্রেই এই জাতীয় প্রকৃতির অধোগতির একটা না একটা মৌলিক কারণ দেখাইয়াছেন। বলা বাহুল্য, ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিত ভিন্ন ভিন্ন কারণ দেখাইয়া দিলেও সেই সমস্ত একটা খাঁটি কথাতে শেষ পর্য্যন্ত গিয়া দাঁড়ায়, এবং আমাদের বৈদেশিক ও স্বদেশীয় সমুদয় ঐতিহাসিকগণ প্রায় একবাক্যেই সেই কথার সমর্থন করেন। কথাটা পাঁচ জনে পাঁচ রকমে সাজাইয়া বলেন, এবং আপন আপন বুদ্ধির হাপরে বিবিধ মর্ম্মভেদী যুক্তির হাতিয়ার বানাইয়া লইয়া তৎপ্রয়োগে ইতিহাসের শরীরকে ছিন্দন, ভিন্দন, কৃন্তন ও বিশ্লেষণ করিয়া অভ্যন্তর হইতে মূল সত্যকে টানিয়া বাহির করেন। এক কথায়, হিন্দুর যত দুর্গতির মূল—হিঁদুয়ানি ও হিঁদুয়ানীর প্রতিষ্ঠাতা ও রক্ষাকর্ত্তা ব্রাহ্মণঠাকুর।

ফলে, ঋগ্বেদের বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের দ্বন্দ্বের সময় হইতে পুনার রাণ্ড সাহেবের হত্যাকাণ্ডের দিন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ যে একটা প্রকাণ্ড ও গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া আছে, অনাদি অনন্ত মহাকালের আদি ও অন্ত থাকিতে পারে, কিন্তু এই ষড়যন্ত্রের আদি আবিষ্কার করিতে পারা যায় না ও অন্তেরও কোন উপস্থিত সম্ভাবনা নাই, ইহা বৈদেশিকগণের এবং আমাদের স্বদেশীয় শিক্ষিতগণের নির্দ্ধারিত অবিসংবাদিত সত্য; এবং এই ষড়যন্ত্র হইতেই ভারতবর্ষে হিন্দুজাতির যত কিছু দুর্গতি, দুঃখ ও যন্ত্রণা। এক কালে হিন্দুজাতি অত্যন্ত উন্নতি লাভ করিয়াছিল, এবং সেই উন্নতি আবহমান-কাল চলিতে পারিত, কিন্তু দুষ্ট ব্রাহ্মণের কূট চেষ্টা পদে পদে সেই উন্নতির গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছে ও অবশেষে হিন্দুজাতিকে কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখর হইতে নেপালের তরাইভূমিতে নামাইয়া আনিয়া হাঁফ ছাড়িয়া প্রসাদ লাভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণই প্রাচীন ভারতের যত দুর্দ্দশার মূল।

এতগুলি বুদ্ধিমান্ লোকে একবাক্যে যাহা বলেন, তাহা মানিতে আমরা বাধ্য; তবে ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে ব্রাহ্মণকে পুঁছিয়া ফেলিলে কি অবশিষ্ট থাকে, তাহার কোন ঠাহর পাই না; এবং বাকী যাহা থাকে, তাহার উন্নতিই বা কি আর অবনতিই বা কি, তাহাও বুঝিতে পারি না। বুঝি আর না বুঝি, ব্রাহ্মণের দুরন্ত শাসননীতিতে ভারতের জাতীয় জীবন যে একবারে কণ্ঠে আসিয়া পড়িয়া কেবল উড্ডয়নের অপেক্ষামাত্র করিতেছিল, তাহা যুক্তিপ্রয়োগে তন্ন তন্ন বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে

পারা যায়: এবং যে পণ্ডিতই দুর্ভাগ্য ভারতের অধঃপতনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে বসেন, তিনিই এই ঐতিহাসিক ঘটনার মুখ্য কারণগুলি একে একে গণিয়া দিতে সঙ্কোচ করেন না।

কিন্তু এইখানে একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিতে হইতেছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে পুনঃপুনঃ অধঃপতন ও অবনতির কথা উল্লেখ করাটা ঠিক হইতেছে কি না, তাহা লইয়াই তর্ক উঠিতে পারে। কেন না, বিলাতের "টাইমস্" পত্র সম্প্রতি বলিয়াছেন, আমরা এক কালে উন্নত ছিলাম, এখন অবনত হইয়াছি, ইহা মনে করাও আমাদের পক্ষে ঐতিহাসিক ভ্রম ও মহাপাপ। কিন্তু বর্ত্তমান প্রস্তাবে একালের কোনও কথা আলোচিত হইতেছে না। একালে আমরা হিমালয়ের শিখরদেশে কেন, রাজা হরিশ্চন্দ্রের মত একবারে বিমানমার্গে উন্নীত হইয়াছি, সে বিষয়ে যেমন কোনও সংশয় নাই, মুসলমানের সময়েও সেইরূপ আমাদের দুর্দ্দশার পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল, ইহাও তেমনি স্বতঃসিদ্ধ বাক্য।

প্রাচীন ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণের শাসননীতির বিশ্লেষণ করিয়া আমাদের অবনতির কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কারণ পাওয়া যায়। এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর আরম্ভে সেই কারণগুলি পুঞ্জীভূত হইয়া হিন্দুস্থানের অবস্থা ঠিক্ এইরূপ করিয়া তুলিয়াছিল যে, তখন মুসলমানের আগমন ও তৎকর্ত্তৃক আমাদের পরাজয় অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রথম—ব্রাহ্মণেরা সমুদয় বিদ্যা একটা সিন্ধুকের মধ্যে পূরিয়া তাহার চাবি আপন হস্তে রাখিয়াছিলেন। জনসাধারণ বিদ্যার আলোকে বঞ্চিত হইয়া মূর্খতার আঁধারে হাবুডুবু খাইতেছিল।

দ্বিতীয়—মূর্খতা হইতে কুসংস্কারের উৎপত্তি হয়। ব্রাহ্মণেরা আপনাদের চালকলার সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য সেই কুসংস্কারগুলির প্রশ্রয় দিতেছিলেন, এবং নানাবিধ কুপ্রথার ও উপধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া জনসাধারণের সমবেত আত্মাকে জড়ীভূত ও নিশ্চেষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন।

তৃতীয়—ব্রাহ্মণেরা জনসাধারণের পায়ে যে অধীনতার শিকল পরাইয়া দিয়াছিলেন, এবং তাহাদের প্রতি যে অত্যাচার ও নির্য্যাতনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, বিধর্ম্মীর অধীনতা ও অত্যাচারও তাহার নিকট সুখের বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।

চতুর্থ—ব্রাহ্মণেরা জাতিভেদের সৃষ্টি করিয়া বিবিধ জাতির মধ্যে পরস্পর

বিবাদ লাগাইয়া দিয়াছিলেন ও তাহাদের পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষের বহ্নিতে কেবলই ইন্ধনপ্রয়োগ করিয়া আমোদ দেখিতেছিলেন। গৃহবিবাদে হীনবল সমাজের পরের আক্রমণ সহিবার ক্ষমতা থাকে না।

পঞ্চম—ব্রাহ্মণের অনুমোদিত কন্যাবিবাহাদি সামাজিক কুপ্রথায় সমগ্র জাতি হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিল।

এইরূপে ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ইত্যাদিক্রমে কারণের সংখ্যা ক্রমেই বাড়াইতে পারা যায়, এবং সকলেরই মূলে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণপ্রবর্ত্তিত সর্ব্বনাশকর জাতিভেদ।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এততেও মনের তৃপ্তি জন্মে না। যেন আরও একটা কিছু অভাব রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

মুসলমান কর্ত্তৃক হিন্দুস্থান-জয় ব্যাপারের ঐতিহাসিক বিবরণ দেখিলে একটা মোটা ঘটনা সহজে ধরা পড়ে। হিন্দুস্থানে সে সময়ে বড় রাজা কেহ ছিল না, এবং দিল্লীপতি কতকটা ছোটখাট সাম্রাজ্য-স্থাপনে যত্নপর হইয়াছিলেন, এবং তিনিই মুসলমানের সঙ্গে কিছু দিন লড়িয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারই সাম্রাজ্যস্থাপনের চেষ্টাতেই সর্ব্বনাশের বীজ অঙ্কুরিত হয়।

ভারতবর্ষ তখন কতকগুলি রাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ইঁহারা একত্র দল বাঁধিয়া মুসলমানের বিরুদ্ধে দাঁড়ান নাই; যিনি একা দাঁড়াইতে সাহস করিয়াছিলেন, তিনি সেই প্রচণ্ড প্রবাহে ভাসিয়া গিয়াছিলেন।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য এই, হিন্দু রাজার সহিত স্থানবিশেষে মুসলমানের লড়াই ঘটিয়া থাকিলেও হিন্দু প্রজা সেই লড়াইয়ে একবারে যোগ দেয় নাই। তাহারা নীরবে ও নির্ব্বিবাদে এই রাজনৈতিক বিপ্লব চক্ষুর সম্মুখে ঘটিতে দেখিল। স্বয়ং মুখ ফুটিয়া একটা উচ্চ কথা কহিল না। মুসলমান হিন্দুর রাজসিংহাসন দখল করিয়া তাহাদের দেবমন্দির ভাঙ্গিল, তাহাদের জাতি ধর্ম্ম লইয়া টানাটানি করিল, তাহাদের ধনমান অপহরণ করিতে লাগিল;—রাজা তাহাদের রক্ষণে সমর্থ হইলেন না। কিন্তু তাহারা স্বয়ং একটা দল বাঁধিয়া এ বিষয়ে কোনরূপ বাধা দেওয়া বা আপত্তি করা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিল না।

হিন্দু প্রজার প্রকৃতিতে এ বিষয়ে একটু অসাধারণত্ব আছে। অন্য দেশে

জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রজা স্বয়ং সচেষ্ট থাকে, বিদেশী শত্রু উপস্থিত হইলে কেবল রাজার মুখাপেক্ষা করিয়া থাকে না। রাজাকে যথাসাধ্য শত্রুদমনে সাহায্য করে, এবং রাজা যখন নিজে পরাস্ত হয়েন, তখন প্রজা স্বয়ং কোমর বাঁধিয়া অবতীর্ণ হইয়া অন্ততঃ একবার শেষ চেষ্টা করিয়া লয়। আমাদের দেশের ইতিহাস অন্যরূপ। এখানে রাজনৈতিক বিপ্লবের সময় প্রজা নির্ব্বিকারচিত্ত। সে সময়ে তাহার নিজের যে একটা কর্ত্তব্য আছে, তাহা সে অনুভবই করিতে পারে না। যুদ্ধ করিয়া দেশ রক্ষা রাজারই কর্ত্তব্য, তাহাতে আমাদের যে কোন দায়িত্ব আছে, তাহা আমরা বুঝি না। রাজা আপন সিংহাসন রাখিতে পারেন ভাল, তিনি সুখে থাকুন। অপরে আসিয়া যদি তাঁহার রাজছত্র কাড়িয়া লয়, ভাল, তাহাই হউক, আমরা নূতন রাজাকে খাজানা দিব, এবং তাঁহার বিধিব্যবস্থা পালন করিব। ভাবটা এইরূপ।

ভারতবাসীর নিকট রাজনৈতিক বিপ্লব কতকটা দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প ও ঝড়ের মত সম্পূর্ণ দৈবনির্দ্দিষ্ট ঘটনা। দৈব উৎপাত উপস্থিত হইলে মরিতে হয় ও সহিতে হয়, তাহার প্রতিবিধান মনুষ্যের সাধ্য নয়। রাজার পরিবর্ত্তনও কতকটা সেইরূপ। রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইলে তাহাও সহিতে হইবে ও স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। তাহাতে ধন প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়ে, নাচার। দৈব ঘটনার আবার প্রতিবিধান কি? যাহাকে আধুনিক ভাষায় রাজনৈতিক জীবন বলে, স্বদেশভক্তি, জাতীয় ভাব প্রভৃতি যাহার লক্ষণ, ভারতবাসীর সেই জীবনটা একেবারে নাই।

আর সেকাল হইতে আজি পর্য্যন্ত ভারতবাসীর প্রকৃতি ঠিক সেইরূপই রহিয়াছে। ভারতের প্রজা ভারতের রাজাকে খাজানা দেয়, সম্মান করে ও তাঁহার আজ্ঞামতে চলে। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যবিপর্য্যয়ে সে সম্পূর্ণ উদাসীন। মুসলমানের হাত হইতে যখন রাজশক্তি ইংরাজের হাতে গেল, তখনও ভারতীয় প্রজা তাহাতে অণুমাত্র বিচলিত হয় নাই; তাহার মনে তজ্জন্য কোন দুঃখের উদয় বা আনন্দের উদয়ও হয় নাই। দেশের মধ্যে যে একটা ওলট-পালট ঘটিয়া গেল, বিশ কোটির মধ্যে উনিশ কোটি লোক, বোধ হয়, তাহার কোন সংবাদ রাখাও দরকার বোধ করে নাই। মুসলমানের কর্ম্মচারী খাজানা আদায় করিতে আসিলে আমরা আপত্তি না করিয়া খাজানা দিতাম; এখন ইংরাজের কর্ম্মচারী খাজনা আদায় করিতে আসে, আমরা তাহার

হাতে খাজানা দিই। তাহার খাজানাগ্রহণের অধিকার আছে কি না, জিজ্ঞাসার দরকার হয় না।

এই রাজনৈতিক জীবনের অভাবের কতকগুলা স্থূল লক্ষণ দেখা যায়। এ দেশে রাজায় প্রজায় কখনও বিরোধ নাই; আবার রাজায় প্রজায় সহানুভূতি বা স্বার্থের টানও নাই। রাজা যিনিই হউন, তাঁহাকে খাজানা দিতে আপত্তি করিতে নাই—তাঁহার আদেশ মানিয়া চলা উচিত। তিনি সুখে রাখেন—সুখের বিষয়; তিনি নিগ্রহ করেন—তথাস্তু। দুঃখের বিষয় বটে, কিন্তু রাজকৃত অত্যাচারের আবার প্রতিবাদ কি? তাহা হইলে ত ভূমিকম্প ও মারীভয়েও প্রতিবাদ আবশ্যক হইতে পারে। উভয়েরই পক্ষে কোন যুক্তি নাই। ইংরাজ নূতন রাজা হইয়া আমাদিগকে আরামে রাখিয়াছেন, পরম সৌভাগ্য; আমরা ইংরাজকে আশীর্ব্বাদ করিব। ইংরাজ যদি অত্যাচারই করিতেন, তাহা হইলেও আমরা তাহা সহিতাম। বিধাতার বিধান,—মানুষে কি করিবে?

আর একটা লক্ষণ এই। আসমুদ্র হিমাচল আমাদের স্বদেশ। হিমাচলের ও পারে ও সমুদ্রের পারে ম্লেচ্ছভূমি; সেখানে আমাদের যাইতে নাই ও সে দেশের সংবাদগ্রহণের কৌতূহলও অস্বাভাবিক। সে সকল দেশে ম্লেচ্ছ বাস করে ও হয় ত গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধরাদিও লীলাখেলা করিয়া থাকে। তাহাদের কাজকর্ম্ম আহারব্যবহার জানিয়া আমাদের কোন ফল নাই। কিন্তু হিমাচল হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত এই দেশ টুকু আমাদের। কামরূপ হইতে সিন্ধুতট পর্য্যন্ত এবং হরিদ্বার হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত আমাদের ধর্ম্মকর্ম্মের স্থান, এই দেশে আমাদের দেবমন্দির, আমাদের তীর্থস্থল সমস্ত ছড়াইয়া রহিয়াছে।

আমাদের স্বজাতি স্বধর্ম্ম আত্মীয় অন্তরঙ্গ সকলেই এই পরিধির মধ্যে বাস করে। কিন্তু তাই বলিয়া বিধর্ম্মী আসিয়া পঞ্জাব আক্রমণ করিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালীর মাথাব্যথার প্রয়োজন কি? অথবা বাঙ্গালী বিধর্ম্মীর পদানত হইল, তাহাতে মহারাষ্ট্রের কি আসে যায়?

জাতীয়তার ও রাজনৈতিক জীবনের যে সমস্ত লক্ষণ, এ দেশে তাহার কিছুই নাই। কোন কালে যে ছিল, তাহারও প্রমাণ বর্ত্তমান নাই। রাজা নিগ্রহ করিলে তাহার প্রতিবাদ করা যেমন আমরা আবশ্যক বোধ করি না, রাজার বিপদ উপস্থিত হইলে তাঁহাকে সাহায্যদানও তেমনি অনাবশ্যক বোধ করি। রাজা প্রজা হইতে অনেক ঊর্দ্ধে অবস্থিত। রাজলোক কতকটা দেবলোকের

মত পুণ্যস্থানীয়। সেখানে কি যায় কি আসে, তাহা আমাদের কৌতূহলের বা অনুসন্ধিৎসার বিষয় হইতে পারে না। সেখানকার ব্যবহারের উপর আমাদের কোন হাত নাই। সত্য বটে, আমাদের শুভাশুভ রাজলোক হইতে অনেক সময় নির্দ্ধারিত ও নিয়মিত হইয়া থাকে; কিন্তু আকাশে গ্রহগণের গতায়াত বা দেবলোকে দেবগণের গতিবিধিও আমাদের শুভাশুভের নিয়ামক। গ্রহের ফের ও দেবতার ইচ্ছা যেমন আমরা নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিতে বাধ্য, রাজলোকে বিহিত ব্যবস্থাও তেমনি মানিয়া লইতে ও গ্রহণ করিতে বাধ্য রহিয়াছি।

কিন্তু অন্য দেশের ইতিহাস ঠিক এমন নহে। সেখানে রাজা প্রজার সম্বন্ধ অন্যরূপ। রাজায় প্রজায় এমন সখ্যসৌহার্দ্য নাই। কথায় কথায় প্রজা রাজার কৈফিয়ৎ চাহিয়া থাকে। রাজা ঘাড় নাড়িলে প্রজা শিং নাড়া দেয়, রাজা ভ্রূভঙ্গী করিলে প্রজা দাঁত দেখায়। সময়ে সময়ে রাজাকে জেলে দেয়, অথবা রাজার উত্তমাঙ্গের সহিত নিম্নদেহের যোগাকর্ষণ পরীক্ষা করিয়া দেখে। কিন্তু আবার বৈদেশিক আসিয়া রাজাকে আক্রমণ করিলে তখন তাহারা রাজ্যের বিপদ বা নিজের বিপদ ভাবে; তখন তাহারা দল বাঁধিয়া অস্ত্র হাতে রাজাকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়, রাজার ও তাঁহার বেতনভুক্ সৈন্যের বাহুবলের অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে না। বৈদেশিককে রাজার সহিত লড়াই করিতে হয় না, তাঁহার লড়াই প্রজার সহিত। রাজা সেখানে প্রজার সহায়মাত্র, অথবা প্রজার নির্দ্দিষ্ট বিশ্বস্ত সেনাপতিমাত্র।

তাহার সেই জাতীয়ভাবের লক্ষণ কি? যতদিন বহিঃশত্রুর আশঙ্কা না থাকে, সে ততদিন রাজ্যের মধ্যে অহর্নিশ রাজার সঙ্গে দ্বন্দ্বে নিযুক্ত থাকে। অহর্নিশ দ্বন্দ্ব—উৎকট কলরব। রাজায় প্রজায় নিয়ত অবিশ্রান্ত মল্লযুদ্ধ—কে কাহাকে হঠায়? ইউরোপের ইতিহাসই এই। রাজা সময়ে সময়ে প্রজাকে দলিত করেন; প্রজা কখন দলিত সর্পের মত গর্জ্জাইয়া রাজাকে দংশন করে। যাহারা সামাজিক ও শান্ত, তাহারা রাজাকে বুঝাইতেছে, থামাইতেছে, শাসাইতেছে; যাহারা সমাজদ্রোহী ও দুরন্ত, তাহারা রাজার ও রাজমন্ত্রীর মুণ্ডপাতের জন্য গভীর রাত্রে ষড়যন্ত্র করিতেছে। ভারতের প্রজা বর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষ ঘটিলে লক্ষ হিসাবে ও কোটি হিসাবে নির্ব্বাক্‌ভাবে মরিতে থাকে, ইউরোপের প্রজা এক বেলা উদর তৃপ্ত না হইলে রাজার অভ্যর্থনার জন্য ডাইনামাইট সংগ্রহ করে। এই গেল এক দিক। অন্য দিকে যখন আবার

বাহিরের শক্র আসিয়া রাজ্য আক্রমণ করে, প্রজা তখন দলে দলে রাজার পাশে আসিয়া দাঁড়ায়, এবং রাজা যদি পরাস্ত হয়েন, তখন তাঁহার হস্ত হইতে শাসনদণ্ড স্বয়ং গ্রহণ করিয়া তাহা শক্রর বিরুদ্ধে পরিচালিত করে। ভারতের প্রজা শান্তির সময় রাজাজ্ঞা অবহিতভাবে পালন করে, কিন্তু রাজার নাম পর্য্যন্ত জানিবার আগ্রহ দেখায় না; আবার এক রাজার হাত হইতে যখন রাজদণ্ড স্খলিত হইয়া অপরের হাতে যায়, তখন নির্ব্বাক নিস্পন্দভাবে চাহিয়া দেখে। ইউরোপের প্রজা শান্তির সময় রাজার প্রত্যেক কথার ও প্রত্যেক কার্য্যের কৈফিয়ৎ না লইয়া চলে না, কিন্তু বিগ্রহের সময় ও বিপ্লবের সময় সে স্বয়ং রাজার আসনে আসিয়া দাঁড়ায়।

কেন এমন হইল? ইতিহাস কি এ কথার উত্তর দিতে সমর্থ নহে? কেবল দুষ্ট ব্রাহ্মণের উপর দোষ চাপাইয়া দিলে প্রশ্নটার প্রতি সুবিচার হইল, বোধ হয় না।

আমার সময়ে সময়ে মনে হয়, এই প্রশ্নের কতকটা এইরূপ উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। ইউরোপে ও ভারতবর্ষে এই পার্থক্যের প্রধান কারণ, ইউরোপে প্রজা চিরকাল ধরিয়া পরাধীন ও ভারতবর্ষের প্রজা চিরকাল ধরিয়া স্বাধীন।

উত্তরটা নিতান্তই হেঁয়ালিগোছের হইয়া পড়িল। সাধারণতঃ শুনা যায়, ইউরোপের প্রজা স্বাধীন ও ভারতের প্রজাই চিরপরাধীন। ইউরোপে এক হিসাবে আবহমান কাল হইতে প্রজাতন্ত্র-শাসননীতি চলিতেছে; ভারতে হিন্দুরাজার সময়েও রাজশক্তি যথেচ্ছাচারপদ্ধতিক্রমে চালিত হইত। ইহাই ইতিহাসের সর্ব্ববাদিসম্মত কথা। কিন্তু এই প্রচলিত মীমাংসার বিরুদ্ধ একটা কথা যখন বলিয়া ফেলিয়াছি, তখন তাহার সমর্থন আবশ্যক; ভাষাশাস্ত্র ও যুক্তিশাস্ত্রকে টানিয়া বুনিয়া যেমন করিয়া হউক সমর্থন করিতে হইবে।

পরাধীন ও স্বাধীন শব্দ দুইটা একটু বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ করিয়াছি। আমি হিন্দুর রাজ্যে বা মুসলমানের রাজ্যে কি খৃষ্টানের রাজ্যে বাস করি, তাহা দেখিয়া আমার স্বাধীনতার পরিমাপ হইবে না। আমার নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের কতখানি রাজার অধীন ও কতখানি আমার নিজের অধীন; জীবনের কতগুলা কাজ রাজার হুকুমে সম্পাদন করিতে হয়, আর কতগুলা কাজই বা আমার ইচ্ছামত সম্পাদন করিতে পারি, তাহা দেখিয়াই আমার

স্বাধীনতার মাত্রা স্থির করিতে হইবে। আমি বলিতে চাহি যে, এই হিসাবে সেকালের ভারতবাসী একালের ইউরোপীয়ের অপেক্ষাও অধিকতর স্বাতন্ত্র্য সম্ভোগ করিয়াছে।

ইউরোপের ইতিহাস ধারাবাহিক সূত্রে আলোচনা করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? রোম নগরীর সম্প্রসারণ হইতে ইউরোপের রাজনৈতিক ইতিহাসের আরম্ভ। গ্রীস অন্যান্য বিষয়ে ইউরোপীয় সভ্যতার জননী হইলেও রাজনীতিবিষয়ে গ্রীসের সহিত আধুনিক ইউরোপের তেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। রোমে রাজা ছিল না, কিন্তু প্রজার সমবেতশক্তি রাজার স্থানে কার্য্য করিত। রোম ক্রমে দেশের পর দেশ গ্রাস করিয়া আপনার কলেবর সম্প্রসারিত করিতে লাগিল, এবং যেখানে যাহাকে পাইল, সকলকেই এক আইনের অধীন করিয়া, সকলকেই সমান রাজনৈতিক ক্ষমতা দিয়া, সমান অর্থে রোমান করিয়া ফেলিল। ইউরোপের সমগ্র দক্ষিণ ভাগে, আফ্রিকার উত্তর ভাগে ও এসিয়ার পশ্চিম ভাগে যে যেখানে ছিল, সকলেই বিভিন্ন বর্ণ, বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন আচার লইয়াও খাঁটি রোমক হইয়া উঠিল, এবং অবশেষে এক জন বা বহু জন সেনানীর হাতে প্রভুশক্তি অর্পণ করিয়া রোমের বিশাল কলেবর পার্শ্বস্থ শক্রগণের গ্রাস হইতে রক্ষায় প্রয়াসী থাকিল। মহাসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল বটে; কিন্তু একটা মহাজাতির সৃষ্টি হইল না। রোমের অভ্যুদয়-কালে যে জাতীয় ভাবের, রাষ্ট্রের হিতের জন্য ব্যক্তিগত হিতপরিহারের জন্য ব্যগ্রতার যেমন উদাহরণ মিলে, রোম যখন প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যে পরিণত হইল, তখন আর তেমন উদাহরণ পাওয়া যায় না। সাম্রাজ্য জমাট বাঁধিল না। ব্যক্তিমাত্রেই রোমক, কিন্তু মহারোমক জাতির প্রতিষ্ঠা হইল না। উত্তরদেশীয় বর্ব্বরগণ সাম্রাজ্য-মধ্যে প্রবেশ করিয়া সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল। যেমন উন্নতি, তদুপযোগী পতন! সেই ভয়ানক বিপ্লবে ইউরোপের ইতিহাসের প্রাচীন পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হইয়া নূতন পরিচ্ছেদ আরব্ধ হইল। এই নূতন পরিচ্ছেদের আরম্ভে আমরা কি দেখিতে পাই? এক এক সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ ভূখণ্ডে এক একটা নূতন সঙ্কীর্ণ জাতির প্রতিষ্ঠা হইতেছে। নূতনে পুরাতনে মিশিয়া গিয়া পুরাতন ভাঙ্গিয়া নূতন মশলায় পুরাতন ইটের বাঁধন দিয়া নূতন ঘর নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই নূতন পরিচ্ছেদে দুইটি নূতন ঘটনার অবতারণা দেখা যায়।

প্রথম, পূর্ব্বে যে একটা বিশাল সাম্রাজ্য ছিল, তাহার মধ্যে কাহারও পর-

স্পর বিবাদ বিসংবাদের উপায় ছিল না। রোমক তাহার অসংখ্য শত্রুর সহিত লড়াই করিতে বাধ্য হইত, রোমক সেনানী রোমক সেনানীর সহিত লড়াই করিত; কিন্তু রোমক প্রজা কথনও রোমক প্রজার সহিত লড়াই করে নাই। কিন্তু এই নূতন অধ্যায়ের সূচনায় ইউরোপ কতিপয় খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হইল; তাহাদের পরস্পরের মধ্যে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ; সেই যে রণকোলাহলের আরম্ভ হইয়াছে, আজ পর্য্যন্ত তাহা থামে নাই। নবম শতাব্দীর আরম্ভে পশ্চিম ইউরোপে রোমসাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; কিন্তু সে কেবল নামে সেই নূতন প্রতিষ্ঠায় আভ্যন্তরীণ বিগ্রহ-ব্যাপার, রাজার সহিত রাজার, রাজ্যের সহিত রাজ্যের, জাতির সহিত জাতির ভীষণ জীবনদ্বন্দ্ব-নিবারণে সমর্থ হয় নাই, এবং সহস্রবৎসরব্যাপী প্রযত্নের বিফলতার ফলে এই উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভেই রোমের শেষ সম্রাট্ রোম-সাম্রাজ্যের নাম পৃথিবীর ইতিহাস হইতে তুলিয়া দিতে সম্মত হইলেন।

দ্বিতীয়,—রোমে রাজা ছিল না; খ্রীষ্টজন্মের পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে রোমের শেষ রাজা তার্কুইন সিংহাসন হইতে তাড়িত হয়েন; এবং খ্রীষ্ট-জন্মের আট শত বৎসর পরে জর্ম্মনির রাজা পোপের হস্ত হইতে সাম্রাজ্যের মুকুট গ্রহণ করিয়া ভাঙ্গা ইট জুড়িয়া নূতন অট্টালিকানির্ম্মাণের চেষ্টা করেন। কিন্তু এই সুদীর্ঘকালমধ্যে রোমে রাজা ছিল না। যিনি সম্রাটের মুকুট ধারণ করিতেন, তিনি রোমক জনসাধারণের বিশ্বস্ত ও মনোনীত ভৃত্য ও সেনানীমাত্র ছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের এই নূতন পরিচ্ছেদে প্রত্যেক রাজ্যে এক একজন স্বতন্ত্র দণ্ডধর রাজার অভ্যুদয় দেখিতে পাই। তিনি রাজা বলিয়া রাজা নহেন;—তিনি বৈদেশিক, বিধর্ম্মী, বিজেতা, অস্ত্রধারী, শাসক, পালক, প্রজার বাহ্যজীবন ও অন্তর্জীবনের নিয়ামক রাজা। রাজার প্রথম কাজ, প্রতিবেশী রাজার সহিত যুদ্ধ;—প্রজার অর্থব্যয়ে ও প্রজার শোণিত-ব্যয়ে, আপন স্বার্থের জন্য। রাজার দ্বিতীয় কাজ, প্রজার নিপীড়ন, প্রজার ভৌতিক ও আত্মিকজীবনের স্বাতন্ত্র্যের সম্পূর্ণ বিলোপসাধন করিয়া আপনার সর্ব্বতোমুখী প্রভুশক্তির স্থাপনার জন্য, আরম্ভে কিছুদিন ধরিয়া শৃঙ্খলমুক্ত বর্ব্বরতা; তখন প্রাচীন রোমসাম্রাজ্যের অট্টালিকা ভাঙ্গিতেছে। ইউরোপের সেই তামস যুগ। পরে নূতন ইতিহাসের নূতন পরিচ্ছেদের আরম্ভ—নূতন নূতন খণ্ডরাজ্য তখন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইউরোপের এই মধ্যযুগ। এই সময়ে সুবিখ্যাত ফিউডাল তন্ত্রের উৎপত্তি।

ফিউডাল তন্ত্রের অর্থ কি? নবাগত বিজেতা বৈদেশিক রাজা আসিয়া প্রজার সমস্ত ভূসম্পত্তি একবারে আত্মসাৎ করিলেন। তার পর সেই ভূসম্পত্তি আপনার আশ্রিত ও অনুগতগণকে বণ্টন করিয়া দিলেন। রাজা দাতা ও প্রজা গ্রহীতা। দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে একটা চুক্তি নির্দ্দিষ্ট হইল। দাতা প্রতিবেশীর সঙ্গে চিরদিন যুদ্ধ করিবেন। গ্রহীতা আপনার জীবন ও আপনার শোণিত দিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে দাতার সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত থাকিবেন। যাঁহারা জমির বড় বড় টুকরা ভাগে পাইলেন, তাঁহারা আবার সেইরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ করিয়া আপন অধীন ভৃত্যবর্গকে জমি বাঁটিয়া দিলেন। শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াইল এই, যাহার এক টুকরা জমি আছে, তাহার জীবনের প্রধান কার্য্য যুদ্ধ; নিজের জন্য নহে, পরের জন্য; শেষ পর্য্যন্ত রাজার স্বার্থসাধনের জন্য। ইউরোপ একটা বিশাল সমরক্ষেত্রে পরিণত হইল। রাজায় রাজায় যুদ্ধ—তাঁহাদের খেয়ালের মর্য্যাদা রাখিবার জন্য যুদ্ধ। প্রজা-সাধারণ অস্ত্রধারী ভুক্তিভুক সৈনিক ও ভৃত্য; তাহাদের প্রধান কার্য্য রাজাজ্ঞায় দেহপাত ও জীবনদান।

ইউরোপের মধ্যযুগে মনুষ্যজীবনের প্রধান কার্য্য যুদ্ধ। মনুষ্যমাত্রেই তখন যোদ্ধা ও অস্ত্রধারী সৈনিক। যে যুদ্ধ করিতে জানে না, সে মানুষের মধ্যে গণ্য হইত না।

রাজায় প্রজায় আর এক অভিনব সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। কেবল যুদ্ধের সময় রাজার আদেশে দেহপাতে প্রতিশ্রুত থাকিয়াই প্রজা মুক্তি পাইল না। রাজা তাহার পদদ্বয়ে শিকলের উপর শিকল পরাইয়া ক্ষান্ত থাকিলেন না; তাহার অন্তঃশরীরেও বন্ধনের উপর বন্ধন কসিলেন। রাজা শাস্তা, রাজা বিচারক, রাজা ব্যবস্থাপক, রাজার আদেশের নাম আইন। কেবল তাহাই নহে—রাজা গুরু, রাজা শিক্ষক, রাজা উপদেষ্টা। রাজা জ্ঞানের পন্থা দেখাইয়া দিবেন, রাজা ধর্ম্মের পন্থা দেখাইয়া দিবেন, রাজা মুক্তির পন্থা দেখাইয়া দিবেন। প্রজাকে সেই পথে চলিতে হইবে—নতুবা মঙ্গল নাই। ধর্ম্মযাজক রাজশক্তির সহকারী পোপ এবং কৈসার উভয়েই পরদেবতার নরদেহে অবতার। শাস্ত্রের ব্যাখ্যা রাজা করিবেন, ধর্ম্মের ব্যাখ্যা রাজা করিবেন। নীতির পথ রাজার আদেশে নিরূপিত হইবে। প্রজা যদি মানিয়া চলে, তাহার পক্ষে মঙ্গল, নতুবা তাহার নশ্বর জীবনের সার্থকতা নাই। তাহাকে পোড়াইয়া ফেলাই যুক্তিসিদ্ধ। আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস এইরূপে আরম্ভ

হইয়াছে। এবং ইহাকে যদি স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা বলিতে চাও, শব্দশাস্ত্রের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

আরম্ভ এইরূপ, কিন্তু এই আরম্ভের পরিণতি কোথায় ? রাজা মনুষ্যের আত্মাকে লুপ্ত করিতে চাহেন, কিন্তু মানুষের আত্মা লুপ্ত হইবার পদার্থ নহে। মানুষের আত্মা এক অপরূপ জিনিস।

মানুষের আত্মাকে স্বাতন্ত্র্যের মুক্ত বায়ুমার্গে বিচরণ করিতে দাও। সে মুক্ত বায়ু ত্যাগ করিয়া কারাগারে আরামে নিদ্রা যাইতে থাকিবে। তাহাকে দলিত ও পীড়িত কর, সে ভুজঙ্গের মত গর্জ্জিয়া উঠিবে। ইউরোপে তাহাই ঘটিয়াছে। সেখানে রাজায় প্রজায় সনাতন বিরোধ; ফলে প্রজার জয়। রাজা স্বার্থের উদ্দেশ্যে প্রজার হস্তে হাতিয়ার দিয়াছিলেন। প্রজা সেই হাতিয়ার শেষ পর্য্যন্ত রাজারই বিরুদ্ধে চালনা করিয়াছে, ধীরে ধীরে রাজার হস্ত হইতে প্রভুশক্তি কাড়িয়া লইয়াছে। এবং এক দিকে বহিঃশত্রুর নিকট ও এক দিকে রাজার নিকট হইতে আত্মরক্ষণে কৃতকর্ম্মা হইয়াছে।

মধ্যযুগে ইউরোপের প্রজামাত্রকেই বাধ্য হইয়া অস্ত্র ধরিতে হইত। তাহাদেরই উপর দেশরক্ষার ও রাজ্যরক্ষার ভার ছিল। বহিঃশত্রুর সহিত সংগ্রাম উপস্থিত হইলে তাঁহারাই রাজার পার্শ্বে দাঁড়াইত। প্রত্যেকেই এইরূপ সৈনিকবৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য থাকায় ইউরোপ কতকগুলি সামরিক জাতির বাসস্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পরবর্ত্তী ইতিহাসে প্রভূত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু ইউরোপের প্রজাসাধারণ আজি পর্য্যন্ত এক হিসাবে সৈনিকবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। মধ্যযুগ অতীত হইলে পর রাজা আর প্রজার উপর ভরসা স্থাপন করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তখন রাজায় প্রজায় রীতিমত বিবাদ আরম্ভ হইয়াছে। রাজা প্রজার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেন না। তার পর আবার বারুদের আবিষ্কারে পুরাতন সামরিক পদ্ধতিই একবারে উল্টাইয়া গিয়াছে। রাজা তখন বেতনভুক্ বাঁধা সৈন্য নিযুক্ত করিলেন। প্রজারা আপন আপন গৃহকর্ম্মসম্পাদনের অনুমতি পাইল। কিন্তু রাজার এই বেতনভোগী সৈন্য প্রজার অর্থে পুষ্ট হইত ও যখন বাহিরের শত্রু উপস্থিত না থাকিত, তখন প্রজারই শাসন ও দমনে নিয়োজিত হইত। প্রজাও কাজেই আত্মরক্ষণের অনুরোধে অস্ত্র ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় নাই। এখনও ইউরোপের প্রত্যেক রাজা বেতন দিয়া বিরাট্ বাহিনী পোষণ করিতেছেন। রাজার নিকট প্রজার ততটা ভয় নাই,

কিন্তু রাজায় রাজায় যুদ্ধের, রাজ্যে রাজ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা পূর্ব্বের অপেক্ষাও বাড়িয়াছে বই কমে নাই। জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, লোলুপ ঈর্ষ্যাপর প্রতিবেশীর গ্রাস হইতে রক্ষার জন্য, অদ্যাপি ইউরোপের প্রত্যেক প্রজা অস্ত্রধারণ করিয়া থাকে। জর্ম্মাণি প্রভৃতি রাজ্যে প্রজামাত্রেই সৈনিক; আবশ্যক মতে সকলেই যুদ্ধক্ষেত্রে নামিতে প্রস্তুত। ইংলণ্ডে প্রজার অধিক মাত্রায় এ বিষয়ে স্বাধীনতা থাকিতে পারে বটে, কিন্তু সেখানেও ইংরাজের রণপোত ও ইংরাজের বলণ্টিয়ার উভয়েই রাষ্ট্রের পক্ষে সমান মূল্যবান।

প্রজার পারিবারিক, সামাজিক, নৈতিক, সমস্ত কার্য্যেই ইউরোপের রাজা হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন; বজ্রবন্ধনে বাঁধিয়া তাহার দেহ ও মন উভয়কেই অভিভূত করিতে চাহেন। এই হেতু উভয়ের মধ্যে সনাতন দ্বন্দ্ব। এই সনাতন দ্বন্দ্বের ফলে সেখানে মুহুর্মুহু রাষ্ট্রবিপ্লব। ফরাসী বিপ্লবে যে ভীষণ ভূমিকম্প আরব্ধ হইয়াছে, অদ্যাপি তাহার ধাক্কা মধ্যে মধ্যে চলিতেছে। রাজায় প্রজায় বিবাদ অদ্যাপি থামে নাই। কখনও যে থামিবে, তাহার ভরসাও নাই।

ঠিক এই কারণেই ইউরোপের খণ্ড জাতিগুলির মধ্যে জাতীয়ভাব এত উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। বাহিরে জাতির সহিত জাতির, রাজ্যের সহিত রাজ্যের চিরন্তন বিসংবাদ; ভিতরে রাজার সহিত প্রজার সনাতন বিরোধ; ফলে প্রজামাত্র তৎপর, কর্ম্মঠ, অস্ত্রধারী সৈনিকে পরিণত।

এই অংশে ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে সমগ্র জাতি কখন এক হইয়া জমাট বাঁধে নাই; এক মহা সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে সকলেই কখনও স্থান লাভ করে নাই। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য সমগ্র মহাদেশকে বিভক্ত রাখিয়াছিল। কিন্তু এই একটি রাজ্যের অধিবাসীরা কখন একজাতীয়ত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। ইউরোপে যেমন ফরাসী, জর্ম্মান, ইতালীয় প্রভৃতি কয়েকটি দৃঢ়বদ্ধ জাতির সৃষ্টি হইয়াছে, যাহাদের স্বার্থ পরস্পরের প্রতিকূল, যাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ সহানুভূতির বন্ধন নাই, ভারতবর্ষে সেরূপ কয়েকটি খণ্ড জাতি গঠিত হইতে পারে নাই। ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থা কতকটা ইহার জন্য দায়ী। ইতালীর একটা ভৌগোলিক সীমানা আছে, স্পেনের আছে, গ্রীসের আছে, ইংলণ্ডের আছে, ফ্রান্স ও জর্ম্মানির মধ্যেও একটা সীমানা খুঁজিলে মিলিতে পারে। বাঙ্গলার কোন নির্দ্দিষ্ট সীমানা নাই, পঞ্জাবেরও সীমানা নাই, মধ্যদেশেরও নির্দ্দিষ্ট সীমানা নাই।

এক বিশাল সমতল প্রান্তরের এক এক অংশ লইয়া এক এক জাতি বাস করে। সেইরূপ, কর্ণাট ও দ্রাবিড়ের মধ্যে, দ্রাবিড় ও মহারাষ্ট্রের মধ্যে কোন ভৌগোলিক সীমারেখা প্রকৃতি নির্দ্দেশ করিয়া দেন নাই। উৎকলের ভাষাকে বাঙ্গালী পরিহাস করিয়া থাকে বটে, কিন্তু কোন্ স্থানে বাঙ্গলার শেষ, আর কোথায় উৎকলের আরম্ভ, তাহার নির্দ্দেশ একবারে অসাধ্য। কাজেই প্রজাগণের মধ্যে জাতিবিভাগ ও জাতিবিদ্বেষ স্থাপিত হয় নাই। বাঙ্গালী তাহার প্রতিবেশী হিন্দুস্থানীকে বিশেষ প্রেমের চক্ষে দেখে না; কিন্তু উভয়ের মধ্যে কোন ধর্ম্মগত বিদ্বেষও বর্ত্তমান নাই। এইরূপ সর্ব্বত্র।

প্রাচীন ভারতবর্ষে একই সময়ে অনেকগুলি রাজা থাকিতেন। কিন্তু কোন রাজারই রাজ্যের স্থায়ী সীমাচিহ্ন ছিল না। যিনি যতটা অধিকার করিয়া থাকিতে পারিতেন, তাহাই তাঁহার রাজ্য। রাজায় রাজায় লড়াই হইত বটে, যিনি যখন একটু প্রবল হইতেন, তিনিই একবার করিয়া দিগ্বিজয়েও বাহির হইতেন। কিন্তু আবহমান কাল ধরিয়া উভয়ের মধ্যে বদ্ধমূল বিদ্বেষের উদাহরণ প্রায় ঘটিত না। ইউরোপের ইতিহাসে কালের সৃষ্টি হইতে আজি পর্য্যন্ত ফরাসীর সহিত ইংরাজের বা জর্ম্মানের সহিত ফরাসীর যে সম্বন্ধের উল্লেখ করে, সেইরূপ সম্বন্ধের উদাহরণ ভারতবর্ষের মধ্যে নাই।

ভারতবর্ষে জাতিভেদের উল্লেখ করিয়া যাঁহারা একটা প্রকাণ্ড অনর্থের কারণ আবিষ্কার করিয়া থাকেন, তাঁহারা ঠিক বুঝাইয়া দেন না, জাতিভেদ-সূত্রে রাজনৈতিক দুর্ব্বলতা কিরূপে উৎপন্ন হইতে পারে। জাতিভেদ একটা বৈষম্য বটে, কিন্তু তাহা রাজনৈতিক অধিকার লইয়া নহে, তাহা সামাজিক অধিকার লইয়া। খুব সম্ভব, ইতিহাসের পুরাতন পাতা উল্টাইলে এই বৈষম্যের মূলে রাজনৈতিক কারণ আবিষ্কৃত হইতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসের যে অংশের সহিত আমাদের পরিচয়, তাহার মধ্যে কোন রাজনৈতিক বিবাদের অস্তিত্ব দেখা যায় না। এই কাল মধ্যে ব্রাহ্মণ কখনও অস্ত্র ধরিয়া শূদ্রদমনে প্রবৃত্ত হয় নাই, শূদ্রও কখনও অস্ত্র লইয়া ব্রাহ্মণের কণ্ঠচ্ছেদে উদ্যত হয় নাই। ব্রাহ্মণের প্রতি প্রেম শূদ্রের না থাকিতে পারে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে নিদারুণ বিদ্বেষ ও ঈর্ষ্যার অস্তিত্বের ঐতিহাসিক প্রমাণ বর্ত্তমান নাই।

বিদ্বেষ ও ঈর্ষ্যার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইলেও মূল বিচারে কিছু আসে

যায় না। ব্রাহ্মণও ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রব্যাপী, শূদ্রও ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রব্যাপী। উভয়ে কিছু স্বতন্ত্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন ভূখণ্ড অধিকার করিয়া বাস করে না। কোন রাষ্ট্রীয় বিপ্লব উপস্থিত হইলে উভয়েরই লাভ বা উভয়েরই ক্ষতি সম্ভব।

কাজেই দেখা যাইতেছে, ইউরোপে একটা যাহা বিদ্যমান আছে, ভারতবর্ষে তাহা নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড রাজ্য উভয়েই বর্ত্তমান, কিন্তু ইউরোপে যেমন ফরাসী জর্ম্মান প্রভৃতি পরস্পরবিরোধী, পরস্পরপ্রতিকূল, দৃঢ়বদ্ধ, সুগঠিত জাতির সৃষ্টি হইয়াছে, ভারতবর্ষে সেই অর্থে তেমন ভিন্ন ভিন্ন বিরোধী জাতির বা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় নাই। ভারতবর্ষে যে কিছু বর্ণগত বা ধর্ম্মগত বা সম্প্রদায়গত বিরোধ আছে, তাহা রাজনৈতিক বিরোধ নহে, তাহা সামাজিক বিরোধ; তাহা প্রত্যেক প্রদেশের, প্রত্যেক ভূখণ্ডের অভ্যন্তরেই বর্ত্তমান। তাহা জমাট বাঁধিয়া এক একটা নির্দ্দিষ্ট সীমাবিশিষ্ট ভূখণ্ড অধিকৃত করিয়া রাখে নাই। ফলে ভারতবর্ষে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইয়াছে, রাজবংশে রাজবংশে বহুদিন ধরিয়া বিবাদ চলিয়াছে, কিন্তু জাতিতে জাতিতে, সমাজে সমাজে মর্ম্মঘাতী যুদ্ধ কখনও ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। এক প্রদেশের লোক দল বাঁধিয়া অন্য প্রদেশের লোকের উপর রাজনৈতিক প্রভুত্বস্থাপনে উদ্যত হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। *

আমার বিবেচনায় ভারতবাসী প্রজার এই প্রকৃতিগত অসম্পূর্ণতাই তাহার পরাধীনতার প্রকৃত কারণ। ভারতবাসী পরাধীন, কেন না, বাহির শত্রু আসিয়া স্বদেশ আক্রমণ করিলে তাহাতে যে আপত্তি করিতে হয়, সে তাহা জানে না; রাজলোকে কোন অঘটন ঘটনা হইলে তাহাতে যে হস্তক্ষেপ করিতে হয়, তাহা তাহার মনের মধ্যে স্থান পায় না। ইংরাজিতে যাহাকে প্যাটরিয়টিজম্ বলে, সে ভাবটা তাহার মনে কখনও অঙ্কুরিত হয় নাই। ভারতবর্ষে কখনও জাতীয়তার বিকাশ হয় নাই। কেন হয় নাই, তাহা আলোচ্য বিষয়; এবং দুষ্ট ব্রাহ্মণের ঘাড়ে সমস্ত নিক্ষেপ করিলেও যে উত্তরটা সম্যক্ হইল, তাহা বিবেচনা করিতে পারি না।

মনে করিও না যে, ভারতবাসীর প্রাণের ভয় অন্যের অপেক্ষা বেশী, বা

* মধ্যে মুসলমানের আমলে মরাঠাগণ ও শিখগণ দুইটা জাতির প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইয়াছিল; তাহার মধ্যে মরাঠা প্রতিবেশীর উপর উৎপাত করিতেও ছাড়িত না। এইখানে ইউরোপীয় ইতিহাসের কতকটা অনুকৃতি দেখা যায়।

ভারতবাসী সাহসবিষয়ে অন্যের অপেক্ষা হীন। এ কথা যে বলিবে, সে ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন করে নাই।

জাতীয় ভাব কেন যে এ দেশে বিস্তার লাভ করে নাই, তাহার একটু অনুসন্ধান দরকার। সমুদায় হিন্দুজাতি কেন যে একটা মহাজাতিতে পরিণত হয় নাই, তাহা বুঝিয়া দেখা আবশ্যক।

এক রাজার অধীনতা জাতীয় ভাবের বিকাশে সহায়তা করে। রাজনৈতিক বন্ধনের মত বন্ধন খুব কম আছে। আজ কাল এ দেশে যে একটু সুর ফিরিবার রকম দেখা যাইতেছে, যেন জাতীয় ভাবের অতি সামান্য একটু বিকাশ হইতেছে বলিয়া কখন কখন সন্দেহ জন্মিতেছে, এক দোর্দণ্ড-প্রতাপ রাজছত্রের অধীনতা তাহার কারণ। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে এ ঘটনা বোধ হয় কখনই ঘটে নাই। চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, সমুদ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি নরপতি এক একবার বিস্তৃতসাম্রাজ্যস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কাহারও সাম্রাজ্য বোধ হয় অধিকদিন স্থায়িত্ব লাভ করে নাই। সমগ্র ভারতকে বহুদিন ধরিয়া একছত্র করিয়া রাখিতে কোন রাজবংশই বোধ হয় সমর্থ হন নাই। তৎপূর্ব্বে সমগ্র দেশ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বস্বপ্রধান রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই ব্যাপারটা জাতীয় ভাবের অবিকাশের একটা কারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

আরও কয়েকটা কথা আছে। ভারতবর্ষ অতি বৃহৎ দেশ। ইহার ভিতর নানাজাতীয় নানা বর্ণের লোক বাস করে। প্রথমেই ত আর্য্য ও অনার্য্য ও তদুভয়ের মিশ্রণে উৎপন্ন বিবিধ সঙ্কর বর্ণ। আবার অনার্য্যগণের মধ্যে ছত্রিশ কোটি শাখা।

এই বর্ণভেদ ও জাতিভেদের সহিত আবার ভাষাগত ভেদ। আর্য্যভাষা অনার্য্য ভাষাকে একবারে লুপ্ত করিতে পারে নাই। দক্ষিণাপথের অধিকাংশ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী লোকেও অনার্য্য ভাষায় কথা কহে। সেই ভাষার মধ্যেও আবার তামিল তেলুগু প্রভৃতি নানা ভাষা। আরণ্য ও পার্ব্বত্য অনার্য্যদিগের সহস্র ভাষার কথা ছাড়িয়া দাও। এক আর্য্য ভাষাই আবার প্রদেশভেদে কত রূপ গ্রহণ করিয়াছে। পঞ্জাব মহারাষ্ট্র বাঙ্গলা, এক প্রদেশের লোকে অন্য প্রদেশের ভাষা বুঝেন না। ভাষাগত ঐক্য না থাকিলে সামাজিক বন্ধন কোন কাজের হয় না। সমস্ত ভারতবর্ষকে এক দেশ বলাই কঠিন। বরং সমগ্র ইউরোপকে এক দেশ বলা যাইতে পারে, সমগ্র ইউ-

রোপীয়কে একজাতিভুক্ত বলা যাইতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষকে একটা দেশ ও সমস্ত ভারতবাসীকে একজাতিভুক্ত বলিতে যাওয়া একরকম বিড়ম্বনা।

বন্ধনের মধ্যে কেবল একটা বন্ধন ছিল। বন্য ও পার্ব্বত্যগণকে ছাড়িয়া দিলে প্রায় সমস্ত ভারতবাসী এক ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। আর্য্যজাতির বেদমূল পন্থায় প্রায় সকলেই চলিতে শিখিয়াছিল ও বেদমূলক আচার গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার মধ্যেও বিবিধ সম্প্রদায়ভেদ, বিবিধ আচারভেদ ঘটিয়া সমস্ত জাতিকে কখনও জমাট বাঁধিতে দেয় নাই।

জাতীয়তার অভাব বুঝাইবার জন্য এইরূপ কতকগুলা কথা বলা যাইতে পারে; এবং সচরাচর এইরূপ কারণই অনেকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সবগুলা জড়াইলে একটা কথায় দাঁড়ায়। ভারতবাসী এক জাতিতে পরিণত হয় নাই; কেন না, ভারতবর্ষ দেশটা অতি প্রকাণ্ড। ইহা একটা দেশ নহে, একটা মহাদেশ; ইহা এক জাতির আবাসভূমি নহে, এক বর্ণের লোক ইহাতে বাস করে না। ইহা নানা জাতি নানা বর্ণের মনুষ্যের বিহারক্ষেত্র। ইহাতে নানা ভাষা, নানা আচার, নানা ধর্ম্ম। রাজনৈতিক বা সামাজিক, ধর্ম্মগত বা ভাষাগত বা আচারগত, কোন একটা সাধারণ সম্বন্ধ এই বিংশ কোটি মনুষ্যকুলকে একটা বাঁধনে আবদ্ধ রাখে নাই। এই সাধারণ বন্ধনের অভাবে ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তির এমন আকর্ষণ ঘটিতে পায় নাই, যাহাতে উভয়ে একত্র হইয়া সাধারণ উদ্দেশ্যে আপনার জীবনের গতি পরিচালিত করিতে পারে।

কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিলেই কি মনের তৃপ্তি হয়? ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্যত্র দৃষ্টিপাত করিলে কি দেখা যায়? অন্যত্রও কি ঠিক এই সকল কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও অন্তবিধ ফলের উৎপত্তি হয় নাই?

মনে কর ইউরোপ। ইউরোপ একটা মহাদেশ। কিন্তু রুসিয়া খণ্ড ছাড়িয়া দিলে এই মহাদেশের যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা আয়তনে ভারতবর্ষ অপেক্ষা অধিক বড় হইবে না। সেখানেও ঠিক জাতিভেদ, বর্ণভেদ, আচারভেদ আমাদের মতই বিভিন্ন। ইউরোপীয়েরা সকলেই আর্য্যবংশীয় বলিয়া যতই আস্ফালন করুন না, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই রক্তে বার আনা অনার্য্য রক্ত বহিয়াছে, ইহা প্রকৃত কথা। তবে ইউরোপে আর্য্যে ও অনার্য্যে যতটা মিশিয়া গিয়াছে, আমাদের দেশে ততটা মিশিতে পায় নাই, ইহা সত্য বটে। আর্য্য-অনার্য্য-বিভেদ ততটা পরিস্ফুট না থাকিলেও এক আর্য্য জাতিরই

বিবিধ শাখা ইউরোপের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। এবং তাহাদের মধ্যে পরস্পর অসাদৃশ্য, এমন কি বিদ্বেষের ভাবও নিতান্ত কম নহে। তার পর ভাষাভেদ, সেও নিতান্ত ফেলিবার নহে। ইউরোপে যতগুলা দেশ, ততগুলা ভাষা; এমন কি, একটা দেশের মধ্যেও পাঁচটা ভাষার অস্তিত্ব নিতান্ত বিরল নহে। একটা ধর্ম্মের বন্ধন উপর উপর দেখা যায় বটে, তুর্কি ছাড়িয়া দিলে ইউরোপের সকলেই খৃষ্টান। কিন্তু সে বন্ধনটা কেবল নামমাত্র, কাজে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কেন না, খৃষ্টানের সঙ্গে খৃষ্টানের যেমন বিবাদ, অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বীর সঙ্গে তত নহে। খৃষ্টান খৃষ্টানকে পোড়াইতে যেমন আনন্দ লাভ করিয়া থাকে, অন্য কোন কার্য্যে তাহার তেমন আনন্দ নাই বা আগ্রহ নাই। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মগত বিদ্বেষ কত দূর ভীষণ আকার ধারণ করিতে পারে, ইউরোপের ইতিহাস আগুনের অক্ষরে তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছে।

ফলে ভারতবর্ষও যেমন কখনও একছত্র হয় নাই, ইউরোপও তেমনি কখনও একছত্রাধীনতায় আসে নাই। ভারতবাসী একত্র হইয়া যেমন মহাজাতিতে পরিণত হয় নাই, ইউরোপবাসীও সেইরূপ মহাজাতিতে পরিণতি লাভ করে নাই। উভয়ত্র একই কারণ। ভারতবর্ষ একটা দেশ নহে, একটা মহাদেশ। ইউরোপও তেমনি একটা দেশ নহে, একটা মহাদেশ। ভারতবর্ষে যেমন একটা জাতি নাই, অনেক জাতি, ইউরোপেও তেমনি একটা জাতি নাই, অনেক জাতি। ভারতবাসীর যেমন ভারতের জন্য প্রাণ কাঁদে না, ইউরোপবাসীরও সেইরূপ ইউরোপের জন্য প্রাণ কাঁদে না।

একই কারণে একই ফল উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষ ও ইউরোপ দুই মহাদেশে একই কারণে একই ফল উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু উভয়ে সাদৃশ্য এই পর্য্যন্ত। ইহার পর আর সাদৃশ্য নাই। ইউরোপবাসীর ইউরোপের জন্য প্রাণ কাঁদে না বটে, কিন্তু ফরাসীর প্রাণ ফ্রান্সের জন্য কাঁদে; জর্ম্মানের প্রাণ জর্ম্মানির জন্য আবেগের সহিত কাঁদিতেছে; ইতালীয়ের প্রাণ ইতালীর জন্য কাঁদিয়া উঠিয়া ইতালীকে এক মহারাজ্যে পরিণত করিয়াছে; ইংরাজের প্রাণ হোমের জন্য কাঁদিয়া থাকে, গ্রীসের প্রাণের অবরুদ্ধ প্রবাহ বাহির হইতে না পারিয়া অন্তঃসলিল বহিতে থাকে। আধুনিক ইতিহাস তাহার প্রমাণ। কিন্তু বাঙ্গালীর প্রাণ বাঙ্গলার জন্য কখনও কাঁদে নাই, পঞ্জাবীর প্রাণ পঞ্জাবের জন্য কাঁদে নাই—সে একবার কাঁদিয়াছিল অত্যাচারী ধর্ম্মদ্বেষী মুসলমানের রক্তপানের অবসর না পাইয়া। মরাঠা মহারাষ্ট্রের জন্য কাঁদিয়াছিল বলিলে

বোধ করি ভুল হয়, সে যে একবার অশ্রু ফেলিয়াছিল, সে বোধ হয় আনন্দের অশ্রু ও উল্লাসের অশ্রু। আনন্দ—মোগল সেনাপতির গলার মুক্তা ছড়াটার জন্য, উল্লাস—যবন রাজার টুপি কাড়িয়া ও দাড়ি মুড়াইয়া আপন উৎকট পরিহাসরসিক বৃত্তির চরিতার্থতায়। ভারতবাসী কেহ কখনও স্বদেশের জন্য বা স্বজাতির জন্য কাঁদে নাই, ইহাই সাধারণ নিয়ম; সাধারণ নিয়মের ব্যভিচারের কেবল একটা মাত্র উদাহরণ ইতিহাসে লেখে,—তেমন উদাহরণ জগতের ইতিহাসেও বোধ করি দুর্ল্লভ; সে উদাহরণ মেওয়ারের রাজপুত।

এইখানে ইউরোপীয় ও ভারতবাসীতে তফাৎ। ইউরোপবাসী মহাদেশের ভাবনা ভাবে না ও মহাজাতিপ্রতিষ্ঠায় তাহার আগ্রহ নাই, কিন্তু সে তাহার খণ্ডদেশমধ্যে খণ্ডজাতির প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনাকে সেই জাতিশরীরের অঙ্গীভূত করিয়া স্পন্দিত হয়। সমগ্র ইউরোপ মহাদেশ কতকগুলি খণ্ড খণ্ড ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছে, এবং এক একটা রাজ্যে এক একটা দুর্দ্দম দৃঢ়বদ্ধ সবল জাতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ফরাসী জর্ম্মানির শোণিতপানের তৃষ্ণায় ব্যাকুল; কিন্তু ফরাসী আবার ফ্রান্সের জন্য আপন শরীরের শেষ শোণিত বিন্দু প্রদান করিতে প্রস্তুত। তেমনি জর্ম্মান, তেমনি ইংরাজ। ইউরোপে এই অর্থে জাতীয় ভাবের স্ফুরণ ও বিকাশ হইয়াছে, ইউরোপে এই অর্থে প্যাটরিয়টিজম উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

তার পর রাজায় প্রজায় সম্বন্ধ। আমাদের দেশে এই সম্বন্ধও ইউরোপ হইতে সম্পূর্ণ বিসদৃশ। অনেক ঐতিহাসিক ভারতের প্রাচীন শাসনপ্রণালীকে রাজতন্ত্র বা যথেচ্ছাচারপ্রণালী বলিয়া বর্ণনা করেন। কিন্তু আমার বিবেচনায় সেকালের শাসনপ্রণালী সম্পূর্ণ প্রজাতান্ত্রিক ছিল; প্রজা যে পরিমাণে স্বাধীনতাভোগের আপনা হইতে অধিকার পাইয়াছিল, সহস্র বৎসরের বিবাদের ফলে আধুনিক ইউরোপীয় প্রজা তাহা পাইয়াছেন কি না সন্দেহ। প্রাচীন হিন্দু রাজা পুরাণপ্রথিত রামচন্দ্র বা যুধিষ্ঠিরের সদৃশ ছিলেন, এরূপ আমার বিশ্বাস নাই। তাঁহারা দোষের গুণের মানুষ ছিলেন; এবং রাজজাতীয় মনুষ্যের স্বাভাবিক নিয়মমত, বোধ হয়, গুণের ভাগ অপেক্ষা দোষের ভাগই অধিক ছিল। স্বার্থের জন্য বা রাজ্যের জন্য, বন্ধু বন্ধুকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে, পুত্র পিতাকে, ভৃত্য প্রভুকে হত্যা পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না; এরূপ উদাহরণ ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসেও বিরল নহে। কিন্তু অন্যত্র প্রজার সহিত রাজার যে একটা বিরোধ দেখা যায়, এখানে

সেটা তেমন প্রবলমাত্রায় ছিল না। রাজার ও প্রজার মধ্যে তেমন দৃঢ় বন্ধনই বোধ হয় ছিল না। প্রজা খুব সামান্য ভাবেই রাজার প্রভুশক্তির অধীন ছিল। প্রজার রাজার নিকট নিপীড়িত হইবারও বিশেষ অবসর ঘটে নাই, রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিবারও তেমন দরকার হয় নাই। অত্যাচারী প্রজাপীড়ক রাজা কেহ ছিল না, এমন কথা নহে। কথাটা হইতেছে সাধারণ নিয়ম লইয়া। কয়েকটা বিষয় আলোচনা করিলে এ বিষয়টা বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইতে পারে।

সেকালের রাজার কেবল একটা কাজ। তিনি দণ্ডধর। তিনি সৈন্যপরিবৃত হইয়া শত্রু হইতে রাজ্য রক্ষা করেন ও রাজসিংহাসন রক্ষা করেন। এবং তিনি রাজ্যের মধ্যে দুষ্টের শাসন দ্বারা শান্তি রক্ষা করিতেন। সর্ব্বত্র না হউক, অনেক স্থলে মন্ত্রণাদান ও বিচারের ভার ব্রাহ্মণের হাতে ছিল; এবং ব্রাহ্মণকে, যেমনই প্রবল রাজা হউন, ভয় করিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন। শাসনবিষয়ে ও বিচারবিষয়ে রাজার খেয়াল ততটা কাজ করিতে পারিত না। কিন্তু এই স্থলেই বোধ করি প্রজার সহিত রাজার সম্বন্ধের শেষ। রাজা কর আদায় করিতেন, করের ভার দুর্ব্বহ ছিল কি না, সে বিষয়ে ইতিহাস কিছু বলে না। করসংস্থাপনে রাজা ইচ্ছার উপর ও খেয়ালের উপর চলিতেন কি না, সে বিষয়েও ইতিহাস নিরুত্তর। রাজা যাহাই করুন, শাস্ত্রকার ব্রাহ্মণ কিন্তু এ বিষয়েও রাজার শক্তি সংযত করিয়া দিতে অন্ততঃ চেষ্টার ত্রুটী করিতেন না। রাজা কর আদায় করিতেন, তাহার দ্বারা আপন সেনা পোষণ করিতেন, শান্তি রক্ষা করিতেন, বাবুয়ানা করিতেন, এবং ইচ্ছা হইলে হয় ত সাধারণের হিতের জন্যও কতক খরচ করিয়া ফেলিতেন। কিন্তু প্রজার স্বাধীনতাসংহারের জন্য এক কপর্দ্দক ব্যয় করিতেন, এরূপ প্রমাণ নাই।

ব্যবস্থাপ্রণয়ন অর্থাৎ আইনকানুনের প্রণয়ন রাজার হাতে ছিল না। প্রজা আপন চিরাগত প্রথানুসারে আপনার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। আইনের ব্যাখ্যাটা ব্রাহ্মণ ঠাকুরের হাতে ছিল বটে, এবং তিনি দায়ভাগ হইতে ডাক্তারী উপদেশ পর্য্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দিতে ছাড়িতেন না; এবং অপরাধীর সংখ্যা ক্রমে বাড়াইয়া একবারে গণনার বাহির করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল অপরাধের অধিকাংশ স্থলেই স্বকৃত প্রায়শ্চিত্ত, জোর এক আধটু সামাজিক নিগ্রহের বিধান ছিল। রাজদ্বারে অধিকাংশ

ক্ষেত্রেই খবর পঁহুছিত না। বিচারাদি কার্য্যও অনেক স্থলে মধ্যস্থের দ্বারা ও সমাজের মুরব্বিদের দ্বারা সম্পাদিত হইত। গ্রামের ভিতর পল্লীর ভিতর প্রজার দৈনন্দিন ও নিত্য নৈমিত্তিক জীবনব্যাপার গ্রামের লোকের পরস্পর সাহায্যে সম্পাদিত হইত। রাজার সহিত কোন বিষয়ে কোন সম্বন্ধ ছিল না, বা সংঘর্ষ ঘটিত না। ফলে শান্তিরক্ষা ও শত্রুর সহিত লড়াই ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত কাজই প্রজারা আপনা-আপনি আপনাদের মধ্যেই গোছাইয়া লইত। গ্রামের পাঁচ জনে মিলিয়া গ্রামের কাজ সম্পাদন করিত। সমাজের পাঁচ জনে কর্ত্তা হইয়া সমাজের কাজ সম্পাদন করিত। রাজার নিকট উপস্থিত হইতে হইত না, রাজাও কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন না। আভ্যন্তরীণ রাজনীতি রাজার অধিকারবহির্ভূত ছিল। হইতে পারে, এই সকল ব্যাপারে ব্রাহ্মণ অন্যান্য জাতির উপর অবৈধ ভাবে ও অন্যায় উপায়ে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিবিস্তারের চেষ্টা করিতেন; হয় ত এই সূত্রে ব্রাহ্মণের সঙ্গে অপরের বিরোধ ঘটিত, বা বিদ্বেষ ঘটিত। কিন্তু সে বিরোধ প্রজায় প্রজায়; রাজার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক ছিল না।

আর একটা প্রকাণ্ড স্বাধীনতা ভারতের প্রজার স্বাভাবিক ছিল,—ভারতের বাহিরে অন্যত্র মনুষ্য যাহার রসাস্বাদে আজি পর্য্যন্ত বঞ্চিত রহিয়াছে।

ভারতবর্ষে রাজা কখনও প্রজার চিন্তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। ইউরোপে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে যাজকসম্প্রদায় জনসাধারণের জন্য ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়া দিতেন। রাজা সেই যাজকসম্প্রদায়ের সহায় ও পৃষ্ঠপোষক থাকিতেন। যে ব্যক্তি প্রচলিত ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে রসনাস্ফালনে সাহসী হইত, সমগ্র রাজশক্তি বজ্রের মত তাহার মস্তকের উপর নিপতিত হইত।

কেহ যদি জ্ঞানবিজ্ঞানের একটা নূতন কথা প্রচার করিলেন, তৎক্ষণাৎ রাজাদেশে প্রজ্বলিত চিতানলে তাঁহার শরীরকে ভস্মীভূত করিয়া আত্মার সদ্গতির ব্যবস্থা হইল। ফলে অজ্ঞানের তমোময় অন্ধকার সমগ্র মহাদেশে সহস্র বৎসর ধরিয়া আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বপ্রান্তে যে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রদীপ্ত শিখা জ্বলিয়া উঠিয়া সমগ্র জগৎকে আলোকিত করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, বর্ব্বর খৃষ্টানের বর্ব্বর রাজশক্তি ও বর্ব্বর যাজকশক্তি একত্র সম্মিলিত হইয়া তাহাতে শীতল বারিধারা নিক্ষেপ করিয়া অচিরে নির্ব্বাণ করিয়া ফেলিল। জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, গণিত, পদার্থবিদ্যা

ও মনোবিদ্যা ও নীতিবিদ্যা, অঙ্কুরিত হইয়া সতেজে শাখাপ্রশাখা সৃষ্টি করিতেছিল; তাহারা একবারে উন্মূলিত ও উৎপাটিত হইল। সুকুমার কলাবিদ্যা মানবের দুঃখময় জীবনে সুখের ও শান্তির প্রতিষ্ঠার জন্য নানা উপায়ে নিযুক্ত হইতেছিল; বর্ব্বরগণের প্রবল কুঠারাঘাতে তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইল। জ্ঞানের পন্থা কণ্টকিত হইল, স্বাধীন চিন্তার দ্বার আবদ্ধ হইল; ইউরোপের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে চিতার অনলে দার্শনিকের ও তত্ত্বানুসন্ধায়ীর নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হইতে লাগিল।

রাজসম্প্রদায়ের ও যাজকসম্প্রদায়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই। মানবাত্মার সম্প্রসারণের পথরোধে সমবেত যাজকশক্তি ও রাজশক্তি কৃতকার্য্য হয় নাই। মনুষ্য আপন স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্য বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়াছে। খড়্গহস্তে আপনার ন্যায্য সম্পত্তি ফিরাইয়া আনিয়াছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর এই অন্তিমকালে, বিজ্ঞান যখন দর্পের সহিত অগ্রসর হইতেছে, দর্শন যখন অজ্ঞানের তিমিররাশি ভেদ করিয়া সত্যের রাজ্যপ্রতিষ্ঠার জন্য চলিয়াছে, এখনও কি সেই পুরাতন জরাজীর্ণ রাজশক্তি ও যাজকশক্তি পৈশাচিক কুটিল কঠাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া নাই?

ভারতবর্ষে বিধান অন্যরূপ। এখানে যে মানবসম্প্রদায়ের হস্তে জ্ঞানালোচনার ভার অর্পিত ছিল, রাজশক্তি সভয়ে তাহার নিকট প্রণত থাকিত। মনুষ্যের ধীশক্তি অপ্রতিহতপ্রভাবে সহস্র দ্বার উন্মুক্ত করিয়া সহস্র দিকে প্রধাবিত হইয়াছিল; কেহ বলিতে সাহস করে নাই, ঐ পন্থায় তুমি চলিও না। যিনি বলিতে চাহেন, ভারতের ব্রাহ্মণ মনুষ্যের চিন্তাশক্তিকে শৃঙ্খলিত ও নিগড়বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনি হয় অন্ধ, নতুবা মিথ্যাবাদী। তাঁহার সহিত বিচারের অবতারণা বিড়ম্বনা।

সামাজিক, নৈতিক, ভৌতিক ও মানসিক, সকল ব্যাপারেই ভারতীয় প্রজা সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন ছিল; ঠিক এই কারণে রাজার সহিত কখনই তাহার বিরোধের আশঙ্কা ঘটে নাই। এই জন্যই সে কখন অস্ত্রধারী সৈনিকের ব্যবসায়-অবলম্বনে বাধ্য হয় নাই। রাজার সহিত রাজার যুদ্ধ হইত; এক রাজার হস্ত হইতে রাজদণ্ড অন্যে কাড়িয়া লইতেন; কিন্তু প্রজার স্বাতন্ত্র্যের বিরুদ্ধে কেহই দণ্ডায়মান হইতেন না। প্রজাও সেই জন্য রাজপরিবারের ও রাজবংশের ভাগ্যপরিবর্ত্তনে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। রাজার সহিত বিরোধ করিতে হয়, রাজার নিকট আপনার পাওনা গণ্ডা বুঝিয়া

লইতে হয়, কথায় কথায় রাজার কৈফিয়ত চাহিতে হয়, ভারতের প্রজার এই শিক্ষালাভের অবসরই ঘটিয়া উঠে নাই। যে শিক্ষা ও যে পরীক্ষা, যে বিরোধ ও দ্বন্দ্ব হইতে জাতীয় ভাব ও রাজনৈতিক ভাব বিকশিত হয়, এ দেশে তাহার সম্পূর্ণ অভাব ছিল। কারণের অভাব, ফলেও সেইরূপ।

ভারতের প্রজা জানিত না, রাজার সহিত বিরোধ করিতে হয়; সে জানিত না, রাজার ছত্রদণ্ড লইয়া অপরে টানাটানি করিলে রাজার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইতে হয়; সে জানিত না, রাজবিপ্লবের ফলের সহিত প্রজার সামাজিক জীবনের শুভাশুভ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইতে পারে। অতি প্রাচীন কালে যুদ্ধ ব্যবসায় চালাইবার জন্য একটা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহাদের নাম ছিল ক্ষত্রিয়। রাজার সিংহাসনরক্ষার জন্য, শত্রুর হস্ত হইতে দেশরক্ষার জন্য এই ক্ষত্রিয় জাতিই প্রয়োজনমত অস্ত্র ধারণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইত। বৌদ্ধবিপ্লবের সময় প্রাচীন ক্ষত্রিয় জাতির উচ্ছেদ হইয়াছিল। ভারতবর্ষে যুদ্ধব্যবসায়ী মনুষ্যসম্প্রদায় বর্ত্তমান ছিল না; যাহারা বেতন গ্রহণ করিয়া যুদ্ধের ব্যবসায় চালাইত, তাহাদের কোনরূপ নৈতিক দায়িত্ববোধ ছিল না। প্রাচীন ক্ষত্রিয় জাতির লোপ হইয়াছিল। প্রাচীন সমাজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, নূতন সমাজগঠনের কার্য্য আরব্ধ হইতেছিল মাত্র। এই সময়ে পশ্চিমদেশ হইতে যবন, শক, হূনাদি বিবিধ সমরপ্রিয় বর্ব্বর জাতি হিন্দুস্থানে দলে দলে প্রবেশ লাভ করিতে থাকে; অনেকে বড় বড় রাজ্যস্থাপনেও কৃতকার্য্য হয়। কিন্তু অল্পদিনেই তাহারা হিন্দুস্থানের সামাজিক আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়া হিন্দুসমাজের অন্তর্গত ও অঙ্গীভূত হইয়া পড়িল। এই সকল নবাগত সমরপ্রিয় জাতিগণকে লইয়া ভারতবর্ষের নূতন ক্ষত্রিয় রাজপুতের অভ্যুত্থান হইল। যখন মুসলমান আসিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিল, ভারতবর্ষের প্রজাসাধারণ তাহাতে শঙ্কিত ও ত্রস্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা আত্মরক্ষণে সমর্থ হয় নাই। আত্মরক্ষার জন্য যে রাজনৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন, সে শিক্ষা কখনও তাহারা পায় নাই। তাহারা দল বাঁধিয়া সাধারণ শত্রুর বিপক্ষে দাঁড়াইতে সমর্থ হয় নাই, অথবা ঐ কার্য্যের আবশ্যকতার উপলব্ধি করে নাই। নূতন ক্ষত্রিয় রাজপুত একা সেই দুরন্ত শত্রুর প্রতিকূলে দাঁড়াইয়াছিল। বেগবতী প্রবাহিনীর গতিরোধ তাহাদের অসাধ্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু মুসলমানের মত প্রচণ্ড শত্রুর সঙ্গে তাহারাও যেরূপ লড়িয়াছিল, তাহার বিবরণ পৃথিবীর ইতিহাসে চিরকাল লিপিবদ্ধ থাকিবে।

মুসলমান আমাদের দেশের রাজা হইয়া রাজসিংহাসনে বসিয়াছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রজার উপর উৎপীড়ন অত্যাচারও যথেষ্ট করিতেন; কিন্তু মোটের উপর প্রজার পারিবারিক ও সামাজিক, দৈহিক ও মানসিক স্বাতন্ত্র্যের দিকে তাঁহাদেরও লোলুপদৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয় নাই। কিছু দিনের মধ্যেই হিন্দু ও মুসলমান ভারতবর্ষের অধিবাসী হইয়া ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন; একই ভারতমাতা উভয়েরই জননীস্বরূপা হইয়া উঠিয়াছিলেন। সম্প্রতি বৈদেশিকের অধিকারে যেন উভয়ের সেই ভ্রাতৃভাবের ও সখ্যভাবের বন্ধন ছিন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে। উভয়ের মধ্যে সামাজিক আচারগত বন্ধন অসম্ভব; কিন্তু ভরসা যে, বিশালচ্ছায় ব্রিটিশ রাজছত্রের তলে দণ্ডায়মান উভয় জাতি এক ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সখ্যসূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া পরস্পরকে বর্দ্ধিত ও পোষিত করিতে থাকিবে।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

সুহৃদ।

"সে মরে গেলে আমার এত কষ্ট হইত না। আমি অন্যের অপেক্ষা কাপুরুষ নহি, কিন্তু এ যন্ত্রণা অসহ্য। আমি তাকে এত ভালবাসিতাম। এই এক বৎসর বিবাহ হয়েছে, আমি ভাবিতেছিলাম বুঝি জগতে আমার আর কিছু চাহিবার নাই। কিন্তু কি নির্ব্বোধ! সে অনায়াসে চলে গেল। কার সঙ্গে গেল? ভাই! দেবতার দিব্য, যদি জান, বল, সে লোকটা কে?"

দুই জনের অনেক দিনের সৌহার্দ্য। কম্পিতহস্তে বিশ্বাসঘাতিনী পত্নীর পত্র লইয়া শোকাকুল স্বামী তাহার প্রিয়তম সুহৃদের নিকট আসিয়াছিল। সে সরল লোক, সাংসারিক বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তাহার বন্ধুটি কিন্তু পাকা সংসারী—পৃথিবীর ছল চাতুরী বেশ বুঝিত, এবং আবশ্যক মত তীক্ষ্ণবুদ্ধির দ্বারা তাহা ব্যর্থ করিতেও সমর্থ।

"আমি যদি সুধু জানিতাম,—কে আমার কাছ হইতে তাহাকে চুরি করিয়া লইয়াছে।"

"তা হ'লে কি হ'ত?"

"প্রথমে বাড়ী যাইয়া ঘুমাইতাম। বলের দরকার—দেখ আমার হাতটা কি রকম কাঁপছে। তার পর আমি—"

"তার পর তুমি কি?"

"তার পর কুকুরের মত তাকে গুলি ক'রে মারিতাম। পৃথিবী আমাদের উভয়ের বসতির জন্য নিতান্ত ক্ষুদ্র।"

"তা হ'লে আমার ইচ্ছা, জ্যাক, যেন তাহার সহিত তোমার কখনও দেখা না হয়।"

"তুমি আমার সুহৃদ!"

"তোমার বন্ধু বলিয়াই এই প্রকার কামনা করি।"

"তুমি আমার অপেক্ষা বুদ্ধিমান। যখন কোনও বিপদে পড়েছি, তুমি আমাকে উদ্ধার করেছ; সেই জন্য আজ তোমার নিকট এসেছি!"

তাহার বন্ধু ধীরে ধীরে বলিল, "হাঁ।"

"কিন্তু তুমি ত কোন পরামর্শ দিতেছ না। তুমিও যেন আমার মত হতবুদ্ধি হয়েছ।"

"হাঁ।"

"আমার সমস্ত শরীর জ্বলে যাচ্ছে, তুমি কি না আমাকে চুপ করে থাকতে বল?"

"তোমার ধৈর্য্য অবলম্বন করাই উচিত। তাহা ভিন্ন আর উপায় কি? বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি হয়,—এ কথা আমার চেয়ে জ্ঞানী লোকেরা বলিয়া গিয়াছেন।"

"তুমি কি মনে কর, আমার স্ত্রীর সঙ্গে আবার দেখা হবে?"

"আমি—আমাকে ক্ষমা কর। আজ রাত্রে আমার শরীরটা বড় ভাল নয়। তোমার খবরটা শুনে একবারে আত্মহারা হয়ে পড়েছি। তোমাকে সান্ত্বনা করিবার ক্ষমতা নাই। আজ বাড়ী যাইয়া ঘুমাও। কাল সকালে যাহা ভাল হয় বলিব।"

"তবে আসি।"

উভয়ে করমর্দ্দন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। জ্যাকের হস্তে তখনও তাহার স্ত্রীর পত্রখানি। সে শূন্যদৃষ্টিতে পত্রখানি দেখিতেছিল। তাহার বন্ধুর মূর্চ্ছার উপক্রম দেখিয়া জ্যাক একটু আশ্চর্য্য হইয়াছিল। তাহার হৃদয়ে বিষম ব্যথা, কিন্তু তথাপি সে ত দাঁড়াইয়া আছে।

নক্ষত্ররাজিত রাত্রে শস্যক্ষেত্রের ভিতর দিয়া সে জনশূন্য গৃহে উপস্থিত হইল। তাহার কণ্ঠস্বরে নৈশনিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইতেছিল।

জ্যাক স্ত্রীর নাম ধরিয়া ডাকিল, কিন্তু কোনও উত্তর নাই।

বাড়ী পৌঁছিলে স্ত্রীর ছোট কুকুরটি কাছে আসিল। জ্যাক তাহাকে আদর করিল। তাহার পর টেবিলের উপর স্ত্রীর সূচীকার্য্যের বাক্সটি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। এক দিন এ সমস্তই তাহার প্রিয়তমার ছিল। কিন্তু সে মধুর দিন যেন বহুকাল গত হইয়াছে।

সে বলিল, "বন্ধুর কথাই ঠিক। আমি অপেক্ষা করিয়া দেখি। এক দিন না এক দিন তাহার সহিত দেখা হইবে। প্রতিশোধের জন্য অপেক্ষা করাই ভাল। ধৈর্য্য ধরিলে সমস্তই মিলে।"

* * * * *

দশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। আবার গ্রীষ্মকালে সোনার রঙ্গের শস্য হইয়াছে। সান্ধ্যবায়ুভরে শস্যের শিষগুলি পরস্পরের দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িতেছিল। বহুদূরস্থ প্রবাস হইতে শ্রীভ্রষ্ট কাতর মুখে জ্যাক বন্ধুর গৃহে উপস্থিত হইল।

ইয়র্ক বলিল, "ফিরে এসেছ? তোমাকে দেখে বাঁচলাম।"

"আমি প্যারিসে গিয়াছিলাম। সেখান হইতে একটা খবর লইয়া আসিতেছি।"

"কাহার নিকট হইতে?"

"আমার স্ত্রীর কাছ থেকে।"

ইয়র্কের মুখ শুকাইয়া গেল, তবুও সাহসে ভর করিয়া বলিল, "তা হ'লে সে এখনো বেঁচে আছে?"

"এত দিন বাঁচিয়া ছিল, তাহা না হইলে কে এ খবর পাঠাইবে? এখন সে মরিয়াছে।"

অনেকক্ষণ দু'জনে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল; জ্যাক ক্যারিংটন বন্ধুর কুঞ্চিত অবয়বের দিকে চাহিয়াছিল।

ইয়র্ককে যেন কে জোর করিয়া বলাইল, "কোথায় এবং কি প্রকার অবস্থায় তাহাকে দেখিলে?"

"প্যারিসের একটা গলিতে উপরতলার এক অতি ক্ষুদ্র গৃহে। গৃহ সূর্য্যালোকে পরিপূর্ণ। সে আলার কাছ হইতে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছিল। পরমেশ্বর তাহাকে আমার নিকট হইতে রক্ষা করুন! হয় ত আমি তাহাকে

চিনিতে পারিতাম না। মৃত্যুর বা তদপেক্ষা কোনও ভয়ানক পদার্থের ছায়া তাহার মুখে পড়িয়াছিল।"

"সে কথা কহিতে পারিয়াছিল?"

"পারিয়াছিল,—কিন্তু এত আস্তে যে আমি তাহার মুখের কাছে কান পাতিয়া অনেক কষ্টে শুনিয়াছিলাম। সে এত শত বার আমার ক্ষমা চাহিতেছিল যে, তাহাতে আমার কেমন কষ্ট বোধ হইতেছিল।"

"তুমি তাহাকে ক্ষমা করিয়াছ?"

"বহুদিন পূর্ব্বে।"

"সে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল?"

"সে বলিল, কি মোহিনীশক্তিপ্রভাবে উন্মত্তের ন্যায় তাহার জ্ঞান লুপ্ত হইয়াছিল। সে শক্তিকে বাধা দিবার তাহার দুর্ব্বল হৃদয়ে ক্ষমতা ছিল না। তাহার পলায়নের বৃত্তান্তও বলিল, সে কথা শুনিলে অতি কঠিন হৃদয়ও গলিয়া যায়। ছোট কুকুরটির জন্য, যে গাছগুলিতে জল সেচন করিত, সেই বৃক্ষগুলির জন্য, কত কাঁদিয়াছিল। কিন্তু যাহার সমস্ত জীবনটা এমন করিয়া নষ্ট করিয়াছে, তাহার জন্য একবিন্দুও অশ্রু পড়িল না।"

"স্ত্রীলোকের এই ধরণ"—কথা কয়েকটি যেন যন্ত্রের মধ্য হইতে বাহির হইল।

"যদিও তুমি বিবাহ কর নাই, কিন্তু স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে দু'কথা জোর করিয়া বলিতে পার। মন্দভাগিনী নিজেকেও শতবার ধিক্কার দিতেছিল। সে বলিল, তাহার বয়সের দোষ নহে, দোষ তাহার নিজের। যে তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া কুকুরের মত মরিবার জন্য পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তাহার শাস্তিও সে প্রার্থনা করিল না। সৌন্দর্য্যহ্রাস হইলে বা অন্য কোনও রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া হতভাগা বহুবৎসর হইল তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে।"

ইয়র্ক পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, "সে তোমাকে সমস্ত বলিয়া গিয়াছে?"

"সুধু যে তাহাকে শান্তিময় গৃহ হইতে ছিন্ন করিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহার নাম বলে নাই।"

"ভালই করিয়াছে। হলাহল রাখিয়া যাওয়ায় লাভ কি?"

ইয়র্ক অতি তাড়াতাড়ি কথাগুলি বলিল। তাহার পাণ্ডুর কপোলে পুনর্ব্বার রক্তের সঞ্চার হইতেছিল।

"সে না বলুক, আমি তাহার নাম জানি।"

জ্যাকের স্বরে তিরস্কার বা ক্রোধের লক্ষণমাত্র নাই। তাহার স্থির অচল দেহ দেখিলে প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া ভ্রম হয়।

জ্যাক ধীরে ধীরে স্পষ্ট করিয়া বলিল, "দশ বৎসর পূর্ব্বে একদিন আমার সমস্ত যন্ত্রণা তোমার কাছে বলিতে আসিয়াছিলাম। অনেক দিন হইয়া গিয়াছে। তথাপি আমার কথা বোধ হয় তোমার মনে আছে?"

কিয়ৎক্ষণ ইয়র্কের সম্মতির অপেক্ষা করিয়া জ্যাক আবার বলিল, "তোমাকে বলিয়াছিলাম, আমার প্রিয়তমাকে যে চুরি করিয়াছে, তাহার ও আমার জন্য এই পৃথিবী অতি ক্ষুদ্র।"

"হাঁ", ইয়র্কের কথা অতি অস্পষ্ট।

ক্যারিংটনের স্থির দেহ একবার স্পন্দিত হইল। সে জামার পকেটে হাত দিল। সেই স্থানে হাত রাখিয়া আর একবার বলিল, "আমার সেই মত এখনও আছে। আমি তোমাকে বাঁচিতে দিলাম, কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্ট জগতে তোমার ও আমার দু' জনের স্থান নাই। সেই জন্য—"

তাহার পরমুহূর্ত্তে সেই গোধূলিধূসর গৃহে অগ্নি স্ফুরিত হইল। গুরুপদার্থের পতনশব্দের সঙ্গে সঙ্গে অনেক ভয়বিহ্বল লোক ছুটিয়া আসিল। এই কোলাহলের মধ্যে ইয়র্ক স্থানুবৎ নির্ব্বাক ও নিশ্চল হইয়া বসিয়াছিল। যখন লোকে আসিয়া তাহার বাহুস্পর্শ করিল ,তখন সে সুধু মৃত ব্যক্তির মুখের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ঈশ্বরের দোহাই! তোমরা মুখটা ঢাকিয়া দাও।"

উন্মাদগ্রস্ত হইবার পূর্ব্বে ইয়র্কের এই শেষ প্রকৃতিস্থ কথা। *

শ্রীনলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

ইংলণ্ডের সংবাদপত্র।

প্রবন্ধারম্ভেই মনে একটা খট্‌কা উপস্থিত হয়,—সংবাদপত্রকে সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বলিব কি না। সংবাদপত্র সাহিত্যের একাংশ হউক বা না হউক, ইহা কিন্তু নিশ্চিত যে, সংবাদপত্রের এক প্রধান অংশ সাহিত্য। সুতরাং আমরা সংবাদপত্রকে সাহিত্যের বিভাগেই

* ইংরাজী হইতে অনুবাদিত।

ধরিয়া লইলাম। "মাদ্রাজ ষ্ট্যাণ্ডার্ড" পত্রের সম্পাদক মিষ্টার জি. পরমেশ্বরন পিলে সম্প্রতি ইংলণ্ডপ্রবাস হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন;—সেদিন তিনি মাদ্রাজের কোন সভার অধিবেশনে ইংলণ্ডের সংবাদপত্রের যে কৌতুহলাবহ বিবরণ দিয়াছেন, এবং এ দেশের সংবাদ কিরূপ বিকৃত হইয়া ইংলণ্ডে পৌছায়, তাহার যে বর্ণনা করিয়াছেন,—তাহারই সার নিম্নে প্রদত্ত হইল।

স্বদেশে বিদেশে।

বিগত বিংশতি বৎসরে এ দেশে দেশীয় কর্ত্তৃক পরিচালিত ও বিদেশীয় কর্ত্তৃক পরিচালিত (অর্থাৎ অ্যাংলোইণ্ডিয়ান) সংবাদপত্রের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে; কিন্তু ইংলণ্ডে সংবাদপত্রের প্রভাব ও ক্ষমতার সহিত তুলনায়, এ দেশে সংবাদপত্রের প্রভাব ও ক্ষমতা কিছুই নহে। সেখানে ক্ষৌরকার, শকটচালক, এমন কি মজুর পর্য্যন্ত, সকলেই নিয়মমত সংবাদপত্র পাঠ করে; আবার কেহ কাহারও নিকট সংবাদপত্র চাহিয়া লইয়া কাজ সারে না।—কাজেই অনুমান করুন, বিলাতে সংবাদপত্রের কিরূপ প্রচলন। এ দেশে যাহারা সংবাদপত্র পড়িতে চাহে, তাহারা লয় না; যাহারা লয়, তাহারা মূল্য দেয় না; যাহারা মূল্য দেয়, তাহারা পড়ে না; যাহারা মূল্য দিয়া লইতে পারে, তাহারা চাহিয়া পড়ে! আবার এ দেশে সংবাদপত্রও তত সুলভ নহে;—কাজেই সংবাদপত্রের প্রচলন অল্প ও তাহার প্রভাবও সামান্য।

দেশীয় ও অ্যাংলোইণ্ডিয়ান।

এ দেশে দেশীয়পরিচালিত ও অ্যাংলোইণ্ডিয়ান উভয়বিধ সংবাদপত্রেরই শক্তি অল্প। তাহার মধ্যে আবার দেশীয় সংবাদপত্রের প্রভাব আরও অল্প। দেশীয় সংবাদপত্রের যাহা কিছু প্রভাব কেবল শিক্ষিত দেশীয়দিগের উপর—এইখানে পাঠক মনে রাখিবেন, এ দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা অতি সামান্য—দেশীয় সংবাদপত্রের ক্ষীণস্বর ভারতসীমায় যাইতে যাইতেই মিলাইয়া যায়—সাগরপারে সে স্বর আর শ্রুত হয় না। অ্যাংলোইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র সম্বন্ধে এ কথা প্রযোজ্য নহে। ভারতসম্বন্ধীয় যে সকল সংবাদ ইংলণ্ডে যায়, সে সকলই অ্যাংলোইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রের মত। প্রথমতঃ Reuter যে সকল সংবাদ তারযোগে প্রেরণ করেন, সে সকলই অ্যাংলোইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রের সংগ্রহ; তাহার পর টাইমস্ পত্রের একজন সংবাদদাতা কলিকাতায় ও সিমলায় থাকেন—তিনি অবশ্য অ্যাংলোইণ্ডিয়ান--কাজেই তাঁহার মতও সেই সম্প্রদায়েরই মত। ইহা ভিন্ন রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের অন্যান্য সংবাদপত্রেরও এ দেশে জন ছয়েক সংবাদদাতা আছেন;—বলা বাহুল্য, ইঁহারাও অ্যাংলোইণ্ডিয়ান। কাজেই দেশীয়দিগের মত আর দেশের বাহিরে যায় না। এইরূপ ব্যাপার যতদিন চলিবে, ততদিন আমাদের কোনও নূতন অধিকারপ্রাপ্তি অসম্ভব; বরং এবার মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতায় ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের যেরূপ দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে, তাহার পুনরাবৃত্তি হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব।

ইংলণ্ডে।

এবার এই যে সম্পাদকদিগকে গবর্মেণ্টের খরচে আহার দিবার এত হুড়াহুড়ি পড়িয়াছে--ইহার মূলে রক্ষণশীলদলের সংবাদপত্র। অ্যাংলোইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র হইতে বিকৃত সংবাদ লইয়া, তাহাই প্রকাশ করিয়া, এই সকল সংবাদপত্র ইংলণ্ডের লোককে উত্তেজিত করিয়াছে। এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, ইংলণ্ডের লোক ভারতবর্ষের সংবাদ কেবল টেলিগ্রামেই পাঠ করে; কিছু দিন পরে যখন ডাকে সম্পূর্ণ সংবাদ যায়, তখন আর সে সংবাদে কাহারও আগ্রহ থাকে না—তাহা তখন 'পান্তো' হইয়া পড়ে—তাহা সকল সংবাদপত্রে প্রকাশিতও হয় না। র্যাণ্ডের হত্যা, প্লেগসম্বন্ধীয় নিয়ম, চিৎপুরের দাঙ্গা, এই সকল বিষয়ের সংবাদ বিলাতের লোকে তারের স্তম্ভ হইতেই সংগ্রহ করিয়াছে। বলা বাহুল্য, সে সকল সংবাদ আবার অ্যাংলোইণ্ডিয়ান

সংবাদপত্রের বিকৃত সংবাদ হইতে সংগৃহীত। রক্ষণশীলদলের সংবাদপত্র এই সকল সংবাদের উপর চোকাল চোকাল সমালোচনা ঝাড়িতে লাগিলেন;—'একে মনসা, তাহাতে আবার ধূনার গন্ধ' হইল। ইংলণ্ডে রক্ষণশীলদলের সংবাদপত্র সকলের ক্ষমতা অসাধারণ—তাহাদের সংখ্যাও অনেক। একখানি উদারনৈতিক সংবাদপত্রের স্থানে প্রায় তিনখানি রক্ষণশীল সংবাদপত্র। আবার সকল উদারনৈতিক সংবাদপত্র ভারতবাসীদিগের পক্ষসমর্থন করে না; কিন্তু সকল রক্ষণশীল সংবাদপত্রই আমাদের বিপক্ষতাচরণ করিয়া থাকে।

অসত্য সংবাদ ও ভ্রান্ত ধারণা।

বোম্বাইয়ের গোলমালের সময় ইংলণ্ডের সংবাদপত্রে যে সকল সংবাদ প্রকাশিত হইত, তাহার কথা শুনিলে হাস্যসংবরণ করা দুষ্কর হইয়া উঠে। কিন্তু পাঠক মনে রাখিবেন, সেই সকল সংবাদপত্রের ছেলেখেলা আমাদিগের পক্ষে বড় সুবিধাজনক নহে। ইংলণ্ডে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইত, "ভারতবর্ষে সিডিশন", "বিদ্রোহের সূচনা", "আরও ইংরাজ নৃশংসভাবে নিহত"—ইত্যাদি। সেখানে সংবাদপত্র সকল ভারতবাসীদিগকে অতি তীব্রভাবে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সেই সকল প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দেশের লোকের মনে ভ্রান্ত ধারণা স্থান পাইত, আবার এই সকল সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল সংবাদপত্রে সিপাহীবিদ্রোহের ভীষণ চিত্র চিত্রিত হইত; ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষের ইতিহাসের সেই রক্তাপ্লুত পৃষ্ঠা দেখিয়া ইংরাজ শিহরিয়া উঠিত। ভারতবর্ষে অ্যাংলোইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রে অসত্য সংবাদ প্রকাশিত হইত; এ দেশ হইতে অ্যাংলোইণ্ডিয়ান সংবাদদাতারা সেই সকল অসত্য সংবাদ প্রেরণ করিতেন; আর রক্ষণশীলদলের সংবাদপত্রে সেই সকল অসত্য সংবাদ স্থান পাইত;—ইহাতেই ইংলণ্ডের লোকের মনে ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল হইয়া যাইত।

ইংলণ্ডের সংবাদপত্রে ভারতবর্ষসম্বন্ধে কিরূপ অসত্য সংবাদ প্রকাশিত হয়, তাহার একটা নমুনা দেখুন। চিৎপুরের দাঙ্গার সময় ৫ই জুলাই টাইম্‌সের সংবাদদাতা টেলিগ্রাফ করিলেন যে, কলিকাতার মুসলমান কশাইরা কতকগুলি ইংরাজের গৃহ-আক্রমণের জল্পনা করিতেছে ও ইংরাজ মহিলাদিগকে প্রহার করিতেছে, দেশীয় সংবাদপত্র সকল ইহাতে আনন্দ প্রকাশ করিতেছে, আর দেশীয়গণ সহরের সর্ব্বত্র য়ুরোপীয়দিগের অপমান করিতেছে: ইহার পর তিনি সংবাদ দেন যে, চিৎপুরের দাঙ্গায় অন্ততঃ ৬০০ জীবননাশ হইয়াছে! বলা বাহুল্য, এ সংবাদে ইংলণ্ডে হৈ-চৈ পড়িয়া গেল! সংবাদদাতা যদি ভুল সংবাদ পাইয়া টেলিগ্রাফ করিতেন, তবে তিনি পর দিবস তাহার সংশোধন করিতেন; কিন্তু ভ্রম দুই প্রকার—ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত। সংবাদপ্রেরণের এক মাস পরে সংবাদদাতা টেলিগ্রাফ করিলেন যে, চিৎপুরের দাঙ্গায় গুলি লাগিয়া এগার জন হত ও কুড়ি জন আহত হইয়াছে! ৬০০ হইতে একেবারে ১১! কিন্তু এ সংবাদ যখন বিলাতে গেল, তখন যে অনিষ্ট হইবার, তাহা হইয়া গিয়াছে। এক মাস পরে এ সংবাদ সকল সংবাদপত্রে প্রকাশিতও হইল না,—আর এই এক মাসকাল সংবাদপত্রে '৬০০ জীবননাশ' বলিয়াই প্রবন্ধ চলিয়াছিল। এই এক মাসের মধ্যে একখানা সংবাদপত্রে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ,—"১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এই সকল কৃষ্ণকায়, ভারতবাসীরা আমাদিগকে (ইংরাজদিগকে) ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহারা কত দূর সফলকাম হইয়াছিল, তাহা সকলেই অবগত আছেন। সোজা কথায় বলি, তাহারা কি আবার সেই কাণ্ড করিবে? তাহারা কি কানপুরের স্ত্রীহত্যা ও শিশুহত্যার পুনরভিনয় করিবে? লক্ষ্ণৌ সহরে ইংরাজগণকে সেবার যে যন্ত্রণা দিয়াছিল, তাহারা কি এবার ইংরাজদিগকে আবার তেমনি যাতনা দিবে?"

পাঠক বুঝুন, লেখকের রজ্জুতে কিরূপ সর্পভ্রম হইয়াছে!

আমাদিগের কর্ত্তব্য।

আমরা দেখাইয়াছি, যে মিথ্যা সংবাদের বিদ্যুৎ এ দেশে অ্যাংলোইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রে প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাই অ্যাংলোইণ্ডিয়ান সংবাদদাতৃগণের দ্বারা ইংলণ্ডে পরিচালিত হইয়া সেখানে রক্ষণশীলদলের সংবাদপত্রসমূহের সাহায্যে জনগণের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার নিবারণের উপায় কি? যদি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদদাতাদিগের সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে বিলাতে 'সত্য' সংবাদপ্রেরণের বন্দোবস্ত করা যায়, তবেই এই অনিষ্ট নিবারিত হইতে পারে,—নতুবা নহে। বাস্তবিক এই গোলো-যোগের সময় যদি অ্যাংলোইণ্ডিয়ানদিগের সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে যথার্থ সংবাদ ইংলণ্ডে প্রেরিত ও প্রকাশিত হইত, তবে বোধ হয় আজ তিলককে জেলে পচিতে হইত না, নাটুদ্বয়কে স্বদেশ ও স্বজনগণের নিকট হইতে দূরে যাইতে হইত না, আর নাটুজননীকে বৃদ্ধবয়সে পুত্রদিগের দুরবস্থা দেখিয়া মর্ম্মব্যথায় জীবনত্যাগ করিতে হইত না। যাহা হইবার, তাহা হইয়াছে;—গবর্মেণ্ট ইচ্ছা করিলে এখনও তিলককে ও নাটুদ্বয়কে মুক্তি দিতে পারেন। কিন্তু যাহাতে এইরূপ ব্যাপার আর সংঘটিত হইতে না পারে, তাহার উপায় করা আবশ্যক। ইংলণ্ডের লোক ভারতবর্ষীয় সংবাদ টেলিগ্রাফে ভিন্ন পাঠ করিবেন না; কাজেই যাহাতে সর্ব্বদা ভারতীয় সকল ব্যাপারের সংবাদ তারযোগে ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। জাতীয় মহাসমিতির মুখপত্র India আগামী বর্ষ হইতে সাপ্তাহিক হইবে। মোলায়েম মাসিক অপেক্ষা সতেজ সাপ্তাহিকে যে অধিক কাজ হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু India সাপ্তাহিক হউক আর দৈনিকই হউক, ইংলণ্ডে তাহার পাঠকসংখ্যা বড় অধিক হইবে না; কাজেই আমাদিগকে এ দেশের সকল সংবাদ তারযোগে ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে প্রেরণ করিতে হইবে। জাতীয় মহাসমিতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা ও ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক সভা হইতে ইহার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত আবশ্যক।

শেষ কথা।

সংবাদপত্রে এইরূপ সংবাদপ্রেরণ ভিন্ন মিষ্টার পিলে আর একটি প্রস্তাব করিয়াছেন। ইংলণ্ডের জনসাধারণের মধ্যে কোন কথা, বিশেষতঃ রাজনৈতিক কথার প্রচারের দুই মুখ্য উপায়,—সংবাদপত্র ও বক্তৃতা। কাজেই সংবাদপত্রে সংবাদ প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেও চলিবে না। বৎসরে অন্ততঃ দুই জন রাজনীতিবিশারদ দেশীয়কে ইংলণ্ডে পাঠাইতে হইবে; তাঁহারা কতকগুলি সভায় বক্তৃতা করিয়া ইংলণ্ডের জনসাধারণকে ভারতবর্ষের অবস্থা বুঝাইবেন। এইখানে বলিয়া রাখি, এই প্রস্তাব নূতন নহে; ইতিপূর্ব্বেও জাতীয় মহাসমিতি হইতে এইরূপ প্রতিনিধি প্রেরণ করা হইয়াছে। এখন সেই প্রথার পুনঃপ্রচলন আবশ্যক।

সমাজ-তত্ত্ব।

আমেরিকান ও নরওয়েজিয়ান রমণীসমাজ।

আমেরিকায়।

সাধারণতঃ লোকের এই একটা বিশ্বাস আছে যে, আমেরিকা স্ত্রীস্বাধীনতার দেশ; সেখানে সকল বিষয়েই স্ত্রীপুরুষের সমান অধিকার। "ওম্যান অ্যাট্ হোম্" পত্রে শ্রীমতী গার্টরুড আথার্টন বলেন, এ বিশ্বাসের মূলে কোনও সত্য নাই। আমেরিকায় বালিকারা বালকদিগের সহিত সমান শিক্ষা পায়, এবং আপনি পতি পছন্দ করে, এই পর্য্যন্ত। যে সকল পুংবৎপ্রগল্ভা, শালীনত্ববিবর্জ্জিতা আমেরিকান বালিকা

দেখিয়া বিদেশীয়গণ মনে করেন, আমেরিকায় স্ত্রীস্বাধীনতার অসাধারণ আধিক্য,—তাহারা সে দেশে ভদ্রসমাজে মিশিতে পায় না। আমেরিকায় যে যুবতী অভিভাবকহীন অবস্থায় কোন অপরিচিত পুরুষের সহিত বেড়াইতে বাহির হয়েন, তাঁহার পক্ষে ভদ্রসমাজের দ্বার রুদ্ধ। আমেরিকায় বালিকার পক্ষে যাহার তাহার নিকট কোন উপহারগ্রহণও নিষিদ্ধ।

প্রমাণস্বরূপ লেখিকা বলিয়াছেন যে, একবার তাঁহার স্বামীর অনুপস্থিতিকালে তিনি ষোড়শবর্ষের অনধিকবয়স্ক কতকগুলি বালক বালিকাকে সান্‌ফ্রান্সিস্কোতে মেলা দেখাইতে লইয়া গিয়াছিলেন ও রাত্রের ট্রেনে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। এই অপরাধে ছয় মাস ধরিয়া তাঁহাকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল।

কাজেই দেখা যাইতেছে, আমেরিকায় স্ত্রীস্বাধীনতা বিশেষরূপ সীমাবদ্ধ। কেবল আমেরিকায় বালিকারা যাহাতে নানা বিষয়ে কোন মত স্থির করে ও তাহা প্রকাশ করিতে পারে, তাহারই চেষ্টা হয়—ইংলণ্ডে তাহা হয় না।

"হিউম্যানিটেরিয়ান" পত্রে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিরা মনে হয়, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়াই প্রকৃত স্ত্রীস্বাধীনতার দেশ। যাঁহারা সে দেশের লোকের আচার, ব্যবহার ও ভাষা জানেন না, তাঁহারা রমণীগণের স্বাধীনতার মাত্রাধিক্য দেখিয়াই বড় ভুল বিশ্বাস লইয়া আইসেন। সেখানে যুবতীরা একাকিনী পথে ভ্রমণে বাহির হয়েন এবং নাট্যালয়েও গমন করেন। নিশীথে কোন সমিতি হইতে গৃহপ্রত্যাবর্ত্তনকালে যুবতীদিগের সহিত কোন ভৃত্য থাকিবারও প্রয়োজন নাই; তাঁহারা একাকিনীই ফিরিয়া আইসেন। যে সকল রমণীকে খাটিয়া খাইতে হয়, তাহাদের স্বাধীনতা অবশ্যই অধিক—অপরে সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করে। সেখানে

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায়।

মহিলারা স্বচ্ছন্দে একাকী হোটেলে গিয়া আহারাদি করেন। সেখানে কোন হোটেলে চা-বা-কফি-পান-রত কৌতুকহাস্যে ব্যাপৃত যুবক যুবতীকে দেখিলেই কেহ যেন এমন মনে না করেন যে, তাহারা প্রেমিক প্রেমিকা, হয় ত তাহারা বন্ধুমাত্র।

এ কথা বলাই বহুল্য যে, রমণীদিগের স্বাধীনতার এই আতিশয্যের ঔচিত্য বিষয়ে বিশেষ মতভেদ লক্ষিত হয়। এ মতভেদ প্রায় সর্ব্বদেশেই দেখা যায়।

অবাধ স্ত্রীস্বাধীনতার সর্ব্বপ্রধান অনিষ্টকারিতা এই যে, এই অতিরিক্ত স্বাধীনতায় মহিলাদিগের শালীনতা ও কোমলতা নিতান্তই অল্প হইয়া দাঁড়ায়। তবে প্রবন্ধলেখিকা বলেন যে, নরওয়েজিয়ান রমণীদিগের ব্যবহার যেরূপই হউক, তাহাদিগের হৃদয় অত্যন্ত নির্ম্মল ও জ্ঞানপিপাসা অত্যন্ত প্রবল।

বিবিধ।

ম্যাক্সমূলারের পূর্ব্বস্মৃতি।

অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের মত একজন সর্ব্বত্রপূজিত পণ্ডিতের জীবনে অতি উচ্চ হইতে অতি নগণ্য বহুবিধ লোকের কথা জানিবার সুবিধা হয়। অধ্যাপক এখন জীবনের শেষ সীমায় উপস্থিত। বহুপ্রকার অভিজ্ঞতাপূর্ণ কর্ম্মবহুল জীবনের স্তূপাকার স্মৃতি এখন তাঁহার চারিদিকে ব্যাপ্ত। সেই সকল স্মৃতির মধ্যে তিনি এখন কিছু কিছু "কস্‌মোপলিস্‌" পত্রে প্রকাশিত করিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে একবার আমরা বহু বিদ্বজ্জন সম্বন্ধে তাঁহার স্মৃতির সারসংগ্রহ দিয়াছিলাম। * এবার অধ্যাপক জ্ঞানবান ছাড়িয়া ধনবানদিগের সম্বন্ধীয় স্মৃতি প্রকাশিত করিয়াছেন। সেই মনোরম প্রবন্ধ হইতে আমরা কিছু কিছু সংগ্রহ কয়িয়া দিলাম।

* ১৩০৩ বঙ্গাব্দের চৈত্রমাসের 'সহযোগী সাহিত্য' দ্রষ্টব্য।

জার্ম্মানীতে "ঋগ্বেদ" প্রকাশমানসে অধ্যাপক বার্লিনে ছিলেন। তিনি সেখানকার পুস্তকাগারে অধ্যায়নরত ছিলেন। তৎকালে অ্যালেক্‌জ্যাণ্ডার ভন্‌ হামবোল্ট, নৃপতিকে তাঁহার কথা

নৃপতির নিমন্ত্রণ ও পুলিশের কুব্যবহার।

বলিয়া তাঁহার সঙ্কল্পিত মহদনুষ্ঠানে নৃপতির সাহায্যদানের চেষ্টায় ছিলেন। পরিশেষে রাজা একদিন অধ্যাপককে আহারের নিমন্ত্রণ করেন। নিমন্ত্রণের দিন পুলিশের একজন কর্ম্মচারী অধ্যাপকের সহিত সাক্ষাৎ করিল, এবং নানা প্রশ্নের পর তাঁহাকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বার্লিন পরিত্যাগ করিতে হুকুম করিল। কি সন্দেহে যে পুলিশ অধ্যাপকের উপর সহসা এই হুকুম জারি করিল, তাহা পুলিশই জানে; কিন্তু এই অযাচিত ও অপ্রত্যাশিত হুকুমে অধ্যাপক কিছু বিপদে পড়িলেন। অধ্যাপক তাঁহার Passport দেখাইলেন, বলিলেন, আর এক সপ্তাহ হইলেই তাঁহার কার্য্য শেষ হয়। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; হাকিম নড়ে, তবু হুকুম নড়ে না।—পুলিশের হুকুম বজায় রহিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া শেষে অধ্যাপক পুলিশের কর্ম্মচারীকে বলিলেন—"আচ্ছা, পুলিশের কর্ত্তাদের বলিবেন, আমি তাঁহাদিগের হুকুম তামিল করিব,—এখনই বার্লিন ছাড়িয়া যাইব, কিন্তু তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া মহারাজকে জানান যে, আজ রাত্রে আমি তাঁহার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিব না।" পুলিশের কর্ম্মচারী প্রথমে ভাবিল, বুঝি অধ্যাপক চালাকি করিতেছেন; কিন্তু যখন দেখিল, ইহা চালাকি নহে, তখন সে যেন বজ্রাহত হইল। সে অধ্যাপককে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল। বলা বাহুল্য, অধ্যাপককে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বার্লিন ত্যাগ করিতে হয় নাই।

মহারাণী বিক্টোরিয়ার বিবাহকালে কোন কোন অপরিমিতসূক্ষ্মদর্শী আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, পতির উপদেশানুবর্ত্তিনী হইয়া মহারাণী হয় ত কাজ করিবেন। সেই কথা লইয়া

রাজনৈতিক সংবাদ-প্রকাশের আতঙ্ক।

অধ্যাপক আর একটা তদ্রূপ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। যখন লর্ড জন রাসেলকে পররাষ্ট্রসচিব করিবার কথা হয়, তখন ক্যাবিনেটের কোন কোন সভ্য তাহাতে আপত্তি করেন। তাঁহাদিগের আপত্তির দুই কারণ,—প্রথমতঃ, লর্ড জনের উপর তাঁহার পত্নীর প্রভাব অত্যন্ত অধিক; দ্বিতীয়তঃ, লর্ড জনের পত্নীর অসাবধানতায় রাজনৈতিক গোপনীয়-সংবাদাদি প্রকাশিত হইয়া যাইতে পারে;—স্ত্রীলোকের পেটে কথা থাকে না। লর্ড পামারষ্টোন এই সকল কথা নীরবে শুনিলেন, তাহার পর বক্তাদিগের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ইহার নিবারণের একমাত্র উপায় এই যে, আমাদের মধ্যে একজন সর্ব্বদা রাসেল-দম্পতীর সহিত একত্র শয়ন করিব।" তাহার পর সকলের বিস্ময়বিস্ফারিত নয়ন দেখিয়া তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, আমরা পালা করিয়া লইব।"

মহারাণী বিক্টোরিয়ার উইণ্ডসর প্রাসাদে নিমন্ত্রিত হইয়া অধ্যাপক একবার বিষম বিপদে পড়িয়াছিলেন। নিয়মিত সময়ে উপস্থিত হইয়া অধ্যাপক দেখিলেন,—সর্ব্বনাশ!—

প্রাসাদে অতিথি।

তাঁহার পোর্টম্যাণ্টো আসে নাই! তিনি ক্রমাগত টেলিগ্রাফ করিতে লাগিলেন। শেষে সংবাদ পাইলেন, পোর্টম্যাণ্টো অক্সফোর্ড ষ্টেশনে পড়িয়া আছে। কিন্তু রাত্রি সাড়ে আট্‌টার পূর্ব্বে অক্সফোর্ড হইতে কোন ট্রেন আসিয়া পৌছায় না! প্রিন্স লিয়োপোল্ড তখন উইণ্ডসরে থাকিতেন। বিপন্ন অধ্যাপক তাঁহাকে সকল কথা জানাইলেন। অধ্যাপক বলিলেন, তিনি লিখিয়া পাঠাইবেন যে, কোনও বিশেষ কারণে তিনি আহারে যোগদান করিতে পারিবেন না। প্রিন্স লিওপোল্ড বলিলেন—"তাহা হইবে না; রাণী যখন আপনাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তখন আপনাকে আহারে যোগদান করিতেই হইবে।" প্রিন্সের কথা শুনিয়া অধ্যাপকের চক্ষুঃস্থির!

প্রিন্স তখন বাটীর সকলের নিকট হইতে পোশাক যোগাড় করিতে লাগিলেন। কাহারও কোট, কাহারও ওয়েষ্টকোট, কাহারও জুতা, এইরূপে পোশাকের যোগাড় হইল। কিন্তু সেই বিচিত্র সম্মিলনে এরূপ দাঁড়াইল যে, অধ্যাপক স্পষ্টই বলিলেন,—সেরূপে সং সাজিয়া রাণীর নিকট যাওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। হতাশ হইয়া তিনি যখন আহারে যোগদান করিতে পারিবেন না বলিয়া পত্র লিখিতে বসিলেন, তখন সাড়ে আট্‌টার গাড়ী আসিল। সেই গাড়ীতে অধ্যাপকের পোর্টম্যাণ্টোও পৌঁছিল। তাড়াতাড়ি পোর্টম্যাণ্টো খুলিয়া পোশাক বাহির করিয়া পোশাক পরিয়া অধ্যাপক নিশ্চিন্তভাবে আহারে যোগদান করিলেন। সুখের বিষয়, মহারাণীর সেদিন ফিরিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল; তাই আহারেও কিছু বিলম্ব ঘটিয়াছিল।

অধ্যাপক বলেন, ব্যাবিলোনীয়, পারসীয়, ম্যাসিডোনীয় ও রোমক সাম্রাজ্য সকলের সহিত তুলনা করিলেও এ কথা বলা যায় যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মত সাম্রাজ্য আর হয় নাই। আবার ইংলণ্ডের মত স্বাধীনদেশ আর কোথায় আছে? (দুঃখের বিষয়, ইংলণ্ডের অধীন দেশ সকলের সহিত ব্যবহারকালে এই প্রশংসিত স্বাধীনতা সময় সময় নিতান্তই সঙ্কুচিত হইয়া আইসে।) এখন লোকে বলিবে, বহুশতাব্দীর পরীক্ষার পর এখন এ কথা বলা যাইতে পারে, একজন রাজা বা রাণীর অধীনে Constitutional গবর্মেণ্টই সর্ব্বোৎকৃষ্ট গবর্মেণ্ট।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। আশ্বিন। শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবীর "আগমনী" নামক কবিতাটি এত আন্তরিকতাপূর্ণ ও করুণ সমবেদনায় এমন অভিষিক্তিত যে, মুগ্ধহৃদয়ে পাঠ করিয়া কবিত্ব-বিচারে আর প্রবৃত্তি থাকে না। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'জনপ্রবাদমূলক' গল্প—"জামাইজাঙ্গাল" কৌতূহলোদ্দীপক ও সুখপাঠ্য। লেখকের ভাষা অপেক্ষাকৃত পরিমার্জ্জিত ও রচনাকৌশল সুসংস্কৃত হইলে গল্পটি অত্যন্ত মনোরম হইত। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের "দীপান্বিতা"র আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না। ক্রমে ক্রমে তাঁহার পল্লীচিত্রগুলি নিতান্ত 'একঘেয়ে' ও কষ্টকল্পিত পুনরাবৃত্তিমাত্রে পরিণত হইতেছে। হিন্দুবিধবা যেমন পঞ্জিকার আদেশ অনুসারে অমাবস্যা প্রভৃতি তিথির পালন ও একাদশীর উপবাস করেন, দীনেন্দ্র বাবুও যেন তেমনই পাঁজী খুলিয়া বসিয়া আছেন;—পর্ব্ব দেখিলেই হিন্দু বিধবার একাদশীর মত অবশ্যকর্ত্তব্যজ্ঞানে তাহার চিত্র অঙ্কিত করিতেছেন! অনবরত কচলাইলে লেবু তিক্ত হইয়া যায়,—দীনেন্দ্র বাবুর মত একজন পল্লীচিত্রকর যে এই গ্রাম্য বচনটির যাথার্থ্য অবগত নহেন,—ইহা বিচিত্র বলিয়া বোধ হয়। এই সংখ্যায় "কাহাকে" সমাপ্ত হইল।—"যথা পূর্ব্বং তথা পরং।" শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "সূর্য্য" প্রবন্ধটি উৎকৃষ্ট। একে বিষয়গুণে জ্যোতিষবিষয়ক প্রবন্ধগুলি সাধারণতঃ সাধারণের অনধিগম্য; তদুপরি মাধব বাবুর ভাষাও সাধারণ পাঠকের পক্ষে দুরূহ। অবশ্য, তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধগুলি সর্ব্বসাধারণের জন্য কল্পিত নহে। কবে মাধব বাবু সর্ব্বসাধারণের জন্য লিখিতে আরম্ভ করিবেন? বিলাতে যাহাকে "Popular Science" বলে, আমাদের সাহিত্যে কি বিশেষবিৎ মাধব বাবুই জ্যোতিষে তাহার পথপ্রদর্শক হইবেন না?

উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি।

ইতিপূর্ব্বে ইতিহাসে দীর্ঘতমার স্থান নির্ণয় করিতে যত্ন করিয়াছি। এক্ষণে ঋগ্বেদে তাঁহার স্থান কিরূপ, দেখা যাউক।

যে ঋগ্বেদসংহিতা সম্প্রতি প্রচলিত, ইহা শাকল শাখার ঋক্‌সংহিতা বলিয়া বিখ্যাত। ইহা দশ মণ্ডলে বিভক্ত। এই দশ মণ্ডলের মধ্যে দ্বিতীয় হইতে অষ্টম পর্য্যন্ত সাতটি মণ্ডল সাত জন বিখ্যাত ঋষি কর্ত্তৃক দৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। যথা:—

২য় মণ্ডল—ঋষি গৃৎসমদকর্ত্তৃক দৃষ্ট।
৩য় " " বিশ্বামিত্র "
৪র্থ " " বামদেব "
৫ম " " ভরদ্বাজ "
৬ষ্ঠ " " অত্রি "
৭ম " " বসিষ্ঠ "
৮ম " " কণ্ব "

ইহা একটি স্থূল মত। বাস্তবিক ঐ কয়েকটি মণ্ডল যে প্রত্যেকেই কেবল এক এক জন ঋষির রচিত, তাহা নহে। পণ্ডিতসমাজে ঐ কয়েকটি মণ্ডল প্রত্যেকে তত্তৎ ঋষিবংশের ঋক্‌সংহিতা বলিয়া পরিগণিত। কোন এক সময়ে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সাতটি বিখ্যাত ঋষিবংশ বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহারা উপরি-উক্ত সাত জন ঋষিকে আপনাদের আদিপুরুষ বলিয়া পরিচয় দিতেন। সেই সাত ঋষিবংশের অধ্যাপকেরা নিজ নিজ পরিষদে পূর্ব্বপুরুষগণের রচিত এক একটি ঋক্‌সংহিতা সংগ্রহ করিয়া রক্ষা করেন। তাহাই কালক্রমে সমগ্র ঋক্‌সংহিতার দ্বিতীয় হইতে অষ্টম পর্য্যন্ত সাতটি মণ্ডলে পরিণত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত সোমযাগে বহিষ্পবমান স্তোত্রের জন্য সোমের প্রশংসাপূর্ব্বক যে সকল সামসংগীত রচিত হইয়াছিল, সামগায়কেরা সেই সকল সংগীতের ঋক্ একত্র করিয়া একটি পৃথক সংহিতা প্রণয়ন করেন; তাহাতে উল্লিখিত সাত ঋষির রচিত পবমান স্তোত্র সকলও নিবিষ্ট হইয়াছিল। এই সংহিতা উত্তরকালে সমগ্র সংহিতার নবম মণ্ডলে পরিণত হইয়াছে।

ইহার পর যে সকল ঋষির ঋক্ অবশিষ্ট রহিল, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত হইল। যে সকল ঋষি শতাধিক ঋক্ রচনা করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের রচনা এক ভাগে,—এবং অবশিষ্ট ঋষিগণের ঋক্ দ্বিতীয় ভাগে নিবদ্ধ হইল। প্রাতরনুবাকে এক শত ঋক্‌পাঠের ব্যবস্থা ছিল। বোধ হয়, যে সকল ঋত্বিকেরা প্রাতরনুবাকপাঠে নিযুক্ত হইতেন—তাঁহারা শতাধিকঋক্‌রচনাকারী এক এক ঋষির ঋক্ কণ্ঠস্থ করিতে পারিলেই স্ব স্ব কার্য্যের যোগ্য বলিয়া পরিগণিত হইতেন। এই সকল শতাধিকঋক্‌রচনাকারী ঋষিরা ‘শতর্ষি’ নামে বিখ্যাত। ইঁহাদের প্রত্যেকের রচনা একদা এক একটি ক্ষুদ্র সংহিতার আকার ধারণ করিয়াছিল, এবং সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংহিতা একত্র করিয়া বর্ত্তমান ঋক্‌সংহিতার প্রথম মণ্ডল সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহা তজ্জন্য ‘শতর্ষিগণের মণ্ডল’ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

এ স্থলে বলা উচিত যে, এই শতসংখ্যাগণনায় এক একটি চরণ এক একটি ঋক্ বলিয়া গণিত হইয়াছে। যথা :—

> “গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণো অর্চন্তি অর্কমার্কিণঃ।
> ব্রহ্মাণস্ত্বা শতক্রতো উদ্বংশমিব যেমিরে॥”

ইহা এক্ষণে একটি ঋক্ বলিয়া গণ্য,—কিন্তু উল্লিখিত গণনায় ইহা দুইটি ঋক্ বলিয়া গণ্য। এই কথা স্মরণ রাখিলে দেখা যাইবে, প্রথম মণ্ডলের সকল ঋষিই শতাধিক চরণ বা ঋক্ রচনা করিয়া গিয়াছেন; কেবল মধুচ্ছন্দার পুত্র জেত এই নিয়ম রক্ষা না করিয়াও ‘শতর্ষিগণের মণ্ডলে’ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই একটিমাত্র ব্যতিক্রমে নিয়মের যে ব্যভিচার ঘটিয়াছে—তাহার কারণ ইহাই বোধ হয় যে, কোনও সময়ে জেতার রচনা তদীয় পিতা মধুচ্ছন্দার রচনা বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল, পরে সেই ভ্রম ধরা পড়ে; কিন্তু তখন আর সংহিতায় জেতার স্থান পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।

শতর্ষিগণকে বাদ দিয়া অন্য ঋষিদের যে ঋক্‌সূক্ত অবশিষ্ট রহিল, তাহাই ঋগ্বে .র দশম মণ্ডল হইল। পূর্ব্বকালে প্রয়োগের জন্য ঋক্‌মাত্রেরই ঋষি, ছন্দ ও দেবতার জ্ঞান বিশেষ আবশ্যক ছিল। যজমানের গোত্র ও প্রবর অনুসারে বিশেষ বিশেষ ঋষির রচিত ঋক্‌ই প্রশস্ত বলিয়া গণ্য হইত। তজ্জন্য কোন্ ঋক্ কোন্ ঋষির রচনা, ইহা জানা নিতান্ত অপরিহার্য্য ছিল। অধিকন্তু উচ্চারণের জন্য ছন্দঃজ্ঞানের আবশ্যকতা, এবং এক দেবতার প্রশংসা অন্য দেবতার উপাসনাস্থলে অনুপযোগী বিধায়ে দেবতাজ্ঞানের আবশ্যকতাও অপরিহার্য্য

ছিল। সুতরাং প্রথম হইতেই ঋক্‌রচনাকারী ঋষিদের নাম স্মরণ করিয়া রাখা হইত। তথাপি স্থলবিশেষে কোনও কোনও ঋষির নাম একবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে,—কোনও কোনও ঋক্‌সূক্তের রচনাকারী ঋষি সম্বন্ধে মতভেদ দাঁড়াইয়াছে; এবং স্থলবিশেষে একের রচনা অন্যের রচনা বলিয়া পরিগৃহীত যে না হইয়াছে, তাহাও দৃঢ়তার সহিত বলা যায় না। যে সকল ঋক্‌সূক্তের ঋষির নাম অজ্ঞাত, তাঁহাদের এক এক জন ঋষি কল্পিত হইয়াছেন;—অথবা, ঋষির অনির্দ্দেশ্যতাবশতঃ ‘প্রজাপতি’ই ঋষি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। দশম মণ্ডলেই এই শ্রেণীর ঋক্‌সূক্তের সংখ্যা অধিক।

ফলতঃ ইহা নিশ্চিত যে, কালের পৌর্ব্বাপর্য্য অনুসারে বর্ত্তমান ঋক্‌বেদ-সংহিতায় সূক্ত বা মণ্ডলের স্থাননির্দ্দেশ হয় নাই। সুতরাং, ঋগ্বেদ-সংহিতায় দীর্ঘতমার স্থান দর্শনে অন্য অন্য ঋষির সহিত তাঁহার পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণীত হইবার নহে।

ঋগ্বেদসংহিতায় দীর্ঘতমা এক জন ‘শতর্ষি’ ঋষি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। বাস্তবিকও তাঁহার রচিত ঋক্ এক শতের অনেক অধিক। এই জন্য সংহিতার প্রথম মণ্ডলেই আমরা দীর্ঘতমার দর্শন পাই। তিনি সর্ব্বশুদ্ধ ২৫টি ঋক্‌সূক্ত রচনা করেন; অথবা তদ্রচিত ২৫টিমাত্র ঋক্‌সূক্ত কালের প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে আমাদের সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইহা ঋক্‌বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ১৪০ হইতে ১৬৪ সূক্ত বলিয়া পরিগণিত। উহা ১ হইতে ২৫ পর্য্যন্ত গণিত হইল না কেন, তাহার কারণনির্দ্দেশ করা বড়ই কঠিন। প্রথম মণ্ডলের সর্ব্বপ্রথমেই মধুচ্ছন্দা ঋষির সূক্ত। মধুচ্ছন্দা দীর্ঘতমা হইতে অনেক অর্ব্বাচীন। দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান্ ঋষির ঋক্‌সূক্তও দীর্ঘতমার পূর্ব্বেই প্রথম মণ্ডলে স্থান পাইয়াছে। সুতরাং শতর্ষি ঋষিগণকেও যে সময়ের পৌর্ব্বাপর্য্য অনুসারে প্রথম মণ্ডলে সাজানো হইয়াছে, তাহা নহে।

দীর্ঘতমার পিতা উচথ্য এক জন ঋক্‌রচনাকারী ঋষি ছিলেন; কিন্তু তাঁহার রচিত কয়েকটি পবমান সোমের অর্চ্চনাবিষয়ক ঋক্‌মাত্র সংরক্ষিত হইয়াছে। ইহাতে অনুমান হয়, তিনি এক জন সামগায়ক ছিলেন। দীর্ঘতমার উশিক্ বা উশিজ নামে এক পত্নী ছিলেন;—তাঁহার গর্ভে দীর্ঘতমার ঔরসে বিখ্যাত ঋষি কক্ষীবানের জন্ম হয়। ‘শতর্ষি’গণের মধ্যে কক্ষীবান অন্যতম। কক্ষীবানের কন্যা ঘোষা এক জন ব্রহ্মবাদিনী ঋষিকন্যা ছিলেন। তাঁহার শরীরে কোন রোগ উপস্থিত হওয়ায় পরিণত বয়সেও তাঁহার বিবাহ হয় নাই; কিন্তু

অবশেষে তিনিও দেবতাদের অনুগ্রহে পতিলাভ করিয়া সুহস্ত্যের জননী হয়েন।—সুহস্ত্যও এক জন ঋক্‌রচনাকারী ঋষি। কিন্তু ঘোষা ও সুহস্ত্যের ঋক্ সংখ্যার অল্পতাবশতঃ দশম মণ্ডলে স্থানলাভ করিয়াছে।

ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, দীর্ঘতমার বংশ একটি ঋষিবংশ। এই বংশে উত্তরোত্তর আমরা পাঁচ জন ঋষি দেখিতে পাইলাম;—তন্মধ্যে চার জন পুরুষ, এবং এক জন স্ত্রী।

দীর্ঘতমার পৌত্রী ঘোষার ঋক্‌সূক্তে অবগত হওয়া যায়, তাৎকালিক রীতি অনুসারে বিধবা স্ত্রীলোকেরা দেবরের সহিত সহবাস করিতেন। দীর্ঘতমা সম্বন্ধে এইরূপ উপাখ্যান শ্রুত হওয়া যায় যে, বৃহস্পতি নামে তাঁহার এক পিতৃব্য ছিলেন। তদীয় মাতা মমতা দেবীর গর্ভে বৃহস্পতির ঔরসে বিখ্যাত ঋষি ভরদ্বাজ জন্মগ্রহণ করেন। যে আকারে এই উপাখ্যান পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সুরুচির অনুরোধে এ স্থলে উদ্ধৃত হইল না; অধিকন্তু তাহা অতিপ্রাকৃত, সুতরাং মিথ্যা। সেই গল্পের সারাংশ অবলম্বন করিয়া ইহাই অনুমান হয় যে, মমতা দেবী বিধবা হইলে, বৃহস্পতির সহবাসে গর্ভবতী হইয়া ভরদ্বাজের জননী হইয়াছিলেন। এই অনুমান সত্য হইলে, দীর্ঘতমা ও ভরদ্বাজ সমসাময়িক ঋষি ছিলেন। মহাভারতের ইতিহাসেও ভরদ্বাজ ঋষি দুষ্মন্তপুত্র ভরতের সমকালীন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

দীর্ঘতমার রচনায় মহারাজ ভরতের সুস্পষ্ট উল্লেখ কোনও স্থানেও দেখা যায় না, কিন্তু দুই এক স্থানে তিনি আপন এক যজমানের যে প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে যেন দিগ্বিজয়ী ভরতেরই ছায়াপাত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এক স্থানে তিনি অগ্নির নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিতেছেন,—

> "রথায় নাবং উত নো গৃহায় নিত্যারিত্রাং পদ্বতীং রাসি অগ্নে।
> অস্মাকং বীরান্ উত নো মঘোনো জনাংশ্চ যা পারয়াৎ শার্ম যাব॥"

হে অগ্নে! নঃ অস্মাকং রথায় রথসদৃশায়, গৃহায় গৃহসদৃশায় চ, যজমানায় নিত্যারিত্রাং পদ্বতীং নাবং যজ্ঞফলরূপাং রাসি দেহি। যা নৌঃ অস্মাকং বীরান্ উত অপিচ অস্মাকং মঘোনঃ ব্রাহ্মণান্ জনাংশ্চ সংসারসমুদ্রং পারয়াৎ পারয়েৎ যাব ব্রহ্মসমাগমরূপং শার্ম মঙ্গলং লম্ভয়েৎ॥

"যিনি আমাদের রথের স্বরূপ,—যিনি আমাদের গৃহের স্বরূপ, সেই যজমানকে, হে অগ্নি! তুমি নিত্যকাল অরিত্রসম্পন্না এবং অবাধে গমনশীলা যাগফলরূপিণী নৌকা দান কর। সেই নৌকা আমাদের ক্ষত্রিয়গণকে,

আমাদের ব্রাহ্মণগণকে এবং আমাদের বৈশ্যগণকে যেন সংসারসমুদ্র হইতে উদ্ধার করে, এবং তাহা যেন আমাদের ব্রহ্মসমাগমরূপ পরম মঙ্গল বিধান করে।"

যাঁহার যজ্ঞে ঋত্বিকের বরণ প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘতমা এই অপূর্ব্ব প্রার্থনা রচনা করিয়াছিলেন, সেই যজমানকে ঋষি কিরূপে বর্ণনা করিতেছেন, তাহা পাঠকবৃন্দ মনোযোগপূর্ব্বক দেখুন। যিনি আমাদের গৃহের স্বরূপ, অর্থাৎ যিনি আমাদের আশ্রয়দাতা;—যাঁহার আশ্রয়ে দীর্ঘতমার ন্যায় মহর্ষি বাস করিতেছিলেন, তিনিই এ স্থলে সুস্পষ্ট উল্লিখিত হইতেছেন। তিনি আবার আমাদের রথের ন্যায়। সে কিরূপ? তাহা বুঝিতে গেলে আমাদিগকে ৩৬০০ বৎসর অতিক্রম করিয়া তৎকালীন সামাজিক অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবেক। আমরা পূর্ব্বে উদাহরণ দিয়া দেখাইয়াছি, দীর্ঘতমার সময়ে আমাদের পিতামহগণ একটি প্রকাণ্ড নদীর প্রবাহ অনুসরণ করিয়া উপনিবেশ বিস্তার করিতেছিলেন। সে নদী সম্ভবতঃ গঙ্গা;—কেন না, গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগেই আমরা ঐতিহাসিক পৌরব রাজগণকে দেখিতে পাই। ফলতঃ, এই সময়ে মানব ক্ষত্রিয়গণ পঞ্জাব প্রদেশ পার হইয়া দেশ হইতে দেশান্তরে আপনাদের আধিপত্যবিস্তার ও উপনিবেশস্থাপন করিতেছিলেন। যে দিগ্বিজয়ী সর্ব্বদমন ভরতরাজা দেশ হইতে দেশান্তরে আপন অনুচরবর্গকে লইয়া যাইতেছিলেন, তাঁহাকেই দীর্ঘতমা, 'যিনি আমাদের রথের স্বরূপ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,—আমার এইরূপ উপলব্ধি হয়।

প্রার্থনার ভঙ্গীও বিচিত্র। যে যজমানের জন্য ঋষি সংসার-সাগর হইতে পার হইবার জন্য নৌকা প্রার্থনা করিতেছেন, তিনি স্পষ্টই তৎকালীন সমাজের অধিনায়ক। সেই নৌকা যে কেবল তাঁহাকেই পার করিবে, এমন নহে; তাঁহার রাজ্যের সমুদায় ক্ষত্রিয়গণকে, সমুদায় ব্রাহ্মণগণকে, সমুদায় বৈশ্যগণকেও উদ্ধার করিবে। এ অতি উচ্চ প্রার্থনা, যাহা কেবল রাজার যজ্ঞে রাজপুরোহিতের মুখেই শোভা পায়। ইংলণ্ডের কোন রাজকীয় মহোৎসবে আর্কবিশপ অব্ কেণ্টরবরী—যেন রাজার জন্য এবং সমগ্র প্রজাপুঞ্জের জন্য ঈশ্বরের নিকট অলৌকিক মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছেন। মহর্ষি এখানে আপনার জন্য কিছু ভিক্ষা করিতেছেন না। কোনও ক্ষুদ্র যজমানের জন্যও কোনও ক্ষুদ্র বর মাগিতেছেন না; সম্রাটের যজ্ঞে সম্রাটের পুরোহিতের মুখে যেরূপ প্রার্থনা সাজে, এখানে অবিকল তাহাই তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে।

যাঁহারা বিবেচনা করেন, ঋগ্বেদরচনার সময়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য নামক শ্রেণীবিভাগের অস্তিত্ব ছিল না, তাঁহারা হয় ত চমকিয়া উঠিয়া বলিবেন যে, মূলে ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের কোন উল্লেখ নাই, অনুবাদক কোথা হইতে তাহা পাইলেন? তাঁহারা প্রণিধান করিলে দেখিতে পাইবেন যে, 'অস্মাকং বীরান্' শব্দে ঋষি তৎকালীন ক্ষত্রিয়গণের, 'উত নো মঘোনঃ' শব্দে তৎকালীন ব্রাহ্মণগণের, এবং 'জনাংশ্চ' শব্দে সাধারণ প্রকৃতিপুঞ্জ বা বৈশ্যগণের উল্লেখ করিয়াছেন। সমগ্র দ্বিজাতিসমাজ উত্তরকালের ন্যায় দীর্ঘতমার সময়েও তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর লোকেরা 'জনাঃ' বা সাধারণ প্রকৃতিপুঞ্জ বলিয়া গণ্য ছিল। তাহাদের উভয়ের এক শ্রেণীর লোকেরা 'বীরাঃ' অর্থাৎ যোদ্ধা ও যুদ্ধব্যবসায়ী ছিলেন, এবং আর এক শ্রেণীর লোকেরা 'মঘোনঃ' বা বিদ্বান ও বিদ্যাব্যবসায়ী ছিলেন। এই 'মঘোনঃ' শব্দের ইতিহাস বড় বিচিত্র। এই শব্দের প্রথমার এক-বচন 'মঘবা।' আধুনিক সংস্কৃতে 'মঘবা' শব্দে প্রায়ই ইন্দ্রকে বুঝায়; কিন্তু বৈদিক সংস্কৃতে ইহার অর্থ ভিন্ন। ফলতঃ, শব্দটি অতীব প্রাচীন; ভারতবর্ষে অস্মৎপিতামহগণের আগমনের বহু পূর্ব্বেও তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এবং তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের জ্ঞাতিস্থানীয় ইরানীগণ 'মঘবা' শব্দ তুল্যার্থে ব্যবহার করিতেন। ইরানী সমাজের ব্রাহ্মণেরা বহুকাল এই 'মঘবা' নামেই বিখ্যাত ছিলেন; এবং ঐ নাম হইতে ইংরেজী maji এবং majie শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। আমাদের সমাজের ব্রাহ্মণেরা দীর্ঘতমার সময় পর্য্যন্ত 'মঘবা' এই নামে কীর্ত্তিত হইতেন, দেখা যায়; কিন্তু উত্তরকালে উক্ত শব্দের তাদৃশ প্রয়োগ অপ্রচলিত হইয়া পড়ে, এবং যে শ্রেণীর লোকেরা একদা 'মঘবা' বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেন, ব্রাহ্মণ[illegible] তাহাদের প্রশস্ত নাম বলিয়া গৃহীত হয়। তাঁহারা 'ব্রহ্ম' বা বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাতে জীবন উৎসর্গ করিতেন বলিয়া 'ব্রাহ্মণ' এই নূতন উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। আর্য্যসমাজ যে ঋগ্বেদরচনার সময়ে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, তাহার আর এক প্রধান নিদর্শন নিবিদের ভাষা। নিবিদ্ সকল ঋক্ অপেক্ষাও অনেক প্রাচীন; কেন না, ঋগ্বেদেই অনেক স্থলে 'পূর্ব্বয়া [illegible]বদা' বলিয়া নিবিদ্ সকলের প্রাচীনতার উল্লেখ দৃষ্টিগোচর হয়। এই নিবিদ্ সকলের অবসানে একই প্রকার প্রার্থনা সন্নিবিষ্ট হইত; যথা:—

"প্রেদং ব্রহ্ম
"প্রেদং ক্ষত্রং
"প্রেদং সুম্বন্তং যজমানমবতু"॥

"ইহা প্রকৃষ্টরূপে ব্রহ্মসম্প্রদায়কে ও ক্ষত্রসম্প্রদায়কে রক্ষা করুক, এবং সোমাভিষবকারী যজমানকে রক্ষা করুক।" প্রণিধানের বিষয় এই যে, নিবিদের সময়ে ক্ষুদ্রাবয়ব সমাজে বৈশ্য-নামক বা 'জনাঃ'-নামক শ্রেণীর আবির্ভাব হয় নাই। তখন সমাজের সকলেই হয় 'ক্ষত্র', না হয় 'ব্রহ্ম'-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিল। 'ব্রাহ্মণগণ' দেবার্চ্চক ছিলেন, ক্ষত্রগণ যোদ্ধা ছিলেন। ব্রাহ্মণ ব্যতিরিক্ত আর সকল স্বাধীন ব্যক্তিকেই যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতে হইত। ইহা অপেক্ষাকৃত আদিম অবস্থা। ক্রমে ক্রমে সমাজের আয়তনবৃদ্ধি ও কৃষিবাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 'বিশঃ' বা 'জনাঃ' নামক একটি নূতন শ্রেণী ধীরে ধীরে গঠিত হইল; ক্ষত্রগণের ন্যায় ইহাদিগকে যুদ্ধে আহ্বান করা হইত না; ইহারা নিশ্চিন্ত হইয়া কৃষিবাণিজ্যের অনুসরণ করিত। নিবিদের ভাষায় ইহাদের উল্লেখ নাই, কিন্তু মহারাজাধিরাজ ভরতের সময়ে তাঁহার রাজপুরোহিত দীর্ঘতমা ইহাদিগের স্পষ্ট উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

আমাদের প্রাচীন ইতিহাসও ঠিক এই কথাই বলে। সেই ইতিহাসে লিখিত আছে যে, গৃৎসমদ শৌনক অস্মৎসমাজের চাতুর্বর্ণ্যের ব্যবস্থা করেন। অর্থাৎ, 'দাস' নামক বর্ণ চিরকালই ছিল। দাসগণ গবাদির ন্যায় সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত ছিল। ঋষিগণ যজ্ঞস্থলে যেমন গবাশ্বাদি দক্ষিণা পাইতেন, তেমনই দক্ষিণাস্বরূপ দাসীও পাইতেন; বিশেষ, রথ দক্ষিণা দিলে তৎসঙ্গে দাসী দক্ষিণা দেওয়া একপ্রকার প্রচলিত ব্যবস্থা ছিল, দেখা যায়। দাস-দাসীগণ এইরূপ হীনাবস্থাপন্ন থাকায় তাহাদের মঙ্গলের জন্য বিশেষ কোনও প্রকার প্রার্থনা করা হইত না। সুতরাং নিবিদ্‌রচনার সময়ে, সমাজ, ব্রহ্ম, ক্ষত্র ও দাস, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, বিবেচনা করিতে হইবেক। গৃৎসমদ ঋষি মহারাজ ভরতের অনেক পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। তাহা স্থানান্তরে দেখাইয়াছি।—সুতরাং ইতিহাসের স্পষ্ট উল্লেখ অনুসারে ও ভরতরাজার প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বেই গৃৎসমদ শৌনক কর্ত্তৃক চাতুর্বর্ণ্য ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, দেখা যায়। চাতুর্বর্ণ্য প্রথা প্রচলিত হইলে আর্য্য সমাজের অবস্থা যে দিন দিন হীন হইতে আরম্ভ হয়, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ পাই না। বরঞ্চ এই প্রথা প্রচলিত হইবার পরেও বহুকাল সমাজ উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়াছিল, তাহারই সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ফলতঃ, বহুকালব্যাপিনী উন্নতির হেতু বলিয়াই চাতুর্বর্ণ্য প্রথা এদেশে এতাদৃশ সুবদ্ধমূল হইয়াছে। মনুষ্যসমাজ এতাদৃশ কাণ্ডজ্ঞানশূন্য নহে যে, কুফল-

যাঁহারা বিবেচনা করেন, ঋগ্বেদরচনার সময়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য নামক শ্রেণীবিভাগের অস্তিত্ব ছিল না, তাঁহারা হয় ত চমকিয়া উঠিয়া বলিবেন যে, মূলে ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের কোন উল্লেখ নাই, অনুবাদক কোথা হইতে তাহা পাইলেন? তাঁহারা প্রণিধান করিলে দেখিতে পাইবেন যে, 'অস্মাকং বীরান্' শব্দে ঋষি তৎকালীন ক্ষত্রিয়গণের, 'উত নো মঘোনঃ' শব্দে তৎকালীন ব্রাহ্মণগণের, এবং 'জনাংশ্চ' শব্দে সাধারণ প্রকৃতিপুঞ্জ বা বৈশ্যগণের উল্লেখ করিয়াছেন। সমগ্র দ্বিজাতিসমাজ উত্তরকালের ন্যায় দীর্ঘতমার সময়েও তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর লোকেরা 'জনাঃ' বা সাধারণ প্রকৃতিপুঞ্জ বলিয়া গণ্য ছিল। তাহাদের উভয়ের এক শ্রেণীর লোকেরা 'বীরাঃ' অর্থাৎ যোদ্ধা ও যুদ্ধব্যবসায়ী ছিলেন, এবং আর এক শ্রেণীর লোকেরা 'মঘোনঃ' বা বিদ্বান ও বিদ্যাব্যবসায়ী ছিলেন। এই 'মঘোনঃ' শব্দের ইতিহাস বড় বিচিত্র। এই শব্দের প্রথমার এক-বচন 'মঘবা।' আধুনিক সংস্কৃতে 'মঘবা' শব্দে প্রায়ই ইন্দ্রকে বুঝায়; কিন্তু বৈদিক সংস্কৃতে ইহার অর্থ ভিন্ন। ফলতঃ, শব্দটি অতীব প্রাচীন; ভারতবর্ষে অস্মৎপিতামহগণের আগমনের বহু পূর্ব্বেও তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এবং তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের জ্ঞাতিস্থানীয় ইরানীগণ 'মঘবা' শব্দ তুল্যার্থে ব্যবহার করিতেন। ইরানী সমাজের ব্রাহ্মণেরা বহুকাল এই 'মঘবা' নামেই বিখ্যাত ছিলেন; এবং ঐ নাম হইতে ইংরেজী maji এবং majie শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। আমাদের সমাজের ব্রাহ্মণেরা দীর্ঘতমার সময় পর্য্যন্ত 'মঘবা' এই নামে কীর্ত্তিত হইতেন, দেখা যায়; কিন্তু উত্তরকালে উক্ত শব্দের তাদৃশ প্রয়োগ অপ্রচলিত হইয়া পড়ে, এবং যে শ্রেণীর লোকেরা একদা 'মঘবা' বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেন, ব্রাহ্মণ তাঁহাদের প্রশস্ত নাম বলিয়া গৃহীত হয়। তাঁহারা 'ব্রহ্ম' বা বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাতে জীবন উৎসর্গ করিতেন বলিয়া 'ব্রাহ্মণ' এই নূতন উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। আর্য্যসমাজ যে ঋগ্বেদরচনার সময়ে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, তাহার আর এক প্রধান নিদর্শন নিবিদের ভাষা। নিবিদ্ সকল ঋক্ অপেক্ষাও অনেক প্রাচীন; কেন না, ঋগ্বেদেই অনেক স্থলে 'পূর্ব্বয়া নিবিদা' বলিয়া নিবিদ্ সকলের প্রাচীনতার উল্লেখ দৃষ্টিগোচর হয়। এই নিবিদ্ সকলের অবসানে একই প্রকার প্রার্থনা সন্নিবিষ্ট হইত; যথা:—

"প্রেদং ব্রহ্ম
"প্রেদং ক্ষত্রং
"প্রেদং সুম্বন্তং যজমানমবতু"।

"ইহা প্রকৃষ্টরূপে ব্রহ্মসম্প্রদায়কে ও ক্ষত্রসম্প্রদায়কে রক্ষা করুক, এবং সোমাভিষবকারী যজমানকে রক্ষা করুক।" প্রণিধানের বিষয় এই যে, নিবিদের সময়ে ক্ষুদ্রাবয়ব সমাজে বৈশ্য-নামক বা 'জনাঃ'-নামক শ্রেণীর আবির্ভাব হয় নাই। তখন সমাজের সকলেই হয় 'ক্ষত্র', না হয় 'ব্রহ্ম'-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিল। 'ব্রাহ্মণগণ' দেবার্চ্চক ছিলেন, ক্ষত্রগণ যোদ্ধা ছিলেন। ব্রাহ্মণ ব্যতিরিক্ত আর সকল স্বাধীন ব্যক্তিকেই যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতে হইত। ইহা অপেক্ষাকৃত আদিম অবস্থা। ক্রমে ক্রমে সমাজের আয়তনবৃদ্ধি ও কৃষিবাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 'বিশঃ' বা 'জনাঃ' নামক একটি নূতন শ্রেণী ধীরে ধীরে গঠিত হইল; ক্ষত্রগণের ন্যায় ইহাদিগকে যুদ্ধে আহ্বান করা হইত না; ইহারা নিশ্চিন্ত হইয়া কৃষিবাণিজ্যের অনুসরণ করিত। নিবিদের ভাষায় ইহাদের উল্লেখ নাই, কিন্তু মহারাজাধিরাজ ভরতের সময়ে তাঁহার রাজপুরোহিত দীর্ঘতমা ইহাদিগের স্পষ্ট উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

আমাদের প্রাচীন ইতিহাসও ঠিক এই কথাই বলে। সেই ইতিহাসে লিখিত আছে যে, গৃৎসমদ শৌনক অস্মৎসমাজের চাতুর্বর্ণ্যের ব্যবস্থা করেন। অর্থাৎ, 'দাস' নামক বর্ণ চিরকালই ছিল। দাসগণ গবাদির ন্যায় সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত ছিল। ঋষিগণ যজ্ঞস্থলে যেমন গবাশ্বাদি দক্ষিণা পাইতেন, তেমনই দক্ষিণাস্বরূপ দাসীও পাইতেন; বিশেষ, রথ দক্ষিণা দিলে তৎসঙ্গে দাসী দক্ষিণা দেওয়া একপ্রকার প্রচলিত ব্যবস্থা ছিল, দেখা যায়। দাসদাসীগণ এইরূপ হীনাবস্থাপন্ন থাকায় তাহাদের মঙ্গলের জন্য বিশেষ কোনও প্রকার প্রার্থনা করা হইত না। সুতরাং নিবিদ্‌রচনার সময়ে, সমাজ, ব্রহ্ম, ক্ষত্র ও দাস, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, বিবেচনা করিতে হইবেক। গৃৎসমদ ঋষি মহারাজ ভরতের অনেক পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। তাহা স্থানান্তরে দেখাইয়াছি।—সুতরাং ইতিহাসের স্পষ্ট উল্লেখ অনুসারে ও ভরতরাজার প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বেই গৃৎসমদ শৌনক কর্ত্তৃক চাতুর্বর্ণ্য ব্যবস্থা বিবিবদ্ধ হইয়াছিল, দেখা যায়। চাতুর্বর্ণ্য প্রথা প্রচলিত হইলে আর্য্য সমাজের অবস্থা যে দিন দিন হীন হইতে আরম্ভ হয়, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ পাই না। বরঞ্চ এই প্রথা প্রচলিত হইবার পরেও বহুকাল সমাজ উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়াছিল, তাহারই সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ফলতঃ, বহুকালব্যাপিনী উন্নতির হেতু বলিয়াই চাতুর্বর্ণ্য প্রথা এদেশে এতাদৃশ মূবদ্ধল হইয়াছে। মনুষ্যসমাজ এতাদৃশ কাণ্ডজ্ঞানশূন্য নহে যে, কুফল-

দর্শনেও দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া কুপ্রথার অনুসরণ করিবে। এই চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থাই অদ্যাবধি আমাদের সমাজকে সজীব করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের বীরগণ অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে সমাজের অবশিষ্ট অংশের পতন হয় নাই। বীরগণই বা একবারে অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন কই? অদ্যাপি রাজপুত, শিখ ও গুর্খা প্রাচীন ক্ষত্রের স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। তবে রাজপদ ও রাজসিংহাসন কিছু দিন মুসলমানজাতীয় ক্ষত্রগণের, এবং সম্প্রতি ইংলণ্ডীয় ক্ষত্রগণের অধিকৃত হইয়াছিল ও হইয়াছে। শূদ্রগণের অবস্থা উন্নীত হইয়া তাহারা বৈশ্যগণের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে, এবং ব্রাহ্মণগণ রাজসম্মান হারাইয়া মলিনভাবাপন্ন হইয়াছেন, কিন্তু এখনও বিনষ্ট হয়েন নাই। চাতুর্ব্বর্ণ্যের নঙ্গরে বাঁধা না থাকিলে আমাদের সমাজরূপিণী নৌকা প্রবল রাজবিপ্লবের বাত্যায় এতদিন কালসমুদ্রের গর্ভে বিলীন হইয়া যাইত, সন্দেহ নাই।

দীর্ঘতমার যে প্রার্থনাটি উপরে উদাহৃত হইল, তাহা প্রথম মণ্ডলের ১৪০ সূক্ত। ঐ সূক্তে এবং পরবর্ত্তী ১৪১ সূক্তে একটি প্রশস্ত যজ্ঞের বর্ণনা দেখা যায়। সেই যজ্ঞের যে যজমানের কথা উপরে কিঞ্চিৎ বর্ণিত হইল, তিনি আর এক স্থানে 'পরম যজমান' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। তদ্দ্বারাও তিনি এক জন উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তি বলিয়া স্পষ্টই সূচিত হইতেছে। ফলতঃ আমার বিবেচনা হয়, মহাভারতে ও বিষ্ণুপুরাণে মহারাজ ভরতের যে পুত্রেষ্টিযজ্ঞানুষ্ঠানের কথা শুনা যায়, ১৪০। ১৪১ সূক্ত সেই যজ্ঞে ব্যবহারের জন্যই রচিত হইয়াছিল। কথিত আছে, মহারাজ ভরত একাধিক মহিষীতে অনেকগুলি পুত্রসন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন, কিন্তু সন্তানেরা কেহই পিতার অনুরূপ হয় নাই বলিয়া মহিষীগণ তাহাদিগকে বধ করেন! এই লোমহর্ষণ ব্যাপার শুনিয়া এক্ষণে আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, কিন্তু যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন গ্রীসদেশীয় স্পার্টানগণের ন্যায় আমাদের ক্ষত্রিয়গণের গৃহে ক্ষীণজীবী সন্তান জন্মিলে তাহারা নিহত হইত। সেকালে বীরপ্রসবিনী হওয়াই ক্ষত্রিয়রমণীগণের প্রধান গৌরব ছিল; ক্ষীণ সন্তান জন্মিলে তাঁহারা মর্ম্মাহত হইয়া স্বহস্তে তাহাদিগকে বধ করিতেন। এইরূপে ভরতের পুত্রোৎপাদন বিফল হইলে তিনি এক পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ১৪০।১৪১ সূক্তে যে যজ্ঞের বর্ণনা আছে, তাহাতে যজ্ঞস্থলে যজমানপত্নীকেও বিদ্যমান দেখা যায়। ঋষি তাঁহাকে 'মাতা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ১৪১ সূক্তে স্পষ্টাক্ষরে পুত্রের প্রার্থনা রহিয়াছে, তাহা এই :—

"অস্মে রয়িং ন স্বর্থং দমূনসং ভগং ন দক্ষং পপৃচাসি ধর্ণসিং।
রশ্মীরিব যো যমতি জন্মনী উভে দেবানাং যজ্ঞং ঋতে আচ সুক্রতুঃ॥"

"হে অগ্নে! যজমানায় ধর্ণসিং রাজ্যস্য ধারকং পুত্রং পপৃচাসি দেহি। কিম্ভূতং পুত্রং অস্মে অস্মভ্যং স্বর্থং ন শোভনং অর্থমিব রয়িং ধনং দমূনসং দাতারং। পুনঃ কিম্ভূতং? ভগং ন রাজানম্ ইব দক্ষং উৎসাহশীলং। কোঽয়ং রাজা? যো রাজা সুক্রতুঃ শোভনক্রিয়াবান্ ঋতে দেবানাং যজ্ঞং আচ আচরংশ্চ রশ্মীরিব উভে জন্মনী দেবান্ মনুষ্যাংশ্চ যমতি নিয়ময়তি।"

"হে অগ্নি! যজমানকে রাজ্যভারধারণক্ষম একটি পুত্র দান কর। যে পুত্র মাদৃশ ঋষিগণকে প্রার্থনীয় ধন দান করিবেন। যিনি রাজার ন্যায় উৎসাহশীল হইবেন—যে রাজা শোভন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া এবং অবিচলিত নিয়মরক্ষার জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দেবলোকের সহিত মনুষ্যলোককে আবদ্ধ করিয়াছেন।"

তাৎপর্য্য এই যে, মনুষ্যেরা দেবতাদিগকে যজ্ঞে আহুতি অর্পণ করেন, এবং দেবতারা প্রীত হইয়া বৃষ্টি দান করেন; তাহাতে মনুষ্যগণের অন্ন উৎপন্ন হয়। মনুষ্য অধার্ম্মিক ও অযাজ্ঞিক হইলে দেবতারা অনাবৃষ্টি দ্বারা তাহাদের দণ্ডবিধান করেন। ঋষির বিবেচনায় ইহা একটি অবিচলিত নিয়ম। যে রাজা এই অবিচলিত নিয়ম প্রতিপালন করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা দেবলোকের সহিত মনুষ্যলোকের সৌহার্দ্য রক্ষা করিতেছেন, যাঁহার রাজ্যে প্রজাগণ সুবৃষ্টি পাইয়া সুখস্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে, যিনি অনেক শোভন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহার ন্যায় উৎসাহসম্পন্ন এক পুত্র তাঁহাকে দান কর,—যিনি তাঁহার রাজ্যরক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন;—ইহাই প্রার্থনা। ইহার সহিত ইতিহাস পুরাণের আখ্যায়িকার এতই মিল যে, দৃষ্টান্তের রাজাকে ভরতরাজা না ভাবিয়া থাকা যায় না।

অবশেষে ঋষি উপসংহারে বলিতেছেন—

"অস্তাবি অগ্নিঃ শিমীবদ্ভিরর্কৈঃ সাম্রাজ্যায় প্রতরং দধানঃ।"

"যিনি সাম্রাজ্যকে প্রকৃষ্টরূপে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, সেই অগ্নিকে আমি শক্তিসম্পন্ন অর্চ্চনামন্ত্রের দ্বারা স্তব করিলাম।"

দীর্ঘতমা মহারাজ ভরতকে যে সামাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, এখানে স্পষ্টই সেই সাম্রাজ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া গেল। অগ্নিই এই সাম্রাজ্যের

রক্ষাকর্ত্তা; ঋষি তাঁহাকে শক্তিসমন্বিত অর্চ্চনামন্ত্রের দ্বারা স্তব করিলেন। অভিনিবেশসহকারে প্রস্তাবিত ঋকৃসূক্ত দুইটি পাঠ করিলে এইরূপ এক দৃঢ় বিশ্বাসের উৎপত্তি হয় যে, সম্রাট ভরতের পুত্রেষ্টি যজ্ঞেই উহা রচিত ও ব্যবহৃত হইয়াছিল।

ইদানীন্তন রাজপরিবারে কোনও সমারোহ হইলে Poet Laureate যেমন তৎসম্পর্কে অভিনব কাব্য রচনা করিয়া পাঠ করেন, তখনকার রাজপরিবারে তেমনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞের ন্যায় সমারোহের কার্য্য উপস্থিত হইলে রাজসভায় 'ব্রহ্মা' বা প্রধান ঋত্বিক্ নূতন ঋকৃসূত্র রচনা করিয়া উপাসনাকালে পাঠ করিতেন। আমরা তাহারই একটি উদাহরণ এ স্থলে দেখিতেছি। এই অতীতের চিত্র অসাধারণ কৌতূহলোদ্দীপক। পাঠকগণ মহারাজাধিরাজ ভরতের সাময়িক চিত্র যদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিবার কামনা করেন, তবে দীর্ঘতমার ঋক্সূক্তমালা আদ্যন্ত যত্নের সহিত পাঠ করিতে হয়। কিন্তু তাহা নিতান্ত সহজ কার্য্য নহে। সারণাচার্য্য,—যিনি এই সূক্তমালার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তিনি অনেক স্থলে ঋষির মর্ম্মার্থ স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। তবে সায়ণের অসাধারণপাণ্ডিত্যপূর্ণ শব্দব্যাখ্যা প্রায়ই প্রকৃত অর্থপরিগ্রহের পক্ষে বিস্তর সাহায্য করে। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় দীর্ঘতমার ঋকৃসূক্তের সহিত সমগ্র ঋকৃবেদসংহিতার যে বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এক দিকে অশুদ্ধ, অপর দিকে অস্পষ্ট। সায়ণ নিজে যেখানে ভুলিয়াছেন, সেখানে দত্ত মহাশয়ের বিশেষ অপরাধ নাই। অনুবাদকার্য্যের পথপ্রদর্শক বলিয়াও দত্ত মহাশয় যশোভাজন, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, দীর্ঘতমার ঋকৃসূক্তের নূতন অনুবাদের বিশেষ আবশ্যকতা লক্ষিত হয়। দীর্ঘতমার ন্যায় একজন ঋষির রচনা আদ্যোপান্ত অভিনিবেশসহকারে পাঠ করিলে, ঋগ্বেদ কি পদার্থ, তাহা বুঝিতে পারা যায়। একটি সম্পূর্ণ মনুষ্যের পূর্ণ মানসিক চিত্র হৃদয়ঙ্গম করিলে তৎকালের ইতিহাসই আয়ত্ত হইয়া পড়ে। ফলতঃ যাঁহারা বলেন, আমাদের প্রাচীন ইতিহাস নাই, তাঁহারা অনভিজ্ঞ। ৩৮০০ বৎসরের প্রাচীন অস্মদীয় ইতিহাস যাঁহারা পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, দীর্ঘতমার সূক্তমালা উদ্‌ঘাটন করিলেই তাঁহাদের মনোরথ সিদ্ধ হইতে পারে।

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।

দোষ কাহার ?

১

চার বৎসর ইংলণ্ডে কিছু আইন ও মহিলাসমাজে মিশিবার অনেকটা আদব কায়দা শিক্ষা করিয়া, মসৃণ আননে প্রাপ্তবয়স্কের চিহ্ন লইয়া, যামিনীমোহন কর যখন দেশে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার নিতান্ত অন্তরঙ্গ আত্মীয় স্বজনগণ ভিন্ন আর কেহই তাহাকে পূর্ব্বপরিচিত যামিনী নামে সম্বোধন করা সঙ্গত মনে করিলেন না। শ্রীমান্ যামিনীমোহন ইঙ্গবঙ্গদলে "মিষ্টার কর" হইয়া দাঁড়াইলেন। আবার শতাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদব কায়দার বাহাদুরীতে মহিলাসমাজে যামিনীমোহন শীঘ্রই সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া দাঁড়াইল।

কোন মহিলাকে দেখিলে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিতে, মহিলাদিগের অনুরোধে অতি সলজ্জভাবে মধুরকণ্ঠে দুই একটি গান গাহিতে ও তাঁহাদিগের একাধিকসহস্র ছোট খাট আবশ্যকে অনাহূত মনোযোগ দিতে, যামিনীমোহনের সমকক্ষ বড় কেহ ছিল না। অল্পদিনের মধ্যেই মহিলাদিগের প্রশংসালাভ ও তাঁহাদিগের স্বেচ্ছায় নিক্ষিপ্ত পাখা ও রুমাল কুড়াইবার ভার যামিনীমোহনের প্রায় একচেটিয়া হইয়া উঠিল। মিষ্টার করের প্রখর-করে সমাজের (অর্থাৎ "সোসাইটী"র) বহু উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক নিতান্ত ম্লান দেখাইতে লাগিল।

যামিনীমোহনকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য পদার্পিতমাত্রযৌবনা হইতে বিগতপ্রায়যৌবনা কুমারীসমাজে কিরূপ ব্যগ্রতা লক্ষিত হইয়াছিল, কোনও সান্ধ্যসমিতি হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনকালে নিষ্ফল প্রয়াসে কত ব্যথিত কোমল হৃদয় হইতে দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হইত, এবং নিশীথে কত বেদনাব্যঞ্জক অশ্রু নীরবে কত উপাধান সিক্ত করিত, তাহা সহজেই অনুমেয়।

এরূপ অবস্থায় যে প্রাপ্তবয়স্কা কন্যার জননীরা যামিনীমোহনকে জামাতৃরূপে পাইবার জন্য চেষ্টা করিবেন, ইহা অবশ্যই স্বাভাবিক।

বস্তুতঃ, যামিনীমোহনের আগমনে ইঙ্গবঙ্গসমাজে বেশ একটু সজীবতা ও পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইতে লাগিল।

২

অল্প দিনের মধ্যেই সকলে বুঝিতে পারিল যে, মহিলাসমাজে মিশিয়া যামিনীমোহন হৃদয়টাকে পদ্মপত্রে জলের মত নিতান্ত নির্লিপ্ত রাখিতে পারে নাই। কুমারীদিগের মধ্যে কুমারী বিমলা বসুর প্রতি তাহার কিছু অতিরিক্ত মনোযোগ লক্ষিত হইতে লাগিল। মিস্ বসু পিয়ানোর নিকট গেলেই যেন কোনও অলক্ষিত আকর্ষণে যামিনীমোহনও সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইত, এবং কখন্ তাঁহার পুস্তকের পাতা উল্টাইতে হইবে, তৎপ্রতি এত অধিক মনোযোগ দিত যে, তাহার আর সেই সুধাময় সঙ্গীত উপভোগ করিবার অবসর হইত না। সেই সময় তাহার চেয়ারের পশ্চাতেই যে ব্যর্থ আশার বেদনা লুকাইয়া সামান্য প্রাণহীন হাসি হাসিয়া কুমারীগণ পরস্পরের মধ্যে অর্থপূর্ণ দৃষ্টির বিনিময় করিতেন, তাহা সে দেখিতেও পাইত না। প্রেম মানবকে এমনই অন্ধ করে! প্রেমিক কল্পনা-জগতে বাস করে; সেখানে বাস্তবের কঠোর সত্য তাহার স্বপ্নভঙ্গ করিতে পারে না। সেই জগতে বাস করিয়া ভ্রান্ত প্রেমিক প্রেমিকাকে আপনার জীবনের সার্থক সাধন বলিয়া মনে করে; প্রেমিকা তাহার নিকট তদীয় মানসকল্পিত আদর্শ—তাহার কোথাও কোন দৈন্য, কোন অসম্পূর্ণতা নাই।

এখন আর যামিনীমোহন কেবল বিদেশীয় কবিদিগের মধুর প্রেমের কবিতা আবৃত্তি করিয়াই সন্তুষ্ট হয় না; এখন সে আপনিও কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছে। হৃদয়ের পূর্ণতায় কবিতা আপনি আইসে। আকাঙ্ক্ষার বেদনা থাকিলে অন্তরের অন্তর হইতে গীতধ্বনি আপনি ধ্বনিত হইয়া উঠে। হিমাবসানে নব-বসন্ত-সমাগমে যেমন কুসুমসুষমাসম্পন্ন বনভূমিতে কোকিলকাকলি আপনি আত্ম-প্রকাশ করে, তেমনই নবপ্রেমসমাগমে মানবহৃদয়ে কবিতা আপনা-আপনি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। কেহ তাহা প্রকাশ করিতে পারে, কেহ পারে না।

যামিনীমোহন বিমলার যাহাই অভিপ্রায় থাকুক, কর্ম্মহীনা মহিলাগণ সে বিষয়ে কিছুমাত্র মনোযোগ না দিয়া প্রচার করিলেন যে, শীঘ্রই তাহাদের বিবাহ হইবে। আবার সেই বিবাহের যোগ্যতা অযোগ্যতা লইয়া তর্ক-বিতর্ক, বিচার, আন্দোলন চলিতে লাগিল। পরচর্চ্চার কি একটা আকর্ষণ আছে, জানি না; কিন্তু সসঙ্কোচে এ কথা বলিতে হয় যে, কেবল মহিলাসমাজে নহে—পুরুষসমাজেও পর-চর্চ্চা-প্রিয়তা প্রায় সর্ব্বদাই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

এইরূপে কয় মাস কাটিয়া গেল।

৩

কয় মাস পরেই সহসা একটা বড় পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইল। যেমন শরতের আকাশে সহসা খানকতক মেঘ আসিয়া প্রকৃতির হাস্যোজ্জ্বল আনন মলিন করিয়া দেয়—তাহারা কোথা হইতে আইসে, কেন আইসে,—কোথায় উৎপন্ন হয়, কেহ তাহা বলিতে পারে না, তেমনই সহসা এই প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে যেন পূর্ব্বতন আকর্ষণের স্থলে উপেক্ষার ভাব আসিল;—কেন যে এ ভাব আসিল, কোথা হইতে যে এ ভাব আসিল, তাহা বাহিরের লোক কেহ জানিতে পারিল না। সে কথা বাহিরের লোক কেহ জানিতে পারিল না বলিয়াই সে রহস্যের উদ্ঘাটন-চেষ্টা যেন অতি প্রবল হইয়া উঠিল। যাহা অজ্ঞাত,তাহাই জানিবার জন্য ঔৎসুক্য বুঝি সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই মানবচরিত্রের একটা বিষম দুর্ব্বলতা; তাই জন্ম মৃত্যুর রহস্য-উদ্ঘাটনের বৃথা চেষ্টায়, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-তত্ত্বের মূলে কোন বুদ্ধিসম্পন্ন মহাশক্তির অস্তিত্ব-বিচারে, মানবের মানসিক পরিবর্ত্তনের ইতিহাসে বহু পৃষ্ঠা পূর্ণ।

কেন যে এ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল, তাহার কারণ বাহিরের কেহ জানিতে পারিল না বটে, কিন্তু যখন একটা সমিতিতে দৃষ্ট হইল যে, মিস্ বসুর সহিত যামিনীমোহনের সাক্ষাৎ হইলে কেবল পরিচয়জ্ঞাপক সামান্য অভিবাদনমাত্র বিনিময়ের পর দুই জনে দুই দিকে চলিয়া গেল ও তাহার পর আর তাহারা দেখা করিল না, তখন সকলেই স্থির করিলেন যে, একটা কিছু বিশেষ ব্যাপার হইয়া গিয়াছে—বিনা মেঘে কি কখনও বজ্রপাত হইতে পারে!

কথায় বলে,—"যার বিয়ে তার মনে নাই; পাড়াপড়শীর ঘুম নাই।" এ ক্ষেত্রেও ব্যাপার সেইরূপ দাঁড়াইল। যখন বিমলার সহিত যামিনীমোহনের বিবাহের কথা প্রচারিত হইয়াছিল, তখনও তাহাদের দুই জনের অপেক্ষা মহিলাসমাজের ভাবনাটাই অধিক হইয়াছিল; এখনও যেন তাহাদিগের অপেক্ষা সেই ক্লান্ত মহিলাসমাজেরই ভাবনাটা অধিক হইল। কোথাও দুই চারি জন মহিলা একত্র হইলেই কেবল সেই এক কথা। গৃহের এক পার্শ্বে কোন প্রৌঢ়া চার পাঁচ জন শ্রোতার নিকট অতি মৃদুস্বরে

বলিতেছেন যে, নিশ্চয়ই ইংলণ্ডপ্রবাসকালে যামিনীমোহন কোন মহিলার সহিত বিবাহের প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়াছিল; আর এক পার্শ্বে এক জন কৌতুকপরায়ণা যুবতী সেই কথা লইয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছেন যে, যাহাই হউক, সহজে যে বিমলার মত বুদ্ধিমতী মেয়ে অমন শিকার ছাড়ে, ইহা বিশ্বাস হয় না—নিশ্চয়ই ভিতরে কিছু বিশেষ গলদ আছে; কেহ বলিতে লাগিলেন, যামিনীমোহনের দোষেই বিবাহসম্বন্ধ ভঙ্গ হইয়াছে; কেহ বলিতে লাগিলেন,—বিমলার দোষেই বিবাহসম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আসল ব্যাপার যে কি, তাহা কেহই বলিতে পারিলেন না।

যাহা হউক, ক্রমে মহিলাসমাজে এই আন্দোলন এমনই প্রবল হইয়া উঠিল যে, তাহার মধ্যে অবস্থান করা বিমলার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হইয়া উঠিল। শিলাপাততাড়িতা ভয়চকিতা হরিণী যেমন প্রান্তর-প্রান্তে ভগ্ন জীর্ণ দেবালয়ের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে, বিমলা তেমনই বহুদূরে—বোম্বাই সহরে এক খুল্লতাতের নিকট চলিয়া গেল। কলিকাতার মহিলাসমাজে দিন কতক অনেকে তাহার পরিচিত মধুর কণ্ঠ, সরস মধুর সুরুচি-সম্পন্ন কথাবার্ত্তা ও পরিচিত গোলাপী পোষাকের অভাব অনুভব করিলেন। অবশ্য এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, কেহ কেহ তাহার কলিকাতা-ত্যাগে আনন্দিতাও হইল;—কারণ, "সোসাইটী"তে সর্ব্ব বিষয়ে তাহার মত প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বড় সচরাচর দেখা যায় না। যাহা হউক, ক্রমে ক্রমে সকলে সে অভাব ভুলিয়া গেল;—অপেক্ষাকৃত ক্ষীণজ্যোতিঃ জ্যোতিষ্কগণই সকলের নয়নানন্দ হইয়া উঠিল।

৪

বিমলা কলিকাতা হইতে চলিয়া যাইবার কয় দিন পরে যামিনীমোহনও সমাজে মেশামিশি ছাড়িয়া দিল। জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত,—"সব লোকের দৃষ্টির বাণ আর সহিতে পারি না।—'সোসাইটী'র পক্ষে আমি মৃত।" বন্ধুরা হাসিয়া বলিতেন, "মনে রাখিও মরা হাতী লাখ টাকা।"

যামিনীমোহন কি করিত, কিরূপে সময় কাটাইত, ইত্যাদি—তাহার দুই চারি জন বন্ধু ব্যতীত বাহিরের বড় কেহ জানিতে পারিত না। পর-নিন্দা-পরায়ণা মহিলাগণ সে কথা লইয়া দিন কতক আপন আপন মতামত ব্যক্ত করিলেন; তাহার পর নূতন কথায় নূতন কুৎসায় সকলে সে আলোচনা ত্যাগ করিলেন।

যামিনীমোহনের বন্ধুগণ তাহাকে বলিতে লাগিলেন যে, সকল মানবের জীবনেই নানা অপ্রীতিকর ঘটনার ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া যায়; জীবনের একটা সামান্য ঘটনা লইয়া একেবারে গৃহ-কোণবাসী হইয়া সকল কার্য্যে অবহেলা করা উচিত নহে;—তিলকে তাল করাটা সুবুদ্ধির কাজ নহে। বন্ধুদিগের এইরূপ কথায় যামিনীমোহন কোন উত্তর দিত না,—কেবল একটু হাসিত। কাহারও কাহারও হাসিবার বিশেষ এক প্রকার কৌশল থাকে; যে কোন বিষয়ই হউক, তাহারা একটু হাসিয়াই সব শেষ করিতে পারে। যামিনী-মোহনেরও সেইরূপ হাসিবার কৌশল ছিল। বন্ধুদিগের এত যে গুরু-গম্ভীর উপদেশ, যামিনীমোহন কেবল একটু হাসিয়াই সে সব উড়াইয়া দিত; কোনও উত্তরই দিত না। বলিয়া বলিয়া বন্ধুদিগের উৎসাহও ক্রমে কমিয়া যাইতে লাগিল।

যামিনীমোহনের কাজ ছিল কেবল—দুই তিন খানা দৈনিক সংবাদ-পত্রের আদ্যোপান্ত ও রাশি রাশি নূতন উপন্যাস পাঠ করা। যামিনীমোহনের বন্ধুরা আশা করিতেন যে, এই একঘেয়ে জীবন শীঘ্রই তাহার বিরক্তিকর হইয়া দাঁড়াইবে; তখন সে আবার সকলের সহিত মিশিতে আরম্ভ করিবে, আবার ব্যবসায়ে মনোযোগ দিবে। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে যামিনীমোহনের কোন পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা দৃষ্ট হইল না। সে কিছুতেই আপনার নিভৃত গৃহকোণ পরিত্যাগ করিল না।

৫

কলিকাতার মহিলাসমাজ হইতে দূরে তালীবনশ্যাম সমুদ্রকূলে বিমলা কেমন করিয়া দিন কাটাইত, তাহার সংবাদও সর্ব্বদা কলিকাতায় আসিত না। মধ্যে মধ্যে সে তাহার পরিচিতদিগকে দুই একখানা পত্র লিখিত। কোন পত্রে মৃদু-সমীরসঞ্চারে ক্ষুদ্রক্ষুদ্রবীচিবহুল বারিধিবক্ষে তরী ভাসাইয়া "হস্তী গুহায়" গমনের কথা,—প্রত্যাবর্ত্তনকালে অস্তগামী তপনের মরণাহত করজালে লোহিতাভ গগনপটে অঙ্কিতবৎ বোম্বাই সহরের সৌন্দর্য্যের বর্ণনা থাকিত; কোন পত্রে এক দিন মধুর সন্ধ্যাকালে কোনও মধুরহাসিনী পার্শী যুবতীর পরিণয়ের বর্ণনা থাকিত; কোনও পত্রে বর্ণবৈচিত্র্যবহুলবেশপরিহিতা সুন্দরী-কুলে পরিপূর্ণ সাগরানিলসেবিত সিন্ধুকূলে ভ্রমণের বর্ণনা থাকিত। কিন্তু সে সকল পত্রে পরিচিত কলিকাতা "সোসাইটী"তে ফিরিবার জন্য আকুলতা ও সে 'সোসাইটী' পরিত্যাগ করাতে কোন প্রকার দুঃখ প্রকাশ পাইত না।

সেই সকল পত্র লইয়া কলিকাতার মহিলাসমাজে মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু আন্দোলন হইত। মহিলারা আশা করিতেন যে, অল্প দিনের মধ্যেই বিমলা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবে। তাঁহারা বলিতেন যে, বিমলা নিতান্তই "সেণ্টিমেণ্ট"-প্রবণা বালিকা; নহিলে এই একটা সামান্য ঘটনা লইয়া সে অতটা করিত না;—এমন প্রেম-পরিচয়, এমন বিবাহ-সম্বন্ধ, এমন বিবাহ-সম্বন্ধ-ভঙ্গ, এ ত নিত্যই হইয়া থাকে; ইহা লইয়া এতটা করা কোন বুদ্ধিমতী রমণীরই উচিত নহে।

যিনি যে মতামত ব্যক্ত করুন,—তাহাতে কাহারও কোন ক্ষতি বৃদ্ধি ছিল না। প্রায় ছয় মাস কাটিয়া গেল;—বিমলা ফিরিয়া আসিল না; তাহার কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের কোনও সূচনাও লক্ষিত হইল না। উদ্যানে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর কুসুমটি ঝরিয়া গেলে যে সমগ্র উদ্যান নষ্ট হয়, তাহা নহে; একা বিমলা ছিল না বলিয়া যে মহিলাসমাজে সমিতি, নিমন্ত্রণ, কুৎসা ও পরচর্চ্চার অভাব ছিল, তাহা নহে।

৬

বিমলা বোম্বাই যাইবার পর প্রায় ছয় মাস চলিয়া গিয়াছে।

যামিনীমোহনের গৃহে কয় জন বন্ধু আহার করিতে বসিয়াছেন।

প্রস্ফুটিত কুসুমে সুসজ্জিত টেবিল হইতে কুসুমের মৃদু সৌরভ, আহারীয়ের গন্ধ ও কাঁটা চামচের ঠুন্ঠুন শব্দ উঠিতেছে। সরস কথাবার্ত্তায়, তদপেক্ষাও সরস আহারীয়ে, "পার্টী" বেশ জমিয়াছে। মধ্যে মধ্যে উচ্চ হাস্য উঠিতেছে। কতকগুলি যুবক একত্রিত হইয়া আহারে বসিলে যাহা হয়, তাহার কিছুরই অভাব নাই।

এক জন বলিল, "তবে যামিনীমোহন, তুমি এখন সেই প্রেম-ব্যাপারের স্মৃতিটা বেশ ভুলিতে পারিয়াছ!"

কাঁটা ও ছুরী রাখিয়া চেয়ারে হেলান দিয়া যামিনীমোহন হাসিতে হাসিতে বলিল, "প্রথম বয়সের সে পাগলামীর কথা আর বলিও না। তবে এইবার আমি তিনটি জিনিস বেশ বুঝিয়াছি।"

কয় জনে সমস্বরে বলিল, "কি?"

যামিনীমোহন বলিল, "জগতে তিনটি কাজ স্ত্রীলোক কখন করিতে পারে না;—রাত্রিকালে খাটের তলে কোন শব্দ শুনিলে স্ত্রীলোক কখনও সাহস করিয়া খাটের তলে চাহিয়া দেখিতে পারে না; স্ত্রীলোক কখনও কোন

কথা গোপন রাখিতে পারে না; স্ত্রীলোক কখনও ভালবাসিতে পারে না।"

সকলে হাসিয়া উঠিল।

এক জন বলিল, "তবুও ভাল যে তুমি এ ধাক্কা কাটাইয়া উঠিয়াছ। আবার শীঘ্র ফাঁদে না পড়িলে হয়!"

যামিনীমোহন বলিল, "সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিতে পার; এ নয়ন আর কখনও রমণীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইবে না।"

এক জন বলিল, "সেটা বড় ভরসার কথা নহে; জান ত—

'আঁখিতে চাহে না প্রেম মন দিয়া চায়,
দৃষ্টি-হীন স্মর তাই বিদিত ধরায়।'

মনটা সাবধানে রাখিও।"

আর একবার গৃহমধ্যে উচ্চহাস্য-ধ্বনি ধ্বনিত হইল।

এক জন বলিল,—"সে কি কথা!—আমি ত বুঝি, আঁখি মেলিয়া যাহাকে ভাল লাগে, তাহাকেই ভাল বলিয়া জানি। যাহা হউক যামিনীমোহন, এবার য়ুরোপ ঘুরিয়া আসিয়া ভাল করিয়া কাজে মন দাও। ইংলণ্ডের কথা ভাবিলে আর এই ঘ্রাম ও ঘামাচির দেশে থাকিতে ইচ্ছা হয় না। ইংলণ্ডের কাছে ভারতবর্ষ!"

আর এক জন বলিল, "তুমি কি দেশদ্রোহী নাকি? ভারতবর্ষে কি নাই বল ত? আর ভাল হউক মন্দ হউক, এই আমাদের দেশ। আমরা যদি কাক হই—কাক থাকাই আমাদের ভাল,—ময়ূরপুচ্ছ চুরি করিয়া ময়ূরের দলে মিশিবার দুরাকাঙ্ক্ষা না করাই কি ভাল নহে?"

পূর্ব্ব বক্তা বলিল, "যাহা বলিতে হয় বল, ভারতবর্ষ অপেক্ষা ইংলণ্ডই আমার বেশী ভাল লাগে।"

যামিনীমোহন বলিল, "আমাকে একবার ঘুরিয়া আসিতে দাও; তাহার পর দেখিবে, সুপ্ত সিংহ আবার জাগিয়াছে;—দেখিবে, রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে সমাজ-সংস্কার পর্য্যন্ত সবই এক জনে কেমন করিয়া করে। আমি জুতা সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত সবই করিব।"

আবার একবার হাস্য-ধ্বনি উঠিল।

আহারান্তে কিঞ্চিৎ মদ্যপানানন্তর সকলে পার্শ্বের একটা ঘরে উঠিয়া গেলেন। সেখানে চুরুট-টানা ও গল্প গুজব চলিতে লাগিল।

এক জন বলিল, "দেখ যামিনীমোহন, তুমি বোম্বাই না গিয়া এখান

হইতেই জাহাজে রওনা হও। বোম্বাই গেলে তুমি একবার বিমলার খুড়া মহাশয়ের নিমন্ত্রণ এড়াইতে পারিবে না। সেখানে তোমার সহিত বিমলার সাক্ষাৎ হইবে। আপনার উপর বড় অধিক বিশ্বাস-স্থাপন করাটা যুক্তি-সঙ্গত নহে।"

যামিনীমোহন বলিল, "সে ভয় আর করিও না। আমার অগ্নি-পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে—আর কোন আশঙ্কা নাই।"

ইহার পর কিছুক্ষণ গল্পগুজবান্তে স্ব স্ব টুপি ও যষ্টি লইয়া একে একে নিমন্ত্রিতগণ স্বস্বগৃহাভিমুখগামী হইলেন।

যামিনীমোহন মনস্থ করিয়াছে,—আর একবার য়ুরোপ ভ্রমণ করিয়া আসিবে। য়ুরোপ ঘুরিয়া আপনার প্রেমস্মৃতির শেষ চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া সে আবার নূতন হইয়া দেশে ফিরিবে। দুই দিন পরে যামিনীমোহন রওনা হইবে;—আয়োজন সব ঠিক্ ঠাক্ হইয়া গিয়াছে।

৭

প্রভাত-পবনে শেষ ফাল্গুনের অপেক্ষাকৃত ক্ষীণাঙ্গী জাহ্নবীর বক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ খেলা করিতেছে। উপরে অনন্তপ্রসারিত নীলাম্বর; দক্ষিণে হাবড়ার পুল;—আজ পুল খোলা; বামে নদীবক্ষে বহুসংখ্যক বাষ্পীয় জলযান, পান্সী ও ভাউলে; উভয় তীরেই স্নানের ঘাটে নরনারীগণ স্নান করিতেছেন। একখানা মধ্যায়তন পান্সী কলিকাতার পার হইতে হাবড়ার পারে লাগিল। পান্সী হইতে কয় জন নিরবচ্ছিন্ন-ইংরাজবেশধারী ও কয় জন নিরবচ্ছিন্ন-বাঙ্গালীবেশধারী যুবক অবতরণ করিলেন। বহু কষ্টে তটভূমির কর্দ্দম হইতে পাদুকা রক্ষা করিয়া তাঁহারা উপরের রাস্তায় উঠিলেন। তাঁহারা হাবড়া ষ্টেশনে চলিলেন; পশ্চাতে পশ্চাতে দুই জন কুলি দ্রব্যাদি লইয়া চলিল।

ট্রেণ প্ল্যাটফরমে উপস্থিত ছিল। এঞ্জিন্ হইতে এক প্রকার অস্পষ্ট শব্দ উঠিতেছিল; যেন কর্ম্মপ্রার্থী দানব অধীরতা প্রকাশ করিতেছিল; প্ল্যাটফরমে লোক জনের গতায়াত, হাঁকাহাঁকির গোল উঠিতেছিল। যামিনীমোহনের বন্ধুগণ একটা খালি কামরায় তাহার দ্রব্যাদি তুলিয়া দিলেন। একজন ছুটিয়া গিয়া একখানা সংবাদপত্র কিনিয়া আনিলেন; এমন সময় প্রথম ঘণ্টা পড়িল। যামিনীমোহন কামরায় উঠিয়া বসিল। ডাকাডাকি দৌড়াদৌড়ি আরও প্রবল হইয়া উঠিল; "পান-চুরুট-দেশলাই"-ওয়ালাগণ আরও উচ্চ স্বরে বিক্রেয় জিনিস হাঁকিতে লাগিল।

দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়িল। যামিনীমোহন বন্ধুদিগের সহিত করমর্দ্দন করিল। এক জন হাসিয়া বলিলেন, "দেখিও যেন কোন নীল-নয়নার কনক-কেশ-জালে জড়িত হইয়া পড়িও না।"

এঞ্জিন্ হইতে একটা তীব্র হুইসল্ ধ্বনিত হইল,—যেন দানব একবার আপনার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিল। বিজাতীয় কণ্ঠে একজন শ্বেতাঙ্গ হাঁকিল, "হঠো! হঠো!" ট্রেণ ধীরে ধীরে প্ল্যাটফরম্ হইতে বাহির হইয়া গেল। যতক্ষণ দেখা গেল, যামিনীমোহনের বন্ধুরা রুমাল উড়াইতে লাগিলেন; ট্রেণ দৃষ্টির বাহিরে যাইলে তাঁহারা ফিরিলেন।

ঘাটে পান্সী আরোহীদিগের প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। যামিনীমোহনের বন্ধুগণ আসিয়া পান্সীতে উঠিলেন,—পান্সী আবার কলিকাতার দিকে চলিল।

আরোহীদিগের মধ্যে কয় জন চুরুট ধরাইয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন। বন্ধুকে বিদায় দিয়া সকলেই যেন মনের মধ্যে কেমন শূন্যতা অনুভব করিতেছিলেন। একজন সঙ্গীদিগকে হাবড়ার পুলের নির্ম্মাণ-কৌশল বুঝাইতে লাগিলেন; অন্য সকলে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হইয়া তাহা শুনিতে লাগিলেন। জাহ্নবীর জলরাশি যেমন কোন দিকে দৃক্পাত না করিয়া বহিয়া যাইতেছিল, তেমনই শ্রোতাদিগের মনোযোগ বা অমনোযোগের প্রতি দৃক্পাতমাত্র না করিয়া তিনি অনর্গল হাবড়ার পুলের নির্ম্মাণকৌশল বুঝাইতে বুঝাইতে চলিলেন।

হাবড়ার পুলের নির্ম্মাণকৌশল বুঝান শেষ হইবার পূর্ব্বেই পান্সী আসিয়া তীরে লাগিল; নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বক্তা বক্তৃতা বন্ধ করিলেন। সকলে অবতরণ করিলেন।

৮

ট্রেণ হাবড়ার প্ল্যাটফরম্ ছাড়াইয়া চলিয়া গেল। প্রকৃতির শোভাময় সৌন্দর্য্যের মধ্যে আসিয়া যামিনীমোহনের নগরদৃশ্যক্লান্ত নয়ন বড় আনন্দ লাভ করিল। যে দিকে তাকাও, কেবল সবুজের খেলা;—মাঝে মাঝে কোথাও একটা ডোবায় বা নালায় এখনও কিছু জল আছে, তাহার প্রায় সর্ব্বাংশই পানায় সমাচ্ছন্ন।

কিন্তু যামিনীমোহনের নয়ন আনন্দ বোধ করিলেও তাহার হৃদয় সে আনন্দোপভোগে অংশী হইতে পারিল না। পশ্চাতে পরিচিত, সম্মুখে

অজ্ঞাত ;—পশ্চাতে পরিচিত গৃহকোণ, সম্মুখে লক্ষ্যহীন ভ্রমণ ;—পশ্চাতে অভ্যস্ত জীবন, সম্মুখে অনভ্যস্ত নূতন ব্যাপার ; পশ্চাতে প্রাচীন, সম্মুখে নবীন! যেন কোন হতভাগ্য গৃহে জীবনের সুখ দুঃখে বহুদিনের সঙ্গিনীকে রাখিয়া কোন অপরিচিত দারান্তর গ্রহণ করিতে যাইতেছিল। এই সময় স্বভাবতই অতীত জীবনের পরিচিত ঘটনা সকল ও শত শত ছোট খাট সুখ দুঃখের স্মৃতি মনে পড়ে,—তাহাদিগের গতিরোধ করা অসম্ভব হইয়া উঠে। এই পুরাতন ও নূতনের সন্ধিস্থলে আজ অতীত জীবনের শত স্মৃতি যামিনীমোহনের হৃদয় প্লাবিত করিয়া তুলিল। তাহার হৃদয়ে স্মৃতির পর স্মৃতি, চিত্রের পর চিত্রের মত উদিত হইতে লাগিল—তাহার অধিকাংশই অস্পষ্ট। অতীত জীবনের সেই শত স্মৃতির মধ্যে একটা ঘটনার স্মৃতি, একজনের স্মৃতি, সর্ব্বাপেক্ষা পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল।

দিন যায়; রাত্রি আইসে ; আবার দিন যায় ; ট্রেণ গন্তব্যস্থানাভিমুখে ছুটিয়া চলিতে লাগিল।

জীবনের সর্ব্বপ্রধান সুখ ও সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র যাতনার স্মৃতি হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলা অসম্ভব। তাই আজ সেই অতীত প্রেমের স্মৃতি তাহার হৃদয়ে যেন আরও স্পষ্ট হইয়া ফুটিতে লাগিল ;—বিমলার কথা কেবলই তাহার মনে পড়িতে লাগিল।

এই সময় ট্রেণ একটা বড় ষ্টেশনে আসিয়া স্থির হইল। যাত্রীদিগের উঠা নামা, গোলমাল আরম্ভ হইল। বোম্বাই হইতে কলিকাতাগামী ট্রেণও তখন সেই ষ্টেশনের অপর প্ল্যাটফরমে দাঁড়াইয়াছিল। যামিনীমোহন চাহিয়া দেখিল, সেই ট্রেণে—বিমলা! আপনার কামরার সেই দিকের দ্বার খুলিয়া যামিনীমোহন নামিতে গেল—দ্বার রুদ্ধ। বিফলমনোরথ হইয়া সকল ভুলিয়া যামিনীমোহন উন্মত্তবৎ চীৎকার করিয়া ডাকিল,—"বিমলা!"

সেই পরিচিত নয়নে বিস্ময় ও বিরক্তিব্যঞ্জক দৃষ্টি ; তাহার পর গবাক্ষে দুইখানি পরিচিত হস্ত দৃষ্ট হইল ; গবাক্ষদ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল।

যামিনীমোহন আর একবার তীব্র বেদনাব্যঞ্জক স্বরে ডাকিল—"বিমলা!"

সেই সময় কলিকাতাভিমুখগামী ট্রেণের এঞ্জিন হইতে তীব্র হুইসল্ শ্রুত হইল ; ট্রেণ প্ল্যাটফরম্ ছাড়াইয়া গেল। যামিনীমোহন চেতনাহতের মত নিকটস্থ আসনে বসিয়া পড়িল। যখন সে প্রকৃতিস্থ হইল, তখন দেখিল, ট্রেণ ছুটিয়া চলিয়াছে। তীব্রতম যাতনায় তাহার হৃদয় মথিত হইতেছিল।

ট্রেণ যখন বোম্বাই সহরে পৌঁছিল, তখন যামিনীমোহনের জীবনের আর কোনও লক্ষ্য নাই।

* * * *

ইহার পর যামিনীমোহন বোম্বাইয়ের পদতলচুম্বী নীল সাগরসলিলে আপনার জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিল, কি য়ুরোপীয় সমাজের সদাচঞ্চল ফেনিল উত্তেজনাময় স্রোতে জীবন ভাসাইয়াছিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না। তবে কাহার দোষে বিমলা ও যামিনীমোহনের বিবাহসম্বন্ধ ভঙ্গ হইয়াছিল, তাহা লইয়া কলিকাতার মহিলাসমাজে আজও তর্ক বিতর্ক হইয়া থাকে। কিন্তু কে বলিবে,—দোষ কাহার ?

মহারাষ্ট্র ইতিহাসের উপকরণ।

প্রাচীন ভারতে ইতিহাসরচনার প্রথা বিশেষ প্রচলিত ছিল না। মানবচরিত্র-বর্ণনায় সময়ক্ষেপ করা অপেক্ষা দেবস্তুতিমূলক রচনায় প্রাচীন কালের আর্য্যগণের সমধিক প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণগ্রন্থে "নারাশংসী গাথা" বা নরচরিতাখ্যানমূলক কবিতার সম্বন্ধে যেরূপ উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহাতে সে বিষয়ে ঋষিগণের তাদৃশ অনুরাগের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় দৈবশক্তিবর্ণনাপূর্ণ ঐতিহাসিক কাব্যও প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে অতি বিরল। পুরাণ গ্রন্থ হইতে প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্ত কিয়ৎ-পরিমাণে সংগৃহীত করিতে পারা যায় বটে, কিন্তু দুই একখানি পুরাণ ভিন্ন প্রায় অপর সকলগুলিই ধর্ম্মব্যাখ্যানে ও রূপকময় ধর্ম্মোপাখ্যানে পরিপূর্ণ। সুতরাং প্রাচীন ভারতের ইতিহাসোদ্ধার একরূপ দুর্ঘট ব্যাপার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ভারতের বৈদিক ও পৌরাণিক কালের ইতিহাসের ন্যায় বৌদ্ধযুগের ইতিবৃত্ত নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য নহে। বৌদ্ধগণের ললিতবিস্তর, দীপবংশ, মহা-বংশ ও জৈনগণের আদিপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের ও বর্ত্তমানকালের পণ্ডিত-মণ্ডলীর চেষ্টায় আবিষ্কৃত প্রস্তরলিপি, তাম্রশাসন ও প্রাচীন মুদ্রাদির

সাহায্যে, বৌদ্ধযুগের ইতিহাস আংশিক পরিস্ফুট হইয়াছে। নবাভ্যুদয়সম্পন্ন বৌদ্ধ ও জৈনগণ, তাঁহাদিগের প্রসিদ্ধ পুরুষগণের, বিশেষতঃ ধর্ম্মাচার্য্যগণের ও তাঁহাদিগের ধর্ম্মবিতণ্ডার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। প্রসিদ্ধ নরপতিগণের কাব্যাকারে রচিত জীবনচরিত ও প্রতাপশালী রাজবংশসমূহের কীর্ত্তিকাহিনীপূর্ণ "রাজপ্রশস্তি"-রচনার প্রথাও এইকালে প্রচলিত হইয়াছিল, এরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেকালের রচিত সমস্ত গ্রন্থ অদ্যাপি আধুনিক ঐতিহাসিক পণ্ডিতমণ্ডলীর হস্তগত হয় নাই। বহুসংখ্যক গ্রন্থই বিলুপ্ত ও দেশান্তরিত হইয়াছে। আধুনিক কৃতবিদ্যগণ অতি-অল্পসংখ্যক গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কহ্লণকৃত রাজতরঙ্গিণী, দিল্লীর ইতিবৃত্তমূলক কালিন্দীমাহাত্ম্য, বিহ্লণের বিক্রমাঙ্কদেবচরিত, গুজরাটের রাসমালা, হেমাদ্রিকৃত দেবগিরির যাদববংশীয় নৃপতিগণের "রাজপ্রশস্তি" প্রভৃতি কয়েকখানি কবিতাময় গ্রন্থ ভিন্ন সংস্কৃত সাহিত্যে ইতিহাস-নামের যোগ্য আর কোনও গ্রন্থের বিষয় শ্রুত হওয়া যায় না। প্রাকৃত বৃহৎকথা বা সংস্কৃত কথাসরিৎসাগরের ন্যায় কথাগ্রন্থই বা কয়খানি পাওয়া যায়? ফল কথা, পুরাণবর্ণিত কালের ও মুসলমানগণের আগমনকালের মধ্যবর্ত্তী সময়ে, ইতিহাসরচনায় প্রবৃত্তি অপেক্ষা সেকালের ইতিবৃত্তমূলক গ্রন্থসমূহের বিলোপই সেই যুগের ইতিহাস জ্ঞাত হইবার প্রধান অন্তরায় বলিয়া বোধ হয়।

এই যুগের মহারাষ্ট্র দেশের ইতিহাসও কয়েকখানি বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থ, এবং প্রাচীন প্রস্তরলিপি, তাম্রশাসন ও মুদ্রাদির সাহায্যেই আংশিকরূপে অবগত হওয়া যায়। এই প্রাচীন ইতিহাসোদ্ধারের কার্য্য প্রথমতঃ রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর সভ্যগণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। তৎপরে "ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্টিকোয়ারী" নামক পুরাতত্ত্ববিষয়ক মাসিকপত্রের দ্বারা এই কার্য্য বহুপরিমাণে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে, এবং এখনও হইতেছে। এই মাসিকপত্রে ভারতীয় প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের গবেষণামূলক রচনা-সমূহ প্রকাশিত হইয়া থাকে। সেই সকল প্রবন্ধের সারসঙ্কলন পূর্ব্বক পণ্ডিতাগ্রগণ্য ডাক্তার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর মহোদয় ইংরাজী ভাষায় মহারাষ্ট্রদেশের প্রাচীন ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত, অর্থাৎ মুসলমানদিগের আগমন-কাল পর্য্যন্ত সময়ের ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে।

প্রাচীনকালের তিমিরাচ্ছন্ন ভারত পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান-শাসিত ভারতে প্রবেশ করিলে, ঐতিহাসিক তত্ত্বের প্রথমাভাস দৃষ্টিগোচর হয়। এ কালের প্রারম্ভভাগের ইতিহাস মুসলমান লেখকগণের বিজয়বৃত্তান্তমূলক গ্রন্থ হইতে কিয়ৎপরিমাণে অবগত হওয়া যায়। মুসলমানগণ এ দেশে বদ্ধ-মূল হইলে, এতদ্দেশবাসিগণের সহিত বিশেষ পরিচয় ঘটিলে, মুসলমানগণের দ্বারা যে সকল "তওয়ারিখ" বা ইতিহাসগ্রন্থ রচিত হয়, তাহাতে ভারতবাসীর তদানীন্তন অবস্থা অপেক্ষাকৃত অধিকপরিমাণে বিবৃত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, সর্ব্বদেশের জেতৃজাতির লিখিত ইতিহাসে বিজিত জাতির চরিত্র ও বিবরণ সম্বন্ধে সচরাচর যে সকল দোষ সংঘটিত হইয়া থাকে, এই সকল তওয়ারিখ গ্রন্থেও সে সকল দোষের কিছুমাত্র অভাব দৃষ্ট হয় না। তথাপি এই সকল গ্রন্থের আলোচনা করিলে প্রায় সকল গ্রন্থ হইতেই কিয়ৎপরিমাণে এবং ফেরিস্তা, বদৌনী, গোলাম হোসেন, আবুল ফজল ও খাফি খাঁ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ও সমসাময়িক ইতিহাসলেখকগণের গ্রন্থ হইতে বহুপরিমাণে ভারত-সংক্রান্ত আবশ্যক ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে। এই কারণে ভারতীয় ইতিহাসের উদ্ধারপ্রয়াসী লেখকমণ্ডলীর পক্ষে পারস্য ও আরবীয় ভাষা শিক্ষাপূর্ব্বক স্বদেশীয় ভাষায় ঐ সকল "তওয়ারিখ" গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ প্রকাশিত করা অতীব আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। স্যার এইচ্. এম্. ইলিয়ট সাহেব গবর্মেণ্টের সাহায্যে অধিকাংশ প্রসিদ্ধ মুসলমান ইতিহাস-লেখকের গ্রন্থের সারসঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ History of India, as told by its own Historians নামে পরিচিত ও বড় বড় আট খণ্ডে সম্পূর্ণ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার সঙ্কলিত সারার্থ সর্ব্বত্র ভ্রমপ্রমাদশূন্য নহে, এবং মূল গ্রন্থ বা তাহার অবিকল অনুবাদপাঠের ফলও ইলিয়ট মহোদয়ের সঙ্কলিত সংক্ষিপ্তসারপাঠের ফল হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তবে যত দিন মূলগ্রন্থসমূহের অবিকল অনুবাদ স্বদেশীয় ভাষায় প্রকাশিত না হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত ইতিহাসালোচনপ্রিয় লেখকগণকে অগত্যা 'ঘোল খাইয়া দুধের সাধ মিটান'র মত, ইলিয়টের গ্রন্থ পাঠ করিয়াই পরিতৃপ্ত থাকিতে হইবে।

মহারাষ্ট্রদেশে স্বদেশীয় ইতিহাসের উদ্ধারকামিগণ এ বিষয়ে বঙ্গদেশবাসি-গণের অপেক্ষা কিয়ৎপরিমাণে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহাদিগের চেষ্টায়, ফেরিস্তার রচিত ইতিহাসের ও "বুসাতিনে সালাতিন" নামক বিজাপুরের

তওয়ারিখ গ্রন্থের অনুবাদ মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি আরঙ্গজীবের সমসাময়িক জীবনীলেখক সুপ্রসিদ্ধ কাফি খাঁ কর্ত্তৃক আরবীয় ভাষায় লিখিত প্রকাণ্ড ইতিহাসগ্রন্থের অবিকল মহারাষ্ট্রীয় অনুবাদ আরব্ধ হইয়া "বিবিধজ্ঞানবিস্তার" নামক মাসিকপত্রে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। তদ্ভিন্ন, দেশীয় ভাষায় পূর্ব্বকথিত ডাক্তার ভাণ্ডারকর প্রণীত Early History of the deccan down to the mehomeden Conquest নামক গ্রন্থের ও গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেবের প্রণীত History of the Marathas গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত এবং Bombay Gazzatteers প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে "মহারাষ্ট্র-দেশীয় দুর্গসমূহের বিবরণ" নামক গ্রন্থ সঙ্কলিত এবং কোহ্লাপুর কর্ণাট প্রদেশের গেজেটীয়ার-সমূহ অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীয়গণ স্বদেশীয় ভাষায় রচিত প্রাচীন বখর বা ইতিহাসগ্রন্থসমূহের বিষয়ে ও গবেষণাপূর্ণ ঐতিহাসিকগ্রন্থের রচনাতেও বিশেষ উৎসাহ দেখাইতেছেন।

মহারাষ্ট্র দেশের মুসলমানশাসিত কালের দেশীয় ভাষায় রচিত কোনও ইতিহাসগ্রন্থ অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই। এইকালের মুসলমানগণের লিখিত ইতিহাসের মধ্যে ফেরিস্তার রচিত গ্রন্থই সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক ও উৎকৃষ্ট। এই গ্রন্থের যে দুইখানি সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ ইংরাজীতে প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে জেনারেল ব্রিগস্‌কৃত অনুবাদই উৎকৃষ্ট। এই গ্রন্থে আলাউদ্দীন কর্ত্তৃক ১২৯৪খৃঃ মহারাষ্ট্রবিজয় হইতে ১৬০৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় তিন শত বৎসরের ঐতিহাসিক বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে। ফেরিস্তার গ্রন্থে ব্রাহ্মণী ও তদন্তর্ভুক্ত নিজামশাহী রাজ্যের ইতিহাস যেরূপ বিস্তৃতভাবে বিবৃত হইয়াছে, আদিলশাহী, কুতুবশাহী ও বিজয়ানগর প্রভৃতি রাজ্যের ইতিহাস সেরূপ বিস্তৃতভাবে বিবৃত হয় নাই। বিজাপুরের পারস্য ভাষায় রচিত অনেক ইতিহাসগ্রন্থ ছিল; কিন্তু এখন আর সে সকল গ্রন্থ সুপ্রাপ্য নহে। স্থানীয় লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ইংরাজ কর্ম্মচারী ও ভ্রমণকারিগণ আসিয়া ঐ সকল বহুমূল্য গ্রন্থ ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়াছেন। মহারাষ্ট্র দেশের ইতিহাসলেখক ক্যাপ্‌টেন জেমস্ গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেব মহোদয়ও বিজাপুর হইতে পারস্যভাষায় রচিত কয়েকখানি ইতিহাসগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এই সকল কারণে, বিশেষতঃ পারস্যভাষার চর্চ্চার অভাবে, অনেক পারসী গ্রন্থ বিলুপ্তপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। মহারাষ্ট্রীয়গণের অভ্যুদয়-কালেও পারসীগ্রন্থের প্রতি সাধারণের অনাদর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়

নৃপতিগণের অধীনে সেকালে "পারসীনবীশ" নামে পরিচিত পারস্যভাষাভিজ্ঞ কর্ম্মচারী থাকিতেন। শুনা যায়, এই পারসীনবীশদিগের নিকট অনেক পারস্য গ্রন্থ সংগৃহীত থাকিত। মহারাষ্ট্রীয় ও পারস্যভাষায় তুল্য অনুরাগ হেতু তাঁহাদিগের চেষ্টায় কোনও কোনও পারস্য গ্রন্থ মহারাষ্ট্রীয় ভাষাতে অনুবাদিত হইয়াছিল। কিন্তু অধুনা সেই সকল মূল গ্রন্থ বা তদনুবাদসমূহের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। কেবল কোহ্লাপুরের মহারাজের ভূতপূর্ব্ব পারসীনবীশের নিকট হইতে "বুসা তিনে সলাতিন" নামক গ্রন্থের প্রাচীন মারাঠী অনুবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুরের তত্ত্বাবধানে অনেক পারস্য ভাষায় রচিত ইতিহাসগ্রন্থ আছে। ঐ সকল গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হইলে, দাক্ষিণাত্যের মুসলমান শাসনকালের ইতিহাস বহুপরিমাণে পরিস্ফুট হইবার সম্ভাবনা।

উত্তর-ভারতে রচিত ইতিহাসগ্রন্থের মধ্যে কাফি খাঁর প্রণীত ইতিহাস হইতে মহারাষ্ট্রদেশের সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব সংগৃহীত হইতে পারে। কাফি খাঁ আরঙ্গজীবের অধীন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম মহম্মদ কাশেম খাঁ। ইহাঁর রচিত গ্রন্থে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মোগল-শাসিত ভারতবর্ষের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। সয়ের মুতাক্ষরীণ প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থে কাফি খাঁর ইতিহাস হইতে অনেক অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। কাফি খাঁ মোগল সম্রাটের অধীন নানাবিধ রাষ্ট্রীয় ও সামরিক কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া, এবং সমসাময়িক প্রাচীনগণের ও বিভিন্নদেশীয় ও বিভাগীয় কর্ম্মচারিগণের প্রমুখাৎশ্রুত বিবরণ অবলম্বন করিয়া স্বীয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার লিখিত সমসাময়িক ঘটনাবলীর মোগলপক্ষীয় বিবরণ যে বহুপরিমাণে বিশ্বাসযোগ্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিষয়েও এই গ্রন্থে অনেক স্থলে উল্লেখ আছে। লেখক অপক্ষপাতিতার সহিত লিখিবার চেষ্টা করিয়াও মহারাষ্ট্রীয়দিগের সম্বন্ধে স্বীয় তাচ্ছীল্য ও বিরাগ গোপন করিতে পারেন নাই। সেকালের মহারাষ্ট্রীয়গণ মোগলদিগের শাসনশৃঙ্খল ছিন্ন করিবার জন্য যেরূপ চেষ্টিত হইয়াছিলেন, এবং তদ্বিষয়ে যেরূপ কৃতকার্য্য হইতেছিলেন, তাহাতে কাফি খাঁর ন্যায় মোগল ইতিহাসলেখকের মনে তাঁহাদিগের সম্বন্ধে প্রগাঢ় বিদ্বেষ উদিত হওয়া কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নহে। এই কারণে মহারাষ্ট্রীয়দিগের উল্লেখ-স্থলে কাফি খাঁর গ্রন্থে অনেক স্থানেই তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কুক্কুর, নারকী

কুক্কুর (Helle dog) প্রভৃতি তীব্রঘৃণাসূচক বিশেষণসমূহ প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজ শিবাজীর স্বর্গারোহণের উল্লেখকালে এই লেখক "ঐ কুকুর নরকে গমন করিল", এইরূপ বাক্য ব্যবহার না করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই। মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রতি গ্রন্থকারের এইরূপ বিদ্বেষ সত্ত্বেও তাঁহার গ্রন্থ যে ইতিহাসচর্চ্চাপ্রিয় লেখকগণের আলোচ্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সয়ের মুত্তাক্ষরীণ, বাদশানামা, আলম্‌গীরনামা প্রভৃতি গ্রন্থেও মহারাষ্ট্রীয়দিগের আংশিক ইতিবৃত্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মুসলমানদিগের লিখিত গ্রন্থ ভিন্ন সেকালের মুসলমান নরপতিগণের অধীন হিন্দুকর্ম্মচারিগণও স্বসমকালের প্রসিদ্ধ ঘটনাবলীর বিবরণ লিখিয়া রাখিতেন। মুসলমান ভূপতিগণের অধীনে বাস হেতু ও তৎকালে সর্ব্বত্র পারস্য ভাষার আদরাধিক্যবশতঃ, তাঁহারা পারস্য ভাষাতেই লিখিত ইতিহাসগুলির রচনা করিয়াছেন। এইরূপ যবনাধীন হিন্দু লেখক কর্ত্তৃক পারস্য ভাষায় লিখিত দুইখানি ইতিহাসগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমখানি দলপৎ রায় নামক আরঙ্গজীবের জনৈক বুন্দেল কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক লিখিত। কাশীরাজপন্ত নামক সুজাউদ্দৌল্লার কোনও কর্ম্মচারী দ্বিতীয় গ্রন্থের প্রণেতা। প্রথম গ্রন্থের লেখক দাক্ষিণাত্যের প্রত্যেক মোগল অভিযানের সময় সম্রাট আরঙ্গজীবের সঙ্গে থাকিয়া দাক্ষিণাত্য সমরের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ স্কট জোনাথন সাহেব কর্ত্তৃক Aurungzeb's Operation in the Deccan নামে প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয় গ্রন্থে কাশীরাজপন্ত পাণিপতের তৃতীয় যুদ্ধের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং এই মহাসমরে উপস্থিত থাকিয়া যবনগণের পক্ষীয় যাবদীয় ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার লিখিত বিবরণ যে বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বলা অনাবশ্যক যে, এই গ্রন্থকারের পক্ষে যবনদিগের গুপ্তপরামর্শাদির বিবরণ অবগত হইবার যেরূপ সুবিধা ছিল, মহারাষ্ট্রীয় পক্ষের অবস্থা জানিবার তাদৃশ সুযোগ ছিল না। এসিয়াটিক্ রিসার্চেস্ নামক গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে এই গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীয়গণও এই গ্রন্থ স্বদেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন।

ইহার পর স্বদেশীয় ভাষায় রচিত ঐতিহাসিক উপকরণসমূহ আমাদিগের আলোচ্য। ভারতে মুসলমানশাসনকালে, কিয়ৎপরিমাণে মুসলমানদিগের

অনুকরণে ও প্রধানতঃ মুসলমানগণের সঙ্ঘর্ষে, ভারতীয় ভিন্নপ্রদেশীয় হিন্দুগণের মধ্যে স্বদেশীয় ভাষায় ইতিহাস ও ঐতিহাসিক গাথারচনার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। মুসলমানদিগের সহিত বিবাদ করিয়া মহারাষ্ট্রীয়, রাজপুত ও শিখ প্রভৃতি যে সব জাতি স্বাধীনতালাভের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহারা অভ্যুদয়লাভের পর আপনাদিগের উন্নতির ইতিহাস, বিশেষতঃ মুসলমানগণের সহিত বিসম্বাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। জাতীয় অভ্যুদয়, স্বাধীনতা, অপর জাতির সহিত নিত্য সংঘর্ষ ও বিজয়লাভ, ইতিহাসরচনার প্রবর্ত্তক। পরপদানত, গৌরবহীন, বিপন্নজাতির ইতিহাসরচনার প্রবৃত্তি সম্ভব নহে। রাজপুত জাতির অতি প্রাচীন ইতিহাস সুপ্রাপ্য ও সুস্পষ্ট নহে। তাঁহাদিগের মধ্যযুগের ইতিহাস, পরস্পরের সহিত সংঘর্ষের ও যবনগণের সহিত বিরোধে জয়লাভের বা তাদৃশ কোনও জাতীয় গৌরবকর বা চিরস্মরণীয় ঘটনার বিবরণপূর্ণ আখ্যানমালা, বহুপরিমাণে সুলভ। মধ্যযুগে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজন্যবর্গের সহিত বিরোধে বৈদেশিক আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টায় একমাত্র "মেওয়ার" (মিবার) প্রদেশই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সফলপ্রযত্ন হইয়াছিল বলিয়া, রাজপুতানার অপরাপর প্রদেশ অপেক্ষা মেওয়ারের স্বদেশীয় ভাষায় লিখিত ইতিহাস অধিকতর পরিস্ফুট ও বিস্তীর্ণ।

মহারাষ্ট্রীয়গণের ইতিহাসগ্রন্থসমূহও ঠিক এইরূপ অবস্থায় রচিত। মহারাষ্ট্রদেশের অতিপ্রাচীন ইতিহাসগ্রন্থের মধ্যে কেবল গুণভদ্ররচিত উত্তরপুরাণের ঐতিহাসিক পরিশিষ্ট (খৃঃ দশমশতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত) বিদ্যাপতি বিহ্লণ কৃত "বিক্রমাঙ্কদেবচরিত" (খৃঃ ১২শ শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত) ও হেমাদ্রি-প্রণীত দেবগিরির যাদববংশীয় নরপতিগণের "রাজপ্রশস্তি" (ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত) এই তিনখানি গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। * এই তিনখানি গ্রন্থই সংস্কৃত ভাষায় কাব্যাকারে তদানীন্তন মহারাষ্ট্রপতিগণের দাক্ষিণাত্যের সার্ব্বভৌমত্বপ্রাপ্তিকালে রচিত। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যাদববংশীয় নৃপতিগণের অধঃপতনের পর মহারাষ্ট্রদেশে মুসলমান-শাসন প্রবর্ত্তিত এবং মহারাষ্ট্রজাতির অবনতির আরম্ভ হয়। ইহার পর তিন শত বৎসর কাল মহারাষ্ট্রীয়গণ যবনগণের কঠোর শাসনচক্রে নিষ্পেষিত হইয়া ম্রিয়মাণ অবস্থায় কালাতিপাত করেন। এই সময়ে জাতীয় ভাষায় কোনও ইতিহাস রচিত হয় নাই। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রাতঃস্মরণীয় "ক্ষত্রিয়কুলাবতংস শ্রীরাজা শিবছত্রপতি"র চেষ্টায় মহারাষ্ট্রীয়গণের

জাতীয় শক্তি সঞ্জীবিত হইলে, নবাভ্যুদিত মহারাষ্ট্র জাতির হৃদয়ে ইতিহাস-রচনার প্রবৃত্তি জাগরূক হইয়া উঠে। সর্ব্বপ্রথম, শিবাজীর মাতার আদেশে, অনুমান ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে, অজ্ঞানদাস নামক পুনার একজন গ্রাম্যকবি বা "ভাট" প্রতাপগড়ের যুদ্ধ ও আফজল খাঁর পরাভব সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ গীতিকবিতার রচনা করেন। তাহার পর, অপর কবিগণ কর্ত্তৃক "সিংহগড়-বিজয়" ও শিবাজীর বাল্যসহচর বাজীফসলকরের শৌর্য্য সম্বন্ধেও দুই একটি কবিতা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই সকল কবিতা সমসাময়িক কবিগণ কর্ত্তৃক রচিত হওয়ায়, ইহাদিগের মধ্যে সেকালের জনসমাজের জ্ঞান বিশ্বাসের ও ঐ সকল ঘটনার জীবন্ত ঐতিহাসিক চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এইরূপে মহারাষ্ট্রীয়গণের জাতীয় জীবনের বিকাশের সহিত, তাঁহাদিগের মধ্যে আপনাদিগের অভ্যুদয়-বিবরণ, প্রধান প্রধান যুদ্ধের বিজয়-বার্ত্তা ও প্রসিদ্ধ পুরুষগণের শৌর্য্যবীর্য্যাদিমূলক গাথারচনার ও তাহা গৃহে গৃহে সঙ্গীতাকারে গীত হইবার প্রথা প্রচলিত হয়। পরবর্ত্তিকালে এই প্রথা মহারাষ্ট্রদেশে বিশেষরূপে প্রসার লাভ করিয়া মহারাষ্ট্রীয়গণের অভ্যুন্নতির পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। সম্প্রতি আকওয়ার্থ সাহেব ও শালিগ্রাম মহোদয়ের চেষ্টায় বহুসংখ্যক ঐতিহাসিক গাথা সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রাম্যকবির রচিত পূর্ব্বোক্ত গাথাত্রয়ের রচনার পর শিবাজীর সম-সাময়িক হিন্দুস্থানী কবিভূষণ শিবাজীর গুণগ্রাম বর্ণনা করিয়া সহস্রশ্লোক-সংবলিত এক ঐতিহাসিক কাব্যের রচনা করেন। বৃদ্ধগণের মুখে শুনা যায়, শিবাজীর সভাপণ্ডিত গাগাভট্ট সংস্কৃত ভাষায় এক "শিবাজী-চরিত" রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ঐ গ্রন্থের কোনও সন্ধানই পাওয়া যায় নাই। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথমপাদে পুরুষোত্তম পণ্ডিত কর্ত্তৃক "শিব-কাব্যং" নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে শিবাজী হইতে শেষ বাজীরাওয়ের সিংহাসনপরিত্যাগ ও ইংরাজদিগের আগমন পর্য্যন্ত কালের ইতিহাস কাব্যাকারে সংকলিত হইয়াছে।

* কর্ণাটকীয় ভাষায় দেবগিরি ও বিজয়ানগরের হিন্দু নরপতিগণের চরিতাখ্যানমূলক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে দেবগিরির শেষ নৃপতি রামচন্দ্র রাওয়ের একখানি বখর (ইতিহাস) মাদ্রাজের সরকারী গ্রন্থসংগ্রহালয়ে রক্ষিত আছে। তাঞ্জোর অঞ্চলে তদ্দেশীয় ভাষায় "নরপতিবিজয়" প্রভৃতি বিবিধ ইতিহাস গ্রন্থ আছে, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। তামিলী ভাষাতেও অনেক ইতিহাসগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, শুনিতে পাওয়া যায়।

যাহা হউক, শিবাজীর জীবদ্দশায় রচিত ঐতিহাসিক উপকরণের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত গাথাত্রয়, ভূষণের কবিতা-গ্রন্থ, এবং শিবাজীর প্রতি তুকারাম ও রামদাস স্বামীর প্রেরিত কয়েকখানি পত্র ভিন্ন আর কিছু পাওয়া যায় না। শিবাজীর মানবলীলাসম্বরণের ১২। ১৩ বৎসর পরে, কৃষ্ণাজী অনন্ত সভাসদ নামক তাঁহার জনৈক কারকুন্, শিবাজীর স্বরাজ্যস্থাপনের ইতিহাস-সম্বলিত জীবনচরিত রচনা করেন। ইহাই মহারাষ্ট্রীয়দিগের জাতীয় ভাষায় রচিত ইতিহাস-নামের যোগ্য প্রথম গদ্য গ্রন্থ। পরবর্ত্তী কালে শিবাজীর জীবন অবলম্বন করিয়া অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয় কৃতবিদ্য-মণ্ডলীর চেষ্টায়, এ পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির রচিত শিবাজীর সাতখানি বখর পাওয়া গিয়াছে, এবং তন্মধ্যে পাঁচখানি বিবিধ টীকা টিপ্পনী সহ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে।

কৃষ্ণাজী অনন্ত সভাসদের বখর রচিত হইবার পর হইতে মহারাষ্ট্রদেশে গদ্য-ইতিহাস-রচনার প্রথা বিশেষরূপে প্রবর্ত্তিত হইল। ক্রমে, মহারাষ্ট্রীয়-গণের স্বরাজ্যকালে প্রাদুর্ভূত অধিকাংশ প্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবনচরিত ও বিখ্যাত ঘটনাসমূহের বিবরণ সমসাময়িক রাজকর্ম্মচারী ও মারাঠা সর্দ্দার-গণের যুদ্ধসহচর কারকুন্ ও পরভবিক লেখকগণ কর্ত্তৃক লিখিত হইতে লাগিল। মুসলমান নরপতিগণের অনুকরণে মহারাষ্ট্রদেশীয় ভূপতিগণ ও তাঁহাদিগের প্রতিনিধি, মন্ত্রী ও অভিজাতবর্গ আপনাদিগের জীবনের ও রাজকীয় দৈনন্দিন ঘটনাবলী লিখিয়া রাখিবার জন্য, "আখবরনবীশ" ও "বাঁকা-নবীশ"-(বৃত্তান্তলেখক)-সমূহ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই সকল লেখকের গ্রন্থাদি এখনও মহারাষ্ট্রদেশে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য নহে। স্বরাজ্যকালে মহা-রাষ্ট্রীয়গণের রাষ্ট্রীয় উন্নতির সহিত ইতিহাসরচনাপ্রিয়তা এত দূর বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, নানা ফড়নবীসের ন্যায় রাজমন্ত্রিগণ "আত্মচরিত" লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয় লেখকগণ কেবল স্বদেশীয় খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের কীর্ত্তিকলাপের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াই পরিতৃপ্ত না হইয়া, সেকালের দাক্ষিণাত্যের সুলতান ও নবাবগণের ইতিবৃত্তমূলক গ্রন্থেরও রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল বখরের মধ্যে বিজাপুরের সুলতান-গণের বিবরণ বিষয়ক আটখানি বখর সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই শ্রেণীর গ্রন্থসমূহ যে অধিকাংশস্থলে পারস্য ভাষায় রচিত তওয়ারিখ হইতে সঙ্কলিত, তাহা বলাই বাহুল্য।

এই সকল ঐতিহাসিক গ্রন্থ ভিন্ন সেকালের রাজন্য ও সামন্তবর্গের এবং রাজাশ্রিত বা তৎসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের বংশধরগণের নিকট হইতে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের লিখিত মূল চিঠিপত্রাদি ও পারিবারিক উৎসবাদির ব্যয়বিবরণসম্বলিত কাগজপত্র সংগ্রহ করাও দুর্ঘট নহে। এই সকল বখর ও কাগজপত্র সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইলে, তাহা হইতে নানাবিধ বহুমূল্য ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারিবে। এই কারণে মহারাষ্ট্র-দেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ ঐ সকল বখর ও ঐতিহাসিক কাগজপত্র সংগ্রহ করিবার জন্য বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। তাঁহাদিগের চেষ্টায় এ পর্য্যন্ত প্রায় চল্লিশখানি প্রাচীন বখর ও ৫।৬ শত ঐতিহাসিকবিবরণসম্বলিত চিঠিপত্র প্রকাশিত হইয়াছে। মহারাষ্ট্রদেশের ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য তাঁহারা কিরূপ চেষ্টা করিতেছেন, এবং তাঁহাদিগের প্রয়াসসিদ্ধির কিরূপ সম্ভাবনা ও সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা "ডেকান ভার্ণাকিউলার ট্রান্‌শ্লেশন সোসাইটী"র গত বৎসরের বিবরণী হইতে দুই এক স্থল উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণের গোচর করিতেছি।

"পুনার ভূতপূর্ব্ব মহারাষ্ট্রপতি পেশওয়েগণের দপ্তরখানায় যে সব সরকারী কাগজপত্র ছিল, সে সকল এক্ষণে বৃটিশ গবর্মেণ্টের রক্ষণাধীন আছে। ঐ সকল কাগজপত্র মহারাষ্ট্রদেশের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাসের রচনার পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইতে পারে বিবেচনায়, বর্ত্তমান সভা গবর্মেণ্টের নিকট ঐ সকল কাগজপত্র দেখিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ২।৩ বার প্রত্যাখ্যান করিয়া পরিশেষে গতবৎসর সদাশয় বোম্বাই গবর্মেণ্ট এই সোসাইটীকে "পুনা দপ্তরের কাগজপত্র"-সমূহ দেখিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। এই পুনা দপ্তরের কাগজপত্র পাঠ করিলে, ইহাকে ঐতিহাসিক তত্ত্বের সমুদ্র-বিশেষ বলিয়াই ভ্রম জন্মে। ইহাতে মহারাষ্ট্রজাতির গত দুই শত বৎসরের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, ধর্ম্মসংক্রান্ত উন্নতির সুবিস্তৃত ইতিহাসরচনার উপযোগী যে সকল রাশি রাশি বহুমূল্য কাগজপত্র বা উপকরণ সংগৃহীত রহিয়াছে, তাহা দর্শন করিলে, প্রত্যেক ঐতিহাসিকের হৃদয়ই পরমানন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। সভার চেষ্টায় তৃতীয় পেশওয়ে শ্রীমন্ত বালাজী বাজীরাওয়ের জীবনী-সংক্রান্ত কাগজপত্রসমূহের যে সকল অত্যাবশ্যক অংশ গবর্মেণ্টের আদেশে ইংরাজীতে অনুবাদিত হইয়াছে, তাহা মুদ্রিত করিলে, ফুলস্ক্যাপ আকারের ৪৪০০ পৃষ্ঠা হইবে! সাতারার নরপতিগণের ইতিহাসের উপকরণসমূহ

প্রকাশ করিলে, তাহাও ঐ আকারের ১২ শত পৃষ্ঠার কম হইবে না। তদ্ভিন্ন ভূতভূর্ব্ব মহারাষ্ট্রপতিগণের চিটনাম বা পত্রলেখকদিগের স্বহস্তলিখিত প্রায় পঞ্চাশৎসহস্রাধিক পত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে! এই সকল পত্রের মধ্যে অন্যূন পাঁচ সহস্র পত্র এবং চতুর্থ পেশওয়ে মাধবরাও সাহেবের স্বহস্তে লিখিত ও স্বাক্ষরিত প্রায় পাঁচ ছয় শত পত্র প্রকাশযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে! এই সকল কাগজপত্র গবর্মেণ্টের চিরপ্রচলিত পদ্ধতিক্রমে মুদ্রিত হইলে, উহা সাধারণের হস্তাগত হইতে বহুবিলম্ব ঘটিবে। এই হেতু সাতারার দুই জন সুপ্রসিদ্ধ উকিল—রাজশ্রী বলবন্ত শ্রীধর সহস্রবুদ্ধি ও রাজশ্রী রঘুনাথ পাণ্ডুরাঙ্গ করন্দীকর, এই দুই মহোদয় নিঃস্বার্থ স্বদেশহিতৈষণার বশবর্ত্তী হইয়া ফুলস্ক্যাপ আকারের প্রায় ৫৫০০ পৃষ্ঠায় পরিমিত উপকরণ-মুদ্রণের ব্যয় প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। সভার অন্যতম উদ্যোগী সভ্য ও মহারাষ্ট্র ইতিহাসে সুপণ্ডিত রাজশ্রী দত্তাত্রয় বলবন্ত পারসনীস মহাশয়ের প্রতি ঐ সকল কাগজপত্র উপযুক্ত টীকা টিপ্পনী প্রভৃতি সহ সম্পাদন পূর্ব্বক প্রকাশ করিবার ভার প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অপরাপর যে সমস্ত ঐতিহাসিক উপকরণ মহারাষ্ট্রীয় কৃতবিদ্যমণ্ডলীর চেষ্টায় সংগৃহীত হইয়াছে, তৎসমূহের প্রকাশ জন্য এই সভার তত্ত্বাবধানে একখানি মাসিকপত্রও প্রকাশিত হইতেছে।"

পুনার পেশওয়েগণের দপ্তরের বহুমূল্য ঐতিহাসিক কাগজপত্রের ন্যায় আরও অনেক স্থানে প্রাচীন সর্দ্দার, জাইগীরদার ও সামন্তবর্গের বংশধরগণের নিকট, এবং জয়পুর, যোধপুর, গোয়ালিয়ার, বান্দা, ঝান্সী, সাগর, বরোদা, ইন্দোর, তাঞ্জোর, কর্ণাট, নাগপুর, সাতারা, কোহ্লাপুর, কোলাবা ও ইসলামপুর প্রভৃতি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ প্রদেশসমূহে মহারাষ্ট্র ইতিহাসের অনেক উপকরণ প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। পুনার ভার্ণাকিউলার সোসাইটী সে সব উপকরণও সংগ্রহ করিবার চেষ্টায় আছেন, এবং তদ্বিষয়ে কিয়ৎপরিমাণে সফলপ্রযত্নও হইয়াছেন। পেশওয়েগণের অন্যতম সেনাপতি পরশুরাম ভাউ পটবর্দ্ধন মহোদয়ের বংশধরগণের নিকট হইতে মহারাষ্ট্র-ইতিহাসসংক্রান্ত এত কাগজপত্র পাওয়া গিয়াছে, এবং সে সকল এত বহুমূল্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে যে, কেবল তাহাদিগের প্রকাশ জন্য "ঐতিহাসিক লেখ-সংগ্রহ" নামক একটি স্বতন্ত্র মাসিকপত্র প্রকাশ করা আবশ্যক হইয়াছে। আর এক জন ঐতিহাসিক, মহারাষ্ট্র মন্ত্রী নানা ফড়নবীসের দপ্তর অনুসন্ধান

করিয়া, তাহা হইতে ইতিহাসোপযোগী এত কাগজপত্র বাছিয়া বাহির করিয়াছেন যে, তৎসমস্ত প্রকাশিত করিতে প্রায় ৩০।৪০ সহস্র টাকার প্রয়োজন। নানা ফড়নবীসের দপ্তরে দ্বিতীয় মাধব রাওয়ের কয়েকটি দৈনন্দিন ঘটনায় বিবরণপূর্ণ পুস্তক (খাতা) পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে মাধব রাওয়ের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রত্যেক দিবসের ঘটনাবলী বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে। এই দপ্তরে একটা মানচিত্রের পুলিন্দা পাওয়া গিয়াছে;—তাহাতে বিবিধ যুদ্ধক্ষেত্রের, কেল্লা ও দুর্গসমূহের, দুর্গাবরোধের, সমগ্র ভারতবর্ষের, নিজামের রাজ্যের ইংরাজ-অধিকৃত প্রদেশের, মহারাষ্ট্রীয় সামাজ্যের, কঙ্কণ প্রদেশের এবং ইংরাজদিগের নৌবলের (Navy) ও বোম্বাই প্রভৃতি নগরীর ভিন্ন ভিন্ন মানচিত্রসমূহ অদ্যাপি সযত্নে রক্ষিত আছে। তন্মধ্যে কঙ্কণের মানচিত্রখানি প্রায় ৪০।৫০ হস্ত দীর্ঘ! মাধব রাওয়ের ভূগোলশিক্ষার ও দূরবীক্ষণযোগে নভোমণ্ডলস্থ গ্রহনক্ষত্রাদি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য নানা ফড়নবীস যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণও এই দপ্তরে প্রাপ্ত হওয়া যায়!

মহারাষ্ট্রদেশের বহির্ভাগস্থিত মহারাষ্ট্রীয়গণও স্বদেশীয়-ইতিহাস-উদ্ধারের কার্য্যে বিশেষ যত্নপরায়ণ হইয়াছেন। বরোদানগরে মহারাষ্ট্র ইতিহাসের উপকরণসংগ্রহের জন্য একটি সভা সংস্থাপিত ও তাহার তত্ত্বাবধানে কয়েকখানি বিলুপ্তপ্রায় প্রাচীন বখর প্রকাশিত হইয়াছে। মহারাষ্ট্রদেশের কায়স্থগণও তাঁহাদিগের সামাজিক ইতিহাসের সংগ্রহে বিশেষ মনোযোগী হইয়া কতিপয় ইতিহাসগ্রন্থের প্রকাশ করিয়াছেন।

গদ্য গ্রন্থ ভিন্ন বিবিধ কবিতাময় গ্রন্থেও ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে। মহীপতি-প্রণীত ভক্তি-বিজয়-ভক্তলীলামৃত, সন্তবিজয়, সন্তলীলামৃত প্রভৃতি ভক্তচরিতাখ্যানমূলক গ্রন্থে মহারাষ্ট্রদেশের সাধুপুরুষগণের জীবনী ও ধর্ম্মোন্নতির ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। নামদেব, একনাথ, রামদাস, তুকারাম প্রভৃতির শিষ্যগণও তাঁহাদিগের কবিতাময় জীবনচরিত রচনা করিয়াছেন। এই সকল সাধুপুরুষের আবির্ভাবই মহারাষ্ট্রীয় জাতীয় উন্নতির ও স্বাধীনতার এক প্রধান কারণ হইয়াছিল। এই কারণে তাঁহাদিগের জীবনী মহারাষ্ট্র ইতিহাসের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। ভক্তচরিতাখ্যায়ক গ্রন্থ ভিন্ন, মহারাষ্ট্রীয় জাতির উৎপত্তির বিবরণ, ভূপতিবিজয়, প্রভুবংশকাব্য, জনকবিজয়, মাধববিজয় প্রভৃতি বিবিধ ইতিহাসমূলক গ্রন্থও সংস্কৃত ও মারাঠী ভাষায় রচিত হইয়াছিল।

এই প্রবন্ধে আমরা মহারাষ্ট্র ইতিহাসের দেশীয় উপকরণের বিপুলতা সম্বন্ধে সংক্ষেপে যাহা বলিলাম, তাহা হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, ঐ সকল উপকরণ নিঃশেষরূপে সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইলে, মহারাষ্ট্রদেশের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাসরচনার পথ সুগম হইবে। ভারতের আর কোনও প্রদেশের ইতিহাস লিখিবার এরূপ প্রচুর উপকরণ আছে কি না সন্দেহ। মহারাষ্ট্রীয়দিগেরও স্বদেশীয় ইতিহাসগ্রন্থপাঠেচ্ছা আজকাল এরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছে যে, ইতিহাস নামে পরিচিত বা তৎসংক্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হইবামাত্র, অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাহার সমগ্র সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছে। ইতিহাসপাঠকের এরূপ সংখ্যাধিক্য দেখিয়া, মহারাষ্ট্রের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাসলেখকের আবির্ভাব প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।

শ্রীসখারামগণেশ দেউস্কর।

মশক।

মশক আমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সারাদিনের পরিশ্রমের পর শ্রান্তদেহে শয়ন করিলাম; পোঁ পোঁ শব্দে রণভেরী বাজাইতে বাজাইতে দলে দলে মশককুল আক্রমণ করিতে আসিবে। 'মশারি'-রূপ দুর্গ-মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, কৌশলকুশল শত্রু কেমন সতর্কতার সহিত দুর্গদ্বার অন্বেষণ করিবে! রণনিনাদ থামাইয়া কেমন ধীরে ধীরে দুর্গ-প্রাচীরে উপবেশন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার জন্য সুযোগের প্রতীক্ষা করিবে! নেটের মশারি সূতা দিয়া নির্ম্মিত বটে, কিন্তু পালঙ্কপার্শ্বে বিলম্বিত দেখিলে বিনা সূতার হারের কথা মনে পড়ে। ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যামিতিক ছিদ্ররাজি যেন নিতান্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরস্পর পরস্পরের সহিত আবদ্ধ;—পৃথক হইবার অব্যহিত পূর্ব্বে ভ্রাতায় ভ্রাতায় যেরূপ ভাব দেখা যায়, এই ছিদ্ররাজির মধ্যে যেন তাহা পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান; সামান্য কারণেই পরস্পর বিভিন্ন হইয়া পড়ে। তস্কর যেমন নীরবে সিঁদের মধ্যে পদ প্রবেশিত করিয়া দেয়, মশক সেইরূপ মশারির ছিদ্রের মধ্যে আপন পশ্চাদ্ভাগের পদদ্বয় প্রবেশিত করিয়া দিয়া দেখে যে, পথ প্রশস্ত কি না। যদি সুযোগ না বুঝে, তবে আবার ভেরী বাজাইতে বাজাইতে অন্য স্থানে গিয়া পূর্ব্ববৎ পরীক্ষা করে; মশারির কোন স্থান ছিন্ন পাইলে, সেই পথ

দিয়া ভিতরে প্রবেশ পূর্ব্বক আমাদিগকে আক্রমণ করে। তাই বলিতেছিলাম, মশক আমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

কিন্তু জীবনের সকল কালে আমাদের শত্রুতা করে না। মাতৃজঠর হইতে নির্গত হইয়া অধিকাংশ পতঙ্গের ন্যায় পৃথক পৃথক চারি ভাবে বিরাজ করে। ইহাদিগের জীবনবৃত্তান্ত এতই কৌতুকাবহ যে, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে হৃদয় বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে; ইহাদিগের শত্রুতার কথা ভুলিয়া যাইতে হয়। যে অস্ত্রের দ্বারা ইহারা আমাদিগকে আক্রমণ করে, তাহা এমনই সুকৌশলে বিনির্ম্মিত যে, তাহা দেখিবার সময় মনে হয়, মশক! আর কিছুক্ষণ আমার রক্তপান কর, তোমার অস্ত্রের নির্ম্মাণকৌশল নয়ন ভরিয়া দেখিয়া লই।

পক্ষীদিগের ন্যায় মশকমাতা অণ্ড প্রসব করে। ইহারা জলের ধারে গিয়া বহুসংখ্যক স্থূলাগ্র লম্বা ডিম্ব ছাড়িয়া দেয়। দিন কয়েক পরে এই সকল ডিম ফুটিয়া তাহা হইতে লম্বা লম্বা পোকা বাহির হয়; তাহাদিগের পক্ষ থাকে না। তখন মশকের কোন অবয়বই থাকে না। ইহাদিগের মুখ গোল, চ্যাপ্টা ও কেশমণ্ডিত। শরীরের অন্য অংশেও কেশ থাকে, কিন্তু তাহা মুখের কেশ অপেক্ষা ছোট। পুচ্ছদেশে দুইটি নল থাকে; একটি বড় ও একটি তদপেক্ষা ক্ষুদ্র। এই বড় নলে ইহাদের শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়। এই জন্য ইহাদিগকে শ্বাসপ্রশ্বাসনির্ব্বাহের সময়ে জলের মধ্যে মস্তক স্থাপন করিয়া শ্বাস প্রশ্বাসের নলটিকে জলের উপর উন্নমিত করিতে হয়। ইহাদিগকে আমাদের মত শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে হয় না। দ্বিতীয় নলটির মুখের নিকট অতি ক্ষুদ্র স্বচ্ছ চারিটি পাখনা থাকে। ইহা দ্বারা জল সঞ্চালিত করিয়া পোকাগুলি সন্তরণ করিতে পারে। মুখের কেশদাম ইহারা নিয়ত সঞ্চালন করিতে থাকে। ইহার ফলে জলে সামান্য স্রোত উৎপন্ন হয়। এই স্রোতে যে সকল কীটাণু ও উদ্ভিদাণু ভাসিয়া আসিয়া ইহাদিগের মুখগহ্বরে প্রবিষ্ট হয়, তদ্দ্বারা ইহারা উদরপূর্ত্তি করে।

এইরূপ অবস্থায় জীবনধারণকালে ইহারা অনেকবার গাত্রাবরণ পরিত্যাগ করে। তিন সপ্তাহ পরে শেষ আবরণ উন্মোচন করিয়া মশক-শিশু এক নূতন আকার ধারণ করে। এ আকারের সহিত পূর্ব্বতন আকারের আর কোন সৌসাদৃশ্য থাকে না। তখন আর সেই কেশগুচ্ছপরিশোভিত, নলদ্বয়-বিশিষ্ট-পাখ্না-সংযুক্ত লম্বদেহ নাই। তাহার পরিবর্ত্তে এক্ষণে ক্ষুদ্র গোলাবয়ব;

মস্তকের সহিত একটি লাঙ্গূল ভিন্ন আর কিছুই নাই। এই অবস্থায় মশক-শিশু আহার করে না। সর্প যেরূপ ভাবে আঁকা-বাঁকা হইয়া জলে সন্তরণ করে, সেইরূপ ইহারা আপনাদিগের শরীর কুঞ্চিত ও প্রসারিত করিয়া জলমধ্যে বেড়াইয়া বেড়ায়। নিশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য ঋষভ-কর্ণের ন্যায় দুইটি অঙ্গ চক্ষের নিকট বাহির হয়; তাহার অগ্রভাগ জলের উপর থাকে। প্রায় এক মাস এইরূপ নিরাহার থাকিয়া যখন মশকশিশুর অন্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবার সময় আইসে, তখন ইহারা মাথা তুলিয়া জলের উপরিভাগে শান্তভাবে লাঙ্গূল ছড়াইয়া শয়ন করে। ক্ষণকাল এই ভাবে থাকিতে থাকিতে মস্তকের উপর ঋষভকর্ণাকৃতি শ্বাস প্রশ্বাসের নলের মধ্যভাগের চর্ম্ম বিদীর্ণ হইয়া যায়। নিমেষের মধ্যে এই বিদারণ বর্দ্ধিত হয়। অমনি শরীরের অভ্যন্তর হইতে নবদূর্ব্বাদলশ্যাম মূর্ত্তি নয়নগোচর হয়। চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে এই শ্যাম মূর্ত্তি মস্তক উত্তোলন করে। পশ্চাদ্ভাগ পূর্ব্ব-দেহাবরণের মধ্যেই থাকিয়া যায়। এই সময় ইহাদিগকে মাস্তুল-বিশিষ্ট নৌকার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। পরিবর্ত্তনের এই অবস্থা মশকদিগের পক্ষে অতি কঠিন; এই নৌকায় জল প্রবেশ করিলে মশকের আর পরিত্রাণ নাই। যে মশকশিশু এত দিন জলচরজীবরূপে বাস করিত, জলে যাহারা এতকাল আহার, বিহার ও সন্তরণ করিত, এখন জলস্পর্শমাত্রে তাহারা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। বায়ুর ঈষৎ সঞ্চালনে, জলবিহারী জীবগণের গতি বা পার্শ্বপরিবর্ত্তনে যে সামান্য জলতরঙ্গ উত্থিত হয়, তাহার এক একটির জন্য সহস্র সহস্র মশক-কুমার-কুমারীর জীবনলীলা সাঙ্গ হইয়া যায়। যাহাদিগের এরূপ কোন বিঘ্ন না ঘটে, তাহারা কিছু ক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া আপনাদিগের লাঙ্গূল নৌকা হইতে বিমুক্ত করিয়া লইয়া, জলের উপর একবার বসিয়া, রৌদ্রে পক্ষদ্বয় শুষ্ক করিয়া লয়। জল ইহাদিগের ভার সহ্য করিতে পারে, এবং সম্ভবতঃ ইহাদিগের গাত্রে তৈলাক্ত কোন পদার্থ থাকে; তাই ডুবিয়া যায় না। পলকের মধ্যে ইহাদিগের গাত্র শুকাইয়া উঠে; অমনি পোঁ শব্দে জল হইতে উড়িয়া বায়ুমণ্ডল মুখরিত করে।

মশক শব্দ করে। এ শব্দ ইহার পক্ষসঞ্চালনজনিত; মুখের নহে। ইহাদিগের জিহ্বা নাই। সুতরাং ইহাদিগের মুখ দ্বারা শব্দ করিবার সামর্থ্যও নাই। কেবল মশক বলিয়া নহে, কোন পতঙ্গই কথা কহিতে পারে না। ভ্রমরের গুণ্ গুণ্ ও ঝিল্লীর রবও মুখনিঃসৃত নহে।

অণুবীক্ষণ দ্বারা দেখিলে মশককে অতিশয় সুন্দর দেখায়। ইহার সর্ব্ব-শরীর লম্বা লম্বা চতুষ্কোণ আঁইসের দ্বারা আবৃত। মস্তকের উপর দুইটি বড় বড় চক্ষু; যেন জাল দিয়া আবৃত। নয়নের পার্শ্ব দিয়া, সম্মুখভাগে অতিশয় মনোরম চারিটি শৃঙ্গ বাহির হইয়াছে। আমাদের লেখনী পক্ষিপুচ্ছের দুই পার্শ্ব দিয়া যেমন পালক সকল ধারাবাহিকরূপে বাহির হইয়াছে, সেইরূপ এই সকল শৃঙ্গের দুই পার্শ্বে অতিশয় মনোরম কেশদাম পরিপাটীরূপে সজ্জিত। এই শৃঙ্গচতুষ্টয়ের মধ্যদেশে আমাদিগের শোণিতগ্রহণকারী শুণ্ড প্রসারিত।

শুণ্ডকে মশকের অস্ত্র না বলিয়া আয়ুধত্রাণ বলাই সঙ্গত। কারণ, এই শুণ্ডের আমাদিগকে বিদ্ধ করিবার সামর্থ্য নাই। শুণ্ডের মধ্যে কতকগুলি ছুরিকাসদৃশ অস্ত্র আছে। মশক দংশন করিবার সময় শুণ্ডের অগ্রভাগস্থিত ছিদ্র দিয়া সেই সকল অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া আমাদিগকে বদ্ধ করে। হস্তী যেমন শুণ্ড দ্বারা জলপান করে, অর্থাৎ শুণ্ড জলপূর্ণ করিয়া তাহা আপন মুখবিবরে ঢালিয়া দেয়, সেরূপ না করিয়া, মশক এই শুণ্ডের সাহায্যে শোণিতশোষণ করিয়া একবারে আপন পাকস্থলীতে লইয়া যায়। ইহারা শোণিত পান করে, কোন কঠিন পদার্থ আহার করে না, এই জন্য অন্যান্য পতঙ্গের ন্যায় ইহাদিগের মুখবিবরে কঠিনপদার্থপেষণোপযোগী কোন অবয়ব নাই। ইহাদিগকে রোমন্থন করিতে হয় না; সুতরাং গবাদির ন্যায় কোন কোন পতঙ্গের গলদেশের অভ্যন্তরে রোমন্থনের পূর্ব্বে খাদ্য রাখিবার জন্য যে থলি থাকে, তাহা মশক ও অন্যান্য শোষক পতঙ্গগণের মধ্যে কাহারও নাই।

শুণ্ডের মধ্যে মশকের অস্ত্রের সংখ্যা কত, তাহা এ পর্য্যন্ত নিশ্চিতরূপে নির্ণীত হয় নাই। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ ছয়টি পর্য্যন্ত দেখিতে পাইয়াছেন। বস্তুতঃ, এই সকল অস্ত্র এতই সূক্ষ্ম ও একটির সহিত অপরটির এরূপ ভাবে সংস্থিতি যে, অতি উৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ লইয়া দেখিলেও ভাল বুঝিতে পারা যায় না। অস্ত্রচিকিৎসকের ল্যান্‌সেটের ন্যায় অবিকল মশকাস্ত্রের গঠন। এ গুলি এরূপ কৌশলে সজ্জিত যে, অস্ত্রগুচ্ছটি যেন একটি তরবারির সঙ্কীর্ণ প্রতিকৃতি। একটি তরবারির সহিত একটি সূক্ষ্মতম সূচীর আকারের যে তুলনা, সেই সূচীটির সহিত মশকের অস্ত্রগুচ্ছের আকারের সেই অনুপাত।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, এত ক্ষুদ্র অস্ত্রে বিদ্ধ হইয়া আমরা এত কষ্ট অনুভব করি কেন? ইহার কারণ এই যে, মশক আমাদিগকে বিদ্ধ করিয়া

কেবল যে আমাদের রক্তশোষণ করে, তাহা নহে; অতি স্বচ্ছ এক প্রকার বিষ বিদ্ধস্থানে ঢালিয়া দেয়। মশক আমাদের গাত্রে বসিয়া হুল ফুটাইয়া দিবামাত্র আমরা কষ্ট অনুভব করি না। ইহারা হুল বা শুণ্ডটির অগ্রভাগ আমাদিগের গাত্রে প্রবেশ করাইয়া দিয়া, উহাকে ধনুকাকারে পরিণত করিয়া বিষ প্রয়োগ করিলে, আমরা যাতনা পাইয়া থাকি। সম্ভবতঃ, এই বিষ আমাদিগের অনিষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রদত্ত হয় না; নরশোণিত মশকের উপযোগী করিবার নিমিত্ত, সহজপরিপাচ্য করিবার জন্যই উহার অস্তিত্ব। কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন কি না, জানি না; কিন্তু আমাদের এইরূপই বোধ হয়। এই বিষ আমাদিগের শরীরে প্রবেশ করিলে দষ্ট স্থান ফুলিয়া উঠে। মশকদংশনের অব্যবহিত পরে দষ্ট স্থানে শীতল বারি প্রক্ষেপ করিলে, এই বিষের উগ্রতা কমিয়া যায়। তৈলসিক্ত অঙ্গে মশক বড় দংশন করে না। ধূমে ইহাদিগের শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট হয়; এই জন্য ইহারা ধূমময় স্থানে বাস করিতে পারে না।

আমাদিগের দেশে চারি পাঁচ প্রকারের মশক দেখিতে পাওয়া যায়। "ডাঁশ" নামক এক প্রকার মশক আছে; ইহারা বড় বড়; আমাদিগের গৃহপালিত পশুর শোণিত পান করে। তাহাদিগের দ্বারা দষ্ট অঙ্গে আবার কোন কোন জাতীর পতঙ্গ ডিম্ব প্রসব করিয়া যায়। সেই সকল ডিম্ব হইতে পতঙ্গশাবক উৎপন্ন হইয়া পশুগণকে বড়ই কষ্ট দিয়া থাকে। কখন কখন ইহাতে তাহাদের প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া থাকে। আর এক প্রকার মশক আছে,—তাহারা সাধারণ মশক অপেক্ষা ক্ষুদ্র। ইহাদিগের নাম "ওয়ানী"। ইহারা বর্ষাকালে সময়ে সময়ে দলে দলে প্রাদুর্ভূত হয়। অতি ক্ষুদ্র আর এক প্রকার মশক উত্তরবঙ্গের নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের বিষ বড়ই তীব্র। ইহাদিগের উৎপাত হইতে আত্মরক্ষার পক্ষে সাধারণ নেটের মশারি নিতান্ত অকর্ম্মণ্য। নেপাল তরাই ও ভুটান দুয়ারের নিবিড় শাল, শিশু, শিরীষ, ওদলা অরণ্যে কখন কখন এক এক দল ধূসরবর্ণ মশা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের দংশনে শরীরে অতিশয় প্রদাহ উপস্থিত হয়। অধিকসংখ্যক মশক দংশন করিলে সন্তাপে জ্বর হয়। মেচ জাতি এইরূপে দষ্ট হইলে অরণ্যজাত ওষধির প্রলেপ দিয়া থাকে; শুনিয়াছি, আপাঙের মূলও উপকারী।

দেবতার দান।

"বাছা সকল, ঘুমাও।"

কথাটা ঠাকুরমার মুখ হইতে বাহির হইতে না হইতে পাঁচ সাতটা ক্ষুদ্র, পুষ্ট, কুসুমসুকুমার দেহ—কোনটা নড়িল, কোনটা পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল, কোনটা উঠিয়া বসিল; পাঁচ সাতটা নবীন, কোমল, দেবোপম্ কণ্ঠ, সুনীল আকাশে শরতের মেঘধ্বনির ন্যায়, গর্জ্জন করিল,—"না, আমরা ঘুমাব না।"

"কেন ঘুমাবি না, রাত হয়েছে যে!"

"তুই রূপ-কথা বল্; নৈলে তোর হরিনামের ঝুলি চুরি করব।"

ঠাকুরমা জানিতেন, ছেলেগুলি বড় দস্যি; এদের পারিবার যো নাই; হরিনামের ঝুলি চুরি যাওয়া সর্ব্বনাশের কথা। তার চেয়ে একটা রূপ-কথা বলা ভাল। ঠাকুরমা বলিলেন,—"তোদের বাপ খুড়োরা ত এমন দস্যি ছিল না; তোরা এমন হলি কেন?"

ছেলেরা ভ্রূকুটি করিল। প্রস্ফুটোন্মুখ কুসুম যদি ভ্রূকুটি করিতে জানিত, সে ভ্রূকুটি বুঝি এমনই হইত। বলিল,—"তা হই হই। তুই রূপ-কথা বল্‌বি ত বল্, নৈলে হরিনামের ঝুলিকে এখনি বিসর্জ্জন দিব।"

"হতভাগারা! এই বুঝি বুদ্ধি হচ্ছে! আচ্ছা, একটা গল্প বল্‌ছি। তোরা ঘুমিয়ে পড়্‌বি না ত?"

"না। আমরা শুন্‌ব।"

"তবে শোন্। আমার যেমন কপাল! ছোঁড়াদের জন্যে আমার ইহ-কাল পরকাল সব নষ্ট হবে।"

দেখেছিস্ ত, আমাদের গ্রামের ওধারে যে একটা বড় বট গাছ আছে, সেইখানে এক গণেশের মন্দির ছিল। সেই মন্দিরের দুয়ারে এক সন্ন্যাসী বসিয়া থাকিত, এবং অন্য লোক দেখিলে "শিব, শিব!" বলিত। সন্ন্যাসী বটে, কিন্তু একটি সেবাদাসীও ছিল। সন্ন্যাসী লোক দেখিলে "শিব, শিব" করে বটে, কিন্তু এত শিব-নাম করিয়াও দুই চারি মুঠা আতপ চাউল, আর দুই চারিটা কাঁচা কলা ছাড়া আর কোন লাভ প্রায় তাহার হয় না।

মধ্যে মধ্যে দুই একটা পয়সাও পায়; কিন্তু সে কদাচিৎ। সন্ন্যাসী বড় মনোদুঃখেই থাকে। সন্ন্যাসীর মনোদুঃখই হউক, আর যাহাই হউক্, সেবা-দাসী ত ছাড়িবার নহে। সে দিন রাত পীড়াপীড়ি করে। বোবার শত্রু নাই মনে করিয়া সন্ন্যাসী চুপ্ করিয়া সবই সহ্য করে। এইরূপে দিন যায়।

এক দিন ঝন্‌ঝনে দুই প্রহর বেলায় শিব দুর্গা সেইখানে বেড়াইতে আসিয়াছেন। মন্দিরদ্বারে সন্ন্যাসীকে দেখিয়া ভগবতী সবই জ্ঞানচক্ষে দেখিলেন। বলিলেন,—"হে দেবেশ! আজ কাল্ শুনিতে পাই, মানুষে আর দেবতাকে শ্রদ্ধা করে না। এত দিন মনে করিতাম, মানুষেরই দোষ। এখন দেখিতেছি, দোষ দেবতাদেরই।"

মহাদেব বলিলেন,—"তুমি আদ্যাশক্তি বলিয়া সব কথা জোর করিয়া কও। দেবতার কি দোষ দেখিলে, বল দেখি।"

ভগবতী বলিলেন,—"দেবতাদের কথা ছাড়িয়া দাও। তুমি ত দেবতারও দেবতা; তোমারই দেবত্ব দেখ না কেন?"

মহাদেব বলিলেন,—"কেন, আমার আবার তুমি কি দেখিলে যে শক্তি-গিরি প্রকাশ কর্‌ছ।"

পার্ব্বতী রাগ করিয়া বলিলেন,—"তোমার চোখ নাই, তাই কিছুই দেখিতে পাও না। দেখিবেই বা কেমন করিয়া। তিনটাই হউক, আর দশটাই হউক, সারা দিন রাত নেশায় থাকিলে কি আর চক্ষু থাকে!"

মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"কি হইয়াছে, বল।"

পার্ব্বতী বলিলেন,—"ভোলা মহেশ্বর, তোমার ত কিছুতেই মনোযোগ হয় না। এই লোকটা যে এত দিন ধরিয়া তোমার নাম করিতেছে, অথচ এমন দীন দরিদ্র,—এ তোমার সাধনা করিয়া কি ফল পাইল? তোমরা এমন নিষ্ঠুর হইলে লোকে আর তোমাদের সেবা করিবে কেন? মর্ত্ত্যলোকে দেবপূজার যে লোপ হইতেছে, তাহা ঠিকই হইতেছে।"

মহাদেব বড় লজ্জিত হইলেন। বলিলেন,—"আচ্ছা, আজই ইহার ব্যবস্থা করিতেছি।"

শিব দুর্গা উভয়েই গিয়া গণেশের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। গণেশ উঠিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলে মহাদেব বলিলেন,—"দেখ বাপু গণপতি, তোমার মন্দিরের দ্বারে ঐ যে ভিক্ষুক বসিয়া থাকে, ও ব্যক্তি বড় গরিব। উহার জন্য তোমাকে কিছু করিতে হইবে।"

গণেশ বলিলেন,—"লোকটা ভাল নহে। ভিক্ষাজীবী, অথচ একটা সেবাদাসী রাখিয়াছে।"

মহাদেব বলিলেন,—"ও ত মানুষ; দেবতাদেরই কি বিনা সঙ্গিনীতে চলে! তা, রাখিলেই বা সেবাদাসী; সর্ব্বদা আমার নাম করে ত।"

তখন গণেশ যুক্তকরে বলিলেন,—"যে আজ্ঞা; আপনার যখন ইচ্ছা হইয়াছে, তখন সেই রূপই কার্য্য হইবে। সাত দিনের মধ্যে উহাকে লক্ষ টাকা দেওয়াইব।"

অদৃষ্ট এড়াইবার যো নাই। এক সুদখোর বণিক সেই মন্দিরের নিকটে সেই সময়ে বেড়াইতেছিল। মহাদেব ও গণপতির এই কথাবার্ত্তা শুনিয়া সে মনে করিল, এ একটা দাঁও বটে।

অণুমাত্র বিলম্ব না করিয়া সে গিয়া সন্ন্যাসীর নিকট উপস্থিত হইল। অতি ভক্তিভরে—লাভের প্রত্যাশায় যে ভক্তির মাত্রা অসম্ভব বৃদ্ধি পায়, তাহা সচরাচরই দেখা যায়—অতি ভক্তিভরে সে সন্ন্যাসীর চরণে প্রণিপাত করিয়া যুক্তকরে অবস্থিত রহিল।

সন্ন্যাসী ভাবিল, এমন ভক্ত বুঝি আর হয় না। সন্ন্যাসী বলিল, "তোমাকে বড়ই ধার্ম্মিক দেখিতেছি। আমার নিকট কি প্রয়োজন?"

বণিক বলিল, "আপনার ন্যায় সাধু জগতে দুর্ল্লভ; তাই আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিতে আসিয়াছি।"

এত ভক্তি তাহার সন্ন্যাসি-জীবনে সে কখন পায় নাই। সুতরাং গলিয়া জলের অধিক হইয়া বলিল, "তোমার মতন ধার্ম্মিক ভক্তের অবশ্যই মঙ্গল হইবে; আশীর্ব্বাদ করিতেছি।"

বণিক বলিল, "প্রভো, ভক্তের ধৃষ্টতা যদি মার্জ্জনা করেন, তাহা হইলে একটি নিবেদন করিতে সাহস পাই।"

সাধু বলিলেন, "তোমার যাহা ইচ্ছা, জিজ্ঞাসা করিতে পার। তোমাকে অভয় দিতেছি।"

বণিক বলিল, "প্রভো, আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, আপনার সংসার-যাত্রার সুবিধা হয় কি? এইখানে বসিয়া আপনি দিনান্তে কত পাইয়া থাকেন?"

সন্ন্যাসী বলিল, "পাই আর ছাই! যাহা পাই, তাহাতে দিন চলে না। দুই চারিটা পটোল, বেগুন, মূলা, আর দুই চারিটা চাউল—আর কি পাইব? কখন কেহ এক আধটা পয়সা দেয়।"

বণিক সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া যুক্তকরে নিবেদন করিল, "আপনি যে ক্লেশ পান, এটা আমাদের অসহ্য। একবার অদৃষ্ট পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন?"

সন্ন্যাসী বলিল, "কিরূপে?"

বণিক নিবেদন করিল, "আপনার অদৃষ্টে কিছু হয় না; আমার অদৃষ্টে কিছু হয়, তাহা জানেন। আমি বলি কি, আজি হইতে সাত দিনের মধ্যে আপনি যাহা কিছু পাইবেন, তাহা আমাকে দিবেন। তৎপরিবর্ত্তে আমি আপনাকে এখনই এক শত টাকা দিতেছি। কেবল অদৃষ্ট-পরীক্ষা।"

সন্ন্যাসী এক শত টাকার কথায় রাজি হইতে তখনই উদ্যত; কিন্তু সেবাদাসীকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন গুরুতর কাজ করা যে নিরাপদ নহে, তাহা বিলক্ষণ জানিত, তাই বলিল, "আচ্ছা বিবেচনা করিয়া বলিব। তুমি কাল প্রাতঃকালে আসিও।"

রাত্রে কথাটা সেবাদাসীর কাছে উপস্থিত করায়, সে চোখ ঘুরাইয়া বলিল, "পুরুষ জাতি যে বোকা, তা জানি; কিন্তু তোমার মতন এত বোকা, তা জানিতাম না। লাভের প্রত্যাশা না থাকিলে বেণে কি কখন টাকা বাহির করিতে যায়? তোমায় কিছু করিতে হইবে না; কাল প্রাতে আমি উপস্থিত থাকিব। যাহা বলিতে হয়, আমি বলিব।"

পরদিন প্রাতে গণেশের মন্দিরের দ্বারে সন্ন্যাসী বসিয়া এবং সাক্ষাৎ সেবাদাসী দাঁড়াইয়া। বণিক আসিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া বলিল, "প্রভুর বিবেচনা স্থির হইয়াছে ত?"

সন্ন্যাসীকে উত্তর করিতে হইল না। শ্রীমতী সেবাদাসী বলিল, "হইয়াছে। এক শত টাকায় কিছু হইবে না।"

বণিক দেখিল, বড় গোল। কিন্তু লক্ষ টাকার লোভ সম্বরণ করাও ত সহজ নহে, বণিকের পক্ষে ত একেবারেই নহে। সে ভাবিল; ক্রমে এক শত হইতে পাঁচ শত, পাঁচ শত হইতে হাজার, হাজার হইতে দশ হাজার, শেষে পঞ্চাশ হাজার পর্য্যন্ত উঠিল।

সেবাদাসী রাজি হইয়া বলিল, "টাকা কিন্তু এখনই চাই।"

বণিক স্বীকার করিল।

কিছুকাল পরে ছালায় ছালায়, বস্তায় বস্তায়, গাড়ীতে গাড়ীতে, টাকা আসিয়া পৌছিল।

ষষ্ঠ দিন কাটিয়া গেল, বণিক ভাবিয়া অবসান। সপ্তম দিন দ্বিপ্রহরে

প্রাণের দায়ে বণিক গিয়া মন্দিরদ্বারে উপস্থিত,—এমন সময় দেখিল, হর-পার্ব্বতী আসিতেছেন। হরপার্ব্বতী গিয়া গণেশের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। দেবতাদের কি কথা হয় শুনিবার জন্য হতভাগ্য বণিক গিয়া মন্দিরের দ্বারে কর্ণসংযোগ করিল। যেমন দ্বারে কর্ণসংযোগ করা, অমনি কাণটি দুয়ারে আটকাইয়া গেল।

মন্দিরের ভিতরে মহাদেব বলিলেন, "বাপু গণেশ, তুমি সেই দুঃখীর জন্য কি করিয়াছ?"

গণেশ বলিলেন, "আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছি। লক্ষ টাকা দেওয়াইব বলিয়াছিলাম, তাহার পঞ্চাশ হাজার টাকা সে পাইয়াছে। বাকি পঞ্চাশ হাজার যাহাকে দিতে হইবে, তাহার কাণ চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়াছি।"

ছেলেগুলি হাসিয়া কুটি কুটি। বলিল, "কর্ত্তা মা, বেণেকে কি আর পঞ্চাশ হাজার দিতে হইল?"

"তা আর হবে না। দেবতায় কাণ চাপিয়া ধরিলে টাকা না দিয়া কি রক্ষা আছে! বাছা সকল এখন ঘুমাও।"

বাছারা বলিল, "তুই আর একটা কিছু বল।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "আজ রাত হয়েছে, তোমরা ঘুমাও। আর এক দিন বলিব।"

শ্রীযোগমায়া দেবী।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

ব্রাউনিং-পত্নীর পত্রাবলী।

উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে ব্রাউনিং দম্পতীর স্থান বড় উচ্চে। পতিপত্নী উভয়েই এরূপ যশস্বী, এমন দৃষ্টান্ত সকল দেশের সাহিত্যেই বিরল। ব্রাউনিংএর কবিতা স্থানে স্থানে এত জটিল যে, দুর্ব্বোধপ্রায় বোধ হয়; সেই জন্য কবিকে Fit audience though few লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছিল। এ কথা বলাই বাহুল্য যে, কবির উপাসক-বৃন্দ উপাসিতের শেষ পুস্তকগুলিকেও তাঁহার পূর্ব্বরচিত রচনার সহিত সমান সম্মান দেখাইতেন, কিন্তু ব্রাউনিংএর প্রথমরচিত রচনা সকলই তাঁহার যশোলাভের সোপান; শেষ কবিতাগুলি বড়ই জটিল। এই প্রসঙ্গে আমরা একটি হাস্যোদ্দীপক বর্ণনার কথা বলিব। বেসাণ্ট ও রাইসের Golden butterfly নামক উপন্যাসের নায়ক একবার ব্রাউনিং পাঠ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; দশ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পড়িয়া তিনি দেখিলেন যে, কিছুই বুঝিতে

পারেন নাই; তিনি আবার প্রথম হইতে আরম্ভ করিলেন—ফল সমানই হইল,—কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। বহুবার চেষ্টা করিয়া গলদঘর্ম্ম হইয়া পরিশেষে তিনি ব্রাউনিংএর গ্রন্থ সকল অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। সে সকল পুস্তক ভস্মসাৎ করিয়া তবে তাঁহার আক্রোশ মিটিয়াছিল। কেহ কেহ মনে করেন, কবিতা যতই অস্পষ্ট, যতই দুর্ব্বোধ হয়, তাহার ভাব ততই গভীর হয়—সে কবিতা ততই প্রশংসনীয়। ব্রাউনিংএর অন্ধ উপাসক-দিগের মধ্যে অনেকে এই দলের।

পতি ও পত্নী।

পতির রচনায় যে অস্পষ্টতা, যে জটিলতা ছিল, পত্নীর রচনায় তাহা ছিল না; তাঁহার কবিতা সরল, প্রাণস্পর্শিনী—তাহা নির্ঝরমুক্ত বারিরাশির মত স্বত-উচ্ছ্বসিত হইত;—তাঁহার কবিতার উৎস হইতে মধুর কবিতা আপনি প্রবাহিত হইত। টেনিসনের কথায় তাঁহার আপনার কথা বলা যাইতে পারে,—

"I do but sing because I must,
And pipe but as the linnets sing."

পতির কবিতায় চরিত্রবিশ্লেষণ, মানবচরিত্রের জ্ঞান, সূক্ষ্ম দর্শন ও স্বভাবপ্রিয়তা দৃষ্ট হইত; তাঁহার কবিতা সকল যেন

"———Like Nature, half reveal
And half conceal the Soul within."

উৎকৃষ্ট কবিতা স্বচ্ছ স্রোতস্বতীর সহিত উপমেয়—তাহা স্বচ্ছ হইবে, এবং একটু মনোযোগ দিয়া দেখিলেই তাহার অন্তর পর্য্যন্ত দেখা যাইবে। পতির কবিতা এরূপ ছিল না—পত্নীর কবিতা এইরূপ স্বচ্ছ ছিল।

১৮০৯ খৃষ্টাব্দে কুমারী এলিজাবেথ ব্যারেটের জন্ম হয়; ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে কবি ব্রাউনিংএর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়; ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ব্রাউনিং-পত্নীর মৃত্যু হয়।

সম্প্রতি ব্রাউনিং-পত্নীর পত্র সকল প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল পত্র হইতে আমরা তাঁহার পারিবারিক জীবনের সুখ দুঃখের কথা জানিতে পাই। কবি ব্রাউনিং-পত্নীর কথা ইহাতে নাই। কিন্তু রমণী ব্রাউনিং-পত্নীর কথায় ইহা পূর্ণ। তাঁহার কবিতার উপাসক অনেক;—এখন তাঁহার রমণীচরিত্রের উপাসকের অভাব হইবে না। কারণ, এই সকল পত্রে আমরা দেখিতে পাই যে, ব্রাউনিং-পত্নী ভক্তিময়ী দুহিতা, পতিপ্রাণা পত্নী ও স্নেহময়ী জননী ছিলেন।

আজ কাল অনেক যুরোপীয় মহিলা, বিবাহপ্রথা ঘৃণিত, এই জঘন্য মতের পৃষ্ঠপোষক। এই সকল ভ্রান্ত মতের উপাসিকা মহিলাদিগের প্রভাবে গত কয় বৎসর হইতে ইংরাজী সাহিত্য কলুষিত হইতেছে; বিগত কয় বৎসর মধ্যে প্রকাশিত বহু পুস্তক ধর্ম্মযাজকগণ কর্ত্তৃক প্রকাশ্যভাবে নিন্দিত হইয়াছে। ব্রাউনিং-পত্নীর জীবনের ইতিহাস পাঠ করিয়া এই সকল "নরনারী"র লজ্জিত হওয়া উচিত।

তাঁহার বিবাহিত জীবন নিরবচ্ছিন্ন সুখের ইতিহাস; জননী হওয়া তিনি দুর্ভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন না। যখন তিনি ভগ্নদেহে, ক্রমেই নিরাশার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছিলেন, তখন ব্রাউনিংএর প্রেম কেমন করিয়া তাঁহার জীবনে নবসুখ ও অন্ধকার হৃদয়ে আশার নবীন আলোক আনয়ন করিয়াছিল, সে কথা তিনি তাঁহার কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন।

কবির সহিত পরিচয়।

কবির সহিত পরিচয় ও প্রেমবন্ধনের কথা তিনি তাঁহার কোন বান্ধবীকে লিখিয়াছিলেন;—বিবাহের দুই বৎসর পূর্ব্বে ব্রাউনিংএর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তৎপূর্ব্বেই উভয়ের পরিচিত এক বন্ধু তাঁহাদিগের পরিচয় করাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু কুমারী ব্যারেট তখন আর কোন অপরিচিতের সহিত পরিচিত হইবার ইচ্ছা করেন নাই। তাহার পর কুমারী

ব্যারেটের একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইল ;—কবি তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিলেন। সেই সময় হইতে উভয়ের মধ্যে পত্রের আদান প্রদান চলিতে লাগিল। কবির পত্র সকল বড় মধুর, বড় সুন্দর। কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে কুমারী ব্রাউনিংএর বড় ইচ্ছা ছিল না, তথাপি তাঁহার কবির সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা হইল। কবি প্রেমের কথা প্রকাশ করিলে, তিনি বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার পক্ষে বিবাহ করা অসম্ভব ; কবি যদি পুনরায় এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন, তবে তাঁহাকে কবির সহিত সাক্ষাৎ করা বন্ধ করিতে হইবে। এই কথা শুনিয়া কবি কিছু দিন আর সে কথা উত্থাপিত করেন নাই কিন্তু এই সময়ের মধ্যে কবি তাঁহার সহিত অনেকবার সাক্ষাৎ করেন ও তাঁহাকে বহু পত্র লেখেন—কবির কথায় ও পত্রে তিনি একটা জিনিস লক্ষ্য করিতেন—তাহা বিশ্লেষণ করা অসম্ভব ; কিন্তু বুঝিতে না পারাও সম্ভব নহে। তাঁহার পর কবি আবার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন।

বিবাহের প্রস্তাব।

কুমারী ব্যারেট তাঁহাকে স্পষ্টই বলিলেন যে, তিনি আপনার প্রেমরাশি ভস্মে নিক্ষেপ করিতে যাইতেছিলেন। তিনি বুঝাইয়া বলিলেন যে, যৌবনমাধুরী বা প্রফুল্লতা কিছুই তাঁহার নাই, এ অবস্থায় কবির পক্ষে তাঁহাকে বিবাহ করা দুর্ভাগ্যমাত্র। কবি বলিলেন,—ভালই হউক আর মন্দই হউক, তিনি তাঁহাকে ভাল বাসেন, এবং এ প্রেম জীবন থাকিতে যাইবার নহে ; তিনি আরও বলিলেন যে, প্রথম যৌবনের মাধুরী তাঁহারও নাই—তিনি জগতে অনেক দেখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও ভালবাসেন নাই। তিনি বেশ জানিতেন যে, কুমারী ব্যারেট তাঁহাকে বিবাহ না করিলেও তিনি তাঁহাকেই ভালবাসিবেন ; তবে বিবাহে তাঁহার অনিচ্ছা থাকিলে সে কথা তুলিয়া তাঁহাকে আর বিরক্ত করিবেন না—তাঁহার মত হইলে কবি বিংশতি বৎসর অপেক্ষা করিবেন ; তখন হয় ত কুমারী ব্যারেট বুঝিবেন—কবির কথায় তিনি বিশ্বাস করিতে পারিবেন। বলা বাহুল্য, ইহার পর কবিকে বিবাহ করিতে কুমারী ব্যারেটের আর আপত্তি রহিল না। যাঁহারা বলিবেন, প্রেম অন্ধ—এই প্রেমই কবিকে তাঁহার প্রেমিকার দোষ দেখিতে দেয় নাই, তাঁহারা মনে রাখিবেন, কবি স্বয়ং বলিয়াছেন—প্রেম অন্ধ নহে ; লোকে বলে ঘৃণায় ঘৃণিতের সকল দোষ চক্ষে পড়ে—তাহা নহে ; প্রেমে প্রেমিকের সকল ত্রুটি যেরূপ চক্ষে পড়ে, ঘৃণায় সেরূপ কখনই হইতে পারে না।

পিতা ও কন্যা।

কুমারী ব্যারেটের পিতা তাঁহার সন্তানদিগের বিবাহের বিরোধী ছিলেন। সন্তানদিগের মধ্যে যিনি যখন বিবাহ করিতেন, তাঁহার সহিত তখন হইতে পিতার সম্বন্ধ শেষ হইত ; পিতা আর তাঁহার নামও সহ্য করিতে পারিতেন না। বিবাহ-হেতু পিতার সহিত এই অসদ্ভাবে কুমারী ব্যারেট বড়ই দুঃখিতা হইয়াছিলেন। তিনি পিতাকে বড়ই ভালবাসিতেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বিপদে সাহসের জন্য তিনি পিতাকে বড় ভালবাসিতেন। অনেক মহিলা সবল পুরুষদিগকে ভক্তি করিয়া থাকেন—কুমারী ব্যারেট সেই দলের ছিলেন। পিতার একটি কোমল কথায়, একটি স্নেহের দৃষ্টিতে, কন্যার কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত ; পীড়ার সময় সোপানশ্রেণীতে তাঁহার পদশব্দ শুনিলে কন্যার দেহে রক্তস্রোত চঞ্চল হইয়া উঠিত ; কন্যা পিতাকে এমনই ভালবাসিতেন। কিন্তু বিবাহের পর হইতেই পিতা কন্যার উপর বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। কন্যা পিতাকে অনেকবার পত্র লিখিয়াছিলেন। বিবাহের পাঁচ বৎসর পরে কন্যার একখানি পত্র পাইয়া পিতা তদুত্তরে একখানি অত্যন্ত কঠিন পত্র লেখেন ও তাঁহার পূর্ব্বপ্রেরিত সকল পত্র ফিরাইয়া দেন—তিনি সে সকল পত্র খুলেনও নাই!

বিবাহ।

বিবাহে কিছুতেই মিষ্টার ব্যারেটের মত হইবে না জানিয়া, প্রেমিক প্রেমিকা তাঁহার অজ্ঞাতে বিবাহ করিবেন, স্থির করেন। ইহার জন্য কেহই দুঃখিত হয়েন নাই। একটা গির্জ্জায় দুই জন সাক্ষীর সম্মুখে বিবাহ হয়।

বিবাহের দিন মিস্ ব্যারেটকে দেখিয়া বোধ হইয়াছিল, যেন কে তাঁহাকে শ্মশান হইতে তুলিয়া আনিয়াছে।

বিবাহান্তে।

বিবাহের পরেই ব্রাউনিং-পত্নী বুঝিতে পারিলেন, অসাধারণ প্রতিভা ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যই তাঁহার পতির সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ গুণ নহে, তাঁহার নৈতিক চরিত্র অতি মহৎ ; তাঁহার প্রেমের—"নাই সীমা আগে পাছে, যত চাও তত আছে।" থ্যাকারে এক স্থানে পরিহাসচ্ছলে প্রেমকে "মটন চপের" তুল্য বলিয়াছেন,—তাহা বড় শীঘ্র জুড়াইয়া যায়। কবির প্রেম সেরূপ ক্ষণস্থায়ী ছিল না, তাহা পবিত্র, স্থির, অচঞ্চল। যে প্রেম সম্বন্ধে কবি সাদে বলিয়াছেন,—"From heaven it comes to heaven returneth", কবির প্রেম সেইরূপ। ব্রাউনিং-পত্নী বলিয়াছেন, তাঁহার স্বামীর কোথাও যেন কোন অসম্পূর্ণতা ছিল না—তবে তিনি ভাবিয়া পাইতেন না, কেন ব্রাউনিং তাঁহার মত অনুপযুক্ত পাত্রে আপনার প্রেম অর্পণ করিয়াছিলেন! বিবাহের পাঁচ বৎসর পরে ব্রাউনিং-পত্নী লিখিয়াছেন, এ বিবাহ করাতে দুঃখিত হওয়া দূরে থাকুক, এই বিবাহ তাঁহার জীবনের সুখ ও সম্মানের কারণ হইয়াছে।—তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার পতি তাঁহার পক্ষে একাধারে পতি, প্রেমিক ও শুশ্রূষাকারী।

পতির এইরূপ প্রেম পাইয়াছিলেন বলিয়াই রুগ্নদেহে সংসারের নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও তাঁহার কবিতা স্বচ্ছ স্রোতস্বতীর মত সদা প্রবহমানা ছিল। তাঁহার পত্র সকল পাঠ করিয়া তাঁহার উপর অনেকের শ্রদ্ধা আরও বর্দ্ধিত হইবে, সন্দেহ নাই ; কারণ, এই সকল পত্র হইতে আমরা বুঝিতে পারি, সংসারের সংঘর্ষে ব্রাউনিং-পত্নীর হৃদয়ের নারীসুলভ কোমলতা বিনষ্ট হইয়া যায় নাই। পূর্ব্বে তাঁহার কবিতা পাঠ করিয়া অনেকে তাঁহার প্রশংসা করিতেন ; এখন তাঁহার পত্র সকল পাঠ করিয়া আরও অনেকে তাঁহার প্রশংসা করিবেন, সন্দেহ নাই।

ভ্রমণবৃত্তান্ত।

ভারতবর্ষে।

"মার্কটোয়েন" আখ্যাধারী সুপ্রসিদ্ধ পরিহাসরসিক মিষ্টার ক্লেমেন্সের কথা আমরা পূর্ব্বে কিছু বলিয়াছি। * অল্প দিন পূর্ব্বে তিনি দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন ; ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন নগরেও তিনি বক্তৃতা করিয়াছিলেন ; সম্প্রতি তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। এ কথা বলাই বাহুল্য যে, পরিহাসরসিকের পুস্তকে হাস্যরসের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়। লেখক আপনি বলিয়াছেন বর্ত্তমান পুস্তকে তিনি ভিন্ন ভিন্ন স্থান সম্বন্ধে তাঁহার ধারণামাত্র প্রদান করিয়াছেন—খুঁটী নাটি লইয়া ব্যাপৃত হয়েন নাই ; বাস্তবিক, যখন তিনি ইচ্ছা করিয়া খুঁটিনাটি লইয়া ব্যাপৃত হয়েন, তখন ভিন্ন খুঁটিনাটিতে তাঁহার বড় সুবিধাও হয় না। তদ্ভিন্ন তিনি পাঠককে প্রত্যেক বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ প্রদান করিতে বাধ্যও নহেন। পাঠককে আনন্দপ্রদান করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ; তবে যদি তাঁহার রচনা পাঠ করিয়া পাঠকের কোন শিক্ষালাভ হয়, সেটা পাঠকের "উপরি"-লাভ। যাহা হউক, পাঠকের এই "উপরি"লাভও বড় অল্প হয় নাই। আমরা নিম্নে লেখকের ভারতভ্রমণের বিবরণ হইতে দুই স্থানের বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ; পাঠক ইহাতে পাওনা ও "উপরি"-পাওনা, উভয়ই দেখিতে পাইবেন।

* ১৩০৩ সালের আশ্বিন সংখ্যায় "সহযোগী" দ্রষ্টব্য।

ভ্রমণের পর দিল্লীতে লেখক বিশ্রাম করেন; যে গৃহে তিনি অবস্থান করিতেন, সেটা ঐতিহাসিক গৃহ। সে গৃহে একজন ইংরাজের ছিল—গৃহবাসী প্রাচ্যপ্রভাবে পরিশেষে প্রাচ্যদেশের মত শুদ্ধান্ত পর্য্যন্ত রাখিয়াছিলেন। তিনি বড় উদারপ্রকৃতির লোক ছিলেন—অবরোধবাসিনীদিগের জন্য একটা মস্‌জিদ্ ও নিজের জন্য একটা গির্জ্জা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন; যে দিক দিয়াই হউক, তাঁহার একটা সদ্গতি হইবে। সিপাহি-বিদ্রোহের সময় এই গৃহে ইংরাজ সেনাপতির আড্ডো ছিল। প্রাচ্য ধরণে সজ্জিত উদ্যানের মধ্যে গৃহ অবস্থিত—উদ্যানের বহুশাখাপ্রশাখাশালী পাদপে বহু শাখামৃগ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। এই সকল শাখামৃগ বড় কৌতূহলশালী—ভয় তাহাদিগের বড় একটা নাই। সুবিধা পাইলেই তাহারা গৃহের কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হয়—ও দ্রব্যাদি লইয়া পলায়ন করে। এক দিন প্রাতঃকালে গৃহস্বামী স্নানাগারে ছিলেন—স্নানাগারের বাতায়ন মুক্ত ছিল। নিকটেই একটা পাত্রে খানিকটা হরিদ্রা রং ও একটা তুলি ছিল। বাতায়নসম্মুখে কতকগুলা বানর দেখিয়া তাহাদিগকে তাড়াইবার অভিপ্রায়ে গৃহস্বামী তাহাদিগের দিকে স্পঞ্জখানা ছুড়িয়া ফেলেন। কপিদল কিছুমাত্র ভীত না হইয়া লম্ফ দিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার গাত্রে রং দেয়; তিনি পলায়ন করেন। তাহার পর বিজয়ী বীরবৃন্দ সে কক্ষের দ্রব্যাদি ও কক্ষপ্রাচীর রং করিয়া পার্শ্বের কক্ষে আসিয়া রং করিতে আরম্ভ করিল। এমন সময় লোকজন আসিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়!

দিল্লীতে।

এই সকল বানর পরিহাসরসিকের সহিত রসিকতা করিয়া আপনাদিগের পরিহাসপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছিল। একদিন লেখকের কক্ষের একটা বাতায়ন মুক্ত ছিল;—প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গের পর লেখক দেখিলেন যে, সেই মুক্ত বাতায়নপথে দুইটা বানর তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে—একটা আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া চুল ব্রশ করিতেছে, আর একটা তাঁহার "নোট-বহি" লইয়া হাস্যোদ্দীপক রচনার এক পৃষ্ঠা পাঠ করিতেছে ও চীৎকার করিতেছে। যে ব্রশ লইয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে কিছু গোল ছিল না; কিন্তু যে "নোট-বহি" লইয়াছিল, তাহাকে তাড়াইবার জন্য লেখক তাহাকে কি একটা ছুড়িয়া মারিয়াছিলেন; তিনি বলেন—সেটা বড় অন্যায় হইয়াছিল।

বানর।

মার্কটোয়েনের মতে বোম্বাই সহরে দ্রষ্টব্য জিনিসের অভাব নাই। তিনি পার্সিদিগের মৌন মন্দিরের (Tower of Silence) যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, পরিহাসরসিকের পুস্তকপাঠে আনন্দ ব্যতীত শিক্ষাও লাভ করা যায়। পার্সিদের মৃতদেহ গৃধ্র কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া থাকে। মৌনমন্দিরগুলি প্রাচীরবেষ্টিত, ছাদবিহীন, একমাত্রদ্বারবিশিষ্ট। "মন্দিরের" ঠিক মধ্যভাগে একটি গভীর কূপ; অবশিষ্ট স্থান তিন ভাগে বিভক্ত; এক স্থানে শিশুদিগের, অন্য স্থানে স্ত্রীলোকদিগের, আর অপরত্র পুরুষদিগের মৃতদেহ রক্ষিত হয়। শববাহিগণ ভিতরে প্রবেশ করিয়া বসনমুক্ত শব নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া চলিয়া আইসে। তাহারা মন্দিরের বাহিরে আসিতে না আসিতে প্রাচীর হইতে শত শত গৃধ্র আসিয়া, মৃতদেহ ভক্ষণ করিয়া ফেলে—অস্থিরাশি মন্দিরের পাষাণনির্ম্মিত হর্ম্ম্যতলোপরি পড়িয়া থাকে; তাহার পর কিছু কাল পরে সেই অস্থিরাশি কুড়াইয়া কূপমধ্যে নিক্ষেপ করা হয়। ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, সাধু অসাধু, সকলের অস্থিরাশিই সেই একই কূপমধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়।

মার্কটোয়েন অবশ্য মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন নাই—শববাহকগণ ভিন্ন আর কেহই মন্দিরমধ্যে যাইতে পারে না। বাহির হইতে লেখক যাহা দেখিয়াছিলেন, তিনি তাহার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—নগরের কোলাহল হইতে দূরে—পত্রপুষ্পপূর্ণ বৃক্ষলতাবেষ্টিত উচ্চভূমিতে মৌনমন্দির অবস্থিত। তন্নিম্নে

মৌন-মন্দির।

আনতপত্রমুকুটশোভিত নারিকেল-তরুরাজির কুঞ্জ; তাহার পরেই জল-কোলাহলময়ী সুদূর-প্রসারিতা নগরী; তাহার পরে জলবেণীরম্য নীল জলরাশিবিস্তার,—সিন্ধু-বক্ষে কত তরণী আসিতেছে, যাইতেছে। সকলই যেন শব্দহীন গম্ভীরমূর্ত্তিতে বিরাজিত। মৌনমন্দিরের প্রাচীরে বৃত্তাকারে বহু গৃধ্র বসিয়া রহিয়াছে—মৃতদেহের জন্য অপেক্ষা করিতেছে; তাহারা এমন নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছে যে, দেখিলে বোধ হয়, যেন প্রাচীরোপরি গৃধ্রমূর্ত্তি সকল রক্ষিত হইয়াছে। সহসা সকলে সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া গেল—সকলেই নির্ব্বাক, দ্বারপথে মৃতদেহ বহন করিয়া কতকগুলি লোক প্রবেশ করিল। তাহারা মন্দিরদ্বারাভিমুখে প্রস্থান করিল—শবাধারে শব রক্ষিত। শবোপরি একখানি শ্বেত বস্ত্রাচ্ছাদন রহিয়াছে—অন্যান্য শব বিবস্ত্র। শববাহিগণের পশ্চাতে মৃতব্যক্তির শোকার্ত্ত আত্মীয়স্বজনগণ গমন করিতেছেন,—তাঁহারাও শুভ্রবেশধারী; দুই জন দুই জন একত্র হইয়া গমন করিতেছেন—যে দুই জন একত্র গমন করিতেছেন, তাঁহারা একখানি রুমালের দুই প্রান্ত ধারণ করিয়াছেন। সর্ব্বশেষে একটি সারমেয় গলরজ্জুবদ্ধ হইয়া আনীত হইতেছিল। শববাহী দল ভিন্ন অন্য কেহ মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইয়া মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনাদিরা সেই স্থানে একটি প্রার্থনামন্দিরে প্রবেশ করিয়া মৃত ব্যক্তির আত্মার মঙ্গলকামনায় প্রার্থনা করিতে থাকে। শববাহিগণ মন্দিরদ্বার মুক্ত করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করে। অল্পক্ষণ পরেই শববাহিগণ শবাধার ও আচ্ছাদনবস্ত্র লইয়া বাহিরে আইসে ও দ্বার রুদ্ধ করে। শব সেই মৌনমন্দিরে রাখিয়া আইসে।

বোম্বাই সহরে লেখক একজন যোগীকে দেখিয়াছিলেন,—তিনি নির্ব্বিকার, উলঙ্গ। লেখক শুনিয়াছিলেন যে, তিনি হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের বহু ভাষ্য রচনা করিয়াছেন।

বিবিধ।

আফ্রিদ্রিস্থানে হিন্দু।

বর্ত্তমান সীমান্ত গোলযোগের কল্যাণে আফ্রিদিদিগের নাম এখন আর পাঠকের নিকট অপরিচিত নহে; কিন্তু অনেকেই অবগত নহেন যে, আফ্রিদিস্থানে বহু হিন্দু অধিবাসী বাস করেন। আফ্রিদিস্থানের খাঁ অর্থাৎ সর্দ্দারগণের রক্ষিত না হইলে, ইঁহারা সেখানে বাস করিতে পারিতেন না। আমরা নিম্নে আফ্রিদিস্থানের হিন্দু অধিবাসিগণের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

অরোরাগণ পঞ্জাবে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী—ইহাদিগের সংখ্যাও অল্প নহে। আফ্রিদিস্থানের অধিকাংশ হিন্দু অধিবাসীই এই সম্প্রদায়ের—ইহারা সাধারণতঃ কিরার নামে পরিচিত। ইহারা সকলেই গুরু নানকের শিষ্য; ধর্ম্মকর্ম্মে ইহাদিগের অনাহত মনোযোগ। দেখিলে সহসা তদ্দেশবাসী মুসলমান ও এই সকল হিন্দুর মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ পরিলক্ষিত হয় না; কেবল মেইডান উপত্যকার ভিন্ন ভিন্ন গ্রামবাসী হিন্দুগণ শিখ্ সম্প্রদায়ের বিশেষ চিহ্ন দীর্ঘকেশ ধারণ করিয়া থাকে। ইহাদিগের ভাষা পঞ্জাবী ও তদ্দেশের ভাষার মিশ্রণোৎপন্ন। উচ্চপর্ব্বতবাসী হিন্দুগণ দীর্ঘকেশও ধারণ করে না; তাহারা মুসলমান প্রতিবেশিগণের ভাষাই ব্যবহার করে। আফ্রিদি হিন্দুগণ বলিয়া থাকে যে, তাহারাই আফ্রিদিস্থানের আদিম অধিবাসী। পূর্ব্বে তাহারা সকলেই হিন্দু ছিল, তাহার পর মুসলমান ধর্ম্মের প্রবল বন্যায় আফ্রিদিস্থান প্লাবিত হইয়াছিল,—সে প্লাবনে যাঁহারা প্রাচীন ধর্ম্ম ত্যাগ করেন নাই, বর্ত্তমান হিন্দুগণ তাঁহাদিগের

ইহারা কাহারা?

বংশধর। ভিন্ন ভিন্ন আফ্রিদি সম্প্রদায়কে মুসলমান করিতে না কি প্রায় আট শত বৎসর লাগিয়াছিল। এখন তাহারা স্বাধীনতারক্ষার জন্য ইংরাজদিগের সহিত যেরূপ যুদ্ধ করিতেছে, পূর্ব্বে ধর্ম্মরক্ষার জন্য মুসলমানদিগের সহিত সেইরূপ যুদ্ধ করিয়াছিল। ভারতবর্ষ বা আফগানিস্থানের কোন শাসনকর্ত্তা তাহাদিগকে জয় করিতে পারেন নাই। মুসলমান ধর্ম্মপ্রচারকগণ আপনাদিগের ধর্ম্ম প্রচার করিতেন; আফ্রিদি হিন্দুগণ দেখিত, তাহাদিগের স্বদেশবাসিগণ মসলেম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষে ও পারস্যে উচ্চ পদ পাইত; তাহারা শুনিত, হিন্দুস্থানে হিন্দুদিগের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে;—এই সকল কারণে ক্রমে ক্রমে তাহারা গায়ত্রী ত্যাগ করিয়া কল্‌মা গ্রহণ করে। এখন আফ্রিদিস্থানের অধিবাসিগণের মধ্যে শতকরা পাঁচজনমাত্র হিন্দু; অবশিষ্ট সকলেই মুসলমান। এখনও প্রতি বৎসরই দুই এক জন হিন্দু যুবক মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তদ্ধর্ম্মাবলম্বিনী কোন রমণীকে বিবাহ করেন, বা কোনও হিন্দু রমণী মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়া মুসলমান পতির সহিত পরিণয়বন্ধনে বদ্ধ হয়েন।

শিখ-ধর্ম্ম।

প্রচলিত গোঁড়া হিন্দু ধর্ম্মের পদে পদে নিষেধ, পদে পদে বিবিধ বিধান। সে সকল পালন করিয়া মুসলমানপ্রধান দেশে স্বধর্ম্ম বজায় রাখা একরূপ অসম্ভব; কাজেই ইসলামের স্রোতে মুষ্টিমেয় হিন্দু প্রায় ভাসিয়া যাইতেছিল। এই সময় প্রবল অত্যাচারে পঞ্জাব ও তন্নিকটবর্ত্তী নানা স্থান হইতে বহু শিখ টিরা ও অন্যান্য উপত্যকায় আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহাদিগের নিকট আফ্রিদি হিন্দুগণ গুরু নানক ও গুরু গোবিন্দের ধর্ম্মের কথা শুনিতে পায়। তাহাদিগের পক্ষে শিখ-ধর্ম্ম-গ্রহণে নানা সুবিধা বুঝিতে পারিয়া তাহারা শিখ-ধর্ম্ম অবলম্বন করে। এইরূপে শিখ হইয়া ইহারা মুসলমান ধর্ম্মের প্রবল স্রোত প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

খাল্‌সা সাম্রাজ্যের প্রাধান্যকালে আফ্রিদিস্থানে ইহাদিগের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। আফ্রিদি শিখগণ লাহোরের রাজার আশ্রিত ও অনুগৃহীত ছিল; বৃটীশ প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদিগের সে প্রতিপত্তি এখন অন্তর্হিত হইয়াছে; তবে সোয়াট উপত্যকা ভিন্ন অন্যত্র ইহারা দাসের মত ব্যবহৃত হয় না, এবং ইহাদিগকে কোন বিশেষ বেশ পরিধান করিতে হয় না।

আচার ব্যবহার।

আফ্রিদিস্থানে ব্যবসা বাণিজ্য প্রায় হিন্দুদিগের একচেটিয়া। এই সকল হিন্দু বণিকের মধ্যে অনেকে ধনশালী। তাহারা সেখানে বড়লোকের মতই বাস করে। তাহারা ভূমিসম্পত্তি করিতে পারে না সত্য, কিন্তু ঋণের জন্য ভূমিসম্পত্তি বন্ধক রাখিতে পারে। স্থানে স্থানে তাহাদিগের ধর্ম্মশালাও আছে। মুসলমানগণ সাধারণতঃ তাহাদিগের উপর কোনও অত্যাচার করে না; তবে তাহারা এই হিন্দুদিগকে "কাফের" কহে, এবং ইহাদিগের স্পৃষ্ট কোনও আহারীয় আহার করে না। কিন্তু অনেক মুসলমান ইহাদিগের চাকরী করে; ধনবান হিন্দুদিগের গৃহে প্রহরী ও সশস্ত্র ভৃত্যগণ প্রায়ই মুসলমান। হিন্দুদিগকে স্বতন্ত্র নাপিত ও যানবাহক রাখিতে হয়; কারণ, মুসলমান নাপিত কাফেরের কেশ কর্ত্তন করে না, মুসলমান যানবাহক কাফেরকে বহন করে না। আফ্রিদিস্থানে ঝট্‌কা অর্থাৎ তরবারির এক আঘাতে ছাগ বা মেষ কর্ত্তন নিষিদ্ধ; শঙ্খধ্বনিসম্বন্ধেও সেই ব্যবস্থা; কিন্তু অর্থের প্রভাব সর্ব্বত্রই সমান—সুসভ্য আমেরিকাতেও যেমন, অসভ্য টিরাতেও তেমনই—অর্থ সর্ব্বসাধনক্ষম; কাজেই সম্প্রদায়ের সর্দ্দারকে কিছু উপহার দিলেই সকল গোল চুকিয়া যায়; সুতরাং ধনবান হিন্দুগণ অর্থবলে যাহা ইচ্ছা করিয়া থাকেন। মুসলমানদিগের মত আফ্রিদি হিন্দুদিগেরও প্রতিহিংসাবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল। আফ্রিদিদিগের সাম্প্রদায়িক কলহে হিন্দুগণ এক বা অপর পক্ষ অবলম্বন করে। আফ্রিদিগণ যেরূপ কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত হইয়া থাকে, প্রকৃতপক্ষে তাহারা সেরূপ নিন্দ-

নীয় কি না সন্দেহ। অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে তাহাদের সততা সত্য সত্যই প্রশংসনীয়। কোন আফ্রিদি যদি ঋণ গ্রহণ করে, তবে কোন দলিলাদি না থাকিলেও, তাহার বংশীয়গণ তাহার মৃত্যুর পর সেই ঋণ পরিশোধ করিয়া থাকে—সে ঋণ পরিশোধ না করা বড় অপমানের কথা। আফ্রিদিস্থানের বিচারে হিন্দু ও মুসলমানে কোন পার্থক্য নাই। আফ্রিদিস্থানে ঋণদাতা 'মহাজনগণ' সকলেই হিন্দু।

হিন্দু ও মুসলমান।

মোটের উপর আফ্রিদিস্থানে হিন্দু মুসলমানে সদ্ভাবের অভাব নাই। লাহোরবাসী এক গুরু-পরিবারের অনেক শিষ্য আফ্রিদিস্থানবাসী। প্রতি বৎসর পরিবারের এক জন আফ্রিদিস্থানে গিয়া বার্ষিক সংগ্রহ করিয়া আনেন। সেই পরিবারের কর্ত্তা বহুবার টিরায় গমন করিয়াছেন, তিনি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দেও একবার সেখানে গিয়াছিলেন—তাঁহারই কথিত বিবরণ হইতে বর্ত্তমান প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইল। তিনি আফ্রিদিস্থানের প্রায় সকল গ্রামেই গমন করিয়াছেন; কিন্তু কখনও মুসলমানগণ তাঁহার প্রতি কোনরূপ কুব্যবহার করে নাই, বরং অনেক স্থানেই স্থানীয় সর্দ্দার তাঁহাকে মাননীয় অতিথিজ্ঞানে সম্মান করিয়াছেন। এই সকল হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, মুসলমানবহুল আফ্রিদিস্থানে হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীদিগের মধ্যে কোন অসদ্ভাব নাই।

শেষ কথা।

আফ্রিদিস্থানে পর্ব্বতাঙ্গে খোদিত একটি গুহামন্দির আছে। টিরাস্থ সেই মন্দির মুসলমানগণ কর্ত্তৃক পঞ্চ পীরের আবাসস্থান বলিয়া ও হিন্দুদিগের নিকট পঞ্চ পাণ্ডবের লুকাইবার স্থান বলিয়া পরিচিত। ইংরাজ অধিকার হইতেও হিন্দু-তীর্থযাত্রীরা সেই মন্দির দেখিতে গিয়া থাকে—দস্যু তস্করের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার্থ এই সকল যাত্রীকে একটা নির্দ্দিষ্ট কর-প্রদান করিতে হয়। এই কর প্রদান করিলে আর কোন আশঙ্কা থাকে না।

গঙ্গোত্রীর পথে।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি, ধারাসু হইতে বাহির হইয়া অগ্রসর হইতে হইতে রাস্তার পার্শ্বে একখানি গ্রাম দেখিয়াছিলাম। আজ সর্ব্বাগ্রেই সেই গ্রামের কাহিনী বলিতেছি, যাঁহারা মনে করিয়াছেন, সেই গ্রামে হয় ত কোন অদ্ভুতপূর্ব্ব ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, এবং আমি তাহারই একটা অপূর্ব্ব বর্ণনা করিব, তাঁহাদিগকে একেবারে যোলআনা নিরাশ হইতে হইবে; কারণ সে গ্রামে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কোন ব্যাপার ঘটে নাই; সেখানে কোন লোমহর্ষণ কাণ্ডের অভিনয়ও হয় নাই। গ্রামটি জনশূন্য; বর্ণনার খাতিরে বলিতেছি না, সত্য সত্যই সে গ্রামে লোক নাই। ঘর আছে, দ্বার আছে, প্রাঙ্গণ আছে, প্রাঙ্গণের পার্শ্বে এখনও পূর্ব্বের মত ফুল ফোটে, এখনও দূরদূরান্তর হইতে পক্ষিকুল আসিয়া সেই গ্রামের উন্নত বৃক্ষরাজিতে বাসা করিয়া

থাকে; এখনও সে গ্রামের অনেক গৃহে দ্রব্যাদি সজ্জিত আছে, কিন্তু লোক নাই। সে এক ভয়ানক দৃশ্য। ছোট ছোট বাড়ীগুলি হা হা করিতেছে; আমার বোধ হইল, যেন একটা রুদ্ধ বায়ু সেই গ্রামের উপর দিয়া সভয়ে ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে। অপরাহ্ন সময়ে এমন একটা পরিত্যক্ত পল্লীর নিকট উপস্থিত হইলে মনে গভীর বিষাদের ভাব উদিত হয়। মনুষ্যসমাগমশূন্য গ্রাম কখনও কল্পনাও করিতে পারি নাই। এই ভাবের একটা দৃশ্য বঙ্কিম বাবুর আনন্দ-মঠে পড়িয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতেও মানুষের অতিসামান্য সাড়াশব্দ ছিল। এ গ্রামে তাহার কিছুই নাই। আমি গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহিলাম, কিন্তু সঙ্গী সিপাহী কিছুতেই আমাকে সেখানে প্রবেশ করিতে দিবে না। গ্রামের অবস্থা দেখিয়া মনে হইল, বুঝি সেকালের ঠাকুরমার গল্পের কোন একটা দৈত্য আসিয়া এক দিনে গ্রামবাসী আবালবৃদ্ধবনিতাকে দামোদরে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। সিপাহীকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল যে, এ অতি ভয়ানক গ্রাম; বৃশ্চিকে এ গ্রামের এই দশা করিয়াছে। গ্রামের লোকেরা নিরাপদে এই পর্ব্বতক্রোড়ে বাস করিতেছিল; তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার পীড়া বা অসুখ ছিল না; হঠাৎ এক দিন কোথা হইতে এক দল বৃশ্চিক এই গ্রামে দেখা দিল, এবং যাহাকে পাইল, তাহাকেই দংশন করিতে আরম্ভ করিল। আমাদের কবিগণ যার কথায় সহস্রবৃশ্চিকদংশন অনুভব করেন, তাঁহাদের মধ্যে এই জাতীয় একটি বৃশ্চিককে প্রেরণ করিলে আর দ্বিতীয়বার দংশনের অবকাশ দিতে পারিতেন না। এই গ্রামে যে সমস্ত বৃশ্চিক আসিয়াছিল, তাহাদের বিষ এমনই তীব্র যে, যাহাকে দংশন করিয়াছে, তাহাকেই সেই মুহূর্ত্তেই শমনভবনে গমন করিতে হইয়াছে।

এই আকস্মিক বিপৎপাতে গ্রামের লোক যে যে দিকে পারিল, পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। পলায়নসময়ে যে হাতের নিকটে যে দ্রব্য পাইয়াছিল, তাহাই লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। যে কোন প্রকারে হউক, তখন প্রাণ বাঁচাইতে পারিলেই হয়। সেই দিন অপরাহ্ন হইতে এই গ্রাম জনশূন্য। আজ পর্য্যন্তও কাহারও সাহস হয় নাই যে, গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কোন দ্রব্য বাহির করিয়া আনে। এমন কি, আমরা যে পথে চলিতেছি, পথিকগণ ঐ পথে চলিবার সময় অতি সতর্ক ও দ্রুতপদবিক্ষেপে চলিয়া যায়। রাত্রিকালে কেহই সে পথে চলিতে সম্মত হয় না।

আমার সঙ্গী সিপাহী সেখানে কিছুতেই দাঁড়াইতে চাহিল না, এবং সে

বেচারী প্রতি মুহূর্ত্তেই পায়ের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল;—কত বার যে অনর্থক তাহার পদদ্বয় ঝাড়িতে লাগিল, তাহার আর সংখ্যা করা যায় না। আমি তাহাকে অগ্রসর হইতে বলিলাম। সে কি করে; আমার জন্য সেখানে দাঁড়াইয়া সে ত আর তার 'জান' দিতে পারে না; তার 'জানের' মূল্য আছে; গৃহে তার মা আছে, দুইটি ভগিনী আছে, তিন মাস পূর্ব্বে সে একটি গৃহস্থের সাত বৎসরের বালিকা কন্যার ভার গ্রহণ করিয়াছে। সে অকারণ এমন ভয়ানক স্থানে দাঁড়াইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার জীবন বিপন্ন করিবে কেন? আমি যেন কিছুতেই সে গ্রামের দিকে একপদও অগ্রসর না হই, সে বার বার এই অনুরোধ জানাইয়া আমাদের রাত্রিবাসের স্থান স্থির করিবার জন্য চলিয়া গেল।

আমি দাঁড়াইয়া সেই ভয়ানক গ্রাম দেখিতে লাগিলাম। কেমন সুখে গ্রামবাসিগণ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিল; ঐ সকল জনহীন শূন্য কুটীর সকল এক দিন বালকবালিকার উচ্চ হাস্যে প্রতিধ্বনিত হইত, কত আশা, কত উৎসাহ ঐ সকল ক্ষুদ্র গৃহে আবদ্ধ ছিল। আজ সব শূন্য! হয় ত উহার কত কুটীরে কত মৃতদেহ মাটীর সহিত মিশিয়া গিয়াছে। হয় ত কত গৃহে নরকঙ্কাল চারি দিকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে;—সে হতভাগ্যদিগের শবদেহ শ্মশানভূমিতে লইয়া যাইবার সাহস কাহারও হয় নাই। আমার বড়ই ইচ্ছা হইল, একবার গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করি; কিন্তু যখন বৃশ্চিকের কথা মনে হইল, তখন আর প্রবেশ করিতে সাহস কুলাইল না। বৃশ্চিক মহাশয় আমার অপরিচিত জীব নহেন; তাঁহার দংশনের সহিত এই প্রশান্ত হিমালয়বক্ষে একবার আমার পরিচয় হইয়াছিল। আমি তখন হরিদ্বার হইতে বদরিকাশ্রমে যাইতেছিলাম; এক অন্ধকার রাত্রে লছমন ঝোলা পার হইয়া একটি বৃক্ষতলে শয়ন করিয়াছিলাম। সেই রাত্রিতে আমার দক্ষিণ হস্তের মধ্যম অঙ্গুলিতে বৃশ্চিক দংশন করে। সে যন্ত্রণার কথা চিরকাল আমার মনে থাকিবে। সৌভাগ্যক্রমে এক জন সন্ন্যাসী যদি অদ্ভুত উপায়ে আমাকে আরোগ্য না করিতেন, তাহা হইলে সেই অন্ধকার রজনীতে সেই লছমন ঝোলায় আমার এই অকিঞ্চিৎকর জীবনের শেষ যবনিকা পতিত হইত। এই বৃশ্চিক-তাড়িত গ্রামের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমার সেই দিনের কথা মনে হইল; সেইরূপ বা ততোধিক অসহ্য যন্ত্রণা পাইয়া এই গ্রামে কত নরনারী, কত বালক বালিকা, কত যুবক যুবতী অকালে জীবন

বিসর্জ্জন করিয়াছে। কত জনের জন্য কত প্রকারের মৃত্যু-ব্যবস্থা হইয়াছে, কে বলিতে পারে?

আমি সেই স্থানে দাঁড়াইয়া কত কথা ভাবিতেছি, এমন সময়ে স্বামীজী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁহাকে গ্রামের ইতিহাস বলিলাম। তিনি কোথায় সেই গ্রামবাসিগণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিবেন, না তাহার উল্টা হইল। তিনি আমাকে তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলেন, কেন আমি এমন ভয়ানক স্থানে দাঁড়াইয়া আছি; জীবনটা যদি এতই দুর্ব্বহ হইয়া থাকে, তবে মরণের আরও অনেক দ্বার উন্মুক্ত আছে, তাহারই কোন একটা দিয়া প্রবেশ করিলেই ত সকল জ্বালা জুড়াইয়া যায়, এমন করিয়া পথে পথে এ পাপের বোঝা বহিয়া বেড়ান কেন? ইত্যাকার অনেক কথা তিনি আমাকে শুনাইতে শুনাইতে চলিতে লাগিলেন; এবং আমি মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলাম। তাঁহার ঐ সকল অনুযোগের জবাব আমার বুদ্ধির ভাণ্ডারে ছিল না; আর থাকিলেও এ ক্ষেত্রে তাহা প্রয়োগ করা যায় না। এ তিরস্কারের ভিতর দিয়া যে স্নেহের অমৃতধারা বহিয়া যাইতেছিল, যদি কেহ জীবনে এই ভাবের তিরস্কার কখনও পাইয়া থাকেন, তিনিই আমার সেই সময়ের মনের ভাব বুঝিতে পারিবেন।

এই ভাবে আমরা 'ডুণ্ডা' নামক একটি গ্রামে উপস্থিত হইলাম। আমরা যেখানে উপস্থিত, সে স্থানটিতে গ্রাম নাই; গ্রাম পর্ব্বতের পার্শ্বে; এখানে রাস্তার ধারে দুইখানি দোকানঘর। আমরা তাহারই এক দোকানের বারান্দায় উপবিষ্ট হইলাম। দুই দোকানই বন্ধ, দোকানদার কেহই সেখানে নাই। এক জন রাখাল সেখানে মহিষ চরাইতেছিল, সে বলিল, দোকানদার দুই জনই শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে। সিপাহীও পূর্ব্বে আসিয়া সেই দোকানেই বসিয়া আছে; গ্রামে রসদসংগ্রহের জন্য যায় নাই। কারণ, দুই জন দোকানদারই গ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু লোক; তাহারা দোকান হইতেই আমাদের জিনিসপত্র গোছাইয়া দিবে। আমরা এই আশায় বসিয়া আছি। দোকানদারের আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। পেয়াদা সান্ধ্যকৃত্য সমাপন করিবার জন্য চলিয়া গেল। স্বামীজীও সেখান হইতে উঠিয়া এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইতে গেলেন; আমি একাকী সেই নির্জ্জন বারান্দায় বসিয়া রহিলাম; সেদিন থাকিয়া থাকিয়া কেবল সেই জনহীন পল্লীর শ্মশান-দৃশ্য আমার

মনে পড়িতেছিল; আমি বসিয়া বসিয়া সেই গ্রামের মৃত পলায়িত ব্যক্তিগণের জীবনকাহিনী ভাবিতেছিলাম।

এমন সময়ে কোথা হইতে এক প্রকাণ্ডকায় দীর্ঘযষ্টিধারী ব্যক্তি আসিয়া কেই কুটীরপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল। একটি কিসের বস্তা তাহার পৃষ্ঠদেশে আবদ্ধ। সে প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া প্রথমে আমাকে দেখিতে পায় নাই; তাহার পৃষ্ঠের সেই বস্তাখানি খুলিয়া সে যেমন সেই বারান্দায় উঠাইতে যাইবে, অমনই আমার উপর তাহার দৃষ্টি নিপতিত হইল। তখন সেই পুরুষপুঙ্গব এমন সুমধুর স্বরে "কোন্ হ্যায়" বলিয়া আমাকে সম্ভাষণ করিলেন যে, সে অভ্যর্থনায় আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। আমি যেন কেমন একটা থতমত খাইয়া গেলাম। পুনরায় প্রশ্ন হইল; এইবার আমি জবাব করিলাম, "মুসাফির"। পথে ঘাটে কখন কোন দিন আমি সাধু, সন্ন্যাসী বলিয়া আপনার পরিচয় দিই নাই, দিতে প্রবৃত্তি হয় নাই, কথা মুখে বাধিয়া গিয়াছে। হৃদয়ের মধ্যে এত পাপ, এত প্রলোভন, এত বড় একটা সংসার, এতখানি অতৃপ্ত সংসারবাসনা সত্ত্বেও নিজেকে সন্ন্যাসী, সাধু, সর্ব্বত্যাগী বলিয়া পরিচয় দেওয়াটাকে আমি, অমার্জ্জনীয় আপরাধ কেন, মহাপাপ বলিয়াই মনে করিতাম। যাহাদিগকে হিন্দু সাধারণ ধার্ম্মিকের উচ্চ মঞ্চে বসাইয়া যুগযুগান্তর হইতে ভক্তি শ্রদ্ধার উপহার দিয়া আসিতেছে, আমি আমার এই পাপকলঙ্কিত, ধূলিধূসরিত মলিন হৃদয়কে কেন সে পবিত্র মঞ্চের সমীপস্থ করিব? তাই আমি সকল সময়েই নিজেকে 'মুসাফির' বলিয়া পরিচয় দিয়াছি। আমি যে তীর্থভ্রমণে যাইতেছি, এ কথাও আমি কখন কাহারও নিকট বলি নাই, বলিলে মিথ্যা কথা বলা হইত। তীর্থভ্রমণও আমার উদ্দেশ্য ছিল না; অসংখ্য নরনারী যে ভক্তিপ্রবণ হৃদয় লইয়া তীর্থদর্শনে যায়, তাহার তিলার্দ্ধও আমাতে ছিল না। 'যেন তেন প্রকারেণ' আমার দিন কয়টি কাটিয়া গেলেই আমি বাঁচি, ইহাই তখন আমার উদ্দেশ্য ছিল; আর সে কয়টি দিন লোকালয় অপেক্ষা বন জঙ্গলে কাটিয়া গেলেই ভাল। সে কথা যাক্।

আমি আগন্তুক দোকানদার মহাশয়কে যে জবাব দিলাম, তাহা তাঁহার নিকট সন্তোষজনক বোধ হইল না। তাহার সেই আটা, গম, লবণ, লঙ্কাপূর্ণ প্রশস্ত পণ্যশালার দ্বারদেশে এক জন অজ্ঞাতকুলশীল ঝাঁকড়া-চুলওয়ালা কৃষ্ণকায় ব্যক্তি উপবিষ্ট থাকিবে, ইহা তাহার পক্ষে অসহ্য হইল। "মুসাফির"

আদমির সেখানে থাকিবার স্থান হইবে না, সে সদাব্রত দিতেও বসে নাই, এই কথা বলিয়া আমাকে তখনই সে স্থান ত্যাগ করিবার জন্য আদেশ প্রচার করিল। আজকালকার অজাতশ্মশ্রু হুজুরগণের মত আমার জবাব না শুনিয়াই সে একেবারে Summery আদেশ দিয়া বসিল। আমি তাহার আদেশের প্রতিবাদ করিবার জন্য দুই একটি কথা বলিতে না বলিতেই "ব্যস্, গোল মৎ করো, হিঁয়াসে নিকালো" বলিয়া আমাকে জোর করিয়া বাহির করিতে আসিল। সেই নির্জন পর্ব্বতপ্রান্তে, ততোধিক নির্জন কুটীরে, এক জন প্রকাণ্ডকায় পর্ব্বতবাসীর প্রদত্ত অর্দ্ধচন্দ্রের উপর আমার বিশেষ প্রীতি না থাকায়, আমি অগত্যা তাহার সেই বারান্দা, আমার সেই অন্ধকার রাত্রের আশ্রয়স্থান ত্যাগ করিয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলাম। সে বিশেষ রাগের ভরে সিপাহীর গাঁট্‌রী এবং স্বামীজীর কমণ্ডলু উঠানে ফেলিয়া দিল। আমি আর সেগুলি কুড়াইয়া লইলাম না।

দোকানদার তখন ঘরের দ্বার খুলিয়া ভিতরে গেল, এবং আলো জ্বালিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল। ইত্যবসরে স্বামীজী ও সিপাহী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং আমাকে অমন ভাবে দণ্ডায়মান দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দোকানদার যে আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছে, সে কথা তাঁহাদিগকে বলিলাম। আমাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া দোকানদার বাহির হইয়া আসিল; তখনও তাহার মেজাজ খুব চড়া, কিন্তু তাহার এমন উগ্রমূর্ত্তি হইবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ আমি ত মোটেই খুঁজিয়া পাই নাই। আমাদের তিন জনকে দেখিয়া তাহার ক্রোধ আরও প্রজ্জ্বলিত হইল, এবং আমাদের যে অভিসন্ধি মন্দ, তাহা বুঝিতে তাহার আর অধিক বিলম্ব হইল না। অন্য কথা না বলিয়া সে এক প্রকাণ্ড যষ্টি ঘরের ভিতর হইতে বাহির করিয়া "আও" বলিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। কথা নাই বার্ত্তা নাই, একেবারে মহা যুদ্ধঘোষণা। লোকটার উদ্ধতভাব দেখিয়া আমার হঠাৎ কেমন রাগ হইল; আমি সিপাহীকে বলিলাম যে, উহার কাণ ধরিয়া লাঠিখানি কাড়িয়া লয়! সিপাহীও চটিয়া গিয়াছিল, এবং এতক্ষণ পরে সে আত্মপরিচয় দিল; কিন্তু দোকানদার তখন রাগে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছে, সে একেবারে রাগের চোটে তিহরীর অমন প্রবলপ্রতাপান্বিত রাজপরিবারকে 'নস্যাৎ' করিয়া দিল; সে কাহারও হুকুম মানে না।

সিপাহী মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট যে মহাস্ত্র আছে, তাহার প্রয়োগ

করিলেই দোকানদারের মস্তক অবনত হইবে; কিন্তু তাহার এ অমোঘ অস্ত্র ব্যর্থ হইল দেখিয়া তাহার গৌরবের উপর প্রকাণ্ড একটা আঘাত লাগিল; বিশেষতঃ তাহার যে মনিবকে এত বড় একটা হিমালয় পর্ব্বত অবনত-মস্তকে কর প্রদান করে, সেই ভারতপূজ্য গিরিরাজকে কি না এক জন সামান্য দোকানদার মানিতে চাহে না, আর সেই কথা সে কি না সেই রাজার এক জন প্রভুভক্ত ভৃত্যের মুখের উপর আমাদের সম্মুখে শুনাইয়া দিল? সিপাহী রাগিয়া একেবারে সিংহের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিল, এবং দোকানদারকে ভাল করিয়া শিক্ষা দিবার জন্য আস্তিন গুটাইতে লাগিল। আমার তখন ইচ্ছা, বেটাকে ঘা কতক ভাল করিয়া বসাইয়া দেয়। কিন্তু স্বামীজী নিরীহ প্রকৃতির লোক, তিনি তাড়াতাড়ি সিপাহীর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন। সিপাহী কি সহজে যাইতে চায়? স্বামীজী তাহাকে সেই উঠান হইতে রাস্তায় টানিয়া লইয়া গেলেন; এ দিকে দোকানদার "আও না" বলিয়া তাহাকে সদর্পে আহ্বান করিতে লাগিল! আমার দিকে আর তাহার দৃষ্টি নাই। আমি আর কি করিব, সিপাহীর ঝুলি ও স্বামীজীর কমণ্ডলু কুড়াইয়া লইয়া ধীরে ধীরে রাস্তায় যেখানে তাঁহারা দাঁড়াইয়াছিলেন, সেখানে উপস্থিত হইলাম। "ভাগ্‌তা কাঁহে" বলিয়া আমাদিগকে বিদ্রূপপূর্ণ কম্‌প্লিমেণ্ট দিয়া দোকানদার আবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

আমরা অনন্যোপায় হইয়া নিকটস্থ একটা বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। কারণ, দ্বিতীয় দোকানদার তখনও আসিয়া উপস্থিত হয় নাই। সিপাহী প্রস্তাব করিলেন যে, আমরা নিকটের গ্রামে যাই। আমরা বলিলাম, এ রাত্রি আমরা সেই বৃক্ষতলেই থাকিব, এবং কোন প্রকার আহারের আয়োজনেরও দরকার নাই; তবে সিপাহীর যদি কিছু আহারের আবশ্যক থাকে, তাহা হইলে সে গ্রামে যাইতে পারে। কিন্তু সে আমাদিগকে ছাড়িয়া গেল না; সে রাত্রি সেও অনাহারে কাটাইবে স্থির করিয়া কম্বল মুড়ী দিয়া বসিল।

স্বামীজী আমার পার্শ্বেই বসিয়াছিলেন; এবং লোকটা বড়ই গোঁয়ার বলিয়া তাহার উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করিতেছিলেন। আমি চুপ করিয়াই বসিয়া আছি। এ পথে বাহির হইয়া এমন সাদর অভ্যর্থনা কোন দিনই পাই নাই। এই পাহাড়ের মধ্যে এমন একটা উৎকট বীরের আবির্ভাবে আমি বড়ই আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলাম। স্বামীজী ধীরে ধীরে আমার নিকট হইতে উঠিয়া আবার সেই দোকানের দিকে গেলেন; তিনি সেখানে কি করিলেন,

বুঝিতে পারিলাম না। প্রায় আধ ঘণ্টা তিনি অনুপস্থিত। আমি ঘুমাইবার আয়োজন করিতেছি, এমন সময়ে তিনি সেই দোকানদারকে সঙ্গে করিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন! এবং আমাকে ডাকিয়া বলিলেন যে, দোকানদারের কোন দোষ নাই, সে আজ একটু অধিকপরিমাণে সিদ্দি খাইয়াছিল, এবং তাহার পরে গাঁজাতেও বেশী দম দিয়াছিল; তাই তাহার মাথা ঠিক নাই। এখন সে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়াছে এবং তাহার ব্যাবহারের জন্য দুঃখিত হইয়াছে। আমি বুঝিলাম, এ স্বামীজীর কর্ম্ম।

দোকানদার তখন সেখানে বসিয়া আমি কোথা হইতে আসিতেছি জিজ্ঞাসা করিল; আমি তখন বলিলাম, আমি বাঙ্গালী, দেরাচুনে থাকি; তখন আমার আওয়াজটা তাহার পরিচিত বলিয়া বোধ হইল। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমি কি কালীকান্ত সাহেবের বাসায় থাকিতাম? আমি যখন হাঁ বলিলাম, তখন লোকটা বড়ই অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। আমার কণ্ঠস্বর তাহার পরিচিত; আমিও তাহার পরিচিত। যখন তিহরীরাজ্য লইয়া রাণীজী ও মৃত রাজার ভ্রাতা কুমারবিক্রম সাহেবের বিবাদ হয়, তখন দেরাচুনের মাষ্টার কালীকান্ত বাবু কুমার সাহেবের পক্ষ অবলম্বন করেন। এ লোকটি সেই কুমার সাহেবের পক্ষীয়। এ তখন প্রায়ই সংবাদ আদি লইয়া দেরাচুনে যাতায়াত করিত, এবং কুমার সহেহের স্বপক্ষের এক জন প্রধান সাক্ষী ছিল। আমি ও কালীকান্ত বাবু একত্র থাকিতাম, সুতরাং তখন আমাকে দেখিয়াছে; কিন্তু সে সময়ে এমন দিন ছিল না, যে দিন আমাদের বাসায় ৫। ৭ জন লোক না আসিত। কাজেই আমি ইহাকে চিনিতে পারিলাম না।

আমি কালীকান্ত সাহেবের বিশেষ আত্মীয় লোক, আমার উপরে এ প্রকার ব্যবহার করিয়া সে অতিশয় অন্যায় করিয়াছে, নেশার ঝোঁকে মানুষ জানোয়ারের মত ব্যবহার করে, এই সব বলিয়া সে আমাদিগকে দোকানে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল; কিন্তু সিপাহী কিছুতেই রাজী হইল না; সে এই দোকানদারকে নিগৃহীত করিয়া তাহার মহারাজের গৌরব পুনঃস্থাপিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। রাজধানীতে গিয়াই ধুন্ধুরাম দোকানদারের উপর 'গিরেপ্‌তারি' পরওয়ানা বাহির করিয়া তবে সে ছাড়িবে। সিপাহীর নির্ব্বন্ধাতিশয়দর্শনে আমরা আর কিছুই বলিলাম না; দোকানদার ভবিষ্যৎ বিপদ বুঝিয়া অতি ধীরে ধীরে

দোকানে চলিয়া গেল, এবং ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। আমরা অনাহারে সেই বৃক্ষতলে রজনী অতিবাহিত করিলাম।

আজি ১৪ই জুন রবিবার অতি প্রত্যূষে উঠিয়া বাহির হইলাম। আট মাইল রাস্তা আসিয়া উত্তর-কাশীতে উপস্থিত হইলাম। উত্তর-কাশী সম্বন্ধে আমার ডায়েরীতে অতি সামান্য লেখা আছে। কারণ আমি উত্তর-কাশীতে যে ত্রিশূল দেখিয়াছিলাম, তাহা আঁকিয়া আনিয়াছিলাম। যে কাগজে তাহা আঁকিয়াছিলাম, সেই কাগজেই উত্তর-কাশীর সমস্ত বিবরণ যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম, তাই ডায়েরীতে অতি সামান্যই লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। সেই ত্রিশূল-অঙ্কিত কাগজখানি দেখিয়া গত বৎসরের পূর্ব্ববৎসরে জন্মভূমিতে আমি উত্তর-কাশী সম্বন্ধে একটা বড় প্রবন্ধ লিখি; তাহার পর যে সে কাগজ ও সে ছবি কোথায় গিয়াছে, আমি আর তাহার সন্ধান পাইতেছি না। আমার ডায়েরীর এক পৃষ্ঠাতেও সেই ত্রিশূলের একটা ছোট ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছিলাম,—সেখানিও কে ছিঁড়িয়া লইয়াছে। উত্তর-কাশীর বর্ণনা আমি দিতে পারিলাম না। যাঁহারা জন্মভূমি পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহারা তাহাতে দেখিতে পাইবেন। আমি এখানে ঠিক ঠিক আমার ডায়েরীখানি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

14th June, Sunday—প্রাতে যাত্রা, ৮ মাইল রাস্তা আসিয়া উত্তর-কাশীতে উপস্থিত। ঠিক গঙ্গার উপরে একটা ৪ হাত square নাটমন্দিরে আমাদের থাকিবার স্থান হইল; একেবারে গঙ্গার উপর। পাণ্ডা স্থির হইল, সে বিশেষ যত্ন করিতে লাগিল। দুই প্রহরের মধ্যে আর কোথাও যাওয়া হইল না। আমার পায়ের তলায় হঠাৎ একটি ফোড়া দেখা দিল। এখানে অতি সামান্য দুই একখানি দোকান আছে, খাবার দ্রব্য বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না; চাউল আদি অতি দুর্ম্মূল্য। স্থানটি সহর বা গ্রামের মতও নহে; বাড়ীগুলি মাঠের মধ্যে বিক্ষিপ্ত; মন্দিরগুলিও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; কোন নিয়ম, কোন শৃঙ্খলা নাই। শুনিলাম, এখানেও কাশীর ন্যায় সমস্তই ছিল; জ্ঞানবাপী, বিষ্ণুঘাট প্রভৃতি ছিল। একবার বর্ষাতে সমস্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কাশীর ন্যায় এখানেও মণিকর্ণিকার ঘাট আছে। আজ দর্শন হইল না। শুনা যায়, কাশী অপেক্ষাও এই কাশী পুরাতন; তবে বৌদ্ধগণের সময়ে একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। মহাত্মা শঙ্কর আসিয়া এই স্থানের উদ্ধার করেন। এখানে আপাততঃ দুইটি সদাব্রত আছে; একটি লছমীচাঁদ শেঠের; যাহাকে সাধারণতঃ কলিকাতার ছত্র বলে; ইঁহাদের এখানে, হৃষীকেশে ও গঙ্গোত্রীতে ছত্র আছে। দ্বিতীয় ছত্র একজন ব্রহ্মচারীর; ইনি শীতের কয় মাস দেশে দেশে ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করেন, আর এই কয় মাস গঙ্গোত্রীযাত্রী সাধুদিগকে আহার দান করেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে বিশ্বনাথ দর্শন করিতে গেলাম। আমরা যখন গেলাম, তখন মন্দির অন্ধকার; প্রথমেই মন্দিরের সম্মুখে একটা ঘরের ছাদ বিদীর্ণ করিয়া সেই অনাদি পুরাতন ত্রিশূল রহিয়াছে; সবিস্ময়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম; ত্রিশূল দর্শন করিলাম; কিন্তু অন্ধকারের জন্য

ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না ; আগামী কল্য দেখিয়া সবিশেষ লিখিয়া রাখিব। তাহার পরে অন্ধকারে পাণ্ডার হাত ধরিয়া বিশ্বনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। পাণ্ডা আমাকে অন্ধের মত এক স্থানে বসাইয়া দিল ; অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলাম না ; অজ্ঞাতসারে চক্ষু মুদ্রিত হইয়াছিল। পূজক কখন আসিয়াছিল, জানি না ; শঙ্খ ঘণ্টার রবে জাগিয়া উঠিলাম ; তখন আরতি আরম্ভ হইল ; আমি চাহিয়া দেখি, আমি একেবারে বিশ্বনাথের কোলের কাছে বসিয়া আছি ; সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলাম ; চারি দিকে স্তোত্র গীত হইতেছে ; আরতি হইতেছে। চতুর্দ্দশবর্ষীয় একটি সুন্দর বালক অতি-সুমিষ্টস্বরে মহাদেবের স্তুতিগান করিতে করিতে আরতি করিতেছে ; দেহের মৃদু সঞ্চালনে তাহার সুন্দর কৃষ্ণকেশগুচ্ছ আন্দোলিত হইয়া আরও শোভার বিকাশ হইতেছে। অতি আনন্দ ও শান্তি উপভোগ করিলাম ; জীবনে এরূপ সুদিন অতি কমই হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরে যৎকিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়া মন্দির হইতে বাহির হইলাম। তখন রাত্রি হইয়াছে ; স্বামীজী ও পাণ্ডা মহাশয় বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। ধীরে ধীরে বাসায় আসিলাম। পায়ের তলায় বড়ই বেদনা হইল।

১৫ই জুন সোমবার—প্রাতে উঠিয়া পায়ের ফোড়ার অবস্থা অতি খারাপ দেখিলাম, চলিতে ফিরিতে বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। এত দিন কিছুই হইল না, আজ কেন এমন হইল ? শরীরও বড়ই অসুস্থ হইল। দুই প্রহরে শরীর বেশী কাতর হওয়ায় স্থান ত্যাগ করিয়া নিকটেই কেদারেশ্বরের মন্দিরে স্থান লওয়া গেল। মন্দিরের সঙ্গেই সম্মুখে একটি ছোট ঘর, এটি ঠিক মন্দিরের দরদালান ; সেখানেই আড্ডা করা গেল। অপরাহ্নে ত্রিশূল ও বিশ্বনাথ দর্শনের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পায়ের জ্বালায় বাহির হওয়া গেল না। দিনটা যেন বিফলে গেল বলিয়া বোধ হইল। গঙ্গোত্রী যাওয়ার সঙ্কল্প ঘুচিয়া গেল, মসুরীতে ফিরিয়া যাওয়াই স্থির হইল। রাত্রে এক জন বাঙ্গালী ভৈরবী মন্দিরে আসিয়া খুব গান করিলেন। কিন্তু শেষে তাঁহার রীতি প্রকৃতি শুনিয়া দেখিয়া বুঝিয়া আমি বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলাম। শরীর বিশেষ কাতর।

১৬ই জুন মঙ্গলবার—প্রাতে কয়েক জন সাধু আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; দুইটি বালক অতি সুন্দর, আর একটি যুবক বড়ই ধর্ম্ম-পিপাসু, তাঁহার প্রকৃতি বড়ই মধুর। তাঁহাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল ; তাঁহারা গঙ্গোত্রী যাইতেছেন ; আমরা আর সে পথে যাইব না ; আমরা লোকালয়ে ফিরিয়া যাইতেছি। পায়ের বেদনায় বাহির হওয়া কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে ; তবুও শেষ বেলায় অনেক কষ্টে বিশ্বনাথের মন্দিরে যাইয়া ত্রিশূলের একটা rough ছবি ও স্থানের বিশেষ বর্ণনা, ইতিহাস লিখিয়া আনিলাম। ত্রিশূল কত কালের, কাহার, কেহই কিছু জানে না ; অষ্টধাতুতে নির্ম্মিত, তবে তাহার মধ্যে তাম্রের ভাগ বেশী বলিয়া বোধ হয়। পাণ্ডারা বলিলেন, অনেক দিন পূর্ব্বে (বোধ হয় নেপাল-যুদ্ধের সময়) নেপালের রাজা এখানে আসিয়াছিলেন ; তিনি এই ত্রিশূল দর্শন করিয়া ইহা উঠাইয়া লইয়া পশুপতিনাথের মন্দির

সম্মুখে রাখিবার আদেশ দিয়া যান। তাঁহার আদেশক্রমে কর্ম্মচারিগণ খনন করিতে আরম্ভ করেন। অপর কাগজে লিখিত চিত্রের নীচে যে কলসীটি আছে, খুঁড়িতে খুঁড়িতে এই প্রকার সাতটি কলসী দেখিতে পাওয়া যায় ; শেষে আর খনন করা অসম্ভব হইয়া পড়ে ; অনেক বৃশ্চিক ও সর্প বাহির হইয়া খননকারীদিগকে দংশন করিয়া মারিয়া ফেলে ; সকলে পলায়ন করে ; সুতরাং নীচে আর কত দূর ত্রিশূল প্রোথিত আছে, কে জানে ? এই সাত কলসী পর্য্যন্ত হিসাব করিলেও ৭২ হস্ত হইবে ; কারণ, একটি কলসী হইতে ত্রিশূলের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত ১২ হাত হইবে ; আর উপরের ত্রিশূল তিন হাত ; সর্ব্বশুদ্ধ ৭৫ হাত জানিতে পারা গিয়াছে। ত্রিশূলের গায়ে তিন লাইন কি লেখা আছে (তাহার নকল অন্য কাগজে রহিল) পড়া গেল না। স্বামীজী বলিলেন, পালি ভাষা। আর একটি ব্যাপার আছে ; এই ত্রিশূলের গায়ে অঙ্গুলি দ্বারা সামান্য ঠেলা দিলে ত্রিশূল কাঁপিয়া উঠে, কিন্তু জোর করিয়া ঠেলিতে গেলে মোটেই নড়ে না। স্বামীজী বলিলেন, ইহার মধ্যে magnetic কিছু আছে। (পাণ্ডা বলিলেন, এখন আর পূর্ব্বের মত কাঁপে না ; কারণ ঘরের ছাদে বাধিয়া যায়।) এক জন শ্রেষ্ঠী একটি ঘর বানাইয়া শুধু ত্রিশূলটি ঘরের ছাদ ভেদ করিয়া উপরে বাহির করিয়া দিয়াছেন। এই ত্রিশূল দর্শন করাই আমার এখানে আসিবার উদ্দেশ্য। অপরাহ্নে নর্ম্মদাতীরস্থ অমরকণ্ঠ মহাদেবের মন্দির-বাসী চৈতনদাস নামক একজন ভক্ত সাধু আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসি-লেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ধর্ম্মালোচনা হইল। সচরাচর পথে ঘাটে যেমন সন্ন্যাসী দেখিতে পাওয়া যায়, ইনি তেমন নহেন ; কোন প্রকার সন্ন্যাসীর ভাণ নাই। উঠিয়া যাইবার সময়ে আমাকে তাঁহার আশ্রমে যাইবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া গেলেন, এবং যাইবার ঠিকানাও বলিয়া গেলেন। মধ্য-ভারতবর্ষের বিলাসপুর ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে হইবে ; ছত্রিশগড়ের নিকটে নর্ম্মদাতীরে অমরকণ্ঠ মহাদেবের মন্দির বলিলেই লোকে দেখাইয়া দিবে। স্বামীজী আমার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন ; শরীর সুস্থ হইলে মসুরী ফিরিয়া গেলেই হয় ; কিন্তু তিনি তাহা চান না ; যাহাতে আগামী কল্যই আমরা বাহির হইতে পারি, তাহারই বন্দোবস্ত করিতে তিনি ব্যস্ত। আমার জন্য পাহাড়ী ডাণ্ডী ভাড়া করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমার নিষেধ শুনিতেছেন না।

১৭ই জুন বুধবার—আজ উত্তর-কাশী-ত্যাগের কথা ছিল, কিন্তু আমার জন্য যানের বন্দোবস্ত না হওয়ায় যাওয়া স্থগিত রহিল ; এ দিকে আমার পা ক্রমেই ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। আজ ভগীরথ-দশহরা। পাণ্ডা বলিলেন, আজ অতি পবিত্র দিন। পাণ্ডার অনুরোধে আমি অতি কষ্টে মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করিতে গেলাম ; মণিকর্ণিকার ঘাটের তেমন আড়ম্বর এখানে কিছুই নাই। আমাদের কাশী প্রকাণ্ড সহর, উত্তর-কাশী সামান্য গ্রামও নহে ; একটি বাঁধা ঘাটও নাই। ঠিক পুরাতন আর্য্যভাব এখনও এখানে বর্ত্তমান ; কৃত্রি-মতা কিছুই নাই ; যাহা ছিল, তাহাই আছে ; মানুষের হাত মোটেই লাগে

নাই। স্থানটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পূর্ণ। পুরাতন আর্য্য-ব্রাহ্মণগণের ন্যায় এখনও এ স্থানের ব্রাহ্মণেরা ক্ষেত্র-কর্ষণ করে, এবং গো-পালন করে। সম্পত্তির মধ্যে গোধূমক্ষেত্র ও গো-মহিষ; তাহাতেই ইহারা সন্তুষ্ট। পাণ্ডাগণ বড়ই দরিদ্র। বদরিকাশ্রমে কি কেদারনাথের পথে অনেক বড়মানুষ আসিয়া থাকে, গঙ্গোত্রীর পথে সাধু সন্ন্যাসী ছাড়া আর কেহ বড় একটা আসে না; পাণ্ডাদিগের সেই জন্যই কিছু আয় হয় না; এমন কি, বিশ্বনাথের পূজক ব্রাহ্মণের সামান্য কিঞ্চিৎ জমি ভিন্ন অন্য সম্পত্তি মোটেই নাই; প্রণামী দর্শনী অতি সামান্যই হইয়া থাকে। অন্যান্য বিবরণ পৃথক কাগজে লিখিয়া রাখিলাম। ১২৲ টাকা দিয়া একখানি পাহাড়ী ডাণ্ডী ভাড়া করা হইল। স্বামীজীর এ অনুরোধ আমি কিছুতেই অতিক্রম করিতে পরিলাম না। আমার সন্ন্যাস ও কঠোরতা ঘুচিয়া গেল!

১৮ই জুন, বৃহস্পতিবার—আজ উত্তর-কাশীত্যাগ। উত্তর-কাশীতে যে কয় দিন ছিলাম, সে কয় দিনের বিবরণ ভিন্ন ভিন্ন কাগজে লিখিয়া রাখিয়াছিলাম; তবে যে আমার ডায়েরীতে উপরের কয়েকটি কথা লিখিত ছিল, সে স্বামীজীর কথা মত। তিনি বলিয়াছিলেন, আল্গা কাগজের লেখা হয় ত হারাইয়া যাইতে পারে; অন্ততঃ চুম্বক করিয়া খাতায় লিখিয়া রাখা ভাল। বৃদ্ধের দূরদর্শিতার ফল ফলিয়াছে; সে কাগজগুলির আর উদ্দেশ হইতেছে না; এই খাতায় যাহা ছিল, তাহাই আমার সম্বল; এবং তাহাই উত্তর-কাশী সম্বন্ধে আমার বক্তব্য বিষয়। কত দিন চলিয়া গিয়াছে, সব কথা তেমন মনে নাই। এ অবস্থায় খাতাখানিতে যাহা লেখা আছে, তাহাই যথাযথ তুলিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য মনে করিলাম। ত্রিশূলের ছবি আমার কাছে মোটেই নাই; আমার পরমপূজনীয় সুহৃদ উত্তরপাড়া-নিবাসী পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমার সেই ছবি দেখিয়া স্বহস্তে একটা sketeh করিয়াছিলেন; তাহা যদি তাঁহার নিকট থাকে, তবে ভবিষ্যতে সেই ত্রিশূলের ছবি পাঠকগণকে উপহার দিতে পারিব।

আমি আজ আর সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গী নহি। আজ পাহাড়ী ডাণ্ডীতে চড়িয়া চলিতেছি। তীর্থের পরিসমাপ্তি মন্দ নহে। চার জন প্রকাণ্ডকায় পাহাড়ী আমার ডাণ্ডী-বাহক। স্বামীজী আমাকে এই অবস্থায় ফেলিয়াছেন। আমার পায়ের অবস্থা অবশ্যই দিন দিন খারাপ হইতেছিল, তাহারই জন্য তিনি বিশেষ ভীত হইয়া আমার জন্য এই ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন, এবং যত শীঘ্র আমরা মসূরীতে পৌঁছিতে পারি, ততই মঙ্গল মনে করিয়া দণ্ডে দশবার ডাণ্ডীওয়ালাদিগকে দ্রুতগমনের জন্য তাড়না করিতে লাগিলেন। আজ তাঁর ভাব দেখিয়া বোধ হইল, কেহ যদি আজই আমাদিগকে মসূরী পৌঁছাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে তিনি তাঁহার একমাত্র সম্বল পাগড়ী, গায়ের কম্বল ও হাতের কমণ্ডলুটিও দিতে প্রস্তত।

এই স্থানে ডাণ্ডীর একটা বর্ণনা দেওয়া বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িল। কারণ, আমার যে এই তিন ঘণ্টাতেই ভয়ানক বুকের বেদনা হইল,

তাহার ত একটা কারণনির্দ্দেশ করিতে হইবে। একখানি মোটা লম্বা বাঁশ, অবশ্য বাঁধুনি খুব দৃঢ়, আর একখানি কম্বল, আর দুইখানি শক্ত দড়ি, এই তিনটি দ্রব্য আমার ডাণ্ডীর উপকরণ। পর্ব্বতবাসিগণ সেই বাঁশের দুই দিকে খানিকটা স্থান বাহিরে রাখিয়া কম্বলখানি দড়ি দিয়া সেই বাঁশের সঙ্গে বেশ করিয়া বাঁধিয়া লইল। আমি সেই কম্বলের মধ্যে বসিয়া বুকের মধ্যে বাঁশটি লইয়া দুই হাত দিয়া চাপিয়া বসিয়া রহিলাম; সুতরাং প্রতিপদবিক্ষেপে আমার বুকে আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা; যথাসম্ভব বুক রক্ষা করিতে লাগিলাম বটে, কিন্তু কত রক্ষা করা যায়? বুকে এবং হাতে বেদনা হইয়া গেল। এ সুখের অপেক্ষা সোয়াস্তি ভাল ছিল! পা দুখানি কম্বলের বাহিরে ঝুলিয়া থাকায় আরও কষ্ট হইতে লাগিল। শেষে ডাণ্ডিওয়ালার পরামর্শে বেদনাযুক্ত পাখানি অপর পায়ের হাঁটুর উপর রাখিয়া কথঞ্চিৎ ভাল বোধ হইল। ডাণ্ডীওয়ালাগণ এরূপ না করিয়া যদি আমাকে কম্বল দিয়া জড়াইয়া বাঁধিয়া দড়ির মধ্যে বাঁশ দিয়া স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইত, তাহা হইলেও বোধ করি বেশী সোয়াস্তি হইত।

যাহা হউক, এই ভাবে আট মাইল আসিয়া সেই গঙ্গার ক্ষেত্র ডুণ্ডার দোকানে উপস্থিত হইলাম। এবার দ্বিতীয় দোকানদার দোকানেই ছিল, এবং আমরা তাহারই দোকানে অতিথি হইলাম। ধুন্দুরাম দোকানদার আজ দোকান বন্ধ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। এ দোকানদার আমাদের যথেষ্ট খাতির করিল। আমার পায়ের অবস্থা দেখিয়া তাড়াতাড়ি গ্রামে গিয়া কতকগুলি জোয়ান সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিল, এবং আটা ও জোয়ান একত্র বাটিয়া গরম করিয়া তাহার উপরে বেশ ভাল করিয়া ঘৃত দিয়া আমার পায়ে একটা পুল্টিস্ দিয়া দিল; যাতনা কম বোধ হইতে লাগিল। আমার ইচ্ছা হইয়াছিল, ২। ১ দিন এখানে থাকিয়া পা ভাল হইয়া গেলে শেষে মসূরী চলিয়া যাইব। কিন্তু স্বামীজী তাহাতে রাজী নন। ডাণ্ডীওয়ালারা বসিয়া থাকিতে চাহে না; তাহাদিগকে ছাড়াইয়া দিতে গেলে বন্দোবস্ত অনুসারে ১২৲ টাকা দিতে হয়; তাহাই বা কোথায় মেলে? আরও এক কথা, পথে ঘাটে যার তার যে সে ঔষধ ক্ষতস্থানে লাগাইতে দেওয়া স্বামীজীর ইচ্ছা নহে। তিনি আমাকে কোন রকমে টানিয়া মসূরীতে লইয়া যাইতে চান। অগত্যা অপরাহ্নে আবার রওনা হওয়া গেল। বাহির হইবার সময়ে দোকানদার আর একটা পুল্টিস গরম করিয়া লাগাইয়া দিল, এবং রাত্রে আরও দুই বার যাহাতে লাগাইতে পারি, আমাকে তদুপযুক্ত সরঞ্জাম দিল। দোকানদারকে ধন্যবাদ দিয়া আমি আবার সেই অপূর্ব্ব যানে উঠিয়া বসিলাম।

ক্রমশঃ।

শ্রীজলধর সেন।

কবিতাকুঞ্জ।

বিশ্ববধূ।

তুমি শুধু আছ বসি বিশ্ব-অন্তঃপুরে
আপন সৌন্দর্য্যমাঝে আপনি বিলীন!
ঘেরি তব চারিধার বসন্ত নবীন
ঢালিছে সুরভি-সার; বাঁশরীর সুরে
মলয় গাহিছে ফিরি' মধুর মধুরে;
নিত্য হাসি হাসিছে কুসুম; নিশিদিন
জ্বলিছে তারকা-দীপ; বিরাম-বিহীন
ধ্বনিছে জলদ-শঙ্খ সুদূর সুদূরে!
যুগযুগান্তর ধরি মুগ্ধ কবিকুল
হেরি সে আরতিলীলা রাতুল চরণে
সর্ব্বস্ব সঁপিয়া দেয় সজলনয়নে;
অবশেষে কাঁহি উঠে আনন্দে আকুল,—
"হে বধূ! হেরিনু সব, আজি শেষবার
দেখাও গুণ্ঠনে-ঢাকা মু'খানি তোমার।"

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

গান।

সিন্ধু কাফি—ঝাঁপতাল।

এ হৃদিকুঞ্জবনে তুমি রহ হে প্রাণ সখা,
মম জীবন-ভাতি,
নিখিল শান্ত নব, নিরঁতি নিভৃত সব,
নীরব সে দিনরাতি।
স্নিগ্ধ-বসন্ত-সুসেবিত, পুষ্পিত, চম্পক
বেলা মালতী জাতি;
বিহর তথা মম হৃদয়বিলাসী,
শত-ফুল-গন্ধে মাতি;
রহ ঘিরি মোরে, তব ভুজ-ডোরে,
হে চিরজীবন-সাথী!
দিব পিক-কূজন, মলয় সমীরণ,
কুসুমহার দিব গাঁথি।
শয়ন তরে দিব শিশির-সুশীতল,
কিশলয়-কোমল এ বুক পাতি!

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

সিন্ধু।

আকুল, অনন্ত বারি,
তরঙ্গিত দূর দূরান্তর;
সীমাশূন্য, কূলশূন্য
অসীম—এ অনন্ত সাগর।
অনন্তের অন্তঃস্থল
পৃথিবীতে রাখিতে ঢাকিয়া,
তরঙ্গিত সিন্ধু বুকে
অলসেতে পড়েছে হেলিয়া।
দূর হ'তে দূরান্তরে
ছুটিতেছে তরঙ্গ ভীষণ।
গাঢ় নীল বারিরাশি
মরকত বিমল যেমন।
নিথর নীলিমাকাশ
বিরাজিছে বারিধির বুকে;
তরঙ্গিত মহাসিন্ধু
ছুটিয়াছে গগনের মুখে।
সাম্য, চাঞ্চল্যের এই
সুগভীর মহান্ মিলন,
এক স্থির; অপরের
দিগ্ব্যাপী কল্লোল ভীষণ।
সীমাশূন্য মহা গীত
উঠিতেছে কল্লোলে কল্লোলে;
প্রকৃতি গম্ভীর স্থির
সুগভীর সাগরের জলে।
সুধু জলজন্তুগণ
খেলিতেছে তরঙ্গ ফেনিলে;
নিরজন চারি ধার—
তৃণটুকু ভাসে না সলিলে।
চারি দিক প্রাণিশূন্য—
স্তব্ধ—স্থির—প্রশান্ত—বিজন;
অর্দ্ধেক পৃথিবী ঘিরে
তরঙ্গের গভীর গর্জ্জন।
রবি, শশী দেয় কর,
সুবিমল সাগরের নীরে
ঝিকিমিকি করে দূরে
স্বর্ণরশ্মি—তরঙ্গের শিরে।

৺প্রমীলা নাগ।

তুমি।

তুমি স্নিগ্ধ যেমন শব্দবিহীন
স্তব্ধ বরষা-রাতি;
তুমি উজ্জ্বল যেন কুসুমবহুল
পুষ্পসময়ভাতি;
তুমি কোমল যেমন শারদ আকাশে
জ্যোৎস্নামধুর নিশি;

তুমি মধুর যেমন অরুণ-উদয়ে
পুলক-আকুল দিশি;
তুমি সুখদ যেমন বেদনাতপ্তে
অশ্রু—বেদনহারী;
তুমি উদার যেমন গগনবিলীন
সুনীল সাগরবারি;
তুমি অসীম যেমন নিঃস্ব হৃদয়ে
ব্যাকুল বাসনারাশি;
তুমি পূত যেমন শিশুর অধরে
সরস মধুর হাসি;
তুমি হাস্যে যেমন নববিকশিত
কুসুম লোচনলোভা;
তুমি ক্রন্দনে যেন শিশিরসিক্ত
বিকচ-কুসুম-শোভা;
তুমি প্রণয়ে যেমন সুনীল আকাশে
রজত জ্যোৎস্নাধারা.
তুমি বিরাগে যেমন প্রভাতগগনে
ম্লান-আলোক তারা;
তুমি হৃদয়-সরসে ফুটিয়া উঠেছ
প্রভাতনলিনী সম;
তুমি চন্দ্র যেমন করেছ উজল
আঁধার হৃদয় মম।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

কুহু।

আদিকালে কবে তুই উঠিলি প্রথম,
রে মর্ম্মবিদারী কুহু! কি মানে বিষম,
কি মধু বিধুরে, কেন ওরে চিরাদৃত!
কোন প্রত্যাখ্যান-স্বপ্নে? ঘনশ্যামাবৃত
নিভৃত নিকুঞ্জে কার কণ্ঠে ছি'লি জাগি?
সে দিন কি চন্দ্রাপীড় মেলেছিল আঁখি
এই স্বরে? ফুটেছিল কবি-কল্পনায়
মেঘদূত সেদিন কি শিপ্রাতীরে? হায়,
আকণ্ঠ নিমজ্জি' ওই ছড়ায়ে কুন্তল,
বধূ, শূন্য কুম্ভ ভাসাইয়া, স্তব্ধ ছল ছল
উৎকর্ণে শুনিছে ও কি! অবেলায় নেয়ে,
ঘরে ফিরে যাবে বুঝি ওই মুগ্ধ মেয়ে
আর্দ্রবাসে, আর্দ্রকেশে, শুনে তোরে কুহু!
ফিরে ফিরে পথে থেমে, বক্ষে লয়ে উহু!

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

কবিতা।

কবিতা!
সতত বাসনা জাগে পূজি তোমা হৃদি ভাগে
ধরার সৌন্দর্য্য-আগে তব অধিষ্ঠান!
এ জগত কবিত্ব মহান।

সৌন্দর্য্য-আধার বিশ্ব, নরনারী কি রহস্য,
আলোক-আঁধার দৃশ্য জন্ম-অবসান।
এ জগত কবিত্ব মহান।

সুনীল অম্বর ভরা চন্দ্র সূর্য্য আলো করা
চারুশোভা মনোহরা স্বরগ সমান!
ফুটে উঠে শতদল যেন দীপ্ত শতদল
বিস্ময়ে বিহ্বল তাই হয়েছে নয়ান।
এ জগৎ কবিত্ব মহান।

এ ধরা প্রেমের বন্ধ প্রাণে প্রাণে নিত্য দ্বন্দ্ব
হৃদে হৃদে প্রেমগন্ধ বহে অবিরাম।
তরঙ্গ নাচিয়া দোলে, বিহঙ্গ কুলায় বোলে,
ফুল সে বসন্তকোলে অনঙ্গ-সন্ধান।
এ জগত কবিত্ব মহান।

নির্ম্মম কঠোর হিয়া আপন সর্ব্বস্ব দিয়া
বাঁধিতে পারে না হিয়া, খোঁজে প্রতিদান।
লাঞ্ছনা ঝটিকা যায় তবু ছুটে পায় পায়
আলোক আঁধার হায় সকলি সমান।
এ জগত কবিত্ব মহান!

সসাগরা বসুন্ধরা বনশোভা প্রীতি-ভরা
উর্দ্ধশির, কি বিশাল পর্ব্বত পাষাণ;
প্রবল সাগর-নীর মলয় বহিছে ধীর
সুনীল বিস্তার স্থির আকাশ বিমান।
এ জগত কবিত্ব মহান।

তপন চন্দ্রমা যাচে দিবস নিশীথ কাছে
নিত্য ধায় পাছে পাছে, তবু ব্যবধান।
অভিমান নিরাশায় কাঁদিয়া ফিরিয়া চায়
নর-চক্ষে বারি ধায় অনিন্দ্য বয়ান।
এ জগত কবিত্ব মহান।

না জানি কেমন সেই কবিতা সৃজিল যেই
মর্ত্ত্যলোকে স্বর্গ এই আনন্দ ভূমান্।
প্রকৃতি সে প্রতি বর্ষে বিতরিছে অতি হর্ষে
জীবনে এ উপভোগ অযাচিত দান।
এ জগত কবিত্ব মহান।

শ্রীচুণীলাল গুপ্ত।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। চতুর্থ ভাগ, প্রথম সংখ্যা। বর্ত্তমান বর্ষে "বিশ্বকোষের" বিখ্যাত সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু পরিষৎ-পত্রিকার সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সংখ্যা পাঠ করিয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি। এই সংখ্যার প্রথমেই ভূতপূর্ব্ব সম্পাদকের "মহারাণী বিক্টোরিয়ার রাজত্বে বাঙ্গালা সাহিত্য" নামক একটি প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধটি আশানুরূপ হয় নাই; এরূপ বিস্তৃত বিষয়ের আলোচনা সক্ষিপ্ত প্রবন্ধে অসম্ভব। আর প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গুপ্ত মহাশয় বর্ত্তমান প্রবন্ধে বিক্টোরিয়া রাজত্বের বাঙ্গালা সাহিত্যের যে সকল লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার মধ্যেও বিশেষ কোনও নূতন কথার অসদ্ভাব। এই প্রবন্ধে তিনি যে সকল মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাও সম্পূর্ণ অভিনব নহে, তাঁহার পূর্ব্বপ্রকাশিত অন্যান্য সন্দর্ভেও প্রায় এই সকল কথাই ইতিপূর্ব্বে সাধারণে পাঠ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র রায়ের "ভৌগোলিক পরিভাষা" আলোচনার যোগ্য। শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরীর "নরোত্তম ঠাকুর" প্রবন্ধটি উৎকৃষ্ট,—জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ। এই সংখ্যায় নরোত্তম ঠাকুরের "দেহকড়চ" অবিকল প্রকাশিত হইয়াছে। সম্পাদক বলিতেছেন,—"ইহা বঙ্গভাষার এক খানি প্রাচীন গদ্য গ্রন্থ। প্রায় সাড়ে তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের কিরূপ অবস্থা ছিল, এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা হইতে তাহার কতক কতক নিদর্শন পাওয়া যায়। দেহ-কড়চের দুই খানি পুথি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। * * * দুই খানি পুথিই বর্ণাশুদ্ধিতে পরিপূর্ণ।" কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিৎ সম্পাদক মূলে সংশোধন না করিয়া, টীকায় সংশোধন, পাঠান্তরাদির নিরূপণও আবশ্যকমত অর্থনির্দ্দেশ করিয়া বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন। "দেহকড়চ" বিদ্বৎসমাজে সমাদৃত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাঙ্গালার প্রত্নতত্ত্ব" পাণ্ডিত্যপূর্ণ উপাদেয় প্রবন্ধ। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বিরচিত "রমাই পণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গল" প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। শাস্ত্রী মহাশয় প্রতিপন্ন করিতেছেন যে, ধর্ম্মপূজা বৌদ্ধধর্ম্মের শাখাবিশেষেরই রূপান্তর ও অবশেষমাত্র। তিনি এখনও এ বিষয়ের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত আছেন, এবং ক্রমে আরও নূতন তত্ত্ব প্রকাশিত করিবেন, বলিতেছেন। আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছি। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ পরিশিষ্টে "ধর্ম্মমঙ্গল"-প্রথিত লাউসেনের রাজধানী ও ধর্ম্মপূজার আদিম জন্মভূমি "ময়নাগড়ে"র বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। আমরা আশা করি, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা এই নবনির্ব্বাচিত পথের পথিক হইয়া ক্রমশঃ অধিকতর উন্নতি ও উপযোগিতা লাভ করিবে। এসিয়াটিক্ সোসাইটীর জর্ণ্যাল্ যেমন বিবিধ 'বিশিষ্ট' বিষয়ের আলোচনায় অগ্রণী, পরিষদের মুখপত্র পরিষৎ-পত্রিকাও বঙ্গভাষার সেই অভাবপূরণ করিতে পারিবে। বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস, বাঙ্গালা দেশের, জাতির, ভাষার, সাহিত্যের প্রত্নতত্ত্ব, প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্য সাহিত্য প্রভৃতির অনুসন্ধান, আবিষ্কার, উদ্ধার ও সমালোচনা প্রভৃতি যে সকল 'বিশিষ্ট' বিষয়ের আলোচনা ব্যক্তিগত চেষ্টার দুঃসাধ্য, সাধারণের অনধিগম্য, পণ্ডিতজনের আলোচ্য ও পরিষদের মত বিদ্বৎসমাজেরই একমাত্র কর্ত্তব্য,—সেই সকল নিতান্ত আবশ্যক গুরুতর বিষয়ের আলোচনায় অবহিত হইলে, পরিষদের সাফল্য ও পত্রিকার গৌরব অবশ্যম্ভাবী। বক্ষ্যমাণ সংখ্যায় তাহার যে সূচনা দৃষ্ট হইতেছে, তাহা আশাপ্রদ। প্রার্থনা করি, নূতন সম্পাদক ক্রমে সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করুন।

আলফন্স ডোডে।

মসূরীর পথে।

আর গঙ্গোত্রীর পথে লিখিলে চলিবে কেন ? এ যাত্রায় গঙ্গোত্রী-দর্শন হইল না। আমরা এবার পথের মধ্য হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। কেন আসিলাম ? দেশে এমন কি আকর্ষণ ছিল যে, তাহারই জন্য লোকালয়ে আসিলাম ? এ কথার উত্তর দেওয়া তখন বড় সহজ হইত না। এখন যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, 'গঙ্গোত্রীর পথে' না হইয়া 'মসূরীর পথে' হইল কেন, তাহার একটা জবাব দিতে পারি। এখন এই ক্ষুদ্রগৃহপ্রান্তে বসিয়া নিজের জীবন সমালোচনা করিলে সে কথার জবাব পাই। গঙ্গোত্রীর পথে যাইতে যাইতে প্রতিদিনই আমার লোকালয়ের কথা মনে পড়িত ; এমন দিন যায় নাই, যেদিন আমি মানুষের বসতিস্থানে আসিবার জন্য ব্যাকুল হই নাই। পশ্চাতে এত টান লইয়া কি কেহ পর্ব্বতে আরোহণ করিতে পারে ? সম্মুখে স্থিরদৃষ্টি না হইলে এ সব দুর্গম বিপদসঙ্কুল পথে চলিবার যো নাই। একাগ্রতাই এই হিমালয়ে প্রধান পথপ্রদর্শক ; আমার সেই পথপ্রদর্শকের অভাব হইয়াছিল, তাই আমি পথ ছাড়িয়া, অনন্তহিমানীমণ্ডিত গঙ্গার উৎপত্তিস্থান ছাড়িয়া, জনকোলাহলপূর্ণ বিলাসকাকলিমুখরিত কৃত্রিমতার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। আর আমি যদি গঙ্গোত্রী যাইবার জন্য একাগ্রচিত্ত হইতাম, তাহা হইলে কি পথের মধ্যে আমার পদতলে এমন একটা প্রকাণ্ড স্ফোটক হয় ? হিমালয়ের মধ্যে আমি রোগে কষ্ট অতি কমই পাইয়াছি। এবারে আমাকে নিতান্তই ফিরিতে হইবে, তাই নানা দিক হইতে নানা প্রকার বাধা আমাকে ছাঁকিয়া ধরিয়াছিল।

ডুণ্ডা হইতে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমরা ধারাসুতে রাজার বাঙ্গলায় পঁহুছিলাম। গঙ্গোত্রীর উদ্দেশে যাইবার সময়েও এই বাঙ্গলাতেই আমরা ছিলাম। এত শীঘ্রই আমাদিগকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া বাঙ্গলার চৌকীদার বড়ই বিস্মিত হইল ; কিন্তু সে যখন শুনিল, আমি অসুস্থ—তাই ফিরিতে হইয়াছে, তখন সেই পর্ব্বতবাসী বড়ই কাতর হইল, এবং আমার পায়ের ফোড়া আরোগ্যের সহস্র রকম ঔষধের ব্যবস্থা করিল। ডুণ্ডার সে দোকানদার আমার পায়ে যে পুল্টিস বাঁধিয়া দিয়াছিল, এবং রাত্রে পুনরায়

লাগাইবার জন্য যে উপকরণ দিয়াছিল, তাহাতেই বিশেষ উপকার হইবে বলাতে, বাঙ্গলার চৌকীদার সেই পুল্টিস গরম করিবার জন্য তাড়াতাড়ি তাহার বাড়ীতে চলিয়া গেল। কিছু ক্ষণ পরেই সে তাহার দুইটি শিশুপুত্র ও একটি কিশোরী কন্যা সঙ্গে আমাদের নিকট উপস্থিত হইল; মেয়েটির হাতে গরম পুল্টিসের বাটী। চৌকীদার একখণ্ড নেকড়ায় করিয়া আমার পায়ে পুল্টিস বাঁধিয়া দিবার বন্দোবস্ত করিতেছে দেখিয়া, মেয়েটি "ঐসী নেহী" বলিয়া অসম্মতি জ্ঞাপন করিল; এবং সে যে এ বিষয়ে তাহার পিতা অপেক্ষা বেশী অভিজ্ঞ, তাহা দেখাইবার জন্য বাপের নিকট হইতে পুল্টিস কাড়িয়া লইল, এবং আমার ফোড়ার উপরে ধীরে ধীরে বসাইয়া দিতে লাগিল। চৌকীদার যে প্রকারে দিতেছিল, চিকিৎসাশাস্ত্রে সেই প্রকার বিধান থাকিলেও, মেয়েটির এ প্রকার স্নেহের বিধানের উপর কোন কথাই বলা ঘটিয়া উঠিল না। শুনিলাম, চৌকীদার তার মেয়ের শাসনে সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত থাকে; আজ আড়াই বৎসর হইল, তাহার সহধর্ম্মিণী এই "ছোটো লেড়কাঠো" দিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ছোট ছেলেটি যখন নয় দিনের, তখন তাহার মায়ের মৃত্যু হয়। সেই মৃত্যুদিন হইতেই বালিকা মায়ের পদে প্রোমোশন পাইয়াছে; সেই দিন হইতে সে তার মায়ের অপেক্ষাও অতি যত্নে ছোট ভাই দুটিকে লালনপালন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। হঠাৎ কোথা হইতে বালিকার ক্ষুদ্র প্রাণে ষোল আনা মাতৃকর্ত্তব্যের আবির্ভাব হইল, তাহা আমরা ক্ষুদ্র মানব কেমন করিয়া বলিব? কিন্তু চৌকীদার বলিল, তাহার সহধর্ম্মিণী বাঁচিয়া থাকিতেও তাহার গৃহস্থালী এমন গোছালো ছিল না। যেখানে যেটি যেমন ভাবে থাকিলে মানায়, এই বালিকা তাহা কেমন সুন্দর ভাবে করে; কখন কাহার কি দরকার হইবে, তাহা এই এতটুকু মেয়ের ঐ ক্ষুদ্র মাথার ভিতরে কেমন ঠিক আছে! আর সর্ব্বাপেক্ষা বিপদগ্রস্ত চৌকীদার বেচারী; তাহার পরলোকগতা সহধর্ম্মিণী তাহাকে সময়ে অসময়ে দুই একটা উপদেশ ও দুই একটা কটুকাটব্য বলিত; কিন্তু সে আজ এই বৃদ্ধবয়সে যে মায়ের হাতে পড়িয়াছে, সে যতক্ষণ জাগিয়া থাকিবে, ততক্ষণ তার এই ষষ্টিবৎসর-বয়স্ক ক্ষুদ্র শিশু পুত্রটিকে নানা প্রকার শাসনে রাখে! তার এই অপোগণ্ড ছেলেটির কি কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য, কোথায় যাওয়া উচিত কোথায় যাওয়া উচিত নয়, এই প্রকার সহস্র বিষয়ের পরামর্শ দেয়; সুধু পরামর্শ দিয়াই ক্ষান্ত থাকে না। তাহার সেই পরামর্শ-অনুসারে কার্য্য হইতেছে কি না,

তাহার অনুসন্ধান লয়। চৌকীদার বলিল, এই অল্প সময়ের মধ্যেই বালিকা স্থির করিয়া লইয়াছে যে, সমস্ত বিষয়ে সে তাহার বাপের অপেক্ষা বেশী বুঝে; আর তার বাপের বুঝিবার শক্তিও ভারি কম; তাই একটি কথা পাঁচ বার বলিয়াও তাহার বিশ্বাস হয় না। সে তখনও মনে করে, তার কথা বুঝি তাহার বাপ বোঝে নাই; তাই যখন তখন প্রশ্ন করে, "বাবাজী সমজ্‌মে গিয়া?" চৌকীদার যতক্ষণ "হাঁ মায়ী" বলিয়া কথাগুলির পুনরুক্তি না করিবে, ততক্ষণ নিস্তার নাই। মেয়ের এই সব অলৌকিক গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে চৌকীদার সত্যসত্যই আত্মহারা হইয়া গেল; তার হৃদয়ের মধ্যে কন্যাস্নেহের এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় অমৃতধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। হয় ত সেই সব কথা বলিতে বলিতে তার সেই জীবনের সহচরীর স্বর্গারোহণের কথাও তাহার মনে হইয়াছিল।

যখন চৌকীদার তার মেয়ের গুণকাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল, তখন মেয়েটি সেখান হইতে প্রস্থান করিল, এবং যেখানে আমাদের আহারের আয়োজন হইতেছে, সেই দিকে গেল; স্বামীজীও সেই দিকে চলিয়া গেলেন। আমি অতৃপ্তহৃদয়ে বালিকার স্নেহের ইতিহাস শুনিতে লাগিলাম। চৌকীদার আর কেন বিবাহ করিবে? এমন সোনার চাঁদ 'লেড়কা লেড়কী' যাঁর ঘর আলো করিয়া বিরাজিত, সে আবার কি দুঃখে বিবাহ করিবে? আর বিবাহ করিলে যে তাহার লেড়কালেড়কী পর হইয়া যাইবে, তাহার কি? আমি তাহার এ কথায় একটা আপত্তি করিলাম;—বিমাতা হইলেই যে মন্দ লোক হয়, তাহা ঠিক নয়। আমার কথায় বাধা দিয়া চৌকীদার বলিল, "নেহি নেহি পণ্ডিতজী, হররোজ এইসী হোতা"; এই বলিয়া সে তাহার দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতার ইতিহাস বলিতে বসিল;—তার এক মাসতুতো ভাই আছে, সে যখন পাঁচটি সন্তানের বাপ, তখন তার স্ত্রী মারা গিয়াছিল; সকলেই বিবাহ করিতে নিষেধ করিল, কিন্তু সে তার শ্বশুরের কথা শুনিয়া তার শ্যালিকাকে বিবাহ করিয়াছে; হায় হায়! আপন বড় বোনের ছেলে, তবুও সপত্নীসন্তান বলিয়া সেই ছেলেমেয়েগুলিকে সে কত কষ্ট দেয়, তা আর বলিবার নয়। আর কোন এক গ্রামের এক জনের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী তার সপত্নীর একমাত্র শিশুকন্যাকে এরূপ যন্ত্রণা দিত যে, এক দিন সেই মেয়েটি সকলের সম্মুখে পাহাড়ের গা হইতে ঝাঁপ দিয়া নীচের 'খদে' পড়িয়া বিমাতার যন্ত্রণার হাত হইতে নিস্তার পাইয়াছে। এই রকম আরও দশটা

গল্প বলিল। বুঝিলাম, এই পর্ব্বতপ্রদেশেও সপত্নীসন্তানের প্রতি হিংসা বর্ত্তমান আছে। একটা ভাবনা মনে হইল; এত দেশ ভ্রমণ করিলাম, মনুষ্য-প্রকৃতি সকল স্থানেই এক প্রকার; সেই দেবাসুর সকল দেশে সকল গ্রামে সকল স্থানেই আছে। সেই কলহ বিবাদ, সেই হিংসা দ্বেষ, সেই ভাল মন্দ, স্থানেই সমভাবে বিরাজ করিতেছে; এমন একটা স্থানও আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় দেখিলাম না, যেখানে পূর্ণ শান্তি, পূর্ণ প্রেম, পূর্ণ মঙ্গল বিরাজমান। এরূপ স্থান কি জগতে নাই?

মনের মধ্যে স্বর্গ নরক ত একটু একটু বুঝি; কিন্তু নিজের মনটুকু লইয়া যে সংসারে চলা যায় না, তার কি? প্রতিদিনই সহস্র মনের সঙ্গে ব্যবহার করিতে হইবে; সহস্র প্রকারের প্রকৃতির সঙ্গে আদান প্রদান করিতে হইবে। তাহার মধ্যে সব দিক গোছাইয়া স্বর্গ ঠিক রাখাটা কবিকল্পনায় সহজেই হয়, কিন্তু প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে জীবনসংগ্রামে কতখানি সম্ভবে, তাহা জানি না। মনুষ্যপ্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া আমি ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। সে কথা এখন থাক।

চৌকীদারের সুখ দুঃখের কাহিনী শুনিতে শুনিতে রাত্রি অধিক হইয়া গেল। এ দিকে আমাদের আহার প্রস্তুত। যথাসময়ে আহারাদি করিয়া সেই রাজ-বাঙ্গলায় হয় ত এ জন্মের মত শেষ নিদ্রার আয়োজন করা গেল।

শুক্রবার—আজ শুক্রবার; আমরা আজ ধারাসু হইতে নূতন পথে মসূরী যাইব। নূতন বটে, কিন্তু পথ নহে; পর্ব্বতের মধ্যে সাধারণের সর্ব্বদা-গমনোপযোগী যে রাস্তা, তাহার ভীষণতা মনে করিলেই প্রাণ আকুল হইয়া উঠে; পাহাড়ীদিগকে কোন রাস্তার কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা 'সি' অক্ষরটির উপর অনাবশ্যক দীর্ঘ টান দিয়া "সিধা সড়ক" বলিয়া যে রাস্তার গুণ ব্যাখ্যা করিয়াছে, সেই রাস্তার চড়াই উৎরাই ভাঙ্গিতেই আমাদের মত দুর্ব্বলপ্রাণ জীবের অস্থিপঞ্জর ভাঙ্গিয়া যায়। আর আজিকার এই যে নূতন পথে আমরা যাইব, তাহার সম্বন্ধে ডাণ্ডিওয়ালারাই এক ভীষণ বর্ণনা দাখিল করিল; এ সব পাকদাণ্ডী দিয়া সচরাচর লোকজন চলে না; নিতান্ত জরুরী কাজ না থাকিলে এবং শরীরে যথেষ্ট শক্তি না থাকিলে, এ পথে কেহ যাইতে চাহে না। কিন্তু আমাকে শীঘ্র মসূরী পৌছাইবার জন্য স্বামীজী সব প্রকার কষ্ট সহ্য করিতেই প্রস্তুত; পক্ষান্তরে পাঁচ দিনের কাজ যদি একটু বেশী কষ্ট স্বীকার করিলে দুই দিনেই হয়,

ডাণ্ডিওয়ালাগণেরও তাহাতে আপত্তি নাই। সুতরাং আমরা গঙ্গার তীরভূমি ত্যাগ করিয়া একবারে পর্ব্বতের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। নদীর তীর দিয়া ক্রমাগত যাওয়ার সুবিধা অসুবিধা দুইই আছে; সুবিধা এই যে, চড়াই উৎরাই থাকিলেও তাহা প্রায়ই খুব বড় হয় না; কারণ নদীর গায়ে গায়ে যাইতে হইবে; তবে রাস্তার সুবিধার জন্য কোন স্থানে চড়াই উঠিতে হয়, কোথাও বা নামিতে হয়, এবং কোন স্থানে একটু রাস্তা সংক্ষেপ করিবার জন্য এক আধটা পর্ব্বত পার হইতে হয়। সুবিধা এই। অসুবিধা এই যে, সেই পর্ব্বতদুহিতা আপন মনে কাহারও সুবিধা অসুবিধার দিকে দৃষ্টি না করিয়া, সময় যে অমূল্যধন, এ কথাটা মোটেই না পড়িয়া ও না বুঝিয়া, আপন খুসীতে একবার বামে একবার দক্ষিণে চলিতেছেন। তাঁহাকে যাইতে হইবে দক্ষিণ দিকে, হিমালয়নিঃসৃতা কাহারও দক্ষিণ ছাড়া গতি নাই, অন্ততঃ ভারতবর্ষের দিকে যাঁহাদের টান। কিন্তু এই পর্ব্বতনন্দিনীগণের দিক্‌নির্ণয়-শক্তি এমনই প্রবল যে, তাঁহারা দক্ষিণ দিকে না গিয়া খাড়া পশ্চিম দিকেই তিন মাইল চলিলেন; তাহার পর হয় ত চৈতন্য হইল; তখন নানা কৌশলে এবং যেখানে কৌশল সফল হয় না, সেখানে বলপ্রকাশে পর্ব্বত-দেহ বিদীর্ণ করিয়া বিশ পঁচিশ হাত দক্ষিণ দিকে গেলেন। আবার দিক্ ভুল! আবার পশ্চিম কি পূর্ব্ব দিকে গতি। এমন নিষ্কর্ম্মা ভবঘুরে আপনা-ভোলা পর্ব্বত-নদীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলে রাস্তা যে সহজে ফুরাইতে চায় না, তাহা বলাই বাহুল্য। আমরা যদি গঙ্গার ধারে ধারে ক্রমাগত চলিতাম, তাহা হইলে এই ধারাসু হইতে মসূরী আসিতে অনেক দিন লাগিত; বিশেষ মসূরীর সঙ্গে ত গঙ্গাদেবীর সাক্ষাতের কখনও কোন সুদূর সম্ভাবনাও নাই। একজন আপনার গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া হিমালয়ের এক পার্শ্বের শিখরদেশে বসিয়া আছেন, আর এক জন সেই হিমালয়ের পদ ধৌত করিয়া নিম্ন হইতে নিম্নতর প্রদেশে যাইতেছেন। এক জন উপরে উঠিতে-ছেন, এক জন নীচে নামিতেছেন; এক জন মস্তকে উঠিতেছেন, আর এক জন পদতলে লুটাইয়া পড়িতেছেন; এ দুই জনের সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব। তবে এ দুই জনের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কাহার গৌরব অধিক, সে বিচার এখন করিতে গেলে "শিবের গীত"ও সীমা অতিক্রম করিয়া বসে।

আমরা আজ গঙ্গাকে ফেলিয়া এড়োএড়ি পাকদাণ্ডি দিয়া মসূরী যাইবার সোজা পথে উঠিলাম। এ পথের কষ্টের কথা আর কি বলিব? তবুও আমি

আর এখন পদব্রজে চলিতেছি না; আমার চলিবার শক্তি নাই; আমি সেই দৃঢ়কায় পর্ব্বতবাসী দুইটি জীবের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া এই চড়াই উৎরাই পার হইতেছি। কিন্তু তাহাদের বারম্বার কাঁধ-বদল ও লোক-বদল দেখিয়াই বুঝিতে পারিতেছিলাম যে, একে আমার মত প্রকাণ্ডদেহ মানুষকে বহন করাই সহজ কথা নহে, তাহার উপর এই রাস্তা। আমাদের বঙ্গদেশীয় ডাল-ভাত-ভোজী বাঙ্গালী বেহারা হইলে ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যেই তাহাদের বেহারা-জীবনের শেষ হইয়া যাইত। কিন্তু পাহাড়ী লোকের মত কষ্টসহিষ্ণু জাতি বোধ হয় ভারতবর্ষে অধিক নাই। তাহারা অনায়াসে তিন চারি মণ বোঝা লইয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চড়াই উঠিয়া যায়। আমরা দেখিয়াছি, পনর ষোল বৎসরের একটি মেয়ে তিন মণ একটা কাপড়ের গাঁট লইয়া রাজপুর হইতে মস্থরী যাইতেছিল। রাজপুর হইতে মস্থরী সহর প্রায় সাত মাইল, আর তাহার আগাগোড়া চড়াই। আমার সঙ্গে যে বাহকেরা ছিল, তাহারা বলিল যে, আমি যদি তিহরীর পথে মস্থরী আসিতাম, তাহা হইলে তাহাদের এত কষ্ট হইত না। কিন্তু তাহারা পাঁচ দিনের কাজ দুই দিনে শেষ করিবার জন্য ইচ্ছাক্রমেই এই ভয়ানক পথে আসিয়াছে। তাহাদের কষ্টের সঙ্গে তুলনায় আমার কষ্ট কম হইলেও, আমার বড়ই ক্লেশ হইতেছিল; এ প্রকার ডাণ্ডি চড়িয়া যাওয়া অপেক্ষা আমার পদব্রজে যাওয়ার শক্তি থাকিলে তাহাই শত গুণে ভাল ছিল। আমার এ ভক্তির মধ্যে Sentimentality মোটেই নাই। তাহা হইলে আর অনায়াসে পরের স্কন্ধে চড়িয়া তীর্থপর্য্যটনের শেষ করিতাম না। আমি বাহকগণের কষ্টে ব্যথিত হইয়াছিলাম কি না, সে কথা নাই বলিলাম; কিন্তু আমার যে কষ্ট হইতেছিল, তাহা অসহ্য। আমাদের দেশে একটা প্রবাদকথা আছে,—"সুখের চাইতে স্বস্তি ভাল!" আমারও সেই কথা মনে হইতে লাগিল; পরের স্কন্ধে চড়িয়া যাওয়া অপেক্ষা হাঁটিয়া যাওয়া আমার ভাল ছিল। পথ চলিয়া পায়ে বেদনা হওয়াটা এখন একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছি। পথ চলিতে চলিতে তখন এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল যে, বেদনাবোধ ছিল না; সুতরাং পথ চলিতে চড়াই বা উৎরাইয়ের কষ্ট আমার তেমন অনুভব হইত না। কিন্তু ডাণ্ডির বাঁশ ক্রমাগত আমার বুকে লাগিয়া এমন যন্ত্রণা দিতে লাগিল যে, আমার বোধ হইতেছিল, আমার বুকের অস্থিপঞ্জর বুঝি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যখন এক একবার ডাণ্ডি নামাইয়া বাহকগণ বিশ্রাম করে, আমি তখন অনন্যোপায় হইয়া দুই হাতে বুক চাপিয়া বসিয়া থাকি-

তাম। কিন্তু আর উপায় নাই। পথের মধ্যে থাকিবার স্থান নাই। বহু কষ্টে বহু পরিশ্রমে লালুড় গ্রামে আসিয়া একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আমি ত একেবারে শুইয়া পড়িলাম, এবং বুকের বেদনায় অস্থির হইয়া গেলাম। কিন্তু স্বামীজীকে কিছুই বলিলাম না। তিনি আমার পায়ের অবস্থা দেখিয়াই কাতর, এবং সেই জন্যই বৃদ্ধ এত কষ্ট স্বীকার করিয়া তাড়াতাড়ি আমাকে লইয়া মস্থরী যাইতেছেন; তাহার পর যদি তাঁহাকে বলি, আমার বুকে অসহ্য বেদনা, তাহা হইলে হয় ত এই পর্ব্বতের মধ্যে বৃদ্ধ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবেন। আমার এই ভয় বড়ই অধিক হইয়াছিল, বিশেষ এখন তাড়াতাড়ি যাইতে হইলে আর ত কোন উপায় নাই; যেমন করিয়া হউক, এই দাণ্ডীতেই যাইতে হইবে।

লালুড় গ্রামের লোকেরা পরম যত্নে রাজঅতিথির সেবা করিল। এবার আমরা এক-আধ জন লোক নহি, আমরা দলে নয় জন লোক। ছয় জন ডাণ্ডিওয়ালা, আমরা দুই জন, আর এক জন সিপাহী। আমরা পরম পরিতোষের সহিত মধ্যাহ্নক্রিয়া শেষ করিয়া সেই তরুতলেই বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। আমার পায়ের অবস্থা অনেক ভাল।

অপরাহ্নে প্রকাণ্ড তিন ক্রোশের চড়াই উঠিতে হইল। ইহার মধ্যে জল পাইবার যো নাই; এই জন্য এ স্থানটি আরও ভয়ানক। ভগবান যদি এই সব পাষাণ-হৃদয়ে জলের প্রস্রবণ না দিতেন, তাহা হইলে এই সব পর্ব্বত মানুষের গমনাগমনের অযোগ্য হইত। আমাদের সঙ্গে যে সামান্য জল ছিল, নয় জন মানুষ একবার পান করিতেই তাহা নিঃশেষ হইয়া গেল। আমরা সকলেই রাস্তা হইতে অনেকগুলি 'চিলু' ফল সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম। এ ফলগুলি খুব বড় না হইলেও নিতান্ত ছোট নহে, এবং ইহাদের স্বাদ অম্ল-মধুর; সুতরাং এ সময়ে এই ফল আমাদের বড়ই উপকারে লাগিল। আমার যদিও বেশী তৃষ্ণা বোধ হয় নাই, কারণ আমি ত আর হাঁটিতেছি না, তথাপি বাহকেরা যখন এক এক স্থানে বসিয়া সেই ফল পরস্পরে বাঁটিয়া খাইতে লাগিল, তখন আমাকেও তাহাদের সমান ভাগ দিতে লাগিল। আমি দুই চারিটি খাইলাম, এবং দুই চারিটি তাহাদিগকে দিলাম। এই ফল খাইয়া সকলেই মুখে কথঞ্চিৎ রস আনিতে লাগিলেন। এই প্রকারে বহু কষ্টে প্রায় সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময়ে চড়াই উঠা শেষ হইল; তখনও জল নাই; আর পর্ব্বতের অতি উচ্চ শিখরের উপর জল কোথায় বা থাকিবে? আমরা

কি করি? সেই সন্ধ্যার সময়, যখন চারি দিকে সব নিস্তব্ধ হইয়া আসিতেছে, যখন পশ্চিম-গগনে সূর্য্য অস্ত গিয়াছেন,—কিন্তু এখনও তাঁহার গমনপথ সিন্দুররঞ্জিত রহিয়াছে, যখন পাখীরা চারি দিকে বাসায় যাইতেছে, সেই সময় আমরা সেই পর্ব্বতের মস্তকে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছি; সেখানে আর গ্রাম বা লোকালয় কোথায় থাকিবে? এখন তিন মাইল পথ নীচে নামিলে তবে গ্রাম পাওয়া যাইবে। গ্রামের জন্য আমরা তত ব্যস্ত হই নাই। এক রাত্রি বৃক্ষতলে কাটাইতে আর আমাদের কষ্ট নাই; এমন অনেক বিনিদ্র রজনী অনাবৃত নীলাম্বর-তলে প্রস্তরশয্যায় কাটিয়া গিয়াছে। সে জন্য ভাবনা হয় নাই; এক রাত্রি অনাহারে থাকিলেও মারা যাইব না; এমন অনাহার এ দীর্ঘ প্রবাসে অনেক দিন সহিতে হইয়াছে; অতি অল্প দিনই দুই বেলা আহার জুটিয়াছে। সে জন্য ব্যাকুল হই নাই। আমরা তখন তৃষ্ণায় কাতর; ফলগুলি ইতিপূর্ব্বেই ফুরাইয়া গিয়াছে; এখন আর তৃষ্ণানিবারণের কোনও উপায় নাই। সিপাহী প্রস্তাব করিল, আজ রাত্রে এইখানে গাছের তলায় সকলে পড়িয়া থাকি, এবং দাণ্ডিওয়ালারা কয়েক জন নীচে যাইয়া আমাদের জন্য জল অনুসন্ধান করিয়া লইয়া আসুক। সিপাহী কখনও সে পথে মসূরী যায় নাই, সে কোন সংবাদই রাখে না। ডাণ্ডিওয়ালাদের মধ্যে দুই জন সে পথ জানে। তাহারা বলিল, এখান হইতে দেড় মাইল নীচে একটা ঝরণা আছে, এক মাস পূর্ব্বে তাহারা সেই পথে যাইবার সময়ে দেখিয়া গিয়াছে; এত দিনে যদি সেই ঝরণা শুকাইয়া গিয়া না থাকে, তাহা হইলে কষ্টে-সৃষ্টে এই দেড় মাইল পথ গেলে জল মিলিতে পারে। স্বামীজীর সেই মত হইল। তখন অন্ধকার হইয়াছে। আমরা বিশেষ সাবধানে নামিতে লাগিলাম; বোধ হয় দুই মাইল পথ নামিয়া আমরা একটা অতি ক্ষুদ্র ঝরণা পাইলাম; তাহার জল অতি শীতল। আমরা প্রাণ ভরিয়া সেই জল পান করিলাম, এবং সে রাত্রি ঐ ঝরণার পার্শ্বেই অতিবাহিত করিবার সঙ্কল্প করিলাম। সকলের তাহাতে মত হইল না। আর এক মাইল নীচে নামিলেই যখন লোকালয় পাওয়া যাইবে, তখন অকারণ এই হিংস্রজন্তুপূর্ণ স্থানে বাস করিবার প্রয়োজন কি? স্বামীজী না হয় সন্ন্যাসী, আমিও না হয় বাড়ী ঘর ছাড়িয়া পথে পথে বেড়াইতেছি; ডাণ্ডিওয়ালারা ত আর সন্ন্যাস করিতে বাহির হয় নাই; তাহারা আমাকে মসূরী পৌঁছাইয়া দিয়া টাকা পাইবে, সেই টাকায় তাহাদের সংসার চলিবে; তাহাদের স্ত্রী পুত্র পরিবার

তাহাদের প্রত্যাগমনপথের দিকে চাহিয়া দিন গণিবে; তাহাদের অভাবে তাহাদের পর্ব্বতকুটীর অন্ধকার হইবে। তাহারা অকারণ এই জঙ্গলের মধ্যে পড়িয়া থাকিতে স্বীকার করিবে কেন? অবশেষে সেই অন্ধকারে আরও এক মাইল নীচে নামিয়া 'মারোয়াড়া' গ্রামে পৌঁছিলাম। তখন গ্রামের লোকের অর্দ্ধরজনী। রাত্রি প্রায় আটটা বাজিয়া গিয়াছে, এত রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকিবার কোন দরকার তাহাদের হয় না; বিশেষ কোন ব্যাপার উপস্থিত না হইলে সন্ধ্যার সময়ে পর্ব্বতক্রোড়স্থ গ্রাম সকল নিদ্রার ক্রোড়ে সুষুপ্ত হইয়া পড়ে।

আমরা নয় জন লোক হঠাৎ সেই রাত্রে সেই সুপ্ত গ্রামের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া একটা বিষম কোলাহল জাগাইয়া তুলিলাম। প্রথমে যে গৃহস্থের দ্বার আমরা আক্রমণ করিলাম, সে ত কিছুতেই কথা কহে না; অনেক ডাকাডাকিতে এক জন স্ত্রীলোক সাড়া দিল, এবং জানাইয়া দিল যে, তাহারা গরিব মানুষ; তাহাদের গৃহে অতিথির স্থান হইবার সম্ভাবনা নাই; গ্রামের লম্বরদার বড়মানুষ, তাহার বাড়ীতে গেলে আমরা স্থান পাইব। কিন্তু সে লম্বরদার (তহসিলদার) কোন গৃহের মালিক, সে প্রশ্নের আর কোনও উত্তর পাওয়া গেল না। আমরা তখন সকলে মিলিয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করা সুবিধাজনক নহে স্থির করিয়া, সেই কুটীরপ্রাঙ্গণে বসিয়া পড়িলাম। সিপাহী ও ঐ প্রদেশের পথ ঘাট সম্বন্ধে জানা শুনা আছে, এমন দুই জন ডাণ্ডিওয়ালা লম্বরদারের গৃহ-উদ্দেশে যাত্রা করিল। তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায় অবলম্বন করিল; সম্মুখে যাহার গৃহ দেখে, চেঁচাইয়া তাহাকেই জাগায়, এবং সে যখন লম্বরদারের গৃহ "আউর আগাড়ি" বলিয়া অর্গলবদ্ধ গৃহের মধ্যেই পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া দ্বিতীয়বার নিদ্রার আয়োজন করে, তখন সিপাহী তাহারই নিকটবর্ত্তী আর এক গৃহস্থকে ডাকিয়া উঠায়। এমনি করিয়া সেই ক্ষুদ্র গ্রামের সমস্ত অধিবাসীকে জাগরিত করিয়া অবশেষে গ্রামের অপর প্রান্তের একখানি অনতিবৃহৎ গৃহ হইতে লম্বরদার মহাশয়কে টানিয়া বাহির করিল। রাজার পেয়াদা, রাজার পরওয়ানা আছে, সে এক জন সামান্য লম্বরদার কি করে; ভয়ে ভয়ে আমাদের কাছে আসিল; কিন্তু সে সময়ে বোধ হয় সে মনে মনে এমন অতিথিগণকে যমের গৃহের সোজা রাস্তা দেখাইতেছিল। লম্বরদার আসিয়াই এত রাত্রে "রসদ মিল্‌না ত বহুত মস্কিলকা বাত" বলিয়া গৌরচন্দ্রিকা আরম্ভ করিল। স্বামীজী তাহাকে বলি-

লেন, আমাদের জন্য কিছুরই দরকার নাই, তবে এই ডাণ্ডিওয়ালা ছয় জন রাত্রে কিছু আহার করিতে না পাইলে প্রাতে কেমন করিয়া পথ চলিবে? আর গ্রামে যদি কোন দোকান থাকে, তাহা হইলে আমরা পয়সা দিয়া আটা আদি কিনিতে সম্মত আছি। স্বামীজীর কথা শুনিয়া লম্বরদার চলিয়া গেল, এবং কিছুক্ষণ পরে আসিয়া আমাদিগকে ডাকিয়া লইয়া গেল। আমরা গিয়া দেখি, একখানি ঘরের মধ্যে আমাদের দুই জনের জন্য দুইখানি চারপায়ী দিয়াছে; এবং তিন চারি জন গ্রামবাসী আমাদের আহারের আয়োজন করিতেছে। স্বামীজী একখানি চারপাইয়ের উপর আসন করিয়া বসিলেন; এবং গ্রামবাসিগণকে বলিলেন যে, ডাণ্ডিওয়ালারাই সকলের আহার প্রস্তুত করিবে, তাহাদের আর কোন কষ্ট করিতে হইবে না। গ্রামবাসিগণ তখন ধীরে ধীরে আসিয়া স্বামীজীর সম্মুখে বসিল; তাহারা চার পাঁচটি মানুষ—বোধ হয় তাহারাই গ্রামের মধ্যে ভাল মানুষ, কারণ এত রাত্রে যখন তাহারা আমাদের জন্য কষ্ট করিয়া সমস্ত সংগ্রহ করিয়া দিল, তখন তাহাদের মনে একটু ধর্ম্মভাব আছে!—স্বামীজী যথারীতি তাহাদের সঙ্গে ধর্ম্মকথা জুড়িয়া দিলেন; আর আমি বুকের বেদনায় কাতর হইয়া দ্বিতীয় চারপাইয়ের উপর শুইয়া পড়িলাম, এবং ধীরে ধীরে নিদ্রার কোমলক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিলাম। অনেক রাত্রে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইলে নিদ্রার ঘোরেই কি খাইয়া আবার শুইয়া পড়িলাম। কোন দিক দিয়া রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল।

শনিবার—প্রাতে গ্রাম-ত্যাগ। আজ ক্রমাগত উৎরাই। ছয় মাইল নামিয়া আসিয়া একটি স্থানে উপস্থিত; তাহার দুই পার্শ্বে অতি উচ্চ পর্ব্বত; মধ্যে অতি সঙ্কীর্ণ স্থান, সেই স্থান দিয়া একটা ঝরণা প্রবলবেগে বহিয়া যাইতেছে। আর সেই ঝরণার এমন আঁকা বাঁকা চলন যে, তাহার মধ্যে ডাণ্ডি ঘোরা দূরে থাকুক, দুই এক স্থানে মানুষেরই ঘোরা ফেরা শক্ত। আমাদিগকে সেই ঝরণার উজান বাহিয়া কতক দূর যাইতে হইবে; কারণ ঝরণার যে পারে আমরা দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহার অপর পার একেবারে সমানে দাঁড়াইয়া আছে; তাহার গায়ে একগাছি তৃণও নাই। বিরাট পর্ব্বত নিজের পাষাণ-দেহের অস্থিকঙ্কাল বাহির করিয়া নগ্নদেহে দাঁড়াইয়া আছে। আমাদিগকে সেই ঝরণা উজান বাহিয়া যাইতে হইবে, তাহা হইলে অপর পারে একটা সমতলভূমিতে উপস্থিত হইতে পারিব। ডাণ্ডিওয়ালাদের এক জন ডাণ্ডি স্কন্ধে লইয়া প্রথমে গেল, এবং দুই চারি পা গিয়াই অদৃশ্য হইল, কারণ

সেই ঝরণার গতি এমনি বাঁকা যে, দশ পা গেলেই আর মানুষ দেখা যায় না। সিপাহীর হাত ধরিয়া স্বামীজী রওনা হইলেন; আমাকে ফেলিয়া যাইবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ডাণ্ডিওয়ালারা যখন তাঁহাকে অভয় প্রদান করিল, তখন তিনি অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত মনে চলিয়া গেলেন। আমাকে লইয়া যাইবার জন্য তিন জন লোক রহিল। এতদিন অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়া অনেক যানে আরোহণ করিয়াছি, কিন্তু আজ যানের চরম! পর্ব্বতবাসিগণ স্কন্ধ অপেক্ষা পৃষ্ঠে বেশী বোঝা বহিতে পারে। আমাদের দেশের কুলীরা স্কন্ধে অথবা মস্তকে মোট বহন করে; পর্ব্বতবাসিগণ তাহা পারে না, তাহারা পৃষ্ঠে করিয়া লইয়া যায়।

ডাণ্ডিওয়ালারা আমাকে তাহাদের একজনের পিঠে চড়িয়া গলা জড়াইয়া ধরিতে বলিল; কিন্তু আমি তাহা বড় সুবিধার কথা মনে করিলাম না। হঠাৎ যদি আমার হাত খুলিয়া যায়, তবেই একেবারে প্রাণ হারাইব। সে ভাবে যাইতে অস্বীকৃত দেখিয়া তাহারা আমাকে কম্বলে জড়াইয়া এক জন তাহার পিঠের সঙ্গে বাঁধিল, এবং অবলীলাক্রমে সেই জলরাশি ভেদ করিয়া যাইতে লাগিল; আর দুই জন তাহার পশ্চাতে থাকিল, এবং তাহারা অতি সতর্কভাবে আমার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। বুঝিলাম, তাহাদের মতলব এই যে, যদিই কোন রকমে আমি কম্বল ছিঁড়িয়া পড়িয়া যাইবার মত হই, তাহা হইলে তাহারা তৎক্ষণাৎ আমাকে ধরিয়া ফেলিবে। পথও নিতান্ত কম নহে; আধ মাইলের উপর হইবে। ঝরণার স্রোতও অতিশয় প্রবল; সেই স্রোতের প্রতিকূলে যাইতে হইতেছে। প্রতিপদক্ষেপেই পতনের সম্ভাবনা, কিন্তু সবলকায় ডাণ্ডিওয়ালা অতিসাবধানে পা ফেলিয়া আমাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দিল। আজ আমার পায়ের অবস্থা অনেক ভাল। এমন কি, পা পাতিয়া আমি দুই চারি পা চলিলেও চলিতে পারি।

আমরা ঝরণা পার হইয়া একটা পরিত্যক্ত দোকান-ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। গ্রাম সেখান হইতে এক মাইল উপরে, আমাদিগকে আজ আর উপরে উঠিতে হইবে না। সুতরাং আমরা সেই দোকানেই বসিলাম; সিপাহী ও ডাণ্ডিওয়ালারা গ্রামে গিয়া আহার-দ্রব্য লইয়া আসিল। শুনিলাম, সে গ্রামের নাম "আল্‌মস।" আজ অপরাহ্নে আমরা আর বাহির হইতে পারিলাম না। কারণ, দুই জন ডাণ্ডিওয়ালা অতিশয় কাতর হইয়া পড়িয়াছে,

তাহাদিগকে এ অবস্থায় ফেলিয়া যাওয়াও অকর্ত্তব্য মনে করিয়া আমরা সে রাত্রি সেখানেই বাস করিলাম।

রবিবার—আজ আমরা মসূরী পঁহুছিব। এই 'আল্‌মস' হইতে মসূরী বার মাইল রাস্তা; অবশ্য চড়াই উঠিতে হইবে। অসুস্থ ডাণ্ডিওয়ালা দুই জন ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। অনুমান পাঁচ মাইল রাস্তা আসিয়া একটা মেষ-পালকের আড্ডায় আশ্রয় লইলাম। সে আমাদের জন্য খাদ্য-দ্রব্য কিছুই সংগ্রহ করিতে পারিল না, অনাহারেই মধ্যাহ্ন কাটিয়া গেল।

বেলা প্রায় তিনটার সময়ে আমরা আবার বাহির হইলাম। মাইল দুই আসিয়া অতি সুন্দর রাস্তায় পড়িলাম। আর কিছু দূর আসিয়াই আমরা ল্যাণ্ডর সহর দেখিতে পাইলাম। তখন স্বামীজী, সিপাহী ও দুই জন ডাণ্ডি-ওয়ালা মসূরীর দিকে চলিয়া গেলেন। আমি দিবাভাগে এমন সুন্দর যানে আরোহণ করিয়া সহরের মধ্যে যাইতে অস্বীকার করিলাম। কাজেই আমরা সহরের বাহিরে সন্ধ্যার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। বেলা তখন প্রায় তিনটা। মসূরীতে গ্রীষ্মকালে দেরাদুনের The Great Trignometrical Survey আফিসের একটা শাখা উঠিয়া আসে। বড় বড় সাহেবেরা এবং conpator মহাশয়েরা গ্রীষ্মের কয় মাস মসূরীতে বাস করেন। সর্‌ভে আফিসের বাঙ্গালী বাবুরা আমার পরমাত্মীয়। স্বামীজী তাঁহাদের বাসায় পৌছিয়া সংবাদ দিলেই দুই তিন জন আমার সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং সন্ধ্যার অনেক পূর্ব্বেই তাঁহারা আসিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া আমার এমন আনন্দ হইল যে, আমার পায়ের যন্ত্রণা ভুলিয়া গেলাম। সেই সময়ে সেখান দিয়া একটা ঘোড়া যাইতেছিল, তাঁহারা সেই ঘোড়া ভাড়া করিলেন, এবং আমি তাঁহাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া ধীরে ধীরে সহরে প্রবেশ করিলাম; বন্ধুদ্বয় আমার সঙ্গে গল্প করিতে করিতে পদব্রজে চলিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার সময়ে আমরা বাসায় পৌছিলাম। সেই রাত্রেই বন্ধুগণ ডাণ্ডিওয়ালাদিগকে বিদায় দিলেন, এবং সিপাহীকেও যথেষ্ট পুরস্কার দিয়া ও তিহরীর বন্ধুগণকে ধন্যবাদপত্র লিখিয়া বিদায় করিলেন। আমার গঙ্গোত্রী-ভ্রমণ-বৃত্তান্তও সমাপ্ত হইল। পাঠকমহাশয়-গণ একবার সমস্বরে বলুন,—"আঃ বাঁচা গেল!"

শ্রীজলধর সেন।

আলফন্স ডোডে।

সাধারণ পাঠকসমাজে উপন্যাসের যত আদর, অন্য কোনও প্রকার পুস্তকের তত আদর নাই। কোন কোন সমালোচকের মতে উপন্যাস-বিভাগে ফরাসী সাহিত্যের যেরূপ উৎকর্ষ হইয়াছে, অন্য কোন সাহিত্যের সেরূপ উৎকর্ষ হয় নাই। আবার কোন কোন সমালোচক ইহাও বলিয়া থাকেন যে, ফরাসী সাহিত্যে অশ্লীল উপন্যাসের সংখ্যা অন্য সকল সাহিত্য অপেক্ষা অধিক। এ কথা যে একেবারে অসত্য, এমন কথা বলিতে পারা যায় না; কিন্তু ফরাসী উপন্যাসের একজন সমালোচক এ কথার যে উত্তর দিয়াছেন, তাহাও নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। তিনি বলেন,—ফরাসী উপন্যাস অপ্রাপ্তবয়স্ক পাঠকের জন্য লিখিত হয় না। ইংলণ্ডে বালক বালিকারাও অবাধে সংবাদ-পত্র ও উপন্যাস সকল পাঠ করিতে পাইয়া থাকে; ফ্রান্সে জনক বা জননী আপনি পাঠ না করিয়া কোনও পুস্তক দুহিতাকে পাঠ করিতে দেন না। জগতে পাপের অভাব নাই সত্য; কিন্তু পাপের পূতিগন্ধ বাদ দিয়াও পাপের চিত্র চিত্রিত করা যাইতে পারে। ভিক্টর হুগোও বাস্তবাদর্শ-প্রিয়, জোলাও বাস্তবাদর্শ-প্রিয়, তথাপি উভয়ের রচনায় কত প্রভেদ! কোন সঙ্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ আবিল জলরাশির বর্ণনার সময় হুগো সেই জলবক্ষে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য-করোজ্জ্বল নীলাম্বরের চিত্রও অঙ্কিত করিতেন; জোলা সেই চিত্রটি পরিহার করেন, অধিকন্তু তাঁহার বর্ণনায় সেই আবদ্ধ জলের অপ্রীতিকর দুর্গন্ধ অনুভূত হয়। ডোডের বাস্তবাদর্শমূলক উপন্যাস "স্যাফো"র উৎসর্গ এইরূপ,—"To my sons when they are twenty"; ইহা হইতেই পাঠক সমালোচকের পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তির অর্থ বুঝিবেন—ফরাসী উপন্যাস অপ্রাপ্তবয়স্ক পাঠকের জন্য লিখিত হয় না।

বিগত বিংশতি বৎসরকাল যে সকল ঔপন্যাসিকের পুস্তক সকল ফরাসী উপন্যাসের পূর্ব্বগৌরব অক্ষত রাখিয়াছে, তাঁহাদিগের মধ্যে গীদে মোপাসাঁ, পিয়ের লোটি, এড্‌মণ্ড ডি গন্‌কুর, আলফন্স ডোডে, জর্জ্জেস অনেট, পল-বুর্জ্জ্যা ও এমিল্ জোলার নাম সাধারণের নিকট বিশেষ পরিচিত। ইহাঁদের অন্যতম ডোডের সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে।

দরিদ্র পরিবারে ডোডের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা সামান্য ব্যবসায়ে ব্যাপৃত-ছিলেন। তাঁহার আয় বড় অধিক ছিল না, কিন্তু পরিবারে সন্তানের সংখ্যা ছিল

সপ্তদশ। অল্প আয়ে এই বৃহৎ পরিবারের প্রতিপালন একেবারে অসম্ভব না হইলেও দুঃসাধ্য ; কাজেই পরিবারে দুঃখ দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর দংশন সর্ব্বদাই সহ্য করিতে হইত। শৈশব হইতে ডোডে নিত্য দেখিতেন, রুটিওয়ালা আর ধারে রুটি দিতে চাহে না ; ভৃত্য বেতন না পাইয়া আর প্রভুকে সম্মান করে না ; উত্তমর্ণগণ ক্রমেই অধীর হইয়া উঠিতেছে। নানা দুঃখে সজলনয়না জননী ও নানা জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত সদাক্রুদ্ধ পিতার স্মৃতি ডোডের শৈশব-স্মৃতির সহিত বিজড়িত হইয়া গিয়াছিল। ডোডের প্রথম জীবনের ইতিহাস পাঠ করিতে করিতে অনেক সময় অশ্রু সম্বরণ করা অসম্ভব হইয়া উঠে। তিনি তাঁহার নানা পুস্তকে আপনার জীবনের নানা অবস্থার বর্ণনা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন—সে সকল বর্ণনা তাঁহার আপনার অভিজ্ঞতার ফল বলিয়াই হৃদয়স্পর্শী ও হৃদয়বিদারক।

এইরূপ দরিদ্র পরিবারে নানা কষ্ট সহ্য করিয়া বিদ্যাশিক্ষার পর ডোডে কোনও বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এখানে তাঁহার যন্ত্রণার সীমা ছিল না। ডোডে আপনি বলিয়াছেন, তাঁহার সেই যন্ত্রণার সহিত তুলনায়, প্যারিসের দরিদ্র্যদুঃখও তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। সেই সময় আত্মহত্যা করিয়া সকল যন্ত্রণা শেষ করিবার কথাও তাঁহার মনে হইয়াছিল! ক্ষীণদৃষ্টি শিক্ষকের উপর ছাত্রগণ নানাপ্রকার অত্যাচার করিত ;—আবার ডোডে বড় অল্পে ব্যথিত হইতেন। একটি ছাত্রকে ডোডে বড় ভালবাসিতেন ; সে অবকাশের সময় তাঁহাকে নিজ গৃহে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিল। ডোডে বড় আশায় সেই অভিলষিত দিনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ডোডের শিক্ষাদান-কৌশলে বালক সেবার বিদ্যালয়ে পুরস্কার পাইয়াছিল। পুরস্কারবিতরণের দিন তাহার পিতা মাতা বিদ্যালয়ে আসিয়াছিলেন ; বিদ্যালয়ের কার্য্য শেষ হইলে বালক ডোডেকে পিতা মাতার নিকট লইয়া গিয়া বলিল, "ইনিই ডোডে, ইনি সাহায্য না করিলে আমি পুরস্কার পাইতাম না।" তাহার পিতা মাতা একবার ডোডের দিকে চাহিলেন, তাহার পর সন্তানকে লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী চলিয়া গেল—হতাশহৃদয়ে ডোডে ফিরিয়া আসিলেন।

এক বৎসর এই যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ডোডে আর পারিলেন না ; সাহিত্য-সেবা করিবার সঙ্কল্প করিয়া তিনি ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমকালে প্যারিসে আসিলেন। ভ্রাতা আর্ণেষ্ট পূর্ব্ব হইতেই প্যারিসে থাকিতেন। দুই দিন ধরিয়া বহুজনাকীর্ণ তৃতীয় শ্রেণীর কক্ষে বহুকষ্টে আসিয়া ডোডে প্যারিসে উপনীত হই-

লেন ; পরিধানে গ্রীষ্মকালোপযোগী বসন, তাহাতে শীতনিবারণ হয় না। পথে তাঁহার মূর্চ্ছার উপক্রম হইয়াছিল, সহযাত্রী নাবিকগণ দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে একটু পানীয় প্রদান করিয়াছিল—সে পানীয় ক্ষুধাতৃষ্ণাকুল ডোডের কি মিষ্টই লাগিয়াছিল! চল্লিশ "সু" অর্থাৎ প্রায় এক টাকা মাত্র সম্বল লইয়া ডোডে প্যারিসে উপনীত হইলেন।

ভ্রাতা আর্ণেষ্ট ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। ভ্রাতৃদ্বয় পথে একটা হোটেলে উপস্থিত হইলেন—তখনও হোটেলের দ্বার রুদ্ধ। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর দ্বার মুক্ত হইলে উভয়ে অল্পব্যয়ে মূল্যোপযোগী সামান্য আহারীয় আহার করিয়া গৃহে উপস্থিত হইলেন।

প্যারিসে আসিয়া ডোডের নূতন প্রকার যন্ত্রণার আরম্ভ হইল—ইহাও দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম। পুস্তক রচনা করিয়া ডোডে প্রকাশকদিগের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই এই নবীন লেখকের রচনা প্রকাশ করিতে সম্মত হইল না। প্রতিদিন কত আশায় বহুশ্রমের ফল পুস্তকখানি লইয়া নবীন লেখক প্রকাশকদিগের দ্বারস্থ হইতেন, আর প্রতিদিন হতাশ হইয়া দারিদ্র্য-দুঃখপূর্ণ গৃহে ফিরিয়া আসিতেন। ডোডের জীবনে সেই একদিন—আর যখন তাঁহার একখানা পুস্তকের প্রকাশক হইবার জন্য লালায়িত হইয়া নানা দেশ হইতে নানা প্রকাশক তাঁহার দ্বারস্থ হইত, সেই একদিন! বড় কষ্টে নবীন লেখকের দিন কাটিতে লাগিল।

ডোডের এই সময়ের একটা বড় যাতনাকর ঘটনা পাঠকের প্রচুর আনন্দ-দায়ক হইবে। নিমন্ত্রণে যাইতে হইলে প্রথমে তদুপযোগী বেশ আবশ্যক, তাহার পর নিমন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক। বহুকষ্টে ডোডে একটা ভাল কোট সংগ্রহ করিলেন, একটা সমিতিতে নিমন্ত্রিতও হইলেন। নিমন্ত্রণস্থলে উপস্থিত হইলে তাঁহার দীর্ঘকেশ ও দীপ্ত কৃষ্ণতার নয়ন দেখিয়া মহিলাদিগের অধরপ্রান্তে মৃদুহাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। কোনও কারণে একজন তাঁহাকে কোনও রাজপুত্র বলিয়া মনে করিলেন—বোধ করি, সে দিন রাজপুত্রেরও সেই নিমন্ত্রণ-সভায় আসিবার কথা ছিল। একবার নৃত্যের পর নৃত্যকারিগণ আহারাগারে প্রবেশ করিলেন। লজ্জাশীল ডোডে সাহস করিয়া সে কক্ষে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। আবার নৃত্য আরম্ভ হইল, সকলে আহারাগার হইতে আসিলেন। এইবার ডোডে সাহস করিয়া সে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ক্ষীণদৃষ্টি ডোডে চারি দিকে চাহিয়া দেখিলেন—কক্ষে আর কেহ নাই।

টেবিলে বহু কাচপাত্রে উজ্জ্বল আলোক শত-হীরকদীপ্তি জ্বালাইয়া তুলিতেছে; ডোডে ধীরে ধীরে হস্ত প্রসারিত করিয়া একটা পানীয়পূর্ণ ডিক্যাণ্টার লইলেন, ভাবিলেন, একটা উৎকৃষ্ট পানীয় লইয়াছেন। তিনি একটু একটু করিয়া গ্লাসে পানীয় ঢালিয়া লইলেন; ধীরে ধীরে গ্লাস মুখে তুলিলেন।—একি—এ যে কেবল জল! তিনি কেবল জল ঢালিয়া ভাবিয়াছেন, মদ্য ঢালিয়াছেন। ডোডের মুখ বিকৃত হইল; সেই সময় কক্ষের একপ্রান্ত হইতে কলহাস্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। ডোডে দেখিতে পান নাই, কক্ষের এক প্রান্তে এক-জন পুরুষ ও একটি রমণী ছিলেন; তাঁহার দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহারা হাস্য-সম্বরণ করিতে পারেন নাই। কম্পিত-করে তিনি গ্লাস নামাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেন, জামার আস্তিনে বাধিয়া একটি,—দুইটি,—তিনটি গ্লাস পড়িয়া গেল; তিনি ঘুরিতে গেলে কোটের পুচ্ছদেশে বাধিয়া বহু কাচপাত্র পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। শব্দ শুনিয়া গৃহকর্ত্রী সেই কক্ষে আসিলেন; সৌভাগ্যবশতঃ তিনিও ক্ষীণদৃষ্টি। ডোডে সে কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া গৃহে ফিরিবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহার এক পরিচিত ডাক্তার "রাজপুত্রকে" আপনার গাড়ীতে লইয়া যাইতে চাহিলেন; তাঁহার গৃহ ডোডের আবাস-গৃহের সম্মুখে। কিন্তু ডোডের ওভার-কোট ছিল না, কাজেই ডোডে ডাক্তারের অনুরোধে স্বীকৃত হইতে পারিলেন না—তিনি একাকী গৃহাভিমুখগামী হইলেন। দ্বারে ভৃত্য বলিল, "কোট লইলেন না?" ডোডে কোনও উত্তর দিলেন না; গৃহের বাহিরে আসিলেন। তখন তুষারপাত আরম্ভ হইয়াছে; সেই তুষারাবৃত পথে কম্পিতকলেবরে ডোডে চলিতে লাগিলেন। তিনি শীতে কম্পমান, ক্ষুধায় কাতর। পথে একটা আহারাগারে কদর্য্য আহারীয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া ডোডে গৃহে ফিরিলেন। তিনি যখন গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন, তখন ডাক্তারের গাড়ী আসিয়া তাঁহার গৃহদ্বারে স্থির হইল। বিষণ্নমনে ডোডে গৃহে প্রবেশ করিলেন।

তখন ডোডে বহুকষ্টে এক জন প্রকাশক যোগাড় করিয়া কতকগুলি কবিতা প্রকাশ করিয়াছেন। পুস্তকখানি দেখিতে নয়নবিনোদন—সেই ডোডের প্রতিভার প্রথম সন্তান। এই সময় আপনার পূর্ব্বকর্ম্ম হারাইয়া ভ্রাতা আর্নেষ্ট প্যারিস ত্যাগ করিলেন। এত দিন ডোডের বন্ধুর জীবন-পথে সুখে দুঃখে এক জন সঙ্গী ছিলেন, এখন তিনি একাকী। সেই সময়ের কথায় ডোডে বলিয়াছেন যে, তখন এক এক দিন অনাহারে গিয়াছে; এক এক দিন পাদুকা-অভাবে শয্যায় দিন কাটাইতে হইয়াছে; আবার যদি বা পাদুকা

কিনিয়াছেন, তথাপি তাহার কদর্য্য শব্দে লোকের কাছে যাইতে লজ্জা করিত। কিন্তু অর্থাভাবে জামা কাচাইতে না পারিয়া যখন তাঁহাকে মলিন জামা পরিধান করিতে হইত, তখনই তাঁহার বড় কষ্ট হইত। অনেক দিন উপযুক্তবেশবিরহে ডোডে মহিলাদিগের নিমন্ত্রণে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাঁহার অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ভ্রাতা আর্নেষ্ট প্যারিস ত্যাগ করেন;—তখন হইতে তিন বৎসর কাল ডোডের এমনই কষ্টে কাটিয়াছিল।

এই সময় একটা ঘটনা ঘটিল। ডোডের একটি কবিতা পাঠ করিয়া সম্রাট-পত্নী প্রীত হইলেন। তাঁহার ইচ্ছায় ডোডের একটা কার্য্য জুটিল; নিরাশার অন্ধকারে ডোডে আশার আলোক দেখিতে পাইলেন। ইহার পর তাঁহার যশ, অর্থ, বন্ধু, কিছুরই অভাব ছিল না; কিন্তু কিছুতেই অসাধারণ প্রতিভার অধীশ্বর ডোডের হৃদয়ের মাধুর্য্য বিনষ্ট হয় নাই।

কেহ কেহ ডোডেকে ফরাসী ডিকেন্স বলিয়াছেন। উভয়েই প্রকৃতি-প্রিয়, উভয়েই সমাজের নিম্নস্তরচিত্রণে সুনিপুণ। কিন্তু উভয়ের রচনায় যথেষ্ট প্রভেদও পরিলক্ষিত হইবে। ডিকেন্সের উজ্জ্বল প্রশান্ত হাস্য ডোডের রচনায় অল্প স্থানেই দেখা যায়। আবার ডিকেন্স যেখানে হাস্যরস ঢালিয়াছেন, সেখানে কেবল হাস্যরসই প্রবল; যেখানে হাস্য ত্যাগ করিয়া করুণরস ঢালিয়াছেন, সেখানে নিরবচ্ছিন্ন করুণারই প্রবাহ। ডোডে এতদুভয় যেমন করিয়া মিশ্রিত করিতে পারিতেন, ডিকেন্স তেমন পারিতেন না। হাস্যরস-প্লাবিত রচনায় ডোডে কিরূপ সিদ্ধহস্ত ছিলেন, যাঁহারা তাহা জানিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে "টার্টারিনে"র কীর্ত্তিকাহিনী পাঠ করিতে অনুরোধ করি। সে কাহিনী পাঠ করিতে করিতে অতি গম্ভীর দার্শনিকের অধরেও হাস্য ফুটিয়া উঠিবে। আবার করুণরসপ্লাবিতকাহিনীকথনে ডোডে কিরূপ পারগ ছিলেন, তাহার প্রমাণস্বরূপ তাঁহার "জ্যাক" নামক উপন্যাসের উল্লেখ করা যাইতে পারে। নায়ক জ্যাক বড় অল্পে ব্যথিত হয়—এইরূপ প্রকৃতির লোকেরা কঠোর জগতে বড়ই যাতনা পাইয়া থাকে।—তাহার জননী "Is a butterfly creature, whose wings were early singed in the irregular flames of trivial intrigues, and she is constitutionally incapable of standing alone." জ্যাক পিতার নাম জানিত না; সে হৃদয়ের পূর্ণ আবেগে জননীকে ভালবাসিত। সে তাহার জননীর খেলিবার পুতুল ছিল; শিশু জ্যাক জননীর কাছে অনেক সময় আদর পাইত। তাহার

বিপথগামিনী জননী একটা অপদার্থ কবিতারচনাকারীকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিল—সেই কবিনামধারীর চরণে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিল। সেই অপদার্থের ইচ্ছায় জননী ও পুত্রে বিচ্ছেদ ঘটিল। হতভাগ্য জ্যাক জীবনপথে সঙ্গিহীন, স্নেহহীন হইল। কিন্তু জীবনের নানা দুঃখ দুর্দ্দশার মধ্যে জ্যাকের জননীর প্রতি ভালবাসা অক্ষুণ্ণ ছিল। নানা কষ্ট পাইয়া দুঃখে রোগে জ্যাক মৃতপ্রায় হইল;—মৃত্যুশয্যায় সে জননীকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইল। কিন্তু তখনও তাহার দুঃখের শেষ হয় নাই! জ্যাকের মৃত্যুর পর তাহার জননী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মৃত?" যে দয়ালু চিকিৎসক জ্যাকের মৃত্যুকালে উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলিলেন,—"মুক্ত।" সত্য সত্যই সে হতভাগ্যের পক্ষে মরণ মুক্তিমাত্র। কোন কোন সমালোচক এ কথাও বলিয়াছেন যে, লেখক এই পুস্তকে এত করুণরস ঢালিয়াছেন যে, পাঠকের পক্ষে তাহা অতিরিক্ত বেদনাদায়ক হইয়া উঠে; কিন্তু তাঁহারা বুঝেন না যে, হতভাগ্য নায়কের দুঃখে পাঠকের সহানুভূতির সৃষ্টিই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। তাঁহার সেই উদ্দেশ্য যে সফল হইয়াছে, তাহাতেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয়।

ডোডের "রবার্ট হেলমণ্ট" এক নূতন ধরণের পুস্তক। ইহা প্যারিস-অবরোধ-কালে একটি গ্রামে বদ্ধ একজনের রোজনামচা। প্রতিভাশালী লেখকের প্রতিভা সকল প্রকার রচনাকেই কিরূপ উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারে, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ এই পুস্তকের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

উপন্যাস ব্যতীত ডোডে কয়েকখানি নাটক ও কতকগুলি ছোট গল্প লিখিয়াছিলেন। তাঁহার "আর্টিষ্টস্ ওয়াইভস্" নামক পুস্তকে অনেকগুলি সুন্দর ছোট গল্প আছে।

আলফন্স ডোডের নামের সহিত তাঁহার পত্নী জুলিয়া ডোডের নাম বিশেষরূপে বিজড়িত। পত্নী জুলিয়া যে কেবল সংসারের শত কষ্টে পতির সাহায্যকারিণী ছিলেন, তাহা নহে। পতির সাহিত্যিক কার্য্যেও তিনি সাহায্য করিতেন। তিনি আপনিও একজন সুলেখিকা।

French Academyর উপর ডোডের শ্রদ্ধা ছিল না। যে সভা বল্‌জাক প্রভৃতি প্রতিভাবান লেখককে সভ্য নির্ব্বাচন করে নাই, তাহার উপর ডোডের বিরক্তি ব্যতীত শ্রদ্ধা ছিল না। এড্‌মণ্ড ডি গন্‌কুর অপর একটি সভা সংস্থাপন করিবার জন্য ডোডের হস্তে বহু অর্থ ন্যস্ত করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার অবসর ডোডে আর পাইলেন না। ডোডে

তাঁহার একখানি পুস্তকে "ফ্রেঞ্চ অ্যাকাডেমীকে" আক্রমণ করিয়াছিলেন। জোলাও পূর্ব্বে এই অ্যাকাডেমী-বিরোধীদিগের দলে ছিলেন; তাহার পর জোলা আপনার মত পরিবর্ত্তিত করিয়া উহার সভ্য হইবার জন্য বহুবার চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হইয়াছেন।

জোলার সাহিত্যিক কার্য্য যেরূপ সুনিয়মে সম্পাদিত হয়, ডোডের সেরূপ হইত না। জোলা প্রতি দিন প্রাতে তিন বা চারি ঘণ্টা লিখিয়া থাকেন। ডোডে হয় ত কিছুদিন কিছুই লিখিতেন না, আবার হয় ত কিছু দিন গুরুতর পরিশ্রম করিতেন। যখন লিখিতে আরম্ভ করিতেন, তখন তিনি প্রতিদিন আঠার ঘণ্টা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন; আহারের সময়ও উঠিতেন না,—তাঁহার লিখিবার ঘরে খাদ্য আনিতে হইত। ডোডে ধীরে ধীরে লিখিতেন, এবং একাধিকবার রচনার সংশোধন করিতেন। উপন্যাসগুলি তিনি আপনি লিখিতেন; আপনি কেবল বলিয়া যাইয়া অন্যের উপর লিখিয়া লইবার ভার দিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইত না। তবে তাঁহার শরীর যখন সুস্থ ছিল, তখন নাটক সম্বন্ধে তিনি এই ব্যবস্থা করিতেন;—তিনি কক্ষে পদচারণ করিতে করিতে বলিয়া যাইতেন, লিপিকর তাহাই লিখিয়া লইতেন। ডোডে প্রথমে নোট-বুকের এক পৃষ্ঠায় নানাবিধ নোট লইতেন, তাহার পর অপর পৃষ্ঠায় তাহাই ভাল করিয়া লিখিতেন। নোটগুলির যে অংশ যখন কোন রচনায় ব্যবহৃত হইত, সে অংশ তখনই চিহ্নিত করা হইত। ডোডের পুস্তকগুলির পাণ্ডুলিপি তিনবার লিখিত হইত—এত সংশোধনেও লেখকের তৃপ্তি হইত না।

ডোডের জীবন শেষ হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার প্রতিভার পরিচায়ক গ্রন্থমালা বিনষ্ট হয় নাই। আবার "Temples crumble into ruin; pictures and statues decay; but books survive.—একরূপে দেখিতে গেলে ডোডের মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু "The great and good do not die, even in this world, Embalmed in books their spirits walk abroad." ডোডের যশঃপ্রভায় ফরাসী সাহিত্য উজ্জ্বল থাকিবে। *

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

* "সাহিত্য-সমাজের" অধিবেশনে পঠিত।

মাতৃ-আজ্ঞা।

১

নবীন-সন্ন্যাসিবেশে শচীর ছুলাল
যবে আসি দিলা দরশন,
হাহাকারে চারিধারে ভক্ত সব ঘেরি তাঁরে
উভরোলে করিলা রোদন ;—
"গোরা যদি ছেড়ে যায় কি ফল জীবনে, হায়,
জাহ্নবী-সলিলে সবে পশিব এখন।"

২

বিষণ্ণ বৈষ্ণব সবে করিয়া সম্ভাষ
কহিলেন সন্ন্যাসী নিমাই,—
"শুন যত প্রিয়জন ! ত্যজ ক্ষোভ অকারণ,
করযোড়ে ভিক্ষা এই চাই ;
কৃষ্ণের কাঙাল আমি, যা'রা কৃষ্ণ-অনুগামী
তাদের ছাড়িয়া মোর অন্য গতি নাই।

৩

"তোমা সবে তেয়াগিয়ে, কাঁদাইয়ে মা'য়,
বৃথা মোর, বৃথা এ সন্ন্যাস ;
মিছা সে যমুনা ভুলে ফিরিনু জাহ্নবী-কূলে,
মিছা মোর, মিছা সে প্রয়াস।—
হায় ! কোথা বৃন্দাবন ! কোথা কৃষ্ণ প্রাণ-ধন !
ধিক্ মোরে ! মিটিল না জনমের আশ।

৪

"তাই পুন তোমাদের স্নেহের ভবনে
শূন্যমনে আইনু ফিরিয়া ;
দেখিনু দুখিনী মা'য় শোকে মোর মৃতপ্রায়,
বজ্রে বুক গিয়াছে ভাঙিয়া ;
বিরহী বৈষ্ণবদল লুটাইছে ধরাতল,
অবিরল আঁখিজল যেতেছে বহিয়া।

৫

"হেরি' সে শোকের ছবি, বিষাদে বিহ্বল,
পরিণাম না করি গণন,
মাতৃ-সন্নিধানে আজ করেছি মূঢ়ের কাজ,
জান সবে, নহে তা' গোপন ;
উঠিতে বসিতে ক্ষণে সেই চিন্তা উঠি' মনে
চিত্তে মোর নিদারুণ করিছে পীড়ন।

৬

"স্বাধীন মানসে সর্ব্ব-সমক্ষে সে দিন
সাক্ষী করি বিশ্ব চরাচর,
মুড়ায়ে কেশের রাশ পরেছি কৌপীন-বাস,
কৃষ্ণ-আশে তৃষিত কাতর ;—
আজি মাতৃ-আজ্ঞা পেলে দণ্ড কমণ্ডলু ফেলে
চাহি পুন পশিবারে সংসার ভিতর !

৭

"কিন্তু ত্রিজগৎ যদি মোরে উপহাসে
বরষিয়া বিদ্রূপের বাণ,
প্রতিজ্ঞা করেছি যাহা যতনে পালিব তাহা,
বাক্য মোর না হইবে আন ;
গৃহে বসি করি মেলা খেলিব কৃষ্ণের খেলা,
কৃষ্ণ-প্রেম বিনা আর কি চাহে পরাণ ?

৮

"যাও তবে, ভক্ত সব বিবরি' বিশেষ
নিবেদিও মায়েরে আমার,—
সন্ন্যাসী সন্তান প্রতি যা' করেন অনুমতি
ধর্ম্মাধর্ম্ম করিয়া বিচার,
তর্ক নাই, দ্বিধা নাই, শিরে সে ধরিবে তাই,—
মাতৃ-আজ্ঞা—দেববাণী—করিবে সে সার।—"

৯

প্রভুর বচন শুনি, ত্বরিত হরষে
ভক্ত সব শচী পাশে ধায়,
সুখের বারতা হেন উচ্ছ্বসিত স্রোতে যেন
শতমুখে নিবেদিলা তাঁয়,—
"মাগো তোর আজ্ঞা হ'লে নিমাই নদিয়া চলে,
সহস্র মায়ের ছেলে দেহে প্রাণ পায়।

১০

"তোমার সকাশে আজি শ্রীমুখে আপন
যে প্রতিজ্ঞা করিলা নিমাই,
উঠিতে বসিতে ক্ষণে সেই কথা জাগে মনে,
আমা সবে পাঠাইলা তাই ;
বিলম্ব না সহে আর, বল্ মাগো একবার,
নদিয়ার চাঁদে মোরা ঘরে নিয়ে যাই।"

১১

ব্যাকুল বৈষ্ণবকুলে চাহি' একবার
ভূতলে মা স্থাপিলা নয়ন ;
সহসা নিশ্বাসে কাঁপি' বসন-অঞ্চলে ঝাঁপি'
অশ্রু বুঝি করিলা গোপন ;
মুহূর্ত্তেকে আর বার তুলি' দু'টি আঁখিতার
ধীরে ধীরে সকাতরে কহিলা তখন।—

১২

"হা নিমাই ! এত দিনে মায়েরে তোমার
এল বুঝি বুঝিবার কাল !
নারী আমি হীনমতি, সদা স্বার্থপথে গতি,
প্রাণে যত জড়তা-জঞ্জাল !
মৃদু ঘাতে টুটে যায়, কোথা সে মৃণাল, হায়,
কোথা হেন বজ্রে বাঁধা পরীক্ষা বিশাল !

১৩

"নিজ ধর্ম্ম ভার তুমি মায়েরে সঁপিয়া
বাড়াইলে মায়ের সম্মান,
ধর্ম্মে তোর সাধি' বাদ সাধিব স্বার্থের সাধ,
আমি কি রে এমনি পাষাণ !
জানি রে বিরহে তোর যা'বে এ জীবন মোর,
যায় যা'ক্ !—সত্য তব করিব না আন !

১৪

"তোমারে ইঙ্গিতে ধরি যত নীচ জন
তীব্রহাসে করিবে কৌতুক,
শুভ্রযশে সগৌরবে পীড়িবে ছিঁড়িবে সবে
ক্রুদ্ধ দন্তে দুরন্ত হিংসুক,—
সে সব শাণিত বাণ স'বে না মায়ের প্রাণ,
মর্ম্মে মর্ম্মে বিমরিয়া বিদরিবে বুক।

১৫

"হে সাধু বৈষ্ণবগণ ! মায়ের বচনে
সন্ন্যাসীরে কহিও আমার,—
আজি পঞ্চরাত্রি গত লইলা যে পুণ্যব্রত
পণ করি সমস্ত সংসার,
সে ব্রত করিতে নাশ ভুলে যদি করি আশ,
জননীর যোগ্য তবে নহি আমি তাঁর।"

১৬

বিষাদে বিস্ময়ে রোষে বৈষ্ণব-সমাজ
সিন্ধু যেন উঠিল শ্বসিয়া ;—
বলে, "মাগো কি করিলে নিজবাক্যে বিদাইলে
প্রাণ-শূন্য করিলে নদিয়া ?
এ কথা শুনিলে পরে আর ত র'বে না ঘরে,
এখনি ছাড়িয়া যা'বে গৃহ আঁধারিয়া।"

১৭

বৈষ্ণবের বাণী শুনি' চকিতে চমকি'
করে শির করিয়া তাড়ন,
বলে মাতা,—"হাহা বিধি ! আমার অঞ্চল-নিধি
সত্য কি রে ত্যজিবে ভবন ?"
বলিতে বলিতে কথা বজ্রাহত তরু যথা
ভূতলে মা মূর্চ্ছাতুর পড়িলা তখন।

১৮

উচ্ছ্বাসে ভকত-সব উঠিল কাঁদিয়া,
শান্তিপুর পুরিল রোদনে ;—
কেহ প্রভু প'রে রোষে, কেহ বা মায়েরে দোষে
বিনাইয়া বিবিধ বচনে ;
কেহ বা কহিছে,—"হায় ! এমন না হ'লে মা'য়
এমন তনয় তবে হ'বে বা কেমনে ?"

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

রাজা টোডরমল।

সম্রাট্ আকবরের যে সকল হিন্দুজাতীয় রাজকর্ম্মচারী ছিলেন, রাজা টোডর-মল * (১) তাহার মধ্যে একজন প্রধান। আকবর তাঁহাদের সমরকৌশল, শাস্ত্র-জ্ঞান, সংগীতপারদর্শিতা, চিকিৎসানৈপুণ্য, কবিত্ব, গণিতজ্ঞান ইত্যাদিতে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহারা এক এক বিষয়ে অদ্বিতীয়—তাঁহাদের কেহ কেহ বা দুই বা তদধিক বিষয়ে নৈপুণ্য লাভ করিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন।—তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ রণ-বীর, অথচ আয়-ব্যয়াদিনিপুণ;—রাজা টোডরমল সেই শ্রেণীর লোক। তাঁহাকে প্রায় সকলেই সম্রাটের হিসাব-পরীক্ষক বলিয়াই জানেন। কিন্তু তাহা নয়। তিনি এক জন প্রকৃত বীরপুরুষ। তিনি কোন্ কোন্ যুদ্ধে কত প্রকারে বীর-দম্ভ প্রকাশ করিয়া অক্ষয় শূর-কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহা বিবৃত হইবে।

অতি অল্প বয়সেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। সুতরাং তাঁহার জননীকে অশেষ ক্লেশে নিপতিত হইতে হয়। বাল্যকাল হইতেই টোডরমলের বুদ্ধি-বৃত্তি মার্জ্জিত ও প্রখর ছিল। কেরাণীর কার্য্য হইতে তিনি অত্যুচ্চ পদবীতে অধিরোহণ করেন (২)।

তিনি ক্ষত্রিয় বর্ণ। লাহোর তাঁহার জন্ম-ভূমি। (৩)

৯৭২ হিজিরায় তিনি আকবরের কার্য্য করিতেন। সেই সূত্রে তাঁহাকে জুনাপুরে খাঁ জমালের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে রাজা

(১) হিন্দী ভাষায় ও প্রাচীন ইতিহাসপুস্তকে তাঁহার নাম টোরেল মল।

(২) "তক্রীহুল্ ইমারতী" নামক অমুদ্রিত পার্সী পুস্তকে এই পরিচয় পাওয়া যায়। আসিয়াটিক সোসাটীতে ঐ পুস্তক আছে। আগরা গবর্মেণ্ট কলেজের সিলচাঁদ উহার প্রণেতা। ঐ পুস্তকে আগরার পুরাতত্ত্ব কীর্ত্তিত। উহাতে বিস্তর মহামূল্য ও প্রীতিপ্রদ প্রসঙ্গ নিবদ্ধ। বিজ্ঞাপনে জেম্স্ ষ্টীফেন নামক ইংরেজের প্রশংসাবাদ দৃষ্ট হয়। ঐ সাহেবের উপাধি জানিবার উপায় নাই। ব্লক্মান্ অনুমান করেন—তাঁহার নাম বেবিঙটন বা ঐরূপ একটা কিছু হইবে। পুস্তকের ভাষায় সুশৃঙ্খলার অভাব।

(৩) সম্রাট আকবরের ১৮শ রাজ্যাব্দে তিনি তৎকর্ম্মচারিপদে নিযুক্ত হন। "নাসিরুল্ উমরা" পুস্তকে ঐ কথাই লিখিত থাকিলেও, উহা গ্রহণযোগ্য নয়। 'বদৌনির' মতে ৯৭১ হিজিরায় তিনি মুজফ্ফরের অধীনে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হন।

টোডরমল, অলৌকিক বিক্রম প্রকাশ করিলেও, যুদ্ধের বিজয়লক্ষ্মী সম্রাটের অঙ্কগত হন নাই। তখন আকবরের ১০ম রাজ্যাব্দ চলিতেছিল। ১৮শ রাজ্যাব্দে (৯৮১ হি) তাঁহার কার্য্য সুদৃঢ় হয়। ইহাই তাঁহার প্রথম ও প্রয়োজনীয় পদ-মর্য্যাদা। তৎপূর্ব্বেই গুজরাট বিজিত হইয়াছিল। সেই প্রদেশের আয় ব্যয়ের তালিকা প্রস্তুত করিবার ভার তাঁহার উপর বিন্যস্ত হইল। বলা বাহুল্য, তাঁহাকে তদুপলক্ষে তথায় অবস্থান করিতে হয়। পর বর্ষে (১৯শ অব্দে) পাটনা অধিকৃত হইলে তিনি "আলম্" ও "নিকারা" প্রাপ্ত হন। সেই সময়ে "মুনিম্ খাঁ"কে বাঙ্গালা দেশে লইয়া যাইবার ভার তাঁহার উপর পড়িল। ঐ যুদ্ধ-যাত্রায় তিনিই মূলাধার—সুতরাং তাঁহারই সুপ্রচুর প্রাধান্য। যখন বঙ্গদেশে দায়ুদ খানি করা-রাণীর সঙ্গে যুদ্ধে খাঁ আলমের মৃত্যু হইল,—মুনিম খাঁর যুদ্ধতুরঙ্গ রণক্ষেত্র হইতে দ্রুতপদে ধাবিত হইতেছিল—তখনই তিনি অদম্য। তিনি ধীরভাবে বলিতেন—"যদি খাঁ খাঁনাও উপরত হয়—তাহাতেই কি? আমরা নিশ্চয় জয়লাভ করিব।" তাহার পর তিনি বঙ্গ ও উৎকলের রাজস্বের ব্যবস্থা করিয়া সম্রাট্-সদনে গিয়া উপনীত হইলেন। তখন হইতে রাজ-স্বের হিসাব, উত্তম বন্দোবস্ত প্রভৃতির জন্য তাঁহাকে প্রয়োজনীয় কর্ম্মচারী বলিয়া সকলের প্রতীতি জন্মিল। আর প্রধানতঃ সেই ভারই তাঁহার উপর পড়িল। কিন্তু খাঁ জঁহা (৪) আবার যৎকালে পঞ্জাব হইতে আহূত হইয়া বঙ্গা-ক্রমণে আদিষ্ট হইলেন, তখনও রাজা টোডরমলকে তাঁহার সাহায্যার্থ তথায় যাইতে হয়। সে বারেও তিনি পূর্ব্ববৎ দায়ুদের পরাজয়ে খ্যাতিমান্ হইলেন।

একবিংশ রাজ্যাব্দে তিনি বাঙ্গালা হইতে জয়লব্ধ দ্রব্যের নিদর্শন-স্বরূপ ৩০০ কি ৪০০ হস্তী আনয়ন করেন। পর বৎসর গুজরাটে দ্বিতীয়বার যাইবার নিমিত্ত তাঁহার উপর হুকুম হয়। উজির খাঁ নামে তথায় যে শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তাঁহার কার্য্য, আশানুরূপ সন্তোষপ্রদ হওয়া দূরে থাকুক—নিতান্ত জঘন্য হইতেছিল। রাজা যখন আমেদাবাদ-সংক্রান্ত গোলযোগের শান্তি করিতে-ছিলেন, মিহ্র আলি গুলাবের প্রতারণায় মুজফ্ফর হুসেন বিদ্রোহী হন। সেই যুদ্ধে উজির খাঁ, দুর্গে লুক্কায়িত হইবার বাসনা করেন—কিন্তু টোডরমল যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিলেন। তিনি আমেদাবাদের বার ক্রোশ দূরবর্ত্তী ধোলাক

(৪) কেন না, ৯৮৩ হিজিরায় খাঁ খাঁনানের মৃত্যু হয়। আর সেই সূত্রেই বঙ্গও বিশৃঙ্খল হইয়া যায়।

নামক স্থানের সমীপে বিদ্রোহীদিগকে পরাভূত করেন। রাজা, এই সময়ে উপস্থিত থাকিয়া রণে মিলিত না হইলে, উজির খাঁ জীবন হারাইতেন। যাহা হউক, যুদ্ধে পরাজিত মুজফ্‌ফর জুনাগড়ে পলাইয়া গিয়া প্রাণ বাঁচাইল।

এইবার তিনি "উজির" হইলেন। যখন আকবর আজমীর হইতে পঞ্জাবে যান, ঠিক্ সেই সময়েই রাজা টোডরমলের গৃহদেবতাগুলি নষ্ট হয়।

আকবর, মজফ্‌ফরের মৃত্যু এবং বাঙ্গালা ও বিহারের বিদ্রোহবৃত্তান্ত অবগত হইয়া, টোডরমল, কাদিক্ খাঁ, তার্সন্ খাঁ প্রভৃতিকে ফতেপূর শিকৃরি হইতে বিহারের প্রেরণ করিলেল। রোটসের শাসনকর্ত্তা মাহিবালি এবং মহম্মদ্ মেকুম খাঁই ফারাঙ্খূদি, তাঁহাদের সহকারী নিযুক্ত হইলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি তিন সহস্র সুসজ্জীকৃত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া রাজার সহিত মিলিত হন। কিন্তু তিনি তাঁহাকে শান্ত রাখিয়াছিলেন। তিনি এই সংবাদ রাজসভায় জ্ঞাত করিয়াছিলেন। তখন "ম্যাকুম ই কাবুলির", কাকৃশালদিগের এবং মির্জা সরফুদ্দিন্ হুসেনের অধীনস্থ বাঙ্গালার বিদ্রোহকারী সকল, ত্রিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য, পঞ্চাশটি হস্তী, বহুসংখ্যক রণতরী এবং গোলাগুলি সমভিব্যাহারে লইয়া মুঙ্গেরের নিকটে উপস্থিত হইলেন। টোডরমল, নিজসহকারীদিগের বিশ্বাসঘাতকতায় ভীত হইয়া, মুঙ্গের দুর্গে অবরুদ্ধ হইলেন। এই অবরোধসময়ে, তাঁহার দুই জন কর্ম্মচারী "হুমায়ুন ফর্ম্মিলি" এবং "তারখাঁ দেওয়ান" সেই বিদ্রোহকারীদিগকে মিলিত করিয়াছিল। রাজা খাদ্যাভাবে যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও নির্ব্বিঘ্নে জীবনধারণ করিয়াছিলেন। তিনি রাজসভা হইতে কিছু টাকা সাহায্য পাইতেন। কিছু কাল অবরোধের পর, বাবাখাঁ কাকৃশালের মৃত্যু হইল, এবং মজ্জুন কাকৃশালের পুত্র জবারি পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিল। বিদ্রোহিগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। "ম্যাকুম ই কাবুলি", বিহারের দক্ষিণাংশে গমন করে, এবং আরব বাহাদুর হঠাৎ পাটনা আক্রমণ করিয়া, সম্রাটের ধনসম্পত্তি হস্তগত করিবার প্রয়াস পায়। উক্ত ধন-সম্পত্তি, ঐ নগরের দুর্গে পাহাড় খাঁ কর্ত্তৃক নির্ব্বিঘ্নে রক্ষিত ছিল। ম্যাকুম ই ফেরান্খুডিকে পাহাড় খাঁকে সাহায্য করিবার জন্য পাটনায় প্রেরণ করিয়া টোডরমল এবং কাদিক খাঁ, উভয়ে "ম্যাকুম ই কাবুলির" অনুগমন করিলেন। তাঁহারা বিহারে পঁহুছিলেন। ম্যাকুম, কাদিক্ খাঁকে পরাভূত করিবার মানসে একদা রাত্রিতে হঠাৎ তাঁহাকে আক্রমণ করে; কিন্তু উড়িষ্যার জমিদার ইসাখাঁও তাঁহার সহিত সংমিলিত দেখিয়া সে পলাইতে বাধ্য হয়।

তখন তিনি আক্‌বরকে জানাইলেন যে, দক্ষিণবিহারের গার্হি পর্য্যন্ত দিল্লীর সামাজ্যভুক্ত হইয়াছে।

সপ্তবিংশতি বৎসরে (৯৯০ হিজিরায়) তোডরমল দেওয়ান হইলেন। তিনি, কর সম্বন্ধে যে উন্নতি বিধান করিয়া এত প্রসিদ্ধ হন, তাহা এই সময়েই প্রচারিত হয়। আইনের তৃতীয় ভাগে খাজনার ফর্দ্দ সন্নিবিষ্ট আছে। ইহা মজফ্‌ফর-রচিত করপ্রথা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

টোডরমল, কর-সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করেন, তাহা অত্যাবশ্যক। তিনি, ভাষা এবং কর-হিসাবপ্রথা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে হিন্দী ভাষায়, হিন্দু মুহুরীর দ্বারা এই সকল বিষয় লিখিত হইত। টোডরমল এই নিয়ম করিলেন যে, রাজকীয় সমস্ত হিসাব, পারস্য-ভাষায় লিখিত হইবে। অধুনা ইংরাজেরা যেরূপে ভারতবর্ষে ইংরাজী ভাষা প্রচলিত করিয়াছেন, মুসলমানাধিকারে টোডরমলও সেইরূপ স্বজাতীয়দিগকে পারস্যভাষা শিক্ষা করিতে বাধ্য করেন। অগত্যা সকলেই অর্থোপার্জ্জনার্থ পারস্য ভাষার অনুশীলন করিতে লাগিল। ইহার ফলে বিস্তর হিন্দু সম্রাটের কর্ম্মচারী হইলেন।

আকবর, মানসিংহকে সাত সহস্র সৈন্যের অধিনায়ক-পদে নিযুক্ত করেন। টোডরমলের পূর্ব্বোক্ত আদেশ এবং আকবর কর্ত্তৃক হিন্দুদিগের সর্ব্বোচ্চ পদপ্রাপ্তি-সম্বন্ধে তাহাদের অন্তঃকরণে যে গুপ্ত অভিপ্রায় ছিল, তাহা এই :—

প্রথমতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ হইবার পূর্ব্বে হিন্দুগণ মুসলমানদিগের পারস্যভাষার শিক্ষক হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় পার্সী ও উর্দ্দূর প্রসারবৃদ্ধি হয়। হিন্দুগণ পারস্যভাষা না শিখিলে "উর্দ্দূ" ভাষার কি প্রকারে অস্তিত্ব থাকিত? আকবরের পূর্ব্বে হিন্দুগণ সাধারণতঃ পারস্যভাষা পড়িতেন না, এবং তজ্জন্যই তাঁহারা মুসলমানদিগের রাজনীতি অতি অল্পই জানিতেন।

ঊনত্রিংশ বৎসর রাজত্বকালে আকবর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করেন। ৩২ বৎসর রাজত্বকালে একজন ক্ষেত্রী, আন্তরিক ঘৃণাপ্রযুক্ত রাত্রিতে তোডরমলকে আহত করে। জিঘাংসু তৎক্ষণাৎ সেই স্থানেই নিহত হইল।

যুসুফ্‌জাইস্‌দিগের সহিত সমরে বীরবল নিহত হইলে, টোডরমলের উপর এই ভার পড়িল যে, তিনি মানসিংহকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইবেন। কেন না, বীরবলের স্থানে তৎকালে মানসিংহকেই সৈন্যাধ্যক্ষতা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। চৌত্রিশ রাজ্যাব্দে আকবর কাশ্মীরে অভিযান করেন।

তখন লাহোর এই টোডরমলের অধীনে রক্ষিত হইয়াছিল। ইহার অব্যবহিত পরে তিনি রাজকীয় কর্ম্ম হইতে অবসর লইবার অভিলাষী হন। তিনি সঙ্কল্প করিলেন, জীবনের কাল পূর্ণপ্রায়। অতএব অবশিষ্ট কতিপয় দিবস ভাগীরথীতীরে যাপন করিবেন। প্রথমে পাৎসা তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাঁহাকে অবকাশ দেন। কিন্তু তাঁহাকে "হরিদ্বার" হইতে পুনরায় আনয়ন করেন। টোডরমল, নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক প্রত্যাগত হন। ফিরিয়া তিনি কিন্তু অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। ৯৯৮ হিজিরার একাদশ দিবসে তাঁহার দেহাবসান ঘটে। লাহোরেই তিনি তনুত্যাগ করেন। রাজা ভগবান দাস তাঁহার সৎকারার্থ গমন করিয়াছিলেন।

রাজা টোডরমলের সমসাময়িক কোন কোন ঐতিহাসিক, তাঁহাকে গোঁয়ার ও গোঁড়া বলিয়াছেন বটে, কিন্তু আকবরের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদের মধ্যে তাঁহার ন্যায় উত্তম সেনানী ও আয়-ব্যয়-পরীক্ষক সুদুর্লভ। তাঁহার কার্য্যপরম্পরাই তাঁহার গুণাবলী জাগরূক রাখিয়াছে। আবুল ফাজল, টোডরমল, (৪) মানসিংহ, এই তিন জন আকবরের সভার মুকুটস্বরূপ। তাঁহার পুত্রের নাম ধারু। তাঁহার উপাধি "সপ্তশতী।" সিন্ধুদেশে অভিযানসূত্রে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি খাঁ খানাঙের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। লোকে বলে, তিনি সোনা দিয়া ঘোঁড়ার খুর বাঁধাইতেন।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

রাণী ভবানী।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ;—পুণ্যকীর্ত্তি।

রাণী ভবানী যখন তীর্থভ্রমণোপলক্ষে কাশীধামে গমন করেন, তখন আর তাহাকে পুরাণ-বর্ণিত আনন্দনগরী বলিয়া চিনিয়া লইবার উপায় ছিল না। ধর্ম্মান্ধ আরঙ্গজীবের কঠোর শাসনে সীমাচিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, দেবমন্দিরগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, বিশ্বেশ্বরের মন্দির পর্য্যন্তও মুসলমানের মসজেদে পরিণত হইয়াছিল! উপযুক্ত আবাসগৃহের অভাবে

(৪) সম্রাট শাহজাহাঁরও টোডরমল নামে এক কর্ম্মচারী ছিলেন।

তীর্থযাত্রীদিগের ক্লেশের অবধি ছিল না; হিন্দুদিগের পক্ষে সে দৃশ্য স্বভাবতঃই হৃদয়বিদারক হইয়া উঠিয়াছিল।

কাশীধামের পুণ্যক্ষেত্র এরণ্ডপত্রাকৃতি; সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে সীমাচিহ্নসংস্থাপন না করিলে, কোন্ কোন্ স্থান পুণ্যক্ষেত্র, তাহা সহজে নির্ণয় করা যায় না। রাণী ভবানী এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য বহুব্যয়ে কাশীধামের লুপ্তোদ্ধারে যত্নবতী হইয়াছিলেন। তাঁহার কল্যাণে আবার সীমাচিহ্ন নির্দ্দিষ্ট হইল; আবার বহুশত মন্দিরচূড়ায় কাশীর পূর্ব্ব গৌরব বিকশিত হইয়া উঠিল; আবার শঙ্খঘণ্টানিনাদে পুণ্যভূমি মুখরিত হইল।

এই কার্য্যে কত অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই; পদে পদে কত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই; কত দিনের অধ্যবসায়ে এই মহাব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছিল, তাহার কথা চিন্তা করিলেও বিস্মিত হইতে হয়।

প্রচুর অর্থব্যয় করিতে পারিলে অন্য লোকেও ইহা সুসম্পন্ন করিতে পারিতেন। কিন্তু কাশীর লুপ্তোদ্ধার করিয়া রাণী ভবানী তাহার সর্ব্বত্র আত্মহৃদয়ের পরিচয় প্রদান করিবার জন্য যে সকল অভিনব কীর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, অন্য লোকের হৃদয়ে তাহা হয় ত আদৌ উদিত হইত না।

রাণী ভবানীর প্রত্যেক পুণ্যকীর্ত্তিতেই তাঁহার বিশেষত্ব প্রকটিত হইয়াছিল; অন্য লোকে অর্থবলে যাহার সম্পাদন করিতে পারিতেন, তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট হইতেন না; তিনি প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যেই এমন কিছু নূতনত্বের পরিচয় প্রদান করিতেন যে, লোকে দুই হাত তুলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিত। সেগুলি তাঁহার বিশেষত্বসূচক; তাহাতে তাঁহার জীবহিতব্রতের পরিচয় প্রকাশিত হইত। কাশীধামের লুপ্তোদ্ধার কার্য্যেও তাহাই হইয়াছিল।

তিনি কাশীর সীমাচিহ্ন-সংস্থাপন করিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ব্যবধানে "এক এক ধর্ম্মঢোকা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। অর্থাৎ ঐ ঐ স্থানে এক এক পিল্লা, এক এক বৃক্ষ ও এক এক কূপ খনন করিয়া দিয়াছিলেন। পথশ্রান্ত লোক বা যাহারা আপন মস্তকে দ্রব্যাদি বহন করে, তাহারা শ্রান্ত বা পিপাসাযুক্ত হইলে বিনা সাহায্যে ঢোকার উপর মোট বা দ্রব্যাদি রাখিয়া বৃক্ষমূলে বসিয়া বিশ্রাম এবং জলপানাদি করিত, পরে ঢোকার উপর হইতে অক্লেশে মোট আপন মস্তকে লইয়া পুনর্ব্বার গমন করিত।" (১)

(১) নবনারী।

অন্তঃপুরবাসিনী রাজরাণী হইয়াও যাঁহার কোমল হৃদয় ভারবাহী দীন-দরিদ্রের দুঃখ কষ্টে বিগলিত হইত, কাশীবাসিগণ যে অদ্যাপিও অন্নপূর্ণার অবতার বলিয়া প্রাতরুত্থানসময়ে তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করিয়া থাকেন, ইহাই রাণী ভবানীর অবিনশ্বর স্মৃতিচিহ্ন।

এক জন চরিতাখ্যায়ক এই সকল কথার উল্লেখসময়ে লিখিয়া গিয়াছেন,—

"নিজ কাশীতে নিত্য প্রাতঃকালে এক প্রস্তরের চৌব্বাতে আট মণ ছোলা ভিজান যাইত, তাহা অনাহূত যে সকল লোক আগত হইত, তাহাদিগকে দেওয়া যাইত এবং অন্নপূর্ণার মন্দিরে নিত্য নিত্য ২৫ মোণ তণ্ডুল বিতরণ হইত।"

সাঁতোল-নিবাসিনী রাণী শর্ব্বাণী করতোয়াতটে যে মহাপীঠের আবিষ্কার করেন, তদ্দর্শনার্থ বহু শত যাত্রী সমবেত হইত। পথ ঘাটের সুব্যবস্থা না থাকায় লোকের যথেষ্ট কষ্ট হইত; রাণী ভবানী সে কষ্ট দূর করিয়া তীর্থ দর্শনের সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন, এবং সীতারামের দেবমন্দিরগুলির জীর্ণসংস্কার করিয়া তথায় যথারীতি সেবা পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। অশ্যকৃত প্রাচীন কীর্ত্তিরক্ষার জন্য তাঁহার যেরূপ আন্তরিক অনুরাগ ছিল, হিন্দুসাধারণের সেরূপ অনুরাগ থাকিলে রাণী ভবানীর পুণ্যকীর্ত্তি এত অল্পদিনের মধ্যেই এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইত না!

অর্দ্ধবঙ্গব্যাপী রাজসাহী রাজ্যের অধীশ্বরী হইয়াও রাণী ভবানী ব্রহ্মচারিণীর ন্যায় জীবনযাপন করিতেন। কখনও নাটোর রাজবাটীতে, কখনও পুণ্যতীর্থে, কখনও বা বড়নগরের গঙ্গাতীরে অবস্থান করিয়া, রাজকার্য্য পরিদর্শন, পুরাণাদিশ্রবণ, সন্ধ্যাবন্দনাদিসম্পাদন ও লোক-হিত-সাধনে দিনযাপন করিতেন। তাঁহার হবিষ্যান্নের জন্য উড়ি ধান্য ভিন্ন কৃষিজাত ধান্য ব্যবহৃত হইত না। এক জন হিন্দু কবি এই সকল কথার উল্লেখ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,—

"অতিপুণ্যবতী রাজ্ঞী কুশাসনবিলাসিনী।
ব্রীহ্যন্ননিয়তাহারা ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বিনী॥" (১)

যে সময়ে প্রাচীন রাজবংশের উত্তরাধিকারিগণ যথাকালে রাজস্বদানে অশক্ত হইয়া নবাব-দরবারে নানারূপে বিড়ম্বনা ভোগ করিতে বাধ্য হইতেন, সেই সময়ে বর্ষে বর্ষে বহুলক্ষ মুদ্রা রাজকর পরিশোধ করিয়া এই সকল বহুব্যয়-সাধ্য পুণ্যকার্য্য সংস্থাপন করায়, রাণী ভবানীর শাসনপ্রতিভা সকলের নিকটেই বিস্ময়ের ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল।

(১) লঘুভারতম্।

এই সকল কীর্ত্তিকাহিনী স্মরণ করিয়া একজন সহৃদয় ইংরেজ রাজপুরুষ লিখিয়া গিয়াছেন,—

"রাণী ভবানী পুণ্যশীলা ও ধর্ম্মপরায়ণা বলিয়া সবিশেষ পরিচিতা। তিনি সর্ব্বদাই দেবসেবা ও দেবমন্দিরপ্রতিষ্ঠার জন্য মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতেন; একমাত্র কাশীধামেই তিন শত দেবমন্দির, অতিথিশালা ও ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছিলেন। আজ পর্য্যন্ত তাহার অনেকগুলি রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, অনেকগুলি এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না;—হয় ত বিস্তীর্ণ রাজ্য হস্তচ্যুত হইলে রাণী ভবানীর বংশধরগণ অর্থাভাবে সেগুলির রক্ষা করিতে পারেন নাই! রাণী ভবানী এই সকল সেবাপূজার জন্য অর্থ ও ভূমিদান করিয়া গিয়াছিলেন; তন্মধ্যে কতকগুলি নাটোরে অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। শ্যামরায়ের সেবা এখনও মুরশিদাবাদ প্রদেশে সর্ব্বজনপরিচিত। ইহার জন্য রাণী ভবানী যে ভূমিদান করেন, তন্মধ্যে চুয়াগাছা ও কালীগঞ্জের মধ্যবর্ত্তী ডিহি ফুলবাড়িয়া সর্ব্বপ্রধান।"(২)

কাশীধামের পুণ্যকীর্ত্তির আর সেরূপ গৌরব নাই;—একদিন কাশীধামে রাণী ভবানীর ছত্রই সর্ব্বপ্রধান হইয়া উঠিয়াছিল, এখন কেবল তাহার ধ্বংসাবশেষমাত্রই বর্ত্তমান;—সে পূর্ব্বগৌরব অতীতকাহিনীমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

মুরশিদাবাদ প্রদেশের পুণ্যকীর্ত্তিগুলিও কালক্রমে পূর্ব্বগৌরবচূড়া হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে। যে শ্যামসুন্দর বিগ্রহের সেবা পূজা ইংরাজ রাজপুরুষেরও বিস্ময়োদ্দীপন করিয়াছিল, তাহার জন্য রাণী ভবানী যে সহস্র-বিঘা-পরিমিত শস্যবহুলা সফলা ভূমি সম্প্রদান করিয়াছিলেন, এ স্থলে দৃষ্টান্তস্বরূপ সেই অতীত-সাক্ষী দানপত্রখানি উদ্ধৃত হইল।

"শ্রীযুতশ্যামসুন্দরদেবচরণসরসীরুহরাজেষু সেবার্থদবোত্তর পত্রমিদং।"
"নিজ সুকৃতীবিধাত্রী লিখ্যতে দানপত্রী শাকে ১৬৮৩ সনে ১১৬৮ বর্ষে লিখনং কার্য্যনঞ্চাদৌ পরন্ত মদীয়রাজ্যৈকদেশে রাজসাহীপরগণাখ্যে গ্রামাণ্যন্তর্গতপরগণে গোহাসেতিপ্রসিদ্ধরাজ্যোপদেশে একসহস্রবিঘেতি লৌকিকপ্রসিদ্ধা শস্যসম্প্রদানভূমিঃ॥"

"দেবস্য হারিণো যে চ যে চ তদ্বিঘ্নকারকাঃ।
নরকান্নিষ্কৃতিস্তেষাং নাস্তি কল্পশতৈরপি॥"

ইংরাজাধিকার প্রচলিত হইয়া কালক্রমে রাজবিধির বিচারানুষ্ঠানে রাণী ভবানীর প্রদত্ত অনেক দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর ভূমির কর ধার্য্য হইয়াছিল।

(২) Westlands' Jessore.

মূল দানপত্রগুলি যথাকালে প্রকাশিত ও প্রমাণীকৃত না হওয়ায়, অনেকস্থলে এইরূপ বিচারবিভ্রাট সংঘটিত হইয়াছিল। অনেকে স্বার্থসিদ্ধির জন্যও অনেক কাগজপত্র লুকাইয়া ফেলিয়াছিলেন। যে সকল দেবোত্তরভূমি এখনও প্রচলিত আছে, তাহারও সমস্তগুলির দানপত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। রাজসাহীর কালেক্টারীতে কতকগুলির অনুলিপি আছে; মূলদানপত্র কি হইল, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। (১)

রাণী ভবানীর ভূমিদানপত্রের সংখ্যানির্ণয় অসম্ভব; তিনি যে বহুলক্ষ বিঘা ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা বঙ্গদেশে প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল দানপত্রে সাধারণতঃ নিম্নোক্ত শ্লোকাবলী লিখিত থাকিত,—

"বহুভির্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ।
যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলং॥
ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্নাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি।
উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ॥
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেত্তু বসুন্ধরাং।
স বিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে॥"

রাণী ভবানী সাদরে শাস্ত্রানুশাসনবাক্য উদ্ধৃত করিয়া দানপত্র লিখিয়া দিতেন; উত্তরকালে তাহার মর্য্যাদা সকল স্থলে সম্যক্‌রূপে রক্ষিত হয় নাই বলিয়া রাণী ভবানীর গৌরব ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না।

রাণী ভবানীর এই সকল পুণ্যকীর্ত্তির মর্য্যাদানিরূপণ আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। লোকে গৌরবলালসায়, বা স্বধর্ম্মানুরাগে, বা স্বদেশপ্রীতিতে প্রণোদিত হইয়াই এই শ্রেণীর পুণ্যকীর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে;

(১) রাজসাহীর কালেক্টারীতে যে সকল অনুলিপি রক্ষিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এইগুলি প্রধান;—যথা;—

১১৬২। ২৫ কার্ত্তিক রাধাকান্ত দেব ঠাকুর ১০০০ বিঘা।
১৬৫। ১ শ্রাবণ কানাইয়ালাল দেব ঠাকুর ২০০০ বিঘা।
১১৬৭। ২২ মাঘ মদনমোহন দেব ঠাকুর ১০০০ বিঘা।
১১৬৮। ২৪ আশ্বিন গোপীনাথ দেব ঠাকুর ১৭৫০ বিঘা।
১১৬৮। ২২ চৈত্র শ্যামসুন্দর দেব ঠাকুর ৩০০০ বিঘা।
১১৬৯। ১৫ কার্ত্তিক লক্ষ্মীজনার্দ্দন দেব ঠাকুর ৫০০ বিঘা।
১১৭০। ৮ পৌষ লক্ষ্মীজনার্দ্দন দেব ঠাকুর ৫০০ বিঘা।
১১৭১। ১৫ ভাদ্র মনোমোহন দেব ঠাকুর ১২৫০ বিঘা।

রাণী ভবানীর পুণ্যকীর্ত্তিগুলি ইহার কোন শ্রেণীর অন্তর্গত, তাহার আলোচনা না করিলে আমরা তাঁহাকে ভাল করিয়া চিনিতে পারিব না।

অনেকে গৌরবলালসায় উত্তেজিত হইয়া লোকপ্রশংসা বা রাজদত্ত-উপাধিলাভাশায় অনেক পুণ্যকীর্ত্তির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর দান একেবারেই নিন্দনীয় নহে। কিন্তু ইহার সহিত খ্যাতিলাভগণনার সংস্রব থাকায়, ইহাতে দাতার মহোচ্চহৃদয়ের পরিচয় প্রকাশিত হয় না। যাঁহারা উপাধিলাভের পূর্ব্বে গ্রামে গ্রামে দীনদরিদ্রদিগকে অন্ন জল বিতরণ করিয়া গলদ্‌ঘর্ম্মকলেবরে আত্মকার্য্যের ঢক্কানিনাদ করিতেছেন, উপাধিলাভ করিবামাত্র তাঁহারাই যে আবার দীনদুঃখীদিগকে রিক্তহস্তে ফিরাইয়া দিতেও কাতর হন না,—এরূপ দৃষ্টান্ত এ হতভাগ্য দেশে বিরল নহে। যে বিষয়ে দান করিলে রাজার শুভদৃষ্টিলাভের পথ সহজ হইবে, সেই বিষয়ে দান করিবার জন্যই ইঁহাদের সমধিক আগ্রহ। নিজের বাসগ্রামের কাঙ্গাল প্রতিবেশিগণ অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে, তাহাদের করুণ ক্রন্দন নিত্যই কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে, অথচ ধনকুবের গ্রামবাসী বড়লোক মহাশয় শৈলশিখরবিহারী বিলাসিগণের বিশ্রামভবননির্ম্মাণের জন্য সমুদয় সহৃদয়তা ফুরাইয়া ফেলিতেছেন,—এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। রাণী ভবানীর দানশীলতা এই শ্রেণীর অন্তর্গত ছিল না।

তাঁহার দানশীলতার সহিত ক্ষতিলাভগণনার সংস্রব ছিল না বলিয়া তাহা উৎসের ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া চতুর্দ্দিক শীতল করিয়া দিত। স্বদেশপ্রেমিকের জীবন নিষ্কাম সেবকের জীবন। তিনি স্বদেশকে এমন প্রণয়ে স্নেহে প্রাণের সঙ্গে ভালবাসিতে জানেন যে, তাহাতে তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যই মধুময় হইয়া যায়। রাণী ভবানীর পুণ্যকার্য্যের মূলে স্বদেশপ্রীতি বর্ত্তমান থাকায় তাহার আলোচনামাত্রও আমাদের নিকট মধুময় বলিয়া বোধ হয়।

নবম পরিচ্ছেদ;—রাজকুমারী তারা।

রাণী ভবানী যাঁহাদের সহায়তায় রাজসাহীর রাজ্য শাসন করিয়া প্রতিভাশালিনী শাসনকর্ত্রী বলিয়া ইতিহাসে চিরস্মরণীয়া হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই জনের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। রাজান্তঃপুরে রাজকুমারী তারা, এবং রাজকার্য্যালয়ে বৃদ্ধ মন্ত্রী দয়ারাম, রাণী ভবানীর প্রত্যেক রাজকার্য্যের মন্ত্রণার সহায় বলিয়া পরিচিত ছিলেন। স্বচক্ষে দর্শন করিতে না পারিলেও,

স্বকর্ণে সকল কথা শ্রবণ করিয়া, এই দুই জন বিশ্বস্ত মন্ত্রীর সহায়তায়, রাণী ভবানী রাজকার্য্য সুসম্পন্ন করিতেন।

তারা ঠাকুরাণীর (১) নাম নানা কারণে বাঙ্গালীর নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তিনি বিবিধ বিদ্যার অনুশীলন করিয়া বালবৈধব্যপীড়িতা হইয়া নিরন্তর মাতৃসন্নিধানে বাস করিয়া বহুলপরিমাণে মাতৃগুণে বিভূষিতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। যৌবনোন্মেষে তাঁহার রূপলাবণ্য সুশিক্ষার আলোকে অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। রাণী ভবানী তাঁহাকেই রাজসাহী রাজ্যের পাটেশ্বরী করিবার আশায় নবাব-সরকারে জামাতার নাম জারি করাইয়াছিলেন। (২) তাঁহার অকালমৃত্যুতে সে আশা সফল হয় নাই; কিন্তু বালবিধবা তারা রাজসাহীর শাসনকার্য্যে লিপ্ত হইয়া রাণী ভবানীর সবিশেষ সহায়তা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

তারা ঠাকুরাণীর বিষয় বিভবের অভাব ছিল না; মাতার স্নেহানুরাগে তিনি যে সকল তালুক উপঢৌকন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে একালের লোকে বড়মানুষ বলিয়া অহঙ্কার করিতে পারিতেন। কিন্তু রাজকুমারী তারা অতুল সম্পদের অধিকারিণী রাণী ভবানীর সাধু দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া, আত্ম-সম্পদের অধিকাংশ ভাগ পুণ্যকীর্ত্তিপ্রতিষ্ঠার্থই ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। উপর্য্যুপরি প্রবল ভূমিকম্পে নাটোর-রাজবাটীর প্রায় সমস্ত পুরাতন অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইয়াছে; সমুন্নত মন্দিরচূড়ায় যে সকল স্থান গৌরবময় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা এখন ভগ্নস্তূপ! যে দুই চারিটি পুরাতন মন্দির বর্ত্তমান ছিল, তাহা বিগত ১৮৯৭ সালের ১২ই জুনের ভূমিকম্পে একেবারে ধূলিপরিণত হইয়াছে। এখন কেবল একটিমাত্র মন্দির নাটোর-রাজবাটীর পূর্ব্ব গৌরবের

(১) রাজসাহী প্রদেশে রাজকুমারীমাত্রই "ঠাকুরঝি-মহাশয়"-নামে সম্বোধিত হইয়া থাকেন; ইঁহারা এখনও রাজকার্য্যে অনেক সহায়তা করিয়া থাকেন। প্রাদেশিক প্রথানুসারে তারা দেবীকে লোকে "তারা ঠাকুরঝি মহাশয়" বলিত; তিনি এখনও সেই নামে পরিচিতা।

(২) রাজসাহীর খাজুরা-গ্রাম-নিবাসী রঘুনাথ লাহিড়ীর সহিত তারা ঠাকুরঝি মহাশয়ের বিবাহ হয়; রাণী ভবানী কন্যাজামাতার হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিবেন বলিয়া নবাব-দরবারে রঘুনাথের নাম জারি করাইয়াছিলেন। গ্রাণ্ট সাহেবের রাজস্ববিষয়ক পুস্তকে ইহার উল্লেখ আছে। রঘুনাথের মাতা রাজসাহী কালেক্টরী হইতে ইংরাজ রাজত্বেও পেন্সন পাইয়াছিলেন।

সাক্ষিরূপে দণ্ডায়মান;—তাহার নাম তারকেশ্বর-মন্দির। ইহা তারা ঠাকুরাণীর কীর্ত্তিচিহ্ন।

নাটোরের ন্যায় বড় নগরেও তারা ঠাকুরাণীর কীর্ত্তিচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি মাতার সহিত বড়নগরে গঙ্গাবাস করিবার সময়ে, তথায় একটি গোপাল-মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন; তাহাতে তারা ঠাকুরাণী আত্মপরিচয় প্রদান করিবার সময়ে আপনার স্বামিকুলের উল্লেখ না করিয়া কেবল পুণ্যময়ী মাতার নামোল্লেখ করিয়া লিখাইয়াছিলেন;—

"শশূন৷মৈত্রশাকে শ্রীভবানীতনুসম্ভবা।
নির্ম্মমে শ্রীমতী তারা শ্রীমদ্গোপালমন্দিরম্॥"

এতদ্ভিন্ন রাঢ়দেশে "তারা-পীঠ" নামে যে বিখ্যাত হিন্দুতীর্থক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও তারা ঠাকুরাণীর পুণ্যকীর্ত্তির সাক্ষিরূপে অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। তিনিও মাতার ন্যায় পূজাব্যপদেশে ক্ষুধাতুরকে অন্নদান করিবার জন্য, এই সকল দেবোদ্দেশে অনেক দেবোত্তরভূমি দান করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার অভাবে এই সকল পুণ্যকীর্ত্তি রক্ষা করিবার আশায়, সমস্ত ভার নাটোর ছোটতরফ রাজপরিবারের আদিপুরুষ রাজকুমার শিব নাথ রায় বাহাদুরের উপর ন্যস্ত করিয়া দানপত্র সম্পাদন করিয়া গিয়াছিলেন। (১)

নাটোর রাজবংশের রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে দয়ারামের নাম চিরসংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। কখনও অসিহস্তে ভূষণার শিবিরে, কখনও লেখনীহস্তে নাটোর রাজ-কার্য্যালয়ে, কখনও বা উষ্ণীষমস্তকে নবাব-দরবারে, দয়ারাম রায় আন্তরিক অনুরাগে নাটোরাধিপতির সৌভাগ্যবর্দ্ধনের চেষ্টা করিতেন। রামজীবনের সংসারে দয়ারামের পদমর্য্যাদা সর্ব্বজনপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি রাজবাটীতে "দয়ারাম দাদা" বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

রাণী ভবানী যখন রাজসাহী রাজ্যের শাসনভার পরিচালিত করিতেছিলেন, দয়ারাম তখন বার্দ্ধক্যবশতঃ সর্ব্বদা রাজবাটীতে অবস্থান করিতেন না। তাঁহার অনুপস্থিতিসময়ে কেহ কেহ তাঁহার কৃত কার্য্যের দোষোদ্ঘাটন করিবার চেষ্টায় তারা ঠাকুরাণীর নিকট অনেকরূপ অভিযোগ করিতেন। তদুপলক্ষে সময়ে সময়ে দয়ারাম ও তারা ঠাকুরাণীর মধ্যে কলহ হইত।

(১) রাজসাহীর কালেক্টারীতে তারা ঠাকুরাণীর দানপত্রের যে সকল অনুলিপি দেখিতে পাওয়া যায়, মূল দানপত্র নহে বলিয়া তাহাতে তাঁহার স্বাক্ষর নাই। অনুলিপিগুলিও এখন নিতান্ত জরাজীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এই দানপত্র বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত।

সে কলহ কিরূপ সুখের কলহ ছিল, তাহার একটি জনশ্রুতি অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

একবার তারা ঠাকুরাণী সংবাদ পাইলেন যে, দয়ারাম কেবলমাত্র আপনার নাম স্বাক্ষর করিয়া অনেক ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন। রাজভৃত্যের পক্ষে এরূপ কার্য্য সম্পূর্ণ অনধিকারচেষ্টা বলিয়া, তারা ঠাকুরাণীর পরামর্শে সেই সমস্ত ব্রহ্মোত্তর অসিদ্ধ গণ্য করিবার জন্য ব্রাহ্মণগণকে রাজধানীতে আহ্বান করা হইল। বিপ্রবর্গ দয়ারামের শরণাগত হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে রাজদরবারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বলিয়া, স্বয়ং রাণী ভবানীর দরবারে উপনীত হইলেন।

তারা ঠাকুরাণী বুঝাইয়া দিলেন যে, দয়ারাম রাজভৃত্যমাত্র, রাজকার্য্য-পরিচালনের অধিকার থাকিলেও, ভূমিদানের অধিকার নাই। অতএব তাঁহার স্বাক্ষরযুক্ত দানপত্রগুলি অসিদ্ধ! দয়ারাম ইহার কিছুমাত্র প্রতিবাদ না করিয়া এক খণ্ড পুরাতন জীর্ণ পত্র বাহির করিয়া রাণী ভবানীকে প্রদান করিলেন, এবং বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন;—"মা! আমি রাজভৃত্য হইয়াও যে ব্রাহ্মণগণকে ভূমি দান করিয়াছি, তাহা অসিদ্ধ হয় হউক, তাহাতে আর দুঃখ কি? কিন্তু এই জীর্ণ পত্রখানি দেখুন, ইহা আপনার বিবাহের লগ্নপত্র; ইহাও কিন্তু এই রাজভৃত্য দয়ারামই স্বাক্ষর করিয়া দিয়াছিল।" (১) বলা বাহুল্য, কাহারও ব্রহ্মোত্তর আর অসিদ্ধ হইতে পারিল না।

তারা ঠাকুরাণীর শিক্ষা দীক্ষার কথা, অপরূপ রূপলাবণ্যের কথা, এবং সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার কথা বঙ্গদেশের সকল স্থানেই ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সে কথা কালক্রমে সিরাজদ্দৌলারও কর্ণগোচর হইয়াছিল। মাতামহের অসঙ্গত বাৎসল্যবশতঃ সিরাজের বাল্যজীবনেই অশেষ কুশিক্ষার বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছিল; যৌবনোদ্গমে তাঁহার অধীর হৃদয় প্রবৃত্তিদমনে অশক্ত হইয়া নানারূপ ভোগবিলাসের সূচনা করিয়াছিল। হিরাঝিলের প্রমোদভবনে যে বিলাসলালসা বিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা তারা ঠাকুরাণীর দিকে ধাবিত হইল। বড়নগর-নিবাসিনী রাণী ভবানী ও রাজকুমারী তারা তচ্ছ্রবণে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। অবশেষে গোপনে বড়নগর

(১) "মাতর্দয়াময়ি তব দয়য়ৈব সদাশয়ঃ। মৎকৃতেন চ পত্রেণ বিবাহো যদি সিধ্যতি।
ভৃত্যোঽহংহি দয়ারামো দত্তভূমিং দ্বিজন্মনে। তুচ্ছং ব্রহ্মোত্তরপত্রং সিধ্যেদিত্যত্র কা কথা॥"
—লঘুভারতম্।

হইতে পলায়ন করিয়া তারা ঠাকুরাণীর মৃত্যুসংবাদ রটনা করার পরামর্শ স্থির হইলে, তদনুরূপ আয়োজন হইতে লাগিল। বড়নগরের নিকট যে সকল সন্ন্যাসী বাস করিতেন, তাঁহারাই রাণী ভবানী ও তারা ঠাকুরাণীকে গোপনে নাটোরে আনয়ন করিয়াছিলেন, এইরূপ কিম্বদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়। এই জনশ্রুতি একেবারে অমূলক বলিয়া বোধ হয় না। রাণী ভবানী সন্ন্যাসীদিগের এই কার্য্যের প্রত্যুপকার করিবার জন্য নাটোরে একটি আখড়া স্থাপন করিয়া ভূমিদান করিয়াছিলেন; তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

জনশ্রুতির কল্যাণে এই ঘটনা বহুবিধ আকারে বঙ্গসাহিত্যে বিবৃত হইয়াছে। দ্বাদশনারী রচয়িতা বলেন,—

"রাজকন্যা তারার রূপরাশির প্রশংসাবাদ শুনিয়া তারাকে আপন জীবনতোষিণী করিতে দুরন্তের ইচ্ছা হইল। ভবানী অর্থের প্রলোভনে ভুলিলেন না। বরং গর্ব্বসহকারে সিরাজকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, যদিও হিন্দুগর্ব্ব খর্ব্বপ্রায়—যদিও হিন্দু আজি উৎসন্ন-দশাগ্রস্ত, তথাপি সিরাজ হেন পাপিষ্ঠেরা তাহার পদদলিত হইবার যোগ্য নহে। সৈন্যদল নবাবের আজ্ঞাক্রমে রাজসাহীর রাজভবনলুণ্ঠনমানসে তদভিমুখে গমন করিল। অন্নদাত্রী পালনকর্ত্রী মাতার উত্তেজনায় সমগ্র রাজ্য কাঁপিয়া উঠিল। ভবানীর শত সহস্র প্রজা সৈন্য সিরাজের বিদ্রোহিতা অবলম্বন করিল।"

দ্বাদশনারী-লেখক এইরূপ উপক্রমণিকা করিয়া, এই যুদ্ধ বর্ণনায় ইহার উপসংহার করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, সে যুদ্ধে সিরাজসেনা পরাজিত হইয়া মুর্শিদাবাদে পলায়ন করিয়াছিল। রাজসাহী প্রদেশে কিন্তু এরূপ জনশ্রুতি শুনিতে পাওয়া যায় না। নবাব আলিবর্দ্দীর শাসনসময়ে সিরাজের যৌবনোদ্গমকালে তারার উপর তাঁহার পাপচক্ষু পতিত হইয়াছিল; তাহা লইয়া কোনরূপ প্রকাশ্য বলপ্রয়োগের আয়োজন হইতে পারে নাই। সিরাজের হৃদয়বেগ দুর্দ্দমনীয়; সুতরাং রাণী ভবানী বড়নগর হইতে নাটোরে পলায়ন করিয়া আত্মসম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন—ইহাই রাজসাহীর জনশ্রুতি।

আর এক জন লেখক বলেন:—

"রাজকুমারী তারার অলৌকিক রূপলাবণ্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য সিরাজদ্দৌলা গঙ্গাবাসপুরীতে (বড়নগরে) আগমন করিয়া সসৈন্যে রাজপুরী বেষ্টন করিলেন। মাতা ও কন্যা আত্মঘাতিনী হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রাজরাজেশ্বরীর মন্দিরে পূজা আরম্ভ করিলেন। ইত্যবসরে মস্তরাম নামক জনৈক সন্ন্যাসী শূলহস্তে সিরাজের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ায় তিনি প্রাণভয়ে পলায়ন করায় রাজকুমারীর ধর্ম্মরক্ষা হইল!" (১)

(১) লঘুভারতম্।

বড়নগর রাজবাটীর রাণী ভবানীর বংশধর রাজা উমেশচন্দ্রের নিকট শুনিয়াছেন বলিয়া, আর এক জন লেখক লিখিয়া গিয়াছেন ;—

"প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী এই সময়ে বঙ্গের প্রধান জমিদার ছিলেন। ইঁহার হস্তে প্রভূত ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল। ইঁহার প্রচুর ধনবল ও সৈন্যবল ছিল। প্রজাদিগকে প্রাণদণ্ডাদি সর্ব্ববিধ দণ্ডদানের অধিকার ছিল। রাণী এই সময়ে আজিমগঞ্জের নিকটস্থ তাঁহার প্রকাণ্ড ভবনে বিধবা দুহিতা তারা দেবীর সহিত গঙ্গাবাস করিতেছিলেন। তারা অপূর্ব্ব সুন্দরী, তৎকালীন বঙ্গীয় রূপসীমণ্ডলে আদর্শ রূপবতী ছিলেন। সপ্তম বর্ষ বয়সে তারার বিবাহ হয়। বিবাহের সাত দিবস পরে তিনি বিধবা হন। এখন তারা পূর্ণযৌবনা, এক দিন প্রাসাদশিখরে দাঁড়াইয়া সিক্তকেশের রাশি শুষ্ক করিতেছিলেন, এমন সময়ে নবাবের বজরা সেই ভবনের নিম্নস্থ জাহ্নবীবক্ষে ধীরগতিতে ভাসিয়া যাইতেছিল। তরলমতি নবাব শ্যেন পক্ষীর মত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেই রূপরাশি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার তরুণ প্রাণে তারার রূপের যে ছাপ বসিয়াছিল, তাহা তিনি কিছুতেই মুছিয়া ফেলিতে পারিলেন না। অবশেষে উন্মাদের মত রাণীর নিকট তারাপ্রাপ্তির প্রস্তাব করিলেন। রাণী রোষে ঘৃণায় অপমানে সংক্ষুব্ধ হইয়া সেই পাপ প্রস্তাবে অসম্মতি প্রদান করিলেন। নবাব সিরাজদ্দৌলা কৌশলে পরাজিত হইয়া বল অবলম্বন করিলেন। ভবানী ভয় পাইলেন না, তাঁহার সাহস টুটিল না।" ইত্যাদি। (১)

বড়নগরের রাজা উমেশচন্দ্র এখন স্বর্গারূঢ়। তিনি রাণী ভবানীর বংশধর বলিয়া গৌরব করিতেন, এবং অনেক বিষয়ে বর্ত্তমান লেখকের সহায়তা করিতেন। তাঁহার নিকট শুনা বলিয়া যত কথা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সমস্তই যে তিনি বলিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ রহিয়া গেল। কোনরূপ প্রকাশ্য বলপ্রয়োগের আয়োজন বা যুদ্ধকলহের কথা যে রাজা উমেশচন্দ্র বিশ্বাস করিতেন, তাহা বোধ হয় না। রাণী ভবানীর জীবনী সঙ্কলনের জন্য তাঁহার নিকট যে প্রশ্নাবলী প্রেরিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ইহার উল্লেখ ছিল ; কিন্তু তিনি রাজসাহী প্রদেশের প্রচলিত জনশ্রুতির কোন প্রতিবাদ করেন নাই।

জনশ্রুতি মুখে মুখে বিস্তৃত হইয়া এত রূপান্তরিত হইয়া পড়ে যে, অল্প দিনের মধ্যেই সত্যের সঙ্গে অসত্য জড়িত হইয়া প্রকৃত তথ্যনির্ণয়ের পথ অবরুদ্ধ করিয়া দেয় ; এ স্থলেও তাহাই হইয়াছে। মুসলমানদিগের ইতিহাসে সিরাজের অনেক কুকীর্ত্তির উল্লেখ আছে, কিন্তু এই ঘটনার উল্লেখ নাই। প্রকাশ্য যুদ্ধ হইলে তাহার কোন-না-কোনরূপ উল্লেখ থাকা সম্ভব হইত।

(১) নব্যভারত ; ১২৯৮ ;—শ্রীবিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়।

সিরাজের নবাবী আমলে এই ঘটনা সংঘটিত হয় নাই ; আলিবর্দ্দীর শাসনসময়ে হইয়াছিল। সিরাজ ইচ্ছামাত্রই প্রকাশ করিয়াছিলেন, কোনরূপ বাহুবলপ্রয়োগের চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার চরিত্রবিকারের কথা কাহারও অপরিজ্ঞাত ছিল না। রাণী ভবানী কলঙ্কগ্রস্ত হইবার ভয়ে তারা ঠাকুরাণীর মৃত্যু রটনা করিয়া দিয়া নাটোরে পলায়ন করিয়াছিলেন, ইহাই বিশ্বাসযোগ্য জনশ্রুতি।

দশম পরিচ্ছেদ ;—রাষ্ট্রবিপ্লব।

রাণী ভবানী যখন রাজসাহীর রাজ্যভার গ্রহণ করেন, সে সময়ে জমিদারেরাই প্রকৃতপ্রস্তাবে এ দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইয়া উঠিয়াছিলেন। সম্রাট আকবরের ন্যায় প্রবলপ্রতাপশালী মোগল রাজরাজেশ্বরকেও জমিদারবর্গের পদমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইয়াছিল। (১)

নবাব মুরশিদ কুলী খাঁর শাসনসময়ে রাজস্বদানে অশক্ত হইয়া কোনও কোনও পুরাতন জমিদারকে রাজপদ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল ; তদুপলক্ষে যে সকল নূতন জমিদারের অভ্যুদয় হয়, তাঁহারাও অল্পদিনের মধ্যেই প্রাচীন জমিদারবংশের ন্যায় পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এইরূপে বিষ্ণুপুর ও বীরভূমির প্রাচীন জমিদার-বংশ, দিনাজপুর, রাজসাহী, বর্দ্ধমান ও কৃষ্ণনগরের অপেক্ষাকৃত আধুনিক রাজবংশ, বাঙ্গালার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া মোগল রাজসরকারে নির্দ্দিষ্ট রাজকর প্রদান করিয়া স্বরাজ্যে স্বাধীনভাবে সর্ব্বপ্রকার রাজশক্তির পরিচালন করিতেছিলেন। ইঁহারা দেওয়ানী ফৌজদারী বিচারকার্য্য সম্পাদন করিয়া অপরাধিগণকে রাজবাটীতে কারারুদ্ধ

(১) The first class of Bengal Zamindars represented the old Hindu and Mohomedan Rajas of the country, previous to the Mogul conquest by the Emperor Akber in 1576, or persons who claimed that status. The second class were Rajas, or great landholders, most of whom dated from the 17th and 18th centuries, and some of whom were, like the first class, *de facto* rulers in their own estates or territories, subject to a tribute or land tax to the representative of the Emperor. These two classes had a social position faintly resembling the Feudatory Chiefs of the British Indian Empire, but that position was enjoyed by them on the basis of custom, not of treaties.

—The Bengal MS Records, vol I, 31.

করিতেন, সেনাপালন করিয়া রাজ্য রক্ষা করিতেন, এবং সর্ব্বাংশে সামন্ত নরপতির ন্যায় পদগৌরব সম্ভোগ করিতেন। (১)

বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার নবাব নাজিমের ন্যায় এই সকল জমিদারগণও দিল্লীশ্বরের সনন্দ গ্রহণ করিয়া, দিল্লীশ্বরের নামের দোহাই দিয়া, রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন; সুতরাং যথাকালে রাজকর প্রদান করিতে পারিলে, মুরশিদাবাদের নবাব ইঁহাদিগের রাজ্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না।

নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ এই সকল পরাক্রান্ত জমিদারদলের সহায়তায় দিল্লীশ্বরের নিকট সনন্দ লাভ করিয়া বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার মস্‌নদ অধিকার করেন। বর্গীর হাঙ্গামায় বিপর্য্যস্ত হইয়া কখনও ঋণগ্রহণে, কখনও বা সেনা-সহায়তাগ্রহণে, নবাব আলিবর্দ্দী জমিদারদলের পদমর্য্যাদার উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। জমিদারেরা স্বরাজ্যে এত দূর প্রতাপশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, ইংরাজ সওদাগরগণ তাঁহাদের দরবারেই বিচারপ্রার্থী হইতেন; সময়ে সময়ে তাঁহাদের উৎপীড়নে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া হাহাকার করিতেন; কখনও বা উৎকোচ উপঢৌকন পাঠাইয়া মনস্তুষ্টিসাধন করিতেও ত্রুটি করিতেন না।

সিরাজদ্দৌলা ইহার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি নিজাম-উল্‌-মোলকের ন্যায় স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপন করিবার আশায়, নাম-সর্ব্বস্ব দিল্লীর বাদশাহের সনন্দ-গ্রহণ করা আবশ্যক মনে করিলেন না। বাহুবলে ইংরাজদমন করিয়া, শাসনকৌশলে জমিদারগণকে পদানত রাখিয়া, বিচারবলে দুষ্টদলন করিয়া, ইচ্ছানুসারে রাজ্যশাসন করিবেন, অঙ্কুরেই তাহার কিছু কিছু আভাস পাওয়া গিয়াছিল। সিরাজ-চরিত্র অদম্য হৃদয়বেগের বশীভূত হইয়া উত্তরোত্তর অনেকের স্বার্থের পথে কণ্টক রোপণ করিবে, ইহা বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বেই, রাজধানীর পাত্রমিত্রগণ, জমিদারদলের সহায়তায় অন্য কোনও ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। সিরাজদ্দৌলা তাহার সন্ধান পাইয়াছিলেন; রুগ্নশয্যাশায়ী বৃদ্ধ আলিবর্দ্দীও তাহার পূর্ব্ব লক্ষণ বুঝিতে পারিয়া অন্তিম সময়ে সিরাজদ্দৌলাকে সাবধান হইবার জন্য উপদেশ দান করিয়াছিলেন।

---

(১) Such Zamindars held princely courts, maintained their own bodies of armed followers, dispensed justice in their territories or estates, and handed down their position from father to son.

—The Bengal MS. Rrcords, vol. I. 33.

বৈদ্য রাজা রাজবল্লভের চেষ্টায় নওয়াজেস মোহম্মদকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য অনেক ষড়যন্ত্র হইয়াছিল। আলিবর্দ্দীর জীবনকালে নওয়াজেসের মৃত্যু হওয়ায় সে চেষ্টা সফল হয় নাই। সিরাজদ্দৌলা সিংহাসনে পদার্পণ করিবামাত্র ষড়যন্ত্রকারিগণ স্বার্থরক্ষার জন্য নওয়াজেসের পালিত পুত্রের সদ্যোজাত শিশুসন্তানকে সিংহাসনে বসাইবার উদ্যোগ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অবশেষে সকলে মিলিয়া পূর্ণিয়ার নবাব সাইয়েদ আহম্মদের পুত্র শওকৎ জঙ্গকেই নবাব নির্ব্বাচনের চেষ্টা করায়, সিরাজদ্দৌলা নবাবগঞ্জের যুদ্ধে শওকৎ জঙ্গকে নিহত করায়, সে আশাও নির্ম্মূল হইয়া গেল। ষড়যন্ত্রকারিগণ তখন অনন্যোপায় হইয়া ইংরাজদিগের সহায়তায় মীরজাফরকে সিংহাসনে বসাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

সিরাজদ্দৌলা ইংরাজদিগকে দেখিতে পারিতেন না; ইংরাজেরাও তাঁহার সহিত সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই; এরূপ ক্ষেত্রে ইংরাজেরাও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতে অসম্মত হইলেন না।

রাণী ভবানী এই সকল ষড়যন্ত্রে কোন পক্ষেই লিপ্ত ছিলেন না; তিনি বিদেশীয় বণিক-সমিতির সহায়তায় সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার পক্ষপাতিনী ছিলেন না। বরং জমিদারদলের অগ্রণী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে এই অকীর্ত্তিকর রাজবিগ্রহের সংকল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার আশায়, ইঙ্গিতে সদুপদেশ প্রেরণ করিবার জন্য, শাঁখা, সিন্দূর ও শাটী উপঢৌকন পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। রমণীর নিকটেও যাহা স্ত্রীজনসুলভ কাপুরুষোচিত অপকার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, বাঙ্গালার প্রধান প্রধান পুরুষ জমিদার ও সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারিগণ তাহা পৌরুষের কার্য্য বলিয়া ইংরাজের সহায়তা গ্রহণ করাই স্থির করিলেন।

ষড়যন্ত্রের কথা আকারে ইঙ্গিতে সিরাজ-কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু মীরজাফর কোরাণ স্পর্শ করিয়া শপথ করায় তিনি মীরজাফরকেই সেনাপতি-পদে বরণ করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন বৃহস্পতিবারে পলাশির প্রান্তরে সিরাজ-সেনার সহিত ইংরাজদিগের যে যুদ্ধাভিনয় হইল, তাহাতেই সিরাজদ্দৌলার সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে রাজপ্রাসাদে, এবং রাজপ্রাসাদ হইতে কাঙ্গালের মত রাজপথে দাঁড়াইতে বাধ্য হইলেন। সেনা সংগ্রহ করিয়া নষ্ট-রাজ্যের পুনরুদ্ধারকামনায় গোপনে বিহার প্রদেশে পলায়ন করিতে গিয়া,

পথিমধ্যে ধৃত ও শৃঙ্খলাবদ্ধচরণে মুরশিদাবাদে আনীত হইয়া, কুক্কুরের ন্যায় নির্দ্দয়রূপে নিহত হইলেন!

পলাশির যুদ্ধাবসানে যে রাষ্ট্রবিপ্লবের সূচনা হইল, তাহাই বাঙ্গালার জমিদার-বংশের স্বাধীন রাজশক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিল। রাজবিদ্রোহী রাজকর্ম্মচারী সিংহাসনে আরোহণ করিলেন; পদাশ্রিত বণিক-সমিতি সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন; তাঁহাদের সহিত নবাবের এবং নবাবের সহিত তাঁহাদের, নানা কারণে মনোমালিন্য সংঘটিত হইতে লাগিল।

মীরজাফর ইতিহাসে "ক্লাইবের গর্দ্দভ" নামে পরিচিত হইয়া উঠিলেন। ক্লাইব স্বদেশযাত্রা করায়, যাঁহাদিগের উপর কলিকাতার ইংরাজদরবারের কার্য্যভার ন্যস্ত হইল, তাঁহারা মীরকাশিমের টাকা খাইয়া, জরাপলিত বৃদ্ধ "গর্দ্দভকে" কলিকাতায় নির্ব্বাসিত করিয়া, মীরকাশিমকে সিংহাসনদান করিলেন।

মীরকাশিমের দিনও সুখে কাটিল না। তিনি বাঙ্গালীর বাণিজ্য রক্ষা করিতে গিয়া, ইংরাজের বিরাগভাজন হইলেন; কালক্রমে তাহাতেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। সে অগ্নিতে মোগলরাজছত্র ভস্মীভূত হইয়া গেল। মীরকাশিম ফকিরের ন্যায় বঙ্গবিহার উড়িষ্যা হইতে চিরবিদায়গ্রহণ করিলেন; বৃদ্ধ মীরজাফর ইংরাজের হাত ধরিয়া আবার জরাপলিত-মস্তকে গৌরবহীন রাজমুকুট পরিধান করিলেন।

দিল্লীশ্বর শাহ আলম নামমাত্র বাদশাহ ছিলেন। মহারাষ্ট্র সেনাপতিগণ তাঁহাকে স্বরাজ্যে প্রবেশ করিতে দেন নাই। তিনি কখন আহমদ শাহ আব্দালী, কখন বা অযোধ্যাধিপতি উজীর বাহাদুরের শরণাপন্ন হইয়া, সিংহাসনারোহণের আয়োজন করিতেছিলেন। তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট তারিখে, বার্ষিক ২৬০০০০০ লক্ষ টাকা রাজকর লইয়া,ইংরাজদিগকে বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী-সনন্দ প্রদান করিলেন।

ইংরাজ সেনাপতি লর্ড ক্লাইব ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে "শুভ পুণ্যাহের" সূচনা করিয়া বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যায় ইংরাজ রাজত্বের ভিত্তিমূল প্রোথিত করিলেন; এই হইতে কোম্পানীর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করিল।

দিল্লীর অধঃপতনে মোগল সাম্রাজ্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল; মুরশিদাবাদের অধঃপতনে, সর্ব্বত্র অরাজকতার সূত্রপাত হইল। কোম্পানী বাহাদুর নূতন রাজ্যে সহসা শান্তি সংস্থাপন করিতে পারিলেন না;—অরাজকতা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

এই সকল রাষ্ট্রবিপ্লবে রাণী ভবানী স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া প্রাণপণে প্রজারক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসনকৌশলে দস্যু তস্করের অত্যাচার প্রবল হইতে পারিল না; কিন্তু ইংরাজ বণিকদিগের অত্যাচার প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। ইংরাজেরা বঙ্গদেশের নানা স্থানে বাণিজ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন; রাণী ভবানীর রাজ্যেই তাঁহাদের অধিকাংশ বাণিজ্যদ্রব্য উৎপন্ন হইত। লাভের লোভে অন্ধ হইয়া ইংরাজ সওদাগরগণ বলপূর্ব্বক সুলভ মূল্যে ক্রয় ও দুর্ল্লভ মূল্যে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করায়, দেশের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। রাণী ভবানী ইহার গতিরোধ করিতে পারিলেন না; যাঁহারা দিল্লীশ্বরের সনন্দক্রমে বঙ্গদেশের রক্ষক, তাঁহারাই স্বার্থরক্ষার জন্য ভক্ষক হইয়া উঠিলেন।

বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ।

মার্কিন স্থাপত্য।

একটি গল্প আছে,—আমেরিকার কান্সাস্ অঞ্চলে, এক নূতন রেলপথ নির্ম্মাণের সময়, রেল-কোম্পানির সহিত একটি ক্ষুদ্র গ্রামের অধিবাসিগণের ধাস্তিতগুা হয়। অধিবাসিগণ তাঁহাদের ক্ষুদ্র সহরটির মধ্য দিয়া রেল চালাইতে অনুরোধ করেন; কিন্তু রেলের কর্ত্তৃপক্ষগণ, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া, গ্রামের পাঁচ ক্রোশ ব্যবহিত একটি স্থান দিয়া পথ নির্ম্মাণ করিলেন। গ্রামে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল; সাধারণ সভাগৃহে গ্রামবাসিগণ সমবেত হইয়া স্থির করিলেন,—রেলপথ যদি গ্রামের নিকটবর্ত্তী না হয়, গ্রাম নিশ্চয়ই রেলপথের সন্নিহিত হইবে। পরদিন অতি প্রত্যূষ হইতেই বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা, হোটেল ও সাধারণ উপাসনালয়, সমৃদ্ধিশালী গ্রামটিকে মহাশ্মশানে পরিণত করিয়া, পঞ্চক্রোশদূরবর্ত্তী রেলওয়ে ষ্টেশনের সংলগ্ন বৃহৎ প্রান্তরে নীত হইতে লাগিল। সন্ধ্যার মধুর ক্ষীণালোক অপসৃত না হইতেই বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকাস্থ সান্ধ্য-প্রদীপের স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতিঃ এবং সহস্র নরনারীর আনন্দকোলাহলে, পূর্ব্বদিনের নির্জ্জন প্রান্তরটি উৎসবময় হইয়া উঠিল। নাগরিকগণ সদ্যঃপ্রতিষ্ঠিত ভজনালয়ে সমবেত হইয়া জগদীশ্বরকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ দিলেন; একটা ক্ষুদ্র দিনে, একটি অশ্রুতপূর্ব্ব বিস্ময়কর কার্য্যের সংঘটন হইয়া গেল;—রেলওয়ের কর্ত্তারা অবাক্!

পাঠকপাঠিকাগণ এই বিবরণটি অবাস্তবিক গল্প ভাবিবেন না;—ইহা হোসেন খাঁর ন্যায় কোনও সুচতুর ঐন্দ্রজালিকের অদ্ভুত ইন্দ্রজাল নয়, আধুনিক সম্মোহনবিদ্যার (Hypnotism) সাহায্যেও এ কার্য্য সাধিত হয় নাই;—আধুনিক উন্নত বিজ্ঞানের সাহায্যে ও কেবল স্থপতিবিদ্যার কৌশলে, উল্লিখিত বিস্ময়কর ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

অট্টালিকার স্থানান্তরীকরণ কার্য্যের সহিত আমেরিকার নূতন অধিবাসিগণ বহুকাল হইতে

পরিচিত আছেন। ঠিক অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে কয়েক জন স্থপতিবিদ্যাকুশল ব্যক্তির যত্নে, একটি ক্ষুদ্র গৃহ রাজপথের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে নীত হইয়াছিল। তৎকালে যথোপযুক্তরূপ বলপ্রয়োগের উপযোগী কোনও যন্ত্রই পরিজ্ঞাত ছিল না;—এই প্রতিকূল অবস্থাতেও তাঁহাদের আশাতীত সফলতা দেখিয়া, সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। ভবিষ্যতে অট্টালিকা সকল যাহাতে সহজ ও উৎকৃষ্টতর প্রথায় স্থানান্তরিত হইতে পারে, তাহার একটা সুব্যবস্থা করিবার জন্য একদল মার্কিন-শিল্পী সেই সময় হইতেই বহুবিধ চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞানের নানা শাখার উন্নতির সহিত উক্ত প্রথারও ক্রমোন্নতি হইয়াছে; এবং আজ কাল যে প্রণালীতে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা স্বল্পব্যয়ে যথেচ্ছ পরিচালিত হইতেছে, তাহার বিবরণ শুনিলে বাস্তবিকই স্তম্ভিত হইতে হয়।

আজ কাল ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক কার্য্যের জন্য যে প্রকার যন্ত্রের সাহায্য গৃহীত হইয়া থাকে,—আশ্চর্য্যের বিষয়, অট্টালিকা-পরিচালন কার্য্যে তাহার কিছুই আবশ্যক হয় না। কেবল কতকগুলি "স্ক্রু" এবং কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া থাকে; বলপ্রয়োগ কার্য্যটা অশ্বাদি দ্বারাই সম্পন্ন হয়; অধিক বলপ্রয়োগের আবশ্যকতা দেখিলে কখনও কখনও কেবল সাধারণ বাষ্পীয়যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অট্টালিকা স্থানচ্যুত করিতে হইলে, গৃহভিত্তির মধ্য দিয়া যে সকল ছিদ্রপথ থাকে, তন্মধ্যে প্রথমতঃ কতকগুলি দীর্ঘ কাষ্ঠখণ্ড উপর্য্যুপরি রক্ষিত হয়, পরে তাহার উপর কয়েকটি সুদৃঢ় "স্ক্রু" (Lifting jack-screw) স্থাপিত করিয়া, কার্য্য আরম্ভ হয়। এই "স্ক্রু"গুলি কিয়ৎকাল ঘুরাইলেই অট্টালিকা ভিত্তিচ্যুত হইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে থাকে। এই "স্ক্রু"গুলি এ প্রকার সুব্যবস্থায় স্থাপিত যে, ইহাদের আবর্ত্তন-কার্য্যে অধিক বলের আবশ্যকতা হয় না,—এক জন সবল ব্যক্তির দ্বারাই এক একটি 'স্ক্রু' বেশ সহজে চালিত হইয়া থাকে। এই প্রকারে উত্তোলিত হইলে, অট্টালিকাটি বৃহৎ বৃহৎ স্তম্ভাকার কাষ্ঠখণ্ডের (Roller) উপর স্থাপিত করিয়া, সম্মুখ হইতে রজ্জু ও শৃঙ্খলাদি দ্বারা সুকৌশলে টানিয়া, অভীষ্ট স্থানে নীত হইয়া থাকে। এই কার্য্যে অধিক কাষ্ঠেরও আবশ্যক হয় না,—অট্টালিকা বিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই, পশ্চাৎ হইতে কাষ্ঠগুলি আনিয়া নূতন-পথ প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। এই উপায়ে বাটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে নীত হইলে, নূতন ভিত্তির খনন-কার্য্য আরম্ভ হয়;—পরে ভিত্তি-গহ্বরের উপরও কাষ্ঠ সজ্জিত করিয়া, অট্টালিকাটি গহ্বরের উপর আসিয়া উপস্থিত হইলে, নূতন ভিত্তি গঠিত করিয়া, পুরাতন বাটীর সহিত তাহা সুদৃঢ়ভাবে সংলগ্ন করা হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত কার্য্যগুলি এত সুকৌশলে সম্পন্ন হইয়া থাকে যে, স্থানান্তরিত করিলে বাটীগুলির অণুমাত্র ক্ষতি হয় না। অল্প দিন হইল, সিকাগো সহরে একটি নূতন রাজপথ নির্ম্মাণের প্রয়োজন হয়। রথ্যাটি বিখ্যাত নর্ম্মাণ্ডি হোটেলের অধিকৃত ভূমিখণ্ডের উপর দিয়া না গেলে, সাধারণের বিশেষ অসুবিধা হইত। উপায়ান্তর না দেখিয়া হোটেল-স্বামী পূর্ব্ববর্ণিত উপায়ে বৃহৎ বাড়ীটি ২৪০ গজ দূরবর্ত্তী একটি স্থানে আনয়ন করিয়াছিলেন। এই কার্য্য এত দক্ষতার সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল যে, হোটেল-পরিচালনকালে হোটেলবাসী ভদ্রলোকগণের স্বস্ব নির্দ্দিষ্ট গৃহ পরিত্যাগের প্রয়োজন হয় নাই, এবং চলিষ্ণু হোটেলে থাকিয়াও, তাঁহারা কোন প্রকার অশান্তি ভোগ করেন নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ব্রাইটন্‌ব্রিচ্ নামক আর একটি ৩৫০ হাত উচ্চ ত্রিতল হোটেল স্থানান্তরিত হয়। এই হোটেলটি ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে, সমুদ্র হইতে প্রায় ৪০০ হাত দূরে বহুব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল; কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে, এই প্রাসাদের সংলগ্ন অধিকাংশ ভূমিই সাগরগর্ভসাৎ হওয়ায়, ইহার স্থায়িত্বসম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু হোটেলস্বামী বাড়ীটি স্থানান্তরিত করিবার ইচ্ছা

প্রকাশ করিলে,—কেহই সেই বৃহৎ প্রাসাদ নির্ব্বিঘ্নে পরিচালিত করিতে সাহস করেন নাই। অল্প দিন হইল, মিলার নামক জনৈক শিল্পী, ১১২ খানি অনাবৃত রেলগাড়ীর উপর বাড়ীটি পূর্ব্ববর্ণিত উপায়ে স্থাপিত করিয়া, বাষ্পীয় শকটের সাহায্যে স্থানান্তরিত করিয়াছেন।

এই অট্টালিকা-পরিচালন কার্য্য আজকাল আমেরিকায় এত অধিক হইতেছে যে, অধিবাসিগণের নিকট ইহা একটা দৈনন্দিন ঘটনা বলিয়া বোধ হয়। প্রত্যেক বৃহৎ নগরেই বাটী স্থানান্তরিত করিবার জন্য দুই তিনটি কোম্পানী আছে;—উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইলে, তাহারা ক্ষুদ্র বৃহৎ অট্টালিকামাত্রই নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া আইসে। বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে, আমেরিকার সহিত য়ুরোপের বহুকাল হইতে প্রতিযোগিতা চলিতেছে, এবং অনেক ব্যাপারে য়ুরোপীয়গণ মার্কিনের সমকক্ষতাও লাভ করিতেছেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আজও কোনও য়ুরোপীয় শিল্পী প্রাসাদসঞ্চালন-বিদ্যার অনুসরণ করিতে পারেন নাই।—এখন যে উপায়ে সৌধ প্রভৃতি স্থানান্তরিত হইয়া থাকে, তাহাই যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রথা, তাহা বলা যায় না;—আজ কাল ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্ প্রদেশের নগরগুলির প্রতিদিনই যে প্রকার উন্নতি হইতেছে, এবং বাণিজ্য ও লোকসংখ্যার সহিত নগরমধ্যে জলাশয় ও নূতন রাজপথাদির যে প্রকার আবশ্যকতা দৃষ্ট হইতেছে,—তাহাতে আশা করা যায়, এই প্রথা ক্রমেই অধিকতর উন্নত হইবে। *

অধ্যাপক ল্যাঙ্গলে।

আমেরিকার বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্ অধ্যাপক ল্যাঙ্গলের (S. P. Langley) নানা গবেষণার কথা, "বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহে" পূর্ব্বে অনেক লিখিত হইয়াছে। যথেচ্ছ বিমানবিহারের উপযোগী একটি যন্ত্রনির্ম্মাণের জন্য, ইনি গত দ্বাদশ বর্ষ হইতে যে প্রকার সহিষ্ণুতার সহিত পরীক্ষাদি করিয়া আসিতেছেন, তাহার উদাহরণ জগতে বাস্তবিকই দুর্লভ। সম্প্রতি অধ্যাপক ল্যাঙ্গলে, একখানি ইংরাজি বৈজ্ঞানিকপত্রে, তাঁহার পরীক্ষাদির আমূল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

বায়ু অপেক্ষা লঘু বাষ্প দ্বারা সাধারণ উপায়ে যে প্রকারে ব্যোমযান ঊর্দ্ধোত্থিত হইয়া থাকে,—সেই প্রথায় ব্যোমযান-নির্ম্মাণ তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁহার কল্পনা কিছু মৌলিক ধরণের;—অধ্যাপকের সঙ্কল্প ছিল, পক্ষিজাতির ন্যায় অতি দুর্ব্বল প্রাণিগণ যে উপায়ে দুইখানি পক্ষের সাহায্যে অনায়াসে আকাশে বিচরণ করে,—সেই প্রকার কৃত্রিম-পক্ষ নির্ম্মাণ করিয়া, আকাশপরিভ্রমণের একটা যন্ত্র উদ্ভাবন করিবেন। শকুন ইত্যাদি কতকগুলি পক্ষীকে উড়িবার সময় স্থিরপক্ষ হইয়া আকাশে বিচরণ করিতে দেখিয়া,—এই সকল পক্ষীর উড্ডয়ন-কৌশল আবিষ্কার করিবার জন্য ইনি প্রথমতঃ বহুবিধ পরীক্ষা করেন; আবশ্যকীয় যন্ত্রাদির নির্ম্মাণকল্পে, এই প্রথম অনুষ্ঠানেই তাঁহার বহুল অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল। কিন্তু অনতিকালমধ্যেই এই প্রভূত অর্থব্যয়ের সার্থকতা দৃষ্ট হইয়াছিল;—বহু পরীক্ষাদির পর পক্ষীদের উড্ডয়ন-তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া,—অতি লঘু ও ঈষৎবক্র ধাতুফলকে সুকৌশলে চাক্রবালিক (Horizontal) অর্থাৎ "আড়া-আড়ি" গতি প্রয়োগ করিয়া, তিনি ধাতু-ফলক-

* অনুসন্ধিৎসু পাঠক, অট্টালিকাসঞ্চালন প্রথার সচিত্র বিবরণ, গত জুলাই মাসের ষ্ট্রাণ্ড ম্যাগাজিন্ নামক ইংরাজি মাসিকপত্রে দেখুন।

টিকে অচঞ্চল অবস্থায় রাখিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, এবং উহাকে যে কোনও দিকে চালিত করিবারও সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

উপাদান সকল হস্তগত হইলে, এবং নির্ম্মাণপ্রথা সুপরিচিত থাকিলে,—প্রায়ই অভীষ্ট যন্ত্র-নির্ম্মাণ কঠিন হয় না; কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী পরীক্ষাদির পর পক্ষীর উড্ডয়ন-তত্ত্ব সম্বন্ধে নানা বিষয় আবিষ্কার করিয়াও, কল্পিত যন্ত্রটির নির্ম্মাণ-বিষয়ে ল্যাঙ্গলে সাহেবকে নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত কৃত্রিমপক্ষে চাক্রবালিক গতির যোজনা করিতে হইলে, কোন্ প্রকার যন্ত্র দ্বারা অবিরাম গতিযোজন কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে, তিনি বহু চিন্তাতেও তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। অধ্যাপক স্বয়ং জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, কিন্তু আধুনিক যান্ত্রশিল্পে তৎকালে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন না; এই জন্য পূর্ব্বোক্ত কঠিন প্রশ্নের মীমাংসা, তাঁহার বড়ই দুরূহ বোধ হইয়াছিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া, শেষে কয়েকটি শিল্পী বন্ধুর সাহায্য গ্রহণ করিয়া, নানাপ্রকার যন্ত্র দ্বারা কৃত্রিম পক্ষ উর্দ্ধোত্থিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রত্যেক পরীক্ষাতেই পক্ষপরিচালক যন্ত্রটির ভারাধিক্য প্রযুক্ত সকল আয়োজনই ব্যর্থ হইতে লাগিল। পুনঃপুনঃ অকৃতকার্য্য হইয়াও, ল্যাঙ্গলে অণুমাত্র নিরাশ হ'ন নাই;—শেষে কয়েকটি সুচতুর শিল্পীর সহিত পরামর্শ করিয়া, একটি ২৬ আউন্স-(এক সেরেরও কম!)-ভারবিশিষ্ট বাষ্পীয়যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই অতি ক্ষুদ্র যন্ত্রটির অসাধারণ শক্তি * দেখিয়া, তাহার সাহায্যে ল্যাংলের নূতন ব্যোমযানটি যে নির্ব্বিঘ্নে চালিত হইবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ রহিল না। কিন্তু সমগ্র যন্ত্রটি পরীক্ষাক্ষেত্রে নীত হইলে, তাহাতে ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা ত্রুটি দৃষ্ট হইতে লাগিল। একটি সংশোধিত হইতে না হইতেই, অপর এক অভাবনীয় দোষ প্রকটিত হইয়া, অধ্যাপকের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিতে লাগিল। এই প্রকার বিবিধ ত্রুটির সংশোধনে প্রায় পাঁচ বৎসর অতিবাহিত করিয়া, গত মে মাসে, ল্যাঙ্গলে যন্ত্রনির্ম্মাণ শেষ করিয়াছেন।

ল্যাঙ্গলের এই যন্ত্রটির আয়তন অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু যথেচ্ছ আকাশপরিভ্রমণের উপযোগী সকল সুব্যবস্থাই ইহাতে সুন্দরভাবে দর্শিত হইয়াছে। এখন এই প্রথায় বৃহদায়তন যন্ত্রের নির্ম্মাণ ও তাহার পরীক্ষা না হইলে, এই আবিষ্কারের উপযোগিতা কিছুই হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না। ল্যাঙ্গলে কয়েকটি বিখ্যাত শিল্পীকে এই প্রথায় যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

পাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় অবগত আছেন, সম্প্রতি "ম্যাক্সিম" কামানের উদ্ভাবয়িতা হেরাম্ ম্যাক্সিম্, অন্য প্রণালীতে, একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আকাশ-ভ্রমণ যন্ত্রের নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এবং ইতিমধ্যে একটি কারখানা স্থাপিত করিয়া, উক্ত যন্ত্র বিক্রয়ও করিতেছেন। † ল্যাঙ্গলের যন্ত্র নির্ম্মিত হইলে, উভয় যন্ত্রের মধ্যে বিশেষ প্রতিযোগিতা হইবার সম্ভাবনা। শেষে যোগ্যতরটিই যে স্থায়িত্ব লাভ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই;—কিন্তু অধ্যাপক ল্যাঙ্গলে অসাধারণ অধ্যবসায়ের সহিত পক্ষীর উড্ডয়ন-ব্যাপার সম্বন্ধে যে সকল নবতত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছে,—সে গুলি নিশ্চয়ই অধ্যাপকের নাম অক্ষয় রাখিবে।

---

* ইহার শক্তি এক ঘোড়ার শক্তির তুল্য;—অর্থাৎ, একটি ৩৩০০০ পৌণ্ড ভারবিশিষ্ট কোনও পদার্থকে, এক মিনিট সময়ের মধ্যে, এক ফুট উর্দ্ধে তুলিতে যে শক্তির আবশ্যক, যন্ত্রটি হইতে সেই পরিমাণ শক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

† ম্যাক্সিমের এই যন্ত্রের বিশেষ বিবরণ আজও প্রকাশিত হয় নাই;—জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি পরিজ্ঞাত হইলে, যথাসময়ে "সাহিত্যে" বিবৃত হইবে।

বুদ্বুদ।

বুদ্বুদ পদার্থটা অতীব তুচ্ছ,—জগতে যাহা কিছু অকিঞ্চিৎকর, ক্ষণস্থায়ী ও অসার, বুদ্বুদের সহিত সকলেই তাহার উপমা দিয়া থাকে;—কিন্তু বিজ্ঞানবিদ্‌গণের নিকট বুদ্বুদ একটা বিষম ব্যাপার;—ইহার উৎপত্তি, বিকাশ ও ধ্বংস, সকলই অতীব জটিল কার্য্য-পরম্পরায় জড়িত।

বুচার (I. F. Bucher) নামক জনৈক পণ্ডিত বুদ্বুদ অবলম্বন করিয়া কিছু দিন পরীক্ষাদি করিয়াছিলেন, এবং সম্প্রতি পরীক্ষান্তে বুদ্বুদ সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা প্রকাশ করিয়াছেন। এই পণ্ডিতটি বলেন, তরল পদার্থমাত্রেরই গোলাকার ধারণ করিবার একটা শক্তি আছে। মুক্তাবস্থায় থাকিলেই তরল পদার্থে এই শক্তির বিকাশ দৃষ্ট হয়। এই জন্য, জল কিম্বা অপর তরল পদার্থ উচ্চ স্থান হইতে নিক্ষেপ করিলে, বা কোন তৈলাক্তপাত্র জলসিঞ্চিত হইলে, জলবিন্দু সকল গোলত্ব প্রাপ্ত হয়। তরল পদার্থের এই একই নির্দ্দিষ্ট আকারগ্রহণ-শক্তির কারণ সম্বন্ধে, বর্ত্তমান ও প্রাচীন কালে অনেক অনুসন্ধান হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিতগণ একমত হইয়া বলেন,—প্রত্যেক তরলপদার্থজাত ক্ষুদ্র বিন্দুমাত্রেই একটি শক্তি নিয়ত কার্য্য করিতেছে;—উক্ত শক্তি-বিন্দুর ঠিক কেন্দ্র হইতে সমভাবে আকর্ষণ করিয়া, চতুর্দ্দিকের অণুগুলিকে গোলাকারে সজ্জিত করে। বুদ্বুদের গোলত্বে এই শক্তির কোনও কার্য্যই নাই, ঠিক ইহার বিপরীত আর একটি শক্তি দ্বারা বুদ্বুদ গঠিত হইয়া থাকে। তরল পদার্থের অতিসূক্ষ্ম আবরণ দ্বারা বায়ু আবদ্ধ হইলেই, উক্ত বায়ুর মধ্য হইতে একটি চাপ সমান বলে আবরণের চারি দিকে আঘাত করিতে থাকে; ইহারই ফলে আবরণ স্ফীত হইয়া, সাধারণতঃ গোলাকার বুদ্বুদে পরিণত হয়।

বুদ্বুদের আবরণ অতীব সূক্ষ্ম; বুচার সাহেব গণনা করিয়া দেখিয়াছেন,—জলবিম্বের দশ লক্ষ আবরণ উপর্য্যুপরি সজ্জিত করিলে, ইহাদের সমবেত স্থূলতা এক ইঞ্চির অধিক হয় না। এতদ্ব্যতীত বুদ্বুদের উপর সূর্য্যরশ্মি পতিত হইলে যে সকল সুন্দর বর্ণ দৃষ্ট হয়, তাহার উৎপত্তির কারণ-নির্ণয়েও অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন; এবং বুদ্বুদের সূক্ষ্ম আবরণ কি পরিমাণ স্থূল হইলে, উহার বাহ্য অংশ, অন্তর্ভাগ হইতে প্রতিফলিত আলোকতরঙ্গের সহিত সম্মিলিত হইয়া কোন্ কোন্ বর্ণের উৎপাদন করিবে, তাহাও বুচার সাহেব গণনা করিয়াছেন।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

মহিলা ঔপন্যাসিক।

ইংরাজী সাহিত্যে উপন্যাসের অসাধারণ আদরের কথা আর নূতন করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই। রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালীন সাহিত্যে নাটকের যে স্থান, বর্ত্তমান সময়ের সাহিত্যে উপন্যাসের সেই স্থান। ব্ল্যাক, ব্ল্যাকমোর, হার্ডি ও হ্যাগার্ড হইতে ক্রোকেট,

কিউ পর্য্যন্ত ঔপন্যাসিকদিগের নিত্য নূতন উপন্যাস বর্ত্তমান সময়ের ইংরাজী সাহিত্য প্লাবিত করিয়া দিতেছে। ইংরাজী সাহিত্যে প্রতিদিন গড়ে ছয় বা সাত খানা নূতন উপন্যাস প্রকাশিত হইয়া থাকে। আবার ইংরাজী সাহিত্যে উপন্যাসের বহুল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মহিলা ঔপন্যাসিকের সংখ্যাও বর্দ্ধিত হইতেছে। এই সকল মহিলা ঔপন্যাসিকের উপন্যাস পুরুষ ঔপন্যাসিকদিগের উপন্যাস অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহে। "ওম্যান্ অ্যাট্ হোম্" পত্রে শ্রীমতী সারা টুলে, ত্রয়োবিংশতি জন মহিলা ঔপন্যাসিকের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

বিবাহ-বন্ধন।

এই প্রবন্ধে দেখা যায় যে, এই ত্রয়োবিংশতি মহিলা ঔপন্যাসিকের মধ্যে, পঞ্চদশ জন বিবাহিতা; অবশিষ্ট আট জন কুমারী। বিবাহিতাদিগের মধ্যে তিন জন বিধবা; তিন জন বিবাহবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন। আজ কাল ইংরাজী সাহিত্যে বিবাহের ঔচিত্য অনৌচিত্যের বিচার ও প্রেমবিহীন বিবাহের বিষয়ে আলোচনা যেন কিছু অতিরিক্ত হইয়া দাঁড়াইতেছে। এই সকল মহিলা ঔপন্যাসিকদিগের মধ্যেও কেহ কেহ এই সকল আলোচনায় যোগদান করিয়াছেন। অলিভ্ স্ক্রিনারের Story of an African Farm ও সারা গ্র্যাণ্ডের Heavenly Twins প্রভৃতি গ্রন্থে ইহাই দেখা যায়। উইডা আপনি অবিবাহিতা; তিনি এক স্থানে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, ইংরাজী সাহিত্যের অধঃপতনের একটা কারণ এই যে, যে প্রণয় গীর্জ্জায় বা অন্ততঃ রেজেষ্ট্রী-আফিসে সার্টিফিকেট না পায়, সে প্রণয়ের কথা উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করা নিষিদ্ধ। এই অতিরিক্ত সুরুচিপ্রিয়তা ইংরাজী উপন্যাসের অধঃপতনের অন্যতম কারণ।

বিদেশের প্রভাব।

শ্রীমতী টুলে যে ত্রয়োবিংশতি জন মহিলা ঔপন্যাসিকের বিবরণ বিবৃত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে বিদেশের প্রভাব পরিহার করিতে পারেন নাই। শ্রীমতী ক্লিফোর্ড, অলিভ্ স্ক্রিনার এবং শ্রীমতী হামফ্রি ওয়ার্ড, উপনিবেশে জন্ম গ্রহণ করেন। জন অলিভার হব্স্ আমেরিকায় ও শ্রীমতী মোল্স্‌ওয়ার্থ হল্যাণ্ডে জন্মিয়াছিলেন। উইডা অর্দ্ধেক ফরাসী। শ্রীমতী ষ্টিলের শিক্ষা ভারতবর্ষেই হইয়াছিল। ফ্লোরেন্স মেরিয়াটও অল্প বয়সে কিছু কাল ভারতবর্ষে কাটাইয়াছিলেন। মেরী করেলি, কুমারী এডওয়ার্ডস্ ও শ্রীমতী ম্যাকুওড্, ইহাদিগের উপর ফরাসী প্রভাব বড় পরিস্ফুট। বিয়াট্রিস হ্যারাডেন্ কিছু কাল ক্যালিফর্ণিয়ায় ছিলেন। শ্রীমতী হ্যারিসনও ভারতবর্ষের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। সারা গ্র্যাণ্ডের বিবাহিত জীবন সিঙ্গাপুর, হংকং প্রভৃতি প্রাচ্য প্রবাসেই অতিবাহিত হইয়াছিল। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, এই ত্রয়োবিংশতি জন মহিলা ঔপন্যাসিকের মধ্যে কেবলমাত্র সাত জন খাঁটি ইংরাজী প্রভাবের মধ্যে পরিবর্দ্ধিত; আর সকলেই অল্পাধিকপরিমাণে বিদেশের বিভিন্ন প্রকার অবস্থার মধ্যে থাকিয়া, অন্যপ্রকার প্রভাবের অধীন ছিলেন। শ্রীমতী মিড্ ও সারা গ্র্যাণ্ড আয়র্লণ্ডে, ও শ্রীমতী ষ্টিল্ স্কটল্যাণ্ডে, জন্মগ্রহণ করেন।

প্রথম পুস্তক।

এই সকল মহিলা ঔপন্যাসিকের মধ্যে অনেকের প্রথম পুস্তকই সাধারণের নিকট বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। এ কথা অবশ্য বলাই বাহুল্য যে, প্রথম পুস্তক প্রকাশের জন্য প্রকাশক পাইতে অনেকেরই বড় বিপদ হইয়াছিল। সারা গ্র্যাণ্ড আপনি তাঁহার প্রথম পুস্তক প্রকাশ করেন। কুমারী হ্যারাডেনের প্রথম পুস্তক সম্বন্ধে প্রকাশক ব্ল্যাকউড্ এই মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, অমন বিষাদরসাপ্লুত পুস্তক পাঠকসমাজে আদৃত হয় না; কিন্তু পুস্তকখানির আশাতীত আদর হইয়াছিল।

এই সকল মহিলা ঔপন্যাসিকের মধ্যে অনেকের প্রথম পুস্তক অল্পবয়সে রচিত। কুমারী

হ্যারাডেন চতুর্ব্বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার প্রথম পুস্তক প্রকাশ করেন। প্রথম পুস্তকের রচনাকালে জন অলিভার হব্সের বয়স দ্বাবিংশতি ও অলিভ্ স্ক্রিনারের বয়স, বোধ করি, বিংশতি বৎসর হইয়াছিল।

শ্রীমতী হামফ্রি ওয়ার্ড, কুমারী সার্জেণ্ট ও কুমারী হ্যারাডেন, তিন জনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কুমারী বার্ণেট দরিদ্রের দুহিতা; অল্পবয়সে গল্প লিখিবার কাগজ সংগ্রহ করাই তাঁহার পক্ষে দুষ্কর ছিল। শ্রীমতী হারিসনের পিত্রালয়ে অল্পবয়সে উপন্যাসপাঠের ব্যবস্থা ছিল না। অধিক বয়স না হইলে তিনি উপন্যাস পাঠ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হয়েন নাই।

উপন্যাসে মতামত।

এই সকল মহিলা ঔপন্যাসিকের মধ্যে কেহ কেহ সাধারণ ধরণের উপন্যাস লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন। কেহ কেহ আজকাল্কার বিবিধ সামাজিক সমস্যার তর্ক বিতর্কে উপন্যাস পূর্ণ করিতেছেন। শ্রীমতী হামফ্রি ওয়ার্ড তাঁহার উপন্যাসসমূহে ইংলণ্ডের নানা সামাজিক সমস্যার মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; তাঁহার পুস্তকে শিক্ষণীয় বিষয়ের অভাব নাই, ইহা তাঁহার পক্ষে অল্প প্রশংসার কথা নহে। আত্মাভিমান একটু অল্প হইলে তাঁহার পুস্তক সাধারণের নিকট আরও অধিক আদৃত হইত, সন্দেহ নাই। প্রণয়হীন পরিণয়ের সম্বন্ধে আজকাল নানা উপন্যাসে যে নানারূপ মতামত দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার মূল অলিভ্ স্ক্রিনারের Story of an African Farm গ্রন্থে। সেই গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন যে, প্রণয়ের জন্য যে বিবাহ হয়, সে বিবাহ আত্মায় আত্মায় মিলনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাহ্যিক নিদর্শন; আর প্রণয়হীন পরিণয়ের মত অপবিত্র ব্যাপার জগতে আর কিছুই নাই। দক্ষিণ আফ্রিকার এই মহিলা ঔপন্যাসিকের গ্রন্থে যে তর্কের উৎপত্তি, তাহার ব্যাপ্তি এখন বহু ঔপন্যাসিকের গ্রন্থে দৃষ্ট হইবে।

শ্রীমতী লিন্ লিন্টন তাঁহার সমসাময়িক সমাজের চিত্র চিত্রিত করিয়া থাকেন। মহিলাদিগের নানারূপ খেয়াল ও চাতুরী, পুরুষদিগের আত্মম্ভরিতা, তাঁহার পুস্তকে অতি নিপুণভাবে চিত্রিত দেখা যায়। তাঁহার উপন্যাসে যেন সমাজের প্রতি তাঁহার বিরক্তি ও কিছু ঘৃণার ভাব প্রকাশিত দেখিতে পাই।

শ্রীমতী ষ্টিলের গ্রন্থে ভারতবর্ষের নানা ছবি অঙ্কিত হইয়া থাকে।

মেরী করেলির সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়াই আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। মেরী করেলি এক দিকে যেমন আজকালকার "সোসাইটী"র প্রতি তীব্রতম আক্রমণ করিয়া থাকেন, অপর দিকে আজকালকার শালীনত্ববিবর্জ্জিতা "নরনারী"র প্রতি তাঁহার ঘৃণা ও ক্রোধের সীমা নাই। জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি কতকগুলি মতে তাঁহার বিশ্বাস আছে। খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মের মতামতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বাহির করাও তাঁহার পুস্তকের একটা বিশেষ অঙ্গ। সমালোচকদিগের উপর তাঁহার বড়ই ক্রোধ; তাঁহার Sorrws of satan গ্রন্থে তিনি সমালোচকদিগকে সং সাজাইয়া দেখাইয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ সকল সাধারণ পাঠকসমাজে সবিশেষ আদর পাইয়াছে।

জীবন-চরিত।

হামফ্রি ওয়ার্ড।

"সাহিত্যে"র বর্ত্তমান সংখ্যায় "সহযোগী সাহিত্যের" অপর একটি প্রবন্ধে আমরা শ্রীমতী হামফ্রি ওয়ার্ড সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়াছি। বর্ত্তমান সময়ের ইংরাজি ঔপন্যাসিক-দিগের মধ্যে তাঁহার স্থান একটু স্বতন্ত্র। বাস্তবাদর্শ-প্রিয় ও কল্পনাদর্শ প্রিয়, এই দুই শ্রেণীর ঔপন্যাসিকদিগের কোনও শ্রেণীতেই শ্রীমতী ওয়ার্ডের স্থান নির্দ্দেশ করা যায় না। তিনি উভয় দল হইতেই কিছু কিছু গ্রহণ করিয়াছেন ; অথচ তিনি উভয় দল হইতেই স্বতন্ত্র। তাঁহার উদ্দেশ্যের উচ্চতা উপলব্ধি করিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে জর্জ্জ এলিয়টের উত্তরাধিকারিণী বলিয়াছেন ; আবার কেহ কেহ তাঁহার উপন্যাসে সমাজতত্ত্ব, ধর্ম্ম ও রাজনীতির জটিল তর্ক বিতর্কে বিরক্ত হইয়াছেন। এই শেষোক্ত দলের মত এই যে, শ্রীমতী ওয়ার্ডের কেবল জর্জ্জ এলিয়টের আত্মম্ভরিতাই আছে, তাঁহার প্রতিভা শ্রীমতী ওয়ার্ডের নাই। সম্প্রতি "বুক্‌ম্যান্‌" পত্রে প্রকাশিত তাঁহার বিবরণ হইতে বর্ত্তমান প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইল।

রচনায় জীবনের ছায়া।

শ্রীমতী ওয়ার্ডের জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহার জীবনের সহিত তাঁহার পুস্তকের সম্বন্ধ বড় অল্প নহে। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার নানা পুস্তকে তাঁহার আপনার জীবনের ছায়া দৃষ্ট হইবে। শ্রীমতী ওয়ার্ড অ্যাল্‌ব্‌ডুরী নামক পল্লী-গ্রামে বাস করেন। অ্যাল্‌ব্‌ডুরী খাঁটি ইংরাজী পল্লীগ্রামের আদর্শ। শ্রীমতী ওয়ার্ডের প্রসিদ্ধ "মার্সেলা" নামক উপন্যাসে এই পল্লীগ্রামের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। ঔপন্যাসিকের আপনার আবাসগৃহ তাঁহার একাধিক উপন্যাসে বর্ণিত গৃহের আদর্শ।

ঔপন্যাসিকের পরিবার।

শ্রীমতী ওয়ার্ড দরিদ্রদিগের দুঃখ দুর্দ্দশায় সমধিক সহানুভূতিসম্পন্না হইলেও তাহা-দিগের গৃহে তিনি প্রায় কখনই গমন করেন না। কিন্তু গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই তাঁহাকে ভালবাসে; তাহারা সকলেই জানে যে, তাঁহার নিকট কোন-রূপ সাহায্য প্রার্থনা করিলে কখনই বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিতে হইবে না। শ্রীমতী ওয়ার্ডের এক পুত্র ও দুই কন্যা ; ইঁহারা সকলেই দরিদ্রের দুঃখমোচনে বদ্ধপরিকর। কন্যাদ্বয়ের মধ্যে একজন প্রায়ই গ্রামের দরিদ্রদিগের গৃহে গমন করিয়া তাহাদিগের অভাব দূর করিবার চেষ্টা করেন। গত বৎসর গ্রীষ্মকালে তিনি লণ্ডন হইতে বহু দরিদ্র শিশুকে গ্রামে লইয়া আসিয়াছিলেন। গ্রামের দরিদ্র পরিবার-সমূহে সেই সকল শিশুর অবস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছিল। ইহাতে গ্রামের দরিদ্রগণও কিছু সাহায্য পাইয়াছে ; আর শিশুগণও ধূলিধূমময় জনারণ্য লণ্ডনের বাহিরে স্নিগ্ধশ্যাম শোভা-ময় পল্লীগ্রামে আসিয়া আনন্দ ও উপকার উভয়ই পাইয়াছে। শিশুরা তাঁহার গৃহপ্রাঙ্গণে খেলা করিত, এবং তাঁহার মিষ্ট কথায় তুষ্ট হইত। শিশুর দুঃখ তিনি সহিতে পারেন না। ওয়ার্ড-দম্পতী অত্যন্ত অতিথিসৎকারপরায়ণ ; তাঁহাদিগের গৃহও লণ্ডন হইতে বড় দূরে নহে ; কাজেই তাঁহাদিগের গৃহে দুই এক জন অতিথি প্রায় সর্ব্বদাই থাকেন। শ্রীমতী ওয়ার্ড "ফেশানেবল" সমাজের পক্ষপাতী নহেন ; বিলাসিনী আনন্দসর্ব্বস্ব মহিলাদিগকে তিনি দেখিতে পারেন না। সাহিত্যসেবী, শিল্পী প্রভৃতি নানা ব্যবসায়ের বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সহিত মিশিতে শ্রীমতী ওয়ার্ড বিশেষ আনন্দ উপলব্ধি করেন। কোন সাধারণ সভা সমিতিতে তিনি কিছু গম্ভীর ; কিন্তু পরিচিতদিগের মধ্যে সকলেই তাঁহার সরস মধুর আলাপে বিশেষ

প্রীত হইয়া থাকেন। শ্রীমতী ওয়ার্ডের বিশেষ গাম্ভীর্য্য বা পাণ্ডিত্যাভিমান নাই। পরন্তু তিনি কথাবার্ত্তায় বিশেষ সরল।

শিক্ষা ও আন্তরিকতা।

সমালোচকগণ একবাক্যে এ কথা বলিয়া থাকেন যে, শ্রীমতী ওয়ার্ডের উপন্যাসসমূহে অসাধারণ আন্তরিকতা লক্ষিত হইয়া থাকে। রচনায় এই আন্তরিকতার জন্য তাঁহার পিতা টমাস আর্ণল্ড এবং তাঁহার ভ্রাতা ম্যাথিউ আর্ণল্ড প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন। তাসমানিয়ায় শ্রীমতী ওয়ার্ডের জন্ম হয়। পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি সেখান হইতে চলিয়া আইসেন। বিদ্যালয় ত্যাগ করিবার পরেই অক্‌স-ফোর্ডে বিখ্যাত দার্শনিক ও নীতিবিদ্‌দিগের প্রদর্শিত পথে তিনি সাহিত্য সেবা করিতে আরম্ভ করেন। তখন তিনি সাহিত্য-সমালোচনা, সমালোচনা ও শিশুদিগের উপযোগী গল্প লিখিতেন। তাঁহার সাহিত্য-সমালোচনার বিশেষ প্রশংসা হইয়াছিল। সেই জন্য এড-মণ্ড গস্‌ দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, আজকাল লোকে উপন্যাস ভিন্ন আর কিছুই পাঠ করিতে চাহে না ; তাই ইচ্ছায় হউক, আর অনিচ্ছায় হউক সকল লেখককেই উপন্যাস লিখিতে হয় ; শ্রীমতী ওয়ার্ড উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করায় আমরা একজন প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্য-সমালোচক হারাইয়াছি।

শ্রীমতী ওয়ার্ড যখন "রবার্ট এল্‌স্‌মেয়ার" গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তখন তিনি আপনিও একবার ভাবেন নাই যে, তাঁহার পুস্তকে ইংরাজ সমাজে এমন পরিবর্ত্তন ঘটিবে। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইবামাত্র পাঠকসমাজে ইহার এত অতিরিক্ত আদর হইয়াছিল যে, তাহাতে স্বয়ং লেখিকাই বিস্মিত হইয়াছিলেন। "রবার্ট এল্‌স্‌মেয়ার" যে কেবল সাধারণ পাঠকসমাজে অতিরিক্ত আদর পাইয়াছিল, এমন নহে। পাঠকদিগের মধ্যে এক দল কেবল আনন্দলাভের জন্য পাঠ করেন ; আর এক দল পুস্তকে লিখিত বিষয় পাঠ করিয়া চিন্তা ও বিচারশক্তির চালনা করিয়া থাকেন। শ্রীমতী ওয়ার্ডের গ্রন্থ এই শেষোক্ত দলের নিকটও অত্যন্ত আদৃত হইয়াছিল।

মহিলাদের সম্বন্ধে তাঁহার মত।

আজ কাল ইংলণ্ডে মহিলাদিগের অধিকার সম্বন্ধে নানা তর্ক বিতর্কের ঝঞ্ঝাবাত সর্ব্বদাই বহিয়া থাকে। এ গোলযোগে শ্রীমতী ওয়ার্ড কোনও পক্ষ অবলম্বন করেন নাই। তবে রমণী-দিগের শিক্ষাদানসম্বন্ধে তাঁহার মত সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। অক্‌স্‌ফোর্ডে অবস্থানকালেই শ্রীমতী ওয়ার্ড মহিলাদিগের মধ্যে উচ্চশিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। মহিলাদিগকে পুরুষের সহিত সমান শিক্ষাদান করাই তাঁহার অভিপ্রেত। আজ এই উনবিংশতি শতাব্দীর শেষ-ভাগে কেহই এ কথা বলিবেন না যে, স্ত্রীশিক্ষা অনাবশ্যক বিলাসমাত্র ; এখন এ কথা সর্ব্বতোভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, পুরুষদিগের শিক্ষার মত মহিলাদিগেরও শিক্ষা নিতান্ত আবশ্যক। দেখিতে গেলে শ্রীমতী ওয়ার্ড অন্তঃপুরবাসিনীর মতই বাস করেন। তিনি আপনি সমাজের ফেনিল আবর্ত্তে আসিতে চাহেন না ; পরন্তু আপনার সুখপূর্ণ গৃহকোণে থাকিতেই ভালবাসেন। কিন্তু যাঁহারা মনোযোগসহকারে তাঁহার পুস্তক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আর বলিয়া দিতে হইবে না যে, তাঁহার গ্রন্থের নায়িকা "মারসেলা"র মত যে সকল মহিলা সমাজ ও প্রচলিত প্রথার যুক্তিহীন কঠোর শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া কর্ম্মপ্রার্থী হৃদয়ের জ্ঞান ও উন্নতির পিপাসা পরিতৃপ্ত করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের সহিত শ্রীমতী ওয়ার্ডের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে।

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

মধ্য এসিয়ায় চারি বৎসর।

উৎসাহশীল, কর্ম্মপ্রার্থী, অধীর জাতি সকলের মধ্যে এক এক জন মানব দেশভ্রমণোপলক্ষে যেরূপ কষ্ট সহ্য করিয়া থাকেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। লিভিংষ্টোন প্রভৃতি হইতে ন্যান্‌সেন পর্য্যন্ত ভ্রমণকারিগণের বৃত্তান্ত, গৃহকোণপ্রিয়, বিদেশগমনপরাঙ্মুখ বঙ্গবাসীর নিকট নিতান্তই স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিয়া মনে হয়। সম্প্রতি ডাক্তার ভেণ্ডহেডিন মধ্য এসিয়া ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। সেই সঙ্কটসঙ্কুল, বিঘ্নবিজড়িত ভ্রমণ-বৃত্তান্তের কিঞ্চিৎ বিবরণ আমরা প্রদান করিলাম।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে, দ্বাদশটি অশ্ব ও চার জন লোক লইয়া ডাক্তার তুষারসমাচ্ছন্ন পামির-অধিত্যকাভিমুখে যাত্রা করেন। পামিরের পূর্ব্বভাগভ্রমণেই গ্রীষ্মকাল ও শরৎকাল কাটিয়া যায়। খাস্‌গড়ে শীত কাটাইয়া, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি আবার যাত্রা করেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, দুই শত মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে গিয়া মরুপ্রান্তে শস্যশ্যামলা ভূমি পাইবেন; সেখানে কোন প্রাচীন সভ্যতার চিহ্ন দেখিবার আশাও তাঁহার ছিল। ডাক্তারের ইচ্ছা ছিল, সেখান হইতে তিব্বতে যাইবেন। কাজেই বহু দ্রব্যাদি লইতে হইয়াছিল। ভারবাহী আটটি উষ্ট্র ব্যতীত সঙ্গে কুকুর, মেষ, কুক্কুট প্রভৃতি ছিল; সেই মরুমধ্যে প্রতিদিন প্রাতে কুক্কুটের পরিচিত কণ্ঠরবে সকলের নিদ্রাভঙ্গ হইত। একটা উষ্ট্রের ককুদের উপর কুক্কুটের খাঁচাটি রক্ষিত হইত;—প্রথম প্রথম কয় দিন প্রত্যহ ডিম্বের অভাব হইত না। কিন্তু সলিলের স্বল্পতার সঙ্গে সঙ্গে কুক্কুটের ডিম্‌পাড়াও বন্ধ হইয়া গেল। সঙ্গে চার জন লোক ছিল,—ভৃত্য ইস্‌লামবেগ, ইয়ারখন্দবাসী কাসিম ও মহম্মদ শা ও মরুপথপ্রদর্শক কাসিম। প্রথম প্রথম কয় দিন ভূমি খনন করিয়া জল পাওয়া যাইত; সে জল লবণাক্ত হইলেও উষ্ট্রের পানোপযোগী। কিছু দিন ভ্রমণের পর সকলে এক পর্ব্বতমূলে উপনীত হইলেন। সেখানে স্ফটিকোপম জলরাশিপূর্ণ দুইটি হ্রদ শোভমান;—কূলে কূলে নলবনে হংস কারণ্ডবাদির কূজন; চারি দিকে ভূমি দ্রুমলতায় আচ্ছাদিত।

সেখানে দুই দিন অবস্থানের পর সকলে আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন। দুই ঘণ্টার মধ্যেই পর্ব্বতমালা দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল। মরুপ্রান্তে শেষ বৃক্ষতলে একটু বিশ্রাম করিয়া আবার সকলে অগ্রসর হইলেন। সঙ্গে দশদিনের উপযোগী জল লইবার কথা ছিল; কিন্তু ডাক্তার দেখিলেন, কেবল চার দিনের উপযোগী জল লওয়া হইয়াছে। কূপ খনন করা হইল—জল উঠিল না! যাহা হউক, পথপ্রদর্শক আশা দিল, চারি দিনের মধ্যেই জল পাওয়া যাইবে। পর দিবস মরুমধ্যে বিষমবাত্যা বহিতে লাগিল। বালুকায় চারি দিক যেন ঘনমেঘাচ্ছন্ন হইয়া গেল; মরুমধ্যে এক প্রকার অস্পষ্ট হরিতাভ আলোক দৃষ্ট হইতে লাগিল। এখন উত্তরে ও দক্ষিণে পর্ব্বতমালা, আর কেবল বালুকাবিস্তার। সকলে পূর্ব্বাভিমুখে বহুকষ্টে সেই বালুকাসমুদ্রপথে চলিতে লাগিলেন। সত্যই এ যেন বালুকাসমুদ্র—বালুকাতরঙ্গে পূর্ণ। দৃশ্যমধ্যে কিছুমাত্র বৈচিত্র্য নাই। মক্ষিকার গুঞ্জনশব্দও শ্রুত হয় না; পবনতাড়িত একটা শুষ্ক বৃক্ষপত্রও দৃষ্ট হয় না! ২৬শে এপ্রেল শূন্য জলকুণ্ড সহ দুইটি উষ্ট্র ত্যাগ করিয়া আসিতে হইল। তখনও যে জল ছিল, তাহাতে কোনরূপে দুই দিন চলিতে পারে। সেই দিন সন্ধ্যাকালে যাত্রিদল বালুকাবিবর্জ্জিত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বড় আশায় কূপ-খনন আরব্ধ হইল।

সলিলানুসন্ধানে।

সকল প্রাণীগুলি, এমন কি কুক্কুট পর্য্যন্ত, বড় আশায় সেই কূপপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। দশ ফিট খননের পর জলসিক্ত মৃত্তিকা দেখা গেল। সকলের মনেই বড় আশার সঞ্চার হইল। তাহার পর আবার শুষ্ক মৃত্তিকা! সকল আশা ফুরাইল। ২৭শে তারিখে দেখা গেল, দুইটি মরাল উড়িয়া যাইতেছে। সকলের মনে আশার সঞ্চার হইল। সন্ধ্যাকালে গগনে সজল জলদজাল দৃষ্ট হইল। তাম্বু খাটান হইল। বারিপাতমাত্র সেই জীবনদায়ী সুধা সংগ্রহের জন্য সকলে প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। কিন্তু মেঘমালা পবনতাড়িত হইয়া ভাসিয়া গেল! পর দিন প্রাতে নিদ্রান্তে সকলে দেখিলেন, দ্রব্যাদি বালুকায় প্রোথিতপ্রায়। দ্রব্যাদি তুলিয়া লইয়া আবার যাত্রারম্ভ হইল। চারি দিক বালুকাসমাচ্ছন্ন; যেন মরুদেশ ঘন কুহেলিকাবরণমণ্ডিত। সামান্য দূরের বস্তুও আর নয়নগোচর হয় না। পবনতাড়িত বালুকাকণার ঘাতপ্রতিঘাতে সেই মরুভূমে এক প্রকার শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। সে দিন একটা উষ্ট্র হারাইয়া গেল। ২৯শে তারিখে সামান্য একটু জল অবশিষ্ট ছিল; কিন্তু পর দিবস প্রভাতে আর তাহা পাওয়া গেল না।

বালুকাবাত্যা।

১লা মে দলের সকলেই তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পড়িলেন। ডাক্তারের নিকট উনানে ব্যবহারের জন্য একটু চীনদেশীয় মদ্য ছিল। অগত্যা তিনি তাহাই পান করিলেন। ইহাতে তিনি একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। ডাক্তার যাত্রিদলের পশ্চাতে পড়িলেন। তাহাদের ঘণ্টারবও ক্রমে আর শ্রুতিগোচর হয় না। কোনরূপে তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া ডাক্তার দেখিলেন, তাহারা শুইয়া পড়িয়াছে! দুই জন কাঁদিতে কাঁদিতে আল্লার করুণা প্রার্থনা করিতেছে। তখন উষ্ট্র সকলও শ্রান্ত। সেই সর্ব্বত্র বিরাজমান নিস্তব্ধতার মধ্যে কেবল উষ্ট্রগুলির নিশ্বাসের শব্দ শ্রুত হইতেছিল। সেই দিন হইতে মহম্মদ শা ও মরুপথপ্রদর্শকের আর সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

দিবাবসানসময়ে ডাক্তার অবশিষ্ট পাঁচটি উষ্ট্র লইয়া আবার অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইস্‌লাম ও কাসিম সঙ্গেই চলিল। প্রথমে তিনি উষ্ট্রারোহণে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু নৈশান্ধকারাবৃত মরুমধ্যে তাহা শীঘ্রই অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। তখন লণ্ঠন জ্বালাইয়া সকলে পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় দেখিলেন, কেবলমাত্র আড়াই মাইল পথ আসিয়াছেন! ইস্‌লাম আর চলিতে পারে না। তাহাকে একটু সুস্থ হইলে তাঁহাদিগের পদাঙ্ক অনুনুসরণ করিতে বলিয়া, ডাক্তার কাসিমকে লইয়া সেই তিমিরাবগুণ্ঠিত নিশীথে আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন। লণ্ঠন ইস্‌লামের কাছেই রহিল। সঙ্গে কিছু খাদ্য থাকিলেও আহার করা অসম্ভব;—কারণ, তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুষ্ক হইলে কোনও খাদ্য গলাধঃকরণ সম্ভব নহে। দুই জন ধীরে ধীরে সারারাত্রি চলিতে লাগিলেন। পর দিন বেলা ১১টার সময় উত্তাপ এত অধিক হইল যে, আর পথ চলা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল; তখন দুই জনে উলঙ্গ হইয়া বালুকা খনন করিয়া শয়ন করিলেন। অপরাহ্ন হইতে রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত আবার পথ চলিয়া উভয়ে বিশ্রাম করিলেন। তাহার পর পথ চলিতে চলিতে কাসিম তাঁহার স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিয়া পূর্ব্ব দিকে কি দেখাইল। ডাক্তার কিছু দেখিতে পাইলেন না; কিন্তু কাসিম বৃক্ষ দেখিতে পাইয়াছিল। বহুকষ্টে তরুতলে উপস্থিত হইয়া উভয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। উভয়ে সেই রসপূর্ণ তরুপত্র চর্ব্বণ করিলেন। বহুক্ষণ বিশ্রামের পর উভয়ে কূপখননের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কাহারও আর সে সামর্থ্য নাই! তখন উভয়ে সেখানে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলেন;—যদি কাসিম বাঁচিয়া থাকে, তবে সে সেই আলোক দেখিয়া আসিতে পারিবে।

তরুতলে।

৪ঠা মে তাঁহারা আবার অনুর্ব্বর ভূমিতে উপস্থিত হইলেন। দিবাভাগে একটা তরু-

তলে বিশ্রাম করিয়া সাতটার সময় বেশ পরিধান করিয়া ডাক্তার কাসিমকে আসিতে বলিলেন। বহুকষ্টে অস্পষ্টস্বরে কাসিম উত্তর দিল যে, তাহার আর যাইবার শক্তি নাই! ডাক্তার একাকী চলিতে লাগিলেন। রাত্রি একটার সময় পথশ্রমে মৃতপ্রায় হইয়া এক তরুতলে উপবেশন করিলেন। কিছু ক্ষণ পরে কাসিম আসিয়া উপস্থিত লইল। তখন উভয়ে একত্র চলিতে লাগিলেন। ৫ই মে তাঁহারা দূরে চক্রবালক্রোড়ে শ্যামশোভা দেখিতে পাইলেন। খোটানডারিয়ার অরণ্য তবে আর অধিক দূর নহে। তমস্বিনী রজনীতে উদয়োন্মুখ ক্ষীণচন্দ্রের ম্লান আলোকের মত, আশার জ্যোতিঃ উভয়ের হতাশ হৃদয়ে দেখা দিল।

যাতনাবসান।

উভয়ে পত্রচ্ছায়াবহুল-বন-মধ্যে উপনীত হইলেন; বুঝিলেন, সেই বহুদিনের অভিলষিত-দর্শন নদ আর অধিকদূরব্যবহিত নহে। তখন তৃষ্ণার জ্বালায় কাসিমকে উন্মত্তের মত বোধ হইতেছিল। সেই ছায়াস্নিগ্ধ বন মধ্যেও দিবাভাগে পথভ্রমণ সম্ভবপর নহে। কাজেই দিবসে তরুতলে বিশ্রাম করিয়া, সন্ধ্যা সময়ে ডাক্তার আবার যাত্রা করিলেন। কাসিম আর উঠিতে পারিল না।

সেই নিবিড় বন মধ্যে কোথাও হাঁটিয়া, কোথাও হামা দিয়া, ডাক্তার বনপ্রান্তে উপনীত হইলেন; দেখিলেন, সম্মুখে ম্লানচন্দ্রকরোদ্ভাসিত নদীগর্ভ। এখন নদী জলশূন্য; গ্রীষ্মকালে গিরিশিখরাগত বারিরাশি পাইয়া তাহার শুষ্ক হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইবে, তখন জলবেণীরম্যা স্রোতস্বিনী কূলে কূলে পূর্ণ হইয়া উঠিবে।

বহুকষ্টে ডাক্তার নদীর শুষ্ক গর্ভ অতিক্রম করিয়া অপর পারে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, পাঁচ ঘণ্টায় কেবল এক ক্রোশ পথ আসিয়াছেন। সেই সময় তাঁহার মস্তকের উপর একটা মরাল উড়িয়া গেল। ডাক্তার এতক্ষণে জলোচ্ছ্বাসশব্দ শুনিতে পাইলেন। দেখিলেন, সম্মুখে স্বচ্ছ নির্ম্মল জলরাশি। এই স্থানে নদীস্রোতের একটু জল বাধিয়া আছে। আপনি জলপান করিয়া তিনি জুতায় করিয়া জল লইয়া কাসিমের নিকট উপস্থিত হইলেন। জলপান করিয়া কাসিমের মৃতপ্রায় দেহে নবজীবন সঞ্চারিত হইল। কিন্তু কাসিম তখনও পথ চলিতে অসমর্থ। ডাক্তার একাকী তিন দিন দুই রাত্রি নদীগর্ভ দিয়া উত্তরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। এ কয় দিন তিনি কেবল তৃণ ও বেঙ্গাচি আহার করিতেন। ৮ই মে তিনি কয়েক জন রাখালের নিকট উপস্থিত হইলেন; আর বিপদের আশঙ্কা রহিল না।

এ দিকে সাঙ্কেতিক অগ্নি দেখিয়া ইস্লাম বেগ ক্রমে ক্রমে অবশিষ্ট একটিমাত্র উষ্ট্র লইয়া ডাক্তারের নিকট উপস্থিত হইল।

বাঙ্গলার ইতিহাসে 'বৈকুণ্ঠ'।

জমা কামেল তুমারী অর্থাৎ মুর্শিদ কুলী খাঁর জমিদারী বন্দোবস্ত প্রবন্ধে দৃষ্ট হইয়াছে (১) যে, কুলী খাঁ বাঙ্গলার প্রায় সমগ্র জমিদারী হিন্দু জমিদারগণের

(১) সাহিত্য; জ্যৈষ্ঠ; ১৩০৪। ভ্রমক্রমে "জমা কামেল তুমারী" জমা কামেন তুমারী এইরূপ অদ্ভুত মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে।

সহিত বন্দোবস্ত করিয়া যান। অনায়াসসাধ্য হইলেও কুত্রাপি নূতন মুসলমান জমিদারের পত্তন করেন নাই, বরং সময়ে পূর্ব্ববর্ত্তী মুসলমান জমিদারগণকে অবাধ্যতার জন্য উৎখাত করা হইলে, তাঁহাদের স্থানে হিন্দুর প্রতিষ্ঠা করেন। যে জমিদারী বন্দোবস্তের জন্য বঙ্গীয় সুবাদারগণের মধ্যে তাঁহার নাম শীর্ষস্থানীয়, সেই বন্দোবস্তই আবার তাঁহার কলঙ্ক। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা বাঙ্গলার ইতিহাসের এই অংশের সমালোচনা করিব।

মুর্শিদ কুলী খাঁর প্রতিভা ও ন্যায়নিষ্ঠা ইতিহাসে একবাক্যে স্বীকৃত। যে দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান বাল্যে মুসলমান বণিকের ক্রীতদাসরূপে আরম্ভ করিয়া দিল্লীর বাদসাহের অধীন সর্ব্বোচ্চপদে আরূঢ় হন, তাঁহার প্রতিভা আদর্শস্থানীয়; যিনি ন্যায়বিচারের অনুরোধে স্বীয় একমাত্র পুত্রেরও প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়া ভারতের ইতিহাসে রোমীয় বীর-চরিত্রের দ্বিতীয় অভিনয় দেখাইয়াছেন, সেরূপ এক জন ক্ষণজন্মা আদর্শ পুরুষের নিন্দাবাদ রটনা করিবার পূর্ব্বে একটু চিন্তার প্রয়োজন। ভাগ্যদোষে আমাদের দেশে নিরপেক্ষ ইতিহাস-সমালোচকের বড়ই অভাব; নতুবা এরূপ চরিত্র কখনই বর্ত্তমান ভাবে ইতিহাসে দেখা দিত না।

আজি কালি অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলার ইতিহাসের সমালোচনায় যে দুই এক জন বাঙ্গালী লেখক হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, তাঁহারা কেহই অপেক্ষাকৃত প্রাচীন মুসলমান ইতিহাস দুইখানি স্বচক্ষে দর্শন করেন নাই। মুর্শিদাবাদের ইতিহাস সম্বন্ধে পারসী ভাষায় এ পর্য্যন্ত যে কয়েকখানি গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত দুইখানি অপেক্ষাকৃত পূর্ব্ববর্ত্তী;—

(১) ইউসুফ্ আলি খাঁর লিখিত নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সময়ের ইতিহাস; অন্য নামের অভাবে আমরা ইহাকে "তারিখ ইউসুফী" নামে অভিহিত করিয়াছি। লেখক, আলিবর্দ্দী খাঁর সমসাময়িক মুর্শিদাবাদের অন্যতম ওমরাহ। আমরা এ পর্য্যন্ত একখানিমাত্র "ইউসুফী" সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি; তাহাও কীটদষ্ট।

(২) এক জন অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারের কৃত ইতিহাস। ইহাতে মুর্শিদাবাদের স্থাপনার কিছু পূর্ব্বে, অর্থাৎ শোভাসিংহের বিদ্রোহ হইতে সিরাজদ্দৌলার রাজ্যপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। গ্রন্থে কোন নাম দেওয়া নাই; আমি "তারিখ বাঙ্গলা" নামে ইহার উল্লেখ করায় দেখিতেছি, অনেকে অনুগ্রহ

করিয়া ঐ নাম গ্রহণ করিয়াছেন। গবর্ণর ভান্সিটার্ট সাহেবের আদেশে এই গ্রন্থ লিখিত হয়; সুতরাং ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে ইহার সময় ধরা যাইতে পারে। খ্যাতনামা গ্লাডউইন্ সাহেব ১৭৮৮ সালে ইহার অনুবাদ প্রকাশ করেন। (১)

স্পষ্ট দেখা যায়, স্বনামখ্যাত 'সিয়ার-উল্-মুতাক্ষরীণ'-রচয়িতা সায়দ গোলাম হোসেন উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয় হইতে সাহায্য পাইয়াছেন, আলিবর্দ্দীর প্রথমাংশ-রচনায় 'তারিখ ইউসুফী'ই তাঁহার অবলম্বন; দুই এক স্থলে ইউসুফ্ খাঁর নামোল্লেখও আছে।

গোলাম হোসেন সলিমের কৃত "রিয়াজ-উস্-সালাতিন" (১৭৮৬—৮৮ খৃঃ) গ্রন্থে, গ্রন্থকার, মুর্শিদাবাদ ইতিহাসে সিরাজের রাজ্যাধিকার পর্য্যন্ত উল্লিখিত অজ্ঞাতনামা লেখকের সম্পূর্ণ অনুকরণ করিয়াছেন; একবারেই নকল করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মূলগ্রন্থের ভাষার অলঙ্কার মোচন করিয়া সরল করিয়াছেন; কোনও স্থলে নিতান্ত অবিশ্বাস্য বর্ণনা ত্যাগ করিয়াছেন মাত্র। সোসাইটী এখানি মুদ্রিত করিয়াছেন, এবং অনুবাদ প্রকাশেরও চেষ্টা হইতেছে। এই গ্রন্থখানিও মুসলমান-অধীন বাঙ্গলার সম্পূর্ণ ইতিহাস, তবে এখানি সংগ্রহ-গ্রন্থমাত্র।

এখন মুর্শিদ কুলী খাঁর চরিত্র সমালোচনা করিতে হইলে, উল্লিখিত ইতিহাসগুলি কোন্ সময়ে কিরূপ অবস্থায় লিখিত হয়, তাহা না জানিলে পাঠক নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন, এরূপ ভরসা করা যায় না।

(১) এই ইতিহাসের একখানি হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি শ্রদ্ধেয় বন্ধু দেওয়ান ফজলে রব্বী খাঁ বাহাদুর সংগ্রহ করিয়া আমার হস্তে দিয়াছেন। আরও একখণ্ড সংগ্রহ করিয়া আমরা এসিয়াটিক সোসাইটীর সাহায্যে ইহা মুদ্রিত করিয়া জনসমাজে প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছি। গ্রন্থকার আপনার নাম দেন নাই। কিন্তু দেওয়ান সাহেব বলেন, তাঁহাদের অঞ্চলে লোক-পরম্পরায় প্রবাদ যে, ইহা মুর্শিদাবাদের ফতেসিংহ পরগণার সুজাউদ্দীন নামক জনৈক মুন্সীর রচিত। আমাদের সংগৃহীত একখানি গ্রন্থ, জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী গণ্ডগ্রাম মঙ্গলকোটের সেখ নজিবুল্লা ১১৯৪ সালের ২১শে ফাল্গুন তারিখে বাবু সুখলালের জন্য নকল করেন। গ্লাডউইনের অনুবাদও ঠিক এই সময়ে প্রকাশিত হয়, দেখা যাইতেছে। এই অনূদিত গ্রন্থও এ দেশে দুর্লভ; মহাত্মা বেভারিজ সাহেব বিলাত হইতে লেখককে তাঁহার নিজখণ্ড পাঠাইয়া উপকৃত করিয়াছেন। ১৭৮৮ সালের 'এসিয়াটিক মিস্‌লেনী'তে এই গ্রন্থ ও ইহার আনুমানিক গ্রন্থকারের বিবরণ কিছু প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি এই প্রাচীন পত্রিকা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ অনুসন্ধান করিয়া এই বিষয় জানাইলে বিশেষ কৃতজ্ঞ হইব।

প্রথমে অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারকে দেখুন। ইনি গ্রন্থারম্ভে গবর্ণর ভান্সিটার্ট সাহেবের এক বিস্তৃত বন্দনা দিয়াছেন। এখানে ভান্সিটার্ট সাহেব সুদীর্ঘ বিশেষণ-ঘটায় বাণভট্টের রাজা শূদ্রক অপেক্ষা বড় কম নহেন। গ্ল্যাডউইন এই অংশের অনুবাদ দেন নাই। সময়ান্তরে আমরা ইহা পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিব। কোম্পানীর কর্ম্মচারী প্রভুগণের সন্তুষ্টিসাধন যে লেখকের অন্যতম উদ্দেশ্য, তাহা তিনি গোপন করেন নাই। "যাঁহারা অন্যের মন্দ দেখিয়া ভাল হইতে চান, বাঙ্গলা দেশের ভূতপূর্ব্ব নাজিমগণের কার্য্যকলাপ তাঁহাদের অবগতি ও সুবিচার জন্য আমি এই ইতিহাস রচনা করিলাম।" বিশেষ দুঃখের বিষয়, লেখক মহোদয়ের লেখনী যেরূপ ওজস্বিনী, সত্যনির্দ্ধারণের চেষ্টা তত দূর দেখা যায় না। ইনি যেখানে যাহা শুনিয়াছেন, অকাতরে তাহাই গ্রহণ করিয়া সুন্দর লিপিকৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন। কোথাও কতকগুলি অসম্বদ্ধ প্রবাদের সংযোগে, কোথাও বিরুদ্ধ ভাবের কথা এক স্থানে সমাবেশ করিয়া বিষম গোল করিয়া গিয়াছেন। এক বিষয়ে ইনি ঠিক আছেন; ইনি গোঁড়া মুসলমান, কাফের হিন্দুগণের নির্য্যাতনবর্ণনায় লেখকের বড়ই উল্লাস। সুতরাং হিন্দু জমিদার উৎপীড়ন সম্বন্ধে ইঁহার অতিরঞ্জিত উক্তি বিশেষ সাবধানে গ্রহণ করিতে হইবে। কুলী খাঁর হিন্দু জমিদার পীড়ন, হিন্দু দেবালয়ের বিনাশ-কল্পনা, হিন্দুকে মুসলমান করা ইত্যাদি অবাস্তব ঘটনা সংযোগ জন্য ইনিই দায়ী—পরবর্ত্তী লেখকের তাঁহার পশ্চাৎগামী হইয়াছেন মাত্র। মুতাক্ষরীণকার, এমন কি রিয়াজ গ্রন্থকার পর্য্যন্ত তাঁহার অনেক কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারায় গ্রহণ করেন নাই। পূর্ব্বতন নাজিমগণের কীর্ত্তি ইনি সুদ সহ দেখাইয়াছেন। আলিবর্দ্দী খাঁও এ হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। এখানে আলিবর্দ্দী ঠিক মুতাক্ষরীণে চিত্রিত আলিবর্দ্দী নহেন। বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক হত্যাকাণ্ডে আলিবর্দ্দী খাঁকে ভাস্কর পণ্ডিতের কথা ভিন্ন আরও দুই এক ক্ষেত্রে লিপ্ত দেখাইয়াছেন। এখানেও কাফের হিন্দুবধে লেখকের যেন উল্লাস এবং স্ফূর্ত্তিই দেখা যায়। মুরশিদ কুলী খাঁর "হিন্দু-বিদ্বেষ" সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া আপাততঃ আমরা কেবল জমীদার পীড়নেরই সমালোচনা করিব। আমাদের সৌভাগ্য যে, ইংরেজ দপ্তরের কাগজে এই সময়ের জমিদারী বন্দোবস্তের সম্পূর্ণ ও প্রামাণিক ইতিহাস পাওয়া যাইতেছে। নতুবা লেখকের কাহিনী বাঙ্গলার ইতিহাসের এই অংশে চিরদিনের মত এই কালিমা

রাখিয়া যাইত। যেখানে প্রকৃত বস্তুর সহিত লেখকের উক্তির সামঞ্জস্য নাই, সেখানে আমরা তাহা ত্যাগ করিতে বাধ্য। এইরূপ, মুসলমান লেখকগণও ইঁহার অনেক উক্তি গ্রহণ করেন নাই।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, মুর্শিদাবাদের ইতিহাসলেখকগণের মধ্যে ইউসুফ আলি খাঁ সর্ব্বপ্রথম। ইনি আপন গ্রন্থের উপক্রমণিকায় স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন, পূর্ব্বতন নাজিমগণের প্রামাণিক ইতিহাস সংগ্রহ করা একরূপ অসাধ্য ব্যাপার। অথচ ইনি মুর্শিদাবাদের এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; তাঁহার পিতা এক জন উচ্চপদস্থ সৈনিক; কটক হইতে দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্র সৈন্যের সম্মুখে আলিবর্দ্দী খাঁর সুবিখ্যাত প্রত্যাবর্ত্তনের অন্যতম সঙ্গী; নানা রূপে রাজসংসারে সংসৃষ্ট হইয়াও ইনি সমসাময়িক ইতিহাস ভিন্ন অন্য তথ্য সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। প্রবাদে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া স্বকপোলকল্পিত ইতিহাসরচনায় অপ্রবৃত্তিই কি ইহার কারণ নহে? তবেই দেখা গেল, কুলী খাঁর বিবরণ এই সময়েই, সত্য ও মিথ্যা, এই উভয়বিধ প্রবাদে জড়ীভূত হইতে আরম্ভ হয়। আলিবর্দ্দী খাঁর শত গুণ থাকিলেও, তিনি প্রভুপুত্রের সহিত বিশ্বাসভঙ্গ করিয়া ছলে বলে রাজ্য গ্রহণ করেন; সুতরাং তাঁহার ও তৎপারিষদ-বর্গের বৈঠকে পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনের দোষসমূহ অতিরঞ্জিতভাবে সমালোচিত হই-বারই কথা। এরূপ ব্যবহারের কারণও কিয়ৎপরিমাণে বর্ত্তমান না ছিল, এমন নহে। ইউসুফ্ আলি খাঁ বলেন, আত্মীয় সুজা খাঁর আশ্রয় লাভ জন্য যখন আলিবর্দ্দী দিল্লী হইতে মুর্শিদাবাদে আসিয়া পৌঁছেন, সেই সময়ে নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁ তাঁহার সমাদর করা দূরে থাকুক, বরং উপেক্ষাই প্রদর্শন করেন। প্রকৃতপক্ষে নবাগত অজ্ঞাতকুলশীল ভাগ্যমৃগয়ান্বেষণে ধাবমান মুসলমান সেনানীগণের উপর কোনও কালেই কুলী খাঁর বিশেষ আস্থা ছিল না। ইহারা মুসলমান রাজের বলস্বরূপ না হইয়া বরং দেশের কণ্টক, দূরদর্শী মুর্শিদের এইরূপ ধরণাই ছিল। বাঙ্গলার মুসলমান সামন্তগণের সাধারণ ব্যবহারই ইহার প্রমাণ। বর্ত্তমান কালের রাজপুরুষগণের ন্যায়, কুলী খাঁর স্বজাতি-বাৎসল্য অত্যধিক প্রবল ছিল না। বঙ্গের মুসলমান জায়গীরদারগণ চিরকালই তাঁহার চক্ষুঃশূল। তাঁহাদিগকে উড়িষ্যায় স্থানান্তরিত করিয়া কুলী খাঁ নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচেন। উপরন্তু, চরিত্রহীনতানিবন্ধন জামাতা সুজার প্রতি তাঁহার বিশেষ বাৎসল্য ছিল না। তাঁহার সতীশিরোমণি কন্যারত্নের ভর্ত্তাসত্ত্বেও চিরবৈধব্যপ্রায় অবস্থা সততই তাঁহার হৃদয়ে মুর্ম্মুরদাহ উপস্থিত করিত।

এরূপ ক্ষেত্রে জামাতার দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও সমাদর বড় একটা আশা করা যায় না। যাহা হউক, আলিবর্দ্দী খাঁ ক্ষুণ্ণমনেই মুর্শিদা-বাদ হইতে উড়িষ্যায় প্রস্থান করেন। এই সকল কারণে, সুজা খাঁর বা আলি-বর্দ্দী খাঁর মুর্শিদের উপর ভাব ভক্তি বড় ভাল হওয়া সম্ভব কি না, পাঠক তাহার বিচার করিবেন। আমাদের বিশ্বাস, যেমন পরবর্ত্তী বিপ্লবের পর ইংরেজী ইতিহাসে সিরাজের চরিত্র অতিরঞ্জিত হইয়া ভীষণতর আকার ধারণ করিয়াছে, সেইরূপ আলিবর্দ্দী খাঁর সিংহাসনগ্রহণের পর, কুলী খাঁর কঠোর ন্যায়পরতা, ভীষণ অত্যাচারের ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে।

দেখা যাইতেছে, খ্যাতনামা মুতাক্ষরীণ-কার এই অজ্ঞাতনামা লেখকের কথায় সম্পূর্ণ আস্থাস্থাপন করিতে পারেন নাই, এবং এই জন্যই এ সময়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা যুক্তিসঙ্গত বোধ করেন নাই। তবে তাঁহার সময়ে উল্লিখিত কারণপরম্পরায় মুর্শিদ কুলী খাঁর জমিদারপীড়নের প্রবাদ বড়ই প্রবল ছিল; এ জন্য তিনিও লিখিয়া গিয়াছেন, ঐ অত্যাচার সম্বন্ধে কাগজ কালী খরচ করাই অন্যায়। গোলাম হোসেন খাঁ অশেষ গুণ সত্ত্বেও আলিবর্দ্দী খাঁর বড়ই পক্ষপাতী; বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক শত্রুবধেও ইনি আলিবর্দ্দী খাঁর দোষ দেখেন না। কিন্তু অন্যত্র নরহত্যা বা বিশ্বাসঘাতকতার বর্ণনে তাঁহার লেখনী শতমুখী। এজন্য আলিবর্দ্দী খাঁর দরবারের মতই তাঁহার মত, এরূপ ধরিয়া লইলে বড় ভ্রম হয় না। যাহা হউক, যে দুই এক স্থানে প্রসঙ্গতঃ কুলী খাঁর উল্লেখ রহিয়াছে, সেখানেই তাঁহার প্রতিভা, কর্ম্মনিষ্ঠা ও রাজদরবারে প্রতিপত্তির কথা বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, কুলী খাঁর বন্দোবস্তে বেশীর ভাগ হিন্দু জমিদার দেখিতে পাই। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার মহোদয় স্বকপোলকল্পিত একটি মতের উল্লেখ করিয়াছেন;—ইনি বলেন, মুর্শিদ কুলী খাঁ রাজস্ব আদায় কার্য্যে বাঙ্গালী হিন্দু ভিন্ন অন্য কাহাকেও নিযুক্ত করিতেন না; কেন না, হিন্দুরা শাস্তির ভয়ে শীঘ্রই আপন দুষ্কৃতি প্রকাশ করিয়া ফেলিবে ও তাহারা ভীরুস্বভাব, সুতরাং রাজ্যের কোনরূপ ক্ষতির আশঙ্কা নাই। হিন্দু জমিদারগণকে এই প্রশংসাপত্র দিবার সময় গ্রন্থকার সম্ভবতঃ শোভাসিংহ বা রাজা উদয়নারায়ণ ও সীতারামের বিদ্রোহ ব্যাপার একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছিলেন। এ কালের বাঙ্গালীর স্বভাব যাহাই হউক, সেকালে জমিদারগণ যে নিতান্ত ভালমানুষ ছিলেন, ইহা প্রমাণ করা কষ্টকর।

গ্রন্থকার গোঁড়া মুসলমান ; হিন্দুরাই যে বুদ্ধিমান ও কর্ম্মকুশল ছিলেন, ইহা স্বীকার করিতে তাঁহার কষ্ট হয়। কুলী খাঁও এক জন গোঁড়া মুসলমান হইয়া হিন্দু জমিদারগণের এত পক্ষপাতী ছিলেন, ইহার একটা মন-গড়া কারণ নির্দ্দেশ না করিলে চলে কই ?

এ সম্বন্ধে কোম্পানীর সেরেস্তাদার গ্রাণ্ট মহোদয়ও একটা সমীচীন ব্যাখ্যা না দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। সুবিস্তীর্ণ রাজসাহী জমিদারী ক্রমশঃ এক ব্রাহ্মণসন্তানকে দেওয়া হইয়াছে দেখিয়া, তিনিও উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা এই (৩) যে, মুর্শিদ কুলী খাঁ জমিদারগণের বিভীষিকার জন্য বিদ্রূপ করিয়া 'বৈকুণ্ঠ' নাম রাখিয়া এক নরককুণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছিলেন ; তিনিই আবার এক জন পৌরোহিত্যব্যবসায়ী বিষয়ানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণকে এই সর্ব্বপ্রধান জমিদারী অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু এই উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণের প্রবঞ্চনা ও গ্রাহকতা বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও রাজ্যের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, এক অদূরদর্শিনী-নীতি অবলম্বন করিয়া, তাঁহার হস্তের এই সর্ব্বপ্রধান দান পুরুষানুক্রমে স্থায়িভাবে থাকিবে জানিয়াও, এইরূপে দিয়া গিয়াছেন। ইহার কারণনির্দ্দেশ স্থলে কেবল এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, যথেচ্ছাচারিরাজন্যবর্গস্বভাবসুলভ সময়োচিত স্বার্থসাধিনী নীতিই তাঁহাকে এইরূপ আত্মহত্যার ব্যাপারে প্রণোদিত করিয়াছিল। পাঠক মার্জ্জনা করিবেন, গ্রাণ্ট মহোদয়ের বাক্যগুলি বড়ই লম্বা, ভাবমাত্রসঙ্কলনেই রুদ্ধশ্বাস। গ্রাণ্ট সাহেব বোধ হয় জানিতেন না, কথিত চালকলাভোজী ব্রাহ্মণসন্তান রঘুনন্দনের পদতলে বসিবার যোগ্য বিবেচিত হইলেও, অনেক রাজস্বসচিব আপনাকে ধন্য মনে করিতেন। যে কৃষ্ণনগর রাজবংশের বিদ্যোৎসাহিতা, সংস্কৃতশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে নিষ্কর ভূসম্পত্তি দান প্রভৃতির জন্য বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ চির-ঋণী, বিধর্ম্মী গ্রাণ্ট মহোদয় নিজ প্রভু বণিক কোম্পানীর সামান্য রাজস্বের ক্ষতি উপলক্ষে সেই কৃষ্ণনগর-রাজদত্ত লাখেরাজ সম্বন্ধে অযথা গালিবর্ষণে সমধিক আগ্রহ দেখাইয়াছেন। (৪) তাঁহার মতে, এই লাখেরাজের প্রাচুর্য্যবশতঃই কৃষ্ণনগর-রাজের সদর রাজস্ব পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারগণের তুলনায় অল্প হইয়াছে। তবেই স্বীকার করিতে হইল, বর্ণিত হিন্দুবিদ্বেষী মুর্শিদ কুলী খাঁ এখানে লাখেরাজ

(৩) Fifth Report ; New Ed, vol I. p. 260.

(৪) Fifth Report ; p. 261.

বাজেয়াপ্ত বা অযথা রাজস্ববৃদ্ধি করেন নাই। কোম্পানীর আমলের বন্দোবস্তে রাজস্বের পরিমাণ কি পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল, এবং বাকী করের জন্য কত শত জমিদারের সর্ব্বনাশসাধন ঘটে, ইহা সাধারণের অবিদিত নাই। সুতরাং তুলনায় সমালোচনা করিতে হইলে, কোন্ বন্দোবস্ত জমিদারগণের পক্ষে হিতকর, তাহা বিবেচিত হইবে। এই সঙ্গে ভারতের যে ভাগে এখনও স্থায়ী বন্দোবস্ত হয় নাই, সেগুলির বন্দোবস্তের কথা মনে রাখিলেও মন্দ হয় না।

প্রকৃত কথা, বাঙ্গলার জমিদারগণ ইতিপূর্ব্বে বিপ্লবের সুবিধায় রীতিমত রাজকর আদায় দেওয়ার পদ্ধতি একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছিলেন। মুর্শিদ কুলী খাঁ প্রথম হইতেই এই আবর্জ্জনারাশি পরিষ্কার করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। স্পষ্ট দেখা যায়, তাঁহার বন্দোবস্ত যে অরাজক অবস্থার পরে সংঘটিত, তাহাতে যত দূর সম্ভব, অল্প জবরদস্তীতে কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল। বিপ্লবের পর এরূপ সুবন্দোবস্ত বড় একটা দেখা যায় না। এরূপ সময়ে অল্পাধিক অত্যাচার অবশ্যম্ভাবী। সেকালের চক্ষে দেখিলে নিতান্ত দুষ্ট বিদ্রোহী জমিদারগণকে নজরবন্দী রাখিয়া বন্দোবস্ত করা বড় বেশী দোষের বোধ হইবে না। ফলতঃ, কুলী খাঁর বন্দোবস্তে অত্যাচার সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি বর্ত্তমানে কেডাষ্ট্রাল্ সার্ভে সম্বন্ধে এক শ্রেণীর লোকের চীৎকারের ঠিক অনুরূপ।

বাকী খাজানা আদায়ের জন্য জমিদারগণকে দেওয়ানী জেলে রাখা তৎকালে আইন ছিল। সুবিখ্যাত প্রজারঞ্জক আলিবর্দ্দী খাঁর সময়েও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে এই জন্য কারারুদ্ধ দেখা যায়। (৫) সুতরাং চিরাগত মুসলমানী আইন অনুসারে, রাজস্বদানে অশক্ত অথচ অবাধ্য জমিদারগণকে কারারুদ্ধ করিয়া, কুলী খাঁ বড় বেশী অন্যায় করিয়াছেন, বোধ হয় না। এই সুসভ্য কালেও দেনার দায়ে জেলের ব্যবস্থা রহিয়াছে। আইনের দোষ ব্যক্তিবিশেষের স্কন্ধে অর্পণ করা যুক্তিযুক্ত নহে। কুলী খাঁ এই আইন অবস্থাবিশেষেই কার্য্যে পরিণত করেন। আলিবর্দ্দী খাঁর সময়ে নজরাণার টাকার জন্যও কারাবাস দেখা যায়। অতএব এ অবস্থা সেকালের পক্ষে অসাধারণ নহে। অজ্ঞাতনামা ইতিহাসলেখক এক স্থানে বলেন, কুলী খাঁ রাজস্বদানে অশক্ত হিন্দু-জমিদারগণকে সপরিবারে মুসলমান করিতেন। কিন্তু জমিদারী বন্দোবস্তে এক জনও এমন জমিদার দেখা যায় না। তবে জমিদারগণকে মুসলমানও করা হইত, এবং জমিদারী কাড়িয়া লইয়া অন্য হিন্দুজমিদারকে পুনরায় ঐ জন্যই

(৫) ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত ; ১০৪ পৃঃ।

পত্তন করা হইত, এরূপ কথা যদি বলা হয়, তাহা হইলে এ বুদ্ধির নিকট সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করা ভিন্ন আর উপায় কি ? মুর্শিদ কুলী খাঁর প্রধান রাজস্বসচিব হইতে আরম্ভ করিয়া রাজস্ববিভাগের উচ্চতর কর্ম্মচারিমাত্রই হিন্দু ছিলেন, ইহা আমরা ইতিপূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছি। হিন্দু মন্ত্রী, হিন্দু কর্ম্মচারী, হিন্দু জমিদার, চতুর্দ্দিকে হিন্দুগণে বেষ্টিত হইয়া কেবল হিন্দুর প্রতিই এই ব্যবস্থা কি করিয়া সঙ্গত হয়, লেখকই বলিতে পারেন। তিনি এক দৃষ্টান্ত দ্বারাও তাঁহার উক্তিসমর্থনের চেষ্টা করেন নাই। এরূপ ক্ষেত্রে তদানীন্তন বাঙ্গালী হিন্দুমাত্রেরই নিতান্ত কাপুরুষতা স্বীকার না করিলে, তাঁহার সঙ্গে 'ডিটো' দেওয়া যায় না।

এই সমস্ত কথিত অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা "বৈকুণ্ঠে"। অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার বলিতেছেন, "নবাবের দৌহিত্রীপতি সইদ্ রজি খাঁ বাঙ্গলার দেওয়ান নিযুক্ত হইয়া বাকী করের আদায়ের জন্য জমিদার ও আমিলগণের উপর উৎপীড়নের নানাপ্রকার নূতন উপায়ের উদ্ভাবন করিতে আরম্ভ করিলেন। চর্ম্মনির্ম্মিত ঢিলা পায়জামা পরাইয়া তাহার ভিতর বিড়াল ছাড়িয়া দেওয়া হইত; কাহাকেও বা লবণমিশ্রিত মহিষদুগ্ধ পান করাইয়া দেওয়া হইত, যাহাতে উদরাময় হইয়া অচিরাৎ মৃতপ্রায় হইয়া আসে। প্রবাদ এই যে, মনুষ্যসমান একটি খাদ প্রস্তুত করাইয়া নানাবিধ পূতিগন্ধময় অকথ্য পদার্থে তাহা পূর্ণ করা হইয়াছিল। (ভদ্রতার খাতিরে লেখকের সম্পূর্ণ বর্ণনা দিতে আমরা অসমর্থ।) হিন্দুগণের প্রতি উপহাসচ্ছলে এই নরককুণ্ডের নাম 'বৈকুণ্ঠ' রাখিয়া, রাজস্ব আদায় দানে অশক্ত জমিদার ও আমিলগণকে এই হ্রদে প্রক্ষিপ্ত করিয়া টানিয়া আনার ব্যবস্থা হয়।" স্মরণ রাখা উচিত, জমিদারগণের উপর অত্যাচারের বর্ণনা এই গ্রন্থেই প্রথম।

কিন্তু এখানেই জনশ্রুতি বলিয়া আরম্ভ। পরবর্ত্তী দুই এক জন মুসলমান গ্রন্থকার এই উক্তি অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। মুতাক্ষরীণে বৈকুণ্ঠের উল্লেখ নাই। রাজস্বসচিব গ্রাণ্ট সাহেব কুলী খাঁর স্কন্ধেই ইহার পিতৃত্বের আরোপ করেন। কিন্তু অনুগ্রহ করিয়া বলিতেছেন, বাস্তবিক বৈকুণ্ঠবাসের ব্যবস্থা হইত না। বিভীষিকা দেখাইয়া অনাদায়ী রাজস্বের সংগ্রহ ও ভবিষ্যতে ক্রটী না হয়, ইহাই লক্ষ্য ছিল। গ্রাণ্ট সাহেব রাজস্ববিভাগের কার্য্যের অনুরোধে মুর্শিদাবাদে আসিয়াছিলেন; নিজামত রেকর্ড এবং মিলের ইতিহাস দৃষ্টে জানা যায়, গ্রাণ্ট সাহেব ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে মুর্শিদাবাদের প্রভিন্সিয়াল্ কাউন্সিলের

একাউণ্টাণ্টের কার্য্য করিতেন। সুতরাং তিমি সমসাময়িক লোকের মুখে বৈকুণ্ঠ-ব্যাপার সবিশেষ অবগত হইয়াই রাজস্ববিবরণীতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তবেই দেখা গেল, রজি খাঁ হইতে বৈকুণ্ঠ কুলী খাঁর হাতে পড়া ও জমিদারমাত্রেরই বৈকুণ্ঠবাসের প্রবাদ ভয়প্রদর্শনমাত্রে পরিণত হওয়া, ঐ সময়ে ঘটিয়াছিল। ফল কথা, এক সময়ে নানা লোকে ঐ প্রবাদ নানা প্রকারে প্রচার করিতেছেন। কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তা কে, ইহাই অনুসন্ধানের বিষয়। সুতরাং প্রবাদের এই রূপান্তর অবশ্যই সমসাময়িক লোকের মুখে শুনিয়াছেন। স্যার জন শোর সাহেব গ্লাড্উইনের অনুবাদ দেখিয়া সেই মতই বলিয়াছেন। সুতরাং রজি খাঁ হইতে 'বৈকুণ্ঠ' স্বয়ং মুর্শিদ কুলীর হস্তে যাওয়া, এবং জমিদারমাত্রেরই বৈকুণ্ঠবাস হইতে ভয়প্রদর্শনমাত্রে পরিণত হওয়া, ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই ঘটে। গ্রন্থকার বলেন, রজি খাঁ বাঙ্গলার দেওয়ান হইয়া অত্যাচার আরম্ভ করেন। এখানে একটি কথা বক্তব্য আছে। এখন জমিদার-পীড়নে রজি খাঁর কতটুকু হাত ছিল, দেখা যাউক; এখানে মূলেই গোল বোধ হয়। যত দূর দেখা যায়, তাহাতে সইদ রজি খাঁ দেওয়ান-ই-আলি বা প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। আমরা একবার 'নবাবী আমলে হিন্দু কর্ম্মচারী' প্রবন্ধে দেখাইয়াছি (৬) যে, নবাবের স্বসম্পর্কীয় আত্মীয়বর্গই প্রধানমন্ত্রিত্বপদে বা প্রাইভেট সেক্রেটরীর কার্য্যে সাধারণতঃ নিযুক্ত হইতেন; কারণ, এ দুই পদেই মন্ত্রগুপ্তির বিশেষ প্রয়োজন। রাজস্ববিভাগের কার্য্যে বিশেষ বুৎপত্তির জন্য হিন্দুরাই সাধারণতঃ নিয়োজিত ছিলেন। মুর্শিদ কুলীর শাসনের প্রথম বর্ষেই, অর্থাৎ ১৭০৭ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে, সইদ ইক্রাম খাঁ এই পদে নিয়োজিত হন, এবং ঐ সময়েই ভূপতি রায় রাজস্ব বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তা হইয়াছিলেন। ইক্রাম খাঁর মৃত্যুর পর রজি খাঁ অতি সামান্য দিনমাত্র দেওয়ান ছিলেন; কারণ ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে রজি খাঁর পরলোকান্তে নবাব আপন দৌহিত্র সরফরাজকে ঐ পদে নিযুক্ত করিয়া বাদশাহ ফেরোক সেরের নিকট হইতে উপাধি আনাইয়া দেন, ইত্যাদি কথা লেখক আপনি উল্লেখ করিয়াছেন, এবং ইতিহাসপাঠকমাত্রেই ইহা দেখিয়া থাকিবেন। সরফরাজ ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে বালকমাত্র; সুতরাং রাজস্ববিভাগ প্রভৃতি সমস্ত পরিদর্শনের ভার তাঁহার হস্তে ছিল, ইহা মনে করা অসঙ্গত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ইক্রাম খাঁর সময় হইতে রাজস্ববিভাগে ভূপতি রায় হইতে আরম্ভ করিয়া হিন্দু

(৬) Stewart, 2nd Ed. p. 246.

কর্ম্মচারী দেখা যায়। কুলী খাঁর বন্দোবস্তের পর হইতে দেওয়ান খালসা অর্থাৎ 'রাজস্বসচিব' রায় রাইয়াঁ রঘুনন্দন। ইনিই নাটোরের রঘুনন্দন, কুলী খাঁর দক্ষিণ হস্ত। ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদ কুলীর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রিয়-পাত্র রঘুনন্দন পরলোকগত হন। অতএব রজি খাঁর জমিদার-পীড়নের অবসর কোথায়? যাঁহারা ছাপার লেখা ব্রহ্ম জ্ঞান করেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র; অন্যে ইহা বিশ্বাস করিতে ইতস্ততঃ করিবেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে অন্যত্র দেখাইয়াছি, (সাহিত্য; ১৩০২) নবাবী আমলে প্রত্যেক বিভাগে স্বতন্ত্র দেওয়ান থাকিতেন। যত দূর জানিতে পারা যায়, তাহাতে নবাবের নাতিনী-জামাতা সইদ রজী খাঁ দেওয়ান-ই-আলি বা প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। মুর্শিদ কুলী খাঁর বন্দোবস্তের পর হইতে রঘুনন্দন খালসা দেওয়ান বা রাজস্বসচিবের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার পরে এ পদে হিন্দুরাই নিযুক্ত হইতেন। ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে কুলী খাঁ এবং রঘুনন্দন, উভয়েই পরলোকগত হন। অতএব, জমিদার-পীড়নে রজি খাঁর কতটুকু হাত ছিল, ইহা চিন্তার বিষয়। বলা বাহুল্য, খাল্‌সা দেওয়ানই রাজস্ববিভাগের কার্য্যের জন্য দায়ী। তর্কস্থলে যদি স্বীকার করা যায় যে, রজি খাঁ ঐরূপ কোনও অত্যাচারের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এই প্রবাদ নিতান্ত অমূলক নয়, তাহা হইলেও কুলী খাঁর স্কন্ধে উহা কিরূপে আরোপিত হইতে পারে, তাহা বিশেষ বোধগম্য হয় না।

বৈকুণ্ঠের স্থাননির্দ্ধারণের চেষ্টায় বিফলমনোরথ হইয়া জিজ্ঞাসু হইলে, পরিহাসরসিক মুর্শিদাবাদবাসী আমার কোনও বন্ধু, মুর্শিদাবাদের বর্ত্তমান নবাবী কিল্লার দক্ষিণ তোরণের নিকট ইহার কাল্পনিক স্থান নির্দ্দেশ করেন। আমি এই কথা সেই পরিহাসচ্ছলেই, যমের দক্ষিণ দ্বারই উহার উপযুক্ত স্থান বলিয়া, তিন বৎসর পূর্ব্বে "সৎসঙ্গ" মাসিকপত্রে উল্লেখ করি। এক্ষণে দেখিতেছি, আমরাই অনেককে স্বশরীরে "বৈকুণ্ঠে" লইয়া যাইবার প্রথম পথপ্রদর্শক হইলাম। এই স্থানই প্রকৃত "বৈকুণ্ঠ" বলিয়া গৃহীত হইতে চলিল। ইতিহাস-রসজ্ঞ দেওয়ান সাহেব এ কথা লইয়া বড়ই হাস্য করিয়াছেন! তিনি বহুদিন অবধি প্রাচীন লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া ইহার কোনও খোঁজ খবর পান নাই। বাস্তবিক, ব্যক্তিবিশেষের উর্ব্বর মস্তিষ্ক ভিন্ন অন্যত্র ইহার স্থান অন্বেষণ পণ্ডশ্রমমাত্র।

শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ। প্রথমে শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবীর "ভাইফোঁটা" নামক একটি কবিতা। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "কাজির বিচার" একটি রহস্যপূর্ণ ক্ষুদ্র গল্প;—বিশেষত্ব নাই। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস গুপ্তের "নেপালে তিন সপ্তাহ" মনোরম ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। লেখক বিনা আড়ম্বরে নেপালের একখানি ক্ষুদ্র রেখাচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। "ভারতে সূর্য্যগ্রহণ" শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়ের রচিত জ্যোতিষবিষয়ক প্রবন্ধ। লেখক বর্ত্তমান বর্ষের সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষ করিয়া বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে গ্রহণ সম্বন্ধে বিবিধ সাধারণ বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের "মীর কাসিম" এখনও চলিতেছে। "শ্যাম বাউল" শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের রচনা; শ্যাম. "নবদ্বীপের কোনও 'কীর্ত্তনীয়া' সম্প্রদায়ের দলপতি ছিল, সে নিজে বৈষ্ণব।"—লেখক দুঃখ করিয়াছেন, শ্যাম বাউলের নাম আর কাহারও মুখে শোনা যায় না। লেখক এই কয় পৃষ্ঠায় 'শ্যামের' যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে স্মরণ করিয়া রাখিবার মত কিছু দেখা গেল না। "স্বরলিপি"তে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত একটি নূতন গান আছে—"আমি কেবলই স্বপন করেছি বপন বাতাসে।" শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সরকার "গার্সী উৎসবে"র কাহিনী বর্ণবদ্ধ করিয়াছেন। গার্সী বাঙ্গলার প্রদেশবিশেষের গ্রাম্য উৎসব। প্রবন্ধটি দীনেন্দ্রবাবুর পল্লীচিত্রের মত;—কিন্তু সঙ্ক্ষেপে সঙ্কলিত হইয়াছে। "বড় বউ" কোনও অজ্ঞাতনামা লেখকের রচিত একটি চলনসই গল্প। "বর্ণরহস্য" শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর রচিত একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। লেখক বর্ণ-বিজ্ঞানের গূঢ় রহস্যের সহিত গভীর দার্শনিক তত্ত্বের সন্নিবেশ করিয়াছেন। রামেন্দ্র বাবু যেমন বিজ্ঞানে, তেমনই দর্শনেও কৃতবিদ্য। তাঁহার পক্ষেই এরূপ বিষয়ের আলোচনা সম্ভব। ইহার সমকক্ষ রচনা বাঙ্গলা সাহিত্যে বিরল। "একটি পুরাতন ভয় ও তাহার অমূলকতা" প্রবন্ধে লেখক রুসিয়ার পক্ষে ভারতাক্রমণ অসম্ভব, এই পুরাতন মতটির উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কৃষিকার্য্য" প্রবন্ধটির উপযোগিতা কি, বলিতে পারি না। অদ্যাবধি প্রবন্ধে কৃষির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। এখন 'হাতে ও হাতিয়ারে' না করিলে ফল ফলিবে, বোধ হয় না।

ভারতী। পৌষ। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়ের "বৈষ্ণবদর্শন" প্রবন্ধে নূতনত্বের অভাব। বৈজ্ঞানিক রায় মহাশয় সহসা ভক্তি-পথের পথিক হইলেন কেন? শ্রীযুক্ত জলধর সেন সুদূর হিমালয় হইতে "প্রত্যাবর্ত্তন" করিতেছেন। গমনের পথে যেরূপ আগ্রহ উদ্দীপিত হইত, প্রত্যাবর্ত্তনে তাহা নাই। শ্রীযুক্ত নিত্যগোপল মুখোপাধ্যায়ের "জর্ম্মন্ শিল্পশিক্ষা" জ্ঞাতব্য কথায় পূর্ণ;—অন্নহীন বাঙ্গালীর আলোচ্য। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় "বৈজ্ঞানিক সার-সংগ্রহে" উদ্ভিজ্জকেশ, ফটোগ্রাফি, উদ্ভিদ্‌নিদ্রা, এই তিনটি বিষয়ের বিবরণ দিয়াছেন। তিনটিই মনোরম ও শিক্ষাপ্রদ। "নিশি" শ্রীমতী সরলাবালা দাসীর গ্রথিত একটি ক্ষুদ্র সামাজিক গল্প। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "হাসির গানে" বিলাতফেরতা, বঙ্গবীর, নূতন কিছু ও দেশহিতৈষী, এই চারিটি গান আছে। "বিলাতফেরতা" গানটি তীব্র শ্লেষে অনু-প্রাণিত। ইহার এক চরণ এইরূপ,

"আমরা মা মাসীকে জ্যাকেট কামিজ পরাই।"

হাসি স্বাস্থ্যকর ও আমাদের জীবনে নিতান্ত আবশ্যক বটে, কিন্তু হাস্যরসের উদ্দীপনের জন্য বিলাতফেরতার মা মাসী প্রভৃতির উল্লেখ না করিলে বোধ করি শোভন হইত। "পোষলা"

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের পল্লীচিত্র,—বনভোজনের বৃত্তান্ত; চৌদ্দ পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া সেই পুরাতন চর্চ্চিতচর্ব্বণ! "রমণীদস্যু" একটি ক্ষুদ্র অনূদিত গল্প। গল্পটি মনোরম।

প্রদীপ। প্রথম ভাগ; প্রথম সংখ্যা; পৌষ। "দাসীর" ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদকতায়, এই নূতন মাসিকপত্র প্রকাশিত হইতেছে। সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করিতেছি,—নূতন সহযোগী দীর্ঘজীবন ও সাফল্য লাভ করুন। সম্পাদক মহাশয় সূচনায় বলিতেছেন, "আমরা নিজ ক্ষুদ্র সাধ্যানুসারে সামান্যভাবে নূতন কিছু করিবার চেষ্টা করিব।" চিত্র ভিন্ন অন্য কোনও নূতনত্ব আমরা দেখিতেছি না। "ঈপ্সিত" একটি সুন্দর সনেট; শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়ের "মরিব কি বাঁচিব?" প্রবন্ধটিতে বাঙ্গলার বর্ত্তমান সামাজিক সমস্যার আলোচনা ও তাহার মীমাংসার চেষ্টা আছে। এই উৎকৃষ্ট প্রবন্ধটি আলোচনার যোগ্য। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্তের "আগ্রা—১৮৫৭ অব্দের মধ্যভাগে" একটি ঐতিহাসিক সন্দর্ভ। প্রবন্ধের শেষে একখানি চিত্র আছে;—বোধ করি, তাহা রজনী বাবুর চিত্ররূপে কল্পিত হইয়া থাকিবে; চিরপরিচিত গুপ্তমহাশয়কে ছবিখানি দেখিয়া কিন্তু চিনিবার যো নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলির মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "মায়াবাদ"ই উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "জ্যোতিষ" নামক একটি ধারাবাহী প্রবন্ধের সূত্রপাত করিয়াছেন। "কলিকাল" শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের রচিত ক্রমশঃপ্রকাশ্য সামাজিক উপন্যাস। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের "সীমান্ত-সংগ্রাম" সময়োপযোগী রাজনৈতিক প্রবন্ধ। লেখক অনেক অনুসন্ধান করিয়া এতদ্বিষয়ক বিবিধ জ্ঞাতব্য তথ্যের সমাবেশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে লর্ড লরেন্সের সময় হইতে চিত্রল অধিকার পর্যান্ত সীমান্ত-সমরের পূর্ব্ব ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের "পরজীবী" একটি প্রাণিবিজ্ঞানবিষয়ক সুন্দর প্রবন্ধ। "যোদ্ধা প্যারীমোহন" প্রবন্ধে, লেখক বাঙ্গালীর শৌর্য্যবীর্য্যের অস্তিত্বপ্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের চিত্র আছে।

মুকুল। অগ্রহায়ণ। "মহারাণী স্বর্ণময়ী" একটি সুলিখিত ক্ষুদ্র প্রবন্ধ। "পিরামিড" একটি সচিত্র রচনা। "প্রভাত" একটি সচিত্র সুন্দর কবিতা। "বলবন্ত সিং" একটি সচিত্র উপকথা; মুকুলের শিশু পাঠকদের চিত্তরঞ্জন করিবে।

মুকুল। পৌষ। প্রথমে "সন্ধ্যা" নামক একটি সচিত্র কবিতা। কবিতার হিসাবে "সন্ধ্যা" মন্দ হয় নাই, কিন্তু বালকেরা ইহার কবিত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবে না; "উদার গগন" প্রভৃতি প্রয়োগের কবিত্ব ও সৌন্দর্য্য বুঝিবার শক্তি মুকুলের পাঠকগণের নাই, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। "ডুবুরীর কার্য্য" প্রবন্ধটি কৌতুকাবহ। "লেমার" প্রাণিতত্ত্ব-বিষয়ক একটি উৎকৃষ্ট রচনা। লেমারের ছবিখানিও মনোহর। "কেম্ব্রিজের পত্র"ও মন্দ নহে। "ভজন সিংএর বাঘ মারা" একটি সচিত্র রহস্য-কবিতা। রচনার পারিপাট্য বা কোনও বিশেষত্ব নাই, এবং বর্ণিত ঘটনা অত্যন্ত অদ্ভুত। নিতান্ত আজগুবি হইলেই রহস্য হয় না।

সখা ও সাথী। অগ্রহায়ণ ও পৌষ। "বিবিধ" মন্দ নহে। "সীমান্ত যুদ্ধে দেশীয় রাজগণ" প্রবন্ধটি বালকদের উপযোগী নহে। কিন্তু এই প্রবন্ধে পাঁচখানি উৎকৃষ্ট চিত্র আছে। "বুনো ও পশু" প্রবন্ধের বিষয় শিক্ষণীয়; কিন্তু অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। "বন্দীর কাহিনী" একটি কৌতূহলোদ্দীপক গল্প। "চানাচুর" বিবিধ বিষয়ের সঙ্কলন,—চিত্তগ্রাহী হইয়াছে। "প্রাচীন মহারাষ্ট্র জাতি" প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য; আমরা এইরূপ প্রবন্ধের পক্ষপাতী। এইরূপ রচনায় বালকদের শিক্ষা ও আমোদ ও উপকারলাভের উপায়বিধান করা যায়। "জোর জীবনচরিত" কৌতুকাবহ।

বন্ধ্যা।

১

সাগরতটে ক্ষুদ্র কুটীরে করিম ও তাহার পত্নী মিরিয়ম বাস করিত। তাহাদের কুটীরের সম্মুখে সুদূরপ্রসারিত সুনীল সিন্ধু; যত দূর দৃষ্টি যায়, কেবল নীল জলের খেলা, তাহার পর নীল নীরদ আর উদার সমুদ্র পরস্পরের আলিঙ্গনবদ্ধ; পশ্চাতে শ্যামশষ্পশোভিত প্রান্তর, প্রান্তরের পরপারে পর্ব্বতশ্রেণী—যেন নীল মেঘের উপর গাঢ় নীলমেঘ। কুটীর হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। সাগরসলিলে ক্ষুদ্র নৌকায় ঘুরিয়া করিম যে মাছ ধরিত, গ্রামে তাহা বিক্রয় করিত। বিক্রয়লব্ধ অর্থে স্বামী স্ত্রীর স্বচ্ছন্দে দিন কাটিত। কিন্তু দুই জনেই মনে করিত, তাহারা নিঃসঙ্গ। তাহাদের সন্তান নাই। সে দুঃখ করিম অপেক্ষা মিরিয়মেরই অধিক ছিল, কর্ম্মহীন স্নেহবিকাশহীন জীবন তাহার নিতান্তই ভার বলিয়া বোধ হইত। করিম যখন মাছ ধরিতে চলিয়া যাইত, তখন সে একাকিনী সাগরতটে বসিয়া জলখেলা দেখিত, আর মনে মনে ভাবিত, যাহার সন্তান নাই, তাহার মত দুঃখ কাহার? যদি একটি ক্ষুদ্র শিশু তাহার জীবন সুখময় করিত!

কত দিন গৃহে ফিরিয়া শ্রান্ত করিম দেখিত, মিরিয়ম গৃহে নাই। মিরিয়ম কোথায় থাকিত, তাহা সে জানিত; কুটীরের সম্মুখে যেখানে কতকগুলি ঝাউ গাছ সাগরের জল পর্য্যন্ত ঘুরিয়া গিয়াছে, সেখানে একখানা পাথরের উপর বসিয়া মিরিয়ম উদাসনয়নে সম্মুখের অনন্তবিস্তৃত নীল জলরাশির দিকে চাহিয়া থাকিত। মাথার উপর ঝাউগাছের মধ্য দিয়া বাতাস সোঁ সোঁ করিয়া বহিয়া যাইত; দূরে জলচর বিহঙ্গম বৃত্তাকারে উড়িয়া উড়িয়া চীৎকার করিত, আর তাহার পদপ্রান্তে সাগরের ফেনচূড় তরঙ্গরাশি ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িত, খেলা করিত;—সে কেবল সোহাগের সাদর সঞ্চলন, আদরের আনন্দ আলিঙ্গন। করিম জানিত, মিরিয়ম সেখানে বসিয়া চঞ্চল জলোচ্ছ্বাস দেখিতে ভালবাসে।

ধীরে ধীরে ঝাউগাছের পার্শ্ব দিয়া আসিয়া করিম পত্নীর স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিত। মিরিয়ম চমকিয়া তাহার দিকে চাহিত। করিম বলিত, "আজ কি গৃহকর্ম্ম করিতে হইবে না?"

মিরিয়ম বলিত, "কাহার জন্য করিব?"

করিম দেখিত, পত্নীর নয়নে অশ্রু। সে বুঝিত, হৃদয়ে কি শূন্যতা লইয়া

তাহার বন্ধ্যা পত্নী কালযাপন করে। সে তাহার পার্শ্বে বসিত, সেই শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া দুই জনে নির্ব্বাক হইয়া সম্মুখে চাহিয়া থাকিত। মিরিয়মের মস্তক করিমের বক্ষে আসিয়া পড়িত; স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া মিরিয়ম কাঁদিত। করিমের নয়নও অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিত।

তাহার পর মিরিয়ম বলিত, "চল, ঘরে যাই।"

করিম বলিত, "চল যাই।"

উঠিয়া উভয়ে গৃহে আসিত।

এমনই করিয়া তাহাদের দিন কাটিত।

সাধারণ সাংসারিক সুখের তাহাদিগের কোন অভাবই ছিল না; আবার এই এক কারণে তাহাদের দুঃখেরও অন্ত ছিল না। করিম পত্নীকে পাখী আনিয়া দিত, মিরিয়ম তাহা উড়াইয়া দিত; ভুলিয়া পিঞ্জরদ্বার মুক্ত রাখিয়া জল আনিতে গিয়াছিল, পাখী উড়িয়া গিয়াছে। করিম বিড়ালের ছানা লইয়া আসিত, মিরিয়ম তাহাকে তাড়াইয়া দিত; বিড়ালে মাছ খাইয়া যায়। সে কেবল সাগরতরঙ্গলীলা দেখিতেই ভালবাসিত।

মিরিয়ম তীরে বসিয়া সাগরের খেলা দেখিত; আর করিম সাগরের তরঙ্গোপরি তরী ভাসাইয়া মাছ ধরিতে যাইত। সাগরসলিলে চক্রবালরেখায় সূর্য্য তেমনই উদিত হইত, অস্ত যাইত; ঝাউগাছের মধ্যে দিয়া মর্ম্মাহতের দীর্ঘশ্বাসের মত বাতাস তেমনই বহিয়া যাইত; প্রভাতে সন্ধ্যায় মেঘের উপর রবিকরের উজ্জ্বল অঞ্চল তেমনই লুটাইয়া পড়িত; কুটীরের পশ্চাতে প্রান্তরের পরপারে পর্ব্বতশ্রেণী প্রভাকরকিরণের প্রখরতার সঙ্গে সঙ্গে নানা বর্ণ ধারণ করিত; আর সাগরের নিত্যপ্রবাহিত তরঙ্গের মত দিনগুলা বহিয়া যাইত।

আষাঢ়ের আকাশে যেমন জলভরা জলধর স্বচ্ছান্ধকারাবরণে ধরণীর মুখ আচ্ছন্ন করে, তেমনই সেই এক কাতর চিন্তা বন্ধ্যা মিরিয়মের হৃদয় অন্ধকারাচ্ছন্ন করিত। সুখেই হউক আর দুঃখেই হউক, দিন যায়, থাকে না; মিরিয়ম ও করিমেরও দিন কাটিতে লাগিল।

২

বৈশাখের সন্ধ্যা। আকাশে একটিও তারকা দেখা যায় না; মসীবর্ণ মেঘমালা রজনীর অন্ধকার গাঢ়তর ও গম্ভীরতর করিয়া তুলিয়াছে। উপরে আঁধার আকাশ, আর নিম্নে আঁধার জলের অনন্ত বিস্তার,—আঁধারে আঁধার মিশিয়া গিয়াছে। সেই অন্ধকার রজনীতে, সেই অন্ধকার অম্বরতলে, সেই অন্ধকার

জলরাশি কোন্ অন্ধকার অকূলের দিকে বহিয়া যাইতেছে। চারি দিকে গভীর নিস্তব্ধতা রাজত্ব করিতেছে। বাতাস নাই; ঝাউগাছের পাতাও কাঁপিতেছে না। সমুদ্র যেন আলেখ্যে লিখিত।

রাত্রি গভীর হইতে লাগিল।

সহসা বাতাস উঠিল; সমুদ্রসৈকতে বালুকারাশি উড়াইয়া একটা ঝাপটা বাতাস বহিয়া গেল। তাহার পর বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, আর ঝড় বহিতে লাগিল।

ঝড়ের বেগ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, করিমের ক্ষুদ্র কুটীর কম্পিত হইতে লাগিল। একটা বড় ঝাউগাছ ভাঙ্গিয়া পড়িল, ফেনিল উচ্ছ্বাসে দুই একটা তরঙ্গ কুটীরের অতি নিকট পর্য্যন্ত আসিতে লাগিল। বাহিরে মেঘগর্জ্জন আর পবনের হুহু শব্দের সহিত সমুদ্রের গভীর কল্লোল মিশিয়া এক প্রকার শব্দ উৎপাদন করিতে লাগিল। আজ বড়ই দুর্য্যোগ!

ঘনশব্দবিক্লবা মিরিয়ম করিমের আরও নিকটে সরিয়া আসিল। করিম তাহাকে তাহার দৃঢ়বাহুপাশে বদ্ধ করিয়া আরও নিকটে টানিয়া লইল; যেন কিছুতেই তাহার নিকট হইতে মিরিয়মকে দূরে লইয়া যাইতে পারিবে না।

শেষ রাত্রে ঝড়ের বেগ প্রশমিত হইয়া গেল; সাগরের গর্জ্জনও মন্দীভূত হইল। প্রভাতে করিম ও মিরিয়ম কুটীরের বাহিরে আসিল। তখনও প্রান্তরমধ্যে দূরে বৃক্ষশাখায় অল্প অল্প অন্ধকার জড়াইয়া আছে। সমুদ্র এখন শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, দূরে তাহার বক্ষের উপর আকাশের নীলিমা নামিয়া আসিয়াছে। তীরে বৃক্ষশাখা, ছিন্নলতা, বৃক্ষপত্রাদি ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে; ইহারাই সাগরের খেলার সাক্ষী। এখন সিন্ধুবক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ মৃদুপবনে উঠিতেছে, নামিতেছে। কি পরিবর্ত্তন! এই কি সেই উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল সাগর!

তীরস্থিত বৃক্ষশাখা প্রভৃতির মধ্যে করিম খানকতক ভগ্ন কাষ্ঠ দেখিতে পাইল; সে বলিল, "রাত্রে নৌকাডুবি হইয়াছে।"

মিরিয়মের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

করিম আপনার দক্ষিণে চাহিল; তাহার পর ফিরিয়া বামে চাহিল। দূরে কি একটা দ্রব্য তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সে সেই দিকে চলিল। মিরিয়মও স্বামীর অনুসরণ করিল। দুই জনে আসিয়া দেখিল, সাগরতটে শুভ্রসৈকতশয্যায় রমণীদেহ পড়িয়া আছে! ঝড়ের সময় তটের তত দূর পর্য্যন্ত তরঙ্গ আসিয়াছিল, এখন জলরাশি সরিয়া গিয়াছে। রমণীর আলুলায়িত কুন্তলজাল

বালুকারাশির উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে ; চক্ষু মুদিত। রমণী দুই হস্তে বক্ষে কি চাপিয়া ধরিয়া আছে—করিম ও মিরিয়ম দেখিল, ক্ষুদ্র শিশু ; উৎপাটিত মূল মৃণালের বক্ষে কমলকোরকের মত জননীর বক্ষে ক্ষুদ্র শিশু। মিরিয়ম কাঁদিয়া ফেলিল।

করিম দেখিল, রমণীর অঙ্গ শীতল, রমণী মৃতা। তরঙ্গোচ্ছ্বাসে, তীরে পতনের গুরু আঘাতে, রমণীর প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। করিম শিশুকে জননীর স্নেহবন্ধনচ্যুত করিল ; রমণীর দুই হস্ত দুই পার্শ্বে সৈকতরাশির উপর পড়িয়া গেল ; যেন আর এক জনের হস্তে পুত্রকে সমর্পণ করিয়া জননী চিন্তামুক্ত হইলেন। শিশুর অঙ্গ তখনও ঈষৎ উষ্ণ ; করিম ও মিরিয়ম তাহাকে লইয়া ছুটিয়া কুটীরে গেল। জননীর মৃতদেহ সাগরতটে পড়িয়া রহিল ; নবোদিত সূর্য্য সেই শুভ্রদেহ ও শুভ্র শয্যার উপরে আলোক ঢালিতে লাগিল ; আর অদূরে সাগরের চলোর্ম্মিমালা তটের উপর ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল।

কুটীরে গিয়া করিম শিশুর সিক্তবসন খুলিয়া ফেলিল ; আর মিরিয়ম খানকতক কাষ্ঠ আনিয়া অগ্নি জ্বালিল। দুই জনে শিশুকে মৃদু মৃদু তাপ দিতে লাগিল। উভয়ে নিমেষহীন নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে শিশু নয়ন উন্মীলিত করিল। তখন করিম গ্রামে গেল ও কিছুক্ষণ পরে একটু দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিল। মিরিয়ম সেই দুগ্ধ ঈষদুষ্ণ করিয়া শিশুকে পান করাইতে লাগিল।

তাহার পর করিম আবার সাগরতীরে গমন করিল। তখন সূর্য্যকিরণ প্রখর হইয়া উঠিয়াছে, সেই কিরণজাল রমণীর মৃতদেহ ও সৈকতশয্যার উপর পড়িয়াছে ; যেন জ্যোতিশ্ছটায় কোন অলৌকিক দেবীমূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইয়াছে। করিম সেই মৃতদেহ তুলিয়া সাগরসলিলে নিক্ষেপ করিল, খানিকটা জল উচ্ছ্বসিত হইয়া করিমের গায়ে লাগিল।

আর এক জনের হস্তে হৃদয়ের ধন অর্পণ করিয়া জননীর মৃতদেহ কোন অকূলে ভাসিয়া চলিল।

৩

শিশু বাঁচিয়া উঠিল। বন্ধ্যা মিরিয়ম তাহার স্নেহোচ্ছ্বাসে সেই ক্ষুদ্র শিশুকে প্লাবিত করিয়া দিল। সে তাহাকে তাহার বিপুল স্নেহের মধ্য সযত্নে বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। কোরকের নিবিড় স্নেহতপ্তহৃদয়ে সৌরভের মত, মিরিয়মের স্নেহে শিশু বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

তাহাদের কুটীরের চারি পার্শ্বে যে এত সৌন্দর্য্যের উপাদান ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল, করিম বা মিরিয়ম কেহই পূর্ব্বে তাহা জানিত না। প্রান্তরের ক্ষুদ্র কুসুমে, বৃক্ষের উদ্ভেদোন্মুখ পত্রে, সাগরতটে অযত্নবিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ডে যে এত সৌন্দর্য্য ছিল, উভয়ের কেহই পূর্ব্বে তাহা জানিত না। এখন তাহারা তাহা জানিতে পারিল ; কারণ, সে সকল পাইলে শিশু আনন্দিত হয়, তাহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠে। দেবতার আশীর্ব্বাদে অন্ধের চক্ষু লাভের মত, এই শিশুর প্রতি স্নেহে যেন তাহাদিগের চক্ষে জগতের শত সৌন্দর্য্য বিভাসিত হইয়া উঠিল।

এখন আর মিরিয়মের পাখী উড়িয়া যায় না ; এখন আর বিড়ালে মাছ খাইয়া পলায় না। কেবল এখনও করিম মাছ ধরিতে গেলে মিরিয়ম সাগরের জলখেলা দেখিতে যায়। দুইটি ঝাউ গাছে একখানি বস্ত্র বাঁধিয়া মিরিয়ম শিশুর জন্য দোলনা প্রস্তুত করিয়া দেয়। শিশু তাহাতে শয়ন করিয়া থাকে ;—পবন তাহাকে দোল দিয়া যায় ; আর অদূরে সাগর তাহার নিদ্রার জন্য “ঘুমপাড়ানী” গীত গাহিতে থাকে। আর সেই শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া মিরিয়ম জলখেলা দেখে আর ভাবে, কোথা হইতে এই ক্ষুদ্র শিশু আসিয়া তাহার শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিতেছে! এখন সংসারে তাহার এই আকর্ষণ কোথা হইতে আসিল!

সে ভাবিত, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিত না।

সাগরের তরঙ্গমালা তাহার পদপ্রান্তে তেমনই লুটাইয়া পড়ে, ঝাউ গাছের মধ্য দিয়া পবন তেমনই বহিয়া যায়, আর দূরে জলচর বিহঙ্গম চক্রাকারে উড়িতে উড়িতে তেমনই ডাকিতে থাকে।

এমনই করিয়া এক বৎসর কাটিয়া গেল।

৪

আবার বৈশাখ আসিয়াছে। দিন যায় যায় ; দুই একখানা ক্ষুদ্র মেঘ আকাশে খেলা করিতেছে,—বাতাসের সঙ্গে ছুটাছুটি করিতেছে। ক্রমে আরও দুই একখানা মেঘ আসিতে লাগিল। আজ আর মরণাহত তপনের করজাল আকাশের উপর সৌন্দর্য্য ছড়াইতে পারিল না ; আজ মেঘের ঘন-কৃষ্ণ আচ্ছাদনের পশ্চাতে তাহারা নিবিয়া গেল।

সাগরতটে শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া মিরিয়ম ভাবিতে লাগিল, যদি আজ ঝড় উঠে! করিম আজ সাগরে গিয়াছে! সে তাহার ক্রোড়শয়ান শিশুর

দিকে চাহিল; সেও ত আর এক বৈশাখের রাত্রি, সে দিনও সন্ধ্যার সময় মেঘমালা আকাশে এমনই সমবেত হইতেছিল! মিরিয়ম শিহরিয়া উঠিল। ক্রোড়ের শিশু কি জানি কেন তাহার বড় বড় চক্ষু তুলিয়া মিরিয়মের মুখের দিকে চাহিয়াছিল। মিরিয়ম তাহার মুখ চুম্বন করিল। তাহার পর সে আবার ভাবিতে লাগিল।

চারি দিক নিস্তব্ধ; একটুও বাতাস নাই। ক্রমে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। মিরিয়ম উঠিয়া কুটীরে গেল। দীপ জ্বালিয়া সে শিশুকে দুগ্ধ পান করাইল; তাহার পর তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া শয্যায় রাখিয়া আপনি কুটীর-দ্বারে বসিয়া করিমের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

বড় ঝড় উঠিল। কুটীরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া মিরিয়ম সেই এমনই আর এক রজনীর কথা ভাবিতে লাগিল; সে রজনীতে করিম তাহাকে তাহার দৃঢ় বাহুর আশ্রয় দিয়াছিল। আজ বাহিরে তেমনই ঝড় বহিতেছিল, সমুদ্রে তেমনই তরঙ্গ উঠিতেছিল, গভীর জলরাশি তেমনই কল্লোলে ছুটিতেছিল। আজ মিরিয়মের হৃদয় সেই বাত্যাবিক্ষুব্ধ বারিধিবক্ষ অপেক্ষা অধিক বিক্ষুব্ধ। এ ঝড়ে করিম কোথায়! তিমিরাবগুণ্ঠিত নিশীথে, তরঙ্গতাড়িত সাগরতটে, স্তিমিত দীপালোকে আলোকিত কুটীরাভ্যন্তরে বসিয়া অভাগিনী মিরিয়ম বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। একটা তরঙ্গ আসিয়া কুটীরের দ্বারে পড়িল; দ্বার ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল। মিরিয়ম উঠিয়া সুপ্ত শিশুকে ক্রোড়ে লইল; তাহার পর তাহাকে বক্ষে লইয়া শয্যায় শয়ন করিল। বাহিরে ঝড় তেমনই বহিতে লাগিল, বাতাসে জলে তেমনই উন্মাদের খেলা চলিতে লাগিল।

* * * *

প্রায় নিশাশেষে একবার বড় বেগে ঝড় বহিল; মড় মড় করিয়া একটা ঝাউ গাছ ভাঙ্গিয়া পড়িল; সমুদ্রে আরও বৃহৎ বৃহৎ তরঙ্গ উঠিল। উত্তাল তরঙ্গমালা সফেন আবেগে তীরের উপর আসিয়া পড়িল, যেন শতফণাময় ভুজঙ্গ ক্রোধান্ধ হইয়া সবেগে ছুটিয়া আসিতেছিল। যখন তরঙ্গ সরিয়া গেল, তখন ঝপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল। ক্রমে ঝড় থামিয়া গেল। সাগর শান্ত হইল।

৫

ঝড় উঠিবার পূর্ব্বেই করিম গ্রামের নিকটে নৌকা ভিড়াইয়াছিল। সেই দুর্য্যোগে রাত্রিতে সে আর কুটীরে ফিরিতে পারে নাই, গ্রামেই ছিল। হৃদয়ে নানাপ্রকার অমঙ্গল-আশঙ্কা লইয়া প্রত্যূষেই সে কুটীরাভিমুখে চলিল।

প্রান্তর হইতেই দেখিতে পাইল, তাহার ক্ষুদ্র কুটীরের একাংশ পড়িয়া গিয়াছে। উচ্চস্বরে করিম ডাকিল, "মিরিয়ম!" শব্দ দূরে পবন পথে মিশিয়া গেল। উত্তর না পাইয়া করিম ছুটিয়া গেল। ভগ্ন কুটীরে প্রবেশ করিয়া চারি দিকে চাহিল। মিরিয়ম কুটীরাভ্যন্তরে নাই।

বাহিরে আসিয়া করিম ব্যাকুলভাবে চারিদিকে দেখিল। সহসা সে দেখিতে পাইল, ঝাউ গাছের নিম্নে শিলাতলে পড়িয়া—ও কি!

করিম ছুটিয়া সেখানে গেল।

কিছুক্ষণ ধরিয়া করিম নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া রহিল। এমনই আর এক প্রভাতের কথা তাহার মনে পড়িল; সে দিনও দূরে আকাশের নীল জলে সাগরের নীলিমা এমনই মিশিয়াছিল; সেদিনও নবরবিকরে প্রকৃতি এমনই হাসিতেছিল; আর সে দিন আর এক জন রমণীর দেহ মরণেও পুত্রকে হৃদয়ে ধরিয়া এই সাগরতটে পড়িয়াছিল।

সম্মুখে মিরিয়ম পড়িয়া আছে। সাগরের তরঙ্গে তাহার আলুলায়িত কুন্তলজাল একবার তীরের দিকে আসিতেছে, আবার তীর হইতে ভাসিয়া যাইতেছে। যে সাগরের তীরে বসিয়া সে জলখেলা দেখিত, যে সাগর তরঙ্গ তুলিয়া আদরে সোহাগে তাহার পদপ্রান্তে খেলা করিত, আজ সেই সাগর আসিয়া তাহার পার্শ্বে বিলাপগীত গাহিতেছে। মিরিয়মের বক্ষে শিশুর মৃত-দেহ। করিম আর এক দিন এই সমুদ্রতীরে জননীর বক্ষে এই শিশুকে এমনই ভাবে দেখিয়াছিল। শিশুর শীতল কপালে অযত্নবিক্ষিপ্ত কুঞ্চিত কেশ-রাশি ছড়াইয়া রহিয়াছে; তাহার চক্ষু মুদিত; মুখে বিকৃতির চিহ্নমাত্র লক্ষিত হয় না। যেন বৃন্তচ্যুত কমলকোরক।

করিম ডাকিল, "মিরিয়ম!"

অশ্রুপূর্ণ নয়নে করিম মরণাহতা পত্নীর দিকে চাহিল। তাহার পর সে পত্নীর নিকট হইতে শিশুর মৃতদেহ লইতে গেল।

মিরিয়ম শিশুর মৃতদেহ দৃঢ় করিয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিয়াছিল; যেন সে স্নেহবন্ধন কেহই ছিন্ন করিতে পারিবে না।

অধীরভাবে করিম আবার ডাকিল, "মিরিয়ম!"

মিরিয়ম আর চক্ষু উন্মীলিত করিল না। কেবল সাগর তেমনই বিলাপ-গীতি গাহিতে লাগিল।

রাণী ভবানী।

একাদশ পরিচ্ছেদ ;—নূতন নবাব।

পলাশির যুদ্ধের পর হইতেই একদল নূতন নবাবের আবির্ভাব হইয়াছিল ; ইঁহারা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারী। কোম্পানী বাহাদুর যৎসামান্য বেতনে যে সকল ইংরাজ গোমস্তা এদেশে পাঠাইয়া দিতেন, তাঁহারা ধর্ম্মপথে থাকিয়া কোম্পানীর কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন না। সামান্য বেতনে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্ব্বাহ করাও কঠিন হইত ; তাহার পর যখন ভারতবর্ষের তৎকালপ্রচলিত বিলাসলালসা বর্দ্ধিত হইত, তখন অল্পবয়স্ক ইংরাজ যুবকগণের পক্ষে উপায়ান্তর অবলম্বন পূর্ব্বক অল্পদিনে প্রভূত ধনোপার্জ্জন করা আবশ্যক হইয়া উঠিত। তাঁহাদের ধনতৃষ্ণা নিবারণ করিবার জন্য যে উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলেও, এখন, ইংরাজ ইতিহাসলেখকগণ লজ্জায় অধোবদন হইয়া থাকেন।

যথাসম্ভব অল্প মূল্যে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া তাহাই অগ্নিমূল্যে বিক্রয় করা ও তদ্দ্বারা অল্পদিনের মধ্যে প্রভূত ধনোপার্জ্জন করা অনেকেরই লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরাজেরা বঙ্গবিহার উড়িষ্যার প্রবল প্রতাপশালী নূতন নবাব হইয়া লক্ষ্যসাধনের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; তাঁহাদিগের কার্য্যে কেহ বাধা প্রদান করিতে পারিত না ; তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উপস্থিত হইত না ; কেহ অভিযোগ উপস্থিত করিলেও কে তাহার বিচার করিবে ? দেশ অরাজক, মোগল গৌরবরবি অস্তগত, জমিদারদিগের শাসনক্ষমতা পতনোন্মুখ ; ইংরাজেরা রাজ্যের সকল স্থানে প্রতাপশালী হইয়া উঠিতেছিলেন। এরূপ ক্ষেত্রে যাহা হইবার, তাহাই হইতে লাগিল। দেশের লোকে হাহাকার করিতে লাগিল ; কত লোকে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নামোল্লেখ করিয়া অভিসম্পাত করিতে লাগিল ; তাহারা বলিতে লাগিল যে, তিনিই ইংরাজদিগকে আহ্বান করিয়া আনিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিলেন। এইরূপে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্বত্র "নিমকহারাম" নামে কলঙ্কিত হইতে লাগিলেন। *

কৃষ্ণচন্দ্রের অপরাধ কি, লোকে তাহা ধীরভাবে বিচার করিবার অবসর পাইল না। ইংরাজ নবাবের অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া সকলেই নিতান্ত

* ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত।

অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতে লাগিল। যাঁহারা সে দিনও মুসলমানের অনুগ্রহভিক্ষার জন্য নবাবদরবারে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইতেন, এবং নবাবের শুভদৃষ্টিলাভের আশায় হিন্দু মুসলমান আমীর ওমরাহগণকে নানারূপ স্তুতি স্তবন করিতেন, তাঁহারা যে রাষ্ট্রবিপ্লবে কত দূর ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন ও সেই ক্ষমতাবলে দেশের লোকের উপর কিরূপ অত্যাচার উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিতেও ক্লেশ বোধ হয়। সরকারী কাগজপত্রে এখনও যে দুই চারিটি অত্যাচারকাহিনী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই যথেষ্ট।

বিনোদরাম চট্টোপাধ্যায় এক জন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণসন্তান। তিনি বার্টন নামক এক জন সাহেবের কোপদৃষ্টিতে নিপতিত হন। সাহেব কলিকাতার ইংরাজদরবারের দ্বারদেশে বিনোদরামকে অবরুদ্ধ করিয়া ভৃত্যবর্গের সহায়তায় হস্তপদ বন্ধন করিয়া বংশখণ্ডে বিলম্বিত অবস্থায় চট্টোপাধ্যায়কে স্বগৃহে বহন করিয়া আনিলেন। তথায় স্বহস্তে নিতান্ত নির্দ্দয়রূপে চাবুক প্রহারে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিয়া মুখের মধ্যে বলপূর্ব্বক গোমাংস প্রবিষ্ট করিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। * বিনোদরামের এইরূপ বিচারপ্রণালীতে দেশের লোক যে কিরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তাহা এখন কল্পনা করাও অসম্ভব। যাহারা অল্পবুদ্ধি নিরক্ষর, তাহারা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রশংসা করিতে পারিল না ; যাঁহারা পদস্থ ধনশালী ইংরাজবন্ধু, তাঁহারাও এরূপ কার্য্যের অন্য কোন সদুত্তর প্রদান করিতে সক্ষম হইলেন না। উত্তরকালে কবিকাহিনীতে লিখিত হইয়াছে,—

"এক রাজা যাবে পুনঃ অন্য রাজা হবে,
বাঙ্গালার সিংহাসন শূন্য নাহি রবে।" †

* Mr. Barton laying in wait seized Binautram chattagee opposite to the door of council, and with the assistance of his bearers, and two peons tied his hands and feet, swung him upon a bamboo like a hog, carred him to his own house, there with his own hands chawbooked him in the most cruel manner, almost to the deprivation of life ; endeavoured to force beaf into his month, to the irreparable loss of his Brahmin's caste, and all this without giving ear to, or suffering the man to speak in his own defence, or clear up his innocence to him.—Selections from the Records of the Government of India, vol. I. Record no. 463.

† পলাশীর যুদ্ধ কাব্য।

লোকে এই হিতকথায় সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিল না; তাহারা মনে মনে নূতন নবাবদিগের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল।

এই অসন্তোষ কালে বিলীন হইয়া গিয়াছে। অরাজকতার মূলোচ্ছেদ করিয়া, সুশিক্ষার বহুল প্রচার করিয়া, সুবিচার ও সুশাসনের বহুবিধ বিধি-ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়া, ইংরাজরাজ সভ্যসমাজে আদর্শ শাসনকর্ত্তা বলিয়া কীর্ত্তিলাভ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তখন ইংরাজ শাসন প্রচলিত হয় নাই, কেবল ইংরাজবাহু দেশলুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

রাণী ভবানী রাষ্ট্রবিবর্ত্তনের বিরোধী ছিলেন। তথাপি তাঁহার কথায় কেহ কর্ণপাত করেন নাই। এখন সকলেই তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া হায় হায় করিতে লাগিলেন। দেশের মধ্যে যে অভিনব উপদ্রবের সৃষ্টি হইল, তাহা এ দেশের লোকের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন।

বঙ্গদেশে বহুবার রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে; কখনও হিন্দু, কখনও বৌদ্ধ, কখনও পাঠান, কখনও মোগল, বাঙ্গালীর উপর রাজদণ্ড পরিচালন করিয়াছেন। কিন্তু সে সকল রাষ্ট্রবিপ্লবে দীনদুঃখীদিগের দুঃখ ছিল না; যাঁহারা রাজা বা জমিদার, তাঁহাদেরই সর্ব্বনাশ হইত; দেশের লোকে নিরুদ্বেগে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইত; যিনি রাজসিংহাসন অধিকার করিতেন, তাঁহাকেই সহাস্যবদনে করপ্রদান করিত। বর্ত্তমান রাষ্ট্রবিপ্লবে ইহার বিপরীত ঘটনা সংঘটিত হইতে লাগিল। দেশের রাজা ও জমিদারবর্গ ইংরাজের সহায়; তাঁহাদের আপাততঃ কোনও ক্ষতি হইল না; যাহারা নিতান্ত দীন দুঃখী অসহায়, তাহাদিগেরই সর্ব্বনাশ হইতে লাগিল। হাট বাজার কাঁপিয়া উঠিল; ইংরাজের গোমস্তার অত্যাচারে জোলা তাঁতি পলায়ন করিতে লাগিল; অর্থোপার্জ্জনের আশায় ইংরাজেরা ধান চাউল পান সুপারি তামাক লবণ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যের কারবার খুলিয়া দিলেন; অন্তর্বাণিজ্যে দরিদ্র বঙ্গবাসীর যে দুই পয়সা আয় হইবে, সে আশা ত ফুরাইল।

নূতন নবাবদিগের দৌরাত্ম্যে যে কেবল বাঙ্গালীরই সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল, তাহা নহে;—কোম্পানী বাহাদুরেরও বিলক্ষণ সর্ব্বনাশ হইতে লাগিল! ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ স্বার্থসাধনের জন্য কোম্পানীর বাণিজ্যোন্নতির বিষয়ে উদাসীন হইয়া আপন আপন বাণিজ্যোন্নতি সাধন করিতে লাগিলেন। সহসা যুদ্ধকলহে লিপ্ত হইয়া সামরিক ব্যয় বর্দ্ধিত হইতেছিল, তাহা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে

লাগিল। বিলাতের কোর্ট অব্ ডিরেক্টারের সদস্যগণ পুনঃপুনঃ পত্র লিখিয়াও ইহার গতি রোধ করিতে পারিলেন না!

বঙ্গদেশের ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ নানা স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া ও বহুসংখ্যক সেনা নিয়োগ করিয়া আত্মপক্ষ প্রবল করিতে লাগিলেন। কোর্ট অব ডিরেক্টারের সদস্যগণ লিখিয়া পাঠাইলেন যে,—"তোমাদের প্রভু বণিক, সে কথা ভুলিয়া গিয়া তোমরা সামরিক চিন্তায় আত্মহারা হইয়াছ কেন? আমাদের মূলধনের অর্দ্ধাংশ কি দুর্গপ্রাচীরতলে প্রোথিত করিব?" *

এরূপ তীব্র তিরস্কারেও ফল হইল না। এ দেশের ইংরাজেরা লিখিয়া পাঠাইলেন যে, "তাহা না করিলে ইংরাজ বাণিজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে;—ফরাসি বা ওলন্দাজগণ ভারতবাণিজ্যে একাধিপত্য প্রাপ্ত হইবেন।" সুতরাং এ দেশের ইংরাজদিগের ইচ্ছামতই সকল কার্য্য চলিতে লাগিল।

রাণী ভবানীর জীবনকাহিনীর সহিত এই সকল ঐতিহাসিক ঘটনার ঘনিষ্ঠ সংস্রব। তিনি তৎকালে বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থানের অধিশ্বরী; কেবল তাহাই নহে; তাঁহার রাজ্যমধ্যেই ইংরাজদিগের অধিকাংশ বাণিজ্যালয়। তখনও রাণী ভবানীর স্বাধীন শাসনক্ষমতা তিরোহিত হয় নাই, তখনও স্বরাজ্যের জীবন মরণের বিচারক্ষমতা তাঁহার করতলগত। সুতরাং নূতন নবাবদিগের সহিত রাণী ভবানীর নানা কারণে মনোমালিন্য সংঘটিত হইতে লাগিল।

এ দেশের রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে যে ইংরাজ লেখকগণ শতমুখে রাণী ভবানীর শাসনপ্রতিভার প্রশংসা কীর্ত্তন করিতেন, রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবামাত্র তাঁহারাই রাণী ভবানীর শাসনকলঙ্ক আবিষ্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। রাণী ভবানী রমণী,—অবরোধ-কারাবাসিনী বিধবা হিন্দুরমণী; অশিক্ষিতা, কুসংস্কারাচ্ছন্না, পাত্রমিত্রপরিবেষ্টিতা, শাসনকৌশলবিহীনা, অযোগ্য ভূম্যধিকারিণী, ইত্যাদি অনেক কথা ইংরাজদরবারে উপনীত হইতে লাগিল। ভবানী সে সকল কথায় কর্ণপাত না করিয়া রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন, এবং দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, আর্ত্তের রক্ষণ, আশ্রিতের কল্যাণসাধন করিয়া আপন পদগৌরবের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিলেন না।

---

* We can not avoid remarking that yon seem so thoroughly possessed with military ideas as to forget your employers are merchants, and trade their principal object ; and were we to adopt your several plans for fortify-

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ;—দেশের কথা।

প্রসঙ্গক্রমে অনেক যুদ্ধ কলহ ও রাষ্ট্রবিবর্ত্তনের কথা শুনাইতে বসিয়া, দেশের কথা বর্ণনা করা হয় নাই। রাণী ভবানী যে রাজ্যের মহারাণী ও প্রাতঃস্মরণীয়া দেবী বলিয়া পূজনীয়া হইয়াছিলেন, সে রাজ্যে শিক্ষা দীক্ষা শিল্প বাণিজ্য সকল বিষয়ের সঙ্গেই তাঁহার সংস্রব ছিল। তাহার কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা আবশ্যক।

রাণী ভবানীর সময়ে দুই শ্রেণীর রাজকর প্রচলিত ছিল ;—আসল ও আবওয়াব। আসল জমা যৎসামান্য ছিল, আবওয়াবের সংখ্যা ও পরিমাণ অনির্দ্দিষ্ট থাকায়, তাহাই অধিক বলিয়া বিবেচিত হইত। যাহারা কৃষিজীবী, তাহারা যৎসামান্য রাজকর প্রদান করিত ;—যাহারা ব্যবসায়ী, তাহাদিগকেই অধিকমাত্রায় রাজকর প্রদান করিতে হইত।

সে কালে বাস্তুভূমির রাজকর বড়ই যৎসামান্য ছিল ; নিতান্ত দরিদ্র লোকেও ঘর-বাড়ী বাঁধিয়া নিরুদ্বেগে বাস করিতে পারিত। রাণী ভবানীর রাজ্যে অধিকাংশ বাস্তুভূমি নানা কারণে রাজকরপ্রদানের দায়িত্ব হইতে মুক্তিলাভ করায়, প্রজাপুঞ্জের পক্ষে নিরুদ্বেগের কারণ হইয়াছিল। দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, লাখেরাজ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে অধিকাংশ বাস্তুভূমিই কার্য্যতঃ নিষ্কর বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল ; রাণী ভবানীর রাজ্যে উত্তরদ্বারী গৃহের জন্য রাজকর গৃহীত হইত না বলিয়া, তদুপলক্ষেও অনেকে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল।

আসল জমার পরিমাণ যতই যৎসামান্য হউক, আবওয়াবের পরিমাণ নিতান্ত যৎসামান্য ছিল না। সেকালের শিল্প বাণিজ্যাদির লভ্যাংশের উপর আবওয়াব ধার্য্য হইত, সামাজিক ও পারিবারিক মাঙ্গলিক ব্যাপারের জন্যও আবওয়াব প্রদান করিতে হইত। এতদ্ভিন্ন বিচারকার্য্যের জন্য অর্থী প্রত্যর্থিগণকে নানারূপে অর্থ ব্যয় করিতে হইত। এই সকল উপায়ে রাণী ভবানীর প্রচুর অর্থাগম হইত। তিনি সেই অর্থের কিরূপ সদ্ব্যবহার করিতেন, তাহার নিদর্শনে, বঙ্গভূমি কেন,—ভারতবর্ষের বিবিধ পুণ্যক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

এই সকল কারণে রাণী ভবানীর রাজ্যে লোকের সুখের অবধি ছিল না। তাহারা কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে

ing, half our capital would be buried in stone-walls.—Courts' letter, 23 March, 1759, para 55.

সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। ইংরাজেরা রাজসাহী রাজ্যের এইরূপ উন্নত অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই নানা স্থানে বাণিজ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষ আজকাল কৃষিপ্রধান দেশ বলিয়াই খ্যাতি লাভ করিয়াছে ; তাহার প্রধান কারণ এই যে, ভারতবর্ষের শিল্প বাণিজ্য তিরোহিত হইয়া কেবলমাত্র কৃষিকার্য্যই অবশিষ্ট রহিয়াছে। রাণী ভবানীর সময়ে এ দেশের এরূপ দুর্দ্দশা ছিল না। কার্পাস ও পট্টবস্ত্রের জন্য রাজসাহীর সবিশেষ সুখ্যাতি ছিল ; কার্পাস বৃক্ষের কৃষিকার্য্যে, কার্পাস সূত্রের ক্রয় বিক্রয় ও কার্পাস বস্ত্রের বিনিময়ে, বাঙ্গালীরা সুসভ্য ইউরোপ হইতেও অর্থোপার্জ্জন করিতেন।

ইংরাজেরা বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামে জমিদারী লাভ করার পর হইতেই, তাঁহাদের অসঙ্গত অত্যাচারে ও অশিষ্ট আচরণে, বাঙ্গালীর শিল্প-বাণিজ্য উৎসন্ন হইবার সূত্রপাত হয়। ইংরাজ বণিক বামনের ন্যায় বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামে ত্রিপাদ ভূমি প্রাপ্ত হইয়া, কালক্রমে বাঙ্গালীর শিল্প ও বাণিজ্য ও কারুকার্য্যের স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল অধিকার করিয়া ফেলিয়াছিলেন। রাণী ভবানীর রাজ্যে এই উপলক্ষে কিরূপ অত্যাচার হইত, মালদহের ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী গ্রে সাহেব তাহার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। *

কলিকাতার ইংরাজ দরবারের সহৃদয় সদস্যগণ, বা বিলাতের কোর্ট অব্ ডিরেক্টারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ সহসা এই অশিষ্ট ব্যবহারের গতিরোধ করিতে না পারায়, বাঙ্গালার শিল্প বাণিজ্য দিন দিন অধোগতি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। লর্ড ক্লাইব পুনরায় বঙ্গদেশে শুভাগমন করিয়া সুশাসন সংস্থাপনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকেও প্রকারান্তরে স্বীকার করিতে

* Mr. Gray, resident at Malda, in January 1764 wrote to the President,—"Since my arrival here, I have had an opportunity of seeing the villainous practices used by the Calcutta gomastas, in carrying on their business. The Government has certainly too much reason to complain of their want of influence in their country, which is torn to pieces by a set of rascals, who in Calcutta walk in rags, but when they ara set out on gomastaships, lord it over the country, imprisoning the ryots and merchants, and writing and talking in the most insolent, domineering manner to the fouzdars and officers.

হইয়াছিল যে, এরূপ ক্ষেত্রে অরাজক রাজ্যে দুষ্ট দমন করা একরূপ অসাধ্য ব্যাপার। *

মোগল শাসন ভাসিয়া গিয়াছে, ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই, বাহুবলই সকল তর্কের একমাত্র মীমাংসক বলিয়া পরিচিত হইয়াছে,—এরূপ ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে দস্যু তস্করের উপদ্রব প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। অরাজক রাজ্যে শান্তি সুখ তিষ্ঠিতে পারিল না;—বিধবার অশ্রুধারা, অনাথের আর্ত্তনাদ, দুর্ব্বলের কাতর ক্রন্দন, অসহায়ের হাহাকারে, রাণী ভবানী নিত্যই মর্ম্মপীড়িত হইতে লাগিলেন। অল্পদর্শী লোকে রাষ্ট্রবিবর্ত্তনের এই সকল প্রত্যক্ষ কুফল দর্শন করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের উদ্দেশে গালিবর্ষণ করিতে লাগিল।

প্রজার সুখেই জমিদারগণের সুখ;—প্রজার সর্ব্বনাশ সমুপস্থিত হইয়া জমিদারদলকেও বিব্রত করিয়া তুলিতে লাগিল। তাঁহারা রাষ্ট্রবিপ্লবে লাভবান হইবেন বলিয়া সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন; কিন্তু লাভ দূরে থাকুক, অন্তর্বিপ্লবের তুমুল তরঙ্গে প্রাচীন জমিদার-বংশ নিমজ্জিত হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল। রাণী ভবানীর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল;—খাল কাটিয়া কুম্ভীর আনিবার ফল ফলিল, সমুদ্রমন্থনে অমৃতকুণ্ডের পরিবর্ত্তে হলাহল ভাসিয়া উঠিল!

এই সকল অপূর্ব্ব বিড়ম্বনার মধ্যে হিন্দু মহিলার পক্ষে রাজসাহীর ন্যায় বিস্তৃত রাজ্যের শাসনভার পরিচালন করা কত দূর কঠিন, তাহা বিবেচনা করিলে, সে কালের কথঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাণী ভবানী এরূপ

* "In a country where money is plenty, where fear is the principal of government, and where your arms are ever victorious, it is no wonder that the lust of riches should readily embrace the proferred means of its gratification, or that the instruments of your power should avail themselves of their authority, and procced even to *extortion* in those cases where simple corruption could not keep pace with their rapacity. Example of this sort, set by superiors, could not fail of being followed in a proportionate degree by inferiors. The evil was contageous, and spread among the civil and military, down to the writer, the ensign and the free merchant.—Clive's letter.

অন্তর্বিপ্লবের মধ্যেও হতাশ হইয়া আত্মকর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিলেন না। পূর্ব্ববৎ প্রজাপালনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

রাণী ভবানীর চেষ্টায় রাজসাহী রাজ্যে কিয়ৎপরিমাণে সুশাসন বর্ত্তমান ছিল; কিন্তু তাহাও যায়-যায় হইয়া উঠিতে লাগিল!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ;—দেশের কথা।

রাণী ভবানীর শাসন-সময়ে এ দেশে গোব্রাহ্মণসেবার যথেষ্ট সমাদর ছিল। লোকে লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া কবচাকারে সাগ্রহে অঙ্গে ধারণ করিত; পীড়া বা যন্ত্রণার সময়ে ভক্তিভরে সর্ব্বৌষধিরূপে সেবন করিত, এবং যাত্রাকালে মস্তকে স্থাপন করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইত!

দেশের অধিকাংশ লোকেই শাক্তমতাবলম্বী হইলেও, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শিষ্যানুশিষ্যবর্গের পাদপূজার অভাব ছিল না; বরং জনসাধারণের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম্মেরই প্রাদুর্ভাব অধিকমাত্রায় পরিলক্ষিত হইত।

নদীয়ার ও নাটোরের রাজবংশ শাক্তমতাবলম্বী বলিয়া, রাজসাহী ও কৃষ্ণনগর অঞ্চলে রাজানুকম্পায় তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপের প্রাধান্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। তদুপলক্ষে সুরার উপাসনাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এক জন লিখিয়া গিয়াছেন যে,—"রাজসাহী শাক্ত সমাজের লীলাভূমি; ইহার গ্রামে গ্রামে শক্তিপূজা প্রচলিত ছিল, এবং তদুপলক্ষে সুরার উপাসনাও বিশেষরূপে প্রচলিত হইয়াছিল!" * রাজসাহী প্রদেশে অদ্যাপিও শাক্তমতেরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কৃপায় গৌরাঙ্গদেবের জন্মভূমিতেও শাক্তমতের প্রাধান্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। সভাপণ্ডিত আগমবাগীশ মহাশয় দীপান্বিতা-শ্যামা-পূজা ও জগদ্ধাত্রী-পূজার প্রচলন করিয়া, শাক্তোৎসবের সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

এই সময়ের সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সমাজসংস্কারের চেষ্টা আজকাল নূতন প্রচলিত হয় নাই। রাণী ভবানীর সময়েও দুইটি কঠোর সমাজ-নিয়মের সংস্কার করিবার চেষ্টা হইয়াছিল।

আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তৎকালে পূর্ব্ব-বাঙ্গলায় বিক্রমপুরের পণ্ডিতসমাজ, এবং পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গে নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজ সর্ব্বপ্রকার সামাজিক আচার পদ্ধতির নিয়ামক হইয়া উঠিয়াছিলেন। পূর্ব্ববাঙ্গলায় প্রাচীন স্মৃতি ও নবদ্বীপাঞ্চলে রঘুনন্দন স্মার্ত্তশিরোমণি মহাশয়ের অষ্টাবিংশতি-তত্ত্বাত্মক নব্যস্মৃতির সমাদর দেখিতে পাওয়া যাইত। এই সময়ে বাঙ্গলা দেশের

সকল স্থানেই গৌরীদান, বিধবার ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণপ্রথা দৃঢ়সংস্থাপিত হইয়াছিল।

ইহাতে কোনও কোনও বিষয়ে সমাজশাসনের সুব্যবস্থা হইলেও, কোনও কোনও বিষয়ে বড়ই মর্ম্মান্তিক দুঃখ ক্লেশের কারণ সংঘটিত হইয়াছিল। অষ্টমঃ বর্ষীয়া বালিকার গৌরীদানের পর সে যদি দৈববশে বিধবা হইত, একাদশীর দিনে আত্মীয় বান্ধবগণকে জীবন্মৃতাবস্থায় নিশাযাপন করিতে হইত;—ধর্ম্মরক্ষার আশায় বালবিধবাকে গৃহাভ্যন্তরে অর্গলরুদ্ধাবস্থায় রাখিয়া, পিতা মাতা কত ক্লেশে নিশাতিপাত করিতেন, তাহা কল্পনা করিতেও সাহস হয় না!

রাণী ভবানীকে এই নিদারুণ যন্ত্রণা বহন করিতে হইয়াছিল। তিনি পরম সমারোহে তারা ঠাকুরাণীর গৌরীদান করিয়াছিলেন; কিন্তু বালিকার জ্ঞানোদয় হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে ব্রহ্মচর্য্যের নির্ম্মম নিয়মের অধীন হইতে হইয়াছিল! বালিকার পক্ষে একাদশী ব্রতের কঠোর নিয়ম পরিপালন করা সহজ নহে; রাণী ভবানীকে তাহার জন্য মর্ম্মপীড়া ভোগ করিতে হইত। তিনি ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায়, মধ্যবঙ্গেও একাদশী ব্রতকে সহজসাধ্য করিবার আশায়, পণ্ডিতসমাজের ব্যবস্থা সংগ্রহের আয়োজন করিয়াছিলেন। এ কালের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ দীর্ঘাতিদীর্ঘ উপাধিলাভ করিতেছেন, অনেকেই কমলার কৃপায় মর্ম্মরখচিত হর্ম্ম্যতলে বাস করিয়া অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি পঞ্চযজ্ঞ সাধন করিয়া, হিন্দু সমাজের পূজার পাত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। সে কালের ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের এরূপ সাংসারিক সৌভাগ্যের মুখদর্শন করিবার উপায় ছিল না। কিন্তু তাঁহাদের বিদ্যা ছিল, বুদ্ধি ছিল, উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত উন্নত জীবনে নির্ভীক স্বাধীন সত্যানুরাগ ও তেজস্বিতা ছিল। রাণী ভবানী অর্দ্ধবঙ্গাধিকারিণী প্রাতঃস্মরণীয়া দেবী হইয়াও, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে ইচ্ছানুসারে পরিচালিত করিতে সক্ষম হন নাই;—তাঁহারা স্মার্ত্তশিরোমণির বহুকালপ্রচলিত দেশাচারের সংস্কার করিতে সম্মতিদান করিলেন না!

এই সময়েই বিধবাবিবাহের প্রস্তাব প্রথমে উত্থাপিত হয়। বর্ত্তমান যুগের প্রাতঃস্মরণীয় পূজ্যপাদ স্বনামখ্যাত বিদ্যাসাগর মহাশয় যাবজ্জীবন যে সামাজিক মহাসমরে লিপ্ত হইয়া বীরের ন্যায় আত্মমতের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, সে কালের এক জন বাঙ্গালী জমিদার সর্ব্বপ্রথমে সেই সামাজিক মহাসমরের ঘোষণা করেন।

"বিক্রমপুর ও নবদ্বীপ প্রদেশের ভদ্রসমাজে অদ্যাপি এই প্রবাদ চলিয়া

আসিতেছে যে, বিক্রমপুরবাসী প্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভ, স্বীয় তরুণবয়স্কা কন্যার বৈধব্যযন্ত্রণাদর্শনে, যৎপরোনাস্তি ব্যথিতহৃদয় হইয়া, বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন।" *

বলা বাহুল্য যে, রাজা রাজবল্লভের এই চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। কিন্তু কি জন্য, কাহার দোষে তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইল না, "ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে" তাহার জনশ্রুতি লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আমরা প্রসঙ্গক্রমে উক্ত জনশ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"বিধবাবিবাহ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ নহে, ইহার ব্যবস্থা পূর্ব্ব পশ্চিম নানা অঞ্চলের পণ্ডিতগণের নিকট সংগ্রহ করিয়া, নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থার জন্য, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সন্নিধানে কতিপয় পণ্ডিত প্রেরণ করেন। রাজবল্লভ তৎকালে ঢাকার নবাব ও প্রভূতক্ষমতাশালী রাজপুরুষ ছিলেন। সুতরাং তিনি মনে করিয়াছিলেন, 'যখন অন্য অন্য অঞ্চলের পণ্ডিতদিগের নিকট অনুকূল ব্যবস্থা পাইয়াছি, তখন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে অনুরোধ করিলে, অনায়াসেই নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতগণেরও নিকট ঐরূপ ব্যবস্থা পাইব।' তাঁহার প্রেরিত পণ্ডিতেরা রাজবাটীতে উপনীত হইলে, কৃষ্ণচন্দ্র অতীব আদরের সহিত তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন, এবং তাঁহাদের প্রভুর অভীষ্টসাধনে যথাসাধ্য যত্ন করিতে অঙ্গীকৃত হইলেন। তদনন্তর সভাস্থ ও নবদ্বীপস্থ প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণকে গোপনে রাজবল্লভের প্রেরিত ব্যবস্থা দেখাইলেন। তাঁহারা ইহা পাঠকরণান্তর 'এ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ শাস্ত্রসম্মত' কহিলেন। ইহা শ্রবণমাত্র কৃষ্ণচন্দ্র নিরতিশয় ঈর্ষ্যাদগ্ধচিত্ত হইয়া বলিলেন, 'এ ব্যবস্থা শাস্ত্রবিরুদ্ধ না হইলেও ব্যবহারবিরুদ্ধ বলিয়া রাজবল্লভকে নিরস্ত করিতে হইবে। এক জন বৈদ্যজাতীয় যে এই চির-অপ্রচলিত ব্যবহার প্রচলিত করিয়া যাইবেন, ইহা কোন মতেই সহনীয় নহে। কিন্তু, এক্ষণে রাজবল্লভের যেরূপ প্রভাব, তাহাতে আমি তাঁহাকে কোন মতেই বিরক্ত করিতে পারি না। অতএব তাঁহার সন্তোষার্থ আমি আপনাদিগকে এই ব্যবস্থায় স্বাক্ষর করিবার নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি অনুরোধ করিব, এবং আপনারা অসম্মত হইলে আপনাদের প্রতি তাড়নাও করিব। আপনারা এই কহিবেন যে, মহারাজ বা কাহারও অনুরোধে আমরা এরূপ ব্যবস্থা দিয়া পাপগ্রস্ত হইতে পারিব না'।"

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কিন্তু পণ্ডিতগণকে করতলগত করিতে পারিলেন না।

* ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত।

তখন স্বনামখ্যাত গোপাল ভাঁড় কৌশলে কার্য্যোদ্ধার করিবার জন্য বিক্রমপুরাগত পণ্ডিতবর্গের নৌকায় তাঁহাদের আহার্য্য দ্রব্য বহন করিতে লাগিলেন। পণ্ডিতেরা সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন যে, আহার্য্য মধ্যে একটি গোবৎসও আনীত হইয়াছে। জিজ্ঞাসায় গোপাল ভাঁড় বলিলেন যে, গোমাংসভক্ষণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে, অতএব ইহাও ভোজন করিতে হইবে। তখন পণ্ডিতগণ পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া স্বভাবসুলভ সংস্কারবশতঃ বলিয়া উঠিলেন—'শাস্ত্রসম্মত হউক, ব্যবহারবিরুদ্ধ কার্য্য কিরূপে সম্পাদন করিব ?' গোপাল অবসর পাইয়া বলিয়া উঠিলেন,—'তবে আর বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিতে আসিয়াছেন কেন ? তাহাও ত ব্যবহারবিরুদ্ধ !'

অতঃপর বিক্রমপুরাগত পণ্ডিতমণ্ডলী নবদ্বীপে অবস্থান করা নিরর্থক ভাবিয়া রজনীযোগে পলায়ন করায় বিধবাবিবাহের আন্দোলন এইখানেই পরিসমাপ্ত হইল।

ইহা অবশ্যই জনশ্রুতিমাত্র। কিন্তু এই জনশ্রুতিতে সেকালের পণ্ডিতসমাজের ও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের স্বভাবের যেরূপ পরিচয় রহিয়া গিয়াছে, তাহা সবিশেষ শিক্ষাপ্রদ। সে কালের পণ্ডিতমণ্ডলীর ন্যায় পণ্ডিত এখন কোথায় ? কিন্তু সেকালের কৃষ্ণচন্দ্রের ন্যায় জমিদারের যে একালেও অভাব হয় নাই, স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিধবাবিবাহ বর্ত্তমান যুগের রাজবিধির কল্যাণে বৈধবিবাহমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, কিন্তু ব্যবহারবিরুদ্ধ বলিয়া আজিও ইহা হিন্দুসমাজে স্থান লাভ করিতে পারে নাই।

এ কালের বিধবাদিগের দুঃখের অবধি নাই ;—তাহার প্রধান কারণ এই যে, কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যও তাহারা পরমুখাপেক্ষিণী হতভাগিনীর ন্যায় কত তাড়না সহ্য করিতে বাধ্য হয় ! জীবিকার্জ্জনের উপায় না থাকায় এ কালের নিরাশ্রয়া বিধবাদিগকে দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। সে কালে এ বিষয়ে কিয়ৎপরিমাণে সুবিধা ছিল। দেশে প্রচুর পরিমাণে কার্পাস উৎপন্ন হইত ; বিধবাগণ তাহা হইতে সূত্র প্রস্তুত করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইত। এ দেশের তন্তুবায়গণ ব্যবসায়ান্তর অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে ; কার্পাসের কথা এখন অভিধানে অধ্যয়ন করিতে হইতেছে ; সুতরাং পল্লীরমণীগণের পক্ষে শ্রমলব্ধ অর্থোপার্জ্জনের সর্ব্বপ্রধান পথ অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

রাণী ভবানী জীবহিতকামনায় নানারূপ পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। হতভাগিনী বিধবাদের ভরণপোষণের জন্যও গঙ্গাতীরে আশ্রয়স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার আশ্রয়ে বহুসংখ্যক বিধবা গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্ত হইত।

এই সময়ে রাজসাহী রাজ্যে কার্পাস ও পট্টবস্ত্রের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। ইংরাজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ বণিকগণ বাঙ্গলা দেশের নানাস্থান হইতে কার্পাস ও পট্টবস্ত্র ক্রয় করিয়া ইউরোপে বিক্রয় করিতেন, এবং যথাকালে বস্ত্র ক্রয় করিতে সক্ষম হইবেন বলিয়া তন্তুবায়গণকে 'দাদন' অর্থাৎ অগ্রিম মূল্য প্রদান করিতেন। ইহাতে যাহাদের কিছুমাত্র মূলধন ছিল না, তাহারাও দাদনের কৃপায় বস্ত্রবয়নে অগ্রসর হইয়াছিল। এই সকল বস্ত্রের এক একটি আড়ং অর্থাৎ বিক্রয়স্থান নির্দিষ্ট ছিল ; তন্তুবায়গণ তথায় বিক্রয়ার্থ বস্ত্র আনয়ন করিত। রাজসাহী রাজ্যে এইরূপ বহুসংখ্যক আড়ং ছিল ;—ইংরাজেরা লিখিয়া গিয়াছেন যে, প্রত্যেক আড়ং হইতেই তাঁহারা বৎসরে ১৪৮১০০ খণ্ড বস্ত্র ক্রয় করিতে পারিতেন। রাজপুরুষেরা বলেন যে,—রাণী ভবানীর রাজ্যে বিংশতি লক্ষ লোকের বসতি ছিল। যে রাজ্যে বিংশতিলক্ষ লোকের পরিধেয় প্রস্তুত হইয়া লক্ষ লক্ষ বস্ত্র ইউরোপীয় বণিকের নিকট বিক্রীত হইত, সে রাজ্যে প্রজার লক্ষ্মীশ্রী কিরূপ ছিল ? সে রামও নাই—সে অযোধ্যাও নাই ; এখন রাজসাহীতে বিলাতী কাপড়েরই একাধিপত্য !

রাণী ভবানীর শাসনসময়ের শেষদশায়, দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের তিরোধানের সূত্রপাত হয়। ইংরাজেরা পরাক্রান্ত হইয়া অল্পমূল্যে ক্রয় ও বহুমূল্যে বিক্রয় করিয়া কারবারে লাভবান হইবার আশায় দেশের লোকের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করায়, মীরকাশিমের সময়ে যুদ্ধানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। মীরকাশিমের পরাজয়ে ইংরাজেরাই সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন, সুতরাং তাঁহাদের কর্ম্মচারিবর্গ কোম্পানীদত্ত নির্দ্দিষ্ট বেতনে সন্তুষ্ট না হইয়া, গোপনে ও প্রকাশ্যে বাণিজ্যব্যাপারে অর্থোপার্জ্জনে লিপ্ত হইতে লাগিলেন। যাঁহারা রক্ষক, তাঁহারাই ভক্ষক হইয়া উঠিলেন ;—বিদেশীয় বণিকসমিতির অর্থপিপাসা শান্ত করিবার জন্য দেশের লোকের শিল্পবাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিল ; লোকে ক্রমে ক্রমে একমাত্র কৃষিকার্য্যের উপরেই একান্ত নির্ভর করিতে বাধ্য হইল।

১১৭৭ সালের মন্বন্তরে বাঙ্গালার যে সর্ব্বনাশ সংসাধিত হইয়াছিল, ঐতি-

হাসিক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সম্প্রতি স্তর উইলিয়ম হণ্টার প্রণীত বঙ্গবিবরণীর সমালোচনায় ইহাকেই তাহার একতম কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। *

কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে রাজসাহী প্রদেশে নানাবিধ চাউল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত; তদ্ভিন্ন স্থানে স্থানে নীল, তামাক, খর্জ্জূরী শর্করা ইত্যাদিরও সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। বাঙ্গালীরা এই সকল শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্য লইয়া সমুদ্রপথে নানা দেশে বাণিজ্য করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিত। একবার ইংরাজেরা দেশীয় বণিকৃগণের বাণিজ্যপোত লুণ্ঠন করায়, নবাব আলিবর্দ্দীর আজ্ঞায় তাঁহাদিগকে দ্বাদশ লক্ষ মুদ্রা অর্থদণ্ড প্রদান করিতে হইয়াছিল। † ইংরাজেরা সর্ব্বেসর্ব্বা হওয়ায় তাঁহাদিগকে আর শাসন করিবার কেহ রহিল না; অগত্যা বাঙ্গালীর বহির্বাণিজ্য দিন দিন অবসন্ন হইতে লাগিল!

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ;—মন্বন্তর। §

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইব বিলাতে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে,—"আমরা আরও কিছুদিন দেশীয় শাসনপ্রথার পদানত থাকিয়া, স্বেচ্ছাচারী শাসনকর্তৃগণের লুণ্ঠন ও অপমান সহ্য করিয়া, সামান্য বণিক্-সমিতির মতই নীরবে ভারতবর্ষে অবস্থান করিব, অথবা এখন হইতেই তরবারি হস্তে কোম্পানীর

* The appalling blunders of the first administrators, the ruin of the old aristocracy of Bengal, the ruin of internal trade under a system pursued for the profit of the Company's servants and gamastahs, and desertion of Villages and fields under the misrule of the years immediately preceding the Famine, all these were important and accelerating causes which have been darkly hinted at but not fully told by the historian of the Famine of 1770.—R. C. Dutt Eqr. C. S., Professor of Indian History, University college, London. (Quoted from 'India' 25 March, (1898).

† Long's Selections from the Records of the Government of India, Vol. I. Record No. 46.

§ এই পরিচ্ছেদের অধিকাশ বিষয় ইতিপূর্ব্বে 'মন্বন্তর' শীর্ষক একটি পৃথক প্রবন্ধে 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইয়াছে; সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজনবোধে, ইহাতে কেবল প্রসঙ্গক্রমে মন্বন্তরের উল্লেখমাত্রই রহিল।

ক্ষমতা ও রাজ্যরক্ষায় নিযুক্ত হইব,—ইহার কোন্ পথ কোম্পানীর পক্ষে কল্যাণকর, তাহার নির্ণয় করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। পরিণামফল যাহাই হউক, একবার যখন শত্রুতাসাধন করিয়া এত দূর অগ্রসর হইয়াছি, তখন প্রত্যেক যুদ্ধে, প্রত্যেক গুপ্তমন্ত্রণায়, কোম্পানীর অধিকার সঙ্কটময় হইয়া উঠিতেছে। ইহার গতিরোধ করিতে হইলে, কোম্পানীর শাসন সুদৃঢ়রূপে সংস্থাপন করা আবশ্যক, এবং আমাদিগের বিবেচনায় তাহাই যুক্তিযুক্ত।" *

লর্ড ক্লাইব এইরূপ ভণিতা করিয়া লিখিলেন,—"নবাবের সহিত কোম্পানীর কর্ম্মচারিবর্গের সর্ব্বদাই যে সকল কলহ বিবাদ উপস্থিত হইতেছে, এবং যে সকল অত্যাচার উৎপীড়নের কথা পুনঃ পুনঃ কর্ণগোচর হইতেছে, তাহাতে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার 'দেওয়ানী সনন্দ' গ্রহণ করা ভিন্ন সে সকল অসুবিধার মূলোচ্ছেদ করিবার উপায়ান্তর নাই! দিল্লীশ্বরকে বাহুবলে সিংহাসনে সংস্থাপন করায়, তিনি সিংহাসনরক্ষার আশায় কৃতজ্ঞচিত্তে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগকে 'দেওয়ানী সনন্দ' প্রদান করিতে চাহিতেছেন। দেওয়ানী আর কিছুই নহে,—প্রজার নিকট রাজকর সংগ্রহ করিয়া নবাব নাজিমের ব্যয় সংকুলনার্থ যাহা প্রয়োজন, তদ্ভিন্ন অবশিষ্ট রাজস্ব দিল্লীশ্বরকে পাঠাইয়া দিতে হইবে।" †

বিলাতের কোর্ট অব ডিরেক্টারের সদস্যগণ বহুদূরে,—ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা কিছুই জানেন না; তথাপি তাঁহারা শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সম্মত ছিলেন না; বাণিজ্যরক্ষাই তাঁহাদিগের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য। তাঁহারা ক্লাইবের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেও স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, "দেশশাসন ও বিচারকার্য্যে যেন লিপ্ত হইতে না হয়।" ‡

এ দেশের ইংরাজেরা সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। লর্ড ক্লাইব 'পুণ্যাহ' করিয়া প্রকারান্তরে সর্ব্বময় শাসনকর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। ইহাতে কোম্পানীর বাণিজ্যব্যাপারের দিকে কর্ম্মচারিবর্গের আর সেরূপ মনোযোগ রহিল না; তাঁহারা রাজ্যেশ্বর হইয়া এক একটি ক্ষুদ্র নবাব হইয়া উঠিলেন। বর্ষশেষে বিলাতে আয় ব্যয়ের বিবরণী প্রেরণ করিবার সময়ে ক্লাইবকে স্বীকার করিতে হইল যে, কোম্পানী দেওয়ানী লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি লিখি-

* Clive's letter to the Court of Directors.

† Long's Selections, Record No. 833.

‡ Ditto—Record No. 861.

লেন,—"জমিদারবর্গ রাজস্বদান না করিয়া তাহা আত্মসাৎ করিয়া থাকেন; ইহার গতিরোধ না করিলে দেওয়ানীর আয়ে ব্যয় সংকুলন হইবে না, জমিদারেরাও স্বস্বপ্রধান হইয়া উঠিবেন!" *

ক্লাইব জমিদারদলকে করসংগ্রাহক রাজকর্ম্মচারী বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহাদের স্থলে নূতন করসংগ্রাহক নিয়োগ করিবার কল্পনা করিতেছিলেন। এমন সময়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করায় তিনি স্বহস্তে জমিদারগণকে পদচ্যুত করিতে না পারিয়া স্বদেশ হইতে লিখিয়া পাঠাইলেন,—"বাঙ্গলা দেশে কিরূপ আকারে রাজ্যতন্ত্র গঠিত হইবে, তাহাই সর্ব্বপ্রথম কথা। দেওয়ানী-সনন্দ-বলে কোম্পানীই দেশের রাজা হইয়াছেন, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছে। নবাবের আর সে ক্ষমতা নাই,—তিনি এখন ক্ষমতা ও উপাধির পুরাতন ছায়াতলে বসিয়া বসিয়া কায়ক্লেশে দিনপাত করিতেছেন। তথাপি আমরা যে এই ছায়াকে মান্য করি, কিছুদিনের জন্য এইরূপ ভাব রক্ষা করিয়া চলাই আমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে।" †

এই রাজনীতির অনুসরণ করিতে গিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ "দ্বিত্ব-শাসন" ‡ সংস্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন। যিনি নামতঃ শাসনকর্ত্তা, কার্য্যে তাঁহার কোনই ক্ষমতা রহিল না; যাঁহারা কার্য্যতঃ প্রভু, তাঁহাদের কোনরূপ শাসন-দায়িত্ব সংস্থাপিত হইল না! বাঙ্গালা দেশ ক্রমেই মহাবিপ্লবে বিপর্য্যস্ত হইতে লাগিল।

প্রজাপালন সর্ব্বপ্রধান রাজধর্ম্ম,—তাহা একেবারে বিলুপ্ত হইল। ইংরাজেরা প্রজার উপর উৎপীড়ন করিলে, এবং তাহার কথা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণীকৃত হইলেও, নবাব বা জমিদারগণ তাহার নিবারণ করিতে পারিলেন না। ইংরাজ বণিক ও তাঁহাদের অগণ্য কর্ম্মচারিবর্গ যথেচ্ছাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। এক জন বিখ্যাত ইংরাজ ইতিহাসলেখক এই সকল কথার উল্লেখ করিবার সময়ে লিখিয়া গিয়াছেন যে,—"প্রজার একমাত্র অপরাধ এই যে, তাহারা গোমস্তাবর্গের অর্থলালসা পূর্ণ করিতে পারিল না; সেই অপরাধে ইংরাজের গোমস্তাবর্গ এরূপ উচ্ছৃঙ্খলভাবে প্রজাপীড়ন আরম্ভ করিয়া দিল যে, নবাব ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণকে ভয়প্রদর্শনে বশীভূত করিয়া গোমস্তারাই

* Long's Selections, Record No. 885.

* Clive's letter to the Select Committee 1776.

† Double Government.

বিচারক সাজিয়া উৎপীড়িত প্রজাপুঞ্জকে দণ্ডদান করিতে লাগিল!" * ইংরাজ-ইতিহাসলেখক কেবল দেশীয় গোমস্তাগণের উপরেই সকল দোষ নিক্ষেপ করিয়াছেন, কিন্তু ডিরেক্টারগণ তজ্জন্য ইংরাজ কর্ম্মচারিগণকেও অপরাধী করিয়া গিয়াছেন। †

শ্রমলব্ধ ধনধান্য নিরুদ্বেগে উপভোগ করিতে না পারিলে শ্রমে প্রবৃত্তি জন্মে না। জনসমাজের ধনবল বর্দ্ধিত করিতে হইলে শ্রমে প্রবৃত্তি দিতে হয়, তজ্জন্য শ্রমলব্ধ ধনভোগের ব্যবস্থা করিতে হয়, অপহারককে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া শ্রমের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়। অরাজকতায় রাজশাসন শিথিল হইয়া দেশের লোকের দুর্দ্দশার অবধি রহিল না। তাহারা প্রধান প্রধান শিল্প বাণিজ্যের আড়ং হইতে দূরদূরান্তরে পলায়ন করিতে লাগিল; অনেকে শিল্প বাণিজ্য পরিহার করিয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া নির্জ্জনে মাথা লুকাইয়া দিনপাত করিতে লাগিল; বাঙ্গালীর গৃহস্থালীর গৌরব তিরোহিত হইয়া গেল। কৃষকপল্লীতে আর শস্যসঞ্চয়ের আড়ম্বর রহিল না; মহাজনদিগের পণ্যশালায় আর শস্যভার বাহিত হইতে পারিল না। লোকে কোনরূপে কায়ক্লেশে সশঙ্কচিত্তে দিনাতিপাত করিতে লাগিল।

বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম এবং চব্বিশ-পরগণার পুরাতন জমিদারগণকে তাড়িত করিয়া কোম্পানী বাহাদুর যে নূতন জমিদারী লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে ইংরাজের "খাসতহশিল" আরম্ভ হইল; অন্যান্য স্থান মহম্মদ রেজা-খাঁর নায়েব-দেওয়ানীর অধীন রহিল। জেলায় জেলায় রাজস্ববিভাগের কার্য্য-

* The Government of the country, as far as regarded the protection of the people, was dissolved. Neither the Nabob nor his officers dared to exert any authority against the English, of whatsoever injustice or oppression they might be guilty. The gomastas or Indian agents employed by the company's servants, not only practised unbounded tyranny, but overawing the Nabob and his highest officers, converted the tribunals of justice themselves into Instrument of cruelty, making them inflict punishment upon the very wretches whom they oppressed, and whose only crime was their not submitting with sufficient willingness to the insolent rapacity of those subordinate tyrants.—Mill's History of British India, vol. III, 435—436.

† Letter from the Court of Directors, 28 August, 1771.

পরিদর্শনার্থ ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দ হইতে কয়েক জন ইংরাজ "সুপারভাইজার" নিযুক্ত হইয়াছিলেন; তাঁহারা দেশের রীতি, নীতি, অবস্থা ও ইতিহাসসঙ্কলনের সঙ্গে সঙ্গে রাজস্বসংগ্রহের পরিদর্শনভার প্রাপ্ত হইলেন! *

যাঁহারা রাষ্ট্রবিপ্লবের মূল, তাঁহাদের সকলকেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল;—মীরজাফর, মীরণ, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, সকলেই নানা ক্লেশে জীবন বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; প্রজাপুঞ্জ এতদিন একরূপ নিরুদ্বেগেই কালাতিপাত করিতেছিল; কিন্তু তাহাদেরও প্রায়শ্চিত্তকাল সমুপস্থিত হইল!

বাঙ্গালীর অন্নগত প্রাণ। সাতাত্তরের 'মন্বন্তরে' সেই অন্ন দুর্ল্লভ হইয়া উঠিল; লোকে দলে দলে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। প্রাচীন জমিদারবংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে লাগিল। পথঘাট নদীতীর শবদেহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। দুর্ভিক্ষশেষে স্থির হইল যে, 'মন্বন্তরে' বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ হইয়াছে,—হলকর্ষণক্ষম কৃষক জীবিত নাই, বীজধান্য ও গোবৎসের অভাব হইয়াছে, শস্যক্ষেত্র তৃণকণ্টকে পূর্ণ হইয়াছে, গ্রাম নগর বিজন বনে পরিণত হইয়াছে!

দীনপালিনী রাণী ভবানী এই দুর্দ্দিনে রাজভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া প্রজারক্ষার আয়োজন করিয়াছিলেন। বহু কোটী লোক তাঁহার কৃপায় অন্নজল লাভ করিয়াছিল; কিন্তু সকল শক্তিরই সীমা আছে। মন্বন্তরের সহিত সংগ্রাম করিতে গিয়া রাণী ভবানী আত্মশক্তির সীমা দর্শন করিলেন। রাজকোষ শূন্য হইয়া গেল, তথাপি প্রজারক্ষার উপায় হইল না। দুর্ভিক্ষাবসানে রাজসাহীর সম্পন্ন জনপদ শ্মশান হইয়া গেল। অতুল-ঐশ্বর্য্যশালিনী রাণী ভবানী শূন্যহস্তে ঊর্দ্ধনেত্রে দেশের দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া ভগ্নহৃদয়ে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ;—গঙ্গাবাস।

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের নাম চিরস্মরণীয় হইয়াছে। তাঁহার শাসনকাহিনী অবলম্বন করিয়া কত পুস্তক রচিত হইয়াছে; তাঁহার অত্যাচারকাহিনীর বর্ণনা করিয়া কত বাগ্মী যশস্বী হইয়াছেন; তথাপি এখনও তাঁহার কথা লইয়া লেখকসমাজে কত বিবাদ বিসম্বাদ চলিতেছে! তাঁহার রোহিলাধ্বংসের, চেৎসিংহ-নির্য্যাতনের, বেগম-লুণ্ঠনের বা নন্দকুমার-হত্যার কাহিনীর সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে বর্ত্তমান গ্রন্থের কোনও সংস্রব নাই। তাঁহার নিকট রাণী

* Annals of Rural Bengal.

ভবানী কিরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাই একমাত্র আলোচ্য বিষয়। কারণ, হেষ্টিংসের ব্যবহারে মর্ম্মপীড়িত হইয়াই প্রতিভাশালিনী অর্দ্ধবঙ্গাধিকারিণী রাণী ভবানী পুত্রহস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া, স্বয়ং গঙ্গাবাস আরম্ভ করেন।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রেল, ওয়ারেণ হেষ্টিংস ভারতবর্ষের শাসনভার প্রাপ্ত হন। তিনি নূতন লোক নহেন; যৌবনে কাশিমবাজারের ইংরাজ কুঠীর মোহরের-রূপে এ দেশে আসিয়া, নানা সময়ে নানাবিধ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, অবশেষে ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। লোকে তাঁহাকে চিনিত, তিনিও এ দেশের প্রধান প্রধান রাজবংশের অধীশ্বরকে জানিতেন। বিলাতের লোকে ভাবিত, তাঁহার মত ভারতজ্ঞ লোক আর নাই; সেই পরিচয়ে তিনি সর্ব্বোচ্চ রাজপদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু তখন তাঁহার এমন দৈন্যদশা যে, ভারতবর্ষে আসিবার সময়ে ব্যয়-সংকুলনার্থ তাঁহাকে ঋণ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। *

ভারতবর্ষে উপনীত হইয়া, ৪ঠা মে হইতে ক্লাইবের শাসননীতি প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য, ওয়ারেণ হেষ্টিংস কোম্পানীর খাস শাসনের সূচনা করিলেন। এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার সময়ে, কোম্পানী বাহাদুরকে সাক্ষাৎভাবে জমিদারদিগের সংস্রবে আসিতে হইল।

ইংরাজেরা এ দেশের শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার সময়ে জমিদারদিগের প্রকৃত মর্য্যাদা নিরূপণ করিতে পারেন নাই; তাঁহারা জমিদারগণকে করসংগ্রহকারী রাজকর্ম্মচারিমাত্রই মনে করিয়াছিলেন। উত্তরকালে এ বিষয়ে অনেক বাদানুবাদের সূত্রপাত হইয়াছিল; কিন্তু হেষ্টিংস যখন প্রত্যক্ষভাবে কোম্পানীর শাসন প্রচলিত করেন, তৎকালে এ বিষয়ে কোনরূপ মতদ্বৈধ উপস্থিত হয় নাই। সকলেই বুঝিয়াছিলেন যে, রাজস্ব-সংগ্রহ করাই কোম্পানীর সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য; তজ্জন্য পুরাতন জমিদারগণকে পদচ্যুত করিতে কাহারও কোনরূপ দ্বিধাবোধ হয় নাই।

কোম্পানীর "খাস তহশিল" প্রবর্ত্তিত করিয়া হেষ্টিংস রাজস্বসংগ্রহের সুব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইলেন। মিডল্টন, ডেকার, লরেল ও গ্রাহাম নামক চারি জন সদস্য লইয়া, হেষ্টিংস একটি সমিতির গঠন করিলেন; ইহারই নাম "সরকিট কমিটী"। পরগণায় পরগণায় পরিভ্রমণ করিয়া পাঁচ

* Rulers of India—Hastings.

বৎসরের জন্য সমগ্র জমিদারীর করসংগ্রাহক নিয়োগ করিবার জন্যই এই কমিটীর উৎপত্তি হয়। সেকালের লোকে ইংরাজি জানিত না; তাহারা ইংরাজি শব্দাদি সহজে স্মরণ রাখিবার জন্য উচ্চারণবিকৃতিবলে দেশীয় ভাষায় তাহার প্রতিশব্দ গঠন করিয়া লইত। অদ্যাপি এইরূপ অনেক অদ্ভুত শব্দ-গঠন-কৌশলের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই অভ্যাসদোষে সেকালে লোকে "সুপারভাইজারের" নাম করিয়াছিল, "শূয়োর ভাই"। এক্ষণে "সুরকিট" সংস্থাপিত হওয়ায় তাহার নাম রাখিল "ছরকট"। এই সুরকিট কমিটী যেরূপে রাজস্বনির্দ্ধারণ কার্য্য সুসম্পন্ন করেন, তাহাতে অনেক "ছরকট" সংঘটিত হইয়াছিল। ইতিহাস পড়িয়া মনে হয় যে, লোকে ব্যঙ্গ করিয়া ইহার যেরূপ নামকরণ করিয়াছিল, কার্য্যতঃ তাহা একেবারে নিরর্থক হয় নাই।

কমিটী প্রথমে নদীয়ার রাজেন্দ্র বাহাদুরকেই ধরিয়া বসিলেন। তাঁহারা কৃষ্ণনগরাধিপতির রাজ্যের যে পরিমাণ রাজস্ব নির্ণয় করিয়াছিলেন, তাহাতে সম্মত না হইলে, রাজ্য অন্যের হস্তে সমর্পিত হইবে, এই সংবাদে কৃষ্ণচন্দ্র একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। পলাশির যুদ্ধাবসানে কামান ও রাজেন্দ্র বাহাদুর উপাধি লাভ করিয়া যে কৃষ্ণচন্দ্র দুই হাত তুলিয়া ইংরাজকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, তিনি এখন সেই দুইখানি হাতে কৃতাঞ্জলি হইয়াও কমিটীর মতিপরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইলেন না। অবশেষে নিরুপায় হইয়া অগত্যা কমিটীর প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন, এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার শিবচন্দ্রের নামে ১৭৭৩ হইতে ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চারি বৎসর মেয়াদে, জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন। *

কমিটীর সদস্যগণ নদীয়া হইতে কাশিমবাজার ও কাশিমবাজার হইতে রাজসাহীতে উপনীত হইলেন। রাণী ভবানী তাঁহাদের আদর ও অভ্যর্থনার ক্রটি করিলেন না; কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফলোদয় হইল না। যে রাজ্যে রাণী ভবানী জীবন-মরণের বিচারকর্ত্রী অন্নদাত্রী কল্যাণবিধাত্রী মহাদেবী, সেই রাজ্যের বুকের উপর কোম্পানীর ঢোল ভীমকলরবে ঘোষণা করিল, সে রাজ্য আর রাণী ভবানীর নহে; যে অধিক রাজকর দিতে অগ্রসর হইবে, রাজমুকুট তাহারই।

অভিমানিনী রাণী ভবানীর রাজ্যাভিমান বিদূরিত হইল; তেজস্বিনী বীর-রমণীকে নানা উপায়ে হেষ্টিংসের তুষ্টিসম্পাদন করিয়া রাজ্যরক্ষার্থ

* ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত।

কমিটীর প্রস্তাবেই সম্মত হইতে হইল। কিরূপে ইহা সুসম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা হেষ্টিংসের স্বহস্তলিখিত সমসাময়িক কার্য্যবিবরণী হইতে অনুবাদিত হইল,—

"কৃষ্ণনগর প্রদেশের রাজস্বনিরূপণের সময়ে যে যে নিয়মে কার্য্য সম্পাদন করা হইয়াছিল, রাজসাহী ও হুজুরি জেলাতেও তাহারই অনুসরণ করা হইল। রাজসাহী রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন পরগণা কে কত অধিক জমায় বন্দোবস্ত করিয়া লইতে চাহে, তাহা জানিবার জন্য প্রকাশ্য ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া উপযুক্ত সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা হইয়াছিল। পশ্চিমাঞ্চলের পরগণাগুলি অন্য লোকে যত টাকায় বন্দোবস্ত করিয়া লইতে চাহে, তদপেক্ষা রাণী ভবানীর প্রস্তাবানুযায়ী বন্দোবস্ত করাই লাভজনক বোধ হইল। সুতরাং তাঁহার সঙ্গেই পাঁচ বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। তাঁহার ধনবল আছে, বিশ্বাসপাত্রী বলিয়া লোকসমাজে সুখ্যাতি আছে, চরিত্রগুণে তাঁহার কথায় আস্থা স্থাপন করিবারও কারণ আছে। তাঁহার সহিত বন্দোবস্ত করায় আরও বিশেষ সুবিধা এই যে,—তিনি কমিটীর নির্দ্দেশানুসারে বন্দোবস্তী মহালগুলি চৌদ্দ ভাগে বিভক্ত করিয়া যথাকালে রাজকর-পরিশোধের অঙ্গীকারে নিজের ও প্রজাবর্গের কবুলিয়ত দাখিল করিতে সম্মত হইয়াছেন। পূর্ব্বাঞ্চল সম্বন্ধে অন্য কেহ বন্দোবস্তের প্রস্তাব উপস্থিত না করায়, তাহাও রাণী ভবানীকেই বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। রাণী বহু বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া এ দেশের শাসন-কার্য্যে যেরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে অন্য লোকে তাঁহার [illegible] অধিক জমায় বন্দোবস্ত করিয়া লইতে সাহস পায় নাই। রাজসাহীর ন্যায় বহুবিস্তৃত সম্পন্ন রাজ্য হইতে যে পূর্ণমাত্রায় রাজস্ব সংগৃহীত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না। প্রাচীন রাজবংশের সহিত বন্দোবস্ত করায়, আমাদের রাজস্ব-সংগ্রহের ব্যয়বাহুল্যও হইবে না।" *

এই বন্দোবস্ত বাঙ্গলার জমিদারী সেরেস্তায় "পঞ্চসনা" বন্দোবস্ত নামে পরিচিত। ইহা সুসম্পন্ন হইলে কমিটীর সদস্য মিডল্‌টন্ সাহেবের উপর মাসে মাসে "কিস্তী কিস্তী" রাজসাহীর রাজস্ব-সংগ্রহের ভার নিক্ষিপ্ত হইল। রাণী ভবানী স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও, এই সময় হইতেই তাঁহার প্রজাপালন ও পুণ্যকীর্ত্তিসংস্থাপনের ক্ষমতা ও অর্থবল অবসন্ন হইয়া পড়িল। ইহাই রাণী ভবানীর অধঃপতনের মূলসূত্র।

হেষ্টিংসের শত্রুদল অনেক। তাঁহার শাসনসময়ের প্রায় প্রত্যেক কার্য্যের জন্যই তাঁহার নামের সঙ্গে বহু কলঙ্ক সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। রাণী ভবানীর সহিত তিনি এতদুপলক্ষে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা লইয়াও দুইটি কলঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছিল;—একটি উৎকোচগ্রহণ, অপরটি রাজ্যাপহরণ।

* Fifth Report.

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের শাসনসময়ের যে সকল সরকারী কার্য্য-বিবরণী সম্প্রতি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, * তাহার এক স্থানে লিখিত আছে,—

"The Governor's Banian stands foremost and distinguished by the enormous amount of his farms and contracts, to say nothing of the large sums standing in his name in the accounts of money received from the Rannies of Rajeshahy and Burdwan which have either been proved by the production of the original papers at the Board, or by witnesses upon oath ; our opinion of Mr. Hastings will not suffer us to think that a participation of profits with his servant would have been *repugnant to his principles*, to assert as he does that *it would have been opposite to his interest* seems too extravagant to deserve an answer." †

নাটোর রাজদপ্তরে রাণী ভবানীর শাসনসময়ের 'সুমার' বা হিসাবের কাগজপত্র এখন আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সুতরাং হেষ্টিংসের উৎকোচ-গ্রহণের অপবাদ সম্বন্ধে তাঁহার সহযোগিগণ যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার সত্যাসত্য নির্ণয় করা সহজ নহে। তবে ক্লেভারিং, মন্‌সন্‌ ও ফ্রান্সিস্‌ নামক সদস্যগণ হেষ্টিংসের শত্রু হইলেও উৎকোচগ্রাহী ছিলেন না ; তাঁহারা হেষ্টিংসের সমক্ষে কৌন্সিলের প্রকাণ্ড অধিবেশনে যে মন্তব্য-পত্র প্রদান করেন, তাহাতে উৎকোচগ্রহণের অভিযোগ সুস্পষ্ট লিখিত রহিয়াছে। এ দেশের জনশ্রুতিও হেষ্টিংসের অনুকূল নহে। কিন্তু আধুনিক ইতিহাসলেখকগণ এ সকল কথায় আস্থা স্থাপন না করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রন্থরচনা করিতেছেন।

সেকালে বাৎস্যগোত্রীয় চাঁদ রায় নামক জনৈক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বাহিরবন্দের জমিদার ছিলেন। চাঁদ রায়ের দশ আনা অংশে তাঁহার পুত্র রঘুনাথ উত্তরাধিকারী হইয়া রাণী সত্যবতী নাম্নী বিধবা পত্নী বর্ত্তমান রাখিয়া পরলোকগমন করেন। রাণী সত্যবতী বাহিরবন্দ, ভিতরবন্দ, গয়াবাড়ী, স্বরূপবাড়ী, আমবাড়ী, পাতিলাদহ, ইস্‌লামবাড়ী ও সুজানগর, এই আট পরগণার

* Selections from the Letters, Despatches and other State papers preserved in the Foreign Department of the Government of India 1772—1785, Edited by George W. Forrest B.A. In three volumes. Calcutta 1890.

† Minuts from General Clavering, Colonel Monson and Mr. Francis —25 January 1776, para 11.

অধিকারিণী ছিলেন ; কিন্তু নবাব-সরকারে এই সকল পরগণা রাণী ভবানীরই নামজারি ছিল। তিনি স্নেহপরবশ হইয়া রাণী সত্যবতীকে রাজ্যচ্যুত করেন নাই ; পরে সত্যবতীর অভাবে এই সমস্ত পরগণা রাণী ভবানীর রাজ্যভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। হেষ্টিংসের হুকুমে বাহিরবন্দ রাণী ভবানীর হস্তচ্যুত হইয়া গেল।

হেষ্টিংসের শত কলঙ্কের মধ্যে এই রাজ্যাপহরণও একটি সর্ব্বজনপরিচিত প্রধান কলঙ্ক। বাহিরবন্দ ও তাহার বিচিত্র কাহিনী নানা স্থানে নানা ভাবে বর্ণিত হইয়াছে ; বঙ্কিমচন্দ্রের "দেবী চৌধুরাণীর" কাহিনীও বাহিরবন্দের কাহিনী। আমরা "মুর্শিদাবাদ হিতৈষী"পত্রে বাহিরবন্দের যে সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছি, তাহাতে সমস্ত ঐতিহাসিক তত্ত্ব বর্ণিত রহিয়াছে। এ স্থলে তাহাই উদ্ধৃত হইল।

"বাহারবন্দ রঙ্গপুর জেলার একটি প্রসিদ্ধ পরগণা, কেবল রঙ্গপুর কেন, সমগ্র বঙ্গরাজ্যের মধ্যে এরূপ বিস্তৃত ও উর্ব্বরা পরগণা অতি অল্পই আছে বলিয়া বোধ হয়। ব্রহ্মপুত্র, ধরলা ও ত্রিস্রোতার সলিলসিক্ত হইয়া শ্যামল শস্যরাজিপরিপূর্ণ বাহারবন্দ বহুকাল হইতে বঙ্গদেশে স্বীয় নাম বিঘোষিত করিতেছে। মুসলমান রাজত্বের বহু পূর্ব্ব হইতে ইহার নাম শ্রুত হওয়া যায়। বাহারবন্দ বাঙ্গলা দেশে প্রবাদবাক্যের সহিত জড়িত। ইহার পুরাতত্ত্ব জানিতে হইলে, রঙ্গপুর দেশের কিঞ্চিৎ বিবরণ জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক, কারণ বাহারবন্দ রঙ্গপুরের অনেক অংশ অধিকার করিয়া আছে। রঙ্গপুর পূর্ব্বে প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল, প্রাগ্‌জ্যোতিষ কামরূপের নামান্তর। প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত রঙ্গপুর স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভগদত্ত কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে দুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বন করেন, এবং অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিহত হন। ভগদত্তের বংশীয়েরা অনেকদিন কামরূপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পর রঙ্গপুর প্রদেশে পৃথু নামে একজন পরাক্রান্ত রাজার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বোদা ও বৈকুণ্ঠপুরের মধ্যে তাঁহার রাজধানীর ভগ্নাবশেষ লক্ষিত হয়। তিনি কীচকগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া সরোবর-সলিলে জীবন বিসর্জ্জন করেন। পৃথু রাজার পরে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী সুপ্রসিদ্ধ পালবংশীয়গণের রাজত্বের কথা আমরা অবগত হই। দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানে পালবংশীয়দিগের অশেষ কীর্ত্তির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। রঙ্গপুর ও কামরূপ পর্য্যন্ত তাঁহাদের রাজ্যের বিস্তার ছিল। সর্ব্বপ্রথমে ধর্ম্মপালের নাম শ্রুত হয়। ধর্ম্মপালের পর গোপীচন্দ্র তাঁহার সিংহাসন অধিকার করেন। গোপীচন্দ্রের মাতা মীনাবতী ধর্ম্মপালের সৈন্যদিগকে পরাস্ত করায় ধর্ম্মপাল কোথায় অন্তর্হিত হন, তাহা কেহই জানিতে পারে নাই। গোপীচন্দ্র তৎপরে শূন্যসিংহাসনে আরোহণ করেন। বাহারবন্দের প্রধান স্থান উলিপুরের পূর্ব্বে ওয়ারী নামক স্থানে গোপীচন্দ্রের ভবনের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাইত। গোপীচন্দ্রের পুত্রের নাম ভবচন্দ্র, যে ভবচন্দ্র ও তাঁহার মন্ত্রী গবচন্দ্রের বুদ্ধিমত্তার কাহিনী

সমগ্র বাঙ্গলায় প্রচলিত, সেই ভবচন্দ্রই উক্ত গোপীচন্দ্রের পুত্র। ভবচন্দ্রের উত্তরাধিকারী হইতে পালবংশের অবসান হয়, তাহার পর কোচ প্রভৃতি জাতি কর্ত্তৃক রঙ্গপুর ও কামরূপ বারম্বার আক্রান্ত হয়। পালবংশের পর অন্য একটি বংশের উল্লেখ আছে; সেই বংশে নীলধ্বজ, চক্রধ্বজ ও নীলাম্বর নামে রাজা জন্মগ্রহণ করেন। নীলাম্বর গৌড়ের বাদসাহ হোসেন সার সময় মুসলমানগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হন। মুসলমানদিগের হস্ত হইতে কামরূপ ও রঙ্গপুর অঞ্চল কোচগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। কোচবংশের স্থাপয়িতার হাজোর হীরা ও জীরা নামে দুই কন্যা ছিল, হীরার গর্ভে বিশু ও জীরার গর্ভে শিশুর জন্ম হয়। বিশু কোচ-বিহার বংশের এবং শিশু জলপাইগুড়ি রাজবংশের আদিপুরুষ। বিশু স্বীয় পুত্র শুক্লধ্বজ ও নরনারায়ণকে আপনার রাজ্য বিভাগ করিয়া দেন। শুক্লধ্বজের পৌত্র পরীক্ষিত প্রথমে মুসলমানদিগের বশ্যতা স্বীকার করেন, খৃষ্টীয় ১৬০৩ অব্দে রাজস্ব অনাদায়ের জন্য পরীক্ষিতের রাজ্য মোগলগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। পরীক্ষিত অতি অল্পমাত্র ভূভাগের অধীশ্বর থাকেন, তাঁহার অবশিষ্ট রাজ্য ঢাকার মোগল শাসনকর্ত্তার অধীন হয়। এই অধিকৃত রাজ্য চারি সরকারে বিভক্ত হয়, এবং ১৬৬২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত মোগলদিগের অধীন থাকে, উক্ত চারি সরকারের মধ্যে বাঙ্গলাভূম একটি। বাহারবন্দ ও ভিতরবন্দ লইয়াই বাঙ্গলাভূম। খৃঃ ১৬৬২ অব্দে আরঙ্গজীবের প্রধান সেনাপতি মীরজুম্লা আসাম অধিকার করিতে গিয়া পরাজিত হইলে, উক্ত চারি সরকারের মধ্যে তিন সরকারের অধিকাংশ ভূভাগ মুসলমানদিগের হস্তচ্যুত হয়। কেবল সরকার বাঙ্গলাভূম তাঁহাদের অধীন থাকে। সুতরাং ১৬০৩ খৃঃ অব্দ হইতে বাহারবন্দ মুসলমান রাজত্বের অন্তর্ভুত হয়। বাঙ্গলা জয়ের সঙ্গে ইহা ইংরেজ অধিকারে প্রবেশ লাভ করে।

"মোগলগণ কর্ত্তৃক বাহারবন্দ অধিকৃত হইলে ইহা অন্যান্য পরগণার ন্যায় রাজস্ব আদায়ের জন্য জমিদারদিগের হস্তে অর্পিত হয়। তৎকালে জমিদারগণ রাজস্বসংগ্রাহকের কার্য্য করিতেন। বাহারবন্দ জমিদারগণের হস্তে অর্পিত হইলেও অনেক সময়ে ইহা জায়গীররূপে নির্দ্দিষ্ট হইত। চাঁদ রায় নামক এক ব্যক্তি ইহার প্রথম জমিদার বলিয়া উল্লিখিত হন। তাঁহার পর রঘুনাথ রায় বাহারবন্দের জমিদারী প্রাপ্ত হন। রঘুনাথের পর তাঁহার পত্নী পুণ্যশ্লোকা রাণী সত্যবতী বাহাবন্দের অধিকার লাভ করেন। রাণী সত্যবতীর অগণ্যকীর্ত্তি অদ্যাপি বাহারবন্দ অলঙ্কৃত করিতেছে। তাঁহার স্থাপিত দেবমন্দিরাদি আজিও তাঁহার পবিত্র নাম বিঘোষিত করিয়া থাকে। রাণী সত্যবতীর জীবনাবস্থায় বাহারবন্দ নাটোরাধিপ রাজা রামকান্তের হস্তে অর্পিত হয়। রামকান্তের পত্নী ভারতপ্রসিদ্ধা দীনপালিনী রাণী ভবানী সত্যবতীর ভগিনীতনয়া ছিলেন, সত্যবতী সংসার পরিত্যাগ করিয়া কাশীধামে গমন করায় স্বীয় ভগিনীপুত্রীকে বাহারবন্দ অর্পণ করিয়া যান। এই সময়ে বাহারবন্দ নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ মহাবৎ জঙ্গের আদেশে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা সৈয়দ আহাম্মদ খাঁ সালৎজঙ্গের নামে জায়গীররূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। কিন্তু সেরেস্তায় নাটোর-রাজের নামেই লিখিত থাকে। রাজা রামকান্তের মৃত্যুর পর রাণী ভবানী স্বীয় জামাতা রঘুনাথ রায়কে বাহারবন্দ প্রদান করেন। রঘুনাথের মৃত্যুর পর বাহারবন্দ পুনর্ব্বার নবাব

নজমউল্লা দৌলৎ সৈয়দ নজাবত আলি খাঁর নামে জায়গীররূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া মুর্শিদাবাদের অধীন হয়। কিন্তু রাণী ভবানীর সম্বন্ধ একেবারে দূর হয় নাই। রাজা গৌরীপ্রসাদ কিছু-কাল ইহার জমিদার নিযুক্ত হন, কিন্তু পুনর্ব্বার ইহা রাণী ভবানীর হস্তে আগমন করে। কোম্পানীর দেওয়ানী গ্রহণের পর বাঙ্গলা ১১৭৬ খৃঃ অব্দ হইতে ১১৭৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ঘন-শ্যাম সরকার নামে এক ব্যক্তি ইহার ইজারা লয়। ১১৭৯ সালে ইহা রঙ্গপুর কালেক্টরীর অন্তর্ভুত হয় ও সেই বৎসর বিষ্ণুচরণ নন্দী ইহার ইজারা লইয়া ১১৮০ পর্য্যন্ত নিজ অধি-কারে রাখে, পরে ১১৮১ অব্দে কান্ত বাবুর পুত্র লোকনাথকে ৮২, ৬৩৯ টাকায় চিরস্থায়ি-রূপে ইজারা দেওয়া হয়। আমরা ইতিপূর্ব্বে কান্ত বাবু শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইয়া আসিয়াছি যে, রাণী ভবানী বাহারবন্দের জমিদার ছিলেন। কিন্তু হেষ্টিংস সাহেব বলপূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে লইয়া উক্ত পরগণা বিষ্ণুচরণ ও লোকনাথকে প্রদান করেন। বিষ্ণুচরণ কান্ত বাবুর বেনামদার ও লোকনাথ তাঁহার পুত্র। মহারাজা নন্দকুমার কাউন্সিলে ইহার জন্য হেষ্টিংসের প্রতি দোষারোপ করেন, এবং কাউন্সিলের সভ্যেরা তজ্জন্য হেষ্টিংস সাহেবকে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত করিয়াছিলেন। লোকনাথকে চিরস্থায়িরূপে বাহারবন্দ প্রদান করায় ডিরেক্টরগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার হস্ত হইতে পুনর্ব্বার লইবার জন্য লিখিয়া পাঠান। কিন্তু হেষ্টিংস সে বিষয়ে কর্ণপাত করেন নাই। বাহারবন্দ এক্ষণে কাশীম্বাজার রাজবংশের সম্পত্তি। দানশীলা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়া ইহার অধিকারিণী। ইনি ইহার অগাধ আয় প্রতিনিয়ত পুণ্যকার্য্যে ব্যয়িত করিয়া বাহারবন্দকে দেশমধ্যে আরও স্মরণীয় করিতেছেন। এবং বাহারবন্দের পুরাতন নামের সহিত তাঁহার পবিত্র নাম মিশিয়া বঙ্গ-বাসীর হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার করিতেছে।" *

জনৈক লেখক লর্ড ক্লাইবের স্কন্ধে এই রাজ্যাপহরণের কলঙ্ক নিক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন, "রাণী সত্যবতীর স্বামী রঘুনাথ রায় বাঙ্গালা ১১৩০ সালে অভাব হন, তাহার পরে রাণী সত্যবতী জমিদারী প্রাপ্ত হন, এবং ১১৮৯ সাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। রাণী সত্যবতীর অভাব হইলে বাহিরবন্দ পর-গণা নাটোরের রাজ্যভুক্ত হয়। পরে লর্ড ক্লাইবের সময়ে কাশিমবাজারের কান্তি বাবু বাহিরবন্দ প্রাপ্ত হন।" † বলা বাহুল্য, এই বর্ণনা সত্য হইতে পারে না; লর্ড ক্লাইব সে সময়ে আদৌ এ দেশে ছিলেন না।

প্রাচীন রাজবংশের অধিকার হইতে জমিদারী কাড়িয়া লইয়া কোম্পানী লাভবান হইতে পারিলেন না। প্রাচীন রাজবংশের অধীন প্রজাপুঞ্জ নিরুদ্বেগে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত, রাজস্বও যথাকালে প্রদত্ত হইত। হেষ্টিংসের আদেশে যে সকল জমিদারী নূতন লোকের হস্তে সমর্পিত হইতে লাগিল,

* মুর্শিদাবাদহিতৈষী;—৪ পৌষ; ১৩০২।
† গৌড়ে ব্রাহ্মণ।

তাহার পুরাতন অধিকারিগণকে 'পেন্সন' দিতেই অনেক ব্যয় হইতে লাগিল; নূতন জমিদারগণও সবিশেষ শাসনকৌশলের পরিচয় দিতে পারিলেন না। ইহাতে দেশের মধ্যে অরাজকতা প্রশ্রয় পাইতে লাগিল।

ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত-লেখক এবং স্যর উইলিয়ম হণ্টার, উভয়েই এই প্রকার পরিণামফলের কথা সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। রাণী ভবানী ইহার পূর্ব্বসূচনা অনুভব করিবামাত্র দত্তকপুত্র মহারাজ রামকৃষ্ণের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া গঙ্গাবাস আশ্রয় করিলেন। সম্পদ হইতে সম্ভ্রম অধিকতর মূল্যবান; রাণী ভবানীর হৃদয় সম্ভ্রমনাশের প্রথম আঘাতেই চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তিনি যেদিন রাজসাহীর রাজ্যভার পরিত্যাগ করিলেন, সেই দিন হইতেই রাজসাহীর গৌরব বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ করিল। অতঃপর কেবল রাজসাহীর রাজ্যনাশকাহিনীতেই রাণী ভবানীর বংশধরদিগের ইতিহাস পরিপূর্ণ।

বাঙ্গলার জমিদারবর্গের কথা কালক্রমে ইংলণ্ডাধিপতি তৃতীয় জর্জের সিংহাসনও বিচলিত করিয়াছিল। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংসের শাসনভার পরিত্যাগ করিবার সময়ে, ইংলণ্ডীয় মহাসভা হইতে নূতন রাজবিধি প্রচলিত হইয়া, দেশীয় শাস্ত্র ও ব্যবহার অনুসারে ভারতবর্ষ শাসন করিবার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। ইহাই নব্যভারতের প্রথম সূচনা, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের প্রথম স্নেহবন্ধন, এবং পরবর্ত্তী ইতিহাসের পূর্ব্বসূচনা।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

সমাপ্ত।

পিতৃহীন।

১

এখনো নিদ্রিত পিতা! এলো সন্ধ্যা হ'য়ে,
কতক্ষণ ঘুমাইবে আর?
করিবে না সন্ধ্যাহ্নিক? গঙ্গোদক ল'য়ে
রাখিয়াছি শিয়রে তোমার।
উঠ, দেখ চেয়ে, দে'ছি গবাক্ষ খুলিয়া,
সূর্য্য ওই বসেছেন পাটে;
মেঘ হ'তে মেঘে আলো পড়িছে ঢলিয়া,
অন্ধকার জমিতেছে মাঠে।

২

সন্ধ্যা হ'লো, উঠ পিতা! মন্দিরে মন্দিরে
আরতির বাজি'ছে বাজনা।
জ্বালিব কি দীপ? জ্বলে কুটীরে কুটীরে—
করিব কি গায়িত্রীবন্দনা?
বড় অন্ধকার গৃহ, পাইতেছি ভয়,
উঠ পিতা, কও, কথা কও।
অন্য দিন কত পাঠ কত গল্প হয়,
তুমি তো কঠোর কভু নও।

৩

কেন এ ঘর্ঘর ঘন, কেন এ ভ্রূকুটী?
কেন পিতা, কেন হেন রোষ?
সেই আমি আছি বসি, ল'য়ে ভাই দুটি,
করি নাই আজ কোন দোষ।
পদাঘাত?—তাই করো; পুন পদাঘাত!
বড় বাজিয়াছে পিতা বুকে।
বেজেছে তোমার পায়? বুলাব কি হাত?
কও পিতা কও হাসি-মুখে।

৪

একি পিতা! কেন পদ তুষার-শীতল?
কেন হেন নিশ্বাস সঘন?
দিব কি উত্তাপ আমি, জ্বালিব অনল?
শীতে বুঝি করিছ এমন?—
এস ভাই বসো হেথা নিমেষের তরে,
দীপ জ্বালি' শীঘ্র অগ্নি করি।
এখনো হয়নি রাত,—দিব ভাত পরে,
কাঁদিস্ না পায়ে তোর পড়ি।

৫

পিতা! পিতা! কেন মাথা লুটায় এমন?
একি নব দেবতা-প্রণতি?
একি মুখভঙ্গী! একি ঘূর্ণিত নয়ন?
ক্ষমা কর, ভয় পাই অতি।
কি করুণ কণ্ঠে শিবা ডাকিছে বাহিরে!
পেচকের কি ঘন চীৎকার!
কি চঞ্চল দীপশিখা!—আঁকিছে প্রাচীরে
কত মূর্ত্তি বিকট-আকার!

৬

পিতা! পিতা! ঘুমালে কি? গৃহ অন্ধকার
আকুলি উঠিছে প্রাণ ত্রাসে!
আশে পাশে ঘুরিতেছে শুভ্রবাস কার!
রুদ্ধ গৃহে কেবা যায় আসে!
এ কি নিদ্রা! সর্ব্বদেহ শীতল কঠিন,
নাহি শ্বাস, বহে না ধমনী!
এ কি মৃত্যু! যে মৃত্যু মাগিতে প্রতিদিন?
লভেছেন যে মৃত্যু জননী?

৭

প্রভাতে ফিরিছে গৃহে স্বপ্নাতুর মত,
গলে শোক-উত্তরীয় দোলে।
প্রতিবাসী জনে জনে বুঝাইতে কত—
দ্বারে এসে ডাকে পিতা ব'লে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

সামাজিক সুশিক্ষা ও প্রাকৃতিক কুশিক্ষা।

মানব আপনার দোষ দেখিতে পায় না, কিন্তু পরের একটুমাত্র ছিদ্র পাইলেই তাহা লইয়া তৎক্ষণাৎ কেমন একটা ভীষণ গণ্ডগোল করে। এই অভ্যাস যে মানবসমাজে কেবল শ্রেণীবিশেষের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নহে। ইহা একটি ব্যক্তিগত দোষ; লোকমাত্রেরই এই অভ্যাসটি আছে। এমন কি, ইহাকে সামাজিক জীবনের একটি অনিবার্য্য নিয়ম বলা যাইতে পারে। নৈতিক-কুলতিলক, যাঁহার প্রত্যেক পদক্ষেপ প্রতি মুহূর্ত্তে নৈতিক বিচারের উপর নির্ভর করে, ন্যায়, অন্যায় বিচার না করিয়া যিনি জলগ্রহণ করেন না, তিনিও অনেক সময়ে বলিবেন, "মানব সদা সত্য কহিবে, কদাচ কলহ করিবে না, কলহ করা বড় দোষ," ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু তাঁহারই জীবন-পুস্তকের প্রত্যেক পংক্তি পর্য্যবেক্ষণ কর, দেখিবে, পদে পদে সত্যের অপলাপ, পদে পদে সার্ব্বভৌম কলহ। তাঁহার চক্ষে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করিয়া তাঁহার দোষ দেখাইয়া দাও। তিনি বলিবেন, "অজাতশ্মশ্রু মূর্খ বালকের পক্ষে যাহা দুষ্ট, সুদীর্ঘ-শ্মশ্রু-গুম্ফ-বিরাজিত ব্যক্তির পক্ষে তাহা দোষযুক্ত নহে।" তিনিই বলিবেন, "আমরা যে অসত্যের আশ্রয় লই, তাহা তোমাদের হিতসাধনের জন্য; আমরা যে কলহ করি, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য তোমাদের হিতসাধন, স্বার্থসিদ্ধির জন্য নহে। আমাদের সকলই পরার্থ বা পরমার্থ। আর তুমি বাচাল, কাণ্ডজ্ঞানহীন, তরলমস্তিষ্ক, নির্ব্বোধ বালক, তোমার এ সকল শোভা পায় না। তোমার বিস্তর দেখিবার আছে, বিস্তর শিখিবার আছে; যাহা বলি, শুনিয়া যাও, এবং তদনুসারে কাজ কর।"

আমি মনে মনে ভাবি, আমাদের নৈতিকপুঙ্গব একটি মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বর্ত্তমান বিজ্ঞান-জগতের মতের সহিত তাঁহার মতের সামঞ্জস্য একেবারেই নাই। এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে (অথবা বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বলিলেও চলে) যে সমাজতত্ত্ববিদ্, অথবা দার্শনিক, অথবা নীতিশাস্ত্র-বিদ্, অথবা ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব না মানিয়া চলেন, তাঁহার মত যে সম্পূর্ণ বিচিত্র ও কাল্পনিক হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? আমি বলি, বিজ্ঞান স্পষ্টই বলে, মিথ্যা কথা বলা অথবা সত্যের অপলাপ করা মানবের প্রাকৃতিক ধর্ম্ম। অনেক নীতিবাগীশ হয় ত এই কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠি-

বেন, কিন্তু আমি তাঁহাদের অভয়দান করিয়া পদে পদে কারণ দর্শাইয়া আমার আপন মত সমর্থনের চেষ্টা করিব।

পাঠক! তুমি বিজ্ঞান পাঠ করিয়াছ, তুমি প্রাকৃতিক ভূগোল অথবা ভূবিদ্যা পড়িয়াছ। "ধীরে ধীরে ভূপঞ্জর-চালন" ইত্যাদি অনেক কথা শিখিয়াছ; প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র অম্লজান যবক্ষারজান, Adiabatic expansion, Hypsometer, Papin's digester ইত্যাদি কত শাস্ত্র এবং কত কথা পড়িয়াছ এবং শিখিয়াছ। আচ্ছা বল দেখি, এই সকল তথ্য কি তুমি পূর্ব্বে জানিতে? আমাদিগের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধপিতামহ, অতিবৃদ্ধ-পিতামহ, বৃদ্ধপ্রপিতামহ, অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ, কেহ কি এ সকল জানিতেন? না, বর্ত্তমান সভ্যতার ফলে মানবের স্বযত্নার্জ্জিত জ্ঞান স্বতঃ বিস্তৃত হইয়া আমাদের অন্ধতমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে অকস্মাৎ প্রবিষ্ট হইয়াছে? পাঠক! তুমি হয় ত পুরাতন আর্য্যঋষিদের স্মরণ করিয়া আমাদের চতুর্দ্দশ পুরুষ অতিক্রম করিয়া কি জানি কোন পুরুষের নাম করিয়া বলিবে, "হাঁ, সকল সত্যই আর্য্যঋষি-দিগের জানা ছিল; নূতন কিছুই নহে।" কিন্তু যথার্থ আপন বক্ষে হস্ত স্থাপন করিয়া বল দেখি, এই সকল তত্ত্বানুসন্ধানে কত মানব প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়াছে, কত সময় কত অর্থ ব্যয় করিয়া, কত শারীরিক ও মানসিক শক্তির অপচয় করিয়া, কত ঐহিক দুঃখ স্বীকার করিয়া, মানব এই সকল সত্যানুসন্ধানে সফলকাম হইয়াছে। তুমি হয় ত বলিবে, যথার্থ সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তির এই সকল কথা চিন্তা করাই উচিত নহে। ঠিক, কিন্তু একবার ভাবিয়াছ কি, কেন মানবকে ঈশ্বরের সত্য জানিতে এত চেষ্টা করিতে হয়? বাল্যকালে পড়িয়াছিলাম, "পুত্তলিকার চক্ষু আছে দেখিতে পায় না, কর্ণ আছে শুনিতে পায় না।" ভাবিয়াছিলাম, মানব বুঝি চক্ষু অথবা কর্ণ দ্বারা জগতের সত্যাসত্য সহজে নির্ণয় করিতে পারে। কিন্তু বল দেখি, সেই চক্ষু কর্ণ থাকিতেও কেন এত বৃথা চেষ্টা, কেন এত আগ্রহের বৃথা অপচয়, কেন এত আলোকতৃষার মধ্যে সূচিভেদ্য অন্ধকার? হায়, মানব আর পুত্তলিকায় কি প্রভেদ, কে বলিতে পারে?

Psychologist অর্থাৎ যিনি মনোবিজ্ঞানের সকল সত্য আপনার আয়ত্ত করিয়াছেন, তিনি বলিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? We are all short-sighted creatures and see but one side of things (Locke). সত্য বটে, কিন্তু পাঠক আমি বলি,

মনোবৈজ্ঞানিক যদি সকল মানবকে অদূরদর্শী না বলিয়া সুদূরদর্শী বলিতেন, তাহা হইলে ঠিক হইত। বাস্তবিক, মানব ত নিকটের দ্রব্য ভাল দেখিতে পায় না। কি বালক, কি বৃদ্ধ, সকলেই সুদূরদর্শী, বা Long-sighted ;—এ কথা শুনিলে অনেক চক্ষুচিকিৎসক হয় ত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইবেন; কিন্তু আমরা নাচার।

আমি বলি কি, যদি সত্যসত্যই মানব Short-sighted অথবা অদূরদর্শী হইবে, তাহা হইলে মানব আপনাকে আপনি দেখিতে পায় না কেন? তুমি প্রতিবেশী দূরে দাঁড়াইয়া আছ, আর একজন বিদেশী আরও দূরে অবস্থিত, মানব তাহাদিগকে বেশ সুস্পষ্ট দেখিতে পায়। কাহার নাসিকায় কোথায় কি দোষ আছে, কাহার দৈহিক অথবা মানসিক সৌন্দর্য্য কোথায় কি কারণে ক্ষীণপ্রভ হইয়াছে, কাহার হৃদয়ের মর্ম্মদেশে কোন স্থানে কোন কোন দোষের প্রাবল্য আছে, সকলই আমরা দেখিতে পাই। এই বিষয়ে মানবমণ্ডলীর সহিত তর্ক বিতর্ক করি, লোকচরিত্রের সমালোচনা করিয়া ব্যক্তিবিশেষের চতুর্দ্দশ পুরুষের পিণ্ডদান করি, কিন্তু ইচ্ছা করিলে মুহূর্ত্তমধ্যে যে হৃদয়ের প্রত্যেক স্তর পরীক্ষা করিতে পারি, তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতে পাই না। পরের চক্ষে তাহাকে দেখিতে হয়। আপনার বিষয়ে আপনি অন্ধ, ইহা অপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি আছে? সেই জন্যই বলি, মানবমাত্রেই Long-sighted।

জনসাধারণের এই অন্ধতার কারণ কি, পাঠক কখনও ভাবিয়াছ কি? আমার মনে হয়, প্রকৃতির সহিত মানবের একপ্রকার বিরোধ-ভাব আছে। আমরা ক্ষুদ্র মানব, সমগ্র প্রকৃতির তুলনায় অগাধ সমুদ্রে তৈলবিন্দুবিশেষ; আমরা বিশাল অনন্ত প্রকৃতির হৃদয়াভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে চাহিলে প্রকৃতি কি বলিবে? বলিবে কি, এস হে কীটানুকীট! হে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নগণ্য জীব! এস, তোমারই জন্য হৃদয়ের সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছি; তোমারই জন্য আমার ক্রমসঞ্চিত অতুলনীয় রত্নরাজি সাজাইয়া রাখিয়াছি! তুমি কেবলমাত্র হস্তপ্রসারণ কর, আর এই ব্রহ্মাণ্ড-প্রহেলিকার সারমর্ম্ম তোমার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হস্তে আমি সাদরে তুলিয়া দি?

অথবা সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি আপন অসীমত্বের গৌরব অনুভব করিয়া তোমায় বলিবে, হে ব্রহ্মাণ্ডকীট! হে অপদার্থ অন্তঃসারহীন গর্ব্বস্ফীত কূপমণ্ডূক, তুমি আমার পবিত্র অনন্ত হৃদয়ে প্রবেশ করিও না; প্রবেশ করিলে আপনিই

হাবুডুবু খাইয়া মরিবে। আমার অতলস্পর্শজলধিসিঞ্চনে তুমি অক্ষম; তোমার বৃথা শ্রম, বৃথা আকাঙ্ক্ষা, বৃথা আস্ফালন। তুমি ক্ষুদ্র হইয়া মহতের সহিত সহবাস করিতে চাও, বামন হইয়া চন্দ্রের জন্য তোমার দুর্দ্দমনীয় তৃষ্ণা, এই জন্যই প্রকৃতি তোমায় পদে পদে শাস্তি দেয়। তুমি জান না, ক্ষুদ্রের নিকট মহতের মহৎ হৃদয় কঠিন আবরণে আবৃত। কে তুমি যে তোমার সসীম মুহূর্ত্তস্থায়ী হৃদয়-বুদ্বুদের সহিত অসীম অনন্তকালস্থায়ী প্রাকৃতিক হৃদয়ের প্রেমসন্ধি হইবে?

তুমি যেমন আপন সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের সহিত ব্রহ্মাণ্ড-হৃদয়ের বিনিময়-প্রার্থী, ব্রহ্মাণ্ড-হৃদয় তেমনি তোমার গর্ব্বপূর্ণ দুরাকাঙ্ক্ষা দেখিয়া তোমার নিকট আপন হৃদয়কেন্দ্র অনাবৃত রাখিতে উৎসুক, তাহাতে তোমার দুঃখ কি বল দেখি?

মানব, তুমি আপন মস্তিষ্ক পরিচালন করিয়া সৌরজগতের কেন্দ্র নিরূপণ করিতে ব্যগ্র, আর ঐ দেখ, বিশ্বপ্রকৃতি আপন চাতুর্য্যজাল বিস্তার করিয়া কত দিন তোমায় বুঝাইয়া আসিতেছে, এই পৃথিবীই সৌরজগতের কেন্দ্র, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ উপগ্রহ আমাদের প্রসূতি ধরণীর চতুর্দ্দিকে নিয়তই পরিভ্রমণ করিতেছ। এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতে পারে। সংসারে আমরা কারণ দেখিতে পাই না, কার্য্যই দেখিতে পাই। "The occult causes are hidden; the effects only are manifest". অথবা কারণের যে অংশটুকু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাও সকল সময়ে ভ্রমশূন্য নহে। সমস্ত বিজ্ঞান পাঠ কর,—দেখিতে পাইবে,—প্রকৃতির ইচ্ছা নহে যে, আমরা তাঁহার হৃদয়াভ্যন্তরস্থ গূঢ়মর্ম্ম সকল এক মুহূর্ত্তমধ্যে সংগ্রহ করিয়া লই।

এই সকল দেখিয়া হে পাঠক, তোমার কি স্বতঃই এই প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হয় না,—হে বিশ্বপ্রকৃতি, হে জগৎপ্রসবিনি, হে আদ্যাশক্তিরূপিণি, কেন মা তোমারই সন্তানের নিকট আপন হৃদয়ের আবরণ আজি উন্মুক্ত করিতে তুমি প্রস্তুত নহ? যাহা হইতে উৎপত্তি, যে শক্তিতে শক্তিমান, যে অনন্তজীবনপ্রস্রবণ হইতে এক মুহূর্ত্ত জন্য জীবনীশক্তি পাইয়াছি, তাহারই সহিত এত বিদ্বেষভাব কেন? কিন্তু হায়, কে এ প্রশ্নের উত্তর দিবে? যে সর্ব্বাপেক্ষা আপন, সে কেন পর হয়? যে আমার সর্ব্বস্ব জানে, সে কেন নিজের কিছুই আমায় জানিতে দেয় না? কেন তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিতে আজীবন প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও আমরা সফলকাম হইতে পারি না? পাঠক! এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পার কি?

সেই জন্যই বলি, প্রকৃতি আপনিই আমাদের অন্ধকারে রাখিতে চাহে। প্রকৃতি বলে, ভ্রান্ত নর, ভ্রান্তই থাক, তোমার দুরাকাঙ্ক্ষাপরিতৃপ্তির জন্য; এই দেখ, কেমন তোমায় ছায়াবাজি দিয়া ভুলাইয়া রাখিয়াছি। তুমি বালক, তোমায় মিথ্যা বলিতে আমি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নহি।

এই জন্যই মানব আপনা-আপনিই মিথ্যা বলিতে শিক্ষা করে; বাল্যকাল হইতে মানবের নিকট নানা প্রকারে সত্যের প্রশংসা কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, কিন্তু মিথ্যা বলিতে রীতিমত শিক্ষা সামাজিক জীবনে খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। সামাজিক শিক্ষা বল, পারিবারিক শিক্ষা বল, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বগ্রাসিনী শিক্ষা বল, সকল শিক্ষাই সত্যের প্রশংসা করে। "সদা সত্য কহিবে, মিথ্যা বলা বড় দোষ" সর্ব্বদাই আমাদের কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতেছে, কিন্তু তথাপি, সঙ্কীর্ণ মানবপ্রকৃতি, অসীম বিশ্বপ্রকৃতির মিথ্যার অনুকরণ করিতে সর্ব্বদাই উৎসুক।

এখন বল দেখি পাঠক! প্রকৃতি আমাদের আপন হৃদয়ের ভাব সংগুপ্ত রাখিতে আমাদের উৎসাহিত করে কি না? সর্ব্বজননী বিশ্বপ্রকৃতির নিকট আমরা আর একটি ভীষণ কুশিক্ষা পাই। যেমন মিথ্যা বলিতে মানব প্রকৃতির অনুকরণ করে, তেমনি সংসারে আসিয়া পরস্পরের সহিত দ্বন্দ্ব করিতেও মানব প্রাকৃতিক দৃষ্টান্তের অনুসরণ করে। সংগ্রাম বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা সংসারের একটি অনিবার্য্য নিয়ম। যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, দেখিবে, পরস্পরের সংঘর্ষ, ঘাতপ্রতিঘাত, পরস্পরের উন্নতির বা অবনতির অন্তরায় হইতেছে।

মানবসমাজে দেখ, ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান। আপন পারিবারিক জীবনে দেখ, সামান্য ভূসম্পত্তি লইয়া ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব, গৃহবিচ্ছেদ, আত্মীয়স্বজনগণের মধ্যে পবিত্র প্রণয়ক্ষেত্রে বিষবৃক্ষরোপণ। ভালবাসার সামগ্রী লইয়া পরস্পরের দ্বন্দ্ব, পিতাপুত্রে কলহ, স্বামীস্ত্রীর হৃদয়ের অসামঞ্জস্য, জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে যৎসামান্য কারণে আজীবন বিচ্ছেদ, এই সকল ঘটনা সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়।

সামাজিক জীবনে হীনবল প্রতিবেশীর উপর সবলের সফল চেষ্টা, কর্ম্মক্ষেত্রে মানবমাত্রেরই পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ভীষণ আক্রোশ, এ সকল দৃশ্য ত প্রতিমুহূর্ত্তেই আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে।

বাহ্যজগতে চাহিয়া দেখ, দেখিবে, কোটী কোটী কীটাণুর প্রতি-মুহূর্ত্তের

জীবনসংগ্রাম লইয়া প্রাণিজগৎ আজি সজীব হইয়া আছে। নিশ্চেষ্ট জড়জগতের প্রত্যেক অণুও এই সংগ্রামে ব্যতিব্যস্ত, সচেষ্ট আধ্যাত্মিক জীবনের প্রত্যেক unitও এই পারস্পরিক ঘাতপ্রতিঘাতে উন্নতিলাভের জন্য উৎসুক। বিশাল সৌরজগৎপানে চাহিয়া দেখি, আমাদের সূর্য্য এই সৌরজগতের প্রণয়কেন্দ্রস্বরূপ, সমগ্র গ্রহ নক্ষত্রকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসে বলিয়া আপন বক্ষে টানিয়া লইতে চাহে, আর বিদ্বেষবুদ্ধিসম্পন্ন গ্রহনক্ষত্রগণ এই প্রণয়কেন্দ্র হইতে দূরে অবস্থান করিতে চেষ্টা করে। এই প্রেমাকর্ষণ ও বিদ্বেষপ্রণোদিত বিকর্ষণের উপর সমগ্র সৌরজগৎ সংস্থাপিত। আমাদের পার্থিব জগতের দিকে চাহিয়া দেখি, অহরহ এই সংগ্রাম চলিতেছে। উত্তাপের বিকর্ষণীশক্তি আর রাসায়নিক সংযোগের আকর্ষণীশক্তি, এই উভয়ের মধ্যে অবিরাম কলহ। আর এই কলহ হইতেই Solid, Liquid ও Gas এর উৎপত্তি। এক এক সময়ে ভাবি, কেন এ সংসার সংগ্রামভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইল? পূর্ণপ্রণয়ের উপর কি সংসার টিকিতে পারে না? কি উদ্দেশ্যসাধনের জন্য অনন্তভোগী মহাপুরুষ সুধার সহিত হলাহল মিশ্রিত করিলেন? হায়! কত কবি, কত প্রেমিক, কত দার্শনিক, এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই!

প্রাকৃতিক তৃতীয় কুশিক্ষা,—অপচয়শীলতা। আমরা অনেক সময়ে মানবকে অপচয়শীল বলিয়া দোষ দিয়া থাকি। মানব সময়ের যথার্থ ব্যবহার জানে না। যতটুকু খরচ করা নিতান্ত প্রয়োজন, তাহা অপেক্ষা বিস্তর অধিক খরচ করে। অবশেষে আপনার মূলধনের অভাব দেখিয়া আপনি ব্যতিব্যস্ত হয়! কিন্তু হে পাঠক, বল দেখি, অপচয়শীলতা মানব কোথা হইতে শিক্ষা করিল? তুমি হয় ত বলিবে, মানব বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া এইরূপে আপনার পায়ে আপনি কুঠারাঘাত করিতেছে। কিন্তু ইহার উত্তরে কি বলা যায় না যে, মানব এই অপচয়শীলতা বিশ্বপ্রকৃতির নিকট শিক্ষা করিয়াছে? প্রকৃতি প্রতিমুহূর্ত্তে কত জিনিস অপচয় করিতেছে, বল দেখি? বৈশাখী নিদাঘের জ্বলন্ত তেজ আর বৈশাখী অমাবস্যার কঠিন দুর্ভেদ্য অন্ধকার, ইহা কি একটি নিতান্ত অপচয়শীলতার চিহ্ন নহে? যেখানে জনমানব নাই, প্রাণিজগতের অথবা উদ্ভিদ্‌জগতের লেশমাত্র যেখানে দৃষ্টিগোচর হয় না, সেই দিগন্তব্যাপী মরুভূমির মধ্যে, আলোকাধিক্যে নয়ন ঝলসিয়া যায়, কিন্তু যেখানে একটিমাত্র আলোকরশ্মির জন্য সহস্র নয়ন একত্র বিস্ফারিত

হইয়া আছে, সেইখানেই আলোকের পূর্ণাভাব। ইহা কি সংসারের Radiant energyর সম্পূর্ণ অপচয়ের দৃষ্টান্ত নহে?

উত্তাপ বা Heat energyর সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথা বলা যাইতে পারে। যেখানে উত্তাপের আর প্রয়োজন নাই, সেইখানেই উত্তাপাধিক্য; আর যেখানে ভীষণ শীতে প্রাণিজগৎ সর্ব্বদা কম্পমান, সেখানে উত্তাপের অভাব। ইহা দেখিয়া কি বোধ হয় না যে, বিশ্বপ্রকৃতির সমানুপাতজ্ঞান নিতান্তই অল্প?

বিশ্বপ্রকৃতির, একখানি বীজগণিত ক্রয় করিয়া, শীঘ্রই "নিপাত অনুপাত সমানুপাত জ্ঞান" লাভ করিবার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য!

আবার শব্দজগতের কথা ভাবিয়া দেখ। দেখিবে, পৃথিবীতে যে পরিমাণে শব্দের অপব্যয় হয়, তাহার অধিকাংশ কমাইয়া দিলে, জগৎসংসারের সুখের বৃদ্ধি বই হ্রাস হয় না। বর্ষায় বিদ্যুল্লতা যখন নয়ন ঝলসিয়া অম্বরপথে ক্রীড়া করে, তখন যদি ইন্দ্রের বজ্র শব্দবিহীন হয়, তাহা হইলে কাহার কি বিশেষ ক্ষতি,—বলিতে পার কি? জ্ঞানী পাঠক হয় ত বলিবেন, মানব, তোমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি, তুমি অনেক সময়ে আপন Domestic Economy বুঝিতে পার না, তোমার কি সাধ্য যে, তুমি Universal Economyর মর্ম্মগ্রহণ করিবে? স্বীকার করি, আমাদের সকলেরই বুদ্ধি সুদূরগামিনী নহে, কিন্তু যেটুকু আছে,—সুবুদ্ধিই বল, আর দুর্ব্বুদ্ধিই বল,—সেইটুকুর পরিচালন করিয়া কি এ কথা স্পষ্টই বোধ হয় না যে, সমস্ত শব্দজগতের সীমা, বর্ত্তমান সীমা অপেক্ষা সঙ্কীর্ণ করিলে কাহারও কোনও ক্ষতি নাই!

এইরূপ জগতের শক্তিসমষ্টির মধ্যে এক একটি লইয়া চিন্তা কর, দেখিবে, কোন শক্তিরই এ জগতে even distribution নাই। শুধু তাহাই নহে, অনেক বৈজ্ঞানিক পুঙ্গব এমন কথা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন যে, জগতের শক্তিসমষ্টির প্রতিমুহূর্ত্তে অপচয় হইতেছে। আর এমন এক দিন আসিবে, যে দিন এই জগতের অপচয়শীলতার শেষ ফল আমরা দেখিতে পাইব। যে দিন জগতের জীবনীশক্তি ক্রমে ক্রমে অপব্যয়িত হইয়া একেবারেই অন্তর্হিত হইবে। ভাস্কর দিবাকর আর এ জগতে থাকিবে না;

> "গৃহমাঝে দীপপ্রায় রবি আকাশের গায়
> কালের প্রভাবে নিভে যাবে একদিন।"

গ্রহনক্ষত্রাদি কালের অনন্তগর্ভে বিলীন হইয়া যাইবে। সমগ্র সৌরজগৎ

এই বিষম অপচয়শীলা প্রকৃতির হস্তে পড়িয়া Krakatoaর isletএর ন্যায় এক মুহূর্ত্তের মধ্যে মহাশূন্যে বিলীন হইয়া যাইবে।

এ কথা বিশ্বাস করিতে সহজে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু কি করিব, বৈজ্ঞানিকের কথা বিশ্বাস না করিয়াও থাকিতে পারি না। এই দেখ, তোমার পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে কি বলে,

> " Although, therefore, in a strictly mechanical sense there is a conservation of energy, yet as regards usefulness or fitness for living beings, the energy of the universe in process of deterioration. Universally diffused heat forms what we may call the great wasteheap of the universe, and this is growing larger year by year.........but if we regard it (the universe) rather as a candle that has been lit, we become absolutely certain that it cannot have been burning from Eternity, and that a time will come *when it will cease to burn*."—Balfour Stewart. Conservation of Energy.

প্রকৃতির আর একটি বিষম দোষ আমরা প্রত্যহই দেখিতে পাই। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক Heraclitus বলিয়াছেন, Change is the law of the nature; অর্থাৎ জগৎ পরিবর্ত্তনশীল। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রধান ব্রিটিশ্ দার্শনিক মিল বলেন, "Nature is uniform"; আর জগতের সমস্ত বিজ্ঞান এই uniformityর উপর প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞান বল, দর্শন বল, ধর্ম্ম বল, সামাজিক নীতি বল, Nature's uniformity না স্বীকার করিয়া লইলে কিছুই থাকে না।

কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ সকল দেখিয়া কি বোধ হয়? মিল্ যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ঠিক্? না, বৃদ্ধ Heraclitus যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ঠিক্? বুড়ার কথা আপৎকাল ব্যতীত কেহ শুনিতে চাহে না সত্য, কিন্তু আমার কেমন পক্ককেশ দেখিলেই হৃদয়ে গভীর প্রেমের সঞ্চার হয়। আমি বলি, হে Heraclitus! তুমি বিশ্বজগতের orecle হইয়া আসিয়াছিলে; আর হে মিল্, তোমার ভুল বিশ্বাস, জাগতিক জীবন প্রতিপদেই খণ্ডন করিতেছে।

এই দেখ আবার পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক কেমন আমার মত সমর্থন করিতেছেন,—

> "......It seems clear that Heraclitus must have had a vivid conception of the allied in character to......that of modern philosophys who regard matter as essentially dynamical."

জাগতিক অনন্ত পরিবর্ত্তনশীলতার আর অধিক প্রমাণ চাও কি? ঐ দেখ, তোমার সমক্ষে প্রতিমুহূর্ত্তে চন্দ্রসূর্য্যের অনন্ত পরিবর্ত্তন, সমগ্র ভৌতিক জগতের পরিবর্ত্তন, অন্তর্জ্জগতের অসীম ভাবস্রোত, এ সকল দেখিয়া শুনিয়াও কি জাগতিক পরিবর্ত্তনশীলতা প্রমাণ অপেক্ষা করে? প্রতি পলে, প্রতি অনুপলে, প্রতি বিপলে, অনন্ত জগতের যে অনন্ত পরিবর্ত্তন হইতেছে, Demiurgusএর নিয়ম অনুসারেই হউক, অথবা যে কোনও কারণেই হউক, কোন মূর্খ তাহা অস্বীকার করিবে? এই হাসি, এই কান্না, এই প্রেম, এই বিচ্ছেদ, এই নিদ্রা, এই জাগরণ, ইহাই সংসারের নিয়ম।

"The Eternal ups and downs of life, not of the life human, but of the llfe of the cosmos, this is the theme of all sound philosophy."

এ কথা অস্বীকার করিতে পার? সাধ্য কি? এই জন্যই চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ, শ্লোকের সৃষ্টি হইয়াছিল; এই জন্যই মা লক্ষ্মী চিরকালই চঞ্চলা; এই জন্যই গভীর দার্শনিক বলিয়াছেন, সর্ব্বমনিত্যং; এই জন্যই phenomenon আর noumenonএর পার্থক্য।

এখন বল দেখি, সংসার কেন এত পরিবর্ত্তনশীল? জগজ্জননীর মুখের দিকে চাহিয়া এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে কি না, কেন মা! তুমি চঞ্চলা, অধীরা পরিবর্ত্তনশীলা? প্রকৃতির মুখ পানে চাহিয়া ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব—বিশাল বিশ্বপ্রকৃতির পদরেণু—বলে, জননী স্থিরা ভব, স্থিরা ভব। মানবকে অনেক সময়ে আমরা চঞ্চল, পরিবর্ত্তনশীল, unsteady, irregular বলিয়া দোষ দিয়া থাকি। Bacon বলিয়াছেন,—

"Seek to make thy course regular, that men may know beforehand what they may expect."

কিন্তু যখন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সর্ব্বদা এই unsteadiness শিক্ষা দেয়, তখন কেমন করিয়া সুস্থির থাকি? পার্থিবজীবনে পিতামাতা আত্মীয় স্বজন যাহা করেন, আমরা তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকি। এই অনুকরণশক্তি মানবজীবনের একটি প্রধান উপকরণ। কিন্তু বল দেখি, বিশ্বজননী যাহা করেন, বিশ্বপিতা যে অভ্যাসের পক্ষপাতী, তাহার অনুকরণ কি নিন্দনীয়?

হে ক্ষুদ্র মানব, তোমার নৈতিক নিয়মাবলী গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দাও। কে তুমি যে প্রকৃতিকে পদদলিত করিয়া নিজ মস্তিষ্কসম্ভূত স্পর্দ্ধাজাত নিয়মাবলীর আশ্রয় গ্রহণ করিবে? যখন জননী বলেন, সন্তান, আমি

স্বয়ং মিথ্যার, সংগ্রামের, অপচয়শীলতার, অধৈর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি, প্রতি পদে তোমার সমক্ষে ধরিতেছি, যাহা যাহা দেখাইতেছি, তাহাই শিখিবে;—তখন বিশ্বজগতের মানবমণ্ডলীর দোষ লইয়া এত কোলাহল কেন বল দেখি?

পাঠক! এই মহান্ প্রশ্নের উত্তর কখনও ভাবিয়াছ কি? বিশ্বস্রষ্টার যে নৈতিক জ্ঞানের বিশেষ অভাব আমরা দেখিতে পাই, তাহার কারণ কি? অদূরদর্শী মানব যখন অনন্তবুদ্ধিজীবী জাগতিক শক্তির দোষ দেয়, তখন ব্রহ্মাণ্ডই যে পদে পদে মানবের স্পর্দ্ধা উদ্দীপিত করে, ইহার কারণ কি? আমি ইহার যে কারণ নির্দ্দেশ করিব, হয় ত তাহার সহিত তোমার মতের অনৈক্য হইতে পারে। কিন্তু স্মরণ রাখিও যে, অনৈক্যও একটি প্রাকৃতিক নিয়ম।

প্রকৃতির সীমা কত দূর, পাঠক একবার ভাবিয়াছ কি? সংসারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল পদার্থ, অতীন্দ্রিয়, মনোগত ভাব, যাহা হইয়াছে, হইতেছে, এবং হইবে, সকলই প্রকৃতির অন্তর্ভূত। ভৌতিক জীবন, আধ্যাত্মিক জীবন, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, এই সকলের সমষ্টি লইয়া প্রকৃতি। এখন বল দেখি, মানবের সামাজিক জীবন প্রকৃতির অন্তর্ভূত কি না? জড় জগতের যেমন কেবলমাত্র ভৌতিক জীবন আছে, সেইরূপ আধ্যাত্মিক জগতের আবার সামাজিক জীবন আছে। দিগন্তব্যাপিনী মরুভূমির মধ্যে যে উদ্ভিদ জগতের 'একঘরে' একমাত্র তরু আজীবন বিজনশান্তি অনুভব করে, তাহার সামাজিক জীবন নাই। সমস্ত বিশ্বজগতের উত্তাপ আলোক বিদ্যুৎ ইত্যাদি শক্তিসমষ্টির সহিত ইহার কত দূর সৌহার্দ্দ্য, তাহা এখন বলিব না। কিন্তু সাধারণতঃ এ কথা বলা যাইতে পারে যে, সামাজিক জীবন মনুষ্যের একটি বিশেষ স্বত্ব; অন্য কোনও জীব বা উদ্ভিদের এই স্বত্ব নাই।

কোনও কোনও সূক্ষ্মদর্শী দার্শনিক অথবা সমাজতত্ত্ববিৎ হয় ত বলিবেন, সামাজিক জীবন convential, artificial; মানব নিজে গড়িয়া লইয়াছে মাত্র। বিশ্বপ্রকৃতি আমাদের সামাজিক জীবন দেন নাই। বাস্তবিক ভাবিতে গেলে ইহা অস্বীকার করা দুষ্কর বলিয়া বোধ হয়। অস্বীকার করা দুষ্কর বোধ হয় বলিয়া উপরি-উক্ত মহান্ তথ্য স্বীকার করিয়া লইলাম, কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, কোথায় human convention science বা বিজ্ঞানের উপর সংস্থাপিত নহে? আর কোথায় বিজ্ঞান প্রকৃতির প্রতিমূর্ত্তি নহে? যদি প্রতি পদে বিজ্ঞান প্রাকৃতিক শক্তির যথাযথ বর্ণনা হয়, আর যদি প্রত্যেক art বিজ্ঞান-

ভিত্তির উপর গঠিত হয়, তাহা হইলে আজি তুমি যাহাকে অনৈসর্গিক বলিয়া ঘৃণা কর, তাহা কি প্রাকৃতিক ভিত্তির উপর সংস্থিত নহে?

Nature আর artএর পার্থক্য নির্দ্দেশ করা বড়ই কঠিন। এই জন্যই কবি বলিয়াছেন,—

"All nature is but art unknown to thee,
All chance direction which thou caust not see".

স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিলে, মানবের ভৌতিক জীবন ও সামাজিক জীবন, উভয়ই প্রাকৃতিক বলিয়া বোধ হয়। আমাদের সামাজিক জীবন যে প্রাকৃতিক, এই কথা ধরিয়া লইয়া, পাঠক একবার ভাবিয়া দেখ, দেখিবে সামাজিক শিক্ষা ও প্রাকৃতিক শিক্ষা, এই উভয়ের মধ্যে যথার্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতা আদৌ নাই।

প্রাকৃতিক জীবন বলে, (আত্মরক্ষা বা self conservationএর জন্য শত্রুর নিকট) সদা মিথ্যা বলিবে, (যে সকল দস্যু বা তস্কর তোমার সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়া তোমায় জীবনসংগ্রামে পরাজিত করিতে সর্ব্বদা উৎসুক তাহাদের সহিত) সদা কলহ করিবে, সর্ব্বদা আপন আয়ত্তাধীন দ্রব্য (কাঙ্গাল প্রতিবেশীর হিতের জন্য) অপব্যয় করিবে, (শত্রুভয় নিবারণের জন্য) কদাচ স্থির থাকিবে না। সামাজিক জীবন বলে, হে মানব! সদা সত্য বলিবে, কলহ করা বড় দোষ, আয়ত্তাধীন দ্রব্যমাত্রেরই সদ্ব্যবহার করিবে, বিপদি স্থৈর্য্যন্, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কিন্তু এই যে প্রাকৃতিক ও সামাজিক শিক্ষার পার্থক্য, মানবের অদূরদর্শিতাই ইহার মূলীভূত কারণ। উপরি-উক্ত মতের সমর্থনে কি এই কথা বলা যায় না যে, আমাদের সামাজিক জীবনও প্রাকৃতিক? প্রকৃতির দয়ার ইয়ত্তা নাই, প্রকৃতি অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ দিয়া থাকে। ভৌতিক জীবনে যে উপদেশ, সামাজিক জীবনে তাহা নহে। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে ব্যক্তিবিশেষের কর্ত্তব্য ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। এই শিক্ষাই আমরা জগন্মাতার নিকট জন্মজন্মান্তরে প্রাপ্ত হই।

বিশ্বমাতা স্পষ্টই বলেন, মানব, তোমার জীবনের ভিন্ন ভিন্ন ভাব আছে; তোমার ভৌতিক জীবনের আইন এক, আর সামাজিক জীবনের আইন এক। যখন একাকী বাস করিবে, তখন কেবলমাত্র আপনার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিবে; আর যখন তোমারই ন্যায় প্রতিবেশিমণ্ডলীর মধ্যে বাস

করিবে, তখন আপনাকেই সর্ব্বেসর্ব্বা ভাবিও না; তোমার ন্যায় আরও অসংখ্য জীব আছে; সকলেই সমান; সকলে একত্রীভূত হইয়া The golden rule of the Jesus of Nazarath অনুসারে কাজ কর।

হে বিশ্বপ্রকৃতি, আমরা ক্ষুদ্র, অন্ধতমসাচ্ছন্ন; আমাদের হৃদয় অহঙ্কারপূর্ণ; আমরা গর্ব্বস্ফীত; পাপের বোঝা আপনার দুর্ব্বল স্কন্ধে লইয়া, আপন গৌরবে আপনি আত্মহারা হইয়া, সর্ব্বদা আপন মূর্খতার পরিচয় দিই।

হে ব্রহ্মাণ্ড-জননি! স্নেহ-প্রস্রবিণি! পূর্ণপ্রেমরূপিণি! তোমারই ইয়ত্তাধীন ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানবের নিত্য নৈমিত্তিক ভ্রম দূর করিয়া দাও। আর যেন বিশ্বজগতে তোমারই সন্ততি তোমার সহিত সংগ্রাম না করে!

শ্রীলালগোপাল চক্রবর্ত্তী।

মগধের পুরাতত্ত্ব।

মগধের রাজধানী গিরিব্রজপুর নামে মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে। দুর্গপ্রাচীরের ন্যায় পঞ্চ পর্ব্বত গিরিব্রজপুরকে পরিবেষ্টিত করিয়া অবস্থিত ছিল। মহাপরাক্রান্ত অসুরপতি জরাসন্ধ এখানে রাজত্ব করিতেন। মহাবীর ভীমসেনের সহিত বাহুযুদ্ধে জরাসন্ধ নিহত হন। মহাভারতের সভা-পর্ব্বে এই ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সার উইলিয়াম জোন্সের মতে, কলিযুগের আরম্ভে ৩০০১ খৃষ্টাব্দে যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক জরাসন্ধ বর্ত্তমান ছিলেন। রাজতরঙ্গিণীর মতে কলিযুগের ৬৫৩ অব্দে, ২৪৪৮ খৃঃ-পূঃ-অব্দে যুধিষ্ঠির আবির্ভূত হন। (১) তখন শকাব্দের পূর্ব্বতন ২৫২৬ বৎসর প্রবহমান ছিল। জরাসন্ধের পুত্র সহদেবের সময়ে কুরুক্ষেত্রের ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সহদেব কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। মহাভারতীয় কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের অবসানে, অর্জ্জুনের পৌত্র ও অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণুপুরাণের

(১) শতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভুবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ॥ ৫১॥
'আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়-দ্বিক-পঞ্চ-দ্বি-যুতঃ শককালঃ তস্য রাজ্যস্য'॥ ৫৬॥—রাজতরঙ্গিণী।

মতে, মহারাজ পরীক্ষিতের ১০১৫ বৎসর পরে নন্দবংশ মগধে প্রতিষ্ঠালাভ করে। (২) বায়ু ও মৎস্যপুরাণের মতে, পরীক্ষিতের ১০৫০ বর্ষ পরে নন্দবংশ মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। শত বৎসর রাজত্বের পর ব্রাহ্মণজাতীয় কৌটিল্য বা চাণক্যের যত্নে নন্দবংশ উন্মূলিত হয়, এবং মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে সংস্থাপিত হন। অতএব বিষ্ণুপুরাণের মতে পরীক্ষিতের জন্মলাভের ১১১৫ বৎসর পরে মগধে চন্দ্রগুপ্ত অভ্যুদিত হইয়া, পাটলীপুত্র নগরে মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ডাক্তর কারণ ও রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের মতে খৃষ্টের আবির্ভাবের পূর্ব্বতন ৩২২, সুপণ্ডিত কর্ণেল টড্ ও রমেশচন্দ্র দত্তের মতে ৩২০, সার উইলিয়ম জোন্সের মতে ৬০৩, কর্ণেল উইলফোর্ডের মতে ৩৫০, এবং ডাক্তর উইলসন ও হরনলি ও রিস্ ডেভিড সাহেবের মতে ৩১৫ অব্দে, চন্দ্রগুপ্ত পাটলীপুত্রের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ৩১৫ খৃঃ পূঃ অব্দকে চন্দ্রগুপ্তের পাটলীপুত্রে প্রতিষ্ঠালাভের সময় অনুমান করিলে, খৃঃ পূঃ ১৪৩০ (১১১৫+৩১৫) অব্দে পরীক্ষিতের জন্ম ও কুরুক্ষেত্রের ভীষণ যুদ্ধের কাল পাওয়া যাইতেছে। বিষ্ণুপুরাণের এই সময়নির্দ্দেশকে অভ্রান্ত বলিয়া বঙ্গের লেখকচূড়ামণি বঙ্কিমচন্দ্র স্বপ্রণীত 'কৃষ্ণচরিত্রে' গ্রহণ করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণের মত সত্য হইলে, শকাব্দের পূর্ব্বতন ২৭০৮ (১২০০+১৫০৮) অব্দে কলিযুগের আরম্ভ গণনা করিতে হয়। বরাহমিহিরের মতে শকাব্দের পূর্ব্বতন ৩১৭৯ অব্দে কলির কাল-গণনা আরব্ধ হয়। এই মত সর্ব্বত্র গৃহীত ও প্রচারিত হইয়াছে। অতএব, বিষ্ণুপুরাণের মত ভ্রান্ত ও সুপ্রচলিত মতের বিরোধী। বিষ্ণুপুরাণের মত প্রামাণিক বিবেচনায় উইলসন জরাসন্ধের পুত্র সহদেবের সময় খৃষ্টের আবির্ভাবের পূর্ব্বতন ১৪০০

---

(২) "যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনং।
এতদ্ বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরং॥ ৩২॥
তে তু পরীক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম।
তদা প্রবৃত্তশ্চ কলের্দ্বাদশাব্দঃ শতাত্মকঃ॥ ৩৪॥—বিষ্ণুপুরাণ, ৪।২৪।

বরাহমিহিরের মত, 'রাজতরঙ্গিণীতে' গৃহীত হইয়াছে। বরাহমিহিরের মতে, শকাব্দের পূর্ব্বতন ৩১৭৯ অব্দে কলির আরম্ভ, এবং শকাব্দের পূর্ব্বতন ২৫২৬ বর্ষ পূর্ব্বে মহাভারতীয় যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির রাজত্ব করেন। বিষ্ণুপুরাণের মতে, কলিযুগের ১২০০ অব্দে পরীক্ষিতের জন্ম হয়, এবং শকাব্দের পূর্ব্বতন ২৭০৮ অব্দে (১২০০+১৫০৮) কলিযুগ আরব্ধ হয়।

অব্দ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। সুপণ্ডিত রমেশচন্দ্র দত্তের মতে জরাসন্ধ খৃঃ পূঃ ১২৮০ অব্দে, এবং সহদেব খৃঃ পূঃ ১২৫৯ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

সহদেবের পুত্র সোমাপি। এই সোমাপির একবিংশতিতম বংশধর রিপুঞ্জয় বৃহদ্রথের প্রতিষ্ঠিত বংশের শেষ নরপতি। জরাসন্ধের পিতা চন্দ্রবংশীয় বৃহদ্রথ গিরিব্রজপুরে এই রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। রমেশ বাবু প্রতি নরপতির রাজত্বকাল ২১ বৎসর ধরিয়া, জরাসন্ধের সময় ১২৮০ খৃঃ পূঃ অব্দ, এবং রিপুঞ্জয়ের সময় ৭৯৭ খৃঃ পূঃ অব্দ, অনুমান করিয়াছেন। প্রিন্সেপ সাহেবের মতে খৃঃ পূঃ ৯১৫ অব্দে, উইলফোর্ডের মতে খৃঃ পূঃ ৭০০ অব্দে, এবং রমেশ বাবুর মতে খৃঃ পূঃ ৭৭৫ অব্দে, রিপুঞ্জয়ের রাজত্ব-অবসানের পর, শৌনকবংশীয় প্রদ্যোত মগধে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণের মতে, বৃহদ্রথের বিংশতি বংশধরগণ সহস্র বৎসর, বায়ুপুরাণের মতে ৯২১, মৎস্যপুরাণের মতে ৯৩৫, এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে ৯১৯ বৎসর,—মগধে রাজত্ব করেন।

বিষ্ণুপুরাণের মতে শৌনক-বংশীয়েরা পাঁচ পুরুষে ১৩৮ বৎসর মগধে রাজত্ব করেন। উইলসন সাহেবের মতে খৃঃ পূঃ ৯১৫ হইতে ৭৭৭ অব্দ পর্য্যন্ত ১২৮ বৎসর, এবং রমেশ বাবুর মতে খৃঃ পূঃ ৭৭৫ হইতে ৬৩৮ অব্দ পর্য্যন্ত ১৩৮ বৎসর, শৌনকবংশ মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

অনন্তর বিদেহবংশীয় শিশুনাগ মিথিলা হইতে রাজগৃহে আগমনপূর্ব্বক বিদেহবংশের আধিপত্য মগধে প্রতিষ্ঠিত করেন। বিষ্ণু, ভাগবত, মৎস্য ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের মতে, এই বংশ ৩৬২ বৎসর মগধে রাজত্ব করেন। বায়ুপুরাণের মতে, এই বংশ ৩৩২ বৎসর মগধে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মহারাজ অজাতশত্রু এই শিশুনাগের অধস্তন পঞ্চম বংশধর। ইতিপূর্ব্বে শিশুনাগের মগধের রাজধানী রাজগৃহে প্রতিষ্ঠার কাল খৃঃ পূঃ ৬৩৮ বর্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। শিশুনাগের চতুর্থতম বংশধর ভাতীয়ের নাম সিংহলদ্বীপের প্রামাণিক ইতিহাস মহাবংশে উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। বিষ্ণুপুরাণে এই ভাতীয় 'ক্ষেত্রজ' নামে পরিচিত হইয়াছেন।

বিদেহবংশীয় এই ভাতীয়ের রাজত্বকালে বুদ্ধদেব কপিলবস্তুতে জন্মগ্রহণ করেন। খৃষ্টের আবির্ভাবের পূর্ব্বতন ৫৫৮ অব্দে বুদ্ধদেব ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হন। এই ঘটনার পাঁচ বৎসর পরে খৃঃ পূঃ ৫৫৩ অব্দে, রাজগৃহের রাজপ্রাসাদে মহারাজ ভাতীয়ের পুত্র বিম্বিসার জন্মগ্রহণ করেন। এই বিম্বিসারের

রাজত্বের ষোড়শতম বর্ষে ৩৫ বৎসর বয়সে বুদ্ধদেব বোধিদ্রুমের মূলে সিদ্ধি লাভ করিয়া বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন। ৫২৩ খৃঃ পূঃ অব্দে বুদ্ধদেব বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া ধর্ম্মপ্রচারের জন্য বারাণসীতে গমন করেন। সেই সময়ে 'মহাবংশের' মতে বিম্বিসারের রাজত্বের ষোড়শ বর্ষ গত হইতেছিল। ইহা হইতে বিম্বিসারের রাজ্যারম্ভকাল খৃঃ পূঃ ৫৩৮ অব্দ বলিয়া জানা যাইতেছে। বিম্বিসার হইতে শিশুনাগ চারি পুরুষ অন্তর। চারি পুরুষে এক শতাব্দী ধরিয়া বিম্বিসারের শত বর্ষ পূর্ব্বে শিশুনাগের রাজত্বের আরম্ভকাল খৃঃ পূঃ ৬৩৮ অব্দ পাওয়া যাইতেছে।

মহাবংশের মতে বিম্বিসার ৫২ বৎসর, অজাতশত্রু ৩২, উদয়িভদ্রক ১৬, অনুরাধক ও মুণ্ড ৮, নাগদশক ২৪, দ্বিতীয় শিশুনাগ ১৮, কালাশোক মহানন্দ ২৮, সুধন্বা নন্দ ২২, নবনন্দ ২২, চন্দ্রগুপ্ত ৩৪, বিন্দুসার ২৮, এবং অশোক ৩৭ বৎসর মগধে রাজত্ব করেন। ৮০ বৎসর বয়সে ৪৫ বৎসর ধর্ম্মপ্রচারে অতিবাহিত করিয়া, অজাতশত্রুর রাজত্বের অষ্টম বর্ষে, বুদ্ধদেব কুশীনগরে নির্ব্বাণ লাভ করেন। সেই বৎসর রাজগৃহে প্রথম বৌদ্ধ মহাসঙ্ঘের অধিবেশন হয়। কালাশোকের রাজত্বের দশম বর্ষে ও বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণলাভের শত বৎসর পরে, দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসংঘ বৈশালী নগরে অধিবিষ্ট হয়। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণলাভের ২১৮ বৎসর পরে এবং রাজপদপ্রাপ্তির ৪ বৎসর পরে মহারাজ অশোক পাটলীপুত্রের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। মহারাজ অশোকের সাম্রাজ্যপদে অভিষেকের অষ্টাদশতম বর্ষে ও বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণলাভের ২৩৬ বৎসর পরে, অশোকের পুত্র মহেন্দ্র বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারের জন্য সিংহলদ্বীপে গমন করেন। এই সকল সময়নির্দ্দেশ হইতে অনায়াসে শিশুনাগের প্রতিষ্ঠিত বিদেহবংশ, নন্দবংশ ও মৌর্য্যবংশের সময় নিরূপিত হইতে পারে। কিন্তু 'মহাবংশের' নির্দ্দেশ-অনুসারে খৃষ্টের আবির্ভাবের পূর্ব্বতন ৫৪৩ অব্দে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ লাভ করেন। তদবধি মগধের সম্রাট অজাতশত্রুর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধাব্দের কালগণনা আরব্ধ হয়। এই বৌদ্ধাব্দ সিংহল ও ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত হয়। এই কালগণনায় ৬৫ বৎসরের ভ্রম প্রবিষ্ট হইয়াছে; পশ্চাৎ তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। (১)

(১) "It appears to me to be impossible for any unbiassed examiner of these records to follow up the links of this well connected chain of chro-

বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণলাভের ২১৮ বৎসর পরে মহারাজ অশোক পাটলীপুত্রের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। ৫৪৩ হইতে ২১৮ বৎসর বাদ দিয়া ৩২৫ খৃঃ পূঃ অব্দে অশোকের রাজ্যাভিষেকের কাল পাওয়া যাইতেছে। অশোক ৩৭ বৎসর মগধ সাম্রাজ্য শাসন করেন। খৃঃ পূঃ ৩২৫ হইতে ২৮৮ খৃঃ পূঃ অব্দ পর্য্যন্ত অশোক মহাবংশের মতে মগধে রাজত্ব করেন; গ্রীক ইতিহাসবিৎগণের নির্দ্দেশ অনুসারে, ৩২১ খৃঃ পূঃ সুবিখ্যাত গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডার পঞ্জাব আক্রমণ করিয়া পুরুরাজকে পরাজিত করেন। মগধের রাজকুমার চন্দ্রগুপ্ত সম্রাট আলেকজাণ্ডারের শিবিরে উপনীত হইয়া সমাদরের সহিত গৃহীত হন। চন্দ্রগুপ্তের গর্ব্বিত ব্যবহারে গ্রীক সম্রাট বিরক্ত হইলে, চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক শিবির হইতে পলায়ন করেন। ৩২৩ খৃঃ পূঃ অব্দে ব্যাবিলন নগরে গ্রীক সম্রাটের মৃত্যু হয়। পর বৎসর চন্দ্রগুপ্ত পঞ্জাবে বিদ্রোহপতাকা উড্ডীন করিয়া গ্রীক সম্রাটের প্রতিষ্ঠিত পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তাকে ব্যতিব্যস্ত করেন। জাষ্টিনের মতে ৩১৭ খৃঃ অব্দে চন্দ্রগুপ্তের দ্বারা গ্রীক শাসনকর্ত্তা নিহত হন, এবং পঞ্জাব চন্দ্রগুপ্তের পদানত হয়। ইহার প্রতিশোধগ্রহণমানসে সিরিয়ার সম্রাট সেলিউকাস নাইকেটর ব্যাবিলন ও ব্যাক-

nological evidence, and arrive at the specific date of 218 A. B., assigned to the inauguration of *Asoka*, without acknowledging that that date is designedly a cardinal point in the history....If the *Buddhistical* evidence is to be sustained, the invasion of Alexander, must, as the necessary consequence, be considered to have taken place in the early part of the reign of *Asoka*, and not during the commotions which preceded the usurpation of the Indian Empire by his grandfather *Sandracottus*; and the embassy of Megasthenes and the treaty of Seleucus must also necessarily fall to a more subsequent period of the reign of *Asoka*, instead of their occurring during the rule of *Sandracottus*....I admit myself to be persuaded of the correctness of the conclusions which identifies *Sandracottus* with *Chandra Gupta*; and by my adherence to that persuation, I am necessarily compelled to acknowledge that there is a discrepancy of about 68 years between the Western and *Buddhistical* chronologies, at the particular point at which this identity takes place."

G. Inmour in the "*Journal of Asiatic Society of Bengal.*" VI. 716.

ট্রিয়া অধিকার করিয়া ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তর প্রান্তে উপনীত হন। চন্দ্রগুপ্তের সহিত মিত্রতা সংস্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার পরাক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী এণ্টিগোনাসের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য ৩১২ খৃঃ পূঃ অব্দে ব্যাবিলন নগরে প্রত্যাবৃত্ত হন। চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলীপুত্র নগরে ৩১২—৩০৭ খৃঃ পূঃ অব্দে মিগাস্থিনিস গ্রীক সম্রাটের দূতরূপে অবস্থিতি করিয়া, ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। মেগাস্থিনিস 'সেন্দ্রেকোটাস' নামে চন্দ্রগুপ্তের এবং 'পালিবোথ্র' নামে পাটলীপুত্রের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। গঙ্গা ও হিরণ্যবাহু শোনের সঙ্গমস্থলে এই পাটলীপুত্র অবস্থিত ছিল। সংস্কৃত পুরাণ ও 'মুদ্রারাক্ষস' অধ্যয়নকালে সার উইলিয়াম জোন্স মগধেশ্বর চন্দ্রগুপ্তের নাম অবগত হন। তদবধি মেগাস্থিনিসের বর্ণিত সেন্দ্রেকোটাস ও চন্দ্রগুপ্ত অভিন্ন বলিয়া তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মে। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি এই অভিন্নতা ইউরোপীয় পণ্ডিতসমাজে সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত করেন। মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্তের নাম, সময় ও রাজধানী নিঃসন্দিগ্ধরূপে অবধারিত করিয়া, কল্পনার রাজ্য হইতে ভারতীয় ঘটনাপুঞ্জ ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে আনয়ন করেন। তদবধি ভারতীয় পুরাতত্ত্বের কালনির্ণয়ের সূত্রপাত হয়। (১)

(১) "I cannot help mentioning a diseovery, which accident threw in my way....To fix the situation of that *Palibothra* which was visited and described by Megasthenes, had always appeared a very difficult problem. ...We could not confidently decide that it was *Pataliputra*, though names and most circumstances nearly correspond, because that renowned capital extended from the confluence of the *Sone* and the *Ganges* to the city of *Patna*, while *Palibothra* stood at the junction of the Ganges and *Erannobous*...But this only difficulty was removed, when I found in a classical Sanskrit near 2000 years old, that *Hiranyabahu*, which the Greeks changed into *Erannobous*, was in fact another name for the *Sone* itself... This discovery led to another of greater moment; for *Chandra Gupta*, who from a military adventurer, became like *Sandracottus*, the sovereign of upper Hindustan, actually fixed the site of his empire at *Pataliputra*, where he received ambassadors from foreign princes, and was no other than that very *Sandracottus* who concluded a treaty with Seleucus Nicator."—Sir William Jones in "Asiatic Researches", IV. 10—11.

পালী 'মহাবংশের' নির্দ্দিষ্ট খৃঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দকে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণলাভের সময় বলিয়া গ্রহণ করিলে, মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক ঘটনা তাঁহার পৌত্র অশোকের সময়ে সংঘটিত হয় বলিয়া নির্ণয় করিতে হয়। 'মহাবংশে'র মতে অশোক ও চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে ৬২ বৎসর অন্তর; অতএব পূর্ব্বোল্লিখিত কারণ হইতে স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হইতেছে যে, 'মহাবংশে'র সময়নির্দ্দেশে অন্ততঃ ৬২ বৎসরের ভ্রম প্রবিষ্ট হইয়াছে। টার্ণার সাহেবের মতে ৬৮, ওয়েবারের মতে ৬৬, এবং আমাদের বিবেচনায় ৬৫ বৎসরের ভ্রমপ্রমাদ মহাবংশের সময়নির্ণয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছে। মহাবংশের নির্দ্দিষ্ট সময় হইতে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণলাভের কাল ৬৫ বৎসর পরবর্ত্তী। খৃঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দের পরিবর্ত্তে খৃঃ পূঃ ৪৭৮ অব্দে বুদ্ধদেব পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে কানিংহাম সাহেবের দ্বারা বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণলাভের এই প্রকৃত সময় প্রথমতঃ অনুমিত হয়। (১) পালীভাষায় সুপণ্ডিত রিজ ডেভিড সাহেবের মতে, বুদ্ধদেব ৪১২ খৃঃ পূঃ অব্দে বা তৎসন্নিহিত কালে নির্ব্বাণ লাভ করেন, এবং অশোক বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ লাভের ১৫০ বৎসর পরে প্রাদুর্ভূত হন। সুবিখ্যাত পণ্ডিত ওয়েবার সাহেবের মতে বুদ্ধদেব খৃঃ পূঃ ৩৭০ অব্দে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। (২) লাসেনের মতে বৌদ্ধনরপতি কনিষ্ক ৪০ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হন বলিয়া তাঁহার নামাঙ্কিত মুদ্রালিপি হইতে জানা যায়। তিব্বতীয় ও চৈনিক বৌদ্ধ গ্রন্থের মতে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের ৪০০ পরে এই কণিষ্কের সময় চতুর্থ বৌদ্ধ মহাসংঘের অধিবেশন হয়।

বুদ্ধদেবের আবির্ভাব ও নির্ব্বাণকাল সম্বন্ধে সিংহলের ন্যায় অন্যান্য দেশেও ভ্রান্ত মত প্রচলিত আছে। চীন ও জাপানদেশীয় বৌদ্ধগণের মতে, ১০২৭ খৃঃ পূঃ অব্দে বুদ্ধদেবের জন্ম হয়, এবং ৯৪৯ খৃঃ পূঃ অব্দে নির্ব্বাণলাভ ঘটে। তিব্বতীয় বৌদ্ধ গ্রন্থের মতে খৃঃ পূঃ ৯৬২ অব্দে বুদ্ধদেবের জন্ম হয়, এবং খৃঃ পূঃ ৮৮২ অব্দে তিনি পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধগণের মতে ৬২৮ খৃঃ পূঃ অব্দে গৌতমের জন্ম, এবং ৫৪৪ খৃঃ পূঃ অব্দে নির্ব্বাণপ্রাপ্তি সংঘটিত হয়। সিংহলীয় মহাবংশের মতে খৃঃ পূঃ ৬২৩ অব্দে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়া খৃঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দে পরিনির্ব্বাণ করেন। (৩)

(১) *Journal of Asiatic Society of Bengal*, xxiii. 704.

(২) Rhys David's "*Buddhism*". (1880). A. Weber's "*History of Indian Literature*". (1878), p. 287.

(৩) "With reference to the tradition as to *Buddha's* age, the various

ইতিপূর্ব্বে বিস্তারিতভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বুদ্ধদেব ৫৫৮ খৃঃ পূঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া খৃঃ পূঃ ৪৭৮ অব্দে পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। এই সময় নিরূপণের সত্যতা ও অভ্রান্ততা সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে বিবিধ কারণ প্রদর্শিত হই-হইয়াছে। ইহা হইতে পূর্ব্বতম ও পরবর্ত্তী সময় নিশ্চিতরূপে নির্ণীত হইতে পারে। পালী 'মহাবংশের' নির্দ্দিষ্ট রাজত্বকাল অবলম্বনে নিম্নে মগধরাজ অজাতশত্রুর পূর্ব্বতন ও পরবর্ত্তী বিভিন্নবংশীয় নরপতিগণের সময় নির্দ্দেশ করিব। বিদেহবংশীয় মগধের নরপতিদিগের উর্দ্ধতন পৌরাণিক কালের সময়গণনার আবশ্যকতা দৃষ্ট হইতেছে না।

বিদেহবংশ।

১।	শিশুনাগ	(খৃঃ পূঃ ৬৩৮)
২।	কাকবর্ণ	(„ „ ৬১৩)
৩।	ক্ষেমধর্ম্ম	(„ „ ৫৮৮)
৪।	ভাতীয়	(„ „ ৫৬৩)
৫।	বিম্বিসার	(„ „ ৫৩৮)
৬।	অজাতশত্রু	(„ „ ৪৮৬)
৭।	উদয়িভদ্রক	(„ „ ৪৫৪)
৮।	অনুরাধকমুণ্ড	(„ „ ৪৩৮)
৯।	নাগদশক	(„ „ ৪৩০)
১০।	শিশুনাগ (২)	(„ „ ৪০৬)

Buddhist eras which commence with the date of his death exhibit the widest divergence from each other. Among the Northern Buddhists 14 different accounts are bound, ranging from B. C. 2242 to B. C. 546; the eras of the Southern Buddhists on the contrary, mostly agree with each other, and all of them start from B. C. 544 or B. C. 543. This latter chronology has been recently adopted as the correct one, on the ground that it accords best with historical conditions, although even it displays a discrepancy of 66 years as regards the historically authenticated date of *Chandra Gupta*."—

A. Weber's "*History of Indian Literature*". (1878), p. 287.

নন্দবংশ।

১১।	কালাশোক মহানন্দ	(„ „ ৩৮৮)
১২।	সুধন্বা নন্দ	(„ „ ৩৬০)
১৩।	নব নন্দ	(„ „ ৩৩৮)

মৌর্য্যবংশ।

১।	চন্দ্রগুপ্ত	(„ „ ৩১৬)
২।	বিন্দুসার	(„ „ ২৯২)
৩।	ধর্ম্মাশোক প্রিয়দর্শী	(„ „ ২৬৪)
৪।	সুযশ (কুণাল)	(„ „ ২২৩)
৫।	দশরথ	(„ „ ২১৫)
৬।	সঙ্গত	(„ „ ২০৭)
৭।	শালিশুক	(„ „ ২০০)
৮।	সোমাশ্রম	(„ „ ১৯৪)
৯।	শতধন্বা	(„ „ ১৯০)
১০।	বৃহদ্রথ	(„ „ ১৮৬)

বিম্বিসার হইতে অশোক পর্য্যন্ত মগধের নরপতিগণের রাজত্বকালের পরিমাণ 'মহাবংশ' হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই বিষয়ে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রাচীন ও প্রামাণিক ইতিহাসের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিবার অণুমাত্রও কারণ দেখিতে পাইতেছি না। মহাবংশের মতে চন্দ্রগুপ্ত ৩৪ বৎসর এবং বুদ্ধঘোষের রচিত 'অর্থকথা' মতে ২৪ বৎসর মগধে রাজত্ব করেন। আমরা চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালের পরিমাণ ২৪ বৎসরই সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিলাম। খৃঃ পূঃ ৩২৬ অব্দে চন্দ্রগুপ্ত পঞ্জাব প্রদেশে নন্দবংশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করেন। মহাবংশে সেই সময় হইতে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল পরিগণিত হইয়া থাকিবে। ইহার দশ বৎসর পরে নন্দবংশের উচ্ছেদসাধন-পূর্ব্বক তিনি পাটলীপুত্রে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। নন্দবংশ সুপ্রাচীন বিদেহবংশ হইতে উদ্ভূত হয়। সচরাচর নন্দবংশের রাজত্বকাল শত বর্ষ বলিয়া গণিত হয়। সিংহলীয় প্রাচীন ইতিহাসের মতে, নন্দবংশ তিন পুরুষে ৭২ বৎসর রাজত্ব করেন। এই বংশীয় প্রথম রাজা কালাশোকের রাজত্বের দশম বর্ষে ও বুদ্ধদেবের তিরোভাবের শতবর্ষ পরে খৃঃ পূঃ ৩৭৮ অব্দে বৈশালী নগরে দ্বিতীয় বৌদ্ধমহাসংঘের অধিবেশন হয়। কালাশোকের পর তাঁহার পুত্র নন্দ রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হন। তাঁহার পিতা মহানন্দ নামে বিষ্ণু-

পুরাণে বর্ণিত হইয়াছেন। অনন্তর নন্দের নয় জন পুত্র (১) সমবেতভাবে মগধের শাসনদণ্ড পরিচালন করেন। তাঁহাদের শাসনকালের মধ্যভাগে খৃঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডার পঞ্জাব আক্রমণ করিয়া পর বৎসর স্থলপথে ব্যাবিলন নগরে প্রত্যাবৃত্ত হন। এই সময়েই চন্দ্রগুপ্ত পঞ্জাবে নন্দবংশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া থাকিবেন। অবশেষে চাণক্যের (২) বুদ্ধিকৌশলে নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া, খৃঃ পূঃ ৩১৬ অব্দে চন্দ্রগুপ্ত মগধে মৌর্য্যবংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন।

চন্দ্রগুপ্ত মহারাজ নন্দের নাপিতজাতীয়া উপপত্নীর গর্ভজাত বলিয়া জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। তাঁহার মাতার নাম মুরা। নীচজাতীয়া মুরার গর্ভজাত বলিয়া নন্দের পুত্রগণ চন্দ্রগুপ্তকে অত্যন্ত ঘৃণা ও অবজ্ঞা করিতেন। এই

(১) ১৮৭৫ খৃঃ কর্ণূল নগরে একটি মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়। তাহাতে পালী অক্ষরে কুনন্দের নাম লিখিত দৃষ্ট হয়। উহাতে কুনন্দ 'মহারাজ' ও 'অমোঘভ্রাতৃক' বিশেষণে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা হইতে ডাক্তার মিত্র তাঁহাকে নব নন্দের অন্যতম বলিয়া অনুমান করেন।
Journal of Asiatic Society for 1875.

(২) বিশাখদত্তের রচিত 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকে চাণক্যের বুদ্ধিকৌশল এবং চন্দ্রগুপ্তের প্রতি তাঁহার অপার স্নেহ ও অসীম অনুগ্রহ বর্ণিত হইয়াছে। কোন্ সময়ে এই রাজনৈতিক নাটক প্রণীত হয়, তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। অনন্ত কবির দ্বারা এই নাটকের একখানি পূর্ব্বপঠিকা বা ভূমিকা রচিত হয়। তাহাতে সুধন্বা নন্দের নয় পুত্রের কাল্পনিক নাম প্রদত্ত হইয়াছে। রাজমহিষী রত্নবতীর গর্ভে সুধন্বা নন্দের নয় পুত্র জন্মে। উদগ্রধন্বা, তীক্ষ্ণধন্বা, বিকটধন্বা, উৎকটধন্বা, প্রকটধন্বা, সংঘটধন্বা, বিষ্মধন্বা, শিখরধন্বা ও প্রখরধন্বা নামে নন্দের নয় পুত্র সম্মিলিতভাবে মগধ সাম্রাজ্য শাসন করেন। বিষ্ণুপরাণে সুমাল্য এই নবনন্দের জ্যেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; মুদ্রালিপি হইতে কুনন্দের নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে। চাণক্যরচিত নীতিশাস্ত্র 'চাণক্য-শতক' নামে প্রসিদ্ধ; ন্যায়সূত্রের প্রাচীনতম ভাষ্যকার বাৎসায়ন ও চাণক্য অভিন্ন ব্যক্তি। চন্দ্রগুপ্তের গুরু ও মন্ত্রী চাণক্য পক্ষিল স্বামী নামে পরিচিত। তিনি বাৎস্যগোত্রে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম চাণক্য। মহর্ষি গৌতমের প্রণীত ন্যায়সূত্রের ভাষ্য পণ্ডিতশিরোমণি চাণক্যের দ্বারা রচিত হয়। 'ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্য' বাচস্পতি মিশ্র এবং সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে মাধবাচার্য্য পক্ষিল স্বামীকে ন্যায়সূত্রের ভাষ্যকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জৈন আচার্য্য হেমচন্দ্র সূরির মতে চাণক্যই কৌটিল্য, বাৎসায়ন, মল্লনাগ, দ্রামিল, অঙ্গুল, বিষ্ণুগুপ্ত ও পক্ষিল স্বামী নামে পরিচিত ছিলেন।

"বাৎসায়নো মল্লনাগঃ কুটিলশ্চণকাত্মজঃ।
দ্রামিলঃ পক্ষিলস্বামী বিষ্ণুগুপ্তোঽঙ্গুলশ্চ সঃ॥"—অভিধানচিন্তামণি।

নিমিত্তই চন্দ্রগুপ্ত মগধ হইতে পলায়নপূর্ব্বক পঞ্জাবে গ্রীক সম্রাটের শিবিরে উপনীত হইয়া সম্রাটকে মগধ সাম্রাজ্য আক্রমণের জন্য প্ররোচিত করেন। গ্রীক সম্রাটের প্রত্যাবর্ত্তনের পর পঞ্জাবে বিদ্রোহী হইয়া মগধ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। তাঁহার নীচজাতীয়া মাতার নাম অনুসারে চন্দ্রগুপ্তের প্রতিষ্ঠিত বংশ মৌর্য্যবংশ নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। নীচ শূদ্রকুলে উৎপন্ন বলিয়া চন্দ্রগুপ্ত প্রাচীন অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারবর্গের অধিষ্ঠিত রাজগৃহ পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গা ও শোণের সঙ্গমস্থলস্থ পাটলীপুত্র নগরে আপনার রাজধানী সংস্থাপিত করিয়া থাকিবেন। মৌর্য্যবংশ নন্দবংশেরই শাখামাত্র। সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে চন্দ্রগুপ্তের আধিপত্য প্রসারিত হইয়া মগধের অধিকার বিস্তারিত হয়। তাঁহার ন্যায় মহাপরাক্রান্ত সম্রাট ঐতিহাসিককালে ভারতবর্ষে ইতিপূর্ব্বে আবির্ভূত হন নাই। গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিসের মতে, আর্য্যাবর্ত্তের ১১৮টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য চন্দ্রগুপ্তের পদানত হয়। চন্দ্রগুপ্তের সৈনিকবিভাগে ছয় লক্ষ পদাতিক, ত্রিশ সহস্র অশ্বারোহী ও নয় হাজার রণহস্তী নিযুক্ত ছিল।

মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে খৃঃ পূঃ ৩০৫ অব্দে তাঁহার স্বনামখ্যাত পৌত্র অশোকের জন্ম হয়। অশোকের চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু হয়, এবং অশোকের পিতা বিন্দুসার খৃঃ পূঃ ২৯২ অব্দে মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। অষ্টাবিংশতি বৎসর বয়সে ২৭৭ খৃঃ পূঃ অব্দে অশোক পিতার অধীনে উজ্জয়িনীর শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হন। তাঁহার অশিষ্ট ও দুর্বৃত্ত ব্যবহারে বিন্দুসার অশোককে উজ্জয়িনীতে নির্ব্বাসিত করেন। ডাক্তার মিত্রের মতে অশোক তক্ষশীলায় বিদ্রোহ দমন উপলক্ষে প্রেরিত হন। (১) তাঁহার মাতা সুভদ্রাঙ্গী ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। সুভদ্রাঙ্গীর গর্ভে বিন্দুসারের দুই পুত্র অশোক ও বীতাশোকের জন্ম হয়। বিন্দুসারের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুসীম বিদ্রোহী হইয়া পিতার বিরাগভাজন হন, এবং অশোকের স্থলে তক্ষশীলায় প্রেরিত হন।

* "*Asoka* was uncomely in his person, and that was the cause of his not winning the affection of his father. His conduct too was repulsive. He was so very unruly and troublesome that it was deemed adviseable to get rid of him by deputing him to quell a muting which had broken out a *Takshasila*."—Dr. R. L. Mitra's Indo-Aryans," II. 411.

ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান সম্রাটের সম্বন্ধে ডাক্তার মিত্রের গবেষণা কতকগুলি অবিশ্বাস্য ও অমূলক উপাখ্যান সন্নিবিষ্ট করিয়া মহারাজ অশোকের বিকৃত প্রতিকৃতি প্রকাশ করিয়াছে। অশোকের সম্বন্ধে এরূপ অসার ও সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ ডাক্তর মিত্রের ন্যায় পুরাতত্ত্ববিদের লেখনীর উপযুক্ত হয় নাই। মহারাজ অশোকের জীবনী সম্বন্ধে দুই তিনখানি সংস্কৃত গ্রন্থ নেপাল হইতে পুরাতত্ত্ববিদ হগ্‌সন সাহেবের দ্বারা সংগৃহীত হয়। তন্মধ্যে 'দিব্যাবদান' নামক গদ্য গ্রন্থের সারমর্ম্ম প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত বার্নুফের দ্বারা প্রকাশিত হয়, এবং 'অবদানশতক' নামে আর একখানি গ্রন্থের নামমাত্র উল্লিখিত হইয়াছে। 'অশোকাবদান' নামে পদ্যময় তৃতীয় গ্রন্থ অবলম্বনে ডাক্তর মিত্রের প্রবন্ধ ১৮৭৯ খৃঃ রচিত হয়। ইহার এক তৃতীয়াংশে অশোকের উপাখ্যান বর্ণিত আছে, এবং অপরাংশে তাঁহার গুরু উপগুপ্তের বর্ণিত বৌদ্ধধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিবিধ উপাখ্যান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পাটলীপুত্রের কুক্কুটবিহারের অন্তর্গত 'উপকণ্ঠিকারাম' উদ্যানে উপবিষ্ট হইয়া বৌদ্ধযতী জয়শ্রী আপনার শিষ্যবর্গের নিকট এই সকল উপাখ্যান বর্ণনা করেন। অশোকের পিতামহ চন্দ্রগুপ্তের নাম পর্য্যন্ত এই সকল গ্রন্থে উল্লিখিত হয় নাই।

উজ্জয়িনী নগরে অবস্থানকালে খৃঃ পূঃ ২৭৪ অব্দে অশোকের পুত্র মহেন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। এই ঘটনার দশ বৎসর পরে অষ্টাবিংশতি বৎসর রাজত্ব করিয়া মহারাজ বিন্দুসার কালগ্রাসে পতিত হন। সেই সময় হইতে মগধ সাম্রাজ্যের সিংহাসন অধিকারের জন্য রাজকুমারদিগের মধ্যে ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হয়। চারি বৎসর পর্য্যন্ত আত্মকলহে বিন্দুসারের সাম্রাজ্য উৎসন্ন হইবার উপক্রম হয়। চারি দিকে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়া সাম্রাজ্যের আয়তন হ্রাস হইতে থাকে। এই ভ্রাতৃবিরোধে অশোক জয়লাভ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতৃগণ যুদ্ধে নিহত হন। চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহ প্রশমিত করিয়া অশোক সাম্রাজ্যমধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বিবাদে বৃদ্ধ মন্ত্রী রাধগুপ্তের উপদেশ ও মন্ত্রণা হইতে অশোক বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হন। অনন্তর ২৬০ খৃঃ পূঃ অব্দে ৪৫ বৎসর বয়সে মহাসমারোহে মহারাজ অশোক পাটলীপুত্রের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। টার্ণার সাহেবের মতে খৃঃ পূঃ ২৪৭ অব্দে অশোকের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয়। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণলাভের ২১৮ বৎসর পরে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। চন্দ্রগুপ্ত ও বিন্দুসার উভয়েই হিন্দুধর্ম্মে অনুরক্ত ছিলেন; হিন্দুধর্ম্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বলিয়া মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের নাম

পর্য্যন্ত 'অশোকাবদান' এবং 'দিব্যাবদান' নামক সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থদ্বয়ে উল্লিখিত হয় নাই।

রাজ্যাভিষেকের চতুর্থ বর্ষে ২৫৭ খৃঃ পূঃ অব্দে মহারাজ অশোক পৈতৃক হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। বৌদ্ধাচার্য্য উপগুপ্তের নিকট অশোক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন; উরুমুণ্ড পর্ব্বতের আশ্রম হইতে আগমন করিয়া উপগুপ্ত পাটলীপুত্রের বেণুবন বিহারে আপনার বাসস্থান মনোনীত করেন। উপগুপ্ত মথুরা নগরে এক ধনবান শ্রেষ্ঠীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। অশ্বগুপ্ত ও ধনগুপ্ত নামে দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত উপগুপ্ত উরুমুণ্ড পর্ব্বতে বৌদ্ধযতী সোনবাসীর শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। অশোকের ভ্রাতুষ্পুত্র নিগ্রোধ এই সময়ে বৌদ্ধাচার্য্যের পদে নিযুক্ত হন। এই নিগ্রোধই অশোকের বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণের প্রধান প্রবর্ত্তক। অশোকের জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সুসীম, ভ্রাতৃবিরোধে নিহত হইলে, তাঁহার অন্তঃস্বত্ত্বা পত্নী পাটলীপুত্রের রাজপ্রাসাদ হইতে পলায়ন করেন। এই রাজমহিষীর গর্ভে নিগ্রোধের জন্ম হয়। মাতার যত্নে নিগ্রোধ মহারাজ অশোকের অনুষ্ঠিত ভীষণ হত্যাকাণ্ড হইতে রক্ষা পান। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া নিগ্রোধ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধযতীর বেশ ধারণ করেন। এইরূপে মৌর্য্যবংশীয় মগধের রাজকুলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশাধিকার লাভ করে। ভিক্ষা আহরণের ছলে তিনি পাটলীপুত্রের রাজপ্রাসাদের পার্শ্ব দিয়া গমনকালে মহারাজ অশোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। অশোক তাঁহার পূর্ব্ব পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া জিতেন্দ্রিয় বৌদ্ধযতীর দিব্য কান্তি ও রূপলাবণ্যদর্শনে মোহিত হন। নিগ্রোধ মহারাজের সমীপে আহূত হইয়া পিতৃব্যের সহিত পরিচিত হন; অশোক তাঁহার উপদেশে প্রীতিলাভ করিয়া পাটলীপুত্র নগরের বহির্ভাগে তাঁহার আবাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করেন। অবিলম্বে গঙ্গাতীরে কুক্কুটবিহার নির্ম্মিত হইয়া নিগ্রোধের বাসস্থলে পরিণত হয়। এই নিগ্রোধের উপদেশে ও প্ররোচনায় অশোক বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরক্ত হইয়া উপগুপ্তের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তদবধি পাটলীপুত্র বৌদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। পাটলীপুত্রের বিহার হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ ও তাহার চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়া পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ অধিবাসীকে কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত করে।

খৃঃ পূঃ ২৫৬ অব্দে মহারাজ অশোকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা তিষ্য বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। রাজসিংহাসনে অভিষেকের পর, মহারাজ অশোক আপনার

কনিষ্ঠ সহোদরকে উপরাজের পদে অভিষিক্ত করেন। সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারীকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া, অশোক মগধে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বৎসর সিরিয়ার সম্রাট্ দ্বিতীয় এণ্টিয়োকাসের (২৫৯-২৪৪ পূঃ খৃঃ) সহিত সন্ধি ও মিত্রতা সংস্থাপিত করিয়া, ভারতবর্ষের বহির্ভাগে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারের বন্দোবস্ত করেন। সিরিয়া দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম গৃহীত ও আদৃত হইতে থাকে। বৌদ্ধভিক্ষুগণ সিরিয়ায় "এসিনি" নাম ধারণ করিয়া দলে দলে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অহিংসা, দয়াদাক্ষিণ্য, পবিত্রাচার ও নির্ম্মল চরিত্রের জন্য বৌদ্ধযতিগণ সিরিয়ার সর্ব্বত্র সমাদৃত ও সম্মানিত হইতে থাকেন। সিরিয়ায় বৌদ্ধধর্ম্ম ও নীতি সবিশেষ প্রচারিত হয়। মহাত্মা খৃষ্টদেব পেলেষ্টিনে জন্মগ্রহণ করিয়া, স্বদেশীয় বৌদ্ধযতিগণের নিকট ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা করেন। খৃষ্টের আবির্ভাবকালে রোমেন পণ্ডিত প্লিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বরচিত গ্রন্থে বৌদ্ধ 'এসিনি'গণের উল্লেখ করিয়াছেন। খৃষ্টের দ্বারা বৌদ্ধনীতি ও পবিত্রতা খৃষ্টধর্ম্মের অঙ্গীভূত হয়।

খৃঃ পূঃ ২৫৪ অব্দে রাজকুমার মহেন্দ্র ও তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী সঙ্ঘমিত্রা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। সঙ্ঘমিত্রার স্বামী রাজজামাতা অগ্নিবর্ম্মা পত্নীর সহিত বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। মহারাজ অশোকের বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণের পর হইতে, বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। মহারাজ অশোকের যত্নে বৌদ্ধধর্ম্ম রাজকীয় ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতম আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে থাকে। সেই সময় হইতে আট নয় শত বর্ষ পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে একাধিপত্য লাভ করে। দেশে ও বিদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়া, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মগধ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র, সাম্য, মৈত্রী ও অহিংসার প্রশংসাগীতি প্রচারিত হইতে থাকে। হিন্দুধর্ম্মের অনুমোদিত ক্রিয়াকাণ্ড, যাগযজ্ঞ ও পশুবধ রহিত হয়। অশোকের রাজপ্রাসাদে প্রত্যহ বহুতর ব্রাহ্মণ সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্যে ও মাংসাহারে উদর তৃপ্ত করিতেন। বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণের পর, মাংসাহারী ব্রাহ্মণের পরিবর্ত্তে, নিরামিষাশী ও ফলমূলভোজী বৌদ্ধযতিগণকে সযত্নে প্রত্যহ আহার করাইয়া, মহারাজ পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম সম্রাটের অনুগ্রহ লাভ করিয়া, রাজকীয় মহাধর্ম্মে পরিণত হয়। হিন্দুশাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণপণ্ডিতের পরিবর্ত্তে ভিক্ষুবেশী বৌদ্ধযতিগণ মগধ সম্রাটের পূজনীয় ও আদরণীয় হইয়া উঠেন। বৌদ্ধধর্ম্মের স্থূল মর্ম্ম প্রিয়দর্শী মহারাজ

অশোকের নামে মগধ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে থাকে। সাম্রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে প্রস্তর-স্তম্ভে ও পর্ব্বত-গাত্রে সম্রাটের আদেশলিপি উৎকীর্ণ হইয়া, শোভা পাইতে থাকে। (১)

মহারাজ অশোকের দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্ম রাজকীয় ধর্ম্মে পরিণত হইলে, বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে সবিশেষ আধিপত্য লাভ করে। মগধ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র বৌদ্ধধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়। হিন্দুর চিরপূজ্য ব্রাহ্মণজাতি অপেক্ষা বৌদ্ধ শ্রমণ ও যতিগণের সমাদর ও সম্মাননা সর্ব্বত্র বর্দ্ধিত হয়; ইহাতে জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত পতিত হয়। জন্ম ও জাতির প্রভাব তিরোহিত হইয়া, নীতি ও চরিত্রের সম্মান প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতিনির্ব্বিশেষে সচ্চরিত্র, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও ধর্ম্মভীরু বৌদ্ধযতিগণ সর্ব্বত্র সমাদৃত হইতে থাকেন। ধর্ম্মজগতের চিরপ্রচলিত নিয়ম-অনুসারে এই সময়ে অনেক ধূর্ত্ত ও ভণ্ড হিন্দু বৌদ্ধযতির বেশধারণপূর্ব্বক সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে থাকে। যতীর বেশধারী এই সকল প্রবঞ্চক ও অধার্ম্মিকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। এই সকল ধূর্ত্ত প্রতারকের আবির্ভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের মহত্ত্বে ও পবিত্রতায় কলঙ্ককালিমার রেখাপাত হইতে থাকে। বৌদ্ধধর্ম্মের নামে এই সকল ভণ্ড যতিগণ নানাবিধ গর্হিত ও অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে থাকে। অত্যাচার ও উৎপীড়নের সময়ে বিশ্বাসী ও প্রকৃত ধার্ম্মিকের আবির্ভাবে ধর্ম্মের গ্লানি ও মলিনতা দূরীভূত হয়। অত্যাচরিত হইয়া, ধর্ম্ম মহত্ত্ব ও পবিত্রতার দীপ্তিতে সর্ব্বত্র উদ্ভাসিত হয়। উৎপীড়নে প্রকৃত ও বিশ্বাসী

---

(১) বৌদ্ধ সম্রাট্ প্রিয়দর্শী অশোকের নামাঙ্কিত চতুর্দ্দশটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পশ্চিমে গান্ধার ও সৌরাষ্ট্র হইতে পূর্ব্বে কলিঙ্গ, উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে অপরান্ত (উত্তর কঙ্কণ) ও রাষ্ট্রিক (মহারাষ্ট্র) পর্য্যন্ত অশোকের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। অশোকের আদেশলিপি তাহা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতেছে। জুনাগড়ের সন্নিহিত গির্ণার (জীর্ণ নগর), কটকের সন্নিহিত ধৌলি (ধবলগিরি), আফ্গানিস্থানের নিকটবর্ত্তী সাহবাজগিরি, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের অন্তর্গত খলসী, দিল্লী, গাজীপুর ও আলাহাবাদ, মিথিলার অন্তঃপাতী বখরা, লৌরিয়া অররাজ, নবন্দগড়, সরিয়া এবং কেশরিয়া, মগধের অন্তর্গত বরাবর পর্ব্বত, এবং মধ্যভারতের অন্তর্গত রূপনাথ ও সাহসরামে আশোকের শিলালিপি ও প্রস্তরস্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ২৫১ খৃঃ পূঃ অব্দে এই সকল লিপি সর্ব্বপ্রথম ক্ষোদিত হয়। বরাবর পর্ব্বতের একখানি শিলালিপি ২৪৮ খৃঃ পূঃ এবং দ্বিতীয়লিপি ২৪১ খৃঃ পূঃ অব্দে উৎকীর্ণ হয়। গির্ণারের শিলালিপি অশোকের রাজত্বের দ্বাদশতম (২৪৮ খৃঃ পূঃ) এবং অষ্টাবিংশতম (২৩২ খৃঃ পূঃ) ক্ষোদিত হয়।

ধার্ম্মিকের সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়। অত্যাচার ও উৎপীড়ন না থাকিলে, ধর্ম্মে মলিনতা ও অপবিত্রতার ছায়া পতিত হইবার অবকাশ পায় না; ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও প্রবঞ্চকের আবির্ভাব ও ধর্ম্মের উজ্জ্বল প্রভায় কালিমাপাত হইতে পারে না। কিন্তু কোনও ধর্ম্ম পরাক্রান্ত এবং ক্ষমতাশালী নরপতির বিশেষ আশ্রয় ও অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইলে, ধার্ম্মিকের বেশধারী, ধর্ম্মদ্বেষী প্রতারকের আবির্ভাবে, তাহার লাঞ্ছনা ও অবমাননা সাধিত হয়। ধর্ম্মজগতের সর্ব্বত্র এই নিয়ম প্রচলিত। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির ইতিহাস এই বিষয়ে স্পষ্টাক্ষরে সাক্ষ্য দিতেছে। বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস হইতেও এই তত্ত্ব প্রমাণিত হইতেছে।

ভণ্ড ও ধূর্ত্ত বৌদ্ধভিক্ষুর বেশধারী প্রতারকগণের হস্ত হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের মহত্ত্ব ও পবিত্রতা অব্যাহত রাখিবার জন্য, ২৪২ খৃঃ পূঃ অব্দে তৃতীয় মহাসঙ্ঘের অধিষ্ঠান হয়। মহারাজ অশোকের রাজত্বের অষ্টাদশতমবর্ষে পাটলীপুত্র নগরে তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্ঘের অধিবেশন হয়। বৌদ্ধাচার্য্য মোগালীপুত্র তিষ্য এই মহাসভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েন। তিনি এই সময়ে ৭২ বৎসর বয়সে পদার্পণ করেন। ষষ্টি সহস্র ভণ্ড বৌদ্ধযতী বৌদ্ধাচার্য্য তিষ্যের পরামর্শে মহারাজ অশোকের দ্বারা দূরীভূত হয়। অশোকারাম বিহার হইতে এই সকল পীতবেশধারী ভণ্ড যতী শুভ্রবস্ত্রে আবৃত হইয়া রাজাদেশে নিষ্কাশিত হয়। অবিলম্বে তাহারা পাটলীপুত্রপরিত্যাগে বাধ্য হয়। এই উপলক্ষে পাটলীপুত্র নগরে ষষ্টিলক্ষ বৌদ্ধভিক্ষু সমবেত হয়। তন্মধ্যে এক সহস্র মহাজ্ঞানী ও প্রবীণ বৌদ্ধযতী বৌদ্ধাচার্য্য তিষ্যের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়া তৃতীয় মহাসঙ্ঘের অধিবেশনে বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রের সংস্কারে ও পরিশোধনে নিযুক্ত হন। নয় মাস কাল এই মহাসঙ্ঘের অধিবেশনে বৌদ্ধ 'ত্রিপিটক' সংশোধিত হয়। এই মহাসভায় দেশবিদেশে ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণের কর্ত্তব্যতা স্থিরীকৃত হয়। তদনুসারে বর্ষাকালের অবসানে বৌদ্ধাচার্য্য মহেন্দ্র ধর্ম্মপ্রচারের জন্য সিংহল দ্বীপের অভিমুখে জলযান আরোহণ পূর্ব্বক যাত্রা করেন। (১)

(১) মহেন্দ্র স্বীয় ভগিনী সঙ্ঘমিত্রার সহিত সিংহলে যাত্রা করেন। উজ্জয়িনী নগরে অবস্থানকালে যুবরাজ অশোক বৈশ্যনগরে কার্য্যোপলক্ষে গমন করিয়া, এক পরমসুন্দরী শ্রেষ্ঠীকন্যাকে দৈবাৎ দর্শন করেন। অশোক উক্ত বণিকতনয়ার রূপে মুগ্ধ হইয়া, বণিকের নিকট আপন বিবাহের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। বণিক এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, অশোকের হস্তে স্বীয় দুহিতাকে পরম আহ্লাদে সমর্পণ করেন। এই শ্রেষ্ঠীর তনয়া 'দেবী' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই রমণীর গর্ভে অশোকের পুত্র মহেন্দ্র ও তনয়া সঙ্ঘমিত্রার জন্ম হয়।—Journal of A. St. Bengal, vii, 930.

বৌদ্ধাচার্য্য মহেন্দ্রের দ্বারা সিংহল দ্বীপ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। সিংহল রাজ্যের সর্ব্বত্র বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়। সিংহলের রাজধানী অনুরাধপুরে মহাবিহার নির্ম্মিত হইয়া, তাহা বৌদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। ২৩৪ খৃঃ পূঃ অব্দে মহেন্দ্র সিংহলে মহাসমারোহে প্রধান ধর্ম্মাচার্য্যের পদে অভিষিক্ত হন। ১৯৪ খৃঃ পূঃ অব্দে অশীতি বৎসর বয়সে আচার্য্য মহেন্দ্র সিংহল দ্বীপে তনুত্যাগ করেন। তিনি ৪৮ বৎসর কাল সিংহলে অবস্থিতি করিয়া, তথায় বৌদ্ধধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

২২৩ খৃঃ পূঃ অব্দে মগধের সম্রাট অশোক ৩৭ বৎসর রাজত্বের পর কালগ্রাসে পতিত হন। সিংহলের প্রাচীন ইতিহাসে অশোকের পরবর্ত্তী মগধের কোনও নরপতির উল্লেখ দেখা যায় না। অশোকের অধস্তন মৌর্য্যবংশীয় নরপতিগণের নামমালার জন্য বিবিধ পুরাণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এই সকল পুরাণের মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ ও বায়ুপুরাণ অতি প্রাচীন। বিষ্ণুপুরাণের মতে মৌর্য্যবংশীয় দশ জন নৃপতি ১৩৭ বৎসর মগধে রাজত্ব করেন। বায়ুপুরাণ ও ভাগবত পুরাণে এই রাজত্বকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মৌর্য্যবংশের পূর্ব্বতন নন্দবংশীয় নয় জন রাজা ১০০, শিশুনাগবংশীয় দশ জন ৩৬২, প্রদ্যোতবংশীয় পাঁচ জন ১৩৮, এবং বার্হদ্রথ-বংশীয় ২৪ জন নরপতি ১০০০ বৎসর রাজত্ব করেন। (১) বিষ্ণুপুরাণের নির্দ্দিষ্ট নামমালা অধিকতর প্রামাণিকবোধে ইতিপূর্ব্বে গৃহীত হইয়াছে। চন্দ্রগুপ্ত হইতে অশোক পর্য্যন্ত মৌর্য্যবংশীয় তিন জন নরপতি ৩১৬—২২৩ খৃঃ পূঃ অব্দ পর্য্যন্ত ৯৩ বৎসর রাজত্ব করেন; বিষ্ণুপুরাণ মৌর্য্যবংশের রাজত্বকাল ১৩৭ বৎসর নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, অশোকের অধস্তন সাত জন মৌর্য্যনরপতি ৪৫ বর্ষকাল মগধে শাসনদণ্ড পরিচালন করেন। গড়ে অশোকের বংশধরেরা ৭ বৎসরেরও ন্যূনকাল রাজত্ব করেন। বিষ্ণুপুরাণে মৌর্য্যবংশীয় বিভিন্ন নৃপতিদিগের রাজত্বকালের পরিমাণ প্রদত্ত হয় নাই।

বায়ুপুরাণের মতে মৌর্য্যবংশীয় নয় জন নরপতি ১৩৭ বৎসর মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। বায়ুপুরাণের মতে চন্দ্রগুপ্ত ২৪, ভদ্রসার ২৫, অশোক ২৬, কুণাল ৮, বন্ধুপালিত ৮, ইন্দ্রপালিত ১০, দেবধর্ম্মা ৭, শতধর ৮, এবং বৃহদ্রথ ৭ বৎসর মগধে রাজত্ব করেন। (২) চন্দ্রগুপ্ত, অশোক ও বৃহ-

(১) বিষ্ণুপুরাণ; চতুর্থ অংশ; ২৩।২৪ অধ্যায়।

(২) "চন্দ্রগুপ্তং নৃপং রাজ্যে কৌটিল্যঃ স্থাপয়িষ্যতি।
চতুর্ব্বিংশৎসমারাজা চন্দ্রগুপ্তো ভবিষ্যতি ॥ ৩২৫ ॥

দ্রথের নাম ভিন্ন বিষ্ণুপুরাণের সহিত বায়ুপুরাণের নামমালার কোনও সাদৃশ্য নাই। বায়ুপুরাণের নির্দ্দিষ্ট বিভিন্ন নৃপতিদিগের রাজত্বকালের সমষ্টি ১২৩ বৎসর মাত্র পাওয়া যাইতেছে। ইহা হইতে বায়ুপুরাণের ভ্রান্তি স্পষ্টাক্ষরে অনুমিত হইতেছে। মৎস্যপুরাণের মতে মৌর্য্যবংশীয় চারি জন রাজা মগধে আবির্ভূত হন।

অশোকের মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধর মৌর্য্যকুলজাত নরপতিগণ ক্রমশঃ হীনবল হইতে থাকেন। অশোকের পর মৌর্য্যবংশ ৪৫ বৎসরকালমাত্র মগধে প্রতিষ্ঠিত থাকে। বিষ্ণুপুরাণের ন্যায় বায়ুপুরাণ ও ভাগবত পুরাণ মৌর্য্য বংশ ১৩৭ বৎসর মগধে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। বৃহদ্রথ মৌর্য্যবংশীয় দশম নরপতি। সেনাপতি পুষ্পমিত্র (পুষ্য মিত্র) আপনার প্রভু বৃহদ্রথকে নিধন করিয়া পাটলীপুত্রের সিংহাসনে আরোহণপূর্ব্বক মগধে সুঙ্গ (মিত্র) বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। (১) খৃঃ পূঃ ১৭৯ অব্দে সুঙ্গবংশের আধিপত্য মগধে সংস্থাপিত হয়, এবং মহারাজ পুষ্পমিত্রের নাম অনুসারে রাজধানী পাটলীপুত্র 'কুসুমপুর' নামে পরিচিত হইতে থাকে।

ভবিতা ভদ্রসারস্তু পঞ্চবিংশৎসমানৃপঃ।
ষড়বিংশৎসমারাজা অশোকো ভবিতা নৃষু॥ ৩২৬ ॥
তস্য পুত্রঃ কুণালস্তু বর্ষাণ্যষ্টৌ ভবিষ্যতি।
কুণালসূনুরষ্টৌ চ ভোক্তা বৈ বন্ধুপালিতঃ॥ ৩২৭ ॥
বন্ধুপালিতদায়াদো দশমানীন্দ্রপালিতঃ।
ভবিতা সপ্তবর্ষাণি দেবধর্ম্মা নরাধিপঃ॥ ৩২৮ ॥
রাজা শতধরশ্চাষ্টৌ তস্য পুত্রো ভবিষ্যতি।
বৃহদশ্বশ্চ বর্ষাণি সপ্ত বৈ ভবিতা নৃপঃ॥ ৩২৯ ॥
ইত্যেতে নব ভূপা যে ভোক্ষ্যন্তি চ বসুন্ধরাং।
সপ্তত্রিংশচ্ছতং পূর্ণং তেভ্যস্তু গৌ ভবিষ্যতি॥ ৩৩০ ॥
পুষ্পমিত্রস্তু সেনানীরুদ্ধৃত্য বৈ বৃহদ্রথং।
কারয়িষ্যতি বৈ রাজ্যং সমাঃ ষষ্টিং সদৈব তু॥ ৩৩১ ॥

বায়ুপুরাণ। উত্তর ভাগ। ৩৭ অধ্যায়।

(১) ডাক্তর কারণ সাহেবের মতে ৩২২ খৃঃ পূঃ অব্দে চন্দ্রগুপ্তের দ্বারা মগধে মৌর্য্যবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ সাহেবের এই অনুমানকে প্রামাণিক বলিয়া বোম্বের বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিৎ ডাক্তর রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর গ্রহণ করিয়াছেন। তদনুসারে তিনি ৩২২—১৮৫ খৃঃ পূঃ অব্দ পর্য্যন্ত ১৩৭ বৎসর মৌর্য্যবংশের রাজত্বকাল অবধারণ করিয়াছেন। তাঁহার

মহারাজ অশোকের পৌত্র দশরথের নামাঙ্কিত এক শিলালিপি বরাবর পর্ব্বতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যায় যে, মহারাজ দশরথ বৌদ্ধ ছিলেন। বৌদ্ধযতীদিগের বিশ্রামার্থ দশরথ রাজত্বের প্রথম বর্ষে পর্ব্বতগাত্রে যে মনোরম প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করান, তাহা 'গোপী গুহা' নামে অদ্যাপি প্রসিদ্ধ। অশোকের রাজত্বের দ্বাদশতম (২৪৮ খৃঃ পূঃ) ও ঊনবিংশতিতম (২৪২ খৃঃ পূঃ) বর্ষে বৌদ্ধযতীদিগের নিবাসের জন্য তিনটি বৃহত্তর প্রকোষ্ঠ নির্ম্মিত হয়। তাহা এক্ষণে 'কর্ণচৌপর', 'সুদাম' ও 'বিশ্ব' গুহা নামে পরিচিত। পিতামহের পদানুসরণ করিয়া দশরথ নাগার্জ্জুনী পর্ব্বতগাত্রে এই প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করিয়া, অবিনশ্বর কীর্ত্তি ও অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। কানিংহাম সাহেবের মতে, ২১৪ খৃঃ পূঃ অব্দে দশরথের রাজত্ব আরব্ধ হয়। (১) ইহা হইতে আমাদের অনুমিত সময়ের সত্যতা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে। মৌর্য্যবংশীয় মহারাজ দশরথ ও তাঁহার বংশধরগণের ন্যায় সুঙ্গবংশ বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহাদের নামাঙ্কিত বহুতর মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই সকল মুদ্রায় বৌদ্ধস্তূপ, বোধিদ্রুম ও ধর্ম্মচক্রের প্রতিকৃতি দৃষ্টে, মিত্রবংশীয় নরপতিদিগের বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরক্তি-সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

মতে ১৮৫—১১৮ খৃঃ পূঃ অব্দ পর্য্যন্ত ৬৭ বৎসর সুঙ্গবংশ ও ১১৮—৭৩ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত কাণ্ববংশ ৪৫ বর্ষ কাল মগধে রাজত্ব করেন। ৭৩ খৃঃ পূঃ অব্দ হইতে ২১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২৯১ বৎসর কাল অন্ধ্রভৃত্য বংশ দক্ষিণাপথে রাজত্ব করেন। রমেশ বাবুর মতে সুঙ্গবংশ ১৮৩ খৃঃ পূঃ অব্দে, কাণ্ববংশ ৭১ খৃঃ পূঃ অব্দে ও অন্ধ্রভৃত্য বংশ ২৬ খৃঃ পূঃ অব্দে আধিপত্য লাভ করেন। প্রিন্সেপ সাহেবের মতে ২১ খৃঃ অব্দে এবং উইলফোর্ডের মতে ১৯০ খৃষ্টাব্দে অন্ধ্রভৃত্যবংশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রিন্সেপ ও কার্লেইল সাহেবের মতে ১৭৮ খৃঃ পূঃ অব্দে সুঙ্গবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়।

(১) "The two groups of *Barabar* caves are separated by date as well as by position, *Satghara* caves having been excavated in the 12th and 19th year of *Rajah Piyadasi* or *Asoka*, while those of Nagarjune were excavated in the first year of *Dasarath*, the beloved of the *Devas*. According to the Vishnu-Purana, *Dasarath* was the grandson of *Asoka* and the son of *Suyasas*. As the son of *Asoka*, according to the Vayu-Purana, reigned only 8 years, the accession of *Dasarath* must have taken place in 214 B.C."—A. Cunningham's "Archa-eological Survey Reports, for 1861-62, p. xlviii-xlix in J.A.S.B. for 1863.

বিষ্ণুপুরাণের মতে সুঙ্গ (মিত্র) বংশের আধিপত্য ১১২ বৎসর এবং কাণ্বংশের অধিকার ৪৫ বর্ষ প্রতিষ্ঠিত থাকে। বায়ুপুরাণে উভয় রাজবংশের অবস্থিতিকাল সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণের সহিত কোনও অনৈক্য দৃষ্ট হয় না। উভয়বংশীয় নরপতিদিগের নামমালা সম্বন্ধে বিষ্ণু ও বায়ুপুরাণের বিশেষ কোনও বিভিন্নতা লক্ষিত হয় না। সুঙ্গবংশে ১০ জন ও কাণ্বংশে ৪ জন নৃপতি আবির্ভূত হন। ক্ষত্রিয়জাতীয় সুঙ্গবংশ যেমন সেনাপতির পদ হইতে রাজপদে অধিষ্ঠিত হন, সেইরূপ ব্রাহ্মণজাতীয় কাণ্বংশ মন্ত্রিত্বপদ হইতে রাজত্ব লাভ করেন। ব্রাহ্মণজাতীয় মন্ত্রী বালাজী বিশ্বনাথ খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যেরূপ মহারাষ্ট্রপতি শিবাজীর পৌত্রের হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক শাসনদণ্ড আচ্ছিন্ন করিয়া সেতারারাজের নামে স্বয়ং রাজত্ব করিতে থাকেন, সেইরূপ সুঙ্গবংশের দশম নরপতির হস্ত হইতে মন্ত্রী বাসুদেব স্বহস্তে রাজ্যশাসনভার গ্রহণ করেন। বাসুদেব কাণ্বংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বংশ চারি পুরুষ পর্য্যন্ত প্রবল পরাক্রমের সহিত শাসনদণ্ড পরিচালন করেন। সুঙ্গবংশীয় শেষ রাজা দেবভূতিকে রাজ্যশাসনে সম্পূর্ণ অক্ষম ও অপারগ দেখিয়া, বাসুদেব স্বহস্তে যাবতীয় ক্ষমতা গ্রহণপূর্ব্বক রাজত্ব করিতে থাকেন। সুঙ্গবংশ হীনপ্রভ অবস্থায় কালযাপন করিতে বাধ্য হন। ডাক্তর ভাণ্ডারকর পুরাণের উল্লিখিত সুঙ্গবংশীয় দশ জন নরপতির রাজত্বকাল ৬৭ বৎসর, এবং কাণ্বংশীয় চারি জন ভূপতির শাসনসময় ৪৫ বর্ষ বলিয়া অনুমান করেন। (১) তাঁহার অনুমানের কোনও বিশিষ্ট কারণ প্রদর্শিত হয় নাই। তাঁহার অনুমান একান্ত অমূলক বলিয়া প্রতীত হইতেছে। নিম্নে "বায়ুপুরাণ" (২) হইতে সুঙ্গ (মিত্র) ও কাণ্বংশের পৌরাণিক বিবরণ উদ্ধৃত হইতেছে। অতঃপর আমাদের মন্তব্য প্রদান করিব।

"পুষ্পমিত্রস্তু সেনানীরুদ্ধৃত্য বৈ বৃহদ্রথং।
কারয়িষ্যতি বৈ রাজ্যং সমাঃ ষষ্টিং সদৈব তু ॥ ৩৩১ ॥
পুষ্পমিত্রসুতশ্চাষ্টৌ ভবিষ্যতি সমা নৃপঃ।
ভবিতা চাপি সুজ্যেষ্ঠঃ সপ্তবর্ষাণি বৈ ততঃ ॥ ৩৩২ ॥
বসুমিত্রঃ সুতো ভাব্যো দশবর্ষাণি পার্থিবঃ।
ততোঽর্দ্রক সমা দ্বেতু ভবিষ্যতি সুতশ্চ বৈ ॥ ৩৩৩ ॥
ভবিষ্যতি সমাস্তস্মাত্তিস্র এব পুলিন্দকঃ।
রাজা ঘোষবসুশ্চাপি বর্ষাণি ভবিতা ত্রয়ঃ ॥ ৩৩৪ ॥
ততো বৈ বজ্রমিত্রস্তু সমারাজা ততঃ পুনঃ।
দ্বাত্রিংশদ্ ভবিতা চাপি সমাভাগবতো নৃপঃ ॥ ৩৩৫ ॥
ভবিষ্যতি সুতস্তস্য দেবভূতিঃ সমাদশ।
দশৈতে শুঙ্গরাজানো ভোক্ষ্যন্তীমাং বসুন্ধরাং ॥
শতং পূর্ণং দশ দ্বেচ তেভ্যঃ কিংবা গমিষ্যতি ॥ ৩৩৬ ॥
নিপাত্য দেবভূতিং তু বাল্যাদ্ ব্যসনিনং নৃপং।
বসুদেবস্ততোঽমাত্যঃ শুঙ্গেষু ভবিতা নৃপঃ।
ভবিষ্যতি সমারাজা নব কাণ্বায়নস্তুসঃ ॥ ৩৩৭ ॥
ভূমিমিত্রঃ সুতস্তস্য চতুর্ব্বিংশদ্ ভবিষ্যতি।
ভবিতা দ্বাদশ সমাস্তস্মান্নারায়ণো নৃপঃ ॥ ৩৩৮ ॥
সুশর্ম্মা তৎসুতশ্চাপি ভবিষ্যতি সমাদশ।
চত্বারঃ শুঙ্গভৃত্যাস্তে নৃপাঃ কাণ্বায়নাঃ দ্বিজাঃ ॥
ভাব্যা প্রণতসামন্তাশ্চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ ॥ ৩৩৯ ॥
তেষাং পর্য্যায়কালে তু নৃপোঽন্ধ্রো হি ভবিষ্যতি ॥ ২৪০ ॥
কাণ্বায়নমথোদ্ধৃত্য সুশর্ম্মাণং প্রসহ্য তং।
শুঙ্গানামপি যচ্ছিষ্টং ক্ষয়য়িত্বা বলং ততঃ।
সিন্ধুকোঽন্ধ্রজাতীয়ঃ প্রাপ্যতীমাং বসুন্ধরাং ॥ ৩৪২ ॥
ইত্যেতে বৈ নৃপা ত্রিংশদন্ধ্রা ভোক্ষ্যন্তি যে মহীং।
সমাঃ শতানি চত্বারি পঞ্চষড় বৈ তথৈব চ ॥ ৩৫১ ॥

বায়ুপুরাণের মতে কাণ্বংশের পর অন্ধ্রভৃত্যবংশ আধিপত্য লাভ করে। কাণ্বংশীয় রাজা সুশর্ম্মাকে পরাজিত করিয়া সিন্ধুক অন্ধ্রভৃত্যবংশের অধিকার সংস্থাপিত করে। সুঙ্গবংশের ক্ষয়াবশিষ্ট শক্তি সিন্ধুকের পদানত হয়। অন্ধ্রভৃত্যবংশীয় সিন্ধুকের বংশধর ৩০ জন নরপতি ৪৫৬ বৎসর কাল

(১) The *Kanvas* are poinedly spoken of as *Sunga-Vhrtys* or servants of the *Sungas*. It therefore appears likely that when the princes of *Sunga* family became weak, the *Kanvas* usurped the whole power and ruled like the *Peshwas* in modern times, not uprooting the dynasty of their master, but reducing them to the character of nominal sovereigns; and this supposition is strengthend by the fact that like the Peshwas they were *Brahmans* and not *Kshatriyas*. Thus then, these dynasties reigned contemporaneously, and hence the 112 years, that tradition assigns to the *Sungas*, include the 45 assigned to the *Kanvas*. The *Sungas* and *Kanvas* therefore were uprooted and the families of the *Andhra-Vhrityas* came to power in B.C. 73."—Dr. R. G. Bhandarkar's "Early History of Deccan," (Bombay, 1884) p. 24.

(২) কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর অর্থব্যয়ে ও ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদকতায় প্রকাশিত বায়ুপুরাণ অতি ভ্রমপূর্ণ দেখিয়া তাহা স্থানে স্থানে সংশোধিত হইল।

রাজত্ব করেন। বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণের মত অনুসারে অন্ধ্রভৃত্যবংশীয় ৩০ জন নৃপতি ৪৫৬ বর্ষ রাজ্যশাসন করেন। মৎস্যপুরাণের মতে ২৯ জন ভূপতি ৪৬০ বৎসর রাজত্ব করেন। অন্ধ্রভৃত্যবংশের সহিত মগধের ইতিহাসের বিশেষ সম্পর্ক নাই।

পুষ্পমিত্রের পুত্র অগ্নিমিত্র মহাকবি কালিদাসের রচিত "মালবিকাগ্নিমিত্র" নামক ঐতিহাসিক নাটকের নায়ক। অগ্নিমিত্রের নামাঙ্কিত এক মুদ্রা ১৮৫২ খৃঃ কানিংহাম সাহেবের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়। "মালবিকাগ্নিমিত্র" নাটক হইতে নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাওয়া যায়। অগ্নিমিত্র বিদিশা নগরে অবস্থিতি করিতেন। বিদিশা এক্ষণে ভিল্সা নামে পরিচিত। বেত্রবতীর তীরে অবস্থিত এই বিদিশা দশার্ণ রাজ্যের রাজধানী ছিল। এই নগর হইতে অগ্নিমিত্র পিতার প্রতিনিধিরূপে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত শাসন করিতেন। এই সময়ে যজ্ঞসেন নামে নরপতি বিদর্ভ দেশে রাজত্ব করিতেন। প্রাচীন বিদর্ভ এক্ষণে বেরার নামে পরিচিত। যজ্ঞসেনের পিতৃব্যের পুত্রের নাম মাধবসেন। মালবিকা নামে মাধবসেনের এক রূপবতী কনিষ্ঠা ভগিনী ছিলেন। অগ্নিমিত্রের শৌর্য্যবীর্য্য ও গুণানুবাদশ্রবণে মালবিকা তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরাগিনী হইয়া উঠেন। মাধবসেন স্বীয় ভগিনী মালবিকার সহিত বিদিশা অভিমুখে যাত্রা করেন। বিদর্ভের সীমান্তদেশে যজ্ঞসেনের সেনাপতি দ্বারা মাধবসেন ধৃত ও কারারুদ্ধ হন। ইহাতে মালবিকা সহচরী সুমতির সহিত ছদ্মবেশে বিদিশার অভিমুখে পলায়ন করেন। অগ্নিমিত্র বিদর্ভরাজের নিকট মাধবসেনের কারামুক্তি প্রার্থনা করেন। মৌর্য্যবংশীয় শেষ নরপতি বৃহদ্রথের মন্ত্রী বিদর্ভরাজ যজ্ঞসেনের শ্যালক ছিলেন। বৃহদ্রথের নিধনের পর পুষ্পমিত্র মন্ত্রীকে কারারুদ্ধ করিয়া পাটলীপুত্রের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। মৌর্য্যরাজমন্ত্রীর কারামুক্তির পর মাধবসেনকে মুক্তি দিতে যজ্ঞসেন প্রতিশ্রুত হন। অগ্নিমিত্র এই প্রস্তাবে একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, বিদর্ভে এক দল সেনা প্রেরণ করেন। বিদর্ভরাজ যজ্ঞসেন যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, অগ্নিমিত্রের প্রস্তাব অনুসারে, পিতৃব্যপুত্র মাধবসেনকে বিদর্ভের অর্দ্ধাংশের আধিপত্য প্রদান করিতে বাধ্য হন। বরদা নদী, বিভক্ত রাজ্যদ্বয়ের সীমারূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। "মালবিকাগ্নিমিত্রে" এই ঐতিহাসিক ঘটনা বিবৃত হইয়াছে।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

তীর্থযাত্রীর সঙ্গে।

একবার মহরমের ছুটিতে বহরমপুরে গিয়াছিলাম। আমার প্রকৃতি ভ্রমণ-পরায়ণ নয়, সুতরাং অনেক দিন পরে হঠাৎ কয়েক দিনের মত আমার আড্ডা-ত্যাগের প্রস্তাবে হিতৈষী বন্ধুবর্গ শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের আশঙ্কা দূর করিবার অভিপ্রায়ে আমি একটু কূট নীতির অবতারণা করিলাম; অর্থাৎ হিন্দুবন্ধুবর্গকে বলিলাম, "ভাই হে, পাপের বোঝাটা মাথার উপর বড় ভারি হইয়াছে, এই যোগ উপলক্ষে গঙ্গায় একটা ডুব দিয়া খানিক হাল্কা করিয়া আসি।"—ইতিমধ্যে এক জন মুসলমান বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আদাব, হঠাৎ এখন মুর্শিদাবাদ যাবার মরজি হ'লো কেন?" স্মিতমুখে প্রত্যভিবাদন জানাইয়া উত্তর করিলাম, "মুসলমান নবাবদের আসল ভিটেটাতে যদি মহরমের কাণ্ড কারখানা না দেখ্‌লাম ত দেখ্‌লাম কি?" হিন্দু বান্ধব এবং খাঁ সাহেব, উভয়েই আমার শুভ-যাত্রা (bon-voyage) কামনা করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে প্রস্থান করিলেন।

১৮ই জুন বেলা তিনটের সময় আফিসের কাজে অর্দ্ধ পথেই যবনিকা ফেলিয়া বাসায় রওনা হইলাম। আমার জনৈক উকীল বন্ধুও কিছু দূর পর্য্যন্ত আমার ষ্টীমারের সহযাত্রী হইবেন, এইরূপ কথা ছিল; তিনি বেলা দুটো পর্য্যন্ত তাগাদা দিয়াও আমাকে সঙ্গে লইতে না পারিয়া অগত্যা একাকীই বাসায় আসিয়াছেন। প্রায় চারটের সময় আসিয়া দেখিলাম, তিনি একটা বিছানায় পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছেন। দেখিয়া "সকল পথ তাড়াতাড়ি, নদীর ধারে গড়াগড়ি" এই প্রাচীন প্রবাদটা মনে পড়িয়া গেল। তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "ষ্টীমার এখনো আসে নাই; আমি ভাবিয়াছিলাম, দামুকদিয়া ঘাট হইতে ষ্টীমার আসিয়া যাত্রী ও মাল নামাইয়া দিয়া পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে।"

ভরসা পাইয়া আমি আমার জিনিষপত্র গুছাইতে লাগিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে পদ্মার খাড়ীতে কিয়ৎক্ষণ নৌবাহন করা গেল, কিন্তু ষ্টীমারের দেখা নাই। গঙ্গাস্নান উপলক্ষে শত শত যাত্রী নৌকায় চলিয়াছে; এক একখানি ক্ষুদ্র নৌকায় পঞ্চাশ ষাট জন যাত্রী, ততোধিক পুঁটুলি পোঁটলা। কোনও বন্ধু পরামর্শ দিলেন, অধিক সময় নষ্ট না করিয়া নৌকায় যাত্রা করাই

কর্ত্তব্য। কিন্তু এরূপ নৌ-যাত্রা বিড়ম্বনামাত্র; গঙ্গাস্নানের পুণ্যফলের ওজনে এই কষ্টটুকুর ভার অনেক বেশী! অগত্যা ষ্টীমারের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

রাত্রি নয়টার সময় ষ্টীমার আসিল। কিন্তু ষ্টীমার বোঝাই যাত্রী; সে ষ্টীমারে বোয়ালিয়া হইতে একটি যাত্রীও লইল না; অবশ্য এক জনেরও তাহাতে স্থান ছিল না। সে রাত্রে আরও দু'খানি অতিরিক্ত ষ্টীমার যাত্রী লইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু পুণ্যপ্রয়াসী যাত্রিগণের আমদানীতে রাত্রিকালে আর ষ্টীমারে উঠিবার সুবিধা করিতে পারিলাম না; বিশেষতঃ রাত্রি দশটা হইতে ভয়ানক বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। পর দিন অতি প্রত্যূষে একখানি ক্ষুদ্র ষ্টীমার যাত্রী লইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া ঘাটে দাঁড়াইল; আমরা অবিলম্বে তাহাতে উঠিয়া একখানি ক্ষুদ্র বেঞ্চি দখল করিয়া বসিলাম।

পাঁচটার সময় ষ্টীমার ছাড়িয়া ছিল। পদ্মার সুবৃহৎ চড়া ঘুরিয়া ক্ষুদ্র ষ্টীমারখানি যখন নদীর প্রশান্ত বক্ষে গিয়া পড়িল, তখন ষ্টীমারের যাত্রিগণ মহাহর্ষে হুলুধ্বনি ও হরিবোলের রোল তুলিল। সুন্দর প্রভাত! রাত্রে প্রচুর বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, সেই বর্ষণে সমস্ত প্রকৃতি স্নাত হইয়া শ্যাম স্নিগ্ধ বিমল বেশ ধারণ করিয়াছে। তাহার পর পূর্ব্বাকাশে তরুণ সূর্য্য হাসিতে হাসিতে যখন তাহার লাল আলো নদীর জলে, আকাশের খণ্ডবিখণ্ড ভাসমান অভ্রশুভ্র মেঘে, দূরবর্ত্তী শ্যামল প্রান্তরে ও উচ্চ তরুশিরে উজ্জ্বল প্রাভাতিক শ্রী প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিল, এমন কি, নদীচরের বালুকারাশি পর্য্যন্ত কনকচূর্ণের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল, তখন মনে হইল, এমন সুন্দর দৃশ্য সচরাচর দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। তাহার উপর এই যে এত গুলি তীর্থযাত্রী নদীর উন্মুক্ত হৃদয়ে ভাসমান হইয়া আপনাদিগের অকৃত্রিমভক্তিপূর্ণ হৃদয়োচ্ছ্বাস ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিতেছে, ইহাও অতি মধুর। এই সুন্দর দৃশ্যের মধ্যে আপনার ক্ষুদ্র জীবনের সুখ দুঃখ সম্প্রসারিত করিয়া আমরা ধীরে ধীরে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

ষ্টীমারের উপর যাত্রীদের কলরবের আর বিরাম নাই। তাহারা এক একটা বোঁচকা পাশে লইয়া বসিয়া গিয়াছে, আর নিজ নিজ সুখ দুঃখের গল্প করিতেছে। তাহাদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক,—কাহারও নাকে নথ, কানে পাশা, দাঁতে মিশি, ওষ্ঠে উল্কি। যে কয়েক জন পুরুষ যাত্রী ছিল, তাহারা কেহ এদিকে ওদিকে দাঁড়াইয়া তামাক টানিতেছে, কেহ ঘটীতে দড়ি বাঁধিয়া

জল তুলিতেছে, কেহ একটা তুচ্ছ কথা লইয়া খালাসীর সঙ্গে তুমুল ঝগড়া বাধাইয়া দিয়াছে।

ষ্টীমারের আগে পাছে অসংখ্য নৌকা পাল উড়াইয়া চলিয়াছে; একখানি নৌকা হইতে হরিবোল শব্দ উঠিলেই, নিকটবর্ত্তী অন্যান্য নৌকা হইতেও অনুরূপ শব্দ উঠিতেছে; ইলিশমারা জেলেডিঙ্গিতে বসিয়া জাল টানিতে টানিতে জেলেরা অবাক হইয়া এই সকল নৌকার দিকে চাহিয়া আছে।

বেলা প্রায় আটটার সময় আমরা মরিচার দেয়াড়ে নামিলাম। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, ষ্টীমার ছাড়িবার পূর্ব্বে আমরা অনেকে টিকিট পাই নাই; এক জন কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "যে টিকিট আমদানি হইয়াছিল, তাহা সমস্ত ফুরাইয়া গিয়াছে, আপনারা নামিবার সময় টিকিটের দাম দিলেই চলিবে।" আমরা নামিবার সময় তাহাই করিলাম। ষ্টেশনমাষ্টার টিকিটগুলি সংগ্রহ করিতে করিতে টিকিটের মুল্যস্বরূপ যাহা নগদ পাইলেন, তাহা গরদের কোটের পকেটে ফেলিতে লাগিলেন; জানি না, তাহা ষ্টীমারের সত্বাধিকারী ইণ্ডিয়ান জেনেরাল ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর ভোগে লাগিবে কি না।

রাজসাহী হইতে বহরমপুরে যাইবার এই পথ। নামিয়া দেখিলাম, মরিচার দেয়াড়ে অসংখ্য যাত্রী সম্মিলিত হইয়াছে। এখানে কয়েকখানি ময়রার দোকান আছে, সেই সকল দোকানে কতকগুলি যাত্রী বসিয়া কেহ বিশ্রাম করিতেছে, কেহ গুমো চিঁড়ে ও গুড়ে মুড়কি কিনিয়া জল দিয়া ভিজাইয়া ফলার করিতেছে। নদীর ধারে ভিজে মাটীতে কতকগুলি স্ত্রীলোক পা মেলিয়া বসিয়া গিয়াছে; তাহাদের সঙ্গে দড়ী-বাঁধা এক একটা ঘটী, এবং প্রত্যেকের গাঁটরির সঙ্গে তৈলপূর্ণ এক একটা শিশি, ক্বচিৎ কাহারও কাছে মুখ-সরু মৃণ্ময় 'তাড়ি'; কেহ তেল মাখিতেছে, কেহ গল্প করিতেছে, কেহ কেহ বা যাত্রার উদ্যোগ করিতেছে। দেখিলাম, একটি যুবতী তাহার শিশু সন্তান লইয়া বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। শিশুটির বয়স দুই মাসের অধিক নহে, রৌদ্র বাতাসে খোলা মাঠের মধ্যে পড়িয়া ছেলেটির সুন্দর মুখখানিতে নীল পড়িয়া গিয়াছে, এতটুকু শিশুর কি এত অনিয়ম সহ্য হয়? মায়ের পরিধানবস্ত্র ভিন্ন তাহার গায়ে দ্বিতীয় আচ্ছাদন নাই। হয় ত তাহার মাতা জল ঝড় মাথায় করিয়া তাহার স্নেহের ধনটুকুকে বস্ত্রাঞ্চলে বুকের মধ্যে ঢাকিয়া পদব্রজেই যাত্রা করিবে। হায় অন্ধ নিষ্ঠা! নির্ব্বোধ জননী বুঝিতে

পারিতেছে না যে, তাহার এই গঙ্গাস্নানজনিত পুণ্যটুকুর মূল্য তাহার বক্ষঃ-পঞ্জর অপেক্ষা অধিক আদরণীয় এই ক্ষুদ্র শিশুর জীবনের অপেক্ষাও অধিক ;" কে বলিবে, এই ক্ষুদ্র শিশুর ক্ষীণ প্রাণের পরিবর্ত্তে তাহা ক্রীত হইবে কি না ?

মরিচার দেয়াড়ে গো-শকটের অভাব নাই। অনেক গাড়ী যাত্রী লইয়া বালুচরে চলিয়া গেলেও, দেখিলাম, তখনও বিশ পঁচিশখানি গাড়ী নদীতীরে ভাড়ার অপেক্ষা করিতেছে। আজ গাড়োয়ানেরা দু'পয়সা পাইবার প্রত্যাশায় গাড়ীর ভাড়া বাড়াইয়া দিয়াছে। অন্য সময় বারো চৌদ্দ আনা হইলেই বালু-চর যাইবার গাড়ী পাওয়া যায় ; আজ সুবিধা বুঝিয়া তাহারা দ্বিগুণ ত্রিগুণ ভাড়া হাঁকিতেছে। তিন চারি জন লোক পথশ্রম হইতে অব্যাহতি পাইবার লোভে একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া তাহারই মধ্যে বহু কষ্টে গাদাগাদি হইয়া বসিয়াছে। দেড় টাকায় একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া আমিও সেই যাত্রিপ্রবাহের অনুগমন করিলাম। দুই পাশে যাত্রী চলিতেছে ; আমার আগে পাছে পাঁচ ছয়খানি গাড়ী চলিতে লাগিল। যাত্রীরা কেহ মাথায়, কেহ কাঁকে পুঁটুলী লইয়া চলিয়াছে ; হাতে গঙ্গাজলসংগ্রহের জন্য ঘটি ঝুলিতেছে, পুঁটুলীর সঙ্গে তেলের শিশি দুলিতেছে,—সেকালে আধ পয়সা দামের তেলের তাড়িতেই যাত্রীদের তেল লওয়া চলিত, এখন তৎপরিবর্ত্তে শিশির চলন হইয়াছে। সকল বিষয়েই এই রকম ; সেকালে ছয় পয়সা দামের তালপাতার ছাতি হইলেই চাষার বর্ষা কাটিয়া যাইত, কিন্তু একালে আট পয়সার মজু-রের হাতেও পাঁচ শিকার কঞ্চির দামাটওয়ালা স্প্রীংয়ের ছাতি ; পানাইয়ের পরিবর্ত্তে চাষারাও কে. এম্., দাসের চটি পায়ে দিতে আরম্ভ করিয়াছে দেখিয়া, সেকাল অপেক্ষা একালে সাধারণের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে ভাবিয়া দেশের শাসনকর্ত্তৃগণ প্রচুর আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।

কোনও কোনও পুরুষ যাত্রীর কাঁধে লাঠি, তাহার দুই দিকে ভার ঝোলান, চাউল ডাউল হইতে আরম্ভ করিয়া এ কয় দিনের ব্যবহার্য্য সকল জিনিষই তাহাদের কাঁধে চলিতেছে। পথের এক স্থানে একটি বাবাজীকে দেখিলাম ; তাঁহার পরিধানে কৌপীনের উপর বহির্ব্বাস, মস্তকে নামাবলী জড়ানো, গলায় মোটা তুলসীর কাঠের মালা, হাতে হরিনামের ঝোলা, ললাটে দীর্ঘ তিলক, সর্ব্বাঙ্গে রাধাকৃষ্ণের পদাঙ্কলেখা। বাবাজী প্রায় বিশ জন স্ত্রীযাত্রীর পথপ্রদ-র্শক হইয়া চলিয়াছেন, তিনি আগে আগে যাইতেছেন, আর স্ত্রীলোকেরা

গড্ডলিকাপ্রবাহের ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিতেছে, দৈবাৎ কেহ যুথভ্রষ্ট হইয়া পড়িলে বাবাজী তাহাদিগকে গুছাইয়া লইতেছেন।

আমার সঙ্গের গাড়ীগুলির অধিকাংশই স্ত্রীযাত্রী বোঝাই, দৈবাৎ তাহার মধ্যে এক আধজন পুরুষ অভিভাবক ; গাড়ীর মধ্যে যাত্রীদের অতি কষ্টে বসিয়া যাইতে হইতেছে। উচু নীচু পথ দিয়া গাড়ী হটর হটর করিয়া চলি-তেছে, আর আরোহীরা গাড়ীর ভিতর বসিয়া ছৈয়ের বাতা ধরিয়া দুলিতেছে। আমার গাড়ীর পশ্চাৎভাগ খোলা। দেখিলাম, আমার পশ্চাতের গাড়ীতে দুই তিনটি যুবতী অতি সঙ্কুচিত হইয়া বসিয়া আছেন ; বোধ হইল, আমার দৃষ্টিপথে পড়াতেই তাঁহাদের এরূপ সঙ্কোচ। আমার গাড়ী খানিক আগে চালান হইল ; আমার পশ্চাতে আর একখানি গাড়ী পড়িল, তাহাতে এক জন বৃদ্ধ ও একটি যুবতী বসিয়াছিল ; দেখিলাম, তাহারা দু'জনে অসঙ্কোচে হাস্যালাপে রত, চারি দিকের লোকের প্রতি কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই দেখিয়া আমার মনে হইল, বুঝি বৃদ্ধটি এই যুবতীর পিতামহ, মাতামহ, অথবা সেইরূপ-সম্পর্ক-বিশিষ্ট আর কেহ ; আদরিণী নাতিনীকে গঙ্গাস্নান করাইতে লইয়া যাইতেছে। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলাম, পথপ্রান্তবর্ত্তী একটি অল্প-বয়স্কা বৈষ্ণবী (তিলক ও রসকলি দৃষ্টে ইহাকে কোনও বাবাজীর সেবাদাসী বলিয়া অনুমান হইল—) একটা বাঁধা হুকাতে তামাক খাইয়া হুকাটি আনিয়া উক্ত যুবতীর হস্তে অর্পণ করিল, সেও অসঙ্কোচে তাহাতে দম দিয়া তামাকটুকু নিঃশেষ করিয়া গজভুক্ত কপিত্থবৎ হুকাটি পরিত্যাগ করিল ; তাহার পর যেরূপ প্রগল্‌ভতার সহিত বৃদ্ধের সহিত আলাপ করিতে লাগিল, তাহাতে সহজেই অনুমান হইল যে, এই যুবতীর সঙ্গে বৃদ্ধের সম্বন্ধ হয় ত অন্যরূপ।

কিছু দূরে আসিয়া গাড়োয়ান গাড়ী ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেল। খানিক পরে বলদ দুটির জন্য এক বোঝা কাঁচা ঘাস আনিয়া গাড়ীতে বিছানার নীচে পাতিয়া পুনর্ব্বার গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

আমরা পদ্মাতীরবর্ত্তী পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলাম ; এই পথটি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে গিয়াছে। আমাদের দক্ষিণ পার্শ্বে পদ্মার চড়া, নদী অনেক দূর সরিয়া গিয়াছে। পদ্মার চড়ায় বন-ঝাউ ও বড় বড় খড় জন্মিয়াছে, প্রাভাতিক বায়ুতে সেগুলি হিল্লোলিত হইতেছে ; রাখালেরা গরু ছাড়িয়া দিয়া নির্ভাবনায় খেলা করিতেছে, মধ্যে একটা খোলা যায়গায় আসিয়া মাথার 'মাথাল'

ছাড়িয়া দিতেছে, আর প্রবল বাতাসে 'মাথাল'গুলি উড়িয়া গড়াইতে গড়াইতে নিকটস্থ খাড়ির মধ্যে গিয়া পড়িতেছে।

বেলা এগারটার সময় আমরা 'পাতিবোনা' আসিয়া আড্ডা ফেলিলাম। বহরমপুরের পথে 'পাতিবোনা' একটি সমৃদ্ধ গণ্ডগ্রাম। সেদিন এই গ্রামে কোনও উৎসব ছিল কি না, জানি না; কিন্তু দেখিলাম, পথের ধারে একটি বৃহৎ বটগাছের নীচে হাট বসিয়াচে, সেখানে লোকে লোকারণ্য, বোধ হয়, আজ যাত্রীদিগের উপস্থিতিতেই এখানে এরূপ সমারোহ। যাত্রীরা পুঁটুলীগুলি পাশে ফেলিয়া বসিয়া গিয়াছে। কোনও রমণী কোনও বর্ষীয়সীর মুক্তকেশে বিলি দিয়া উকুন তুলিতেছে; কোনও যুবতী নিকটবর্ত্তী দিঘী হইতে কলসীতে করিয়া জল আনিতেছে,—পরিধানে গুলবাহার শাড়ী, প্রকোষ্ঠে কালো বেলোয়ারি চুড়ি, নাকে নথ। হাটের মধ্যে ছোট ছোট চালা, যাত্রীরা সেই সকল চালায় ও গাছের ছায়ায় বসিয়া ভাত রাঁধিতেছে, অনেকে কদলীপত্রে স্তূপাকার লোহিতবর্ণ কদন্ন ঢালিয়া পরিবেশনের যোগাড় করিতেছে; নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা কালোজাম, আম, কাঁটাল, বিক্রয় করিতেছে; কেহ তাহা কিনিয়া খাইতেছে, কেহ কতকগুলি লইয়া পুঁটুলির মধ্যে পুরিতেছে।

বাজারের মধ্যে অনেকক্ষণ ঘুরিয়া দেখিলাম। বিলক্ষণ ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল, এবং উদরকে বঞ্চিত করিবারও অভিপ্রায় ছিল না। দেখিলাম, বাজারে চারি পাঁচখানি ছোট ময়রার দোকান, এই সকল দোকানে চিঁড়া, মুড়ী, মুড়কী ও সাধারণ রকমের সন্দেশ বিক্রয় হইতেছে। একটি দোকানে গিয়া বসিলাম। ময়রা মহাশয় ভরসা দিলেন যে, তাঁহার দোকানে অতি উৎকৃষ্ট সন্দেশ প্রস্তত আছে, কিন্তু কার্য্যকালে অতি জঘন্য তেলেভাজা কালো জিলাপী ও গুড়ের রসে সিক্ত দুর্গন্ধময় ছানাবড়া ভিন্ন আর কিছু মিলিল না; অগত্যা তদ্দ্বারা দগ্ধোদর কথঞ্চিৎ পূর্ণ করিয়া গাড়ীতে চড়া গেল।

গাড়ী আবার চলিতে লাগিল। আকাশে মেঘ হইয়াছিল, অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল। আমার গাড়ীর ছৈ ভাল ছিল বলিয়া বৃষ্টিধারা হইতে শরীররক্ষা হইল বটে, কিন্তু বিছানার কিনারা ভিজিতে লাগিল; অগত্যা বিছানাটি গুটাইয়া বসিলাম।

আমরা তখন একখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক্ষুদ্র পল্লীর ভিতর দিয়া চলিতেছিলাম, গ্রামমধ্যবর্ত্তী মেটে রাস্তা দিয়া চলিতেছিলাম; রাস্তাটি বেশ প্রশস্ত। রাস্তার পূর্ব্বধারে ক্ষুদ্র গ্রামখানি, পশ্চিম ধারে মাঠ, নীলের জমী, দূরে দূরে

ছোট ছোট বাবলা গাছ, গ্রামের কুটীরগুলি বিক্ষিপ্ত, কৃষকের কুটীরের পাশে বেড়া দিয়া ঘেরা, জমীর মধ্যে পাট, ভুট্টা বা গেমা জন্মিয়াছে, পথের দিকে মাটীর 'আল' উচু করিয়া দেওয়া, গোশৃঙ্গাঘাতে 'আইল'গুলি ক্ষতবিক্ষত। ঘরের পাশে কলাবাগান, জাফ্রির মধ্যে ছোট ছোট আম কাঁঠালের চারা; লাউ ও শশার গাছ লতাইয়া চালের উপর উঠিয়াছে; নিকটে কচুবনের কাছে সবুজ ঘাসের জমীতে কতকগুলা সাদা ও কালো রঙ্গের ছাগল চরিতেছিল, দুটি কালো ছাগশিশু, গলায় ঘুঙুর বাঁধা, এক বার মাথা নীচু করিয়া নবোদ্ভিন্ন কচি কচি ঘাসের ডগা কাটিয়া খাইতেছে, লাফাইয়া খেলা করিতেছে, দৌড়িয়া গিয়া মায়ের বাঁটে ঢু মারিতেছে, এমন সময় কৃষকদের তিন চারি বৎসরের একটি ছেলে নগ্নদেহে ছুটিয়া আসিয়া একটি ছাগবৎসের সমুখের পদদ্বয় ধরিয়া বুকের উপর টানিয়া তুলিল; ছাগী উধ্ন দোলাইতে দোলাইতে দূরে পালাইল; তাহার পর ছাগশিশু বালকের বক্ষে বন্দী হইয়া যখন 'ব্যা ব্যা' করিয়া ডাকিতে লাগিল, তখন সে দূর হইতে মুখ ফিরাইয়া করুণনেত্রে তাহার শিশুর দিকে চাহিয়া রহিল।—সেই অবোলা জীবের চক্ষে সন্তানের বিপদাশঙ্কায় যে একটা সকরুণ উদ্বেগ ফুটিতে দেখিয়াছিলাম, তাহা বুঝি বিশ্বজগতে চিরপ্রাচীন মাতৃহৃদয়ের অপরিবর্ত্তনীয় সুধাময় অক্ষয় সম্পত্তি; সৃষ্টির প্রথম প্রভাত হইতে তাহা মূক ধরণীর বক্ষঃস্থ প্রত্যেক জীবের চক্ষে মৃত্যুঞ্জয়ী সুধারূপে সঞ্চিত হইয়াছিল, এবং চির দিন তাহা হিংসা, ক্রূরতা, উৎপীড়ন ও অত্যাচার, বিষ ও ছুরিকার কুটিল আবর্ত্তের মধ্যে অমর মহিমায় বিরাজ করিবে; ক্ষুদ্র পুষ্পের মধ্যে অনন্ত বিশ্বসৌন্দর্য্যের আভাস কল্পনা করিয়া কবির চক্ষে জল আসিয়াছিল; ছাগীর চক্ষে মাতৃস্নেহের গভীর উদ্বেগ লক্ষ্য করিয়া আমার মনেও ভারি একটা দার্শনিক তত্ত্বের উদয় হইতেছিল, এমন সময় কোথা হইতে এক জন গৃহস্থের একটা সাদা বকনা বাছুর গোঁজ উপড়াইয়া লেজ ঊর্দ্ধে তুলিয়া দড়িসমেত আমার গাড়ীর সম্মুখে ছুটিয়া আসিয়া আমার চিন্তাস্রোত বিপর্য্যস্ত করিয়া দিল।

বেশ মিষ্ট বাতাস বহিতেছিল। আমি গাড়ীর মধ্যে শুইয়া পড়িলাম, এবং শীঘ্রই নিদ্রাকর্ষণ হইল। হঠাৎ যখন ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তখন দেখিলাম, আমাদের গাড়ী ভৈরব নদের গর্ভে প্রবেশ করিতেছে। নদীর পাড় হইতে নদীগর্ভ খুব ঢালু; বর্ষা আসন্নপ্রায়, কিন্তু এখনও সেখানে জল নাই, শুভ্র বালুকারাশিতে চারি দিকে ঢাকা, মধ্যে মধ্যে স্বচ্ছ জল; সেই অপরিসর জলে

বড় বড় মহাজনী নৌকা বাঁধা রহিয়াছে, নৌকার উপরের খড়ের ছাউনী জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, মাঝি মাল্লারা নৌকা ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে ; শুনিলাম, ভৈরবগর্ভে এরূপ অসংখ্য নৌকা স্থানে স্থানে আটকাইয়া গিয়াছে ; বর্ষাকালে পদ্মার জল বর্দ্ধিত হইয়া এই নদীতে বন্যা আসিলে মাঝি মাল্লারা স্ব স্ব নৌকায় প্রত্যাগমনপূর্ব্বক নৌকাগুলিকে অভীষ্ট স্থানে লইয়া যাইবে।

এই ভৈরব আমাদেরই বাসগ্রামের প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। সেখানে ইহার বিস্তার ইহা অপেক্ষাও সঙ্কীর্ণ, কিন্তু বারো মাসই সেখানে অল্পপরিমাণে জল থাকে ; সে কত দূরে! আজ আমার সেই আজন্মের মধুর-স্মৃতিবিজড়িত চিরপরিচিত ভৈরবের উৎপত্তিস্থলে সমাগত হইয়া তাহার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলাম না। ভৈরব অতি প্রাচীন নদ, এক সময়ে তাহার আকার, তাহার ভীষণ তরঙ্গভঙ্গ ও সঙ্কট-সঙ্কুল গভীর আবর্ত্ত তাহার নামের উপযুক্ত ছিল ; কিন্তু একালে শুধু এই নামটি ও অতিবিস্তীর্ণ শুষ্ক বালির চড়া তাহার অতীত গৌরবের নির্ব্বাক্ সাক্ষিরূপে পড়িয়া আছে।

ভৈরবের বুকের উপর ওয়াটসন কোম্পানীর নীলের ক্ষেত। নীল গাছ-গুলি বেশ সতেজ, এবং বড় হইয়াছে ; ক্ষেতের মধ্য দিয়া গাড়ী যাইবার পথ। সেই পথে গাড়ী চলিতে লাগিল, প্রবল বাতাসে বালি উড়িয়া বিছানা ঢাকিয়া ফেলিল, বালুকাকণা চোখে মুখে প্রবেশপূর্ব্বক একেবারে অস্থির করিয়া তুলিল, কিন্তু নিরুপায়। অল্প দূর না যাইতেই মাথার মধ্যে এত বালি জমিয়া গেল যে, মাথাটাকে নদীর চড়া, আর কালো চুলগুলাকে নীল গাছ বলিয়া ভ্রম হইবার কোনও কারণ রহিল না।

নীলের ক্ষেত প্রায় ছাড়াইয়াছি, এমন সময় ওয়াটসন কোম্পানীর যম-দূতের মত চারি জন মুসলমান 'তাকাতগিরি' (নীলরক্ষক) আমাদের গাড়ী-গুলি আটক করিল। শুনিলাম, নীলের ক্ষেতের মধ্য দিয়া গাড়ী লইয়া যাওয়া তাহাদের মনিব কোম্পানীর অভিপ্রায়বিরুদ্ধ, কিন্তু সরকারী পথ দিয়া গাড়ী লইয়া যাওয়ার আপত্তি কিরূপ মূল্যবান হইতে পারে, তাহা বুঝিলাম না ; বোধ হয়, গাড়োয়ানদের কাছে দুই চারি পয়সা আদায় করিবার অভিপ্রায়েই তাহারা এরূপ করিতেছিল, কিন্তু গাড়োয়ানেরা দলে পুরু ছিল, তাহারা রণে ভঙ্গ দিল না, তাকাতগিরিদের সঙ্গে তাহাদের তুমুল বচসা আরম্ভ হইল, অনন্তর জোর করিয়া গাড়ী লইয়া চলিল ; তাকাত-

গিরিরা ব্যর্থমনোরথ হইয়া নিষ্ফল আক্রোশে গাড়োয়ানদিগকে ভয় দেখাইতে লাগিল।

বেলা প্রায় দুইটার সময় আমরা একটা প্রকাণ্ড দীঘীর ধারে আসিয়া পড়িলাম। দীঘীর চারি দিকে উচু পাড়ে অশ্বত্থ ও বটের গাছ, দুই একটি আম কাঁঠাল গাছে এখনও আম কাঁঠাল ঝুলিতেছে ; বটগাছের নীচে একখান ছোট মুদীর দোকান, বৃক্ষতলে অসংখ্য যাত্রী বিশ্রাম করিতেছে। আমার সঙ্গে ষ্টিমারে যে সকল যাত্রী আসিয়াছিল, তাহাদিগের অনেককেই এখানে উপবিষ্ট দেখিলাম। গাড়োয়ানেরা বলদগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া তামাক খাইতে লাগিল। আমি গাড়ীর মধ্যে বসিয়া চারি দিকে চাহিয়া দেখিতেছি,—গাড়ীর মধ্যে বিছানার উপর একখানি নূতন সংস্করণের 'ইন্দিরা' পড়িয়াছিল ; 'ইন্দিরা'র শ্বশুরবাড়ীযাত্রার কথা তখনও মনে জাগিতেছিল ; এই স্থানে আসিয়া কালা-দীঘীর সেই ডাকাইতির কথা আমার মনে পড়িয়া গেল। দীঘীর পাড় তেমনি উচু, তেমনি ঘনবিন্যস্ত বট পাকুড়ের সারি, এবং তেমনি একখান ছোট দোকান, কেবল দীঘীতে তেমন কালো গভীর জল নাই, আর নাই তীরে সালঙ্কারা, সযৌবনা, তাম্বূলরাগরঞ্জিতাধরা, রূপাভিমানিনী, পতিসন্দর্শনাভি-লাষিণী সেই ইন্দিরা সুন্দরী, বেহারা দারোয়ানসমন্বিত রূপা-বাঁধানো হাঙ্গর-মুখো-দাণ্ডাবিশিষ্ট পাল্কী এবং মোটা মোটা সোণার দানা গলায়, তসর-পরিহিতা নূতন বড়মানুষের বাড়ীর সেই ঝি ;—তৎপরিবর্ত্তে শত শত যাত্রী বৃক্ষমূলে বসিয়া কলরব করিতেছে। আজ এখানে যতই জনসমাগম হউক, স্থানটি যেরূপ নিভৃত এবং পথ যেমন দুর্গম, তাহাতে কে বলিতে পারে, এখানে এক দিন ডাকাতেরা পথিকের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া তাহাদিগকে মারিয়া এই দীঘীতে প্রোথিত করিয়া রাখে নাই ?

কত ঘাট, কত তরুতল, বাঁশ-বন অতিক্রম করিয়া আমাদের গাড়ী চলিতে লাগিল। অবশেষে আমরা একটি ক্ষুদ্র নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই নদীতে অধিক জল নাই, এবং পার হইবার জন্য নদীবক্ষে কোনও নৌকাও নাই ; কতকগুলি বাঁশের উপর মাটি ফেলিয়া নদীর উপর জমীদারেরা একটা সামান্য সাঁকো নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। সাঁকো পার হইবামাত্র জমীদারের সিপাহী আমাদের কাছে পারাণীর পয়সা চাহিল। শুনিলাম, সাঁকো প্রস্তুতের ব্যয় বাবদ ইহারা প্রত্যেক পথিকের নিকট এক পয়সা এবং প্রত্যেক গাড়ীর জন্য চারি পয়সা হিসাবে মাশুল আদায় করে ; পূর্ব্বাপর

নাকি এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। বর্ষাকালে নদীতে জল বাড়িলে পারের নৌকা রাখা হয়; কিন্তু পয়সা দিবার ভয়ে যে সকল যাত্রী সাঁকো দিয়া নদী পার না হইয়া জল কাদা ভাঙ্গিয়া নদীগর্ভস্থ অন্য অপ্রশস্ত স্থান দিয়া পারে যাইতেছে, তাহাদের নিকট হইতেও কেন পয়সা আদায় করা হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ইহা যথেচ্ছাচার ভিন্ন আর কিছুই নহে; এইরূপ গণ্ডগ্রামেই জমীদারের এরূপ অত্যাচার শোভা পায়, কিন্তু তাহা নিবারণ করিবার কোনও উপায় নাই।

নদী পার হইয়া দুই পাশের ধানের জমীর উপর দিয়া আমরা যাইতে লাগিলাম। এই সকল জমী বর্ষাকালে জলে ডুবিয়া যায় কি না জিজ্ঞাসা করায়, গাড়োয়ানের নিকট জানিতে পারিলাম, সহজে এ সকল জমী ডুবিবার কোনও সম্ভাবনা নাই, তবে যে বৎসর বর্ষার প্রকোপে ললিতাকুঁড়ীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়, সে বৎসর এ সকল জমী রক্ষা পায় না; এমন কি, যে স্থান দিয়া আমাদের গাড়ী চলিতেছিল, সেখানে বড় বড় নৌকা চলে; তবে ললিতা-কুঁড়ীর বাঁধ ভাঙ্গিলে মুর্শিদাবাদ নহে, ভাগীরথীর জলে নদীয়ার যশোহরের এমন কি, চব্বিশপরগণার কিয়দংশও জলমগ্ন হইয়া বহু লক্ষ বিঘা জমীর ধান একেবারে নষ্ট হইতে পারে বলিয়া, বর্ষাকালে কর্তৃপক্ষগণ অতি সতর্কতার সহিত এই বাঁধ রক্ষা করেন। তথাপি কোনও কোনও বৎসর ইহা ভাঙ্গিয়া যায়।

তখন প্রায় অপরাহ্ন হইয়াছিল। গাড়োয়ানেরা একবার দক্ষিণে একবার বামে হেলিয়া গরু খেদাইতে খেদাইতে ও তাহাদের লেজ মলিতে মলিতে মেঠো গান গাহিতেছিল; চাষারা গামছা পরিয়া মাথায় মাথাল আঁটিয়া ধানের ক্ষেতে ঘাস নিড়াইতেছিল; তাহাদের ছেলে মেয়েরা গামছায় ভাত তরকারী বাঁধিয়া তাহাদের জন্য লইয়া যাইতেছিল; এবং দুই একটি রাখাল যমকে বাহনচ্যুত করিয়া তাহাদের লাঙলা মহিষের পিঠে চড়িয়া এ মাঠ হইতে ও মাঠ যাইতেছিল।

আমরা চলিতে চলিতে এমন একটা যায়গায় আসিয়া পড়িলাম, যাহার এক দিকে ধানের জমী, অন্য দিকে নীলের ক্ষেত, মধ্যে ভয়ানক পঙ্কিল পথ। আমাদের গাড়ী সেই মহাপঙ্কে নিমজ্জিত হইল, পাঁকের ভিতর হইতে আর কিছুতেই চাকা উঠে না। গাড়োয়ান নির্দ্দয়রূপে বলদ দুটোকে ঠেঙ্গাইতে লাগিল, কিন্তু তাহারা গতিশক্তিহীন। গাড়ীর জোয়াল কাঁধে লইয়া সিং নীচু

করিয়া অক্ষমভাবে দাঁড়াইয়া রহিল;—ভাবখানা এই যে, "তোমরা যত ঠেঙাও, এ পাঁক হইতে গাড়ী তোলা আমাদের কর্ম্ম নয়।" আমার কিন্তু তখন মনে হইতে লাগিল,—

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।"

কত আনন্দে উৎসাহে বুক বাঁধিয়া কয়েক দিনের জন্য বহরমপুরে বেড়া-ইতে যাইতেছি, ও হরি, শেষে বুঝি এক গলা পাঁকে নামিয়া গাড়ী ঠেলিতে হয়! ব্যতিব্যস্ত হইয়া বিপদ্‌ভঞ্জন মধুসূদনের নাম স্মরণ করিতে লাগিলাম। ভাগ্যে আমাকে আর গাড়ী হইতে নামিতে হইল না, সঙ্গের গাড়োয়ানেরা আসিয়া গাড়ীর চাকার কাছে কাঁধ বাধাইয়া পাঁক হইতে গাড়ীর চাকা টানিয়া তুলিল; সঙ্গে সঙ্গে বলদের পিঠে আর দু পাঁচটা পাঁচনের বাড়ি পড়িবামাত্র গরুগুলা গাড়ী টানিয়া শুষ্ক পথের উপর উঠিয়া পড়িল, আমার বুক হইতেও পাষাণভার নামিয়া গেল।

পথের দুই দিকে আম্রকানন। পথের ধারে বড় বড় বাবলা গাছের সারি। হঠাৎ দেখিলাম, ছেলে কোলে লইয়া, দীর্ঘ লেজ পথের উপর প্রসারিত করিয়া দিয়া, পাঁচ সাতটা হনুমান পথ আলো করিয়া বসিয়াছে। দেখিয়া, গাড়োয়ানদের বড় আমোদ বোধ হইল, তাহারা তাড়া করিবামাত্র হনুমান-গুলা লাফাইয়া বাবলা গাছে গিয়া উঠিল; কিন্তু গাড়োয়ানেরাও ছাড়িবার পাত্র নহে, ঢিল ছুড়িয়া তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। কেহ কেহ দীর্ঘ লম্ফে অদূরবর্ত্তী আম্রশাখায় আশ্রয় লইল, এবং 'হুপ হাপ' শব্দে কানন-ভূমি ধ্বনিত করিতে লাগিল। কোনও কোনও দুষ্ট বানর গাড়োয়ানদের লোষ্ট্র নিক্ষেপে উত্যক্ত হইয়া গাছের আড়াল হইতে তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করি-বার অভিপ্রায়ে দাঁত বাহির করিয়া বিকট মুখভঙ্গী করিতে লাগিল;—দেখিয়া, যাত্রীদের মধ্যে হাসির ধূম পড়িয়া গেল! এই সকল যাত্রীর মধ্যে যাহারা ইতিপূর্ব্বে বৃন্দাবনে তীর্থপর্য্যটনে গিয়াছিল, তাহারা বৃন্দাবনে মর্কটদিগের অত্যাচার ও বুদ্ধির গল্পে সহযাত্রীদিগের বিস্ময় উৎপাদন করিতে লাগিল।

বেলা প্রায় পাঁচটার সময় আমরা একটি ইষ্টকরচিত পথে আসিয়া পড়িলাম। এই পথ ভগবানগোলা হইতে বালুচর পর্য্যন্ত গিয়াছে। পথটি অতি সুন্দর, পরিষ্কার, লোহিতবর্ণ। শুনিলাম, বালুচর এখান হইতে দেড় ক্রোশের অধিক নহে। এখান হইতেই কিন্তু নগরের আভাস পাওয়া গেল। মধ্যে মধ্যে সুদৃশ্য

বাংলো, ছোট ছোট কলমের আমবাগান, শাক সবজীর সুন্দর ক্ষেত। বেলা সাড়ে ছয়টার সময় প্রায় এগারো ক্রোশ পথ অতিক্রমপূর্ব্বক এবং সমস্ত দিন গরুর গাড়ীর মধ্যে পড়িয়া সর্ব্বাঙ্গ বেদনাপ্লুত করিয়া বালুচরের পারঘাটার সম্মুখে আসিয়া নামিলাম।

গাড়োয়ান তৎক্ষণাৎ আমার জিনিষপত্র নামাইয়া দিয়া বিদায় হইয়া গেল। আমি কিন্তু কি উপায়ে এখন খাগড়া যাই, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম; এখান হইতে খাগড়া প্রায় সাত ক্রোশ। আকাশে ভয়ানক মেঘ, অবিলম্বেই ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা। আগামী কল্য সকালে দশহরা গঙ্গাস্নানের যোগ। চারি দিক হইতে অসংখ্য যাত্রী আসিয়া এ দিকে ও দিকে ঘুরিতেছে, আড্ডা খুঁজিতেছে, সঙ্গীদের ডাকাডাকি করিতেছে, কোন সঙ্গীর অনুসন্ধান না পাইয়া তাহার উদ্দেশে গালিবর্ষণ করিতে করিতে, পুঁটুলী কাঁকালে লইয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া তিন চারি জন যাত্রী মুখোমুখি হইয়া ঝগড়া করিতেছে। কিন্তু এই জনস্রোতের মধ্যে আমি একখানিও পরিচিত মুখ দেখিতে পাইলাম না। পথের ধারে পানের দোকানে পান বিক্রয় হইতেছে, সন্দেশের দোকান সুন্দররূপে সাজাইয়া দোকানী প্রচুর বিক্রয়ের সুখস্বপ্নে মগ্ন। আমি শুধু একাকী এই জনপূর্ণ যাত্রিকোলাহলমগ্ন ভাগিরথীতীরে বসিয়া ভাবিতেছি, করি কি? একবার আমাদের সেই হাস্যকল্লোলমুখরিত বন্ধুবান্ধবপরিবেষ্টিত রাজসাহীর বাসার কথা মনে পড়িতেছে, একবার আমার সেই বহুদূরের বৃক্ষলতামধ্যবর্ত্তী স্নেহময় আত্মীয়স্বজনপূর্ণ ক্ষুদ্র গৃহের ক্ষুদ্র সুখ ও সন্তোষের কথা, ঐ মেঘাবৃত আকাশের বিদ্যুৎছটার ন্যায় অতীত স্মৃতির সুখালোকময় চাঞ্চল্য উৎপাদন করিতেছে। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। এদিকে সমস্ত দিন প্রায় অনাহার; আকাশের অবস্থা অত্যন্ত সংশয়াপন্ন। আমি খাগড়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। শুনিলাম, এখন ষ্টীমার লালবাগ পর্য্যন্ত যাইতে পারে, তাহার ওদিকে যায় না। ডাক-গাড়ী সকালে আটটার সময় বালুচর ছাড়ে, এখন তাহাও পাইবার উপায় নাই। গরুর গাড়ীতে রওনা হইলে সমস্ত রাত্রি লাগিবে, আবার রাত্রেও অনাহার। সমস্ত রাত্রি 'হটর হটর হট্'! একখানি হাড়ও তাহা হইলে বাড়ী ফিরাইয়া লইয়া যাইতে পারিব না। এখানে দুই একখানি ঘোড়ার গাড়ী পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য। অগত্যা নৌকার সন্ধানে লোক পাঠাইলাম। বুঝিলাম, এমন দুর্দ্দিনে এই ঝড় বৃষ্টি মাথায় করিয়া ছয় সাত ক্রোশ পথ নৌকাপথে যাওয়া

বিড়ম্বনা, তবে এক ভরসা, গঙ্গায় বেশী জল নাই! আর যাহাই হউক, ডুবিয়া মরিব না।

নৌকার সন্ধানে লোক পাঠাইয়া নদীতীরে বসিয়া থাকিলাম। অপর পারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর আফিস, রেলের গাড়ী, গুদাম ঘর, দেখা যাইতেছে। রেলের ঘাটে এখনও ছোট ছোট ষ্টীমার বাঁধা আছে, দক্ষিণে অদূরে জৈন ও মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদিগের প্রকাণ্ড অট্টালিকা; নদীবক্ষে জেলে ডিঙ্গীর সংখ্যাও অল্প নহে; কিন্তু বালুচরের পারে ডিঙ্গী একেবারেই নাই, সকলগুলিই আজিমগঞ্জের পারে বাঁধা আছে।

আমি নদীতীরে বসিয়া বসিয়া বহুদেশ হইতে আগত যাত্রিগণের কাণ্ড দেখিতে লাগিলাম। এরূপ দৃশ্য আর কখনও দেখি নাই।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে স্ত্রী পুরুষ বহুসংখ্যক যাত্রী ধীরে ধীরে নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং জলের ধারে বোঁচকা ও পুঁটুলীগুলি নামাইয়া রাখিয়া হরিধ্বনিপূর্ব্বক সারি দিয়া বসিয়া মৃত্তিকায় মস্তক স্পর্শ করিল, তাহার পর সর্ব্বাঙ্গ মাটিতে লুটাইয়া নদীতীরে গড়াগড়ি দিতে লাগিল, সর্ব্বাঙ্গ ধূলিধূসরিত হইলে তাহারা উঠিয়া বসিয়া প্রেমগদ্গদভাবে মস্তক, ওষ্ঠ এবং কণ্ঠে গঙ্গামৃত্তিকা স্পর্শ করিল। দেখিলাম, কত অন্ধ, কত খঞ্জ, কত অস্থিচর্ম্মসার চিররোগী, যষ্টিহস্তে বহুকষ্টে অনেক দূর হইতে জননী জাহ্নবীর পবিত্র উৎসঙ্গে আপনাদের তাপদগ্ধ জীবনের দীর্ঘসঞ্চিত পাপতাপ এবং অবসাদ ধৌত করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। জানি না, তাহাদের কামনা পূর্ণ হইবে কি না। তাহাদের আশা, তাহাদের উৎসাহ, তাহাদের অমার্জ্জিত হৃদয়ের এই অসীম অন্ধ বিশ্বাসের পরিণাম যাহাই হউক, আমি কিন্তু বিশ্বাসহীন, নিরাশ, শুষ্ক হৃদয় লইয়া, বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে এই দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। একটি বৃদ্ধা উদরী রোগে বড় কষ্ট পাইতেছিল, সে বহুকষ্টে পবিত্র গঙ্গামৃত্তিকায় উদর ন্যস্ত করিয়া স্থিরভাবে শুইয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিল; তাহার মুখে শান্তি এবং প্রসন্নতার ভাব ফুটিয়া উঠিল দেখিয়া বোধ হইল, তাহার অর্দ্ধেক যন্ত্রণা দূর হইয়াছে।

অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। সন্ধ্যার অন্ধকার এবং বাতাসের বেগ বাড়িয়া উঠিল। আমি অগত্যা পারঘাটার মাশুল আদায়ের ঘরে আশ্রয় লইলাম। যাঁহাকে নৌকার সন্ধানে আজিমগঞ্জের পারে পাঠাইয়াছিলাম, তিনি ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, এই ঝড় বৃষ্টি মাথায়

করিয়া কোনও মাঝিই নৌকা ছাড়িতে প্রস্তুত নহে, বিশেষতঃ বিপরীত বায়ুতে নৌকা চালানও কঠিন। আমি উপায়ান্তর না দেখিয়া ঘোড়গাড়ীর সন্ধানে বাহির হইলাম; এবং অনেক ভাড়া দিয়া একখানি গাড়ী স্থির করিয়া সন্ধ্যার পর খাগড়া রওনা হইলাম।

বালুচরের আঁকা বাঁকা পথ ঘুরিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল। প্রায় দুই ঘণ্টা ক্রমাগত চলিয়া চকের নিকট আসিয়া গাড়ী থামিল। গাড়োয়ান ঘোড়াকে 'দানাপানি' খাইতে দিল। তখন রাত্রি প্রায় দশটা। আমি গাড়ী হইতে নামিয়া এদিক ওদিক ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম। মহরম আরম্ভ হইয়াছে; তাই এই প্রাচীন মুসলমান রাজধানীতে উৎসবের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল। দোকানগুলি সুসজ্জিত, চারি দিকে উজ্জ্বল আলোকমালা, নানা জিনিসের অনেক দোকান। হঠাৎ গম্ভীরস্বরে ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল; কিন্তু এই ব্যাণ্ডের স্বর কাণে নূতন ঠেকিতে লাগিল। মহরম মুসলমানগণের বিষাদোৎসব, তাই এই ব্যাণ্ডের সুরে একটা আকুল বেদনা, একটা নিরাশাপ্লুত বিষাদের রেখা অঙ্কিত ছিল; বোধ হইতেছিল, "কে যেন কোন মহাপুরুষের বিস্মৃতপ্রায় অতীত-সমাধির উপর বসিয়া গভীর শোকে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে, এবং অশ্রুধারায় জগতের বক্ষ হইতে কোমল সহানুভূতি এবং বেদনা বহন করিয়া সেই কণ্টকময় সমাধি সিক্ত করিতেছে।

অনেকক্ষণ পরে ব্যাণ্ড থামিয়া গেল। আমার গাড়ী আবার চলিতে আরম্ভ করিল। এবার আমরা নগরের বক্ষ ভেদ করিয়া চলিতে লাগিলাম। দুই দিকে প্রকাণ্ড অট্টালিকাশ্রেণী বঙ্গের প্রচীন রাজধানীর অতীত গৌরবের পরিচয় প্রদান করিতেছে। কত গির্জ্জাঘর, কত মসজিদ, মুসলমানদের সেকেলে ধরণের জীর্ণবাড়ী,—মহরম উপলক্ষে সেগুলি নূতন চূণকাম করা হইয়াছে,—মুসলমানদের খোলা উপসনালয়ে লাল, নীল, সবুজ ফানুসে আলো জ্বলিতেছে, উন্মুক্ত বাবুর্চিখানা হইতে পলাণ্ডুখচিত মোগলাইখানার সুগন্ধ উঠিতেছে, দ্বারপ্রান্তে মুসলমান বালক ও যুবকেরা দাঁড়াইয়া কলরব করিতেছে। কোন কোন দোকানে মহরমের তাজিয়া, সুরঞ্জিত সোলার বাগান প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে। পথে অধিক লোক নাই, দূরে দূরে দুই একটি আলো, আকাশ মেঘপূর্ণ, তাহারই মধ্যে রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া দুই চারি জন মুসলমান যুবক গল্প করিতেছে, তুচ্ছ কথায় উচ্চ হাসিতেছে; তাহারা উৎসবের পরিচ্ছেদে সজ্জিত।—পায়ে জরির জুতা, পরিধানে ঢিলা পায়জামার

উপর সূক্ষ্মকারুকার্য্যখচিত আচকান, তাহার উপর জাফ্‌রান বা বেগুনি রঙ্গের ফতুয়া, মাথায় চূড়াদার টুপী। দুই এক জন শুভ্র-দাড়ী-গোঁফ-মণ্ডিত, শুভ্র পরিচ্ছদে আবৃতদেহ, সৌম্যমূর্ত্তি, বৃদ্ধ মুসলমান ইতস্ততঃ পদচারণ করিতেছে; দেখিয়া বোধ হয়, যেন তাহারা আরব্য-উপন্যাস-বর্ণিত সেকালের দরবেশ বা মৌলবী। সুবেশিনী মুসলমান রমণীগণ অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া গোলাপবাসিত পীত কিম্বা ভায়োলেট রঙ্গের ক্রেপের ওড়নায় ক্ষীণ তনু আবৃত করিয়া বর্ত্তিকাহস্তে অভীপ্সিত স্থানে গমন করিতেছে; তাহাদের করতল মেদী-রঞ্জিত, তাহাদের পদপ্রান্তের ভূষণশিঞ্জন ধরণীর মূক বক্ষে সুখস্বপ্নের ন্যায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। এই সুবৃহৎ, ভগ্নপ্রায়, সমৃদ্ধিশালীন, প্রাচীন নগরের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে আমার বোধ হইতে লাগিল, যেন আমি এই অর্দ্ধরাত্রে রহস্যপরিবৃত, কুহকস্বপ্নমগ্ন, আলোকান্ধকারময় প্রাচীন মুসলমান রাজধানী বোগ্দাদের রাজপথ বহিয়া চলিতেছি; এ যেন সত্য নহে, স্বপ্ন; এখনি যেন আরব্য উপন্যাসের কি একটি অলৌকিক দৃশ্য আমার নয়নসমক্ষে উদ্ঘাটিত হইবে।

রাত্রি ১১টার সময় খাগড়ায় উপস্থিত হইলাম। যাঁহার গৃহে আমার আতিথ্যগ্রহণের কথা ছিল, দেখিলাম, তাঁহার সদর দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অনেক ডাকাডাকির পর এক জন লোক আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। দেখিলাম, বহিঃপ্রাঙ্গণে বহুসংখ্যক লোক। বুঝিলাম, গঙ্গাস্নানের যাত্রীরা আসিয়া এখানে আশ্রয় লইয়াছে। অন্ধকারময় সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া আলোকপ্লাবিত দ্বিতলের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, প্রায় সকলেই নিদ্রামগ্ন; আমার মধুরহৃদয়, স্নেহময়ী Hostess নিদ্রোত্থিত হইয়া অনুযোগ পূর্ব্বক কহিলেন যে, আমার সকালে পঁহুছিবার কথা ছিল, এবং তদনুসারে তিনি আহারাদির আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমার আসা হইল না মনে করিয়া, তিনি রাত্রির জন্য আর কোনও আয়োজন করেন নাই; সুতরাং রন্ধনশালায় যে কিছু অন্নব্যঞ্জন উদ্বৃত্ত আছে, তদ্দারাই আমাকে জঠরানল নির্ব্বাপিত করিতে হইবে। আমি অগত্যা তাহাতেই সম্মত হইলাম। কিন্তু আসন গ্রহণ করিয়া দেখিলাম, তিনি আমাকে পরিহাস করিয়াছেন। আমার জন্য সে রাত্রে যে খাদ্যসামগ্রী রক্ষিত হইয়াছিল, তাহা তিন জন ঔদরিকের পরিপূর্ণ খোরাক!

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

রত্নাবলীর রচয়িতা শ্রীহর্ষ।

"রত্নাবলী" নাটিকা সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডারের একটি অমূল্য রত্ন। ইহার রচয়িতার দেশ, কাল ও চরিত্র জানিবার জন্য পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু লোকমাত্রেরই স্বভাবতঃ নিতান্ত কৌতূহল হইয়া থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইতিহাসহীন প্রাচীন ভারতে রত্নাবলী-কারের দেশ, কাল ও চরিত্রের তত্ত্ব অপেক্ষা, বোধ হয়, অন্য কোনও কবির ঐতিহাসিক তত্ত্ব অধিক জটিল ও সন্দিগ্ধ নহে। বিষয়টি জটিল ও সন্দিগ্ধ বলিয়াই, এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ও ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতমণ্ডলী যে পরিমাণে চিন্তা ও গবেষণা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অন্য কোনও কবির সম্বন্ধে প্রায় সেরূপ দৃষ্ট হয় না।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে প্রথমতঃ পণ্ডিতপ্রবর উইলসন্ সাহেব তাঁহার "হিন্দুজাতির দৃশ্যকাব্য" নামক সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকে এই বিষয়ের আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তৎপরে পণ্ডিতপ্রবর হল্ সাহেব, স্বপ্রকাশিত "বাসবদত্তা"র উপক্রমণিকায়, উইল্সন্ সাহেবের মত পরিত্যাগ করিয়া, নিজে একটি অভিনব মত স্থাপন করেন। তৎপরে স্বপ্রকাশিত "কাব্যপ্রকাশের" বিজ্ঞাপনে, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রসঙ্গতঃ এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন; তিনি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদ্বয়ের উভয়ের মতই খণ্ডন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় পর-মত-খণ্ডন ব্যতীত এ সম্বন্ধে নিজে কোনও মত স্থাপন করেন নাই। ডাক্তার শ্রীযুক্ত রামদাস সেন মহাশয় এ সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি রত্নাবলীর রচয়িতা সম্বন্ধে উইল্সন্ সাহেবের সিদ্ধান্তেরই অনুসরণ করিয়াছেন; কিন্তু উইল্সন্ সাহেব রত্নাবলীর রচনাকাল যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিলে, একটি অসামঞ্জস্য ঘটে,—ইহা দেখিয়া, তিনি কোনও প্রমাণ-প্রয়োগ না করিয়াই, রত্নাবলীর রচনাকাল সম্বন্ধে উইল্সনের মতটি ভ্রান্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ফলতঃ, রত্নাবলীর ঐতিহাসিক তত্ত্বের সমালোচনা-বিষয়ে, আমাদিগের স্বদেশীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত ন্যায়রত্ন মহাশয়ই সমধিক চিন্তা ও তার্কিকতা শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। পণ্ডিতপ্রবর রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সমালোচনায় উইল্সনের মতখণ্ডনবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে ন্যায়রত্ন মহাশয়েরই মতানুসরণ করিয়াছেন; তবে তিনি ন্যায়রত্ন মহা-

শয়ের ন্যায় কেবল পরমতখণ্ডন করিয়াই ক্ষান্ত না হইয়া, রত্নাবলী-কার সম্বন্ধে নিজেও একটি মত প্রকাশ করিয়াছেন। রাজকৃষ্ণ বাবুর মতের সহিত হল্ সাহেবের মতের অনেকাংশে সৌসাদৃশ্য আছে; তবে রাজকৃষ্ণ বাবু এ সম্বন্ধে নিজে একটি সুন্দর ও সুকৌশলময় যুক্তি দেখাইয়াছেন।

রত্নাবলীর ঐতিহাসিক তত্ত্ব সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ও স্বদেশীয় পণ্ডিতগণের অনেকেই এইরূপ অনেক চিন্তাপূর্ণ সমালোচনা করিয়া থাকিলেও, বিষয়টি যে আশানুরূপ বিশদ ও নিঃসন্দিগ্ধ হইয়াছে, এরূপ বলা যায় না। পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত ও যুক্তিগুলির আলোচনা করিলেই ইহা প্রতীত হইবে।

সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডার সমুদ্রবিশেষ; যত্ন ও গবেষণা দ্বারা ইহা হইতে যে কত অমূল্য রত্ন সমুদ্ধৃত হইতে পারে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। পূর্ব্বোক্ত সমালোচনা সকল প্রকাশিত হইবার পরে, রাজসাহায্যে পণ্ডিতপ্রবর ডাক্তার পিটর্সন্ ও বুলার প্রভৃতি মহোদয়গণ কর্তৃক কাশ্মীরাদি দেশস্থিত প্রাচীন পুস্তকাগার হইতে যে সকল দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন সংস্কৃত হস্তলিখিত পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা হইতে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক নূতন তত্ত্বই আবিষ্কৃত হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত সমালোচনাগুলির পরে রত্নাবলীর ঐতিহাসিক তত্ত্ব সম্বন্ধে অপর কোনও মৌলিক সমালোচনা প্রকাশিত হয় নাই। বোধ হয়, সেইরূপ সমালোচনার উপযুক্ত উপকরণও বর্ত্তমান ছিল না; কিন্তু এখন এই নবাবিষ্কৃত প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সকলের সাহায্যে, রত্নাবলী সম্বন্ধে নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে কয়েকটি তত্ত্ব আমরা অবগত হইতে পারি, তদ্দ্বারা রত্নাবলীর ভূতপূর্ব্ব সমালোচনার অনেকাংশেরই অভ্রান্তরূপে খণ্ডন ও কোনও কোনও বিষয় অভ্রান্তযুক্তিপ্রদর্শনে নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত করা যাইতে পারে। আমরা এই উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধটি লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমরা প্রথমতঃ রত্নাবলী সম্বন্ধে ভূতপূর্ব্ব পাশ্চাত্য ও স্বদেশীয় সমালোচকগণের মতের সমালোচনা করিয়া, পরে আমাদিগের নিজ মত ব্যক্ত করিব।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা করিলে, দুই জন সুপ্রসিদ্ধ রাজা শ্রীহর্ষের বিষয় অবগত হওয়া যায়। ইহাদের প্রথম কান্যকুব্জাধিপতি রাজা হর্ষবর্দ্ধন বা শ্রীহর্ষ। ইনি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন, ইহা চীনদেশীয় বিখ্যাত পরিব্রাজক হুয়েন্থসঙ্গের ভ্রমণবৃত্তান্তপাঠে জানা যায়। দ্বিতীয় কাশ্মীররাজ শ্রীহর্ষ; ইনি অধ্যাপক উইল্সন্ সাহেবের মতে ১১১৩

খৃষ্টাব্দ হইতে ১১২৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কাশ্মীর রাজ্য শাসন করেন ; কিন্তু মহামহোপাধ্যায় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কৃত রাজতরঙ্গিণীর ব্যাখ্যা অনুসারে দেখা যায় যে, তিনি ১০৯১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০৯৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কাশ্মীরের রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। এই দুই জন রাজা শ্রীহর্ষের মধ্যে কোনও এক জন যে রত্নাবলীর রচয়িতা, ইহা ভূতপূর্ব্ব সমালোচকগণ প্রায় সকলেই একরূপ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। বস্তুতঃ, এই দুই জন শ্রীহর্ষ ভিন্ন প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে অপর কোনও রাজা শ্রীহর্ষের প্রসিদ্ধি দেখা যায় না। যিনি রত্নাবলীর রচয়িতা, তিনি রাজা না হইয়া দরিদ্র হইলেও কেবল কবি বলিয়াই সাহিত্যসমাজে অতিশয় প্রসিদ্ধিলাভের নিতান্ত সম্ভাবনা দেখা যায় ; তাহাতে রত্নাবলীর রচয়িতা যে পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, তাহা রত্নাবলীর প্রস্তাবনাতেই স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় এই প্রসিদ্ধ শ্রীহর্ষদ্বয় ব্যতীত অপর কোনও অপ্রসিদ্ধনামা শ্রীহর্ষ যে রত্নাবলীর রচয়িতা হইবেন, এরূপ অনুমান সম্ভবপর বোধ হয় না।

অধ্যাপক উইল্‌সন্ সাহেব এই দুই জন শ্রীহর্ষের মধ্যে কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষকেই রত্নাবলী-কার বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ইহার কারণ এই যে, কহ্লণপণ্ডিতকৃত রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে কাশ্মীররাজ শ্রীহর্ষদেব সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকটি দৃষ্ট হয় ;—

> "সোঽশেষদেশভাষাজ্ঞঃ সর্ব্বভাষাসু সৎকবিঃ।
> কৃৎস্নবিদ্যানিধিঃ প্রাপ খ্যাতিং দেশান্তরেষ্বপি ॥"
>
> —রাজতরঙ্গিণী ; ৭ম তরঙ্গ ; ৬১১ শ্লোক।

রত্নাবলী-কার যে রাজা ছিলেন, তাহা রত্নাবলীর প্রস্তাবনাতেই প্রকাশ পাইতেছে। কাশ্মীররাজ শ্রীহর্ষ ভিন্ন অপর কোনও রাজা শ্রীহর্ষের কবিত্বের খ্যাতি যে সংস্কৃত সাহিত্যে আছে, বোধ হয়, তাহা উইল্‌সন্ সাহেব জানিতেন না ; সুতরাং তিনি রাজতরঙ্গিণীর পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটি দেখিয়া কাশ্মীররাজ শ্রীহর্ষকেই রত্নাবলী-কার বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

পণ্ডিতপ্রবর হল্ সাহেব দেখিলেন যে, কাশ্মীররাজ শ্রীহর্ষকে রত্নাবলী-কার বলিয়া স্বীকার করিলে, কতকগুলি অসামঞ্জস্য অনিবার্য্য হইয়া উঠে। কেবল রাজতরঙ্গিণীর এইরূপ একটি প্রশংসাশ্লোকদর্শনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইলে, বাণভট্টরচিত শ্রীহর্ষচরিতে কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধনের তদ্রূপ বা তদপেক্ষাও অধিক প্রশংসাদর্শনে তাঁহাকেও রত্নাবলীর রচয়িতা বলা

যাইতে পারে। বিশেষতঃ, কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধনকে রত্নাবলী-কার স্বীকার করিলে, কোনও অসামঞ্জস্য ঘটে না। বোধ হয়, ইহা দেখিয়াই হল্ সাহেব অন্য কয়েকটি যুক্তির আশ্রয়ে কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধনের সভাপণ্ডিত বাণভট্টকেই রত্নাবলী-কার বলিয়া স্থির করিয়াছেন। হল্ সাহেবের সেই যুক্তিবিন্যাস এই ;—

১ম। "কাব্যপ্রকাশনিদর্শন" নামক কাব্যপ্রকাশের প্রাচীন টীকাপুস্তকে, "শ্রীহর্ষাদের্বাণাদীনামিব ধনং" এইরূপ পাঠভেদ দৃষ্ট হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বাণভট্ট প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া শ্রীহর্ষ প্রভৃতি রাজগণের নিকট হইতে প্রচুর ধন লাভ করিয়াছিলেন।

২। রত্নাবলীস্থিত "দ্বীপাৎ" ইত্যাদি শ্লোকটি বাণভট্টের হর্ষচরিতেও দৃষ্ট হয় ; এতদ্দ্বারা উভয়ের রচয়িতা যে এক ব্যক্তি, তাহা প্রতীত হইতেছে।

৩। "শার্ঙ্গধরপদ্ধতি" নামক প্রাচীন সংগ্রহপুস্তকে—

> "অহো প্রভাবো বাগ্‌দেব্যা যন্মাতঙ্গদিবাকরঃ।
> শ্রীহর্ষস্যাভবৎ সভ্যঃ সমো বাণময়ূরয়োঃ ॥"

এই কবিতাটি দৃষ্ট হয় ; ইহা দ্বারা বাণভট্ট যে শ্রীহর্ষের সভ্য ছিলেন, তাহা জনা যায়।

হল্ সাহেবের পরে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়, স্বপ্রকাশিত কাব্যপ্রকাশের বিজ্ঞাপনে, প্রসঙ্গতঃ উইল্‌সন্ সাহেব ও হল্ সাহেবের মতের সমালোচনা করিয়াছেন। কাশ্মীরাধিপতি হর্ষদেব রত্নাবলীর রচয়িতা, উইল্‌সন্ সাহেবের এই মতের বিরুদ্ধে ন্যায়রত্ন মহাশয় নিম্নলিখিত আপত্তিগুলি উত্থাপিত করিয়াছেন ;—

১ম। রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে হর্ষদেবচরিত সবিস্তরে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু রত্নাবলী যে হর্ষদেব-রচিত, কুত্রাপি এইরূপ উক্তি দেখা যায় না ; সুতরাং কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষ রত্নাবলী-কার নহেন।

২য়। রত্নাবলী-কারের নাম শ্রীহর্ষ ; কিন্তু হর্ষ নহে। সুতরাং "শ্রিয়া যুক্তো হর্ষঃ শ্রীহর্ষঃ" এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়া, কাশ্মীরপতি হর্ষদেবকে রত্নাবলী-কার শ্রীহর্ষ বলিয়া স্থির করা সঙ্গত নহে।

৩য়। মালবাধিপতি ভোজদেব স্বকৃত "সরস্বতীকণ্ঠাভরণ" নামক অলঙ্কার নিবন্ধে রত্নাবলী হইতে অনেকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। কাশ্মীরাধিপতি হর্ষদেবের পিতামহ অনন্তদেবের রাজ্যকালে ভোজদেব মালব রাজ্য

শাসন করিতেছিলেন। ইহা কহ্লণকৃত রাজতরঙ্গিণীর নিম্নলিখিত শ্লোকে জানা যায়,—

"মালবাধিপতির্ভোজঃ প্রহিতৈ রত্নসঞ্চয়ৈঃ।
অকারয়ৎ যেন কুণ্ডযোজনং কটকশ্বরে॥"

—৭ম তরঙ্গ; ১৯০ শ্লোক।

অনন্তদেব ১০৬৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কাশ্মীররাজ্যের রাজা ছিলেন; সুতরাং তাঁহার সমকালে বা কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক সময়ে যে ভোজদেব বর্ত্তমান ছিলেন, ইহা নিঃসন্দেহে স্থির করা যাইতে পারে। উইল্‌সন্ সাহেবের মতানুসারে হর্ষদেব ১১১৩ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। সুতরাং হর্ষদেব রত্নাবলী-কার হইলে, তাঁহার পিতামহের সমকালীন ভোজদেব কর্ত্তৃক রত্নাবলীর শ্লোক সমুদ্ধৃত হওয়া কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? সুতরাং রত্নাবলী যে কাশ্মীররাজ হর্ষদেবের অনেক পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, এবং তিনি যে রত্নাবলীর রচয়িতা হইতে পারেন না, ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে।

৪র্থ। ধনিক, ওরফে ধনঞ্জয় পণ্ডিত, "দশরূপ" নামক অলঙ্কার-গ্রন্থে রত্নাবলী হইতে অনেকগুলি উদাহরণ গ্রহণ করিয়াছেন। ধনিক মালবাধিপতি মুঞ্জ নৃপতির সভ্য ছিলেন, ইহা দশরূপ চতুর্থ পরিচ্ছেদের অন্তে "বিষ্ণোঃ সুতেনাপি ধনঞ্জয়েন" ইত্যাদি শ্লোকটি পাঠ করিলেই জানা যাইতে পারে। মুঞ্জ নৃপতি ভোজদেবের পূর্ব্বে মালবদেশের রাজা ছিলেন। ইহা ভোজপ্রবন্ধ, ভোজচরিতাদি গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায়। ইতিহাসবেত্তারা ১০৩০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে মুঞ্জের রাজ্যকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন; সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মুঞ্জের রাজ্যকালে হর্ষদেবের জন্ম হইবারও কথা নহে। এরূপ অবস্থায় তাঁহার রচিত রত্নাবলী যে সে সময়ে প্রচলিত থাকিবে, ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? ইহা দ্বারা হর্ষদেবের পূর্ব্বেও রত্নাবলীর অস্তিত্বের প্রমাণ হইতেছে; সুতরাং কাশ্মীররাজ হর্ষদেব কোনরূপেই রত্নাবলীর রচয়িতা হইতে পারেন না।

৫ম। "শ্রীহর্ষাদের্ধাবকাদীনামিব ধনং" কাব্যপ্রকাশের এইরূপ পাঠ ও "প্রথিতযশসাং ধাবকসৌমিল্লকবিপুত্রাদীনাং" ইত্যাদিরূপ মালবিকাগ্নিমিত্রের পাঠ স্বীকার করিলে, ধাবক কবি মালবিকাগ্নিমিত্রকার কালিদাসেরও পূর্ব্বে রত্নাবলী লিখিয়া শ্রীহর্ষ হইতে ধন লাভ করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রতীত

হয়। সুতরাং এরূপ অবস্থায় কাশ্মীররাজ হর্ষদেব যে রত্নাবলীকার হইতে পারেন না, এ সম্বন্ধে আর কি বক্তব্য আছে?

পণ্ডিতপ্রবর রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কেবল ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ৩য় ও ৪র্থ যুক্তি অবলম্বন করিয়াই উইল্‌সনের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সুতরাং আমরা তাঁহার যুক্তির স্বতন্ত্র সমালোচনা না করিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয়ের যুক্তিগুলির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় যুক্তি কেবল অনুমানমূলক; কোনও ব্যক্তি কর্ত্তৃক কোনও বিষয়ের অনুল্লেখ যে সেই বিষয়ের অস্তিত্বাভাবের নিশ্চিত প্রমাণরূপে গণ্য হইতে পারে না, ইহা বোধ হয়, বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। এইরূপ অনুল্লেখদর্শনে কেবল সন্দেহেরই উদয় হইতে পারে, কিন্তু সেই সন্দেহের মূলেও নিঃসন্দিগ্ধরূপে কোনও অনুমান করা যাইতে পারে না। ন্যায়রত্ন মহাশয়, বোধ হয়, এই দুইটি যুক্তির উপর বিশেষ কোনও নির্ভর করেন নাই। সুতরাং আমরা এইরূপ অনুমানমূলক যুক্তির সন্দিগ্ধতা বিশেষ করিয়া দেখাইতে ইচ্ছা করি না। আমাদিগের বিবেচনায় নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ দ্বারা কোনও বিষয়ের তথ্য নির্ণীত হইলে, এইরূপ অনুমানমূলক যুক্তি তাহার পোষকতাস্থলে গ্রহণ করিলেও কোনও ক্ষতি নাই; বোধ হয়, ন্যায়রত্ন মহাশয় সেই ভাবেই এই যুক্তি দুইটির উল্লেখ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ৩য় ও ৪র্থ যুক্তি প্রতিপাদ্য বিষয়ের চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীমধ্যে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। রাজকৃষ্ণ বাবু কেবল এই যুক্তি দুইটিই উইল্‌সন্ সাহেবের মতখণ্ডনবিষয়ে যথেষ্ট মনে করিয়াছেন, ইহা দ্বারাই যুক্তি দুইটির সারবত্তা বিলক্ষণ প্রতীত হইবে। কিন্তু এই যুক্তি দুইটির সম্পূর্ণতাবিষয়ে আমাদের মনে যে গুরুতর সন্দেহের উদয় হইয়াছে, তাহা এ স্থলে ব্যক্ত করিতেছি।

হর্ষদেব ১১১৩ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। উইল্‌সন্ সাহেবের এই উক্তিটি যে ভ্রান্ত, রাজতরঙ্গিণীর প্রমাণানুসারে যে অন্যরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হয়, তাহা ন্যায়রত্ন মহাশয় কাব্যপ্রকাশের বিজ্ঞাপনে উত্তমরূপে প্রমাণিত করিয়াছেন। রাজতরঙ্গিণীর মতানুসারে ন্যায়রত্ন মহাশয় স্থির করিয়াছেন যে, হর্ষদেব ১০৯১ খৃষ্টাব্দের পরে ও ১০৯৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে, কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। উইল্‌সন্ সাহেব কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া ১০০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে মালবরাজ ভোজ-

দেবের রাজ্যকাল নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ন্যায়রত্ন মহাশয় পূর্ব্বোক্ত রাজতরঙ্গিণীর প্রমাণানুসারে ভোজদেবের রাজ্যকাল কাশ্মীররাজ অনন্তদেবের সমকালে, অর্থাৎ ১০৬৫ খৃষ্টাব্দের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বা পরে, স্থির করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার স্বীকৃত হর্ষদেব ও ভোজদেবের রাজ্যকালের মধ্যে ২৬ বৎসরের অন্তর দেখা যাইতেছে। উইল্‌সনের স্বীকৃত ভোজদেব ও হর্ষদেবের রাজ্যকালের মধ্যে শতাধিক বৎসরের অন্তর দেখা যায়। সুতরাং উহা যথার্থ হইলে, এইরূপ সুদীর্ঘকালের পরবর্ত্তী হর্ষদেবের রচিত রত্নাবলী ভোজদেব কর্ত্তৃক দৃষ্ট হওয়া একপ্রকার অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু উইল্‌সন্ সাহেবের নির্ণীত ভোজ ও হর্ষদেবের রাজ্যকাল অপ্রামাণ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া, ন্যায়রত্ন মহাশয় রাজতরঙ্গিণীর মতানুসরণে তাঁহাদের যে রাজ্যকাল স্থির করিয়াছেন, যদি তাহা প্রকৃত হয়, তবে ভোজদেব ও হর্ষদেবের রাজ্যকালের মধ্যে ২৬ বৎসরের অন্তর দেখা যায়। এরূপ অবস্থায় হর্ষদেব-রচিত রত্নাবলী ভোজদেব কর্ত্তৃক পঠিত হওয়া নিতান্তই অসম্ভব বলা যায় কি? পণ্ডিতবর রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এই যুক্তি-টির উপর নির্ভর করিয়া বলিয়াছেন যে, যখন ভোজদেব হর্ষদেবের পিতা-মহ অনন্তদেবের সমকালীন লোক, তখন তিনি যে হর্ষদেবের রচিত রত্নাবলী পাঠ করিতে পারিবেন, ইহা সম্ভবপর নহে। রাজতরঙ্গিণীর পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটির প্রমাণানুসারে ভোজদেব যে হর্ষদেবের পিতামহ অনন্তদেবের সম-কালীন ব্যক্তি ছিলেন, এ সম্বন্ধে কাহারও কোনও সন্দেহ হইতে পারে না। কিন্তু রাজতরঙ্গিণীর গ্রন্থকার ভোজদেবের রাজ্যকালের কোনও সীমানির্দ্দেশ করেন নাই। এরূপ অবস্থায় যখন ন্যায়রত্ন মহাশয়ের স্বীকৃত ভোজদেব ও হর্ষদেবের রাজ্যকালমধ্যে ২৬ বৎসরের অন্তর দেখা যাইতেছে, তখন ভোজ-দেব যে দীর্ঘজীবী হইয়া হর্ষদেবের রাজ্যকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন না, ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে? আমরা জিজ্ঞাসা করি, পিতামহের পক্ষে পৌত্রকে কৃতবিদ্য দেখিয়া যাওয়া, বা পৌত্রের রচিত কোনও গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া পাওয়া কি নিতান্তই অসম্ভব? তাহা না হইলেও পিতামহের সম-কালীন লোক বলিয়াই যে কোনও ব্যক্তি তাঁহার সমকালীন কোনও ব্যক্তির পৌত্রের লিখিত কোনও গ্রন্থাদি পাঠ করা অসম্ভব, এ কথা প্রমাণান্তরের অভাবে কিরূপে বলা যাইতে পারে? একটি দৃষ্টান্ত দেখুন না কেন? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পূজ্যপাদ স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমকালীন

ব্যক্তি; তিনি এখন পর্য্যন্তও জীবিত আছেন। তিনি কি তাঁহার সমকালীন ব্যক্তি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পৌত্র কি দৌহিত্রাদির লিখিত গ্রন্থাদি পাঠ করিতে পারেন না? যদি ইহা অসম্ভব না হয়, তাহা হইলে ভোজদেবের পক্ষে তাঁহার সমকালীন ব্যক্তি অনন্তদেবের পৌত্র হর্ষদেবের রচিত রত্নাবলী পাঠ করিতে পারা কি জন্য অসম্ভব হইবে? আমরা যে একটি দৃষ্টান্ত দেখাইলাম, সমসাময়িক ইতিহাস হইতে কি এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় না? সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মতানুসারে ভোজদেব ও হর্ষদেবের রাজ্যকাল স্থির করিলেও, তাহা হইতে কোনরূপে নিঃসন্দেহে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না।

ন্যায়রত্ন মহাশয় হর্ষদেবের যে রাজ্যকাল স্থির করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কাহারও কোনও সন্দেহ নাই; কিন্তু ভোজদেবের রাজ্যকাল সম্বন্ধে নবাবিষ্কৃত কতকগুলি অনুশাসনপত্রের সাহায্যে, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এই যুক্তিটির প্রতি-কূলে একটি নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায়। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ বেবর, লাসেন ও কোলব্রুক সাহেব ভোজদেব ও তাঁহার পরবর্ত্তী রাজগণের রাজ্যকালের কয়েক-খানি নবাবিষ্কৃত অনুশাসনপত্রের সাহায্যে স্থির করিয়াছেন যে, ভোজদেব ১০৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জীবিত ছিলেন। * বস্তুতঃ, এইরূপ প্রমাণ কোনরূপেই অস্বীকার করা যাইতে পারে না। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, ভোজরাজ ও হর্ষদেবের রাজ্যকালের মধ্যে বিশেষ কোনও অন্তর নাই। সুতরাং এরূপ অবস্থায় রাজতরঙ্গিণীর সহিত অনুশাসনগুলির সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, ভোজদেব অনন্তদেবের সমকালবর্ত্তী লোক হইলেও যে তিনি হর্ষদেবের রাজ্যকাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই ত অধিকতর সঙ্গত বোধ হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রত্নাবলী কাশ্মীর-রাজ হর্ষদেবের রচিত হইলেও, ভোজদেব কর্ত্তৃক তাহা পঠিত হইতে পারা আপাততঃ যেরূপ অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়, বাস্তবিক সেরূপ অসম্ভব নহে। বরং প্রমাণান্তরদর্শনে ইহাই প্রকৃত ঘটনা বলিয়া বোধ হয়।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ৪র্থ যুক্তিটি আপাততঃ নিতান্তই গুরুতর বলিয়া বোধ হয়। ভোজদেব হর্ষদেবের পিতামহ অনন্তদেবের সমকালীন ব্যক্তি হইলেও, যেন তাঁহার দীর্ঘজীবন অনুমান করিয়া লইলেও কোনরূপে বিষয়টির সামঞ্জস্য

---

* Weber সাহেবের কৃত "The History of Indian Literature" নামক সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকের ২০১ পৃষ্ঠা দেখুন।

রক্ষা করা যাইতে পারে। কিন্তু মুঞ্জ ও তাঁহার সভাপণ্ডিত ধনঞ্জয় সম্বন্ধেও সেইরূপ কথা খাটে না। ন্যায়রত্ন মহাশয় ভোজপ্রবন্ধ, ভোজচরিতাদি গ্রন্থ হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে, মুঞ্জ ভোজদেবেরও পূর্ব্বে মালবের রাজা ছিলেন। তিনি কোনও কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতানুসরণ করিয়া ১০৩০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে মুঞ্জের রাজ্যকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মুঞ্জের সভাপণ্ডিত ধনঞ্জয়েরও তাহা হইলে এই সময় স্থির হইতেছে। রাজতরঙ্গিণীর মতে হর্ষদেব ১০৯১ খৃষ্টাব্দের পরে কাশ্মীরের রাজপদে সমারূঢ় হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং ধনঞ্জয় যে তাঁহার ৬১ বৎসরকাল পরবর্ত্তী রাজা হর্ষদেবের রত্নাবলী উদ্ধৃত করিয়া যাইবেন, ইহা ত আরও অবিশ্বাস্য কথা। মুঞ্জরাজের রাজ্যকালের যে একখানি অনুশাসনপত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদ্দর্শনে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নির্ণীত কাল হইতে আরও ৫৬ বৎসর পূর্ব্বে মুঞ্জের রাজ্যকাল স্থির হয়। * মুঞ্জের আর একটি নাম বাক্‌পতিরাজ ছিল। অনুশাসনপত্রখানিতে মুঞ্জের পরিবর্ত্তে বাক্‌পতিরাজ নাম দেখা যায়। বাক্‌পতিরাজ যে মুঞ্জেরই নামান্তর ছিল, তাহা বোধ হয়, জয়পুর-নিবাসী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদই প্রথমে প্রমাণ করেন। তাঁহার সম্পাদিত "প্রাচীনলেখমালা" পুস্তকখানি এতদ্দেশে বিরল প্রচার বলিয়া আমরা পণ্ডিতপ্রবরের সেই যুক্তিগুলির নিম্নে উল্লেখ করিতেছি,—

১ম। ধনিক পণ্ডিত স্বকৃত দশরূপালোক গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদে এক স্থলে "প্রণয়কুপিতাং দৃষ্ট্বা দেবীং" ইত্যাদি শ্লোকটি বাক্‌পতিরাজের নামে উদ্ধৃত করিয়া, পুনরায় সেই শ্লোকটি অন্যত্র মুঞ্জের নামে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা দ্বারা ধনিকের মতে বাক্‌পতিরাজ মুঞ্জের নামান্তর বলিয়া প্রতীত হইতেছে।

২য়। হলায়ুধ পণ্ডিত তাঁহার কৃত পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রের বৃত্তিতে নিম্নলিখিত তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"ব্রহ্মক্ষত্রকুলীনঃ প্রলীনসামন্তচক্রনুতচরণঃ।
সকলসুকৃতৈকপুঞ্জঃ শ্রীমান্ মুঞ্জশ্চিরং জয়তি॥"
"জয়তি ভুবনৈকবীরঃ সীরায়ুধতুলিতবিপুলবলবিভবঃ।
অনবরতবিত্তবিতরণনির্জ্জিতচম্পাধিপো মুঞ্জঃ॥"

* "Indian Antiquary" নামক সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকার ৬ষ্ঠ খণ্ড ৫১—৫২ পৃষ্ঠা, অথবা বোম্বাই নির্ণয়সাগর যন্ত্রালয় হইতে মুদ্রিত "প্রাচীনলেখমালা" পুস্তকের ১—৪ পৃষ্ঠা দেখুন।

"স জয়তি বাক্‌পতিরাজঃ সকলার্থিমনোরথৈককল্পতরুঃ।
প্রত্যর্থিভূতপার্থিবলক্ষ্মীহঠহরণদুর্ললিতঃ॥"

এই শ্লোকগুলির প্রথম দুইটিতে মুঞ্জ ও তৃতীয়টিতে বাক্‌পতিরাজ নাম দেখা যায়।

৩য়। জৈনধর্ম্মাবলম্বী অমিতগতি নামক যতির প্রণীত "সুভাষিতরত্নসন্দোহ" নামক গ্রন্থের শেষে নিম্নলিখিত শ্লোক দেখা যায়,—

"সমারূঢ়ে পূতত্রিদিববসতিং বিক্রমনৃপে
সহস্রে বর্ষাণাং প্রভবতি হি পঞ্চাশদধিকে।
সমাপ্তং পঞ্চম্যাং অবতি ধরণীং মুঞ্জনৃপতৌ
সিতে পক্ষে পৌষে বুধবিহিতমিদং শাস্ত্রমনঘম্॥"

ইহা দ্বারা ১০৫০ সংবৎ, অর্থাৎ ৯৯৩ খৃষ্টাব্দে মুঞ্জের রাজ্যকাল প্রমাণিত হয়। পূর্ব্বোক্ত অনুশাসনপত্র ৯৭৪ খৃষ্টাব্দে বাক্‌পতিরাজের রাজ্যকালে লিখিত হইয়াছিল; এই উভয় কালের মধ্যে অধিক অন্তর দেখা যায় না। সুতরাং মুঞ্জ যে বাক্‌পতিরাজেরই নামান্তর, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বোক্ত অনুশাসনপত্র-অনুসারে দেখা যাইতেছে যে, মুঞ্জ বা বাক্‌পতিরাজ, ৯৭৪ খৃষ্টাব্দে মালবরাজ্য শাসন করিতেছিলেন। সুতরাং যখন ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নির্ণীত কাল হইতেও ৫৬ বৎসর পূর্ব্বে মুঞ্জের রাজ্যকাল স্থির হইল, তখন তাঁহার সভাপণ্ডিত ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক শতাধিক বৎসরের পরবর্ত্তী হর্ষদেবের রত্নাবলী কিরূপে উদ্ধৃত হইতে পারে?

আমরা এ যাবৎ যাহা বলিলাম, তদ্দ্বারা ন্যায়রত্ন মহাশয়ের চতুর্থ যুক্তিটিরই নিতান্ত পোষকতা হইতেছে; তাঁহার এই যুক্তিটি যে কারণবশতঃ আমাদিগের নিকট সন্দিগ্ধ বলিয়া বোধ হয়, তাহা নিম্নে লিখিতেছি।

বিষ্ণুর পুত্র ধনঞ্জয় পণ্ডিত যে মুঞ্জরাজার সভাপণ্ডিত থাকিয়া দশরূপনামক অলঙ্কার গ্রন্থের রচনা করিয়াছেন, তাহাতে কাহারও কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না;—কেন না, তিনি দশরূপের শেষে "বিষ্ণোঃ সুতেনাপি ধনঞ্জয়েন" ইত্যাদি শ্লোকে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু দশরূপের বৃত্তি অংশ, যাহা "দশরূপাবলোক" বলিয়া খ্যাত, তাহার শেষে প্রত্যেক পরিচ্ছেদান্তে— "ইতি শ্রীবিষ্ণুসূনোর্ধনিকস্য কৃতৌ দশরূপাবলোকে" ইত্যাদিরূপ ভণিতা দৃষ্ট হয়। এখন সকলের মনেই স্বভাবতঃ এই সন্দেহ উদিত হইতে পারে যে, "দশরূপ"-গ্রন্থকার ধনঞ্জয় ও "দশরূপাবলোক"-কার ধনিক, একই ব্যক্তি কি না? তাঁহারা এক ব্যক্তি হইলে, তাঁহাদের ও তাঁহাদের রচিত কারিকা ও বৃত্তি অংশের

নাম বিভিন্ন লক্ষিত হয় কেন? রত্নাবলী ও অন্যান্য গ্রন্থাদি হইতে যে সকল উদাহরণ গৃহীত হইয়াছে, তাহা "দশরূপাবলোক" নামক বৃত্তি-অংশেই পাওয়া যায়। ন্যায়রত্ন মহাশয় এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই করেন নাই; তিনি ধনিক ধনঞ্জয়েরই নামান্তর বলিয়া স্থির করিয়াছেন। পক্ষান্তরে দেখা যায় যে, প্রাচীনলেখমালা পুস্তকের সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ দশরূপাবলোক-কার ধনিককে স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়াই মনে করিয়াছেন। ধনঞ্জয় যে ধনিক হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি, তিনি অবশ্য অপ্রাসঙ্গিক স্থলে সে সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই। কিন্তু এইরূপ বিভিন্ন-গ্রন্থকার বিভিন্ন-নামধারী ব্যক্তিগণের একত্ব প্রমাণিত না হওয়া পর্য্যন্ত যে তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র বলিয়াই ধরিতে হইবে, কার্য্যতঃ ইহার আভাস দিয়াছেন। বস্তুতঃ আমাদিগের বোধ হয় যে, নিরপেক্ষভাবে সত্যের অনুসন্ধান করিতে হইলে, এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সুতরাং আমাদিগকে সন্দিগ্ধচিত্তে জিজ্ঞাসা করিতে হইতেছে যে, ধনঞ্জয় ও ধনিক যে অভিন্ন, এ সম্বন্ধে কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আছে কি? ধনঞ্জয় ও ধনিক উভয়েই আপনাকে বিষ্ণুর পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, কেবল ইহার উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহাদিগকে অভিন্ন বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে কি? যদি প্রকৃতপ্রস্তাবে এই ধনিক বিষ্ণুর পুত্র ধনঞ্জয় বা তাঁহার ভ্রাতা না হইয়া অপর কোনও বিষ্ণুর পুত্র হয়েন, তাহা হইলে এই ধনিকের সময় নির্দ্ধারণ না করিতে পারিলে তাঁহার রচিত দশরূপাবলোকে রত্নাবলীর শ্লোকদর্শনে হর্ষদেব কর্ত্তৃক রত্নাবলী রচিত হওয়ার প্রতিকূলে কোনও তর্কই উত্থাপিত করা যাইতে পারে না। আমরা ইতিপূর্ব্বে মুঞ্জ নৃপতির যে অনুশাসনপত্রের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, তাহা পাঠ করিলে জানা যায় যে, মুঞ্জ নৃপতি তদ্দ্বারা ধনিক পণ্ডিতের পুত্র বসন্তাচার্য্যকে কতকগুলি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। যদি এই ধনিক পণ্ডিতই দশরূপাবলোকের রচয়িতা ধনিক হয়েন, তাহা হইলে তিনি ধনঞ্জয়, বা ধনঞ্জয়ের ভ্রাতা না হইলেও যে অন্ততঃ ধনঞ্জয়ের সমকালীন ব্যক্তি ছিলেন, তাহা অনায়াসেই স্থির করা যাইত। কিন্তু এই অনুশাসনপত্রের উল্লিখিত ধনিক পণ্ডিতই যে দশরূপাবলোকের রচয়িতা ধনিক, এ সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ আছে কি? যদি সেরূপ কোনও প্রমাণ না থাকে, তাহা হইলে যতই সম্ভবপর হউক না কেন, কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এ বিষয়ে কোনও নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে

না। সুতরাং আমাদিগকে অগত্যা বলিতে হইতেছে যে, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এই যুক্তিটিও নিশ্চয়াত্মিকা নহে।

অতঃপর আমরা ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ৫ম ও শেষ যুক্তিটির আলোচনা করিব।

"শ্রীহর্ষাদের্ধাবকাদীনামিব ধনং" কাব্যপ্রকাশের এইরূপ পাঠ, "প্রথিত-যশসাং ধাবকসৌমিল্লকবিপুত্রাদীনাং" ইত্যাদি মালবিকাগ্নিমিত্রের পাঠ, এবং কাব্যপ্রকাশের কোনও কোনও টীকাকারের ব্যাখ্যা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিলে, ধাবক কবি যে কালিদাসেরও পূর্ব্বে রত্নাবলী নাটিকা লিখিয়া শ্রীহর্ষের নিকট হইতে ধন লাভ করিয়াছিলেন, ইহাও যেন স্বীকার করিতে হইল। কিন্তু কাব্যপ্রকাশ ও মালবিকাগ্নিমিত্রের পূর্ব্বোক্ত পাঠগুলি যে অভ্রান্ত, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে কি? ন্যায়রত্ন মহাশয়ই কাব্যপ্রকাশের বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন যে, মালবিকাগ্নিমিত্রের এই পাঠের 'ধাবক' শব্দের পরিবর্ত্তে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাগারস্থিত দুইখানি প্রাচীন সংস্কৃত হস্তলিখিত পুস্তকেই 'ভাসক' এই পাঠ দেখা যায়। বস্তুতঃ, এ স্থলে 'ধাবক' অথবা 'ভাসক', ইহার কোনটি যে প্রকৃত পাঠ, তাহা বলা কঠিন বলিয়াই, ন্যায়রত্ন মহাশয় এই বিষয়টির এইরূপ সন্দিগ্ধভাবে উল্লেখ করিয়াছেন; ফলতঃ, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অধিকাংশ এ স্থলে 'ভাস' বা 'ভাসক' পাঠ বিশুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। * ইহার প্রধান কারণ এই যে, কাব্যপ্রকাশ ও মালবিকাগ্নিমিত্রের কোনও কোনও হস্তলিখিত পুস্তকেই কেবল ধাবকের নাম দেখা যায়। ধাবক যে এক জন খ্যাতনামা কবি ছিলেন, বা কোনও কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, এ সম্বন্ধে সুবিস্তীর্ণ সংস্কৃত সাহিত্যে অপর কোনও প্রমাণই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পক্ষান্তরে দেখা যায় যে, 'ভাস' প্রাচীন সংস্কৃত কবি বাণভট্টকর্ত্তৃক হর্ষচরিতের প্রারম্ভে কালিদাসাদিরও পূর্ব্ববর্ত্তী বিখ্যাত নাটককার বলিয়া অত্যন্ত প্রশংসিত হইয়াছেন। এরূপ অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতগণ মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রস্তাবনায় 'ধাবকের' পরিবর্ত্তে 'ভাস' বা 'ভাসক' পাঠটিই সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কাব্যপ্রকাশের "শ্রীহর্ষাদের্ধাবকাদীনামিব ধনং" এই পাঠ সম্বন্ধেও এইরূপ বা ইহা অপেক্ষা অধিক পাঠভেদ দৃষ্ট হয়। ন্যায়রত্ন মহাশয়ই উল্লেখ করিয়াছেন, কাব্যপ্রকাশের টীকা "কাব্যপ্রকাশনিদর্শনে" "শ্রীহর্ষাদের্বাণাদীনামিব ধনং" এইরূপ

* Weber সাহেব কৃত "The Htstory of Indian Literature" পুস্তকের ২০৫ পৃষ্ঠা।

পাঠ কল্পিত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, হল্ সাহেব এই পাঠদর্শনেই অপর কয়েকটি যুক্তির সাহায্যে বাণভট্টকে রত্নাবলীকার বলিয়া প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। হল্ সাহেবের এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য যথাস্থানে ব্যক্ত হইবে; এক্ষণে কাব্যপ্রকাশের হল্ সাহেব কর্ত্তৃক সমাদৃত এই পাঠভেদের সম্বন্ধে কাশ্মীর হইতে বুলার সাহেব কর্ত্তৃক যে প্রয়োজনীয় তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব। "কাব্যপ্রকাশের" রচয়িতা মম্মট ভট্ট যে কাশ্মীরদেশীয় ছিলেন, পণ্ডিতপ্রবর বুলার কাশ্মীর হইতে এ সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। মম্মট ভট্ট সম্বন্ধে প্রাচীন পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রচলিত কিংবদন্তীও এইরূপই বটে। এরূপ অবস্থায় মম্মটপ্রচিত কাব্যপ্রকাশের কোনও পাঠবিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হইলে, তাঁহার স্বদেশীয় প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকে কিরূপ লিখিত আছে, তাহা জানিবার জন্য সত্যানুসন্ধিৎসু লোকমাত্রেরই স্বভাবতঃ আগ্রহ হইয়া থাকে। পণ্ডিতবর বুলার সংস্কৃত ভাষার প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তক ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহের জন্য কাশ্মীরদেশে গমন করিয়া তথা হইতে অন্যান্য গ্রন্থ ও তত্ত্বের সহিত মম্মটকৃত কাব্যপ্রকাশেরও অনেকগুলি অতি প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহার সকলগুলিতেই "শ্রীহর্ষাদের্বাণ্ণাদীনামিব ধনং" এইরূপ পাঠ দেখা যায়। কাব্যপ্রকাশের সন্দিগ্ধপাঠবিবেকস্থলে মম্মট ভট্টের স্বদেশীয় হস্তলিখিত পুস্তকের পাঠই যে সমধিক প্রামাণ্য, এ বিষয়ে, বোধ হয়, কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না। ফলতঃ, বুলার সাহেবের এই আবিষ্কার দ্বারা কাব্যপ্রকাশনিদর্শনের ধৃত ও হল্সাহেবের সমাদৃত পাঠেরই সমীচীনতা আশ্চর্য্যরূপে প্রমাণিত হইতেছে। মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রস্তাবনার "ভাসসৌমিল্লকবিপুত্রাদীনাং" ইত্যাদি পাঠের সমীচীনতা দ্বারাও এই বিষয়ের পোষকতা হইতেছে। কেন না, মালবিকাগ্নিমিত্রে যদি প্রকৃতপক্ষে ধাবকের নাম না থাকে, তাহা হইলে কেবল কাব্যপ্রকাশের এতদ্দেশপ্রচলিত পুস্তকের পাঠদর্শনে ধাবক কবির অস্তিত্বই নিঃসন্দেহে অনুমিত হইতে পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের উল্লিখিত কাব্যপ্রকাশ ও মালবিকাগ্নিমিত্রের পাঠগুলি পরীক্ষক পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক অসমীচীন বলিয়া পরিত্যক্ত হওয়ায়, সেই পাঠভেদমূলক ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ৫ম যুক্তিটিও নিশ্চয়াত্মিকা হইতেছে না। এক্ষণে সত্যানুরোধে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, ন্যায়রত্ন মহাশয় ও তাঁহার

মতানুসরণ করিয়া রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে যুক্তিগুলির সাহায্যে উইল্‌সন্ সাহেবের মতটি খণ্ডন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, বস্তুতঃ সেই যুক্তিগুলি দ্বারা উইল্‌সন্ সাহেবের মত নিঃসন্দিগ্ধরূপে খণ্ডিত হইতে পারে না।

"কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধনের সভাপণ্ডিত বাণভট্টই রত্নাবলীর রচয়িতা", হল্ সাহেব যে যুক্তিগুলির সাহায্যে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, আমরা ইতিপূর্ব্বেই সেই যুক্তিগুলির উল্লেখ করিয়াছি; এক্ষণে দেখা যাউক, ন্যায়রত্ন মহাশয় সেই যুক্তিগুলির সম্বন্ধে কি বলেন।

হল্ সাহেবের প্রথম যুক্তিটি সম্বন্ধে ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন যে, হল্ সাহেব কাব্যপ্রকাশনিদর্শনের যে একটিমাত্র পাঠ অবলম্বন করিয়া রত্নাবলী বাণভট্টরচিত, এইরূপ প্রমাণ করিতে চাহেন, বস্তুতঃ তাহা এইরূপ একটি বিষয়ের চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না;—এইরূপ পাঠভেদদর্শনে কেবল মনে সন্দেহেরই উদয় হইতে পারে। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এই উক্তিটি যে নিতান্ত সুবিবেচনাসিদ্ধ, তাহাতে সন্দেহ নাই। হল্ সাহেব কাব্যপ্রকাশনিদর্শনের যে পাঠটি যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী গবেষণার ফলে যে কাশ্মীর হইতে তৎসম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রমাণ সংগৃহীত হইবে, ইহা বোধ হয়, সে সময়ে কেহই কল্পনা করেন নাই। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্বোল্লিখিত বুলার সাহেবের আবিষ্কার দ্বারা হল্ সাহেবের সমাদৃত পাঠটিই বিশেষরূপে সমর্থিত হইতেছে। সুতরাং একটি পাঠভেদদর্শনে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মনে যে সন্দেহের উদয় হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয়ই এখন শতগুণে বর্দ্ধিত হইতে পারে। সে যাহা হউক, আমাদিগের বিবেচনায়, সকল কাব্যপ্রকাশেই যদি হল্ সাহেবের স্বীকৃত পাঠের অনুরূপ পাঠ থাকিত, তাহা হইলেও তদ্দ্বারা রত্নাবলী যে বাণভট্ট-রচিত, এই বিষয়টি নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় না। আমরা যথাস্থলে তাহা দেখাইব। এ স্থলে ইহা বলা কর্ত্তব্য যে, এ সম্বন্ধে যতই সম্ভাবনা থাকুক না কেন, ন্যায়রত্ন মহাশয় এইরূপ সম্ভাবনামূলক অনুমানকে নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া নিজের বিলক্ষণ সুবিবেচনা ও তার্কিকতা শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

হল্ সাহেবের দ্বিতীয় যুক্তিটি সম্বন্ধে ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন যে, কেবল একটিমাত্র শ্লোক দুইখানি গ্রন্থে একরূপ দেখিয়া, ঐ দুইখানি গ্রন্থ এক জনের রচিত বলিয়া স্থির করা যুক্তিসিদ্ধ নহে; কেন না, সংস্কৃত কবিগণ

অনেকে অনেক সময়ে নিজের উক্তির সমর্থন করিবার জন্য, অথবা অপরের একটি উক্তি দ্বারা নিজের বক্তব্য বিষয়টি উত্তমরূপে প্রকাশ পায় দেখিয়া, অপরের কৃত গ্রন্থ হইতে দুই চারিটি শ্লোক অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এই উক্তিটি নিতান্ত সত্য; সংস্কৃত সাহিত্য হইতে এরূপ আরও অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। কেবল সংস্কৃত সাহিত্য কেন, এই বিষয়টি এরূপ স্বাভাবিক যে, সকলদেশীয় সাহিত্য হইতেই এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। আমাদিগের বিবেচনায়, এইরূপ শ্লোকগুলি পরবর্ত্তী লেখকগণ কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত না হইয়া থাকিলে, দুইখানি গ্রন্থে এইরূপ অবিকল শ্লোকদর্শনে নিঃসন্দেহে এই অনুমান করা যাইতে পারে যে, গ্রন্থকারদ্বয়ের এক জন অন্যতরের নিকট হইতে, অথবা তাঁহারা উভয়েই কোনও তৃতীয় ব্যক্তির নিকট হইতে শ্লোক গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ, এই অনুমানদ্বয়ের কোনটি সত্য, তাহা প্রমাণান্তর দ্বারা স্থির করিতে পারিলে, ইহা দ্বারা গ্রন্থকারগণের পৌর্ব্বাপর্য্য অবধারিত করা যাইতে পারে। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাবে দুইখানি গ্রন্থ এক ব্যক্তির রচিত কি না, ইহা স্থির করিতে হইলে, গ্রন্থদ্বয়ের ভাষা, রচনাপদ্ধতি, ভাব ও কবিত্বাদির পরস্পর তুলনা ব্যতীত ইষ্টসিদ্ধির অপর কোনও প্রকৃষ্ট উপায় নাই। সুতরাং এরূপ অবস্থায় হল্ সাহেবের যুক্তিটি যে নিতান্তই সন্দিগ্ধ, তৎসম্বন্ধে অধিক বলা বাহুল্য।

হল্ সাহেবের তৃতীয় যুক্তিটি সম্বন্ধে ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন যে, হল্ সাহেব "শার্ঙ্গধরপদ্ধতি"র যে শ্লোকটি দ্বারা বাণভট্ট শ্রীহর্ষের সভ্য ছিলেন, এইরূপ প্রমাণ করিতে চাহেন, বস্তুতঃ তাহাতে সেইরূপ বুঝায় না। ঐ শ্লোকটি দ্বারা মাতঙ্গ দিবাকর যে বাণ ও ময়ূরের সদৃশ ছিলেন, এবং বাগ্দেবীর প্রভাবে শ্রীহর্ষের সভ্য হইয়াছিলেন, ইহাই জানা যায়। কিন্তু কোনরূপেই এরূপ অর্থ প্রকাশ পায় না যে, মাতঙ্গ দিবাকর বাণ ও ময়ূরের সহিত শ্রীহর্ষের সভ্য হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ, মূলে 'সমঃ' পাঠটি থাকিলে তদ্দ্বারা 'সদৃশ' ভিন্ন 'সহিত' অর্থ প্রকাশ পায় না। হল্ সাহেবের উক্তি সম্বন্ধে এ কথাই যথেষ্ট প্রত্যুত্তর বটে। কিন্তু যখন হর্ষচরিতের প্রমাণ-অনুসারে বাণভট্ট-যে শ্রীহর্ষের সভ্য ছিলেন, এই বিষয়টি নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হইতেছে, তখন আমাদিগের বিবেচনায় এই শ্লোকটি আরও একটু ভাল করিয়া আলোচনা করা আবশ্যক ছিল। ফলতঃ, নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে গেলে বলিতে

হয় যে, হল্ সাহেব এই শ্লোকটির পাঠগ্রহণস্থলে ভ্রান্ত হইয়াছেন। প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তক সকলের মধ্যে অনেক সময়েই এরূপ গুরুতর পাঠভেদ দৃষ্ট হয় যে, অনেক স্থলেই কোনটি যে বিশুদ্ধ পাঠ, তাহা স্থির করিতে গিয়া মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণেরও মতভেদ ঘটিয়া থাকে। কালিদাসের জগৎবিখ্যাত অভিজ্ঞানশকুন্তলের বঙ্গদেশ ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলপ্রচলিত পুস্তক সকলের মধ্যে এরূপ গুরুতর পাঠবৈষম্য দেখা যায় যে, পূজ্যপাদ স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন যে, উহার একবিধ গ্রন্থ পাঠ করিলে অন্যবিধ গ্রন্থপাঠের সম্যক্ ফল লাভ করা যাইতে পারে না। সে যাহা হউক, বর্ত্তমান বিষয়ে আমাদিগের বোধ হয় যে, শার্ঙ্গধরপদ্ধতির পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটিতে 'সমঃ' পদের পরিবর্ত্তে 'সমং' পাঠটি সমীচীন বটে। 'সমং' পাঠটি দ্বারা শ্লোকটির তাৎপর্য্য ও অন্যান্য ঐতিহাসিক প্রমাণের সহিত সামঞ্জস্য উত্তমরূপে রক্ষিত হয়। এইরূপ হইলে, 'সমং' পদটি 'সদৃশ' অর্থ না বুঝাইয়া, 'সহিত' অর্থই বুঝাইয়া থাকে। বস্তুতঃ, বাণভট্ট যে শ্রীহর্ষের সভ্য ছিলেন, তাহা বাণরচিত হর্ষচরিতপাঠেই নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানা যাইতে পারে। হর্ষচরিতের অষ্টম উচ্ছ্বাস পাঠে ইহাও জানা যায় যে, হর্ষদেবের রাজ্যকালে দিবাকর নামক এক জন সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন ও হর্ষদেব পিতৃরাজ্য নিষ্কণ্টক করিয়া এই দিবাকরের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। * শ্রীহর্ষ যে জীবনের শেষভাগে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা চীনদেশীয় পরিব্রাজক হুয়েন্থসাঙের ভ্রমণবৃত্তান্তেই স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন কিংবদন্তী অনুসারে সূর্য্যশতক-রচয়িতা ময়ূর কবি বাণভট্টের সমকালীন ও সম্পর্কিত ব্যক্তি ছিলেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহারা যে এক সময়ে অসামান্য গুণগ্রাহী সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের সভ্য ছিলেন, শার্ঙ্গধরপদ্ধতির এই উক্তি, বোধ হয়, অযথার্থ নহে। আর এইরূপ স্বীকার করিলেই শার্ঙ্গধরপদ্ধতির শ্লোকটির ভাব-বৈচিত্র্য সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। কেন না, মাতঙ্গ দিবাকরকে বাণ ও ময়ূরের সদৃশ বলিলে, তিনি যে শ্রীহর্ষের সভ্য হইবেন, ইহাতে আর বাগ্দেবীর কি আশ্চর্য্য প্রভাব দেখা যায়? কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত প্রমাণানুসারে মাতঙ্গ দিবাকর বৌদ্ধ; অতএব হিন্দু

* বোম্বাই নির্ণয়সাগর যন্ত্র হইতে প্রকাশিত সটীক হর্ষচরিতের দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস ৪৯—৯১ পৃষ্ঠা ও অষ্টম উচ্ছ্বাস ২৬২ ও ২৮৮ পৃষ্ঠায়, "ইয়ং তু গ্রহীষ্যতি" ইত্যাদি বাক্য দ্রষ্টব্য।

সমাজের বহিভূর্ত ও বিগর্হিত হইয়াও যে বিদ্যাপ্রভাবে দ্বিজকুলাবতংস বহুমানাস্পদ বাণ ও ময়ূর কবির সহিত সমভাবে সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, ইহা দ্বারাই প্রকৃতপক্ষে বাগ্দেবীর অলৌকিক মহিমা বুঝা যাইতে পারে। সুতরাং শার্ঙ্গধরপদ্ধতির শ্লোকটির এইরূপ তাৎপর্য্যই অধিক সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। সে যাহা হউক, তর্কস্থলে এই বিষয়ের যথার্থতা স্বীকার না করিলেও দেখা যাইতেছে যে, কেবল হর্ষচরিতের প্রমাণানুসারেই বাণভট্ট শ্রীহর্ষদেবের সভ্য ছিলেন, হল্ সাহেবের এই অনুমানটি সত্য বলিয়া স্থির হইতেছে। সে যাহা হউক, বাণভট্ট হর্ষদেবের সভ্য ছিলেন, এইরূপ স্থির হইলেও, ইহা দ্বারা তিনি যে রত্নাবলী রচনা করিয়াছেন, এরূপ কোনও কথা প্রকাশ পায় না। সুতরাং হল্ সাহেবের সিদ্ধান্তটি যে কেবল অনুমানমূলক, সে বিষয়ে, বোধ হয়, কাহারও মতভেদ হইবে না।

আমরা উইল্সন্ সাহেবের মতাবলম্বী নহি। তবে উক্ত সাহেবের মত খণ্ডন করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত সমালোচকগণ এ যাবৎ যে সকল যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাঁহার মত যে তদ্দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে খণ্ডিত হইতে পারে না, সত্যানুরোধে আমরা ইহা বলিতে বাধ্য। কাশ্মীররাজ হর্ষদেব যে রত্নাবলীর রচয়িতা নহেন, এ সম্বন্ধে আমরা যে একটি প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি, তদ্দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে এই বিষয়টি প্রমাণিত ও উইল্সনের মত খণ্ডিত হইতে পারে। আমরা সেই প্রমাণটি নিম্নে লিখিতেছি।

ডাক্তার পিটরসন্ সাহেব দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন সংস্কৃত হস্তলিখিত পুস্তকের সংগ্রহার্থ ভারতবর্ষের নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া খম্ভায়েৎ নগর হইতে একখানি তালপত্রলিখিত জীর্ণ ও অসম্পূর্ণ "শম্ভলীমতম্" নামক দামোদর-গুপ্ত-বিরচিত প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বোম্বাই-নগরীস্থিত নির্ণয়সাগর যন্ত্রের সত্ত্বাধিপতির যত্নে স্থানান্তর হইতে আরও দুইখানি জীর্ণ অসম্পূর্ণ দামোদর-গুপ্ত-রচিত "কুট্টনীমতম্" নামক হস্তলিখিত পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছিল। "শম্ভলী" ও "কুট্টনী" এই দুইটি পর্য্যায়-শব্দ; বস্তুতঃ, পূর্ব্বোক্ত তিনখানি পুস্তকই দামোদর-গুপ্ত-রচিত "কুট্টনীমতম্" বটে। এই পুস্তকখানি লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং নির্ণয়সাগরযন্ত্রাধিপতি অনেক যত্ন ও অনুসন্ধান করিয়া সম্পূর্ণ পুস্তকলাভে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সুতরাং অগত্যা ঐ তিনখানি অসম্পূর্ণ গ্রন্থ অবলম্বনেই "কুট্টনীমতম্" পুস্তকখানি স্বপ্রকাশিত "কাব্যমালা" নাম্নী মাসিকপত্রিকায় অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই মুদ্রিত

করিয়াছেন। দামোদর গুপ্ত বহু প্রাচীন কবি; রাজতরঙ্গিণীর চতুর্থ তরঙ্গে জয়াপীড় রাজার বর্ণনাবসরে দামোদর গুপ্ত সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকটি দৃষ্ট হয়,—

"স দামোদরগুপ্তাখ্যং কুট্টনীমতকারিণম্।
কবিং কবিং বলিরিব ধুর্য্যং ধীসচিবং ব্যধাৎ॥"
—রাজতরঙ্গিণী; ৪র্থ তরঙ্গ; ৪৯৫ শ্লোক।

ইহার অর্থ এই যে, "বলি যেরূপ কবিকে (অর্থাৎ শুক্রাচার্য্যকে) মন্ত্রসচিব করিয়াছিলেন, তিনি-(জয়াপীড়)-ও সেইরূপ 'কুট্টনীমত' গ্রন্থের রচয়িতা, কবি ও ধুরন্ধর দামোদর গুপ্তকে মন্ত্রসচিব করিয়াছিলেন।" জয়াপীড় রাজা ক্ষীরস্বামী নামক সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণাচার্য্যের নিকট শিক্ষা পাইয়া শব্দবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন; তিনি বিদ্যোৎসাহিতাবশতঃ পতঞ্জলিমুনি-কৃত, লুপ্তপ্রায় ও বিচ্ছিন্ন মহাভাষ্য স্বদেশে প্রচারিত করিয়াছিলেন; ভট্ট উদ্ভট নামক সুপ্রসিদ্ধ আলঙ্কারিকাচার্য্য তাঁহার সভাপতি এবং মনোরথ, শঙ্খদত্ত, চটক, সন্ধিমান প্রভৃতি আরও কয়েক জন কবি তাঁহার সভ্য ছিলেন; রাজতরঙ্গিণী হইতে জয়াপীড় সম্বন্ধে এই ঐতিহাসিক তত্ত্বগুলি জানা যায়। * রাজতরঙ্গিণীর মতে, জয়াপীড় নৃপতি ৭৫৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ৭৮৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাশ্মীররাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার মন্ত্রী দামোদর গুপ্তও সেই সময়ের লোক, এ সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। কাব্যমালায় প্রকাশিত "কুট্টনীমত" গ্রন্থের ২য় শ্লোকটি এইরূপ; যথা,—

"অবধীর্য্য দোষনিচয়ং গুণলেশে সন্নিবেশ্য মতিমার্য্যাঃ।
কুট্টন্যা মতমেতৎ দামোদরগুপ্তরচিতং শৃণুত॥" †

ইহার দ্বারা রাজতরঙ্গিণীর বর্ণিত দামোদর গুপ্তের রচিত কুট্টনীমত গ্রন্থ ও কাব্যমালায় প্রকাশিত কুট্টনীমত গ্রন্থ যে একই গ্রন্থ, সে সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

এই কুট্টনীমত গ্রন্থে যে কোনও বিশেষ ঐতিহাসিক তত্ত্ব অন্তর্নিহিত আছে, কাব্যমালার সম্পাদকগণের মনে তাহা উদিত হয় নাই। গ্রন্থখানির প্রাচীনতা, দুষ্প্রাপ্যতা ও কাব্যাংশে উপাদেয়তা দেখিয়াই তাঁহারা সযত্নে ইহা

* রাজতরঙ্গিণীর চতুর্থ তরঙ্গের ৪৮৭। ৪৮৮। ৪৯৪। ৪৯৫। ৪৯৬ সংখ্যক শ্লোকগুলি দ্রষ্টব্য।

† বোম্বাই নির্ণয়সাগর যন্ত্র হইতে প্রকাশিত কাব্যমালার তৃতীয় গুচ্ছ দেখুন।

প্রকাশিত করিয়াছেন। কিন্তু আমরা এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া কতকগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক তত্ত্ব অবগত হইয়াছি। তন্মধ্যে কেবল বর্ত্তমান-প্রবন্ধবিষয়ক তত্ত্বেরই এ স্থলে উল্লেখ করিতেছি।

কুট্টনীমত গ্রন্থের ৯২৫ সংখ্যক শ্লোকে রত্নাবলী নাটিকার প্রশংসাসূচক নিম্নলিখিত শ্লিষ্ট কবিতাটি দৃষ্ট হয়,—

"আশ্লিষ্ট-সন্ধি-বন্ধং সৎপাত্রসুবর্ণযোজিতং সুতরাম্।
নিপুণপরীক্ষকদৃষ্টং রাজতি রত্নাবলীরত্নম্॥"

সংস্কৃতজ্ঞ পাঠক দেখিবেন যে, এই শ্লোকটি শ্লেষালঙ্কারঘটিত বলিয়া ইহার বিশেষণপদগুলি নাটিকা ও রত্নপক্ষে তুল্যভাবে অন্বিত হইতেছে! কেবল কুট্টনীমত গ্রন্থে এইরূপে রত্নাবলী নামটির উল্লেখ থাকিলে, ইহা শ্রীহর্ষদেবের রত্নাবলীবিষয়ক কি না, সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারিত। কিন্তু কুট্টনী-মতের ৮৫৭ হইতে ৯০৬ সংখ্যক আর্য্যা শ্লোকগুলিতে প্রসঙ্গক্রমে শ্রীহর্ষদেবের রত্নাবলী নাটিকার প্রথমাঙ্কের তাবৎ অভিনয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে; কুট্টনী-মতের বর্ণনা আর্য্যাচ্ছন্দে সংক্ষেপে রত্নাবলীর তাৎপর্য্যানুবাদ বলিলেও হয়। এমন কি,—কুট্টনীমতের ৯০৩ সংখ্যক শ্লোকে রাজা উদয়নের মুখে রত্নাবলীর প্রথমাঙ্কের শেষভাগের,—

"উদয়নাগান্তরিতমিয়ং প্রাচী সূচয়তি দিঙ্ নিশানাথম্।
পরিপাণ্ডুনা মুখেন প্রিয়মিব হৃদয়স্থিতং রমণী॥"

এই কবিতাটি অবিকল দেখা যায়। রত্নাবলীর এই শ্লোকটি আর্য্যাচ্ছন্দে রচিত বলিয়া দামোদর গুপ্ত তাঁহার আর্য্যাচ্ছন্দে বিরচিত কুট্টনীমত গ্রন্থে এই শ্লোকটি অবিকল উদ্ধৃত করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু অন্য স্থলে সেই-রূপ না পারিয়া সংক্ষেপে আর্য্যাচ্ছন্দে তাৎপর্য্যানুবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, কুট্টনীমত পাঠে এইরূপ অনুমান হয়। সে যাহা হউক, কুট্টনীমতের বর্ণিত এই বিষয়টি ইহার উপাখ্যানভাগের সহিত এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ যে, কোনরূপেই এই সকল বর্ণনা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করা যাইতে পারে না। সুতরাং ইহা দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে যে, কুট্টনীমত-রচয়িতা দামোদর গুপ্তের সময়ে রত্নাবলী নাটিকা বর্ত্তমান আকারে প্রচলিত ছিল। দামোদর গুপ্ত যে ৭৫৫ হইতে ৭৮৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জীবিত ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং কাশ্মীররাজ হর্ষদেবের রাজ্যকালের তিন শত বৎসর পূর্ব্বে যে রত্নাবলী নাটিকার প্রসিদ্ধি ছিল, এবং এ জন্য কোনরূপেই

যে তাহা কাশ্মীররাজ হর্ষদেবের রচিত হইতে পারে না, ইহা নিঃসন্দিগ্ধ-রূপে প্রমাণিত হইল।

রত্নাবলী-কার সম্বন্ধে হল্ সাহেবের মত ও ন্যায়রত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক তাহার সমালোচনা সম্বন্ধে আমাদিগের যাহা বক্তব্য, তাহা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি; এক্ষণে রত্নাবলী-কার সম্বন্ধে পণ্ডিতবর রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মতের সমালোচনা করা আবশ্যক। এ সম্বন্ধে আমাদিগের নিজের যাহা মত, তাহা বলিয়া উপসংহার করিব।

রাজকৃষ্ণ বাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ধাবক কবি রত্নাবলী রচনা পূর্ব্বক কান্যকুব্জাধিপতি শ্রীহর্ষের নামে প্রচারিত করিয়া প্রচুর ধন লাভ করিয়া-ছিলেন। তাঁহার মতে, এই শ্রীহর্ষের কথাই মম্মট ভট্ট কাব্যপ্রকাশে "শ্রীহর্ষাদের্ধাবকাদীনামিব ধনং" এই বাক্যে বলিয়া গিয়াছেন। রাজকৃষ্ণ বাবু এই পাঠের অনুকূল কতকগুলি টীকাকারের ব্যাখ্যাও উদ্ধৃত করিয়া-ছেন। কাব্যপ্রকাশের এই পাঠ সম্বন্ধে যে নূতন তত্ত্বের বিষয় আমরা পূর্ব্বে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিয়াছি, তদ্দ্বারাই রাজকৃষ্ণ বাবুর এই অনুমানটি নিরাকৃত হইতেছে। তবে তিনি যে যুক্তির সাহায্যে কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষ-বর্দ্ধনকেই রত্নাবলীর রচয়িতৃরূপে খ্যাত শ্রীহর্ষ বলিয়া স্থির করিয়াছেন, সেই যুক্তিটি বিলক্ষণ সুবিবেচনার পরিচায়ক; আমরা নিম্নে তাঁহার সেই যুক্তিটি অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি;—

"এক্ষণে দেখা যাউক, অন্য কোন শ্রীহর্ষের প্রতি রত্নাবলীর আরোপ করা যায় কি না? রত্নাবলী ও নাগানন্দ এই দুইখানি সংস্কৃত নাটক রাজা শ্রীহর্ষের রচিত বলিয়া উভয় গ্রন্থের প্রস্তাবনায় উল্লিখিত হইয়াছে। নান্দ্যন্তে সূত্রধারের উক্তি উভয় গ্রন্থেই প্রায় এক প্রকার। নান্দীতে দেখা যায় যে, রত্নাবলীতে হরপার্ব্বতী ও নাগানন্দে বুদ্ধদেবকে নমস্কার করা হইয়াছে। ইহাতে জানা যায় যে, যে রাজার নামে গ্রন্থদ্বয় পরিচিত, তিনি এক সময়ে হিন্দু ও অপর সময়ে বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন। কান্যকুব্জাধিপতি শ্রীহর্ষ বা হর্ষবর্দ্ধন, যিনি একটি অব্দ সংস্থাপন করেন, তাঁহার সম্বন্ধে এরূপ কথা এক প্রকার বলা যাইতে পারে। যখন কাদম্বরী-কার বাণভট্ট হর্ষচরিত নামে তদীয় জীবনচরিত রচনা করেন, তখন বোধ হয়, তিনি হিন্দু ছিলেন। নতুবা হিন্দু গ্রন্থকার তাঁহাকে বাড়াইতে যাইবেন কেন? যখন চীনদেশীয় পর্য্যটক হুয়েন্থসাঙ্ এতদ্দেশে ভ্রমণে আগমন করিয়া তাঁহাকে সমুদয় আর্য্যা-

বর্ত্তের সম্রাট্‌পদে প্রতিষ্ঠিত দেখেন, তখন তিনি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। মধুসূদন ভাববোধিনী নাম্নী ময়ূরশতকের টীকায় লিখিয়াছেন যে, বাণভট্ট যে হর্ষের সভাপণ্ডিত ছিলেন, সেই শ্রীহর্ষই রত্নাবলীর রচয়িতা। মধুসূদনের গ্রন্থ সংবৎ ১৭১১ অর্থাৎ ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে লিখিত। সুতরাং আমরা যে মতের সমর্থনের জন্য চেষ্টা পাইতেছি, তাহা অন্ততঃ দুই শত বৎসরের পূর্ব্বে এতদ্দেশের পণ্ডিতসমাজের গ্রাহ্য ছিল, এরূপ বোধ হয়।"

"শ্রীহর্ষ এক জন দিগ্বিজয়ী রাজা; তিনি নাটকাদি লিখিবেন, ইহা সম্ভবপর নহে। কিন্তু রাজ্যবিস্তার দ্বারা তিনি যদ্রূপ যশোলাভ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ স্বনামে গ্রন্থপ্রচার দ্বারা যশস্বী হইতে চেষ্টা পাইবেন, এবং তজ্জন্য লেখকদিগকে প্রচুর অর্থ দ্বারা সন্তুষ্ট করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে।"

ধাবকের সম্বন্ধে রাজকৃষ্ণ বাবুর অনুমান অগ্রাহ্য হইলেও, তিনি যে যুক্তির সাহায্যে হর্ষবর্দ্ধনকে রত্নাবলী-কার-রূপে খ্যাত শ্রীহর্ষ বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহার কোন ক্ষতি হয় না। রাজকৃষ্ণ বাবুর এই যুক্তিটির অনুকূল যে তত্ত্বগুলি জানা যায়, আমরা তাহাও এ স্থলে বলিতেছি,—

দিগ্বিজয়ের পূর্ব্বে যে শ্রীহর্ষ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তাহা কেবল এইরূপ অনুমান কেন, হর্ষচরিত হইতেই সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। হর্ষবর্দ্ধন কান্যকুব্জের সম্রাটপদে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, পরিব্রাজক হুয়েন্থ-সাঙ্ যে তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী দেখিয়াছিলেন, হর্ষচরিত হইতে এই বিষয়টিরও সত্যের পোষকতা করা যাইতে পারে। কেন না, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, হর্ষচরিতের অষ্টম উচ্ছ্বাস পাঠে জানা যায় যে, হর্ষবর্দ্ধন তাঁহার সমকালীন দিবাকর নামক সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধসন্ন্যাসীর নিকট বৌদ্ধমতে দীক্ষিত হইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। রত্নাবলী ও নাগানন্দ যে এক ব্যক্তির রচিত, তৎসম্বন্ধে পণ্ডিতগণমধ্যে কোনও মতভেদ দৃষ্ট হয় না। রত্নাবলী-কার সম্বন্ধে দুই শত বৎসর পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণমধ্যে যে কি মত প্রচলিত ছিল, তাহাও রাজকৃষ্ণ বাবুর উল্লিখিত ভাববোধিনী টীকাকার মধুসূদনের উক্তি দ্বারাই জানা যাইতেছে; এরূপ অবস্থায় রাজকৃষ্ণ বাবু যে "ধাবক" সম্বন্ধে একটি অনুমানের উপর আত্যন্তিক বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ধাবককে রত্নাবলী-কার বলিয়া স্থির করিয়াছেন, ইহা আমাদিগের মতে যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই। রাজকৃষ্ণ বাবু যে কারণে হর্ষবর্দ্ধন বা শ্রীহর্ষ কর্ত্তৃক রত্নাবলী রচিত হওয়া অসম্ভবপর বলিয়াছেন, তাহা কোনরূপেই বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। দিগ্বিজয়ী রাজা

ছিলেন বলিয়া যে হর্ষবর্দ্ধন বা শ্রীহর্ষ নাটকাদির রচনা করিতে পারেন না, এইরূপ অনুমানের কোনও মূল আছে কি? বাণভট্ট হর্ষদেবের জীবনচরিত লিখিতে গিয়া তাঁহাকে বাড়াইয়া থাকিতে পারেন, এই আশঙ্কায় আমরা প্রমাণস্থলে এ সম্বন্ধে হর্ষচরিতের কোনও উক্তির উল্লেখ করিব না। নতুবা হর্ষবর্দ্ধন যে সর্ব্ববিদ্যায় ও কলাশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, হর্ষচরিত হইতে এইরূপ অনেক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারিত। সে যাহা হউক, হর্ষবর্দ্ধনও নিতান্ত ধার্ম্মিক ও জিতেন্দ্রিয় রাজা ছিলেন; তিনি যে অলীক যশোলাভের আশায় অপরের দ্বারা নিজের নামে কাব্যপ্রচার করাইতে যাইবেন, ইহা কত দূর সম্ভবপর, সহৃদয় ব্যক্তিগণই বিবেচনা করিবেন। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, বিস্তীর্ণ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস হইতে এইরূপ আর দুই একটি দৃষ্টান্তও কেহ দেখাইতে পারেন কি? বিক্রমাদিত্য, শালিবাহন, জয়াপীড়, মুঞ্জ, ভোজ, লক্ষ্মণসেন প্রভৃতি বিদ্যোৎসাহী রাজগণ বহুসংখ্যক কবি ও পণ্ডিতগণকে প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা অপরের দ্বারা নিজের নামে কোনও গ্রন্থ প্রচার করাইয়াছেন কি? বস্তুতঃ, এই বিষয়টি এরূপ অভূতপূর্ব্ব, অস্বাভাবিক ও প্রকৃত গুণগ্রাহিজনের অযোগ্য যে, আমরা সন্তোষের সহিত বলিতে পারি,—প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্তের বিষয় আমরা অবগত নহি।

হল্ সাহেবের মতাবলম্বী কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, বুলার সাহেবের আবিষ্কৃত ও আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনুমোদিত কাব্যপ্রকাশের "শ্রীহর্ষাদের্বাণাদীনামিব ধনং" এইরূপ পাঠদর্শনে জানা যায় যে, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি রাজগণ হইতে বাণ প্রভৃতি কবিগণ ধনলাভ করিয়াছিলেন। ইহার উত্তরে আমরা বলি যে, কাব্যপ্রকাশের মতে কেন, স্বয়ং বাণভট্টই হর্ষচরিতে সবিস্তরে লিখিয়াছেন যে, তিনি হর্ষবর্দ্ধন বা শ্রীহর্ষ কর্ত্তৃক সাদরে পরিগৃহীত ও পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা দ্বারা তিনি যে রত্নাবলী রচনা করিয়াছিলেন, এরূপ বুঝায় কি? বিদ্যোৎসাহী রাজগণ চিরকাল কবি ও পণ্ডিতগণের সমাদর ও আনুকূল্য করিয়া আসিতেছেন। এ সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস হইতে শত শত প্রমাণের প্রয়োগ করা যাইতে পারে। রাজতরঙ্গিণীর চতুর্থ তরঙ্গের ৪৯৪ সংখ্যক শ্লোকে লিখিত আছে, জয়াপীড় নৃপতি প্রত্যহ লক্ষ দীনার (মুদ্রাবিশেষ) বেতন প্রদান করিয়া পণ্ডিত উদ্ভট ভট্টকে সভাপতি করিয়াছিলেন। উদ্ভট ভট্ট ত রাজা জয়াপীড়ের নামে কোনও গ্রন্থের

প্রচার করেন নাই; সুতরাং যদি তাঁহার ও অন্যান্য পণ্ডিতগণের সম্বন্ধে এইরূপ কোনও কথা না খাটে, তবে বাণভট্ট সম্বন্ধে কাব্যপ্রকাশের এইরূপ একটি সহজবোধ্য উক্তির এরূপ দুর্ব্বোধ্য ও অস্বাভাবিক অর্থ করিবার প্রয়োজন কি? সুতরাং আমাদিগের বিবেচনায় প্রমাণান্তরের অভাবে কাব্যপ্রকাশের এইরূপ পাঠ হইতে, বাণভট্ট কর্ত্তৃক রত্নাবলী রচিত হওয়ার অনুকূলে কোনও প্রমাণই পাওয়া যায় না। ফলতঃ, রাজকৃষ্ণ বাবুর যুক্তিটির সমালোচনাস্থলে আমরা যে কতকগুলি তত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছি, তদনুসারে, আমাদিগের বিবেচনায়, রত্নাবলী কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধন বা শ্রীহর্ষদেবের রচিত বলিয়াই স্থির করা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে অনুকূল যুক্তিগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহার বিরুদ্ধে আরও যে দুই একটি আপত্তি উত্থাপিত করা যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব।

প্রথমতঃ, অনেকে হয়ত বলিবেন যে, কান্যকুব্জাধিপতির নাম যে হর্ষবর্দ্ধন ছিল, বাণরচিত হর্ষচরিতপাঠে তাহা অবগত হওয়া যায়। রত্নাবলী ও নাগানন্দের প্রস্তাবনায় রাজা শ্রীহর্ষ উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। এক্ষণে হর্ষবর্দ্ধনকে কিরূপে শ্রীহর্ষ বলা যাইতে পারে? রাজকৃষ্ণ বাবু কোনও প্রমাণ প্রয়োগ না করিয়াই হর্ষবর্দ্ধনকে শ্রীহর্ষ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে?

আমাদিগের বিবেচনায় এই আপত্তিটি বিশেষ গুরুতর নহে; সহজেই ইহার খণ্ডন করা যাইতে পারে। হর্ষচরিতে যদিও কান্যকুব্জাধিপতির হর্ষবর্দ্ধন এই সম্পূর্ণ নামটি দেখা যায়, তথাপি বাণভট্ট অনেক স্থলেই ইহার পরিবর্ত্তে কেবল "হর্ষ" নামটির ব্যবহার করিয়াছেন। * "হর্ষচরিত" এই গ্রন্থনামটি হইতেও ইহা বুঝা যাইতে পারে। এই "হর্ষ" নামের পূর্ব্বে চিরপ্রচলিতরীত্যনুসারে "শ্রী" শব্দের যোগ করিয়াই "শ্রীহর্ষ" নামটি হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আরও একটি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। আমরা হল্ সাহেবের মতের সমালোচনাকালে শার্ঙ্গধরপদ্ধতির "অহো প্রভাবো বাগ্দেব্যাঃ" ইত্যাদি যে শ্লোকটির উল্লেখ করিয়াছি, তাহার যেরূপ পাঠভেদই থাকুক, ঐ শ্লোকের "শ্রীহর্ষস্য" পদটি যে কান্যকুব্জাধিপতিকে বুঝায়, তৎসম্বন্ধে কাহারও মতভেদ নাই। বস্তুতঃ, হর্ষচরিতের সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে গেলে

* বোম্বাই নির্ণয়সাগর যন্ত্র হইতে প্রকাশিত সটীক হর্ষচরিতের প্রথম উচ্ছ্বাসের একবিংশ শ্লোক এবং ৮৫ ও ১৬৬ পৃষ্ঠা দেখুন।

নিশ্চিতই বলিতে হইবে যে, শার্ঙ্গধরপদ্ধতির "শ্রীহর্ষ" দ্বারা হর্ষবর্দ্ধনকে বুঝাইতেছে। সুতরাং এরূপ অবস্থায় আমাদের বিবেচনায় হর্ষবর্দ্ধনকে শ্রীহর্ষ বলার বিরুদ্ধে কোনও আপত্তি হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, বাণভট্ট হর্ষচরিত লিখিতে গিয়া শ্রীহর্ষের চরিত্র যে কিয়ৎপরিমাণে অতিরঞ্জিত করিবেন, ইহা সম্ভবপর বটে। ফলতঃ, বাণভট্ট শ্রীহর্ষের চরিত্র অতিরঞ্জিত করিয়াছেন কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু তাঁহাকে যে অতিশয় প্রশংসাভাজন করিয়াছেন, হর্ষচরিতেই তাহার সমুজ্জ্বল প্রমাণ দেখা যায়। এরূপ অবস্থায় তিনি রত্নাবলী রচনা করিয়া থাকিলে বাণভট্ট তাঁহাকে সাধারণভাবে "সর্ব্ব বিদ্যায় ও কলাশাস্ত্রে পারদর্শী" বলিয়া ক্ষান্ত না থাকিয়া, রত্নাবলীর রচয়িতা বলিয়া কি উল্লেখ করিতেন না? যাঁহারা এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে বোধ হয়, এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কোনও বিষয়ের অনুল্লেখ সেই বিষয়ের অস্তিত্বাভাবের নিশ্চিত প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। সে যাহা হউক, আমাদিগের বিবেচনায়, বাণভট্ট কর্ত্তৃক হর্ষচরিতে রত্নাবলীর অনুল্লেখের একটি বিশিষ্ট কারণ অনুমিত হইতে পারে। আমরা নিম্নে তাহা লিখিতেছি।

রাজকৃষ্ণ বাবু রত্নাবলী ও নাগানন্দের নান্দীদর্শনে স্থির করিয়াছেন যে, শ্রীহর্ষ পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী থাকার সময়ে রত্নাবলী ও পরে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলে নাগানন্দ রচিত হইয়াছিল। কিন্তু অনেক তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সহৃদয় সমালোচক পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিয়া ইহার বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। পূজ্যপাদ স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় রত্নাবলী নাটিকার কবিত্বের সমালোচনায় যেরূপ অসাধারণ সহৃদয়তা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন, বঙ্গসাহিত্যে সেরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল; তিনি পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়ের পরস্পর তুলনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, "নাগানন্দ কবির প্রথম প্রসূত ও বোধ হয়, তাঁহার নবীন বয়সেরই সন্তান।" আমাদিগের বিশ্বাস, ভূদেব বাবুর এই অনুমানটি অমূলক নহে। এই কথাটি মনে রাখিলে, বাণভট্ট যে কি জন্য হর্ষচরিতে রত্নাবলীর উল্লেখ করেন নাই, এই রহস্যটি সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাইতে পারে। হর্ষচরিতপাঠে জানা যায় যে, হর্ষদেবের পিতা ও অগ্রজের মৃত্যু হওয়ায়, অতি অল্প বয়সেই সাম্রাজ্যের শাসনভার তাঁহার হস্তে পতিত হয়। বাণভট্ট-হর্ষদেবের জীবনচরিত লিখিতে গিয়া অষ্টম উচ্ছ্বাসে হর্ষদেবের দিগ্বিজয়ান্তে

বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণের প্রতিজ্ঞা ও তাঁহার দিগ্বিজয়ের উদ্যোগের বর্ণনা করিয়াই গ্রন্থ পরিসমাপ্ত করিয়াছেন। নাগানন্দ নাটকখানি যে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বনের পরে রচিত হইয়াছিল, রাজকৃষ্ণ বাবুর এই অনুমান সম্বন্ধেও মতভেদ দেখা যায় না। দিগ্বিজয়ান্তে বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণকালে যে হর্ষদেবের নবীন বয়স ছিল, তাহা হর্ষচরিতপাঠেই বেশ বুঝা যায়। এরূপ অবস্থায় নাগানন্দ নাটকখানি হর্ষদেবের প্রথম প্রসূত হইলে, তাহা যে তাঁহার নবীন বয়সেরই রচনা, তাহা বেশ বুঝা যায়। ইহা যদি যথার্থ হয়, তাহা হইলে বাণভট্ট কিরূপে হর্ষচরিতে নাগানন্দ অথবা রত্নাবলী হর্ষদেবের রচিত বলিয়া উল্লেখ করিতে পারেন? বাণভট্ট ত শ্রীহর্ষের বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণ ও তাহার পরবর্ত্তী জীবনচরিতের বর্ণনা করেন নাই। বোধ হয়, বাণভট্টের ন্যায় হিন্দুকবির পক্ষে ঐরূপ বিষয়ের বর্ণনা করা অপ্রীতিকর বলিয়াই বাণভট্ট শ্রীহর্ষের দিগ্বিজয়ের উপক্রমেই গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এরূপ অবস্থায় বাণভট্ট-নাগানন্দ বা রত্নাবলীর উল্লেখ করিতে পারেন না। তবে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, শ্রীহর্ষ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া প্রথমেই নাগানন্দ রচনা করিয়াছিলেন, এইরূপ স্বীকার করিলে, তিনি পরে বৌদ্ধ অবস্থায় থাকিয়া রত্নাবলী রচনা করিতে গিয়া হিন্দুদেবদেবী হরপার্ব্বতীকে কি জন্য নান্দীতে নমস্কার করিবেন? আমাদিগের বিবেচনায়, ইহার দুইটি সদুত্তর দেওয়া যাইতে পারে।

১ম। হুয়েন্থসাঙের ভ্রমণবৃত্তান্তপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, শ্রীহর্ষের রাজ্যকালে হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও বিশেষ বিদ্বেষভাব ছিল না। শ্রীহর্ষ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বন করিয়াও হিন্দু ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণকে তুল্যরূপে সমাদর ও দানাদি করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায়, হিন্দুদেবদেবীগণের প্রতি যে তাঁহার অশ্রদ্ধা ছিল, ইহা কিরূপে বুঝা যাইতে পারে? বিশেষতঃ, লৌকিক বৌদ্ধধর্ম্মে হিন্দুদেবদেবীগণের সত্তা অস্বীকৃত হয় নাই। তবে স্বর্গাদি সুখফলের দাতা ইন্দ্রাদি দেবগণ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মে নির্ব্বাণফলদাতা বুদ্ধদেবের প্রতি সমধিক শ্রদ্ধা অর্পিত হইয়াছে। সুতরাং এরূপ অবস্থায় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও শ্রীহর্ষের পক্ষে হরপার্ব্বতীর নমস্কার অসম্ভবপর নহে।

২য়। ভূদেব বাবু তাঁহার রত্নাবলীর সমালোচনায় দেখাইয়াছেন যে, রত্নাবলীর নান্দীর শ্লোকগুলি অপূর্ব্ব কৌশলে রচিত হইয়াছে; তাহাতে হরপার্ব্বতীর নমস্কার অর্থ ভিন্ন কৌশলক্রমে রত্নাবলীর সমুদায় অঙ্কের বর্ণনীয়

প্রধান বিষয়গুলির আভাষ প্রদত্ত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় রত্নাবলীর নান্দীর শ্লোকগুলি অভিনিবেশসহকারে পাঠ করিলে প্রতীত হইবে যে, দেবতার নমস্কারচ্ছলে এইরূপে বর্ণনীয় বিষয়ের আভাষ দিতে হইলে, কবি হিন্দুদেবদেবীগণের সাহায্য ভিন্ন, কেবল বুদ্ধদেবের নমস্কারসূচক শ্লোকে কোনরূপেই তাহা সম্পন্ন করিতে পারিতেন না। উদয়ন রাজার প্রণয়িনী বাসবদত্তা ও রত্নাবলী বা সাগরিকা; তাঁহাদের কার্য্যের আভাস দিতে হইলে হয় শিবের পত্নী পার্ব্বতী ও গঙ্গা, না হয় বিষ্ণুর পত্নী লক্ষ্মী ও সরস্বতীর কথা আনিতে হইবে। কিন্তু বুদ্ধদেব বা তাঁহার এক স্ত্রী গোপার কথা বলিয়া ত রত্নাবলীর তৃতীয়াঙ্কের বর্ণনীয় বিষয়ের আভাস কোনরূপেই দেওয়া যাইতে পারে না। সুতরাং এরূপ অবস্থায় কবি যে ইষ্টসিদ্ধির জন্যই এইরূপ নান্দীর রচনা করিয়াছেন, ইহাও ত বলা যাইতে পারে।

যখন "অন্বয়ী" হেতু দ্বারাই হর্ষবর্দ্ধন বা শ্রীহর্ষকে রত্নাবলী-কার বলিয়া স্থির করা যাইতেছে, তখন আর অধিক "ব্যতিরেকী" হেতু দেখাইবার আবশ্যক কি? বস্তুতঃ, বাণভট্ট-রচিত হর্ষচরিত, কাদম্বরী, চণ্ডীশতক ও পার্ব্বতী-পরিণয় নামক গ্রন্থগুলির রচনার সহিত রত্নাবলী ও নাগানন্দের তুলনা করিলে, এই গ্রন্থগুলি যে এক ব্যক্তির রচিত নহে, তাহা উত্তমরূপে প্রমাণিত করা যাইতে পারে।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

সমালোচনা।

সাহিত্যে সমালোচনার উপযোগিতা ও উপকারিতা অস্বীকার করা যায় না। শিল্পী শিল্পকার্য্য শেষ করিয়াই নিরস্ত হয়েন, সমালোচক তাহার দোষগুণের বিচার করেন; সেই দোষগুণের বিচারফলে শিল্পীর ভবিষ্যৎ শিল্প উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়। তবেই এ কথা স্বীকার করিতে হয় যে, সাহিত্যে সমালোচনার উপকারিতা যথেষ্ট। কেহ কেহ দৃষ্টান্তস্বরূপ এ কথাও বলিয়া থাকেন যে, ইংরাজী সাহিত্যে প্রকৃত সমালোচনার অভাবের সঙ্গে সঙ্গে ভাল রচনারও অভাব হইয়া পড়িতেছে। যখন "কোয়াটার্লি রিভিউ", "এডিন্‌বরা রিভিউ"

প্রভৃতি পত্রে তীব্র সমালোচনা প্রকাশিত হইত, তখন ইংরাজী সাহিত্যে যত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল, এখন আর তেমন হয় না। কেন ? কেহ কেহ বলেন, ইহার কারণ সমীচীন সমালোচনার অভাব। কেহ কেহ ইহাও মনে করেন যে, "কোয়ার্টার্লির" অতিরিক্ত তীব্র সমালোচনাই কিট্সের অকালমৃত্যুর কারণ। সেই সমালোচনার উপসংহারভাগে সমালোচক যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার ভাবার্থ এইরূপ,—যদি কোনও পাঠক সাহস করিয়া এই পুস্তক (Endymeon) ক্রয় করেন, আমাদিগের অপেক্ষা অধিক সহিষ্ণুতাবশতঃ প্রথম সর্গের অধিকও পাঠ করেন, এবং যদি ইহার কোনরূপ অর্থ বুঝিতে পারেন, তবে যেন সে কথা অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে জ্ঞাপন করেন; তাহা হইলে. এবার যাহা পারিব না বলিয়া হতাশ হইয়াছি, ইহার পর তাহা সম্পাদন করিবার চেষ্টা করিব। অস্মদ্দেশে সাহিত্যসেবা নিতান্তই সখের জিনিষ; তজ্জন্য সাহিত্যসেবীরাও অসাধারণ সূক্ষ্মচর্ম্মী। কেহ আমাদিগের রচনার সমালোচনা করিয়া কেবল প্রশংসা না করিয়া কোনরূপ দোষ দেখাইলে, আর আমাদিগের সহ্য হয় না। আমরা তাহার প্রতিবাদে সমালোচকের যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি না দেখাইয়া তাঁহার উপর কেবল গালি বর্ষণ করি। আমাদিগের আত্মীয়, বন্ধু বা আশ্রিত অনুগতদিগের মধ্যে কেহ সমালোচককে গালি দিবার ভার গ্রহণ না করিলে, আপনারাই মাসিকপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া, বা সভা ডাকিয়া, সমালোচককে গালি দিয়া, আদর্শের ক্ষুদ্রতা, উদ্দেশ্যের হীনতা ও হৃদয়ের নীচতার পরিচয় প্রদান করি, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পরিতৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকি। আবার আমাদিগের "লিটারারী" মোসাহেবগণ আমাদিগের এইরূপ কার্য্যকেও মহৎ কার্য্য বলিয়া আমাদিগকে আত্মদোষের বিষয়ে অন্ধ করিতে ক্রটী করে না। ক্রমে আমরা আপনারাই মনে করিতে আরম্ভ করি যে, আমাদিগের কোথাও কোনরূপ অসম্পূর্ণতা নাই। স্তাবকদিগের মিথ্যা প্রশংসা শুনিতে শুনিতে অবস্থা এমনই দাঁড়ায় যে, মন আপনার কাছে আপনি মিথ্যা কথা কহে ও আপনি সেই মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করে।

সম্প্রতি ইংলণ্ডের অন্যতম খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক মিষ্টার মারে তাঁহার সমসাময়িক ঔপন্যাসিকদিগের সম্বন্ধে যে পুস্তক লিখিয়াছেন, (My Contemporaries in Fiction) তাহা পাঠ করিলে, এবং যদি তাঁহাদিগের বিচারশক্তি একেবারে বিলুপ্ত না হইয়া থাকে, তবে তাঁহার কথাগুলি বিচার করিয়া দেখিলে, অস্মদ্দেশীয় সূক্ষ্মচর্ম্মী সাহিত্যসেবকদিগের অনেক উপকার হইতে পারে।

লেখক বলিয়াছেন, আজ কাল ইংরাজী সাহিত্যের প্রকৃত সমালোচনার অত্যন্ত অভাব। এখন সমালোচক আর সমালোচক নহেন, পেশাদার স্তাবকমাত্র। লেখকের এই কথা

সমালোচনার অভাব।

হইতে করেলি প্রভৃতি ঔপন্যাসিকদিগের সমালোচকদিগের প্রতি ঘৃণার কারণ বুঝিতে পারা যায় না। এখন সমালোচনা সাধারণতঃ নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসামাত্র, ক্বচিৎ—"না মিষ্ট, না টক।" এরূপ সমালোচনায় সাহিত্যের যথেষ্ট ক্ষতি ভিন্ন কিছুমাত্র লাভ নাই, হওয়া সম্ভবও নহে। সমালোচক স্বভাবতঃই পাঠকদিগের মতামত অবগত থাকেন, থাকিয়াও লেখকদিগের নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসামাত্র করিলে এ কথা স্বীকার করিতে হয় যে, তিনি আপনার কর্ত্তব্য অবহেলা করিতেছেন। লেখক বলেন যে, অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে "কোয়ার্টার্লি" প্রভৃতি পত্রের সুতীক্ষ্ণ বাণও সাহিত্যের পক্ষে মঙ্গলকর ছিল, কিন্তু আজকালকার সমালোচকদিগের নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসা বড়ই অমঙ্গলজনক। সেই জন্য মিষ্টার মারে তাঁহার সহযোগীদিগের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি প্রশংসনীয় পুস্তকের প্রশংসা করিতে ক্রটী করেন নাই,

কিন্তু তিনি দোষের প্রতিও দৃষ্টিহীন নহেন। তাঁহার সমালোচনার উদারতা ও মৌলিকতা দেখিয়া প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। কিন্তু বক্ষ্যমাণ পুস্তকের বিশেষ গুণ এই যে, যে সকল অযোগ্য লেখক কেবল সংবাদপত্রের সমালোচনার কৃপায় পাঠকদিগকে ঠকাইয়া খাইতেছে, তাহাদিগের আসল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। আজকালকার সমালোচনার একটা দৃষ্টান্ত এইরূপ,—

আজকালকার সমালোচনায় সচরাচর দেখা যায়, "এই পুস্তকখানি স্কটের উপন্যাসের অপেক্ষা যদি উৎকৃষ্টও না হয়, তবে যে তাহার সমান, ইহাতে আর সন্দেহ নাই।" ঔপ-

একটা দৃষ্টান্ত।

ন্যাসিক ব্যারির একখানি উপন্যাস পাঠ করিয়া তাঁহার মধুর হাস্যরস ও কোমল করুণরসে মুগ্ধ কোনও পাঠকের পক্ষে সন্তোষাধিক্যে এ কথা বলা অসম্ভব নহে যে, ব্যারির A Window in Threems স্কটের উপন্যাসের সমান। কিন্তু তাহা গুণমুগ্ধ পাঠকের কথা, সমালোচকের কথা নহে। দোষগুণের বিচার না করিয়া সহসা একটা কথা বলা সময় সময় স্বাভাবিক হইলেও, তাহা সমালোচকের কার্য্য নহে। সেরূপ কথা বৈঠকখানায় বসিয়া বন্ধুবান্ধবের কাছে বলিলে শোভা পায়, কিন্তু সমালোচনাস্থলে সাধারণসমক্ষে সেরূপ কথা প্রকাশ করিলে অন্যায় হয়। কোনও এক জন লেখকের সম্বন্ধে এরূপ কথা বলিলেও না হয় চলিত, কিন্তু পুনঃপুনঃ নানা লেখক সম্বন্ধে সেই একই কথা বলিলে সন্দেহের কারণ জন্মে। আবার আজ ব্যারির সম্বন্ধে যে কথা বলা হইল, কাল ক্রোকেটের সম্বন্ধে ঠিক সেই কথাই বলিলে, ব্যাপারখানা কি, তাহা বুঝা কঠিন হইয়া উঠে। লেখক বলেন, এই সকল সমালোচক বা স্তাবকদিগের প্রশংসাবাদ ছাড়িয়া দিয়া, প্রকৃতপক্ষে বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, মিষ্টার ক্রোকেট শ্রমশীল লেখক, এই পর্য্যন্ত; স্কটের মুকুট পরিবার মত ক্ষমতা তাঁহার নাই। ক্রোকেট আপনি ব্যারির প্রদর্শিত পথে তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছেন; কিন্তু যে প্রতিভা ও যে মানবচরিত্রজ্ঞান থাকিলে স্বভাবতঃ নীরস বস্তুকে সরস করিয়া, যে উপাখ্যানবস্তুতে (Plot) স্বভাবতঃ মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না, সেই আখ্যানবস্তুতেও পাঠকের অবধান আকৃষ্ট করা যায়, সে প্রতিভা, সে মানবচরিত্রজ্ঞান ক্রোকেটের নাই। এইটুকুই সমালোচকগণ দেখিতে পান না, বা ইচ্ছা করিয়া দেখেন না।

আমাদিগের আলোচ্য পুস্তকে মিষ্টার মারে আর একটা কথা বলিয়াছেন। আজ কাল কোনও কোনও ঔপন্যাসিক ইংরাজী উপন্যাসে ফরাসী উপন্যাসের উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতার আমদানি করিতেছেন। লেখকের মতে ইহা কোনও ক্রমেই সমীচীন

শ্লীল ও অশ্লীল।

নহে। এই ঔপন্যাসিকদিগের দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই জনের নাম উল্লি- হইয়াছে,—টমাস হার্ডি ও জর্জ্জ মুর। দুই জনের রচনা দুই প্রকারের হইলেও, উভয়ের পুস্তকে একই অনিষ্ট হইতেছে; ফরাসী উপন্যাসের উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতা ইংরাজী উপন্যাসে প্রবেশলাভ করিতেছে। হার্ডি নিপুণ চিত্রকর; তাঁহার চিত্রিত চিত্রে যদি বা কোনও ছবি একটু আবৃত থাকে, মুর শিল্পকুশল ফটোগ্রাফার,—তাঁহার চিত্রে—পাপেরই হউক আর পুণ্যেরই হউক, কোনও অংশই বাদ পড়িবে না। তিনি বুঝেন, কিসে চিত্র আদর্শের অনুরূপ হয়। উভয়েরই উপন্যাসে এমন সকল বিষয় আলোচিত হয়, যাহা আলোচিত না হইলেই ভাল হইত। ফরাসী উপন্যাস বালকবালিকার জন্য রচিত হয় না, তাহা প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর জন্য কল্পিত হইয়া থাকে। পাঠক মনে রাখিবেন, ইংরাজীতে অনুবাদ করিবার সময় অনুবাদকদিগকে বহু ফরাসী উপন্যাসের অনেকাংশ পরিহার করিয়া পুস্তক প্রকাশ করিতে হয়। বহু ফরাসী ঔপন্যাসিক পাপের পূতিগন্ধবর্জ্জিত পাপের চিত্র চিত্রিত করিতে পারেন না। তদ্ভিন্ন ডমা

হইতে অনেট পর্য্যন্ত ঔপন্যাসিকদিগের উপন্যাসে ফরাসী সমাজের যে চিত্র চিত্রিত দেখিতে পাই, তাহা নিতান্তই শোচনীয়। বিলাসের বিষম ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সত্য সত্যই কি ফরাসী সমাজে পাপের বিষ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে? ইংরাজী উপন্যাসে সাধারণতঃ ফরাসী উপন্যাসের উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতার অভাব; তাই কোনও ইংরাজ উপন্যাসলেখিকাই বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন যে, যে প্রেম ধর্ম্মমন্দিরের বা অন্ততঃ রেজেষ্টারী আফিসের "সার্টিফিকেট" না পাইয়াছে, ইংরাজী উপন্যাসে সে প্রেমের স্থান নাই। তাঁহার মতে, ইহা ভাল নহে। মিষ্টার মারে বলেন যে, যাহাতে ফরাসী উপন্যাসের আবিলতা ইংরাজী উপন্যাস কলুষিত করিতে না পারে, তাহাই করা কর্ত্তব্য; আর হার্ডিপ্রমুখ লেখকগণ ইচ্ছা করিয়া খাল কাটিয়া ইংরাজী উপন্যাসে সেই আবিলতা আনয়ন করিতেছেন; ইহা কোনও ক্রমেই উচিত নহে।

মিষ্টার মারে তদীয় পুস্তকে তাঁহার সহযোগীদিগের যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ সারসংগ্রহ প্রদান করা সম্ভব নহে। তবে তাঁহার সমালোচনার আর দুই একটি সংবাদ প্রদান করিয়াই আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। তিনি কিপ্‌লিং ও হল্ কেনের প্রশংসা করিয়াছেন; মেরি করেলির আকুলতাও তাঁহার নিকট প্রশংসনীয়। লেখকের মতে, মেরিডিথ পাঠকদিগকে তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র সকলের সহিত অন্তরঙ্গরূপে পরিচিত করাইয়া দেন, এবং তাঁহার হাস্যরসবহুল রচনায় দর্শনের অন্তঃসলিল প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া থাকে।

শেষ কথা।

যাঁহারা বর্ত্তমান সময়ের Society novels অপেক্ষা প্রাচীন উপন্যাস সকলেরই অধিকতর পক্ষপাতী, তাঁহাদিগের নিকট মিষ্টার মারের গ্রন্থ বিশেষ আদৃত হইবে, সন্দেহ নাই। এ গ্রন্থে মিষ্টার মারে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা সকল দেশের সাহিত্যসেবকদিগের বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

জীবনচরিত।

সারা গ্র্যাণ্ড।

সম্প্রতি সারা গ্র্যাণ্ডের নূতন উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে। নানা সংবাদপত্রে Beth Book তীব্ররূপে সমালোচিত হইয়াছে। সারা গ্র্যাণ্ড তাঁহার উপন্যাসে সমাজের কোন-না-কোন কলঙ্ককাহিনী ঘোর অন্ধকার হইতে উজ্জ্বল আলোকে আনিয়া, তাহার বীভৎসতা ও হীনতা প্রকাশিত করিবার চেষ্টা করেন। তাহার ফল Heavenly Twins গ্রন্থের পর Beth Book। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থে তিনি দেখাইয়াছেন যে, এখনকার সমাজে পুরুষের দোষ গণ্যই হয় না। অতি পাপপরায়ণ পুরুষও সমাজে আদৃত, কিন্তু সামান্যমাত্র পাপে লিপ্তা রমণীর পক্ষে সমাজের দ্বার রুদ্ধ। অতি পাপপরায়ণ পুরুষও পবিত্রচিত্তা রমণীকে বিবাহ করা আপনার ন্যায়সঙ্গত অধিকার বলিয়া মনে করে; আর সামান্যমাত্র পাপে লিপ্তা রমণীর পক্ষে পাপপরায়ণ পুরুষকে বিবাহ করিবার আশাও দুরাশামাত্র। তাহার উপর আবার যদি পুরুষের কিছু অর্থ থাকে, তবে ত কথাই নাই; কারণ, এখন "Every door is barr'd with gold, and opens but to golden keys।" সে পুস্তকে লেখিকা দেখাইয়াছেন যে, সমাজের এই ভীষণ প্রথার উচ্ছেদ আবশ্যক। পাপপরায়ণ পতির হস্তে পড়িয়া কোমলপ্রাণা পত্নীর কি দুর্দ্দশা হয়, তাহাই চিত্রিত করিয়া লেখিকা বলিয়াছেন,—এইরূপে নিত্য নিত্য শত শত নারীর প্রাণ-বলিদান হইতেছে। মদ্যপ, প্রবৃত্তির উত্তেজনার

দাস পতির দোষে নিত্য নিত্য শত শত বালিকার কোমল হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে;—এ প্রথা পরিত্যক্ত হওয়া নিতান্তই আবশ্যক। বর্ত্তমান পুস্তকে তিনি দেখাইয়াছেন যে, সমাজে জননীর খেয়ালে, দুর্ব্বলতায়, বা স্বার্থপরতায়, অনেক দুহিতার সর্ব্বনাশ হয়; জননীর পাপ-দৈত্যের প্রীতিকামনায় দুহিতাকে বলিদান করা হয়; জনকজননীর অনুরোধে বা আজ্ঞায় দুহিতার সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে। এমন কথা কেহ অস্বীকার করে না যে, সময় সময় যুবক যুবতীরা জনকজননীর আজ্ঞা তুচ্ছ করিয়া আপনাদিগের উপর দেবতার অভিসম্পাত টানিয়া আনে; কিন্তু তাহা সকলেই জানেন; সে কথায় উপন্যাসোপযোগী নূতনত্ব কিছুমাত্র নাই। কিন্তু আর একটা কথা আছে, সেটা লোককে বুঝান আবশ্যক;—জননী যত সত্বর সম্ভব, কন্যার বিবাহ দিবার অভিপ্রায়ে, পাত্রের যোগ্যতাযোগ্যতা বিচার করেন না। সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞা বালিকা জননীর কথায় ভুলিয়া আজীবন নরকযন্ত্রণা ভোগ করে। কন্যার বিবাহ হইলেই জননীর কর্ত্তব্য শেষ হইল, তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন; কিন্তু অযোগ্য পাত্রে কন্যাসমর্পণ করিয়া, সেই অভাগিনী বালিকাকে চিরদুঃখিনী করিবার অপেক্ষা তাহাকে বিষপান করাইয়া তাহার সকল যন্ত্রণা শেষ করাও যে তাহার পক্ষে মঙ্গলজনক, তাহা জননী বুঝেন না, বা বুঝিতে চাহেন না। কন্যাকে বিষদান করিলে সে পাপের জন্য ফাসি-কাঠের ব্যবস্থা আছে; আর কন্যাকে অযোগ্য পাত্রে দান করিলে লজ্জাও নাই।

তাঁহার Beth book নামক পুস্তকে সারা গ্র্যাণ্ড এই কথাই বুঝাইয়াছেন। কিন্তু সারা গ্র্যাণ্ড উপন্যাসে বক্তৃতা করিবার পক্ষপাতী নহেন; তাই ঐ পুস্তক এমন করিয়া লিখিত যে, যিনি পড়িতে পড়িতে চিন্তা না করিবেন, তিনি পুস্তকের এ উদ্দেশ্য বুঝিতেই পারিবেন না। সেই জন্যই ভিন্ন ভিন্ন সমালোচক পুস্তকের ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য স্থির করিয়া, বিভিন্নরূপ সমালোচনা করিয়াছেন। ইহারই নাম Art to conceal art.

সারা গ্র্যাণ্ডের নবপ্রকাশিত পুস্তকের (Beth Book) নায়িকা চরিত্রে লেখিকার আপনার জীবনের অনেকটা প্রতিবিম্ব লক্ষিত হইবে। লেখিকার জনকজননী ইংরাজ। পিতা নৌবিভাগে কার্য্য করিতেন। কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে আয়ারল্যাণ্ডের একটি সাগরতীরবর্ত্তী স্থানে থাকিতে হইত। সেইখানেই কন্যার জন্ম হয়। কাজেই সারা গ্র্যাণ্ডের শৈশবস্মৃতির সহিত তরঙ্গচঞ্চল সাগরের দৃশ্য ও অনন্তপ্রসারিত নীল বারিরাশির মৃদু গীতি অবিচ্ছিন্নভাবে বিজড়িত। সারা গ্র্যাণ্ড আপনি বলিয়াছেন যে, ইংরাজ হইলেও, আয়ারল্যাণ্ড তাঁহার জন্মভূমি; তিনি আয়ারল্যাণ্ড বড় ভালবাসেন। বস্তুতঃ, আয়ারল্যাণ্ডে কিছু দিন থাকিলে, সে ভালবাসা আপনি আইসে। সেখানে ভৃত্যেরা সকলেই আইরিশ। আবার লেখিকা দরিদ্র কৃষকদিগের পর্ণকুটীরে নানা উপকথা শুনিয়া সময় কাটাইতেন। শৈশবে উপকথার একটা মাধুরী থাকে। শিশুর কাছে উপকথার সকল চরিত্রই যেন জীবন্ত চরিত্র,—তাহাদিগের সুখে বা দুঃখে শিশুও সুখ বা দুঃখ অনুভব করিতে আরম্ভ করে। সারা গ্র্যাণ্ড আপনি বলিয়াছেন যে, শৈশবে তিনি বড় দুরন্ত ছিলেন। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মত অধ্যয়নে রত ছিলেন না; সকলের কথা শুনার অভ্যাসও তাঁহার বড় ছিল না। লোকের সহিত কথা কহিয়া যখন এত আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন গৃহে বসিয়া পাঠ করায় যে কি অধিক আনন্দ, তাহা তিনি বুঝিতেন না। তাঁহাকে প্রায়ই ভৃত্যদিগের ঘরে বা কোনও দরিদ্রের কুটীরে পাওয়া যাইত। দরিদ্রকুটীরে দরিদ্রের নিত্য-আহার গোল আলু আর লবণ খাইতে তাঁহার ভাল লাগিত। এই সকল হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, অল্প বয়স হইতেই দরিদ্রদিগের সহিত সারা গ্র্যাণ্ডের সবিশেষ সহানুভূতির অভাব ছিল না; অর্থাৎ, ঔপন্যাসিকের উপযোগী গুণের মধ্যে অন্ততঃ একটির অভাব তাঁহার ছিল না,—

জন্ম ও শৈশব।

হৃদয়ের অভাব ছিল না। তিনি বলেন যে, আজও তাঁহার সমাজের নিম্নস্তরের সহিত অধিক সহানুভূতি আছে; এখনও সহরের "সোসাইটী"র ফেনিলোচ্ছ্বসিত ঘূর্ণাবর্ত্তে তিনি তত আনন্দ অনুভব করেন না, পক্ষান্তরে দরিদ্রকুটীরে কোনও বৃদ্ধার সহিত গল্প করিয়া প্রচুর আনন্দ সম্ভোগ করেন। পুস্তকপাঠ অপেক্ষা মানব-চরিত্রের অধ্যয়নেই তাঁহার অধিক আনন্দ। জগতে সর্ব্বত্রই "সোসাইটী" আছে; সকল স্থানেই কৃষকসম্প্রদায়ের মধ্যে এমন অনেক লোক দেখা যায়, যাহাদিগের চরিত্র অধ্যয়ন করিলে আনন্দ ও শিক্ষা উভয়ই লাভ করা যায়। কাজেই দেখা যাইতেছে, ঔপন্যাসিকের আর একটি বিশেষ আবশ্যক সম্বলও সারা গ্র্যাণ্ডের ছিল,—তাঁহার মানব-চরিত্র-অধ্যয়নস্পৃহা অত্যন্ত বলবতী।

শৈশবের পর।

সারা গ্র্যাণ্ডের বয়স যখন সাত বৎসর মাত্র, তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার বালিকাহৃদয়ে সে শোক বড়ই লাগিয়াছিল। পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আয়ারল্যাণ্ড-বাসও শেষ হইয়া গেল; বিধবা জননী সন্তানদিগকে লইয়া ইংলণ্ডের একটি সাগরতীরবর্ত্তী ক্ষুদ্র সহরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই সময় সারা গ্র্যাণ্ডের শিক্ষা বড়ই অনিয়মে সম্পন্ন হইয়াছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী নিয়মিত পাঠে ব্যস্ত থাকিতেন, আর তিনি যে পুস্তক পাইতেন, তাহাই পাঠ করিতেন। তাঁহার জননী

পাঠ ও রচনা।

সুশিক্ষিতা ছিলেন, তাঁহার অনেক পুস্তক ছিল; কাজেই দুহিতার পক্ষে পুস্তক পাইবার কোনও অসুবিধাই ছিল না। ঔপন্যাসিকদিগের মধ্যে স্কট, ডিকেন্স ও থ্যাকারের উপন্যাসপাঠেই বালিকার অধিক সময় অতিবাহিত হইত। প্রান্তর-ভ্রমণে, অশ্বারোহণে ও নৌকাবাহনে তাঁহার অত্যন্ত আনন্দ হইত। সে সময়ের রচনার মধ্যে একাদশবর্ষ বয়সে তিনি একটা সঙ্গীত রচনা করিয়া তাহাতে সুরসংযোগ করিয়াছিলেন।

গল্প বলিবার অভ্যাস।

এই সময় তাঁহার গল্প বলিবার খুব অভ্যাস ছিল। রাত্রিকালে দুই ভগিনী শয্যায় শয়ন করিবার পর সারা গ্র্যাণ্ড গল্প বলিতে আরম্ভ করিতেন। সে গল্প সুদীর্ঘ; রাত্রির পর রাত্রি, এইরূপে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, এমন কি, মাসের পর মাস বহিয়া যাইত, তথাপি গল্প সমাপ্ত হইত না। যত প্রকার ভীষণ ঘটনা থাকিতে পারে, তাহার প্রায় সকলই সেই গল্পে সন্নিবিষ্ট হইত; ভীতিপ্রদ ঘটনার প্রাচুর্য্যে শ্রোতার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিত। সারা গ্র্যাণ্ডের ভগিনী বলেন, তিনি আজও সে ধাক্কা সামলাইতে পারেন নাই। সারা গ্র্যাণ্ডের বালিকা-বয়স হইতেই গল্প বলিবার অভ্যাস ছিল।

বিদ্যালয় ও বিবাহ।

চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সারা গ্র্যাণ্ড প্রথম বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। এ কথা বলাই বাহুল্য যে, সে বয়সে সাধারণতঃ বালিকারা নানা বিষয়ে যে শিক্ষা লাভ করে, সারা গ্র্যাণ্ডের তখনও তাহার কিছুই হয় নাই। ইহার দুই বৎসর পরেই তিনি সৈনিকবিভাগের এক জন কর্ম্মচারীকে বিবাহ করেন। বিবাহান্তে স্বামীর সহিত তিনি প্রাচ্য ভূখণ্ডে চলিয়া আইসেন; সিঙ্গাপুর, হংকং প্রভৃতি স্থানে বহুদিন অতিবাহিত করেন। তখন তিনি বিবাহিত জীবনের সুখ দুঃখ ও চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলেন; সে সময় তিনি অবসরমত ছোট গল্প লিখিতেন, কিন্তু তাহার অধিকাংশই দুর্ভাগ্যক্রমে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতেন। ইহার পর তিনি নানা মাসিকপত্রে ছোট ছোট গল্প লিখিতেন। তখন চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁহার জ্ঞান জন্মিয়াছে। রমণীদিগের কোনও বিষয় লইয়া একখানি উপন্যাস রচনার ইচ্ছা এই সময়ই তাঁহার মনে উদিত হয়,—তাহার ফলে Ideala গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়।

সমালোচনা সম্বন্ধে মতামত।

তাঁহার পুস্তকের সমালোচনা লইয়া সারা গ্র্যাণ্ডের মাথা ব্যথা নাই। তিনি বলেন যে, সময় সময় পুস্তকের এমন সমালোচনা হইয়া থাকে, যাহা পাঠ করিলে উপকারের সম্ভাবনা থাকে; কিন্তু সেরূপ সমালোচনা নিতান্তই দুষ্প্রাপ্য। কাজেই সেরূপ সমালোচনার অনুসন্ধানে সময়ব্যয় করা অনাবশ্যক। তাঁহার মতে সমালোচনা সম্বন্ধে নিতান্ত উদাসীন হইয়া রচনা করাই ভাল; কারণ, সর্ব্বদা কিরূপ সমালোচনা হইবে এই ভয় করিলে, রচনা করা দুষ্কর হইয়া উঠে। তবে দুঃখের বিষয়, সারা গ্র্যাণ্ড এ সম্বন্ধে আপনার সঙ্কল্প রক্ষা করিতে পারেন নাই। "ডেলী টেলিগ্রাফ" পত্রে প্রকাশিত Beth Book গ্রন্থের সমালোচনা পাঠ করিয়া, নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, তিনি সেই সমালোচনার একটা জবাব লিখিয়া, কয়েকটি কথা বুঝাইয়াছেন।

মক্ষিকা-সমাচার।

আমরা সচরাচর যে সকল মক্ষিকা দেখিতে পাই, তাহারা সকলেই এক শ্রেণীর অন্তর্গত নয়; ইহাদের মধ্যে নানা বিভাগ আছে, এবং প্রত্যেকবিভাগভুক্ত মক্ষিকার কার্য্য ও আকার প্রভৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। গ্রীষ্মকালে প্রতিগৃহে যে জাতীয় মক্ষিকার আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য।

পতঙ্গ জাতির মধ্যে নানা বিভাগ আছে। প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাদের পক্ষ-সংখ্যার অনুসারে কতকগুলিকে দ্বিপক্ষ, এবং কয়েক জাতিকে চতুঃপক্ষ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। সাধারণ মক্ষিকা দ্বিপক্ষ শ্রেণীর অন্তর্গত। এই শ্রেণীর স্ত্রীমক্ষিকাগুলি ক্ষুদ্র জীবনে সাধারণতঃ চারি বার অণ্ড প্রসব করে; প্রত্যেক মক্ষিকার অণ্ডসংখ্যা প্রতি বারে প্রায় শতাধিকসংখ্যক হইতে দেখা যায়।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রসবের পর সন্তানপালনের জন্য মক্ষিকাকে অণুমাত্র কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না। পুরীষময় দুর্গন্ধপূর্ণ স্থানে পূর্ব্বপ্রসূত অণ্ডগুলি বিনা যত্নে পরিণতি লাভ করিতে থাকে, এবং কয়েক দিবসের মধ্যেই ডিম্বভেদ করিয়া এক প্রকার ঈষৎ-দীর্ঘ বর্ত্তুলাকার কীট বহির্গত হয়। আবার এই কীট কালসহকারে যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইলে, তাহা হইতে সাধারণ মক্ষিকার পতঙ্গ উৎপন্ন হয়। মক্ষিকার সহিত ইহার আকারগত পার্থক্য লক্ষ্য করিলে, এই কীট হইতেই যে মক্ষিকার উৎপত্তি হয়, তাহা সহজে বিশ্বাস হয় না।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মক্ষিকা-কীট পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, ইহাদের শরীর কতকগুলি অঙ্গুরীয়াকার পদার্থে নির্ম্মিত। এই অঙ্গুরীয়-সংখ্যা সাধারণতঃ দ্বাদশটি থাকে। প্রথম অঙ্গুরীয়কে মস্তক; ও তাহার সহিত দুইটি অতিক্ষুদ্র ডিম্বাকার মাংসপিণ্ড সংলগ্ন থাকে। এই অবস্থায় মক্ষিকা-কীটের চক্ষু ইত্যাদি অপর কোনও ইন্দ্রিয় থাকে না। পূর্ব্বোক্ত পুরোবর্ত্তী অণ্ডাকার অংশ দ্বারা কেবল নিকটস্থ পদার্থ স্পর্শ করিয়া আহারাদি সম্পন্ন করে। পাঠকপাঠিকাগণ দেখিয়া থাকিবেন, এই জাতীয় কীটমাত্রই সর্প প্রভৃতি পদহীন সরীসৃপের ন্যায় বুকে হাঁটিয়া চলা ফেরা করে; মক্ষিকা-কীটের গতিবিধির ব্যবস্থা প্রায় তদ্রূপ। ইহাদের শরীরাবরণের দ্বিতীয় অঙ্গুরীয়কে দুইখানি অতি ক্ষুদ্র পদ সংলগ্ন থাকে; কিন্তু এই পদযুগলের অনুপাতে শরীর অত্যন্ত বৃহৎ বলিয়া, গমনাগমন কার্য্যে ইহারা পদের বিশেষ সাহায্য পায় না।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, পূতিগন্ধময় স্থানে গলিত পদার্থ আহার করিয়া কীট সকল বর্দ্ধিত হইলে, কয়েক দিবসের মধ্যে, তাহারা অঙ্গুরীয়াবরণ ভেদ করিয়া, সাধারণ মক্ষিকারূপ প্রাপ্ত হয়। মক্ষিকাশাবক এই প্রকারে আবরণ-নির্ম্মুক্ত হইয়াই শরীরস্থ বায়ুকোষ হইতে বায়ুনিষ্কাশন করিয়া, আপনাদের পক্ষযুগলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নলিকাগুলি বায়ুপূর্ণ করিতে থাকে। এই উপায়ে পক্ষদ্বয় কিঞ্চিৎ লঘু হইয়া উঠিলেই, দুই চারি বার পক্ষ আন্দোলন করিয়া, ইহারা জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যগুলির সূত্রপাত করিতে থাকে।

পতঙ্গ ও অপরাপর প্রাণীদিগের শারীরিক গঠনাদি বিষয়ে অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হয়; তন্মধ্যে অস্থিসংস্থানের পার্থক্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অধিকাংশ জীবের অস্থিই চর্ম্মাবরণের মধ্যে মাংসের সহিত জড়িত থাকে, কিন্তু পতঙ্গ-শরীরের অভ্যন্তরে প্রায়ই অস্থি দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদের দেহের উপরিভাগে যে কঠিন আবরণ দৃষ্ট হয়, তাহাই পতঙ্গ-শরীরে এককালে চর্ম্ম ও অস্থির কার্য্য সম্পাদন করে। মক্ষিকাদেহের এই অস্থিময় আবরণ কেবল একই পদার্থে নির্ম্মিত নয়। বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, এই কঠিন আবরণে তিনটি পৃথক পৃথক স্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রথম স্তরটি একপ্রকার স্বচ্ছ পদার্থে নির্ম্মিত। মক্ষিকার সর্ব্ব গাত্র ও পক্ষদ্বয় কেবল এই উপাদানে গঠিত। ইহাদের পক্ষযুগলে যে শিরাময় অস্বচ্ছ রেখা দৃষ্ট হয়, বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বলেন, কেবল উক্ত স্বচ্ছপদার্থ পক্ষের স্থানে স্থানে ঘনীভূত হইয়া তাহা উৎপন্ন করে। মক্ষিকাদেহাবরণের দ্বিতীয় স্তরটি তন্নিম্নস্তরের সহিত প্রায়ই

দৃঢ়রূপে আবদ্ধ থাকে; এই জন্য এ উভয় একই স্তর বলিয়া অনেক সময় ভ্রম হয়। কিন্তু ইহাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। ঊর্দ্ধতন স্তরটি প্রায়ই এক প্রকার রঞ্জিত উপাদানে নির্ম্মিত; ভ্রমরের ঘোরকৃষ্ণ শরীর ও মক্ষিকার ঈষৎপাটল অঙ্গ, উল্লিখিত দ্বিতীয়স্তরস্থ বিশেষ বর্ণ দ্বারা উৎপন্ন হয়।

মক্ষিকার মুখাকৃতি কিছু নূতন ধরণের। পিপীলিকা প্রভৃতি কীটের ন্যায় ইহারা দংশন বা কোনও কঠিন দ্রব্য ভক্ষণ করিতে পারে না। যে সকল পদার্থ তরল, বা যাহা ঈষৎ লালার সংযোগে দ্রব হইয়া যায়, তাহাই ইহাদের আহার্য্য। এই সকল দ্রব্যে হস্তিশুণ্ডাকার একটি হুল প্রবেশ করাইয়া দিয়া মক্ষিকা সকল আহার্য্য টানিয়া উদরসাৎ করে। শুণ্ডাকার অঙ্গটির দৈর্ঘ্য নির্দ্দিষ্ট করা যায় না, মক্ষিকা সকল যথেচ্ছ ইহার হ্রাস বৃদ্ধি করিতে পারে।

প্রকৃতির শিল্পনৈপুণ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা নৈসর্গিক ঘটনায় প্রতিনিয়তই আমাদের নয়নগোচর হইতেছে; অতি সূক্ষ্ম আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদণু হইতে অনন্ত গ্রহনক্ষত্রখচিত বিশাল আকাশমণ্ডল পর্য্যন্ত, সকলই প্রকৃতিদেবীর অলৌকিক শিল্পচাতুর্য্যের নিত্যপরিচায়ক। ক্ষুদ্র মক্ষিকার অতিক্ষুদ্র চক্ষুর নির্ম্মাণ-ব্যাপার ইহার আর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পাঠকপাঠিকাগণ, বোধ হয়, অবগত আছেন, প্রাণিচক্ষুমাত্রেরই গঠনকৌশল অতি সুনিয়ন্ত্রিত। যেমন ফটোগ্রাফ যন্ত্রে একখানি স্থূলমধ্য কাচ দ্বারা যন্ত্রের মধ্যস্থ পরদায় বাহ্য পদার্থের নিখুঁত ছবি পাতিত করা যায়, চক্ষেও সেই প্রকার এক খণ্ড স্থূলমধ্য স্বচ্ছকোষ (crystaline-lens) আছে, এবং ঠিক তাহারই পশ্চাদ্ভাগে একখানি স্নায়ুব্যাপ্ত পরদা থাকে। ফটোগ্রাফ যন্ত্রের ছবির ন্যায় দর্শনীয় বাহ্য পদার্থের ছবি সেই স্নায়ুময় পরদায় পতিত হইলে, স্নায়ু ও মস্তিষ্কের যোগে দর্শন-জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। সাধারণ প্রাণিদেহে এই প্রকার সুব্যবস্থিত দুইটি চক্ষু দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়া থাকেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রত্যেক মক্ষিকার মস্তকে উক্তরূপ চারি হাজার চক্ষু সংলগ্ন আছে, এবং এতদ্ব্যতীত ইহাদের ললাটদেশে আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষু দৃষ্ট হয়। পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, এই অসংখ্য মক্ষিকাচক্ষুগুলির মধ্যে একটিও দর্শনকার্য্যের উপযোগিতা বা গঠনকৌশলে মানবচক্ষু অপেক্ষা অণুমাত্র হীন নহে।

সাধারণ জীবমাত্রেরই দেহস্থ স্নায়ুমণ্ডলী মস্তিষ্কের এক নির্দ্দিষ্ট অংশে আসিয়া মিলিত হয়; এই জন্য মস্তিষ্কস্থ স্নায়বিক কেন্দ্রে কোনও প্রকার

আঘাত প্রদান করিলে, বা মস্তক দেহচ্যুত হইলে, তৎক্ষণাৎ জীবের প্রাণবিয়োগ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। মক্ষিকাদেহে কেবলমাত্র মস্তিষ্কেই স্নায়বিক কেন্দ্র থাকে না; সাধারণতঃ ইহাদের মস্তক ও দেহের মধ্যাংশ, এই দুই স্থানে দুইটি পৃথক স্নায়বিক কেন্দ্র দৃষ্ট হয়; এই জন্য মক্ষিকামস্তক শরীরচ্যুত করিলেও, হঠাৎ ইহাদের মৃত্যু ঘটে না; বিচ্ছিন্ন অংশদ্বয়ে যে পৃথক পৃথক স্নায়বিক কেন্দ্র থাকে, তদ্দ্বারা জীবনীশক্তি কিয়ৎকাল অপ্রতিহত থাকে। এতদ্ব্যতীত মক্ষিকাশরীরে রক্তসঞ্চালনগতি অতীব মন্থর বলিয়া শোণিতশোষক অক্সিজেন বাষ্প সর্ব্বদাই প্রচুরপরিমাণে দেহে সঞ্চিত থাকে। মক্ষিকার আঘাতসহিষ্ণুতার ইহা অন্যতম কারণ।

মক্ষিকার শ্বাসকার্য্যের যে ব্যবস্থা আছে, অপর পার্থিব জীবে তাহা প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। শ্বাসকার্য্যের জন্য অপর প্রাণিদেহে যেমন এক একটি যন্ত্র নির্দ্দিষ্ট থাকে, ইহাদের তদনুরূপ কোনও ব্যবস্থাই নাই। মক্ষিকাদেহের সর্ব্বাঙ্গে কতকগুলি সূক্ষ্ম ছিদ্রপথ আছে, তদ্দ্বারা বায়ু শরীরপ্রবিষ্ট হইয়া শ্বাসকার্য্য শ্বাসসম্পন্ন করে। যাহাতে ধূলিকণা প্রভৃতি সূক্ষ্ম পদার্থ ছিদ্রপথে পতিত হইয়া কার্য্যের ব্যাঘাত উৎপাদন করিতে না পারে, ছিদ্রপথে তাহারও সুব্যবস্থা আছে।

মক্ষিকার পদযুগলের নির্ম্মাণকৌশলও বিস্ময়কর। পাঠকপাঠিকাগণ অবশ্যই দেখিয়াছেন, মক্ষিকারা কাচ প্রভৃতি অতিমসৃণ পদার্থের উপর স্খলিতপদ না হইয়া, যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া থাকে। প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ বহু অনুসন্ধান ও পরীক্ষায় মক্ষিকার অনায়াসবিচরণের কারণ আবিষ্কৃত করিয়াছেন। পণ্ডিতগণ বলেন, পিচ্ছিল স্থানে বিচরণকালে ইহাদের পদপ্রান্ত হইতে এক প্রকার লালা নির্গত হইয়া পদযুগল যে কোন স্থানে সংলগ্ন করিয়া রাখে; এতদ্ব্যতীত ইহাদের পদের নিম্নদেশ কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কেশবৎ পদার্থে আবৃত থাকে, তদ্দ্বারাও এই কার্য্যের কতকটা সহায়তা হয়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। মাঘ। প্রথমেই শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের "শ্রীপঞ্চমী";—দীনেন্দ্র বাবুর নিজের পুরাতন ছাঁচে ঢালা একখানি পল্লীচিত্র। বঙ্গীয় পল্লীর বিচিত্র উৎসব, পল্লীবাসীর ক্ষুদ্র বৃহৎ বিবিধ সুখ দুঃখ যে সাহিত্য-চিত্রের বিষয়ীভূত, সে বিষয়ে কোনও বিজ্ঞতম সম্পাদকের সহিত এই অজ্ঞতম লেখকের অণুমাত্র মতভেদ নাই। নিরীহ নগরবাসীর পুরদশ্যপীড়িত ক্ষুধিত নয়নে জননী জন্মভূমির স্নিগ্ধ শ্যামল সৌম্য ছবি যে সম্পূর্ণ অভিনব ও সমধিক প্রীতির পদার্থ, এ বিষয়েও বোধ করি প্রমাণ উপস্থিত করিবার আবশ্যক অল্প। কিন্তু চিত্রের বিষয় যতই মনোজ্ঞ হউক, সুচিত্রিত না হইলে আক্ষেপের অবকাশ ঘটে। দীনেন্দ্র বাবুর প্রথম-রচিত চিত্রগুলির প্রত্যগ্র মাধুর্য্য, মনোরম বর্ণবিন্যাস, তাঁহার শেষ চিত্রমালায় সুলভ নহে। সৌন্দর্য্যসৃষ্টির মধ্যেই নব নব ভাববিকাশের আশা করা যায়। নিপুণ শিল্পী যদি পুরাতন সৌন্দর্য্যশূন্য 'চিত্র-বস্তু'র নূতন অঙ্গরাগ করিয়া জাঁকাল ফ্রেমে বাঁধাইয়া সাধারণের সমক্ষে উপনীত করেন, তাহা বর্ণপ্রিয় বালকের নেত্ররঞ্জন করিতে পারে; কিন্তু সৌন্দর্য্যপিপাসীর চিত্তরঞ্জনের পক্ষে বর্ণবৈচিত্র্যমাত্রই পর্য্যাপ্ত নহে। সে জন্য অভিনব সৃষ্টি, ভাববিশেষের অভিব্যক্তি, প্রকৃতির সহিত সঙ্গতি প্রভৃতি বহুতর বিষয়ে শিল্পীর অবধান আবশ্যক। নিপুণ চিত্রকর দীনেন্দ্র বাবু ক্রমাগত নিজের পূর্ব্বসৃষ্টির পুনরাবৃত্তি ও অন্ধ অনুকরণ না করিয়া নূতন ক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করেন, ইহাই আমাদের অভিপ্রেত। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "স্বাগত ও বিদায়" দুইটি গান, কবিতারূপে প্রকাশিত হইয়াছে। "স্বাগত" সুন্দর, কিন্তু "বিদায়" অকিঞ্চিৎকর। শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মিত্রের "হিমালয়ে" দার্জিলিং ভ্রমণের বিবরণ, সুখপাঠ্য; কিন্তু ভাষা গ্রাম্যতাদোষে অত্যন্ত দুষ্ট। লেখকের হাস্যরসসমাবেশের অত্যন্ত প্রয়াস অনেক স্থলেই বিফল হইয়াছে। রহস্যরচনা যেমন পাঠকদের, তেমনই লেখকদের পক্ষেও প্রলোভনস্বরূপ; ধর্ম্মশাস্ত্র বলেন, প্রলোভন জয় করিবে। আর সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রও বলিয়া গিয়াছেন, হাস্যরসরচনা কিছুদিন ফেলিয়া না রাখিয়া ছাপাইও না। উভয় উপদেশই অমূল্য ও অবশ্যপ্রতিপাল্য মনে করি। শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "চন্দ্র" পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্যোতিষশাস্ত্রীয় প্রবন্ধ। কিন্তু সাধারণের পক্ষে আয়ত্ত করা সহজ নহে। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের "মীর কাসিম" দশম পরিচ্ছেদ এবার প্রকাশিত হইয়াছে। "স্বরলিপিতে" শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর গানটি উচ্চভাবে অনুপ্রাণিত। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী "পাণ্ডারপুর" প্রবন্ধে 'বোম্বাই অঞ্চলের সর্ব্বপ্রধান তীর্থস্থানের' বিবরণ দিয়াছেন। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বাভাবিক ভ্রমণরচনানৈপুণ্য 'পাণ্ডারপুরেও' প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। বিবিধ দ্রষ্টব্য বিষয়ের, দেশের ও দেশবাসীর, নিজের ও সঙ্গীর বিবিধ ঘটনার সমাবেশে ভ্রমণবৃত্তান্তটি মনোরম। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "হাসির গানে" 'মধুরে সমাপ্তি'।

ভারতী। ফাল্গুন। "বসন্ত-বন্দনা" শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রচিত কবিতা। বসন্তের বন্দনা নহে, বর্ণনা। "প্রফুল্লমুখী" শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের রচনা। লেখক বলিতেছেন, "দেবী চৌধুরাণী যখন প্রথম পড়ি, তখন উপন্যাসের গল্পাংশ ও প্রফুল্লমুখীর মধুময় চরিত্র বড় মধুর বোধ হইতেছিল; কিন্তু দেবী যে নিষ্কাম ধর্ম্মের আদর্শ, এ বিষয়ে মনে কেমন একটা খট্‌কা লাগিয়াছিল। * * * সাধারণকে জানাইলে এই খট্‌কার একটা সুমীমাংসা হইবার সম্ভাবনা,

এই আশায় এই প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি।" লেখকের আশা সফল হউক। প্রবন্ধটি সুচিন্তিত ও সুরচিত। এই প্রবন্ধের আর একটু বিশেষত্ব আছে, তাহার উল্লেখ আবশ্যক। উপসংহারে লেখক বলিতেছেন, "মহাকবির কাব্যে যে সকল অসঙ্গতি, অসম্পূর্ণতা, অসামঞ্জস্য প্রথম দৃষ্টিতে লক্ষিত হয়, তাহা অনেক স্থলে সমালোচকের বুদ্ধি ও বিবেচনার দোষে, কাব্যের ত্রুটিবশতঃ নহে। গ্রন্থকার মহাকবি, তাঁহার গ্রন্থ মহাকাব্য। ঘোলা জলে সূর্য্যের মলিন প্রতিবিম্ব হয়! সেটা কি সূর্য্যের দোষ, না জলের দোষ?" প্রবন্ধটির আদ্যন্ত এইরূপ বিনয়ে সিক্ত। অকারণে বা অল্প কারণে বঙ্কিম বাবুকে গালি দেওয়া আজকালকার 'ফ্যাশান্' বলিলেও চলে। হীরেন্দ্র বাবুও অনায়াসে বঙ্কিম বাবুকে দুই চারিটি পুষ্পাঞ্জলি দিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি তাহার পরিবর্ত্তে বর্ত্তমান রচনায় যেরূপ শান্ত সংযম ও মধুর বিনয়ের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালী বাক্যবাগীশগণের দৃষ্টান্তস্থল। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল শীল "দেশ বিদেশ" প্রবন্ধে "রামটেক" নামক মধ্যভারতের 'একটি পবিত্র হিন্দুতীর্থে'র পরিচয় দিয়াছেন। রচনাপ্রণালীর দীনতায় প্রবন্ধটির সৌন্দর্য্যহানি হইয়াছে। "শীতলা ষষ্ঠী" শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের রচিত পল্লীচিত্র। "কোকিল ও বিরহিণী" শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের হাসির গান। "দুইটি শব্দ" শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসুর রচিত একটি চলনসই গল্প। গল্পরচনায় লেখকের প্রবণতা আছে। আশা করি, তাঁহার সাধনা সফল হইবে। "বিশ্বাসে সন্দেহে" অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত একটি কবিতা। সুপরিচিত শব্দমালায় গ্রথিত এই বাঙ্গলা কবিতাটির অর্থ-গ্রহণ করিতে ও উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া আমরা প্রথমে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া মনে মনে নিজ বুদ্ধির প্রতি অনেক দোষারোপ করিয়াছিলাম। কিন্তু পরে জানা গেল, আমার মত অনেকেই ইহার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারেন নাই। বিধাতা "বিশ্বাসে সন্দেহে"র তুল্য কবিতা বুঝিবার শক্তি না দিন, আশ্বাস দিতে কুণ্ঠিত নহেন; সুতরাং আমরা আশ্বস্ত হইয়াছি।

মুকুল। মাঘ। "শিশুর আকাঙ্ক্ষা" একটি ক্ষুদ্র কবিতা। "স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাস" একটি সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত। লেখক বলেন, "বাল্যাবস্থাতেই দুর্গামোহনের কয়েকটি গুণ দেখা গিয়াছে, প্রথম পাঠে মনোযোগ। * * * তাঁহার দ্বিতীয় একটি গুণ এই ছিল যে, তাঁহার অবস্থা ভাল, নিজের পিতা ও খুড়া বড়মানুষ, এ জন্য তাঁহার একটুও অহঙ্কার ছিল না। * * * তাঁহার তৃতীয় একটি গুণ ছিল যে, তিনি পরদুঃখকাতর ছিলেন।" উত্তরকালে স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের চরিত্রে এই সকল গুণ বিকশিত হইয়াছিল। দুর্গামোহন বাবুর চিত্রখানি অতি সুন্দর হইয়াছে। "পার্লামেণ্ট দর্শন" প্রবন্ধটি মনোরম ও বালক পাঠকদের উপযোগী। এই প্রবন্ধে পার্লামেণ্টের দুইখানি ছবি আছে। "কানপুর" প্রবন্ধে কানপুরের বর্ণনাপ্রসঙ্গে সিপাহী-বিদ্রোহের একটু ইতিহাস আছে। এই প্রবন্ধের "স্মৃতিচিহ্নের" ছবিটি সুন্দর। "সূর্য্য-গ্রহণ" প্রবন্ধটি উৎকৃষ্ট। লেখক সহজ ভাষায় ও গল্পচ্ছলে গ্রহণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিয়া, অবশেষে তিনখানি চিত্রের সাহায্যে বিগত সূর্য্যগ্রহণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

মুকুল। ফাল্গুন। "ব্রাডল, ব্রাইট ও ফসেট" প্রবন্ধে উক্ত তিন জন ভারতহিতৈষীর জীবনচরিতবর্ণনার চেষ্টা আছে; সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে তিন জনের একজনকেও লেখক চিত্রিত করিতে পারেন নাই। ব্রাডল ও ব্রাইটের ছবি দুইখানি জঘন্য, ফসেটের ছবিখানি মন্দ নহে। "রাক্ষসের দেশে" আন্দামানের নামমাত্র বিবরণ আছে। আন্দামান দ্বীপের নাম শুনিয়া যে কৌতূহল উদ্দীপিত হয়, পড়িয়া তাহার তৃপ্তি হয় না। আন্দামানের আদিম অধিবাসীদের ছবিখানির ছাপা বড় অস্পষ্ট। "লণ্ডনের গল্প" মন্দ নয়। "অতিবুদ্ধি" একটি রহস্য-কবিতা। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, লেখকের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে।

উৎসাহ। কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ দুই পৃষ্ঠায় "উপন্যাসের উপযোগিতা" প্রতিপাদিত করিয়াছেন! শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়ের "জগৎ শেঠ" নামক ঐতিহাসিক প্রবন্ধটি বেশ হইতেছে। "বিহঙ্গমের উপকারিতা" শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বিশ্বাসের রচনা। প্রবন্ধটি মনোজ্ঞ ও জ্ঞাতব্য তত্ত্বে পূর্ণ। শ্রীযুক্ত শশধর রায়ের "নর বানর" একটি সঙ্ক্ষিপ্ত ও সুন্দর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ।

উৎসাহ। পৌষ। শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের "এডিটার" একটি চলনসই নক্সা। "জুনিয়ার উকীল" একটি পদ্য—পাঁচালীর ছড়ার সঙ্গেও খাপ খায় না,—তাহার উর্দ্ধে আনিতেও প্রবৃত্তি হয় না। হায় কষ্টকল্পিত রহস্যরচনা! "জুনিয়ার উকীল" হাস্যরসের উদ্রেক করিতে না পারুন, তাঁহার কল্যাণে "উৎসাহ" হাস্যভাজন হইয়াছেন।

উৎসাহ। মাঘ। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের "বাঙ্গালা ভাষার লেখক" প্রবন্ধটি আমরা আগ্রহসহকারে পাঠ করিয়াছি,—কিন্তু এই নিবন্ধের প্রতিপাদ্য কি, তাহা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। অক্ষয় বাবু পাঠকের পক্ষে বলিতেছেন,—"অন্যান্য সুন্দর বস্তুর ন্যায় সুন্দর সাহিত্যকে ও বাঙ্গালী হতাদর করে না;—ইহার প্রমাণ চাহ ত এবারে শিক্ষিত বাঙ্গালীর গৃহসজ্জার মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া দেখ,—গৃহস্বামীর যেরূপ রুচি তদনুরূপ দুই চারি খানি ইংরাজী সাহিত্য দেখিতে পাইবে। তাঁহার বিশ্বাস, বাঙ্গলা সাহিত্যে কিছু নাই; কেবল সেই জন্যই বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার রুচি হয় না!" অনেক তথাকথিত 'শিক্ষিত' বাঙ্গালীর 'গৃহসজ্জার মধ্যে অনুসন্ধান' করিয়াছি, দুর্ভাগ্যক্রমে দুই চারিখানি কলেজপাঠ্য কেতাবের ছিন্নাবশেষ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাই নাই। সাড়ে পনের আনা শিক্ষিত বাঙ্গালীর ঘরে সাহিত্যের সম্পর্কও নাই, আমাদের এই সংস্কার। ইহা বোধ করি অতি রঞ্জিত অত্যুক্তি নহে। বাঙ্গালীর অধ্যয়নানুরাগ সুপ্রসিদ্ধ!—নূতন করিয়া তাহা প্রমাণিত করিবার চেষ্টা বাক্যের অপব্যয়মাত্র!

পুণ্য। মাসিকপত্র ও সমালোচন। শ্রীমতী প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ১ম হইতে ৫ম সংখ্যা পর্য্যন্ত। আমরা সাদরে "পুণ্যের" আবাহন করিতেছি। সম্পাদিকা এক সময়ে "সাহিত্যে" আমাদের সাহায্য করিতেন; বহুদিন তাঁহাকে সাহিত্যক্ষেত্রে না দেখিয়া আমরা দুঃখিত ছিলাম। সম্প্রতি তাঁহাকে এই নূতন ব্রতে দীক্ষিত হইতে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। আশা করি, তিনি অবলম্বিত ব্রতে সাফল্য লাভ করিবেন। এই তিন সংখ্যা "পুণ্য" দেখিয়া মনে হয়, আমাদের আশা বিফল হইবে না। "সূচনায়" উল্লিখিত হইয়াছে, "পূর্ব্বাবধি এই নামেই ইহা আমাদের গৃহে পরিচালিত হইত, এবং হস্তযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া আমাদের আপনাদের মধ্যেই প্রকাশিত হইত। এখন তাহা লোক-হিতার্থে জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশিত হইল; * * * এই পত্রে জনসমাজের উপযোগী সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, সঙ্গীত প্রভৃতি নানাবিষয়ক প্রবন্ধই স্থান লাভ করিবে। এতদ্ভিন্ন ইহাতে গৃহস্থের এবং মানবমাত্রেরই সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন আহারের বিষয় প্রতি মাসেই থাকিবে। ইহাতে গার্হস্থ্যধর্ম্মের অনুকূল শিল্পবিদ্যা প্রভৃতিরও অভাব দূর করিবার সাধ্যমত চেষ্টা করা যাইবে।" এ দেশে গার্হস্থ্য 'পারিবারিক' পত্রের অভাব আছে। "পুণ্যের" উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হইলে, সে অভাব দূর হইবে। প্রথম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "তর্পণতত্ত্ব" ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "রমণীর মাতৃত্ব" পুণ্য-প্রবৃত্তির উদ্বোধক উল্লেখ-যোগ্য প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বালক তানসেন" সুখপাঠ্য। দ্বিতীয় সংখ্যায় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "মনুসংহিতা ও মাতৃভাব" উৎকৃষ্ট সন্দর্ভ,—আলোচনার যোগ্য। তৃতীয় সংখ্যায় "রমণীর ব্রহ্মচর্য্য ও পতিসেবা" পূর্ব্বপ্রকাশিত "মনুসংহিতা ও মাতৃভাব"

প্রবন্ধেরই অনুবৃত্তি। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উল্লিখিত প্রবন্ধগুলি আর্য্যঋষিদের ভাবে পরিপূর্ণ;—'সাহেবিয়ানা'র বিপরীত, কিন্তু 'আর্য্যামি' নহে। এ বিষয়ে ক্ষিতীন্দ্র বাবুর সমুদায় বক্তব্য সমাপ্ত হইলে, আমাদের বিস্তারিত আলোচনার সঙ্কল্প রহিল। ৪—৫ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্করের রচিত "মহারাষ্ট্রীয়গণের ধর্ম্মোন্নতি" নামক সন্দর্ভটি উল্লেখ যোগ্য। এই প্রবন্ধে দেউস্কর মহাশয়ের মৌলিকতা ও চিন্তাশীলতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া, এই সন্দর্ভের অঙ্গহানি করিব না;—পাঠকগণ অভিনিবেশসহকারে আদ্যন্ত পাঠ করিলে, 'মহারাষ্ট্রীয়গণের ধর্ম্মোন্নতি' বিষয়ে অনেক অভিনব ও শিক্ষণীয় তত্ত্ব অবগত হইবেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর "সেনরাজগণের ইতিহাস" গবেষণাপূর্ণ প্রত্নতত্ত্ব। এই প্রবন্ধে লেখক পুরাতন মতের প্রতিবাদ ও নূতন মতের সংস্থাপন করিতেছেন। শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর "কমলানেবু" প্রবন্ধে 'কমলা ও অরেঞ্জ প্রভৃতি দেশীয় ও বিদেশীয় নামগুলি কোথা হইতে আসিল, কেনই বা আসিল, কোথায় বা তাহাদের জন্মস্থান', দক্ষতাসহকারে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। "পুণ্যের" আর একটি বিশেষত্ব—আহারের ব্যবস্থা।—চন্দ্রকণা বা চন্দ্রকান্ত মেঠাই, বাগ্দা চিংড়ীর কট্‌লেট্‌, মেটের দোপেঁয়াজা, রামমোহন পোলাও, রুই মাছের ঘণ্ট প্রভৃতি সূপশাস্ত্রীয় প্রবন্ধগুলি চিত্তাকর্ষক,—মুখরোচক। এই 'পাউডার' ও 'রুজ্‌', 'বড়িস্‌' ও 'ব্রূচ্‌', 'ফ্যান্‌' ও 'ফ্যাশনে'র দিনে 'বামুনঠাকুর'ই অনেকের ভরসা।—এ অবস্থায় কাগজপত্রে "রুইমাছের ঘণ্ট" দেখিলেও আমরাও সন্তুষ্ট! এই প্রবন্ধগুলির সফলতা সম্বন্ধে প্রথমে আমাদের সন্দেহ ছিল;—কিন্তু এক্ষণে হরিদ্রারঞ্জিত ছিন্ন ভিন্ন "পুণ্য" দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি,—রান্নাঘরেও "পুণ্য" প্রবেশলাভ করিতেছে! পরিশেষে আমাদের অনুরোধ এই যে, সম্পাদিকা "পুণ্যকে" নিরবচ্ছিন্ন 'পারিবারিক' পত্রে পরিণত করুন। গৃহস্থের মানসিক উন্নতির জন্য যেমন নারীজাতির বিষয়ে আলোচনা চলিতেছে,—তেমনই পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের অনুকূল শিশুপালন, শুশ্রূষা প্রভৃতি বিষয়েও আলোচনা চলুক।

প্রদীপ। মাঘ। শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের "আসুরবিবাহ" প্রবন্ধটি উৎকৃষ্ট। এই প্রবন্ধে চন্দ্র বাবুর একখানি চিত্র আছে। শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "মূকবধিরের শিক্ষা" নামক প্রবন্ধটি সকলের পাঠ করা উচিত। "অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসুর প্রতি" কবিতাটি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা। এই অকিঞ্চিৎকর কবিতাটি কবিবর রবীন্দ্রনাথের যোগ্য হয় নাই। "অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু" নামক প্রবন্ধটি সুখপাঠ্য; কিন্তু ইংরেজি কোটেশনে অত্যন্ত কণ্টকিত।

প্রদীপ। ফাল্গুন। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "নসীরাম পালের বক্তৃতা" একটি রহস্যরচনা; লেখক অত্যন্ত ফেনাইয়া অতিবিস্তৃত করিয়া, নসীরামের বক্তৃতাকে শেষে পাঠকের পক্ষে দুর্ব্বিষহ করিয়াছেন! "স্বাধীন ও পরাধীন নারীজীবন" চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। লেখিকার মতে, হিন্দু নারীদের অবনত "অবস্থার প্রথম ও প্রধান কারণ,—সম্পূর্ণরূপে অবরোধপ্রথা ও পরনির্ভরতা।" যে সকল সমাজে রমণী স্বতন্ত্রা ও আত্মনির্ভরশীলা, সেখানেও কি স্ত্রীজাতির যথেষ্ট দুর্দ্দশা দেখা যায় না? আমাদের স্ত্রীজাতির অবস্থা অনেক অংশে শোচনীয়, সে পক্ষে সন্দেহ নাই;—কিন্তু স্বদেশী চশমা ফেলিয়া দিয়া বিলাতী অণুবীক্ষণের সাহায্যে তাহার কার্য্যকারণপরম্পরা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিলে, অনেক স্থলে প্রকৃত কারণটা অতিরিক্তমাত্রায় বড় দেখাইতে পারে। যাহা হউক, এ বিষয়ের আলোচনায় আমরা যথেষ্ট শুভফলের আশা করি।